সম্পাদক **শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন** সহকারী সম্পাদক **শ্রীসাগরময় ঘোষ**

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের নববর্ষ

ভগবানের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া 'দেশ' একবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের ..., অনুগ্রাহক, পাঠক, পাঠিকা ...কে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। বিংশ বৎসর পূর্বে 'দেশে'র যেদিন প্রতিষ্ঠা হয়, সেদিন বাংলার দিক্‌চক্রবাল পরাধীনতার গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। দেশ-মাতৃকার সন্তানবর্গ বাংলার বুকে হোমহুতাশন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। তাহার ধূম্র ধূপের আবর্ত আকাশ বাতাসে বিস্তারলাভ করিতেছিল। যজ্ঞধ্বংসী ...দের বিদ্যুৎবজ্র সাধনারত সন্তান-...কে লক্ষ্য করিয়া বধ বন্ধনের বিভীষিকা ...কীর্ণ করিতেছিল। রাজরোষের ভ্রূকুটি ...হ্য করিয়া আমাদিগকে পদে পদে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কম্পিত আমরা কোনদিন হই নাই। পক্ষান্তরে 'দেশ'-মাতৃকার সেবার অগ্নিময় উদ্দীপনাই অন্তরে লইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের কঠোর সাধনার পথে আমরা সদাসর্বদা দেশবাসীর সমর্থন এবং সহযোগিতা লাভ করিয়াছি। দেশ-বাসীর এই সহযোগিতাই আমাদের পথের একমাত্র সম্বলস্বরূপে কাজ করিয়াছে। দেশবাসীরা 'দেশ'কে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছেন। তাঁহাদের সেই প্রীতির প্রভাবে ভারতের সাময়িক পত্র সাপ্তাহিক 'দেশ' বর্তমানে সর্বাগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যেখানে বাঙ্গালী সেইখানেই 'দেশ'—বিনয় বিনম্রচিত্তে 'দেশে'র প্রতি বাঙ্গালী সমাজের এই অনন্যসাধারণ অনুরাগ আমরা স্বীকার করিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি। আমাদের কৃতিত্বের মূল্য ইহার মূলে বড় কিছু যে আছে, এমন কথা আমরা বলিব না। বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেম এবং নিজেদের সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাই ইহার মূলে রহিয়াছে। আমরা যেন সেই শ্রদ্ধাবৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতে পারি। আজিকার দিনে 'দেশের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। তাঁহার স্বদেশপ্রেম, আদর্শ-নিষ্ঠা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অপরিসীম প্রীতিবৃদ্ধি আমাদের দুর্গম লক্ষ্য সাধনার পথে সদাসর্বদা অনুপ্রাণিত রহিয়াছে। 'দেশে'র বর্তমান প্রতিষ্ঠা দেখিলে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিতেন। গুরু এবং উপদেষ্টা-স্বরূপে আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি এবং নববর্ষের ব্রত উদ্‌যাপনে দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিতেছি। আমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক্। আমরা যেন ব্রত হইতে বিচলিত না হই। দেশ-সেবার যে অগ্নিমন্ত্রে আমরা দীক্ষালাভ করিয়াছিলাম, সেই মন্ত্র অন্তরে উদ্দীপ্ত থাকুক। 'অগ্নে ব্রতপতে, ব্রতং চরিষ্যামি' নববর্ষে এই সঙ্কল্পই আমরা পুনরায় গ্রহণ করিতেছি।

জমিদারী উচ্ছেদ বিল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আইন সভায় উত্থাপিত জমিদখল বিলের ... সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় বিধান সভার অধিবেশন আগামী ৮ই নবেম্বর আরম্ভ হইবে। আমরা যতদূর বুঝিতেছি, বিলটির আলোচনা ... বিবেচনায় অতিরিক্ত সময় ক্ষেপ না করিয়া দ্রুত ইহা বিধিবদ্ধ করিয়া লওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য। কি জন্য এ ... বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে জমিদারী উচ্ছেদ ... প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারমূলক নানা আইন ও বিধান সম্প্রতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতাবৎকাল বিচার-বিবেচনা ও আশ্বাস দিয়া এ সম্বন্ধে জনগণের দাবী ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং সময়োচিত কর্তব্য পালনে তাঁহাদিগকে এখন আগ্রহী হইতে হইয়াছে। আইনটি কবে বিধিবদ্ধ হইবে তাহার সময়ের নিরিখও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথারীতি আইন প্রণীত ও প্রবর্তিত হইল বলিয়া সরকার পক্ষে বিবৃতি প্রদানের পর এক বৎসরের মধ্যে সরকার পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা...

উচ্ছেদ সাধন করিবেন। ইহা ছাড়া, আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, কলিকাতার সমগ্র মিউনিসিপ্যাল এলাকা বিলটির আওতার মধ্যে লওয়া হইয়াছে। মূল বিলে প্রথমে কলিকাতা শহরকে বিলের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। সরকার কর্তৃক জমি দখল এবং জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপের নামে যাহা বুঝায় সেই প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, জটিল এবং কঠিন কাজ। সেই কাজ পূর্ণ করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা আশা করি, বিধান সভায় বিলটির আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ অকারণ বাধা সৃষ্টি করিয়া বিলটি বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিবেন না। বিলটি বর্তমান আকারে প্রাথমিক ব্যবস্থা মাত্র। এই ব্যবস্থাটি কার্যে পরিণত করিয়া ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের বৈপ্লবিক নীতির পথ উন্মুক্ত করাই কর্তব্য।

পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির নূতন গতি

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতির পদ হইতে মিঃ আব্দুল কায়ম খাঁ পদত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে সীমান্ত প্রদেশের রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে তাঁহার চিরবিদায় গ্রহণই প্রকারান্তরে সূচিত হইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। অনেকে এজন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। লোকে এখন আশা করিতেছে যে, সীমান্তের জননায়ক ডাঃ খান সাহেবের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা এখন শিথিল করা হইবে এবং যেসব জনসেবক মিঃ কায়ুমের বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া কারারুদ্ধ আছেন তাঁহারা পুনরায় কার্যক্ষেত্রে ফিরিয়া আসার সুযোগ পাইবেন। বস্তুত ইতিমধ্যেই এই পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। সীমান্তের একজন মন্ত্রী সেদিন ডাঃ খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সীমান্তের অবস্থার এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থান গণপরিষদে খান আব্দুল গফ্ফর খানের মুক্তির জন্য বিরোধী পক্ষ প্রবলভাবে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং মৌলবী ফজলুল হক একত্রে সরকারী আচরণকে নৃশংস, লজ্জাকর ও ইসলামবিরোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিঞা ইফতিখার উদ্দীন বলিয়াছেন, ইহা সরকারী দস্যুতার দৃষ্টান্ত। অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়, সীমান্ত প্রদেশের রাজনীতি হইতে মিঃ কায়ুম খাঁর অপসারণের পর খান ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির সময় হয়ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প সংকট

পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলির সমক্ষে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫২ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে উৎপন্ন ধুতির তুলনায় শতকরা ৬০ ভাগের বেশী ধুতি উৎপন্ন হইতে পারিবে না বলিয়া গত ১৯৫২ সালের নবেম্বর মাসে ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলিতে যে ধরণের কলকব্জা রহিয়াছে তাহা প্রধানত ধুতি এবং শাড়ী প্রস্তুতেরই উপযোগী এবং পশ্চিমবঙ্গে ধুতির অধিক পরিমাণে চাহিদা রহিয়াছে বিধায় এই রাজ্যের কাপড়ের কলগুলি... কর্মপ্রচেষ্টা প্রধানত এই দুই শ্রেণী উৎপাদনের উপরই নিবদ্ধ রহিয়াছে রাতারাতি উহার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নহে। পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলি এইজন্য গত এক বৎসরকাল ধরিয়া ভারত সরকারের এই আদেশ হইতে উহাদিগকে রেহাই দিবার জন্য বহু আবেদন-নিবেদন করিয়াছে। বর্তমানে ভারত সরকার এ... নূতন আদেশ দিয়াছেন যে, যে-সমস্ত কলে উপরোক্ত শতকরা ৬০ ভাগে... অতিরিক্ত ধুতি উৎপন্ন হইবে সেইস... কলের উৎপাদিত অতিরিক্ত কাপড়ে... উপর প্রতি গজে দুই আনা হইতে অ... আনা হারে অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইবে। কোন কাপড়ের ক... যাহাতে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নির্দি... শতকরা ৬০ ভাগের বেশী এক গ... ধুতিও উৎপন্ন করিতে সাহস না প... তজ্জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে এই নূতন আদেশ জারী হইয়... তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। কা... প্রতি জোড়া (১০ গজের) কাপড়ের উ... ৯।০ আনা হইতে ৫, টাকা অতি... উৎপাদন শুল্ক দিয়া কাপড় বিক্রয় ... কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

শালমঞ্জরী

স্কেচ শ্রীনন্দলাল বসু

নীতি তদনুসারেই পরিচালিত হতে থাকে, তবে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে অনেক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাকিস্তানের M E D O পরিকল্পনার অংশীদার হওয়ার সম্ভাবনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এর চেয়েও অনেক নিকটতর সমস্যা আছে যা পাকিস্তান বিধান পরিষদের সিদ্ধান্তের ফলে অবিলম্বে গুরুতর রূপ ধারণ করতে পারে। সে সমস্যা হোল পাকিস্তানের অবশিষ্ট অমুসলমান সংখ্যালঘুদের ভাগ্য নিয়ে।

পশ্চিম পাকিস্তানে অ-মুসলমান সংখ্যালঘুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গে এখনো প্রায় এক কোটি হিন্দু আছে। তাদের পক্ষে এখন কী কর্তব্য? পাকিস্তান বিধান পরিষদে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে পাকিস্তানের অ-মুসলমান অধিবাসিগণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমান নাগরিক অধিকার থেকে বৈধানিকভাবেই [illegible]শত হতে যাচ্ছে। তাহলে তারা পাকি-[illegible]াকবে কী করে? পাকিস্তানে যদি [illegible]য, তবে তাদের ন্যায্য অধিকারের [illegible] করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর [illegible]ড়াই করে আর কিছু [illegible]শা নেই। এখন কিছু করতে হলে [illegible]নিসভার বাইরে অহিংস সংগঠন ও সংগ্রামের প্রয়োজন। অত্যন্ত কঠিন পথ, কিন্তু দেশত্যাগ করে আসতে না হলে অন্য পথও নেই। আরো মুশকিল এই যে, বিধানসভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের, অন্তত গোড়াতে সম্পূর্ণ একলাই অগ্রসর হতে হবে, কারণ লীগপন্থীদের বিরোধী মুসলমান দলগুলির মধ্যে যারা বিধানসভার বর্তমান সিদ্ধান্তগুলিকে মনে মনে খারাপ বলেও ভাবে, যারা বুঝে যে অন্নবস্ত্র হীন অসন্তুষ্ট মুসলমান জনসাধারণের মন-ভুলানোই এই 'ইসলামিক' রাষ্ট্রের ধ্বজা উত্তোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, তাদের পক্ষেও হিন্দুদের ন্যায্য দাবীর সমর্থনে অগ্রসর হবার সাহস সঞ্চার করা আপাতত অত্যন্ত কঠিন হবে কারণ হিন্দুদের পক্ষ হয়ে কিছু বলতে গেলেই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলমান জনসাধারণের কাছে তাদের ইসলাম-বিরোধী বলে প্রচার করবে। এ অবস্থায় যারা ভোট চায় তাদের পক্ষে ন্যায়পথে চলা কী রকম কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং পরে যাই হোক—এবং এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে হিন্দুরা যদি সর্বপ্রকার দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে নাগরিক হিসাবে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তবে অনতিবিলম্বে মুসলমানদের ভিতর থেকেও ধীরে ধীরে প্রকাশ্য সমর্থন ও সহায়তা তারা পাবে—প্রথম ধাক্কাটা হিন্দুদের সম্পূর্ণ নিজেদেরই সইতে হবে এবং সেটা সহজ ধাক্কা হবে না, বিশেষত এক্ষেত্রে যখন হিন্দুদের 'পাকিস্তানের শত্রু' বলে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ আরো বেশি হবে কারণ এখন হিন্দুদের পাকিস্তানের বৈধানিক আইন organic lawএর বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হবে। কিন্তু স্বদেশে মানুষের মতো বাঁচতে হলে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। এতো গেলো পাকিস্তানের অ-মুসলমান অধিবাসীদের দিকের কথা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত গভর্নমেণ্টের কর্তব্য কী? ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক এরূপ নয় যে, একে অপরের কাজকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে, সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে তো নয়ই। পাকিস্তানের অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের বিষয়ে পাকিস্তানের কর্তারা যা-খুশি করতে পারেন, 'বিদেশী গভর্নমেণ্ট' বলে ভারত সরকার তাতে কিছু বলতে পারবেন না, এটা একেবারেই ঠিক নয়। পাকিস্তানের অ-মুসলমান সংখ্যালঘুদের প্রতি ভারতের ও ভারত সরকারের কর্তব্য আছে, এটা স্বীকৃত ব্যাপার। তার জন্য সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতিও দেয়া আছে এবং কেবল পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের খাতিরে নয়, ভারতের মুসলমান সংখ্যালঘুদের স্বার্থেও ভারত গভর্নমেণ্ট পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর যা-তা হতে দিতে পারেন না, কারণ পাকিস্তানে কিছু হলে তার অল্পাবিস্তর প্রতিক্রিয়া এখানে হবেই। ১৯৫০এর এপ্রিলে যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি হয়, তার মূলভিত্তি ছিল এই যে, উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে সমান গণতান্ত্রিক অধিকারাদি ভোগ করতে পারবে। এই সর্তের ভিত্তির উপরেই এটা স্বীকৃত হয় যে, উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের সার্বভৌমিকতা মান্য করে চলবে এবং একে অপরের ভৌগোলিক অধিকারের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো প্রচার বরদাস্ত করবে না।

পাকিস্তান সকলেরই সমান গণতান্ত্রিক অধিকার প্রমাণ করতে পারে, এটা দেখাবার জন্য নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিতে পাকিস্তান বিধান পরিষদের 'Objective Resolution'এর উল্লেখ করা হয়েছিল। উক্ত resolutionএ 'Islamic democracy' শব্দ থাকাতে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাতে লিয়াকৎ আলি সাহেব পণ্ডিত নেহরুকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, গান্ধীজী কেবল 'রামরাজ্য' বলতেন 'Islamic democracy' ও সেইরকম একটা বলার ভঙ্গী মাত্র, 'Islamic democracy'তে অ-মুসলমানদেরও সমান অধিকার থাকবে। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করে নেয়া উচিত হয়েছিল কিনা সে প্রশ্ন এখন তুলে লাভ নেই, তবে এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই যে, পাকিস্তান বিধান পরিষদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে লিয়াকৎ আলি সাহেবের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমেত ১৯৫০ সালের চুক্তির ভিত্তি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়েছে। এখন অতি সুস্পষ্টভাবে একথা ভারত গভর্নমেণ্টের পাকিস্তান গভর্নমেণ্টকে স্মরণ করিয়ে দেয়া কর্তব্য এবং করাচীর কর্তাদের একথাও জানিয়ে দেয়া উচিত যে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা তাদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যদি চেষ্টা করে, তবে তাদের সহায়তা করা ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তব্য বলে মনে করবেন। ৪।১১।৫৩

দেশান্তর

বুদ্ধদেব বসু

> পিটস্‌বার্গ
>
> প্রীতিভাজনেষু
>
> আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি।......কিন্তু মাসে নিয়মিত দুটো ক'রে লেখা দিতে পারবো, এমন সম্ভাবনা দেখছি না। তার কারণ শুধু সময়ের অভাব নয়, লেখার উপকরণও জ'মে ওঠা দরকার। এই পিটসবার্গ শহরে কলেজের জীবন কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়, এই দেশের মধ্যে যখন যে-রকম ভ্রমণ করবো সেইভাবে লিখে যাবো, এই রকম ভেবেছি। কোনো মাসে দুটো হ'তে পারে, কোনো মাসে একটা, কোনো মাসে বা একটাও না।......পাঠকরা যেন নিয়মিত প্রত্যাশা না করেন।......
>
> বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাই।
>
> ইতি— বুদ্ধদেব বসু

॥ এক ॥

বেলা দুপুর। ভাদ্র মাসের মেঘলা রোদে আকাশ থমথমে। কখনো কালো হ'য়ে বৃষ্টি, কখনো ফাঁকে-ফাঁকে আলো—এরই মধ্য দিয়ে পথ চলেছে আমাদের, রইলো পিছনে প'ড়ে চিরকালের কলকাতা, বাস্‌ থামলো দমদম এয়ারপোর্টে। যাত্রী আমি একা, কিন্তু এখন পর্যন্ত বহুবচনের অস্তিত্ব আছে, কাছাকাছি কয়েকটি মানুষ নিয়ে ছোটো একটি দল আমরা। আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়ায় সকলের মুখ মলিন, মুখে কথা কম—এমনকি দলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম যে-মানুষটি, যে এখন পর্যন্ত পাপ্পুন নামেই পরিচিত, যার চঞ্চল কৌতূহলের দাবি মেটাতে-মেটাতে আমি এক-এক সময় অস্থির হ'য়ে উঠি, সেও তার বালকস্বভাবের আনন্দময় চিন্তাহীনতা হারিয়ে থেকে-থেকে উন্মন হ'য়ে পড়ছে। শ্রান্তও ছিল সবাই, আমি ছাড়া অন্য কারো আহার হয়নি, ঈষৎ উজ্জীবনের আশায় আমি সকলকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় এলাম। চা এবং কিঞ্চিৎ খাদ্য নিয়ে সবেমাত্র ঘন হ'য়ে বসা গেছে, এমন সময় এরোপ্লেনের প্রতিনিধি এসে আমাকে তাড়া দিয়ে গেলো। পরে আবিষ্কার করলুম তাড়াহুড়োর প্রয়োজন ছিলো না, প্লেন আজ বিলম্বিত, কিন্তু তখনকার মতো কর্ণধারের আদেশ অমান্য করা গেলো না, অসমাপ্ত চা ফেলে উঠে পড়লুম। কাস্টমস, পুলিশ, ডাক্তার, একে-একে সব বেড়া টপকে আমরা সেখানটায় এসে দাঁড়ালাম, যার পর অযাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। সরু বারান্দা একটা, কৃপণ কয়েকটা বেঞ্চি পাতা আছে, পাখা নেই। ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ মানুষকেই অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সামনে বেড়া, বেড়ার ওপারে বিশাল শানবাঁধানো প্রাঙ্গণ, সেখানে দিগন্তের দশ দিক থেকে নানা দেশের বায়ুযান এসে নামে, আবার উড়ে চ'লে যায়। এখানটায় অত্যন্ত অব্যবস্থিতভাবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর আকাশের পূব দিক থেকে একটি অতিকায় যান্ত্রিক বোয়াল মাছকে অবতীর্ণ হ'তে দেখা গেল। ইনিই আমার প্লেন, চলেছেন সিংগাপুর থেকে লণ্ডন। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেনের চলমান যাত্রীরা এসে সরু বারান্দার ভিড় আরো বাড়িয়ে দিলে, কথাবার্তার চটপটি ফুটলো, গেলাস-ভরা পানীয় ঘুরলো হাতে-হাতে;—এমনি ক'রে কতক্ষণ কাটলো জানি না, তারপর হঠাৎ কেউ যেন বিশৃঙ্খল মানুষগুলোকে এক গোছা তাসের মতো গুটিয়ে নিলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দুটি বাস্‌ এসে অমোঘ দূতের মতো দাঁড়িয়ে গেলো পর-পর। একটিতে চলমান যাত্রীরা, অন্যটিতে আমরা যারা কলকাতা থেকে ছাড়ছি। একবার চোখ তুলে চাওয়া, হয়তো একটু থমকে দাঁড়ানো, একটুখানি পেছিয়ে পড়া হয়তো—তারপরেই একটানে 'আমরা' থেকে নিছক 'আমি'তে পরিণত হলুম। বাস্‌ এসে প্লেনের সামনে দাঁড়ালো, প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ফিরে-ফিরে পিছনে তাকালুম—কিছুই দেখা গেলো না। বেড়ার গা ঘেঁষে ছোটো-ছোটো মানুষের সারি, মানুষের আকার ছাড়া কিছুই তাদের চেনা যায় না—আমার পক্ষে যারা বিশেষ, তারা ভিড়ের সাধারণের মধ্যে মিশে গেছে, আর সেই সাধারণও ইতিমধ্যেই কত যেন দূরে, কত অস্পষ্ট।

এরোপ্লেনে ভ্রমণের ব্যবস্থা সব এমন নিখুঁতরকম যান্ত্রিক যে তার মধ্যে ভ্রমণের রসটুকু ঠিক পাওয়া যায় না। যাদের ছেড়ে যাচ্ছি তাদের জন্য বেদনাবোধ, যে চ'লে যাচ্ছে তার প্রতি দূরপ্রসারিত মঙ্গলদৃষ্টি—এগুলো মানুষের আদিম ক্ষুধার অন্যতম, এর তৃপ্তি না-হ'লে তার মানবস্বভাব ব্যাহত হয়। এবং এর তৃপ্তির জন্য বিদায়বেলাটি দীর্ঘায়িত হওয়া প্রয়োজন, থাকা এবং চলার মধ্যে খানিকটা অনির্ণীত অবকাশের প্রয়োজন। ডাক এলে যেতেই হয় মানুষকে, কিন্তু সেই যাওয়ার পথেও অপসৃয়মান তীরের সঙ্গে একটুখানি সেতুবন্ধ রচনা করার আকাঙ্ক্ষা গৃহস্থ মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনে করা যাক বাংলাদেশের গ্রাম থেকে নৌকোতে কেউ যাচ্ছে, তীরে দাঁড়িয়ে আছে স্বজনেরা; দড়ির টান, জলের গান, পাটাতনের গোঙানি, দাঁড়ের ঝপাঝপ শব্দে গলুই ঘুরে গেলো, তীরের সঙ্গে তরীর ব্যবধান আঁকা হ'তে লাগলো। ছোটো-ছোটো কোঁকড়া ঢেউয়ের রেখায়-রেখায়, অতিশয় আস্তে-আস্তে, দুই দিক জুড়ে পরস্পরের দৃষ্টির মায়া জেগে রইলো—অনেকক্ষণ। তারপর যখন নদীর বুকে ছোট্ট ফোঁটা হ'য়ে নৌকো মিলিয়ে গেলো, চেনা তীর আর চোখে পড়ে না, তখন কান্না-ধোয়া চোখ তুলে তাকিয়ে বড়ো

করুণ, বড়ো সুন্দর মনে হয় এই পৃথিবীকে, গাছপালা আকাশ জল সব যেন নতুন হ'য়ে দেখা দেয়। 'কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ!'—কিন্তু দুঃখ তো নয়, সুখ, বিদায়ের বেদনার পথ ধ'রে আমরা যেন বিশ্বজীবনের বুকের মধ্যে পৌঁছই, আমাদের ব্যক্তিগত ছোটো দুঃখ কোন এক অন্তহীন বিশাল বেদনার মধ্যে গলে গিয়ে অদ্ভুত শান্ত আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কিংবা যখন গোরুর গাড়িতে রওনা হ'তো কেউ, তখনো সেই যানের অনুপাতেই বিদায়ের পালাটা মন্থর ছিলো, ক্রমিক ছিলো; যে যাচ্ছে এবং যারা থাকছে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের আঘাত অত্যন্ত বেশি উগ্র কিংবা আকস্মিক ছিলো না, বন্ধুরা পায়ে হেঁটে-হেঁটে পথিকের সঙ্গ নিতে পেরেছে কিছুক্ষণের জন্য, হয়তো পারুল-ডাঙ্গা, হয়তো আর-একটু দূরে কাজল-তলার দিঘি অবধি এগিয়ে দিয়ে বেদনার অন্তরাগের মধ্যে ফিরে এসেছে। এই একটুখানি এগিয়ে দেয়াটা আমাদের মানসিক প্রকৃতির পক্ষে কল্যাণকর, এতে উভয় পক্ষই দুঃখটাকে হজম করবার [illegible] পায়। রাম যখন বনবাসে গেলেন, ভরত তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সঙ্গে এলেন রাজধানী ছাড়িয়ে, তারপর ভরদ্বাজ মুনির আতিথ্যে বিদায়ের অনুষ্ঠান রীতিমতো একটি উৎসবে পরিণত হ'লো—তার মধ্যে পথিক এবং গৃহস্থ উভয়েরই জন্য নিহিত থাকলো মঙ্গল-কামনা, আমরা বুঝলাম রাম এবার নিষ্কুণ্ঠ পায়ে গহন অদৃষ্টের মধ্যে এগিয়ে যাবেন, ভরতও সংবৃত চিত্তে ফিরে যাবেন তাঁর রাজত্বে। আর যখন শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করলেন—'শকুন্তলা' নাটকের সেই শ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্যরকম বিখ্যাত অংশ—তখন কণ্ব-মুনি যে তাঁর দুহিতার সঙ্গে আশ্রম পরিক্রমণ করলেন, এই বিলম্বিত ধীরমধুর বিদায়দৃশ্যে সব কথাই বলা হয়ে গেলো—যাত্রাকালে যা-কিছু আমরা বলতে চাই, বলতে পারি না, সব তার বলা হয়ে গেলো। যাকে ছেড়ে যাচ্ছি তার অচ্ছেদ্য স্মৃতিবন্ধন, যেখানে যাচ্ছি তার প্রতিও সমর্পণের উৎসুকতা, পরিণীতার হৃদয়ের এই দুঃখ-স্নাত [illegible] দিয়ে আমাদেরই যাত্রাকালীন স্বপ্নের ছবি আঁকা হলো—শুধু দ্বন্দ্ব নয়, তার সমাধানেরও ছবি। এমন সুন্দর, সুসম্পূর্ণ কোনো বিদায়ের দৃশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আর কোথাও আছে কিনা আমি জানি না, এবং, বলাই বাহুল্য, পুরাকালে চলার বেগ মন্থর ছিলো বলেই এই অলংকৃত, কোমল এবং বাস্তব ছবিটি ব্যক্ত হতে পেরেছিলো। মৃগয়াকালে রথের গতির বর্ণনা দিতে গিয়ে কালিদাস যদি অতিরঞ্জন নাও করে থাকেন, তবু আধুনিক মোটর-রথের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার তুলনা হয় না, তার উপর আশ্রমের মধ্যে রথের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো বলেও সময়ের অভাব ঘটেনি। যদি হাল-আমলের নিয়মমতো এমন হ'তো যে দুষ্মন্তর রোলস রয়স একেবারে পোর্টিকোয় এসে দাঁড়ালো এবং শকুন্তলা তাতে উঠে বসামাত্র ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ধাবিত হলো, তাহলে ঐ দৃশ্যটির অর্থময়তা অনেক কমে যেতো—আর কোনো কারণে নয়, সময় হতো না বলে।

কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা কিছু কাজের কথা নয়; যখন মোটর গাড়ির যুগেই বেঁচে আছি, তখন এই ত্বরান্বিত পরিবেশ থেকেই যতটা সম্ভব রস নিংড়ে নেয়াই আমাদের কর্তব্য। আর রস যে কোথাও নেই তাও তো নয়, মানুষের সৃষ্টিশীলতা কালক্রমে সকল পরিবর্তনকেই আত্মসাৎ ক'রে আপন মনের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়, যেটা নেহাৎই যন্ত্র, সেটাও অভ্যাসের বলে আবেগের বাহন হ'য়ে ওঠে। দেখা যাচ্ছে যে রেলগাড়িটাকে এতদিনে আমরা পরিপাক করতে পেরেছি; যদিও সে ঘড়ির কাঁটায় ছাড়ে এবং প্রায় চলামাত্রই অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তবু আমাদের যাত্রা-কালীন আকৃতি তাতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয় না, বরং দৈহিক মানসিক উভয় অর্থেই খানিকটা পদচারণার জায়গা পাওয়া যায়। কামরায় উঠে গুছিয়ে বসলুম, কোনোরকমে একটু শোবার জায়গা হ'লো তো কথাই নেই, শিয়রে বই, কোণে জলের কুঁজো—ছোটো হাতব্যাগটা ঠিক আছে তো?—তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে বন্ধুদের সঙ্গে কিছু কথা, সিগারেট, একটু পায়চারি, বইয়ের স্টলটার সামনে একবার দাঁড়ানো, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে দেখা—যাওয়ার মুখে এই একটু বিচিত্র সময়, তখনকার মতো গন্তব্যটাকে প্রায় ভুলে গিয়ে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, হয়তো প্রায় এমন ভাণ করা যে আমরা যাচ্ছি না, যতক্ষণ না ঘণ্টার শব্দে ফিরে তাকাই, আর প্ল্যাটফর্মের বড়ো ঘড়িটা আলো-জ্বলা গম্ভীর মুখে জানিয়ে দেয় যে, আর মাত্র দু-মিনিট সময় আছে। তবু তার পরেও কিছু বাকি থাকে, দুটি একটি ছোটো অনুষ্ঠান : সবুজ নিশান, হুইসিলের শব্দ, আস্তে রওনা হলাম, দূরে-দূরে স'রে যেতে লাগলো, হাত নাড়া, উঁচু-ক'রে-ধরা ছোট্ট একটি সর্বশেষ সাহসী রুমাল—তারপর হঠাৎ চ'লে এলাম রৌদ্র-জ্বলা পুরোনো পৃথিবীর মধ্যে, কিংবা চিরকালের নক্ষত্র-ঝরা আকাশের তলায়। আর সেখানেই, ঐ খোলা মাঠে, ঐ ঢালু আকাশে, চলতি ট্রেনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেলো আমাদের বেদনা।

কিন্তু এরোপ্লেনে এ-রকম কোনো সুযোগই নেই : আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে সে একটুও প্রশ্রয় দেয় না; আমাদের কুড়েমির ইচ্ছাকে, পথে বেরিয়েও ফিরে তাকাবার দুর্বলতাকে নির্মমভাবে অস্বীকার করে। ভিতরে এবং বাইরে, চলায় এবং থামায়, তার সমস্ত ব্যবস্থাই কাটাছাঁটা, নিক্তি-মাপা, অ-মানুষিক। সিঁড়ি দিয়ে একে-একে যাত্রীরা উঠলো, শেষ যাত্রীটি যেই উঠে বসলো, অমনি আর এক সেকেণ্ডও দেরি না, তক্ষুণি বন্ধ হ'লো দরজা, গ'র্জে উঠলো এঞ্জিন। প্রথমে একটুক্ষণ মাটির উপর শান-বাঁধানো সড়ক দিয়ে দৌড়ে চললো, থামলো কোনো-একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে, যেন ওড়ার আগে দম নেবার জন্য। দুনে থেকে চৌদুনে পৌঁছলো এঞ্জিনের শব্দ, যেন প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টায় যন্ত্রটা তার চরম বল প্রয়োগ করছে। এত অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জন করলো (অন্তত তা-ই মনে হয়) যে মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো ওটা যেন ব্যর্থতার ক্রুদ্ধ স্বর, মাটির টান কাটাতে পারবে না বুঝি, কিন্তু পর-মুহূর্তেই দেখতে পেলাম গাছপালা ছাড়িয়ে উঠে গেছি, মেঘ ছাড়িয়ে উঠে গেছি, এতক্ষণে কোথায় উঠে গেছি কে জানে। 'নো স্মোকিং' নিশানা নিবে গেলো, যাত্রীরা—অনেকে আবার কানুনমাফিক বেল্ট বেঁধে নিয়েছিলো—সহজ হ'য়ে ব'সে

সিগারেট ধরালো, বই খুললো, পরিচারিকা সামনে এসে দাঁড়ালো লজঞ্চুষের ট্রে হাতে নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপান-যাত্রী'তে লিখেছেন যে মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চিত হ'য়ে উঠলে পরে অপেক্ষা করতে হওয়াটা দুঃসহ। যেমন কিনা, রাত্রিবেলা জাহাজে উঠে ব'সে তার পর যদি ভোরের আগে জাহাজ না ছাড়ে, সেই অনভিপ্রেত স্থিতিটা আমাদের পক্ষে উপভোগ্য হয় না। সে-কথা সত্য, কিন্তু অত্যন্ত বেশি অনবকাশেও পথিকের মনের তৃপ্তি নেই। এরোপ্লেন উল্টো দিকের চরমে পৌঁচেছে, সে গতিসর্বস্ব, যথাসম্ভব অল্প সময়ে দেশ, মহাদেশ, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য, আশে-পাশে অন্য কিছুরই সে অস্তিত্ব রাখেনি। ছোঁ মেরে আমাদের তুলে নিয়েই উড়ে চললো, চললো একেবারে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে—আমরা যে শুধু আমাদের অভ্যস্ত গৃহকোণ ছেড়ে এলাম তা নয়, যার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কখনো আমরা ক্লান্ত হই না, বলতে গেলে সেই পৃথিবীটাকেও ছাড়িয়ে এলাম। যেন এক নিরালম্ব নিরঞ্জন নিখিলের মধ্য দিয়ে চলেছি; বাইরে কোনো দৃশ্য নেই, প্রতি-তুলনা নেই, আলোছায়ার সম্পাত নেই, স্মৃতি-জাগানো মন-কেমন-করানো কিছুই নেই; একটা সরু, লম্বাটে, ঢালু বাষ্পের মধ্যে, একটা ইস্পাতে তৈরি বোয়ালমাছের উদরের মধ্যে, পরস্পরের পক্ষে অর্থহীন নানা দেশের কতগুলো মানুষ তাদের সমস্ত পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার মধ্যে বন্দী হ'য়ে যাত্রা করেছে। যাঁদের মন বৈরাগ্যের দিকে উন্মুখ, এ-অবস্থা তাঁদের পক্ষে বরণীয় হ'তে পারে, অতীতে যাঁরা সংসার ছেড়ে মহানিষ্ক্রমণ করেছিলেন, তাঁদের মনের পক্ষে এই বায়ুযান উপযোগী হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা যারা রূপে-রসে লালিত এবং তার জন্য সতৃষ্ণ, আমাদের পক্ষে প্রয়োজন আরো একটু ধীরগামী পার্থিব যান, চলতে-চলতেও আমরা পৃথিবীর কাছাকাছি থাকতে চাই। প্লেনে যাঁরা সাধারণত যাওয়া-আসা ক'রে থাকেন, তাঁরাও মহাজন-সম্প্রদায়ভুক্ত, অর্থাৎ বণিক; যেহেতু প্রত্যেকটা মিনিটকে তাঁরা মনে-মনে টাকার অঙ্কে তর্জমা ক'রে নিয়েছেন, সেই-জন্য সময় বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনোদিকেই মন দেবার সময় নেই তাঁদের—তাঁরাও এক-রকমের সন্ন্যাসী বইকি। আজকের এই প্লেনে যাঁরা চলে'ছেন মনে হচ্ছে তাঁরা অনেকেই শিঙাপুরের বা আসামের প্ল্যাণ্টার, কিংবা হয়তো গঙ্গাতীরবর্তী ইংরেজ ব্যবসায়ী—প্রাচ্যদেশের বন-জঙ্গল এবং তথাকথিত 'রোমান্স'-জড়িত যে-সব সচিত্র মলাটের নভেল তাঁদের হাতে দেখতে পাচ্ছি, তা থেকেই তাঁদের পেশা এবং চরিত্র অনুমান করা সম্ভব—আমি নেহাৎই দৈব-ক্রমে এদের মধ্যে ছিটকে পড়েছি।

এর আগে বার দুই দেশের মধ্যে এরোপ্লেনে ভ্রমণ করেছিলাম। প্রথমবার ঢাকায়;—ছোটো প্লেন, ধূমপান বারণ, কিন্তু যেন খেলাচ্ছলে মিনিট চল্লিশে যখন পৌঁছিয়ে দিলো, মনে-মনে তারিফ না-ক'রে পারিনি। ট্রেন, স্টীমার, কুলি, দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানা রকম আইন-কানুনের হাঙ্গামা—ভূমিলগ্ন সমস্ত বাধা এক দমকে অতিক্রম ক'রে কী সহজে হাওয়ায় ভেসে চ'লে এলো। অথচ সেই যাওয়াটাও অত্যন্ত বেশি উদ্ধত নয়, নিচে তাকিয়ে সজল সবুজ মাটি দেখা যাচ্ছিলো, সুপুরির ঝাড়, স্মৃতিময়ী পদ্মানদীর সরু রেখা—যার বুকের উপর দিয়ে কতবার পারাপার করেছি, কখনো শীতের কুয়াশার ভোরবেলায়, কখনো বর্ষার সূর্যাস্তের ঘনঘটার মধ্যে, যেতে-যেতে স্টীমারের ধীরগামিতায় বিরক্তও হয়েছি, আর আজ যার জন্য দুঃখ করি অমনি ক'রে বাংলাদেশের প্রাণের পথে যেতে-যেতে অবসরের প্রসারে বিরক্ত হবার আর কখনো সুযোগ পাবো না ব'লে। যা-ই হোক, ছোটো প্লেনে ছোটো পথ পেরোনো তেমন অ-মানুষিক মনে হয়নি, কিন্তু পরের বছর যখন বম্বাইতে যাবার নিমন্ত্রণ পেলুম, তখনও আমারই কোনো কাল্পনিক ব্যস্ততার জন্য, কিংবা ঘর ছেড়ে বেরোতেই আমার মৌল অনিচ্ছার ফলে, যাওয়া-আসা দুটোই এরোপ্লেনে ধার্য হলো। ফিরে এসেই বুঝলুম কত বড়ো ভুল হ'য়ে গেলো। পূব থেকে পশ্চিমে ভারতভূমির বিশাল বিস্তার পার হ'য়ে গেলুম, পার হ'য়ে গেলুম—কিন্তু কিছুই দেখলুম না, শুনলুম না, জানলুম না, কোনো অন্ধ, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেতন পদার্থের মতো বাহিত হলুম শুধু, শুধু উপনীত হলুম। সেবারে ছিলো বড়ো প্লেন, সে এতটাই উঁচু দিয়ে যায় যে কৃপণ ঘুলঘুলি দিয়ে উদ্গ্রীব হ'য়ে তাকিয়েও কিছুই চোখে পড়ে না—শুধু ছায়ার মতো অস্পষ্ট ঝাপসা ব্রাউন রঙের একটা বিস্তার—ধ'রে নিতে হবে ওটাই মাটি, ওটাই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ—হয়তো মধ্য-ভারতবর্ষ, যেখানে আছে বিন্ধ্য পর্বত, নর্মদা নদী, দুর্ভেদ্য বন—কিন্তু আছে ব'লে কে বলবে, কোথাও কোনো অবয়ব নেই, রেখা নেই, গাঢ়তা নেই—কোনো নির্মম সমীকরণের ন্যাতা বুলিয়ে-বুলিয়ে কেউ যেন সব বৈচিত্র্য মুছে দিয়েছে, পাহাড় নদী অরণ্য নগর সব এক একায়তনিক ধূসর ম্লানিমার মধ্যে অবলুপ্ত। যদি অন্তত একটা পথেও রেলগাড়ি নিতুম, তাহ'লে সারা দেশের সঙ্গে চোখের চেনাটা হ'য়ে থাকতো, কিছু দৃশ্য-স্মৃতির সম্পদ নিয়ে ঘরে ফিরতে পারতুম—হাতে-হাতে খুচরো কিছু ঘণ্টা-মিনিট বাঁচাতে গিয়ে ভবিষ্যতের স্মৃতির সোনা বিসর্জন দিলুম। কথাটা ভাবতে এখনো আমার অনুশোচনা হয়।

সেবারে বুঝেছিলাম যে এরোপ্লেন-ভ্রমণের মতো এমন ব্যর্থ আর-কিছু নেই। শুধু ব্যর্থ নয়, ব্যাপারটা একটু ইতরজনোচিত, ইংরেজিতে যাকে বলে ভালগার। তার কারণ, এরোপ্লেনে সত্যি বলতে ভ্রমণটাই নেই, আছে শুধু পৌঁছনো; ওর গতিবেগের ভিতরকার কথাটা যাওয়া নয়, চলা নয়, বস্তাবাঁধা মালের মতো ন্যূনতম সময়ে চালান হওয়া। আমরা চালান হই, এক-একটি নিষ্ক্রিয় পার্সেল, দৃষ্টিহীন, অনুভূতি-বর্জিত, যেন কোনো তপস্বীর গুহার মধ্যে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন—দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমায়। কিন্তু দৌড় যতই লম্বা হোক, একে ভ্রমণ বলে না। আমাদের দেশে তীর্থযাত্রাকে পুণ্য বলেছে, তার আসল কারণটা দেবদেবীর অলৌকিক মহিমা নয়, পথে-পথে নতুন দৃশ্য, নতুন মানুষ, নতুন ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় এবং প্রাণের বিনিময়ের লৌকিক সার্থকতাই তার কারণ। গন্তব্যটাকে সর্বস্ব ক'রে তুলে পথটাকে তুচ্ছ করা হয়নি, বরং সেই মন্থর এবং ক্লেশকর

চলাফেরার দিনে এই কথাটাই স্পষ্ট ছিলো যে সতীর ছিন্নভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলোতেই সকল পুণ্য গচ্ছিত হ'য়ে নেই, তা ছড়িয়ে আছে পথেরই হাওয়ায়, লিপ্ত হ'য়ে আছে পথিকেরই পায়ের কাহিনীময় চেতন ধুলোয়। এই সপ্রাণ, সক্রিয় ভাবটির এরোপ্লেন কোনো অস্তিত্ব রাখেনি; মানুষের চলার মধ্যে তার নিজের ইচ্ছা এবং চেষ্টাজড়িত যে-একটি উৎসুকতা স্বভাবতই জেগে ওঠে, বায়ুপথে তার একতিল প্রশ্রয় নেই কোথাও; আমাদের প্রাণের বেগ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে শুধু যানের বেগেই এ-পথে চলতে হয়। ভ্রমণের দ্রুত এবং আরামদায়ক উপায়গুলিকে মানুষ দুই হাত তুলে সোল্লাসে অভ্যর্থনা করেছে, কিন্তু বেগের লোভ যখন অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠে পথটাকে একদম বরবাদ ক'রে দিলো তখন তার প্রকাণ্ড বঞ্চনাটাও ধরা পড়তে বাকি থাকলো না। এই বঞ্চনার অংশ আমাকেও আজ নিতে হ'লো, আমার পক্ষে এটা নেহাৎই ভাগ্যের বিড়ম্বনা।

জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে তাকালেই দেখতে পাই, অত্যন্ত বেশি ত্বরা আমরা সহ্য করতে পারি না। আমাদের দেহ, মন, প্রাণের একটি স্বাভাবিক ছন্দ আছে, কিছুদূর পর্যন্ত তার সম্প্রসারণ চলতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃতিদ্বারা নির্দিষ্ট সীমাটা পেরিয়ে গেলে সেই বেগ মর্মান্তিক হ'য়ে ওঠে। আস্তে-আস্তে খেতে হয়, খাবার সময় অন্যমনস্ক থাকতে নেই, এই কথাগুলো অত্যন্ত প্রাচীন বলেই অশ্রদ্ধেয় নয়; বস্তুত, যেখানে তার ব্যতিক্রম ঘটে সেখানেই স্বাস্থ্য টেঁকে না। হাত, মুখ এবং কণ্ঠনালীকে অসামান্য ক্ষিপ্রবেগে চালিয়ে ভোজের থালাকে এক মিনিটে শূন্য ক'রে দেয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয়, কিন্তু তাতে তার স্বাদ গন্ধের সরস সম্ভোগে শূন্যপাত হয়, পরিপাকেও বিঘ্ন ঘটে। অর্থাৎ, আহারের যেটা উদ্দেশ্য, সেই তৃপ্তি এবং পুষ্টি কোনোটাই তাতে পাওয়া যায় না। আসলে এই উদ্দেশ্যটাও উপায়-নির্ভর; শুধু যথোচিত উপাদান জুটলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, সেই উপাদানের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারের একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীও অনুসরণ করা চাই। শুনেছি, আমাদেরই দেশের ল্যাবরেটরিতে এমন বড়ি তৈরি হয়েছে যার মাত্র দুটি-একটি সেবন ক'রে মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে ঐ পারিভাষিক, শাস্ত্রসম্মত 'স্বাস্থ্য' নিয়ে মানুষ সুখী হতে পারে না, খাদ্যসারময় বটিকা থেকে আইনমাফিক পুষ্টি পেলেও খিদের কামড়ে সে ছটফট করে। এতে বোঝা গেলো, যে-কোনো প্রকারে নিছক নগ্ন উদ্দেশ্যটুকু সাধন করতে গেলে সেই মিতব্যয়িতার কার্পণ্যে উদ্দেশ্যেরই পরাভব ঘটে। আহারের উদ্দেশ্য প্রাণধারণ এবং স্বাস্থ্যরক্ষা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উপায়টাকে মানুষ বহু যুগ ধ'রে নানা রকম কারু-কার্যে পুষ্পিত ক'রে তুলেছে, সেই অলঙ্কারকে বাহুল্য ব'লে বর্জন করলে সময় বাঁচলেও প্রাণ বাঁচে না, খিদে মেটে না। আর এই খিদেটাও শুধু পেটের খিদে নয়, মনেরও খিদে। সত্যি তো, শুধু বেঁচে থাকাই তো উদ্দেশ্য, কত স্থূল এবং অনায়াসলভ্য উপায়েই তা সাধিত হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ তা নিয়ে কত বড়ো কাণ্ডটাই বাধিয়ে তুলেছে দ্যাখো না—তার সুপক্ব অন্ন চাই, বিচিত্র আস্বাদ এবং আঘ্রাণ চাই, আলো, ফুল, সুন্দর পাত্র, আত্মীয়-বন্ধুর সাহচর্য, হাস্যালাপ, এতগুলো বাহুল্যের সমাবেশ ঘটলে তবেই আহার নামক ব্যাপারটি থেকে সে সম্পূর্ণরকম মানবিক তৃপ্তি লাভ করে। শুধু উদরের বা রসনার নয়, নাকের, চোখের তৃপ্তি, সৌন্দর্যবোধের, সৌহার্দ্যবোধের, বুদ্ধিবৃত্তির—সব এক-সঙ্গে—এবং এই সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তির ফলে তার অন্নেরও প্রাণপদার্থ বেড়ে যায়, আর অন্ন থেকে তেজ নিংড়ে নিতেও দেহযন্ত্র উৎসাহী হ'য়ে ওঠে। তেমনি, স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মূলে যে-বৈজ্ঞানিক তথ্যটা আছে সেটা অত্যন্ত জরুরি হ'লেও শুধু তার দ্বারাও এই সম্বন্ধটিকে মাপা যায় না, মানুষের ব্যবহার তাতে বহু দূরে অতিক্রম ক'রে এসেছে। এই মিলনের উদ্দেশ্য বলতে যেটা বোঝায় সেটা নিশ্চয়ই বংশরক্ষা, জীবসৃষ্টি, কিন্তু সংক্ষিপ্ততম উপায়ে প্রজননকর্মটি সম্পন্ন ক'রেই তো মানুষ থামেনি, এর চারদিকে ঘিরে-ঘিরে সে সৃষ্টি করেছে এক বিশাল ভাবলোক, সৃষ্টি করেছে প্রেম, আনন্দ সৌন্দর্য; সেই পরিমণ্ডলের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে কত সুর, কত বর্ণ কত রূপকর্ম, সভ্যতার কত অমূল উপঢৌকন। এই যুগ-যুগান্তের মান সঞ্চয়কে অস্বীকার ক'রে উলঙ্গভা উদ্দেশ্যটাকেই প্রয়োগ করতে মানু তখনই উদ্যত হয়, যখন সে আর প্রকৃতিস্ থাকে না। কিন্তু সম্বিৎ ফিরে এলেই সে দেখতে পায় যে তার দেহমনের সক বৃত্তির সার্থকতা ঐ দূরপথেই, ঘু পথেই, ঐ সময়সাপেক্ষ, প্রতীক্ষাজড়িত আবেগমণ্ডন বিলম্বের কোলেই। আ সেই জগতে, যেখানে কল্পনার আলো ছায়ার খেলা চলছে, যেখানে বাস্ত রূপান্তরিত হ'য়ে হৃদয়ের সত্যে পরিণ হচ্ছে, সেখানে প্রকৃতির সমস্ত দাবি মি গিয়েও অনেক কিছু উদ্বৃত্ত থাকে সেই উদ্বৃত্ত অংশটা এতই বড়ো যে তা মধ্যে জৈব উদ্দেশ্যটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা যখন সবান্ধবে সুসজ্জিতভাবে ভোজের সভায় উপস্থি হই, তখন আমরা কখনো ভাবি না যে নেহাৎই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কিছু বনজ এবং জান্তব পদার্থ গলাধঃকর করতে হচ্ছে। বাসরশয্যার বেপথুমা বর-বধূর মনেও এমন চিন্তার কদাচ উদ হয় না যে তারা আজ পরস্পরের মধ্যে দ্র হ'য়ে যাচ্ছে একটি সন্তানের জন্ম হ ব'লেই। অর্থাৎ, যাকে উদ্দেশ্য বলছি সেটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে সার্থক হ' পারে তখনই, যখন মানুষ সেটাকে ভুলে যায়।

কিন্তু এরোপ্লেন মুহূর্তের জন্য তার উদ্দেশ্য ভোলে না, ভুলতে দেয় ন সে মূর্তিমান এফিশিয়েন্সি, কর্মপটুতা তার উপায় নিরাকার, পথ শূন্যময়, তা মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে শুধু পৌঁছবার প্রকাণ্ড একটা একটানা প্রতিজ্ঞা। উদ্দেশ্যসিদ্ধি এই অত্যধিক গরজটাকে মানুষ তা কাজের ক্ষেত্রে বাহবা দিতে পারে, এবে তার হিশেবের খাতায় মুনফার অঙ্কে চক্রবৃদ্ধি সম্ভব, কিন্তু তার আনন্দে ক্ষেত্রে কুড়েমি করাই তার স্বভাব, যেখানে তার ভালো লাগে সেখানেই সে দেরি করে ধীরে-সুস্থে, চেখে-চেখে, রসিয়ে-রসিয়ে ভোগ করতে চায়। খবর-কাগজের হেড

লাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগে না, কিন্তু কবিতার লাইনের ফাঁকে-ফাঁকে অদৃশ্য লিপি প'ড়ে নেবার জন্য সারা জীবনও যথেষ্ট কি না কে জানে। আপিশে ব'সে কাজের কথাবার্তা কাঁটায়-কাঁটায় মিনিটের মাপে চলতে পারে, কিন্তু বাড়িতে যখন বন্ধুদের আহ্বান করি তখন ঘড়ির দিকে পিঠ ফিরিয়ে অবসরের বারান্দাটাতেই বসতে হয়। পথে বেরিয়ে পথটাকেও আমরা এমনি ক'রে উপভোগ করতে চাই; খুঁটে-খুঁটে খেতে চাই একটু-একটু করে; থেমে, তাকিয়ে, জিরিয়ে, জুড়িয়ে, আস্তে-আস্তে অভ্যস্ত থেকে নতুনের মধ্যে অগ্রসর হ'তে চাই, আর এই অনুক্রমিক প্রক্রিয়ার ফলেই নতুনকে উপলব্ধি করা সহজ হয়। কেননা, যদিও আমরা মুখে ব'লে থাকি যে মনের চেয়ে দ্রুতগামী আর কিছু নেই, তবু আসলে আমাদের মনের ছন্দ আমাদের রক্তেরই ছন্দ—সেই রক্ত, যে এখনো সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির বশ মানেনি, অমিতভাবে মুকুলের অপব্যয় না-ক'রে যে এখন পর্যন্ত একটি ফুলও ফোটাতে পারে না। মনের স্বভাবটা বিলাসী, লয়টা ঢিমে, ছন্দ মন্দাক্রান্তা। তার অভিজ্ঞতার ধারা দীর্ঘসূত্রী, খুশির পথ আঁকাবাঁকা এবং বিশ্রামবহুল, যে-কোনো নতুন দিকে যাত্রা করার জন্য সে সৈনিকের মতো এক পায়ে খাড়া থাকতে পারে না, বাবুর মতো তৈরি হ'তে সময় নেয়। এরোপ্লেন আমাদের মনের এই স্বাভাবিক ছন্দটাকে লঙ্ঘন ক'রে চলে, তাই তার সঙ্গে আমাদের কোনো মানবিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। আমরা তার বিবরে ব'সেও দূরে থাকি—দূরে, বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত; পথটাকে সে এমনতর গোগ্রাসে গিলে নেয় যে আমাদের পক্ষে সেটা প্রায় উপবাসেরই সামিল, হাজার-হাজার মাইল পেরিয়ে চলেছি ব'লেই মনে হয় না। ভূমিকা নেই, পূর্বাভাস নেই, প্রস্তুতির অবসর নেই, প্রাসঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বা প্রক্ষিপ্ত কিছু নেই, এক ফোঁটা বাহুল্য নেই কোথাও—আমাদের সব ক-টা সুস্থ প্রবৃত্তি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

বাহুল্য নেই, এই কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য। শুধু যে বাইরে তাকিয়ে দ্রষ্টব্য কিছু নেই তা নয়, ভিতরেও এমন কিছু নেই যেটা মনের পক্ষে আকর্ষণযোগ্য। এঞ্জিনের গর্জন এবং বসবার সার-বাঁধা ব্যবস্থার জন্য সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপের সুযোগ অত্যন্ত পরিমিত; দৈবাৎ আপনি যার পাশে আসন পেয়েছেন বড়ো জোর তার সঙ্গে দু-একটা মামুলি কথার বিনিময়—যদি অবশ্য তার ভাষা আপনার জানা থাকে। কিন্তু ভাষার বাধা না-থাকলেও আলাপ-পরিচয়ে কোনো পক্ষই তেমন উৎসাহিত হয় না, কেন না এই পথের মেয়াদ বড়োই ক্ষণস্থায়ী, বলতে গেলে এক্ষুণি তো নেমে যাবো, আর তার পরেই এই মানুষগুলো কে কোথায়। জাহাজে, যেখানে অনেকগুলো লম্বা দিন কাটাতে হয়, সেখানে পারস্পরিক মানসিক বিনিময়ের দিকে স্বভাবতই আগ্রহ জাগে, বন্ধুতা, প্রীতিস্থাপন হয়তো বা কোনো নাটকীয় ঘটনার পক্ষেও যথেষ্ট অবসর মেলে সেখানে। রেলগাড়িতেও তা-ই; তার মেয়াদ খুব দীর্ঘ না-হলেও নানা রকম উপকরণে সমৃদ্ধ—স্টেশনে থামা, যাত্রীদের ওঠা-নামা, সকালে-সন্ধ্যায় আলো-ছায়ার আবর্তন—ধাবমান বিচিত্র ঘণ্টাগুলি ভ'রে সহযাত্রীরা পরস্পরের প্রতি একেবারেই উদাসীন হ'য়ে ব'সে থাকে না; কোনো প্রয়োজনে, নয়তো সৌজন্য অথবা কৌতূহলবশত, কিংবা নেহাৎই হয়তো পথের শ্রান্তি দূর করার চেষ্টায়, কেউ-না-কেউ কারো-না-কারো সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হ'য়েই থাকে। কিন্তু এরোপ্লেনে সে-রকম কোনো পরিবেশ নেই, আবহাওয়া নেই। যাত্রীরা শারীরিক অর্থেই একে অন্যের দিকে পিঠ ফেরানো; কুঁজোর জল, টিফিন-কেরিয়ারের খাবার, এই সব সামাজিকতার সূত্রগুলিও অনুপস্থিত, যেহেতু সকলের জন্য সব রকম পানাহারের ব্যবস্থা প্লেন-কোম্পানির কর্তারাই ক'রে রেখেছেন। অতএব এই বায়ুযানের বাইরেটা যেমন চোখের পক্ষে শূন্য, ভিতরটাও মনের পক্ষে তা-ই। এমনকি এর অবয়ব সুষ্ঠু জ্যামিতিক চিত্রের মতো বাহুল্যহীন; ওজন বাঁচাতে হবে ব'লে এর সমস্ত মাপজোক যথাসম্ভব ছোটো, স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে প্রচুরতম সেবার ব্যবস্থা ধরাতে গিয়ে মানুষের উদ্ভাবনীপ্রতিভা একে কাজচালানো কৃপণ ইকনমির আদর্শ ক'রে তুলেছে। দু-সার চেয়ারের মাঝখানকার গলি-পথ দিয়ে দু-জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না, অথচ ওরই এক প্রান্তে খাবার জলের কল পাবেন, পাশে দেয়াল-তাকে সারি সারি সচিত্র পত্রিকা, আর-এক প্রান্তে অতিশয় ক্ষুদ্র একটি বাথরুম, সেখানে একই কলে ঠান্ডা আর গরম জল বেরোচ্ছে, হাত ধোবার সাবান থেকে দাড়ি কামাবার বৈদ্যুতিক ক্ষুর পর্যন্ত প্রসাধনের সরঞ্জাম আছে সাজানো, কিন্তু প্রকোষ্ঠটি এতই ছোটো যে ভিতরে যাওয়ামাত্রই বেরোবার জন্যে ছটফট ক'রে উঠতে হয়। আর বেরিয়ে এসে আপনাকে অবশ্য আবার সেই নির্দিষ্ট আসনটিতেই বসতে হবে, তার হাতলেই অ্যাশ-ট্রে বসানো আছে, গেলাস রাখার গর্ত, খাবার ট্রে বসাবার খাঁজ, মাথার উপরে বই পড়ার ছোটো আলো, হাত বাড়ালে তাকের উপর পশমি ওড়না, শীত করলে পেড়ে নেবেন। সামনের চেয়ারটার পিঠের দিকে যে-থলিটা আছে সেটা আপনার প্রাপ্য; তাতে আপনার খাবার ট্রে অপেক্ষা করছে হাতের বইপত্র থাকতে পারে। মোটের উপর, যাকে সুবিধে বলা হয় তার আয়োজনে কোথাও এতটুকু ত্রুটি বা উদাসীনতা নেই, পানাহারের আতিথ্যও দরাজ—খুব সম্ভব বায়ুপথের অন্যাবিধ সমস্ত বঞ্চনার ক্ষতিপূরণস্বরূপে আহারে এবং উপাহারে আহ্বান আসে অত্যন্ত ঘন ঘন। এই ব্যবস্থাটি না-থাকলে যাত্রীদের পক্ষে রীতিমতো দুঃসহ হ'তো তাতে সন্দেহ নেই—অন্তত এটা শ্রান্তিনিবারক, ব্যাহত তন্দ্রায় পুনরুজ্জীবক, দিনরাত্রির যে-কোনো সময়ে মানচিত্রের যে-কোনো একটি বিন্দুর উপর অচিরভাবে স্খলিত হবার পক্ষে কথঞ্চিৎ উৎসাহজনক—আর তাছাড়া যখন নাস্তিমান ব্যোমমার্গে কৃ-ধাতুটি প্রায় অবলুপ্ত, তখন কিছু একটা করতে পেলেই মনটা একটু সজীব হ'য়ে ওঠে। তবে কথাটা এই যে মানুষ তো শুধু ক্ষুৎ-পিপাসার বান্ডিল নয়, তা ছাড়াও তার দু-চারটে যা চাহিদা আছে—অনুগ্র, অপেক্ষমান কিন্তু অপ্রতিরোধ্য চাহিদা—সেগুলোকে মাটির কোলে পরিত্যাগ

করেই বিমান তার জয়যাত্রায় বেরিয়েছে। কোনো রঙের চমক, কোনো প্রাণের দোলা, কোনো বৈচিত্র্যের আভাস—দৈবাৎ জুটে যায় তো ভালো, কিন্তু কেউ যেন আশা না করে। এরোপ্লেনে যে-মুহূর্তে উঠে বসলেন, সে-মুহূর্তে আপনার নিছক দৈহিক অস্তিত্বটুকুর মধ্যে সীমিত হয়ে গেলেন আপনি, তার বাইরে আর কিছুই নেই—একটা পাখি চোখে পড়বে না, ক্বচিৎ কখনো অনেক নিচে একটুখানি প্রেতের মতো মেঘের ধোঁয়া—এমনকি ঐ কৌশলময় নীরন্ধ্র যন্ত্রটার মধ্যে দিন-রাত্রির প্রভেদও যেন লুপ্ত হয়ে যায়। এই শেষের কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো; আসল কথাটা এই যে বিমানের মধ্যে দিন আর রাত্রি এই দুটো স্থূল বিভাগেরই অস্তিত্ব আছে, সকাল, বিকেল, দুপুর প্রভৃতি উপবিভাগগুলোর স্পষ্ট কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, আর তাদের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যে-সব শ্রুতি, মীড়, ঝংকার নিয়ে শাশ্বতভাবে আমরা বসবাস ক'রে আসছি, তারা তো কোন দূরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে। বাইরে তাকালে রোদ্দুর বোঝা যায়, সন্ধে হলে বাতিও জ্বলে, কিন্তু প্লেনের মধ্যে দিনের আলো সর্বদাই ম্লান, তাপের মাত্রাও নিয়ন্ত্রিত, তাই পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের আলোছায়ার সম্পাত এখানে ভালো করে পৌঁছতে পারে না। দুপুর-বেলার তুলনায় দুপুর-রাত্তিরে শীত একটু বেশি করবে, বিকেলের চাইতে সকালের আলো একটু হয়তো কড়া লাগবে চোখে, কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন সময়গুলোর মধ্যে যে বিশেষ এক-একটি মানসিক ভাব জড়িত আছে, এই পর্দানশিন, শীলমোহর-করা অন্তঃপুরে তাদের প্রবেশের কোনো পথ নেই।

সবচেয়ে অদ্ভুত কথাটা এই যে এরোপ্লেনের গতির বেগ আমাদের অনুভূতির কাছে প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের তৈরি এই যন্ত্র বেগের শক্তিতে বিধাতার অনেক সৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে গেছে; কোনো তুফান এত জোরে ছোটে না, কোনো বন্যার জল এমন বেগে জনপদ ভাসিয়ে নেয় না, যেমন এই পুষ্পক রথ নীলিমাকে দীর্ণ ক'রে চ'লে যায়। কিন্তু হ'লে হবে কী—এই বেগ আছে শুধু তথ্যে, শুধু গণিতে, আমার চেতনায় তার অণুমাত্র ইঙ্গিত নেই ঘণ্টায় দুশো, তিনশো, পাঁচশো মাইল বেগে চলেছি, কিন্তু বাইরে কোনো চলমান দৃশ্যের প্রমাণপত্র নেই ব'লে আর প্লেনের গতি নিরতিশয় মসৃণ ব'লে, আমাদের মনে হয় যেন থেমেই আছি, শূন্যে ঝুলে আছি স্থির হ'য়ে, যেন এরোপ্লেনটা কোনো অতিকায় দৈত্য-ভ্রমরের মতো আকাশের বুকের মধ্যে নিশ্চল হয়ে লোহশব্দে গুঞ্জিত হচ্ছে। দূরকে জয় করবে বলে যে-মানুষ সমুদ্রে প্রথম ভেলা ভাসিয়েছিলো, লাফিয়ে উঠে বসেছিলো বুনো ঘোড়ার পিঠের উপর, তার শক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হ'তে-হ'তে নিজেরই মধ্যে এই অদ্ভুত বিরোধ জাগিয়ে তুলেছেঃ যখন সে সত্যি-সত্যি রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়াটার সওয়ার হ'য়ে বসতে পারলো, তখনই তার চেতনার কাছে সেই গতির কোনো অর্থ থাকলো না। এ-কথা মানতেই হয় যে গতির একটি নিজস্ব এবং বিশুদ্ধ আনন্দ আছে, সেটা প্রায় নেশারই মতো। কাজে লাগছে ব'লে নয়, সময় বাঁচানো যাচ্ছে ব'লে নয়, নিজের বা জগতের কোনো উপকার করা যাচ্ছে ব'লে নয়—চলছি ব'লেই ভালো লাগে আমাদের, চলছি ব'লে অনুভব করতে ভালো লাগে, সেই অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে আমাদের রক্তে স্নায়ুতন্ত্রীতে, কোনো উষ্ণ, উৎসাহময় সুরার মতো মনটাকে আবিষ্ট ক'রে তোলে শিশুরা যে-কোনো চাকাওলা খেলনা নিয়ে মেতে ওঠে, সেটাকে ঠেলতে পারলেও তারা খুশি, চড়তে পারলে তো কথাই নেই। শিশু নয় এমন মানুষও নাগরদোলা ভালোবাসে, সমুদ্রের ঢেউ খেতে ভালো বাসে, গাড়ি চড়তে ভালোবাসে। কিন্তু—অল্ডস হক্সলি অনেক আগেই এ-কথাটা বলেছিলেন— এই বৈজ্ঞানিক যুগে যা যত উন্নত হচ্ছে, গতির সত্যিকার অনুভূতিটাও ক্ষীণ হ'য়ে আসছে ঠিক সে অনুপাতেই। ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘণ্টায় বারো মাইল ছোটার যে উন্মাদনা, রেলগাড়িতে তিরিশ মাইলও সে-তুলনায় ক্ষীণ, আবার রেলগাড়িতে ষাট মাইলে যে-তীব্র র[illegible] পাওয়া যায়, মসৃণ মোটরগাড়িতে [illegible] পেতে হ'লে আইন এবং সুবুদ্ধির শাস[illegible] অমান্য করতে হবে। যত দামি, যত বড়ো যত নিখুঁত-নির্মিত মোটরগাড়ি, [illegible]

গতিটা আমরা ততই কম অনুভব করি; আর এই গতির প্রগতির সর্বাধুনিক ধাপটিতে, এক-এক ঘণ্টায় এক-এক দেশ পেরিয়ে-যাওয়া হাওয়াই জাহাজে, এই অনুভূতি একেবারেই শূন্যে এসে ঠেকলো। কিছুই না; চুপ ক'রে ব'সে আছেন, চুপ, স্তব্ধ—শুধু একটা একঘেয়ে গুঞ্জন শুনছেন, তা ছাড়া সব স্তব্ধ, মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় থেমে আছেন—অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে আপনার। আর যা আমাদের মনে হয় সেটা দিয়েই তো কথা, আমাদের চৈতন্যের কাছে সেটাই তো মূল্যবান।

অবশ্য এ-রকম না-হয়েও উপায় ছিলো না, কেননা এরোপ্লেনের গতির অনুভূতি সহ্য করা মানুষের রক্তমাংসের পক্ষে সম্ভব নয়। শুনেছি একবার কোথায় একটি চলতি প্লেনের দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়, তাতে আর-কোনো বিপদ হয়নি, শুধু হাওয়ার প্রচণ্ড ঝাপটেই অনেক মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে যায়, একজন হার্টফেল ক'রে মারা পড়ে। অতএব যাতে মুহূর্তের জন্যও গতিটা আমাদের বোধ-গম্য না হয়, সেই রকমের ব্যবস্থা করাই যুক্তিসংগত হয়েছে। যুক্তিসংগত—নিশ্চয়ই, তবু এই কথাটা থেকেই গেলো যে অভিজ্ঞতা হিশেবে পুষ্পক-বিহার একেবারেই ব্যর্থ; এর মধ্যে এমন কিছুই স্থান পায়নি, যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রশ্রয় দেয়, ব্যক্তিস্বরূপকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক এই যাত্রা, নৈসর্গিক বা মানবিক সংগরহিত, আলোছায়ার বৈচিত্র্য-বর্জিত; বিবর্ণ, ধূসর অস্পষ্টতার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকি আমরা, ব'সে-ব'সে কখনো চেয়ারটাকে উঁচু ক'রে বাইরে তাকাই বা বই খুলি, কখনো নামিয়ে নিয়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজি, কখনো পা দুটোকে সম্ভবমতো ছড়িয়ে দিই, কখনো বা গুটিয়ে নিয়ে বসি, কখনো হাঁটুর উপর ছড়িয়ে দিই ওভারকোট, কখনো বা তাকে তুলে রাখি সেটাকে—এটুকু, এইটুকুমাত্র বৈচিত্র্যসাধন, যা আমাদের হাতে আছে। এবং এই কারণেই—যদিও এরোপ্লেন এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান, তবু মানুষের হৃদয়ের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে সে স্থান পেলো না। যুদ্ধের প্রয়োজনেই এর আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে, এর গড়ন, চলন, বলন ইত্যাদিও সৈনিকের মনোভাবের সংগেই মানিয়ে যায়, গৃহী মানুষ এর জবরদস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। সৈনিক নিজেও একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, সে একটা অন্ধ বধির বিরাট যন্ত্র-শক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তার কাছে ট্রেন ট্যাংক জাহাজ বিমান সবই সমান। কিন্তু যে-মানুষের মন এবং হৃদয় নামক উপসর্গ দুটো এখনো সজাগ, তার সংগে এরোপ্লেনের সহজ ব্যবহারের পথ খোলা নেই। তুলনায় কত বেশি আশ্চর্য এবং সজীব মনে হয় রেলগাড়িকে, যখন তার বিশাল নামহীন প্রান্তরের উপর করুণ হ'য়ে সন্ধ্যা নামে, কিংবা যখন রাত্রে আমাদের ঘুমের মধ্যে দোল খেতে খেতে তার গতির মত্ত আলোড়ন সমস্ত সত্তা দিয়ে শোষণ ক'রে নিই, কিংবা হয়তো নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকি ঘুরে-চলা দিগন্তের উপর স'রে-স'রে-যাওয়া তারাদের দিকে। কত বেশি সুন্দর এবং বাস্তব মনে হয় জাহাজটাকে, ভিতরে যার নাচ, গান, আলো, উৎসব, আর বাইরে অকূল সমুদ্রের উপর অসীম অন্ধকার, হয়তো বা পরিত্যক্ত ডেকের নির্জনে একলা কোনো দুঃখী মানুষ—যার একদিকে নিঃসংগ চাঁদ যেন আত্মহত্যা ক'রে ডুবে মরে, আর-একদিকে সদ্যস্নাত সূর্য উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকায়, একদিকে জলরাশির রহস্যময় গম্ভীর বিস্তার, আর-একদিকে বন্দরের বর্ণ, গন্ধ, শব্দের ঐশ্বর্য। স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণের মধ্যে এই যেগুলো উপরি-পাওনা আছে, এগুলোই মানুষ সত্যি-সত্যি পেয়েছে, এগুলো তার ভাবের তাপে জীর্ণ হয়েছে, মনের তাঁতে বোনা হ'য়ে গেছে—সেই সঞ্চয় এতই বড়ো যে তার কাছে পেঁৗছনোটাই গৌণ ঘটনা ব'লে মনে হয়। সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার বুনোনের মধ্যে এরোপ্লেন কিছু যোগ করতে পারেনি, মানুষের চিন্ময় সম্পদ যেখানে যুগে-যুগে জমা হচ্ছে এবং বদলে যাচ্ছে, সভ্যতার সেই উপরতলায় কোনো দান নেই তার। নেই যে, তার একটা প্রমাণ এই যে, আজকের দিনের কথা-সাহিত্যে জাহাজ কিংবা রেলগাড়ির পট-ভূমিকা অসংখ্যবার পাওয়া যাবে, কিন্তু এরোপ্লেনকে ঘটনাস্থল ক'রে কোনো সমরসেট মম গল্প লেখেননি।—কিন্তু এই সমস্ত উক্তিগুলোর পরে হয়তো একটা 'এখনো' যোগ করা উচিত; হাজার হোক, এরোপ্লেনটা আনকোরা নতুন, আমাদের পৌত্র কিংবা প্রপৌত্রদের সময়ে লেখকরা যে এটাকেও তাদের কলকব্জার মধ্যে পুরে নেবে না সে-কথা কি কেউ জোর ক'রে বলতে পারে? ততদিনে এই যন্ত্রটারও চেহারা ঠিক এই রকমই থাকবে ব'লে ভাবা যায় না—তবে সেটা আরো কঠোর, আরো নিপুণ, আরো নির্ভুল, আরো নির্মম হবে, নাকি হঠাৎ কোনো দুর্বল মুহূর্তে একটুখানি রক্তমাংসকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলবে, সে-কথা আজকের দিনে উদ্ভাবকদেরও অজ্ঞাত। কিন্তু যা-ই হোক না, এ-রকম একটা সম্ভাবনাকে মেনে নেয়াই ভালো মনে করি, কেননা ইতিহাস আবর্তন-বিলাসী, মানবস্বভাব আশ্চর্যরকম স্থিতি-স্থাপক, এবং অভ্যাসের মত রাজবৈদ্য আর নেই।

সৈয়দ মুজতবা আলী

এক

মধুগঞ্জ মহকুমা শহর বলে তাকে অবহেলা করা যায় না।

মধুগঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য নগণ্য, মধুগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে, মধুগঞ্জে জলের কল, ইলেকট্রিক নেই, তবু মানুষ মধুগঞ্জে বদলি হবার জন্য সরকারের কাছে ধন্যে দিত। কারণ এসব অসুবিধেগুলো যে রকম এক দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে শাপ, অন্যদিক্ দিয়ে আবার ঠিক সেগুলোই বর। মাছের সের দু' আনা, দুধের সের ছ' পয়সা, ঘিয়ের সের বারো আনা এবং সেই অনুপাতে আণ্ডা মুরগী সবই সস্তা। আর সবচেয়ে বড় কথা, কাচ্চাবাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য মধুগঞ্জ পূব-বাঙলা-আসামের অক্সফোর্ড বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না; ওয়েলশ মিশনারিদের কৃপায় মধুগঞ্জে একটি হাইস্কুল আর দুটো প্রাইমারী স্কুল যে পদ্ধতিতে চললো তা দেখে বাইরের লোক মধুগঞ্জে এসে অবাক মানত। স্কুল হস্টেলে সীটের জন্য পূব-বাঙলা-আসামে একমাত্র মধুগঞ্জেই আড়াই-গজী ওয়েটিং লিস্ট্ আপিসের দেয়ালে টাঙানো থাকত। হস্টেলের খাই-খরচা মাসে সাড়ে চার টাকা, আর সীট রেণ্ট চার আনা!

মধুগঞ্জের আরেকটি সদ্গুণের উল্লেখ করতে লেখক মাত্রই ঈষৎ কুণ্ঠিত হবেন। লেখকমাত্রই সাহিত্যিক, কাজেই মধুগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাদের হৃদয় আকৃষ্ট করবে এ তো জানা কথা, কিন্তু সাহিত্যিকেরা এ তত্ত্বও বিলক্ষণ জানেন যে, এ সংসারের আর পাঁচজন শহরের দোষগুণ নির্ণয় করার সময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জিনিসটাকে জমা-খরচের কোনো খাতেই ফেলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ, এ তত্ত্ব তো অতিশয় সত্য যে, নিছক প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে কেউ চাকরীতে বদলি খোঁজে না, কিম্বা ব্যবসা ফাঁদে না।

এ সত্য জানা সত্ত্বেও যে দু' একজন সাহিত্যিক বরযাত্রীরূপে কিম্বা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছেন তাঁরাই মধুগঞ্জের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছেন। তাই দেখে খাস মধুগঞ্জীয় কাঁচা সাহিত্যিকেরাও মধুগঞ্জের আর পাঁচটা সুখ-সুবিধের সঙ্গে তার প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও প্রশস্তি গেয়েছেন।

পশ্চিম বাংলা যেখানে সত্যই সুন্দর সেখানেই দেখি তার উঁচু-নিচু খোয়াই-ডাঙ্গা আর আর দূরদূরান্তের নীলাভ পাহাড়। উঁচু-নিচুর ঢেউ খেলানো মাঠে এখানে ওখানে কখনো বা দীর্ঘ তাল-গাছের সারি, আর কখনো বা একা দাঁড়িয়ে একটিমাত্র তালগাছ। এই তালগাছগুলো মানুষের মনে যে অন্তহীন দূরত্বের মায়া রচে দিতে পারে তা সমুদ্রও দিতে পারে না। সমুদ্রপাড়ে বসে মনে হয়, এই আধ মাইল দূরেই বুঝি সমুদ্র থেমে গিয়েছে—আকাশ নেমে গিয়ে নিরেট দেয়ালের মত হয়ে সমুদ্রের অগ্রগতি বন্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিম বাঙলার খোয়াই-ডাঙ্গা তাই তার শালতাল দিয়ে, দূর না হয়েও যে দূরত্বের মরীচিকা সৃষ্টি করে সে মায়া-দিগন্ত মানুষের মনকে এক গভীর মুক্তির আনন্দে ভরে দেয়। জানি, মন স্বাধীন, সে কল্পনার পক্ষীরাজ চড়ে এক মুহূর্তেই চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে সৃষ্টির ওপার পানে ধাওয়া দিতে পারে, কিন্তু সে স্বপ্ন-প্রয়াণে তো আমার রক্তমাংসের শরীরকে বাদ দিয়ে চলতে হয়—আমাকে দেখতে হয় সব-কিছু চোখ বন্ধ করে, আর এখানে আমার দু'টি মাত্র চোখই এক নিমেষে আমাকে নিয়ে যায় দূরে হতে দূরে যেখানকার শেষ নীল পাহাড় বলে, 'আরো আছে, আরো দূরের দূর আছে' সে যেন ডাক দিয়ে বলে, 'তুমি মুক্ত মানুষ, তুমি ওখানে বসে আছ কি করতে—চলে এসো আমার দিকে।'

এ মুক্তি-ধারণা নিছক কবি-কল্পনা নয়। বহুবার দেখা গিয়েছে সন্ধ্যার সময় পশ্চিমপানে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ সাঁওতাল ছেলে দাওয়া ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে রওয়ানা দিল। তারপর সে আর ফিরল না। মড়া পাওয়া গেল পরের দিন খোয়াইয়ের মাঝখানে—বাড়ি হতে অনেক দূরে। বুড়ো মাঝিরা বলে, ভূত তাকে ডেকেছিল, তারপর অন্ধকারে পথ হারিয়ে কি দেখেছে, কি ভয় পেয়ে মরেছে, কে জানে?

পূব বাঙলার সৌন্দর্য দূরত্বে নয়, পূব বাঙলায় 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয়, সেখানে মাঠের শেষেই ঘনসবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারী গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম জাম কাঁঠালের ঘনসবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূব বাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণশ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে।

শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?

কিন্তু মধুগঞ্জের সৌন্দর্য এ ও নয়, ও ও নয়। মধুগঞ্জ পূব বাঙলার মতে ফ্ল্যাট নয়, আবার পশ্চিম বাঙলার মত ঢেউখেলানোও নয়। ভগবান যেন মধুগঞ্জে এক তিসরা খেল খেলার জন্য নয়া এক ক্যানভাস নিয়ে বসে গেছেন। ক্যানভাসখানা বিরাট্ আর তাতে আছে মোটামুটি তিনটি বড় রঙের পোঁচ—সামনের 'কাজলধারা' নদীর কাকচক্ষু কালো জল, নদী পেরিয়ে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানক্ষেত, সর্বশেষে এক আকাশ-ছোঁয়া বিরাট্ নিরেট নীল পাথরের খাড়া পাহাড়। এখানে পশ্চিম বাঙলার মত মাঠ ঢেউ খেলতে খেলতে পাহাড়ে বিলীন হয়নি—পাহাড় এখানে দাঁড়িয়ে আছে পালিশ সবুজ মাঠের শেষে সোজা খাড়া পাঁচিলের মত। তার গায়ে কিছু কিছু খাঁজ আছে কিন্তু এ খাঁজ আঁকড়ে ধরে ধরে উপরে চড়া অসম্ভব।

মধুগঞ্জের যেখানেই যাও না কেন উত্তরদিকে তাকালে দেখতে পাবে, কালো নদী, সবুজ মাঠ আর তার পর নীল পাহাড়। আর সেই পাহাড় বেয়ে নেমে এসেছে কত শত রুপালী ঝরণা। দূর থেকে মনে হয়, নীল ধাতুর উপর রুপোর বিদুরী মিনার কাজ।

এ পাহাড় হাত-ছানি দিয়ে ডাকে না—এ পাহাড় বলে, যেখানে আছো সেখানেই থাকো।

এরকম পাহাড় বিলেতে প্রচুর আছে, শুধু গায়ে নেই মিনার কাজ আর সামনে নেই সবুজ মাঠ, কাজলধারার কালো জল।

তাই আইরিশম্যান ডেভিড ও' রেলি মধুগঞ্জে এসিসটেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ হয়ে আসামাত্রই জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেল।

দুই

প্রেমটা কিন্তু দু' তরফাই হল। ছোট্ট মহকুমার শহরটি ওরেলিকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেললে।

তার প্রধান কারণ বুঝতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। ওরেলি সত্যই সুপুরুষ। ইংরেজ বাঙালীর তুলনায় অনেক বেশী ঢ্যাংগা তার উপর এদেশে

বেশীদিন বাস করলে কেউ হয়ে যায় দারুণ মোটা, কেউ বড্ড লিকলিকে, কারো বা নাক হয়ে যায় টকটকে লাল, কারো দেখা দেয় সাদা চামড়ার তলায় বেগনি রঙের মোটা মোটা শিরা উপশিরা। তার-ই মাঝখানে হঠাৎ যখন স্বাস্থ্যসবল আরেক ইংরেজ এসে দেখা দেয়—ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেশ ফ্রম ক্রিস্‌টিয়ান হোম্—তখন সে সুন্দর না হলে তাকে প্রিয়দর্শন বলে মনে হয়, রাজপুত্তুর না হলেও অন্তত কোটালপুত্তুরের খাতির পায়।

বয়স তার একুশ, জোর বাইশ। সায়েবদের ফর্সা তো আছেই কিন্তু তার চুল খাঁটি বাঙালীর মত মিশকালো আর তার সঙ্গে ঘননীল চোখ। এ জিনিসটে অসাধারণ; কারণ সায়েব-মেমদের চুল কালো হলে চোখও হয় কালো, নিদেন-পক্ষে বাদামী—আর চুল ব্লণ্ড্ হলে চোখ হয় নীল। আমাদের দেশেও যাদের রঙ ধবধবে ফর্সা হয় তাদের চোখও সাধারণত একটুখানি কটা; তাই যখন তাদের চোখ মিশমিশে কালো হয় তখন যেন তাদের চেহারাতে একটা অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়। কালো চুল আর নীল চোখও সেই আকর্ষণী শক্তি ধরে।

মধুগঞ্জ যদিও ছোট শহর তবু তার বিলিতি ক্লাব এ অঞ্চলে বিখ্যাত। শহর থেকে বিশ মাইল দূরে যে স্টেশন সে পথের দু' দিকে পড়ে বিস্তর চা বাগান আর রোজ সন্ধ্যায় সে-সব বাগান থেকে ঝেঁটিয়ে আসত ক্লাবের দিক্ সায়েব-মেম আর তাদের আন্ডা-বাচ্চারা।

ফুটফুটে ক্লাব-বাড়িটি। একদিকে লন টেনিসের কোর্ট আর ভিতরে বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা—বিলিয়ার্ডের বল দেখে খানসামারা ক্লাবের নাম দিয়েছিল 'আণ্ডাঘর' আর সেই থেকে এ অঞ্চলে ঐ নামই চালু হয়ে যায়।

এ সম্পর্কে মুরুব্বি রায় বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তীরও একটা 'অনবদ্য অবদান' আছে। ক্লাব তখন সবেমাত্র খুলেছে। সায়েব-মেমরা ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় পরে টুক্‌টাক্ করে টেনিস খেলছেন—রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে রায় বাহাদুর ভীত নয়নে একটিবার সেদিকে তাকালেন। সে সন্ধ্যায় পাশার আড্ডায় রায় বাহাদুর গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে বল্লেন, 'দেখলে হে কাণ্ডখানা, সায়েবরা নিজেদের জন্য রেখেছে একখানা মোলায়েম খেলা; ধাক্কাধাক্কি মারামারি নেই—যে যার আপন কোঠে দাঁড়িয়ে দিব্যি খেলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মত কালা-আদমীদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে একটা কালো ফুটবল। তার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে বাইশটা নেটিভকে—মরো গুঁতোগুঁতি করে, আপোসে মাথা ফাটাফাটি করে। আর দেখেছ, সায়েবদের যদি বা কেউ তোমাদের খেলায় আসে তবে সে মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বাজায় গোরা রায়ের বাঁশী—তার গায়ে আঁচড়টি লাগবার যো নেই।'

পাশা খেলোয়াড়রা এক বাক্যে স্বীকার করলেন, এত বড় একটা দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার একমাত্র রায় বাহাদুরেই সম্ভবে, তদুপরি তিনি ব্রাহ্মণ সন্তানও তো বটেন।

সেই রায় বাহাদুরের সপ্তম দর্শনের বেলুনটি ফুটো করে চুবশে দিয়ে দেশে নাম করে ফেললে বিদেশী ওরেলি। চার্জ নেবার তিনদিন পরেই দেখা গেল, সে ইস্কুলের ছোঁড়াদের সঙ্গে ফুটবলে দমাদ্দম কিক্ লাগাচ্ছে আর এদেশের ভিজে মাঠে খেলার অভ্যাস নেই বলে হাসিমুখে আছাড় খেল বার তিরিশেক।

রায় বাহাদুর বললেন, 'ব্যাটা বদ্ধ-পাগল নয়,—মুক্ত-পাগল।'

পাশা খেলোয়াড়রা কাণ দিলেন না। পুলিশের বড় সায়েব ছোঁড়াদের নিয়ে ধেই ধেই করলে অভিভাবকদের আনন্দিত হওয়ারই কথা। কিন্তু এসব পরের কেচ্ছা।

ক্লাব জয় করেছিল ওরেলি প্রথম দিনই টেনিস খেলায়—জিতে নয়, হেরে গিয়ে। মাদামপুরের চা-বাগিচার বড় সায়েব এ অঞ্চলের টেনিস চেম্পিয়ান। পয়লা সেট ওরেলি জিতল; কারণ সে বিলেত থেকে সঙ্গে এনেছে টেনিস খেলার এক নূতন ঢঙ—মিডকোর্ট গেম্ আর বড় সায়েব খেলেন সেই বেজলাইনে দাঁড়িয়ে আদ্যিকালের কুট্‌স্-কাটুস্। অথচ পরের দু' সেটে ওরেলি হেরে গেল—দাবার ভাষায় বলতে গেলে অবশ্যি গজ-চক্র কিম্বা অশ্বচক্র খেল না বটে। আনাড়ি দর্শকেরা ভাবলে বড় সাহেব প্রথম সেটে সুতো ছাড়ছিলেন; জউরীরা বিলক্ষণ টের পেয়ে গেল, ওরেলি প্রথম দিনেই 'ওভার চালাক', 'বাউণ্ডার' হিসেবে বদনাম কিনতে চায়নি। মেমেরা তো অজ্ঞান—যদিও হারলে তবু কী খেলাটাই না দেখালে, মাস্ট্ বি দি হীট, ইউ নো ফ্রেশ ফ্রম হোম্ ইত্যাদি। বড় সায়েবও খুশী। সবাইকে বলে বেড়ালেন, 'ছোকরা আমার চেয়ে ঢের ভালো খেলে, তবে কিনা, বুঝলে তো, আমার বুড়ো হাড়, হেঁ হেঁ, অফ কোর্স।'

পরদিনই দেখা গেল, ওরেলি বুড়ো পাদ্রী সাহেব রেভরেণ্ড চার্লস ফ্রেডারিক জোনস্‌কে পর্যন্ত বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে 'আণ্ডা' ঘরের দিকে। বুড়ো পাদ্রী অতিশয় নীতিবাগীশ লোক, অবরে সবরে ক্লাবে এলে নির্দোষ বিলিয়ার্ডকে পর্যন্ত ব্যসনে শামিল করে দিয়ে এক কোণে বসে সেই অজ ওয়েলসের দেড় মাসের পুরনো খবরের কাগজ পড়তেন কিম্বা বাচ্চাদের সঙ্গে কাণামাছি খেলতেন। ওরেলির পাল্লায় পড়ে ধর্মপ্রাণ পাদ্রীর পর্যন্ত 'চরিত্রদোষ'

ঘটল। দেখা গেল, পাদ্রী এখন প্রায়ই ক্লাবে এসে ওরেলির সঙ্গে এক প্রস্ত বিলিয়ার্ড খেলে সন্ধ্যের পর তার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শহরের বাইরে ওরেলির বাঙলোর দিকে চলেছেন।

পাদ্রী যে ওরেলির সঙ্গে জমে গেলেন তার অন্য কারণও আছে।

ওরেলির থানার কাছেই পাদ্রীদের ইস্কুল। চাকরীতে ঢোকার দিন দশেক পরে ওরেলি লক্ষ্য করল ইস্কুলে কতগুলো সায়েব মেমের বাচ্চাও ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আসলে এরা ঠিক কি?

ইনস্পেক্টর সোমকে ডেকে পাঠিয়ে বললে 'সোম?'

'ইয়েস স্যর!'

'নো; আমাকে 'স্যর' 'স্যর' করো না।'

'নো, স্যর।'

'ফের 'স্যর'?'

'ইয়েস স্যা—।'

বাচ্চাদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সাহেব শুধাল, 'এরা কারা।'

সোম চুপ করে রইল।

ওরেলি বলল, 'দেখো সোম, তুমি আমার সহকর্মী। তুমি যা জানো আমাকে খোলাখুলি না বললে আমি এখানে কাজ করবো কি করে, আর তুমিই বা আমার সাহায্য পাবে কি করে?'

'আজ্ঞে, এরা ইয়োরেশিয়ন।'

'ভালো করে খুলে বলো।'

'এরা দোঁআসলা; এদের অধিকাংশ চা-বাগান থেকে এসেছে। এদের বাপ—'

'থামলে কেন?'

'—চা বাগানের সাহেব আর মা—এই, এই, যাদের বলে কুলী রমণী।'

ওরেলি থ মেরে সব কিছু শুনলো। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভেবে নিয়ে শুধালো, 'তা এদের সম্বন্ধে আমাকে কেউ কিছু এখনো বলেনি কেন, এমন কি পাদ্রী সাহেব পর্যন্ত না?'

সোম বললে, 'এদের নিয়ে খাস ইংরেজের লজ্জার অন্ত নেই, তাই এরা তাদের ঘেন্না করে। পাদ্রী সাহেব ভালো মানুষ, তাই নিয়ে ও'র দুঃখ হওয়ারই কথা। বোধহয়, আপনাকে ভালো করে না চিনে কোনো কিছু বলতে চান নি।'

সেদিনই থানার থেকে ফেরার সময় ওরেলি সোজা পাদ্রীর টিলায় গেল। পাদ্রীকে সে কি বলেছিল জানা নেই। তবে পাদ্রী-টিলার ব্যাডমিন্টন ক্লাবের প্রথম খাস ইংরেজ সদস্য ওরেলি—অবশ্য পাদ্রী সাহেবদের বাদ দিয়ে—সে কথাটা ক্লাবের মিনিট বুকে সগর্বে সানন্দে লিপিবন্ধ করা হয়েছে।

খবর শুনে এস ডি ও প্লামার ওরেলিকে বললেন, 'গো স্লো।'

ওরেলি তর্ক জোড়েনি, তবে এ বিষয়ে তার মনের গতি কোন্ দিকে সেটা জানিয়ে দিতে কসুর করেনি।

রায় বাহাদুর খবরটা শুনে বললেন, 'নাঃ, ছোঁড়াটাকে তো ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তবে না আখেরে ডোবে। পাদ্রী-টিলার কোনো একটা ডপকা ছুঁড়িকে বিয়ে করলেই চিত্তির!'

আর ইস্কুলের ছোঁড়ারা তো ওর নাম নিয়ে ছড়া বানিয়েছিল,

'ও—রেলি, কোথায় গেলি?'

সাহেব মানে শুধিয়ে উত্তর শুনে ড্যাম্ গ্ল্যাড্।

তারপর হাত পা ছুড়ে আবৃত্তি করলে,

'O, Mary, go and call the cattle home,
Call the cattle home,
Across the sands of Dee.'

আমাকে ঐ ক্যাটলদের একটা মনে করেছ বুঝি? তাই সই, আমি না হয় তোমাদের দেবতা 'হোলি কাও'ই হলুম।'

তিন

এক বৎসর হয়ে গিয়েছে। ওরেলিকে মধুগঞ্জ যে ক্রিকেট ক্যাচের মত লুফে নিয়েছিল সেই থেকে সে শহরের ছেলে-বুড়োর বুকে গোঁজা—ভারতীয় ক্রিকেটের ঐতিহ্যানুযায়ী তাকে ড্রপ্ করা হয়নি।

ইতিমধ্যে ভর বর্ষায় মধুগঞ্জের থলে সাড়ম্বরে নৌকা-বাচ হয়ে গেল। বিলেত তার নৌকা বাচ নিয়ে যতই বড়ফাট্টাই করুক না কেন পূব বাঙলার নৌকা-বাচের তুলনায় সে লাফালাফি বাচ্চাদের কাগজের নৌকো ভাসানোর মত। ওরেলি উল্লাসে বে-এক্তেয়ার।

বেশী। ...চের আইন-কানুন সোমের কাছ ...তিন মিনিটে রপ্ত করে বন্দুক ...ধে করে উঠলো মোটর বোটে। সোমকে বললে, 'তুমি এগিয়ে যাও আমার লঞ্চ নিয়ে ওদিকের শেষ সীমানায়, সেখানে যেন কোনো বদমাইশী না হয়। আমি এদিক সামলাবো—এখানেই তো জেতার গোল?'

সোম বললে, 'সায়েব, নৌকা-বাচের 'ফাউল' আর তারপর বৈঠে দিয়ে মাথা ফাটা-ফাটির ঠ্যালায় ফি বছর এ-দিনটায় ভাবি চাকরী রিজাইন দেব। আজ তুমি আমায় বাঁচালে।'

সায়েব বললে, 'তুমি কুছ্ পরোয়া কোরো না, সোম। ফাউল বাঁচাতে গিয়ে খুন-জখম আমিই করবো। ইউ গো রাইট্ এহেড্।'

তারপর ওরেলি বন্দুক দেগে রেসের স্টার্ট দিলে, পিছনে পিছনে মোটর বোট হেঁকে ফাউল সামলালে, উল্লাসে চিৎকার করে ঘন ঘন 'গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড, ও হাউ গ্র্যান্ড' হুঙ্কার ছাড়লে, কমজোর নৌকোগুলোকে 'চীয়ার আপ্' করলে আর সর্বশেষে প্রাইজের পাঁঠা, কলসী সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে করে স্বহস্তে বিতরণ করলে। মাথা-ফাটাফাটি যে হ'ল না তার জন্য সোম আর বাইচ-ওলাদের অভিনন্দন জানালে।

সর্বশেষে সোম খুশীতে ডগমগ হয়ে বিজয়ী নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে, 'আসছে বছর যে নৌকো জিতবে সে পাবে হুজুরে ওরেলির পিতার নামে দেওয়া 'মাইকেল শীল্ড'। পূব বাঙলায় নৌকো-বাচে এই প্রথম শীল্ড—কম কথা নয়, আপনারা ভেবে দেখুন। আর সে শীল্ড লম্বা তিন হাত হবে, হুজুরের কাছ থেকে সেটা আমি জেনে নিয়েছি। তার মানে পূব বাঙলার যে কোন ফুটবল শীল্ড তার তুলনায় 'ছোক্ত, এ্যান্ড্যা পোলাড্যা।' হুজুর শীল্ড কি ধরণের হবে সেটা আমায় বলতে বারণ করেছিলেন; আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। কাল আমার চাকরী যাবে। তা যাক! এখন আপনারা বলুন,

থ্রী চিয়ারস্ ফর ওরেলি,
হিপ্ হিপ্ হুররে।'

সে কি হুঙ্কারে হিপ্, হিপ্। গাঁয়ের লোক এ ধরণের স্থূল রসিকতা বোঝে। তার উপর তাদের আনন্দ, দু' দিনের চ্যাংড়া ফুটবল খেলার পাতলা দাপাদাপিকে তারা আজ হারিয়েছে। তাদের শীল্ড আসছে, বছর থেকে সব ফুটবল শীল্ডের কান মলে দেবে।

ক্লাবের যে দু' একটি পাঁড় ইংরেজ কালা-আদমীদের রেস দেখতে আসেননি তারা পর্যন্ত হুঙ্কার শুনে আঙুল দিয়ে কান বন্ধ করে বলেছিলেন, 'ওরেলি ইজ গন্ কমপ্লীটলী নেটিভ!'

অসম্ভব নয়। কিন্তু সেদিন শীল্ড-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যদি ওরেলি গা-ঢাকা না দিত তবে পঞ্চাশখানা গাঁয়ের লোক তাকে লিন্চ্ করতো।

পাদ্রী বাঙলোর নয়মি, রুথ, ইভা, মেরি সব ক'টা সোমত্থ মেয়ে জাত-বেজাত ভুলে পাইকেরি দরে পড়ল ওরেলির প্রেমে। সে হ্যাপা সামলাতে না পেরে ওরেলিকে বাধ্য হয়ে প্রকাশ করতে হল তার বিয়ে দেশে ঠিক হয়ে আছে, ছুটি পেলেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আসবে।

ওরেলি বুদ্ধিমান ছেলে। বিয়ের খবরটা সে ভেঙেছিল সোমের কাছে। সোম খবরটাকে বিয়ে বাড়িতে ফাটাবার বোমার মতই হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আদর করার পর সেটি ফাটিয়ে দিলে হাটের মধ্যিখানে কিন্তু তার থেকে বেরল টিয়ার গ্যাস। সে গ্যাস পেঁছে গেল পাদ্রী বাঙলোয় পোপের মৃত্যুসংবাদ ছড়াবার চেয়েও তেজে এবং চোখের জলের জোয়ার জাগালো নয়মি, রুথ, ইভার হৃদয় ছাপিয়ে।

হায় এরা তো জানে না ওরেলিকে, আশা করা এদের পক্ষে বামন হয়ে চাঁদ ধরার আশা করার মত। কিম্বা তাতেই বা কি এবং এ উপমাটাও হয়ত তারা জানে যে সামান্য একটা খরগোশ যখন চাঁদের কোলে প্রতি সন্ধ্যেয় অশ্বিনী ভরণীকে ঢিঢ দিয়ে বসতে পারে তখন এরাই বা এমন কি ফেলনা? বিশেষ করে নয়মি। ভারতীয় সৌন্দর্যের নুন-নেমক আর ইংরেজের নিটোল স্বাস্থ্য নিয়ে গড়া এই তরুণী; এর সঙ্গে ফ্লার্ট করার জন্য পঁচিশটে বাগানের ইংরেজ ছোঁড়ারা ছোঁকছোঁক ঘুরঘুর করে তার চতুর্দিকে, যদিও সকলেরই জানা শেষ পর্যন্ত তারা বিয়ে করে নিয়ে আসবে বিলেত থেকে কতকগুলো খাটাশমুখো ওল্ড মেড।

এ তত্ত্বটাও ওরেলির জানা ছিল বলে সে একদিন সোমকে দুঃখ করে বলেছিল, 'দেখো, সোম, আর যে যা-খুশী ভাবুক। তুমি কিন্তু ভেবো না যে আমি পাদ্রী টিলার মেয়েদের নিচু বলে ধরে নিয়েছি। আমার বিয়ে ঠিক না থাকলে আমি ওদেরই একজনকে বিয়ে করতুম। মেয়েগুলির বড় মিষ্টি স্বভাব।'

সোম কানে আঙুল দিয়ে বললো, 'ও কথা বলো না সাহেব। জাত মানতে হয়।'

ওরেলি আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ক্রিশ্চানের আবার জাত কি?'

সোম বললে 'জাতের আবার ক্রিশ্চান কি?'

করে করে এক বছর কেটে গেল।

ওরেলি ছুটি নিয়ে বিলেত থেকে বউ আনতে গেল।

ক্রমশ

প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে ইলেকসনটা তরে যেতে পারলে এদের তিনি কাজ জুটিয়ে দেবেন। এত ছেলে বসে আছে, এতে দেশেরই ক্ষতি। যুবশক্তির এই বিরাট অপচয় তিনি যথাসাধ্য রোধ করবেন।

চাকরি তো দেবেন, কিন্তু কী চাকরি। রাস্তার আলো জ্বালান-নেবানর কাজটা সহজ বটে, কিন্তু সে-সব এরা চায় না। আদিত্য প্রস্তাব করে দেখেছিলেন। সর্দার ভলান্টিয়র মাথা চুলকে বলেছিল, 'স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।'

'বল।'

'ও সব ছোট কাজ। উড়েরা করে। আমাদের পোষায় না। আজ আমাদের এই রকম অবস্থা দেখছেন স্যার, কিন্তু বরাবর এ-রকম ছিল না। আমরা ভদ্দর-লোকের ছেলে, চান তো সার্টিফিকেট দেখাতে পারি।'

আর একজন বললে, 'ওয়ারের সময় এয়ারপোর্টের কাজ করেছি, এখনও একটা মই পেলে গাছের আগায় তর তর করে উঠে যেতে পারি। লড়াইটা আর কিসুদিন চললে অপিশার হয়ে যেতুম, আমাদের বলছেন উড়ে-মেড়োর কাজ নিতে। বড্ড দাগা দিলেন, স্যার।'

আদিত্য ক্ষীণকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করেছিলেন, 'দেশের কাজ—'

একটি ছেলে, সে কিন্তু ঠোঁট-কাটা, বললে, 'দেশের কাজ বলে কি রোয়াব নিচ্চেন, দেশের কাজ আমরা করিনি? ক'খানা মিলিটারী ট্রাক পুড়িয়েছি, তার হিসেব দেখে আসুন গিয়ে। বলেন তো, এখনও প্রভাত মল্লিকের, মোটর গাড়ি-গুলো বেবাক ঢিল মেরে গুঁড়িয়ে দিই। প্রভাত মল্লিকের সব ট্রাক আসে শিউনন্দন ট্রান্সপোর্ট থেকে, ওদের গারাজে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি।'

আদিত্য ত্রস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'সে-সব কিছু করতে হবে না। এটা ডেমো—গণতন্ত্রের যুগ। আমরা ন্যায়ের পথে এগোব। তোমাদের কাজ শুধু সুস্থ জনমত তৈরি করা।'

চাঁই ভলান্টিয়ার মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'ঠিক তৈরি হয়ে যাবে স্যার, একেবারে দরজির দোকানে ফরমাস-মাফিক। কিচ্ছু ভাববেন না।'

(১৯)

কলরব শুনে ভোর বেলাতেই আদিত্যের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করলেন, বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। একবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন আদিত্য, কী যেন ভাবলেন।

কলরব ক্রমেই বাড়ছে। গোটা এক-তলাটাই আদিত্য ভলান্টিয়রদের ছেড়ে দিয়েছেন। ওদের কেউ কেউ এখানেই রাত্রে শোয়, খায় সকলেই এখানে। ভিজিটার্স রুমটা এখন কমন কিচেন, বড় হলটায় খাওয়া দাওয়ার ঢালা বন্দোবস্ত। আলাদা ঠাকুর, চাকর ইত্যাদি। আয়োজনের ত্রুটি নেই। রাত পোহাতে না পোহাতেই সব একে একে জোটে। উনুনে চা চড়ে, অজস্র সিগারেট পোড়ে, সুর-অসুর সংগীত আর তাথৈ নৃত্য চলে। আদিত্য প্রথম দু'দিন বিরক্তি বোধ করেছিলেন, এখন আর করেন না। মনে মনে এদের সলাঙ্গুলে প্রাক্-মানবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এদের সহায়তা নিতে হচ্ছে, তাতে লজ্জার কিছু নেই। কেননা স্বয়ং রামচন্দ্রকেও এদের স্বারস্থ হতে হয়েছিল।

ঝনঝন শব্দ করে কয়েকটা কাপ-ডিশ ভাঙল নীচের তলায়, আদিত্য চমকে উঠলেন। এদের হাতে কোন কিছু আস্ত থাকলে হয়। হয়ত চায়ে ঠিকমত চিনি হয়নি, কিম্বা দুধের পরিমাণ হয়নি যথোচিত, অমনি পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলেছে মেজেয়। মাঝে মাঝে নীচের ঘরে উঁকি দিয়ে আদিত্য দেখেছেন, তাঁর এমন যত্ন করে পালিশ করা ফ্লোর এখানে ওখানে চোট খেয়েছে, ডিস্টেম্পার করা দেয়ালের ফিকে নীল পানের পিচ লেগে লেগে সবুজ হল।

এত করেও মন পান না। পান থেকে চুণ খসলেই সব তচনচ। টিন টিন দামী সিগারেট আসে, বিলাতী দ্রব্য, কিন্তু উপায় কী। প্রথমে তো বিড়ির বন্দোবস্তই করতে চেয়েছিলেন। ওরা রাজি হয়নি। হেড ভলান্টিয়ার মাথা চুলকে বলেছিল, 'থাকি না স্যার, একেবারে টুইল করে দিন।'

'টুইল?' পরিভাষাটা আদিত্যের কাছে সহজবোধ্য হয়নি।

'সিগারেট, স্যার। বিড়ি তো ওরা বাপের পকেট মেরে দু'চার পয়সা যা পায় তাই দিয়েই জোটায়, বিড়িই যদি খাবে তবে আপনার কাছে আসবে কেন, ইলেকসনে খাটবে কেন।'

বটেই তো, কেন। আদর্শ? দেশের কাজ? আদিত্য সে-চেষ্টাও করে দেখেছেন। এ-যুগের ছেলেদের ধারাটাই কেমন যেন। বড় বড় কথায় এদের মনের চিড়ে ভেজে না।

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, আদিত্যকে

নীচের তলার হল্লা কমেছে। ওদের প্রাতরাশ শেষ হল বোধ হয়। আদিত্য বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। এতক্ষণে সকাল হল। আলোর সোনায় পূব আকাশের মেঘের ঝুলি ভরে গেছে, সূর্য উঠেছে; তপন, তাপন, শুচি, তমিস্রহা। নমস্কার করে আদিত্য নীচে পথের দিকে তাকালেন।

সারি-সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে। ভলান্টিয়ারেরা টপাটপ লাফিয়ে উঠছে, দু'-একটা ইঞ্জিন স্টার্টও দিল।

সর্দার ভলান্টিয়ার বললে, থ্রি চীয়র্স ফর—'

'আদিত্য মজুমদার।'

কী মনে হল আদিত্যর, ওদের এক-জনকে ডাকলেন, 'এই শোন।'

ছেলেটি কাছাকাছি আসতে বললেন, 'থ্রী চীয়ার্স ব'ল না। ইংরাজী ভাষা, ভাল শোনায় না।'

'তবে কী বলব স্যার। জিন্দাবাদ?'

আদিত্য ভেবে দেখলেন। তাও না। জিন্দাবাদে কেমন—কেমন যেন রুশ-রুশ গন্ধ। তবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন সনাতন জয়ধ্বনিই ভাল।

একজন বললে, 'আদিত্য মজুমদার কি—'

সমস্বরে প্রতিধ্বনি উঠল 'জয়।'

একের পিছে আর একটি ট্রাক অদৃশ্য হল।

প্রথম যৌবনে আদিত্য আদর্শবাদী ছিলেন। এক ডাকে কলেজ ছেড়েছিলেন। সেটা বিলাতী দ্রব্য-যজ্ঞ, মাদক-বর্জনের যুগ। হাজার হাজার ছেলের সঙ্গে আইন ভাঙলেন, জেলে গেলেন। কিন্তু তখনও কেউ তাঁকে চেনে না। তিনি তখন অজ্ঞাত কর্মীমাত্র।

বেরিয়ে এসে চমক পেলেন। গরাদের ভিতর দিয়ে এক ফালি নীল আকাশ দেখে বিষণ্ণ হয়ে যেতেন, জানতেন না, তাঁর জন্যে এত ফুলের মালা ফটকের বাইরে জমা আছে। পাড়ার যুব সঙ্ঘের সেক্রেটারী হলেন, লাইব্রেরীর ভার পেলেন, হাতে-লেখা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় নাম উঠল। আদিত্য ভাব[illegible] এ-তো মন্দ নয়। ছোট খাট হিতব্রত [illegible] ভুলে রইলেন, নেশার মত ক'টা দিন [illegible] গেল। ভাল চাকরির সন্ধানও দু' চা[illegible] এসেছিল, হাত বাড়ালেই পাওয়া [illegible] দেশসেবকের সেবা করে কৃতার্থ হ[illegible] লোকের সেদিন অভাব ছিল না। আদি[illegible] সে-সব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেন [illegible] সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি, আবার [illegible] আহ্বান আসে ঠিক কী। আরও ধন্য-পড়ে গেল, সর্বত্যাগী খেতাব জ[illegible] তখন। আবার জেলে গেলেন, আ[illegible] ফিরলেন।

কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতেও বিলম্ব ঘ[illegible] না। দ্বিতীয়বার ফিরে এসে দেখলে[illegible] সহকর্মীদের অনেকেই হৃতস্বা[illegible] বিশ্বাসহীন দুর্বল। সব চেয়ে বিশ[illegible] করেছেন যাদের, তাদের দু' চার[illegible] সরকারী স্পাই পর্যন্ত হয়েছে। সুবি[illegible] বাদী কয়েকজন লাইসেন্স সংগ্রহ ক[illegible] নানা ব্যবসা ফেঁদেছে।

মনে মনে আদিত্য বিচার করেছে[illegible] এর কারণ কী। সিদ্ধান্ত করেছেন কোথ[illegible] ফাঁকি আছে। লক্ষ্যে না থাক, পন্থা[illegible] দেশসেবা মানে অনেকের কাছেই জে[illegible] যাওয়া-আসার শাটল সার্ভিসের সওয়[illegible] হওয়া মাত্র। এ-উপায়ে ইষ্ট সি[illegible] হবে না।

আদিত্য বিশ্বাস খোয়ালেন।

এক বিশ্বাস গেল, অন্য বিশ্ব[illegible] খুঁজে পেলেন না, আদর্শের বদলে যি[illegible] পেলেন না আদর্শ। লুকোচুরিরও ত[illegible] থেকে শুরু। লোকের সঙ্গে, নিজে[illegible] সঙ্গে। চরকায় নিষ্ঠা নেই, অথচ খদ্[illegible] ছাড়লেন না। টেররিস্টদের সঙ্গে সংযো[illegible] হল; দু'দিনেই টের পেলেন তা[illegible] আর তাঁর মত ও পথ এক নয়। তবু তা[illegible] গোপনে অর্থ জুগিয়ে যেতে লাগলে[illegible] কিছুদিন পরে সে-দলেও ভাঙন লাগ[illegible] দলের কর্মীদের অনেকেই একে এ[illegible] নানা বামপন্থী দলে ভিড়ে যে[illegible] লাগলেন; আদিত্যর মন তাতেও স[illegible] দিল না, থমকে দাঁড়ালেন।

ততদিনে আদিত্যের সামাজি[illegible] প্রতিষ্ঠা বেড়েছে, নানা উপায়ে অ[illegible] বেড়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এমন দু'চার

ঘটনা ঘটেছে নীতিবাগীশদের ভাষায় যাকে বলে স্খলন। কিন্তু শান্তি পাননি। বিশ্বাসের সংগে সংগে শান্তিও মন থেকে মুছে গেছে। তাঁর চেয়ে, কখনও মনে হয়েছে, ষাট বছরের ঠাকুমা-দিদিমারও সুখী, যাদের দেবদ্বিজে অচলা ভক্তি। সাকার পূজাকে আদিত্য মনে করেন কুসংস্কার, নিরাকার উপাসনাকে বুজরুকী, আবার ঈশ্বরকে একেবারে উড়িয়ে দেবার মত মনের জোরও নেই। ভক্তিরসে ডুবু-ডুবু দেশ, ঈশ্বরকে অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখালে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার শিকড়ে টান পড়বে।

রাজনৈতিক জীবনেও তখন শূন্য-বাদ চলছে। আইন-অমান্য আন্দোলন শান্ত, বিপ্লবীরা ক্লান্ত, তা-ছাড়া ওদের সংগে তো কবেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আদিত্য এবার হিন্দু সংগঠন নিয়ে মাতলেন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত একটি সমাজকে একসূত্রে বেঁধে দেবেন—হাত-তালি পেলেন, অনুচরও জুটল। কিন্তু শেষে তাতেও অরুচি হল। সব লীলা সাঙ্গ করে আদিত্য এখন মুক্ত পুরুষ, নির্দলীয় জননেতা। প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ, আকৈশোর দেশকর্মী, অথচ কেউ জানে না আদিত্য কী চান, তাঁকে ভয় করে সব দলেই। কোন মত নেই, কোন পথ নেই, আদিত্য নিজের মনের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে শিউরে ওঠেন, তাঁর মত সর্বস্বান্ত কেউ তো নয়। কিছু নেই, কিছু নেই; আদিত্যের মনে না, বাইরে না। শান্তি না, স্বপ্ন না। নিখিল বিশ্ব একটা ধূধূ, [illegible] রুক্ষ মরুভূমি।

আছে, একটুখানি আছে। জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করবার তৃষ্ণাটুকু যায়নি; বাঁচবার সাধ, সকলের মধ্যে মিশে নয়, সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়াবার বাসনা অহর্নিশ শিখা হয়ে জ্বলছে। নিজেকে আদিত্য এখনও ভালবাসেন। এই মোহ, স্বমেহটুকুও গেলে, শান্তি তো গেছেই, স্থৈর্যটুকুও খোয়ালে, আদিত্য কবে পাগল হয়ে যেতেন।

তবু ভাল লাগে না। এতো আদিত্য চাননি। মাঝে মাঝে এই প্রতিষ্ঠার পাহাড়, স্তুতির স্তূপ, ঐশ্বর্য আর আর সাফল্য-পরিকীর্ণ চক্র থেকে বেরিয়ে পড়তে সাধ যায়। সেই সংস্কার-তিমিরান্ধ বাল্য, ভক্তি-পিচ্ছিল কৈশোর আর বিশ্বাসদীপ্ত প্রথম যৌবনে একবারও যদি ফিরে যেতে পারতেন! তবে হয়ত শান্তির কড়িটি ফিরে পেতেন ঝুলিতে, আদিত্যের কাছে আবার পার্থিব রজ মধুময় হত, নক্ত-ঊষা মধুতে ভরে উঠত, সিন্ধু মধু ক্ষরণ করত।

বারান্দাটুকু রোদে ভরে গেছে, পথে ভীড়, আকাশে দু'একটি দলছাড়া চিল। অনেক দূর থেকে হল্লা শোনা যাচ্ছে, আদিত্যর জয়ধ্বনি দিচ্ছে লরীবোঝাই ছেলেরা। সামনের বাড়িটার দেয়ালের দিকে এতক্ষণে আদিত্যর চোখ পড়ল। সারি সারি পোস্টার। একটার পিঠে আরেকটা, থিয়েটারের, ক্ষতরোগের মলমের, ইলেক-সনের। আদিত্যর পোস্টারও আছে। 'ত্যাগীশ্রেষ্ঠ আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন।' পড়তে গিয়ে আদিত্য হোঁচট খেলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হল। 'ত্যাগী' কথাটার উপর কারা যেন 'ভোগী' এ'টে দিয়ে গেছে।—'ভোগীশ্রেষ্ঠ আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন।' ক্রুদ্ধ হলেন আদিত্য, কিন্তু সংগে সংগে হাসিও পেল, লেখাটা বার-বার পড়ে আয়নায় নিজেকে ভেংচি কাটার সুখ পেলেন।

প্রভাত মল্লিকের দলের কীর্তি নিশ্চয়ই। আদিত্য স্থির করলেন, ওখানে নতুন পোস্টার লাগাতে হবে। সব পরি-শ্রম, [illegible] পণ্ড হল। প্রভাত মল্লিককে কোন[illegible]দ করা যায় কি না, তাও ভে[illegible] হবে।

হঠাৎ আদিত্য পিছন ফিরে বললেন, 'এস অতসী।'

অতসী এসেছে, আদিত্য পায়ের শব্দেই টের পেয়েছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'এস অতসী। তোমাকেই ভাবছিলাম। ভালই হল নিজে থেকে এলে। ঘরে চল, কথা আছে।'

ঘরের মাঝখানে ছোট একটি টেবিল, নানাবিধ লেখার আসবাব। পাশে সযত্ন সাজান কাগজপত্র, কোনটা টাইপ করা, কোনটা ছাপান। আদিত্য একটা চেয়ারে

বসলেন, অতসীকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আর একটা।

অতসী বসল না, টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তার দিকে অপলক কিন্তু আড়চোখে একনজর দেখে নিয়ে আদিত্য ধীরে ধীরে বললেন, 'উঁহু, এ চলবে না।'

কী চলবে না?

'এই পোষাক। রঙিন শাড়ি, চুড়ি—এ সব হল বিলাসের প্রতীক। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর হয়ে যারা কাজ করছে, তাদেরও সহজ, রিক্ত, অনাড়ম্বর হতে হবে।'

'বলে দিন, কী ভাবে।'

'শাদা শাড়ি,—খদ্দর হলে ভাল হয়। শাদা ব্লাউজ। তবে হাতের কাছে সামান্য একটু সুচের কাজ থাকলে ক্ষতি নেই। গলায় সরু এক গাছি হার চলতেও পারে, একটি হাত ঘড়িতেও দোষ নেই। অর্থাৎ সজ্জা করবে, কিন্তু করেছ যে, সেটুকু কেউ টের পাবে না।'

অতসী হেসে ফেলল।—'তবে এই খোঁপাটাও খুলি আদিত্যবাবু, বাথরুমে সাবান আছে? তা হলে বলুন, ঘষে ঘষে চুলগুলো রুক্ষ করে ফেলি। একেবারে যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে, কী বলেন।'

আদিত্য গম্ভীর হলেন, একটা অদৃশ্য মুখোসে মুখের সব কটি রেখা ঢেকে গেল। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি বড় চপল হয়েছ অতসী। শিক্ষয়িত্রীকে এতটা মানায় না।'

অতসীও অপ্রতিভ হল, চট করে মুখে কথা সরল না। মাথা নীচু করে হাতের নখ খুটতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে, আদিত্য বললেন, 'যাক যে-জন্যে তোমাকে ঘরে এনেছি, সেটা শোন। তোমাকে একবার 'জন-দর্পণ' কাগজের অফিসে যেতে হবে।'

'কাগজের আফিসে, কেন?'

'প্রয়োজন আছে বলেই বলছি। ওদের কাগজে পর পর তিন দিন প্রভাত মল্লিকের দলের স্টেটমেণ্ট বেরিয়েছে। তুমি গিয়ে জেনে আসবে এর রহস্যটা কী। জিজ্ঞাসা করবে ওরা আমার পাল্টা বিবৃতিও ছাপবে কি না। আর' এখানে আদিত্য কণ্ঠস্বরটা যেন ঝুপ করে ঢিলের মত করে ইঁদারায় ফেলে দিলেন,—'আর এডিটর যদি লম্বা চওড়া কথা, নীতি, আদর্শের বুলি ঝাড়ে, তবে ফেরবার পথে ওদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে। শুধু জিজ্ঞাসা করবে ও'রা গ্যাল্‌ভেটিক ডেভেলপমেণ্টের বিজ্ঞাপনে ইণ্টারেস্টেড কি না। শীগ্‌গিরই এই ট্রাস্ট ক্যাম্পেন শুরু করবে তাও জানিয়ে আসবে—প্রায় পাঁচ লাখ টাকার পাব্‌লিসিটি স্কীম। ম্যানেজারের চোখ-মুখের ভাব কেমন হয়, তাও লক্ষ্য করে আসতে ভুল না।'

'এই কাজ?' অতসী জিজ্ঞাসা করলে।

'আরও একটু আছে।' আদিত্য একটা এলাচদানা তুলে দাঁতে কাটলেন।—'আসবার পথে ক্যালকাটা টাইমস কাগজের অফিসে নামবে। সেখানে এই স্টেটমেণ্টটা দেবে—এতে প্রভাত মল্লিকের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত রহস্য আছে।'

'ওরা ছাপবে কেন'

ঈষৎ হাসি-উদ্ভাসিত প্রত্যয়ের সুরে আদিত্য বললেন, 'ছাপবে, ছাপবে। ছাপবে বলেই তো তোমাকে পাঠান। নইলে এ-কাজের জন্যে অন্য কাউকে কি পাঠান যেত না ভেবেছ? যেত, কিন্তু পুরোপুরি ফল হয়ত পাওয়া যেত না। লোকে যে-জন্যে দোকানে সেলস্‌ গার্ল রাখে, এও তেমনি। এক ধরণের মুখের জয় সর্বত্র, পড়নি?'

অন্ধকার মুখে অতসী বলল, 'আপনি শুধু আমাকে অপমানই করছেন।'

আদিত্য হাসলেন, 'কম্‌প্লিমেণ্ট দিলুম, সেটাকে মনে করলে অপমান? তোমাদের আজকালকার মেয়েদের ভাবনার ধারাই বড় বাঁকা। কম্‌প্লিমেণ্ট আর অপমানের মধ্যে তফাৎ আসলে এক চুলের অতসী, অনেকটা গ্রহীতার মর্জির উপর নির্ভর করে। নইলে ভেবে দেখ, আমি কিছু অন্যায় বলিনি। পুরুষ আর নারীর আলাদা অস্ত্র। পুরুষের অস্ত্র বল, মেয়েদের ছল। ক্ষেত্র বুঝে প্রয়োগ করতে হয়। তোমাকে দিয়ে এ-কাজ সহজে সিদ্ধ হবে, বল প্রয়োগের ক্ষেত্র এটা নয়। এই সহজ কথাটায় রাগ করছ কেন।'

মন্ত্রমুগ্ধবৎ গলায় অতসী বলল, 'কিন্তু এ যে বড় নোংরা কাজ।'

'নোংরা বৈ কি। কিন্তু নোংরা দেখে ভয় পেলে পৃথিবীর অনেক সংস্কা[illegible] কাজে হাতই দেওয়া যেত না। তুমি বল[illegible] পদ্ধতিটাও নোংরা। উপায় কী। ক[illegible] দিয়ে কাঁটা তোলার প্রবাদ শোন[illegible] এও তাই।'

দীর্ঘ একটা যতি দিলেন আদি[illegible] টেবিলটায় আঙুল দিয়ে একটা টক[illegible] গৎ বাজালেন। তারপর গভীর এ[illegible] শ্বাস ফেলে বললেন, 'আমারই কি এ[illegible] ভাল লাগে অতসী; জানি তৃষ্ণা থে[illegible] তৃষ্ণা, কামনা থেকে কামনা, এ-সি[illegible] শেষ নেই। সব ছেড়ে, ঝেড়ে ফেলে [illegible] শান্ত, ছোট, নিঢেউ পুকুরের জী[illegible] ফিরে যেতে পারতুম। কিন্তু আর [illegible] না। পাশার দান পড়লে আর ফেরান [illegible] না। জানি, একবার যখন এপথে নেমে[illegible] তখন আর নীতির সঙ্গে সন্ধি করা মি[illegible] দু' হাতে মুখ ঢাকলেন আদিত্য, [illegible] কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ কর[illegible] 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগি[illegible] সেই গভীর স্বর করতলে প্রতিহত [illegible] বিচিত্র-গম্ভীর প্রতিধ্বনি তুলল। শি[illegible] উঠল অতসী, দু' পা সরে দাঁড়[illegible] ততক্ষণে মুখ থেকে হাত স[illegible] ফেলেছেন আদিত্য, অতসী তাঁকে [illegible] কণ্ঠে বলতে শুনল, 'আমরা সব [illegible] একটি পলিটিক্যাল ধৃতরাষ্ট্র অ[illegible] অন্ধ, একচক্ষু হরিণও নই।'

তার পর কয়েকটি স্তব্ধ, বি[illegible] মুহূর্ত। নীরেখ মুখোস খসে প[illegible] সেই অবসরে অতসী দেখে নিয়েছে [illegible] এক আদিত্যকে; অতৃপ্ত, অসুখী, [illegible] বোধন্যুব্জ, ক্লিষ্ট-কুণ্ঠিত একটি মা[illegible] করুণা প্রত্যাশী।

কিন্তু কয়েক পলক মাত্র। দে[illegible] দেখতে আদিত্য সম্বিৎ ফিরে পে[illegible] তাড়াতাড়ি যেন এঁটে নিলেন মুখে[illegible] নদীর স্রোতে নিমেষের জন্যে মুখ [illegible] একটা শুশুক যেন আবার তলিয়ে [illegible]

অবিচলিত আদেশের ভ[illegible] আদিত্য বললেন, 'তোমার দেরি [illegible] যাচ্ছে, অতসী। নীচে গাড়ি অনে[illegible] থেকে দাঁড়িয়ে আছে। এবার যাও।'

হঠাৎ অভিনেতা পার্ট ভুলে [illegible] ছিল। মুখস্ত বুলি আদিত্যের [illegible] মনে পড়েছে।

(

❀ শারদ সাহিত্য ❀

অলবেরুনী

কনট সর্কাস
নয়াদিল্লী

সুহৃদবরেষু,

... ... পৃথিবী যেন রোগ-শয্যায় শুয়েছিল। এতটুকুও আর শক্তি ছিল না তার। শুধু কান্না আর কান্না। উৎসাহহীনতার ইচ্ছাহীনতার কান্না। সেই কখনো-থামবেনা কান্নাও একসময়ে থামল। তার ঘনপক্ষ্ম চোখের নীচে শেষ অশ্রুবিন্দু তখনো শুকিয়ে যায়নি, কল-কণ্ঠে কে হেসে উঠল হঠাৎ। চেয়ে দেখি, আশ্বিনের অলসগমন মেঘে মেঘে কার নীলাভসুন্দর দৃষ্টির প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশের দেবতা বললেন 'জাগো', বাতাসের দেবতা বললেন 'জাগো'। পৃথিবী তার রোগযন্ত্রণা দুঃস্বপ্ন থেকে উঠে বসল : শরৎ এসেছে।

কাব্য থাক। কাব্যের 'ক'ও অলবেরুনী জানে না। সে শুধু জানে, বিশ্ব-চরাচরের এই রোগমুক্তির মুহূর্তে—প্রাচীনকালে রাজারা যখন মৃগয়ায় বেরতেন—তার জন্যে অন্তত একটি আনন্দ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। ঝকঝকে কয়েকখানি শারদীয় সংখ্যা পাঠের আনন্দ।

* * *

বাংলা সাহিত্যের আসরে কবে যে প্রথম শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন হয়েছিল, আর কিছুকালের মধ্যেই তা হয়তো গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে; আপাতত দেখা যাচ্ছে, শারদীয়া সংখ্যা-গুলিই এখন সাহিত্য-সাধনার একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। সারা বছরে যিনি কিছু লেখেন না, আপনাদের অর্থাৎ সম্পাদকদের তাড়নায় সেই অবসরেচ্ছু অতি-প্রাচীন লেখককেও এই সময়ে কিছু না কিছু, অন্তত একটা মাতৃবন্দনা লিখতে হয়; সারা বছর যিনি পয়সা বাঁচিয়ে চলেন, সেই অতি-হিসেবী ক্রেতাটিকেও এই সময়ে কিছু না কিছু, অন্তত একখানি শারদীয়া সংখ্যা, কিনবার জন্যে তৈরি থাকতে হয়। মহালয়ার দিন কয়েক আগে থেকেই পাড়ায় পাড়ায়—মুখ্যত কলেজ স্ট্রীটে—বইয়ের স্টলগুলি সব কাগজে কাগজে ভরে উঠতে থাকে। যে কিছু কিনবে না, সেও একবার থমকে দাঁড়ায়; হাতের সামনে যে কাগজখানি রয়েছে, সন্তর্পণে তুলে নিয়ে একবার উলটে পালটে দেখে। সে এক অদ্ভুত আনন্দ।

কে একবার বলেছিলেন, ভাল ভাল লেখকের খারাপ খারাপ রচনা নিয়ে যে-কাগজ প্রকাশ করা হয়, তাকেই বলে শারদীয়া সংখ্যা। মিথ্যে কথা। আমাদের বাঙালী সাহিত্যিকেরা গত দশ বছর যে-কটি শ্রেষ্ঠ গল্প কবিতা আর প্রবন্ধ রচনা করেছেন, অলবেরুনী সেদিন তার একটা মোটামুটি তালিকা তৈরি করেছিল। দেখা গেল, তার বারো আনা লেখাই কোনো না কোনো শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশই নয়, আপনাদের আরও বড় কৃতিত্ব, লেখক আর পাঠকের মধ্যে আপনারা একটি সহজ সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। কে কোথায় লিখলেন, কেমন লিখলেন, কিছুকাল আগেও কি তা নিয়ে পাঠকমহলের এত কৌতূহল ছিল? এত আগ্রহ?

সে-আগ্রহ শুধু বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বাংলার বাইরে গিয়েও পৌঁছেচে। পেটের ধান্দায় অলবেরুনীকে প্রবাসে থাকতে হয়, কিন্তু রাজপুতানার মরুপ্রান্তবর্তী এই উঁচকপালে সাহিত্য-বিমুখ স্নব-শহরেও সে তার অস্তিত্ব অনুভব করেছে। এখানে অবশ্য শারদীয়া সংখ্যার প্রচলন নেই, আছে দীপাবলী সংখ্যার। কিন্তু অলবেরুনী তার অবাঙালী বন্ধুদের কাছ থেকে জেনেছে, হিন্দী-উর্দুভাষী পাঠকদের সম্বৎসরের সাহিত্য-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবার জন্যে এই যে বিশেষ দীপাবলী সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা, শারদীয়া-সংখ্যার জনপ্রিয়তাই আসলে এর সকল প্রেরণার উৎস। কথাটা আপনারা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করলেও কোন ক্ষতি নেই। ইন্দ্রপ্রস্থের অধিবাসীরা তাতে বড়-জোড় একটু বিব্রত হবেন, কিন্তু মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হবে না।

শারদীয়া দেশ পত্রিকা যথাসময়ে পাওয়া গেছে, তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। অন্যান্য কিছু কিছু কাগজও যোগাড় হয়েছে, বড়ো-মেজো-সেজো সব রকমের কাগজই তার মধ্যে আছে। এক নিঃশ্বাসে সেগুলি শেষ হলো।

এখন একটা কথা। গত বছর কলকাতায় গিয়ে অলবেরুনী আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল; আপনাকে জানিয়েছিল যে, বাংলা সাহিত্যের একজন নগণ্য পাঠক হিসেবে সে আপনাকে কিছু কিছু মতামত পাঠাতে চায়। আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন। তারপর লিখব-লিখব করেও সে এতদিন কিছু লিখে উঠতে পারেনি। কলম ধরতে তার সংকোচ হয়েছে। সংকোচ, কেননা, মতামতে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সংকোচ, কেননা, হুট্ করে একটা-কিছু লিখে ফেলে নিজেকে অরসিক প্রমাণ করবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ তার ছিল না। একসঙ্গে এতগুলি শারদীয়া সংখ্যা পড়ে সে-সংকোচ তার কেটেছে। বাংলা সাহিত্যের হালফিল চরিত্র সম্পর্কে নিজেকে এখন আর ঢের বেশি ওয়াকিবহাল মনে হচ্ছে। আধ পেগ হুইস্কি টেনেই নেংটি-কেরানির যেমন যুদ্ধং দেহি মনোভাব হয়, অলবেরুনীরও এখন প্রায় সেই রকম অবস্থা। মনে হচ্ছে, আপনাকে যদি কিছু জানাতেই হয় তো এই তার সুবর্ণ সুযোগ। এর পর আর তার মুখ খুলবার সাহস হবে না।

এবারকার ছোট গল্প

প্রথমে গল্পের কথা বলা যাক। গত শতকের শেষ পঁচিশ বছর আর বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ, এই অর্ধ-শতাব্দীকালকে বাংলা সাহিত্যের একটা সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির যুগ বলে গণ্য করা

যায়। সে আপনি জানেন। সাহিত্যের আসরে এই সময়ে এমন কয়েকজন মহারথীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁদের অধিকাংশেরই প্রতিভা বিশেষ কোন একটা ক্ষেত্রের—গল্পের, কি কবিতার, কি নাটকের, কি প্রবন্ধের—নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। একই সময়ে সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে তাঁরা হাত দিয়েছেন। যা-কিছুতে হাত দিয়েছেন, তাইতেই সোনা ফলেছে। তবু বলা যায়, গল্প-সাহিত্যই বোধ হয় এই স্বল্প সময়ে সবচাইতে বেশি উপকৃত হয়েছে। বস্তুত এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা গল্পের যে দ্রুত, প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত, উন্নতি ঘটেছে, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া শক্ত। অলবেরুনী অন্তত কোথাও পায়নি। সেই উন্নতির জের আরও কয়েক বছর চলেছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি তা আবার শ্লথগতি হয়ে এসেছে। অলবেরুনীর কিছু কিছু বন্ধুবান্ধব অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন এবং তাঁদের মতের অনুবর্তী হতে পারলে সে সুখীই হতো। দুঃখের কথা, এবারকার শারদীয়া সংখ্যা-গুলি পড়ে সে তার আশু মত-পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দেখছে না। শ' খানেক গল্প সে পড়েছে। এই একশো গল্পের মধ্যে অন্তত আশিটি গল্প ভাল। কিন্তু শুধু ভাল হওয়াটাই সব সময়ে যথেষ্ট নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো নয়ই। একসঙ্গে এতগুলি সুলিখিত গল্প পড়েও সে তাই খুশি হয়নি। তার বদলে এমন কিছু গল্প যদি তার চোখে পড়ত, যা হয়তো তেমন সুলিখিত নয়, কিন্তু যার মধ্যে নতুন কোন সম্ভাবনার সামান্যতম কোন ইঙ্গিত রয়েছে তো সে ঢের বেশি উৎফুল্ল হতো। তেমন ইঙ্গিত যে সে কোথাও পায়নি, একথা বললে অবশ্য তার মিথ্যাভাষণের অপরাধ হবে। পেয়েছে, কিন্তু সেসব গল্পের সংখ্যা এতই অল্প—এবং সংখ্যাল্পতার দরুণ এতই তারা ক্ষীণকণ্ঠ —যে, শারদ গল্প-সাহিত্যের মোটামুটি চরিত্রের তারা কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। কথাটা দুঃখের, তবে হতাশার নয়। কেননা, সাহিত্যের স্কুল-পালানো ছাত্রেরাও জানেন যে, ফী বছরেই কিছু সাহিত্যের চরিত্র পাল্টায় না। সে-পরিবর্তন কালে-ভদ্রে আসে। বাকী সময়টা হলো মান—স্ট্যাণ্ডার্ড অর্থে মান—রক্ষা করে চলবার সময়। মান রক্ষা করতে গিয়ে কারো এবারে প্রাণান্ত হয়নি। এটা আশার কথা।

পরশুরামের লেখা চারটি গল অলবেরুনী এবারে পড়েছে, 'পঞ্চপ্র পাঞ্চালি' (আনন্দবাজার), 'সরলাক্ষ হো (দেশ), 'নিকষিত হেম' (যুগান্তর), অ 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' (ক

সাহিত্য)। এই আচার্যস্থানীয় প্রবীণ লেখকের রচনার তীক্ষ্ণতা আজকাল ঈষৎ কমে এসেছে, এমন কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। কথাটা সত্যি কিনা, অলবেরুনীর সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ রয়েছে। যে চারটি গল্পের এখানে উল্লেখ করা হলো, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে, পরিহাসে আর বর্ণনার অনায়াসভঙ্গীতে তার প্রত্যেকটিই একাধিকবার পড়বার মতো, পড়ে মুগ্ধ হবার মতো। তবে একটা কথা, তাঁর আগেকার রচনায় যে-একটি ঘটনানির্ভর নিটোল গল্পাংশ থাকত, আজকাল আর বড় একটা তার দেখা মেলে না। তাতে ক্ষতি নেই। কেননা, নিছক গল্প বলবার জন্যে যাঁরা গল্প লেখেন, পরশুরাম তাঁদের সমগোত্র নন। তাঁর রচনা ঘটনানির্ভর নয়, ভঙ্গীনির্ভর। এবং বাংলা কথাসাহিত্যে যে একটি অনন্যায়ত্ত অসামান্য ভঙ্গীর তিনি প্রবর্তন করেছেন, একমাত্র তার জন্যেই বোধ হয় তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকতে পারি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাত্র একটি গল্প এবারে চোখে পড়ল, 'কালো মেয়ে' (জনসেবক)। গত বছরেও তিনি খুব কম লিখেছিলেন। স্বভাবতই তাই আশা করা গিয়েছিল, এবারে তিনি একটু মুক্তহস্ত হবেন। সে আশা পূর্ণ হয়নি। 'কালো মেয়ে' গল্পটি অবশ্য ভাল। যে গভীর সহানুভূতি আর সংবেদনার তিনি এখানে পরিচয় দিয়েছেন, তা উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু মানব-চরিত্র সম্পর্কে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির তিনি অধিকারী, সে-দৃষ্টি আছে বলেই এক সময়ে 'অগ্রদানী' কিংবা 'প্রত্যাবর্তন'-এর মতো আশ্চর্য রকমের সার্থক গল্প তিনি লিখতে পেরেছেন, এখানে তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বিষয়বস্তু নির্বাচনেই হোক, কিংবা তার ট্রিটমেণ্টেই হোক, কোনখানে এমনকিছু ত্রুটি ঘটেছে, যার ফলে গল্পটির মধ্যে একটা ট্র্যাজিক সুরের ছোঁয়া লাগতে-লাগতেও লাগেনি। তার জায়গায় অল্প একটু পেথস্-এর সৃষ্টি হয়েছে মাত্র।

আর একজন বহুপ্রত্যাশিত লেখকও এবারে একটিমাত্র গল্প লিখেছেন এবং সে-গল্প প্রকাশের কৃতিত্ব আপনারই। অচিন্ত্যকুমারের গল্প-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে যে একটি তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ছিল, ব্যক্তিগতভাবে অলবেরুনীর সেটা খুবই ভাল লাগত। সেই যন্ত্রণা যে কখন নির্লিপ্ততে, এবং সেই নির্লিপ্তি যে কখন আনন্দরসে রূপান্তরিত হয়েছে, অলবেরুনী টের পায়নি। যখন পেল, তার প্রিয় লেখকদের শিল্পদৃষ্টিতে তখন এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সে-পরিবর্তন সুফলপ্রসূ হয়েছে, 'এক-রাত্রি'ই তার প্রমাণ। ফর্মের শিকলকে এ-গল্পে আর একটু শিথিল করে দেওয়া যেত হয়তো। কিন্তু সে-কথা থাক। গল্পটির মধ্যে যে গভীর প্রশান্তির ছায়া পড়েছে, সেইখানেই এর সার্থকতা।

অন্নদাশঙ্করের দুটি গল্প এবারে চোখে পড়ল, 'রানীপসন্দ' (দেশ) আর 'বান্ধবী' (চতুরঙ্গ)। অন্নদাশঙ্করের সব-চাইতে বড় গুণ, কোন বৃহৎ বক্তব্য থাক আর না-ই থাক, নিছক বর্ণনাভঙ্গীর কৌশলেই তিনি তাঁর গল্পকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। 'রানীপসন্দ'-এও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে মার্জিত, অথচ অনায়াসভঙ্গীতে তিনি একটার পর একটা ঘটনার মধ্যে সূত্র যোজনা করতে করতে তাঁর গল্পের মূল স্রোতটিকে এখানে একটি পরিচ্ছন্ন পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, তাতে বিমুগ্ধ হতে হয়। তার চাইতেও বড় কথা, কোন একটা স্পষ্ট পরিণতিতে গিয়ে যে পৌঁছতেই হবে শেষ পর্যন্ত, এমন কোন পূর্বসিদ্ধান্তও তাঁর এখানে ছিল না। আপনার কী মনে হয়? ছিল? থাকলেও তিনি তা প্রচ্ছন্ন রাখতে পেরেছেন। সেটা আরও বেশি প্রশংসার কথা। বলবার গুণে 'বান্ধবী'ও একটি উপভোগ্য গল্প হয়েছে।

উপভোগ্য গল্প আর একজনও লিখেছেন। তিনি মনোজ বসু। 'পাটিহার' (যুগান্তর), 'একটুকু বাসা' (আনন্দবাজার), 'অভিনয়' (দেশ), 'বাদাবনের গল্প' (বসুমতী), এই চারটি গল্পের প্রথম তিনটি রোম্যাণ্টিক। এবং প্রথম তিনটিই সুখপাঠ্য। 'পাটিহার'-এ অবশ্য তাঁরই আগেকার লেখা আর একটি গল্পের ঈষৎ ছায়া পড়েছে, তবে তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। 'অভিনয়' আরও হ্রস্বায়তন হতে পারত। মনোজ বসুর এবারকার গল্পগুলি পড়ে মনে হলো, মিষ্টি রোম্যাণ্টিক গল্পেই তাঁর হাত বেশি খোলে। সেটা কিছু অগৌরবের নয়। তাঁর লেখায় একটা ঘরোয়া লাবণ্য থাকে—এবারেও আছে—অন্যত্র যা খুঁজে পাওয়া শক্ত।

সুবোধ ঘোষের মোট চারটি গল্প অলবেরুনী এবারে পড়েছে, 'বৈদেহী' (আনন্দবাজার), 'থিরবিজুরি' (দেশ), 'মিছার মা' (জনসেবক), আর 'ঠগিনী' (বর্ধমান)। সংখ্যা হিসেবে চার অবশ্য কিছুই নয়, কিন্তু প্রতিটি গল্পই যেখানে স্বতন্ত্র সুর এবং প্রতিটি সুরই যেখানে পাঠকের হৃদয়ে নতুন কোন অনুভূতির মূর্ছনা জাগিয়ে দিতে সক্ষম, চারটির বেশি পাঁচটি গল্পও সেখানে আশা করা অন্যায়। তা ছাড়া গল্পগুলির মধ্যে যে সুস্থ প্রত্যয়নিষ্ঠ প্রগাঢ় জীবনপ্রেমের স্বাক্ষর রয়েছে এবং গল্পের নিজস্ব দাবীকে লঙ্ঘন
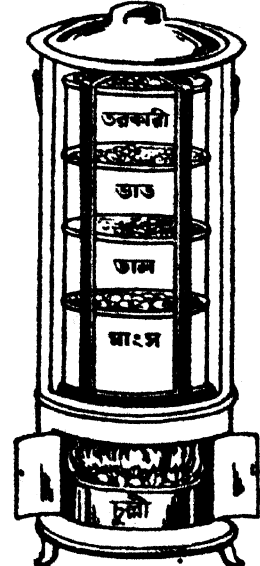
না করেও যে সশ্রদ্ধ বিশ্বাসে তিনি সেখানে মানবিক শুভবুদ্ধির জয় ঘোষণা করেছেন, এই দুর্যোগের মুহূর্তে তা একটু দুর্লভ বই কি। অথচ চলতি অর্থে যাকে আমরা পপুলের লেখক বলি, সুবোধ ঘোষ তা নন। তিনি সেই বিরল গোষ্ঠীর লেখক, আনন্দরসাভিসারের পথে একমাত্র সুনির্বাচিত মার্জিতরুচি পাঠকরাই যাঁদের সঙ্গী হয়ে থাকেন, সেই অন্তরঙ্গ পাঠকদের মধ্যেও কোন আশু আনন্দ বিতরণ যাঁদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু একটু কষ্ট স্বীকার করলেই পাঠকরা যাঁদের হাত ধরে সত্যোপলব্ধির আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন। তাঁর চারটি গল্পই এবারে সুন্দর হয়েছে। বিষয়বস্তুগত সূক্ষ্মতার দিক থেকে 'বৈদেহী', ট্রিটমেন্টের দিক থেকে 'থিরবিজুরী', গল্পাংশ বয়নের নৈপুণ্যের দিক থেকে 'ঠগিনী', পরিবেশ-রচনার দক্ষতার দিক থেকে 'মিছার মা', এবং পরিণামরসের সার্থকতার দিক থেকে সব ক'টি গল্পই উল্লেখযোগ্য।

* * *

চিঠি বড় হয়ে পড়ছে, আপনিও হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠছেন, কিন্তু অলবেরুনী এখনো অর্ধেক পথেও গিয়ে পৌঁছায়নি।

* * *

প্রমথনাথ বিশী আগে হাসির গল্পই বেশি লিখতেন, ইদানীং সিরিয়স বিষয়-বস্তুর দিকেও তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তাঁর চারটি গল্প চোখে পড়েছে, 'জেমি গ্রীন-এর আত্মকথা' (আনন্দবাজার), 'নানাসাহেব' (যুগান্তর), 'রক্তের জের' (দেশ), আর 'গুলাব সিং-এর পিস্তল' (জনসেবক)। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত এই গল্পচতুষ্টয় বাঙালী পাঠকদের কাছে এক নতুন আস্বাদ বহন করে নিয়ে এসেছে। ঠিক এই ধরনের গল্প ইতিপূর্বে আর কেউ লিখেছেন বলে অলবেরুনীর জানা নেই। প্রথম এবং শেষ গল্পে একটা মৃত্যুছায়াশিহরিত grim পরিবেশ ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে লেখক অশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

হাসির গল্প নিয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও অসামান্য সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর এবারকার গল্পগুলি তেমন সুবিধের হয়নি। আর শুধু এবার বলেই বা কেন, গত কয়েক বছর ধরেই তাঁর রচনায় একটা শৈথিল্য-ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'দূত-কাব্য' (জনসেবক), 'কীর্তনীয়া' (যুগান্তর), আর 'পৌরুষ' (আনন্দবাজার), এ-তিনটি গল্পের কোনটিই যেন আর 'বরযাত্রী'র সেই শক্তিশালী লেখককে মনে করিয়ে দেয় না। 'কীর্তনীয়া' গল্পটি যা-ও-বা কিছু দানা বেঁধেছে, অন্যান্য গল্পগুলি তা-ও না। সর্বত্রই কেমন একটা 'ছাড়া-ছাড়া' ভাব, গল্পাংশ তার ফলে ঠিক জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি।

বনফুল আর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবারে তাঁদের সুনামের সম্মান রক্ষা করতে পারেন নি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প 'আদায় কাঁচকলায়' (দেশ), আর 'তা তা থৈ থৈ' (যুগান্তর)-এর মধ্যে প্লটের গুণে প্রথমটি তবু উপভোগ্য হয়েছে, শেষোক্ত গল্পটি দাঁড়ায় নি। অথচ তাঁর মত এত প্রসাদ-গুণান্বিত ভাষা, এত মধুর বর্ণনাভঙ্গী, এ-যুগে খুব কম লেখকেরই আছে। বনফুলের একটি গল্প—'চতুরীলাল' (আনন্দবাজার) খুব ভাল লাগল। যে নিপুণ কৌশলে একটি জটিল মানব-চরিত্রের দ্বৈত ব্যক্তিত্বকে এখানে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, তাতে মুগ্ধ হতে হয়। কিন্তু তাঁর আর একটি গল্পে—'বাল্মিকী' (যুগান্তর) যে তিনি কী বলতে চেয়েছেন, অলবেরুনী তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। কিছু-একটা বক্তব্য তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, সে-বক্তব্য স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেই ভাল হতো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবারে একটিমাত্র গল্প লিখেছেন, 'সশস্ত্র প্রহরী' (স্বাধীনতা)। গল্পটি উৎকৃষ্ট হয়েছে। অল্প একটু ব্যঞ্জনা লাগিয়ে দিয়ে গল্পের মৌল আবেদনকে যে কত গভীর করে তোলা যায়, কত অল্প বলেও যে কত বেশি বলা যায়, 'সশস্ত্র প্রহরী'ই তার প্রমাণ। অলবেরুনী সম্প্রতি কিছু কিছু 'প্রগতিবাদী' গল্প পড়ে দেখেছে, তবে তার বারো আনা গল্পের মধ্যেই সে একটা দুর্দান্ত ক্রোধ—ক্রুদ্ধ হয়ে মিছিল বার করা যায়, গল্প লেখা যায় না—আর এক-গাদা কটূক্তি ছাড়া কিছু খুঁজে পায়নি। 'প্রগতিবাদী' লেখকদের প্রতি তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ, মানিকবাবুর এই গল্পটি তাঁরা পড়ে দেখুন। উপকৃত হবেন। আর কিছু না হোক, গল্প লিখতে শিখবেন। সমরেশ বসুর 'কিমলিস' (স্বাধীনতা) এরও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু হায়, অলবেরুনী এ করছে কী। বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে যে সে সপ্তকান্ড রামায়ণ ফেঁদে বসেছে। এবং অরণ্যকান্ডই যে এখনো তাঁর শেষ হলো না। এ-চিঠির আয়তন যদি এই হারে বাড়তে থাকে তো ডাকমাশুল যোগাতেই যে তাঁর প্রাণান্ত হবে। সুতরাং—

মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে অপেক্ষাকৃত তরুণবয়সী লেখকদের রচনাতেই এবারে অধিকতর নিষ্ঠা এবং সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা কেউ ভাবের ঘরে চুরি করেননি। তাঁদের কোনো-কোনো লেখা বেশি ভাল, কোনো-কোনো লেখা অল্প ভালো, কিন্তু সব লেখাতেই যত্নের ছাপ পরি-স্ফুট। তাঁদের অনেকেরই হয়তো যতো সাধ ছিল, ততো সাধ্য ছিল না। কিন্তু সাধ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁরা একটি দরাজ, সুন্দর এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিতে পেরেছেন। লেখাটা যে একটা দায়িত্বের কাজ, তা তাঁরা জানেন। সেই দায়িত্বের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীল। পাঠকদের শ্রদ্ধার্জনেও তাই তাঁদের দেরি হবার কথা নয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং নবেন্দু ঘোষ বর্তমান কালের এ'রা চারজন বিশিষ্ট লেখক। প্রথমজনের বেশ কিছু গল্প অলবেরুনী এবারে পড়েছে। তার মধ্যে ছ'টি গল্পের নাম উল্লেখযোগ্য—'সপ্তপদী' (বসুমতী), 'মারীচ' (আনন্দবাজার), 'গন্ধরাজ' (যুগান্তর), 'জরতী' (দেশ), 'দরজা' (ব্রাত্য) এবং 'উন্মোচন' (স্বাধীনতা)। সবগুলিই ভাল গল্প। তবে চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যে আর বর্ণনার সৌষ্ঠবে 'মারীচ', জরতী' আর 'উন্মোচন'ই সব চাইতে ভাল লাগল। 'মারীচ' রচনাটিতে প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় তিনি আশ্চর্য রূপানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ এবারে দুটি মাত্র গল্প লিখেছেন; পনেরো টাকার বৌ' (আনন্দবাজার) এবং মিলনান্ত' (দেশ)। ছোট গল্পের বিন্যাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট, স্বচ্ছ। শব্দের যথাযথ ব্যবহারে এবং বিভিন্ন শব্দের মধ্যে নতুন নতুন সম্পর্ক স্থাপনে তাঁর মত এত কুশলী হাত খুব কম লেখকেরই আছে। কিন্তু তা-ই সব নয়, শব্দ দিয়ে মূর্তি গড়াই শুধু নয়, হৃদয়াবেগের প্রবল স্পর্শে সেই মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেও তিনি জানেন। তাঁর দুটি গল্পই এবারে অনিন্দ্য হয়েছে (অনিন্দ্য শব্দটি এখানে নেগেটিভ নয়, পজিটিভ), দুটি গল্পেই তাঁর শক্তিকে তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

শিল্পী হিসেবে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অবশ্য সন্তোষকুমার ঘোষের সমগোত্র। দুজনেই অনুভূতিপ্রবণ লেখক এবং দুজনের লেখাতেই যেন যৌবনের তাপ একটু বেশি মাত্রাতেই পাওয়া যায়। তবে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের দৃষ্টি—সে-দৃষ্টি সন্তোষকুমারের মতো অতো বৈচিত্র্যবিলাসী অবশ্য নয়—তারও সূক্ষ্ম। তাঁর গল্পের আঙ্গিক একটু বা আটপৌরে, কিন্তু এতই স্বচ্ছন্দ যে, যতো জটিল, যতো সূক্ষ্ম সূত্রেরই তিনি অবতারণা করুন না কেন, ঠিক তার সঙ্গে সহজেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সূত্র যোজনা করে নিতে পারে। এবারেও তিনি অনেকগুলি গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হোটেলের গল্প' (আনন্দবাজার), 'মহড়া' (যুগান্তর), 'চিঠি' (দেশ) এবং 'ছোট দিদিমণি' (নতুন সাহিত্য)। গল্পগুলির মধ্যে একটা মুক্তস্রোত স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে—সেটা ভাল লাগার, ভাল লাগানোর মতো। নবেন্দু ঘোষের তিনটি গল্প অলবেরুনী এ পর্যন্ত পড়েছে—'দুর্দিন' (দেশ), 'রাক্ষস' (নতুন সাহিত্য), আর 'নতুন' (আনন্দবাজার)। তাঁর এবারকার লেখায় পরিমার্জনার ঈষৎ অভাব। সংলাপও প্রায় স্থলেই প্রায়-পঙ্গু। কিন্তু একটি গুণে এসব ত্রুটি ঢাকা পড়ে গিয়েছে, প্রায় প্রতিটি গল্পেই 'দুর্দিন' আর 'নতুন' এ তো বটেই—তিনি বাঁধাধরা ভাববস্তুর বদলে বড় কোন আইডিয়াকে আশ্রয় করবার চেষ্টা করেছেন। প্রশংসার কথা, সন্দেহ নেই।

বিমল মিত্র, সুশীল রায় এবং প্রভাত দেব-সরকারও এবারে উৎকৃষ্ট কয়েকটি গল্প লিখেছেন। বিমল মিত্রের সবচাইতে বড় গুণ তাঁর নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী। পরিবেশ নির্মাণে তাঁর দক্ষতা অসামান্য, কিন্তু সেই পরিবেশের দ্বারা লেখকের পৃথক সত্তাকে তিনি কখনো আচ্ছন্ন হতে দেন নি। নিজেকে তিনি একটু দূরে, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সরিয়ে রাখতে জানেন। তা না হলে গল্পের পাত্রপাত্রীর মানসিক ভঙ্গীগুলিকে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। এ পর্যন্ত তাঁর তিনিট গল্প চোখে পড়েছে, 'মিষ্টি দিদি' (আনন্দবাজার), 'মিছরী বৌদি' (দেশ), আর 'পুনরাবর্তন' (বর্ধমান)। তিনটি গল্পই সুন্দর, সুখপাঠ্য। তার চেয়ে বড় কথা, তিনটি গল্পেই একটা তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। সুশীল রায়ের বৈশিষ্ট্য অবশ্য অন্যত্র, প্রধানত তাঁর ঘটনা-ব্যবহারের কৌশলে। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পেই একটা-না-একটা বক্তব্য থাকে এবং একটানা গল্প বলে যাওয়ার পরিবর্তে সেই বক্তব্য আর গল্পের ক্লাইম্যাক্স-পয়েন্টের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে বিবৃত ঘটনাবলীর মধ্যে প্রায়ই তিনি স্তরবিন্যাস পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই বিশেষ পদ্ধতিটির পরিণামফল যে কতো কার্যকর হতে পারে, তাঁর এবারকার গল্পগুলি পড়েই পাঠকরা তা বুঝতে পারবেন। 'বেহাগ' (আনন্দবাজার), 'ইমারত' (যুগান্তর), 'মহুয়া' (দেশ), 'নাম' (বর্ধমান), আর 'মেজাজ' (মন্দিরা), তাঁর এই পাঁচটি গল্পের মধ্যে 'ইমারত' আর 'মহুয়া'ই সবচাইতে ভাল হয়েছে। তবে ক্লাইম্যাক্সের আকস্মিকতায় 'মেজাজ' একটু আলাদা উল্লেখের দাবী রাখে। প্রভাত দেব-সরকারেরও তিনটি গল্প অলবেরুনীর চোখে পড়েছে, 'আসঙ্গ' (দেশ), 'নার্সারি স্কুল' (আনন্দবাজার), আর 'আকাশ-বাণী' (বর্ধমান)। তাঁর প্রধান সম্পদ আন্তরিকতা। আঙ্গিকের সতর্ক চক্ষু পাহারা নেই, বিষয়বস্তুরও এমন-কিছু পোষাকী জলুস নেই, চট্ করে যা মন ভোলাতে পারে। আছে একটি সুমিত সুস্মিত লাবণ্য, যা থাকলেও তেমন চোখে পড়ে না, আবার না থাকলেও সব ব্যর্থ। আর আছে চিত্তের প্রসন্নতা। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে তাই একটি সুন্দর সুর-

তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। পড়া শেষ হয়ে যাবার পরেও হৃদয়কে তা আচ্ছন্ন করে রাখে।

সাহিত্যের আসরে সতীনাথ ভাদুড়ীর আবির্ভাব এ'দের অনেক পরে, কিন্তু অনেক পরে এসেও অনেক আগের একটি আসন তিনি দখল করে নিতে পেরেছেন। সে তাঁর আপন শক্তির জোরেই। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশাও বড় কম নয়। কিন্তু নিতান্তই আমরা মন্দভাগ্য, সেই প্রত্যাশার সম্মান তিনি এবারে সর্বাংশে রক্ষা করেন নি। দুটি গল্প তিনি লিখেছেন, 'পরিচিতা' (স্বাধীনতা), আর 'অপরিচিতা' (দেশ)। দুটি গল্পই অলবেরুনী পড়েছে। কিন্তু কোনটিতেই

সে 'জাগরী'র' সেই জাত-লেখককে খুঁজে পায়নি। দুটি গল্পই ভাল। ভাল, কিন্তু সতীনাথ ভাদুড়ীর কাছে সবাই আরো ভালোর প্রত্যাশী।

সিরিয়স আর হাল্কা দুরকমের গল্পই আশাপূর্ণা দেবী লিখে থাকেন। একই গল্পের মধ্যে দুরকম রসের মিশ্রণ ঘটাতেও তিনি পারদর্শিনী। শ্লেষ আর মাধুর্যের সার্থক সংমিশ্রণে তাঁর দুটি গল্প এবারে খুব সুন্দর হয়েছে, 'অকৃত্রিম' (আনন্দ-বাজার), আর 'পতঙ্গ' (জনসেবক)। প্রথম গল্পটিতে একটু তিক্ততা লক্ষ্য করা গেল, সেটা না থাকলেই ভাল হতো।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং রমাপদ চৌধুরী, এ'রা দুজন তরুণ, কিন্তু শক্তিমান লেখক। এ'দের সাহিত্যকর্মের সাদৃশ্য এইখানে যে, বাংলা সাহিত্যের পুরনো একঘেঁয়ে পরিবেশের মধ্যে এ'রা দুজনেই খানিকটা বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। বৈসাদৃশ্য এইখানে যে, প্রথম জনের গল্পের আবেদন মূলত ভাবগত, দ্বিতীয় জনের মূলত আঙ্গিক-গত। দুজনেই এ'রা কয়েকটি করে ভাল গল্প এবারে লিখেছেন। তার মধ্যে হরি-নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিকল্প' (মন্দিরা), 'বিনিময়' (দেশ), 'পরিশোধ' (জনসেবক) আর 'দধীচি' (বর্ধমান) এবং রমাপদ চৌধুরীর অরণ্যকুমারী' (দেশ), 'রেবেকা সোরেনের কবর' (আনন্দবাজার) আর 'বৌরাণী' (জনসেবক)-র উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষোক্ত লেখকের শেষ গল্পটির কয়েক জায়গায় তাঁরই সম-সাময়িক আর একজন লেখকের—বিমল মিত্রের—সংলাপভঙ্গীর ছায়া পড়েছে গল্পের পরিবেশ-সাদৃশ্যের জন্যেই হয়তো। তা হোক, গল্পটি ভাল।

গৌরকিশোর ঘোষ গতবারে একটিমাত্র গল্প লিখেছিলেন। এবারেও একটিই মাত্র লিখেছেন, 'শরৎদা' (দেশ)। গল্পটি অলবেরুনী পড়েছে, পড়ে মুগ্ধ হয়েছে। এত মমতা, এত শ্রদ্ধা, এত সহানুভূতি—যা দিয়ে তিনি এখানে একটি ট্র্যাজিক চরিত্রের পরিপূর্ণ রূপ কল্পনার চেষ্টা করেছেন—কালেভদ্রে এর সাক্ষাৎ মেলে। অলবেরুনী শুনেছে, ইনিই নাকি 'রূপদর্শী' ছদ্মনামে লিখে থাকেন। তা যদি হয়, তো বড় বিস্ময়ের কথা। কে[illegible] 'রূপদর্শী' আর গৌরকিশোর ঘো[illegible] রচনার মধ্যে কোনখানেই কোন সা[illegible] নেই। এ-লেখা সম্পূর্ণ আলাদা হা[illegible] বস্তু, ভঙ্গী, বিশ্বাস—সবই আলাদা।

শারদীয়া দেশ পত্রিকায় দ[illegible] শক্তিশালী নতুন লেখকের এবারে সা[illegible] পাওয়া গেল—বিমল কর, আর শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অলবেরুনীর বি[illegible] প্রার্থনা, শেষোক্ত লেখকের উপরে এ[illegible] নজর রাখবেন। আসরে নেমেই ইনি [illegible] লাগিয়ে দিয়েছেন। নিষ্ঠা আর অধ্যব[illegible] যদি অটুট থাকে, বাংলা কথাসাহি[illegible] ইনি একদিন মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে[illegible] অলবেরুনী তাতে বিস্মিত হবেন না

* * *

জনপ্রিয় দুজন লেখক এ[illegible] অনুপস্থিত, সৈয়দ মুজতবা আলি প্রবোধকুমার সান্যাল। আর একজ[illegible] —তিনি জনপ্রিয় কিনা জানি না, অলবেরুনীর প্রিয়জন—এবারে [illegible] লেখেন নি। তিনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

* * *

বাংলা দেশে এবারে নাকি প্রায় তি[illegible] শারদীয়া সংখ্যা বেরিয়েছে, কে [illegible] বলছিল। গড়পড়তায় কাগজপিছু দশটি করেও গল্প থাকে, তো এই তি[illegible] কাগজে তিন হাজার গল্প থাকবার [illegible] তার মধ্যে অলবেরুনী পড়েছে শ' খানেক। অর্থাৎ ৩⅓ পারসেণ্ট। য[illegible] সময় অনেক উটকো ব্যাঙ্কে সুদের [illegible] এর চাইতে বেশি ছিল। এত কম মতামত প্রকাশ করতে গেলে মার খা[illegible] ভয় থাকে। অলবেরুনী মূর্খ, বলেই তার ভয়ডর একটু কম।

* * *

কিন্তু আর না। বাড়িতে ত[illegible] বিসুখ চলছে, হোটেল থেকে আনিয়ে নিতে হবে। আর যদি রাত তো মতিমহলের দরজাও বন্ধ হয়ে সম্ভাবনা। ভালবাসা জানবেন। ইতি
২৬।১০।৫৩

পুনশ্চ—এ-চিঠি ব্যক্তিগত, কাগজে করবার জন্যে নয়। তবু যদি করেন তো তার আগে কিছু কিছু বর্জন করাই ভাল।

গানের আসর

—শার্ঙ্গদেব—

মোগলাই যুগের জমজমাটি গানের আসর চলে গেছে অনেকদিন। সেই হাজার ঝাড়ের আলোয় উদ্ভাসিত মর্মরকক্ষে আতরের ছড়াছড়ি, আলবোলার জরির কাজ করা নলের পাকে পাকে সুবাসিত তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, স্ফটিকপাত্রে সরাব পরিবেশনের ঠুনঠুন আওয়াজ আর বহুৎ কদরদানের ঢুলুঢুলু আঁখির মুগ্ধ চাহনিতে বিস্ময় আর প্রশংসা।

রাত্রির প্রথম প্রহরটা আসরের তদারকেই কেটে যেত। তারপর একে একে আসতেন খান্‌খানান্‌, আমীর-উল্‌-উমারার দল তাঁদের বাছাইকরা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। নবাব বাদশারা হাতের কাজ সেরে গণ্যমান্য মেহ্‌মানদের নিয়ে যখন প্রবেশ করতেন তখন রাত্রি গভীর হয়েছে। ইতিমধ্যে গাইয়ে-বাজিয়ের দল যন্ত্র-টন্ত্র বেঁধে ঠিকঠাক করে রেখে দিয়েছেন—শুধু হুকুমের প্রতীক্ষা। নড়ে চড়ে বসতে বসতে আরও খানিকটা সময় যেত। প্রভূত শিষ্টাচার প্রচুর বিনয় সম্ভাষণের পর আসরের উদ্বোধন হত কাওয়ালি গানে। তারপর ধীরে ধীরে জমাট আসরে কোন রাতে শোনা যেত রবাব স্বরমণ্ডলের গম্ভীর টঙ্কার, কোন রাতে কলাবন্তদের কণ্ঠে ধ্রুপদের ভরাট আলাপ। পাখোয়াজ, আওয়াজ, তবল্‌, দুহুল্‌, ডফ্‌, খঞ্জরী কত রকমের সঙ্গতের বন্দোবস্ত। কত রাতে শোনা যেত সারেঙ্গী, সানাই, বাঁশী, উপাঙ্গের মধুর সুর, এক এক আসর এক এক রকম। রকম রকমের নৃত্য, গীত, বাদ্য—বর্ণনার চেয়ে কল্পনা করতেই ভাল লাগে।

কিন্তু, সে যুগটা চলে গেছে নিঃসংশয়েই। এত আসর, এত ঢিলেঢালা রয়ে বসে কাটাবার দিন আর নেই। এক ঘণ্টা বড় জোর ঘণ্টা দুই—এর বেশি একটা গান বা বাজনা শোনবার ধৈর্য বা সময় শ্রোতার কই? কয়েক ঘণ্টার আসরে বহু শিল্পীর দক্ষতা পরীক্ষা করতে হবে। ওরই মধ্যে যেটুকু, তার বেশী সময় দেওয়া যায় না। জীবনধারাটাই একেবারে পাল্টে গেছে। বাংলাদেশ থেকে খবর নিয়ে দেহলী যেতে এককালে একটি মাস লেগে যেত। বাদশারা যুদ্ধক্ষেত্রেও রয়ে বসে ছাউনি ফেলে শত শত বেগম বাঁদী, ওস্তাদ, বাইজী নিয়ে বেশ ফুর্তি করেই দিন কাটাতেন। সে যুগটা কবে কেটে গেছে—এখন জরুরি কাজ এক নিমেষে সমাধা হচ্ছে কলকাতায় দিল্লীর একটা "ট্রাঙ্ক কল" মারফৎ। তাই ভারতজোড়া নামকরা শিল্পী সময় পেলেন বড় জোর এক ঘণ্টা—ভাড়া করা সিনেমার স্টেজে বিজলীর আলোয় গান বা বাজনা ধরলেন। সে গান-বাজনা প্রচারিত হল মাইক্রোফোনে। যাঁর ভাগ্য ভাল তিনি মেজাজ এনে দিলেন আর যাঁর বরাত খারাপ তাঁর ঠিক জমল না, জমিয়ে বসবার মত সময়ই পেলেন না তিনি, তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় থেকে শহরবাসী বঞ্চিত হয়ে রইল। এই হচ্ছে এ যুগের কালোয়াতি গানের আসরের অভিশাপ।

সাবেক ঢঙে সাবেক আমলের আসরটা চলে আসছিল ক্রমান্বয়ে কয়েক শো বছর ধরে। জাঁকালো আসরে ভারি ভারি গান ছাড়া আর কিছুর ঢোকবার উপায় নেই। ক্রমে লয়ের লড়াই আর কণ্ঠবাদনের আতিশয্যে রসের স্রোত এল রুদ্ধ হয়ে, গুণী ব্যক্তিরা এই বাহুল্যকেই বলতে লাগলেন আসল সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপার নিয়ে "সঙ্গীতের মুক্তি" নামক প্রবন্ধে অনেক লিখেছেন, তবে সেটা বিপরীত রসজ্ঞদের কাছে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু সার্থক হয়েছে আর প্রেরণা দিয়েছে প্রকৃত রসজ্ঞদের। আজ তাই সগৌরবে আমরা আসন পেতেছি কাব্য-সঙ্গীতের যাতে ওস্তাদি মহল থেকেও কম লোক আসেন না এবং তারিফ করেন —গাইতেও যে না চেষ্টা করেন এমন নয়।

বৃটিশ আমলের প্রথম যুগে যখন শিক্ষায় একটা আলোড়ন দেখা দিল তখন সঙ্গীতের দিক থেকেও একটা আলোড়ন শুরু হয়েছিল। গানের ভাষায় রুচির পরিচ্ছন্নতা আর সাহিত্যিক রূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল এবং সেটার সূচনা নিধুবাবু থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রযুগে এসে সার্থকতা লাভ করেছে। আজ সারা ভারতকে বিশ্বের কাছে মহীয়ান করে তুলেছে বাংলার গান, বাংলার নিজস্ব কাব্যপ্রধান সঙ্গীত। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি আমরা মাথা নেড়ে শুনি, ভাল লাগলে "বহুৎ আচ্ছা" বলে ফেলতে একটুও দ্বিধা করি না, কিন্তু সহজ কথায় সহজ সুরে প্রাণের কথাটি যখন শুনি তখন তেলেনা তান বাঁটের আয়াসসাধ্য কলাকৌশলকে একটু তফাতে রেখে সেই সুরের সুরধুনীতে নেমে অবগাহন করতেও এক মুহূর্তে বিলম্ব করি না। অন্য প্রদেশের ওস্তাদরা বাঙালী গাইয়েদের ঠাট্টা করে বলেন ওরা চুটকি গান গায়, ওরা হালকা রসের উপাসক। কিন্তু বাংলার শিল্পী মৃদু হেসে শ্লেষটাকে উপেক্ষা করেন। বাঙালীচিত্তে কাব্যরসের আস্বাদ, রসের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য কতখানি প্রাধান্য লাভ করেছে ওরা কি করে বুঝবে? তাই উর্দু-হিন্দী টপ্পায়

বাঙালীর মন ওঠেনি, নতুন সঙ্গীতরসে পরিপুষ্ট হয়েছে বাংলার টপ্পা। হিন্দী, ব্রজবুলি ধ্রুপদ ভেঙে বাংলায় সৃষ্ট হয়েছে কাব্যসম্পন্ন ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত, উর্দু ঠুংরি গজল থেকে আলাদা করে তৈরি হয়েছে বাংলার রাগপ্রধান গান আর গজল। এমন কি পাশ্চাত্য রীতিকেও আমাদের গানে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা কম হয় নি। হাল আমলে এই কাব্য-সঙ্গীতপ্রবাহ স্বীয় প্রাণশক্তিতে বেগবান—সর্বশ্রেণীর বাঙালী শিল্পী তার উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান। ফল কোথাও আশানুরূপ হচ্ছে কোথাও হয়তো হচ্ছে না তবু চেষ্টা চলেছে, গতি অব্যাহত। ভুলচুক আছেই। সর্বকালেই প্রতিভার স্বর্ণযুগ আশা করা যায় না, তবু চেষ্টা চলেছে এবং চলবেও। বাংলার কাব্য-সঙ্গীত সংগীত এবং সাহিত্যের যুগ্ম-সম্পদ।

আর একটা সংগীত এবং সাহিত্যকে আজকাল আমরা আলাদা করে দেখি তার নাম পল্লীসাহিত্য এবং পল্লীসংগীত। এক সময় পল্লীসংস্কৃতিই ছিল আমাদের সংস্কৃতি এবং পল্লীর আসরই ছিল সব-চেয়ে বড় আসর। কত কৃষ্ণকথা, গাথা, কাহিনী, মঙ্গলগীতি বিচিত্রসুরে কথায় কাব্যে নৃত্যে কত রাত্রি ধরে চলত পল্লীর আসরে। প্রাচীন যুগে পালরাজাদের কীর্তিকথা নিয়ে রচিত হত পালাগান এবং সেগুলি অনুষ্ঠিত হত পল্লীতে পল্লীতে। লোকের মুখে মুখে ফিরত সে সব গান। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন সংগীতের দিক থেকে কম মূল্য-বান ছিল না। বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন এইসব পালা পল্লীর আসরেই অনুষ্ঠিত হত। এর সংগে ছিল মঙ্গলগানের পালা। মঙ্গলচণ্ডীর গান বহুকাল থেকে প্রচলিত ছিল। বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে এই গানের বহুল প্রচারের কথা উল্লেখ করেছেন।। এ ছাড়া টুকিটাকি ছোটখাট গান তো ছিলই। বৌদ্ধযুগের নানারকমের গানের উল্লেখও পাওয়া যায়। মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই রকম গানের উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর প্রাচীন বাঙলার সহজিয়া তন্ত্রের 'বেণের মেয়ে' নামক উপন্যাসে লইুসিদ্ধার কীর্তনাঙ্গ গানে পটুত্বের কথা এবং এসব দলের ধরণ-ধারণ কেমন ছিল এই বইটিতে তার একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অনেকে বলেন একালের বাউলেরা উক্ত সহজিয়া শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত এবং তাদের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যই বহন করে থাকেন।

আসল কীর্তনের প্রচার অবশ্য তার অনেক পরে। শ্রীচৈতন্যের প্রেরণায় দেশে এল নামকীর্তনের বন্যা। এই কীর্তনের একটি মহান সাঙ্গীতিক রূপ দিলেন শ্রীনরোত্তমদাস খেতরীর মহোৎসবে। এই উৎসবেই কীর্তনের উৎকৃষ্ট সংগত এবং গায়ন প্রণালী অবধারিত হল। পরবর্তী-কালে এর কত বৈচিত্র্য কত রূপায়ন সম্ভব হয়েছে। এই কীর্তনের শৈলী এসে মিলেছে বাউল দরবেশের গানে—সেখানেও কত বৈচিত্র্য।

পল্লীর আসরে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীর গানের কায়দা-কানুনও ঢুকেছে। সেকালের যাত্রা-গানের পালায় অনেক উচ্চাঙ্গের সংগীত বর্তমান। পল্লীগীতির সংগে টপ্পা মিশাল হয়ে উদ্ভূত হয়েছে শ্যামাসংগীত, সাধন-সংগীত, আগমনীসংগীত প্রভৃতি। আজ-কাল এসব গান শুনি কিন্তু সেই ঢং সেই রস তাতে নেই, তার সেই পরিবেশও ে

এক সময়ে পুজোর আগে আগম গান উৎসবের একটা অংগ ছিল। আজ পুজোর সমারোহ অন্যরকম—আনুস সংগীতাদিও ভিন্ন ধরণের। দুর্গার ম যেমন আসল শ্রী বর্জিত হয়ে কো পাহাড়ি মেয়ে কোথাও প্রাচীন ক দোহাই দিয়ে তন্বী তরুণীর প্রতিব বহন করেছে তেমনি আগমনীর খোল মন্দিরাকে হটিয়ে দিয়ে কা চাকতির চক্রে চক্রে ইস্পাতের কা খোঁচায় আর্তনাদ করে উঠেছে, সংগী একটা বিকৃতি আর সেটাকে যতদূরে প যায় সগৌরবে ঘোষণা করছে এ যু লাউড-স্পীকার। এবার পুজোয় যে গান আগমনী বলে প্রচারিত হয়েছে অনেকগুলি শুনেছি। মনে হ'ল আগ গানের যে একটা বিশিষ্ট র আর পদ্ধতি আছে অনেক শিল্পী জানেন না। আধুনিক কায়দায় রচিত সব আগমনী শুনে দীর্ঘশ্বাস যে অনেকেই রেডিও বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের একটি মধুর সংগীতরূ এমনি বিকৃত পরিচয় বাস্তবিকই দুঃ বিষয়।

গানের আসর সম্বন্ধে লিখতে ব এমন অনেক কথাই ভীড় করে আস এক সপ্তাহ অন্তর সেসব ক অবতারণা এই আসরেই য যাবে। প্রাচীন গানের উল্লেখে 'হায় সেকাল হায় রে' বলে অনেক দুঃখ প্রব করা গেল কিন্তু বর্তমান যুগ আর ব মান রূপ এই যে প্রবহমান সংগীত এ তো মূল্য অবধারণ করতে হবে—ত আজকাল নানা প্রকৃতির গানের আস খবর আমাদের কাছে মূল্যবান, বি করে যেসব অনুষ্ঠানে সত্যিকা পরীক্ষামূলক কাজ চলেছে। শহ শহরতলীতে এবং তার বাইরে সমগ্র দে যেসব আসর অনুষ্ঠান হচ্ছে তার খ আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার আম জানাচ্ছি উদ্যোক্তাদের। এইসব খবর আম যথাসম্ভব প্রকাশ করবার চেষ্টা ক এবং বলা বাহুল্য, উক্ত প্রসংগে নানা বিষ আলোচনার অবকাশ থাকবে যা সাঙ্গীতিক কোন বিষয়ই আমাে বিচারের পরিধির বাইরে না পড়ে থাকে

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির পরেই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ হিসাবে তাঁহার ছোট গল্পগুলির স্থান। বিচিত্র প্রকৃতির বহু নাটক তিনি লিখিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই সব নাটকের কোন কোন পর্যায় যেমন কাব্য নাট্যগুলি তাঁহার গান ও কবিতার পরেই বা সঙ্গেই সমান অমরতার আসন দাবী করিবে, ছোট গল্পগুলি তেমন আসন পাইবে কি না, জানি না। কেননা, সাহিত্যিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, পদ্যের পরমায়ু গদ্যের চেয়ে বেশি। কিন্তু সেই শেষ বিচারের কথা এখানে মুলতুবী রাখিয়াও অনায়াসে বলা যায় যে, ছোট গল্পগুলিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ ধর্ম যেমন প্রকাশ পাইয়াছে, এমন তাঁহার সব নাটকে নয়। তাঁহার প্রথম বয়সের অনেক নাটক যেমন রাজা ও রাণী এবং বিসর্জন, শিল্প সৃষ্টি হিসাবে অমূল্য হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ নয়, তাহাতে তিনি তৎকাল প্রচলিত পঞ্চমাঙ্ক ট্রাজেডির ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এরকম স্বধর্ম-বহির্ভূত পদক্ষেপ নাই বলিলেই হয়, কেবল প্রথম বয়সে রচিত তিনটি ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাঁহার পদাঙ্কের নীচে অস্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পদচিহ্ন যেন চোখে পড়ে। কিন্তু সে তিনটিকে ছাড়িয়া দিলে যখনি তিনি ছোট গল্পের ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন, একেবারে স্বক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন, অপরের জমিতে আধি-চাষ করিয়া রাজস্ব জোগাইবার দায় বহন করেন নাই। শুধু তা-ই নয়, সেই হইতে জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত ছোট গল্পের ধারা বহন করিয়া আসিয়াছেন; আরও দেখিতে পাইব যে, সে-ধারা তাঁহার গান ও কবিতার ধারার সঙ্গে সমান্তরলতা রক্ষা করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সেই-জন্যই দেখিতে পাইব যে, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে যেসব পরিবর্তন ও ছায়ালোকপাত ঘটিয়াছে, সে সমস্তই চিহ্নিত তাঁহার ছোট গল্পগুলিতে। কাজেই যে মাপ-কাঠিতে তাঁহার কবিতার বিচার করি, সেই মাপকাঠিখানা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে অন্যায় হইবে না, বরঞ্চ সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। সুফল পাওয়া যাক আর না যাক, সেই-ভাবে বিচার করিবারই আজ ইচ্ছা। কিন্তু সে কাজে নামিবার আগে বিচারের ক্ষেত্রটির সীমা সরহদ্দ স্থির করিয়া তাহার সম্বন্ধে ধারণাটি পরিষ্কার করিয়া লইব।

আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প। ছোট গল্প বলিতে এখানে বুঝিতেছি, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছ, সে, গল্পসল্প ও তিন-সঙ্গী। রচনাকাল ১৮৮৪ সাল হইতে ১৯৪১ সাল, অর্থাৎ কবি-জীবনের সাতান্ন বৎসর কাল। ১

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বলিয়াছেন যে, ভিখারিণী গল্পটি রবীন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত রচনাগুলির সঙ্গে রচনাবলীর পরবর্তী কোন খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। অন্যগুলির সমস্তই রচনাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব আলোচনার বস্তু পরিধি দাঁড়াইল ১১৮টি গল্প আর কাল পরিধি দাঁড়াইল কবি-জীবনের সাতান্নটি বৎসর। বস্তু ও কাল দুই-ই ব্যাপক, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

গল্পগুলির মর্মে প্রবেশের আগে বস্তু পরিধি ও কাল পরিধি সম্বন্ধে আরও একটু সচেতন হওয়া আবশ্যক, তাহাতে কবি-মনের কিছু কিছু রহস্য প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা।

১৮৯১ সাল হইতে (বাংলা ১২৯৮ সাল) রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনার রীতিমতো সূত্রপাত। ভিখারিণী গল্পটি ছাড়িয়া দিলে তার আগে তিনটি মাত্র গল্প তিনি লিখিয়াছেন, ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা ১৮৮৪ সালে আর মুকুট গল্পটি ১৮৮৫ সালে।

১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ (১২৯৮—১৩০২)-এর মধ্যে পাইতেছি চুয়াল্লিশটি গল্প, সমগ্র গল্পগুচ্ছের অর্ধেকের কিছু বেশি, প্রায় প্রত্যেক মাসে একটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধনা পত্রিকার জন্য রচিত। এই কয়েক বছর সোনার তরী ও চিত্রা কাব্য রচনার সময়।

তারপর ১৮৯৬।৯৭ (বাং ১৩০৩।৪) কোন ছোট গল্প পাই না, কেননা, সাধনা পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাওয়াতে মাসে মাসে গল্পের তাগিদ আর নাই। তার বদলে পাইতেছি চৈতালি কাব্য এবং মালিনী নামে কাব্যনাট্য।২

আবার ১৩০৪ সালে পাই কাহিনী নামে প্রকাশিত কাব্যে সন্নিবেশিত কাব্য-নাট্যগুলির অধিকাংশ।৩

১৮৯১ (১২৯৮) সাল হইতে ছোট গল্পের যে ধারা অবিচ্ছিন্ন স্রোতে বহিয়া

১॥ কিন্তু ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'ভিখারিণী' গল্পটি ধরিলে দাঁড়ায় চৌষট্টি বৎসর। ভিখারিণী গল্পটি আমি দেখি নাই। ১২৯২ বা ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত মুকুট গল্পটি গল্পগুচ্ছে সন্নিবেশিত না হইলেও এটিকে ছোট গল্প বলিয়াই ধরা উচিত। তাহা হইলে তাঁহার সাকুল্য ছোট গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায়ঃ—

গল্পগুচ্ছের তিন খণ্ডে	৮৪
সে গ্রন্থে অনুচ্ছেদ	১৪
গল্পসল্পে	১৬
তিন সঙ্গীতে	৩
মুকুট	১
ভিখারিণী	১
	১১৯

২॥ * চৈতালি চৈত্র ১৩০২—শ্রাবণ ১৩০৩ মালিনী সর্বপ্রথম সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থাবলীর সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে, ১৮৯৬।

৩॥ পতিতা (কবিতা) সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, গান্ধারীর আবেদন এবং ভাষা ও ছন্দ (কবিতা)।

আসিতেছিল, গল্পের চাহিদা না থাকায় তাহার বিরাম ঘটিল না, ঘটিল কেবল রূপান্তর। এই দুই বছরে লিখিত অধিকাংশ কবিতাই কাহিনীমূলক, কাহিনী নামেই তাহার পরিচয়। এমনকি, চৈতালির অনেকগুলি কবিতাই গল্পের আভাস বহন করিতেছে, আর একটু চাহিদার চাপ পড়িলেই সেগুলি রীতি-মতো গল্পাকারে বিস্তারিত হইতে পারিত।৪

তারপরে ১৮৯৮ (১৩০৫) সালে পাই সাতটি গল্প। এ বছরে কাহিনীমূলক কাব্য আর পাই না, কারণ গল্প বলার ধারাটা আবার গদ্যের খাতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইহার প্রধান কারণ সাধনা বন্ধ হইয়া যাইবার আড়াই বছর পরে ভারতীর সম্পাদকত্ব তাঁহার উপরে পড়ে। এবারে ভারতীর জন্য গল্পের জোগান দিতে হইতেছে।৫

পুনরায় ইংরেজি ১৮৯৯ (বাংলা ১৩০৬) সালে ছোট গল্প আর পাই না, তার বদলে পাই কথার অনেকগুলি কাহিনীমূলক কবিতা।৬ আবার স্রোতটা কাহিনী কাব্যের খাতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

অতঃপর ১৯০০ (১৩০৭) সালে পাই আটটি ছোট গল্প। কাহিনী কাব্যের স্রোত এবারে মন্দ। এখন কবিকে দেশের নানা পত্রিকায় গল্প জোগাইতে হইতেছে।

১৯০০ সালে আসিয়া বহুনিন্দিত, বহুপ্রশংসিত ঊনবিংশ শতাব্দী সমাপ্ত হইল। এখানে আসিয়া কবি-জীবনের একটি অধ্যায়ে এবং সেই সঙ্গে ছোট গল্প রচনার একটি অধ্যায়ে ছেদ পড়িল। অতঃপর দেখিতে পাইব যে, তাঁহার জীবনে আর সেই সঙ্গে তাঁহার ছোট গল্পগুলিতেও নূতন ছায়ালোকপাত হইতে শুরু করিয়াছে।

এখন ১৯০১ সাল, কবির বয়স চল্লিশ বৎসর। ১৯০১ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে সবশুদ্ধ আটটি মাত্র গল্প পাই। এই স্বল্পতার কারণ কি? কাহিনী-মূলক কাব্য এ-পর্বে পাই না, তবে গল্পের স্রোতটা গেল কোথায়? গল্পের টুকরাগুলি জমিয়া একজোট হইয়া উপন্যাসের আকার লাভ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন, চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা।

তারপরে একবারে ১৯১৪ সাল (১৩২১)। এখন সবুজ পত্রের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁহাকে গল্প লিখিতে হইতেছে। পাইতেছি সাতটি গল্প। ইহা বলাকা কাব্যেরও পর্ব বটে। বলাকায় নূতন যৌবনের ও নূতন জীবনের যে সুর ধ্বনিত, এ গল্পগুলিতেও তাহারই প্রতিধ্বনি।

১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে ছোট গল্প পাই না, তার বদলে পাই ঘরে-বাইরে এবং চতুরঙ্গ।

১৯১৭ সালে (১৩২৪-এ) পাই তিনটি গল্প। ইহা পলাতকা কাব্যের সময়। পলাতকা কাব্যের প্রধান একটি ভারসূত্র নারী জীবনের মূল্য স্বীকার। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'—পলাতকা কাব্যে ঐ ভাবটিকেই যেন পূর্ণতা দান করিলেন, বলিলেন, মাতা, কন্যা বা বধূ রূপটিই নারীর সম্পূর্ণ রূপ নয়, নারী বলিয়াই তাহার নিজস্ব একটি মূল্য আছে। পলাতকায় আছে—

"আমি নারী, আমি মহিয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না
বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হতো কাননে ফুল ফোটা।"

এ সময়কার এবং কিঞ্চিৎ পূর্ববর্ত বলাকা পর্বের গল্পগুলি এই ভাবের যেন ভাষ্যময় রূপ।

ইহার পরে মাত্র পাঁচটি গল্প পাই একটি ১৯২৫-এ, দুইটি ১৯২৮-এ একটি ১৯২৯-এ, আর শেষেরটি ১৯৩৩ সালে।

কিন্তু এখানেই গল্পধারার শেষ নয়, আছে বিভিন্ন সময়ে লিখিত আরও তিনখানা বই, সে, গল্পস্বল্প ও তিনসঙ্গী।

সে-র কিম্ভূত রসের গল্পগুলিকে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া বুঝিতে হইবে। গল্পস্বল্পের পরি-প্রেক্ষণী 'ছেলেবেলা' নামে জীবনকথা, আর তিনসঙ্গীকে বুঝিতে হইলে তাঁহার চিত্রাবলীর ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বিশ্ব-পরিচয়ের সাহায্য লইতে হইবে। সে চেষ্টা যথাস্থানে করিব—এখন এই আভাস-টুকুই যথেষ্ট।

এইতো হইল রবীন্দ্রনাথের গল্পধারার চৌহদ্দি, দেশ ও কালের একজোট পাকান গ্রন্থি। পূর্বোক্ত স্থূলে কথাগুলি মনে রাখিয়া এবারে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করিব

২

এবারে যে প্রশ্নটি স্বভাবতঃই মনে জাগিতে পারে, তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ছোট গল্পের মর্যাদা স্মরণ রাখিলে রবীন্দ্র প্রতিভার যে বিশেষ ধর্মের প্রকাশ গল্পধারায় হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব বুঝিলে, গান ও কবিতার পরেই ছোট গল্পকে রবীন্দ্র-প্রতিভার যোগ্যতম বাহন স্বীকার করিলে, স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে তবে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রতিভা একটি স্বক্ষেত্রে পৌঁছিতে তাঁহার এ বিলম্ব হইল কেন? ইতঃপূর্বে তিনি কাব্য, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর রচনায় হাত দিয়াছেন, কিন্তু ছোট গল্পে হাত দেন নাই কেন? একটি সহজ উত্তর এই যে নাটক, উপন্যাস, কাব্য, কবিতা প্রবন্ধাদির ধারা বাংলা সাহিত্যে বহমান ছিল, তিনি সহজেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ছোট গল্পের ধারা ছিল না, এ ধারা তাঁহারই সৃষ্টি, কাজেই কিছু বিলম্ব

৪॥ দ্রষ্টব্যঃ—দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য, সামান্য লোক, কর্ম, দিদি, পরিচয়, পুঁটু, সঙ্গী, সতী, স্নেহ দৃশ্য, করুণা। এগুলি সমস্তই গল্পের অঙ্কুর। মাটিতে লালিত হইলে গল্প তরু হইতে পারিত, আকাশে লালিত হওয়াতে আকাশ কুসুম সৃষ্টি করিয়াছে। এগুলি গল্পের গুটি পোকা হইতে উদ্ভূত রঙীন প্রজাপতি, জাত একরূপ আলাদা।

৫॥ রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৪৪।

৬॥ পূজারিনী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্য প্রাপ্তি, নগর লক্ষ্মী, অপমান বর, স্বামী লাভ, স্পর্শ মণি, বন্দী বীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরি খেলা, বিচারক, পণ রক্ষা, বিসর্জন (কাহিনী) প্রভৃতি। এবং কর্ণ কুন্তী সংবাদ রচিত ফাল্গুন, ১৩০৬।

হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অন্যান্য সহজ উত্তরের মতোই ইহাও আংশিক মাত্র সত্য। কবি কর্তৃক পরিত্যক্ত ভিখারিণী গল্পটি বাদ দিলে ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা লিখিত হয় ১৮৮৪ সালে, তখন কবির বয়স তেইশ বৎসর; এক বৎসর পরে লিখিত হয় মুকুট গল্পটি। বস্তুত মুকুট ছোট গল্প নয়, ছোট উপন্যাস মাত্র। কি গঠনরীতি, কি বিষয়বস্তু, কোন বিচারেই তাহাকে ছোট গল্প বলা যায় না, খুব সম্ভব সেইজন্যই রচনাবলী সংস্করণে উহা উপন্যাস পর্যায়ে গ্রথিত হইয়াছে। সমকালে লিখিত রাজর্ষি উপন্যাসের সঙ্গেই মুকুটের নাড়ীর যোগ, কি বিষয়ে, কি গঠনরীতিতে। অবশ্য ঘাটের কথা ও রাজপথের কথাকে ছোট গল্পের পর্যায়ে ফেলিতে হইবে। কিন্তু রাজপথের কথায় গল্প নাই বলিলেই হয়, উহাকে 'বিচিত্র প্রবন্ধের' অন্তর্গত করিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। ঘাটের কথায় অবশ্য গল্প আছে। কিন্তু এ গল্পটির ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেতে আসিয়া নবীন লেখক যেন একটা ফসল ফলাইয়া লইয়াছেন। সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য কীর্তন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের নয়, ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ সন্ন্যাস বা সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই করিয়াছেন।৭ ঘাটের কথায় সন্ন্যাসী যেন চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের একটা মিশ্র-রূপ, উল্টা দূরবীণে দৃষ্ট বলিয়া আকারে ছোট। আবার পাঠককে সম্বোধন করিয়া গল্প জমানো বঙ্কিমী-রীতি, রবীন্দ্র-রীতি নয়। আমার বক্তব্য এই যে ঘাটের কথাকে তাঁহার প্রথম ছোট গল্প বলিয়া স্বীকার করিলেও সেই সঙ্গে স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্র-নাথের ছোট গল্প বলিতে যে বস্তু বুঝি, কি বিষয়ে, কি বাচন-রীতিতে ইহা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা তাঁহার কীর্তি, কিন্তু স্বক্ষেত্রের কীর্তি নয়। এ সত্য রবীন্দ্রনাথও যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্যই, তারপরে সাত বছরের মধ্যে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আর পদার্পণ করেন নাই। ১২৯৮ সালে (১৮৯১-এ) যখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে, নিশ্চিন্তভাবে ছোট গল্পের স্বক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, সে পদচারণা জীবনের শেষতম বৎসর পর্যন্ত সচল ছিল। এই স্বক্ষেত্র প্রাপ্তির কিছু ইতিহাস আছে।

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে ক্ষেত্রের ভেদ আছে। উপন্যাস-গুলির ক্ষেত্র নাগরিক জীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই নাগরিক নরনারী।৮ আর তাঁহার অধিকাংশ ছোট গল্পের ক্ষেত্র পল্লীজীবন, প্রধান অপ্রধান প্রায় সকলেই পল্লীবাসী। *

এইভাবে নাগরিকবঙ্গ ও পল্লীবঙ্গকে তাঁহার প্রতিভা যেন ভাগ করিয়া লইয়া-ছিল। তাঁহার ছোট গল্পের ক্ষেত্র নির্বিশেষ কোন দেশ নয়, তাহাকে মানচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা যায়—এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। তবে শিল্পীর হাতের গুণে বিশেষ অনেক স্থানে নির্বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা সজ্ঞান চেষ্টাকৃত। বিশেষের বীজকে উদ্ভিন্ন করিয়াই সর্বদা মহৎ শিল্পের বনস্পতি উদ্ভূত হয়; আকাশ-কুসুমের চাষ বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পল্লীবঙ্গই তাঁহার ছোট গল্পের যথার্থ ক্ষেত্র। যে সময় হইতে তিনি নিয়মিত ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন হইতেই পল্লীবঙ্গের সহিত তাঁহার স্থায়ী পরিচয়ের সূত্রপাত।

রবীন্দ্রনাথ খাস কলিকাতার মানুষ। কিন্তু তাঁহাদের পৈতৃক জীবিকার উপায়টির অবস্থান সুদূর পল্লীবঙ্গে। ইতিপূর্বে তিনি সেখানে অনেকবার গিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে যাওয়া এবং সে দেখা নিতান্তই বাহির হইতে। বিস্তৃত জমিদারীর পরিদর্শনভার গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি গেলেন ১৮৯১ সালে।

"বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল। গত কয়েক বৎসর হইতে মাঝে মাঝে জমিদারী পরিদর্শনের জন্য স্থানে স্থানে যাইতে হইতেছিল বটে, কিন্তু পরিচালনার ভার কখনো তাঁহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। জমিদারীর তদারক ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার অবশেষে রবীন্দ্রনাথের উপরে আসিয়া পড়িল। তখন ঠাকুর এস্টেট সমস্তই একমালিতে ছিল, সুতরাং খুবই বড় জমিদারী।...... ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোন কঠিন দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্য-জীবনের বিচিত্র মাধুর্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারী তদারকের কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাঁহার সহজ বুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে, তিনি আশ্চর্য নিপুণতার সহিত নূতন কর্তব্যকে জীবনের সঙ্গে মানাইয়া লইলেন; শুধু মানাইয়া লইলেন না, তাহাকে নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। যেমন নিজের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো খুঁটিনাটি কাজকর্ম পালন করিতেছিলেন—তেমন ভাবেই। জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুব বড়। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টি-সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিয়াছিলেন, মানুষকে তেমন নিবিড়-ভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাঙলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এ যুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য দান করিল।" ৯

৭॥ দ্রষ্টব্য, মুক্তির উপায়, উদ্ধার, তপস্বিনী।

৮॥ বৌঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি সম্বন্ধে একথা খাটিবে না, কারণ তখন তিনি অংশ বঙ্কিমী রীতিকে অনুসরণ করিতে-ছিলেন।

* শেষ জীবনের ছোট গল্পে কিছু ব্যতিক্রম আছে।

৯॥ রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাত মুখো-পাধ্যায় ১ম খণ্ড পৃ ২৩২

রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় কবি-জীবনের এই ঘটনাটির তাৎপর্য সুনিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু আরও কিছু বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ ধনী জমিদার এবং বাহিরের লোক। কাজেই তথাকার পল্লীজীবনের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার উপায় ছিল না। পল্লীজীবনের মধ্যে মিলিত হইবার ইচ্ছা যতই প্রবল হোক, বাধা দুর্লঙ্ঘ্য; ফলে তাঁহাকে দূরে হইতে, বাহির হইতে দেখিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ইহা যেন নদী-স্রোতে ভাসমান নৌকা হইতে তীরভূমির পল্লীকে দর্শন। ইহাই সত্যকার ছোট গল্পের দেখা। এখনকার অভিজ্ঞতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় তাঁহার মনে আসে না, আসে খণ্ডশঃ। সে খণ্ডগুলি এমন ব্যাপক নয় যে, তাহার উপরে উপন্যাসের ইমারত গাঁথা চলে; সে টুকরাগুলি ছোট গল্প রচনার মাপে সংকীর্ণ। তার উপরে আবার যখন মনে করি যে, ক্ষুদ্র পরিসরে আত্মপ্রকাশ করাই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ। তখন রবীন্দ্র-নাথের ছোট গল্প রচনার ইতিহাসটি আভাসে যেন দেখিতে পাই। আবার পল্লীবঙ্গের সাধারণ নরনারীর ছোটখাটো সুখ-দুঃখের তন্তু যে ইতিহাসের সুদৃঢ় গ্রন্থি রচনার পক্ষে উপযোগী নয়—ইহাও স্বাভাবিক। এখন রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড রূপ, সেই খণ্ড খণ্ড রূপের বিশেষ লক্ষণ এবং রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষ ধর্ম—এই তিনটি উপাদানকে একত্র করিয়া মিশাইয়া লইলে কি তৎকালে রচিত ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছাই না? আমার তো বিশ্বাস পৌঁছাই। তাঁহার অনেক ছোট গল্পের প্রাথমিক খসড়া পাই 'ছিন্নপত্রে'। 'চৈতালি' পর্বে তিনি ছোট গল্প লেখেন নাই। চৈতালির অনেক কবিতারও প্রাথমিক খসড়া আছে ঐ ছিন্নপত্র গ্রন্থখানাতেই।

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে ও ছোট গল্পে সমগ্র বঙ্গদেশকে যেন নগরবঙ্গে ও পল্লীবঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছেন, একথা আগেই বলিয়াছি। তাঁহার ছোট গল্পের ক্ষেত্র পল্লীবঙ্গকেও যেন আবার দুইটি ভাগ করা সম্ভব। পল্লীবঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-ভাবে আছে মানুষ ও প্রকৃতি, জনপদ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, একদিকে গ্রাম ও ছোট-খাটো সব শহর, আর একদিকে নদ-নদী, বিল-খাল, শস্যহীন ও শস্যময় প্রান্তর, আর সবচেয়ে বেশি করিয়া আছে রহস্যময়ী পদ্মা। মোটের উপরে বলিলে অন্যায় হইবে না যে, এই পর্বে লিখিত কাব্য-কবিতার রসের উৎস এই প্রকৃতি, আর ছোট গল্পগুলির রসের উৎস এইসব জনপদ। কবিতায় প্রতিধ্বনি নদ-নদীর, ছোট গল্পে প্রতিচ্ছবি জনপদগুলির। এই স্থূলভাগ সত্য হইলেও একেবারে ওয়াটার টাইট বা জল-অচল ভাগ নয়। এক ভাগের রেশ অপরভাগে আসিয়া পড়িয়াছে, তাই ছোট গল্পে পাইব স্পর্শ। প্রাকৃতিক স্পর্শ আর কবিতায় পাইব মানবিক স্পর্শ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, তাঁহার সাহিত্যে যেন দুটি আকাঙ্ক্ষা আছে, সুখ, দুঃখ, বিরহ, মিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আবার নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উধাও হইয়া পড়িবার আকাঙ্ক্ষা। পূর্বোক্ত ভাগ দুটি যেন সেই দুটি আকাঙ্ক্ষার আশ্রয়। ছোট গল্পগুলির মধ্যে পাই সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবসমাজে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আর তৎকালীন কবিতায় পাই, বিশেষ সোণার তরী ও চিত্রার ন্যায় কাব্যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উধাও হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আবার বলিয়া রাখি যে, এ দুই ভাগ ওয়াটার টাইট বা জলঅচল ভাগ নয়। এই পর্বে রচিত কাব্য ও ছোট গল্প মিলাইয়া পড়িলে তবেই কবির তৎকালীন মনো-ধর্মের সমগ্র রূপটি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিচিত্র লীলাটি উপলব্ধি হইবে। ছোট গল্প আলোচনার সময়ে আমরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে—"সেই সময়ে (এই পর্বটায়) আমি প্রথম অনুভব করে-ছিলুম যে, বাঙলা দেশের নদীই বাঙলা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।"১০ আবার জাভাযাত্রীর পত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, বাঙলাদেশের পল্লীতে সন্ধ্যাবেলায় চাঁদ উঠিয়াছে, অথচ গান ওঠে নাই, এমন কখনো হয় না। এ দুটি উক্তি মিলাইয়া লইলে পাই নদীর গানে আর মানুষের গানে বাঙলার সমগ্র বাণীরূপ। এই সমগ্র বাণীরূপের আধার তাঁহার কাব্য ও ছোট গল্প। ছোট গল্পই এখানে আলোচ্য বিষয় সত্য, কিন্তু যেহেতু সত্য মানেই সমগ্র রূপ এবং যেহেতু সমগ্র রূপের সন্ধানেই আমরা বহির্গত, ছোট গল্পগুলিকে সমকালীন কবিতার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া আলোচনা করিব। আশা করি, কিছু সুফল পাওয়া যাইবে। ১১ (ক্রমশ)

১০॥ রবীন্দ্র জীবনী প্রভাত মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১০৩, ১ম খণ্ড।

১১॥ রবীন্দ্রনাথের ও পরবর্তীদের ছোট গল্পে প্রধান প্রভেদ এই যে, পরবর্তীদের ছোট গল্প সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার, তাহাতে অনাবশ্যক তথ্যকে বাদ দেওয়াই প্রধান সমস্যা; আর রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস, অজ্ঞাত তথ্যকে সৃষ্টি করাই সেখানে প্রধান সমস্যা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কেন এমন হইল তাহা আগে বলিয়াছি। তথ্যের অপূর্ণতাকে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে কল্পনার মিশল দিতে হইয়াছে। খুব সম্ভব এই জন্যে অনেকে তাঁহার অনেক ছোট গল্পকে "লিরিকধর্মী" বলিয়া থাকেন। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব, এখন প্রসঙ্গান্তর।

—আট—

সংসারে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে চিরন্তন অসহযোগ। যা চাই তা পাই না; আর যা চাই না বলে তারস্বরে চীৎকার করি, পাওয়ার ঘরে তারই বোঝা স্তূপাকার হয়ে ওঠে। এ অতি মামুলি কথা, যার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমন নরনারীর সাক্ষাৎ মিলবে না কোন দেশে এবং কোন যুগে। এই পুরাতন তত্ত্বের অধুনাতন দৃষ্টান্ত আমরা দুজন—বিখ্যাত জেলর মৌলবী মোবারক আলি, আর তার অখ্যাত ডেপুটি বাবু মলয় চৌধুরী।

খানিকটা আগেই বলেছি, স্বদেশীদের কাছে নিজের পরিচয়টা একটু বিশদভাবে দেবার জন্যে মোবারক আলি অনেকদিন থেকে ছটফট করছিলেন। সে বিষয়ে এখানকার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। কারণ, প্রথমত, সংখ্যায় এ'রা নগণ্য। দ্বিতীয়ত, গোড়াতেই তাঁর ব্যাকরণ-নিষ্ঠার অমর্যাদা আলি সাহেবের অভিমানকে এতখানি আঘাত দিয়েছে যে, ও'দের সংস্রব থেকে নিজেকে তিনি একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

এদিকে সমতল ভূমি থেকে নানাসূত্রে নানা রুচিকর খবর প্রতিদিন তাঁর কাছে ভেসে আসছিল। একদিন শুনলাম, কোন্ একটা বড় জেলে এক হাজার 'স্বদেশী-ওয়ালা' তাদের সদ্য-লব্ধ দু হাজার নতুন কম্বল একত্র জড়ো করে খাণ্ডব-দাহনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং সংগে সংগে আবার একজোড়া করে নতুন কম্বল দাবী করে মাঠের মধ্যে সত্যাগ্রহ করে পড়ে আছেন। সেটানিক গভর্নমেণ্টের কম্বলগুলোও যে শয়তান, এ-তত্ত্ব অস্বীকার করি না এবং শয়তানকে যে আগুনে পুড়িয়েই মারতে হয়, এ-যুক্তিও অকাট্য। অতএব বহ্ন্যুৎসবের অর্থ বুঝি। কিন্তু আর একজোড়া 'শয়তান' দাবী করে আবার সত্যাগ্রহ কেন?

কেন আবার? গর্জে উঠলেন মোবারক আলি, পিঠ চুলকোচ্ছে, বুঝতে পারছেন না? ওষুধ চাই।

আবার একদিন শোনা গেল, আর একটা কোন্ স্পেশাল না সেণ্ট্রাল জেলে ভাত-ডালের হোলি খেলা চলছে। অন্ন উদরে প্রবেশ না করে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কারা-কর্মীদের মাথায় এবং শূন্য থালার সামনে বসে সারিবন্দী রাজবন্দীরা গর্জন করছেন ম্যয় ভুখা হুঁ!

এর ক'দিন পরেই কোত্থেকে এল এক উড়ো খবর—সেখানে নাকি 'স্বদেশী-বাবুরা' সন্ধ্যাবেলায় ব্যারাকে না ঢুকে, চড়েন গাছে এবং গভীর রাত পর্যন্ত আবৃত্তি করেন শিবরামের মহাসংগীত। মোবারক বললেন, 'গুলী খেয়ে গাছের ওপর থেকে পাখী পড়তে দেখেছি। মানুষ কি করে পড়ে, দেখতে ইচ্ছা করে।' অর্থাৎ ওখানে উপস্থিত থাকলে দৃশ্যটা তিনি স্বহস্তে উপভোগ করতেন।

এই জাতীয় খবর আমাদের স্নায়ু-তন্ত্রীর উপর যে আঘাত করত, তার প্রতিক্রিয়া উভয়ের বেলায় ছিল বিপরীত। আমি প্রার্থনা করতাম, এই সব 'স্বদেশী'-পীঠস্থান থেকে আমাকে রক্ষা করো ভগবান! মোবারকের প্রার্থনা ছিল—হে খোদাতাল্লা, বেশি নয়, শ' পাঁচেক বেয়াড়া স্বদেশী আমার হাতে এনে দাও। একবার পরখ করে দেখি, তারা কী রকম চীজ।

নিছক নৈর্ব্যক্তিক প্রার্থনায় নির্ভর না করে তিনি শেষ পর্যন্ত কালি-কলমের আশ্রয় নিলেন। লিখিত আবেদনে জানালেন উপরওয়ালার দরবারে, এই সংকটকালে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্য রক্ষায় নিয়োগ করতে উৎসুক। অতএব তাঁকে কোন বৃহৎ রাজনৈতিক জেলে স্থানান্তরিত করা হোক।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের রসজ্ঞান আছে। তাঁর সরব এবং আমার নীরব—কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হল না। মোবারক রায় গেলেন পাহাড়ের দেশে চোর-ডাকাত আগলে; আমার ডাক পড়ল এক নির্জলা 'স্বদেশী' ছাউনিতে সত্যাগ্রহী দমনের মহান ব্রত স্কন্ধে নেবার জন্যে।

দুর্গম জংগলে ঘেরা ডজন খানেক ভাঙা বাড়ি। এককালে ছিল গোলা-বারুদের কারখানা। প্রহরে প্রহরে বেয়নেট দেখাত টহলদার প্রহরী, অজ্ঞ পথচারীর প্লীহা কাঁপিয়ে হুংকার দিত—

হুকুমদার! কালক্রমে প্রহরী বদল হ'ল। বেলুচ রেজিমেণ্ট যেখানে ছিল সেখানে দেখা দিল ফেরুপাল। তারাও প্রহর ঘোষণা করে। 'হুকুমদার' বলে না, বলে হুক্কা হুয়া।

এক যুগ পরে আজ আবার এল পট-পরিবর্তনের পালা। কোদাল, কুড়ুল, আব শাবলের ঘায়ে ভিটেছাড়া হয়ে গেল শিবরামের দল। নতুন দৃশ্যে যারা অবতীর্ণ, সরকারের চোখে তারাও একজাতীয় জীবন্ত গোলা-বারুদ। তাই নতুন করে আবার শুরু হয়েছে সশস্ত্র প্রহরীর টহল-গর্জন। হুঁশিয়ারির সরঞ্জাম এবার ব্যাপকতর।

এই কারখানা থেকে একদিন যে বুলেট বেরিয়েছিল, তাদের খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক। রক্ত-পিছল পথে তারাই করেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের উদ্বোধন। আজ যেসব বুলেট জড়ো হ'ল এই ভাঙা ঘরের বুকে, তাদের পথ রক্তহীন। কে জানে হয়তো এদের হাতে এই পথ বেয়েই আসবে একদিন সেই সাম্রাজ্যের উপসংহার।

জঙ্গলের পাশে মাঠ। সেখানে তৈরি হ'ল সারি সারি চালাঘর। শালের খুঁটি, খড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া। পাঁচিল ছাড়া জেল হয় কেমন করে? কারাগার বলতে প্রথমেই বুঝি কারা-প্রাচীর। সে থিওরি বাতিল হয়ে গেল। একটা সূক্ষ্ম কাটা তাঁরের বেষ্টনী কোন-রকমে আব্রু রক্ষা করে বাঁচিয়ে দিল জেলের মান, মসলিনের ওড়না যেমন করে লজ্জা নিবারণ করে রাজপুত রমণীর। কাস্তেধারী পথচারী কৃষকের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর হাসে। যারা তরুণ, ঠাট্টা করে বলে, এ জেল, না বাবুদের বাগান-বাড়ি? একটু প্রাচীন যারা, সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দেয়, এখানে কারা থাকবে জানিস? স্বদেশীবাবুরা। গান্ধি-বাজার . লোক। এতো চোর-ডাকাত নয়, যে পালাবে?

সেটা আমরাও বুঝি। তবু চিন্তিত হলেন অভিজ্ঞ এবং দক্ষ জেলর মহেশ তালুকদার। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ইন্সপেক্টর জেনারেল তাঁর আশঙ্কাকে আমল দিলেন না। বললেন, দু-চার-দশটা যদি পালায়, টেক নো নোটিশ। তার বেশি হলে একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দিও আমার অফিসে। তবে

rest assured jailor সে রিপোর্ট তোমাকে দিতে হবে না। এ'রা পালাবার জন্যে আসেনি।

তার ঘেরা শেষ হতেই শুরু হ'ল বন্যাপ্রবাহ। বড় বড় মোটরযান ভর্তি—আসছে তো আসছেই। যুবক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও কিশোর। উচ্ছ্বল হাসি আর প্রদীপ্ত উৎসাহ। আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে বন্দে মাতরম, মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়।

—আজ কত এল?

—তিনশ পঁচিশ।

—মোটে? আমাদের এসেছে চারশ' সাতান্ন।

পাশাপাশি দু জেলের কর্মীদের দিনান্তে দেখা হলে আলাপের বিষয় ঐ একটি। পাকা বাড়িতে থাকেন নেতা এবং উপ-নেতার দল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী। আর তৃতীয় শ্রেণীর জন্যে খড়ের চালা। তাদের আর শেষ নেই। পাঁচশ, ছশ' আটশ, হাজার, বারশ। আর যে জায়গা নেই। কে শোনে সে কথা? বন্যার জল ফেঁপে ফুলে উঠছে প্রতিদিন। এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রুধিবে কে?

কাঁটা তারের গেট। তার সামনেই টালির ঘরে অফিস বসেছে। কাজ চলেছে সকাল থেকে রাত বারোটা। লড়াই-ফেরতা সুপার, ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি। প্রবীণ এবং সুদক্ষ জেলর মহেশ তালুকদার। চারজন তার ডেপুটি। তার-পর আছে কেরানীকুল এবং সিপাই-সান্ত্রীর বিশাল বাহিনী। টেবিলে টেবিলে ওয়ারেণ্টের হিমালয়, আর ফাইলের পিরামিড। নানা আকারের আর নানা প্রকারের খাতার উপর কলম চলছে অবিরাম। তার সঙ্গে চলছে হাসি, পরিহাস, চা-সিগারেট আর মাঝে মাঝে অফিস-পলিটিক্সের রুচিকর ফোড়ন।

ও, বাবা! এ যে সবাই দেখছি rigorous imprisonment সশ্রম কারাদণ্ড। কি শ্রমটা করছেন এ'রা? অনেকটা আপন মনেই বললে সুধাংশু আমদানী বইতে ওয়ারেণ্ট নকল করা তার কাজ।

ডেপুটি জেলর হৃদয়বাবু চা খাচ্ছিলেন। বললেন, কেন, শ্রমটা কম হচ্ছে কোথায়? তোমাদের ঘানিটানা পাথর-ভাঙ্গা এসব করছে না বটে; কিন্তু ওদের লাইনে ওরা খাটছে সারাদিন।

—যথা?

—যথা, ভোরে উঠেই—মিলিটারী কায়দায় বললেন হৃদয়বাবু—

বাঁয়া ডাহিনা,
বাঁয়া ডাহিনা,
ঘুম যাও।
বাঁয়া ডাহিনা,
বাঁয়া ডাহিনা,
ঠার যাও।

সকলেরই হাতের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। যতীশদা বললেন এধার থেকে, ক্ষেপে গেলেন নাকি হৃদয়বাবু? ওসব কি বলছেন?

হৃদয়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, বুঝতে পারছেন না? প্যারেড; স্বদেশী প্যারেড! আপনারা যাকে বলেন, —

Left Right, Left Right!
About Turn
Left Right, Left Right
Halt!

হাসির রোল উঠল ঘর জুড়ে। যতীশদা কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভোরবেলার খবর রাখেন না। সন্দেহের সুরে বললেন, এসব সত্যিই করে নাকি ওরা, না বানিয়ে বলছেন আপনি?

হৃদয়বাবু চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, আপনি ভাগ্যবান লোক, দাদা। রোজ বৌদির হাতে লেহ্য পেয় খেয়ে দশটা পাঁচটা করছেন। একদিন মশার কামড় খান না, আমাদের সঙ্গে এই জঙ্গলে? নিজেই দেখতে পাবেন, বানিয়ে বলছি কিনা। যতীশদা একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন। সুধাংশু বাধা দিয়ে বলল, সে থাকগে। আপনি, বলুন। এর পরের পর্বটা কি? হৃদয়বাবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, এর পরেই শুরু হ'ল ক্লাস। নিম্ন প্রাই-মারী থেকে এম এ পর্যন্ত যত রকমের ক্লাস আছে, সব। কতক ঘরে, কতক মাঠে, কতকটা গাছতলায়। এতবড় রেসি-ডেন্সিয়াল ইউনিভার্সিটি পৃথিবীতে একটাও হয়নি আজ পর্যন্ত।

—কটা অবধি ক্লাস চলে?

—ঘড়ি ধরে এগারটা। তার পর স্নান এবং আহার পর্ব। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম। দুটো থেকে শুরু হবে বক্তৃতা, আলোচনা, ডিবেট, আর তার মধ্যে (গলাখাটো করে বললেন হৃদয়বাবু) কোনো কোনো ঘরে সিক্রেট মিটিং কিংবা ক্লোজ ডোর মন্ত্রণা-সভা। এই জেলে বসেই ভবিষ্যৎ কার্যক্রম তৈরি হচ্ছে, জেনে রেখো।

—তারপর?

—তারপর বিকেল বেলায় খেলাধুলো। দাঁতকপাটি, হাডু-ডু-ডু, দাড়ি বাঁধা, চোর চোর। সন্ধ্যার পরে আমোদ প্রমোদ। ক্যারিকেচার, ম্যাজিক, সাঁওতাল নাচ আর কত কি! কোনো কোনো ঘরে আবার গানের মজলিশও বসে। তার সঙ্গে জলের ড্রাম বা বালতির সংগত।

নিতাই বক্সী নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বেশ আছে কিন্তু লোকগুলো। জেল খেটে দেশোদ্ধারও হ'ল, এ দিকে ফুর্তির সীমা নেই। আর আমাদের অবস্থা

দ্যাখ। কোন্ সকালে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছি। বারোটা বেজে গেল। কখন যে ফিরবো, কে জানে? আর, ফিরেও তো সেই লোহাকাটাদের হোটেলের শুক্‌নো ভাত। থালায় ঢাললে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে, যেন পাথরের টুক্‌রো।

ছোকরা মত কে একজন বলল, তার চেয়ে চলুন না, দাদা, গান্ধীজী কী জয় বলে বেরিয়ে পড়া যাক্। লোহাকাটাদের লোহার টুকরোর বদলে দিব্যি দুবেলা গরম গরম—

চালিয়ে, হুজুর—জমাদার তমেশ্বরনাথ মিশির সেলাম দিয়ে আমন্ত্রণ জানাল। ব্যাপার নতুন কিছু নয়। প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা। রন্ধন-যজ্ঞ সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে। এবার ভোজন-যজ্ঞের উপক্রমণিকা, অর্থাৎ পরিবেশন,—জেলের ভাষায় যাকে বলে ফিডিং প্যারেড্।

নিতাই বক্সীর টিফিন ক্যারিয়ারে হোটেলের শুষ্ক অন্ন শুষ্কতর হ'তে লাগল। টুপিটা তুলে নিয়ে ছুটতে হ'ল অপরের সদ্য-পক্ব অন্ন বিতরণ-উৎসবে খবরদারি করবার জন্যে। তিনি একা নন। আমরাও সঙ্গ নিলাম, সমব্যথার ব্যথী। ডেপুটি জেলর বাহিনীর এটা হ'চ্ছে দৈনন্দিন অভিযান। ফল যা হবে সেটাও আমাদের মুখস্থ। বণ্টন ব্যাপারে যথাসম্ভব হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও অন্তত পঞ্চাশজনের ভাত কম পড়বে, যদিও চাল যেটা দেওয়া হয়েছে বরাদ্দ মত তার হিসাব নির্ভুল এবং রান্নার ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধানে কোনো ত্রুটি নেই। তারপর হবে একটা নিষ্ফল এন্‌কোয়ারি, অর্থাৎ স্বদেশী ক্যাম্পের পাণ্ডাদের সঙ্গে খানিকটা নিরর্থক বাগবিতণ্ডা।

জমাদার বলবে, হামি খোদ দেখেছি, এই পাঁচঠো বাবু দোবার করে ভাত লিয়েছে। স্বদেশীরা গর্জে উঠবেন, মিথ্যা কথা। আমরা ঘোর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত ও'দের কোনো মতে ঠাণ্ডা করে আমাদের রিপোর্ট দিতে হবে—রন্ধনশালার সাধারণ কয়েদীদের অনবধানতা বশত তেইশ সের দশ ছটাক চালের ভাত পুড়ে গিয়ে মনুষ্য খাদ্যের অযোগ্য হ'য়ে গেছে। অতএব ঐ পরিমাণ চাউল অতিরিক্ত ইস্যু করা হউক! অতঃপর বড় সাহেবের হুকুম হবে, তথাস্তু এবং নতুন করে কয়লা পড়বে বয়লারে।

এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হ'চ্ছে প্রতিদিন। স্বদেশী নেতারা বলছেন, আমাদের হাতে কিচেন ছেড়ে দিন। সেখানকার সাধারণ কয়েদীদের চালাব আমরা। রসদ হিসাব করে বুঝে নেবো। বাকী দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু কর্তৃপক্ষ রাজী নন। সরকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে এ ব্যবস্থা চলে কেমন করে? কিচেন আমাদেরই চালাতে হ'বে। জেল-ম্যানেজমেণ্ট সরকারের দায়িত্ব। তোমরা কয়েদী। কয়েদীর হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা রসদ-গুদামের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। বারান্দায় বসে স্টোর ক্লার্ক সুরেশবাবু হিসাব কষছেন। টেবিলের ওপাশে আরেকখানা চেয়ারে বসে আছেন ওতরফের একজন ছোট নেতা, বিমল মজুমদার। তাঁর হাতেও খাতা পেন্সিল। সুরেশবাবুর হাঁক শোনা গেল—হলুদ ৩৭ সের বার ছটাক হ'চ্ছে, বিমলবাবু। আপনার কত হল?

—আজ্ঞে, আমার হ'চ্ছে তের ছটাক।

—বেশ। ঐ এক ছটাক আপনাকে বখ্‌শিস্ দেওয়া গেল।

দুজনেই হেসে উঠলেন। যে-সব সাধারণ কয়েদীরা মাল ওজন করছিল,
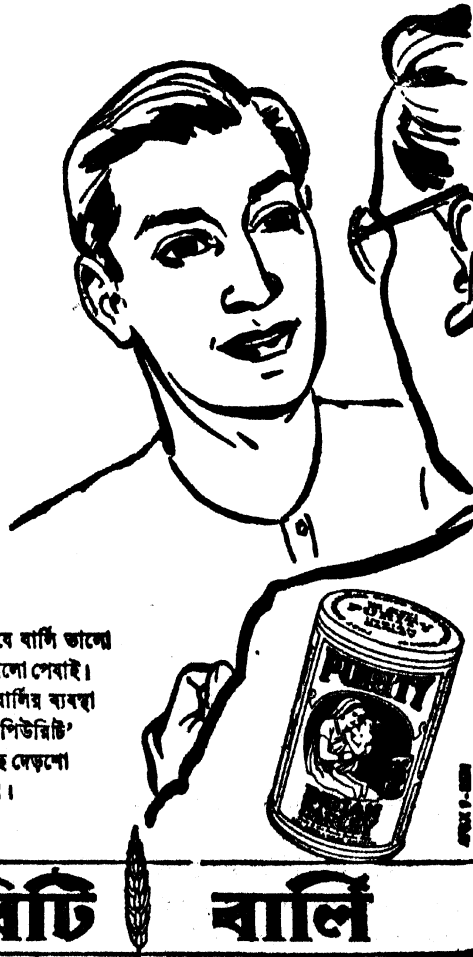
তাদের মুখেও দেখলাম খুশীর ঝলক। সমস্ত রসদ কষে, মাল ওজন করে বিমল-বাবু কিচেনে নিয়ে গেলেন, কয়েদীর মাথায় চড়িয়ে। শুনলাম, উনিই নাকি এ মাসের মত মেস কমিটির সেক্রেটারী। রন্ধনশালায় তদারক করছেন আর একজন। তিনি কিচেন কমিটি। রান্নার চেহারাও দেখলাম বদলে গেছে। জেলের আইনে প্রত্যেক কয়েদীর প্রাপ্য হ'চ্ছে চার ছটাক সব্জি। এক গাড়ি তরকারী আসে রোজ। আলু, বেগুন, কুমড়ো পালংশাক, মুলো, বাঁধাকপি আরও কত কি। এই হরেক রকমের জিনিস একসংগে মিলিয়ে একটা উপাদেয় রসায়ন তৈরি হ'ত এতকাল। আজ সেই একই উপকরণযোগে তরকারী হচ্ছে দুটো—আলু আর বাঁধাকপির ডালনা, বাকী সব দিয়ে একটা চচ্চড়ি মত। ডাল আর জলের অসহযোগ আমরা কোনোদিন ঘোচাতে পারিনি। এবারে দেখলাম, তারা বেমালুম মিলে গেছে এবং তার মধ্য থেকে উঁকি দিচ্ছে মাছের মাথার ভগ্নাংশ। একমাত্র ভাজা ছাড়া মৎস্য খণ্ডের যে আর কোনো সদ্গতি করা যেতে পারে, রন্ধন কর্তৃপক্ষের সেটা ছিল কল্পনার বাইরে। সেই মৎস্যকেই দেখলাম, কালিয়ারূপে শোভা পাচ্ছে কয়েদীর থালায়।

কিচেন কমিটি হেসে বললেন, কি দেখছেন, ডেপুটি বাবু; বিধাতা আমাদের রসনা দিয়েছেন দুটো কাজের জন্যে—বক্তৃতা আর সুখাদ্যের রস গ্রহণ। প্রথমটা যখন আপনারা গায়ের জোরে বন্ধ করলেন, সে লোকসান তো দ্বিতীয়টা দিয়েই পুষিয়ে নিতে হ'বে।

আমি বললাম, পুষিয়ে নেওয়া কেন? বলুন সুদ শুদ্ধ আদায় করে নেওয়া।

মেস কমিটি হেসে উঠলেন।

ফিরবার পথে ভাবতে ভাবতে এলাম, কার হুকুমে হ'ল এসব? কেউ জানলো না, তবু হয়ে গেল রাতারাতি কর্তৃত্ব হস্তান্তর। আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, চুক্তি-পত্র সই করেও নয়, কতকটা যেন, স্বভাবের নিয়মে, আপনি আপনি। কর্তৃপক্ষ দেখেও চোখ বুজে রইলেন, মনে মনে বোধহয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সব চেয়ে খুশী হোলাম আমরা, অর্থাৎ নিতাই বকসীর দল। পঁচাশ আদমিকা ভাত ঘট্ গিয়া——এই ভয়াবহ রিপোর্ট নিয়ে আর আসে না তমেশ্বর মিশির। এনকোয়ারির দায় থেকে মুক্তি পেয়েছি।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও যায় যায়। জোয়ারের বেগ শেষ হ'ল। দেখা দিয়েছে ভাঁটার টান। যারা মাঝ দরিয়ায় তরী ভাসিয়েছিল, ঝড় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটিকে গ্রাহ্য করেনি, তাদের মন আজ ঘরমুখী, তীরের আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল। দেশমাতৃকার দীপ্ত মূর্তি অনেকের চোখেই ঝাপসা হ'য়ে এসেছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আপন আপন গৃহের রূপ। দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন, মেজাজ রুক্ষ। প্যারেড, ডিবেট আর ক্যারিকেচার আপনা হ'তেই বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় এসেছে অসহিষ্ণু বাক্‌যুদ্ধ আর অহেতুক দলাদলি। বাইরের খবর কি? জেলের এই কদন্ন আর কম্বল শয্যা আর কতকাল কপালে আছে? মহাত্মাজী কি বলছেন? কম্প্রমাইজের কতদূর হ'ল? এই সব প্রশ্ন ঘুরে ফিরে গুঞ্জন করছে সবারই মনে মনে।

আফিস চলছে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। যেখানে রাত বারোটায় নিঃশ্বাস পড়ত না, সেখানে বেলা বারোটায় নাক ডাকে। আগমনীর পালা অনেক দিন শেষ হ'য়েছে; এখন চলেছে বিদায়ের পর্ব। রোজই এক-দল বেরিয়ে যাচ্ছে জেলের মেয়াদ শেষ করে। বন্ধুরা গেট পর্যন্ত এসে বিদায় দিয়ে যায়। মুরুব্বিরা ভিড় করেন আফিস পর্যন্ত। তারপর পাথেয় নিয়ে চলতে

থাকে দর কষাকষি। খোরাকী দুদিন হবে, না তিন দিন; নৌকা ভাড়া তিন টাকা হ'বে না সাড়ে তিন। জেলর মহেশ তালুকদার খাঁটি ব্যুরোক্র্যাট—ইস্পাতের ফ্রেমের উপর কাদার গাঁথুনি। বিনয়ে সৌজন্যে গদগদ। সাড়ে তিন ঘণ্টা অসীম ধৈর্য নিয়ে বক্তৃতা শুনে যাবেন, কিন্তু টাকার অঙ্ক তিন থেকে সাড়ে তিন হ'বে না।

ওদিকে স্বদেশী পান্ডারাও ইস্পাতের জাত। মাঝে মাঝে যখন সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ডাক পড়ে আমার। জেলর সাহেবের অনুগ্রহে আমি হচ্ছি তার ভৌগোলিক উপদেষ্টা।

—এই যে, মলয়, তুমিতো অনেক কাল কাটিয়েছ ওদেশে। বলতো কুমিল্লা থেকে বদরখালি নৌকা ভাড়া কত?

কুমিল্লার সঙ্গে আমার পরিচয় ভূগোলের পাতায়; আর বদরখালির নাম এই প্রথম শুনলাম। তবু বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য নিয়ে বলতে হয়, বদরখালির কোন পাড়ায় বাড়ি আপনার?

খালাসোদাত আসামীটি বললেন, দক্ষিণপাড়ায়।

নৌকো তো ওদিকে সস্তা। কত চাইছেন আপনি?

ভদ্রলোক উত্তর দেবার আগেই, তালুকদার সাহেব বললেন, উনি তো চার টাকা হে'কে বসে আছেন। আমার মনে হয়, আড়াই টাকার বেশী লাগবে না।

আমি রায় দিলাম, টাকা তিনেকের মত পড়বে।

যেন সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এমনিভাবে বললেন মহেশবাবু; ব্যাস; মিটে গেল। মলয়ের যে সব জানা কিনা?

পান্ডারা মনে মনে উত্তপ্ত হ'লেও বাইরে কিছুই বললেন না। খালাসীটি ছেলে মানুষ। মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না। উষ্মার সঙ্গে বলে উঠল, আচ্ছা। স্বরাজ হলে আমাদের হাতেই ক্ষমতা আসবে। তখন দেখবো, কি করে আপনাদের চাকরি থাকে।

তালুকদার মশায় হেসে উঠলেন, বলেন কি? চাকরি থাকবে না? বরঞ্চ মাইনে বেড়ে যাবে আমাদের। আজ বিদেশী সরকারের পয়সা বাঁচাচ্ছি; তখন বাঁচাবো আপনাদের।

কিন্তু আমি জানি, তালুকদার সাহেব কড়াকড়ি যতই করুন; শেষ পর্যন্ত হার হত তাঁরই—অন্তত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, ঠিক যেমন করে হারতেন আমাদের আঠারো নম্বর মেসের ম্যানেজার হরিদাসবাবু।

গল্পটা যখন মনে পড়ল, বলেই ফেলি।

অনেকদিন আগেকার কথা। ইস্কুলে পড়ি। থাকতাম এক মেসে। নতুন ঠাকুর বহাল হল—মহাদেব মিশ্র। অতবড় কর্মিতকর্মা লোক সারাজীবনে দ্বিতীয়টি আর দেখলাম না। কামিনীবাবুর আফিস ঠিক সাড়ে আটটায়। আটটা বাজতে পনর মিনিট হ'তেই খাবার ঘর থেকে হুঙ্কার এল—ঠাকুর ভাত নিয়ে এসো। মাছ সবে কোটা হচ্ছে তখন। কামিনীবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ শুধু লোলুপ দৃষ্টি আর দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে তার জন্য বরাদ্দ ছিল দু পয়সার দই, অর্থাৎ মধুপর্কের এক বাটি। হঠাৎ সেদিন দইয়ের বদলে হাতা হস্তে মহাদেবের প্রবেশ। কামিনীবাবু অবাক। ওটা আবার কি?

—আজ্ঞে, রামরস!

—রামরস মানে?

মহাদেব হাতা উপুড় করে দিল কামিনীবাবুর পাতে। দস্তুরমত মাছের ঝোল। সঙ্গে একটুকরা মাছ। কামিনীবাবুর চোখে আনন্দাশ্রু; সেকি এরি মধ্যে হয়ে গেল?

—করে ফেললাম একহাতা।

হাঁড়ি নয়, কড়া নয়, হাতায় করে রান্না মাছের ঝোল। কামিনীবাবুর কপাল ফিরে গেল সেই দিন থেকে।

দুদিন না যেতেই মহাদেব গোটা মেসটাকে জয় করে ফেলল। মহাদেব ছাড়া আর কোন বাবুরই চলে না। আস্তে আস্তে বাজারের ভারও এসে গেল তার হাতে। লেখাপড়া সে জানত না। কাগজ-কলমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। হিসাব সব মুখে মুখে। রোজ সকালে ম্যানেজার হরিদাসবাবু দুখানা দশ টাকার নোট তার হাতে ধরে দিতেন। সন্ধ্যাবেলা সে খরচ লিখিয়ে হিসাব মিটিয়ে যেত। হরিদাসবাবু খাতা খুলে বললেন, বল, মাছ?

—মাছ ৮৷৷৶০

হরিদাসবাবু লিখলেন, ৭৷০

—পটল?

মহাদেব বলল, পটল ২৸৶০

হরিদাস লিখলেন, ২৷০

এমনি করে মহাদেব যা বলত, প্রতি দফায় বেশ কিছু ডিসকাউণ্ট বাদ দিয়ে ম্যানেজার বসাতেন তার খাতায়। লেখা শেষ হলে মহাদেব জিজ্ঞেস করত, কত হ'ল বাবু? হরিদাসবাবু খাতার অঙ্ক যোগ করে বললেন, ১৭৷৶১০

—কত ফেরৎ দিতে হবে?

—২৷৷/১০

মহাদেব বিনা বাক্যব্যয়ে ২৷৷/১০ ফেলে দিয়ে চলে যেত। হরিদাস তাকিয়ে থাকতেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগত তার হাঁ বন্ধ হতে। যতই কাটুন, সব যেত জলের উপর দিয়ে। দুধে হাত পড়ত না কোনদিন।

গল্পটা একদিন জেলর সাহেবকে শোনালাম। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর হেসে বললেন, তোমার ঐ হরিদাসের সঙ্গে আমার আসল জায়গাতেই তফাৎ।

—যেমন?

—তিনি জিতবার চেষ্টা করে ঠকতেন। আমি জিতবার চেষ্টা করি না।

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। মহেশবাবু আর একটু পরিষ্কার করে বললেন, বুড়ো হয়ে গেলাম। জীবনে নিজের রোজগার থেকে দুটো পয়সা কোন সৎকাজে কারো হাতে তুলে দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। দৈবক্রমে গৌরীসেনের এত বড় সিন্দুকটা যখন হাতে এসে পড়েছে, তার থেকে দু-চারটা পয়সা যদি ঐ বাপ-তাড়ানো মা-খেদানো ছেলেগুলোর ভোগে লাগে তো লাগুক না। আমার তো কোন লোকসান নেই।

(ক্রমশ)

এতদিন পরে যে আবার পুতুল দিদির কথা মনে পড়লো, এ পুতুল দিদির মেয়ের বিয়ে বলে নয়। কিম্বা তার মেয়ের বিয়েতে এত পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে বলেও নয়। মনে পড়ার আরো একটি কারণ আছে।

কারণটা পরে বলবো।

পুতুল দিদিকে জানি খুব ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলায় পুতুল দিদির ওপর ভার পড়তো আমার তদারকের।

বাবার চাকরিতে খুব ঘন ঘন বদলি হোত তখন। আজ মীরাট, কাল দিল্লী, পরশু জব্বলপুর, আবার তারপর দিনই হয়ত কলকাতা। বদলি হবার মুখে বাবা আমাদের সবাইকে মামার বাড়িতে রেখে একলা চলে যেতেন। তারপর বাড়ি বা কোয়ার্টার ঠিক করে আবার আমাদের নিয়ে যেতেন সেখানে।

তা এই সূত্রে বড় ঘন ঘন মামার বাড়ি যাওয়ার সুযোগ ঘটতো আমাদের।

মামার বাড়িতে গেলেই আমার ভার পড়তো পুতুল দিদির ওপর। তা শোয়ানো, খাওয়ানো, জামা পরিয়ে বেড়াতে পাঠানো, সমস্ত করতো পুতুল দিদি। আমার অন্য ভাইবোনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো মা। তাই যে-কদিন মামার বাড়ি থাকতাম, সে-কটাদিনই পুতুল দিদির হেপাজতে থাকতে হতো।

মনে আছে দালানে সবাই সার সার শুয়ে আছি। মাঝরাত্রে আমার ঘুম ভেঙেছে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে। ডাকলাম—পুতুল দি—

ডাকতে গিয়েও যেন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। যদি ধমক দেয়! যদি মারে! পুতুল দিদি মারতো খুব। মেরে আমার গালে, পিঠে, বুকে একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিত।

বলতো—পিসীমা, তোমার বড় ছেলেটিকে একেবারে বাঁদর করে তুলেছ—

মনে আছে, যখন আমার খুব অল্প বয়েস, পুতুল দিদিকে যেন ফ্রক পরতে দেখেছি। স্মৃতির সিন্দুক খুললে এখনও অস্পষ্ট আবছা আবছা সে-চেহারাটা মনে পড়ে। খুব মোটা-মোটা গোলগাল থলথলে চেহারা ছিল তখন। আর ধব্ ধব্ করছে গায়ের রং। আমাকে কোলে করে নিয়ে বারান্দার এ-পাশ থেকে ও-পাশে ঘুরতো। তারপর সেই পুতুল দিদি সাড়ি পরতে শুরু করলে। তখন গায়ের থল্-থলে ভাবটা কমে গেছে। রংটি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। গায়ে আরো জোর হয়েছে। পুতুল দিদি একটা চড় মারলে সমস্ত মাথাটা আমার ঝিম্ ঝিম্ করতো।

কিন্তু যত বিপদ হতো রাত্রে। পুতুল দিদি আমার পাশেই শুতো। ঘুমোতে ঘুমোতে কখন আমার গায়ে পা

তুলে দিয়েছে খেয়াল নেই। কিন্তু তবু নড়তে পাবো না।

পুতুল দিদি মা'কে বলতো—পিসীমা, জানো, যত দুষ্টুমি ওর রাত্রে—

সত্যি, রাত্রেই আমার কেমন একলা কলতলায় যেতে ভয় করতো। সমস্ত বাড়িটা তখন নিশুতি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশে পাশে ভাই বোনদের নিঃশ্বেস ফেলবার শব্দ আসছে। আবার একবার আস্তে আস্তে ডাকতাম—পুতুল দি—

শেষ পর্যন্ত যখন কলতলায় নিয়ে যেত আমাকে, তখন রাগের চোটে আমার ওপর দুম্ দুম্ করে কিল্ বসিয়ে দিত।

বলতো—রাত্তিরে যে একটু ঘুমোব তারও উপায় নেই তোর জ্বালায়—

এমনি প্রতিদিন।

আবার বলতো—আজ যদি রাত্তিরে আবার উঠিস তো, কাল তোকে কিছু খেতে দেব না, উপোস করিয়ে রাখবো—দেখিস্ ঠিক—

কিন্তু তারপরেই বিকেল বেলা যখন জামা কাপড় পরিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠাতো ঝি-এর সঙ্গে, সে এক অন্য চেহারা। পাউডার স্নো মাখিয়ে, কপালে একটা খয়েরের টিপ পরিয়ে দিয়ে আমার কড়ে আঙুলের ডগাটা আলতো করে কামড়ে দিয়ে ছেড়ে দিত।

বলতো—সন্ধ্যে বেলা পড়তে বসতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন—

কিন্তু আমাকে ভালোও বাসতো খুব পুতুল দিদি। কেউ আমাকে বকলে কি মারলে পুতুল দিদি এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বলবে—পল্টুর ওপরে তোদের এত গায়ের জ্বালা কেন রে—ও তোদের কী করেছে রে—শুনি—

এমনি করে মীরাট থেকে জব্বলপুর, জব্বলপুর থেকে কাটনি, কাটনি থেকে কোথায় কোথায় বাবার সঙ্গে আমরাও বদ্‌লি হয়ে চলতে লাগলুম। আর মাঝে মাঝে এক-একবার প্রায় পাঁচ-ছ'মাসের মত মামার বাড়ি গিয়ে থাকি।

তখন পুতুল দি আরো বড় হয়েছে। ভালো ভালো সাড়ি পরে। গায়ে সাবান মাখে, এসেন্স মাখে। পুতুল দিদি যখন আদর করে কাছে টেনে নেয়, আমি বুক ভরে এসেন্সের গন্ধ শুঁকি। পুতুল দিদির কাছে-কাছে থাকতে ভালো লাগে। পুতুল দিদির পুতুলের বাক্সতে হাত দিতে দেয় তখন। বেড়াতে যাবার আগে সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে এক-একদিন একটা আধলা দেয়। বলে কাউকে বলিসনি পল্টু—তোকে আমি এমনি দিলুম—

আমি আবার সেই আধলা দিয়ে হয়ত চিনেবাদাম কিনে এনে লুকিয়ে লুকিয়ে দিতুম পুতুল দি'কে।

পুতুলদি বলতো—আজ লালার দোকানের কচুরি আনতে পারবি পল্টু—

বলতুম—কেন পারবো না—

—কাউকে বলবি না বল্—

বলতুম—না, সত্যি বলছি, কাউকে বলবো না পুতুলদি—

—মাইরি বল্, মা কালীর দিব্যি, বল্—

তাই বলতাম। শেষে সেই গরম গরম তেলে ভাজা হিং-এর কচুরি নিয়ে এসে ছাদের ওপরে চিলে কুঠুরীর কোণে বসে দুজনে খাওয়া।

এমনি করে কতবার কতরকম নিষিদ্ধ খাওয়া খেয়েছি দুজনে। কেবল আমি আর পুতুলদিদি। পুতুলদি আমার চেয়ে পাঁচ-ছ' বছরের বড়। তবু আমাদের বন্ধুত্বে বাধেনি কোথাও।

একবার মামার বাড়িতে গিয়ে দেখলুম পুতুলদি আরো বড় হয়েছে। ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে পেয়ে পুতুলদি যেন একটা কাজ পেলে হাতে। পুতুল খেলা তখন ছেড়ে দিয়েছে। বই পড়ে খালি। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আমি গিয়ে বই নিয়ে আসি পাশের বাড়ির থেকে চেয়ে চেয়ে। পুতুলদি'র পড়া হয়ে গেলে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসি। বেশির ভাগ সময় পুতুলদি ছাদের ওপরে বসে বসে পড়তো।

পুতুল দি একমনে পড়তো আর আমি পাহারা দিতাম।

পুতুলদি বলতো—ওখানে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাক্, কেউ এলেই আমাকে বলে দিবি—

সিঁড়িতে কারো পায়ের শব্দ হলেই আমি ইঙ্গিত করতাম পুতুলদিকে আর পুতুলদি বইটা লুকিয়ে ফেলতো কাপড়ের মধ্যে। তখন একেবারে ভালো মানুষ যেন। পুতুলদি এক এক সময় গান গাইতো গুন গুন করে। আর আমি হাঁ করে শুনতাম। গানের খাতায় কত যে গান লেখা ছিল পুতুলদিদির। পুতুলদি'র বিছানার তলায় সে-সব লুকোন থাকতো। এক আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না সে-কথা।

আমাকে কেবল সাবধান করে দিত পুতুলদিদি—খবরদার আমি যে গান গাই, বই পড়ি—কাউকে বলবিনে—বললে তোর হাড় মাস আর আস্তো রাখবো না কিন্তু পল্টু—

তা পুতুলদিদির পক্ষে সবই সম্ভব। প্রত্যেক কথাতেই মারতো আমাকে। বেড়াতে গিয়ে হয়ত প্যাণ্ট-এ ময়লা লেগেছে, দেখামাত্র মার। পুতুলদিদি নিজে গান গাইতো বটে, কিন্তু আমি গাইলে আর রক্ষে নেই।

বলতো—খুব যে ওস্তাদ্ হয়ে গেছিস পল্টু—এই বয়সেই গান ধরেছিস্—

কিম্বা হয়ত বলতো—বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেশা হয়, না—তোমার আড্ডা মারা আমি বন্ধ করছি—

কখনও হয়ত গাল টিপে দিয়ে বলতো—লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বই পড়ছিলি—এই বয়েসেই নবেল পড়া দেখাচ্ছি তোমার—

কিন্তু সেবার এক কাণ্ড হলো।

হঠাৎ মামাবাবু আপিস থেকে বাড়ি এল একদিন দুপুরবেলা। আমি তখন ঘুমোচ্ছি। মামীমা জেগে ছিল বোধ হয়। একটা আচম্‌কা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি একতলায় মামাবাবু পুতুলদি'কে খুব মারছে। সে কী মার। দেখে আমার কান্না পেতে লাগলো। পুতুলদি চুপ করে মার সহ্য করছে। আর মামাবাবু বেত দিয়ে পিঠের ওপর সপাং সপাং করে মারছে। মারতে মারতে পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

সবাই এসে কাছে ভীড় করে দাঁড়ালো। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। মামাবাবুর সামনে কারো কথা বলার সাহস নেই। মামীমাও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ও হতভম্ব হয়ে গেছে। আমরা ভাই বোনরা সব ভয়ে নির্বাক হয়ে দেখছি।

মামাবাবু বললে—আজ আমি ওকে ান্ত রাখবো না আর—ও মেয়ে মরে াওয়াই ভালো—

মামীমা কাঁদছিল। বললে—ও মেয়ে ামার একদিন মুখ পোড়াবে ঠিক, দেখে নও তোমরা—

মা বললে—চেঁচিও না বউ, লোক ানাজানি হলে আমাদেরই মুখ পুড়বে -ওর আর কী—

মামীমার কান্না তখনও থামেনি। লতে লাগলো—এইটুকু মেয়ের পেটে পটে এত বুদ্ধি মা, আমি কতবার লেছি বিয়ে দিয়ে দাও ও-মেয়ের—তখন কউ কথা শুনলে না আমার,—এখন লো তো—

মা বললে—দিন কাল খারাপ পড়েছে উ, এ হাওয়ার দোষ, আমার পল্টু য়েছে ওই বয়েসে—বিয়ে দিলে ও মেয়ে তন ছেলের মা হতো এতদিনে—

তা পুতুলদি'র বয়েস তখন তেরো ার আমার বয়েস সবে আট।

সেই তেরো বছর বয়েসের পুতুলদিদি সদিন কী অপরাধ করেছিল বুঝিনি, কন্তু যে-শাস্তিটা পেয়েছিল তা এখনও নে আছে। মনে আছে সেদিন কয়লা াখবার একটা ঘরে সারাদিন বন্দী হয়ে াকতে হয়েছিল পুতুল দিদিকে; খেতে দওয়া হয়নি, ঘুমোতে পায়নি। এক লাস জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি সেদিন ুতুল দিদিকে। আমার বার বার মনে ়ছিল পুতুল দিদির কথা। কান্না পেয়ে-ছল পুতুল দিদির অবস্থা ভেবে। কিন্তু য়ে কয়লার ঘরটার কাছে যেতে পারিনি কবারও। যদি কেউ দেখতে পায়!

পরের দিন পুতুলদিদিকে জিজ্ঞেস রেছিলাম—ওরা তোমাকে অত মারলে কন পুতুলদিদি? কী দোষ করেছিলে ুমি?

পুতুলদিদি ভীষণ রেগে গিয়েছিল,—ললে—তোর অত খবরে দরকার কী রে—ড় জ্যাঠা হয়েছিস তো তুই—লেখাপড়া াই, খালি—

তারপরে পুতুলদিদির বিয়েতে াবার একবার এলাম মামারবাড়িতে। ুতুলদিদি তখন অনেক বড় হয়েছে। খন বোধ হয় বছর ষোল বয়েস। ারিক্কি হয়েছে চেহারা। বেনারসী আর চন্দনের টিপ পরে সে রীতিমত অন্য চেহারা। বিয়ের দিন সন্ধ্যেবেলা চারদিকে আলো জ্বলছে। বাজনা বাজছে। লোক-জন আত্মীয়-স্বজন। লুচিভাজার গন্ধ।

আমি পুতুলদিদিকে একলা পেয়ে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার ভয় করছে না পুতুলদি?

পুতুলদি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—ভয় করতে আমার বয়ে গেছে—

বললাম—তুমি তো শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে এবার—

পুতুলদিদি বললে—যাচ্ছি বৈকি—যাবোই তো—তোর কী রে—

কী জানি আমার যেন কেমন কষ্ট হচ্ছিল। সমস্ত বাড়ির কল-কোলাহল আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমার মন যেন উদাস হয়ে যাচ্ছিল পুতুলদিদির কথা ভেবে। মামারবাড়িতে একটা মাত্র লোভ একটা মাত্র আকর্ষণ ছিল—সে পুতুল-দিদি। পুতুলদিদির হাতে মার খেতেও যেন কত আনন্দ। পুতুলদিদির গালা-গালিও যেন কত মিষ্টি। মামার বাড়িতে এলে এবার থেকে কে সাজিয়ে গুজিয়ে দেবে। কে পাহারা দেবে আমায়। আমি নভেল পড়ছি কি না কে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখবে। আমার ভালো মন্দের জন্যে কে অত মাথা ঘামাবে।

পুতুলদিদি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখছিল। একবার এদিক একবার ওদিক। নতুন গয়না পরে কেমন দেখাচ্ছে, তাই।

পুতুলদিদি বললে—দেখিস তো—কেউ যেন আসে না এদিকে—

বিয়ে বাড়িতে রাজ্যের লোক। দরজাজানালা বন্ধ করে দিলাম। কেউ আর দেখতে পাবে না। পুতুলদিদি আপন মনে সাজগোজ করতে লাগলো চুপ করে। আমি যে একটা মানুষ, তা যেন গ্রাহ্যই নেই। শাড়িটাকে ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে নানা-ভাবে নানান্ কায়দায় পরেও সোয়াস্তি নেই। কিছুতেই যেন পছন্দ আর হয় না নিজেকে। নিজের রূপ নিয়ে নিজেই বিভোর। একবার ঘোমটা দিলে। একবার ঘোমটা সরিয়ে দিলে। একবার ঠোঁটে রং দিলে। আবার ঘষে রং মুছে ফেললে। কিছুতেই আর পছন্দ হচ্ছে না।

শেষকালে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে—

পুতুলদিদির দিকে চেয়ে কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু। আমার মনে হলো যেন অপূর্ব। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা সব নামগুলো একসঙ্গে মনে এল।

পুতুলদিদি বুঝতে পারলে। বললে—আমার দিকে অমন করে চাইছিস কেন রে—আমি না তোর দিদি হই—খবরদার কিল্ মেরে পিঠ ভেঙে দেব—

বলে কথা নেই বার্তা নেই আমার পিঠে এক কিল বসিয়ে দিলে দুম্ করে।

বললে—এই সব শিক্ষা হচ্ছে, না?...

বললাম—আমি কী করেছি—

—আবার কথা? আমি বুঝি না কিছু—মেয়েমানুষের দিকে অমন করে তাকাতে আছে?

পিঠের ব্যথায় আমার চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছিল।

পুতুলদি বললে—আবার ছিঁচকাঁদুনি আছে ঠিক—বিদেশে থেকে থেকে এই সব যত বদ শিক্ষা হচ্ছে—

আমার বড় অভিমান হয়েছিল সেদিন মনে আছে। খিল খুলে বাইরে চলে আসছিলাম।

পুতুলদিদি বললে—কোথায় যাচ্ছিস শুনি—

—বাইরে—

পুতুলদিদি হঠাৎ হাতটা ধরে এক টান দিলে। বললে—এইটুকু বয়েস থেকেই এত শয়তানি—যেতে হবে না বাইরে—একটা কাজ কর—দাঁড়া এখানে—

তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখনি বর আসবে। ঘরের বাইরে লোকজনের গলা শোনা যায়। সবাই কাজে ব্যস্ত। এখনি বরযাত্রীরা এসে পড়বে। জামা-কাপড় পরে সবাই তৈরি হয়ে নিয়েছে। পুতুলদিদি হঠাৎ একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। একমনে কী সব লিখলে খানিকক্ষণ। তারপর চিঠিটা খামে পুরে জিব দিয়ে খামের মুখটা ভিজিয়ে সেঁটে দিলে। বললে—এই চিঠিটা দিয়ে আয় তো—

আমি চিঠিটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম।

পুতুলদিদি থামিয়ে দিলে। বললে—কাকে দিবি—

তখন বড় হয়েছি আমরা। সব জিনিস বুঝতে শিখেছি। অতীতের ঘটনার নতুন অর্থ করেছি। তবু আমার কাছে অবাক লেগেছে কেমন করে এ সম্ভব হলো। ভেবেছি—কত বড় দরাজ বুক হলে পরের সন্তানশুদ্ধ স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারে লোকে। কত বড় ক্ষমাপরায়ণ মন হলে এ সম্ভব হয় তা-ও বুঝেছি। বুঝেছি সংসারে আইন দিয়ে আর যত কিছুই বাঁধা যাক মন বস্তুটি বড় শক্ত জিনিস, সে কারো শাসন মানে না, কোনও আইন মানে না সে, কোনও বাঁধা ধরা পথে সে চলতে চায় না। শুধু একটা জিনিস বুঝিনি—সেই পুতুল-দিদিই কেন আবার তার স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে রাজী হলো। বুঝিনি বটে কিন্তু বুঝতে চেষ্টাও যে করিছি তা-ও নয়। ভেবেছি স্বামী-স্ত্রীর মনের অন্তস্তলে কোথায় কোন্ দুর্ভেদ্য রহস্য লুকিয়ে আছে তা বোঝবার চেষ্টা করাও যেন বৃথা। পুতুলদিদির স্বামী-ত্যাগও যেমন দুর্বোধ্য, স্বামীকে তার পুনর্গ্রহণও তেমনি। সে সম্বন্ধে বাইরের লোকের মতামত শুধু নিরর্থকই নয়, মিথ্যেও বটে। তাতে সুবিচারের নামে অবিচারই তো ঘটতে দেখি সংসারের সর্বত্র। সুতরাং সে-চেষ্টাও আর করিনি।

মামাবাবুর মৃত্যুর পর থেকে মামার-বাড়ি যাওয়া আমাদের কমে গেল বটে, কিন্তু সম্পর্ক ঠিকই ছিল। বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে দেখা বা চিঠি লেখা হতো। আমাদের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও জটিল হয়ে উঠলো।

ফটিকের ঘাড়েই তখন সংসারের সব ভার পড়েছে। তিন বোনের বিয়ে, দুই ভাইকে কলেজে পড়িয়ে মানুষ করানো থেকে বাড়িটা দোতলা তোলা। তা ছাড়া লোকলৌকিকতা খাওয়া-পরা, এই সামান্য রেলের চাকরি থেকে করা সামান্য কথা নয়।

সেবার অন্তুর বিয়েতে গিয়েই দেখলাম—এলাহি কান্ড করে বসেছে ফটিক। রশোনচৌকি, ব্যান্ড, খাস-গেলাসের আলো বাজি ফাটানো আর বিলাসপুর ঝেঁটিয়ে সমস্ত বাঙালীদের সপরিবারে খাওয়ানো কি কম খরচের ব্যাপার। দেখে মনে হলো—ফটিক কি চাকরিতে মোটা ঘুষ পায় নাকি?

বলেছিলাম—ধার দেনা হলো বোধহয় তোর অনেক—

ফটিক বললে—আমি ধার করবার পাত্তোর বটে—আমার তো ওই চাকরি, জানিস তো তুই—দশ আনা রোজ—ওদিকে মিন্টুর বরকে বিলেত পাঠানো হয়েছে জানিস তো—আর এবারে বাড়িটাও তেতলা তোলা হবে—ঘরে আর কুলোচ্ছিল না—

বললাম—তা তো বটে—

ফটিক বললে—এবার পুজোতে আত্মীয়-স্বজনকে কাপড় দেওয়া হলো। সবাই খুসী, দিতে পারলে সবাই ভালো—কী বল্—

বললাম—কিন্তু এমন করে টাকা ওড়ানোর দরকার কী—

ফটিক বললে—এ-সব কি আমার ইচ্ছে—বললে পুতুলদি শোনেনা—

—পুতুলদিদি?

—হ্যাঁ, পুতুলদিদিই তো সন্তু-নন্তুর বিয়ে টিয়ে দিলে, যাবতীয় খরচ করছে সে, পুতুলদিদি ছিল বলে আবার বিলাসপুরে বাঙালী সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি ভাই—পুতুলদি'র জন্যেই একবার মাথা হেঁট হয়েছিল আমাদের, আবার ওই পুতুলদি-ই আমাদের মাথা উঁচু করিয়ে দিয়েছে, এবার এখানকার দুর্গো পুজোয় আট শো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছিল, খুব খুশী সবাই— আবার বলেছে এখানকার লেপার হোমের জন্যেও কয়েক হাজার টাকা দেবে—টাকার তো অভাব নেই জামাইবাবুর—

—অত টাকা কী করে হলো?

—ব্যবসায় জানিস তো উঠতি পড়তি আছে। এখন উঠতির সময় চলছে—দু' হাতে টাকা উপায় করছে জামাইবাবু—

জিজ্ঞেস করলাম—পুতুলদিদির ছেলে-মেয়ে কী?

—ওই সেই মেয়ে একটা, লক্ষ্মী, আর তো হলো না—

এ-সব ঘটনা অনেক দিনের। পুতুলদিদির জীবনটা পূর্বাপর আলোচনা করে যেমন কোনও তাৎপর্য খুঁজে পাইনি, তাৎপর্য খোঁজবার চেষ্টাও করিনি কোনও-দিন। এখন বুঝেছি ফরমুলা দিয়ে বাঁধা যায় গল্প উপন্যাসকে—মানুষের জীবন ফরমুলার ধার ধারে না। নইলে সেই পুতুলদিদি স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যবসা তুলে দিয়ে আবার কেন বিলাসপুরে আসে। কোতোয়ালীর সামনে আবার বিরাট প্রাসাদ তুলেছে পুতুলদিদি। স্বর্গত বাবার নামে বাড়ির নাম দিয়েছে—"জানকী-ভবন"। যে-মামাবাবু পুতুলদিদির ব্যাপারে লজ্জায় অপমানে দেহত্যাগ করলেন, সেই মামাবাবু—জানকীনাথ বসুই অমর হয়ে রইলেন বিলাসপুরে। এখন জানকীবাবুর নাম-ডাক খুব। বাবার নামে হাসপাতাল করে দিয়েছে পুতুলদিদি। ট্রেজারীর পাশে কাছারির মুখোমুখি মস্ত দুশো বিঘে জমির ওপর "জানকীনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল"। জানকীবাবুর নাম করলে এখন হাজার মাইল দূরের লোক পর্যন্ত চিনতে পারে। হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে। বলে—ধন্য মেয়ে জন্মেছিল বটে।

আর তা ছাড়া গুণও কি কম।

মারহাট্টিদের গণেশ পুজো, মাদ্রাজীদের পঙ্গল, বাঙ্গালীদের দুর্গাপুজো, ছত্রিশ গাড়িয়াদের ছটু পরব,—এক একটা উৎসবে হাজার হাজার লোক কাপড় পায় একখানা করে। আর সিধে।

অথচ খুব বেশি দিনের কথাও তো নয়। কিন্তু মানুষ চিনি, মানুষের সব জানি বলে বড়াই-এরও তো অন্ত নেই আমাদের। কী করে কী হলো—এসব ভাবতে গেলে কেমন যেন উপন্যাস পড়ছি বলে মনে হবে।

সেই কথাই ভাবছিলাম লক্ষ্মীর বিয়েতে এসে। পুতুলদিদির একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ে আজ। ঘটার শেষ নেই। জাঁকজমকের অন্ত নেই।

পুতুলদিদিকে দেখলাম অনেকদিন পরে। একটা তসরের থান পরে বসে আছে। চারদিকে সাত্ত্বিক সতীলক্ষ্মী বিধবা-সধবা আত্মীয়স্বজন তোষামোদ করছে তাকে ঘিরে। পাশে লক্ষ্মী বসে আছে।

আন্নাদিদি বলছে—তুই কিছু মুখে দে পুতুল—আমরা তো আছি—দেখছি সব—

কাল একাদশী করেছে পুতুলদিদি। নির্জলা একাদশী করে আজ এতটা বেলা মুখে কিছু দেয়নি বলে আত্মীয়দের মাথা-ব্যথার অন্ত নেই। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে বড় অবাক লাগলো। সকাল থেকে পুলিস-কনস্টেবলে ছেয়ে গেছে বাড়ির চারদিক।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ পাহারা কেন রে?

ফটিক বললে—ও একটা ব্যাপার আছে—পরে বলবো—

বাড়ি আবার সরগরম হয়ে উঠেছে। অন্তু এসেছে, সন্তু এসেছে, নন্তু এসেছে। জামাইরাও এসে বাড়ি আলো করেছে। ভাই, ভাজ, ভাইপো, বোন, বোনঝি, বোনঝি-জমাই—সব!

পুতুলদিদি বললে—ছেলেদের নিয়ে এলি না কেন শুনি—? কতদিন তাদের দেখিনি—বউকেও নিয়ে এলিনে—বড় হয়ে সব পর হয়ে গেলি নাতি তোরা?

রাত্রের দিকে পুলিশ-পাহারা আরো বাড়লো।

ফটিককে জিজ্ঞেস করলাম—এত পুলিশ-পাহারার বন্দোবস্ত কেন?

ফটিক ব্যস্ত ছিল। তবু গলা নিচু করে বললে—পুতুলদিদি কোতোয়ালীর বড় দারোগাকে বলে নিজে এ-ব্যবস্থা করেছে—

—কেন?

—ওই লক্ষ্মীর জন্যে, ভাগলপুরে যতদিন ছিল, ওখানকার পাড়ার ছেলেরা ভালো নয়, লক্ষ্মীও ঠিক নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে না তো, সে-বয়েসও হয়নি, একবার এক-ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপরে অনেক কষ্টে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে—

কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম।

ফটিক বললে—তা এইবার বিয়ের সম্বন্ধ হবার পর চোখে চোখে রাখতে হচ্ছে। ওকে উড়ো চিঠিও দিয়েছে একটা তাই পুতুলদি নিজের কাছে বসিয়ে রেখেছে সমস্ত দিন—

কিন্তু মনে হলো—বরও তো আশ্চর্য ছেলে।

ফটিক বললে—তাকেও সব বলা হয়েছে, সব শুনেই সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে—

খুব ভালো বলতে হবে তাকে—

ফটিক বললে—টাকায় সব হয় ভাই, শাশুড়ীর একমাত্র মেয়ে জানে তো—টাকার লোভটাও আছে বৈকি।

তা যাহোক কখন বিয়ের ধুমধামের মধ্যে সমস্ত দিন কাটলো। বর এল। শাঁখ বাজলো। হুলুধ্বনি উঠলো। হাজার-হাজার লোক পাত পেড়ে লুচি তরকারি খেয়ে কখন বিদায় নিলে, কিছুই বোঝা গেল না। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে কাটলো সন্ধ্যেটা। কোনও বিঘ্ন ঘটতে পারে না জানতাম। বিঘ্ন হলোও না।

আমি একফাঁকে সরে পড়লাম।

ফটিক ধরলে—এখুনি যাবে কেন,—গাড়ি তো তোমার কাল ভোর বেলা—

বললাম—সেই ভোর চারটেয় ট্রেন, তারপর আবার শীতকাল—অত সকালে স্টেশনে যাওয়া—স্টেশন কি এখানে নাকি—

তোমাকে আমি গাড়ি করে পৌঁছে দেব, কোনও ভাবনা নেই—

তবু আমি থাকতে রাজি হইনি। খাওয়া-দাওয়া চুকলেই বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রে গিয়ে ওয়েটিং-রুমে আরাম করে শুয়ে থাকবো। তারপর ট্রেন আসবার ঘণ্টা শুনলেই উঠে পড়া যাবে। শীতকালের রাত। রাত চারটে মানে শেষ রাত্তির। আর বিলাসপুরের আপার-ক্লাস ওয়েটিং-রুমটা ভারি নিরিবিলি। দোতলার ওপর। বেশি লোকজন থাকে না। ভোরের ট্রেনে যেতে গেলে বরাবর এমনি রাত্রে গিয়ে শুয়ে থেকেছি সেখানে। এ আজ নতুন নয়। কিম্বা প্রথমও নয়।

একটা টাঙ্গা নিয়ে উঠে পড়লাম স্টেশনের দিকে।

এখন এই পর্যন্ত গল্পটা হলে পুতুলদিদিকে নিয়ে অন্য লেখকরা হয়ত গল্প লিখতে পারতো। কিন্তু আমি আবার একটু কন্‌ক্রীটের ভক্ত। চরিত্রদের হাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে গল্প শেষ করতে আমার বাধে তা আপনারা জানেন। আমার লেখা যাঁরা পড়েন তারা জানেন চরিত্রগুলোর একটা পুরো বিলি-ব্যবস্থা

না করে থাকতে পারিনে। তা এই ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই সে-রাত্রে যা ঘটলো তার পরে দেখলাম সত্যি আমার এতদিনের চেনা পুতুলদিদি রীতিমত একটা গল্পে দাঁড়িয়ে গেছে বেশ।

সেই ঘটনাটিই বলি এখানে।

টাঙ্গার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে কুলির মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে দোতলায় ওয়েটিং-রুমে তো গিয়ে হাজির। লোকজন বিশেষ তখন কেউ নেই। কেবলমাত্র একজন ভদ্রলোক ভালো খাটটা জুড়ে বসে আছেন।

কুলিকে বলে দিলাম গাড়ি আসবার লাইন-ক্লিয়ারের ঘণ্টা হলেই যেন এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয় আমার। তারপর শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম।

শোবার আগে ভদ্রলোকের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম।

বললাম—আলো নিভিয়ে দিলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে—

ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন—কেন?

—না, আমার আবার আলো জ্বললে ঘুম আসে না কিনা—

ভদ্রলোক বললেন—আমি এখুনি চলে যাবো, এই সাড়ে এগারোটার গাড়িতে—আপনি বরং এই খাটটায় এসে শোন্—এইটেই মজবুত, শুয়ে আরাম পাবেন—আমি সারাদিন ছিলাম এখানে—

বলে ভদ্রলোক সত্যিই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কুলি ডেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ভেতরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ও'র খাটটি দখল করে শুয়ে পড়লাম। শুধু বাইরের সি'ড়িতে একটা আলো জ্বলতে লাগলো। ভারি শীত পড়েছিল। আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম কখন টের পাইনি।

আর তারপর মনে হলো বোধহয় মিনিট খানেকও হয়নি। গাঢ় ঘুমের মধ্যে দু'ঘণ্টাকেও যেন সময় এক মিনিট বলে ভুল হয়েছে তো কতবার।

অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ যেন কে ডাকতে লাগলো—দাদাবাবু গো—ও দাদাবাবু—

প্রথমটায় অস্পষ্ট। তারপর যেন মনে হলো রামধনির গলা। মামাবাবুর বুড়ো চাকর রামধনির গলার মতন। কিন্তু এত রাত্রে আমাকে কেন ডাকে। বললাম—হুঁ

রামধনি বললে—দিদিমণি বড় রাগ করছিল আপনার ওপর, গেলেন না একবার, তাই খাবার পাঠিয়ে দিলেন—আর এই চিঠিটা—

কেমন যেন অবাক লাগতে লাগলো।

রামধনি বললে—আমার আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে দাদাবাবু যাই আজ্ঞে আমি—খাবার রইল, খাবেন কিন্তু—নইলে দিদিমণি পই পই করে বলে দিয়েছে—

সত্যি সত্যিই আরো দু'একবার ডেকে রামধনি চলে গেল। অনেক রাত হয়ে গেছে। সে-ও ক'দিন ধরে নাগাড়ে খাটছে। তাকে আবার অনেক দূর সিটিতে ফিরে যেতে হবে এই শীতের রাতে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। আলো জ্বাললাম। একটা টিফিন কৌটোতে থরে থরে লুচি পোলাও মাংস মাছ মিষ্টি যত্ন করে সাজানো। আর একটা ভাঁজ করা চিঠি। চিঠিটা খুলতেই নিচে নজরে পড়লো পুতুলদিদির নাম সই।

পুতুলদিদি লিখছে—চিরটাকাল তোমার এমনি অভিমান করেই কাটলো, তাতে লাভটা কী হলো বলতে পারো। কাল সকালে খাবারগুলো বাসি হয়ে যাবে তাই রাত্রেই রামধনিকে দিয়ে পাঠালাম। তোমার জন্যে কি মানুষকে লজ্জা-সরম সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে বলো। এত খরচ করে ও-সাড়ি দেবার কী দরকার ছিল! তোমারও যেমন মেয়ে, আমারও তো তেমনি! আমি তো দিয়েইছি। আমার দিলেই তোমারও দেওয়া হলো। আজ রাত্রের ট্রেনেই চলে যেও না, অনেকদিন পরে এলে, দেখা করে যেও। আমার হাতে টাকা নিতেও তো তোমার বাধে, পর পর ক'বারই মনি-অর্ডার ফেরত এল। ব্যাপার কী! বুড়ো বয়েসে কি আবার রাগ-অভিমান ভাঙাতে হবে নাকি! দেখবার লোক তোমার কেউ নেই, এটা মনে রেখে শরীরটার দিকে নজর রেখো,......

প্রেমিকের প্রার্থনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাকে দাও তুমি উজাড় করা ঘৃণা—
বৃষ্টি দিয়ে বে'ধো বজ্র দিয়ে হানো,
দু' চোখ ছুরিকায় অন্ধ করে দাও
যেখানে যত জ্বালা এখানে সব আনো
আমার হাহাকারে হৃদয় ভরে নাও।

এখনো এই প্রাণ বাসনাচঞ্চল
রক্তে জেলে দাও দারুণ দাবানল
আমারি চুম্বনে নিবিড় আশ্লেষে
হৃদয় দিয়েছিলে একদা ভালোবেসে
সারাটা জীবনের সেই কি সম্বল!

আমাকে দাও তুমি বিষের মতো ঘৃণা
দেখো না তাও আমি সইতে পারি কি না
রক্তে জেলে দাও দারুণ দাবানল
পাথুরে কালো রাতে আহত পশুটাকে
ঝড়ে বা বন্যাতে এখনো কেন ডাকে?

কঠিন শৃঙ্খলে আমাকে বে'ধোনাকো
কঠিনতম করে আঘাত হানো তুমি
আমার গভীরতা বুকটা চিড়ে দেখো
ভেবো না সেখানেও শুষ্ক মরুভূমি
জানোনা সাগরই তো নদীর প্রিয়তম!

সিকিমের মুখোস

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিম্পংয়ের যে বন্ধুটি আমার ভ্রমণের প্ল্যান স্থির করে দিচ্ছিলেন, সিকিম সম্বন্ধে তাঁর মত ওয়াকিবহাল লোক চট করে মেলা মুশকিল। বাবা ইউরোপীয়, মা তিব্বতী, ইংরেজীভাষী এ বন্ধুটি নিজে বহুবার সিকিম ও তিব্বত ঘুরে এসেছেন এবং ভারতবর্ষ থেকে যে দরজা দিয়ে এ দুটি দেশে প্রবেশ করতে হয় সেই কালিম্পংয়ে বহুদিন ধরে বসবাস করার ফলে আমার প্রয়োজনীয় খবরাখবর তাঁর নখদর্পণে। তাঁর যে জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আমি ধার নিচ্ছিলুম, তা পুরাতন অভিজ্ঞতার রোমন্থন মাত্র নয়; দেশী, বিদেশী কয়েকটি বিখ্যাত পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে টাইপরাইটারের চাবিতে দ্রুতগামী আঙ্গুল ছুঁইয়ে তাঁকে দীর্ঘকাল সিকিম ও বিশেষ করে তিব্বতের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। এই দুটি প্রায়-অজানিত দেশে ভ্রমণের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, এরকম মূল্যবান অভিজ্ঞতার নাগাল পেলে তার অর্ধেকের বেশী কাজ সহজেই হাসিল হয়।

মূল্যবান এইজন্যে যে তিব্বত সম্বন্ধে অনেকগুলি ইংরেজী কেতাব থাকলেও (যদিও তাদের অধিকাংশ রোমাঞ্চ-সিরিজের সগোত্রীয়) সিকিমের ওপর উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। এই প্রতিবেশী রাজ্যটি সম্বন্ধে বাঙলায় কোনো পুস্তকের অস্তিত্ব আমি অবগত নই; আর ইংরেজীতে প্রায় একশো বছর আগেকার লেখা হুকার ও ক্যাম্বেলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলির পরেই পার্সি ব্রাউনের দুতিনখানি মনোজ্ঞ বই ছাড়া আর গতি নেই। তাও শেষের বইগুলি যে সব সময়ে বাজারে পাওয়া যায় এমন নয়। সিকিমের খুঁটিনাটি খবর জানতে হলে অনুসন্ধিৎসু পর্যটককে সেজন্য প্রাচীন পুঁথি কণ্টকিত লাইব্রেরীর শরণাপন্ন হতে হয়। অবস্থাটা সিকিমের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সবুজ পার্বত্য দেশটির অধিবাসীদের থেকে দুর্ভাগ্য সম্ভবত তাঁদের প্রতিবেশীদেরই বেশী যাঁরা এই অজ্ঞতার ফলে গাঁটের কড়ি খরচ করে ভারতবর্ষের দূর দূরান্তরে চিত্তবিনোদনের জন্যে পাড়ি জমান, কিন্তু ঘরের পাশের এই নিরিবিলি রাজ্যটির দিকে ফিরেও তাকান না। আমার বন্ধুভাগ্যের কথা স্মরণ করে আমি যে বিশেষ উল্লসিত হয়েছিলুম সেকথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মুশকিল হল ফটোগ্রাফীর খুঁটিনাটিতে এসে। বন্ধুবরের কালিম্পং-এর বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে একথা আবিষ্কার করে আমি তাজ্জব বনে গেলুম যে তাঁর একাধিকবার তিব্বত ও সিকিম ভ্রমণের সময়ে তিনি সঙ্গে কোনো ক্যামেরা নিয়ে যাননি। মনের খুপরিতে নাকি সব ধরে এনেছেন বলে সাফাই গাইলেন কিন্তু গদাময় জিলাটিনে কিছু স্থায়ী জিনিস ধরে আনলে তাঁর পদ্মময় প্রাণের সঞ্চয় যে কিছুমাত্র ব্যাহত হত এমন মনে করবার কোনো কারণই আমি দেখলুম না। পরিষ্কার আবহাওয়ার ঋতুতে আমি যদি আগে খবর পাই যে কোনো দর্শনীয় ইমারত পূর্বমুখী দাঁড়িয়ে, তাহলে গললগ্নীকৃত ক্যামেরা আমি সেখানে যাই সকালে; আর যদি

মৃত্যু-দেবতা মহাকাল

ভয়াল, দুরতিক্রম্য কাঞ্চনজঙ্ঘা

জানি পশ্চিমমুখী, তবে বিকেলে। পরিশ্রম ও সময় বাঁচানোর পক্ষে এ পন্থা বিশেষ কার্যকরী। যে মূল গ্রীক শব্দ দুটি থেকে ফটোগ্রাফী কথাটির উৎপত্তি, বাঙলায় তাদের সরলার্থ হল—আলোর লিখন। আলো কখন কোন দিক থেকে পড়বে এ তথ্য আমার কাছে মহামূল্যবান। দুনিয়ার কোনো গাইড-বই বা ভ্রমণকাহিনীতে এ সংবাদ পরিবেশিত হয় না কিন্তু ভুক্তভোগী আলোকচিত্রী মাত্রেই জানেন এই খুঁটিনাটি খবরের মূল্য কি! আমার বন্ধুটিও দেখেছেন সবই, মনেও রেখেছেন বিস্তর, কিন্তু কোন ইমারতের কোনদিকে মুখ বা কোন সড়ক গেছে পুবে না দক্ষিণে, একথা চিন্তাও করেননি কখনো। এ ছাড়াও আমি জানতে চাই কোথায় ফটো তোলা বারণ, কোথায় বা নয়; বন্ধুবর সব শুনে শুধু দাড়ি চুলকান আর জানালার বাইরে তাকান। গ্যাংটকের প্রাসাদসংলগ্ন বৌদ্ধমন্দিরের বা সাংগাচেলিং, পেমিয়ঙ্চি প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠের ভেতরের ছবি নিতে অথবা এইসব উপাসনাগৃহে বহুদিনের সঞ্চিত আশ্চর্য মুখোসগুলিকে আদৌ ফটোগ্রাফ করতে দেওয়া হয় কি না কিংবা দেওয়া হলে, কি উপায়ে অনুমতি যোগাড় করতে হয়, আমার দিক থেকে এইসব অতিশয় জরুরী প্রশ্নের জবাবে বন্ধুটির আমতা আমতা ভাব লক্ষ্য করে অতিশয় নিরুৎসাহ বোধ করলুম। অবশেষে রফা হল তাঁর বিশেষ পরিচিত সিকিমের ধর্মমন্ত্রীর কাছে এক পরিচয়পত্র নিয়ে রওনা হব; বাকিটা নির্ভর করবে আমার ভাগ্য আর মুখযশের ওপর।

গ্যাংটক শহরের শেষ প্রান্তে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছবির মত সুন্দর একটি কাঠের বাড়ি; সামনে প্রশস্ত উদ্যান। পশ্চিমের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে; সোনালী আলো এসে পড়েছে সবুজ ঘাসে আর ফুলের গাছে গাছে। গৃহস্বামী বাগানেই পায়চারি করছিলেন। প্রৌঢ়, সৌম্য পুরুষ; পরনে সিকিমী আলখাল্লা; চুলগুলি দুটি বিনুনী করে মাথার ওপর দিয়ে বাঁধা। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এগিয়ে এসে আমায় অভ্যর্থনা করলেন। হাঁ, তিনিই সিকিমের ধর্মমন্ত্রী, রায় বাহাদুর বার্মেক কাজী। পরিচয়পত্রটি পেশ করলুম। যেন খুব প্রসন্ন হয়েছেন বলে মনে হল। বাইরের বারান্দায় দুই মুখোমুখি সোফায় আমরা গিয়ে বসলুম।

প্রসন্নতার কারণ রায় বাহাদুর নিজেই ব্যক্ত করলেন। সিকিমে যারা বেড়াতে আসে বড় অল্প দেখে তারা ফিরে যায় এবং ফিরে গিয়ে সম্ভবত একথা রটায় যে সেখানে দর্শনীয় কিছুই নেই। এই কিছুদিন আগে, কালিম্পং থেকে একগাড়ি বোম্বাই ছোকরা হাজির; তাঁকে পাকড়াও করে বললে দুঘণ্টার মধ্যে সিকিমের ওপর আমাদের পাক্কা তালিম দিয়ে দিন; সেই দিনই তাদের ফিরতে হবে। সিকিম দেশটা ছোট হলেও তার ঐতিহ্য এত ছোট নয়, রায় বাহাদুর সখেদে বললেন। খুব খুশি হয়েছেন চিঠিতে সিকিমের ধর্মজীবন সম্বন্ধে আমার আগ্রহের কথা জেনে। বললেন, তিব্বত ও সিকিমে ধর্মই মানুষের প্রধান অবলম্বন। এদুটি দেশের আত্মাকে জানতে হলে এই হল ফটক যেখান দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। তিব্বতের হালফিল রাজনৈতিক পরিবর্তন তার ধর্মজীবনকে কতখানি প্রভাবিত করবে সে সম্বন্ধে, আমার মতই, তিনিও নিঃসন্দেহ নন তবে তিব্বত যে কোনোদিন নাস্তিক হয়ে যেতে পারে এ সম্ভাবনাটা তার কল্পনার অতীত বলে মনে হল। সরল, আত্মভোলা মানুষটি কোনো বিশেষ প্রসঙ্গ ভাল করে বোঝাতে হলে আলমারি থেকে তিব্বতী পুঁথি পেড়ে, শুনে দুর্বোধ্য সূত্রের ইংরেজীতে দেশের শোনান আবার কখনো হয়ত ভূমি ভেতর থেকে গুরু রিম্পোচীর প্রিয়তমা পেতলের মূর্তি

এনে দেখান। তাবৎ ছাত্রের কাছে অবহেলা পাওয়াই হয় শিক্ষকের অভ্যাস, দৈবক্রমে কোনো উৎসাহী ছাত্রের নাগাল পেলে তার যে অবস্থা হয় রায় বাহাদুরের আজ সেই অবস্থা। উঠে আসবার সময় বললেন, পেমিয়াণ্ডি ও সাঙ্গাচেলিং মঠের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করে দিতে পারবেন, তবে গ্যাংটকের প্রাসাদ-সংলগ্ন বৌদ্ধ মন্দিরের কর্তৃত্ব স্বয়ং মহারাজার হাতে; ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে যেতে বা ছবি তুলতে তাঁর ব্যক্তিগত অনুমতির প্রয়োজন হবে। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন, তার পরে মহারাজার মর্জি।

কলকাঠি কে নেড়েছিলেন জানিনে, পরদিন স্যার তাসী নামগিয়াল আমার প্রস্তাবে সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে তাঁর সবিশেষ আগ্রহও হয়ত এর কারণ হতে পারে, কেননা, অধিকাংশ সময় তিনি এ-বিদ্যার টেকনিক্যাল দিক নিয়েই আলোচনা করলেন। সমধ্যায়ীর ওপর এ হয়ত স্বাভাবিক পক্ষপাত অথবা সবটাই সম্ভবত রায় বাহাদুরের অনুগ্রহ। মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর সঙ্গে সামনের মাঠটুকু পার হয়ে মঠের সামনে এসে দাঁড়ালুম। প্রধান লামাকে তাঁর কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে সচিব মহাশয় বিদায় নিলেন।

ইন্দ্র-বাহন গরুড়

* * *

বহুদিন এ সিঁড়ি দিয়ে কেউ ওঠানামা করেনি। তিনতলার তালাবন্ধ কুঠুরির সামনে একটুখানি আলো; সে আলোতে সিঁড়ির অনেকগুলি মাকড়সাকে যে গৃহহীন করে এসেছি, তার প্রমাণ সর্বাঙ্গে জড়িত দেখলুম। প্রতি বৎসর পৌষ-মাঘ মাসে কিন্তু এ-পথ সরগরম হয়ে ওঠে। খোদাই আর রঙের মিস্ত্রীরা ব্যস্তপদে যাতায়াত করে; লামা আর সরকারী কর্মচারীরা তদারক করে বেড়ান আগামী নাচের আসরে মুখোসগুলিকে ঠিক সময়ে রং-পালিশ করে নামান যাবে কি না। শীতকালীন এই লামা-নৃত্যই সিকিমের প্রধান সামাজিক উৎসব।

দরজা খুলে প্রধান লামা একপাশে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রায়ান্ধকার ঘর; নীচু কাঠের ছাতের মাঝখানে একটুকরো বড় ঘসা কাঁচ বসানো। সেই আবছা আলোতে যে দৃশ্য দেখলুম, তা ভোলবার নয়। কাঠের দেওয়ালে সারি সারি রঙীন মুখোস টাঙ্গানো; তাদের রঙ এত উগ্র যে, আলোর অভাবটা আর মনে রইল না। গাঢ় নীলের ওপর টকটকে লালের কাজ—এ'রাই মহাকাল আর কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর এই যে সবুজে সোনালীতে অপরূপ সৃষ্টি—এরা 'চাচুন' আর 'নেমো'। এদিকে এই সাদা আর হলুদের আশ্চর্য বিন্যাস—এরা 'খি' আর 'ছুসিং'। কত যে রং, আর কী নিপুণ যে খোদাইয়ের কারিগরি, তা বর্ণনা করতে পারি, এমন শক্তি আমার কলমের নেই। আগের দিন রাত্রে রায় বাহাদুর তাঁর তিব্বতী পুঁথি থেকে কিছু কিছু ড্রয়িং দেখিয়েছিলেন, আর বছর-খানেক আগে কলকাতার আর্টিস্ট্রী হাউসে শ্রীমতী দেবযানী কৃষ্ণের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখেছিলুম, এ'দের অনেক-গুলি উৎকৃষ্ট প্রতিলিপি। শ্রীমতী কৃষ্ণের তুলির মুন্সীয়ানায় মুগ্ধ হয়েছিলুম মনে আছে। আর আজ এই বন্ধ কুঠুরিতে সিকিমের অখ্যাত লোকশিল্পীর বলিষ্ঠ শিল্প নিদর্শনগুলি দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তার আশ্চর্য নিসর্গশোভা আর ফুলের সমারোহের মত এই মুখোস-গুলিও সিকিমের এক বিশিষ্ট সম্পদ। উপাস্য দেবদেবী, পশুপক্ষী আর পৌরাণিক জীবের সাদৃশ্যে তৈরি হাল্কা কাঠের এ-মুখোসগুলির ব্যবহার প্রধানত প্রতীক হিসেবে। বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভের সন্ধিক্ষণে সমাজদেহ থেকে পুরনো দিনের সঞ্চিত পাপ নিরসনের উদ্দেশ্যে ধর্ম-মূলক উৎসবের আয়োজন করা সিকিমের এক প্রচলিত প্রথা। শুদ্ধচিত্তে নতুন বছরকে অভ্যর্থনা করবার এই হল প্রস্তুতি।

এ-অনুষ্ঠানে যে শাস্ত্রীয় আচরণ ও মুখোস-নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তার তাৎপর্য হল, অধর্মের ওপর ধর্মের জয়, অশুভের ওপর শুভের। বৌদ্ধ মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, অকল্যাণের আকর মুখোস মূর্তিগুলিকে বারংবার পরাজিত করেন মহাকাল ও কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোস-ধারী দেবগণ আর অসংখ্য পর্যায়ের পশুপক্ষী ও পৌরাণিক জীবের দল। সমস্ত সৃষ্টি যেন অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। দেবলোক আর মর্তলোক সেখানে হাত মিলিয়েছে। এই মহতী যৌথ প্রচেষ্টার শেষ দৃশ্যে অশুভের অন্তিম পরাজয় ও মৃত্যুতে সোল্লাস ধ্বনি ওঠে দর্শকদের মধ্যে। আবর্জনামুক্ত শুচি মন নিয়ে আর একটা বছর আরম্ভ হয়। আবার স্তূপীকৃত হতে থাকে কলুষ ও গ্লানি। বর্ষশেষে পুনরায় এ-উৎসবের আয়োজন না করলে সমাজ-দেহ পাপমুক্ত হয় না। এইভাবে চলে শুভ আর অশুভের হানাহানি। সিকিমী ধর্মজীবনে এই রূপকের প্রাণদান করে এ-মুখোসগুলি। সেদেশের লোক-কল্পনায় সেজন্য এগুলির প্রভাব দূরপ্রসারী।

কল্যাণ ও অকল্যাণকে ভিত্তি করে সিকিমে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত। আর একটি হল থারপা নাকপোর কাহিনী। প্রথম জীবনে থারপা নাকপো নাকি বিদ্যোৎসাহী, এমনকি, ধার্মিকও ছিলেন। তারপরে, কোথা থেকে কি হল, কালাপাহাড়ের মত তিনি ঘোরতর ধর্মবিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। কর্মদোষে থারপা নাকপো জন্ম-জন্মান্তর নরকে বাস করে অবশেষে আবার যখন মর্ত্যভূমিতে দেখা দিলেন, তখন তাঁর জন্ম হল এক কুলটার গর্ভে। প্রসূতিগৃহেই মায়ের মৃত্যু হওয়াতে লোকের আর সন্দেহ রইল না যে, নবজাতক এক রাক্ষস। মায়ের মৃতদেহের সঙ্গে তাকেও তারা কবর দিলে। আশ্চর্য তার জীবনীশক্তি—থারপা নাকপো জননীর গলিত মৃতদেহ ভক্ষণ করে বেঁচে রইলেন। তারপরে অন্যান্য শবদেহে পুষ্টিলাভ করে থারপা নাকপো যখন বড় হলেন, তখন তাঁর আভরণ হল নরমুণ্ডমালা আর একমাত্র পণ হল প্রচলিত ধর্মের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন। এই যথেচ্ছাচারী নরদানবের হাতে ধর্মকর্ম এতদূর বিপন্ন হয়ে পড়ল যে, অবশেষে দেবগণ একজোট হয়ে তাঁকে সংহার করলেন। অশুভের নিপাতে তৃপ্ত ও সিকিমের ধর্মজীবন বিপন্মুক্ত হল।

এজাতীয় কিংবদন্তী থেকে একথাটাই বিশেষ করে প্রমাণিত হয় যে, এই দুটি দেশের বৌদ্ধধর্মে ভারতীয় তন্ত্রসাধনার খাদ মিশেছে অনেকখানি। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত সাবেক বৌদ্ধধর্মের সাদামাটা দেহে অজস্র রূপক আর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সংক্রমিত হয়েছে। ফলে, দুর্গম ও বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘা উপাসনার আসরে স্থান পেয়েছেন এক বিশেষ মূর্তিতে, যে মূর্তিতে তিনি ভয়াল, দুরতিক্রমা, অপরাজেয়। মহাকালের রূপে চিত্রণ করে যে আর একটি মুখোসের কল্পনা করা হয়েছে, তাতে মৃত্যু দেবতার ভয়ংকর মহিমা সুপরিস্ফুট। কাল্পনিক সৃষ্টি, ভীষণদর্শন পুরুষ ও স্ত্রী, 'ঠোয়ো' ও 'ঠোমো', আমাদের ব্রহ্মদৈত্যের সগোত্রীয়। এছাড়া ইন্দ্রবাহন, 'চাচুন' (গরুড়) ও 'খি' (কুকুর), 'ল্যাং' (ষাঁড়), 'ওরক' (কাক), 'নেসো' (কাকাতুয়া) প্রভৃতি পরিচিত সবরকম পশুপক্ষীরই মুখোস আছে। অকল্যাণ-হননব্রতী এই সব মুখোসের ভীড়ে নাচের আসর যাতে কখনও প্রাণহীন না হয়ে পড়ে, তার জন্যে 'আচার'-এর মুখোসও আছে—এক রকম; তাদের কাজ লঘু অভিনয়ে লোক হাসানো।

কুমীর ও ড্রাগণের মিশ্রণে কাল্পনিক জীব "ছুসিং"

লোকনৃত্যে মুখোসের ব্যবহার সিকিমে কিছু নতুন নয়। দক্ষিণ ভারতের কথাকলি নাচে বা বালী-যবদ্বীপের ক্লাসিক্যাল নৃত্যে মুখোসের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। সিকিমের লামা-নৃত্যে সাধারণত যে ধারা অনুসরণ করা হয়ে থাকে, তাতে মহাকাল, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মুখোসের সঙ্গে নিম্নবর্ণের অন্যান্যদের আসরে নামতে দেওয়া হয় না। পশুপক্ষীদের দিয়ে নাচ শুরু করিয়ে উচ্চস্তরে আরোহণ করাই রীতি। এতে প্রাণিজগতের সকলেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবকাশ পান, কিন্তু তার অন্তিম বিনাশ হয় দেবগণের হাতে। দেব-চরিত্র মূর্ত করলেও মহাকাল, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি মুখোসে যে কোন-রকম দেবভাব আরোপ করা হয়, এমন নয়। কিন্তু এগুলি ও হীন শ্রেণীর অন্যান্য মুখোস তৈরির বেলাতে কঠিন আনুষ্ঠানিক বিধান পালন করা হয়ে থাকে। লামা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট কারিগরেরাই এগুলি খোদাই করতে বা বর্ণসজ্জিত করতে পারেন। তারপরে অত্যুজ্জ্বল বার্নিশের প্রয়োগে এগুলির সজ্জা সম্পূর্ণ করা হয়। কোন কোন মুখোসের চূড়ায় অনেকগুলি সরু দড়ির প্রান্তে ঘুঙুর বাঁধা থাকে; ঘূর্ণ্যমান দ্রুত নাচের তালে তালে সেগুলি আন্দোলিত হয়। পুরনো হয়ে গেলে, হৃতসৌন্দর্য মুখোসগুলিকে বাতিল করে সম্পূর্ণ নতুন মুখোস তৈরি করে নিতে বাধা নেই। কিন্তু নাচের আসরে কয়েক দিনের জন্য এদের বার করা হয় বছরে ঐ একবারই। তারপরে সারা বছর ধরে বাইরের সমাজ-দেহে যখন স্তূপীকৃত হয় মালিন্য আর গ্লানি, তখন বন্ধ কুঠুরিতে এদের গায়ে জমে ধুলো। বৎসরান্তে আবার এদের রং বার্নিশ করা হয় যত্ন সহকারে। অকল্যাণকে পরাভূত করার দায়িত্ব যে তাদেরই।

গ্যাংটক মঠের পাঁজিপাঁটা সংগ্রহ করে, আবার যেদিন পথে বার হয়ে পড়লুম, সেদিনও আমার মনে পড়ে রইল তেতলার এই কাঠের ছোট ঘরটিতে। আবছা আলোয় মহাকাল আর কাঞ্চনজঙ্ঘার যে ভ্রূকুটিভয়াল মুখচ্ছবি দেখেছিলুম, সাঙ্গা-চেলিং ও পেমিয়ঙ্চি মঠ অবধি তারা আমার পশ্চাদ্ধাবন করলে। রায় বাহাদুরের চিঠি দেখিয়ে এ-মঠ দুটিতেও অনুরূপ কয়েকটি মুখোসের দুর্লভ সাক্ষাৎ পেয়ে-ছিলুম। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

লণ্ডনে পটচিত্র প্রদর্শনী

অরুণ ঘোষ

যে পটুয়ারা একদিন দিশী রং আর তুলির কয়েকটা টানে তুলোট কাগজের ওপর দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কল্পনা করেননি, একদিন তাঁদের আঁকা ছবি লণ্ডনের গ্যালারীতে স্থান পাবে আর সেই শহরের শিল্পরসিকরা তাই দেখতে ভীড় করে। কিন্তু আর্টের সর্বজনীনতা এবং অন্য দেশের শিল্প সম্পর্কে আগ্রহের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামের ভারতীয় বিভাগে কলকাতার বাজার-শিল্প (Bazar paintings from Calcutta) নামে বেশ কিছু কালীঘাটে পটের এক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে।

ছবিগুলির বেশীর ভাগই এখন এই সংগ্রহশালার সম্পত্তি। কয়েকটি ছবি অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট থেকে ধার করা হয়েছে। অন্যান্য ছবিগুলি ব্যক্তিবিশেষের দান, ক্রীত বা ভারতের মিশনারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলি ছবি Rudyard Kipling ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহশালাকে দান করেন।

কালীঘাটের তীর্থযাত্রীদের জন্য ছবিগুলি আঁকা তাই অধিকাংশই দেব-দেবীর পট। রাধাকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়িয়ে অথবা কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জন করছেন। বৃষবাহন শিব, কমলাসনা লক্ষ্মী ইত্যাদি। কিন্তু তা ছাড়াও নানা বিষয় শিল্পীদের সৃজনীশক্তিকে স্ফুরিত করেছে। ঘোড়-দৌড় বা বাঘ-শিকারের ছবির পেছনে কোলকাতার ইউরোপীয়দের প্রভাব আছে সন্দেহ নেই। প্রাণী জগতের ছবি আঁকাতেও তাঁরা কম দক্ষতা দেখান নি। সাপের পিচ্ছিল গতি, পায়রার লঘু

উড়ে-যাওয়া তাঁদের তুলিতে ধরা পড়েছে। মাছের মধ্যে চিংড়ী-মাছের প্রতিই এ'দের পক্ষপাতিত্ব বোধহয় রঙের বৈচিত্র্যের জন্য। কয়েকটি এই জাতীয় ছবির মধ্যে একটি শিল্পী যামিনী রায়ের ক্রয় করা—টীকা থেকে জানা গেল।
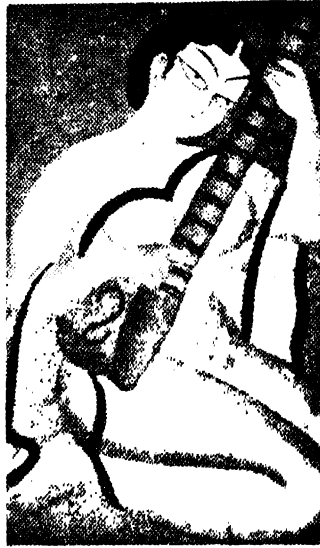
কালীঘাটের পটুয়া কর্তৃক
অংকিত সেতারবাদিনী

কিন্তু তাঁরা মুখ্যত দেবমূর্তির অংকনশিল্পী হ'লেও মাঝে মাঝে কয়েকটি ছবিতে কৌতুকের রং লেগেছে —যেমন শেয়াল রাজার দরবার। ইউরোপীয় সভ্যতা বাংলার পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তারই প্রতিচ্ছবি দেখি প্রেমিকার পদাঘাত (woman trampling on her lover) বা স্বামী কর্তৃক পাশ্চাত্ত্যমুখী স্ত্রী হত্যা (a husband slaying his westernised wife)। যে সব অস্ত্র স্ত্রী স্বামীকে তাড়না করার জন্য ব্যবহার করেন বা করবার ভয় দেখান সেগুলি এখানে স্বামীর হাতে; কখন দা, কখনও বা আঁশবটি। অন্য হাতে স্ত্রীর চুলের মুঠি। মাটিতে লুটোচ্ছে ভ্যানিটি ব্যাগ।

প্রদর্শনী থেকে শিল্পীদের বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তবে অধিকাংশ ছবিরই প্রায় এক আঙ্গিক। বিশেষত বিষয়বস্তু যেখানে এক, হয় সেগুলি একই শিল্পীর রচনা অথবা সবাই একই আঙ্গিকের পক্ষপাতী। ছবিগুলিতে নানা রঙের ব্যবহার করা হয়েছে এবং বহুস্থলেই তা উগ্র। কিন্তু কয়েকটি ছবিতে কেবলমাত্র শাদার ওপর কালোর রেখা টেনে বিচিত্র ভঙ্গীকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিবারণচন্দ্র ঘোষের (১৮৩৩—১৯৩০) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'আলিঙ্গন' (lovers embracing) প্রভৃতি ছবিতে যে নৈপুণ্য দেখা দিয়েছে তা অনেক আধুনিক শিল্পীর প্রেরণাযোগ্য।

যে ছাপা ছবি, সস্তা কাঠ-খোদাই লিথো প্রভৃতির সঙ্গে তাল না রাখতে পেরে এই শতাব্দীর গোড়াতেই পট-শিল্প বিলুপ্ত হয় তারও দু'টি নিদর্শন আছে কাঁসারীপাড়া আর্ট স্টুডিওতে ছাপা ছবিদুটি প্রায় একই ধরণের স্ত্রীলোকের ছবি—পরণে কালাপেড়ে ফরাসডাঙ্গা শাড়ী, কোমরে গোট, কানে মাকড়ী, হাতে অনন্ত। প্রথমার হাতে গোলাপ, অন্যটি হাতে হুঁকো।

পটুয়াদের হাত নিষ্ক্রিয় হ'লে তাঁদের স্বচ্ছন্দভঙ্গী এবং প্রকাশ বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত হয়েছে অনেক আধুনিক শিল্পীর সৃষ্টিতে। তেমনি লণ্ডনে এই প্রদর্শনী হয়তো ইউরোপে নতুনত্বের সন্ধান দেবে।

নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার সমস্যা

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

সম্প্রতি জয়পুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রদত্ত ভাষণটি বক্তব্যের দিক দিয়া অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে। দেশে অন্যান্য যে-সকল খ্যাতনামা এবং কৃতবিদ্য ঐতিহাসিক রহিয়াছেন, তাঁহারা ডাঃ মজুমদারের এই ভাষণের বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছেন কিনা জানি না, এবং শুনিয়া থাকিলেও তাঁহারা সেই ভাষণে নিহিত অভিমত সম্বন্ধে কি ধারণা করিতেছেন, তাহাও অনুমান করিতে চাহি না। এই প্রবন্ধে নিতান্তই অবিশেষজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির ধারণার কথা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দেশের বিগত এবং বর্তমান ঐতিহাসিকদিগের বক্তব্য ও অভিমত হইতে এবং সেই সঙ্গে ডাঃ মজুমদারেরও রচিত ঐতিহাসিক নিবন্ধ এবং সন্দর্ভ-সমূহ হইতে দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করা যায়, তাহা একটি ভুল শিক্ষা এবং ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, যদি ডাঃ মজুমদারের জয়পুর ভাষণের বক্তব্য অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ডাঃ মজুমদারের এতাবৎকালের রচিত নিবন্ধাদি হইতেও যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য জানিবার সুযোগ পাইয়াছি, ডাঃ মজুমদারের জয়পুর ভাষণে সেই সকল তথ্যকেই অতথ্য বলা হইয়াছে। তাই তাঁহার সাম্প্রতিক ভাষণকে বস্তুত একটি দুর্বোধ্য রহস্যের মতই বোধ হইয়াছে। ভাষণটি সমগ্রভাবে না হইলেও অধিকাংশত যেন তাঁহার নিজেরই প্রতিবাদ। জয়পুর ভাষণের ডাঃ মজুমদার যেন দুই-তিন বৎসর পূর্বেরই ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদারের চিন্তা, বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গীকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

প্রথম, রাজা রামমোহন সম্বন্ধে ডাঃ মজুমদারের অভিমত লক্ষ্য করা যাক্। ঐতিহাসিক পরীক্ষক ডাঃ মজুমদার তাঁহার জয়পুর ভাষণে রাজা রামমোহনকে পরীক্ষা করিয়া অনেক বিষয়েই কম নম্বর দিয়াছেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, একটি বিষয়ে রামমোহনকে পাস-নম্বরও দিতে পারেন নাই। দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের নাকি কোন অগ্রণীতা ছিল না। ডাঃ মজুমদার বলিয়াছেন :—

> "রামমোহনের কলিকাতা আসিবার পূর্বেই এখানে যে হিন্দু কলেজ অন্যান্য বাঙ্গালীর ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহার প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোন হাত ছিল না, বরং যখন এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।"

রামমোহন রায় কলিকাতা আসিবার পূর্বে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল কি? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, ডাঃ মজুমদারের মত ঐতিহাসিক হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকালের মত সহজ-জ্ঞাতব্য একটি তথ্য সম্বন্ধে অবহিত নহেন। যাহাই হউক, এ বিষয়ে তাঁহারই লিখিত এবং মাত্র তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে তাঁহারই অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ডেভিড হেয়ার এবং রাজা রামমোহনের একটি বিশেষ এবং প্রধান কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ নিবেদন করিয়া ডাঃ মজুমদার লিখিয়াছেনঃ

> "These two were mainly instrumental in establishing several English schools, including the Hindu College which afterwards developed into the Presidency College."
>
> [An Advanced History of India, PP. 817.]

যে বিষয়ে রামমোহনেরই প্রধান হাত ছিল বলিয়া ইতিহাস গ্রন্থে তিন বৎসর পূর্বে উল্লেখ করিয়াছেন ডাঃ মজুমদার, সেই বিষয়েই 'রামমোহনের কোন হাত ছিল না' বলিয়া জয়পুর ভাষণে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষালয় স্থাপনে উদ্যমশীলদিগের মধ্যে ডেভিড হেয়ার এবং রামমোহনকেই এই গ্রন্থে ডাঃ মজুমদারের নিবন্ধে 'সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য' ('most notable') বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ডাঃ মজুমদারের তিন বৎসর পূর্বের অভিমত অনুযায়ী হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রাজা রামমোহনও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষালয় প্রবর্তনের চেষ্টায় রাম-মোহন, 'প্রথম দিকে' বাধা দিয়াছিলেন, এই তথ্য কোথায় পাইলেন ডাঃ মজুমদার? বরং, এই তথ্যই পাওয়া যায় যে, হিন্দু কলেজ স্থাপনার বৎসরেই রামমোহন আগে সিউড়িতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাঃ মজুমদারেরই তিন বৎসর পূর্বের লিখিত গ্রন্থ বলিতেছে যে, রাজা সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক দুই-তিন বৎসরের মধ্যে নিজের অভিমত এবং তথ্য সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিলে অনৈতি-হাসিক জনের চিন্তা কিরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে, তাহা ডাঃ মজুমদার অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

জয়পুর ভাষণে ডাঃ মজুমদার রামমোহন সম্বন্ধে জাতির ধারণার ভুল ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার মতে রামমোহন ঠিক 'অগ্রণী' তথা পাইওনিয়ার নহেন। সংবাদপত্র প্রবর্তন, ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বাংলা গদ্য রচনা ইত্যাদি গঠনমূলক ও সংস্কারক উদ্যোগে বিদেশীয়েরা এবং কতিপয় দেশীয়রাই প্রথম অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু ডাঃ মজুমদার এই তথ্য উল্লেখ করিবার প্রয়োজন অনুভব করিবেন কেন? যে-সকল বিদেশীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এইসব শিক্ষামূলক উদ্যোগে প্রথম হাত দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কৃতিত্ব কে অস্বীকার করিয়াছে, এবং তাঁহাদিগকে 'প্রথম উদ্যোগী' বলিয়া সম্মান দিতেই বা অস্বীকার করিয়াছে? দেশের শিক্ষিত-সাধারণের অধিকাংশই জানে এবং দেশের শিশুপাঠ্য সাধারণ 'নলেজ-বুক'-গুলিতেও উল্লেখ আছে, কে প্রথম এবং কবে ছাপাখানা, ইংরাজী স্কুল, সংবাদপত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্কুল, ছাপাখানা, সংবাদপত্র, গদ্য ইত্যাদির প্রথম প্রবর্তক ও প্রয়াসীদিগের কৃতিত্ব স্বীকার করিয়াও কি ইহা বলা যায় না যে, রাজা রামমোহন তৎকালীন দেশের এই সকল ভাব চিন্তা ও কর্মের নবোন্মেষকে জাতীয় জীবনে বৃহত্তর প্রকাশ লাভে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন? জাতীয় চিন্তা এবং কর্মের সংগঠকদিগের কাজই তো এই যে, তাঁহারা বিবিধ ভাবোন্মেষের প্রকৃতিতে সুসংহতি দান করেন। এবং সমাজে অথবা জাতীয় জীবনে ভাব ও কর্মের প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করাই পাইওনিয়ার তথা পথিকৃৎ মনস্বীর সাধনা। রাজা রামমোহন তাই পথিকৃৎ। ঐতিহাসিক তাই রাজা রামমোহনকেই আধুনিক ভারতের ভাবজীবনের অগ্রনায়ক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। সুতরাং, কে ছাপাখানা প্রথম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করিয়া রামমোহনের অগ্রনায়কতার ঐতিহাসিক সত্যতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না, করার যুক্তি নাই, করা উচিতও নহে। আরও বিস্ময় বোধ করিতেছি এই কারণে যে, জয়পুর ভাষণে যে প্রবীণ ঐতিহাসিক রাজা রামমোহনকে আধুনিক ভারতের ভাবজীবন ও কর্মজীবনের গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতায় সেকেণ্ড বা থার্ড করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, সেই ঐতিহাসিকই তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার রচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, রাজা রামমোহনই হইলেন নূতন ভারতের ভাবমূর্তি ও জাতীয় গঠনের অগ্রনায়ক।

> "The new spirit of the age is strikingly illustrated by the life and career of Raja Rammohon Roy...... Rammohon was a great pioneer of English education......On the whole he struck the true keynote of social reform in India......In the field of Indian politics also, Raja Rammohon was the prophet of the new age."

রাজা রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজ জীবনীকারের অভিমত সমর্থন করিয়া ডাঃ মজুমদার তাঁহার রচিত নিবন্ধে লিখিয়াছেনঃ

> "'Rammohon Roy laid the foundation of all the principal movements for the elevation of the Indians' which characterise the nineteenth century. His English biographer truly remarks that the Raja 'presents a most instructive and inspiring study for the new India of which he is the type and pioneer.'"
>
> [An Advanced History of India, P. 812-815.]

রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এই ধারণা যিনি তিন বৎসর পূর্বে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে পরিবেশণ করিয়াছেন, তিনিই জয়পুর ভাষণে বলিয়াছেনঃ

> "রামমোহনের মহিমা অযথা বড় করিতে গিয়া আমরা বাঙালী জাতিকে খাটো করিয়াছি।"

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! রাজা রামমোহনের মহিমা 'অযথা' বড় করিবার অভিযোগ কাহার উপর আরোপ করিতেছেন ডাঃ মজুমদার? কে 'অযথা' রামমোহনকে বড় করিবার চেষ্টা করিয়াছে? ডাঃ মজুমদার স্বয়ং রামমোহন সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার বাণী তিনবৎসর পূর্বের নিবন্ধে পরিবেষণ করিয়াছেন, তাহা কি সত্যই অযথা হইয়াছে? রামমোহনের ব্যক্তিত্বের এই মূল্য স্বীকার করিলে অথবা তাঁহাকে 'বড় করিলে' কি বাঙালী জাতি ছোট হইয়া যায়? বরং ইহাই তো আসল সত্য যে, রাজা রামমোহনকে 'বড়' মনে করিলে বাঙালী জাতিকেই বড় মনে করা হয়, কারণ ডাঃ মজুমদারের মতে, রামমোহন হইলেন তৎকালীন বাঙালী জীবনের নবভাবযুগের প্রতীক, পথিকৃৎ, প্রফেট এবং পাইওনিয়ার। জয়পুর ভাষণের দাবী অনুযায়ী রামমোহনকে একটু 'ছোট' করিয়া ভাবিলে অর্থাৎ সেকেণ্ড বা থার্ড বলিয়া মনে করিলে বাঙালী জাতিকে বড় করা হয় কি? দেশের মানুষ রামমোহনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটু ছোট ধারণাই বা ধারণ করিবে কিরূপে, তাহা হইলে ডাঃ মজুমদারের 'অ্যাডভান্সড্ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া'র ঐতিহাসিক তথ্য, তত্ত্ব ও বক্তব্যগুলিকে যে একেবারে বাজে বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে হয়।

জয়পুর ভাষণে ডাঃ মজুমদার আর একটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের ইতিহাস সম্বন্ধে দেশের রাজনৈতিক নায়কদিগের' ভ্রান্ত ধারণার কথা। তিনি বলিয়াছেনঃ

> "ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চিরদিন প্রকাণ্ড ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে ইহা অপ্রীতিকর হইলেও নিদারুণ সত্য।......রাজনৈতিক নায়কগণ যদি ইহা মানিয়া লইতেন তবে হয়তো আজ পাকিস্থান সৃষ্টি হইত না।"

আলাউদ্দীন খিলিজির শাসনকাল হইতে শুরু করিয়া ব্রিটিশের আগমন পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের কতগুলি ঘটনা এবং তথ্যের উল্লেখ করিয়া ডাঃ মজুমদার ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান বস্তুত দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতিরূপেই বর্তমান ছিল এবং আজও রহিয়াছে। সুতরাং, এই দুই ভিন্ন জাতিকে এক জাতি বলিয়া মিলাইবার চেষ্টা করিয়া রাজনৈতিক নায়কগণ যে ভুল করিয়াছেন, তাহার ফলে পাকিস্থান সৃষ্টি হইয়াছে।

ডাঃ মজুমদারের এই সিদ্ধান্তটি উদ্ভট যুক্তিবিভ্রাটের বিস্ময়কর উদাহরণ। ভারতে হিন্দু ও মুসলমান যদি দুই ভিন্ন জাতি

বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাও স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মিঃ জিন্নাও ভারত ইতিহাসকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ডাঃ মজুমদার যে যুক্তিবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, মিঃ জিন্নাও হুবহু সেই যুক্তিবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ের সিদ্ধান্ত একই, পার্থক্য শুধু এই যে, মিঃ জিন্না মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারকে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, এবং ডাঃ মজুমদার হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন।

ঐতিহাসিক তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনার তথ্য সম্বন্ধে ভুল করিবেন, ইহা পরিতাপের বিষয়। দেশের মুসলিম লীগপন্থী জননায়কগণ ডাঃ মজুমদারের ব্যাখ্যাত দুই-জাতি থিওরী স্বীকারই করিতেন, এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃগণও ঐ থিওরীর কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক সত্য এই যে, রাজনৈতিক নায়কগণ এবং কংগ্রেস ১৯৪৭ সালের মে মাসে মাউণ্টব্যাটেনের বৈঠকখানায় বসিয়া এই দুই-জাতি থিওরীর দাবী কার্যত মানিয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই ভারত খণ্ডিত হইয়াছে। দুই-জাতি থিওরী মানিয়া লইলে ভারত একটি একজাতির অখণ্ড দেশ হইয়া থাকিতে পারিত, ডাঃ মজুমদারের এই যুক্তিটি একটি আত্মখণ্ডিত, স্ববিরোধী এবং অত্যদ্ভুত যুক্তি। তাহা ছাড়া, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান 'যদি নেতারা মানিয়া লইতেন' বলিয়া গবেষণা করিবার প্রয়োজন কোথায়? জিন্নার সেই পৃথক্ জাতিত্বের দাবী তো মানিয়া লওয়াই হইয়াছে, আর তাহার ফলে পাকিস্থান হইয়াছে।

হিন্দু ও মুসলমানের একজাতীয়তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য কিংবা মিথ্যা, তাহা লইয়া এই প্রসঙ্গে কোন বিচারের অবতারণা করিতে চাহি না। শুধু এইটুকুই বলিব যে, হিন্দু ও মুসলমানের দুই-জাতিত্বের প্রমাণস্বরূপ ডাঃ মজুমদার যে-সকল তথ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর একটু বেশি তত্ত্বমূলক তথ্য তাঁহার মত ঐতিহাসিকের নিকট হইতে লোকে আশা করে। রাস্তার লোকে, নিতান্ত ইতিহাস-অজ্ঞ লোকেও যে-ধরণের তথ্য ও যুক্তি লইয়া আলোচনা করে, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট হইতে জানিবার প্রয়োজন হয় না। "হিন্দুরা পূজা করিত পূর্বাস্য হইয়া এবং মুসলমানেরা পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া"—এই ধরণের চটুল যুক্তিবাদ এবং অত্যন্ত লঘু তথ্যের সাহায্যে একটি জনসমাজের জাতীয়তার পরিচয় বিভাগ করা ঠিক ঐতিহাসিকসম্মত পদ্ধতি নহে। হিন্দুর পূর্বদিকে মুখ করিয়া পূজা, আর মুসলমানের পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া উপাসনা, এই দুইটি আচারের মধ্যে কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নাই এবং একটি পদ্ধতি অপরটির প্রতিক্রিয়ারূপে উদ্ভূত হয় নাই। পূজার্চনার বিষয়ে অথবা ধর্মীয় বিষয়ে সকল হিন্দু একপ্রথাচারী নহে। ডাঃ মজুমদার 'ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি' বলিতে কি বুঝিয়াছেন জানি না, কিন্তু উক্ত তিন বিষয়ে ভারতের জনসমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহা ঐতিহাসিক প্রভেদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে সকল হিন্দুর একজাতীয়তা এবং সকল মুসলমানের একজাতীয়তা অস্বীকার করিতে হয়।

যাহাই হউক, হিন্দু ও মুসলমানের জাতীয়তার একত্ব, দ্বিত্ব অথবা পার্থক্য এবং প্রকৃতি নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রসঙ্গে কোন বিতর্ক উত্থাপন না করিয়া শুধু ইহাই বলিব যে, ডাঃ মজুমদার তাঁহার প্রতিপাদ্য দুই-জাতি থিওরীর পক্ষে এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করেন নাই, যাহা বিশ্লেষণের ধোপে টিকিতে পারে। আলাউদ্দীন খিলিজির সময় হইতে ইংরাজের আধিপত্যের সূচনাকাল পর্যন্ত ভারতে হিন্দুর উপর মুসলমান শাসকের নির্যাতনের কতগুলি ঘটনার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। এই সকল ঘটনার সত্যতা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহাও সত্য নহে কি যে, বিগত সাত-আট শত বৎসরের ভারত-ইতিহাসে মুসলমান শাসক কর্তৃক মুসলমানের উপর এবং হিন্দু শাসক কর্তৃক হিন্দুর উপর নির্যাতনের বহু ঘটনার এইরূপ এক একটি তালিকা রচনা করা যায়? কিন্তু এই

নির্যাতনী তথ্যের ও ঘটনার তালিকার উপর ভিত্তি করিয়া নিশ্চয়ই হিন্দুর বহুজাতীয়তা এবং মুসলমানের বহু-জাতীয়তার থিওরী দাঁড় করানো যায় না। হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক জাতিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ডাঃ মজুমদারের মত ঐতিহাসিক অত্যন্ত দুর্বল যৌক্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। "মুসলমান ঘরে ঢুকিলে হিন্দুরা তৈজসপত্র ধুইয়া শুদ্ধ করিত"—ডাঃ মজুমদারের বর্ণিত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক্ জাতিত্ব প্রমাণের পক্ষে নিতান্তই গুরুত্বহীন।' কারণ এই সংস্কারটি উত্তমাধম 'বর্ণে' বিভক্ত হিন্দুরা হিন্দুদের সম্পর্কে আরও বেশি করিয়া পোষণ করিত। কিন্তু সেই কারণে ডাঃ মজুমদার হিন্দুসমাজকেই বহু ভিন্ন জাতির সমাবেশ বলিয়া মনে করিবেন কি? ঐতিহাসিক যুক্তি এবং ছেঁদো যুক্তিতে অনেক পার্থক্য।

হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গেই ডাঃ মজুমদার আর একটি যে তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অভিনবত্ব চমৎকারিতায় অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইবে। বাংলা দেশে বর্গীর আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রসঙ্গে ডাঃ মজুমদার বলিয়াছেন ঃ

> "মহারাষ্ট্র সৈন্য যখন বাংলা আক্রমণ করিল, তখন বাংলার হিন্দুরা ইহাকে পাপিষ্ঠ যবনের বিরুদ্ধে পরিত্রাণকারী হিন্দুর অভিযানরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল।"

ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদারের এই উক্তি বস্তুত দুঃসহ তথ্যবিকৃতির উদাহরণ বলিয়া মনে না করিয়া উপায় নাই। যে বর্গীর অত্যাচারের ঘটনাকাহিনী আজও পশ্চিমবঙ্গের জনস্মৃতির মধ্যে সজীব রহিয়াছে, সেই বর্গীকে বাংলার হিন্দুরা স্বাগত জানাইয়াছিল, এমন অস্বাভাবিক ঘটনার কোন্ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাইয়াছেন ডাঃ মজুমদার? ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে বর্গীর বিরুদ্ধে যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর ধিক্কারবাণী সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা অস্বীকার করিয়া কবি ভারতচন্দ্রের অতিপ্রাকৃত কল্পনার কয়েকটি কাব্যিক পংক্তিকে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া বিবেচনা করা বেশি বাস্তব-সম্মত অথবা যুক্তিসংগত ঐতিহাসিকতা নহে, কারণ রাজবৃত্তিপুষ্ট কবির কল্পনা ততটা স্বাধীন ও সত্যভাষী নহে, যতটা স্বাধীন ও সত্যভাষী হইল জনসাধারণে প্রচলিত প্রবাদ ও কিংবদন্তী। জনমতের রায় হিসাবে জনপ্রবাদই অন্ততঃ এক-আধ জন কবির উক্তি হইতে বেশি নির্ভরযোগ্য। ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রতি যবনের আচরণে শিবানুচর নন্দীর মনে ক্রোধ জন্মিল এবং শিবের আদেশে নন্দী সাতারায় মহারাষ্ট্র রাজা রঘুকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন, যাও ভুবনেশ্বর মন্দির রক্ষা কর।

> স্বপ্ন দেখি বর্গীরাজ হইল ক্রোধিত।
> পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে বাছিয়া এই মর্মের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া ডাঃ মজুমদার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, বাংলার হিন্দুরা আক্রমণকারী বর্গীকে পাপিষ্ঠ যবনের বিরুদ্ধে পরিত্রাণকারী হিন্দুর অভিযান বলিয়া মনে করিয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের এই অতিপ্রাকৃত একটি কাল্পনিকতার কয়েকটি কথার দ্বারা বর্গীর আক্রমণ সম্বন্ধে তৎকালীন বাংলার হিন্দুর মনোভাবের পরিচয় নিরূপণ করা যায় না, করা উচিতও নহে। উহাকে বর্গী সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত ধারণার বা প্রচারণার পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারত-চন্দ্র কটকে গিয়া বর্গী সুবাদারের নিকট হইতে সাহায্য, সমাদর ও অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, এইরূপ ঘটনার কথা কবির কোন কোন জীবনবৃত্তান্তে পাওয়া যায়।

বর্গীরা বাংলার হিন্দুর প্রতি কি আচরণ করিয়াছিল এবং বাংলার হিন্দুরা তাহাদিগকে কি চক্ষে দেখিয়াছিল, তাহার প্রমাণ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদের মাঠে ঘাটে আজও নানা ধ্বংসচিহ্ন এবং লোকপ্রবাদের মধ্যে রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন বিগ্রহ স্বয়ং কামান দাগিয়া বর্গী নিপাত করিয়াছিলেন, এই কিংবদন্তীর মধ্যেই বর্গী সম্বন্ধে লোক-মনের পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। সেই মদনমোহন বিগ্রহকে বাঙালী হিন্দু আজও পূজা করে, এবং সেই কামান দেখাইয়া বাঙালী হিন্দু আজও সেই বর্গী নিপাতের কাহিনী আলোচনা করে।

ডাঃ মজুমদার কবি গঙ্গারামের নাম-মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গারামের বক্তব্য উল্লেখ করেন নাই। কবি গঙ্গারাম বর্গীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা, তাঁহার রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

> একজনে ছাড়ে তারা আর জনা ধরে
> রমণের ভয়ে নারী ত্রাহি শব্দ ছাড়ে॥
> এই মতে বর্গী কত পাপ কর্ম করিয়া
> সেইসব স্ত্রীলোক যত দেয় সব ছাড়িয়া॥
> বাঙ্গালা চৌ-আরি যত বিষ্ণুমণ্ডপ
> ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
> এই মতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া
> চতুর্দিকে বর্গী বেড়ায় লুটিয়া॥

ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলার হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানবিরোধী বলিয়া মনে করিবারও কোনই যুক্তিসংগত হেতু ছিল না। কারণ, বর্গীনায়ক ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা দেশে আসিয়া আলিবর্দী-বিরোধী একটি মুসলমান শক্তিপক্ষের (সুজা উদ্দীন, মীর হবিব, রুস্তম জঙ্গ) সহিত অন্তরঙ্গভাবে সহযোগী হইয়া হিন্দু জনসাধারণের উপর এবং হিন্দু ভূস্বামী-দিগের উপর নির্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালাইয়াছিল। বর্গী সৈনিকরা মীর হবিব ও অন্যান্য মুসলমানের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল। বর্গীদের সহিত সহযোগী মুসলমান সৈনিকও থাকিত। হিন্দু জগৎ শেঠের কুঠি নিঃশেষে উজা

করিয়াছিল হিন্দু বর্গী। বর্ধমানরাজ, বিষ্ণুপুররাজ এবং মেদিনীপুরের আরও অনেক বিশিষ্ট হিন্দু ভূস্বামীর সর্বস্ব লুণ্ঠন ও ধ্বংসের ব্যাপারে হিন্দু বর্গীরা কোনরূপ কুণ্ঠা প্রদর্শন করে নাই।

তৎকালীন বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারও বর্গীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা এবং তাঁহার মতে—'সাহু রাজার সৈনিকরা নিষ্ঠুর, তাহারা দীন-দরিদ্রকে, ব্রাহ্মণকে এবং অন্তঃসত্ত্বা নারীকেও অক্লেশে হত্যা করে।' মারাঠা রঘুজী ভোঁসলে বাংলার তৎকালীন পাঠানদলের নেতা মুস্তাফা খাঁর আমন্ত্রণেই বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মুসলমানদের সহিত এত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সূত্রে সম্পর্কিত বর্গী আক্রমণকারীকে যবনের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণকারী বলিয়া বাংলার হিন্দুরা মনে করিয়াছিল, ইহা একটি বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক অসত্য। কবি ভারতচন্দ্র কাল্পনিকতা করিয়া তাঁহার কবিতায় বলিয়াছিলেন যে, রঘুরাজা (অর্থাৎ রঘুজী ভোঁসলা) নন্দীর স্বপ্নাদেশে উড়িষ্যার দেবমন্দির অবমাননাকারী যবনের উপর ক্রোধিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের তথ্য বলে, রঘুজীই ১৭৫২ সালে উড়িষ্যার সুবাদার পদে মুসলিউদ্দীন খাঁ নামক জনৈক মুসলমানকেই নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলায় বর্গীদিগের আচরণে বিশুদ্ধ হিন্দু-প্রীতি এবং বিশুদ্ধ মুসলমানবিদ্বেষের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বাংলার হিন্দুর ক্ষেতখামার এবং হিন্দুনারীর ধর্ম পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল যে বর্গীর দ্বারা, সেই বর্গীর পাপিষ্ঠতাকে বাংলার হিন্দুরা 'পাপিষ্ঠ যবনের' বিরুদ্ধে পরিত্রাণকারী বলিয়া গণ্য করে নাই, কারণ আজ হইতে দুইশত বৎসর পূর্বে বাংলার হিন্দুরা পাগল ছিল না।

ডাঃ মজুমদার তাঁহার ভাষণে কংগ্রেস সম্বন্ধে একটি মন্তব্যে তাঁহার বাঙালী-প্রীতি প্রকাশ করিতে গিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাঙালী-বিরোধী মনোভাবের অভিযোগ আনিয়াছেন। যথাঃ

"কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি লইয়া এক রাজনৈতিক কনফারেন্স বাঙালীর উদ্যোগে কলিকাতায় দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। ......এই কনফারেন্সই যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।......কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে কংগ্রেসের উৎপত্তি লইয়া অনেক আলোচনা আছে, কিন্তু কলিকাতার এই জাতীয় কনফারেন্সের উল্লেখ নাই।"

ডাঃ মজুমদারের তথ্যনিষ্ঠার অভাব এবং তথ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইবার আগ্রহের অভাব দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসটি পাঠ করিবার কর্তব্যটুকুও পালন না করিয়া জোরগলায় এবং সরাসরি এইরূপ অভিযোগপূর্ণ উক্তি একজন বিখ্যাত নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকই করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিলেও ক্লেশ হয়।

কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠার দিকে তাকাইলেই ডাঃ মজুমদার দেখিতে পাইতেন যে, সেখানে নিম্নোক্ত কথাগুলি উল্লিখিত আছেঃ

"....In the year 1883, there was held a political conference at the Albert Hall, Calcutta, at which both S. N. Banerjee and A. M. Bose were present. It was at this meeting that S. N. Banerjee specifically referred, in his opening address to the Delhi assemblage (Delhi Durbar 1877), the model for a like political organisation intended to espouse the country's cause."
History of Indian National Congress—Dr. Sitaramaiya.

কলিকাতা কনফারেন্স সম্বন্ধে এত স্পষ্ট উল্লেখ কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাসে থাকিতেও, ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদার অক্লেশে বলিতে পারিলেন—'উল্লেখ নাই।'

জয়পুর ভাষণে ডাঃ মজুমদার একটি আশাবাদের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেনঃ

"এতদিন নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনার যে সমুদয় বাধা ছিল, স্বাধীনতালাভের ফলে তাহা দূর হইয়াছে।"

ডাঃ মজুমদারের এই উক্তিকে দেশের ঐতিহাসিকেরা সত্যসম্মত উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? ব্রিটিশ শাসনকালে কোন দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকের পক্ষে ব্রিটিশের অন্যায় সম্বন্ধে সত্য তথ্য পরিবেষণ করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে কিসের বাধা ছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনেক ইংরাজ লেখকও তো বেশ কঠোরভাষায় ব্রিটিশরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের পেন্সনভোগী ভারতীয় মেজর বসুও ব্রিটিশের রাজনৈতিক আচরণের বহু অন্যায় ব্যক্ত করিয়া ইতিহাস লিখিতে পারিয়াছিলেন। ইতিহাস গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে তথ্যসন্নিবেশের বিষয়ে ঐতিহাসিকের নিজের সৎসাহসের অভাব ছাড়া আর কোন বাধা ব্রিটিশ শাসনকালে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্রিটিশরাজের কটাক্ষের বাধা অনুভব করিয়া কোন ঐতিহাসিক নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনা করিতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার করিতে এবং বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। যাহাই হউক, ডাঃ মজুমদারের আশাকেই অভিনন্দন জানাইতেছি, নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচিত হউক। তবুও এই আক্ষেপ করিতে হইতেছে যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন বৎসর পরেও তাঁহার লিখিত ঐতিহাসিক নিবন্ধে রামমোহন সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সাম্প্রতিক জয়পুরের ভাষণে তাহার বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশের স্বাধীনতার উপর ঐতিহাসিকের চিন্তার সুস্থিরতা একান্তভাবে নির্ভর নহে। সমস্যাটা হইল ঐতিহাসিকের মনের সমস্যা। 'যো মনমে আটক হৈ বহি আটক রহা'। বাস্তব সত্য এই যে, ইচ্ছার ও মনের একটা প্রবণতা ও ঝোঁক অনুযায়ী অতথ্যকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া চালাইয়া এবং বিনা তথ্যেই অভিমত উল্টাইয়া দেওয়ার অভ্যাসই হইল নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস রচনার একটি বিঘ্ন ও সমস্যা।

চক্রদত্ত

কয়লার খনিতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে আর এই দুর্ঘটনা নানা রকমের হয়। খনিতে গ্যাস হয়ে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে। এই গ্যাসজনিত দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য "ডেভিস ল্যাম্পের" প্রচলন হয়। ডেভিস ল্যাম্পের আর এক নাম "সেফটি" ল্যাম্প।" খনির লোকজন যে সব আলো নিয়ে কাজ করতো সেগুলো ঢাকা না থাকায় খনিতে গ্যাস জন্মালেই অগ্নিকান্ত ঘটে যেতো।
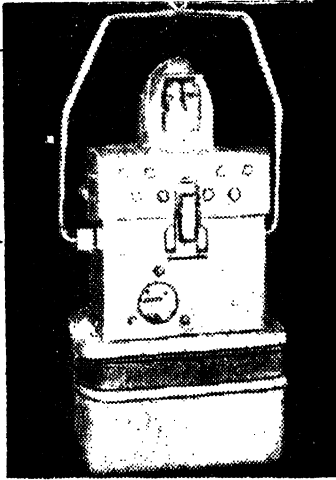
এক্সপ্লোর্সিলিট ল্যাম্প

"ডেভিস ল্যাম্প" আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ক্রমশঃই এই বাতি উন্নত হতে হতে উন্নততর হয়েছে। বর্তমানে যে আলোটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি আরও ভালো। এই আলোটির নাম দেওয়া হয়েছে—'এক্সপ্লোসিলিট্'। আলোটি নিজে নিজেই জ্বলে আর বাতাসে যখন বিস্ফোরক গ্যাস মিশতে থাকে এবং ক্রমশঃ আলোটি যে-সে যখন-তখন খুলতে পারে তখনই এই আলোটির মাথায় বিপদবার্তা জ্ঞাপক একটি লাল আলো জ্বলে ওঠে। আলোটি যে-সে যখন-তখন খুলতে পারে না একটি চুম্বকের টুকরোর সাহায্যে এটা খুলতে হয়।

*

মাথা ধরা রোগটা খুবই সাধারণ। এক আধবার "মাথা ধরায়" ভোগেনি এমন লোক খুব কমই আছে। অনেক লোকের মাথার একদিকে যন্ত্রণা হয় অর্থাৎ এক-দিকের রগের পাশে টন্ টন্ করতে থাকে এ ধরণের মাথার যন্ত্রণাকে সাধারণত "আধকপালি" বলে। অভিজ্ঞরা বলেন প্রায় শতকরা দুজন মানুষই এই রকম "আধকপালিতে" ভোগে। এ রোগের কারণ আজ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। এ রোগের কারণ খুঁজতে গিয়ে কোনও দুজন ডাক্তার একমত হতে পারেন না। এ রোগটি বংশানুগত। এ বিষয়ে ডাক্তারগণের দ্বিমত নেই, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে সব লোকেরা অল্পে উত্তেজিত হয় তাদেরই এ রকম মাথার কষ্ট হয়। যে কোনও কারণেই হোক না কেন আর যত সাধারণই হোক না রোগটি খুবই কষ্টদায়ক। এক একজনে এই রকমের আধকপালিতে এত কষ্ট পান যে, তাদের জীবনযাত্রাই দুরূহ হয়ে ওঠে। খুব অল্প হলেও এ রোগের কষ্ট খুবই সাংঘাতিক। অভিজ্ঞরা বর্তমানে বলছেন যে, এই মাথার রোগটি এ্যালার্জির দরুণ হয়। কোন্ কোন্ খাদ্য থেকে এ্যালার্জি ঘটে ধীরে ধীরে সেটি নির্ণয় করে তারপর খাদ্য তালিকা থেকে সেই খাদ্যটি বাদ দেওয়ার পর এ রোগের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় এবং পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, এভাবে শতকরা প্রায় আশিজন রোগীকে নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। এঁরা বলেন, এ সব ক্ষেত্রে চকোলেটই এ্যালার্জির প্রধান কারণ, এ ছাড়া দুধ, গম ও শুয়োরের মাংসও এ্যালার্জির কারণ বিশেষ। এরা চারমাস ধরে ১১টি পুরুষ ও ৪৪টি রমণীকে পরীক্ষা করার পর এই সিদ্ধান্ত করেছেন। এরা আরও বলেন, প্রধানতঃ রোগটি এ্যালার্জি ঘটিত হলেও মানসিক কারণে রোগটির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

*

ব্লাড্ ব্যাঙ্কে আজকাল মানুষের রক্ত খুব মূল্যবান পদার্থ বলেই সযত্নে সংরক্ষিত হয়, কিন্তু পশু রক্তের কোনও প্রয়োজনীয়তা এ পর্যন্ত দেখা বা শোনা যায়নি। কষাইখানায় হাজার হাজার পশুবলির রক্ত শতধারে গড়িয়ে যেতে দেখলে আমরা শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলি। যাঁরা চোখ ভাল করে খুলে দেখেন, তাঁরা দেখেছেন এই পশুরক্তও নষ্ট করার জিনিস নয়। এই রক্ত থেকে একরকম আঠা তৈরী করা যায় এবং সে আঠা প্লাই উড্ জোড়ার পক্ষে খুব কার্যকরী। বর্তমানে ফেনল, ফরম্যালডিহাইড আর রজন দিয়ে এই আঠা তৈরী হয়। এখন দেখা গেছে যে, এই সমস্ত পদার্থগুলির সঙ্গে মূল পদার্থ হিসাবে পশুরক্ত মিলিয়ে নিলে যে আঠা তৈরী হবে, সেটা আরও ভালো হয়। প্রথমত, এটাতে শক্ত করে সাঁটা যায়, আর এতে ছাতা পড়ে না, কিংবা ব্যাকটিরিয়া জন্মায় না। মোটের উপর স্যাঁতা ধরে না। এইভাবে তৈরী করতে পারলে দামেও কিছু সস্তা হয়। এই নতুন আঠা বাজারে L. I. R. নামে চালু হয়েছে।

*

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীও যে বৈজ্ঞানিক জগতে কী আলোড়ন তুলতে পারে তা আজকালকার দিনে কারো অজানা নয়। কয়েকজন ইটালিয়ান প্রাণীতত্ত্ববিদ কয়েকটি ছোট ছোট মাছের অস্তিত থেকে দুটি মহাদেশের সংযোগ খুঁজে বার করেছেন। এঁদের মতে এক সময় আফ্রিকার সঙ্গে এশিয়ার বর্তমান ভারত মহাসাগরের দ্বারা যোগাযোগ ছিল। এই তথ্যের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক দল মাদাগাস্কার, লাক্ষা আর গোমোরোস দ্বীপে ঘোরাঘুরি করছেন। এঁদের ধারণা যে, এই কয়েকটি দ্বীপই এখন সমুদ্র তলস্থ মহাদেশের অংশ বিশেষ। এটা খুব অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়, কারণ আজকের এ্যাজোরা বিগত এ্যাটল্যাণ্টিক মহাদেশের কোনও পর্বতের শীর্ষদেশ একথা সকলেই জানেন। যদিও সত্য সত্যই এই রকম একটা মহাদেশের অস্তিত্ব এরা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তার কী নাম হতে পারে? এরা বলেন, এটার নাম "ইণ্ডিয়ানিস" রাখা যেতে পারে।

ঠাকুরবাড়ির কথা

স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা দেবী। সিগনেট প্রেস, ১০।২, এলগিন রোড, কলিকাতা—২০। দাম—দুই টাকা চার আনা।

সমালোচকের কাজ খুব প্রিয় নয়। বিশেষ করে বাঙলা দেশে। যেখানে পাঠকের চেয়ে লেখকের সংখ্যা বেশি। যেখানে দলাদলি বা পরশ্রীকাতরতা সাহিত্যকর্মের নামান্তর। সমালোচকের নাম গোপন না করলে যে-দেশে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

তবু এক-একটি এমন বইও হাতে আসে যা শুধু আনন্দই উদ্রেক করেনা, যার স্মৃতির সৌরভে প্রাণের আদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। স্মৃতিচিত্র এমনই একটি বই। লেখিকার কলমে বাঙলা দেশের একটি প্রাচীন বংশের যে ঘরোয়া চিত্র অক্ষর হয়ে ধরা দিয়েছে তা অভিনব বললেও অতিউক্তি দোষে দুষ্ট হবার নয়। ঠাকুর বাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্যের ইতিহাস ইতিপূর্বে "ঘরোয়া" "জোড়াসাঁকোর ধারে" প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থে প্রকাশিত হলেও মহিলার দৃষ্টিতে সে-বাড়ির অন্দর-মহলের কথা এই বোধ হয় প্রথম বলা হলো।

এ সেই যুগের কথা যখন মেয়েরা ছিলেন পর্দানশীন। কিন্তু "সৌখিন মেয়ে মহলে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল বাতিক।" সেই যুগেও ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা ঘোড়ায় চড়েছেন। স্টেজে নেমেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, গ্রাজুয়েট হয়েছেন। সমাজ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তাঁদের দিকে। তাঁদের চালচলন সমাজের চোখে তাক লাগিয়ে দিত। শেষে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না করতে পেরে সাধারণ লোকে বলতো—'ওরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী"।

প্রকান্ড সাতমহল বাড়ি। তার বাড়ির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। চাকর, সরকার, ভাজপুরী দারোয়ান, ফুলবাগান থেকে সুরু করে সুনয়নী দেবী, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া জীবনের কথা—দেশের শিল্পসাধনার কথা সব কিছুই বিচিত্র কথকতার ভঙ্গীতে বলে গেছেন। গল্প বলার এমন স্টাইল বুঝি লেখিকা উত্তরাধিকারী সূত্রেই পেয়েছেন মনে হয়। মনে হয়—এত অল্পে যেন মন ভরেনা। মন বলে—আরো চাই—আরো চাই। আগাগোড়া সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসৌষ্ঠব।

পুস্তক পরিচয়

আর্ট পেপারে সমস্ত বইটি ছাপা। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর বাড়ির কয়েকজনের অপ্রচলিত চিত্র যুক্ত হওয়াতে বইটি আরো মূল্যবান হয়েছে।

কবিতা—

সূর্যতামসী : জলার্ক প্রকাশনী : জলপাইগুড়ি। আট আনা। (৩০৭।৫৩)

জীবন-খাতা : ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়। দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। (৩৫৩।৫৩)

অভিজ্ঞান : সুবোধরঞ্জন রায়। ইণ্ডিয়ানা, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। এক টাকা আট আনা। (৩৩৫।৫৩)

শাখে গাহে পাখী : অমূল্যকুমার চক্রবর্তী। সুপ্রকাশন, ৩, সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা—১৯। (৩৩৮।৫৩)

আলো-ছায়া : শ্রীপবিত্রকুমার মিত্র। গ্রন্থালয়, ১১০বি, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, তালতলা, কলিকাতা। (৩১১।৫৩)

অহনা : শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। আট টাকা। (৩৩১।৫৩)

উনিশোত্তর : চিত্ত সিংহ। সুজনী, ৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা—৩৭। চার আনা। (৩৫৭।৫৩)

যাত্রী : চিত্ত সিংহ। সুজনী, ৬৭-এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা—৩১। চার আনা। (৩৫৮।৫৩)

সূর্যতামসী কয়েকজন লব্ধখ্যাতি ও কয়েকজন অতিতরুণ কবির কাব্যসংগ্রহ। আট পাতার এই সংগ্রহে আটজন কবির আটটি কবিতা স্থান পেয়েছে। সংকলনটি স্বল্প-পরিসর বলে কবিতা নির্বাচনে সম্পাদকের আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল। অন্যথায় একটিমাত্র কবিতা পড়ে, সে কবিতা যদি কবির প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম হয়, কবির ওপর অবিচার করবার আশংকা থাকে। সে আশংকার অবকাশ এখানেও আছে। সুন্দর কাগজে পরিচ্ছন্ন ছাপা সংকলনের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে।

জীবন খাতা কবি ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল সাম্প্রতিক হলেও রচনাকাল বহুদিনগত। এই কথাটি মনে রাখলে জীবন-খাতার কাব্যাস্বাদ গ্রহণ অনেকটা সহজ হবে। রবীন্দ্রোত্তরকালে যে কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রছায়ায় কাব্যরচনায় প্রয়াস পেয়েছেন, নতুন কোন পথ খুঁজে পাননি কবিধর্মে ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই সমগোত্রীয়। প্রচলিত আঙ্গিক গ্রহণ করে বক্তব্যটুকু সহজ করে বলা এঁদের রীতি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিও তার ব্যতিক্রম নন। জীবন-খাতা পড়ে অনেকেই একটি অনায়াস কাব্যাস্বাদ পাবেন।

অভিজ্ঞানের কবি সুবোধরঞ্জন রায়ের রচনারীতিও ধরণীধরের প্রায় সমগোত্রীয়। কেবল কালের সংগে আরও কয়েক দশক অগ্রগতির পালিশ পড়েছে এই যা। কিন্তু সমসাময়িকের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কবিতায় কালপ্রমাদের ছোঁয়া আছে। তবে এই অসংগতি অনেকাংশে পূর্ণ করেছে কবিতায় একটি স্বতোৎসারিত হৃদয়াবেগ। অভিজ্ঞান কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এইটুকুই বক্তব্য। আর সেটুকুও কম নয়।

শাখে গাহে পাখী অথবা আলোছায়া কোন কাব্যগ্রন্থেই বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ নেই। অতি সাধারণ কথা সাধারণ সাজান ছন্দে লেখা অক্ষর মেপে মাত্রা মিলিয়ে। কম ক্ষেত্রেই পদ্যের সীমা ছাড়িয়ে কাব্যের অংগণে পদার্পণে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু প্রযত্ন-প্রসূত ফল খানিকটা সর্বত্রই পরিলক্ষণীয়। শাখে গাহে পাখী কাব্যগ্রন্থের দুটি গদ্যছন্দে রচিত কবিতা দুটি বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে, কিন্তু সুষমা বাড়ায়নি।

অহনা কাব্যগ্রন্থের প্রধান সুর ভক্তি-

রসাত্মক এবং এইটিই প্রায় একমাত্র সূর। ভক্তির ফুলটি যদি কাব্যের অঞ্জলিতে ধরা পড়ত তাহলেই তা নিবেদনে সার্থক হতো। কিন্তু খুব কম কবিতাতেই তা সম্ভব হয়েছে। ফলে ভক্তি যত প্রবল কাব্য তত সবল নয়। বক্তব্য যেখানে দার্শনিকতার পথে পা বাড়িয়েছে তখন সে প্রায় কাব্যের সাহচর্য বঞ্চিত। যে সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে রচনা সেখানে আংশিক সার্থক।

উনিশোত্তর এবং যাত্রী এ দুখানি কাব্য-গ্রন্থেই কবি চিত্ত সিংহ একটি অনুসন্ধানী মনের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষভাবে কিছু বলতে চেয়েছেন। সে-বক্তব্য অবশ্য এখনও পর্যন্ত রূপায়নে সার্থক হয়নি। কিন্তু কোন-দিন হবে এমন আশা করা অন্যায় নয়। তবে তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে আর একটু মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাহলে তাঁর কাব্যের প্রতি পাঠককে অবিচার করবার সুযোগ দেবেন।

অক্টোবর মাসের রেকর্ড-গীতি

অক্টোবর মাসে গ্রামোফোন কোম্পানী ২০খানি হিজ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ড বাজারে বাহির করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৮খানি বাঙলা গান ও হাস্যকৌতুকের ও ২খানি যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড। পি ১১৯২৫নং রেকর্ড-খানিতে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে গাহিয়াছেন দুইখানি ধর্মমূলক গান; পি ১১৯২৬নং রেকর্ডে পংকজ মল্লিক ও উৎপলা সেনের দুইখানি আধুনিক বাঙলা গান শোনা যাইবে। রবীন্দ্রসংগীত গাহিয়াছেন পংকজ মল্লিক পি ১১৯২৭নং রেকর্ডে।

এন ৮২৫৭৭ হইতে এন ৮২৫৯১ পর্যন্ত এই ১৫খানি রেকর্ডের মধ্যে তিনখানি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড (এন ৮২৫৭৮—সুচিত্রা মিত্র, এন ৮২৫৮২—সন্তোষ সেনগুপ্ত ও এন ৮২৫৮৯—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়); চারখানি ধর্মমূলক ও কীর্তনের রেকর্ড (এন ৮২৫৮০—অনুপম ঘটক, এন ৮২৫৮৩—যূথিকা রায়, এন ৮২৫৯১—কমলা ঝরিয়া ও এন ৮২৫৮৪—সুপ্রীতি ঘোষ); পাঁচখানি আধুনিক বাঙলা গানের রেকর্ড (এন ৮২৫৮৬—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন ৮২৫৮৭—জগন্ময় মিত্র এন ৮২৫৮৮ মান্না দে এম ৮২৫৯০—উৎপলা সেন ও এন ৮২৫৭৭—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়); একখানি পল্লীগীতির রেকর্ড গাহিয়াছেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় (এন ৮২৫৭৯); রঞ্জিত রায়ের কৌতুক সংগীত (এন ৮২৫৮৫) এবং ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের কৌতুক নক্সা (এন ৮২৫৮১)। যন্ত্রসংগীতের রেকর্ডের (এন ৮৭৫২২) ক্লারিওনেট বাজাইয়াছেন রাজেন সরকার ও (এন ৮৭৫২৩নং রেকর্ডে) বেহালা বাজাইয়াছেন পরিতোষ শীল।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বিশ্বভাষা পরিচয়—যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, গ্রন্থকার কর্তৃক গ্রাম—চটশালবাড়ী, পোঃ শিবপুর, কোচবিহার হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷০। ৪৬৫।৫৩

পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ—চিত্তরঞ্জন দেব, কতকথা, ৬৭—১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৲। ৪৬৬।৫৩

শিশু বড় হয় কি করে—উৎপল হোমরায়, শ্রীঅজিত বর্মণ কর্তৃক ১৫৩, মন্মথ দত্ত রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—আনা। ৪৬৭।৫৩

বিভ্রান্ত বসন্ত—ভবানী নন্দী, মাধব নন্দী কর্তৃক ময়মনসিংহ, পাকিস্থান হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৷৷০ টাকা। ৪৬৮।৫৩

রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়—ক্ষুদিরাম দাস, পুঁথিঘর, ২২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১০৲। ৪৬৯।৫৩

অমর মিলন—ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য কর্তৃক ১, জ ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৷০। ৪৭০।৫৩

চোরকাঁটা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক দীপন, ২৩৫, বি টি রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৲। ৪৭১।৫৩

সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি—আচার্য বিনোবা, সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা। মূল্য—৶০ আনা। ৪৭২।৫৩

পূর্ব ও পশ্চিম—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, এন জি ব্যানার্জি, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৪৭৩।৫৩

প্রাচীন কবির কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, আর কে বসু, ৫৭-এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০। ৪৭৪।৫৩

নেতাজীর জীবনবাদ—অনিল রায়, অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ, ৪৭এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য—১৷০। ৪৭৫।৫৩

অশোকের সময়ের গ্রাম—দুর্গাদাস সরকার, একক প্রকাশনী, ৪৪৬।১ কালীঘাট রোড, কলিকাতা। মূল্য—৷০ আনা। ৪৭৬।৫৩

কঙ্কাল—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৪৭৭।৫৩

নতুন ফসল গৃহকপোতী—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী, সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৪৭৮।৫৩

মুক্তিপথে—হাওয়ার্ড ফাস্ট, অনুবাদক শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী, দাশগুপ্ত ব্রাদার্স, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫৲। ৪৭৯।৫৩

পাঁক—প্রেমেন্দ্র মিত্র, রীডার্স কর্ণার, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০। ৪৮০।৫৩

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে পুস্তক পরিচয় বিভাগে 'এ্যানিম্যাল ফার্ম' গ্রন্থখানির সমালোচনা পাঠে গ্রন্থকার জর্জ অরওয়েল আমেরিকান লেখক এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হইতে পারে। মূল গ্রন্থখানি আমেরিকা হইতে প্রকাশিত কিন্তু লেখক ইংরেজ।

—সম্পাদক দেশ

খেলার মাঠে

ফ্টবল

বাঙলার ফ্টবল খেলার মরস্ম সরকারী-ভাবে শেষ হইয়াছে সত্য কিন্তু আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার সিদ্ধান্ত লইয়া যে অপ্রীতিকর গণ্ডগোল স্ষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হয় নাই। শীঘ্র যে হইবে তাহারও কোন বিশেষ সম্ভাবনা নাই। আশংকা হয় ইহার জের শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াইবে। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা কমিটি বোম্বাইর ইণ্ডিয়া কালচার লীগের প্রতিবাদ বিবেচনা করিয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ১৯৫৪ সালের শেষ পর্যন্ত সাসপেণ্ড করিয়াছে। এমন কি এই দলে পাকিস্থানের যে দ্ইজন খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন তাঁহাদের পর্যন্ত সাসপেণ্ড করিয়াছে। এইর্প শাস্তিম্লক ব্যবস্থা অবলম্বনের য্ক্তি হিসাবে প্রতিযোগিতা কমিটি পাকিস্থানের শাস্তিম্লক ব্যবস্থাধীনের খেলোয়াড়দ্বয়ের শেষ দিনের ফাইন্যালে বিনান্মতিতে ইস্টবেঙ্গল দলে যোগদানের উপরই জোর দিয়াছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ পাকিস্থানের ফ্টবল ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ মালেকের অন্মতিক্রমে খেলোয়াড়দ্বয়কে দলভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া খেলার মাঠেও ঘোষণা করেন ও পরেও তাঁহারা প্রতিযোগিতা কমিটিকে বলেন। এই সময় প্রতিযোগিতা কমিটি ঐ অন্মতির প্রমাণস্বর্প কি দেখাইতে পারেন, জিজ্ঞাসা করিলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ উহা দাখিল করিবেন বলিয়া সময় প্রার্থনা করেন। প্রতিযোগিতা কমিটি ঐ সময় উত্তীর্ণ হইবার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার কিছ্ দিন পরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ পাকিস্থানের ফ্টবল ফেডারেশনের সভাপতির অন্মতিদানস্চক চিঠি আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিয়া প্নর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেন। এই আপীল পেশ হইবার পর সকলেই মনে করেন, আই এফ এ পরিচালকমণ্ডলী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা প্নরায় প্রতিযোগিতা কমিটিকে পাকিস্থান ফ্টবল ফেডারেশনের সভাপতির পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বিবেচনা করিতে অন্রোধ করেন। প্রতিযোগিতা কমিটিও একদিন এই বিষয় আলোচনা করিয়া সভা স্থগিত রাখেন। ইহার পর কবে মিলিত হইবেন ও কবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, কেহই জানে না। এই দিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য যে তোড়জোড় করিতেছিলেন, তাহাতে চরম বাধা স্ষ্টি হয়। তাঁহারা এই বিষয় কিছ্ই স্থির করিতে এখনও পারেন নাই, তবে যতদ্র জানা যায়, ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবেন না বলিয়াই একর্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা না করিয়া উপায় নাই। যোগদান করিবার সময়ও প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। প্রতিযোগিতা কমিটি যের্পভাবে 'ঢিমে তালে' চলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিলে কোনর্প অন্যায় হইবে না যে, তাঁহারাও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারে ইহা চাহেন না। যাহা হউক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ বর্তমান অবস্থায় যে বিশেষ চিন্তিত ও ক্লাবের স্নাম রক্ষার জন্য যে নানার্প জল্পনাকল্পনা করিতেছেন, ইহা বলাই বাহ্ল্য। কেহ কেহ বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ শেষ পর্যন্ত আদালতের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।' ইহা হইলে আশ্চর্যের কিছ্ই হইবে না, তবে খ্বই পরিতাপের বিষয় হইবে। ইহাতে কেবল যে ক্লাবের স্নাম নষ্ট হইবে তাহা নহে, বাঙলার ফ্টবল সম্পর্কে সারা ভারতের ক্রীড়ামোদী বেশ কিছ্টা বিদ্রূপ করিবার স্যোগ পাইবেন। বাঙলার মাঠ সারা ভারতের ফ্টবল খেলার একমাত্র আকর্ষণ স্থল বলিয়া যাহা আমরা বহ্ সময় গর্ব করিয়া থাকি তাহা চিরতরে নষ্ট হইবে। এইজন্যই আমাদের মনে হয়, সামান্য বিষয়ের জের দীর্ঘ দ্র না টানিয়া উভয়ের মিলিত আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া যদি অবসান করা এখনও সম্ভব হয়, তাহা হইলে করা উচিত। ইহাতে কতকগ্লি লোক বিশেষ বা একটি ক্লাবের দ্র্নাম হইবে তাহা নহে, বাঙালী জাতির চরম কলংকের বিষয় হইবে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

ভারতীয় ফ্টবল দলের সাফল্য

রেঙ্গ্ণে অন্ষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গ্লার ফ্টবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফ্টবল দল সাফল্যলাভ করিয়াছে। ইহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে কি স্তরের ফ্টবল দলসম্হের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ভারতীয় দল এই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে স্মরণ করিলে উল্লাস করিবার কিছ্ই থাকে না। ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতায় শক্তিহীন পাকিস্থান দলের সহিত খেলিয়া কোনর্পে ১—০ গোলে বিজয়ী হইয়াছে। এই জয়লাভ যে নেহাৎ সৌভাগ্যবলে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পরবর্তী প্রদর্শনী খেলাতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতকে ঐ খেলায় ঠিক ১—০ গোলেই পাকিস্থানের নিকট পরাজয়বরণ করিতে হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অপর দলের মধ্যে সিংহল ছিল। ঐ দেশের ফ্টবল খেলাকে বাঙলার চতুর্থ শ্রেণীর সমপর্যায় করা চলে। সেইর্প এক নিম্ন স্তরের দলের সহিত খেলিয়া ভারত মাত্র ২—০ গোলে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সেই হিসাবে পাকিস্থান দলের প্রশংসা করিতে হয় যে, তাহারা সিংহলকে শোচনীয়ভাবে ৬—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। প্রতিযোগিতার চতুর্থ দল বর্তমান প্রতিযোগিতায় উদ্যোগী বর্মা দল। একদিন বর্মার ফ্টবল খেলায় খ্যাতি ছিল, কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বৎসরের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গাফিলতির জন্য এই দেশের খেলাধ্লার মান একেবারেই খ্বই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। এইর্প এক ভাঙ্গা দলের সহিত খেলিয়া ভারত ৪—২ গোলে বিজয়ী হইয়াছে। স্তরাং সকল বিষয় চিন্তা করিয়া বলা চলে, ভারতীয় ফ্টবল দলের এই সাফল্যে আনন্দ করা চলে, উল্লাস করা চলে না।

ভারতীয় দলে শাস্তিম্লক ব্যবস্থাধীনের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়দের খেলিতে দেখিয়া পাকিস্থানের ফ্টবল পরিচালকগণ একট্ চঞ্চল হইয়াছিলেন ও তাঁহারা এই বিষয় আন্তর্জাতিক ফ্টবল ফেডারেশনের দৃষ্টিগোচর করিবেন বলিয়াও স্থির করিয়াছেন এইর্প সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে দ্বঃখের বিষয়। কারণ ইহা ঠিক যখন একটি দলকে শাস্তিম্লক ব্যবস্থাধীনে রাখা হয়, তখন ঐ ব্যবস্থা দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের উপরও প্রযোজ্য। এইর্প অবস্থায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোন খেলোয়াড়কেই দলভুক্ত করা ভারতীয় ফ্টবল ফেডারেশনের পক্ষে য্ক্তিয্ক্ত হয় নাই। আর দলভুক্ত না করিলেও ভারতীয় দলের কোন ক্ষতি হইত না। এই সকল ঘটনা উপলক্ষ করিলে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, ভারতীয় ফ্টবল ফেডারেশনের কোন বিশেষ পাণ্ডার অদ্রদর্শিতার জন্যই কলিকাতার মাঠের যতকিছ্ গণ্ডগোল আন্তর্জাতিক ফ্টবল ফেডারেশন পর্যন্ত গড়াইয়াছে ও এই ক্ষেত্রেও তাহার জন্যই ভারতীয় দলকে কোয়াড্রাঙ্গ্লার ফ্টবল প্রতিযোগিতার সময়েও পাকিস্থানী ফ্টবল পরিচালকদের নিকট হীন প্রতিপন্ন হইতে হইয়াছে। এই পাণ্ডাকে এই সকল গ্রভার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেই অন্রোধ করিব। এই সকল বিষয় প্রকৃষ্ট অযোগ্যতার পরিচায়ক ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১৯৫১ সাল হইতে সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম বৎসরে ভারত ও পাকিস্থান উভয় দলকেই য্ক্ত বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এইবারে ভারত বিজয়ীর সম্মান ও পাকিস্থান রানার্স-আপ হইয়াছে। নিম্নে এইবারের কোয়াড্রাঙ্গ্লার ফ্টবল প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

ভারত	৩	৩	০	০	৭	২	৬
পাকিস্থান	৩	১	১	১	৭	২	৩
বর্মা	৩	১	১	১	৬	৭	৩
সিংহল	৩	০	০	৩	২	১১	০

ট্রামে-বাসে

প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রার উপর বোমা নিক্ষেপের ফলে দুই দলের বিরাট জনতার মধ্যে একটি সঙ্ঘর্ষের সংবাদ আমরা পূজার অব্যবহিত পরেই পাইয়াছি।—"সর্বজনীন পূজার ব্যাপারে এরকম একটা সর্বজনীন হানাহানি না হলে যে অঙ্গহানি হয়"—বিশুখুড়ো মুখখানা বিকৃত করিয়া মন্তব্য করিলেন।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের সভ্যগণ সেবাব্রতের একটি মহান্ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী।—"বিশ্বকর্মার পুত্র বা উত্তরাধিকারীদের ইতিহাস যাঁদের জানা আছে তাঁরা নেহরুজীর উক্তিতে নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

নেহরুজী অন্যত্র বলিয়াছেন যে, শুধু হস্ত ও পদ বৃদ্ধিতেই হয় না, ঐ সঙ্গে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি না হইলে প্রকৃত উন্নতি বলা চলে না। খুড়ো বলিলেন—"হাতের কথা জানা থাকলেও বলব না, তবে পদবৃদ্ধিতে উন্নতি হয় না, পণ্ডিতজীর এই মতের সঙ্গে সায় দিতে পারলাম না। পদবৃদ্ধির ভেল্কিতে শুধু উন্নতি নয়, সাপের পাঁচ পা পর্যন্ত দেখা যায়"!!

* * *

যুদ্ধের পূর্বে সরকারী দপ্তরে কর্মনিরত চাপরাশির সংখ্যা ছিল তিন হাজার দুই শত, বর্তমানে তাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে উনিশ হাজারে।—"ভারতের মান মর্যাদা সম্বন্ধে এর পরেও যদি কারু মনে কোন সন্দেহ থাকে তাহ'লে বলতে হয় ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ"—মন্তব্য করেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

উত্তরপ্রদেশ বোর্ডের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য একশত পঁয়ষট্টি জন ছাত্র-ছাত্রীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।—"অনেকে বলে থাকেন, উত্তরপ্রদেশ মানেই ভারত, সুতরাং বলা যায়—দেখ বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব ভারতের মানচিত্র"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পাক্-শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে জনাব আলির ফরমুলা নাকি পূর্ব পাকিস্থানীরা গ্রহণ করেন নাই।—"তার কারণ তাঁরা পান্তা ভাত আর বেগুন-পোড়াকে ঠাণ্ডি পিলাও ঔর বাইগন কা কোপ্তা বলতে এখনও শেখেন নি, এদের পাক-প্রণালী একটু অন্য ধরণের"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

পূর্ব পাক-সরকার পাঁচ লক্ষ মণ ভারতীয় লবণ আমদানীর লাইসেন্স দিয়াছেন। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিল—"এই লাইসেন্সের একটি সর্তে বলা আছে—'প্রকাশ থাকে, নুন খাওয়ার পর গুণ গাওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবেক না'—।"

* * *

পাঁচশালা পরিকল্পনাকে লোকপ্রিয় করিবার জন্য নাকি নানারকম নৃত্য ও নাটকাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং শুনিলাম, ইহার জন্য সরকার আটত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।—"নাটক ফেল্ করলে চিত্রতারকাদের ক্রিকেট বা ফুটবলের ব্যবস্থা করে দেখতে পারেন। সর্বশেষে হাতের পাঁচ হিসেবে মন্ত্রীদের কথক-নৃত্য"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান, ফিনান্স কমিটির সদস্য এবং স্টেডিয়াম কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, স্টেডিয়াম অপেক্ষা অনেক জরুরী এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় বর্তমানে কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন আছে।—"আমরা জানি, ষণ্ড বিদায় পর্ব এখনো শেষ হয়নি"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বাঙ্গালোর মুল বাগাল তালুকের অধিবাসীদের একটি স্বপ্ন আজ পঞ্চাশ বছর পর সফল হইয়াছে। তাহারা বিশ্বাস করে যে, ঐ তালুকের "তৈলুর আমানি" নামক পুষ্করিণীর জল যেদিন উপ্‌চাইয়া পড়িবে সেইদিন ঐ অঞ্চলে আধ সের চাউল মাত্র এক পাই মূল্যে বিক্রীত হইবে। সম্প্রতি একদিন তৈলুর আমানির জল উপ্‌চাইয়া পড়িয়াছে এবং অধিবাসীরা দলে দলে পাই পয়সা সংগ্রহ করিয়া উক্ত অবিশ্বাস্য মূল্যে চাউল খরিদ করিয়াছে। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"তারা ভাগ্যবান তাই স্বপ্ন সফল হয়েছে। আমাদের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়নি, তাই আমাদের ঘরে ঘরে শুধু আমানির জলের প্লাবন"!!!

* * *

এবার দেওয়ালি উৎসবে যে-যে বাজি পোড়ানো যাইবে না তার একটা ফিরিস্তি দিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনার একটি নোটিশ দিয়াছেন।—"দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচবার পক্ষে নিষেধাজ্ঞাটি সত্যি প্রশংসনীয়। তবে ছুঁচোবাজিটা নিষেধের আওতায় না নিয়ে এলেই হয়ত ভালো হতো, কেননা, ছুঁচো-বাজি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ইংলণ্ডের "বিবাহিতা মহিলা সমিতি" এক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন যে, সরকারকে আইন প্রণয়নের জন্য অনুরোধ করা হউক, যার অনুবলে প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীকে মাসে মাসে কিছু "পকেট মানি" দিতে বাধ্য থাকেন। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"এ ব্যাপারে আমাদেরও সমর্থন আছে। মাসে মাসে পকেট কাটতে দেওয়ার চেয়ে আইন-নির্দিষ্ট একটা অঙ্ক দিয়ে দেওয়াই ভালো"।

* * *

বাংলার ভূতপূর্ব গভর্নর কেসী সাহেব বলিয়াছেন যে, ভারতে নাকি লালের প্রাধান্য নাই।—"তিনি অত্যন্ত ভুল বলেছেন, জহরলাল, গুলজারিলাল, লালবাহাদুর থেকে শুরু ক'রে মায় লাল কেল্লা, লাল ফিতে পর্যন্ত আমাদের সব লালে লাল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

দেশের প্রায় যাবতীয় স্কুল, কলেজ, সওদাগরী অফিস, সরকারী দপ্তর, সেনা বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং শত সহস্র ক্লাব, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিক দল, নাচগানের শিক্ষালয় বছরে দু'একবার কোন একটা উপলক্ষ্য ধ'রে নাটক অভিনয় করেই। একেবারে শিশু থেকে প্রবীণ বৃদ্ধেরাও এইসব অভিনয়ে যোগদান করেন। নাটকের ওপরে বাঙলার লোকের যে একাগ্র টান দেখা যায় আর কিছুর ওপরে অতটা তা আছে কি না সন্দেহ। সমগ্র জাতিই এমন নাটকপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও, বিস্ময়ের বিষয়, কলকাতার মাত্র চারটে স্থায়ী পেশাদার মঞ্চও চলছে না। তার কারণ অবশ্য অনেক; কিন্তু নাট্যগৃহগুলির জরাজীর্ণ চেহারা যে একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একে তো এমনি অবস্থা যে প্রেক্ষাগৃহের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ইচ্ছে যায় না, তার ওপর ভেতরেও আরাম পাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। অথচ নাট্যালয়ের চেয়ে যথেষ্ট কম খরচ ক'রে চিত্রগৃহগুলিতে গিয়ে বসার কতোই না আরামের ব্যবস্থা রয়েছে। নাটক ভালো অভিনীত হ'চ্ছে শুনলেই বাঙালী মাত্রেরই দেখতে যাবার জন্য মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, কিন্তু নাট্যালয়ের পরিবেশ, বসবার ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা মনে হ'লেই অতি আগ্রহী নাট্যামোদীরও মন অনেকটা বিরূপ হ'য়ে ওঠে। পেশাদার মঞ্চগুলির দর্শক আকর্ষণ করার ক্ষমতা এজন্যে অনেকখানিই নিষ্প্রভ। এতোদিন পর এটা সম্প্রতি উপলব্ধি করেছেন স্টার থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র। কলকাতার প্রাচীনতম নাট্যগৃহ এই স্টার থিয়েটার, তাছাড়া এর একটা স্বতন্ত্র ঐতিহ্য রয়েছে। গিরিশচন্দ্রের অমর

দুখানি নতুন নাটক

দু'খানি নতুন নাটক আরম্ভ হয়েছে পুজোর মুখে; দু'খানির নাম প্রায় এক —রঙমহলে "শ্যামলীর স্বপ্ন" এবং স্টার থিয়েটারে "শ্যামলী"। দু'খানিরই আখ্যানবস্তু গ্রহণ করা হ'য়েছে প্রখ্যাত উপন্যাস থেকে। প্রথমখানি প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস থেকে এবং দ্বিতীয়খানি নিরুপমা দেবীর। "শ্যামলীর স্বপ্ন"-কে প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় বহুকাল আগে তৎকালে রঙমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সতু সেনকে ওরই নাট্যরূপ প্রণয়ন ক'রে দেন। নাটকখানি সেদিন মঞ্চস্থ হবার কয়েকদিন পর শ্রী সান্যাল আমাদের জানান যে, রঙমহলে যা মঞ্চস্থ হ'চ্ছে সেটার সঙ্গে তাঁর লেখা নাটকখানির অনেক অমিল আছে এবং তিনি একথাও জানান, অভিনীত নাটকখানি, বলতে গেলে, দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের সৃষ্টি এবং তিনি কর্তৃপক্ষকে তাঁর আপত্তি জানিয়েছেন ঐভাবে মঞ্চস্থ হবার জন্য। কিন্তু পরে পত্রান্তরে নাটকখানির সঙ্গে শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের নাম যুক্ত দেখে শ্রী সান্যাল তারও প্রতিবাদ ক'রে পত্র দেন এই বলে যে, নাটকখানি তাঁরই লেখা। এর পর অবশ্য বিজ্ঞাপনেও নাটকখানির রচয়িতা হিসেবে শ্রী সান্যালেরই নাম প্রকাশিত হ'চ্ছে এবং তা নিয়ে আর যখন কোন কথা ওঠেনি তখন ধ'রে নিতে হবে যে, "শ্যামলীর স্বপ্ন" যা মঞ্চস্থ হ'য়ে চলেছে তা শ্রী স্যান্যালেরই রচিত নাটক। স্টারের "শ্যামলী" নিরুপমা দেবীর ঐ নামেরই উপন্যাস থেকে গল্পের কাঠামোটা নিয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকখানি গঠন করেছেন। গল্পের আঙ্গিকেও অনেক পরিবর্তন সাধিত হ'লেও বক্তব্যটা একই আছে।

* * *

"শ্যামলী" মঞ্চস্থ হওয়াটা কলকাতার নাট্যমহলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ থেকে নাট্যালয়ের একটা নতুন অধ্যায়ই সূচিত হ'লো বলা যায়। নাটক দেখবার লোক এবং নাটককে ভালোবাসে, অন্তত বাঙলা দেশে, তাদের সংখ্যা চলচ্চিত্রামোদীদের চেয়েও বেশী ব'লে বেশ বুঝতে পারা যায়। সমস্ত বাঙলা

নাট্যপ্রতিভার এই মঞ্চেই স্ফুরণ হয়; এই নাট্যালয়েই অভিনয় দেখার জন্য পায়ের ধুলো রেখে গিয়েছেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তারপর থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত স্টার থিয়েটারের নাট্যকীর্তির তালিকা দীর্ঘ হয়েছে। এমন কি, এখনকার পড়তী দিনেও ব্যবসার দিক্ থেকে যা কিছু সাফল্য বলতে গেলে কেবল স্টার থিয়েটারই অর্জন ক'রে চলছিল। কিন্তু এইভাবে কোন রকমে গড়িয়ে দিন গুনে যাওয়ার অর্থ হয় না। সত্ত্বাধিকারী শ্রী মিত্র তা উপলব্ধি করলেন এবং মঞ্চটিকে নতুন-ভাবে ঢেলে সাজাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কয়েক মাস অভিনয় বন্ধ ক'রে রাখতে হয়। এবং তারপর এখন থিয়েটারটি একেবারে ভোল পাল্টে নতুন চেহারা নিয়ে পুনরায় চ'লতে আরম্ভ করেছে। নাট্যগৃহটির ভিতর ও বাইরে আমূল সংস্কার করা হয়েছে; নতুন ক'রে বসবার আসনগুলিকে আরামপ্রদ ক'রে তোলা হয়েছে; দর্শকদের অন্যান্য অসুবিধারও অনেকগুলিই দূর করা হ'য়েছে। ওদিকে আবার ঘূর্ণায়মান মঞ্চ খাটিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং অন্দরে শিল্পী ও কুশলীদেরও আরাম ও সুবিধার জন্য পরিপাটি ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়েছে। সেট সেটিং সিনও সব আনকোরা নতুন। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কলাকুশলী ও শিল্পীদের সঙ্গে নতুন ও উদীয়মানদের সমাবেশ ঘটিয়ে দল বাঁধা হয়েছে। মোট কথা, স্টার থিয়েটারে গেলে সর্ববিষয়েই একটা বিরাট্ পরি-বর্তন কারুরই দৃষ্টি ও অনুভূতি এড়াতে পারবে না। আর এ পরিবর্তন বাঙলার পেশাদার মঞ্চকে নতুন আশায় ভরিয়ে দিয়েছে, একটা উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এমন একটা জোর পাওয়া গিয়েছে, যাতে মনে করা যায় যে, বাঙলার মঞ্চ আবার ভালোভাবে বেঁচে থাকবার একটা ভরসা পেয়ে গেছে।

* * *

গৃহ সংস্কারের সঙ্গে সত্ত্বাধিকারী সলিল মিত্র নাট্যালয়টি চালাবার জন্যেও এমন কলাকুশলী ও শিল্পীদের ওপরে ভার দিয়েছেন যাদের ওপরে দর্শকদের আস্থাও আছে, আকর্ষণও আছে। প্রথমে উল্লেখ করা যায় পরিচালকদ্বয় শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্রের নাম। এ'রা দু'জনে এক সময়ে রঙমহল থিয়েটারের ভার নিয়ে বাঙলার নাট্যালয়ে একটা নতুন যুগই এনে দিয়েছিলেন। ঠিক সে সময়েও মঞ্চের অবস্থা এখনকার মতো জীর্ণ ও নিষ্প্রভ। এ'রা দু'জনে সতু সেনকে সঙ্গে নিয়ে বাঙলার মঞ্চে আবার প্রাণ ফিরিয়ে এনে দিতে সক্ষম হন। এবারেও এ'দের সঙ্গে কুশলী সতু সেন রয়েছেন। শিল্পীদের মধ্যে পুরোভাগে রয়েছেন বাঙলার মঞ্চ ও পর্দার অতি-জনপ্রিয়দের অন্যতম জহর গাঙ্গুলী, সরযূবালা এবং সেই সঙ্গে মঞ্চের প্রবীণ শিল্পিবৃন্দ রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। নবীনদের মধ্যে হাল আমলে জনপ্রিয় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও শ্যাম লাহার সঙ্গে অনুপকুমার, রমা দেবী, শেফালি দত্ত, কল্যাণী দাস, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি অনেকেই রয়েছেন। এ'রা ছাড়া, সৌখীন নাট্যাভি-নয়ে কৃতিদের মধ্যে থেকেও বেছে নেওয়া শিল্পী আছেন জনকয়েক।

* * *

সবকিছু সম্পন্ন করতে প্রায় ষাট হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে এবং বাজারের অবস্থার কথা ভাবলে সলিল মিত্র একটা দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়েছেন বলতে পারা যায়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী ঝুঁকি তিনি নিয়েছেন পুনরুদ্বোধনের জন্য এমন একখানি নাটক নির্বাচন ক'রে যার নায়িকার মুখে কোন কথা নেই—একেবারেই বোবা ও কালা। বাঙলা দেশে বাঙলী দর্শকদের সামনে বাঙলা নাটকে নায়িকা নির্বাক এমন অভাবনীয় ব্যাপার মঞ্চেতে ঘটিয়ে তোলার সাহস আগে কারুর হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু মঞ্চস্থ হবার পর দেখা যাচ্ছে, নায়িকার মুখে কথা না থাকুক, নাটকখানি নাট্যামোদী দর্শকদের বেশ মুখর ক'রে তুলেছে।

* * *

নায়িকার চরিত্রটি ছাড়া "শ্যামলী" নাটকখানির চেহারায় আর কিছু অভিনবত্ব নেই, বা একটা যুগান্তকারী সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃত হবার মতো জোরও নেই। কিন্তু নাট্যগৃহের নব পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মতো সম্পদ-শালী চেহারা তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের বাহাদুরী হ'চ্ছে বিরাট কাহিনীটি থেকে নাট্যরস জমিয়ে তোলার পক্ষে যথাযথ নাটকেন্দ্রটি বেছে নিয়ে সেইভাবে গল্পটি সাজিয়ে দিতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তিন অঙ্কে ষোলটি দৃশ্যের নাটকখানির প্রথম অভিনয় প্রায় ঘণ্টা চারেকের মতো দীর্ঘ হ'য়ে
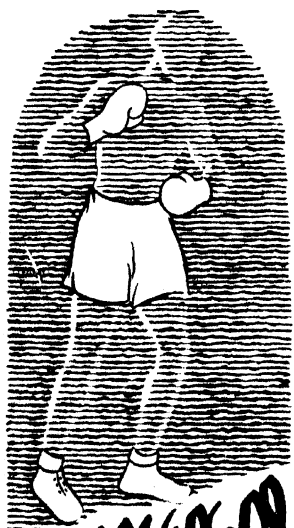
দাঁড়ায়, পরে কাটছাঁট ক'রে এখন আড়াই ঘণ্টাতে ছোট ক'রে আনা হয়েছে। তবুও কোন কোন দৃশ্যে নাটকের বাঁধুনি কিছুটা আলগা লাগে, কিন্তু সমস্তটুকু ধ'রে নাটকখানি বেশ একটি আবেগপূর্ণ সৃষ্টি ব'লে প্রশংসিত হবে; অভিনয় সফল হয়ে ওঠাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতির একটি সৃষ্টি-ব্যতিক্রম যা পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে, তাকে মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে চলবার জন্যে একদিকে মমতাপন্নদের দরদী প্রচেষ্টা, আর অপরদিকে সেই সৃষ্টিকে জীবন থেকে বাতিল করে দেবার জন্য সহানুভূতিহীন নির্দয় জনের অভিপ্রায় এই নিয়েই "শ্যামলী"-র গল্প। বোবা ও কালা মেয়ে শ্যামলীর ছোট বোন বিজলীর বিবাহের আয়োজন হলো। কিন্তু সমাজপতিরা বেঁকে দাঁড়ালেন এই বলে যে বড়োর বিয়ে না দিয়ে ছোটর বিয়ে দেওয়া তারা বরদাস্ত করবেন না। শ্যামলীর নিরুপায় পিতা পিতাম্বর এই প্রতিবন্ধকটা ঘোচাবার একটা উপায় ঠিক করলেন। নির্বাচিত পাত্র অনিলের সঙ্গে তিনি আগে শ্যামলীর বিবাহ কোনরকমে গোপনে তাড়াহুড়ো করে সেরে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার অনিলের সঙ্গে বিজলীর আচারসম্মতভাবে বিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু শ্যামলীর সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হতে না হতেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেলো। বরপক্ষের কাছে পিতাম্বর যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে লাগলেন। অনিল তা সইতে পারলে না, দাদু তারিণীচরণের সম্মতি নিয়ে সে জানিয়ে দিলে যে, যার হাতে হাত রেখে সে মন্ত্রপাঠ করেছে তাকেই সে পত্নীত্বে বরণ করে নিয়েছে, তাকেই সে গ্রহণ করবে। বিজলীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হলো অনিলের বন্ধু শিশিরের সঙ্গে। অনিলের মা সরলার পুত্রবধূ সম্পর্কে যা কিছু আশা ছিলো বোবা কালা শ্যামলীকে বিয়ে করে আনাতে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। সরলা অমন বৌকে নিয়ে ঘর করতে চাইলেন না। তিনি পুনরায় অনিলের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু অনিল বেঁকে দাঁড়ালো; অনিলের সান্ত্বনা তার দাদু তারিণীচরণ। সরলার দারুণ অশান্তি; মাতাপুত্রে একটা বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে উঠলো। এমনি মুহূর্তে মনটাকে কিছু সারিয়ে নিয়ে আসার জন্যে মাকে নিয়ে কিছুদিন তীর্থভ্রমন করে আসার জন্য দাদু অনিলকে পরামর্শ দিলেন। ভ্রমন করতে করতে সরলা হরিদ্বারের কাছে আশ্রমবাসী এক দম্পতির অনূঢ়া কন্যা রেবাকে পেলেন। সরলা তার ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিলেন। ফেরার সময় সরলা রেবাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। পথে অনিল বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। বাড়িতে আসার পর অনিল রেবার অক্লান্ত পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর সরলা তার মনের ইচ্ছাকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে গেলেন, তিনি অনিলের সঙ্গে রেবার বিয়ের ব্যবস্থায় মন দিলেন। কিন্তু বাধা এলো রেবার দিক থেকে; সরলার আশ্রয় ছেড়ে সে চলে যেতে চাইলে। ওদিকে অনিল শ্যামলীর মা মারা যাবার খবর পেলো;

অসহায় শ্যামলীর জন্যে অনিল বিচলিত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। শিশিরকে দিয়ে সে শ্যামলীকে নিয়ে হাজির করলে। একটা দারুণ উদ্বেগ; সরলা শ্যামলীকে গ্রহণ না করলে অনিলের সংগে হয়তো চিরবিচ্ছেদ ঘটে যাবে। কিন্তু তা হলো না; শ্যামলীর অমন সরলতা মাখানো চেহারা আর অসহায় দৃষ্টি সরলার মাতৃ-হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুললে। সরলা শ্যামলীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

* * *

সোজাসুজিভাবে দেখলে এই গল্প, গল্পের ঘটনা এবং যে ধরণের সব চরিত্র রয়েছে তা পুরণো আমলের বলে মনে হবে। এখন আর যেন এসব চলে না। কিন্তু গল্পের মধ্যে এমন একটা মানবিক দিক জড়িয়ে রয়েছে যার আবেদনকে মন থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। শ্যামলীর মতো অমন একটা অসহায় চরিত্রের ওপরে কার না দরদ উথলে উঠবে! আর দর্শকদের দরদীমনকে আরও আবিষ্ট করে তোলে চরিত্রটিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। সাবিত্রীর বহুমুখী প্রতিভার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এই চরিত্রাভিনয়টি। মুখে একটিও কথা নেই, এবং সংগের চরিত্রগুলি মুখর হলেও তাকে দেখাতে হচ্ছে যে সে কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছে না, এমনি অবস্থার মধ্যে দিয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র আঙ্গিক অভিব্যক্তির সাহায্যে তাকে দর্শকমনে আধিপত্য করে নিতে হয়েছে—বড়ো সহজ কৃতিত্ব নয় সেটা। সমগ্র প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে একটিও মনকে তিনি অমরমী থাকতে দেন না। আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিনয়কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অনিলের ভূমিকায় উত্তমকুমার। নিয়মিতভাবে পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করা তার এই প্রথম; সখের দলের হয়ে মাঝে মাঝে মঞ্চে অবতরণ করার অভিজ্ঞতা তার থাকলেও প্রধানতঃ পর্দার অভিনয় নিয়েই তিনি আছেন। কিন্তু এখানে অভিনয়ে তিনি দেখালেন যে, পর্দার চেয়ে মঞ্চাভিনয়েই তিনি বেশী কৃতি। প্রধানত তাঁর অভিনয় গুণেই শ্যামলীর সংগে বিবাহের দৃশ্যটি ইদানীংকালের মধ্যে একটি অতি স্মরণীয় নাটকীয় সৃষ্টিতে পরিণত হতে পেরেছে। জহর গাঙ্গুলী এতে অবতরণ করেছেন বৃদ্ধ রসিক দাদু তারিণীচরণের ভূমিকায়। নাতিদের প্রেমের মর্ম বোঝাবার জন্য ওর মুখের একখানি গান নাটকখানির একটি বিশেষ উজ্জ্বল অংশ। ম সরলার চরিত্রে সরযূবালা একটা ব্যক্তি এনে দিয়েছেন, কিন্তু অভিনয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রচিত্রণের আতিশয্য এ পড়েছে। রেবার চরিত্রে রমা দেবী প্রশংস পাবার মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অনিলের ছোট ভাইয়ের চরিত্রে অনুপ কুমার দাদুর সংগে দাবা খেলার একা দৃশ্যকে বেশ উপভোগ্য করে তুলেছেন শ্যামলীর পিতার ভূমিকায় রবি রায়কে ভালো লাগবে। শিশিরের চরিত্রটিকে মিহির ভট্টাচার্য মানিয়ে নিয়েছেন এ পর্যন্ত। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যা লাহা, কৃষ্ণধন প্রভৃতিকে বিয়ের দৃশে সমাজপতিরূপে ঝগড়া পাকাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা থাকা দৃশ্যটির জৌলুষ ও মনোজ্ঞতা নিঃসন্দে বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ওদের ঐটুকু অংশে জন্য নামিয়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক নয় এযেন ওদের জনপ্রিয়তার সুযোগ নি কোনক্রমে ভূমিকালিপিতে নামটু ব্যবহার করা। কনে সাজাবার দৃশ্যে এ খানি গানও ভালো লাগবে—রচনা, স ও গাওয়া সবদিক থেকেই। গান রচ করেছেন শৈলেন রায় এবং সুর দিয়েছে দুর্গা সেন। সমস্ত দিক মিলি "শ্যামলী" অনেকদিন পর বেশ আরা পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে বসে না সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটসমন্বিত বেশ তৃ পাবার মতো একটি নাট্যসৃষ্টি হ পেরেছে। "শ্যামলী"-র সাফল্য কলকাত নাট্যালয়ে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার ক বলে আশা করা যায়।

* * *

রঙমহলের "শ্যামলীর স্বপ্ন" না খানিও শিল্প কৃতিত্বের দিক থেকে একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টি। নাটকখানি প চালনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। এখা অভিনয়ে মঞ্চ ও পর্দার শিল্পীদের সমাবেশ। খুব নামকরাদের মধ্যে না থাকলেও সুপরিচালনায় অভি চমৎকার সংঘবদ্ধতা গড়ে উঠে নাটকখানির একটি বিশেষ জোর সংলাপের ভাবটি, মনকে আগা সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করে রেখে দেয়।

গল্পের সঙ্গে সংলাপের সম্পর্কটা খুব নিবিড় নয়। গল্পকে পুষ্ট করার জন্য যতোটা দরকার তার চেয়েও বেশী বলা হয়েছে—যেন বলার জন্যই কথার সৃষ্টি, কাজ পাকিয়ে তোলার জন্য বা ঘটনাকে টেনে এনে দেবার জন্য সংলাপ নয়। কথাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর চরিত্রগুলি সরে গিয়েছে পিছনে পশ্চাদপটের গায়ে। তাই দেখা যায়, যাকে নিয়ে গল্প সেই শ্যামলীকে নাটক আরম্ভ হবার চারটে দৃশ্য শেষ করে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের আগে হাজির করা যায়নি। কারণ তার আগে অনেক কথার অবতারণা করে নিতে হয়েছে। তাছাড়া নাটকখানি যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তাতে এর প্রধান চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যার নামে নাটক তার বদলে গল্পের নায়ক সুধাংশু। গল্পেরও ঝোঁকটা পড়েছে সুধাংশুরই ওপরে। বাঙালী ধনী ব্যবসাদাররূপে সুধাংশুর খ্যাতি; টাকাটাই শুধু সে বোঝে। একটা বড়ো কণ্ট্রাক্ট পাবার সুযোগ ঘটিয়ে নেবার জন্য সুধাংশু তার বন্ধু ও তারই প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ নরেনের সঙ্গে এক বেশ্যালয়ে যায় কর্পোরেশনের এক কর্মকর্তাকে বাগিয়ে নেবার জন্য। এই সূত্রে বারবণিতা নীনার সঙ্গে নরেন সুধাংশুর আলাপ করিয়ে দেয়। নীনা সুধাংশুকে নিজের করে নিতে গেলে সুধাংশু তার দম্ভকে আহত করে প্রত্যাখ্যান করে। নীনা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে কিন্তু কার্যত তাকেই সুধাংশুর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। সুধাংশু নীনাকে তার ভগিনী বলে সম্বোধন করে। এরপর নীনার পরিবর্তন দেখা দেয় এবং পরিশেষে নীনাকে গ্রহণ করে নরেন, অবশ্য নরেন আগে থেকেই নীনার প্রতি আকৃষ্ট ছিলো। গল্পের অন্য দিকটা শ্যামলীকে নিয়ে। সুধাংশু নীনার বাড়ীতেই আকস্মিকভাবে শ্যামলীর দেখা পায় এবং ওর কীর্তন গান শুনে মুগ্ধ হয়। সুধাংশু চাইলে শ্যামলীকে ঐ নোংরা জায়গা থেকে উদ্ধার করে তার প্রতিভার যোগ্য সম্মান লাভের সুযোগ করে দিতে। কিন্তু তাতে প্রতিবন্ধক হলো শ্যামলীর আত্মাগত বিনয়। বিনয় শ্যামলীকে লুকিয়ে রেখে সুধাংশুর কাছ থেকে টাকা আদায় করে চলে। ওদিকে বাড়িতে সুধাংশুর আচরণের জন্য স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হলো, আর এই বিরোধে ইন্ধন জুগিয়ে যেতে লাগলেন পদ্মাবতীর মা সুরবালা। সুরবালা মাঝে মাঝে আবির্ভূতা হয়ে কন্যার কাছে সুধাংশুর বারবণিতা নিয়ে মাতামাতির খবর এনে পোঁছে দিতে থাকেন। সুধাংশু আগেই মদ্যপ ছিল, কাজেই আস্তে আস্তে পদ্মাবতীর মনও শ্যামলী ও সুধাংশু সম্পর্কে শোনা কথা বিশ্বাসে দাঁড়ালো। সুধাংশু শ্যামলীর সন্ধান পেয়ে তাকে এক আশ্রমে ভর্তি করে দিলে। শ্যামলী আশ্রমে থেকে স্বামীজীর সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে যাবার উদ্যোগ করলে। ঠিক এমনি মুহূর্তেই পদ্মাবতীও এলো আশ্রমে শ্যামলীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্যে এবং সেখানেই সে শ্যামলীর এবং তার স্বামীর মহত্বের পরিচয় লাভ করলে।

* * *

ভালো করে গোছনো সুন্দর শব্দ-সমন্বিত শুনতে চমৎকার সংলাপই এই নাটকের সার। পতিতাদের উদ্ধার করে সমাজে ঠাঁই করে দেওয়াই হয়তো গল্পের উদ্দেশ্য কিন্তু কথার আড়ালে সে উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বসে বসে শুনে যেতে বেশ ভালো লাগবে, পরিবেশন পারিপাট্যও মনকে খুসী করবে এবং সেই সঙ্গে ভালো লাগবে অভিনয়ের দিকটা আর ক'খানি গান।

দেশী সংবাদ

২৩শে অক্টোবর—অ্যানাসিন ও সারিডন নামক দুইটি ঔষধ জাল করিবার অভিযোগে গত ১৪ই অক্টোবর মাদ্রাজের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সলোমন নামক এক ব্যক্তিকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য সাংবাদিকদের জানান যে, আগামী বৎসর পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সরকারী হিসাব অনুসারে এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ৪৪ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইবে। এই রাজ্যের বাৎসরিক চাহিদা হইতেছে উৎপাদনের পরিমাণ কোন বৎসর এত বেশী হয় নাই।

কারবার গুটানো ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা যাহাতে দ্রুত টাকা ফিরিয়া পাইতে পারে তজ্জন্য অদ্য রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইবার পদ্ধতি ত্বরান্বিত করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য বোনাস সম্পর্কে এক বিবৃতিতে শ্রমিকদের অসন্তোষের কারণ দূর করার জন্য বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার মত ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী ২৯তম অধিবেশন অদ্য উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়। বাঙলার বাহিরে বাঙলাভাষী জনগণ যাহাতে তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন সাধন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে অধিকতর সুযোগদানের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসমূহের সরকারগণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া সম্মেলনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নয়াদিল্লীতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা আন্তঃরাজ্য সম্মেলনে কলিকাতা, পাটনা ও গয়া পর্যন্ত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসারের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

২৮শে অক্টোবর—আঞ্চলিক বাহিনী দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় এক বাণীতে যুবকদিগকে আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগদান করিতে ও কঠোর সংগ্রাম-লব্ধ স্বাধীনতার ভিত্তি দৃঢ় করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন।

ভারতের পুনর্বাসন মন্ত্রী পাকিস্থানের পুনর্বাসন মন্ত্রীকে এক পত্রে জানাইয়াছেন, ১৯৪৯ সালের করাচী চুক্তি ভঙ্গের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কে দায়ী তাহা নির্ধারণের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের বাহিরে কোন ব্যক্তিকে অথবা কোন সংস্থাকে অনুরোধ করা যাইতে পারে। দুই রাষ্ট্রের সরকার একমত হইয়া কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার উপর এই কার্যের ভার দিতে পারেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৯শে অক্টোবর—আজ পাকিস্থান গণ-পরিষদে কতিপয় হিন্দু ও একজন মুসলমান সদস্য বিনা বিচারে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খানকে আটক রাখার নিন্দা করেন।

আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর আবর পাহাড় এলাকার তাগিন (আবর পাহাড়ের একটি খণ্ডজাতি) উপজাতীয়দের এক আক্রমণের ফলে আসাম রাইফেলের কয়েকজন সৈন্য এবং কয়েকজন অসামরিক কর্মচারী সহ অনুমান ২৫ জন লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩০শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ বিধান-মণ্ডলীর বিগত বাজেট অধিবেশনে রাজ্য সরকার কর্তৃক উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল বিলটি বিবেচনার্থ উভয় সভার সদস্য-গণকে লইয়া গঠিত যে যুক্ত কমিটির নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, সেই কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে মূল বিলের কয়েকটি ধারার গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মূল জমিদারী দখল বিলে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকাকে উক্ত বিধানের আওতা হইতে বাহিরে রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। যুক্ত কমিটি কলিকাতা মিউনি-সিপ্যাল এলাকাকেও বিলের আওতার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৩১শে অক্টোবর—লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য অনুমান একশত ছাত্রকে গ্রেপ্তার ও দুইজন অনশন ধর্মঘটীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর অদ্য অপরাহ্নে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকায় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। পুলিশ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে জনৈক রিক্সাওয়ালা মারা গিয়াছে ও ১৫ জন আহত হইয়াছে।

মুঙ্গেরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, দেশ হইতে দারিদ্র্য দূরীকরণে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, উত্তর বিহারের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার বিশেষজ্ঞ-দের লইয়া একটি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১লা নবেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজে[ন্দ্র] প্রসাদ আজ নয়াদিল্লীতে টেলিগ্রাফ শত বার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। গ[ত] একশত বৎসরে ভারতের টেলিগ্রাফের [ক্র]মোন্নতি হইয়াছে, তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হয়।

অদ্য লক্ষ্ণৌয়ে পুলিশ তিনবার গুল[ী] চালনা করে। ফলে চার ব্যক্তি আহত এবং অপ[র] ৭০ জন সামান্য জখম হইয়াছে। সারাদি[ন] জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের পর আ[জ] সন্ধ্যা ৫টা হইতে শহরে ৬০ ঘণ্টাব্যাপী কার[্ফিউ] জারী করা হইয়াছে। পুলিশের গুলীতে আহ[ত] একব্যক্তি আজ মারা গিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু পাটনায় এ[ক] বিপুল জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ভার[ত] কোরিয়ায় যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে, তা [ত্]যাগ করিবে না।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে অক্টোবর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধা[রণ] পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি এসিয়া-আফ্রি[কা] গোষ্ঠীর পরিবর্তিত আকারে রচিত প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর—রুশিয়া গ্রীসের নি[কট] এক প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করিয়া জানাইয়া[ছে] যে, গ্রীসের এলাকায় মার্কিন ঘাটি স্থাপন স[মগ্র] বল্কানের শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জ[নক] হইবে।

২৮শে অক্টোবর—দক্ষিণ আফ্রিকায় ব[র্ণ] সমস্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত রাষ্ট্রপ[ুঞ্জ] কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণসমস্যার শান্তিপ[ূর্ণ] সমাধান সহজ করিয়া তুলিবার জন্য ইউনি[য়ন] গভর্নমেণ্টের নিকট কি কি প্রস্তাব উত্থা[পন] করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে বিবেচনার দক্ষিণ আফ্রিকার সকল বর্ণ ও জাতির লোক প্রতিনিধি লইয়া একটি গোলটেবিল বৈ[ঠকে] আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমি[শন] দক্ষিণ আফ্রিকাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি যদি এখনও পরি[বর্তন] করা না হয়, তবে অবস্থা শীঘ্রই আয়[ত্তের] বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং সমাধান সাধ্যা[তীত] হইবে।

৩০শে অক্টোবর—নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ক[মি]শনের চেয়ারম্যান জেঃ থিমায়া ঘোষণা ক[রেন] যে, উত্তর কোরীয় যুদ্ধবন্দিগণ 'ব্যাখ্যা' শ্র[বণের] জন্য শিবিরের বাহিরে আসিতে স[ম্মত] হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

(সি ৪৪১২)

মনোজ বসুর

চীন দেখে এলাম
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বই হয়ে বেরিয়েছে। ৩৲

নবীন যাত্রা ৩৷৷০ (২য় সং) **বকুল** ২৲ (২য় সং)

বাঁশের কেল্লা ২৷০ (৩য় সং) **সৈনিক** ৪৲ (৬ষ্ঠ সং)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরোগ্য-নিকেতন ৬৲

আমার সাহিত্য-জীবন ৪৲

সতীনাথ ভাদুড়ীর

সত্যি ভ্রমণকাহিনী (২য় সং) ৩৷৷০

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

২১ বর্ষ
২ সংখ্যা

শনিবার
২৮ কার্তিক, ১৩৬০

DESH SATURDAY, 14TH NOVEMBER, 1953.

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

জওহরলাল

তিনি শুভ কর্মপথের পথিক। লোক-কল্যাণের আগ্রহে অনুপ্রাণিত তাঁহার জীবন ভারতের ভাবজীবনের এক নূতন অভিব্যক্তির প্রতীক। তিনি ভারতের কোটি কোটি নরনারীর অন্তরে নিহিত শক্তি ও চেতনার বিপুল উদ্বোধন সত্য করিবার প্রয়াসে ক্লান্তিহীন অভিযাত্রিকের মতই দুরূহ উদ্যোগ এবং পরীক্ষায় তাঁহার জীবনের সকল উদ্যম সমর্পণ করিয়াছেন। দ্বন্দ্ব, সংশয় ও বিদ্বেষে বিব্রত বর্তমান বিশ্বে তিনি শান্তি ও ঐক্যের প্রেরণা। ভারতের পল্লীনিভৃতের দীনতম মানুষ তাঁহাকে চিনে, বিশ্বের সর্বপ্রান্তের মানুষ তাঁহার অন্তরের সংবাদ জানে, তিনি হইলেন ভারতের জওহরলাল।

জওহরলাল ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে। জওহরলালের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভারতীয় জনতার হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা নিতান্ত রাজনৈতিক শ্রদ্ধা নহে। তাই তাঁহার জন্মদিবসরূপে ১৪ই নভেম্বর তারিখটিও দেশবাসীর কাছে নিতান্ত রাজনৈতিক তাৎপর্যে মণ্ডিত একটি দিবস মাত্র নহে। ভারতীয় জনচিত্তের আকাঙ্ক্ষা প্রতিমূর্ত হইয়াছে যে জওহরলালের জীবনে, সেই প্রিয় সুহৃদ ও সাথী জওহরলালেরই প্রতি জাতি তাহার প্রীতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে। আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর প্রবল হইয়া না উঠিলেও, ১৪ই নভেম্বরের জওহর-জন্মদিবসের অনুষ্ঠান জাতির কাছে বস্তুত এক পারিবারিক প্রীতি ও আনন্দের অনুষ্ঠান। জাতি এই বলিয়া গর্ব অনুভবও করে যে, তাহারই প্রতিনিধি জওহরলাল আজ বিশ্বে কল্যাণশক্তির প্রতিষ্ঠায় ভারতের আত্মজীবনের ঐতিহাসিক সত্যকে এবং ভারতীয় জাতির চেতনাসঞ্জাত নৈতিক শক্তিকে ঐতিহাসিক রূপ এবং পরিণতি গ্রহণে পরিচালিত করিতেছেন।

জওহরলালের ব্যক্তিত্বের মধ্যে আধুনিক ভারত তাহার জাতীয় জীবনের নব উন্মেষের রূপ ও পরিচয় দেখিতে পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত জওহরলালও মহাত্মা গান্ধীর মতই অতীত ভারতকে 'রামরাজ্য' বলিয়া মনে করেন না। তাঁহার কল্পনার রামরাজ্য হইল ভবিষ্যতের সুখী, সমুন্নত ও সমৃদ্ধ, মৈত্রী ও সাম্যে গঠিত এবং ভেদবাদবর্জিত ভারত। তিনি অতীত ভারতের মহত্ত্বের ঐতিহ্যকে নবভারতের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিতে চাহেন, কিন্তু অতীতের

অগৌরবগুলিকেও ঐতিহ্য বলিয়া মনে করিবার কোন সংস্কারমোহ তাঁহার নাই। অতীতের ঐতিহ্যবাহক ভারতের সহিত যুগোচিত আধুনিকতার যে যোগসূত্র তিনি রচনা করিতে চাহেন, সেই যোগসূত্রও আধুনিক বিজ্ঞানশীলতার উপাদান দ্বারা গঠন করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার কর্মাদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের পুরাতন প্রজ্ঞার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানবাদের সম্বন্ধসূত্র রচনায় যাঁহারা প্রাচীন ঐতিহ্য হইতেই ভাব ও রীতির উপাদান গ্রহণের কথা বলিয়া থাকেন, সেই শ্রেণীর সংস্কারকদিগের সহিত নবভারতের অন্যতম প্রধান সংগঠয়িতা জওহরলালের এইখানে পার্থক্য। তিনি যোগসূত্রটি নূতন এবং আধুনিক বিজ্ঞানাসিদ্ধ ভাব ও কর্মরীতির দ্বারা নির্মাণ করিতে চাহেন। জাতির সামাজিক জীবনের নবসংগঠনের সাধনায় তিনি রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীরই প্রদর্শিত ভাবপথের পথিক।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁহার অক্লান্ত তৎপরতা ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তিনি ভারতের একটি ভয়ঙ্কর ঐতিহাসিক ভ্রান্তি সম্বন্ধেও নিরন্তর সচেতন রহিয়াছেন। এই সাম্প্রদায়িকতা নিতান্ত হিন্দু ও মুসলমান নামক দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবাদের ব্যাপার নহে। ধর্ম, ভাষা, প্রথা, আচার, বর্ণ ও রীতিনীতির বহু বৈচিত্র্যে আকীর্ণ এই ভারতভূমির মূলে ঐক্য বারম্বার ক্ষুণ্ণ করিয়া স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও শ্রেণীর আধিপত্য প্রবল হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে এবং এই গোষ্ঠীগত স্বার্থবাদই ধর্ম-ভাষা-প্রথা ইত্যাদির প্রভেদগুলিকেই অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করে। বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় সারা ভারতে কয়েক হাজার স্বতন্ত্র প্রার্থী 'জাতের' নামে ভোট দাবী করিয়া ভারতের জনজীবনে যে প্রচণ্ড ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করিবার প্রয়াস করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হইয়াছে। দেশের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক আজ এই সত্য ঘোষণা করিতে কোন কুণ্ঠা অনুভব করিবেন না যে, ধর্ম-জাত-পাত-সম্প্রদায়ের নাম লইয়া যে ভেদবাদের প্রচার সেই সময় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভারতের ঐক্যের প্রতীক জওহরলালেরই প্রচার-অভিযানে ব্যর্থ হইয়াছিল।

জওহরলাল ভারতের জননায়ক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা তাঁহার বিরোধী, তাঁহারাও জওহরলালের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিস্ময়ের বিষয় হইলেও, একটি অদ্ভুত সত্য এই যে, জওহরলাল কংগ্রেস নামে যে রাজনৈতিক সংঘের সভাপতি, সেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অনেক নেতা ও কর্মীর তুলনায় অকংগ্রেসী নেতা ও কর্মীরা জওহরলালের ব্যক্তিত্বের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল এবং ব্যক্তি জওহরলালের আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের প্রতি বেশি অনুরাগী। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, পুঁজিবাদী স্বার্থতন্ত্র ইত্যাদি প্রগতিবিরোধী এবং ঐক্যবিরোধী অপশক্তির প্রতি জওহরলাল বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার এই প্রগতিমূলক চিন্তারীতির বিরুদ্ধে বাধা ও সমস্যা সৃষ্টি করিয়া থাকেন কংগ্রেসেরই নেতা ও কর্মীদিগের একটি বৃহৎ অংশ। প্রধান মন্ত্রী হিসাবেও জওহরলাল বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত চিন্তারীতির ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাইতেছেন কি না সন্দেহ। ভারতীয় জনতার হৃদয়ের পরিচয় তিনি জানেন, ভারতের সমস্যার রূপ তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, ভারতীয় জনতার প্রীতিও তিনি লাভ করিয়াছেন, তথাপি ভারতের প্রকৃত জনশক্তি আজও নবভারতের সংগঠয়িতা জওহরলালের পরিপূর্ণ সহযোগী ও সতীর্থ হইয়া উঠিতে পারে নাই। শাসনদপ্তরের পুরাতন ও জীর্ণ রীতি সেই প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে প্রকৃত জনশক্তিরূপে উদ্বোধিত হইয়া উঠিতে বাধা দিতেছে।

জওহরলালই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, জনজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ, উৎসাহ ও তৎপরতাই দেশের প্রধান শক্তি, স্বাধীনতার রক্ষক এবং সমৃদ্ধির ভিত্তি। ভারতীয় জনতার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি সুখী হইয়া থাকেন। ভারতের পথে, পল্লীতে ও প্রান্তরে সমবেত জনতার নিকটে গিয়া তিনি 'তীর্থযাত্রা'র আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ভারতের কোটি কোটি নরনারীর জনতাকেই তিনি 'ভারতমাতা' বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। জনজীবনের সহিত এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কের নিবিড়তায় জওহরলাল যে উপলব্ধির অধিকারী হইয়াছেন, তাহাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রধান শক্তি। এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয়। বর্তমান পৃথিবীতে কোন দেশেই কোন প্রধান মন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রীয় প্রধান ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার দেশের জনসাধারণের সহিত এতখানি অন্তরঙ্গতার অধিকারী হইতে পারেন নাই। প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলেও ভারতের জনচিত্তে জওহরলালের প্রধানত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

যেহেতু দেশের শাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারী কর্মযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাকে আজ প্রধান নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেই হেতু শাসনিক ত্রুটি ও অব্যবস্থায় পীড়িত দেশবাসীর সকল অভিযোগের প্রধান লক্ষ্য হইবার পরিণামও তিনি বরণ করিয়াছেন। সমস্যায় অভিভূত দেশের প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্মান বাস্তবক্ষেত্রে কণ্টকমুকুটেই পরিণত হইয়াছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষমতাসন গ্রহণ করিয়া জওহরলালকে বস্তুত জাতির দুঃখ ও বেদনার এবং দুর্বলতারও ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তথাপি স্বাধীন ভারতের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি জাতীয় উন্নয়নের ব্রতে যে সংগঠনী শক্তির সার্থক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় জাতির এবং নেতা জওহরলালের যুগোচিত অধ্যবসায়ের সৃষ্টিরূপে ইতিহাসে কীর্তিত হইয়া থাকিবে।

এসিয়াবাসী আজ ভারতের জওহরলালের মধ্যেই মানবমুক্তিপ্রয়াসী এক সংগ্রামী সাধকের ব্যক্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা এবং ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা ঘটনা হিসাবে আন্তর্জাতিক জীবনে যে নূতন তাৎপর্য সঞ্চার করিয়াছে, তাহা পূর্ণতর হইয়াছে ভারতের জওহরলালেরই নেতৃত্বের এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। জওহরলালের জীবনের গৌরব হইল তাঁহারই স্বদেশের নবজাগ্রত কল্যাণশক্তি এবং ভারতেরই ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষার বাণী ও কর্মের প্রতিনিধি জওহরলাল হইলেন ভারতের গৌরব। শুভ কর্মপথের পথিক জওহরলাল দীর্ঘায়ু লাভ করুন।

তুমি আর আমি

শিবরাম চক্রবর্তী

তোমার অসাধ্য কিছু নেই!
ছুঁচের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে হাতী গলাতে তুমি পারো
তুমিই কেবল পারো
তোমার ভক্তেরা ব'লে থাকেন।
আস্ত হাতীকে গলাতে পারো তুমি। অবলীলায়।
একটুখানি ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে।

আর আমি পারি।
আমিও পারি গলিয়ে দিতে—আস্তে আস্তে।

কর্মের কৌশলই হচ্ছে যোগ ঃ
ছুঁচের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে যোগাযোগ শ্রীমান হাতীর ঃ
আমিও করতে পারি সুকৌশলে!

আমিও পারি ছুঁচের ভেতর দিয়ে গলিয়ে দিতে
হাতীকে হাতী—
যদি একবার মেরে ওকে লাট করতে পারি—
তুলোর মতন ধুনে পিঁজে নিয়ে পাট করতে পারি—
তারপর তক্‌লির পিঁজরেয় ফেলে পাকিয়ে
সুতোয় লোপাট করে আনতে পারি একবার!
তখন সূচীভেদ্য সেই হাতীকে—
বা হাতীর সূত্রাকারকে—
ছুঁচের ছ্যাঁদায় গলাতে আমার কতোক্ষণ?

হাতী তো হাতী—স্বয়ং তুমি—তোমাকেও হাতে পেলে...
বুঝি সেই ভয়েই তুমি আমার হাত এড়িয়ে রয়েছো!
কিন্তু এড়াতে পেরেছো কি?
খোদ্‌ ব্রহ্মকেও সূত্ররূপে বানিয়ে টেনেছিলো কে একান্তে?
টানাটানির তক্‌লিফে—
সূত্রযজ্ঞের ছুতোয়—
ভূর্জপত্রের আওতায়—
সেই কি আহা, আমার বাহাদুরিতে,
তোমার প্রথম সূত্রপাত নয়?
তোমার সেই শ্লোকান্তরলাভ?

ব্রহ্মসূত্র কার রচনা?
কস্য খোদ্‌কারি?
আমিই তো!

শিল্পী—শ্রীনন্দলাল বসু

বেরমুদা বৈঠকের প্রস্তাব

গত জুলাই মাসে বেরমুদায় তিন বড়োকর্তার যে-বৈঠক হবার কথা ছিল, সেটা এইবার হবে। ওয়াশিংটন, লণ্ডন এবং প্যারিস থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ডিসেম্বর মাসের চার থেকে আট তারিখ পর্যন্ত বেরমুদায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল এবং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ জোসেফ ল্যানিয়েল পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার জন্য মিলিত হবেন। জুলাই মাসে এই বৈঠক না হওয়ার বাহ্য কারণ ছিল চার্চিল সাহেবের অসুস্থতা। চার্চিল সাহেবের বিশ্রামের প্রয়োজন শুধু শারীরিক কারণে ঘটেছিল, এরূপ বিশ্বাস অনেকেই করেনি। সেই সময়ে বেরমুদা বৈঠক স্থগিত করার আরো কারণ ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল ফ্রান্সে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অস্থিরতা। ফ্রান্সে মন্ত্রিসভা গঠন করাই তখন একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। কে যে প্রধান মন্ত্রী হয়ে অন্তত কিছুদিনের জন্য একটা মন্ত্রিমণ্ডলী খাড়া করে গভর্নমেণ্ট চালাতে সক্ষম হবেন, তাই বোঝা যাচ্ছিল না। আজ যিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন, তিনি ১৫ দিন পরে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন কি না, তার স্থিরতা ছিল না। এ অবস্থায় ফ্রান্সের মুখপাত্র হিসাবে কারো সঙ্গে আলোচনা করার বিশেষ অর্থ হয় না।

য়ুরোপের সর্বপ্রধান সমস্যা এখন হচ্ছে জার্মানীকে নিয়ে। জুলাই মাসে বেরমুদা বৈঠক হলে সেটা এমন সময় হোত, যখন পশ্চিম জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হয়ে এসেছে। তখনও এ্যাডেনয়েরের গভর্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ছিল। সেই সময়ে তিন প্রধানের পক্ষে জার্মানীর সম্বন্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হোত। কোনো কথা বেশি জোর দিয়ে বলাতে ভয়ও ছিল, কারণ জার্মান ভোটারদের উপর কোন্ কথার কী ফল হয়, সেটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল। পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ নির্বাচনের পর এখন সে দুশ্চিন্তা নেই। পশ্চিম জার্মানীর নির্বাচনে ডক্টর এ্যাডেনয়েরের দল জয়ী হয়েছে, তাতে এক-দিকে সোভিয়েট রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়ার সুবিধা বেড়েছে এবং অন্যদিকে জার্মান শক্তির পুনরুজ্জীবনের সুযোগ করে দেওয়ার সম্বন্ধে ফ্রান্সের মনে যে ভয় ও দ্বিধা আছে, যার ফলে "য়ুরোপীয়ান" সৈন্যবাহিনীর সংগঠনকার্য এগুচ্ছে না, তাও ধমক দিয়ে ঠাণ্ডা করা এখন সহজ হবে। জার্মান ভোটারেরা পুনরস্ত্রীকরণের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ফ্রান্স যদি এখন "য়ুরোপীয়ান" সৈন্য-বাহিনীর সংগঠনে সহযোগিতা করতে দ্বিধা করে, তবে পশ্চিম জার্মানীর স্বতন্ত্র পুনরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা হবে, সেটা ফ্রান্সের পক্ষে আরো ভয়ের কথা হবে—ফ্রান্সকে বর্তমানে এই মার্কিন যুক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।
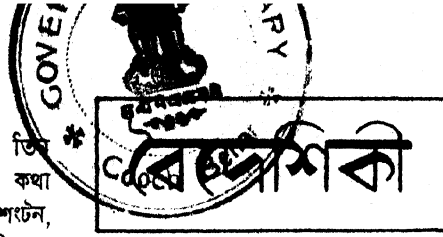
এ বিষয়ে বৃটিশ মনোভাবও সম্প্রতি মার্কিন বক্তব্যের সমর্থনে একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যতটা পূর্বে ছিল না। পূর্বে জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে বৃটেনও অনেকটা দোমনা ছিল। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মুখপাত্রগণের কয়েকটি সাম্প্রতিক বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টও তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জার্মানদের অংশীদার করে "য়ুরোপীয়ান" সৈন্যবাহিনীর সংগঠন চায়। কারণ তা না হলে আমেরিকা নিজের সৈন্য য়ুরোপ থেকে সরিয়ে বা কমিয়ে নিয়ে তার স্থান পুনরস্ত্রীকৃত পশ্চিম জার্মানীর দ্বারা পূরণ করার ভয় দেখাচ্ছে। পরিকল্পিত "য়ুরোপীয়ান" সৈন্যবাহিনীর গণ্ডীর মধ্যে জার্মান পুনরস্ত্রীকরণ সীমা-বদ্ধ রাখতে পারলে অপেক্ষাকৃত বিপদ কম, তা না হলে জার্মানীকে বাগ মানানো আরো কঠিন হবে—এটা পশ্চিম জার্মানীর গত নির্বাচনের পরে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বেশ বুঝেছিল। সুতরাং পাছে আমেরিকা ডক্টর এ্যাডেনয়েরকে আরো সুবিধাজনক সর্ত দিয়ে বসে, সেই ভয়ে অবিলম্বে "য়ুরোপীয়ান" সৈন্যবাহিনী সংগঠনের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টও এখন ফ্রান্সের উপর চাপ দিচ্ছেন। বেরমুদা বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে জার্মান সমস্যা।

জুলাই মাসে বৈঠক না করার আর একটা কারণও ছিল। তার পূর্বেই চার্চিল সাহেব সোভিয়েটকে নিয়ে চার-কর্তার বৈঠকের কথা তুলেছিলেন এবং তার পক্ষে খুব একটা জোর আন্দোলনও খাড়া করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা কিছুতেই সেদিকে এগুতে রাজি হয় নি। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার যখন প্রথম বেরমুদা বৈঠকের প্রস্তাব করেন, তখন সেটা অংশত চার-কর্তার মিলনের প্রস্তাবেরই প্রতিষেধক হিসাবে করেছিলেন। আমেরিকার যুক্তি হচ্ছে, রাশিয়ার সর্বময় কর্তার সঙ্গে দেখা করার পূর্বে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীতি স্থির করে নেওয়া দরকার এবং রাশিয়া কী চায় তাও আগে থাকতে বুঝে নেওয়া আবশ্যক। বেরমুদা বৈঠকের প্রস্তাব ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়া তার তীব্র প্রতিবাদ করে; রাশিয়া বলে, এরূপ বৈঠকের প্রস্তাবের অর্থই হচ্ছে আমেরিকা কোনো মিটমাট চায় না, যদি খোলাখুলি আলোচনা করে একটা মিটমাট করার ইচ্ছা থাকত, তবে আগে থাকতে আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের বড়োকর্তাদের আলাদা বৈঠক করে একগাট্টা হবার চেষ্টা কেন হবে? আমেরিকার আপত্তি সত্ত্বেও রাশিয়াকে নিয়ে চার-প্রধানের বৈঠক করার পক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের মধ্যেও একটা প্রবল জনমত, বিশেষ করে বৃটেনে ছিল। সুতরাং রাশিয়ার প্রতিবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করে তখনই বেরমুদা বৈঠক করার অসুবিধা ছিল। তখনও বেরিয়ার ব্যাপারটা ঘটে নি, স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েটের ভাবগতিকে যে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল, তার দরুণ লোকের মনে রাশিয়ার সঙ্গে একটা মিটমাটের আশা তখনও প্রবল ছিল। এই কারণেও সেই সময়ে বেরমুদা

বৈঠক স্থগিত রাখা কিছুটা আবশ্যক ছিল। ঠিক সময় বুঝেই চার্চিল সাহেবের শরীর অসুস্থ হচ্ছিল। যাই হোক, ইতি-মধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

চতুঃশক্তির বৈদেশিক মন্ত্রীদের একটা বৈঠক করার প্রস্তাব নিয়ে অনেক চিঠি-চাপাটি চললো—ফল শূন্য। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, এই তিন শক্তির ও সোভিয়েটের বৈদেশিক মন্ত্রিগণ জার্মান সমস্যা আলোচনার জন্য লুগানোতে মিলিত হন। সোভিয়েট কর্তৃক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সোভিয়েটের বক্তব্য হচ্ছে, "য়ুরোপীয়ান" সৈন্যবাহিনী গঠনের চুক্তি যদি কার্যে পরিণত করার আয়োজন চলতে থাকে, তবে কনফারেন্স করার কোনোই সার্থকতা নেই। তাছাড়া রাশিয়া বলেছে যে, পৃথিবীময় যে দ্বন্দ্ব ও মন-কষাকষি চলেছে, সেটা কমাতে হলে পঞ্চশক্তির প্রতিনিধিদের নিয়ে অর্থাৎ কম্যুনিস্ট চীনকেও সংগে নিয়ে, আলোচনা করতে হয়। সুতরাং লুগানোতে চতুঃশক্তির বৈদেশিক মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাব বাতিল হোল। বলা বাহুল্য, মার্কিন গভর্নমেন্ট সোভিয়েট গভর্নমেন্টের এই প্রত্যাখ্যানকে সোভিয়েটের মিটমাট করার অনিচ্ছার একটা নিদর্শন হিসাবে সেটাকে বেরমুদা কনফারেন্সের যৌক্তিকতার পক্ষে ব্যবহার করবেন। লোকের মনও এক সময়ে চার-কর্তার মিলনের প্রস্তাবে যেরকম নেচে উঠেছিল, এখন আর সেরকম নেই। সোভিয়েট রাষ্ট্রে মিঃ ম্যালেনকভের আমলের প্রথম কয়েক মাসের খবরাখবরে বাইরের লোকের মনে যে ধরনের একটা উৎসাহ জেগেছিল, সেটা এখন নেই। এই ভাব-পরিবর্তনের যুক্তিসংগত কারণ আছে কি না, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু এটা ঠিক যে, ৩।৪ মাস পূর্বে পর্যন্ত ম্যালেনকভের সংগে চার্চিল, আইজেনহাওয়ার প্রভৃতির সাক্ষাৎ-আলোচনার প্রস্তাবে বহু লোকের মনে যে উৎসাহবোধ ছিল, এখন তা অনেক কমে গিয়েছে। আইজেনহাওয়ার যদি রাজি না হন, তবে চার্চিল একলাই ম্যালেন-কভের সংগে দেখা করুন, এরকম কথাও বৃটেনে অনেকের মুখে শুনা যেতো। এখন আর অতটা জোরের সংগে একথা কো[illegible] বলে না।

তবে চার্চিল সাহেব যে ধুয়া তুলে[illegible] ছিলেন সেটা তাঁর মনের মধ্যে হয়ত এখনে[illegible] গুঞ্জরিত হচ্ছে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইজেন[illegible] হাওয়ারের উপর চাপ দিয়ে কিছু করা[illegible] চেষ্টা, যে-চেষ্টা কয়েক মাস পূ[illegible] প্রোপাগান্ডার দ্বারা করা হয়েছিল, সে[illegible] এখন আরো দুরূহ। তার একটা কার[illegible] ইতিমধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে রাশিয়া[illegible] কিছু হটতে হয়েছে, যেমন পশ্চি[illegible] জার্মানীর নির্বাচন ব্যাপারে। এ্যাডেনয়েরে[illegible] জয়লাভ সোভিয়েটের পক্ষে একটা ব[illegible] কূটনৈতিক ঘা। পূর্ব জার্মানীতে অশা[illegible] ও জনসাধারণের বিক্ষোভ আত্মপ্রক[illegible] করাতেও সোভিয়েটের মর্যাদাহানি ঘটেছে[illegible] এই সব দেখিয়ে আমেরিকা বলবে, [illegible] হয়ে থাকলে এবং ক্রমশ নিজেদের বল বৃ[illegible] করে যেতে থাকলেই রাশিয়া পথে আসবে[illegible] প্রশ্ন এবং তার সমাধান কোনোটাই [illegible] সরল নয়। ১১।১১।[illegible]

হিমালয়

শিশিরকুমার দাশ

আকাশব্যাপ্ত আশীষের ধারা নিয়ে
তরুণী নদীর নিক্কন গুনে গুনে
মৌন পাহাড় মেঘের মমতা মেখে
রুক্ষধূসর নামাবলী গায়ে দিয়ে
সারা পৃথিবীর ক্লান্ত কামনা শুনে
তুষারে তুষারে নিজেকে রেখেছে ঢেকে।
উদ্ধত শিরে দাঁড়িয়েছে হিমালয়
হেরেছি অনেক—অনেক মেনেছি আমাদের পরাজয়।

এবার তোমার অপরাজয়ের লক্ষ-মরণ-স্মৃতি
অতীত-গর্বী-কিরীট তুষারে ঢাকা
তোমার বনেতে শিহরিত জয়গীতি
শিখরে তোমার পায়ের চিহ্ন আঁকা।
সেই হিমবাহ—আকাশের সেই স্নেহ আজ হিমাল[illegible]
ঘোষণা করেছে বহুকাল পরে প্রার্থিত পরাজয়

❁ শারদ সাহিত্য ❁

অলবেরুনী

কনট সার্কাস, নয়াদিল্লী

সুহৃদ্বরেষু,

ইঁদুরকে যদি বেরাল বানিয়ে দিলেন তো আর রক্ষে নেই। কালে কালে সে ব্যাঘ্র হতে চাইবে। অলবেরুনীর অবস্থা এখন প্রায় সেইরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী দরকার ছিল তার কাছে চিঠি চাইবার? চাইলেনই যদি, পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেই হতো। অতো ঘটা করে তা ছাপবার কোনো দরকার ছিল না। তার মতো অবুঝ ব্যক্তিদের—প্রিভিলেজ এবং রাইট-এর যারা তফাত বোঝে না—গোড়াগুড়িই কাট্ করা দরকার। তা আপনি করেননি, এবারে ঠ্যালা সামলান।

আসলে সে হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, ইঙ্গি পেলেই যারা একর চায়। শুধু গল্প সম্পর্কে মতামত পাঠিয়েই যারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, কাব্য সম্পর্কেও দু'চার পাতা লিখতে ইচ্ছে করে। একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। গত চিঠিতে সে লিখেছিল, কাব্যের 'ক'-ও সে জানে না। সেটা তার অন্তরের কথা নয়, বিনয়ের বাড়াবাড়ি মাত্র। আশা করি, তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। ইচ্ছে করলেই অবশ্য আপনি এখন না-বুঝবার ভাণ করতে পারেন। প্রবাসী বন্ধুর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ইংরেজীতে যাকে বলে 'টেকিং ওয়ন অ্যাট হিজ ওয়র্ড' অনায়াসেই তা করতে পারেন আপনি। কিন্তু অলবেরুনীর এই উঠতি-উৎসাহের উপরে সেটা প্রায় ভিজে কম্বল চাপা দেওয়ার সামিল হবে। দয়া করে অতো নির্দয় হবেন না। মুখ যখন সে খুলেছেই, আরো কিছুক্ষণ তাকে গলাবাজি করতে দিন।

ভাবছেন, এত উৎসাহ অলবেরুনীর এল কোথা থেকে। বলব। কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে নিই। এখানকার আবহাওয়া বড় বিচিত্র, ক্ষণে ক্ষণে তার চেহারা পালটায়। এই সেদিন পর্যন্ত গগনে গগনে দেয়া ডাকছিল। সেই গুরুগুরু ডাকের মধ্যেই শরৎ এল। তারপর পনেরো দিনও কাটেনি, শীত এসে গিয়েছে। অথচ, কী আশ্চর্য, গ্রীষ্মের দাপটই এখনো শেষ হলো না। সকালে শনশনে হাওয়া, দুপুরে গনগনে রোদ্দুর, রাত্তিরে কনকনে শীত। আর তার মধ্যে বেচারী শরতের অবস্থা যেন সদ্য শ্বশুর-বাড়িতে আসা কনেবউটির মতো। প্রায় সারাদিনই সে অসূর্যম্পশ্যা। শুধু বিকেলে, তাও মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে, তার দেখা পাওয়া যায়। তখন যদি হাঁটতে হাঁটতে কুইনসওয়েের দিকে চলে যান, ঘননিবদ্ধ তরুশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর আলোছায়ার বিচিত্র বর্ণালী যদি তখন তার পত্রগুচ্ছের মধ্যে চলতি হাওয়ার পায়ের চিহ্ন এঁকে যায়, তাহলে—একমাত্র তাহলে—বুঝতে পারবেন এটা শরৎকাল। গোধূলির ম্লানায়মান দৃষ্টির নীচে শরতের সেই উদাস নির্জন রূপটি দেখে তখন আপনার বড় দুঃখ হবে। সে দুঃখ অর্কাবিকেও কবি বানিয়ে ছাড়ে। অলবেরুনীর অনুভূতি অতো তীক্ষ্ণ নয়, তাকে তাই সমালোচক বানিয়ে ছেড়েছে।

না, তাও নয়। কেন না, তাহলে তার মনের একটা নির্দিষ্ট ফ্রেম থাকত। সেই ফ্রেমের সঙ্গে মাপে-মাপে যা খাপ খেয়ে যায়, তাকে বাদ দিয়ে বাদবাকী আর সব-কিছুই সে বর্জন করতে শিখত। তেমন কোনো ফ্রেম তার নেই, বর্জনের বিদ্যেটাকেও সে আয়ত্ত করতে পারেনি। যা তার ভাল লাগে, লাগে। না লাগলে তাকে চুটিয়ে গাল দেবে, এমন সাহস নেই তার। উৎসাহও নেই। তা-ই যদি হয়, না-ই যদি থাকে, তবে তো সে সমালোচক নয়। নয়ই তো। কী সে তাহলে? নগণ্য পাঠকমাত্র। নগণ্য, এবং নির্বিচার। নির্বিচার, কেন না হাতের সামনে যা-কিছু পায়—খুব কম পায় না—তা-ই সে পড়ে। তার কতক তার ভাল লাগে, কতক লাগে না। কতক মনে থাকে, কতক থাকে না। যেটুকু থাকে, তা-ই নিয়েই সে খুশী। যা তার মনে থাকছে না, মনে দাগ রাখছে না, তাকে নিন্দে করবে এত নির্দয় সে নয়।

এবারকার কবিতা

এবারকার কবিতার কথাই ধরুন। অনেক কবিতাই তো ভাল হয়নি। অনেক ভাল-ভাল কবিরও কিছু কিছু কবিতা তো খারাপই হয়েছে; কিন্তু সেইটেই একমাত্র সত্য নয়। কেউ কেউ যে পুরনো সুরে হলেও নতুন কথা, এবং দু-একজন যে নতুন সুরে নতুন কথা, বলতে পেরেছেন, তা-ও সত্য। এই শেষের সত্যটাকেই অলবেরুনী আশ্রয় করেছে। প্রথমটাকে ভুলতে পারার মতো ঔদার্য, এবং ভুলে গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারার মতো বুদ্ধি, তার আছে।

আর আছে সহিষ্ণুতা। নয়তো অধিকাংশ কবির অধিকাংশ রচনাতেই এবারে যে গতানুগতিকতার—কোনোরকমে লাইনের সঙ্গে লাইন মিলিয়ে দায় চুকিয়ে দেবার—চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাতে সে বিস্মিত, বিপন্ন বোধ করত। অথচ তার কোনোটিই অসংস্কৃত নয়, প্রায় সব-কবিতাই মার্জিতশ্রী। তাতে এমন একটি পালিশ রয়েছে যা যত্নলব্ধ, নিরন্তর সাধনা—'সাধনা' কথাটা এখানে নিতান্তই ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে—ছাড়া তাকে আয়ত্ত করা যায় না। শুধু তা-ই নয়, কবিতার শব্দ-শরীরে এখন যে মিতব্যয়ী মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তারও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। কবিরা আজকাল কম কথা বলেন, সব কথা আবার বলেনও না। তার মানে পাঠকদের কল্পনা-শক্তির উপরে তাঁরা এখন আগের চাইতে শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন। এ যা বললাম, সবই প্রশংসার কথা। এবং এইসব প্রশংসনীয় গুণের একত্র-সমাবেশের ফলে কাব্য-

সাহিত্যের মোটামুটি মান আজকাল অনেক উন্নত হয়েছে। অভাবটা তাহলে কীসের? অভাব সেই সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতার যা না থাকলেও কবিতা উপভোগ্য হয় বটে, কিন্তু যা থাকলে তবেই কোনো কবিতা কালের প্রহার সহ্য করতে পারে। এখনকার কবিতা ভাল, কিন্তু অসম্পূর্ণ। কবি-দৃষ্টি তীক্ষ্ম, কিন্তু খণ্ডিত। অত্যধিক লিরিক-চর্চার ফলেই রূপদৃষ্টির এই বিপর্যয় ঘটেছে কিনা, যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে তার বিচারভার ন্যস্ত হোক। অলবেরুনী ইতিমধ্যে জানিয়ে রাখছে যে, দু'একজন বাদে কোনো কবিই তাঁর পাঠকের হৃদয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্ববিসারী অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারছেন না। শারদীয়া সংখ্যার কবিতা পড়ে সে-বিশ্বাস তার আরও বদ্ধমূল হয়েছে।

দোষটা শুধু কবিদের নয়, সমগ্র সমাজ-মানসের। সমাজের সর্বস্তরেই—চিন্তায় এবং ব্যবহারে—একটা কেন্দ্রবিচ্যুতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। কবিরা সমাজবহির্ভূত মানুষ নন, আপনাপন পরিবেশ থেকেই তাঁরা তাঁদের ধ্যানধারণার পরিপুষ্টি সংগ্রহ করে থাকেন। সুতরাং এ দোষ যে কবিদেরও স্পর্শ করবে, তাতে সন্দেহ কি। করেওছে। এবং তার ফলে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, একমাত্র অসুস্থরাই তাকে সুস্থ বলে আখ্যাত করবেন। কেউ কেউ এর থেকে পরিত্রাণ পেতে চেয়েছিলেন, পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। পারেননি। বাকী অংশ জলতি হাওয়ায় গা ঢেলে দিয়েছেন, সমাজ-শরীরের রূপবিভঙ্গের প্রতিটি অধ্যায়েই মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। তাতে তাঁদের কণ্ঠস্বরই শুধু চড়া হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গীর বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়নি।

এই যে বিপর্যয়, শুধু কবিতায় নয়, সর্বত্রই এর প্রভাব পরিব্যাপ্ত। গল্পে—উপন্যাসে—নাটকে। কিন্তু শুধু কবিরাই একে জয় করতে পারতেন। কবিরাও শিল্পী, গল্পকার আর ঔপন্যাসিকেরাও শিল্পী। কিন্তু শিল্পদৃষ্টির লক্ষ্য বিচারে কবিদের সঙ্গে তাঁদের একটা স্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান। পার্থক্যটা কী? বলছি। মানব-জীবনের একমাত্র নির্ণীত-মূল্য অভিজ্ঞতা' নিয়েই গল্পকার আর ঔপন্যাসিকের কারবার। তার বাইরে দৃষ্টি দিতে হলে একটু অবস্কিয়োর হয়ে পড়তে হয়। গল্পে কিংবা উপন্যাসে অবস্কিয়োরিটির কোনো স্থান নেই, সুতরাং সেই বাঁধাধরা চৌহদ্দীর বাইরে পা বাড়াবার কোনো উপায়ও তাঁদের নেই। পক্ষান্তরে, নির্ণীতমূল্য অভিজ্ঞতার বাইরেও যে একটি বিরাট জগৎ ছড়িয়ে রয়েছে—যাকে বোঝানো যায় না, বোঝাও যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র—একমাত্র কবিরাই সেখানে পদচারণা করতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর সেখানে পরিপূর্ণ-ভাবেই স্বগত। তাই অর্ধস্পষ্ট। কবিতার ক্ষেত্রে এই অর্ধস্পষ্ট অবস্থাটাকে আমরা মেনে নিয়েছি, গল্পে কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এখনো নিইনি। তার কারণ সত্যদ্রষ্টা হিসেবে কবির উপরেই আমাদের বেশী আস্থা। শিল্পী হিসেবে তাঁকে অনেক বেশী স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি। নির্ণীত-মূল্য অভিজ্ঞতার মান যখন ভেঙে যাচ্ছে, তখন গতানুগতিকতার স্রোতে আত্ম-বিসর্জন না করে আপন অনুভবের ক্ষেত্র থেকে যদি অন্যতর কোনো অভিজ্ঞতা তাঁরা আমাদের জন্যে অর্জন করে' আনতে পারতেন, সেই অর্ধস্পষ্ট অভিজ্ঞতাকে যদি অনুভূতির ক্ষেত্র থেকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিতে পারতেন, তাকে স্বচ্ছ-শরীরী, সর্বজনদৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে পারতেন, একমাত্র তাহলেই আমাদের মুখরক্ষা হতো।

যদি পারতেন! কেউই কি পারেননি? 'না' কথাটা অলবেরুনীর ঠোঁটের ডগায় এসেও ফিরে গেল। কেননা, এই মুহূর্তে তার এমন দু'জন কবির নাম মনে পড়েছে, যাঁরা এখনো লেখেন বলেই অলবেরুনী এখনো পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং জীবনানন্দ দাশ। শক্তিতে এ'দের সমকক্ষ যে আর কেউ এখন নেই তা নয়। আছেন। বস্তুত নিত্য নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষায়, রূপকল্পসৃষ্টির অভিনবত্বে আর কবি-কর্মের চাতুর্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যান্য দু'-একজন কবি এ'দের চাইতে অনেক বেশী দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দিয়েও যে তাঁরা অলবেরুনীর হৃদয় জয় করতে পারেননি তার কারণ রূপদৃষ্টির সেই সম্পূর্ণতা এখনো তাঁদের অনায়ত্ত যা দিয়ে সমগ্রকে কল্পনা করতে হয় এবং যা না-থাকলে কবিতা কখনো সত্য অর্থে মহৎ হয়ে ওঠে না। সে হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং জীবনানন্দ দাশই বোধ হয় যুগের মহত্তম কবি। তাঁদের কবি-দৃষ্টি সম্পূর্ণ, পৃথক। রূপকল্পনা অখণ্ডস্বভাব। এবং তার চাইতেও যা বেশী, ব্যক্তিগত অনুভূতির ক্ষেত্র থেকে এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতাকে তাঁরা আমাদের জন্য অর্জন করে নিয়ে আসতে পেরেছেন, যার ভিত্তিতেই হয়তো একদিন এ যুগের সমাজমানসের সার্থক মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

মহত্তম। সম্পূর্ণতমও। অথচ আশ্চর্যের কথা, একই যুগে জন্মগ্রহণ করে' এবং প্রায় একই চিন্তা-পরিবেশের ক্রোড়ে লালিত হয়েও এ'রা দু'জনে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাবনাধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন। ভাবনাধারা পৃথক, তার প্রকাশভঙ্গীও পৃথক। বিশ্বাস না হয় এ'দের এবারকার কবিতা আবার নতুন করে' পড়ে দেখুন, পার্থক্যটা আবার নতুন করে চোখে পড়বে। শুধু তা-ই নয়, যে দুটি বিশিষ্ট ধারায় এ'দের কবিমানসের বিবর্তন ঘটেছে, জীবনানন্দ দাশের এখনো ঘটছে, তাও পরস্পরের বিপরীত। 'প্রথমা' কিংবা 'সম্রাট'-এ কবি-চিত্তের যে অস্থিরতা—সদর্থে অস্থিরতা—চোখে পড়ত, প্রেমেন্দ্র মিত্রের এখনকার কবিতায় কি আর তার লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে? যাবে না, কিন্তু তার জন্যে দুঃখবোধেরও কোনো কারণ নেই। কেননা অস্থিরতাই কোনো কবির শেষ পর্যায় নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রর তো নয়ই। সে-পর্যায় তিনি পার হয়ে এসেছেন। তাঁর দৃষ্টি এখনো অন্বেষণব্যাকুল। ব্যাকুল, কিন্তু শান্তিহীন নয়। গভীর, প্রশান্ত, নির্মল। যন্ত্রণার সমস্ত চিহ্নই সেখান থেকে ধুয়ে মুছে গিয়েছে, তার পরিবর্তে যে স্নিগ্ধ জ্যোতি শান্তি দেখা দিয়েছে, মা[illegible] কবিতার সেটা প্রধানতম লক্ষণ। 'খোঁজা' (পরিচয়), 'জোনাকি-ম[illegible]' (বসুমতী), আর 'চীনা তর্জ[illegible]' (দেশ, সাধারণ সংখ্যা), এবারকার এই তিনটি কবিতায়ই সেই বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কেও এক[illegible] বলতে পারলে অলবেরুনী সুখী হতে[illegible] বলতে না-পেরে সে আরো সুখী।

মুহূর্তেই যে তাঁর সম্পর্কে শেষ কথা উচ্চারণ করা যাচ্ছে না, তার কারণ তাঁর কবিচিত্তের শেষ রহস্য এখনো উন্মোচিত হয়নি; তাঁর রূপদৃষ্টির এখনো বিবর্তন ঘটে চলেছে। কবির পক্ষে এই ক্রম-বিবর্তনের চাইতে সুখের কথা আর কী হতে পারে।

দুঃখের কথা, জীবনানন্দ দাশের যাঁরা অত্যন্তই অনুরক্ত পাঠক, তাঁদেরও একাংশের কাছ থেকে আজকাল তাঁর সর্বাধুনিক পর্যায়ের কবিকর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু আপত্তি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কারণটা দুর্বোধ্য নয়,—দুর্বোধ্যতা। তাঁরা সে কথা খোলাখুলিই বলেন। বলেন যে, তাঁর কবিতা আগে এতটা অস্পষ্ট ছিল না, এবং বেদনা থাকলেও তাতে শান্তি ছিল। এখন তিনি অস্পষ্টতর এবং অস্থির। অস্থিরতার এই অভিযোগ যে অংশত সত্য, তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ দেখিনে। কিন্তু অলবেরুনীর তাতে দুঃখ নেই। কেননা তার প্রিয় কবির এই বিবর্তনের মধ্যে সে যুগবিবর্তনেরই একটা পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছে। 'আধুনিক মানুষের বিশ্বাসবিহীন অনচ্ছ মানসিকতার তিনি সন্ধান রাখেন। তাকে ভাষা দেবার, প্রত্যয়ের ক্ষেত্র খুঁজে দেবার, চেষ্টাই তিনি করছেন। সে-কাজ এখনো তাঁর সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর কবিতাও এখনো তাই অর্ধস্পষ্ট।

তাঁর এবারকার কবিতাও এই অর্ধ-স্পষ্ট কবিস্বভাবের পরিচয় বহন করছে। 'আলো পৃথিবী' (আনন্দবাজার), 'যদিও দিন' (দেশ), 'এখন এ পৃথিবীর' (চতুরঙ্গ), আর 'জীবনে অনেক দূরে' (ব্রাত্য), চারটি কবিতার কোনোটিই যে খুব প্রাঞ্জল, কেউই এমন কথা বলবেন না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই যে অপরিচিত অস্পষ্ট-শরীর অনুভূতির প্রাণস্পর্শ রয়েছে— সাধারণ পাঠকের পক্ষে যার কণামাত্রের স্বাদসংগ্রহ সম্ভব—তার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্যও সবাই ঔৎসুক্য বোধ করবেন। অলবেরুনীর মধ্যে অন্তত ইতিমধ্যেই সে-ঔৎসুক্য জেগেছে। সে জানে, কবিস্বভাবের অভিজ্ঞতা যেখানে যতো সূক্ষ্ম, প্রকাশভঙ্গীও সেখানে ততো জটিল, ততো দুরূহ। সে-জটিলতার আরও অনেক সঙ্গত কারণ থাকতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের বর্তমান পর্যায়ের কবিতা সম্পর্কে তাই তার বিন্দুমাত্রও অভিযোগ নেই। কবিতায় দুর্বোধ্যতা বাঞ্ছনীয় নয় সত্যি, কিন্তু তা নিয়ে এত যে গেল-গেল চিৎকার, এরও সে কোনো সার্থকতা বুঝতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে এলিয়টের উক্তি স্মরণীয়ঃ—

"The difficulty of poetry (and modern poetry is supposed to be difficult) may be due to one of several reasons. First, there may be personal causes which make it impossible for a poet to express himself in any way but an obscure way; while this may be regrettable, we should be glad, I think, that the man has been able to express himself at all. Or difficulty may be due just to novelty.... Or difficulty may be caused by the reader's having been told, or having suggested to himself, that the poem is going to prove difficult. The ordinary reader, when warned against the obscurity of a poem, is apt to be thrown into a state of consternation very unfavour-

able to poetic receptivity". (DIFFICULT" POETRY: T. S. Eliot.)

এলিয়ট যে সমস্ত কারণ নির্দেশ করেছেন, বর্তমান ক্ষেত্রে তার সবগুলিই উপস্থিত। তার মধ্যে নূতনতর প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় সাধনে পাঠকের অনীহাই এক্ষেত্রে সব চাইতে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। পাঠকরা আর একটু উন্মুখ হোন; সারাক্ষণই যদি তারা ভয়গ্রস্ত হয়ে থাকেন, দুর্বোধ্যতার এই দেয়াল যে তাহলে কোনোকালেই ভাঙবে না।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের আর দু'জন বড় কবি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর বিষ্ণু দের বিরুদ্ধেও একাধিকবার এই দুরূহতার অভিযোগ উঠেছে। প্রথমজন সম্পর্কে অলবেরুনীর অভিমত, তাঁর দুরূহতা ততোটা ভাবগত নয়, যতোটা শব্দগত। কঠিন অপরিচিত এবং অপ্রচলিত শব্দের উপরেই তাঁর পক্ষপাত। খানিকটা পরিশ্রম করলেই শব্দের সেই শক্ত খোলসটিকে অবশ্য ভেঙে ফেলতে পারা যায়। কিন্তু তখন তার ভিতর থেকে যে সহজ ভাবস্রোত বেরিয়ে আসে তার কাব্যৈশ্বর্য এত কিছু অপরূপ নয় যে পাঠকরা বারংবার সেই পাথর ভাঙার কষ্ট স্বীকারে উৎসাহ বোধ করবেন। আর তা ছাড়া ভাব যেখানে দুরবগাহ নয়, শব্দ এবং ভঙ্গীর হাতে সঙ্গীন তুলে দিয়ে সেখানে কী যে লাভ হয়, অলবেরুনী বুঝতে পারে না। সত্যিই কি কিছু লাভ হয়? পাঠক আর সমালোচকদের মনে একটু সভয় সম্ভ্রম সৃষ্টি করা ছাড়া? সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সাম্প্রতিক কবিতায় অবশ্য এই কাঠিন্য অনেক কমে এসেছে। যে-কবিতাটি অলবেরুনীর চোখে পড়ল, উল্লেখ করবার মতো। 'শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট অবলম্বনে' (ব্রাত্য)। কাব্য-শরীরের গঠন গাম্ভীর্য আর কবিতার অন্তর্নিহিত বক্তব্যের মধ্যে এখানে সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটেছে।

বিষ্ণু দের কবিতাও আজকাল সহজতর। যাঁকে আমরা সম্পূর্ণ কবি বলি, তিনি তা নন। তাঁর ভাবানুষঙ্গ কখনো দিশী, কখনো বিদেশী; তাঁর কবিকর্মের কোনো ঢালাও সৌন্দর্য নেই। নেই, কিন্তু তারই মধ্যে কখনো সখনো যে বিদ্যুৎ-চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়, প্রায় ক্লান্তিকর কোনো কবিতারও দু-একটি স্তবক মাঝে মাঝে এমন ঝলসে ওঠে—প্রায়ই ওঠে—যে, তাঁর কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে তারপর আর কারুর কোনো সন্দেহ থাকবার কথা নয়। এবারে অবশ্য তিনি বিশেষ কিছু লেখেন নি, যে দুটি-একটি কবিতা লিখেছেন তাতে নতুন কোনো বক্তব্য চোখে পড়ল না।

নতুন বক্তব্য আর কে-ই বা উপস্থিত করতে পারছেন? বুদ্ধদেব বসু না, অমিয় চক্রবর্তী না, অজিত দত্ত না। এরই মধ্যে বুদ্ধদেব বসু একটি আশ্চর্য রকমের ভাল কবিতা লিখেছেন,—'পাম্পার জন্মদিনে' (দেশ, সাধারণ সংখ্যা)। কবিতাটির মধ্যে যে একটি করুণ আর্তি ছড়িয়ে রয়েছে—হৃদয়কে যা শুধু স্পর্শই করে না, আচ্ছন্ন করে রাখে—বাংলা কবিতায় অনেক দিন তার দেখা পাওয়া যায়নি। এত আন্তরিকতারও না। একটি শুধু আপত্তি, রবীন্দ্র-প্রভাব এখানে বড় বেশী প্রকট। যে-কবির নিজস্ব একটি সুর রয়েছে, সুরের স্বাতন্ত্র্যকে যদি তিনি রক্ষা করতে না পারেন, তা একটু বেদনাদায়ক বলে মনে হয় বই কি। আন্তরিকতার দিক থেকে অজিত দত্তর দু'টি কবিতাও—'সমাপ্তি' (আনন্দবাজার), 'উর্ধ্ববাহু' (দেশ)—উল্লেখ করবার মতো।

এর পরবর্তী পর্যায়ে যাঁদের আবির্ভাব, শিল্পস্বভাবের বিচারে তাঁদের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া যায়। তার একদিকে পড়েন নিশিকান্ত, সুনীলচন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ মিত্র দিনেশ দাস, অশোক-বিজয় রাহা; অন্যদিকে বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। দু'দিকেই যে পাঁচটি করে নামোল্লেখ ঘটল, সেটা নিতান্তই আকস্মিক, তার পিছনে প্যারিটি রক্ষার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

বুদ্ধদেব বসুর কাছে আরো অনেক কারণের মধ্যে এই কারণেও অলবেরুনী ঋণী যে, তিনিই সর্বপ্রথম নিশিকান্তর কবি-প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই প্রথম পরিচয়েই নিশিকান্তকে তার অসম্ভব ভাল লেগে-ছিল; তার আগে যে এই স্বপ্রকাশ কবি-স্বভাবের সে খবর রাখত না, সেজন্যে তার আফসোসও হয়েছে বড় কম নয়। কিন্তু তার অদৃষ্ট বড় খারাপ। প্রথম পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হতে না হতেই নিশিকান্ত হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। তারপর অনেকদিন তিনি আর কিছু লেখেননি। লেখেননি বলা বোধ হয় ঠিক হলো না, ছাপার অক্ষরে তা দেখা যায়নি। ইদানীং আবার একটি দুটি করে তাঁর কবিতা পড়তে পাওয়া যাচ্ছে, পাঠক মাত্রেই এতে সুখী হবেন। নিশিকান্তর যে কবিতাটি আপনি প্রকাশ করেছেন, 'সংকল্প' (দেশ), খুবই ভাল। তার মধ্যে যে উজ্জ্বল প্রাণময়তার স্পর্শ রয়েছে, তা কারো চোখ এড়াবার কথা নয়। দু'একটি পঙক্তি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করা গেল নাঃ—

"বিশ্বাসে তার
বিশ্ব ঘনায়
শিশির-কণায়,
মলিন-মাটির পাত্র ভরে সৌর-রসের
সুধার সোনায়।"

সুন্দর যে, তাতে সন্দেহ কি।

দিনেশ দাস, হরপ্রসাদ মিত্র, অশোক বিজয় রাহা,—এ'রা তিনজনেই এবারে কয়েকটি করে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। দুঃখের কথা এই যে, তাতে নতুন কোনো রূপদৃষ্টির সন্ধান পাওয়া গেল না। কবিতাগুলি ভাল, কিন্তু এরকম ভাল তাঁরা আগেও অনেক লিখেছেন। তিন-জনেই এ'রা শক্তিশালী কবি, সুতরাং পাঠকরা যদি এ'দের কাছে আরো কিছু, নতুনতর কিছু, প্রত্যাশা করেন তো সেটা দোষের হয় না। দিনেশ দাসের কবিতায় তবু মাঝে মাঝে এক-একটি অশ্রুতপূর্ব সুরগুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু হরপ্রসাদ মিত্র আর অশোকবিজয় রাহা যেন খানিকটা পথ এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছেন। হরপ্রসাদের আর একটি দোষ, কবিতায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চাইতে তার অঙ্গসৌষ্ঠবের উৎকর্ষ সাধনেই ইদানীং তাঁর বেশী আগ্রহ। অলবেরুনীকে ভুল বুঝবেন না। কবিতাই হোক আর গল্প-উপন্যাসই হোক, ফর্ম যে সব সময়েই নিখুঁত হওয়া দরকার তা সে জানে। সেই সঙ্গে এও জানে যে, ফর্মের দিকে প্রয়োজনের বেশী নজর দিতে গেলে তার ফলাফল সবসময়ে খুব সুখকর হয় না। হরপ্রসাদের ক্ষেত্রে অন্তত হয়নি। সুনীল-চন্দ্র সরকারের কবিতাটিকে—'তৃণ' (দেশ)

—সেদিক থেকে আদর্শ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। ফর্ম আর বিষয়বস্তু, বাক্য আর কাব্যের মধ্যে তিনি সহজ সামঞ্জস্য ঘটিয়েছেন।

অন্যদিকে অলবেরুনী যে পাঁচজনের নামোল্লেখ করেছে, কাব্যোৎকর্ষের বিচারে যে তাঁরা পরস্পরের সগোত্র এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। মিলটা এইখানে যে, তাঁদের মোটামুটি বক্তব্যটা প্রায় একই ধাঁচের। তার মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে অলবেরুনী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কোন্‌টা ভাল কবিতা, আর কোন্‌টা মন্দ, সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তার মানে, তাঁর শিল্পী-মন খুব সচেতন স্বভাবের নয়। মাঝে মাঝে তিনি খুবই ভাল কবিতা লিখে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে এমন সব কবিতা লেখেন, যাকে নিছক স্লোগ্যান বললেও এক স্লোগ্যান জিনিসটার অমর্যাদা ঘটানো ছাড়া আর কোন অন্যায় হয় না। এই শেষোক্ত ধরনের কবিতাই তিনি আজকাল বেশী লিখছেন। তাঁর তিনটি কবিতা এবার চোখে পড়ল। 'রুদ্র-মল্লার' (নতুন সাহিত্য), 'মহাকাব্য' (পরিচয়), আর 'বিদ্যাসাগরের চটিজুতো' (স্বাধীনতা)। এর মধ্যে 'রুদ্র-মল্লার-'এ তবু তাঁর শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়, বাকী দুটি আর যা-ই হোক, কবিতা হয়নি। খুব বেশী রেগে গেলে রাগটাকেও যে ঠিকমতো প্রকাশ করা যায় না, এটুকু অন্তত তাঁর বোঝা উচিত।

সুভাষও উদ্দেশ্যবাদী লেখক; তবে তাঁর সব চাইতে বড় গুণ, উদ্দেশ্যকে তিনি শিল্প-সৌকর্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেন। সুরে সুর না মিলিয়েও তাই তাঁর কবিতা পড়া যায়। এবং পাঠক যতই না কেন ভিন্নমতাশ্রয়ী হোন, রসোপভোগের ব্যাপারে সেই মতদ্বৈধ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কবিতার যে নিজস্ব কিছু-কিছু দাবী-দাওয়া আছে, তা তিনি জানেন এবং উদ্দেশ্যের খাতিরে বড় একটা সেই দাবীকে তিনি লঙ্ঘন করেন না। এবারেও করেন নি। একটিমাত্র কবিতা তিনি এবারে লিখেছেন, 'লাল টুকটুকে দিন' (স্বাধীনতা)। কবিতাটি ভাল এবং আন্তরিক। এই আন্তরিকতার গুণে মণীন্দ্র রায়ের কয়েকটি কবিতাও —'অনন্যা' (আনন্দবাজার), 'অসম্পূর্ণ' (দেশ), আর 'ফাঁদ' (স্বাধীনতা)—ভাল হয়েছে। অরুণ মিত্রেরও একটিমাত্র কবিতা চোখে পড়ল। মঙ্গলাচরণ কিছু লেখেন নি।

তরুণতর গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, আর অরুণ সরকার। ইতিমধ্যেই এ'রা উৎকৃষ্ট কিছু-কিছু কবিতা লিখেছেন। তিন-জনেই সম্ভাবনাপ্রযুক্ত কবি। কবি-স্বভাবে নম্র, তবু দৃঢ়কণ্ঠ। বিশেষ আগ্রহ নিয়েই অলবেরুনী এ'দের ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

গোবিন্দ চক্রবর্তী এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মেজাজ এ-তিন-জনের থেকে কিছু আলাদা। এ'রা এবারে কয়েকটি করে ভাল কবিতা লিখেছেন। দেবদাস পাঠকের 'সাগরিকা' (দেশ), আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'বুধুয়ার পাখি' (আনন্দবাজার)-ও ভাল কবিতা। দুটি কবিতার মধ্যেই যে স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে, সেটা ভাল লাগার মতো।

কবিতা-সংগ্রহের দিক থেকে 'আনন্দ-বাজার' আর 'দেশ', এ দুটি কাগজই সেরা। ছাপানোর ব্যাপারে আপনারা যত্নও নিয়েছেন অনেক। তাছাড়া, 'দেশ'-এর কবিতাগুলির মধ্যে যে আশ্চর্য স্বর-সঙ্গতি ঘটেছে, অন্য কোথাও তার দেখা পাওয়া গেল না। এটা কি নিতান্তই দৈব? না-কি আগে থাকতেই এদিকে নজর দিয়েছিলেন?

* * *

চিঠিখানা যে শেষ পর্যন্ত পড়েছেন, তার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রতিদানে কোন ধন্যবাদের আশা অলবেরুনী রাখে না। কেননা, এ-চিঠি পড়ে যে আপনি তার উপরে খুশি হতে পারবেন না, তা সে জানে। আপনি আশা করেছিলেন নিরঙ্কুশ সমালোচনা, তার জায়গায় সে একখানি প্রায়-নির্জলা স্তুতিবচন লিখে পাঠাল। ভাবছেন সব-কিছুই তার এত ভাল লাগে কেন। ভাল কি লাগে, ভাল লাগায়।

রাত এখন প্রায় পাঁচটা বাজে। সেই যে সে সন্ধ্যাবেলায় কাগজ-কলম নিয়ে বসেছিল, তারপরে আর ওঠেনি। আরো কিছুক্ষণ। তারপরেই যমুনার শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘরখানি এক আশ্চর্য প্রসন্নতায় ভরে উঠবে। আরো কিছুক্ষণ। একটু-একটু করে আলো ফুটবে। সকালে আবার তার ওখলায় যাবার কথা। যাবে না কি? জীবনকে—যা নিয়ে জীবন, তার সমস্ত কিছুকে—যাতে ভাল লাগে, অদৃশ্যে থেকে কে যেন তার সব আয়োজনই সম্পূর্ণ করে রেখেছে। ভাল কি সাধে লাগে, ভাল লাগায়।

ভালবাসা জানবেন। ইতি—৮।১১।৫৩

স্বয়ম্বর

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

হয়ত সীতা শিবের তপস্যা করেছিলেন। শৈব বিক্রমে তাই হরধনুতে গুণ চড়াতে হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রকে। বাহুবলে আস্থাবান শ্রীরামচন্দ্র সেদিন ভাগ্যং দেহি যশো দেহি বলে শিবপ্রিয়া পার্বতীকে স্মরণ করেছিলেন কি না জানি না; তবু সত্য হোক আর মহাকাব্যই হোক, রামের সঙ্গে সীতার, লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার, ভরতের সঙ্গে মান্ডবীর, আর শ্রুতকীর্তির সঙ্গে শত্রুঘ্নের বিবাহ মনে হয় যেন এক একটি পূর্ব পরিকল্পিত সাগ্রহ ব্যবস্থা। হরধনুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হল শ্রীরামচন্দ্রকে; সঙ্গে সঙ্গে পাণিগ্রহ বিষয়ে প্রশ্নপত্র থেকে রেহাই পেলেন তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ। ঊর্মিলাকে পেতে লক্ষ্মণকে কোন কৌশিষ করতে হল না রাজা দুষ্যন্তের মতো মৃগয়ায় বেরিয়ে; আর ঊর্মিলোকেও সলজ্জিত নেত্রে খুঁজে নিতে হল না বহু রাজপুত্রের মাঝ থেকে লক্ষ্মণকে স্বয়ম্বর সভায়। আলগোছে ঠিক হয়ে গেল তাঁদের জীবনসঙ্গী। অভিসার-অনিশ্চয়তায় কেঁপে উঠলো না তাঁদের মন কোন গন্ধর্ব প্রতীক্ষায়—প্রাণ ও প্রেমের প্রতিভূ হয়ে গেল অযোধ্যা ও মিথিলা; রাজা জনক আর রাজা দশরথের বোঝাপড়ায়।

মহাকবির কৃপাদৃষ্টি সকলে পান না। যদি পেতেন, তা হলে এই বিবাহ-উদ্বেল জীবনসমুদ্র থেকে রেহাই পাবার একটা উপায় হয়ত পেতেন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বাস্তব রাজ্যেও। মণিমাণিক্য থেকে আরম্ভ করে সামান্য পিলসুজ পর্যন্ত তখন দাবী-দাওয়ার টানাহেঁচড়া থেকে কিঞ্চিৎ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। কল্পনা ও বাস্তব যেহেতু কোনকালেই পুরোপুরি সংযোজিত হতে পারে নি, তাই [illegible]হ ব্যাপারে কয়েকটি জনপ্রিয় স্ব[illegible] করতে হয়েছিল সেকালের রাষ্ট্রকে, যথা (১) অভিভাবক কর্তৃক নির্দিষ্ট বিবাহ বা "আবাহ বিবাহ" (২) গন্ধর্ব বিবাহ ও (৩) স্বয়ম্বর।

অভিভাবক কর্তৃক নির্দিষ্ট বিবাহ বা আবাহ বিবাহে ভাবী বরবধূর স্বাধীন মতামতের স্থান যেমন কম, গন্ধর্ব মতে বিবাহে অভিভাবকের মতামত তেমনি নিষ্প্রয়োজন। আর স্বয়ম্বরের তো কথাই নেই; সেখানে কন্যার স্বামী নির্বাচনে পুরোপুরি স্বাধীনতা। আবাহ বিবাহে অভিভাবকের মতামত ও ভালমন্দ বিচার বরবধূর মঙ্গলামঙ্গল নিরপেক্ষ। ছেলে-মেয়ের মতামতের কোন কথাই সেখানে ওঠে না। সেকালে কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে জন্মাবার পূর্বেই অভিভাবকেরা পুত্রকন্যার বিবাহে চুক্তিবন্ধ হতেন। বিবাহের সময় কখনো কখনো কন্যা পক্ষও টাকাকড়ি পেতেন। ছোট হোক বড় হোক বিবাহ ব্যাপারটা উৎসবের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। উপযুক্ত বয়সে ছেলেমেয়ের বিবাহ স্থির করা যেমন অভিভাবকের কর্তব্য বলে গণ্য হত, তেমনি গন্ধর্ব মতে অর্থাৎ ছেলেমেয়ে স্বেচ্ছায় ভালবেসে যে বিবাহ করতো তা-ও সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য ছিল না। রাজা দুষ্যন্ত ও আশ্রমকুমারী শকুন্তলার বিবাহ নিতান্তই গন্ধর্বমতে বিবাহ। হতে পারে এটা কবি-কল্পনা; কিন্তু তা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরে একথা কী করে বলি! এমন কি পিতৃ আদেশেও যে কন্যা গন্ধর্ব-মতে স্বামী বরণ করতো তার দৃষ্টান্তও আছেঃ পিতৃ আদেশে নাগরাজকুমারী ইরান্ধতী স্বয়ম্বর উদ্দেশ্যে হিমালয়ের সমস্ত সুন্দর ফুল আহরণ করে নৃত্যগীত সহকারে যক্ষ সেনাপতি পুষ্পকের মন জয় করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। হয়ত এটা একটা কিংবদন্তী মাত্র; কিন্তু সমাজকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে কিংবদন্তী।

প্রাচীন সাহিত্য থেকে যতদূর জানা যায়, সাধারণত রাজকন্যাদের বিবাহ ব্যাপারে স্বয়ম্বর সভা অনুষ্ঠিত হত। সাধারণ মানুষের পক্ষে আবাহ বিবাহ ছিল সহজ পথ। রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভার দুটো উদ্দেশ্য হয়ত ছিল—(১) বহু উপযুক্ততার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে কন্যার স্বাধীন মতামত; (২) কূটনৈতিক; কারণ, আবাহ বিবাহে কন্যাপ্রার্থী অন্যান্য রাজন্যবর্গের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্বয়ম্বর সভায় স্বেচ্ছায় রাজকন্যার পতি-মনোনয়নে পিতৃদায়িত্ব নেই বললেই চলে। তবু স্বয়ম্বর সভাকে উপলক্ষ করে যে রাষ্ট্রনৈতিক বৈরিতা ও মাৎসর্যের অবতারণা হত, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে দ্রৌপদী ও দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায়। নলোদয় কাব্যে নল-দময়ন্তীর পূর্বানুরাগের কথা জানা যায়। বিদর্ভরাজ তা অবহিত ছিলেন। তখন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সুন্দরী রাজকন্যাদের জন্য স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত। প্রচলিত রীতি বজায় রাখতে বিদর্ভরাজ কন্যাকে স্বয়ম্বর নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন। বিদর্ভরাজ ভীম সেই স্বয়ম্বর সভায় আসবার জন্য দেশের প্রধান প্রধান নৃপতিদের আমন্ত্রণও করেছিলেন। আমন্ত্রণ অবশ্য লোকাচার মাত্র; মনে মনে নলকেই দময়ন্তী পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং নলোদয় কাব্য থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ম্বর সভা কখনো কখনো রাজকন্যার স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব আরোপ করবার জন্য "লোকাচার" ছিল মাত্র; কারণ গন্ধর্বমতে রাজপুত্র-রাজকন্যার প্রেম অবিচ্ছিন্ন প্রতিপন্ন হলেও, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে এবং প্রজাদের অটুট শ্রদ্ধা ও আস্থা বজায় রাখতে সর্বজনানুমোদিত পন্থা অনুসরণই ছিল বিধেয়। ইন্দ্র, যম, বরুণ ও অগ্নি যখন নলকে দিয়ে দময়ন্তীর কাছে তাঁদের একজনকে স্বয়ম্বর সভায় পতিত্বে বরণ করবার জন্য অনুরোধ করে পাঠালো, তখন দময়ন্তী নলের প্রতি আসক্তি জানিয়েছিল এই বলে,

"অন্য জন ভজিব হেন না বলিও বাণী।
শরীর ছাড়িব আমি তোমা মনে গণি॥
বিষ খাইয়া মরিব কিম্বা অগ্নিতে শরণ।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন॥

(বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত
—পৃঃ ৮৪-৮৫)

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা অবশ্য এমনিতরো পূর্বানুরাগের নির্দেশ দেয় না। অর্জুনকে পতিত্বে বরণ করতে দ্রৌপদীর মনে বাসনা যদি থেকেও থাকতো, তা হলেও স্বয়ম্বর সভায় ছদ্মবেশী অর্জুনকে চেনা-জানার উপায় ছিল না। তদুপরি লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছিল যে কোন অভিলাষীর করণীয়। এমনিতরো কঠিন

রীক্ষা যেখানে পাণিগ্রহ নিরূপক, সেখানে ন্যার স্বাধীন মতামত প্রকাশ বাস্তবিক দুষ্কর; কারণ চালচলনে সুশ্রী না হয়েও কুশলী ধনুর্বিদের পক্ষে পরীক্ষার কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অধিকতর। মহাভারত থেকে জানা যায় যে রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যার স্বয়ম্বর উপলক্ষে এই ঘোষণা করেছিলেন ঃ—

"এই ধনুকে গুণ দিব সাবধানে।
এই নক্ষত্র (যেবা) হানিব পঞ্চবাণে॥
সেই মোর কন্যার অভিলাষী ধনুর্দ্ধর।
দ্রুপদ ঘোষণা দিল রাজ্যের ভিতর॥
এবং,
"পৃথিবী মণ্ডলে আছে যত নৃপবর
নানা বেশে আইলা সব পঞ্চাল নগর॥"
(বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত—পৃঃ ৩১)

তারপর স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী যখন এলেন, তখন দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সভায় যে সকল বিশিষ্ট নৃপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শৌর্যের পরিচয় জানালেন দ্রৌপদীকে। অবশেষে "মৃগ-চর্ম কাঁধে কৌপীনভূষিত" ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য হলেন তখন হর্ষে বিষাদের অবতারণা হয়েছিল পঞ্চাল নগরে ঃ একদিকে ছদ্মবেশী পঞ্চপাণ্ডব ও অপরপক্ষে মাৎসর্যপরায়ণ অন্যান্য নৃপতিবৃন্দের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ম্বর সভার কূটনীতি এক আধটুকু থেকে থাকলেও তা বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, কারণ "পাওয়া" আর "না-পাওয়ার" কিম্বা "থাকা" আর "না-থাকার" (Haves and Have nots) বিবাদ চিরন্তন।

রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধা এবং পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের কথা ছেড়ে দিলেও, গন্ধর্বমতে বিবাহ কিম্বা স্বয়ম্বরের একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে সেখানে আবাহ বিবাহের ন্যায় বৈষয়িক দাবীদাওয়ার বালাই নেই। অবশ্য একালেও গন্ধর্বমতে বিবাহে দাবীদাওয়ার কথা ওঠে না। অথচ, আবাহ বিবাহে প্রাচীন কালেও পণপ্রথা ছিল, যদিও একালের পণপ্রথা ও সেকালের পণপ্রথার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সেকালে "পণ" সক্ষমের নিদর্শন হিসেবে বরবধূর প্রাপ্য ছিল; একালে কথাটা অনেক সময় চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরিত দলিল-দস্তাবেজের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। "পণ" কথাটির অর্থ মূল্যও বটে। তাই মনে হয় "পণ" কথাটি এসেছে প্রাচীন ভারতের মুদ্রা কার্ষাপণ বা কাহণ থেকে। এবং বিক্রেয় বস্তু বা "পণ্য" কথাটির উদ্ভবও সম্ভবত অনুরূপ।

সেকালে যত না হোক, বিশেষ করে একালে যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মের (Law of demand and supply) উপর পণপ্রথা প্রতিষ্ঠিত। অধিকতর উপযুক্ততায় মেয়ে থেকে যেমন ছেলের দর বেশী, তেমনি কোন কারণে ছেলে থেকে কন্যাপক্ষের উপযুক্ততা বেশী একথা জানা থাকলে পণের কথা একেবারেই ওঠে না। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজে অবিবাহিত মেয়েকে নিয়ে পিতামাতা দায়িত্বের বোঝা অধিককাল মাথায় রাখতে অক্ষম, তেমনি যথাসম্ভব আর্থিক ব্যাপারে সুপ্রতিষ্ঠিত "গণ্য" না হলে ছেলের দিকে বিবাহের ঝোঁক থাকে না। ফলে কখনো কখনো কন্যাপক্ষের চাহিদা ও ছেলের দিকে যোগান, কিম্বা ছেলের দিকে চাহিদা ও কন্যাপক্ষের যোগান ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে অর্থ এসে হাজিরা জানায় ব্যবধান সংকোচনে। এমনি করেই পণপ্রথার উদ্ভব, যা আমরা অধুনা সমাজে অল্পবিস্তর সংক্রামিত দেখতে পাই।

এমন কি অষ্টাদশ শতকে যখন টাকা-কড়ির মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা এতটা কমে যায় নি, তখনো পণপ্রথা অল্পবিস্তর সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজে ছিল। পরে অবশ্য সমাজে স্তরভেদ বেড়ে যাওয়ার সংগে সংগে পণপ্রথার বাড়তি-কমতি হয়েছে। এই প্রসংগে ১১৭৩ সালের একটি মধ্যবিত্ত সমাজের বিবাহের পণপত্র উল্লেখযোগ্য ঃ—

৭ শ্রীশ্রীহরি
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ—

স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়—
শ্রীযুত পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার বরাবরেষু—লিখিতং শ্রীলালমোহন দেবশর্ম্মণঃ শুভ সম্বন্ধ পত্রমিদং সন ১১৭৩ সাল আব্দে লিখনং কাঞ্চনঞ্চ আগে তোমার পুত্র শ্রীগুরুপ্রসাদ দেবশর্ম্মার আমার কন্যা শ্রীমতি শ্রীদাম্নি দেবির সহিত শুভ সম্বন্ধ নির্ণয় করিলাম তাহাতে তোমার কুলমর্য্যাদা পণ ১৪ তঙ্কা দিঞা লগ্নানুসারে সুভকার্য্য সমাপন করিব এতদর্থে শুভ সম্বন্ধ পত্র দিল ইতি তাং ১১ কার্তিক।

পণ—১৪৲
জার—
দান সামগ্রী—১১৲
বরযাত্র—৩৲
কুলাচার্যের বিদায় তোমি করিবেন
শ্রীলালমোহন দেবশর্ম্মণঃ
সাং স্বারসিনী

ইহ পত্রে মধ্যস্থ শ্রীবীরচন্দ্র শর্ম্মা লগ্নানুসারে শুভ কার্য সংপুর্ণ করিব।

উক্ত পত্র সন্দর্শনে ছেলে বিয়ে করিয়ে পণাভিলাষী পিতা বা তৎস্থানীয় অভিভাবক পণের একটা ঐতিহাসিক নজির পাবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু শিক্ষাপ্রসার, জাতিভেদ প্রথার লোপ এবং সর্বোপরি স্বাধীন চিন্তাধারা প্রসারের সংগে সংগে একালের যুবসমাজ কীভাবে পণপ্রথাকে গ্রহণ করবে জানি না। চোখে মুখে প্রগতির অভিলাষ, অথচ কার্যক্ষেত্রে পণানুরাগে স্বীকৃতি ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। এই সমস্যার সমাধান-উদ্দেশে যদি কেউ হিন্দু যৌথ পরিবারের আদর্শ অর্থাৎ পিতৃমাতৃ আজ্ঞার যুক্তি দেখান, তা হলে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে পণপ্রথার মাধ্যমে বরবধূর বেচাকেনার সম্বন্ধ আদর্শগত মর্যাদার কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখে না। পিতামাতা পুত্রকন্যার জন্য বিবাহ স্থির করতে পারেন; কিন্তু বিবাহের উপযুক্ত বয়সে ছেলেমেয়ের মতামত অস্বীকার করা বাস্তব পরিপন্থী তো বটেই, আত্ম-স্বীকৃতি বা স্বাধীনতাকেও খর্ব করে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা এই চণ্ডী বাক্যকে "পণার্থে" কিম্বা "পণ্যার্থে" রূপান্তরের প্রয়াস, স্বার্থপ্রণোদিত নীতি বাক্যের মতো শোনায়।

সেকালে অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পণ প্রথার মাধ্যমে সামাজিক বিষয়-বণ্টন সাধিত হত; কারণ, সকলেই দিচ্ছে এবং পাচ্ছে। পারিবারিক স্নেহপ্রবণতা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, সেকালের সমাজ নিতান্তই ভূমিনির্ভর সমাজ। মানুষের খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। পুত্রকন্যার বিবাহে সঞ্চিত বিত্ত নিঃশেষ হয়ে গেলেও খাদ্যাভাবে ভবলীলা

সম্বরণের আশঙ্কা ছিল না। আজকের এই নাগর-সভ্যতায় পুষ্ট সমাজে আমাদের দেশে বেঁচে থাকার প্রশ্নই গরীব ও মধ্যবিত্তের সব চেয়ে বড় সমস্যা। উদ্বৃত্ত সঞ্চয় দূরে থাক্, নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষাও বহুক্ষেত্রে দায় হয়ে উঠেছে। অথচ, কয়েক হাজার টাকার যোগাড় করতে না পারলে পিতা কন্যার বিবাহ দিতে অক্ষম। রাষ্ট্র কর্তৃক "পণপ্রথা" বেআইনী ঘোষণা হলেই যে সমস্যার ষোল আনা সমাধান হবে একথা সঠিক করে বলা মুশকিল, কারণ তখন ছেলেমেয়ের যোগান-চাহিদার বৈষম্যের সুযোগ নিয়ে "পণ প্রথার" একটা ছোট বড় কালোবাজার বা ব্ল্যাক্ মার্কেটের অবতারণাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তবে যুবসমাজ যদি পণপ্রথার মাধ্যমে বিবাহে নারাজ হয় তা হলে অবশ্য সুফলের আশা করা যায়। তখন পিতামাতা পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে অবশ্য কিঞ্চিৎ উদাসীন হবেন সন্দেহ নাই। তবে, এই স্বাধীন মতামতের পরিণাম গিয়ে দাঁড়াবে পুত্রকন্যার গন্ধর্বমতে নিজ নিজ স্বয়ম্বর ব্যবস্থায়। একালে তো স্বয়ম্বর সভার প্রশ্ন ওঠে না। ভালবেসে বিবাহ বা গন্ধর্বমতে বিবাহ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু ভারতীয় সমাজে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক স্তরভেদ এত অধিক যে এখানে মর্যাদাবোধ ও অভিরুচি পরস্পরের প্রতিপূরক না হয়ে অনেক সময় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই স্তরভেদের কারণ আর্থিক আয়-ব্যয় বৈষম্য। এদেশে মাসে চার হাজার টাকা আয়ের রাজকর্মচারী যেমন আছেন, তেমনি মাসে মাত্র চল্লিশ টাকা আয়ের রাজকর্মচারীও রয়েছে। মানুষের মধ্যে এত বড় অসাম্য অন্য কোন উন্নত দেশে আছে বলে তো জানি না। সুতরাং, সমাজের বর্তমান কাঠামোতে চল্লিশ টাকার রাজকর্মচারীর পক্ষে চার হাজার টাকার রাজকর্মচারীর কন্যাকে ভালবাসা বড় দুষ্কর। তাঁকে মোটামুটি তাঁর স্তরের আশেপাশে ভালবাসতে হবে। অত্যধিক উপরের স্তরে যাওয়া যেমনি অসম্ভব, তেমনি অত্যধিক নিম্নস্তরে যেতে অনেকেই চান না। এক্ষেত্রে "স্বয়ম্বর" নির্বাচনও এক বিরাট সমস্যা। একালে আয়ের অঙ্কে মানুষের স্তরভেদ, আর সেকালে বর্ণাশ্রম রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রে ভেদাভেদ মূলত একই বৈষম্যের সামিল। সেকালের ভেদবুদ্ধিটা অবশ্য ছিল জন্মগত; কিন্তু একালের বৈষম্য যে নিতান্তই কর্মগত একথা কী করে বলি! কারণ, একালে এই ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে পিতৃপরিচয়ের বাহবায় পিতৃস্তরে পৌঁছবার সুযোগ যৎকিঞ্চিৎ হলেও সন্তানের ভাগ্যে জোটে। নামহীন গোত্রহীন হয়েও "মহাভারতে" কর্ণ মহাবীর আখ্যা পেতে পারেন, কিন্তু একালের ভারতে হয়ত এটা মহাভারত নয় বলেই তা সম্ভব নয়।

সুতরাং স্বয়ম্বর নির্বাচনের স্বাধীনতা দিলেও পুত্রকন্যার স্বাধীনতার উপর তা যত-না নির্ভর করবে, ততোধিক নির্ভর করছে সামাজিক স্তরভেদের উপর। অর্থ যে সমাজে প্রতিপত্তির ধারক ও বাহক, সেখানে যে-কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধের মূলে রয়েছে লাভলোকসানের প্রশ্ন, সুখ-সুবিধার চিরাচরিত বাসনা। কী পেয়ে কী খাবে, কী হতে কী না হবে এই সমস্যার সমাধান যতদিন না ভারতীয় সমাজ করতে পেরেছে, ততদিন আবাহ বিবাহে পণপ্রথা কোন-না-কোনভাবে হাজিরা জানাবে। আর যদি মানুষের সুবুদ্ধি ও সুবিচার জীবনের জন্মগত অধিকারকে খর্ব করে মানুষে মানুষে সত্যিকারের মিলনের অভিলাষী হন, তা হলে আজকের দিনে গরীব ও মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহ সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন, অদূর ভবিষ্যৎ-এ বিবাহ ব্যাপারে "পণ" বা "পণ্যের" আনাগোনা লুপ্ত হতে বাধ্য। তখন সাধু ও সুধী চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট সমাজে স্বয়ম্বর নির্বাচন নিতান্তই অল্প বয়সের বাতুলতা বলে গণ্য হবে না। যে সমাজে স্বাধীন চিন্তধারার স্থান আছে বা থাকবে বলে আমরা মনে করি, সেখানে স্বাধীন কর্মপন্থা নিরূপণ অস্বীকার করার উপায় কি! যে সমাজ মানুষের প্রচ্ছন্ন চিত্ত সম্পদকে প্রাণ ও প্রজ্ঞার কাঠামোতে প্রতিষ্ঠ করতে কৃতসংকল্প, সেখানে সভা করে না হোক, অন্তত একআধটু শাঁখ বাজিয়েও স্বয়ম্বর সমর্থনে আপত্তি কি!

অকস্মাৎ

সুশীলকুমার গুপ্ত

তোমাকেও ভুলে যাই, না-ভোলার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি
ভেঙে যাই অকস্মাৎ যখন স্মৃতির আত্মাহুতি
বিস্মৃতির হোমানলে, সব গান দোলা ও মর্মর
অতল নিষ্কম্প এক স্তব্ধতায় নামায় নোঙর,
জটিল প্রশ্নের জট খুলে সব অর্থের অতীত
ব্যঞ্জনা ছড়ায় মনে, শুভ্রতার আশ্চর্য ইঙ্গিত
মোছে সব রঙরেখা, জীবনের অসীম শূন্যতা
ঢাকে মৌন গাঢ় রাত্রি, মন পাওয়া না-পাওয়ার ব্যথা
লুপ্ত প্রশান্তির ধ্যানে, কোন্ এক ক্ষুধার্ত বিস্ময়
সব মন কেড়ে নিয়ে একা একা শুধু জেগে রয়।

তখন যে আমি ঘর বাঁধি ধু-ধু আকাশের তলে
তোমার নিবিড় প্রেমে, স্তব্ধতা ডুবাই কোলাহলে,
প্রাণান্ত প্রয়াসে আলো জেলে জেলে বুঝি অন্ধকার-
সে আমি উত্তীর্ণ হই খুলে খুলে সব রুদ্ধ দ্বার
নিথর নিস্তব্ধ শূন্য জীবনের উদ্ভাসিত কূলে;
সঙ্গীহীন মৌন মন ফোটে দীপ্ত সূর্যে সব ভুলে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

চার

পাইকারি খাসপেয়ারা লোক যখন বিয়ে করে তখন তার একদল বন্ধু বউকে ভালোমন্দ বিচার না করে কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচে আবার আরেক দল তার দিকে তাকায় বড্ড বেশী আড় নয়নে। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। সেম-কোম্পানি দিনের পর দিন মেমসায়েবকে ফুল পাঠালো মিষ্টি পাঠালো, মেমের জলে শখ জেনে ছোঁড়ারা তাকে নিত্যি নিত্যি ডিঙ্গি চড়ালো, পাদ্রীর টিলা ঘন ঘন চড়ুই ভাতে নেমন্তন্ন করলো, ক্লাবে আর বাগিচা বাগিচায় বেনকুয়েট ডিনার হল; এ দলের খুশীর অন্ত নেই।

অন্য দল বিস্তর যাচাই করার পর শুধু একটি কথা বললে, 'মেয়েটি ভালো কিন্তু কেমন যেন মিশুকে নয়।'

কিন্তু তাদের সর্দার রায় বাহাদুর চক্রবর্তীই তাদের কাণা করে দিলেন আর একটি মহামূল্যবান তত্ত্বকথা বলে—বললেন, 'নেটিভদের সঙ্গে ধেই ধেই করা উভয় পক্ষের পক্ষেই অমঙ্গল। ওরা রাজার জাত, রাজত্ব করবে; আমরা প্রজার জাত, হুজুরদের মেনে চলব। এর ভিতর আবার দোস্তী ইয়ার্কী কি রে বাবা? তোমরা ভেবেছ লিবার্টি পেলে তোমাদের নূতন কর্তারা তোমাদের কোলে বসিয়ে মণ্ডা-মেঠাই খাওয়াবেন? দেখে নিয়ো, আজ আমি যা বললুম।'

তখনো স্বরাজের ছবি দিগদিগন্তেরও বহু পিছনে আণ্ডার ভিতরে বাচ্চার মত নিশ্চিন্দি মনে ঘুমুচ্ছেন। কাজেই রায় বাহাদুরের সঙ্গে এ বাবদে তর্ক করার উপায় ছিল না; এবং এ ধরণের মুরুব্বিও তখন সর্বত্রই বিস্তর মজলিস গুলজার করে এই রায়ই ঝাড়তেন। রায় বাহাদুর আবার বললেন, 'নেটিভ সায়েবে যেন তেলে জলে। সাবধান' কিন্তু মধুগঞ্জ এ সাবধান-বাণীতে কান দেবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করল না।

রায় বাহাদুর অবশ্য মেমসায়েবকে সেলাম দিতে প্রথম দিনই কুঠিতে গিয়েছিলেন। মেমসাহেব তার গালকম্বল মান-মনোহর দাড়ি দেখে একেবারে স্ট্রাক্, থ! রায় সাহেব ভালো করেই জানতেন আজকের দিনের দাড়ি-গোঁফ কামানো ছোঁড়ারা তাঁর দাড়িতে উকুন এবং/অথবা ছারপোকা আছে কি না তাই নিয়ে ফিসফাস গুজগাজ করে কিন্তু অন্তরে অন্তরে তাঁর দৃঢ়তম বিশ্বাস ছিল যে তাঁর দাড়িগোঁপের কদর প্রকৃত, রসিক রসিকাদের কাছে কিছুমাত্র নগণ্য নয়।

আদালতে বিস্তর সাহেবকে তিনি বহুবার বেকাবু করেছেন। তার দুটি কারণ; প্রথম, তাঁর আইনজ্ঞান এবং দ্বিতীয় তাঁর মনস্তত্ত্ববোধ। সায়েবের সাদা মুখ লাল, নীল বেগনি রঙের ভোল বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চটপট সমঝে যেতেন সায়েব চটেছেন, খুশী হয়েছেন, হক-চকিয়ে গিয়েছেন কিম্বা আইনের অথই দরিয়ায় হাবুডাবু খাচ্ছেন।

প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝে গেলেন, মেমসাহেব তাঁকে নেকনজরে দেখেছেন। তারই পুরো ফায়দা উঠিয়ে তিনি তাঁকে মেলা অভিনন্দন আর অভ্যর্থনা জানালেন, তিনি যে তাঁর সেবার জন্য সব সময়ই তৈরী সেকথা বললেন, তাঁর স্বামী যে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি সে কথাও উল্লেখ করলেন, এবং বলতে বলতে উৎসাহের তোড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আদালত যে এদেশে শুভাগমন করেছেন—' বলেই তাঁর মনে পড়ল, এ আদালত নয়। ঝপ করে বসে পড়ে বললেন, 'সরি, ম্যাডাম, আই ফরগট!'

মেম তো হেসেই লাল। রায় বাহাদুর ঘেমে কালো। শেষটায় মেম বললেন, 'ইটস্ ও' রাইট, রে ব্যাডুর; থ্যাংকয়্যু ভের মাচ্ ইনডীড্।'

রায় বাহাদুরের এ ভুল জীবনে এই প্রথম নয়। বুড়ো বয়সে সিনিয়র ম্যাজি-স্ট্রেটের প্রথম পুত্র সন্তান হওয়াতে তিনি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টিফিনের পূর্বে 'বারের' পক্ষ থেকে বলেছিলেন, 'আদা-লতের পুত্র সন্তান হওয়াতে আমরা সকলেই বড়ই আনন্দিত হয়েছি।'

এ ভুলটাও তিনি গোপন রাখেননি। সেদিক দিয়ে তিনি সত্যই সরল প্রকৃতির লোক। মেমসায়েবের সঙ্গে তাঁর ভেট তিনি সবিস্তর বাখানিয়া বললেন, চাপ-রাসী ইন্তাজ আলীকে যে তিনি দু' আনা বখশিশ দিয়েছেন সেটাও বলতে ভুললেন না।

সর্বশেষে খানিকক্ষণ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'সায়েবের সঙ্গে তো আমার বিশেষ পরিচয় নেই, তবু কেমন যেন মনে হল একটু বদলে গিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারলুম না।'

আড্ডা বললেন, "আপনিও তাজ্জব বাৎ বললেন, রায় বাহাদুর। বিয়ে করে

কোন মানুষ বদলায় না, বলুন দির্কিনি? অন্তত কিছু দিনের জন্য?'

সোম উপস্থিত ছিল। কেউ কেউ লক্ষ্য করলো সেও কোনো আপত্তি জানালো না।

রায় বাহাদুর বললেন, 'কি জানি, ভাই, আমার অতশত স্মরণ নেই। বিয়ে করেছিলুম কবে, সেই ঠাকুদ্দার আমলে।'

জুনিয়র তালেবুর রহমান বললে, 'সে কি, স্যর! বিয়ের পূর্বের কেসগুলোও তো আপনার খুঁটিনাটি শুদ্ধ মনে আছে।'

উকিল মেম্বাররা সায় দিলেন।

রায় বাহাদুর গুণী লোক। মুনি-ঋষিরা যে রকম এককালে এক সুরে দৃষ্টি দিয়ে হাঁড়ির খবর জানতে পারতেন তিনিও হয়ত খানিকটা ধরতে পেরেছিলেন তবে কি না ঋষিদের তিন হাজার বছরের পুরনো লেনস্ অনাদর-অবহেলায় ক্ষয়ে ঘষে গিয়েছে বলে ছবিটা আবছা-আবছা হয়ে ফুটলো।

ও-রেলি তাগড়া জোয়ান তার উপর পার্টি পরবে ভোর অবধি বেদম নাচতে পারে—একটা ডান্সও মিস্ না করে। তাই বিয়ের পর আড্ডা-ঘরের 'গ্যালা'-নাচে সবাই আশা করেছিল ও-রেলি হয় বউকে কোমরে ধরে লাফ দিয়ে টেবিলের উপর তুলে নিয়ে নাচতে শুরু করবে কিম্বা হলের মধ্যিখানের বউকে দুই ঠেঙে তুলে ধরে পাঁই পাঁই করে তার চতুর্দিকে সার্কেসি ঢঙে চক্কর খাওয়াবে। অন্ততঃ-পক্ষে টাঙ্গো নাচের সময় সে যে বউকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিয়ে গভীর দোদুল-দোলা জাগাবে সে আশা —এবং বুড়ী মেমেরা সে আশঙ্কা—নিশ্চয়ই মনে মনে করেছিলেন; কারণ বউকে, তাও আবার আনকোরা বউকে নিয়ে নাচের সময় যে ঢলাঢলি করা যায় সেটা ইংরেজ সমাজে পরকীয়াতে চলে না। ফ্রান্সে চলে, তবে নাচের মজলিসে নয়।

ও-রেলি নেচেছিল এবং তার নাচে প্রাণও ছিল কিন্তু আয়রল্যাণ্ডে নব বর এ রকম নাচের সময় যে কুরুক্ষেত্র জাগিয়ে তোলে এখানে সেটা হ'ল না। কেউ কেউ কিঞ্চিৎ নিরাশ হল বটে তবে ঝানুরা জানেন নববর (অর্থাৎ নওশাহ্—নূতন রাজা) পয়লা রাতে কি রকম আচরণ করবে তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ কখনো করতে পারে না। মদ খেলে বাচাল হয়ে যায় চুপ আর বোবা হয় মুখর—আর বিয়ে করা তো সব নেশার চেয়ে মোক্কম নেশা, খোঁয়ারি ভাঙাতে গিয়েই বাদ-বাকি জীবনটা কেটে যায়। কিন্তু তাই বলে যে সব সময় ঠিক উল্টোটাই ফলবে তারও তো কোনো স্থিরতা নেই। আবহাওয়ার জ্যোতিষিরা বললেন, বৃষ্টি হবে, অতএব আপনি ছাতা না নিয়ে বেরলেন; ফলং? —ভিজে কাঁই হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ব্যত্যয়ও তো হয়।

কাজেই পায়লোয়ান এবং নাচিয়ে ও-রেলি আড্ডা ঘরকে তার হক্কের পাকী সের থেকে এক ছটাক বঞ্চিত করাতে অল্প লোকেই তাই নিয়ে মাথা চুলকোল।

গ্যালা নাচের পর পাদ্রী-বাঙলো দিলে পিক্‌নিক্। বাইরের বেশী লোককে নেমন্তন্ন করা হয়নি, কিন্তু সোমের ডাক পড়েছিল কারণ পাদ্রীরা এবাবদে বাঙালী, সাহেব কারোরই মত এত মারাত্মক নাক-তোলা নয়। পাদ্রী টিলার পিছনে যে ছোট ছোট টিলা আর বন-বাদাড়ের আরম্ভ তার শেষ হয় কুড়ি মাইল দূরে রেল-স্টেশনে পেঁাছে। এ বনে বুনো আম, কাঁঠাল, বৈঁইচি, কালো জাম, পিণ্টি, মধুর সন্ধানে, সকাল সন্ধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায়। মৌসুমের সময় মাটিতে অগুনতি লুটকি ফুল, আর গাছের গা-ঝুলে ফুটে ওঠে রঙ-বেরঙের অর্কিড ('বাঁদরের ন্যাজ')। এ জায়গাটায় পিক্‌-নিক্ করতে গেলে তাস-পাশা নিয়ে যেতে হয় না, গাছ-তলায় বসে দুটি খেয়ে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না,—এখানে একা একা কিম্বা ছোট ছোট দল পাকিয়ে অনেক কিছুর অনুসন্ধানে বেরনো যায় আর লুকোচুরি খেলার অলিম্পিক যদি কোনো দিন তার সদর আপিস খুলতে চায় তবে গড়ি মসি না করে এখানেই সোজা চলে আসবে।

পাদ্রী-টিলাতে আপোসে বিয়ে হলেই এখানে তার পরের দিন পিকনিক। পিক-নিকওয়ালারা আবার বরবধূকে নানা ছুতোয় একা একা এদিক-ওদিক গুম হয়ে যেতে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে তাই নিয়ে চোখ ঠারাঠারি হাসাহাসি করে।

বর বধূ বিয়ের পর প্রথম কয়ে দিন একে অন্যকে চিনে নেয় ঘরে ভিতরে, বাইরে, বারান্ডায়, নদীর পাে চাঁদের আলোতে কিম্বা সমাজে—আ পাঁচজনের ভিতর। এখানে নিভৃতে বনে ভিতর একে অন্যকে চিনে নেওয়ার ভিত আরেক অভিনব মাধুর্য আছে—ওদিে বন্ধুবান্ধব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও তার নয়। ডাক দিলেই সাড়া মিলবে—ওরা তে এসেছে নব বরের নূতন শাহের খেদম করার জন্যই।

খোয়াই-ডাঙার দিকদিগন্ত-মুগ্ধ কবি পদ্মার অবিচ্ছিন্ন অবিরল স্রোতের সঙ্গে যে কবি তাঁর জীবন-ধারার মিল দেখতে পেয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, গ্রহসূর্যে, তার তারায় বিশ্ব-স্রোত বিশ্ব-গতি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করলেন সে কবি পর্যন্ত আপন বঁধুয়ার যে ছবিটিকে বুকের ভিতর এঁকে নিতে চেয়েছিলেন সেটি পত্রপল্লবের অর্ধ আচ্ছাদনে, বনানীর মাঝখানে;—

'পাতার আড়াল হতে বিকালের
আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার
কালো কেশে॥
হাসিয়া মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে—
বনসরসীর তীরে ভীরু কাঠ-
বিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।

ও-রেলি বসে রইল বুড়ো পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে বটগাছতলায়—পিকনিকের হেড্ আপিসে। অবশ্য বউ মেবলও তার গা ঘেঁষে।

বুড়ো পাদ্রী গল্প বলে যেতে লাগলেন,—চল্লিশ বছরের আগেকার কথা এসব গল্প মধুগঞ্জ বহুবার শুনেছে কিন্তু ও-রেলির কাছে নূতন।

'বুঝলে ডেভিড্ তখন আমি ছোকরা পাদ্রী হয়ে এদেশে এসেছি। সোম এ-সব জানে, তার বাপ তখন এখানে সাব রেজিস্ট্রার। আমাকে অনেক কে বোঝালে টিলাতে বাঙলো না বানিয়ে যেন নদীপাড়ে আসন পাতি। তখনকার দিনে দুপুরবেলায় এখানে বাঘ চরাচরি করত আমার একটা বাছুর চিতে নিয়ে গেল আমার চোখের সামনে, ব্রেকফাস্টের সময়

ও-রেলি শুধালে, 'টিলার মোহটা কি? আপনি তো হরিণ কিম্বা পাখি শিকারও তো করেন না।'

পাদ্রী বললেন, 'বাঘ আর ম্যালেরিয়ার ভিতর আমি বাঘই পছন্দ করি বেশী। টিলার উপর ম্যালেরিয়া হয় কম। বন্দুক দিয়ে বাঘ শিকার করা যায় কিন্তু মশা মারা কঠিন। কি বলো, সোম, তুমি তো রববার হলেই বন্দুক নিয়ে মত্ত। কত বার বলেছি, 'সোম, রববার স্যাবাথ—শান্তির দিন। এ-দিনটায় রক্তারক্তি নাই করলে'।

সোম বললে, 'স্যার, তেত্রিশ কোটি দেবতা ছেড়ে একজন দেবতা পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি?'

তার পর ও-রেলির দিকে তাকিয়ে শুধাল, 'আপনি-ই বলুন, চীফ, তেত্রিশ কোটি টাকার মাইনে ছেড়ে দিয়ে এক টাকার চাকরি নেয় কোন লোক?'

পাদ্রী বললেন, 'ওর যে সব কটা মেকি।'

সোম বললে, 'আমি পুলিশের লোক, স্যার, মেকি টাকা চিনতে না পারলে আমার সায়েবই কাল আমাকে ডিস্‌মিস্ করবেন। মেকি খাঁটিতে তফাৎ আমি বেশ জানি। কিন্তু এদিককার তেত্রিশ কোটি আর ও-দিককার একজন কেউ তো কখনো আমার থানায় এসে এজহার দেন নি। বাজিয়ে দেখব কি করে? মাঝে মাঝে সন্দ হয়, সব ক'জনাই মেকি।'

পাদ্রী বললেন, 'মাই বয়! কি বলছো?'

পাদ্রীর বুড়ী বউ স্বামীকে বললেন, 'তোমাকে কতবার বলেছি, সোমের সঙ্গে কক্‌খনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা করো না। ও যে শুধু হিন্দু তাই নয়—হিন্দুদের ভিতর অনেক সৎ লোক আছেন—ও একটা আস্ত ভণ্ড।'

তারপর ও-রেলিকে শুধালেন, 'সোম আমাদের টিলায় এত ঘন ঘন আসে কেন জানো?'

ও-রেলি হেসে পালটে শুধালে, 'কেন, আপনাদের ঝগড়া মেটাতে?'

বুড়ী রেগে বললেন, 'বিয়ে করেছ তো মাত্র সেদিন। ঝগড়ার তুমি কি জানো হে, ছোকরা? সেকথা থাক; সোম আসে শুধুমাত্র মুর্গী খেতে, বাড়ীতে পায় না বলে।'

সোম বললে, 'মাম্মি, আপনি যে ধরতে পেরেছেন, সে কথাটা—এতদিন বলেননি কেন?'

বুড়ী থ' হয়ে বললেন, 'সে কি রে! তোকে এক শ বার বলেছি, তোর বাপকে পর্যন্ত লুকিয়ে রাখিনি।'

সোম বললে, 'কই, আমার তো মনে পড়ছে না? তা কাল থানাতে গিয়ে দেখব, কোনো পুরনো নথিতে রিপোর্ট লেখা আছে কি না।'

বুড়ো পাদ্রী ও-রেলি আর মেবেলের চোখের উপর কয়েকবার স্নেহের চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এই যে ডেভিড বললে, সোম আসে আমাদের ঝগড়া মেটাতে তা সে কিছু ভুল বলেনি। আজ যে রকম ডেভিড মেবলকে নিয়ে এসেছে ঠিক তেমনি আমিও একদিন নিয়ে এসেছিলুম গ্রেসি-কে। পনরো বচ্ছর কেটে যাওয়ার পর একদিন আমাদের ভিতর সামান্য কথা কাটাকাটি হওয়াতে হঠাৎ গ্রেসি বললে, 'তবে কি আমাদের 'হনিমুন' আজ শেষ হল?' সেই সেদিনই আমি সামলে নিলুম। তার পর দেখো, কেটে গেছে আমাদের 'হনিমুনের' আরো প'ইত্রিশ বছর।'

সোম বললে, 'সে কথা মধুগঞ্জের কে না জানে বলুন। কিন্তু আমার বেলায় উল্টো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর মানে চোদ্দ বছরের জেল। আমার বেলা তারও বেশী। বিয়ে করেছি, চোদ্দ বছর বয়সে, তার পর কেটে গেছে প্রায় আঠাশ বৎসর। এখনো কেউ খালাস করবার কথাটি তোলে না।'

পাদ্রী সোমের পাতলামিতে কান না দিয়ে বললেন, 'ঠিক এই গাছতলাতেই বসেছিলুম গ্রেসিকে নিয়ে। বাঘ-ভালুকের ভয় না করে। পাশের ঝোপে কোকিল কুহু কুহু করছিল, আমাদের মনে কী আনন্দ, এমন সময় একটা হনুমান 'হুম' 'হুম' করে আমাদের সামনে দাঁত-মুখ খিঁচাতে লাগলো। গ্রেসি কখনো বাঁদর দেখেনি, প্রায় ভিরমি গিয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজলো।'

বুড়ী মেম লজ্জায় রাঙা হয়ে বললেন, 'ব্যস, ব্যস হয়েছে।'

এর পরও ডেভিড মেবল উঠলো না।

পাঁচ

দেখা যেত দু'জনকে, রাস্তা থেকে, তাদের বাঙলোর বারান্দায় ছাতা-ল্যাম্পের নিচে আরাম-চেয়ারে বসে আছে। কখনো সায়েব মেম-সায়েবের হাত-পাখাখানা এগিয়ে দিচ্ছে, কখনো মেম-সায়েব ঘরের ভিতর গিয়ে দু'হাতে দু'টো লাইম-জুস নিয়ে আসছে। আর কখনো বা সিংহলী বাটলার জয়সূর্য বারান্দার এক প্রান্তে গ্রামোফনে রেকর্ডের পর রেকর্ড বিলিতি বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই নির্জন বারান্দায়, কিম্বা টিলার বাগানের লিচু গাছতলায় দুজন পাশাপাশি বসে—সামনের কালাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে।

জ্যোৎস্না রাতে দু'জনা ডিনারের পর বারান্দা থেকে নেমে লিচু-বাগানের ভিতর দিয়ে নেমে আসত সদর রাস্তায়। সেখান থেকে চলে যেতো নদীপারে। নদী-পাড় দিয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছত গিয়ে রামশ্রী গ্রামে, যেখানে ছোট্ট কিসাই নদী বড় নদী কাজলধারার সঙ্গে মিশেছে।

কিম্বা তাদের মাথায় চাপত অদ্ভুত খেয়াল। কিসাই-কাজলের মোহনায় খেয়াঘাট; তারা সেই রাত দশটায় হাট-ফের্তাদের সঙ্গে বসত খেয়া নৌকোয়—মাতার উপর। তারপর দুপুর রাত অবধি খেয়া-নৌকোয় বসে এপার-ওপার করে বাড়ির পথ ধরতো চাঁদ যখন ডুবু-ডুবু।

মেম আসার পর সায়েব টুরে গেছে মাত্র একবার। মেমকে সঙ্গে নিয়েই গেল। ভাওয়ালি নৌকোয় করে দু'দিনের রাস্তা। রোজ সন্ধ্যায় সায়েব মেম ভাওয়ালির ছাদের উপর বসে বসে মাঝি-মাল্লার ভাটিয়ালি গান শোনে, আর কখনো বা জয়সূর্য ভলগা-মাঝির গান গ্রামোফনে বাজায়। মাঝি-মাল্লারা সে গীত শুনে তাজ্জব মানে, আর মাঝে মাঝে তার নকল করতে গিয়ে মেম-সায়েবের কাছে ধমক খায়। মেম বলে ভাটিয়ালিই ভালো—মাঝিরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে;—তাদের গান সাহেবদের কলে-বাজানো গাওনার চেয়ে ভালো, এও কি কখনো সম্ভবে। তবে কিনা সায়েব-সুবোদের খেয়াল, আল্লায় মালুম, ওদের দিল্ ওদের দরদ্ কখন কোন্ দিকে ধাওয়া করে। একদিন তো মেমসায়েব নায়ের মশলা-পেষা ছোকরাটার বাঁশের বাঁশী চেয়ে নিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে-পুছে ভাটিয়ালি সুর অনেকক্ষণ ধরে বাজালে।

এবারে নৌকোর পাইকারি ডাবা-হুঁকোতে এনরা গুড়ুক খেলেই হয়েছে আর কি!

মাঝি-মাল্লারা কিন্তু একটা বিষয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর আলোচনা করলো। সায়েব-মেম এক অন্যের সঙ্গে অত কম কথা কয় কেন?—ভাগ্যিস ওরা জানতো না যে বিয়ের আগে ওরেলি সাহেবের বাচাল বলে একটুখানি বদনামও ছিল বটে।

ভাওয়ালির হালদার বুড়ো মাঝি তালেবুদ্দিন বললে, 'খুদাতালা কত কেরামতীই না দেখালে; গোরা হল রাজার জাত—আমাদের ডাঙর জমিদারের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারলে উনি সেটা আল্লার মেহেরবাণী সমঝে দিল-খুশ হয়ে হাবেলী চলে যান। আর সেই গোরা দেখো, মেমের রুমালখানা হাত থেকে পড়ে গেলে তখ্খুনি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মেমকে এগিয়ে দেয়। আমি তো এ মামেলা বিলকুল বুঝতে পারলাম না।'

শুকুরুল্লা বললে, 'কইছো ঠিকই কিন্তু আমাগো সায়েব তো কখনো কাউরে চড় মারে নি। বল্কে, আমার মনে লয়, সায়েবরা হামেশাই কথা কয় কম, কাম করে বিস্তর। দেখছো না, যারা হাম্বাই-তাম্বাই করে বেশী, তারাই কাম করে কম।'

মশলা-পেষা বললে, 'বউয়ের লগে যদি দুই চাইরটা মিডা মিডা কথা না কইলা তয় বিয়া করলা ক্যান্।'

একই বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের মাঝি-মাল্লা চাষাভুষো অনেকক্ষণ ধরে তর্ক-বিতর্ক করতে পারে না—অবশ্য পূব বাঙলার পটভূমি নিয়ে লেখা নভেলে তারা 'গোরা' এবং 'বিনয়ের' মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নব্যন্যায়ের তৈলাধার জ্বালিয়ে রাখতে পারে। তারা আপন আপন রায় জাহির করেই চুপ করে যায়। তর্ক করে যুক্তি দেখিয়ে একে অন্যের অভিমত বদলাবার চেষ্টা করে না। তাই বোধ করি ভদ্রসমাজে নিছক অবাস্তব তর্কাতর্কির ফলে যে রকম মনকষাকষি এবং মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হয়, চাষাভুষোদের ভিতর সে রকম হয় না।

তাই আলোচনার মোড় বদলে গিয়ে সভাস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হল, 'সায়েব-মেমেরা সাঁতার কাটতে ভালোবাসে, কিন্তু নদীর জল ঘোলা হলে গোসল করে না কেন?

পূব বাঙলার লোক এখনো জানে না, সায়েবদের কাছে সাঁতার-কাটা হচ্ছে স্পোর্ট-বিশেষ—স্নানের খাতিরে তারা সাঁতার কাটতে নাবে না। আমাদের কাছে স্নান যা, সাঁতার কাটাও তা।

টুর থেকে ফিরে এসে ও-রেলি পনরো দিনের ছুটি নিয়ে একা কলকাতায় চলে গেল। সোম কিন্তু সবাইকে বললে, 'হুজুর সরকারি কাজে কলকাতা গেছেন; জানেন তো আজকাল যা 'স্বদেশী-ফদেশী আরম্ভ হয়েছে।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'দু'দিকেই বিপদ দেখতে পাচ্ছি। সায়েব যদি স্বদেশীর' পিছনে লাগে, তবে তাদের দফা-রফা। নেটিভদের সঙ্গে দোস্তী জমিয়ে ও তাদের সব হাড়হদ্দ শিখে নিয়েছে, কড়ি চালালে আর কারো রক্ষে নেই। ওদিকে ছোকরা আবার আইরিশ-ম্যান; ওর আপন দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে চলছে জোর 'স্বদেশী'। ও যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তবে তার প্রমোশনেরও তেরটা বেজে যাবে। চাই

কি, কম্‌পলসারি রেটায়ারমেণ্টও হতে পারে। থাক্‌, ওসব কথা কইতে নেই।'

জুনিয়র তালেবুর রহমান বললে, নৌকো দিয়েছেন ভাসিয়ে মাঝগাঙেগ—আর তারপর করছেন নোঙগরের খোঁজ। সোমের সামনে খুলে দিয়েছেন শুঁটকির হাঁড়ি, আর এখন বলছেন, নাক বন্ধ করো।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'বাবা, সুধাংশু—'

সোম জিভ কেটে, দু'কানে হাত দিয়ে বললে 'রাম, রাম।'

এবারে ও-রেলি যখন কলকাতা থেকে ফিরল, তখন সকলেরই চোখে পড়ল তার মুখের উপর গাম্ভীর্যের ছাপ।

সায়েবরা কলকাতা থেকে ফিরলে, তা সে রাত বারোটায়ই হোক তখখুনি যায় ক্লাবে, সবাইকে কলকাতার তাজা খবর বিলিয়ে তাক্‌ লাগিয়ে দেবার জন্য—শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এলে মেয়ে যে রকম ধুলো-পায় সইয়ের বাড়িতে ছুট লাগায়। ক্লাবের সবচেয়ে নিরস বেরসিকও তখন কয়েকদিন ধরে আরব্য উপন্যাসের শেহেরজাদীর কদর পায়।

ও-রেলি ক্লাবে গেল ফিরে আসার তিনদিন পরে।

বুড়ো পাদ্রীর চোখের জ্যোতি কম। তার উপর এতখানি সাংসারিক বুদ্ধি নেই যে, কারো চেহারা খারাপ দেখালে তন্দণ্ডেই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধতে নেই। ও-রেলিকে দেখামাত্রই শুধালেন, 'সে কি হে ডেভিড, তোমার চেহারা ও-রকম শুকিয়ে গেছে কেন?

মাদামপুরের বুড়া-সাহেব ঝানু লোক। ও-রেলি আমতা আমতা করছে দেখে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ করেছিল হয়তো। কলকাতা বড় নাস্‌টি প্লেস—ডিসেণ্ট্রি আর ডিসেণ্ট্রি। কেন যে মানুষ কলকাতা যায় বুঝতে পারিনে। আমি যখন প্রথম মাদামপুর আসি—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার মেম বললেন, 'তা মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার নুতন খবর কি?'

মাদামপুরের বড় সায়েব তখনো আশা ছাড়েন নি; বললেন, 'কলকাতায় যেতে আঠারো দিন লাগত, আর—'

বিষ্ণুছড়া বাগিচার বড় মেমে মীরপুর বাগিচার ছোট মেমে যেন সাপে নেউলে। একে অন্যে দেখা হলেই টুকাটুকি ঠোকাঠুকি। বললেন, 'মিস্টার ও-রেলি, কলকাতার সব খবরই নুতন। ফার্পোতে নেটিভরা ঢুকতে পারছে, সে-ও নুতন খবর, ময়দানে ঘাস গজাচ্ছে, সেও নুতন খবর।

বিষ্ণুছড়ার মেম ছোবল মারতেন, কিন্তু তাঁর সায়েব শান্তভাবে মেমের হাতের উপর হাত রেখে তাঁকে চেপে দিয়ে বললেন, 'তাজা-বাসি আমরাই যাচাই করে নেব ও-রেলি। ওসব ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না।'

আগে হলে ও-রেলি এতক্ষণ সুবোধ ছেলের মত টু বী সীন, নট টু বী হার্ড হয়ে বসে থাকতো না। ততক্ষণে হয়ত সপ্রমাণ করে দিতে গড়ের মাঠে সত্যই একরকম নুতন ঘাস গজাচ্ছে, তার রঙ গোলাপি, ফুল সবুজ আর সে ঘাস নেটিভ মাঠে পা ফেললেই গোখরোর মত ছোবল মারে—ডেঞ্জারেস পয়জন্‌—কিম্বা হয়ত গম্ভীরস্বরে বয়ান করতো, নেটিভরা এখনো ফার্পোতে ঢুকতে পায়নি; তবে কিনা এ খবরে কিছুটা সত্য, এখন ফার্পোর টেবিল-চেয়ার সরিয়ে সেখানে কার্পেটের উপর গোবর নিকনো লেপানো হয়েছে, আর তারই উপর সায়েবরা থালা পেতে হাপুস-হুপুস শব্দ করে খিচুড়ির সঙ্গে মালেগাটানি সুপ মাখিয়ে খাচ্ছেন।

অবশ্য ও-রেলি একেবারে চুপ করে বসে রইল না। কিন্তু খবর বিলোতে গিয়ে দেখল এবারে কলকাতায় সে তেমন কিছুই দেখে নি। গ্র্যাণ্ডে ব'সে লাঞ্চ খেয়েছে অথচ চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নি, ক্যালকাটা ক্লাবের বারে বসে অনেকক্ষণ ধরে এটা-ওটা চুক চুক করেছে; কিন্তু এখন আর স্মরণ করতে পারলো না, পরিচিত কার কার সঙ্গে সেখানে দেখা হয়েছে।

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'ও-রেলি গোপন সরকারি কাজে গিয়েছিলেন কলকাতায়, আর তার ফাঁকে ফাঁকে করেছেন পার্টি-পরব। দুটোয় জট পাকিয়ে গিয়েছে বলে কি বলবেন, কি বলবেন না, ঠিক করতে পারছেন না।'

ও-রেলি বুঝলে, এটা সোমের কীর্তি।

প্রকাশ্যে বললে, 'ঠিক তা নয়; তবে এখন কলকাতার মৌসুমটা মন্দা যাচ্ছে। বেশীরভাগই দার্জিলিঙ কিম্বা শিলঙে। আমার পরিচিত অল্প লোকের সঙ্গেই সেখানে দেখা হল।'

মীরপুর বললেন, 'সে কি মিস্টার ও-রেলি? আপনি তো এক সেকেণ্ডে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারেন বন্ধ কালা-বোবার সঙ্গে, আর আপনি করছেন পরিচয় অভাবের শোক!'

মনের ভিতর চমক খেয়ে ও-রেলি দেখলে, কথাটা একেবারে খাঁটি। এই তার জীবনে প্রথম যে সে কলকাতায় কোনো নুতন পরিচয় জমাতে পারে নি। তবে কি সে জমাতে চায় নি? কেন, কি হয়েছে তার?

কিছু একটা বলতে হয়—যে লোক গল্পবাজ, সে কোনো কারণে চুপ মেরে গেলে সমাজে তার বড় দুরবস্থা—তাই আমতা আমতা করে বললে, 'না, না সেদিক দিয়ে আটকায় নি।' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল, ক্রিকেটার হেণ্ডারসনের সঙ্গে হুয়াইটেওয়ের দোকানে তার দেখা হয়েছিল। ও-রেলি বেঁচে গেল। শুধালে,

'ক্রিকেটার হেণ্ডারসেনকে চেনেন?'

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'আমার দুরসম্পর্কের বোন-পো হয়।'

মীরপুর-মেম কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু তার পূর্বেই ও-রেলি ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিলে—মীরপুরে বিষ্ণুছড়ার কথা কাটাকাটিকে সে 'স্বদেশী' বোমার চেয়েও বেশী ডরাত—বললে, 'একটা ভালো ইংলিস ক্রিকেট টীম নিয়ে আসছে-শীতে ইণ্ডিয়া আসতে চায়। ছেলেটার তাই নিয়ে উৎসাহের অন্ত নেই। ভারতবর্ষের সব কটা 'পিচ' সে তার আপন হাতের তেলোর চেয়েও ভালো করে চেনে। আমার তো মনে হ'ল 'পিচ'গুলোর ঘাস বকরির মত চিবিয়ে খেয়ে যাচাই করে নিয়েছে,

কোনটা বোলারের স্বর্গ আর কোনটা ব্যাটসম্যানের—দরকার হলে 'কোয়ের ম্যাটিঙ' ও চিবুতে তৈরী। আমি বললুম, 'অতশত মাথা ঘামাচ্ছো কেন হেণ্ডারসন, এদেশের ক্রিকেট বড্ড কাঁচা; তোমরা অনায়াসেই জিতে যাবে।' হেণ্ডারসন বললে, 'তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। বোম্বায়ের জ্যাম সাহেব—তোমরা নাকি নামটা অন্য ধরণে উচ্চারণ করো—তা তিনি 'জ্যাম' হোন আর জেলিই হোন, বিলেতে তিনি তাড়ু হাঁকড়ে সবাইকে ক'শ' বার জেলি বানিয়ে দিয়েছেন, তার খবরও তো তোমার অজানা নেই। কে বলতে পারো বলো, কালই এদেশে আরো পাঁচটা জ্যাম বেরিয়ে যাবে না এবং হয়ত জ্যাম নয়, তার চেয়েও শক্ত মাল—'হার্ড নাট'।' আমি উত্তরে বললুম, 'অসম্ভব তো কিছুই নয়, তবে কি না কাল আমার ন্যাজ গজাতে পারে বলে আজ তো আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাইনে কিম্বা ন্যাজ সাফসুতরো রাখার জন্য বুরুশও কিনিনে'।'

মাদামপুরের বুড়ো সাহেব লক্ষ্য করলে, ক্রিকেটের গল্পে উত্তেজিত হয়ে ও-রেলি তার মন-মরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছে। খুশী হয়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'তা তুমি এখানে একটা ক্রিকেট টীম বানাও না কেন?'

ও-রেলি বললে, 'ভাবছি, শমশের-গঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগাবো। সম্প্রতি লোকটা একটা গুম খুনে জড়িয়ে পড়েছিল—অথচ সোম পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে প্রমাণ খাড়া করতে পারলে না। আমি কিন্তু জমিদারকে ভাঁওতা মারলুম, সব প্রমাণ তৈরী, এবারে বাছাধনকে ঝুলতে হবে। পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি, তখন ভবিষ্যতের জন্য তার বুকে যমদূতের ভয় জাগিয়ে দিয়ে যেন নিছক মেহেরবাণী করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। টাকা চাইলে এখন তার ঘাড় দেবে।'

সবাই কলরব তুলে নূতন করে আবার সেই গুম্-খুনের পোস্টমর্টেম লেগে গেলেন। ইংলণ্ডে হিজ ম্যাজেস্টির পরেই ক্রিকেট-আলোচনা আড্ডার রাজা কিন্তু পূব-বাঙলার গুম খুন রাজারও রাজা, অর্থাৎ মন্ত্রী—অবশ্য দাবা খেলার, রাজার চেয়ে ঢের বেশি তাগদ ধরেন। কত রকম কথা কাটাকাটিই না হল, বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, জমিদারের হুকুমে বড় ভাইয়ের চোখের সামনে ছোট ভাইকে জ্যান্ত পোতা হয়েছিল, মীর-পুরের মেম বললেন, গুলতান, লোকটার বড় ভাই-ই নেই, আর সে খুন হয়নি আদপেই; পীরপুরের জমিদারের টাকা খেয়ে গুম হয়ে গিয়েছে শমসেরগঞ্জকে জড়াবার জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলেছিল। ইতিমধ্যে ও-রেলি কেটে পড়েছে।

মাদামপুরকে বাগানে ফেরার সময় বিড় বিড় করে বলতে শোনা গেল, ও-রেলিকে বোঝা ভার। (ক্রমশ)

লেডিস সীট

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

কে গো তুমি স্বাধিকারপ্রমত্তা,
রাজপথে বেপথুমতী রাষ্ট্রকন্যা?
আমাদের এখানে সময় নেই,
সময় নেই পুষ্পবিন্যাসের,
সময় নেই পুষ্পবিলাসের।

ট্রপিকের এই নীল রাজ্যে ফল পাকে পূর্বাহ্নে।
মানুষ হবার খবর পাই স্কুলের শেষের দিকে।
এখানকার বাতাস প্রিয়প্রসঙ্গমুখর;
পীচের পথে ছড়ানো প্রখর যৌবন-সমাচার।
এই ভয়াল ভ্রমর-রাজ্যের একান্তে, তুমি,
অকালসন্ধ্যার কৃষ্ণকলি।

এখানকার যৌবন ধুলোয় ধুসর।
শুধু শ্যাম শষ্পকুঞ্জে শয্যা পাতে
গণ্যমান্য ভাগ্যবানেরা।
মৃণালবাহু—পদ্মআঁখি নয়
রাম-শ্যাম-যদুর জন্যে!
কিন্তু ঘরে যে এলো না, তার
চুলের সুবাস মেলে
এক হাত দূর থেকে।
আঙিনার কাঁচখণ্ডে ধরা পড়েছে অনন্ত আকাশ!
পদ্মআঁখির আজ্ঞা এলো না আর
বহুজনের এই রাজ্যে।
কিন্তু কণ্টকিত পদ্মবনে মিলেছে
অবাধ বিচরণের অধিকার।
এস কাঙাল রাজ্যের স্বয়ংবৃতা কল্যাণী!
এবার থেকে দেবীর আগমন যন্ত্রযানে!

পাক-ভারত মৈত্রী ও কাশ্মীর

কাজী আবদুল ওদুদ

নানা কারণে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্বন্ধ [দূ]র হতে পারেনি। একালে স্বাধীনতা [সং]গ্রামের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের [সে]ই পুরাতন মনোমালিন্য হলো উৎকট। [ফ]লে তাদের বহু শতাব্দীর যৌথ বাস-[ভূ]মি খণ্ডিত হলো—নাম পেলো ভারত ও [পা]কিস্তান, লৌকিক ভাষায় হিন্দুস্থান [ও] প্যাকিস্তান। দুটিই অবশ্য হলো স্বাধীন [রা]জ্য। সূচনা থেকেই এই যমজ রাজ্য-[দ্ব]য়ের মধ্যে বন্ধুভাবের পরিবর্তে শত্রু-[ভা]ব যে প্রবল হলো তা দুঃখকর যতই [থা]ক অপ্রত্যাশিত নয়।

কিন্তু কাল পরিবর্তনশীল। কখনো [ক]খনো সেই পরিবর্তন হয় যেন আমূল। [ভা]রত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার কয়েক [ব]ৎসরের প্রবল রেষারেষি ও অবিশ্বাস যে [রূ]পান্তরিত হতে চাচ্ছে সমঝোথায় ও [প্র]ীতিপূর্ণ আদান-প্রদানে তার কিছু [কি]ছু স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সে-[স]বের একটি এই যে এই দুই দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাও প্রতিপক্ষের প্রতি বিষোদ্গারের চাইতে এই দুই নিকটতম প্রতিবেশীর মধ্যে সম্প্রীতি ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বেশী করে চাচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতাদের বলা হয় বটে নেতা, কিন্তু আসলে 'নেতা' তাঁরা যতখানি 'নীত' তার চাইতে অনেক বেশী —জনসাধারণের প্রবণতা কোন্ দিকে হয়েছে তাঁদের নেতৃত্বে সাধারণত তারই পরিচয় থাকে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস ও মনোমালিন্যের পরি-বর্তে প্রীতি ও মৈত্রী যে জোরালো হতে চাচ্ছে যাঁরা জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য ও জগদ্ব্যাপী শান্তির প্রতিষ্ঠা চান তাঁদের জন্য এটি সত্যই এক সুসংবাদ।

কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই সৌহার্দ্য ও সমঝোথা প্রতিষ্ঠিত হবে কি উপায়ে? কিসে হবে তার সূত্রপাত? মানুষের জীবনে সুসময় আসে। কিন্তু সেই আসাটাই বড় কথা নয়, বড় কথা তাকে কাজে লাগাবার মতো বুদ্ধি ও দক্ষতা থাকা। এই যে সুসময় হিন্দু ও মুসলমানের জীবনে এসেছে একে সার্থক করবার পন্থা কোন্‌টি?

রাজনীতিকদের বেশ একটি উল্লেখ-যোগ্য দল বলছেন, কাশ্মীর সমস্যার ন্যায়-সঙ্গত ও ত্বরিত সমাধান পাক-ভারত মৈত্রী সাধনের পথে প্রথম ও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ। কাশ্মীর সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে একটি অতি বড় সমস্যা তাতে সন্দেহ নেই। এই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে' ভারতের ও পাকি-স্তানের যত লোকক্ষয় ও অর্থক্ষয় হয়েছে, জাতি সঙ্ঘের দফ্‌তরে যত দীর্ঘায়িত বিফল চেষ্টা চলেছে, তাতেই প্রমাণ রয়েছে এর গুরুত্বের। কিন্তু সমস্যাটি এত বড় বলেই এর মীমাংসার উপায়ও ভাবতে হবে ধীর মস্তিষ্কে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে নয়। সেই ধীরতা অবলম্বন করলে হয়ত ব্যস্ত সমস্ত রাজনীতিকদেরও বুঝতে দেরী হবে না যে এই কাশ্মীর-সমস্যা ধারণ করেছে এক অতিশয় জটিল রূপ কোনো সহজ উপায়ে যার মীমাংসা হবার নয়।— কাশ্মীরের অবস্থিতি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, আর এর অধিবাসীদের শতকরা প্রায় আশি জন ধর্মে মুসলমান। কাজেই যেভাবে দেশ বিভক্ত হয়েছে তাতে এর পাকিস্তান ভুক্ত হবারই কথা। কিন্তু এটি একটি দেশীয় রাজ্য, সেই রাজ্যের রাজার ইচ্ছায় এর ভারতভুক্তি ঘটে। (সেই রাজার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয় এর একজন জনপ্রিয় মুসলিম নেতারও ইচ্ছা।) কাশ্মীরের ভারতভুক্তি যে বৈধ ভারত সরকার প্রথম থেকেই সেই দাবি করে আসছেন, অবশ্য চূড়ান্তভাবে এর ভারত-ভুক্তি বা পাকিস্তানভুক্তি নির্বাচিত হবে ভবিষ্যতে কাশ্মীরের সর্বসাধারণের ভোটের দ্বারা এই অঙ্গীকার সহ। আর পাকিস্তান সরকার এই ভুক্তির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করতে কসুর না করলেও এর বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেননি; তাঁরা বরং বহুদিন থেকে দাবি করে আসছেন এই চূড়ান্ত 'ভুক্তি' সম্পর্কে অবিলম্বে গণভোট গ্রহণ কাশ্মীরবাসীদের উপর থেকে ভারতীয় সৈন্যের চাপ সরিয়ে নিয়ে। সত্বর এই গণভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত পাকি-স্তানের সঙ্গে একমত, শুধু তাঁদের বড় দাবি এই যে কাশ্মীরের এই গণভোট গ্রহণ ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যেকার ব্যাপার, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার ব্যাপার নয়, পাকিস্তান কাশ্মীরের যে অঞ্চলের উপরে অবৈধভাবে তাঁদের সৈন্য-সামন্ত মোতায়েন রেখেছেন তা সরিয়ে নিয়ে এই গণভোট গ্রহণ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করুন।

কিন্তু কাশ্মীরের পাকিস্তান-অধিকৃত অঞ্চল থেকে সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নেওয়া পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কি সম্ভব-পর? আর পাকিস্তান যদি তাঁদের সৈন্য-সামন্ত সরিয়ে না নেন তবে কাশ্মীরে চূড়ান্তভাবে গণভোট গ্রহণ ভারত সরকারের পক্ষেই কি সম্ভবপর? পাকি-স্তান আগাগোড়া সামরিক খাতে তাঁদের রাজস্বের এক অতি বড় অংশ ব্যয় করে' আসছেন। বলা বাহুল্য এই সামরিক খাত কাশ্মীর-খাতেরই নামান্তর। এই ব্যয়ের ফলে পাকিস্তানের আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে; পাকিস্তান সরকার জনসাধারণের কিছু বিরাগভাজন হয়েছেন। এমন পরি-স্থিতিতে সৈন্য-সামন্ত সরিয়ে নিয়ে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের ঝুঁকি পাকি-স্তান সরকার নিতে পারেন এ ভাবলে তাঁদের অতিমানুষ ভাবা হবে। ভারত সরকার অথবা ভারতের নেতা পণ্ডিত

জওহরলাল পাকিস্তানের নেতাদের তুলনায় ভাগ্যবান্। দেশে ও বিদেশে এক অসাধারণ প্রতিপত্তি তিনি বর্তমানে ভোগ করছেন। কিন্তু তবু পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে তাঁদের সৈন্যসামন্ত সরিয়ে না নিলে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের ঝুঁকি তিনি মাথায় নিতে পারেন এ আদৌ সত্য নয়, কেননা তিনিও যত বড়ই হোন, জননেতা, কাশ্মীরে ভারতের যে বিপুল অর্থ-ব্যয় হয়েছে সেকথা স্মরণে না রেখে কাশ্মীর সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর ক্ষমতার বাইরে। জাতি সঙ্ঘও এ-ব্যাপারে যা করতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উপরোধ অনুরোধ ছাড়া আর কিছু করতে গেলে হয়ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি মাথায় নিতে হবে—তাতে কোনো বড় শক্তিই রাজী হবার সম্ভাবনা নেই কেননা আণবিক বোমার ভয় সবারই আছে।

ব্যাপারটা এমন ঘোরালো দেখে বাস্তববাদী রাজনীতিকরা হয়ত বলে উঠবেনঃ বোঝা গেল, কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য।—কিন্তু বৃথা তাঁদের এই সিদ্ধান্ত আর এর আনুষঙ্গিক তর্জন-গর্জন। ভারত ও পাকিস্তানের জন-সাধারণ যে যুদ্ধে উৎসাহী আর নয় এতেই এই ধরণের রাজনীতির বিষদাঁত ভাঙা হয়ে গেছে। তাছাড়া যুদ্ধে বাস্তবিকই নামবার ক্ষমতা যে ভারত বা পাকিস্তান কারো নেই, কবে যে হবে তারও কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই, একান্ত নির্বোধরা ছাড়া আর সবাই তা বোঝে।

বাস্তবিক, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিফল অবিশ্বাস ও রেষারেষি নয় সমঝোথা ও মৈত্রীপূর্ণ আদান-প্রদান যে এই দুই দেশের জনসাধারণের কাম্য হয়েছে কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য থাকা সত্ত্বেও, এতেই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে কোন্ পথে পাক-ভারত-মৈত্রী সাধন সম্ভবপর। থাকুক কাশ্মীর-সমস্যা আপাতত অমীমাংসিত হয়েই, এই দুই দেশের জনসাধারণ এবং শান্তি ও মৈত্রীর ক্ষেত্রের কর্মীদল তৎপর হোন কাশ্মীর ভিন্ন অন্যান্য যে সব সমস্যা পাক-ভারত-মৈত্রী ব্যাহত করছে সেসবের সুমীমাংসায়। তাঁদের জন্য এই ধরণের একটি কার্যক্রমের কথা ভাবা যেতে পারেঃ

১। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান যথাসম্ভব ব্যাপক হবে যেন উভয় দেশের জনসাধারণ অচিরে লাভবান্ হতে পারে। বাণিজ্য ও যাতায়াতের সমস্ত অনাবশ্যক বাধা বিদূরিত হবে। দুই দেশের মধ্যে যোগ রক্ষা করছে যে-সব রেল ও নদীপথ সে-সবের যথাযোগ্য উৎকর্ষের কথাও ভাবতে হবে উভয় দেশকে।

২। দুই দেশেই উদ্বাস্তুদের ও সংখ্যালঘু সমাজের দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে দুই দেশের সরকারই আন্তরিক-ভাবে তৎপর হবেন ও পরস্পরকে যথা-যোগ্য সাহায্য করবেন।

৩। পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম যাই দেওয়া হোক মূলত তা হবে আধুনিক জগতের যে কোনো উন্নততর রাষ্ট্রের মতো ধর্মনিরপেক্ষ ও সব নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের প্রতি তুল্যরূপে সজাগ দৃষ্টি।

৪। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান অব্যাহত হবে। সেজন্য ছাত্র ও অধ্যাপক বিনিময়ের সুব্যবস্থা থাকবে।

৫। শান্তি ও বন্ধুভাবের ভিতর দিয়েই এই দুই দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে, সন্দেহশীলতা ও সংঘর্ষের পথে নয়, এই চেতনা দুই দেশে আরো ব্যাপক হলে দুই দেশের মধ্যে নিষ্পন্ন হবে অনাক্রমণ চুক্তি যার ফলে সামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দুই দেশেই যথেষ্ট কমানো যাবে আর গঠনমূলক কাজে ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়ানো যাবে।

৬। এমনিভাবে প্রীতিবদ্ধ ভারত ও পাকিস্তানই যোগ্যভাবে মীমাংসা করতে পারবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি অথবা পাকিস্তানভুক্তি, কেননা তখন কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে সম্পূর্ণ রূপে তার নিজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে, ভয় বা লোভ তার কর্মের নিয়ামক হবে না; ভারত বা পাকিস্তানও কাশ্মীরের কাছ থেকে এ ভিন্ন আর কিছুর প্রত্যাশাও রাখবে না।

বাস্তববাদী বন্ধুরা হয়ত মাথা নেড়ে বলবেন—এও কি সম্ভবপর? আমাদের উত্তর—হাঁ। ভারত ও পাকিস্তানকে প্রকৃতি এক করেছে, পৃথক তারা যে কারণেই হোক সেই প্রাকৃতিক সত্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি তাদের হতেই হবে যদি তারা কল্যাণ চায়। আর শুধু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কেন বৃহত্তর জগতে এমন সমঝোথা ও মৈত্রীবন্ধন চাই। এ অভাবে এই আণবিক যুগে মানব সভ্যতা বাঁচতে পারে ভাবা কঠিন।

আকাশ প্রদীপ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যেমন তোমার চাঁদ ভেঙে যায় জলের আদরে,
আমায় তেমনি ভাঙো গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে,
পারো যদি তারোপর আবার আমায়
পুলকে বিকীর্ণ করো তোমার অমার ত্রিযামায়;
মেঘের ভেলায় তুমি মূঢ় এই মাঝিকে ভাসাও,
ডুবে গেলে কাছে টেনে নাও।

আরেক পূর্ণিমা চলে যায়,
পুরাতন তারার সভায়—
দিলে না এখনো তুমি আলোকের আনন্দ-প্রতিমা,
তবু এই মুহূর্তেই হে মহানীলিমা
আমাকে মেটাতে হবে এ-জন্মের তিমিরের ঋণঃ
তোমার বিশাল মৃত্যু আমাকে করুক আত্মলীন॥

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৩

রবীন্দ্র সাহিত্যের ইতিহাসের মতো রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি ভূগোল কল্পনা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূগোল সাধারণভাবে বাংলা দেশ কিন্তু ঐ সাধারণ পরিচয়টাই যথেষ্ট নয়, বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক।

জমিদারীর ভার গ্রহণ করিবার আগে সাধারণভাবে বাংলা দেশ হইতে তিনি রচনার উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯১ সালে যখন স্থায়ীভাবে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিলেন, একটি বিশেষ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তথাকার মানব সমাজকে তিনি জানিবার সুযোগ পাইলেন। এই সুযোগ প্রত্যক্ষ রূপ লাভ করিল তাঁহার গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি সমস্ত রচনায়। অত্যল্প কাল মধ্যে তাঁহার সমস্ত রচনায় এমন একটি প্রৌঢ়তা ও পরিণতি দেখা গেল যাহা কেবল বয়োধর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রকৃতি ও মানুষের বিশেষ রূপের দ্বারা তাহা সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ। সার্থক শিল্পে বিশেষ সর্বদাই নির্বিশেষ হইয়া উঠিবার মুখে। এখানেও তাহাই ঘটিল। বাংলা দেশের দুইটি ভূখণ্ড তাঁহাকে এই বিশেষের রস জোগাইয়াছে। যে-সময়কার কথা বলিতেছি তখনকার ভূখণ্ডকে মধ্য বঙ্গ বলা যাইতে পারে। আর তাঁহার শেষ বয়সে বিশেষের রস জোগাইয়াছে রাঢ় বঙ্গ। এই দুই পর্বে রচিত রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রাকৃতিক পরিবেশে ও চিত্রে প্রভেদ সুস্পষ্ট। খেয়া ও গীতাঞ্জলি প্রভৃতির বহুতর কবিতার মধ্যে রাঢ় বঙ্গের শাল, তালের মিশ্রিত-মর্মর ধ্বনিত, তেমনি ক্ষণিকা ও চৈতালির মতো কাব্যে মধ্য বঙ্গের পল্লী প্রকৃতির চিত্র ও সঙ্গীত সুনিপুণভাবে অঙ্কিত: একের সঙ্গে অন্যের ভুল হইবার উপায় নাই। প্রথম পর্বের আগে তাঁহার কাব্যে যে প্রকৃতিকে পাই তাহা নিতান্তই নির্বিশেষ।১২ এই বিশেষের স্বাক্ষর তাঁহার চিত্তে এমন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, যে অতঃপর তিনি যেখানেই যান না কেন, সমস্ত চিত্রেই ঐ বাংলা দেশকেই মনে পড়িয়া গিয়াছে।১৩

যাযাবর মানুষের সাহিত্য নাই, কারণ যাযাবর মানুষ ভ্রাম্যমাণ, আর ভ্রাম্যমাণ বলিয়া নিত্য নব নব ভূখণ্ডে সঞ্চরমান বলিয়া তাহার মন বিশেষের রসাভিষেক হইতে বঞ্চিত থাকে। মানুষ যখন কৃষি-কর্ম গ্রহণ করিল তখন হইতেই সে বিশেষ ভূপ্রকৃতির অঞ্চলে বাঁধা পড়িল, তখনই তাহার শিল্প ও সাহিত্যেরও সূত্রপাত হইল। কৃষি ও কৃষ্টি একই ধাতুজাত।

প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্য একান্ত-ভাবে আঞ্চলিক সৃষ্টি। হোমারও তাই, এথেন্সের নাট্যকাব্যও তাই, আবার থিও-ক্রিটাসের কাব্যও তাই। বিশেষ ভূখণ্ডের জীবনরস হইতে বঞ্চিত যে মানুষ, সেই "cityless man"-কে সোফোক্লিস হত-ভাগ্য মনে করিতেন, শুধু তাহাই নয়, তিনি মনে করিতেন সেরকম মানুষ সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপস্বরূপ। গ্রীস যতদিন প্রাণবন্ত ছিল তাহার অধি-বাসিগণ কেবল মানুষ ছিল না, বিশেষ "পুরীর" বা বিশেষ "city state"-র মানুষ ছিল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, বোধ করি প্রাচীন সব সাহিত্যই, প্রধানত আঞ্চলিক সাহিত্য। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব পদকর্তা-গণের নাম ধাম সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা অনতিবিস্তৃত এক ভূখণ্ডের মানুষ ছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্য ও মনসামঙ্গল কাব্যগুলিরও ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করা চলে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভূখণ্ডের বিবরণ আমরা জানি। পূর্ববঙ্গ গীতিকা-গুলিও বিশেষ ভূখণ্ড হইতে উদ্ভূত।*

অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, অঞ্চল বিশেষে সৃষ্টি হইলেই সে রচনা আঞ্চলিক হইতে বাধ্য, তাহা সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে না। ইতিহাসের নজীর ইহার প্রতিকূল। সার্থক আঞ্চলিক সাহিত্যই শেষ পর্যন্ত সর্বজনের রস চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হয়। মূল গ্রীস ভূখণ্ডে সভ্যতার অবনতি ঘটিলে পরে তৎকালীন ভূমধ্যসাগরের ঔপকূলিক দেশসমূহে যে গ্রীক সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, দু' চারিটি ছাড়া তাহার কোন সাহিত্যিক নমুনা যে টিকিয়া নাই, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, বিশেষের রসের দ্বারা সে সাহিত্য পুষ্ট ছিল না,. সন্ধ্যা-কাশের সোনার ফসল সূর্যাস্তের সঙ্গেই রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়া-ছিল। বীজের মধ্যে বনস্পতির ন্যায় বিশেষের মধ্যেই নির্বিশেষ আছে। নির্বিশেষ অভাবাত্মক নয়, তাহার অপর নাম সর্বজনীনতা। বহু দূরাগত ঘটনা-পরম্পরার ধাক্কায় আমরা এখন এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়াছি যে বিশেষের গ্রন্থি-বন্ধন প্রায় ছিন্ন হইতে চলিল। এখন আমরা দেশ বলিতে, সমাজ বলিতে যাহা বুঝি তাহা অস্পষ্ট একটা সত্তা, তাহা হয়তো বুদ্ধিগম্য, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম্য নিশ্চয়ই নয়। আর্কিমিডিস বলিয়াছিলেন পা রাখিবার একটু জায়গা পাইলে পৃথিবীটাকে তিনি বিচলিত করিতে পারিতেন। আমাদের সে পা রাখিবার জায়গাটুকুরই অভাব ঘটিয়াছে, নিজের উপরে তো নিজের দাঁড়ানো চলে না। যেখানে দাঁড়াইতে পারিলে স্থির মস্তিষ্কে সুস্থভাবে জগৎকে দেখিতে পারা যায়, এইরূপ দাঁড়াইবার জায়গাকেই বিশেষ ভূখণ্ড বা বিশেষ অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

১২॥ মানসীর কয়েকটি কবিতায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। এই সব কবিতায় উত্তর বিহারের বিশেষ চিত্র পাওয়া যাইবে।

১৩॥ দ্রষ্টব্যঃ—চিঠি, পূরবী।

*এই ধারা এখনো লোপ পায় নাই। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আধুনিক লেখকের অনেক উপন্যাস ও গল্প আঞ্চলিক সৃষ্টি।

আমাদের সৌভাগ্যবশত বর্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও রবীন্দ্রনাথ ঘটনাচক্রে এইরূপ একটি অঞ্চলের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার ধনী অভিজাত ঘরের ছেলে, দূর পল্লীগ্রামে গিয়া স্থায়ী হইবার কথা তাঁহার নয়, কিন্তু ঘটনার টানে তাহাই ঘটিয়া গেল। ইহার শুভ পরিণামের জন্য এই অঘটনের কাছে বাঙালী পাঠকমাত্রেই ঋণী।

রবীন্দ্র সাহিত্যামোদী পাঠকের পক্ষে এই ভূখণ্ডের প্রতি কৌতূহল স্বাভাবিক মনে করিয়া তাহার কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পৈতৃক জমিদারির প্রধান অংশ নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলাতে। ১৪

শিলাইদহের কুঠিবাড়ী কবিতীর্থে পরিণত হইয়াছে। শিলাইদহ গ্রামটি বিরাহিনপুর পরগণার সদর কাছারি। ইহা নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় অবস্থিত। সাজাদপুর আর একটি পরগণা—ইহার অবস্থান পাবনা জেলার সদর মহকুমায়। ইহা ছাড়া আছে পতিসর, রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায়। তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, নদীয়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলাত্রয়ের কতক অংশ ব্যাপিয়া এই জমিদারির অবস্থান।

ছিন্নপত্র গ্রন্থের ১৫ পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরের মধ্যেই কবির চলাচলের প্রধান পথ। চলাচলের সময় ছাড়াও অনেক সময়ে তিনি পদ্মাবক্ষে বোটে বাস করিতেন।

কবি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পেশা জমিদারি হইলেও নেশা আসমানদারিতে। বর্তমান ক্ষেত্রে জমিদারি ও আসমানদারি এমন মিশিয়া গিয়াছে যে, দুয়ে ভেদ করা কঠিন, আর সেইজনাই সাহিত্য সমালোচনা লিখিতে বসিয়া জমিদারির বিবরণ দিতে হইতেছে।

এই ভূখণ্ডকেই মধ্যবঙ্গ বলিয়াছি। ইহার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ভূপ্রকৃতির মিল আছে কিন্তু রাঢ় বঙ্গ হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানচিত্রের ভাগ অনুসারে ইহা পূর্ববঙ্গও বটে, আবার উত্তরবঙ্গও নিশ্চয়। বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলময় হইয়া গিয়া পৃথিবীর ভূগোল পরিচয় প্রকাশ করে, তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। নদী নালা বিল ইহার জলভাগ, আর বর্ষাজলের স্ফীতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত গ্রামগুলি এবং অনন্ত শস্যক্ষেত্র ইহার স্থলভাগ। পদ্মা প্রধান নদী, অবশ্য যমুনাও (ব্রহ্মপুত্র) কম নয়; আর আছে আত্রেয়ী, নাগর, বড়ল, গোরাই (গোরী নদী) ও ইছামতী প্রভৃতি নদনদী। আর রাজসাহী জেলা ও পাবনা জেলার একাংশ ব্যাপিয়া অনির্দিষ্ট আকার চলন বিল, তাহাও অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই বিচিত্র ভূখণ্ড মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিণত জীবনচিত্র যেন উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হোক্, এখানেই ইহার আসমানদারির সার্থকতা। সত্য কথা বলিতে কি, ঐ সূত্রে এই ভূখণ্ড রবীন্দ্র সাহিত্যের পাদপীঠিকায় আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে।

এই ভূখণ্ডের কথা যখন ভাবি, বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, মনে হয়, মধ্যবঙ্গে অবস্থিত এই ভূখণ্ডে বঙ্গের মধ্যেকার কোন্ সত্য যেন প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয়, সিংহবাহিনী পদ্মা পরিপূর্ণ বিজয়গৌরবে আপন বামচরণ

১৪॥ ইহা ছাড়া যশোহর ও ফরিদপুর জেলাতেও কিছু আছে। উড়িষ্যায় যে জমিদারী আছে সেখানে কবির ভ্রমণের বর্ণনা ছিন্নপত্র গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে জেলার যে পরিচয় প্রদত্ত হইল তাহা অখণ্ড বাঙলার মানচিত্রানুযায়ী।

১৫॥ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অবিলম্বে ছিন্নপত্রের একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশ করা উচিত, যেমন তাঁহারা জীবনস্মৃতি গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন। জমিদারী মধ্যে কবির প্রধান চলাচলের পথের একটি মানচিত্র দিলে পাঠকের সুবিধা হইবে। ছিন্নপত্রের সমকালীন কবির আত্মীয়স্বজন এখনো অনেকে জীবিত আছেন, তাঁহারা টীকা রচনায় সাহায্য করিতে পারিবেন মনে হয়।

চলন বিলরূপী ঐ কালো অসুরটার স্কন্ধের উপরে স্থাপন করিয়াছেন আর তাঁহাকে ঘিরিয়া আত্রেয়ী এবং গৌরী, বড়ল এবং নাগর নদনদীসমূহ বাঙালী জীবনের ধ্যানের বিচিত্রপূর্ণতাকে যেন প্রকাশ করিয়াছে। এহেন ভূখণ্ড কবি-প্রতিভার যোগ্য ধাত্রী বটে! এই ভূপ্রকৃতি যেন ষড়মাতৃকার মতো কবিকে স্তন্যদান করিয়াছে—আর তাই বুঝি কবিও প্রতিভার ষড়মুখে জননীর ঋণ শোধ করিয়াছেন।

এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অংশের প্রধান নায়ক পদ্মা আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত, অজ্ঞাত মানব। কবিজীবনে পদ্মার প্রভাব সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি—এখানে আবার করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে সূর্যের মধ্যে কবি "আমার সত্যের ছবি" দেখিয়াছেন—

"তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার
সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।" ১৬

কিন্তু যে পর্বের কথা বলিতেছি তখন যেন তিনি পদ্মার প্রবাহে আপন "সত্যের ছবি" দেখিয়াছিলেন। পদ্মাকে এমন সহস্রভাবে, সর্বতোভাবে আর কোন কবি দেখেন নাই, উপলব্ধি করেন নাই—একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

কবি লিখিতেছেন—"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি, তা'হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ, পশুর মধ্যে যে চলাচল তা'তে খানিকটা চলা, খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে, সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সেইজন্যেই এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়, সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে, চুরছে, চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।" ১৭

এই ভাবটিই যে পরবর্তীকালে লিখিত বলাকার কাব্যের চঞ্চলা কবিতার ভাবাত্মক নদীতে পরিণত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কবির কাছে পদ্মা কেবল অশরীরী ভাবমাত্র নয়—এমন একটি দিব্য শরীরী সত্তা যাহার সঙ্গে সহজেই হৃদয়ের আত্মীয়তা স্থাপিত হইতে পারে—হইয়াছেও তাই। পদ্মা একটি আইডিয়া মাত্র হইলে তাহাকে লইয়া তত্ত্ব রচনা চলিতে পারিত, কিন্তু কাব্যের বস্তু হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

কত রকমেই না কবি পদ্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন।

"কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হ'য়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এরকম ব্যাপার ঘটছে।......ঠিক যেন আমি সমস্ত নদীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল।" ১৮

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, পদ্মা যেমন একটি ভাবমাত্র নয়, তেমনি মানব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন একটি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক সত্তা মাত্রও নয়। তাহার তরঙ্গাভিঘাতে কবিচিত্তে অনেক মানবসত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নদী-স্রোতে ভাসমান একটি মৃত পাখীর দেহ দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

"আমি যখন মফঃস্বলে থাকি তখন একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে নিজের সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর বলে উপলব্ধি হয়। সহরে মনুষ্য সমাজ অত্যন্ত প্রধান হ'য়ে ওঠে। সেখানে সে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখ-দুঃখের কাছে অন্য কোন প্রাণীর সুখ-দুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এতো জটিল ও এতো প্রধান যে, তারা জন্তুকে বড় বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা মানুষ থেকে জন্তু ও জন্তু থেকে মানুষ হওয়াটাকে কিছুই মনে করে না, এইজন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয়নি। মফঃস্বলে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হ'লে সেই আমার ভারতবর্ষীয় স্বভাব জেগে ওঠে। একটা পাখীর সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষ-টুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতনভাবে ভুলে থাকতে পারিনে।" ১৯

পদ্মা প্রবাহকে অনুসরণ করিয়া একদিকে কবি যেমন মানব সংসারের মধ্যে আসিয়া পড়েন, আর একদিকে তেমনি চলিয়া যান বিরাট বিশ্বের মধ্যে, পদ্মা যেন এ দু'য়ের মধ্যে দৌত্য করিতেছে।

"যেদিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকালবেলার আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে বেরিয়ে আসছে সেদিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড় চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্য গর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃ প্রতিমা উদিত হ'য়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে, আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি ক'রে ধানাক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে ব'সে আছে. সে যেন একটি সুন্দরী দিব্য শক্তির কাছে হার মেনেছে কিন্তু এখনো পোষ মানেনি, দিগন্তের এক কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে ব'সে আছে।" ২০

পদ্মা যেমন একটি ভাব, যেমন একটি ভাবমূর্তি, তেমনি বা ততোধিক একটি লৌকিক সত্তা, নতুবা তাহার সঙ্গে কবির হৃদয় বিনিময় সম্ভব হইত না আর

১৬॥ সাবিত্রী, পূরবী কাব্য।

১৭॥ কুষ্টিয়ার পথে, ২৪শে আগস্ট, ১৮৯৪, ছিন্নপত্র।

১৮॥ ১০ই আগস্ট, ১৮৯৪, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

১৯॥ ৯ই আগস্ট, ১৮৯৪, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

২০॥ ৫ই আগস্ট, ১৮৯৪, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

এই হৃদয় বিনিময়ের ফলেই পদ্মা কাব্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, অন্যথা তত্ত্বের বহিরঙ্গনেই পড়িয়া থাকিত।

"এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেতো, আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প ক'রে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে। লজ্জার সীমা উপচে এলো ব'লে—প্রায় গলাগলি হ'য়ে এসেছে।" ২১

এবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত কবির স্বীকারোক্তি উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

"বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি।......এখন পদ্মার জল অনেক ক'মে গেছে, বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে, একটি পাণ্ডুবর্ণ, ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো, অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য ক'রে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লিখবার অযোগ্য মনে করা উচিত হবে না।" ২২

ভালবাসিলেই সঙ্গে ভয় আসিতে বাধ্য, কবি আশঙ্কা করেন হয়তো এমন দিন আসিবে যখন পদ্মা আর তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না; কিম্বা আরও বড় আশঙ্কার কারণ তাঁহার নিজেরই মনের এমন পরিবর্তন ঘটিবে যখন পদ্মার এই মাধুর্য তাঁহার চিত্তকে আর এমনভাবে আকর্ষণ করিবে না। ২৩

কবি বলিতেছেন—"হয়তো আর কোন জন্মে এমন একটি সন্ধ্যাবেলা আর ফিরে পাবো না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাবো? এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এতো সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে প'ড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকবো! আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।" ২৪

আবার:—"আজকার আমার এই একলা বোটের দুপুর বেলাকার মনের ভাব, এই একটা দিনের কুঁড়েমি সেই কয়েকখানা পাতার [কবির জীবনচরিত] মধ্যে কোথায় বিলুপ্ত হ'য়ে থাকবে। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মাতীরের নিস্তব্ধ বালুচরের উপরকার নির্জন মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোণালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে?" ২৫

উপরিল্লিখিত খণ্ডাংশগুলির সঙ্গে মূল গ্রন্থ ছিন্নপত্র মিলাইয়া পড়িলে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকিবে না যে, পদ্মা কবির কাছে কতখানি সত্য—নদীমাত্র রূপে নয়, ভাব বা ভাবমূর্তি মাত্র রূপে নয়, একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক সত্তারূপে। এই কথাটি বেশ স্পষ্ট করিয়া না বুঝিলে এই পর্বের কাব্যবোধ অসম্পূর্ণ থাকিবে, ছোট গল্পগুলিরও রহস্যোদ্ধার হইবে না।

এই পর্বের গল্প ও কবিতা পরস্পরের সান্নিধ্যে যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য দুয়ে মিলাইয়া পড়া আবশ্যক; এ দুয়ের মধ্যে চলাচলের পথ বিদ্যমান, পদ্মাই সেই চলাচলের পথ। (ক্রমশ)

২১॥ ৩রা জুলাই, ১৮৯৩, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

২২॥ মে, ১৮৯৩, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

২৩॥ দ্রষ্টব্য,—পদ্মা, চৈতালি কাব্য।

২৪॥ ১৬ই মে, ১৮৯৬, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

২৫॥ ১৬ই ফাল্গুন, ১৮৯৫, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

জাঁ-পল সার্ত্র্

শিবনারায়ণ রায়

পনের বছর আগেও জাঁ-পল সার্ত্র্-এর নাম এদেশের কথা ত' ছেড়েই দিলাম তাঁর নিজের দেশেও বিশেষ কেউ জানত না। দু'দশ জন অনুরাগী বন্ধু এবং বিদগ্ধ পাঠক হয়তবা তাঁর তখনকার সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস La Nausée ('গ্লানি'—১৯৩৮) পড়ে চমৎকৃত হয়ে থাকবেন; কোনো কোনো অধ্যাপক সহকর্মী এবং তরুণ ছাত্র হয়তবা তাঁর কোট-কলার এবং টাই না পরে কলেজে দর্শন পড়াতে আসা দেখে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। কিন্তু এই রুগ্ন শিষ্টাচারহীন উন্নাসিক যুবকই যে কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপের চিন্তা-নায়কদের অন্যতম হয়ে উঠতে পারেন—এ সম্ভাবনা সম্ভবত তাঁদের কারো চোখেই ধরা পড়েনি।

ধরা পড়বার কথাও নয়। তখনকার সার্ত্র্ যে শুধু বয়সেই যুবা তা নয়, মনের দিক হতেও নেহাৎ অপরিণত। আর পাঁচটি কল্পনাবিলাসী তরুণের মত তাঁর প্রকাশে ব্যবহারে উঁচুকপালেপানা বিস্তর ছিল, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি এক কড়াও ছিল না। পারী-র এবং তারি সঙ্গে পশ্চিমী সভ্যতার দ্রুত এবং প্রায় প্রতিরোধহীন পতন সে মনে অকস্মাৎ যুগান্তের প্রৌঢ়ত্ব এনে দিল। সার্ত্র্ লিখতে জানতেন—এখন ভাবতে শিখলেন—ভাবতে এবং ভাবাতে।

তারপর গত দশ বছর ধরে সার্ত্র্-এর সে ভাবনা শুধু ফরাসী দেশে নয়, সারা পশ্চিম ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় এবং ক্রমে প্রায় সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে। রক্ষণশীলদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ, ধর্মধ্বজীদের ক্রুদ্ধ অভিশাপ, কম্যুনিস্টদের ক্ষিপ্ত গালাগালি, কিছুই তা ছড়িয়ে পড়াকে আটকাতে পারেনি। পণ্ডিত সমালোচকরা তাঁর চিন্তার নানা গলদ খুঁজে বার করেছেন, আত্মতৃপ্ত ভাবেরালেরা সে চিন্তায় সর্বনাশের অবতরণিকা লক্ষ্য করে শিউরে উঠেছেন, যাঁরা তার কার্যকারিতায় আস্থা হারিয়েছেন, এমনকি শুনতে পাচ্ছি সার্ত্র্ নিজেও নাকি সম্প্রতি সে ভাবনার যাথার্থ্য বিষয়ে কথঞ্চিৎ সন্দিহান। তবু সে ভাবনা আজ পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে গেছে, সে ভাবনার খবর যে রাখে না, আধুনিক মনের একটা বড় দিকই তার অজ্ঞাত রয়ে গেল। সার্ত্র্ নিজে ইচ্ছে করলেও সে ভাবনার গতি আর রোধ করতে পারেননা। কেননা যে ভাবনা শুধু বাক্‌বৈখরী নয়, মনের পরিণতি হতে যার জন্ম, তার একটা নিজস্ব প্রাণ আছে, তা কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়, তা বিশ্বমানবের জীবন্ত উত্তরাধিকার।

জাঁ-পল সার্ত্র্

সার্ত্র্-এর এই ভাবনাটা যে কি, তার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার আগে, তাঁর জীবন সম্বন্ধে যেটুকু জানি তার মোটামুটি বিবরণ দিয়ে নিই। সার্ত্র্-এর জন্ম পারী সহরে, ১৯০৫ সালে, সুতরাং এখন তাঁর বয়েস বছর আটচল্লিশ। অর্থাৎ তিনি এলিয়টের থেকে সতের বছরের ছোট। এলিয়টের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরাট অবক্ষয়ে, সার্ত্র্-এর পরিণতি ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতর ধ্বংসলীলায়। তাঁর বাবা নৌবিভাগে চাকরী করতেন; সার্ত্র্-এর শিশু বয়সে তিনি ইন্দোচীনে অসুস্থ অবস্থায় মারা যান। সার্ত্র্-এর মা-ও বেশী দিন বাঁচেন নি। বাপ-মা-হারা শিশুকে মানুষ করেন তাঁর বুড়ো দাদামশাই আর দিদিমা। সার্ত্র্ প্রথমে পড়াশুনো করেন পারীর লা রশেল্ বিদ্যালয়ে, তারপর সেখান হতে বেরিয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ একোল নর্ম্যালে। আর পাঁচটা চিন্তাশীল ছেলের মত সার্ত্র্ও স্কুল-কলেজে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাননি। কলেজ হতে বেরিয়ে তিনি পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধীনে গবেষক ছাত্র হিসাবে জর্মানীর বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশুনো করেন। তাঁর চিন্তায় সমকালীন জর্মান দর্শন—বিশেষ ক'রে, তাঁর গুরু এড্‌মুন্ড্ হুসের্ল-এর ফেনোমেনোলোগি বা রূপ-বৈচিত্র্যতত্ত্বের প্রভাব খুব স্পষ্ট।

জর্মানী হতে ফিরে সার্ত্র্ পারীর এক উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরী নেন। এখানে তিনি দর্শন এবং প্রাচীন সাহিত্য পড়াতেন। অনুমান করা কঠিন নয় এ চাকরী তাঁর কাছে খুব বেশী সুখের ঠেকেনি। স্কুলকলেজ সব দেশেই স্কুল-কলেজ—শান্তশিষ্ট পোষমানা মনই শুধু সে আবহাওয়ায় সম্যক্ তৃপ্তি পেতে পারে। সার্ত্র্-এর অন্য যে দোষই থাক তাঁর অতিবড় শত্রুও কোনোদিন তাঁকে পোষমানাদের দলে বলে অপমান করেনি। এই কারণে ছাত্রাবস্থাতে তিনি পয়লা নম্বরের ছাত্র হ'তে পারেননি, শিক্ষকাবস্থাতেও তিনি পয়লা নম্বরের শিক্ষক হতে পারলেন না। শুধু যে কোট, কলার, টাই পরে সুবোধ শিক্ষক সাজতেই তাঁর বাধল তা নয়, ভাবনার বাঁধাধরা পাকা সড়কে ছেলেদের চরিয়ে আনার কাজে (যার অন্য নাম মাস্টারি) তাঁর মন বসল না। কলম্বসকে যদি ট্রাম কন্ডাক্টরি করে দিন গুজরান করতে হয় তার চেয়ে গ্লানিকর আর কি হতে পারে! এই গ্লানির কিছুটা আভাস মিলবে সার্ত্র্-এর পরবর্তী কালে লেখা এপিক উপন্যাস

Les Chemins de la liberte' (মুক্তির নানা পথ)-এর প্রথম খণ্ডে—Age de Raison (যুক্তির যুগ) গ্রন্থে।

এই সময়ে ইয়োরোপের জীবনেও যুগান্তের গ্লানি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষেই পশ্চিমী সভ্যতার ভাঙন শুরু হয়। মহৎশিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এলিয়ট সেই ভাঙনের ভয়াবহতা তাঁর 'পোড়োজমি' কাব্যে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছিলেন বলেই অত দ্রুত তিনি আধুনিক পাঠক মনে যুগান্তের কবি বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন। তৃতীয় দশকে যার অবতরণিকা চতুর্থ দশকে তারি তৃতীয় অঙ্কের পট উঠল। ইয়োরোপে রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের দিন যে শেষ হয়ে গেছে তারি চরম প্রমাণ দিতে আবির্ভূত হল হিট্‌লার, নাট্‌সীদল এবং নানা দেশে ছড়ান তাদের চেলাচামুণ্ডারা। ইতালী আগেই গিয়েছিল, গেল জর্মানী (গয়টে-হাইনের দেশ জর্মানী), গেল অস্ট্রিয়া (হেড্‌ন্‌-শুবার্টের দেশ অস্ট্রিয়া), গেল স্পেন (সার্ভান্তেস-গোয়ার দেশ স্পেন)। অবশেষে এল ম্যুনিখের দিন। চেম্বরলেনের ছাতার নীচে মাথা আড়াল দিয়ে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক সভ্যতা ম্যুনিখে আপনার মৃত্যুখতে স্বাক্ষর দিয়ে এলো।

সেদিন ম্যুনিখের সেই অনপনেয় ঐতিহাসিক গ্লানির আঘাতে যে কয়েকজন হৃদয়বান অনুভূতিশীল মানুষের ব্যক্তিগত ব্যর্থতাবোধ অকম্প্য আত্মজিজ্ঞাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সার্ত্র্‌ তাদেরি একজন। পরবর্তীকালে তাঁর এপিক উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড Le Sursis (সাময়িক ক্ষমা) গ্রন্থে তিনি পশ্চিম ইয়োরোপের পটভূমিতে এই ম্যুনিখী মৃত্যুখতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। পশ্চিমী সভ্যতার এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের মূল হেতু হিটলার-মুসোলিনী-ফ্রাঙ্কো নয়, চেম্বরলেন-দালাদিয়েও নয়, বেনেশ ত' ননই। এর আসল কারণ হোল, ইয়োরোপের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ মানুষের স্বধর্মে আস্থা হারিয়েছিল। মানুষের স্বধর্ম হোল স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার মূল কথা হোল নিজের ভাগ্যগড়ার দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নেওয়া। ইয়োরোপের সাধারণ মানুষ ভুলে গিয়েছিল যে, চরম অত্যাচার, নিষ্ঠুরতম মৃত্যুর থেকেও ভয়াবহ কিছু আছে—সে হোল স্বাধীনতাচ্যুত হয়ে বেঁচে থাকা। ইয়োরোপীয় মনে মনুষ্যধর্মের এই ব্যাপক অবক্ষয়ের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর হোল ম্যুনিখের চুক্তি।

হিটলারের কাছে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বলি দিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপের সন্ত্রস্ত গণতন্ত্রী দেশগুলো সাময়িকভাবে মার্জনা লাভ করল বটে, কিন্তু সে মার্জ যে কত সাময়িক বছর না পুরতেই সো টের পাওয়া গেল পোল্যাণ্ডে। চেম্বারলেন ছাতা দিয়ে যুদ্ধকে আর ঠেকিয়ে রা গেল না। ফরাসীদের অবশ্য লড়ায়ে ইচ্ছে ছিল না, তবু একেবারে সদ দরজায় জর্মানী, লোকদেখানো খানিক সাজ সাজ রব উঠল ফ্রান্সে। অন্য পাঁচজ প্রাপ্তবয়স্কের মত সার্ত্র্‌কেও যে

তে হল সেনাবাহিনীতে—সামরিক চিকিৎসাবাহিনীতে প্রাইভেট হিসেবে। যুদ্ধ বাধল, কিন্তু ফরাসীরা লড়ল না, প্রথম ধাক্কাতেই ছত্রাকার হয়ে হিটলারী বাহিনীদের পারীতে পেঁছবার পথ ছেড়ে দিল। পারী পড়ল, আর তারি সঙ্গে শিরদাঁড়া ভেঙে হুমড়ি খেয়ে পড়ল পশ্চিম ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক সভ্যতা। এই পতনের অন্যতম নির্মোহ ইতিবৃত্ত হিসেবে সার্ত্রের এপিক উপন্যাসের শেষ খণ্ড—La mort dans l'Ame (আত্মায় মৃত্যু) গ্রন্থে। আজো ইয়োরোপ প্রায় সেই অবস্থায় পড়ে আছে, কম্যুনিস্ট রাঙানি এবং মার্কিনী মালিশেও সে যে উঠে বসার ক্ষমতাটুকু ফিরে পেয়েছে এমন ত' মালুম হচ্ছে না।

পারীর পতনের পর আরো অনেক দেশবাসীর মত সার্ত্রেও জর্মানদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু তাঁর রুগ্ন শরীর আর অসুস্থতার জন্যে ১৯৪১ সালে জর্মানরা তাঁকে ছেড়ে দেয়। সার্ত্র্ পারীতে ফিরে এলেন, কিন্তু ত' সে আগের সার্ত্র্ নয়—অনভিজ্ঞ, চুপচাপে, গ্লানিগ্রস্ত দর্শনের শিক্ষক অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে পরিণত হয়েছেন সত্যসন্ধী, সুচতুর, বীর্যবান পুরুষে। এই নতুন সার্ত্র্ বিজয়ী জর্মান এবং তাদের তাঁবেদার ফরাসী সরকারের সামনে রুগ্ন অকর্মণ্যতার খোলসটি বজায় রাখলেন, আর তারি আড়ালে কাজ করতে লাগলেন প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার যাথার্থ্য রূপ। মুানিখের বেদনায় মনের যে রূপান্তর শুরু হয়েছিল, প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার যাথার্থ দীক্ষিত হল। পরবর্তী কালে সার্ত্র্ র Morts Sans Sepulture (সমাধিহীন শব) নাটকে প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত পৌরুষ এবং বেদনাকে ক্লাসিক দৃঢ়তার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করেছেন।

প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নিয়ে সার্ত্র্ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারের দ্বারা নয়, আত্মিক উজ্জীবনের মধ্য দিয়েই ইয়োরোপে মানবতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে। এই উজ্জীবনে অংশ নেওয়াই তাঁর আসল কাজ—কি লেখক হিসেবে, কি কর্মী হিসেবে। ১৯৪৩ সালে জর্মানদের একেবারে নাকের ডগায় পারী শহরে প্রকাশ্যভাবে এই উজ্জীবনের বার্তা নিয়ে সার্ত্র্-এর মহৎ নাটক Les Mouches (মাছিরা) অভিনীত হল। এর আখ্যানভাগ প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য হতে নেওয়া—কিন্তু সেটা শুধু আসল বক্তব্যের অবলম্বন মাত্র। ওরেস্টেস-ইলেকট্রার কাহিনী যারা জানে না এমন দর্শকের কাছেও এর আসল বক্তব্য অবোধ্য রইল না। নায়ক ওরেস্টেসের মুখ দিয়ে সার্ত্র্ দেশবাসীকে শোনালেন—তোমরা মানুষ, স্বাধীনতা তোমাদের স্বধর্ম, স্বাধীনতার দায়িত্ব দুঃসহ, তবু সেই

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে ফরাসী সাহিত্যিক জাঁ-পল সার্ত্র্-র নাটক 'নোংরা হাত' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীশিবনারায়ণ রায়।

—সম্পাদক দেশ

সুকঠিন দায়িত্বের মধ্যেই তোমাদের মানবতার প্রকৃত প্রকাশ। ভয়ের কাছে হার মেনোনা। যে মুক্ত সে নির্ভীক।

তারপর হতে তাঁর নানা রচনায়, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে, সিনেমা কাহিনীতে সার্ত্র্ বারবার এই বার্তাই তাঁর দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করেছেন। যুদ্ধ একদিন শেষ হল, কিন্তু তাঁর দায়িত্ব শেষ হোল না। পৃথিবী যে তিমিরে সেই তিমিরে। বরং যুদ্ধের শেষে ইয়োরোপের সে তিমির গাঢ়তর হল। ইয়োরোপের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে রুশ আর মার্কিনের মধ্যে শুরু হোল জুয়ো খেলা। জুয়োখেলার পণ হওয়াই যে ইয়োরোপের ভাগ্য, যাঁরা একথা মানলেন না, সার্ত্র্ দেখা দিলেন তাঁদের পুরোধা হয়ে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে যে "তৃতীয় শক্তির ঘোষণাপত্র" প্রকাশিত হয় তিনি তার অন্যতম প্রধান রচয়িতা। ঐ ঘোষণার ভিত্তিতেই তিনি অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সঙ্ঘের (Rassemblement Democratique Revolutionaire) প্রতিষ্ঠা করেছেন: এর মুখপত্র তাঁরি সম্পাদিত Les Temps Moderne (আধুনিক কাল)। এর মূল প্রস্তাব হোল, ধনতন্ত্র, জাতীয়তা এবং সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার (totalitarianism) উচ্ছেদ করে তারি জায়গায় গণতান্ত্রিক, সমবায় নির্ভর, সংযুক্ত ইয়োরোপ গড়ে তোলা।

ইয়োরোপ আজো পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি করছে, কিন্তু সার্ত্র্ আজো হাল ছাড়েননি। কম্যুনিস্টরা তাঁকে মার্কিনের দালাল বলে গাল পাড়ছে; মার্কিনী দৃষ্টিতে তিনি ছদ্ম কম্যুনিস্ট ছাড়া আর কিছুই নন। আমার বিশ্বাস যাঁরা পরের মুখের ঝাল খেয়ে ভালমন্দ ঠিক করেন না, তাঁরা সার্ত্র্-এর লেখা পড়লে শুধু নূতন কিছুরি স্বাদ পাবেন না, কিছু খাঁটি এবং মূল্যবান জিনিষেরও খোঁজ পাবেন।

দুই

এবারে সার্ত্র্-এর ভাবনার কথা। যে ভাবনা একজন প্রথম শ্রেণীর ভাবুককে পনের বছর ধরে নিত্য নূতন লেখার এবং পরীক্ষানিরীক্ষা করার খোরাক জুগিয়ে আসছে আমি যে পনের কথায় তার পরিচয় দিতে পারব, এ আশা বাতুলতা। তার জন্যে অন্ততঃ একখানা প্রমাণ-সাইজের বই লিখতে হয়। সে বই পড়ার চাইতে যদি বুদ্ধিমান পাঠক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত সার্ত্র্-এর ১৯৪৫ সালে দেওয়া বক্তৃতা L'existentialisme est un humanisme (অস্তিত্বতন্ত্র আসলে একধরণের মানবতন্ত্র—ইংরেজি তর্জমায় Existentalism and Humanism) পড়ে নেন, তাতে বেশী কাজের কাজ হবে। এখানে যেটুকু লিখছি তাতে সার্ত্র্-এর ভাবনাকে শুধু সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, সরলীকৃত করাও হয়েছে। ভরসা এই যে, পাঠকরা হয়ত ঘোলের স্বাদ পেলে দুধের স্বাদের জন্য আগ্রহশীল হবেন।

ইতিপূর্বে সার্ত্র্-এর যে জীবন কাহিনীটুকু বলা হয়েছে, তাতে পাঠক তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথাটি নিশ্চয়ই অনুমান করে থাকবেন।

সার্ত্র্ মানবতন্ত্রী। কারণ তাঁর মতে স্বাধীনতা মানুষের স্বধর্ম। কিন্তু স্বাধীনতা নিরর্থ যদি না

ব্যক্তি তার স্বধর্ম বিষয়ে সচেতন হয়। এই সচেতনতা ব্যাপারটা যে বিশেষ আরামদায়ক তা নয়, বরং তার উল্টো। কেননা এই চেতনার ফলে ব্যক্তি যেমন এক ধারে জীবত্ব হতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়, অন্যধারে তেমনি তার নৈতিক জীবনের মূলে এক অনতিক্রম্য অনিশ্চয়তা এসে বাসা বাঁধে। সার্ত্র্-এর বিচারে এই নিত্য-অনিশ্চয়তাই স্বাধীনতার প্রকৃত ভিত্তি। মানুষ স্বাধীন কেননা তার কোনো সিদ্ধান্তই পূর্বনির্দিষ্ট নয়—জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ একমুখী নয়, বহুমুখী। একমাত্র মানুষই প্রতি অবস্থার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে বাছতে পারে; শুধু পারে না, নানা বিকল্পের মুখোমুখী হয়ে বাছাই করা তার স্বধর্ম। ফলে তার ভাগ্যের দায়িত্ব পুরোপুরি তার নিজের হাতে—সে নিজেই নিজেকে রূপ দিচ্ছে—তার ভাগ্যের দায় কি প্রকৃতি, কি ইতিহাস, কি ব্রহ্ম কারো ঘাড়েই তুলে দেবার এক্তিয়ার তার নেই। এবং সেই কারণেই এই যে আপনার ভাগ্য আপনি গড়া, এই পথ বাছাই, অথবা সার্ত্র্-এর ইতালীয়ান পূর্বসূরী ভিকোর ভাষায় নিজেকে নিজে সৃষ্টি করা—এ কাজে ব্যক্তির কোনো নিত্য, নিশ্চিত বা সর্বজনীন মানদণ্ড থাকতে পারে না। কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক, কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তা যদি এমনি কোনো শাশ্বত মাপকাঠির হিসেবে আগে হতেই ঠিক করা থাকে, তবে আর ব্যক্তির স্বাধীন বাছাইয়ের কি মানে হয়? নৈতিক অনিশ্চয়তা ছাড়া স্বাধীনতা অকল্পনীয়। মানুষ স্বাধীন বলে মানুষকে নিয়তই পথ বাছতে হবে এবং সেই কারণেই মানুষ কোনো দিন নিশ্চয় করে বলতে পারবে না তার পথ বাছাই ঠিক হল, কি ভুল হল। অথচ প্রতি মানুষের প্রতিটি সিদ্ধান্ত শুধু তার নিজের ভাগ্যের পরেই নয় পৃথিবীর সব মানুষের ভাগ্যের পরেই তার অব্যয় স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে। সুতরাং সার্ত্রী জীবনদর্শনে মানুষের অস্তিত্ব স্বাধীন কিন্তু নির্দেশহীন; তাতে দায়িত্ব আছে, কিন্তু নিশ্চয়তা অনধিগম্য।

স্বাধীনতার এই যে নির্নিমিত্ত, নিরুদ্দিষ্ট প্রকৃতি, এটির সম্যক উপলব্ধি ঘটলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়, সার্ত্রী দর্শনে তার একটি বিশেষ নাম আছে। তাঁর পূর্বসূরী জর্মান দার্শনিকরা এই অবস্থাকে বলেছেন Angst; সার্ত্র্-এর ভাষায় এর নাম angoisse। এ শব্দটির কোনো যথার্থ ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই—বাংলায় এটির নাম দেওয়া যেতে পারে আর্তি। আর্তির মধ্যে একধারে রয়েছে সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসহ্য উল্লাস, অন্যধারে অলঙ্ঘ্য নৈতিক অনিশ্চয়তার কঠিন নিরাশ্বাস। জেনে শুনে নিজের ভাগ্য নিয়ে যে চরম জুয়া খেলতে পারে (জুয়ার উপমাটা পাস্কালের), আর্তির স্বাদ শুধু সেই জানে। এই আর্তির অভিজ্ঞতা সব সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে; এ স্বাদে বঞ্চিত গোবিন্দদাসেরা মানুষ হয়ে জন্মেও মানুষ হতে পারল না। তাদের জীবনের প্রতি প্রহরই মুনিখী আত্মঘাতের পুনরাবৃত্তি।

অতি সংক্ষেপে এই হোল সার্ত্র্-এর জীবনদর্শন। দার্শনিক পরিভাষায় এর নাম অস্তিত্ববাদ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সার্ত্র-এর পূর্বেও অনেকে ছিলেন, তাঁর সমকালীনদের মধ্যেও অনেকে আছেন—মুনিয়ে সাহেবত তাঁর Existentialist Philosophies কেতাবে এক মস্ত ঠিকুজিকুষ্টি বানিয়ে সোক্রাতেস হতে নীট্‌শে, বের্গসঁ পর্যন্ত অর্ধেক পশ্চিমী দার্শনিককে এরি কোঠায় ফেলেছেন। কিন্তু স্বদেশে বিদেশে অস্তিত্ববাদ বলতে সাধারণ পাঠক সার্ত্র্-এর জীবনদর্শনই বুঝে থাকেন। তার কারণ সার্ত্র্ শুধু দার্শনিক নন, তিনি পয়লা নম্বরের লেখক। তাঁর প্রধান দার্শনিক রচনা L'etre et le Ne'ant (অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব) খুব কম পাঠক পড়ে থাকলেও তাঁর নাটক - উপন্যাস - গল্প - সাহিত্য-আলোচনা যে কোনো সাধারণ শিক্ষিত পাঠক পড়ে উপভোগ করতে পারেন এবং এসব রচনার প্রতিটিতেই অস্তিত্ববাদী ভাবনার কোনো না কোনো দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। অন্যান্য অধিকাংশ সমকালীন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের লেখা—তাসে কি হাইডেগার, কি যাসপার, কি মার্সেল—সাধারণ পাঠকের অবোধ্য। সার্ত্র্ সাহিত্যিক বলে তাঁর জটিলতম চিন্তা এবং উপলব্ধিকে সহৃদয়হৃদয়সম্বাদী করতে পেরেছেন। খাস দার্শনিক পণ্ডিতেরা এজন্য তাঁর প্রতি অত্যন্ত নারাজ; কিন্তু সাধারণ পাঠক এজন্য তাঁর কাছে নিয়ত কৃতজ্ঞ থাকবে।

সার্ত্র্-এর যে নাটকটি আমি তর্জমা করেছি, আমার ধারণায় অভিনয়-যোগ্যতার দিক হ'তে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটির ফরাসী নাম Les Mains Sales—"নোংরা হাত" তারি সিধে বাঙলা তর্জমা। প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় লেখক কম্যুনিস্টদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন। এর কাহিনীটি সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বনে লেখা। স্বাধীনতা মানুষের ধর্ম, এ প্রত্যয়ে যে বিশ্বাসী, কম্যুনিজমে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আরো অনেক আদর্শবাদী তরুণের মত এ নাটকের নায়কও ভুল বুঝে এক সময়ে কম্যুনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। চরম ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে তাকে সে ভুলের দাম দিতে হোল। তবে সে ট্রাজেডি একেবারে ব্যর্থ হয়নি। মৃত্যুকে বেছে নিয়ে হুগো শেষ পর্যন্ত নিজের স্বাধীন অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেল। কিন্তু কম্যুনিজম মানবধর্মবিরোধী বলে কম্যুনিস্ট মাত্রই কিছু মনুষ্যত্বহীন নয়—তার প্রমাণ এ নাটকের বলিষ্ঠতম চরিত্র কম্যুনিস্ট নেতা হোয়েডেরার। সার্ত্র্ এ নাটকে বর্তমান যুগসঙ্কটের একটি নিগূঢ় দিক মানবতন্ত্রী শিল্পীর অন্ত দৃষ্টি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস, মতবাদনির্বিশেষে সহৃদয় পাঠক মাত্রই এ নাটকটি হতে ভাবনার এবং উপভোগের অনেক খোরাক পাবেন।

॥ নয় ॥

স্বপ্ন দেখছিলাম। দার্জিলিং-এ আমার সেই বাংলো। বাইরের ঘরে ক্যাম্প্ চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। বেলা গড়িয়ে গেছে। জানালায় দাঁড়িয়ে ডেকে যাচ্ছে কাঞ্চী, বাবুজি, বাবুজি...। ঘুম কিছুতেই ভাংগছে না। কাঞ্চীর হাসির ফোয়ারা খুলে গেল, ছড়িয়ে পড়ল স্বপ্নময় মধুর ঝঙ্কারে...।

ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। বিছানার পাশে বিশ্রী কর্কশ সুরে বেজে চলেছে এলার্ম ঘড়িটা। রাত দুটো বেজে পনের। রাউণ্ডে যেতে হবে। নিতান্ত যে ক্রীতদাস তারও আছে গভীর রাত্রির বিশ্রামের অবকাশ। আমার নেই। সেই কথাটাই জানিয়ে দিল ঘড়িটা।

ফাল্গুনের শেষ। শীত চলে গেছে। রাত্রিশেষের কোমল দেহে লেগে আছে তার বিদায় স্পর্শ। কি মধুময় এই নিশীথ রাত্রির শয্যার আলিঙ্গন! ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম। কিন্তু তার চেয়েও প্রবলতর টান মহেশ তালুকদারের ডিউটি রোস্টারের চতুর্থ লাইন—"বৃহস্পতিবার লেট্ রাউণ্ড্—ডেপুটি জেলর বাবু মলয় চৌধুরী।" কোনোরকমে শরীরটাকে টানতে টানতে বেরিয়ে পড়লাম, সেক্সপিয়র যাকে বলেছেন crawling like a snail. আজ বুঝলাম, এই অনবদ্য বিশেষণটির এর চেয়ে যথাযথ প্রয়োগ আর হ'তে পারে না। কোনো রাউণ্ড-গামী জেলর কিংবা তার ডেপুটির সংগে সাক্ষাৎ হয়নি মহাকবির। যদি হ'ত, বেচারা ইস্কুলের ছেলেগুলোর মাথায় এত বড় অপবাদের বোঝা তিনি চাপিয়ে যেতেন না।

রাউণ্ডে চলেছি। কিসের উদ্দেশ্যে আমার এই নৈশ অভিযান? কর্তব্য-পরায়ণতা, সতর্কতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বড় বড় কথার খুঁটো দিয়ে যতই কেননা একে উঁচুতে তুলে ধরি, নিজের কাছে একথা লুকানো নেই যে, আমার আসল উদ্দেশ্য—শিকার সন্ধান। চাকরির উচ্চ মঞ্চে আরোহণের যতগুলো সোপান আছে, এও তার মধ্যে একটি। এই শিকার-সংখ্যাই হ'চ্ছে আমার কৃতিত্বের মাপকাঠি। গিয়ে যদি দেখি, আমার শিকারের দল, অর্থাৎ নিশাচর প্রহরীকুল সজাগ ও সতর্ক, তাদের মাথার পাগড়ি মাথার উপরেই আছে, চাদরত্ব প্রাপ্ত হ'য়ে দেহ আবৃত করেনি; তাদের পায়ের জুতো পায়েই শোভা পাচ্ছে, উপাধানে রূপান্তর লাভ করেনি, আমার সমস্ত পরিক্রমা ব্যর্থ হবে। আমার রিপোর্ট হবে একটি লাইন—Found everything in order. বলা বাহুল্য, এই সরল এবং সুরহীন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কর্ণে সুধা বর্ষণ করবে না, অর্জন করবে কুঞ্চিত নাসিকার অবজ্ঞা—লোকটা কি ওয়ার্থ-লেস্! অর্থাৎ অন্যের গলদ আবিষ্কারের অক্ষমতাই হ'চ্ছে আমার নিজের গলদের বড় প্রমাণ।

কিন্তু অদৃষ্ট যদি প্রসন্ন হয়, আমার রিপোর্টের পাতা ভ'রে উঠবে বিচিত্র শিকার-কাহিনীর সরস বর্ণনায়। কারো হাতে লাঠি নেই, কারুর জামায় নেই বোতাম, কেউ হয়তো দাঁড়িয়ে গেছে দু' মিনিট, অবিরাম টহল দিতে দিতে, কেউ বা নিজের সীমানা ছেড়ে গিয়ে গল্পের থলেটা তুলে ধরেছে সদ্য-মুলুক প্রত্যাগত কোনো ভাইয়ার কাছে। এছাড়া থাকবে দুটো একটা sleeping while on duty—নৈশ প্রহরীর সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ—ঘুম!

ঘুম! তারই বা কত বিচিত্র রূপ! এতদিন জানা ছিল মুদ্রিত চক্ষুই নিদ্রা-দেবীর আসন। খাট নাই, পালঙ্ নাই, খোকার চোখে বস। কিন্তু খোকার সে চোখ যদি চেয়ে থাকে, ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী তো সেখানে বসতে পাবেন না। এই কথাই তো শুনে এসেছি মা-ঠাকুরমার কাছে। রাউণ্ডে বেরিয়ে ধরা পড়ল, ছেলেমানুষ পেয়ে কী প্রতারণাই না তাঁরা ক'রে গেছেন। ঐ যে সিপাইটি লাঠি ঠুকে ঠুকে টহল দিচ্ছে, পা ফেলছে ঠিক সমান তালে, চোখ খোলা, দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ, কাছে এগিয়ে যান, শুনতে পাবেন ওর নাকের ডাক। পথ আগলে দাঁড়ান, ও সোজা এসে পড়বে আপনার ঘাড়ের উপর। মাথার উপর থেকে টুপিটা তুলে নিন, ও জানতে পারবে না। ও জেগে নেই। গভীর ঘুমে বিভোর। ঐ পাঁচিলের

ধারে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে যে শিবনেত্র প্রহরী, লাঠিটা ধরে আছে নিখুঁত অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে, আমাকেই যেন সম্মান দেখাবার জন্যে, দেহ নিস্পন্দ, মাথাটি পর্যন্ত দুলছে না,—ওরও সমস্ত চেতনা নিদ্রাচ্ছন্ন। এরা হঠযোগী নয়, চলন্নিদ্রাসন বা অন্য কোনো উৎকট আসনও অভ্যাস করেনি বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়। কিন্তু এর পেছনে আছে দীর্ঘ দিনের সাধনা আর তার মূলে নিতান্ত প্রাণের দায়। সমস্ত জীবনে একটি সম্পূর্ণ রাত্রিও যাদের কাটে না শয্যার আশ্রয়ে, নিদ্রা-বশীকরণের এই দুরূহ প্রক্রিয়া তাদের বাধ্য হয়েই শিখতে হয়। এই বিদ্যার জোরেই এরা ধূলি নিক্ষেপ করে আমাদের হুঁশিয়ার চোখে এবং আমাদের মারাত্মক লেখনীর কবল থেকে মুক্তি পায়। মুক্তি পায় না তারা, এই জাতীয় ভ্রাম্যমান এবং দণ্ডায়মান নিদ্রা যাদের আয়ত্ত হয়নি, নিদ্রা যাদের কাছে শয়ন-সাপেক্ষ, অর্থাৎ কোনো যৌগিক বা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় না নিয়ে যারা সোজা সটান আশ্রয় করে ভূমিতল। কিন্তু ধূলি-নিক্ষেপের হাত থেকে সেখানেও যে আমাদের চক্ষুযুগল পুরোপুরি মুক্ত নয়, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমাদের সহকর্মী মহীতোষদা।

ভালোমানুষ বলে মহীতোষবাবুর অখ্যাতি ছিল। সেটা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন পুরো তিন মাসের মধ্যেও তার রাউণ্ডের জালে কোনো শিকার ধরা পড়ল না। মহীতোষ রাউণ্ডের সংখ্যা ও সময় বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তার [illegible] ফিরল না। তারপর একদিন তা[illegible]জরে পড়ল, রাউণ্ডে বেরিয়ে প্রতিবারই একটা না একটা পোস্ট তিনি খালি দেখতে পান। অনুপস্থিত সিপাহীর অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তার প্রতিবেশী ওয়ার্ডার এমন একটা জায়গার নাম করে, যেখানকার ডাক জৈবিক প্রয়োজনে অলঙ্ঘনীয়। একদিন তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা যায়। প্রতিবেশী সিপাহি কেমন অস্বস্তি বোধ করছে, কিন্তু তার বন্ধুর দেখা নেই। মহীতোষদা একটা গাছের গোড়ায় বেশ স্থায়ীভাবে বসলেন। ক্রমে প্রহরী বদলের ঘণ্টা পড়ল এবং কিছুক্ষণ পরে একদল নতুন সিপাহিও এসে গেল। পুরানো দলকে এবার ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যার জন্যে তিনি অপেক্ষা করে আছেন, তার অগস্ত্য যাত্রার অবসান হল না।

তারপর সেই বিশেষ স্থানটিও খুঁজে দেখা গেল। কেউ নেই।—মহীতোষবাবু নিরাশ হয়ে অগত্যা ফিরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ গাছের উপর থেকে ঝুপ করে তার মাথায় একটা কি পড়ল। এ কি? খাকী টুপি এল কোত্থেকে? প্রথমটা মনে হল ভৌতিক ব্যাপার। কিন্তু গভীর রাতে গাছের ডাল থেকে নিরীহ ভদ্রলোকের মাথায় টুপি বর্ষণ করে মজা দেখবার মত রসজ্ঞান ভূতেরও আছে কিনা সন্দেহ হল মহীতোষবাবুর। সন্দেহ-ভঞ্জনে দেরি হল না। নিরুদ্দেশ সিপাহির সন্ধান পাওয়া গেল। অর্থাৎ দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তিনি 'উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে বাঁধি নীড়' নির্বিঘ্নে এবং সুস্থদেহে নিদ্রা-সুখ উপভোগ করছেন। শিরশ্চ্যুত টুপিটা অসময়ে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে সে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবার আশু সম্ভাবনা ছিল না।

মহীতোষবাবু অতঃপর আবিষ্কার করলেন, ব্যাপারটা আকস্মিক নয়। তিনটি বৃহৎ শাখার প্রশস্ত সংগম স্থলে কম্বল-বিছানো এবং সেটা নিয়মিত নিদ্রার স্থায়ী ব্যবস্থা। কারো ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত নয়, রীতিমত যৌথ কারবার। লভ্যাংশ সমান ভাগে বণ্টন করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি সিপাহি পালা ক্রমে এই নিদ্রাসুখ ভোগ করেন এবং তার শূন্য পোস্টের উপর যখন রাউণ্ড অফিসারের নজর পড়ে, পার্শ্ববর্তী বন্ধুরা কৈফিয়ৎ দেয়—call of nature, sir.

জেল কর্তৃপক্ষের সৌভাগ্য, সকলেই মহীতোষবাবু নয়। পাহারাওয়ালার মধ্যে যেমন একদল থাকে বুনো ওল, রাউণ্ড-ওয়ালাদের মধ্যেও তেমনি আছে দুচারটা বাঘা তেঁতুল। তার সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আমাদের গগন ডিপুটি'। ভদ্রলোক পদে কেরানী, কিন্তু পরিচ্ছদে ডেপুটি জেলর। নাম গগন হালদার; সিপাহিরা বলে গগন ডিপুটি। যদিও কেরানী হিসাবে 'রাউণ্ড' তার অবশ্যকরণীয় নয়, তার অত্যধিক উদ্যম ও উৎসাহ লক্ষ্য করে কোনো সুরসিক জেলর রাউণ্ডের তালিকায় গগনবাবুর নামটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই অবধি তার দাপটে সিপাহি-কুল কম্পমান। টহল দিতে দিতে দু মিনিট যদি কারো পা দুটো থেমে যায়, লাঠিখানা জড়িয়ে ধরে চোখ দুটো যদি জড়িয়ে আসে তন্দ্রায়, অন্য বাবুদের কাছে কান্নাকাটি চলে, রেহাইও পাওয়া যায়। কিন্তু গগন ডিপটির কাছে নিস্তার নেই। তাই তার রাউণ্ডের পালা যেদিন পড়ে, সিপাহি মহলে হুঁশিয়ারির অন্ত নেই। সবাই সেদিন পুরোদস্তুর ভালো ছেলে। Everything in order. বলা বাহুল্য সেটা গগনবাবুর কাম্য হতে পারে না। তার কলমের খোঁচায় দুচারটা যদি ধরাশায়ী না হল, তার ডেপুটিত্ব বজায় থাকে কেমন করে? কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, সিপাহিরা ষড়যন্ত্র করেছে, তাকে সে সুযোগ দেবে না।

একদিন এক অভিনব কৌশল এল তার মাথায়। গগনবাবু জানেন, আমাদেরও অজানা নেই, রাউণ্ড শেষ হলেই প্রহরীদের মধ্যে জাগে আরামের লোভ। যাক্, ফাঁড়া কাটল—বলে সবাই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কেউ কেউ হয়তো বুট পট্টি খুলে একটু আরাম করে বসে, কেউ বা খানিক গড়িয়ে নেয় কোনো গাছের নীচে কিংবা বারান্দার কোণে। সেই দুর্বল ক্ষণের সুযোগ নিলেন গগনবাবু। একটা পরিক্রমা শেষ করে আধ ঘণ্টা লুকিয়ে রইলেন আফিসে। তারপর আবার শুরু হল তার দিগ্বিজয়।

এবার জাল ভরে গেল মূল্যবান শিকারে। গোটা চারেক শিলপিং, ছ'সাতটা সিটিং ও ডোজিং; তাছাড়া ডজনখানেক টুপিহীন মাথা আর বেল্টহীন কোমর। শাস্তির হিড়িক পড়ে গেল পরদিন সকালের আফিসে। গগন ডিপটির কৃতিত্বে ম্লান হয়ে গেল সত্যিকার ডিপটির দল।

সেবার মাঘ মাসের মাঝামাঝি। পদ্মার তীরে খোলা মাঠের মধ্যে জেল। তার উপর উত্তর বাঙলার শীত। হাড়ের ভিতর থেকে কাঁপুনি উঠে ছড়িয়ে পড়ে দেহের প্রতি অঙ্গে। রাত সাড়ে তিনটা। চারদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার কণাগুলো ঝরে পড়ছে বৃষ্টি ধারার মত, আর বিঁধে যাচ্ছে অস্থি-মজ্জায়। সর্বাঙ্গে কাপড় জড়িয়ে চোখ দুটো কোনো রকমে খুলে রেখে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁপছে সিপাইএর দল। এই ভয়ংকর নিশীথে, দীর্ঘ প্রাচীরের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে কে ও? আপাদ মস্তক কম্বলে ঢাকা, যেন কুয়াশার সাগরে একটি ভাসমান ভেলা। সাত নম্বরের কোণ পার হতেই হাঁক দিল সতর্ক প্রহরী, আসামী ভাগতা হ্যায়। সেই ভয়াবহ বার্তা তীরের ফলার মত বিঁধল গিয়ে সকলের কানে। বেজে উঠল হুইস্‌ল্‌ এবং সঙ্গে সঙ্গে গেট-সেন্ট্রী বাজিয়ে দিল অ্যালার্ম। আশে পাশে যারা ছিল ছুটে এল লাঠি হাতে। বেগতিক দেখে 'কম্বল' ধাবমান হল। কিন্তু সিপাইরা ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। কী যে সে বলল, কারো কানে গেল না। লাঠি চলল বেপরোয়া।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই কর্তারা যখন এসে পৌঁছলেন, 'কম্বলকে' তার আগেই ধরাধরি করে তোলা হয়েছে হাসপাতালের বারান্দায়। চোখ মুখ ফুলে উঠেছে। চিনতে কষ্ট হয়। আর্তনাদ শুনে বোঝা গেল, কম্বলধারী পলাতক আসামী নয়, স্বনামধন্য রাউন্ডবিশারদ গগন ডিপটি।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। কি বলছিলাম? আমি রাউণ্ডে চলেছি। রাত দুটো বেজে পঁচিশ। খানিকটা পথ চল-বার পর একবার চারদিক যখন তাকিয়ে দেখলাম, নিঃশব্দে ঝরে পড়ে গেল মুহূর্ত-পূর্বের পুঞ্জীভূত গ্লানি আর বিরক্তির বোঝা। এ কোন্ পৃথিবী? এর দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে উঠেছে বাসন্তী জ্যোৎস্নার রজত প্লাবন; নিস্তব্ধ রাত্রির সর্বদেহে সঞ্চার করেছে 'শোভা, সম্ভ্রম ও শুভ্রতা'। দিনের আলোয় যা কিছু ছিল তুচ্ছ ও রূপহীন, জ্যোৎস্নার মায়াস্পর্শে তাকেই দেখছি সুন্দর ও মহিমময়। ঐ চুন বালিখসা ভাঙা বাড়িটা যেন রূপকথার রাজপুরী। ঐ কাঁটা ঝোপটা যেন মায়াকানন। হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে এল বাঁশীর সুর। ক্লান্ত করুণ বেহাগের ব্যাকুলতা। কে ও? কার হৃদয়মথিত আকুল কান্না গলিত ধারায় লুটিয়ে পড়ছে ফাল্গুনী নিশীথিনীর বুকের উপর?

গেট পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। ১২৭ ঠিক হ্যায়, হুজুর, তালা জান্‌লা সব ঠিক হ্যায়—বুট ঠুকে স-সেলাম রিপোর্ট জানাল 'দো-সে তিন্‌কা' সতর্ক প্রহরী। অর্থাৎ দুই এবং তিন নম্বর ওয়ার্ড মিলে আসামীর সংখ্যা ১২৭; এবং তারা সবাই উপস্থিত—এই কথাই জানিয়ে দিল ভার-প্রাপ্ত ওয়ার্ডার। তাকিয়ে দেখলাম, ১২৭এর একও নেই এই দুটো ব্যারাকের কোনো কোণে। চাটাইএর বেড়া আর বাখারির জানালা কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কয়েদীরা সব ছড়িয়ে আছে মাঠের এখানে ওখানে, মিশে গেছে অন্য সব ওয়ার্ডের বন্দীদের দলে। তবে তালা-গুলো সব বন্ধ আছে ঠিকই এবং তার শক্তি পরীক্ষাও চলছে যথারীতি। দু ঘণ্টা অন্তর নতুন প্রহরী এসে শূন্য ঘরের তালা টেনে জানালা ঠুকে রিপোর্ট দিচ্ছে—সব ঠিক হ্যায়, হুজুর।

আরো এগিয়ে গেলাম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিদ্রিত মানুষ। মাঝে মাঝে ঠকাস্ ঠকাস্ বুটের শব্দ। সবার উপর গড়িয়ে পড়ছে অবিশ্রান্ত বাঁশীর সুর। বারো নম্বরের কোণে মেহগনি গাছের তলায় একটি ছোট বাঁধানো চত্বর। তারই উপর বসে যে ব্যক্তিটি এই সুরের জাল বুনে চলেছেন, তার কাছে আমার আগমন অজ্ঞাত রয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর কখন এক সময়ে তার পাশটিতে বসে পড়েছি এবং কখন সে সুর থেমে গেছে, কিছুই বুঝতে পারিনি। চমকে উঠলাম তার কণ্ঠস্বরে—কি খবর ডেপুটিবাবু; বে-আইনী হচ্ছে, না?

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম, তা একটু হচ্ছে বৈ কি?

—বাঁশীটা কেড়ে নেবেন তো?

—নেওয়াই তো উচিত। কিন্তু নিতে পারছি কৈ?

—কেন?

—কেড়ে নেবার জোরটাই যে আপনি কেড়ে নিলেন। বড্ড কবিত্ব হয়ে গেল; কি বলেন?

—তা একটু হ'ল। কিন্তু যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলবো এ পথে আসা আপনার ঠিক হয়নি। আপনি মিসফিট্।

আমি বললাম, ঠিক ঐ কথাটা আমিও আপনার সম্বন্ধে বলতে পারি, অনিমেষবাবু। এ রাস্তা আপনার নয়।

—কেন?

আপনি শিল্পী, আপনি রসস্রষ্টা। আপনার পথ সুন্দরের পথ, বিরোধের পথ নয়। রাজনীতির বন্ধুর পথে আপনি

ক্রমাগত হোঁচট খাবেন, অভীষ্ট সীমায় কখনো পেঁছতে পারবেন না।

অনিমেষ চুপ করে রইলেন। আমি একটু থেমে আবার বললাম, আপনি হয়তো বলবেন, এ পথে সংঘর্ষ নেই। মহাত্মাজী শান্তিকামী। তিনি বলেছেন, ইংরেজের সংগে আমাদের বিরোধ নেই, তাঁর নীতির সংগে আমাদের অসহযোগ। কিন্তু ওটা শুধু কথার মার-প্যাঁচ। আসলে ও দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

অনিমেষ এবারেও প্রতিবাদ করলেন না। তেমনি নীরবে বসে রইলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, আপনি এদের এই অহিংস অসহযোগ বিশ্বাস করেন?

নিঃসংকোচে উত্তর এল—না।

—এদের এই খদ্দর ফিলজফি?

—তাও করি না।

—হিন্দু মোস্‌লেম্ ইউনিটি?

—না; সে বস্তুতেও আমার বিশ্বাস নেই।

আমি হেসে ফেললাম, তাহলে দেখছি, আপনার মত বিশ্বস্ত এবং অকপট সৈনিক এদের আর নেই।

অনিমেষ গাম্ভীর্য রক্ষা করেই বললেন, কারো মতবাদ নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই, মলয়বাবু। আমার কাছে মানুষের থিওরির চেয়ে অনেক বড় সেই মানুষটি। সেখানে আমার বিশ্বাস অন্ধ এবং অটল। সে-জায়গায় যদি কোনোদিন ভাঙন ধরে, সেই দিন এ রাস্তা ছেড়ে দেবো।

ঠিক দুবছর পরের কথা। মহাত্মাজী তার আগেই হিমালয়ান ব্লান্ডার ঘোষণা করে সম্মুখ সমর থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। যারা তাঁর এবং তাঁর অধিনায়কদের আহ্বানে স্যার আশুতোষের গোলাম-খানায় পদাঘাত করে বেরিয়ে পড়েছিল, তাদের কানে আবার নতুন মন্ত্র বর্ষিত হ'চ্ছে—ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। কিন্তু সে তপস্যা নতুন করে শুরু করবার পথ কোথায়, সে সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ নীরব। যারা ঘাটেও নহে, পারেও নহে, এই ঘোর সন্ধ্যাবেলায় তাদের ডেকে নেবার কেউ নেই।

এমনি সময়ে একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অনিমেষের সংগে। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। চিনবার কথাও নয়। তিনিই আমাকে ডেকে থামালেন। পরনে একটি জীর্ণ খদ্দরের পাঞ্জাবী, জুতো জোড়া তালির কল্যাণে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। গায়ের উজ্জ্বল রং তামাটে। বয়স বেড়ে গেছে অন্তত দশ বছর।

বললাম, কি করছেন আজকাল? কলেজে ভর্তি হননি?

—কই আর হোলাম? মা মারা গেলেন। দুটো বড় বড় বোন গলার ওপর। আর একটা ছোট ভাই। চাকরি খুঁজছি।

—চাকরিই যখন করতে চান, বি এটা পাশ করলে সুবিধা হ'ত না?

অনিমেষ হেসে বললেন পাশ করতে চাইলেই তো আর করা যায় না। তাছাড়া, পাশ করেই বা আর কি লাভ হত? স্বদেশী মামলায় জেল খেটেছি শুনে সবাই দরজা দেখিয়ে দেয়। গভর্নমেন্ট অফিসে তো বটেই, মার্চেন্ট্ অফিসগুলো পর্যন্ত। আপনার খোঁজে আছে নাকি কিছু? পনের, কুড়ি,—যা দেয়, তাতেই রাজী আছি।

—আচ্ছা, চেষ্টা করবো।

ঠিকানা লিখে দিয়ে অনিমেষ আবার জনারণ্যে মিলিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই অনিমেষ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তার বিধবা মায়ের এবং দু-তিনটি নিঃসহায় ভাইবোনের একমাত্র ভরসাস্থল। মার একান্ত কামনা ছিল, ছেলে বিশ্বান হ'বে, মানুষ হ'বে, সংসারের দুঃখ ঘোচাবে। এই আশা নিয়েই তিনি তাঁর শেষ সম্বল ছেলের কল্যাণে নিঃশেষ করেছিলেন। তারপর কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল। ছেলে কলেজ ছেড়ে আশ্রয় নিল জেলে, আর মায়ের আশ্রয় হল শয্যা। সে আশ্রয় আর তাঁর ঘুচল না। তারপর একদিন সংসার থেকে তিনি বিদায় নিলেন, সম্ভবত বিনা চিকিৎসায়। রেখে গেলেন দুটি নিরাশ্রয়া অনূঢ়া কন্যা আর একটি সহায়হীন শিশুপুত্র। একটি ভদ্র শিক্ষা-মার্জিত সুখী পরিবার বন্যার জলে ভেসে চলে গেল।

অনিমেষ একটা দুটো নয়। এমনি হাজার হাজার অনিমেষ এবং তাদের মুখাপেক্ষী আরো কয়েক হাজার নর-নারী শিশু এইভাবেই সেদিন তলিয়ে গেছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙলার ঘরে ঘরে কে তার জন্যে দায়ী? যাঁরা রাজনীতির উচ্চ মঞ্চে বিচরণ করেন, তাঁরা হয়তে বলবেন, এরা সব স্বাধীনতার বলি বৃহৎ সাফল্যের স্রোতের মুখে এই সামান্য ক্ষতি তৃণের মতই ভেসে গিয়ে থাকে সকল দেশে, ইতিহাসের সকল অধ্যায়ে। স্বাধীনতাকামী পরপদানত দেশের এইটাই একমাত্র পরিণাম অস্বীকার করি না। দেশের বৃহত্ত কল্যাণের গভীর তাৎপর্য মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনিমেষের অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখখানা এবং তাকে ঘিরে তিনটি অ-দৃষ্ট অপরিচিত ও অসহায় কিশোর কিশোরীর ম্লান মুখ বারংবার চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করা হ'ল না অনিমেষের সেই "অন্ধ বিশ্বাস" কি আজ অটুট আছে? একটা ক্ষুদ্র ফাটলও কি দেখা দেয়নি কোনোখানে? (ক্রমশ

অবশেষে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। বর্ষা শেষ, শরতের শুরু। যাই ...ই করে তবু বর্ষা এখনো যেতে ...ারেনি। তার কালো মুখের ছায়া টুকরো ...করো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে ...াকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো ...ড়েছে সেই মেঘের গায়ে। হঠাৎ লজ্জা ...াওয়া মেয়ের মুখের মত লাল ছোপ ...রে গেছে সেই মেঘে। উড়ে চলেছে দিক ...তে দিগন্তরে এই মফস্বল শহরের ...ারখানা ইমারত ও অসংখ্য বস্তির ...উয়ের উপর দিয়ে।

অনেক অলিগলি পেরিয়ে ভেলো ...র্থাৎ ভালরাম আর একটা রুদ্ধশ্বাস ...না গলির মধ্যে ঢুকল। সংগে তার ...ভয়পদ। প্রৌঢ় ভোলা এখানকার স্থানীয় ...াক। কাজ করে একটা সামরিক যান-...হনের কারখানায়। অভয় তার ...ারখানার কর্মী, ভারী ট্রাকের ড্রাইভার। ...ন্তু বিদেশী। ভেলো তাকে একটা ...রের সন্ধান দিয়েছে তাই সে ...লেছে তার নতুন বাসায়। সামগ্রী বলতে ...তে তার একটা টিনের সুটকেশ ও ...াট বিছানার বাণ্ডিল। গলিটাতে দিনের ...লাও অন্ধকার। দুপাশের ঘন টালি ও ...ালার চালা গলির মাথায় আর একটা ...র্ঘ চালার সৃষ্টি করেছে। আকাশ ...খা যায় না, এক ফালি রুপালী পাতের ...লিকের মত মাঝে মাঝে দেখা দেয়। গলি পথটাকে পথ বলার চেয়ে নর্দমা বলাই ভাল। দুপাশের বস্তির যত ক্লেদ এসে জমেছে সেখানে। নর্দমা থাকলে ময়লা বেরুবার একটা পথ থাকত। কিন্তু তা নেই। সারা গলিটার মধ্যে একটা মাত্র টিউবওয়েল। সেখানে মেয়ে পুরুষ ও শিশুর ভিড় ও পাঁতি হাঁসের প্যাকপ্যাকানির মত পাম্পের শব্দ শোনা যায়। সেই সংগেই ঝগড়ার চীৎকার ও হট্টগোল। গলিটার ঢোকবার মুখে একটা বাতি আছে, ইলেকট্রিক বাতি। সেটা এখনো জ্বলছে। সব সময়েই জ্বলে। গলিটা যে স্থানীয় মিউনিসিপালের আণ্ডারে, ওই বাতিটাই তার প্রমাণ।

ভেলোর সংগে অভয়কে দেখে গলির লোকগুলি সবাই একবার ক'রে দেখে নিচ্ছে। ভাবখানা যেন কোন আপদ এসে জুটেছে তাদের পাড়ায়।

অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানী খাকীর জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যাণ্ট। মাথায় একটা চাষাদের টোকার মত দীর্ঘ-বেড় টুপি। পায়ে ভারী বুট। চেহারাটা তার সাধারণ বাঙালীর তুলনায় অনেক লম্বা। মাথাটা চালার গায়ে ঠেকে যাওয়ার ভয়ে ঘাড় গুঁজে চলেছে সে। যেন কোন দলছাড়া সৈনিক চলেছে ট্রেঞ্চের ভেতর দিয়ে। কিন্তু মুখে তার এখনো কোমলতার আভাস। চোখে এখনো স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ তাকে খানিকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে, নয়তো দুর্বোধ্য।

সে আর না ডেকে পারল না, 'ভেলো খুড়ো।'

ভেলোকে ওই নামেই সবাই ডাকে কারখানায়। বলল, 'ভাবছ কেন। তুমি বামুনের ছেলে, ভালরাম কি তোমাকে মিছে কথা বলবে। পাকা বাড়ী, যাকে বলে ইঁটের গাঁথনি, খুঁটে খুঁটে দেখে নিও, বুঝেছ?'

বুঝেছে, কিন্তু এই বস্তির ভিড়ে পাকা বাড়ীর কোন ইশারাও যে চোখে পড়ে না। ভেলো গোঁফের ফাঁকে হেসে আবার বলল, 'কিন্তু যা বলছিলুম, একটু সাবধানে থেকো, বুঝলে দাদা। মানে, আইবুড়ো ছেলে তুমি। আলোর আর কি বল, মরে তো শালার বাদলা পোকা-গুলান।'

'তার মানে, আমিও মরব?' অভয়ের গলায় যেন বিরক্তির ঝাঁজ।

ভেলো বলল, ওই, চটলে তো? ওটা একটা কথার কথা। সেখেনে কি আর পেত্নী আছে যে ঘাড় মটকাবে। মানুষ খুব ভাল, জানলে। তবে মানুষের প্রাণ'......

'মানুষের প্রাণ!' ভেলোর কথার রেশ টেনে বলল অভয়, 'খুড়ো, একদিন মানুষ ছিলাম। এখন ওসব বালাই নেই।' বলতে বলতেই দাঁড়াল দুজনে। সামনেই একটা

চালাঘর যেন ঠেলে এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ং-এর ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্যরকম একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল তারা। সামনেই একটা মুচকুন্দ গাছ। বড় বড় শালপাতার মত অজস্র কালচে কালচে সবুজ পাতা আর ছাগলবাটি লতার বেষ্টনিতে ঝুপসি ঝাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। তলা ঘেঁষে স্তূপাকার হ'য়ে আছে আধলা ইঁটের রাশি। তার আড়ালে একটা ভাঙ্গা বাড়ীর ইশারা জেগে রয়েছে। তারও পেছনে যেন ঘন অরণ্যের বিস্তৃতি, মাঠ ও রেল লাইনের উঁচু জমি।

ভেলো, বলল, 'ওই যে তোমার বাড়ী।'

বাড়ী? বাড়ী কোথায়? বস্তির গায়েই এই হঠাৎ অবাধ উন্মুক্ত জায়গাটা নির্বাক বিষণ্নতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। লোকজন দেখা যায় না একটাও। এ নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে যেন একটা নিরাকার অস্থিরতা অদৃশ্যে ছটফট ক'রে মরছে। এর মধ্যে বাড়ী কোথায়।

ভেলো বলল, 'এসো।'

বলে সে মুচকুন্দ গাছটার তলা দিয়ে, একটা পুকুরের ধার দিয়ে এগুল। পুকুরটায় কচুরিপানার ঘন বিস্তার। পুষ্ট লকলকে ডগাগুলি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কালকেউটের ফণার মত। তার মধ্যেই খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ভাঙ্গা ইঁট বসিয়ে ঘাট করা হয়েছে। ঘাটের কোলে কালো জল, গভীর ও নিস্তরঙ্গ।

পুকুরটার দক্ষিণ পাড়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। একটা ভাঙ্গা বাড়ী। পোড়ো বাড়ীর মত। বাড়ীটাতে ঢোকবার দরজা নেই, একটা ছিটে বেড়ার আড়াল রয়েছে। দেয়ালের ইঁট চোখে পড়ে না। সর্বত্রই গোবর চাপটির দাগ। বোঝা যায়, একসময়ে দোতলা ছিল, এখন ভেঙ্গে গিয়েছে। বট অশ্বত্থের চারা আর বন-কলমির লতা নীচে থেকে উপরে অবাধে জড়িয়ে ধরেছে সর্বাঙ্গে। সামনের ঘরটার জানালায় গরাদ নেই। পোকা খাওয়া পাল্লা দুটো আছে। ফাটল ধরা ভাঙ্গা বারান্দাটায় ছড়িয়ে রয়েছে ছাগলনাদি। বারান্দার নীচেই কৃষ্ণকলি গাছের ঝাড়, ফাঁকে ফাঁকে কালকাসুন্দের বন। বন সেজেছে। অন্ধকার রাত্রের আকাশে খৈ ফোটা নক্ষত্রের মত ফুটেছে কালকাসুন্দের ফুল, হলদে আর লাল কৃষ্ণকলি।

ভেলো বলল, 'কি গো, পছন্দ হয় কি না হয়? ফুল বাগান, পুকুর.........

অভয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'পাকা বাড়ী। খুঁটে আর দেখব কি, এতো খাসা ইঁটের বাড়ী। তবে পোষাবে না ভেলো খুড়ো, চল কেটে পড়ি। ও আমার ঘিঞ্জি বস্তিই ভাল, সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে পারব না।'

ভেলো হা হা ক'রে হেসে উঠল। বলল, 'সাপ কোথায়, এখেনে মানুষ বাস করে। কলকারখানার বাজারে একটু হাঁফ ছাড়তে পারবে। আর......'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ছিটে বেড়ার আড়াল থেকে একটি মুখ বেরিয়ে এল। একটি মেয়ের মুখ। রংটা মাজা মাজা হঠাৎ ফর্সা বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, কিন্তু সিঁদুর নেই কপালে। আঁট করে বাঁধা চুল। মুখে ছিল হাসি। কিন্তু সামনে মানুষ দেখে হাসিটা মিলিয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় বেঁকে উঠল ভ্রূলতা। অভয়পদের টুপি পরা বিদঘুটে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছ ভেলো খুড়ো?'

বোঝা গেল, ভেলো এ সারা অঞ্চলের সকলেরই খুড়ো। বলল, 'কে বিনি ভাইঝি! বলছি, তোর মাকে একবারটি ডেকে দে, সেই লোকটি এসেছে ঘরের জন্য।'

বিনি একবার আড়চোখে অভয়কে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

অভয় বলে উঠল, 'খুড়ো এবে একেবারে বিয়ের যুগ্যি।'

ভেলো বলল, 'বে'র কেন, হ'লে এ্যাদ্দিনে ক' কন্ডা হ'ত, তাই বল। তা' হলে বোঝ, এর উপরে একজন, নীচে আর একজন। তা' বে' কে দেবে বল। বাপ থাকতেই খেতে জোটেনি, এখন তো বেধবা মা। আর জাতেও যদি শালা বামুন কায়েত হ'ত একটা কথা ছিল, জাত যে তোমার ভেলো খুড়োর, মানে সৎচাষা। আর মা ষষ্টি দিলে দি[...] তিনটেই মেয়ে দিলে। একে বলে কপা[...]

অভয়পদের নিজেরই বুকে [...] উৎকণ্ঠার কাটা ফুটল। বোধ হয় [...] নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়ছে, নিজে[...] অবিবাহিতা বোনটির কথা। কিন্তু [...] হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু খু[...] এখেনে তো আমি থাকতে পারব না।'

ভেলো অবাক হ'য়ে বলল, 'ওই না[...] তোমার তাতে কি? দেখে শুনে এব[...] বামুনের ছেলে নিয়ে এলুম ব'লে, যা[...] তাকে তো আর এনে তুলতে পারি[...] আর মেয়েমানুষগুলো একলা থা[...] একটা সাহসও তো পাবে। তারপরে তু[...] তোমার ওরা ওদের।'

অভয়ের আবার আপত্তি ও[...] আগেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে [...] বাড়ির মালিক, বিধবা বুড়ি। দু'হা[...] গোবর মাখা। গায়ে কোনরকম কাপ[...] জড়িয়ে দেওয়া। এল হা করে দাঁত শ[...] মাড়ি বেড় ক'রে। মুখে অজস্র রে[...] পড়েছে যেন জট পাকানো সুতোর দ[...] মত। গলার চামড়া গরু কম্বলের [...] ঝুলে পড়েছে। কাঁপছে থর্ থর্ ক'[...] বেঁকে পড়েছে খানিক শরীরটা।

চোখে বোধ হয় ভাল ঠাওর পায় [...] কয়েক মুহূর্তে অভয়কে দেখে ব[...] 'ভেলো, লোকটা বাঙ্গালী তো'।

ভেলো হেসে ফেলল, 'তবে [...] পাঞ্জাবী। তোমাকে তো বলেছিল[...] সব'।

বুড়ি আর বিরক্তি না ক'রে অ[...] আবার ফিরল, 'না তা বলছিনে। চেহার[...] যেন কেমন ঠেকল।

চোখের মাথা তো খেয়েছি। তা [...] থাক। ঘর আমার বেশ বড়সড়। এব[...] পুরনো, তা......' হঠাৎ চোপসানো [...] কেঁপে উঠে গলাটা বন্ধ হ'য়ে [...] বুড়ির। চোখের কোলে জল এসে পড়[...] বলল, ফিস্‌ফিস্ ক'রে, 'আমি যে জ[...] পাপিষ্টিনী। আমার গলায় বুকে শ[...] কাঁটা। সে মানুষটা যদ্দিন ছিল ভ[...] দিইনি, এখন কেউ নিতেও চায় না। [...] থাকো।'

চোখ মুছে ডাকল, 'অ' নিমি ঘ[...] খুলে দে।'

অভয় তাকাল ভেলোর দিকে। ...লো ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলল, ...ঠ পড়। দুনিয়ার সব জায়গাই সমান। ...স নিয়ে কথা।'

ব'লে বুড়ির পেছন পেছন অভয়কে ...য় বাড়ীতে ঢুকল সে। বাড়ী মানে, ...াটার আড়ালে একটা গলি। গলির ... পাশে দুটি ঘর। ভেতরে দেখা যায় ...টা উঠোন। উঠোনের উত্তরে একটা ...চলের ভগ্নাবশেষ। ওপারে সেই ...কুন্দ গাছ ও ইঁটের স্তূপ। নজরে ...ড় বস্তির খোলার চালা আর মোড়ের ...ই লাইট পোস্টটা। বাতিটা জ্বলছে ...নি।

অভয়ের ভারী বুটের শব্দ দ্বিগুণ ...য় উঠল গলিটার মধ্যে।

নিমি এসে বাঁ দিকের ঘরের দরজাটা ...লে দিল। নিমি বিনিরও বড়। সে ...র্ধকারি বিনির চেয়েও ফর্সা। কেন না, ...ধকার গলিটাতে তার মুখটা পরিষ্কার ...টে উঠেছে। তারও চুল আঁট করে ...া। দোহারা গড়ন। চোখে তার শান্ত ...গ্রতা। বয়স প্রায় তিরিশের কাছা- ...ছি।

দরজাটা খুলে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। ...র পেছনেই দাঁড়িয়েছে টুনি, সকলের ...ট। বিনির মতই একহারা ছিপছিপে ...ন তার। চোখের কালো তারায় খর ...টুনি, বিস্ময়ের ঝিকিমিকি। অভয়ের ...হারা দেখেই বোধ হয় তার ঠোঁটের ...সিটুকু ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার চুল ...লো। হয়তো বেঁধে ওঠার অবসর ...নি।

ভেলোর পেছনে ঘরে ঢুকে সুটকেশ বিছানা নামিয়ে অভয় একবার ভাল ...রে ঘরটার চারদিক দেখে নিল। ...ঝেটার অবস্থা মুখে বসন্তের দাগের ...। সিমেণ্ট উঠে গিয়েছে এখানে ...খানে। দেয়ালের অবস্থাও তাই। ...লস্তারার প' নেই, সর্বত্রই নোনা ইঁট ...রিয়ে পড়েছে। তবে ঘরটার আপাদ- ...তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করা ...য়েছে সেটা বোঝা যায়। ঘরটার কোলেই ...ই বারান্দা, কৃষ্ণকলি ও কালকাসুন্দের ...ড়, তারপরে পুকুর।

ভেলো বলল, 'নাও, ঘর দোর সাজিয়ে বস, এবার আমি চললুম। ভাড়ার কথা বলাই আছে।'

ব'লে ভেলো লোম ওঠা ভ্রূ-সঙ্কেতে ইশারা করল, 'সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চললুম গো বোঠান, এবার তোমরা বুঝে পড়ে নিও।'

ব'লে সে চলে গেল। একে একে সবাই অদৃশ্য হ'য়ে গেল, নিমি, বিনি, টুনি। বুড়ি বলল, ওই পুকুরে নাইবে। খাবে তো তুমি হোটেলে। না যদি খাও, বাড়ীতে আলগা উনুন নিয়ে এস, রেঁধে বেড়ে খেও। আর'......

কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা মেয়েলী গলার উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি যেন তীরের মত এসে বিঁধল। এ ঘরের দুটো মানুষের বুকে। একজনের জিভ্ আড়ষ্ট, চোখে শঙ্কা, কুঞ্চিত লোল চামড়া আবৃত জড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর একজনের ঠিক ভয় নয়, তবু যেন ভয়। আর একটা নাম না জানা তীব্র অনুভূতিতে নিশ্বাস আটকে রইল বুকের মধ্যে।

তারপর হাসিটা নিশ্বাসের দমকে দমকে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল, নিঃশব্দ জলের বুকে বুদ্বুদের শব্দের মত। ঈষৎ হাওয়ায় শিউরে উঠল কৃষ্ণকলির ঝাড়।

লাল মেঘের বুকে পড়েছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। এ নিঃশব্দের ফাঁকে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে অন্ধ গলিটার হট্টগোল।

বুড়ি হঠাৎ অভয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বুকের দুপাশ ও গলাটা দেখিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল, 'এই বুকে আর গলায় ক'রে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারিনে, রাখতেও পারিনে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি, যেদিনে আমি থাকব না।'

ব'লেই সে যেন আগুনের হল্কার জ্বালায় দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। ঝোল ঝাপ্পা পরা অভয় একটা অতিকায় ভূতের মত নির্জন ঘরটার অন্ধকার কোলে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় এনে তুলল আমাকে ভেলো খুড়ো। যে নিঃশ্বাসটা আটকে ছিল বুকের মধ্যে সেটা আর বেরিয়ে আসবার পথ পেল না। বুকের মধ্যেই ছটফট ক'রে মরতে লাগল সে।

বোধ করি, সেই নিঃশ্বাসটা ফেলবার জন্যই অভয় সেই ভোর বেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে। আসবার সময় রোজই শুনতে পায় পাশের ঘরটায় খস্ খস্ কাগজের শব্দ। যে মুহূর্তে গলিটাতে তার বুটের শব্দ হয়, তখন থেকে কয়েক মুহূর্ত শব্দটা বন্ধ হ'য়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে বেলোয়াড়ী চুড়ির রিনিঠিনি। একটু বা ফিস্‌ফিস্, কিংবা চাপা হাসির সঙ্গে কোন গলার একটা মৃদু শব্দ।

অভয় শুনেছে ভোলো খুড়োর মুখে, ওরা তিন বোন কাগজের ঠোংগা আর পিসবোর্ডের বাকস তৈরী করে। ওটাই ওদের প্রধান উপজীবিকা।

কিন্তু অভয়ের শরীরটা তখন অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। সারাদিনে ভারী ট্রাকের হুইলের কাঁপুনি আর বিরাট হাতীর মত বাডিটার ঝাঁকুনি গায়ের মাংসপেশীতে ছুচ ফোটার মত ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে। নাকের মধ্যে ভারী শ্লেষ্মার মত ধুলো জাম হয়ে থাকে।

কোন রকম লম্ফটা জ্বালিয়ে বিছানা পাতে বিড়ি ধরিয়ে লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। খাওয়া হয়ে যায় সন্ধ্যার একটু পরেই। তারও অনেক পরে শোনা যায় হয়তো নিমি ডাকছে। বিনিকে কিংবা বিনি টুনিকে। ওদের খাওয়ার সময় হ'ল। খাওয়ার পর গলিটার বুকে ওদের পায়ের টিপটিপ শব্দ শোনা যায়, ভীত চকিত মানুষের বুকের দুরু দুরু যেন। আবার সেই চুড়ির রিনিঠিনি। রাত্রির নিঃশব্দে আবার সেই চাপা গলার আভাস। পুকুর ঘাটে শোনা যায় বাসন ধোয়ার আওয়াজ।

তিন বোনের গলা আলাদা করতে পারে না অভয়। শুধু শোনে, কেউ বলে, উঃ গায়ে কি ব্যথা হয়েছে রে।' কেউ বলে, তাড়াতাড়ি কর, বড্ড ঘুম পেয়েছে। কেউ বা, সেই মুখপোড়া সাউটা সাত সকালেই মাল নিতে আসবে, বাকসের গায়ে তো এখনো লেবেল আঁটা হল না।

অন্ধকারে যতই ঝিম মেরে পড়ে থাকুক, অভয়ের কান দুটো যেন হা করে থাকে। তারপর হঠাৎ কি কারণে তীব্র মিষ্টি গলার খিলখিল হাসিতে শিউরে ওঠে রাত্রি। যেন একটা অসহ্য গুমোট অস্থিরতার মধ্যে হাসিটা মুক্তির সন্ধান খোঁজে। কিন্তু হাসিটা শেষ হয়ে আবার সেই অস্থিরতাই দলা পাকিয়ে ওঠে।

অভয় অশরীরী সাক্ষীর মত উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখা যায় মুচকুন্দ গাছে ঝুপসি আর মোড়ের সেই বাতিটা। তার এক চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিটা যেন বিদ্রূপ করে বলতে থাকে অভয়কে, আমি জেগে আছি বহুদিন, এবার তুইও জাগছিস।

পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদে[illegible] হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে দক্ষিণের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়ের ঘরে, তার গায়ে। সে ছেলেমানুষের মত মটকা মেরে পড়ে অনুভব করে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি ফুটছে তার গায়ের মধ্যে।

তারপর আবার নিঃশব্দ ও অন্ধকার শুধু দূরের কারখানার বয়লারের ধিকিয়ে চলার একটানা ঘুস ঘুস শব্দ।

সেদিন রাত্রে ফিরতে গিয়ে কৃষ্ণকলি[illegible] বনে থমকে দাঁড়াল অভয়। কে যে[illegible] কাঁদছে। এখনো বস্তিতে হট্টগোল টিউবওয়েলের প্যাকপ্যাকানি। তার মধ্যে এখানকার নিরালায় কান্নার শব্দ।

অভয় কান পাতল। ভুল হয়েছে কান্না নয়, গান গাইছে। দুটি গলায় মিলিত সরু গলার গান। গাইছে দুই বোন,

বনের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুন কেউ না দেখে,
সে পোড়াতে হয়েছি অংগার।

সে গানের টানা সুরের লহরীতে রাত্রি দুলছে না, আড়ষ্ট ব্যথায় থমকে পড়েছে। শরতের আকাশে আধখানা চাঁদ অসংখ্য অপলক চোখের মত তারা নীচেও তারার মতই রাত্রির নিরালায় ঘোমটা খোলা কৃষ্ণকলি।

কিন্তু হাসি নেই, সুপ্তির আরাম নেই। চাপা আগুনের পোড়ানিতে যেন এ বিশ্বসংসার দিশেহারা, তবুও নির্বাক নিরেট।

ধিকিধিকি আগুন জ্বলে যেন অভয়ের বুকেও। ভাবে, পেছুবে। কিন্তু পেছিয়েও সামনেই এগোয়। গানটা থেমে পড়েছে। তবুও আবার থামতে হয় শোনা যায়, একজন বলছে, 'না এখনো আসেনি।'

আর একজন, 'কে সেই মিলিটারি তো?'

'মিলিটারি নয়রে, ভোলা খুড়ো বলছিল, মোটরের মিস্তিরি।'

অভয় নিজের অজান্তেই আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শোনে, 'মাইরি লোকটা যেন কি। আমাদের বোধ হয় ভয় পায়।'

আর একজনের তীব্র বিদ্রূপাত্মক গলা শোনা যায়, ভয় নয়, ঘেন্না করে। ভাবে, ধুমসি পেত্নীগুলোন কোনদিন দেবে ঘাড় মটকে।

তারপর একটা হাসির উচ্ছ্বাস উঠতে গিয়েও মাঝ পথেই ট্রাকের এক্সিলেটর চাপার মত সেটা থেমে যায়। শব্দ ওঠে কাগজের খস্খস্।

অভয়ের গায়ে যেন আগুন লাগে। নিজেকে কিছু জিজ্ঞেস করেও জবাব না পাওয়ায় বোকার মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর, খট খট শব্দ তুলে, ঝনাৎ করে শিকল খুলে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু পরদিন শরৎ আকাশের রং-বাহারি পড়ন্ত-বেলায় অবিশ্বাস্য রকমে অভয়ের বুটের শব্দ শোনা যায় গলিতে। শব্দটা অভয়ের নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয়, কি একটা মহাপাপ করে ফেলেছে সে।

ওদিকে তিন বোনের কি একটা গুলতানি চলছিল। ওরাও একেবারে চুপ হ'য়ে গেল।

ওদের বুড়ি মাও আশেপাশেই আছে কোথাও। বুড়ি সারাদিন ওই মুচকুন্দ গাছের মোটা গোড়া থেকে শুরু করে এখানে সেখানে ঘুটে দিয়ে ও গোবর কুড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে, না বিষ না মধু সেই অমূল্য বস্তুগুলির প্রতি তার নিয়ত সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা ঘুরছে।

অভয় এই মুহূর্তের সংকোচ ও অস্বস্তিটাকে কাটিয়ে তোলার জন্যই যেন, দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢোকে, খাকী ঝাপাঝোপ্পা খোলে। গামছা কাঁধে নিয়ে হুস হুস করে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে এসে বসে। অনেকদিন পরে বিকালের দিকে শরীরটা ক্লেদমুক্ত হয়ে একটু আরাম পায়। কিন্তু মনের মধ্যে থাকে একটা বিষের খচখচানি।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির বনে তিন বোনের মূর্তি ভেসে ওঠে। খালি গায়ের উপর কাপড় জড়ানো। তিনজনেরই সদ্য বাঁধা মস্ত খোঁপায় দিয়েছে চন্দনের বিচির মত লাল মটর দেওয়া সস্তা কাঁটা। সেগুলি যেন কুণ্ডলীপাকানো কালসাপিনীর চোখের মত জ্বল জ্বল করে। আর আশ্চর্য। এতখানি বয়সেও ঘোচেনি কারুর লালিত্য। যৌবনের জোয়ারে ধরেনি ভাঁটার টান। জোয়ার যেন বাধা পেয়ে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। বঙ্কিম ঢেউ উদ্ভাসিত সুউচ্চ রেখায়।

তবু যেন মনে হয় একটা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতা ঘিরে রয়েছে তাদের। নিমি যেন এক ছেলে মরা মা, বিনি মন গোমরানো বউ, টুনি প্রেমিকা কিশোরী।

তিন বোন যেন তিন সই। মিটি মিটি হাসে, আড়ে আড়ে চায়। তবু চাইতে পারে না। তিন জনে গায়ে গায়ে গিয়ে নামে পুকুরের জলে। ঢেউয়ে দোলে কচুরিপানা ফণা তোলা কালনাগিনীর মত।

অভয় চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারে না। জানালা থেকে সরে আসব আসব করেও সময় বয়ে যায়। না দেখতে চেয়েও দেখে, ছপছপ শব্দে গা ধুয়ে ফিরে চলেছে তিনজনা। না হাসি না হাসি করেও ফিক ক'রে হেসে উঠে মোহাচ্ছন্ন করে রেখে যায় সমস্ত জায়গাটা।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে চমকে ওঠে অভয়। পেছনে দেখে বুড়িমা। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণের আকাশের দিকে। থরথর করে কাঁপছে অতিকায় গিরগিটির মত গলার চামড়া। অভয় ফিরে তাকাতে ফিসফিস করে বলে। 'বুকের মধ্যে ধুক-ধুক করে, গলায় ধড়ফড় করে। কোথা রাখি, যাই কোথা। খালি তরাসে তরাসে মরি।' বলেই বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়। অভয়ের মনে হয় সে পাথর হ'য়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বস্তির গণ্ডগোল, হাসি ও হল্লা। ঢোলক অথবা খঞ্জনির বাজনা।

এমনি চলে কয়েকদিন। রোজই অভয় ফিরে আসে বিকালের ছুটির পর। আসব না করে আসে।

কয়েকদিন পর, বিকেলে পুকুরে ডুবে ঘরে ঢুকে অভয় থমকে দাঁড়াল। চোখের সামনে যেন এক অবিশ্বাস্য বস্তু দেখে চমকে উঠল। দেখল এলুমিনিয়ামের গেলাসে খয়েরী রং-এর ধূমায়িত চা। চা? চা-ই তো হ্যাঁ। মনে হল গেলাসটা সাগ্রহ চুমুকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সংশয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখে।

অভয় একবার ভাবল, পেছন ফিরে দেখি। কিন্তু দেখে না। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে ধীরে সুস্থে চায়ের গেলাসটি নিয়ে চুমুক দেয়। ঢোঁকে ঢোঁকে উষ্ণতাতে বুকের মধ্যে একটা দরজা খুলে যায়। মনটা ভোর হয়ে আসে।

তারপর শূন্য গেলাসটা রাখতে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গেলাস নিয়ে গলিটা পেরিয়ে একেবারে ভেতরের উঠনে এসে পড়ে। শূন্য উঠোন। কেউ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল তিন বোন মাথা নীচু করে কাজে ভারী ব্যস্ত।

অভয় বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে করেও কথা আসে না মুখে। কয়েক মুহূর্ত এমনি চুপচাপ।

হঠাৎ টুনিই বলে, তুই দিয়ে এসেছিলি বুঝি।

নিমি বলে, 'আমি কেন, বিনি তো।'

বিনি বলে, 'ওমা, কি মিথ্যুক। আমি কেন বামুনের ছেলেকে চা দিতে যাব।'

অভয় দেখে কালো চোখের চোরা চাউনিতে হাসির চকমকানি। হাসিটা তারও মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, 'না হয় গেলাসটা হে'টে হে'টেই গেল, তাতে বামুনের জাত যাবে না। বামুন আর কোথায়, একেবারে জাত ড্রাইভার। সারাদিনের খাটুনির পর বিকেলে এ রকম, মানে একটু চা পেলে......, আচ্ছা আমি না হয় চা চিনিটা......।' ব'লে সে হেসে চায়।

ততক্ষণে তারা তিন বোন উচ্চ হাসিতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। টুনি বলে, 'বিনি, তুই-ই না হয় চা'টা দিস।'

বিনি বলে, 'নিমি, তুই তা'হলে দুধটা দিস?'

নিমিও বলে, 'চিনিটা তা'হলে টুনির।'

তারপরে আবার হাসি। এবার অভয়ও না হেসে পারে না। এই ভাঙ্গা বাড়ীর বুকে মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসি বোধ হয় প্রথম। যেন এখানকার চাপা পড়া দুঃসহ অস্থিরতা একটা মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে বেরিয়ে এল।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই হাসিটা থেমে এল বুকে ফিক ব্যাথা লাগার মত। ফিরে এল সেই রুদ্ধ অস্থিরতা।

নিমি বলে, 'বিনি, মা কোথা?'

বিনি বলে, 'মাঠের ধারে গোবর কুড়োতে গেছে। পালের গরু ফিরবে এবার।'

তবুও কেউ-ই চাপতে পারে না একটা ছোট্ট নিশ্বাস। তিনজনের মধ্যে মূর্তি ধরে ওঠে হতাশা।

পথের মাঝে বেগড়ানো গাড়ীর বন্ধাকুফ ড্রাইভারের মত অবাক ও মুগ্ধ হয়ে ওঠে অভয়।

কিন্তু এমনি করেই আড় ভেঙ্গে যায়। খুলে যায় সেই মুক্ত দ্বার। বাধা মুক্ত জোয়ার এগোয়। কখনো সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে, কখনো এড়াবার সুযোগ পাওয়াও যায় না।

প্রথমেই তিন বোনের অসীম কৌতূহল, কোথায় বাড়ী, কে কে আছে।

অভয় বলে, 'কে আবার থাকবে। ছোট ছোট ভাই বোন আর বিধবা মা। ছেলেবেলা থেকেই সবাই আমার পোষ্য।'

'আর বিয়ে?'

'বিয়ে কে দেবে আর কে করবে? কথায় বলে, নিজের জোটে না, আবার শংকরাকে ডাকে।'

তারপর এ পক্ষ থেকে প্রশ্ন ওঠে, 'তোমাদের রোজগার কি রকম?'

নিমি বলে, 'ছাই! খেতে জোটে না।'

বিনি বলে, তিনজনের খাটুনিতে রোজ কুল্যে দু টাকার বেশী নয়।'

টুনি বলে, 'আর মা' ঘুঁটের পয়সা জমিয়ে রাখে।'

'কেন?'

'কেন? আমাদের বিয়ে দেবে ব'লে।' ব'লে তারা তিনজনেই তীব্র বিদ্রুপ ভরে হেসে ওঠে। হাসিটা অভয়ের মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে। কিছুক্ষণ কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। পরে বলে, যেন খানিকটা আপন মনে, 'হবে না কেন, হবে।'

হবে! যেন এমন বিচিত্র কথা তারা কোনদিন শোনেনি, এমনি উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তিন বোন তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে।

একটু পরেই টুনিই বলে, 'আমরা তো শংকরী। নিজের না জুটলে কে আমাদের ডাকবে?'

অভয়ের জিভ্ আড়ষ্ট, বুকে পাথর চাপা। সত্যি, কে ডাকবে, কেমন ক'রে ডাকবে। এ বিশ্ব সংসারে সকলের গলা চেপে রেখেছে যেন কোন্ অদৃশ্য দানব। বুকের মধ্যে এত গুলতানি, মুখ দিয়ে ফোটে না।

ফোটে না, তবু ফোটে। রাত্রির নিরালা অন্ধকারে ফুল ফোটার মত সে

নিঃশব্দে ফোটে! এখানে গড়ে ওঠে আর এক নূতন সংসার। তিন মেয়ে আর এক ছেলের বিচিত্র সংসার।

যাকে বলে ডেয়ো ঢাকনা, তাই একে একে জড়ো হয় অভয়ের ঘরে। আলগা উনুন আসে, কিনে আনে হাতা খুন্তি হাঁড়ি, থালা গেলাস।

আর দশটা বাড়ীতে যা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না, এখানে তাই হয়। সকাল বেলাই ভাত খেয়ে কাজে যায় অভয়। ভোর রাত্রে উনুন ধরে। মোটর মিস্তিরি কেন এসব পারবে। পালা ক'রে আসে তিন বোন। আসে ভোর রাত্রের আবছায়ায়, বাসি খোঁপা এলিয়ে, বিচিত্র বিস্রস্ত বেশে, ঠোঁটের কোণে তাজা হাসি নিয়ে। আবার আসে সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে। এসে অভয়কে সরিয়ে নিজেরা বসে রান্না করতে। এক সঙ্গে নয়, পালা ক'রে আসে। ঘরে নিজেদের কাজ আছে, তা' ছাড়া সেই সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির খবরদারিও আছে।

তবু আজ আর বাধ মানে না। অভয়কে ঘিরে এ তিনজনের আর এক নতুন চেহারা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

অবারিত হ'য়ে খুলে যায় চাপা প্রাণের দরজা। অভয়ের রান্না খাওয়া, আর জামা কাপড়টুকু পর্যন্ত নিজেরা কেচে দেয়। সবটুকু ক'রেও তাদের তৃষ্ণার্ত গুপ্ত সাধ মিটতে চায় না। এত আছে যে, দিয়েও প্রাণ ভরে না।

জাত বেজাতের বাধা ডিঙিয়ে ভাত বেড়ে দিয়ে বসে খাওয়ায় তারা অভয়কে।

নিমি খেতে দিয়ে অভয়ের সর্বাঙ্গ পাতিপাতি ক'রে দেখে। চোখে তার মমতা, ঠোঁটের কোণে বেদনার হাসি।

অভয় বলে, 'কি দেখছ?'

নিমি বলে, 'দেখছি তোমাকে। জাত মারলুম মিস্তিরির, তবু তোমার শরীরটা ভাল করে তুলতে পারছি না।'

অভয় হেসে বলে, তোমার খালি ওই ভাবনা। আর কত হবে। ড্রাইভার কি দুধগোলা পুরুষ হবে।'

নিমিও হাস। মন বলে, হ্যাঁ, দুধ-গোলা পুরুষই হবে। ঢল ঢল কান্তি, গোরাচাঁদ হবে অভয়। আর নিমি সবই ফেলে দেবে সেই গোরাচাঁদের পায়ে।

ভাবতে গিয়ে নিমির বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। তার শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার ক'রে ওঠে।

অভয় সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও স্বপ্নাতুর হ'য়ে ওঠে। বলে, 'কি হয়েছে নিমি?'

নিমি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে হাসে।

এমনি বিনিও আসে। সে যেন একটু রহস্যময়ী। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে খালি অভয়কে বলে, এটা দেও, সেটা দেও। তারপরে, 'আজকে বাজার থেকে এই এনো, সেই এনো। খেতে গিয়ে, অভয়ের আপত্তি থাকলেও যা প্রাণ চাইবে, তাই দেবে। না খেলে মাথার দিব্যি দেবে আর নিঃশব্দে কেবলি কাছে বসেও আড়ে আড়ে চেয়ে টিপে টিপে হাসবে। যেন মনের তলার গুরু কথা তার ঠোঁটের কোণে ঝিকিমিকি করে।

তা দেখে ওই হাসিটার মতই অভয়ের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলে। জ্বলুনিটা লাগে এসে রক্তস্রোতে। ডাকে 'বিনি।'

বিনি তাকায়, তার অপলক হাসি চোখে বিচিত্র ইশারা। সুগঠিত ঘাড়ের কাছে মস্ত খোঁপা। চাপা গলায় বলে,

'বল।'

'কিছু বলছ?'

তেমনি তাকিয়ে বিনি বলে, 'কি আবার।' একটু থেমে আবার বলে, 'তুমি না থাকলে বাড়ীটা খা খা করে।'

বলতে পারে না, তাদের মন খা খা করে। সেটুকু কান পেতে শোনে বিনি। শোনে, বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ তোল-পাড়, চাপা গুমরানি। তাকিয়ে দেখে অভয়ের বুকটা।

অভয় বলে, 'আমার কাজে মন বসে না। মনটা যে কোথায় থাকে।'

যেন না জানার জন্যই দুজনে চোখে চোখ তাকিয়ে হাসে।

আর টুনি যেন এক দজ্জাল বালিকা বউ। তাব ক্ষণে হাসি, ক্ষণে রাগ। তার হাসি অবাধ, আবার রাগও করবে। ছুটে ছুটে কাজ করবে। কাজের কি হ'ল না হ'ল তা দেখবে না। দিশেহারা কাজের মধ্যে সার হয় অভয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা। মনের মতটি না হ'লে ধমকাবে।

অভয় তার কাছটিতে বসে বলে, 'এই তবে রইলুম বসে, থাকল মিলিটারি কারখানা, আর চাকরি।' টুনি অমনি খিলখিল ক'রে হাসে। কখনো এলোচুলে, কখনো খোঁপা নেড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবে। দেখবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর থর থর কাঁপবে বাঁধভাঙ্গা শরীর।

অভয়ও মেতে ওঠে তার সঙ্গে। হাসে, রাগ করে। হয় তো আলুগোছে টুনির ঘাড়ের কাপড় মাথায় তুলে ঘোমটা ক'রে দেয়।

টুনি অমনি যেন সত্যি তীব্র অভি-মানে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ বাঁকিয়ে চায়। চোখের কোণে বকুনি ও কান্নার ঝিলিমিলি খেলে।

অভয় বলে, 'কি হ'ল টুনি?'

কি হ'ল তাই ভাববার চেষ্টা করে টুনি। কিছু টের পায় না। শুধু চোখের পাতা ভারী হ'য়ে আসে, অবশ হ'য়ে আসে সমস্ত শরীর। নিজেকে দেখে, সে যেন অভয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ অসহ্য লজ্জায় বিচিত্র রূপে রূপবতী হ'য়ে ওঠে টুনি। বলে, 'কি জানি কি হয়, জানিনে ছাই।'

তারা কেউ জানে না তাদের কি হয়েছে। চারজনে ডুবে আছে আকণ্ঠ।

নতুন গড়া এক ভরা সংসারের তারা চার-জন মানুষ।

অভয় না থাকলে সত্যি বাড়ীটা খা খা করে। সময় যেতে চায় না। তিনজনের বুকে একই তাল। চোখে একই জিজ্ঞাসা। তিনজনেই সারাদিন কান পেতে শোনে পদশব্দ। এই সুযোগে তাদের চাপাপড়া প্রাণের অস্থিরতাটা যেন ফিরে আসতে চায়। টুনি হয়তো গুন্ গুন্ ক'রে ওঠে।

আর রইতে নারি হ'য়ে নারী,
তোমার বাঁশী শুনে গো।
আর চলতে নারি হ'য়ে নারী
একি বিষম দায় গো।

বিনি তাতে গলা দেয়, নিমি সব ভুলে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বেজে ওঠে সেই পদ-শব্দ। বাজে যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

অভয় তিনজনকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারে না। একজনকে ভাবতে গেলে আর একজন আসে। কেউ কাউকে ছাড়া নয়। এর মমতা, ওর হাসি, তার অভিমান। তিনে মিলে যেন একটাই।

'তবু একটা নয়। এ সংসারের বিচিত্র নিয়মের মত তিন বোনের আলাদা সত্ত্বা যেন তলে তলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তাদের প্রাণের আর একটা গোপন দরজা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। অভয়কে তারা তিনজনে তিন রকমে টানে।

এমনি সময় একদিন বেলা দশটার অসময়ে গলিতে বেজে উঠল বুটের শব্দ। অসময়ে কেন। একে একে সব ফেলে ছুটে এল তিন বোন দেখল, শিকল দেওয়া বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে অভয় যেন ভেঙে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে। কি হয়েছে, অসুখ? বাড়ীর দুঃসংবাদ?

অভয় তাকায় তিনজনের দিকে। ফিক ব্যথায় আড়ষ্ট হ'য়ে যায় বুক। বলতে গিয়ে কথা ফোটে না মুখে। চোখের দৃষ্টি নেমে আসে। ভাবে, যাক বলব না। সব যায় যাক, তবু পারব না ছেড়ে যেতে, পারব না এমনি করে ভাসিয়ে দিতে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাই বোনগুলির বুভুক্ষু শুকনো মুখ। ওদের যে আর কেউ নেই। সে বলে, যেন চেপে আসা গলায় কোন রকমে বলে, 'ট্রান্সফার, মানে বদলী ক'রে দিলে, পানাগড় ডিপোতে!'

বদলি! সামনে তিন মেয়ের মুখ নয়, তিনটি প্রাণহীন মৃত মুখ। শিরে শিরে, রক্তপ্রবাহ বন্ধ, চলৎশক্তিহীন। যেন বুঝেও বোঝেনি সমস্ত ব্যাপারটা।

হু হু ক'রে হাওয়া এল গলিটার অন্ধ সুড়ঙ্গে। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া। কবে এসেছে বসন্ত কে জানে। বসন্ত এসেছিল সেই শরতেই, মেঘভাঙা রোদে, হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের রুক্ষতায়।

অভয় বলল, যেতে হ'লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। কালকেই জয়েন করতে হবে।'

যেতে হ'লে নয়, যেতে হবে। দুরন্ত হাওয়ায় সেই কথাটি যেন মর্মে মর্মে এসে বলে দিয়ে যায়।

নিমি, বিনি, টুনি তিন বোন। ওদের চোখে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না থমকে রয়েছে চোখে। বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলে আসছে।

অভয়ও আর তাকাতে পারে না। বুকটা মুচড়ে তারও গলাটা বন্ধ হ'য়ে আসে। কোন রকমে দরজাটা খুলে সে ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফিরে আসে সেই অস্থিরতা। অদৃশ্যে সে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে ঘরে বাইরে। ছটফট করে মরে রুদ্ধ যৌবনের দ্বারে দ্বারে।

সব গোছগাছ হ'য়ে যায়। সেই স্যুট-কেস আর বিছানা।

তিন বোন বুক চেপে দেখে উনুন, কড়া, খুন্তি, হাঁড়ি। সেগুলিও যেন তাদেরই মত রুদ্ধ যন্ত্রণায় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের গড়া ঘর। খেলা ঘর। যাকে ঘিরে সে চলে যায়, এগুলি পড়ে থাকে তাদেরই মত।

তারপর অভয় আবার দাঁড়ায় তিন বোনের মুখোমুখি। পুরুষের শক্ত বুক ফাটে, ঠোঁট বেঁকে ওঠে। খালি শোনা যায়।

যাচ্ছি, যাচ্ছি তবে।'

এই তিনজনের বুকের মধ্যেও হাহা-কার ক'রে উঠল বিদায় দেওয়ার জন্য। ঠোঁট কাঁপল, বন্ধু বিদায়ের হাসি হাসতে চাইল। পারল না। হাত বাড়িয়ে বুঝি ছুঁতে চাইল, পারল না।

হাওয়া এল। শূন্য ঘর। ছড়ানো সংসার। ফুল নেই, শুকনো কাঠির মত শীর্ণ পাতাহীন কৃষ্ণকলির ঝাড়। কাল-কাসুন্দের বন। পোড়া পোড়া পাঁশুটে কচুরিপানা।

একদিন যেমন এসেছিল, আজ তেমনি পোষাকে, তেমনি ঠেকে ঠেকে হাতে আর ঘাড়ে বোঝা, চলেছে অভয়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সবই ঝাপসা।

মুচকুন্দ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আবার তাকাল।

সেখানে এসেছে তিন বোন, ভাঙা পাচিলের ধারে। কিন্তু চোখ অন্ধ হয়ে এসেছে, সামনে অন্ধকার।

অন্ধকার কানা গলিটাতে ঢুকে পড়ল অভয়। মোড়ের বাতিটা তাকিয়ে আছে এই দিকেই, এক চোখে।

তারপর হঠাৎ একটা চাপা তীব্র গুমরানি শুনে তিন বোন ফিরে দেখল, দেয়ালের নোনা ইঁটে মুখ চেপে কাঁদছে বুড়ীমা কেন, তা কেউ জানে না, বুঝবে না।

কার্তিকের আত্মকথা

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

আমার শাস্ত্রীয় নাম স্কন্দ-কার্তিকেয়। বাঙালীদের মধ্যে ম কার্তিক বলিয়াই পরিচিত। স্বয়ং বান যদিও আমাকে বিশ্ববিজয়ী াপতি বলিয়াই ভারতবর্ষে প্রচার রয়াছেন, বাঙালীরা কিন্তু আমাকে বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই স্মরণ য়া থাকে। তাই বাঙলা দেশে আমি পর কার্তিক হইয়া গিয়াছি। প্রতি র শারদীয় পূজার সময় আমি বাঙলা শ আসিয়া থাকি। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শের মত দশভুজার পার্শ্ব রক্ষা করিয়া লীর শারদীয় উৎসবে আমি র্ভূত হই। কিন্তু দশমুখে দশভুজার গান করিয়া বাঙালীরা যে 'শারদীয় া' প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাতে র জীবন কাহিনী স্থান পায় না। ী, সরস্বতীর স্থান আছে; এমন কি হ এবং অসুর পর্যন্ত 'শারদীয় ্যার গবেষণার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। ন্তু 'শারদীয় সংখ্যার' সম্পাদকেরা াকে কেবল এড়াইয়াই গিয়াছেন। তাই ার আমি নিজের আত্মকাহিনী নিজেই খিতে বসিয়াছি। দেবতাদের মধ্যে বই খার রীতি নাই। তাই মানুষের লিখা পড়িয়া পড়িয়া, অজন্তা ও এলোরার হায় গুহায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, প্রস্তর খা উদ্ধার করিয়া এবং পুরাতন মুদ্রার স্য ভেদ করিয়া আমার জন্ম ও কর্ম বন্ধে কতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, ইটুকুই আমি বাঙালীকে উপহার লাম।

কবে এবং কেমন করিয়া যে আমার ম হইয়াছিল, তাহা সঠিক বলিতে রি না। তবে মনে হয় সংহিতা ও ণ যুগের পর এবং উপনিষদের যুগের র্বে কোনও এক সময়ে আমি প্রথম ির্ভূত হইয়াছিলাম। আধুনিক ডতেরা বলিয়া থাকেন দেবতারা নাকি মানুষেরই প্রতিচ্ছবি। মানুষের সমাজে যখন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দেবতাদের মধ্যেও তখন কোন রাজা ছিল না। মানুষের মধ্যে যখন রাজা নামক জীবের আবির্ভাব হইল দেবতাদের মধ্যে, তখন ইন্দ্রকে দেবরাজ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। বৈদিক যুগের রাজারা নিজেরাই সেনাপতির কাজ করিতেন। সুতরাং স্বর্গেও দেবরাজ ইন্দ্রের উপরই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনার ভার অর্পিত ছিল। মানুষের রাজা কিন্তু বেশী দিন সেনাপতিত্ব করিতে পারিলেন না। অন্য বহুবিধ কর্তব্যের ভারে তাহাকে সামরিক দায়িত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল। এই দায়িত্ব পড়িল সেনাপতির উপর। মানুষের রচিত স্বর্গ রাজ্যেও এই রীতিই চলিল। দেবরাজ ইন্দ্র সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং সৈন্য পরিচালনার ভার পড়িল আমার উপর। সেই দিন হইতে দেব সেনাপতি স্কন্দের সৃষ্টি হইল। মর্তালোকে কবে যে সেনাপতির পদ সৃষ্টি হইল, তাহা নির্দেশ করা কঠিন। মহাভারতে ও পুরাণে দুর্ধর্ষ সেনাপতিদের উল্লেখ আছে। সুতরাং ভারতবর্ষে সেনাপতি নিয়োগের প্রথা নিশ্চয়ই মহাভারতের যুগের বহুপূর্বেই হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বা সংহিতা শাস্ত্রে কিন্তু সেনাপতির কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। সুতরাং একথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, মহাভারতের যুগের বহুপূর্বে অথচ ব্রাহ্মণ যুগের পর ভারতবর্ষে সেনাপতি নামক বলাধ্যক্ষের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বর্গরাজ্যে সেনাপতি স্কন্দের জন্মও এই সময়ই হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্যেই বোধ হয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সেনাকে ইন্দ্রের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে অথচ মহাভারতের দেবসেনা আমারই একান্ত প্রণয়িনী। এই জন্যই ব্রাহ্মণ এবং সংহিতার ইন্দ্র সৈন্য-পরিচালক; কিন্তু মহাভারত ও পুরাণের ইন্দ্র শুধু 'দেবরাজ'। পতঞ্জলির সময়ে আমি নিশ্চয়ই উত্তর ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলাম; কারণ পতঞ্জলি লিখিয়াছেন ব্যবসায়ীরা আমার মূর্তি বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জন করিত। ভরদ্বাজগৃহ্যসূত্রের রচনাকারের সহিত আমার পরিচয় ছিল। গীতা রচনা কালে নিশ্চয়ই জগদ্বিখ্যাত সেনাপতি বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল; কারণ গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—সেনানীনামহম্ স্কন্দঃ। আরও অনেক পূর্বে উপনিষদের ঋষিরাও আমার নাম জানিতেন; কারণ ছন্দোগ্যোপনিষদে আমার নামোল্লেখ আছে। পণ্ডিতগণ বলেন, গীতার রচনা কাল খৃষ্টজন্মের ৪০০ বৎসর পূর্বে। ছন্দোগ্যোপনিষদের রচনাকাল খৃষ্টজন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং আমার জন্মও এখন হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারি।

এলোরার কোন কোন মূর্তিতে এবং প্রাচীন পুস্তকে আমার সম্বন্ধে একটা নূতন কাহিনী লেখা রহিয়াছে। আমি নাকি একজন খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত এবং ধর্ম রহস্যের ব্যাখ্যা কর্তা। ছন্দোগ্যোপনিষদে দার্শনিক সনৎকুমারের সহিত আমার অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। বৈদিক শাস্ত্রে সনৎকুমার ধর্ম ও অহিংসার পুত্র। কোথাও বা তিনি ব্রহ্মনন্দন। বৌদ্ধ দীঘনিকায়ের সনম্‌কুমারও

জ্ঞানবান পণ্ডিত। উপনিষদের সনৎকুমার নারদ-ঋষির শিক্ষক। এদিকে আবার মহাভারতের কোথাও কোথাও আমি হইয়াছি ধর্মরহস্যের ব্যাখ্যাতা। এলোরার একটি মূর্তির নিম্নে আমাকে বলা হইয়াছে—শিবদেবস্য দেশিকম্‌। অর্থাৎ শিবের গুরু। ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তা হিসাবে যে আমার এত বড় খ্যাতি রহিয়াছে, তাহা আমিও জানিতাম না। আমি দেব সেনাপতি বলিয়াই চিরকাল নিজকে জানিয়া আসিয়াছি এবং অপর সকলেও আমাকে এই বলিয়াই পূজা করিয়া আসিতেছে। নিজের মনেই একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। ঋষির কল্পনায় যখন আমার প্রথম জন্মলাভ হইল, সেই জন্মমুহূর্তে আমি দার্শনিক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম না সেনাপতি হইয়া? স্বর্গে আমার আদি কর্ম ছিল কি,—শাস্ত্র ব্যাখ্যা না সৈন্য-পরিচালনা? ঋষি ও দার্শনিক স্কন্দই দেবসেনাপতিতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে না দেবসেনাপতি স্কন্দকেই দার্শনিকের সম্মান দেওয়া হইয়াছে? সন্দেহসমাকুল চিত্তে বহু পুরাতন ইতিহাস পড়িয়া ফেলিলাম। একটি সিদ্ধান্ত হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিল। উপনিষদে দেখিলাম বহু ক্ষত্রিয় দার্শনিক হইয়া গিয়াছে। বহু রাজাকে দেখিলাম ঋষির আসনে বসিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন। দেখিলাম ক্ষত্রিয় জনক বৈদেহ ব্রাহ্মণ আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে শিক্ষাদান করিতেছেন; ক্ষত্রিয় অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ বালাকির বিদ্যাগর্ব চূর্ণ করিতেছেন; ক্ষত্রিয় রাজা প্রবহণ জৈবলি ব্রাহ্মণদিগকে জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে অবহিত করিতেছেন; ক্ষত্রিয় রাজা অশ্বপতি কৈকেয় পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন; ক্ষত্রিয় চিত্র গৌতম পুত্র শ্বেত-কেতুর শিক্ষাগুরু হইয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়াও দেখিলাম ক্ষত্রিয়-নন্দন বুদ্ধ এবং মহাবীর ধর্ম প্রচারক হইয়া গিয়াছেন। মনুষ্য জাতির ক্ষত্রিয় প্রধানেরা অনেকেই ধর্ম ও দর্শনে জ্ঞান লাভকেই কাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদের মধ্যে আমিই ক্ষত্রিয়প্রধান। সুতরাং এই সময়ই বোধ হয় আমার উপরও দার্শনিক জ্ঞানের আরোপ হইল। দেব-ঋষি সনৎ-কুমার এবং দেবসেনাপতি স্কন্দ এক হইয়া গেল। ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মর্ত্যের রাজাদের মুখে ধর্মরহস্য প্রকাশ পাইয়াছিল। সুতরাং স্বর্গের ক্ষত্রিয় আমার মুখেও ধর্ম ব্যাখ্যা গুঁজিয়া দেওয়া হইল। মূলতঃ আমি ক্ষত্রিয়,—দেবসেনাপতি। আমার দার্শনিক প্রতিভা ঐতিহাসিক কারণে আবশ্যক একটি গৌণ বৈশিষ্ট্য মাত্র।

পুরাতন বইগুলি পড়িয়া একটা অদ্ভুত তথ্য আমি আবিষ্কার করিয়াছি। আমি নাকি শিশুদের মঙ্গলামঙ্গলের নিয়ামক। মহাভারতের বন পর্বে দেখিলাম আমি ও আমার পারিষদ কুমারক এবং কন্যাগণই নাকি শিশুদের জীবনমরণের কর্তা। দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখা বই শুশ্রুত-সংহিতায় বর্ণিত আছে যে, দেব-সেনার স্বামী স্কন্দ এবং তাহার পারিষদ-বর্গ শিশুরোগের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সূত্র সাহিত্যে মেধাজনন এবং আয়ুষ্য উৎসবের বর্ণনা উপলক্ষেও শিশু-জীবনের উপর আমার প্রভাবের কথা উল্লেখ আছে। খুঁজিতে খুঁজিতে মথুরার কোনও এক স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত একখানা মার্বল-পাথর দেখিতে পাইয়াছি। ঐ পাথরের উপর একটি ছাগমুখ দেবতা এবং শিশুসহ তিনটি নারী মূর্তি খোদিত আছে। ভারতেতিহাসের শক-কুশান যুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে ঐ পাথরের নিম্নে লেখা রহিয়াছে —ভগবা নেমেসো। এই দেবতাটি যে কে তাহা বুঝিঝাম না। প্রত্নতাত্ত্বিক বুলার সাহেব আরও বলিলেন যে, কল্প-জানিলাম যে, 'নেমেসো' কল্পসূত্রের হরিণেগমেসী ব্যতীত আর কেহই নহেন। বুলার সাহেব আরও বলিলেন যে, কল্প-সূত্রে ব্রাহ্মণী দেবনন্দার গর্ভ হইতে মহাবীরের ভ্রূণকে ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করিবার যে গল্প আছে, মথুরার পাথরে তাহারই ছবি আঁকা রহিয়াছে। এই ভ্রূণ স্থানান্তর করিতেছেন হরিণেগমেসী অর্থাৎ মার্বল পাথরের ভগবা নেমেসো। এই হরিণেগমেসীই যে আমি দেবসেনাপতি স্কন্দ, তাহাতে কোন ভুল নাই। কারণ কল্পসূত্রেই অন্যত্র হরিণেগমেসীকে দেবসেনাপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভারতেও আমার এক নাম নৈগমেয় এবং মহাভারতেই

াথাও আমাকে ছাগমুখ বলিয়া বিশেষিত া হইয়াছে। সুতরাং আমিই যে কল্প- ত্রের হরিণেগমেসী এবং মার্বল-পাথরের াবা নেমেসো তাহাতে কোন সন্দেহ ই। ইংরাজ পণ্ডিত স্মিথ সাহেবের রার পুরাবৃত্ত নামক বইতে দেখিলাম রো ফলকের বয়স প্রায় দুই হাজার সর। তাহা হইলে দুই হাজার বৎসরেরও ধিক কাল পূর্বে আমি শুধু দেব- াপতিই ছিলাম না, শিশুদের সুখ- খের নিয়ামক দেবতাও আমিই ছিলাম। শুর মরণ-জননের ভার কি করিয়া ার উপর আসিয়া বর্তিল, তাহা বুঝি ই। ঋগ্বেদের যুগে রুদ্র নামক দেবতাই শু রোগের কর্তা ছিলেন। রুদ্র ক্রমশঃ র হইয়া দেবাদিদেব হইয়া গেলেন। ুদ্র পার্থিব ব্যাপারে তাহার আর উৎসাহ হল না। সুতরাং শিশুদিগের জন্য তুন নূতন দেবতার প্রয়োজন হইল। ার এক নাম ছিল কুমার। আমাকে ার রুদ্রের পুত্র বলিয়াও কল্পনা করা য়াছিল। সংহিতা এবং সূত্র-সাহিত্যে কে যেমন ধূর্ত বলিয়া অভিহিত করা য়াছে, অথর্ব-বেদ পরিশিষ্টে দেখিলাম াকেও তেমনি ধূর্ত বলিয়া ডাকা ইতেছে। রুদ্রের সহিত একখানি সান্নিধ্য ারণেও আমার উপরই বোধ হয় শিশুর দুঃখের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

আমার চারিটি নাম সম্বন্ধে মর্ত- সীদের মধ্যে বড়ই মতদ্বৈধ আছে বলিয়া ন হইল। এই চারিটি নাম,—স্কন্দ, মার, বিশাখ ও মহাসেন। এই চারিটি বল আমারই অভিধা। কিন্তু কলিকাতা শ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কারমাইকেল ধ্যাপক ডি আর ভাণ্ডারকারের ১৯২১ ালের বক্তৃতায় দেখিলাম তিনি লিয়াছেন—পূর্বে এই চারিটি নামের ারিটি বিভিন্ন দেবতা ছিল। তিনি নটি যুক্তি দিয়াছেনঃ ১। পতঞ্জলি ই সময়ে স্কন্দ এবং বিশাখের নাম রিয়াছেন, ২। মহারাজ হুবিস্কের ান কোন মুদ্রায় চারিটি মূর্তি আছে বং সঙ্গে চারিটি নাম আছে,—স্কন্দ, ার, বিশাখ ও মহাসেন, ৩। অভিধান- ে অমর সিংহ তাহার বর্তিকায় চারিটি ক্তিতে কার্তিকেয়ের যে প্রতিশব্দ য়াছেন, তাহার প্রত্যেক পংক্তির প্রথম শব্দ যথাক্রমে স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেন। কারমাইকেল অধ্যাপকের এই যুক্তি কিন্তু আদৌ যুক্তিসহ নহে। বৃটিশ মিউজিয়ামে হুবিস্কের মুদ্রাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, কোন মুদ্রায়ই চারিটি মূর্তি নাই। কোথাও আছে তিনটি, কোথাও দুইটি। তাহার মধ্যে আবার একটি মূর্তিই পুরুষের মূর্তি বুলিয়া মনে হইল; অপর সকলই স্ত্রী মূর্তি। সুতরাং ঐ মুদ্রায় স্কন্দ, কুমার, বিশাখ, মহাসেন বলিতে ঐ একটি পুরুষ মূর্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একই মুদ্রায় একই মূর্তির একাধিক নাম থাকিতে পারে। অনেক মুদ্রায় বুদ্ধদেবের একাধিক নাম রহিয়াছে। কারমাইকেল অধ্যাপকের বিশ্ব-বিখ্যাত পিতা কিন্তু হুবিস্ক মুদ্রার স্কন্দ, কুমার, বিশাখ ও মহাসেন একই দেবতার নাম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া-ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমান অধ্যাপক ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ও এই বিশ্বাসই সমর্থন করেন। আমার কুমার

নামটি বহু প্রাচীন। উপনিষদের যুগেও কুমার আমারই অভিধা ছিল। হুবিস্ক মুদ্রার প্রায় সমসাময়িক শুশ্রুত-সংহিতায় স্কন্দ এবং কুমারকে একই দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাসেন নামটি নিশ্চয়ই সৈনাপত্য বোধক। আমার সেনা-পতিত্বের কথা যত প্রাচীন, আমার মহাসেন নামটিও তত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। পতঞ্জলির প্রমাণকে অবশ্য সহসা আমি উড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। তবে একথা ঠিক যে, অমর সিংহের চারিটি পংক্তি নিতান্তই আকস্মিক। মোটের উপর, হয়ত কোনও কালে আমরা পৃথক দেবতা ছিলাম; কিন্তু সে যে কতকাল পূর্বে তাহা অনুমান করিতে পারি না। হয়ত খৃষ্টের জন্মের অনেক পূর্বে।

আমি রুদ্র এবং পার্বতীর পুত্র। পুরাণের কোথাও কোথাও লিখিত আছে যে, আমি অগ্নির ঔরসে গঙ্গা বা স্বাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অগ্নির সহিত আমার সম্বন্ধটা হয়ত সামরিকসূত্রেই হইয়াছিল। ঋষিদের দেখা যায়, অগ্নি কোথাও কোথাও সৈন্য বাহিনীর পুরো-ভাগে রহিয়াছেন। সেনাগ্নি নামে এক প্রকার অগ্নির উল্লেখও পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। সুতরাং আমি যখন দেবসেনাপতি হইলাম, তখন সহজেই অগ্নির সহিত আমার একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তা ছাড়া, বৈদিক সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ অগ্নি ও রুদ্রের অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই জন্যই রুদ্রপুত্র স্কন্দকে ঋষিরা কোথাও কোথাও অগ্নি-নন্দন বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

মাতৃগণ নামক এক দেবীগোষ্ঠীর সহিত আমার বহুকালের সম্বন্ধ। ইহারা কাহারা আমি সঠিক বলিতে পারিব না। মহা-ভারতে আমি মাতৃনন্দন বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। আমি মাতৃগণের স্তন্য পান করিয়াছি। ইন্দ্র কর্তৃক আমি মাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পূজিত হইয়াছিলাম। আমার মন্দিরে পরিবার-দেবতা হিসাবে সপ্তমাতৃকার বিন্যাসের ব্যবস্থা ছিল। আমি যে অগ্নির পুত্র এবং অগ্নির সহিত যে আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সম্পর্কের সূত্র ধরিয়াই মাতৃগণ আমার মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অগ্নিকে বৈদিক সাহিত্যে মাতরিশ্বন্ বলা হইয়াছে। মাতরিশ্বন্ অর্থ, মাতৃগর্ভে বিবর্ধমান। পরবর্তী কালে অগ্নির এই উপাধিটি অগ্নিপুত্র আমার উপর অর্পণ করা হইয়াছে। এই সূত্রেই আমার পূজার সঙ্গে মাতৃগণের পূজাও প্রচার লাভ করিয়াছে। অনেকে কিন্তু মনে করে, এই মাতৃপূজাটা মূলতঃ বৈদিক সভ্যতার পূজা নহে; ইহা দ্রাবিড় সভ্যতা হইতে আর্য সভ্যতায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিলাতের বিখ্যাত পণ্ডিত আর্থার বেরিডেল কিথ্ অন্ততঃ এইরূপই মনে করেন। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, একগোষ্ঠী আর্যেতর দেবতা আমার মধ্য দিয়া মর্ত্যলোকে পূজা লাভ করিয়াছে। আমি কিন্তু একথা স্বীকার করিতে সম্মত নহি। আমার মনে হয়, বৈদিক রুদ্র হইতেই মাতৃপূজার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বিষয়ে আর্কম্যান এবং হর্ফাকিন্স সাহেব আমার পক্ষে রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

যে সাতাশটি নক্ষত্র হিন্দুদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাহাদের দুইটির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এই নক্ষত্র দুইটি হইল কৃত্তিকা ও বিশাখা। কৃত্তিকার অপর নাম বহুলা। তাই আমার নাম কোথাও কার্তিকেয়, কোথাও বাহুলেয়, আবার কোথাও বিশাখ। মনুষ্য সমাজে নক্ষত্র পূজার প্রচলন আছে। এখনও বাঙলার মেয়েরা তারার ব্রত করিয়া থাকে। এই নক্ষত্র পূজা কি করিয়া আমার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল, জানি না। তবে একথা ঠিক যে, অগ্নি দেবতার সহিত আমার যে সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্ক অবলম্বন করিয়াই কৃত্তিকাদির সহিত আমার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। পুরাতন কাল হইতেই এই সকল নক্ষত্রের সহিত অগ্নির একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কালিদাস কৃত্তিকাকে বলিয়াছেন, অগ্নিশিখাকৃতি-ষট্‌তাড়কাময়। মহাভারতে ইহার অভিধা অগ্নিদৈবত এবং বরাহমিহির ইহাকে বলিয়াছেন, আগ্নেয় এবং বিশাখাকে বলিয়াছেন, ইন্দ্রাগ্নিদৈবত। অগ্নির সঙ্গে আমার এবং কৃত্তিকাদির এই সাধারণ সম্পর্ক হইতেই আমার এই নাক্ষত্রিক আত্মীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। অগ্নি যখন সাধারণের দেবতা হিসাবে স্থানচ্যুত হইয়া গেলেন, তখন কৃত্তিকাদি আমার উপরই ভর করিল। তাহা হইলে আমার একার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে চারিটি দেবতার সংমিশ্র হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। রু[illegible] অগ্নি, মাতৃগণ ও নক্ষত্রগণ—ইহা[illegible] সকলেই আমার অন্যতম উপাদান।

শিব, বিষ্ণু, সূর্য, গণপতি প্রভৃ[illegible] দেবতার উপাসক সম্প্রদায়ের মত ভার[illegible] বর্ষে আমারও একটি শক্তিশালী উপাস[illegible] সম্প্রদায় কোনও কালে ছিল। খৃ[illegible] জন্মের পর চতুর্থ শতকের মধ্যে [illegible] সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করি[illegible] ছিল। মহাভারতে যেভাবে আমার স্তু[illegible] ও প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাতে স[illegible] করিবার কারণ নাই যে, ঐ সময়ে আম[illegible] পূজা সম্প্রদায়গতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলি[illegible] ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের বিরাট রূপে[illegible] মত আমারও একটা বিরাট রূপ ছি[illegible] বলিয়া কথিত আছে। স্কন্দ ভক্তদের [illegible] স্কন্দলোক নামে একটি নূতন স্বর্গ[illegible] একদা সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাভারতে[illegible] অনুশাসন পর্বে মৎ কর্তৃক প্রচারি[illegible] একটি বিশেষ ধর্মের কথা উল্লেখ আ[illegible] এবং সেখানে কৃষ্ণ, হরি প্রভৃতিকে স্ক[illegible] ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। [illegible] সকলই সম্প্রদায়গত ভক্তির লক্ষণ। ক[illegible] গুলি মুদ্রায়ও আমার উপাসনার ক[illegible] ইঙ্গিত আছে। যৌধেয় রাজাদের কতগ[illegible] মুদ্রায় আমার ষড়ানন মূর্তি খো[illegible] রহিয়াছে। কোনও মুদ্রার নীচে ব্রহ্মণ্য[illegible] এবং কোনও মুদ্রার নীচে কুমার লি[illegible] রহিয়াছে। ব্রহ্মণ্যদেব এবং কুমার যাহা[illegible] নাম হউক, ষড়ানন মূর্তি যে আমা[illegible] মূর্তি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুদ্রাগুলি দৃষ্টে সিদ্ধান্ত করা অস[illegible] নহে যে, যৌধেয় রাজগণ আমারই উপা[illegible] ছিলেন। এই মুদ্রাগুলির প্রচলন [illegible] দ্বিতীয় শতাব্দী বলিয়া নির্ণীত হইয়া[illegible] তাহা হইলে দ্বিতীয় শতাব্দীর প[illegible] হইতে আমার উপাসনা ভারত[illegible] নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। পঞ্চম ও [illegible] শতাব্দীর চালুক্য রাজাদের কতগ[illegible] তাম্র শাসনেও আমার উপাসনার [illegible] রহিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ চারি[illegible] বৎসর ভারতবর্ষে আমার উপাসনা প্রচ[illegible] ছিল।

আমি তাহা হইলে নিতান্ত ন[illegible] দেবতা নহি।

২০

খবরের কাগজের অফিস সম্বন্ধে অতসীর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ভেবেছিল না জানি কতক্ষণ বসে থেকে এডিটারের দর্শন পাওয়া যাবে। কিন্তু দামী, ভারী গাড়ি দেখেই দরোয়ান উঠে সেলাম করল, অতসী অস্ফুটস্বরে সম্পাদকের নাম বলতে একেবারে কামরার দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল।

সেখানেও কেউ ঠেকালে না, অতসী কাটা দরজা ঠেলে একেবারে এডিটরের মুখোমুখি পড়ে গেল।

সম্পাদকের নাম জীবনতোষ সরকার, পঞ্চাশোর্ধ, বয়সের তুলনায় চুল বেশি পেকেছে; একদা ঢেউখেলান বাবরিটাইপ চুল ছিল, এখন প্রশস্ত মসৃণ একটি টাক সিঁথিপ্রান্ত থেকে শুরু করে তালুর দিকে গুটিগুটি অগ্রসর। শেষ বয়সের স্বাচ্ছল্য প্রথম যৌবনের অভাব-অনটনের রেখা কটিকে ঢাকেনি, আমসি মুখখানার যেটুকু আকর্ষণ, তা হল কৌতুক চঞ্চল দুটি চোখ। অগ্নিযুগে নাকি সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন, এখনও সাগ্নিক, অবশ্য শুধু ওষ্ঠলগ্ন পুরু বর্মা চুরুটে।

টেবিলের ওপাশে, চেয়ারে প্রায় ডুবে গিয়ে সম্পাদক নিবিষ্ট মনে কী লিখছিলেন, চোখ তুলে বললেন বসুন। ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে চায়ের ফরমাস করলেন।

অতসী মৃদুস্বরে বলল, 'আমি চা খাই না।'

সম্পাদক কলমটা সরিয়ে সকৌতুক চোখে তাকালেন, 'খান না, না খাবেন না, বলুন ত।'

অতসী সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, 'আমি আদিত্য মজুমদারের কাছ থেকে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।'

নামটা যেন মন্ত্রের কাজ করল। সম্পাদক দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, সামনের খোলা ক্যালেণ্ডারে সেদিনের পাতায় লাল-নীল পেন্সিলে কয়েকটা অর্থহীন আঁচড় কাটলেন। তার-পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি?'

এর জবাব অতসীর মনে মনে তৈরিই ছিল। বলল, 'আমি ও'র ইলেকসন ক্যাম্পেনের একজন অর্গানাইজার।'

'কই, আপনাকে এর আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

'এতদিন মেয়েদের ফ্রণ্টে ওয়ার্ক করেছি।'

'এখন ফ্রণ্ট বদলে এসেছেন?' সম্পাদক একটু হাসলেন, বললেন, 'বুঝেছি।'

কী বুঝেছেন বললেন না, ক্যালে-ণ্ডারের পাতাটা লাল পেন্সিলের খেয়ালী রেখায় ভরে তুললেন। অতসী আরামদায়ক নরম চেয়ারে বসেও অস্বচ্ছন্দ হয়ে উঠল। যতক্ষণ সম্পাদক জেরা করেছেন, ততক্ষণ অস্বস্তি বোধ করেছে, কিন্তু এই নীরবতার চেয়ে সেই জেরা ছিল ভাল।

বেয়ারা কী একটা কাগজ নিয়ে এল, সম্পাদক সেটা সই করলেন। চুরুটটা ছাইদানীতে নিবে এসেছিল, যত্ন নিয়ে সেটাকে ফের বহ্নিমান করলেন, ক্রিং ক্রিং ফোনটা তুলে কার সঙ্গে রহস্যালাপ করলেন মিনিট দুই, স্বরচিত অর্ধ-সমাপ্ত প্রবন্ধটায় চোখ বোলাতে শুরু করলেন। অনেক পরে, অতসী হাত-ব্যাগ থেকে ছোট রুমালটা বার করে কপাল মুছতে বোতাম টিপলেন; ক্লিক শব্দ হল, সম্পাদক মুখ তুললেন। অতসীর উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সচেতন হলেন এই প্রথম।

—'কই কেন এসেছেন, বললেন না তো?'

অতসী বলতে পারল না সে সুযোগ সম্পাদক নিজেই দেননি। রুমালটা ফের হাতব্যাগে পুরে আরম্ভ করল, 'আদিত্য-বাবু জানতে চেয়েছেন—'

আড়ষ্টতা যেটুকু ছিল, দু' চার কথাতেই কেটে গেল। সম্পাদক অভি-নিবেশের সঙ্গে শুনে গেলেন, কিন্তু হাতের লাল-নীল পেন্সিলে আঁকি-বুকি কাটা থামল না। সব শুনে সম্পাদক পেন্সিলটা দিয়েই টেবিলে টরে-টক্কা করলেন কয়েক সেকেণ্ড।

অতসী দেখল আমসী মুখের রেখাগুলি সংখ্যায় বাড়ছে। সম্পাদক হাসতে শুরু করেছেন।

'সব তো বুঝলুম মিস—মিসেস—'

'মিস মিত্র। অতসী মিত্র।'

'মিস মিত্র, এবারকার ইলেকসনে আদিত্যবাবুর কোন আশা নেই।'

'নেই কেন।'

'এতদিন আদিত্যবাবুর বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছেন। এবারে আছে বাঘা তেঁতুল, প্রভাত মল্লিক বড় শক্ত ঠাঁই।'

'আদিত্যবাবুকেই বা দুর্বল ভাবছেন কেন।'

'দুর্বল ভাবছি না তো। আদিত্যবাবু অত্যন্ত সবল। একটু বেশি সবল বলেই তো আশঙ্কা। ও'র তিনটে কারখানা আছে। স্বনামে বেনামে মিলিয়ে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিজনেসের সংখ্যা নেই—সব গত পনের বছরে অর্জিত। অথচ সেই তুলনায় সাধারণের সুখসুবিধা তেমন বাড়েনি। আদিত্যবাবু তাদের কেউ নন, সাধারণে এটা বুঝে নিয়েছে।'

'প্রভাত মল্লিকও সাধারণের কেউ নন। তিনি অভিজাত বংশ থেকে এসেছেন। তাঁর জমিদারী আছে, কলকাতায় বাড়ি-ভাড়া থেকেই আয়—'

বাধা দিয়ে সম্পাদক বললেন, 'জানি। আদিত্যবাবু সাধারণ অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন, সেই জন্যেই তো সাধারণের ও'কে বেশি হিংসে অতসী দেবী। প্রভাত মল্লিকের ঐশ্বর্য ও'র আভিজাত্যের মত, ওঁর টুকটুকে রঙ আর গোল ভুঁড়ির মতই স্বতঃসিদ্ধ, ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

অতসীকে জবাব দেবার সুযোগ দিয়ে জবাব না পেয়ে সম্পাদক ফের বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, লোকে মুখ বদলাতে চায়। আদিত্য মজুমদারকে ওরা তিন-চারটে চান্স দিয়েছে, আর দিতে রাজি নয়। প্রভাত মল্লিকও ওদের চাঁদ পেড়ে এনে দেবে না জানে, তবু সে নতুন। সেখানেই প্রভাত মল্লিকের জিৎ।'

'অর্থাৎ।'

'অর্থাৎ গণতন্ত্রের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও সইতে না পেরে লোকে কোন কোন দেশে ফের রাজতন্ত্র ডেকে এনেছে, ইতিহাসে এর নজীর আছে জানেন ত? এ ব্যাপারটাও কতকটা তাই। আভিজাত্যই প্রভাত মল্লিকের বহুদোষনাশী। নিজের লোকের জুতোর লাথি লোকের শুধু গায়ে নয় প্রাণেও বেশি লাগে।'

চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে শীর্ণ মুখখানা লুকিয়ে সম্পাদক ফের বললেন, 'তা ছাড়া প্রভাত মল্লিকও ভোল বদলেছে। গত তিন সপ্তাহে কাগজে ওর কটা ডোনেশনের খবর ছাপা হয়েছে দেখেন নি? আদিত্যবাবু নিজেকে ত্যাগী বলে জাহির করছেন, কিন্তু লোকে ভোলে নি। প্রভাত মল্লিক চটি পায়ে, উড়ুনী গায়ে উস্‌কো-খুস্‌কো চুল নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। ঠিক গুরুদশার পোজ।'

সম্পাদক হাসলেন, নিজের রসিকতায় নিজেই মোহিত হয়ে চপল গলায় বললেন, 'অবশ্য পাল্টা জবাব হিসাবে আদিত্যও লম্বা দাড়ি-গোঁফ গজাতে পারেন। কোন ফল হবে কি না সন্দেহ। আদিত্য মজুমদারের সব কীর্তিকাহিনী তবু তো আমরা এখনও প্রকাশ করিনি। ফ্রেন্ডস ব্যাঙ্কের লালবাতি জ্বালানর পিছনে একজন সর্বত্যাগী ডিরেক্টরের কতখানি হাত আছে জানতে পারলে লোকে চমকে যাবে। আদিত্য মজুমদারের পলিটিক্যাল কেরীয়র ইচ্ছে করলে শেষ করে দিতে পারি।'

সম্পাদকের হুমকিতে ভয় পেত অতসী, যদি নাকি আদিত্য মজুমদারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা থাকত। তবু নেশার মত লাগছিল সমস্ত ব্যাপারটা। খবরের কাগজের পরিবেশটাই ওর কাছে অভিনব। বাইরের বারান্দা আর সিঁড়িতে সদা ব্যস্ত কতকগুলো লোকের চলাফেরার আভাস পাচ্ছে, টাইপ মেসিনের খট-খট, একতলায় অনেকক্ষণ থেকে মেসিন চলছে, হয়ত মফঃস্বল সংস্করণ ছাপা শেষ হয়ে এল। আর পার্টিসন করা ছোট্ট এই ঘরে ছোট্ট একটি মানুষ, যার একহাতে কলম অন্য হাতে চুরুট, অহঙ্কারের অবধি নেই, সমগ্র জনমত যার ধারণা তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্রে এবং সেই আত্মবিশ্বাসের জোরে যে আদিত্য মজুমদারের মত প্রতাপান্বিত নেতাকেও তুচ্ছ করবার স্পর্ধা রাখে; অতসী, যে আদিত্যকে শুধু ভয়ই করে এসেছে, তার কাছে সবটাই কেমন বিচিত্র, অবিশ্বাস্য অথচ গোপন সুখাবহ বোধ হচ্ছিল।

'আদিত্যবাবুর প্রস্তাবের জবাব আপনি এখনও দেন নি,' অতসী স্মরণ করিয়ে দিলে।

'দিই নি?' সম্পাদক হাসলেন, 'আমি তো ভেবেছিলুম দেওয়া হয়ে গেছে। এ-লাইনে প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল অতসী দেবী, ইংরাজের আইনকেও ভয় করিনি। বার তিনেক জেলে গেছি। আদিত্য মজুমদারের ভ্রূকুটিকে কি পরোয়া করবে জীবন সরকার।'

ব্যস্তভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন সম্পাদক, অতসী বুঝল এটা ওকে উঠে যেতে বলার ইঙ্গিত।

একটি জানালা শুধু বন্ধ হ'য়ে গেছে। এখনও শরীর দুর্বল, নীরক্ত চোখ, বেশি চলাফেরা মানা। প্রহরে প্রহরে দাগ মেপে ওষুধ গেলা। বিস্বাদ, সব বিস্বাদ।

জানালা খুলে সুধা অপলক বাইরে চেয়ে থাকে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী মানুষের মুখের মত ফ্যাকাশে চাঁদটা ঢলে পড়ে, হোসপাইপে আসে ঘোলা জল সকালে, টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার সূর্য, এ-বাড়ির দেয়াল, ও-বাড়ির ছাদ টপ্‌কাতে টপ্‌কাতে সুধাদের জানালার শিকে ঠোকর খায়। একটু একটু করে বেলা বাড়ে, ঝর্ঝর জল পড়ে কলতলায়।

াঙা-মোটা গলায় তেল-কলটার ভোঁ-শী অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে াদের ডাকে। সদর রাস্তায় ঢং ঢং ম, গলিতে ঠুন্ ঠুন্ রিক্সা, প্রথম ুন্ ঝুন্ ফিরিওয়ালা, এক সুরে বাঁধা, া-রে-গা-মা।

সব সেই আগের মত। সুধা ক'মাস াগে যেমন দেখে গিয়েছিল। দিদিমা ্যমনি রাত না পোহাতে গোবিন্দকে ারণ ক'রে উঠছেন, ভাল ক'রে লক্ষ্য রলে হয়ত ঠাহর হবে, কোমর একটু াঙা, ধৈর্য ধরে গুণলে দেখা যাবে, পালে, চোখের কোলে আরও ক'টি াখা যোগ হয়েছে। তবু অভ্যস্ত হাতে নুন ধরান ঠিকই আছে। সকাল হতেই খান থেকে ওখান থেকে টুকরো কাগজ ্ড়িয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকেন; কাগজের পর দু' ফোঁটা কেরোসিন তেল, একটা শলাই কাঠি। দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে নুনটা, কিল্‌বিল্ ক'রে অনেকগুলো ্ঁায়ার সাপ ঘর থেকে এক সঙ্গে বেরিয়ে ্ড়তে চায়। সেই অস্বচ্ছ দুঃস্বপ্নলোক ্কে ঈষৎ কুব্জ একটি ছায়ামূর্তি ধীরে ীরে বেরিয়ে আসে, তার রেখারুক্ষ ুখে গভীর বিরক্তি। আপন মনেই ্ড় বিড় করে বুড়ি। হয়ত আদ্যাস্তোত্র ্ড়ে, হয়ত অভিশাপ দেয়।

বিছানায় শুয়েই সুধা সব দেখতে ায়। এ-চেহারাও সুধার চেনা। হয়ত ্সে আর বিরক্তির রেখা ক'টি গভীর ্য়েছে, মিশিকালো ঠোঁটের বিড় বিড় শ্টতর—তার বেশি না। আর কিছুর দল হয়নি।

কিন্তু একটি জানালা বন্ধ হয়ে গছে।

ঘরে ঘরে সুধার চোখ সেখানেই ্ড়ে, বন্ধ জানালার পিছনে যেখানে পঠের কাছে বালিশ জড়ো করে আধ-শায়া একটি মেয়ে পৃথিবীকে শাপ দত।

কোথায় গেল নূপুর, নূপুরের মা, ্াক্তার চৌধুরী, নিশীথ? গ্রামে যাবার াগে সুধা যেন যত্ন ক'রে ঝাঁপি বন্ধ ্'রে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে সব ্ঠক আছে, খোয়া গেছে শুধু কয়েকটা ্ড়ি।

ফুলমাসিকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না, সুধা একদিন দিদিমাকে ডেকে কথাটা পাড়ল। দিদিমা নাক সিঁটকে উঠলেন, বললেন, 'মরণ, মরণ, ওদের কথা মুখে আনাও পাপ।' কিন্তু আসল কথাটা ভাঙলেন না।

এক দৃষ্টে সুধা চেয়ে চেয়ে দেখে। অত বড় বাড়ি, কিন্তু সব বন্ধ, বোবা; প্রাণের সাড়া নেই। একতলার সিঁড়ির নীচে থাকে এক দারোয়ান, মাঝে মাঝে খৈনি টিপ্‌তে টিপ্‌তে বাইরে আসে, কোন কোন রাত্রে গান ধরে উৎকট গলায়। পুরনো কয়েকটি রহস্যময় দিন ও-বাড়ি থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে।

অনেক ভেবে ভেবে সুধা একদিন উপায় ঠিক করল। কাগজ জোগাড় করল ফুলমাসির প্যাড থেকে, কলম নেই, পেন্সিলেই লিখতে শুরু করল, 'নিশীথ-বাবু—'

এইটুকু লিখেই থামতে হ'ল। জিজ্ঞাস্য যেটা সেটা কী ক'রে প্রথমেই লেখা যায়। অথচ আর কিছু বক্তব্যও নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সুধা শেষ পর্যন্ত লিখল।

নিশীথবাবু,

আমি এখানে ফিরেছি।'

নিচে সুধা নাম সই করল। আরেকটা লাইন পেন্সিল কামড়ে, অনেক ভেবে ভেবে লিখেছিল। —'একদিন দেখা করবেন।' পরে সেটাকে কেটে দিল।

সেই চিঠি বহুদিন বালিশের নীচে চাপা ছিল। ডাকে দেওয়ার সমস্যা সহজে পূরণ হয়নি, যদিও নিশীথের ঠিকানা জানাই ছিল, ডাক টিকিটও ছিল সঙ্গে। প্রায় সাতদিন পরে সুধা সুযোগ পেল। ফুলমাসি বাড়ি নেই, দিদিমা দুধ রাখতে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। সুধা হাত-ছানি দিয়ে ওদের গয়লাকে ডাকল, চিঠিখানি দিয়ে বলল, ডাক বাক্সে ফেলে দিও।

বাড়ি ফিরে অতসী জামাকাপড় ছাড়বার অবসরও পেল না, সদরে কড়া কড়কড় বেজে উঠল। দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কে।'

আগন্তুক অনাহূতেই ভিতরে চ'লে এলেন।—'আমি সিতেশ রায়।'

বিস্মিত, খানিকটা-বা অপ্রস্তুত, অতসী তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আগন্তুক বললেন, 'জানি, চিনতে পারেননি। আমি স্বনামধন্য নই। অন্তত আদিত্য মজুমদারের মত নই।' ঘরের কোণে একটা মোড়া ছিল, দেখিয়ে বললেন, 'বসতে পারি?'

অনুমতির অপেক্ষা করলেন না, মৌনকেই সম্মতি ধরে নিয়ে বসে পড়লেন। রুমাল বার ক'রতে পকেটে হাত দিলেন, অতসী সেই অবসরে আগন্তুককে লক্ষ্য করতে লাগল।

সিতেশ রায়, বয়স ত্রিশের কোঠায়, নেহাৎ যদি কায়কল্পের জাদু বা কলপের, জুয়াচুরি না থাকে। স্পষ্টতই সৌখীন, কেননা কামিজটা রেশমের, উড়ুনিটা মিহি, কোঁচার অর্ধেকটাই ধরাশায়ী।

মুখ মুছে রুমালটা ফের পকেটে পুরে সিতেশ বললেন, 'ঠিক বলছেন আমাকে আপনি চেনেন না? কাগজেও আমার নাম পড়েননি?'

অতসী পুত্তলিকাবৎ চেয়ে রইল।

সিতেশ বললেন, 'আমি এবার ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি।'

এতক্ষণে অতসীর মনে পড়ল। জানত বটে লড়াইয়ে শুধু আদিত্য আর প্রভাত মল্লিক নয়, তৃতীয় একজন প্রার্থীও আছে। নামটা মনে ছিল না।

সিতেশ রায় বলল, 'আপনি বোধ হয় অবাক হচ্ছেন, ভাবছেন লোকটার মাথা খারাপ। ষাঁড়ে-মোষে লড়াই, এর মধ্যে এই মেষশাবক কেন। এর কি কোন চান্স আছে?'

একটু চুপ করল সিতেশ, ঘরটার চারদিকে একবার চেয়ে নিল। বলল, 'জবাব আপনাকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্ছি। নেই। আমি জানি, কাঠবিড়ালি বরং সমুদ্র সাঁতরাবে, আমি এই ইলেক্‌-শন বৈতরণী পার হ'ব না। তবু নাম দিয়েছি। পৃথিবীতে এত প্রতিযোগিতা আছে অতসী দেবী, সবাই কি জেতে। অনেকে হারে ব'লেই তো জয়ীর এত গৌরব। রেসের মাঠে গিয়েছেন কখনও? যাননি। গেলে দেখতেন, একটি ঘোড়াই বাজি জেতে, পরের দু'টিও পুরস্কৃত হয়। বাকি সবার কৃতিত্ব লেখা হয়, দু'ট মাত্র শব্দে—'Also ran.' আমিও তাই। জয়ে যেমন আনন্দ আছে, হেরে যাওয়ার মধ্যেও তেমনি নেশা আছে। মহাভারতের এক-

জন মহারথীরও ছিল। আমি রব নিস্ফলের, হতাশের দলে।—পড়েন নি?'

অতসী বলল, 'কী প্রয়োজনে এসেছেন সেটা এখনও বলেননি।'

মুহূর্তের জন্যে, মনে হল, সিতেশ রায় অপ্রতিভ হয়েছে। কিন্তু সামলাতে সময় নিল না। উড়নিটা কাঁধবদল ক'রে হাসল।—'ঐ দেখুন, বক্তৃতা দিয়ে আপনাকে ভোলাতে চেয়েছিলুম, পারলুম না। এতক্ষণ যা বলেছি, সব ফেনা, কথার পিঠে সাজান কথা। আসলে কী জানেন, হারতে আমিও চাই না। ঝোঁকে বা শখে প'ড়ে প্রার্থীর দলে নাম লিখিয়েছিলুম, যত দিন যাচ্ছে তত ফলের কথা ভেবে শঙ্কা হচ্ছে। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে হেডিং দেবে, সিতেশ রায়ের জামানত জব্দ—সে আমার সহ্য হবে না।'

'বেশ ত। সময় আছে, এখনও নাম প্রত্যাহার করতে পারেন।' অতসী মৃদুকণ্ঠে বলল।

'পারি। হয়ত শেষ পর্যন্ত করবও।' উদাস স্বরে সিতেশ বলল, 'কিন্তু কী জানেন, অতসী দেবী, অনেক খরচপত্র ক'রে ফেলেছি, এখন ঠিক ফিরতেও মন সায় দিচ্ছে না। নইলে, প্রভাত মল্লিকের কাছ থেকে আমার তো স্ট্যান্ডিং অফার রয়েছেই। নাম প্রত্যাহার করলেই কিছু টাকা।'

'বেশ তো, নিয়ে নিন।'

'বড় কম দিতে চায় যে। মোটে পাঁচ হাজার। তাতে আমার খরচ হয়ত পোষাবে। কিন্তু বদনাম—বদনামের দাম কে দেবে।'

'কী চান, তাই বলুন।'

মোড়াটা ঘষে ঘষে অতসীর প্রায় পায়ের কাছে নিয়ে এল সিতেশ, মুখ উঁচু ক'রে ধরে বলল, আপনি পারেন, অতসী দেবী। দিন না, আদিত্য মজুমদারকে ব'লে আমাকে হাজার দশেক পাইয়ে।'

অতসী হেসে ফেলল।—'আমি ব'ললেই আদিত্যবাবু দিয়ে দেবেন? তা-ছাড়া, আপনি নিজেই বলছেন, আপনার কোন চান্স নেই। অত টাকা তিনি দেবেনই বা কেন।'

'দেবেন।' সিতেশের মুখের একাংশ প্রার্থীর, অপরাংশ বিশ্বাস-বলিষ্ঠ, বলল, 'দেবেন। আমি বেশি ভোট পাব না, কিন্তু কিছু তো পাব। হয়ত সেই ক'টি ভোটের জন্যেই আদিত্যবাবু প্রভাত মল্লিকের কাছে হেরে যাবেন। আমি প্রবল না হতে পারি, একেবারে তুচ্ছ নই। আমার দুশো রিক্সা আছে, এই কলকাতা শহরেই আমার তিনটে ট্যাক্সি, দুটো বাস দৌড়য়।'

'তাতে কী। আপনার নাম তো কেউ জানে না।'

'সেটায় অসুবিধে যেমন, সুবিধেও তেমনি কিছু আছে। আদিত্য মজুমদারের বস্তি আছে, লোকে তাঁকে জানে শোষক বলে। প্রভাত মল্লিকেরও গোটা কয়েক কলোনী আছে শুনেছি।'

'শোষক তো আপনিও। আপনার রিক্সা যারা টানে, বাস যারা চালায়, তারাই সাক্ষ্য দেবে।'

সিতেশ রাগ করল না, হাসল। —'তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করলুম আমি শোষক। কিন্তু আমার সেই পরিচয় ক'জন জানে, অতসী দেবী। সেখানেও আমার সুবিধে, dark horse কিনা। বেনামী ঘোড়াও অনেক সময় বাজি জেতে। যাক আমার প্রস্তাব আপনাকে জানালুম। আদিত্যবাবুকে বলবেন।'

'বলব।' লোকটার হাত থেকে রেহাই পেতে অতসী তখন সব কিছু কবুল করতে রাজি।

চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে সিতেশ ফিরে তাকাল, আদিত্যবাবু রাজি হন, ভাল। নইলে—নইলে আমাকে হয়ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রভাত মল্লিকের অনুকূলেই নাম প্রত্যাহার করতে হবে।'

হতবাক্ অতসী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি মোটরের স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনল।

সব শুনে আদিত্য বললেন, 'নট্ এ পাই।' কব্জি ফুলিয়ে বললেন, 'আমরা ডাণ্ডাবেড়ি আর লপ্সীর পরীক্ষায় পাশ করেছি অতসী, সিতেশ রায় টাইপের লোককে ছুঁচোর মত জ্ঞান করি। পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে আদিত্য মজুমদার ছুঁচোমারা কল কিনবে না।'

অতসী বলল, 'বেশ তো, কিনবেন না। ভদ্রলোক আমাকে বাড়ি বয়ে বলতে এসেছিলেন। আমি আপনাকে জানালুম, ব্যস।'

চোখের মণি ছোট করে আদিত্য অর্থপূর্ণ হাসলেন, 'ব্যাপার কী বলতো। তোমার এত গরজ কেন। সিতেশ কিছু দালালি দেবে কবুল করে যায়নি তো?'

দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে অতিকষ্টে আত্ম-সংবরণ করল অতসী। কিন্তু ওর মুখের ভাবান্তরটুকু আদিত্যের চোখ এড়াল না। উঠে দাঁড়িয়ে অতসীর পিঠে একখানি হাত রেখে বললেন, 'কী হল।'

সরে দাঁড়াল অতসী, মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন দেয়ালের ঘড়িটাকে বলল, 'ভাবছি আপনি আমাকে কত সস্তা মনে করেন।'

সস্তা? অভিনেতা আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে গাঢ়স্বরে বললেন, 'না অতসী, সস্তা মনে করি না। তোমার মূল্য অনেক বেশি, জানি। সে-মূল্য তো আমি দিতে প্রস্তুতও আছি। তোমাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম, মনে নেই?'

অতসী কেঁপে উঠল। —'প্রতিশ্রুতি? কিসের প্রতিশ্রুতি?

সাহস পেয়ে আদিত্য আবার অতসীকে স্পর্শ করলেন, আহত একটি মুখ ফিরিয়ে নিলেন সামনের দিকে। চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমাদের দুটি জীবন এক হবে। শুধু এই ইলেকসনটা তরে যেতে দাও।'

কণ্টকিতদেহ অতসী বলল, 'আমার ছেলেকে আমি ফিরে পাব?'

আদিত্য বললেন, 'পাবে। শুধু একটা কথা। শুনলুম তুমি একদিন অরফ্যানেজে গিয়েছিলে। এখনও মাঝে মাঝে যাও, কম্পাউন্ডের বাইরে ঘোরাঘুরি কর। আমার একটা অনুরোধ রাখ, আর যেও না। কলঙ্ক আগুনের মত, জ্বলে সহজে, নিবতে চায় না, নিবলেও অনেক কিছু পুড়িয়ে রেখে যায়। লোকে যাকে অপুত্রক বলে জানে, সেই শিক্ষয়িত্রীকে দিনের পর দিন একটা অরফ্যানেজের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করতে দেখলে লোকে নানা কথা রটাবে, অতসী।'

অতসী আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছিল, আদিত্য ডাকলেন, 'শোন।

রকটা কথা, সিতেশ রায় বা ওর দলের ট এলে আমল দিও না। ওদের আমি ন। ওদের ব্যবসাই এই। ইলেকসনে ায়, প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে ভয় থয়ে কিছু টাকা খসাতে। হাজার া খরচ করে পাঁচ হাজার টাকা ায়ের ফিকির।'

অতসী সোজা বাসায় ফেরে নি, রতলীর বাসে উঠেছিল।

পরিচিত কম্পাউণ্ড, গম্ভীর ডাক্তার, বোস ব্যস্তসমস্ত নার্সদের চলাফেরা, সন-ওষুধের গন্ধ, বেডে বেডে সারি র বুক অবধি চাদরঢাকা রোগী। ঘরে । ঘুরল অতসী, মুখ থেকে মুখে লাইটের মত চোখ ঘুরিয়ে আনল। ক খুঁজছে সে কই!

'কাকে খুঁজছেন? কত নম্বর সেট?'

অতসী চমকে দেখল গলায় চামড়ার কোলান একজন ডাক্তার। থতমত র ঢোক গিলে নম্বর বলল।

'নাম?'

অতসী তাও বলল।

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এন ওই বেডে কোন পেসেণ্ট নেই!'

'নেই?'

ডাক্তার বললেন, 'না!'

অতসীর পা অবধি কেঁপে গেল। ন গলায় বলে উঠল, 'কী হল, কী তার ডাক্তারবাবু? সেকি—'

নির্বিকার গলায় ডাক্তার বললেন, ন না, এনকোয়ারি অফিসে ঞ নিতে পারেন। এখানে ড় বাড়াবেন না।' খট খট ো পায়ে ডাক্তার এগিয়ে গেলেন, নী গিরিসৃতার মত অতসী কিছুক্ষণ ় চোখে চেয়ে রইল।

এনকোয়ারি অফিসে ভীড় ছিল, উৎসুক মুখ কাউণ্টার ঘিরে ়য়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা ার মত মনের স্থৈর্য অতসীর ছিল পা টলছে, কপাউণ্ডের প্রশস্ত । দাঁড়িয়ে অতসী যেন পৃথিবীর হক গতি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব ল। তবু বাসে উঠল ঠিক, নির্দিষ্ট । এলে চিনতেও পারল।

গলির পথটুকু কোনক্রমে ফুরোলে বাঁচে অতসী, চোখে মুখে জল ঢেলে বিছানায় অসাড় শরীরটাকে সঁপে দিতে পারে।

কিন্তু সদর দরজা ঠেলেই বাইরের ঘরে আধ অন্ধকারে এই ছায়ামূর্তি দেখতে পেল, দু' পা পিছিয়ে এল অতসী। গলা দিয়ে অস্ফুট একটি কথা শুধু বেরুল, 'আপনি!'

আদিত্য উঠে দাঁড়ালেন।—'বিশেষ প্রয়োজন হল, তাই তোমার খোঁজে এসেছি। তুমি বুঝি হাসপাতালে গিয়েছিলে অতসী।'

অতসী জবাব দিল না, দেয়াল ধরে নিজেকে কোন মতে সোজা করে রাখল।

আদিত্য বললেন 'যাবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে না কেন, তা হলে বৃথা কষ্ট ভোগ করতে হত না। নীলাদ্রি তো ওখানে নেই।'

হাতের মুঠো কঠিন হয়ে উঠল অতসীর। বলল, 'সে কোথায়। সে কি বেঁচে আছে।'

মৃদু হেসে আদিত্য বললেন, 'ব্যস্ত হয়ো না, আছে। নীলাদ্রি ভালই আছে।'

ধুলোভরা মেজে, অতসী সেখানেই বসে পড়ল। আস্তে আস্তে বলল, 'আপনিই তবে ওকে সরিয়েছেন।'

আদিত্য হাসলেন, 'সরিয়েছি, আমিই সরিয়েছি। ওর প্রতি তোমার এত মমতা, জানি ত। একদিন দেখতে গিয়েছিলুম। ওখানে নীলাদ্রির শরীর সারছিল না, আমার কাছে একে একে সব অসুবিধে অভিযোগের কথা খুলে বললে। আমি বললুম, বেশ ত নীলাদ্রি বাবু, এখনকার ব্যবস্থায় আপনার যদি কোন উন্নতি না হয়, আপনাকে আমি সাউথ ইণ্ডিয়ার একটা স্বাস্থ্যাবাসে পাঠাব। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটিতে কী কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল তুমি যদি দেখতে অতসী!'

আদিত্য দম নিয়ে বললেন, 'মৃত্যুর কাছাকাছি গিয়ে নীলাদ্রি তার চেহারাটা দেখতে পেয়েছিল। ভয় পেয়েছিল। ওর সেই রূপ তুমি দেখনি। রোগক্ষীণ শরীর, মুখে আতঙ্ক। নীলাদ্রির মনে তখন একটিমাত্র সাধ, বেঁচে থাকার। কোন লাভ নেই, বেঁচে থাকা মানে আরও কিছুদিন কষ্ট ভোগ, তবু নীলাদ্রি মরতে রাজি নয়। আমি ওকে বাঁচিয়েছি।'

অবিশ্বাসের সুরে অতসী বলল, 'বাঁচিয়েছেন।'

শান্ত গলায় আদিত্য বললেন, 'তুমি অন্য রকম অর্থ করবে জানি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার আর কোন অভিসন্ধি ছিল না। যা কিছু করেছি, তুমি ওকে ভালবাস বলে। লজ্জা পেও না, আমি জানি। লোকের কাছ থেকে সারাজীবন শুধু ভক্তি না হয় ঘৃণা পেয়েছি, তবু ভালবাসা জিনিসটা দেখলে চিনতে পারি।'

একটি দীর্ঘশ্বাস তীক্ষ্ন মুখ হয়ে অতসীর মর্মে গিয়ে বিঁধল। বিবর্ণ মুখে বলে উঠল, 'সে তবে শুধু বেঁচে থাকার লোভে আমাকে আপনার হাতে ছেড়ে গেছে?'

আদিত্য বললেন, 'জানি না। সেটা আমার জানবার কথা নয়, তোমাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার।'

অনেক পরে অতসী বলল, 'তবে ওর ঠিকানাটা দিন আমাকে।'

আদিত্য বললেন, 'দেব। ইলেকসনের পরে দেব।'

অকস্মাৎ যেন সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে আদিত্য বললেন, 'তোমার সেই বোনঝিটির অসুখ শুনেছিলাম, এখন কেমন আছে? চল, দেখে আসি।'

অতসী নীরবে অনুসরণ করল।

সুধার শিয়রে ওর দিদিমা বসেছিলেন, আদিত্যকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, হাসি-হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন।'

আদিত্য বললেন, 'বসব না। এখন কেমন আছে খুকি।' সুধার কপালে হাত দিলেন।

দিদিমা বললেন, 'আজ বিকেলে আবার জ্বর এসেছে। আপনি যাবেন না আদিত্যবাবু, আপনার জন্যে মশলা নিয়ে আসি।'

মশলা নিয়ে দিদিমা যখন ফিরলেন,

আদিত্য তখন ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত, চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছেন। রেকাব থেকে একটিমাত্র এলাচ তুলে নিয়ে বললেন, 'যাই।'

দিদিমা আবদারের সুরে বললেন, 'আপনি আজকাল মোটে আসেন না, আদিত্যবাবু।'

আদিত্য দোষ স্বীকার করলেন। 'কী করি, সময় পাই না। ইলেকসন নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি।'

'জানি। অতসীও তো সেইজন্যে মোটে ফুরসৎ পায় না। ও-ও খুব খাটছে আদিত্যবাবু।'

সস্নেহ প্রশ্রয়ে অতসীর দিকে এক-নজরে চেয়ে আদিত্য বললেন, 'খাটছেই তো। অতসী না থাকলে এই অথৈ জলের কিনারা পেতাম না মাসিমা।'

সুধা বিছানায় শুয়ে আত্মীয়-সম্বোধনে পুলকিত দিদিমার গদ গদ গলা শুনল, 'এসব হাঙ্গামা চুকে যাক, তারপর আমাকে কিন্তু একবার সব তীর্থ ঘুরিয়ে আনতে হবে আদিত্যবাবু, কবে মরি ঠিক নেই, আমি এখনও কাশী, বৃন্দাবন মথুরা দেখিনি।'

বরাভয় দানের ভঙ্গিতে আদিত্য বললেন, 'দেখবেন, সব দেখবেন। পুষ্কর, দ্বারকাও বাকি থাকবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, সামনের এই পরীক্ষাটা যেন পার হতে পারি।'

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

"পশ্চিমবঙ্গে লোকসংগীত প্রচার-ব্যবস্থা"

মহাশয়,—১৪ই কার্তিক 'দেশে' আপনার 'আলোচনা' বিভাগে শ্রীহরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোকের পত্র পাঠ করিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইতেছে।

ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ করিয়া যে সভায় তাঁহার লোকসংগীত প্রচার ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত জানান, সে সভায় উক্ত পত্রলেখক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন কিনা জানি না। আমি ছিলাম। এবং সেই সঙ্গে আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবও ছিলেন। বলিতে বাধা নাই, আমরা হঠাৎ ডক্টর রায়ের উক্ত ঘোষণা শুনিয়া বিস্মিত এবং বিব্রত বোধ করি। কেননা, আমাদের মধ্যের কেহই এরূপ একটা ঘোষণার জন্য সেদিন প্রস্তুত ছিলেন না।

কাহিনীটা তাহা হইলে প্রথম হইতে বলাই ভালো। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিকদিগকে আমন্ত্রণ জানান। সেই দিনের সেই সভায় ডক্টর রায় দেয়ালে বিলম্বিত বাঙলার মানচিত্র সহকারে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পর উপস্থিত অনেকেরই মনে কিছু কিছু প্রশ্ন জাগে। ডক্টর রায়কে একথা জানানো হইলে তিনি সেই সভাতে তখনই বলেন যে, তাহা হইলে পুনরায় আর এক দিন সকলে মিলিত হওয়া যাইবে, এবং সেইদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিবেন, অর্থাৎ সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এর কিছুদিন পরে শিল্পী ও সাহিত্যিকদিগের নিকট দ্বিতীয় আমন্ত্রণলিপি আসিল। এই পত্র পাইয়া আমরা ধরিয়া লাইলাম যে, এবারের সভায় ডক্টর রায় প্রশ্নের উত্তর দিবেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, ঘর অন্ধকার। ডক্টর রায় আলোকচিত্রের সাহায্যে সরকারী পরিকল্পনার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম দিন মানচিত্রের সাহায্যে তিনি যেকথা বলিয়াছেন, দ্বিতীয় দিন আলোকচিত্রের সাহায্যে তাঁহার সেইকথাগুলি শুনিতে আমরা বিশেষভাবে পীড়িত হইয়া উঠি। এবং এজন্যও আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তিন ঘণ্টা এইভাবে কাটে। শেষে তারাশঙ্করবাবু ডক্টর রায়কে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলে ডক্টর রায় তৃতীয় আর একটি বৈঠকের প্রস্তাব করেন, এবং বলেন তাঁহাকে প্রশ্নগুলি আগেই যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পত্রলেখক শ্রীযুত চৌধুরী লিখিয়াছেন—"যাহা হৃদয়ংগম করিতে তিনি [সমালোচক] সক্ষম হন নাই, তাহা ডাঃ রায়কে প্রশ্ন করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত ছিল।" শ্রীযুত চৌধুরী বলুন, এরূপ অবস্থায় কি করিয়া প্রশ্ন করা হইবে এবং কি করিয়াই-বা সব পরিষ্কার করা হইবে।

"ডাঃ রায়ের সমস্ত চেষ্টাকে নষ্ট করিবার মনোভাব" বলিয়া পত্রলেখক শ্রীযুত চৌধুরী যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা সংগত নয়। সমস্ত বিষয়টির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে তিনি একথা বলিতে পারিতেন না। বস্তুতঃপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গে লোকসংগীত ও প্রচারের জন্য ডক্টর রায় যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা না করিলেও এবং তাহাকে উপেক্ষা করিলেও এ পরিকল্পনা নষ্ট হইতে বাধ্য। Right man for the right job—ইহাকে নিছক শ্লোগান-রূপে গ্রহণ না করিয়া ইহাকে কার্যে প্রয়োগ করা দরকার। তাহা না হইলে যাহা হইবার তাহাই হইবে। দেশবাসীকে গালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইবে—

> বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
> খাজনা দিব কিসে ?

ডক্টর রায় যদি পাঁচজন শিল্পী সাহিত্যিকের সহিত উক্ত সভায় খোলাখুলি ভাবে এবিষয় পরামর্শ করিয়া কিছু করিতেন তাহাই শোভন হইত। কিন্তু তাহাতে হয়তো অনেকের অসুবিধাও হইত—হয়তো কোনো যোগ্য লোকের উপর ভার পড়িত এবং অযোগ্যরা বঞ্চিত হইতেন।—জনৈক সাহিত্যিক

২

মহাশয়,—আমরা বাঙলার বাইরে রয়েছি তাই বাঙলার কথা সব সময়ই আমরা হয়তো একটু বেশী করেই ভাবি। সম্প্রতি বাঙলার উন্নয়ন-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য লোকসংগীতের প্রচার ব্যবস্থার কথা শুনে ভালো লাগল। কিন্তু এ কাজ পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত লোক বাঙলায় নেই দেখে মর্মাহত হয়েছি। এ কাজের ভার দেওয়া হল কিনা সুগায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিককে। এর দ্বারা এই ব্যবস্থাকে বিপন্ন এবং পঙ্কজবাবুকে বিব্রত করা হল বলে মনে হচ্ছে। এ কাজের উপযোগী লোক তিনি নন—তিনি গাইয়ে। যিনি দেশের সংস্কৃতি সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে, বাঙলার ইতিহাস ভূগোলের সঙ্গে এবং শেষকথা বাঙলার মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট—এমন একজন গভীর গম্ভীর জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর একাজের ভার ন্যস্ত হওয়াই সংগত। তাঁকে গাইয়ে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এবং সেই সঙ্গে তাঁর সংগঠনের অভিজ্ঞতা থাকাও আবশ্যক। পঙ্কজবাবুর এসব আছে বলে কখনো শুনিনি। তিনি সুকণ্ঠ ও জনপ্রিয় গায়ক মাত্র; এজন্যে তাঁর যে সম্মান, তা তাঁর প্রাপ্য। বিধানবাবুর কাছে অনুরোধ, বিষয়টি ভালো করে ভেবে দেখবেন; এবং বাঙলা দেশের জনকয়েক প্রবীণের পরামর্শও নেবেন। কেবল দপ্তরের সেক্রেটারিদের পরামর্শে এসব কাজে চলা ঠিক নয়। ইতি—মিনতি অধিকারী, এলাহাবাদ।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তে ভূমধ্য-সাগরীয় নাবিক

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

প্রাচীন ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী বন্দর তাম্রলিপ্ত। বিভিন্ন ভারতীয় এবং বৈদেশিক সাহিত্য থেকে জানা যায় এক বিস্মৃতযুগে এই নগরীর বিপুল বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক খ্যাতির কথা। এককালে এই স্থান থেকেই যে দুঃসাহসী বাঙালী নাবিকরা যাত্রা করতেন সমুদ্র-পারের বিভিন্ন দেশের দিকে সে বিষয় আমাদের সন্দেহ নেই। এককালে তাম্রলিপ্ত অথবা তাম্রলিপ্তি পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের বাণিজ্যপথ-গুলের সংযোগ স্থাপন করেছিল বলে সেখানে ভীড় হ'ত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের নাবিক ও ভাগ্যান্বেষিগণের।

নানা কারণবশতঃ পণ্ডিতগণ প্রাচীন তাম্রলিপ্তকে বাঙলার মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত তমলুককে নির্দেশ ক'রে থাকেন। সম্প্রতি এই স্থান থেকে বহু-সংখ্যক অতি মূল্যবান প্রত্নবস্তু (মৃন্ময়-মূর্তি, মৃৎপাত্র, প্রাচীন মুদ্রা ইত্যাদি) আবিষ্কার হওয়ার ফলে১ আরও দৃঢ়-রূপে প্রমাণিত হ'য়েছে যে, বর্তমান তমলুকের শ্যামল সমাধি লুক্কায়িত আছে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের বিস্মৃত বৈভবকে। এই পুরাবস্তুসমূহ নীরবে ঘোষণা করছে এক অতীত গরিমাকে, যার সৌরভ এককালে সপ্তসাগরের উদ্দাম ঊর্মিমালাকে অতিক্রম ক'রতে সক্ষম হ'য়েছিল।

তাম্রলিপ্ত নগরীর প্রতিষ্ঠা কবে হ'য়েছিল তার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। তবে সিংহলের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ "মহাবংশ" এবং "দীপবংশ" পাঠে মনে হয়, এই নগরীর সৃষ্টি সম্ভবতঃ মৌর্য-পূর্ব কালে। এমন কি, এই বিরাট নৌ-বাণিজ্যকেন্দ্রের প্রথম উৎপত্তি গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ—৫ম শতাব্দী), অথবা তার পূর্ব-কালে হওয়াও অসম্ভব নয়। ২

গ্রীক মূর্তি। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী

অতি প্রাচীনকাল থেকে তাম্রলিপ্তে আগমন করত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল-সমূহের নাবিকগণ। ইংরাজী ১৯৪০ সালে স্বর্গত গুরুসদয় দত্তের প্রচেষ্টায় তমলুকে দুইটি বৈদেশিক মৃৎকুম্ভ আবিষ্কৃত হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীরাম-চন্দ্রনের মতে এই মৃৎকুম্ভদ্বয়ের আকৃতি এবং শিল্পশৈলী সুপ্রাচীন মিশর, মিনোয়া এবং সাইসেনির মৃৎপাত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ৩ প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি পুরাবস্তু স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করে যে এক সুদূর অতীতে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে দূরবর্তী নীল নদীর উপত্যকা এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চল-সমূহের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল।

প্রাচীন ভারতের সঙ্গে মিশরের যোগাযোগ অতর্কিত নয়। নানা কারণ-বশতঃ কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মিশরের দুঃসাহসী নাবিকগণ আগমন করতেন দক্ষিণ ভারতে। তাঁদের এই আগমনের প্রধান উদ্দেশ্যই হয়ত ছিল সুবর্ণ আহরণ। দক্ষিণ ভারতের অনেক স্বর্ণ-খনিতে এখনও বিস্মৃত পূর্ব-যুগের খননের চিহ্ন দেখা যায়। পণ্ডিতপ্রবর ইলিয়ট স্মিথ (Ellit Smith) প্রমাণিত করবার চেষ্টা করেছেন যে, খৃঃ পূঃ ৩০০০ থেকে খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের মধ্যে মিশরের (৪) জাহাজসমূহ ভারত মহাসাগরে নিয়মিত বিচরণ করত।

সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি মিশরের অধিপতি 'তুরময়ের' (Ptolemy II Philadelphos) নিকট এক শুভেচ্ছা দল প্রেরণ করেছিলেন। এতদ্‌ভিন্ন, সিরিয়া, গ্রীস এবং সাইরেনেও তাঁর দূত প্রেরিত হ'য়েছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত মিশরের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থায়ী হয়। ২১৫ খৃষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কারা-কাল্লার (Caracalla) আদেশে আলেক্সেন্ড্রিয়া বন্দরে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবার ফলেই প্রধানত এই বাণিজ্যের অবনতি ঘটে।

১। এইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তমলুকের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ধরণের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

৩। Artibus Asiae, Vol. XIV, 3.

৪। "During these centuries ships of Egyptian-type are known to have been trafficking in the Indian Ocean......", In The Begining, p. 102.

দ্বিমুখ বিশিষ্ট মূর্তির সম্মুখ ভাগ। বিপরীত দিকে এর অনুরূপ আরেকটি মুখ আছে। সম্ভবত রোমান্ দেবতা জানুস্। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী

১ম শতাব্দীতে স্ট্রাবোর লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তাঁর সময় প্রতি বৎসর মিশর দেশ থেকে বহুসংখ্যক বাণিজ্য-জাহাজ ভারত অভিমুখে প্রেরিত হ'ত।১ প্রাচীন হেলেনীয়গণের সমুদ্র-বিবরণী 'পেরিপ্লাস্' পাঠে ধারণা হয় যে, এই যুগে মিশরের গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ নিয়মিতভাবে বাণিজ্যার্থে বাঙলা দেশে আগমন করতেন।

ভারত মহাসাগরে 'যবন' অথবা গ্রীকগণ ঠিক কোন্ সময় থেকে তাদের নৌ-চলাচল আরম্ভ করে তা' স্পষ্টভাবে জানা যায় না। আনুমানিক ৩২৫ খৃষ্ট পূর্বে ম্যাসিডনের দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর সৈন্যদলের এক ভাগ সিন্ধুর মোহনা দিয়ে জলপথে ভারত-ত্যাগ করান। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে পেট্রোক্লিস্ (Petrokles) নামে একজন গ্রীক নৌ-সেনাপতি ভারত মহাসাগরে টহল দিয়ে অনেক ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্যসমূহ পরবর্তীকালে স্ট্রাবো (Strabo) এবং প্লিনি (Pliny) কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্লিনির বিবরণীতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক নাবিক হিপ্পালাস্ ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরে মৌসুমির গতিপথ আবিষ্কার করেন। ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ভারতবর্ষে যাবার জলপথ আবিষ্কারের ন্যায়ই এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হিপ্পালাসের মৌসুমী আবিষ্কারের পর থেকেই শুরু হয় গ্রীক এবং রোমানগণের ভারতযাত্রার হিড়িক। এইভাবে ক্রমে ইয়োরোপ এবং এই দেশের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে বাহ্লীক (Bactria)-বাসী গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ করে তার পূর্বাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। "গার্গী সংহিতা"য় বর্ণিত আছে যে, যবনগণ পূর্বদিকে কুসুমধ্বজ অথবা পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত গ্রীক সমুদ্র-বিবরণী 'পেরিপ্লাসে' (**The Periplus of the Erythrian Sea**) বর্ণিত আছে যে, এই সময় গ্রীকগণ বাঙলাদেশে 'গাঙ্গে' নামক এক বিরাট ও সমৃদ্ধশালী বন্দরে বাণিজ্যার্থে আগমন করতেন। এই বন্দর থেকে তারা উৎকৃষ্ট মসলিন, মুক্তা ও অন্যান্য পণ্যসম্ভার সংগ্রহ করতেন। এখন কোন কোন পণ্ডিত এমনও মনে করেন যে, এই 'গাঙ্গে' ও তাম্রলিপ্ত অভিন্ন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে রচিত টলেমীর বর্ণনায় তাম্রলিপ্তকে তামালিতিস নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। এতদ্ভিন্ন ভৌগোলিক প্লিনি এই মহানগরীকে 'তালুক্তাই'

বামে: বৈদেশিক। সম্ভবত কোন গ্রীক অথবা রোমানের প্রতিকৃতি। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী। দক্ষিণে: যক্ষি। আনুমানিক খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী।

(Taluctae) নামে উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তে গ্রীকগণের আগমনের কথা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত রসস্রষ্টা দণ্ডী বিস্মৃত হননি। তাঁর রচিত "দশকুমারচরিতের" একটি আখ্যায়িকায় তাম্রলিপ্তে সমুদ্রপথে গ্রীক বণিকগণের আগমনের কথা উল্লেখ আছে।

"দশকুমারচরিতের" একাদশ পরিচ্ছেদে মিত্রগুপ্তের কাহিনীটি সংঘটিত হ'য়েছে বাঙলার এই সুপ্রাচীন বন্দরকে কেন্দ্র করে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে কাহিনীটি সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেওয়া হ'ল।

সুহ্মদেশের অন্তর্গত দামলিপ্ত (অথবা তাম্রলিপ্ত) নগরীর রাজকন্যা কন্দুকবতী অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু তাঁর ভাই ভীমধন্বন অত্যন্ত উদ্ধত ও উগ্রপ্রকৃতির। তাঁর ইচ্ছে নয় বোনের বিয়ে হোক, কেননা, তা'হলে দেবীর আদেশমত তাঁকে ভগ্নীপতির দাস হ'য়ে থাকতে হবে। এদিকে মগধের তরুণ রাজপুত্র মিত্রগুপ্ত একদিন তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হ'য়ে এই রাজকন্যার রূপলাবণ্য ও তাঁর অপরূপ কন্দুকক্রীড়া দেখে অতিশয় মুগ্ধ হন। মিত্রগুপ্তের মনের অবস্থা অনুধাবন ক'রে ভীমধন্বা তাঁকে অতর্কিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ও রাজপুত্রকে নির্দয়ভাবে বন্দরের জলে নিক্ষেপ করে। অতঃপর সৌভাগ্যক্রমে একটি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে

১। T. R. Glover: "The Ancient World", p. 234.

প্রাচীন মিশরের একটি 'পেপাইরাস্' পাণ্ডুলিপিতে (Oxyrhynchus Papyrus, No. 1280) ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার উল্লেখ আছে।

মৃৎপাত্র। দুই পাশের লম্বা ধরণের দুইটি মৃৎপাত্র প্রাচীন রোমান 'এ্যাম্ফোরা'র সঙ্গে তুলনীয়

গুপ্ত জলে ভাসতে থাকেন। এর পর টি 'যবন' অথবা গ্রীক জাহাজের বিকবৃন্দ তাঁকে দেখতে পেয়ে উম্ধার র। এই জাহাজের অধ্যক্ষের নাম ল রামেশ্ব। মিত্রগুপ্ত উম্ধারপ্রাপ্ত য়ার অব্যবহিতকাল পরে কয়েকটি দস্যুর জাহাজ ক্ষিপ্রগতিতে যবন ণিজ্য-তরণীটিকে আক্রমণ করে। াতিবিলম্বে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হয় ং ক্রমে গ্রীকগণ পরাস্ত হ'তে থাকে। দের শোচনীয়ভাবে পরাভূত হ'তে খে শৃঙ্খলাবন্ধ (ভীমধন্বনের দ্বারা র্বে পরান) মিত্রগুপ্ত তাদের সাহায্য বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শীঘ্র তাঁর খল বন্ধন অপসারিত করা হয় এবং গুপ্ত ধনুঃশর নিয়ে অমিতবিক্রমে দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। র প্রচন্ড আক্রমণে শত্রুগণ পরাস্ত হয় ং নিষ্কোষিত অসি হস্তে বিজয়ী পুত্র বিরুদ্ধ দলের নেতার জাহাজে ক প্রদান করেন। জলদস্যুদের নেতা ন দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে আত্ম-র্পণ করলেন, তখন দেখা গেল যে, তিনি দামলিপ্তের রাজপুত্র ভীমধন্বন। মিত্রগুপ্তের বীরত্ব দেখে এবং কৃতজ্ঞতা পরবশে যবনগণ তাঁকে দেবতার ন্যায় সম্মান করতে লাগল। এর পর গ্রীক জাহাজটি এক ভীষণ ঝটিকায় পতিত হ'য়ে বহুদূরে তাড়িত হয় এবং অবশেষে তাম্রলিপ্ত বন্দরে আগমন করতে সক্ষম হয়। এইখানে তাম্রলিপ্ত অধিপতির অনুমতিক্রমে মিত্রগুপ্ত ও রাজকুমারী কন্দুকবতীর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং ভীমধন্বন বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। যদিও আমরা জানি না "দশকুমার-চরিতের" এই গল্পটি কতদূর সত্য অথবা কাল্পনিক, তবুও এ বিষয় সন্দেহ নেই যে, এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। কারণ, এই আখ্যায়িকা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে যবন অথবা গ্রীকগণের তাম্রলিপ্তে আগমনের স্মৃতি কতকাংশে বহন করছে।

তাম্রলিপ্তে ভূমধ্যসাগরীয় নাবিক-গণের আগমনের কথা সমর্থিত হ'য়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দ্বারা। সম্প্রতি তমলুকে মিশরীয় গ্রীক এবং রোমান আঙ্গিকবিশিষ্ট কয়েকটি অতি মূল্যবান্ পোড়ামাটির শিল্পবস্তু আবিষ্কৃত হ'য়েছে। সুগভীর পুষ্করিণী এবং খাল খনন করবার ফলেই এগুলির উম্ধার সম্ভব হ'য়েছে। এইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১। উপবিষ্ট গ্রীক-মূর্তি। দৈর্ঘ্যঃ ২½"। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী। চিত্র নং ১।

২। পোড়ামাটির দ্বিমুখবিশিষ্ট মূর্তি। মস্তকে রোমান ধরণের শিরস্ত্রাণ। মূর্তির নাসিকা উন্নত, ভ্রূযুগল স্থূল এবং মুখভাব দৃঢ়তাব্যঞ্জক। মস্তকোপরি গোলাকৃতি আংটা দেখে মনে হয় যে, মূর্তিটি হয়ত কোন বৃহৎ রোমান মৃৎ-কুম্ভের মুখাবরণী ছিল। দ্বিমুখ-বিশিষ্ট এই মূর্তিটি প্রাচীন রোমান-গণের যুদ্ধ ও তোরণ-দেবতা জানুসের (Janus) অনুরূপ। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম—২য় শতাব্দী। চিত্র নং ২।

৩। ভগ্ন-মস্তক দণ্ডায়মান পুরুষ-মূর্তি। সম্ভবতঃ কোন রোমানের প্রতিকৃতি। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম—২য় শতাব্দী।

দণ্ডায়মান পুরুষ-মূর্তি। যোম্ধা? আনুমানিক খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী

৪। হাস্যরত আবক্ষ নারী-মূর্তি। আপাতঃদৃষ্টিতে মূর্তির শিল্প-শৈলীতে হেলেনীয় ও মিশরীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

৫। ক্ষুদ্রাকার ভগ্ন মস্তক। সম্ভবতঃ কোন গ্রীক ব্যক্তির প্রতিকৃতিমূলক। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী। চিত্র নং ৩।

৬। ক্ষুদ্রাকার ভগ্ন মস্তক। ৫নং-এর অনুরূপ। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

৭। লম্বা ধরণের দুইটি মৃৎকুম্ভ। এই দুইটি প্রাচীন রোমের 'এ্যাম্ফোরা' (Amphora) কলসের সঙ্গে তুলনীয়। চিত্র নং ৪।

প্রাচীন তাম্রলিপ্তের সঙ্গে ভূমধ্য-সাগরীয় নাবিকবৃন্দের যোগাযোগের কথা এখনও অনেকাংশে বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভে নিহিত। তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত মূর্তি ও মৃৎপাত্রসমূহ কেবল ইতিহাসের এক অতি রহস্যাবৃত প্রান্তরের দিকে পথনির্দেশ করছে। সুপ্রাচীন যুগে বাঙলার মহান সংস্কৃতি এই ঐশ্বর্যময়ী নগরীর মাধ্যমে কিভাবে মিশরীয়, মাইসেনীয়, ফিনিসিয়ান, গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার উপর প্রতিক্রিয়া ক'রে-ছিল, তার সম্যক ইতিহাস আজ আমাদের জানা প্রয়োজন। এর বিস্মৃত কাহিনী যেদিন প্রকাশিত হবে, সেদিন নিঃসংশয়ে এশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হবে। সুপ্রাচীন ফিনিসিয়ার সিডোন এবং টায়ার বন্দরের ন্যায় তাম্রলিপ্তিকেও সেদিন ঐতিহাসিককুল অভিষিক্ত করবে তাদের বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধায়।

চক্রদত্ত

"ওয়েদারম্যান" মানুষ নয় যন্ত্র। এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রটির সাহায্যে আবহাওয়ার হিসাব রাখা যায়। যন্ত্রটি এক নাগাড়ে প্রায় ৮০০ ঘণ্টার আবহাওয়ার হিসাব রাখতে পারে। যাদের মাসের পর মাস ধরে বাইরে কাজ করতে করতে আব-হাওয়ার হিসাব রাখতে হয় তাদের সঙ্গে এই যন্ত্রটি থাকলে আবহাওয়ার খবর আর আলাদা করে রাখতে হবেই না, সুতরাং ভুলে যাওয়ারও ভয় নেই। "ওয়েদারম্যানে"
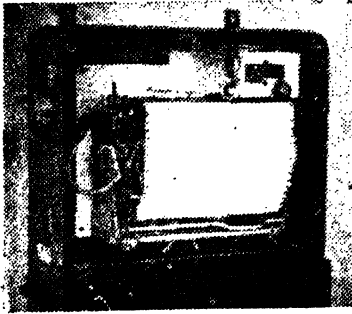
ওয়েদারম্যান

নির্ভুল হিসাব লেখা হবে। লেখা অবশ্য কালিতে হয় না। কাগজের ওপর বিদ্যুতের ফুল্‌কি দিয়ে ফুটো ফুটো ক'রে চিহ্নিত করা হয়। "ওয়েদারম্যান" বায়ু প্রবাহের গতিবেগ ও দিক্‌নির্ণয় করতে পারে। বায়ুর গতিবেগ ১৫০ মাইল পর্যন্ত হ'লেও "ওয়েদারম্যান" নির্ণয় করতে পারে। যন্ত্রটি বহনোপ-যোগী, সেই কারণে সৈন্য বিভাগের পক্ষে এটি বিশেষ কার্যকরী।

*

লোকে কথায় বলে "জহুরীই জহর চেনে" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হীরে জহরতের সুক্ষ্মতম খুঁত কোনও জহুরীর পক্ষেই শুধু চোখে ধরা সম্ভব হয় না। আগে হীরে-জহরতে দোষ ধরার জন্য 'ডায়মণ্ডস্কোপ' নামে যন্ত্র ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে 'ম্যাগনা-স্কোপ' নামে যে যন্ত্রটি বার হয়েছে সেটি ডায়মণ্ডস্কোপের চেয়ে অনেক সুক্ষ্ম খুঁত ধরে দিতে পারে এবং সহজ-বহনোপযোগী। আগের যন্ত্রের সাহায্যে হীরার টুকরোটি বড় আকারে দেখা যেতো সুতরাং ওর মধ্যে খুঁতটুকুও চোখে ধরা পড়তো। বর্তমানের নতুন যন্ত্রটি আরও উন্নত ধরণের। ম্যাগনা-স্কোপের সাহায্যে হীরের টুকরোকে প্রথমে আকারে বিশগুণ বড় করা হয় তারপর হীরার মধ্যে দিয়ে একটা আলোর রশ্মি চালনা করে সামনের একটি ছোট্ট পর্দার ওপর হীরের ছবিটা প্রতিফলিত করা হয়। সেই পর্দার সঙ্গে আবার এমন একটি বন্দোবস্ত থাকে যে ঐ প্রতিফলিত ছবিটি ১২ থেকে ১৫ গুণ বড় আকারে দেখা যায়। এতখানি বর্ধিত আকারে দেখা যাওয়ার ফলে অতি সুক্ষ্মতম খুঁতও চোখে পড়ে কিংবা হীরা কাটার কোনও দোষ থাকলে দেখা যায়। এভাবে দেখতে পাওয়ায় শুধু মাত্র জহুরীদের সুবিধা হয় না ক্রেতাদের পক্ষেও খুব সুবিধা হয়। তারাও নিজে চোখে হীরের দোষ-গুণ দেখে নিতে পারে এবং সেই বুঝে মূল্যও নির্ধারিত হয়।

*

কথায় বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা। কথাটা খুব মিথ্যা নয়—যেসব মাছের শরীরে তেলের পরিমাণ বেশি থাকে, তাদের সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে ভাজা সম্ভব হয়। বর্তমানে মানুষ কিন্তু মাছের শরীর থেকে তেল সংগ্রহ করে নিজেদের নিত্য কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। আমরা সবাই জানি যে, কড মাছ, হেলিবাট মাছ, হাঙ্গর ইত্যাদি থেকে তেল সংগ্রহ করে মানুষের শরীরের পোষ্টাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে সব-চেয়ে বড় যেটা অসুবিধা, সেটা হচ্ছে তেলের একটা বিশ্রী আঁসটে গন্ধ। ফলে এই কয়েকটা মাছ ছাড়া অন্য মাছের তেল প্রায় আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে না। বর্তমানে জার্মান কোম্পানী এক নতুন উপায়ে এই তেলের গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পেরেছে। ফলে এই নতুন উপায়ে এই সব তেল থেকে মারজারিন পাওয়া যাচ্ছে এবং তা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

খোলা চিঠি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমীপেষু,
ভাজনেষু,—

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে হাস শাখার সভাপতিরূপে আপনার প্রদত্ত ভভাষণটি পড়িলাম। পড়িবার পর কতক-ল বিষয়ে মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় চিঠি লিখিতেছি।

আপনার সমগ্র অভিভাষণটি পড়িলে মনে বর্তমানের দ্বি-খণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং ার সন্তান-সন্ততির দুঃখ-দুর্দশা আপনার বেদনশীল চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত রয়াছে এবং বর্তমান বাঙলার দৈন্য-পীড়িত র্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন ভবিষ্যৎএর কারণস্বরূপ পনি কংগ্রেস সমর্থিত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-গী যাহা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর কথা প্রচার রয়াছে তাহাকেই দায়ী করিয়াছেন। এই ্গে আপনি আরও বলিয়াছেন, "স্বদেশীর গে যেমন জাতীয় ভাবধারাই ইতিহাসকে কৃত রূপ দিয়াছিল, পরবর্তীকালে কংগ্রেসের জনীতিও তেমনি আমাদের ঐতিহাসিক ষ্টকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল।"

স্বদেশী যুগ বলিতে আপনি কোন যুগ লতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি নাই; ম্ভবত তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-গেরণের যুগ। সেই যুগে এবং আধুনিক ংগ্রেসী যুগে যাঁহারা ইতিহাস চর্চা করিয়া-ন সেই 'রমেশচন্দ্র দত্ত, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে শুরু করিয়া 'রাখাল-স বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, মাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতিরা এবং আপনি স্বয়ং ান মতবাদের বশবর্তী হইয়া ইতিহাসের ক্রৃতি ঘটাইয়াছেন ইহা কি সত্য সত্যই াপনি বিশ্বাস করেন? যদি তাহা না করেন াহা হইলে আপনার স্বদেশী যুগে এবং রবর্তী কংগ্রেসীযুগে ইতিহাস বিকৃতির ভিযোগ টিকে না। কারণ পূর্বে যাঁহাদের াম করিয়াছি, ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহারাই াপনার উল্লেখিত যুগের প্রধান পুরুষ। াঁহাদের রচিত ইতিহাসই স্বদেশী যুগে এবং ংগ্রেসী যুগে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া াকে।

আপনি বলিয়াছেন,—"ধর্ম, সমাজ ও াজনীতি যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চিরদিনই প্রকাণ্ড ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে, হা অপ্রীতিকর হইলেও নিদারুণ সত্য।" এবং "ইংরাজ যখন বঙ্গদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠা াভ করে, তখনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দৃঢ় ব্যবধান বর্তমান ছিল।"

ধর্ম ও সমাজ হিন্দু-মুসলমানের পৃথক; কিন্তু রাজনীতি যে পৃথক সে কথা কেমন করিয়া স্বীকার করি? পাঠান নরপতির জন্য হিন্দু সেনাপতি হিমুর রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ, মুসলমান আকবরের সহিত মানসিংহ এবং অন্যান্য রাজপুত হিন্দুদের বন্ধুত্ব, ঔরংগজীবের হইয়া যশোবন্তসিংহ রাজসিংহ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের হিন্দু শিবাজীর সহিত যুদ্ধ এই সকল ঘটনা কি রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথাই ঘোষণা করে না? সিপাহীবিদ্রোহের সময় স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য হিন্দু নানাসাহেব কি বাহাদুর শাহকে মুসলমান বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল? ইংরাজ আমলেও বিপ্লবী আন্দোলনে ও জন-আন্দোলনে নানা অপ-প্রচার ও দুর্লংঘ্য বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িয়াছে। কাকোরী ষড়যন্ত্রে হিন্দু রাজেন লাহিড়ীর পাশেই মরণ দোলায় দুলিয়াছে মুসলমান আসফাকউল্লা। মহাত্মাজীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পাঠান সীমান্ত গান্ধী। কাজেই ধর্ম ভিন্ন হইলেই রাজনীতি পৃথক হইবে ইহার নজির পৃথিবীর কোথাও নাই এবং ভারতবর্ষেও সে কথার অন্যথা ঘটে নাই।

ইংরাজ যখন এই দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন হিন্দু-মুসলমান-এর মধ্যে সুদৃঢ় ব্যবধান থাকিলে হিন্দু রাজা রাজবল্লভ হইতে সুরু করিয়া জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, মোহনলাল প্রভৃতি পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দলে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন কি করিয়া?

আপনি বলিয়াছেন, "সাত শত বৎসর একত্র বসবাস করার ফলেও সাধারণ হিন্দু মুসল-মানের পূজা-পদ্ধতি, ধর্ম-বিশ্বাস এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার যেমন বিপরীতপন্থী ছিল তেমনই রহিল।"

কথাটা কি পুরাপুরি সত্য? আকবরের দীন-ইলাহীর কথা বলিব না, কিন্তু "সত্য-নারায়ণ" মাণিকপীর, ওলাবিবি, ঘেঁটু, দক্ষিণ রায়, যাহারা আমাদের জনসাধারণের নিজস্ব দেবতা তাহাদের উপাসনায় তো হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নাই। তাহার পর ধর্ম-বিশ্বাস পৃথক হইলেও সামাজিক আচার ব্যবহার যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট রকমের ছিল তাহার পরিচয় তো আজও মেলে। আজও নমাজ প্রত্যাগত মুসলমানের পবিত্র ফুঁ আমাদের শিশু সন্তানের রোগ নিরাময় এবং আশীর্বাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আজও হিন্দু জ্যোতিষির প্রদত্ত তাগা-তাবিজ মুসলমানের অংগের শোভা বর্ধন করে।

আপনি যে জিম্মি ও জিজিয়ার কথা বলিয়াছেন সে যুগে প্রত্যেক বিজয়ী জাতিই বিজিতদের নিকট ঐরূপ বশ্যতার দাবী করিত। সুসভ্য ইংরাজ বিংশ শতাব্দীতেও জালিয়ানওলাবাগে গোটা রাস্তা বুকে হাঁটাইয়াছিল মানুষকে এবং বিভিন্ন অজুহাতে গৃহীত ইংরাজ আমলের পাইকারী জরিমানার পক্ষপাতদুষ্ট নির্ধারণও আপনার অজানা নহে। আলাউদ্দিন খিলজীর মৌলবীর মতে যে মুসলমানরা দেশ শাসন করে নাই ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। মুঘল যুগে রাজপুত রাজন্যবর্গই তো দিল্লীর প্রধান ভরসা ছিল।

আপনি বলিয়াছেন,—"মহারাষ্ট্র সৈন্যরা যখন বাঙলা আক্রমণ করিল, তখন বাঙলার হিন্দুরা ইহা পাপিষ্ঠ যবনের বিরুদ্ধে পরিত্রাণকারী হিন্দুর অভিযানরূপেই গ্রহণ করিয়াছিল।" তাই যদি হইবে তাহা হইলে মারাঠা দস্যুরা বাঙলার নবাবদের কাছ হইতে অর্থ লইয়াই চলিয়া যাইত কেন? কেন আজও বাঙালী হিন্দুর জননী ও জায়ারা,

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো
কিসে।"

বলিয়া ছড়া কাটিয়া শিশু সন্তানদের নিদ্রা-আকর্ষণ করে? হিন্দু মারাঠার অত্যাচারে বহু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবার যে সুদূর বিক্রমপুর অবধি পাড়ি জমাইয়াছিল সে কথা আপনার নিশ্চয় অজানা নহে।

আপনি বলিয়াছেন,—"মীরজাফরের মুর্শিদাবাদ-এর প্রবেশকালে রাজপথে যে বিরাট জনতা হইয়াছিল, কেবল মাত্র যষ্টি ও ইষ্টকের সাহায্যেই তাহারা ক্ষুদ্র ইংরাজ সৈন্য বিনাশ করিতে পারিত; কিন্তু বাঙালী তাহা করে নাই। সিরাজের চরিত্র ও হিন্দুর যবন-বিদ্বেষ যে ইহার প্রধান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।", যষ্টি ও ইষ্টকের সাহায্যে ইংরাজ বাহিনীকে সেদিন বাঙালী জনতা পরাভূত করিতে পারিত কিনা? এবং করে নাই কেন তাহা আজ অধিকভাবে বলা হয়ত সম্ভব নহে। কিন্তু তাহা যে সিরাজ-বিদ্বেষ হইলেও হইতে পারে; কিন্তু যবন-বিদ্বেষ নহে, তাহা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি। কারণ সিরাজের পরিবর্তে বাঙলার মসনদে হিন্দু জগৎ শেঠ বা রাজা রাজবল্লভ বসেন নাই, যবন মীরজাফরই বসিয়াছিল।

আপনি রাজা রামমোহন রায়ের নজির লইয়া বলিয়াছেন, "ইংরাজের অধীনে হিন্দুরা অনেক বেশী সুখে আছে।" রামমোহনের এই হিন্দু কি পরগাছা শ্রেণীর স্বধর্মচ্যুত "বাবু হিন্দুরা" নহে? তাহা না হইলে যে বিশাল হিন্দু-সমাজ চাষ করিত, মাছ ধরিত, যুদ্ধ করিত, কাপড় বুনিত তাহারা নীল বিদ্রোহ হইতে

একাধিক বিদ্রোহের আগুনে জ্বালিয়াছিল কেন? কেন হিন্দুরা পরবর্তীকালে সংঘবদ্ধ-ভাবে দলমতনির্বিশেষে ইংরাজের বিরুদ্ধতা করিয়াছিল? পক্ষান্তরে সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনের যুগে হিন্দুরা কোথাও সংঘবদ্ধভাবে মুসলমান শাসনের প্রতিবাদ করে নাই।

আপনি বলিয়াছেন, "বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিকগণ যে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব স্বতঃসিদ্ধ রূপে গ্রহণ করিয়া এই ভিত্তির উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।" ভারতবর্ষে বহু জাতি বহু প্রাচীন যুগ হইতে বিজয়ী রূপে প্রবেশ করিয়াছে। আর্যদের দাপটে অনার্যরা তাহাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতা লইয়া হয় অরণ্য কান্তারে আশ্রয় লইয়াছে নয়, আর্যদের দাস হিসাবে জীবন-মরণ করিয়াছে। শক আসিয়াছে, হুন আসিয়াছে এবং সকলেই ধীরে ধীরে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। মুসলমানরা আসিয়াছে অনেক পরে এবং তাহাদের নিজস্ব বিশেষ ধর্মমত এবং সভ্যতা সংস্কৃতি তাহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কাজেই তাহাদের সহিত মিলমিশ একটু দেরীতে হইয়াছিল; কিন্তু মিলমিশ যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ হিন্দুর মনীষাকে মুসলমান অস্বীকার করিতে পারে নাই। তাই যুদ্ধ-প্রিয় পাঠান এবং অন্যান্য মুসলমান নৃপতিবর্গ হিন্দুকে মন্ত্রিত্বে অভিষিক্ত করিয়া দেশ শাসনের ভার হিন্দুর উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যেহেতু হিন্দু শাস্ত্রে বিধর্মী বিবাহ নিষিদ্ধ তাই পরস্পরের মিলনে মুসলমান ধর্মেরই জয় হইয়াছে। গণেশের পুত্র যদুই ইহার প্রমাণ। মুসলমানরা এই দেশেরই অধিবাসী কাজেই কালধর্মে তাহারা অনিবার্য ভাবেই এই দেশের অন্য সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। যতটুকু মেশে নাই, সেই গরমিল হিন্দু সমাজের হরিজনদের সহিতও থাকিয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর যে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বাস করিত তাহার নিদর্শন বাঙলা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মুসলমান পটুয়া ভাবে বিভোর হইয়া কালী ও রাধাকৃষ্ণের পট আঁকিয়াছে, গম্ভীরা গানে মিলিত হইয়া ছড়া কাটিয়াছে, জারি নাচে দিশাহারা হইয়াছে, বাউল ও ভাটিয়ালী সুরে বাঙলার আকাশ বাতাস মাতাইয়া তুলিয়াছে। মহম্মদ জয়সী লিখিয়াছেন "পদ্মাবতী" কাব্য, আলাওল রচনা করিয়াছেন হিন্দু দেবদেবী লইয়া কবিতা, বাঙলায় মুসলমান নৃপতির প্রচেষ্টায় অনুবাদিত হইয়াছে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। তাই বলি হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব কি একেবারে কল্পিত ব্যাপার? পাঠানরা কি হিন্দুর সহিত হাত মিলাইয়া মুসলমান মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই? মুসলমান মুঘল কি হিন্দু মানসিংহের সাহায্যে হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে ধ্বংস করে নাই? মুসলমান আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কোন বিবরণ আমাদের স্মরণে আসে নাই। মুসলমানরা যদি সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুর উপর অত্যাচার করিত তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যের পার্শ্বচর কমল খোজা হইত না এবং মুঘলদের রাজপুত-অসি সাম্রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করিত না।

পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্ম ও সম্প্রদায়কে মিলাইয়া জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিক ভেদ থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তার পথে বাধার সৃষ্টি হয় নাই। অপেক্ষাকৃত তরুণতর জাতি আমেরিকায় ফরাসী, জার্মান, ইংরাজ, ইহুদী প্রভৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড বিভিন্ন ভাষাভাষীদের লইয়া জাতি গঠনে সাফল্য অর্জন করিয়াছে। সেই ক্ষেত্রে একদেশবাসী, এক ভাষাভাষী, একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যায় পীড়িত হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত করিয়া যে বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিকরা অভিনব জাতীয়তার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা যে খুব ভুল হইয়াছিল একথা কেমন করিয়া বলিব? কারণ বিরোধকে বড় করিয়া যাহারা সমন্বয় ও মৈত্রীর পথ রোধ করিয়াছে তাহাদের উপর ইতিহাস বিধাতার নির্মম দণ্ড প্রহারের কথা আপনার মত লব্ধকীর্তি ঐতিহাসিকের নিকট বলা প্রগল্‌ভতা বলিয়াই মনে করি। এই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তার পরাজয় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাতেও হয় নাই; কারণ আপনারই কথায় "বাঙলা দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান" আজও হয় নাই।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ অনেক আগেই ছিল সে কথা অস্বীকার করি না এবং এই বীজ কালে মহীরুহ হইয়া উঠিবে আশঙ্কা করিয়াই জাতীয়তাবাদী ভারত হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর কথা এমন জোরের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছে। দেশ-বিভাগ এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর ব্যর্থতার পরিচায়ক নহে, দেশ-বিভাগের কারণ আপনারই কথায় আমাদের 'অপদার্থতা।' যে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সত্যকার মিলন সম্ভব হইত, আমাদের রাজনৈতিক নেতারা স্বার্থ-বুদ্ধির বশে এবং বাবু রাজনীতির লোভে তাহাকে পরিহার করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের "বাবু রাজনীতি" নীচেরতলার অধিবাসীদের স্পর্শ করে নাই। তাই অভাবের তাড়নায় এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলের ইঙ্গিতে যখন তাহাদের এক ভগ্নাংশ হিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, যখন স্ব-সমাজের এবং ভিন্ন সমাজের লুণ্ঠন লোলুপ গুণ্ডাদের আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সংযত করিতে অক্ষম হইলাম তখনই আমাদের বাবু-রাজনীতির আরাম কেদারাটি লইয়া দেশ গ্রাম ছাড়িতে হইল। সাত শত বৎসরের মুসলমান রাজত্ব যাহাদের দেশ ছাড়া করিতে পারে নাই মাত্র দুই শত বৎসরের ইংরাজ রাজত্বের অন্তিম-দশায় তাহারা ভিটামাটি ছাড়া হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের বিদ্যুৎ-দীপ্তি সহসা মিলাইয়া যাইবার পর যে স্বার্থবুদ্ধি আমাদের অন্ধভাবে অর্থের উপাসনা করিতে শিখাইয়াছে, যাহার ফলে তেরশ পঞ্চাশের মহামন্বন্তরেও আমরা সিগারেট ফুঁকিয়া কফি হাউস জমাইয়া তুলিয়াছি, সেই ক্ষুদ্র সুখবোধই সিনেমা এবং কফি হাউসের ধোঁয়ায় বাঙলার ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে।

হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে ঐতিহাসিক সব ঘটনার বিবরণকেই সমান মর্যাদা দেন না। তাহার জীবন দর্শন অনুযায়ী বিশেষ ঘটনাকেই তিনি সাধারণত প্রাধান্য দিয়া থাকেন। এই জীবন দর্শনই ইতিহাসের প্রাণ। প্লুটার্ক হইতে স্পেংলার অবধি এই কথার সাক্ষ্য দিবে। আর সত্যের ক্ষেত্রে জেমস-এর প্র্যাগম্যাটিজম পুরাপুরি না মানিলেও একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রয়োজন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সত্যকে প্রভাবিত করে। তাই উদার মৈত্রীর আদর্শই যদি জাতীয়তাবাদীদের আদর্শ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ ইতিহাস কি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় না যে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ও সাম্প্রদায়িকতা যুগে যুগে বলিষ্ঠতর মানবতাবোধের আদর্শের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। তাই পাক-ভারত কনফেডরেশনের মিলিত নেতৃত্বে বিরাট এশিয়ার বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিতে বাধা কোথায়? ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও তো একদা স্বপ্নই ছিল।

আপনার নিকট আমি অর্বাচীন মাত্র। তদুপরি আমি ইতিহাসের ছাত্র নহি। কাজেই তথ্যের ভুল ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আমার ভরসা আপনার উল্লেখিত "বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ।" আপনার মন্তব্যের প্রতিবাদ করার স্পর্ধা আমার নাই, আপনার অভিভাষণ পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে তাহাই জানাইলাম মাত্র।

নমস্কারান্তে—

—ধীরেন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

ীন সাহিত্য

াদাবলী পরিচয়—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। াপক শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ়ত ভূমিকাসহ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সন্স, ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩্ টাকা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ত্যরত্ন মহাশয়ের নাম বাঙলা দেশে ান বিদিত। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ন্ধ আলোচনা এবং গবেষণায় ইনি বাঙলার ় ও চিন্তাশীল সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এই াকে তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রতস্বরূপে করিয়াছেন বলা চলে। তাঁহার লিখিত ব পদাবলীর পরিচয়' গ্রন্থখানি পাঠ া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি এবং দ লাভ করিয়াছি। বস্তুত প্রকৃত রসবস্তু রে নয়, পরন্তু অন্তরধর্মের উজ্জীবনে । জীবন্ত লীলার যেখানে সাড়া, সেই রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে হয়। ইহার ফলে বাহিরের মনোময় সেই রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে সৃষ্টি ময় মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং আনন্দময় সংস্পর্শের সংশ্লেষ সংবেদনের আবর্তে লোড়নে সংস্কারাত্মিকা বুদ্ধি বিচূর্ণ হইয়া রসের রাজ্য এই হিসাবে প্রভাবের রাজ্য, কথায় স্বভাবের রাজ্য; কারণ এ প্রভাব ভাবের, মাধুর্যই ইহার বীর্য। শ্রীল রূপ-বামীপাদ ইহাকেই স্বরাজ্য বলিয়া হিত করিয়াছেন। রাধামাধবের মধুরিমা াদনেই আমাদের স্বরাজ্য অর্থাৎ সর্বার্থ-ধ এই তাঁহার উক্তি। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরূপ বামী মহারাজই বৈষ্ণব সাধনার মাধুর্য-। ভাণ্ডারী। রসরাজ পরম দেবতার লীলা-র্য আস্বাদন করিতে হইলে তাঁহারই আশ্রয় ত হয়। সাধকরূপে শ্রীরূপের সেবা এবং রূপে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত ়ু গোবিন্দ লীলার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে র সংবেদন ঘটা সম্ভব নয়।

এই হিসাবে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসা-সিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি এই দুইখানা পদাবলী সাহিত্যের আকরস্বরূপ। তিনি ধ মাধব, ললিত মাধবে এই আকর হইতে । বিস্তার সাধন করিয়াছেন। ফলতঃ রূপ-বামীকে আমরা অনেকে হয়ত বড় ান আলংকারিক বলিয়াই বিচার করি; ় তাঁহার অলংকারেরর সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন-তাঁহার উপলব্ধিতে আসে নাই, রাচ্ছিন্ন লাবণ্যেই তাঁহার হৃদয়ে চিৎঘন বিচিত্র বৈদগ্ধী রস-নীতিতে সমূর্তিতে ়ম হইয়া উঠিয়াছে। রসরাজ-মহাভাব এই ়র মিলিত তনু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার রেই উজ্জ্বল রসলীলা বিস্তার করা

তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই লীলারই সঙ্গী। অব্যবহিত একত্বেই নিত্য, সত্য এবং সার্বভৌম রসধর্ম তাঁহার লেখার ভিতর দিয়া প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী রূপে গোস্বামীর-পাদের অন্তরে বিলসিত অখিল রসামৃত মূর্তির উদ্বেল দোল পাইয়াই নিখিল মানবের চিত্ত মন্থনকারী রসধর্মের প্রাচুর্যে মাধুর্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। লীলা-মাধুর্যের এই পরম প্রভাব উপলব্ধি করিয়াই শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছিলেন, মহারাজ, আমার কি মান আছে? যাঁহার শ্রী, ভঙ্গী, রঙ্গ, কটাক্ষ আমার বচনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে, আমার কথা শুনিবার জন্য সকলের অন্তরে আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করিতেছে তাঁহার জয় ছিল? অবশ্য ইহা বৈষ্ণব রসসাধনার অতি উচ্চ স্তরের কথা। বুদ্ধিরও উপরের স্তরে আত্মার সে অমৃতময় রাজ্যে অনুপ্রবেশ সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু শিক্ষার সমুৎকর্ষ, মানবতা, স্বার্থ পরিচ্ছিন্ন প্রতিবেশের নীরস শুষ্কতা এবং দৈন্য হইতে জীবনের পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে হইলেও বৈষ্ণব পদাবলীর অমৃতময় অবদানের আলোচনা এবং তাহার মর্ম-গত প্রেমের রীতির সঙ্গে পরিচিতি প্রয়োজন, নহিলে আমাদের শিক্ষা দীক্ষাই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বাঙলা দেশের যাঁহারা মহামানব, যাঁহারা মনস্বী, আমাদের যাহারা পথপ্রদর্শক নেতা, তাঁহারা সকলেই এই অমৃতময় উৎস হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করিয়াছেন। 'সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরো দেওয়া'র কোন মূল্য হয় না। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে অগ্রগণ্য উপদেষ্টা। তিনি শুধু পণ্ডিত নহেন, শাস্ত্রবাসন হইতেও তিনি মুক্ত। তিনি বহুদিন ধরিয়া পদাবলী কীর্তনের ধারার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন দেবতার সাধনা করিতেছেন। সেইভাবেই মাতিয়া আছেন। চিন্ময় রসবস্তুর ধর্মই এই যে, তাহা বিস্তার চায়—"মধুরং হি বিষ্ণুদৈবতং", মধুর রস বিস্তার-শীল। নিজে আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি হয় না, অপরকে দিবার জন্য হৃদয় আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পদাবলী পরিচয়ে' আমরা সেই আনন্দস্পৃহারই বা উদ্দীপনা দেখিতেছি। পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণরস আস্বাদন করিতে হইলে মোটামুটি যে সব জ্ঞান থাকা আবশ্যক তিনি আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সবই সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বিস্তার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাঙলার ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যসেবী এবং রসিক সর্বশ্রেণীর মধ্যে এই পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি। ,

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীধরস্বামীকৃত ভাবার্থ-দীপিকা—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকৃত সারার্থদর্শিনী

টীকা সমন্বিত। পণ্ডিত ফারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য-কৃত পুষ্পাঞ্জলি নামক ব্যাখ্যাযুক্ত এবং পণ্ডিত শশধর বেদান্তপুরাণ জ্যোতিস্তীর্থকৃত অন্বয় ও অনুবাদ। দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় খণ্ড। প্রাপ্তিস্থান—ভারতীয় শাস্ত্র পর্ষৎ, ১০।২, ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০ টাকা।

পণ্ডিত ফারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে প্রথম খণ্ডের সমালোচনা আমরা ইতঃপূর্বে করিয়াছি। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডে কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ নন্দোৎসব পর্যন্ত অনূদিত এবং ব্যাখ্যাও হইয়াছে। অন্বয় সুন্দর, অনুবাদ সহজ ও সরল। শ্রীধরস্বামী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের সর্বজন সমাদৃত টীকা চলিতেছে। সম্পাদক দর্শনাচার্য মহাশয়ের 'পুষ্পাঞ্জলি' নাম্নী ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। লোকানুগ্রহার্থেই শ্রীভগবানের অবতার, সুতরাং ভগবৎ-কৃপা এমন লীলায় বহুভাবে বিচ্ছুরিত, "স্ব স্ব ভাব অনুযায়ী ভক্ত আস্বাদয়" এবং যাহার যেভাব সেইটিই সর্বোত্তম। এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঋষি প্রণিহিত সেই সার্বভৌম সত্যকে বৈয়াকরণ প্রতিভা প্রয়োগে আচ্ছন্ন করা যে না হয়, একথা বলা চলে না এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রয়োজন সূত্রের মুখ্যাবৃত্তিতে চাপা দিয়া কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাও আরোপিত হইয়া থাকে। আলোচ্য সংস্করণের সম্পাদক দর্শনাচার্য মহাশয় অসাম্প্রদায়িক-ভাবে শ্লোকার্থগুলির ব্যাখ্যা করার দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা বুদ্ধি আছে এবং শাস্ত্র মর্মানুধাবনে তাঁহার মনস্বিতারও পরিচয় আছে। তাঁহার বিচার সুদৃঢ়; এজন্য তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া বৈয়াকরণ প্রতিভার পাকে কিম্বা দার্শনিক পরিভাষার জটিলতায় গোলক ধাঁধায় পড়িতে হয় না। বাঙলার ভক্ত, ভাবুক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট এই সংস্করণের বিশেষ সমাদর হইবে, সন্দেহ নাই। অনতিবিলম্বে সমগ্র ভাগবত শাস্ত্রের ক্রমপ্রকাশ সম্পন্ন হয়। আমরা ইহাই কামনা করি। ৪৯৮।৫৩

অনুবাদ সাহিত্য

পঙ্কিল—অনুবাদক শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীসুকুমার দাশগুপ্ত। বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থ-মালা সিরিজ—(১)। প্রকাশক : রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য চার টাকা।

কোন অনুবাদ-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া সাধারণ ব্যাপার নয়। "পঙ্কিল"-এর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়েছে বিষয়বস্তুটির অসাধারণত্বের জন্যে। আলেকজাণ্ডার কুপ্রিনের জগদ্বিখ্যাত "ইয়ামা দি পিট"-এর এটি অনুবাদ। রাশিয়ার এককালের গণিকাপল্লীর ইতিবৃত্ত হলেও পৃথিবীর সব দেশেরই গণিকাপল্লী ও তাদের অধিবাসী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের চেহারা স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়। মানুষেরই সমাজের এক কোণে জঘন্য পরিবেশের মধ্যে কি কুৎসিত ও পঙ্কিল জীবনধারা এদের—যা সমাজের সুস্থ অংশকেও কলুষিত করে তোলে।

মূল গ্রন্থকে অনুবাদে কিছু সংক্ষেপ

নেওয়া হয়েছে। অনুবাদ মোটামুটিভাবে পাঠ্য। ২য় সংস্করণের ছাপা ও বাঁধাই ...াটি। ২৭১।৫৩

...থ

...র্ষপঞ্জী, ১৩৬০—সম্পাদক ঃ সন্তোষ- সেনগুপ্ত। প্রকাশক ঃ এস আর সেন- এন্ড কোং, ২৫এ চিত্তরঞ্জন এভিনু্য, ...াতা ১৩। মূল্য চার টাকা।

...জানবার অনেক তথ্যের গুছিয়ে একত্র ...ন আলোচ্য "বর্ষপঞ্জী" যা সাত বছর প্রকাশিত হয়ে চলেছে। শিক্ষক, ছাত্র, ...দিক এবং জনসাধারণও যে যে-বিষয়ে ...হী সে-বিষয়ে প্রামাণ্য সূত্রটি চট করে নিতে হাতের কাছে এমন একখানি ...ন দরকার। বিগত বছরের ঘটনার ...মামী থেকে আরম্ভ করে ভৌগোলিক ...। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পরিচয়, ...র আদমসুমারী, বিভিন্ন দেশের ...ন, ভারতীয় অর্থনীতি, ভারতের বিভিন্ন ও বাণিজ্য, বীমা, পঞ্চবার্ষিকী পরি- ...া, যানবাহন, জনস্বাস্থ্য, কংগ্রেস, খেলা- চলচ্চিত্র, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের ...নে ৩৫২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পাদিত ...। তাছাড়া পরিশিষ্টে আছে ৬৪ ব্যাপী বিশিষ্ট বাঙালী, ভারতীয় ও ...ন্তানীদের জীবন পরিচয়। ৩৪১।৫৩

...ট গল্প——

...র পাঁচালি ঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী ...স্থান ঃ দাসগুপ্ত এন্ড কোং, কলিকাতা। ঃ ১৷৷৹ আনা।

লেখক ইতিপূর্বে 'জয় হিন্দ' এবং ...চ্ছপ' নামে দুইটি রূপক নাটক রচনায় ...কতার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থের ...র্গে তিনি বলিয়াছেন—

এই নিরালায়,
দুটো গল্প বলি যার মাথামুণ্ড নাই।

সত্য কথা বলিতে কি, ভূত সম্বন্ধে লৌকিক বিশ্বাস ও ধারণাকে নাট্যরস সঞ্জীবিত গল্পের মধ্যদিয়া তিনি পরিবেশন করিয়াছেন। শিশু-কিশোরগণ তাঁহার গল্প- গুলিকে যেমন উপভোগ করিবে তেমন আবার ইহাদের বর্ণনা স্থলে লেখক মাঝে মাঝে যে জীবন সমালোচনার 'Criticism of life'- এর ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা সাহিত্য রসিককে তৃপ্ত করিবে। অধিকাংশ কবিতায় প্রবহমান পয়ারছন্দে সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। আমরা গ্রন্থখানার বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বিপ্লবতীর্থে—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত- রায়, বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—৩৲। ৪৮১।৫৩

মনীষীদের দৃষ্টিতে আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ—স্বামী আত্মানন্দ, গ্রন্থকার কর্তৃক ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১৷৷৹। ৪৮২।৫৩

আঁধারে আলো (৩য় প্রবাহ)—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্র- নাথ, শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১২।১ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য—১৷৹। ৪৮৩।৫৩

মাও সে তুং—সরলানন্দ সেন, নওরোজ লাইব্রেরী, ১সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা—মূল্য—২৲। ৪৮৪।৫৩

পঞ্চভূত—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরু- দাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য—২৷৷৹। ৪৮৫।৫৩

দক্ষিণের বিল (২য় খণ্ড)—অমরেন্দ্র ঘোষ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য—৪৲। ৪৮৬।৫৩

ক'টা বাজলো?—মিখাইল ইলিন, অনু- বাদক—গিরীন চক্রবর্তী, মিত্রালয়, ১০, শ্যামা- চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য—১৷৷৹। ৪৮৭।৫৩

সাধনা-গীতি (২য় খণ্ড)—শ্রীললিতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক দামোদর আশ্রম, রঘুদেবপুর—পোঃ, জেলা— হাওড়া হইতে প্রকাশিত—মূল্য—২৲। ৪৮৮।৫৩

রূপদর্শীর সার্কাস—রূপদর্শী, মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য—৩৲ ৪৮৯।৫৩

সুনন্দার প্রেম—দেমুখৎ, দেবাশীষ মুখো- পাধ্যায় কর্তৃক ৩৯, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য—৵৹ আনা। ৪৯০।৫৩

একটি মেয়ের কাহিনী—দেমুখৎ, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩৯, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য—৵৹ আনা। ৪৯১।৫৩

বর্গী এলো দেশে—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সবুজ প্রকাশনী, ৪, শুঁড়া ইস্ট রোড, কলিকাতা—মূল্য—১৲। ৪৯২।৫৩

খেলার রাজা—ক্রিকেট—বিনয় মুখো- পাধ্যায়, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য—২৲। ৪৯৩।৫৩

সাহেব বিবি গোলাম—বিমল মিত্র, নিউ এজ পাবলিশার্স, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলি- কাতা—মূল্য—৬৷৷৹। ৪৯৪।৫৩

সূর্য গ্রাস—সুশীল জানা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী—৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা —মূল্য—৩৲। ৪৯৫।৫৩

এ জন্মের ইতিহাস—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- পাধ্যায়, স্টার লাইট পাবলিকেশানস্, ১৯এ, চক্রবেড়ে লেন, কলিকাতা—মূল্য—৫৲। ৪৯৬।৫৩

ঔষধ পরিচয়—ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- পাধ্যায়, হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং, ১৬৫ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য—৯৲। ৪৯৭।৫৩

ট্রামে-বাসে

হাজারীবাগ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, একটি ব্যাঙ নাকি একটি সাপকে গিলিয়া ফেলিয়াছে। সাপের কর্তৃত্ব ব্যাঙরা চিরকালই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নিজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া সাপ যখন পাঁচ পায় চলিতে আরম্ভ করেন, তখন

তাঁকে সর্বনাশের হাত হইতে বাঁচানো শক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং 'ওরে মূর্খ ইহা দেখি শিক্ষ'!!

* * *

ব্যাঙের সর্প ভক্ষণের সংবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনিলাম, কলিকাতার জনৈক ভদ্রলোকের পোষা দুইটি লাল মুনিয়া পাখীর নাকি দাঁত
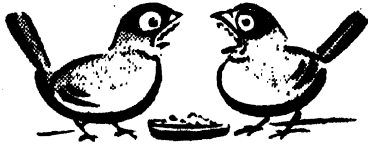
উঠিয়াছে। —'তাদের খাদ্যে প্রচুর বালি-কাঁকর থাকে বলেই হয়ত প্রকৃতি একটু-খানি বদান্য হয়ে এই ব্যবস্থাটি করেছেন' —অনুমান করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, জনৈক আতসবাজি প্রস্তুতকারক এবার দেওয়ালির জন্য এক ধরণের একটি বোমা প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন —'এটম বম্'। —'মানে-না -মানা শাড়ির পর এটম বমের আবির্ভাব মোটেই আকস্মিক নয়। যাহোক পুলিশ কমিশনারের তৎপরতায় এটম বম্ শেষ পর্যন্ত বাজারে ছাড়া হয়নি, সুতরাং হাইড্রোজেন বম্ যদি কেউ তৈরি করে থাকেন, তবে তার দুঃখ করার কিছু নেই' —মন্তব্য অবশ্য বিশু খুড়োই করেন।

* * *

কুয়াশা হইতে আত্মরক্ষার জন্য লণ্ডনে নাকি সম্প্রতি একটি বিশেষ ধরণের মুখোস পরার ব্যবস্থা করা হইতেছে। —'মুখোস পরার কায়দাটা এ'দের নূতন নয়, কু-আশার প্রতি দুর্বলতাকে এ'রা চিরকাল এমনি করে মুখোস দিয়েই ঢেকে এসেছেন'—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

পাকিস্তান রাষ্ট্রের নূতন নামকরণ হইয়াছে—'ঐশ্লামিক গণতন্ত্র'। গণতন্ত্রের সঙ্গে ঐশ্লামিক শব্দ সংযোজিত হওয়ায় রাষ্ট্রের অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসী-দের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে অনেকেই মনে মনে নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন এবং 'গণতন্ত্র' সম্বন্ধে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইতেছেন না। —'যাঁরা গণতন্ত্রের অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন না যে, কখনো কখনো কাঁঠালেরও আমসত্ব হয়।'!!

* * *

নির্ধারিত তারিখে লক্ষ্ণৌতে প্রথম টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। —'বোঝা গেল, বডিলাইন বোলিং আর

চলে না; কথাটা পন্থজীর মতো ঝানু খেলোয়াড়ের ভেবে দেখা উচিত এবং ঐ সঙ্গে নূতন যাঁরা মাঠে নামছেন, তাঁদেরও'!!

ডাঃ কাটজু নাকি বলিয়াছেন যে, যে-কোন আঞ্চলিক ভাষা দেব-নাগরী অক্ষরে লিখিত হইলে সমস্যার সমাধান বহুলাংশে সম্ভব হইবে। খুড়ো বলিলেন—'বাঙলাকে বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা কাটজুজী প্রকাশ করেছিলেন, তা দেব-নাগরীতে ছাপা হলেই আর কারো মনে কোন বিক্ষোভ থাকতো না।'

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যের প্রত্যেক নবজাত শিশুর জন্ম রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশ দিয়াছেন এবং তার জন্য পল্লী এবং শহরাঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট হারে 'ফি' দেওয়ার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। —'নবজাত মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের জন্যে এই ধরণের একটা রেজিস্ট্রেশন-ফি আদায় করলে রাজ্য সরকারের আর্থিক উন্নতি হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস'— বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পৃথিবীর মহিলাদের পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন দুই পক্ষেরই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। —'উত্তম পরামর্শ, কিন্তু এ'রা দুই পক্ষের কথা না শুনে একতরফা ডিক্রীর দাবী করেন বলেই পৃথিবীতে 'দ্বিতীয় পক্ষের' এত ছড়াছড়ি' —বলেন পাকা সংসারী বিশু খুড়ো।

* * *

অভিযোগ করা হইয়াছে, বাঙলা ছায়াচিত্রে নাকি হৃদয়াবেগকে একটু বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—'ওটা ভাতের গুণ। আরো একটু বেশি গমের ব্যবস্থা হলে হৃদয় আপনা থেকেই যে নস্যাৎ হবে, তার কিছু আভাস এখন থেকেই পাচ্ছি'।

* * *

বিগত আদমসুমারীতে প্রকাশ, ভারতে পাঁচ হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের প্রায় ন' লক্ষ ছেলেমেয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।—"এরা মনে মনে নিশ্চয় এই মন্ত্রই পাঠ করেছে— যদিদং ইয়ো-ইয়ো তব তদিদং ইয়ো-ইয়ো মম"!!

গ্রন্থাগারে শিশুসাহিত্য

কুমুদরঞ্জন সিংহ

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার-
গুলিতে শিশুসাহিত্যের সমাবেশ
ন্ত নগণ্য। কোথাও বা যদি কিছু
ু সাহিত্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তার
ধকাংশই অপাঠ্য এবং অপঠিতও!
দুটো কারণ। একটি গ্রন্থাগারের
ক থেকে শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবহার
বার প্রয়োজন সম্পর্কে ঔদাসীন্য
ানো হয়। দ্বিতীয় তো যথেষ্ট
মাণে শিশুসাহিত্য সম্পর্কে
হিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণ এখনো গুরুত্ব
রোপ করেনি। যার ফলে আমাদের
ুদের মানসিক পুষ্টির প্রচুর অভাব
তঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটি যুগ
বর্তনের মুখে যখন দেশের তরুণ-
স্বাগত জানিয়ে বলা হয়, জাতির
গামী নোতুন মানুষ দেশের কিশোর-
শারীগণ তাদের পূর্ণ বিকাশেই
টা জাতির এক মহান অভ্যুদয়। সেই
শার-কিশোরীদের শিক্ষা ও তার
থ মননশীল সৃষ্টির উপযুক্ত উন্মুক্ত
বেশ তৈরীর আয়োজন কোথায়?
াই খুব আশ্চর্য হতে হয়, জাতির
ৃতির ক্ষেত্র—মহা সম্ভাবনার মুকুলিত
নগুলি অনাদরে আর উপেক্ষায়
জা কেন ম্রিয়মাণ?

যাক্ কথাটাকে ঘুরিয়ে আমার
ব্য আসছি; গ্রন্থাগারে শিশুসাহিত্য
র্কে আমার কথা; শিশুসাহিত্যের
বসাতে হবে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের
রোই যেন তাদের গ্রন্থাগারে এসে
পড়ার সুযোগ পায় তার সুব্যবস্থাও
ত হবে।

শিশুসাহিত্য নির্বাচন করা খুবই
ন; এই জন্য গ্রন্থাগারিককে শিশু
তত্ত্ব জানতে হবে। শিশুদের
াসার অন্ত থাকে না, বিস্ময়েরও
নেই তাদের। তাই নিত্য তাদের
বার ও জানবার দুর্দমনীয় ইচ্ছাকে
য়ে রাখাই শিশুসাহিত্যের অন্যতম
। এই প্রেক্ষিতে শিশুমনের পর্যায়
য় বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে
াগারিককে পুস্তক নির্বাচন করতে
। ছড়া ও রূপকথাই হলো আসলে
শিশুসাহিত্যের রাজ প্রাসাদের সদর দরজা। এদুটোই কল্পনার জিনিষ, খাপছাড়া। মানুষের মন শৈশবে সব কিছুকে বোঝে না—কল্পনাকে ভর করেই সে জীবনের আনন্দ খোঁজে। তারপরই আসে প্রকৃতির কথা—এই বিশ্ব প্রকৃতির যেসব অপরূপ সৃষ্টি, তার নানা লীলা রহস্য তখন সেগুলি শিশুমনের চারধারে ভিড় করে দাঁড়ায়। শিশুমন তখন প্রকৃতির এই অনুপম সৌন্দর্য আর নানা বিচিত্রতার মর্ম বুঝতে চায়, এগুলিকে পেতে চায় তার সাহিত্যে, এই হলো শিশুসাহিত্যের একটি মহল। তারপরে দেখা দেয় আশে-পাশের লোকগুলি—খেলার সাথী, দরদী বন্ধু বনমালী, সনাতন চাকরবাকর, মা, বাবা, মাস্টার মশাই; এই নিয়ে তখন হয় শিশুসাহিত্যের 'গল্প'—তারপর গল্প যখন জমাট করে বুঝতে শেখে, তখন সে চায় এমনসব জীবনের গল্প, যেসব জীবনের সঙ্গে রয়েছে ওঠা-পড়া সুখ-দুঃখের কাহিনী; বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটতে থাকে, ঠিক সেইসব জিনিষ। তখনই শিশুসাহিত্যে এসে পড়ে গল্পের ছলে ভালো মন্দ লোকের জীবনী। জীবনী মাত্রই সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, কাজেই জীবনী যখন শিশুসাহিত্যের কোঠায় শিশুমন দেখতে পায়, তখন সে উন্মুখ হয়ে ওঠে আরো কিছু জানবার জন্য। সেইটাই ইতিহাস। ইতিহাস জানতে গিয়ে শিশুমন সন্ধান পায় দেশ-বিদেশের নামের; পরিচিত হলো ভূগোলের সঙ্গে। অর্থাৎ এলো তখন শিশুসাহিত্যে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সেতু বেয়ে ছোটদের মন চাইবে নোতুন নোতুন সৃষ্টি করতে।

এই হলো শিশুমনের ক্রমবিকাশ ও তার সাহিত্যেরও ক্রম ব্যাপ্তি। এখন এই সাধারণ অবস্থায় বিভিন্ন স্তরকে লক্ষ্য রেখে পুস্তক সংগ্রহ করলেও দুটো দিন বিশেষ ক'রে লক্ষ্য বস্তু হবে। একটি পুস্তকের বিষয়বস্তু, দ্বিতীয় তার আঙ্গিক সৌষ্ঠব।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই প্রধান বিবেচ্য হবে—গ্রন্থকারের আলোচিত বিষয়টি সাধারণ বিধিবহির্ভূত কিনা? গল্প বা কবিতাই হোক তাতে শিশুমনের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে কতখানি সহায়ক হবে? অযথা কল্পনা বিলাস, বা ভয়ংকর একটা ভৌতিক কান্ড অথবা নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের পট আছে কিনা? আমরা দেখি অবাস্তব রোমাঞ্চকর ঘটনা দিয়ে শিশুসাহিত্যে শিশুমনকে পীড়িত করে তোলার চেষ্টাও চলছে। গ্রন্থাগারিক এই বিষয়কে সযত্নে পরিহার করবেন। অতএব শিশুসাহিত্য এমন হওয়া প্রয়োজন, যা উত্তরকালে শিশুকে তার জীবনে আদর্শ নির্বাচনে সাহায্য করতে পারবে। তার কল্পনাকে জাগ্রত ও বিচিত্র করে তুলবে। তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করে দেবে। তার চরিত্র ও প্রকৃতিকে মহৎ ও উদার করে গড়ে তুলবে। শিশুসাহিত্যই শিশুদের চিত্ত বৃদ্ধির স্ফূর্তি বিকাশ পূর্ণতা ও শ্রীবৃদ্ধির সাধনে সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে। জাতি গঠনের প্রথম সোপান এই শিশুসাহিত্য।

আমাদের দেশে শিশুসাহিত্যের নামে যা কিছু চলছে, তাতে দেখা যায় যে, অতি শৈশব কাল থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত এতদিন যা শিখে এসেছে, তা শুধুই 'রোমান্স'! নিরর্থক ভাবসর্বস্ব কল্পনাবিলাস মাত্র, ফলে আমাদের দেশের কিশোরগণ হয়ে ওঠে কল্পনা-বিলাসী ও ভাবপ্রবণ! এই মারাত্মক ভাবপ্রবণতায় কিশোরদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দেয়। নিজের পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে ভয় পায়, নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস হারিয়ে তারা শেখে দৈব-নির্ভরতাটাই প্রাণপণে আঁকড়ে

ধরতে। এই অবস্থার সৃষ্টির জন্য একমাত্র আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যকেই দায়ী করা যায়। অনেকে মনে করেন, শিশুসাহিত্য সৃষ্টি করা খুবই সহজ কাজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর চেয়ে বড় দায়িত্ব ও কঠিন কর্তব্য আর নেই। গোটা জাতির চরিত্র গঠিত করে এই শিশুসাহিত্য। শৈশবে যে বীজ বপন করা হবে শিশুমনে, উত্তরকালে তাই অংকুরিত হয়ে উঠবে তাদের জীবনে। যিনি দেশ, জাতি, সমাজ ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত নন, শিশু মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁর নিবিড় পরিচয় নেই, শিশুর রসবোধের মাপকাঠি যার অজানা, তেমন লোকের পক্ষে শিশুসাহিত্য রচনা করতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। শুধু তাই নয়, শিশুর বুদ্ধিবৃদ্ধি ও রসবোধের ক্রমবিকাশ এবং তার অনুকূল জ্ঞান ও শিক্ষার স্তর ভেদ অনুসারে শিশুসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে যাঁরা একান্ত অজ্ঞ, শিশুসাহিত্য রচনার পক্ষে তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। যাই হোক আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্ এবং সাহিত্যিকেরা এসম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান হলে জাতি গঠনে শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ হবে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। আমাদের দেশে কিশোরীদের জন্য আলাদা করে কোন বই লেখা হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। অবশ্যি আজকাল 'এই দেশেরই মেয়ে' 'মহীয়সী নারী' এই ধরণের কয়েকখানা বই দেখা যাচ্ছে, তবে ছোট মেয়েদের উপযোগী গল্পের বই বা উপন্যাস নেই বল্লেই চলে। অথচ আমরা দেখি, ছেলেদের চেয়ে অনেক কম বয়সে মেয়েদের পড়ার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। যে খুকু সাত বছর বয়সে রূপকথা পড়ে আমোদ পায়, তেরো চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যেই তাকে বড়দের উপযোগী রোমান্সে মগ্ন থাকতে দেখা যায়। অথচ এই বয়সের ছেলেরা অন্তত দু' বছর আগে এই ধরণের বই ছুঁতে চায় না। এর কারণ হলো মাঝামাঝি সময়ের জন্য আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য সহজ আনন্দ ও মজা পরিবেশনের মতো কোনো বই নেই।

ছোটদের বইয়ের ধরণ সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা আলোচনা করেছি। এবার কোন্ শ্রেণীর বই সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তার কথা বলবো।

গ্রন্থাগারের ব্যবহার শুধু অবসর যাপনের জন্যই নয়, একথাটা সব সময়ই মনে রাখতে হবে। গ্রন্থাগারে এসে ছোটরা যাতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সজাগ ও জ্ঞানলাভ করতে পারে, এটাই দেখা প্রথম কর্তব্য। তাই সর্বসাম্য বজায় রেখে শ্রেণিগতভাবে গ্রন্থাগারে মননশীল বইয়ের সংগ্রহ করতে হবে। ছোটদের বই সংগ্রহ করবার সময়ে মনে রাখতে হবে A Library is a collection of productive books. Our books must be good ones and be selected in a catholic manner so that all subjects suitable for youngsters are represented.

সুরুচি ও মননশীল সাহিত্যের সমবেদনা ছোটদের মনের সুস্থতা ও ক্রমব্যাপ্তির প্রসারে সহায়তা করে।

এইবার বইয়ের আঙ্গিকের দিকটার কথা কিছু বলা যাক। ছোটদের বই কিনতে হলেই দেখতে হবে বইটির ছাপা ও বাঁধাই। অবিশ্যি সত্যিকারের ভালো বই, যদি না তার যথেষ্ট বিক্রির সম্ভাবনা থাকে, তাহলে কখনোই তা সস্তায় বিক্রি হতে পারে না। অথচ আবার দামের দিক দিয়েও এমন একটা বাঁধা নিয়ম থাকা চাই যে, ছোটদের বই একটা নির্দিষ্ট মূল্যের বেশী হতে পারবে না। অনেক সময় আমরা ভাবি যে, সস্তায় একটা মোটাগোছের বই কিনতে পারলেই খুব বেশী কিছু লাভবান হলাম। তাই প্রকাশকেরা অনেক ক্ষেত্রেই মোটামোটা কাগজে ছেপে মোটামোটা দাম আদায় করে নেয়। কিন্তু এর দোষ কোথায় ভাবলেই দেখবেন, এই কাগজগুলি টেঁকে না মোটেই, আলো ও আর্দ্রতার স্পর্শ পেলেই বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সেলাইও থাকে না। কিছুদিন বাদেই বইটি অকেজো হয়ে যায়।

ছাপার বেলাও ঠিক তাই। ছোটদের বইতে ছোট ছোট হরফের ছাপা এবং ঘনসন্নিবিষ্ট লাইন, ভাঙা ভাঙা অক্ষর, অস্পষ্ট ছাপা মোটেই হবে না। এতগুলি দিক বিচার করে গ্রন্থাগারে শিশুসাহিত্য সংগ্রহ করতে হবে।

সংশয়

দিবাকর সেনরায়

যে বোধ হৃদয়ে আসে—সে যে চায় জীবনেতে রূপ,
মনের একান্ত কোণে যে প্রেম রয়েছে নিশ্চুপ
গোপনে নিভৃতে—
রাখি তারে হৃদয়ের ছোটো কোণটিতে।
সেখানে সে দীপ হয়ে জ্বলে ওঠে দেখি—
সতর্ক বিষয়ী মন চিনবে তারে কি?

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

একটি অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টি

একটিমাত্র চরিত্রের অভিনয়ের জোরে থানি ছবি যে লোককে আনন্দে ক'রে দেবার কতখানি শক্তি লাভ তে পারে গত সপ্তাহের নতুন ছবি র্ণ টকীজের "দুই বেয়াই"-এর জনের চরিত্রাভিনয়ে ধীরাজ ভট্টাচার্য ই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় য়েছেন। কাহিনীর রচয়িতা ও পরি-ক প্রেমেন্দ্র মিত্র হয়তো বিচিত্র ত্রটির উদ্ভাবন ক'রে দেন কিন্তু তাকে ায়িত ক'রে একটি অনবদ্য চরিত্র-ষ্টতে পরিণত করায় ধীরাজ ভট্টাচার্য শিল্পদক্ষতার পরিচয় সামনে তুলে রেছেন তা তাঁর এ পর্যন্তকার শিল্প-বনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তো বটেই, এমন একথাও নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে এমন দরের অভিনয় চট ক'রে মনে ও শক্ত হবে। ধীরাজ ভট্টাচার্যের ম যুগের অভিনয়ের কথা মনে প'ড়লে লোচ্য চরিত্রসৃষ্টিটি আরও অনেক ময়কর ব'লে মনে হবে। কোথায় ই "যমুনা পুলিনে"-র মেয়েলী ষ্টো' আর কোথায় এই বাঘের মতো মশীল বেয়াই! এ যে কী পরিবর্তন া গোড়া থেকে ওর অভিনয় অনুসরণ র আসছেন তাঁরা তা উপলব্ধি ক'রতে রবেন। সেযুগে হিরোর চরিত্রে ওর য়লিপণা অভিনয়ের জন্য বিদ্রূপ ও রহাসই অর্জন ক'রে আসছিলেন এবং াবেই হয়তো চ'লতো বরাবরই যদি না মেন্দ্র মিত্র তাঁকে "কালোছায়া"-তে রকম কিছু করার সুযোগ পাইয়ে তন। ধ'রতে গেলে এই ছবিখানিতেই রাজ ভট্টাচার্য প্রথম নিজেকে একজন নপুণ চরিত্রচিত্রশিল্পিরূপে প্রকৃত তার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। বোঝা ন, চরিত্রাভিনয়ই ধীরাজের আসল ন, আগে অদ্দিন ধ'রে যা ক'রে সছিলেন তা ছিলো নেহাৎই াকৃতিক। "কালোছায়া"-তে দু'টো রীতধর্মী চরিত্রে দু'রকমের রূপ-জায় চরিত্রানুযায়ী একেবারে ভিন্ন ভিন্ন স্বরও তিনি অবলম্বন করেন। অদ্ভুত রেশযুক্ত তাঁর ঐ দ্বিতীয় স্বরটির া একটা সম্মোহক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই থেকেই মোড় ঘুরলো এবং অতঃপর ধীরাজ ভট্টাচার্য কেবলমাত্র চরিত্রাভিনয়েই আত্মপ্রকাশ ক'রে আসছেন। বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে, সেই থেকে তিনি প্রত্যেক ছবিতে নতুন এবং বিচিত্র এক একটি চরিত্র সৃষ্টি ক'রে চ'লেছেন। চরিত্র পরি-কল্পনা, রূপসজ্জা, চরিত্রানুগ স্বর ও অভিব্যক্তিতে প্রতিটি চরিত্র আলাদা আলাদা সৃষ্টিতে পরিণত ক'রছেন এবং প্রত্যেকটিই স্মরণে থাকবার মতো রূপায়ন। এর জন্যে তাঁকে কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নিগ্রহও ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে। "হানাবাড়ী"-তে অভিনয় ক'রতে পা ভেঙে ছ' মাস তাঁকে শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হয়। আর এই "দুই বেয়াই"-তে বিচিত্র হুংকারটি আগাগোড়া বজায় রেখে যেতে ফুস্‌ফুসে আর স্বরনালীতে এমন চাপ সহ্য ক'রতে হয় যে, প্রতিদিন শুটিংয়ের শেষে স্বাভাবিকভাবে দম নিতে বেশ অনেকক্ষণ সময় ব্যয় ক'রতে হ'তো। তাঁর এই কষ্ট অবশ্য সার্থকও হ'য়েছে প্রতিবারই। তাঁর ইদানীংকার অভিনীত সব ছবিই হয়তো জনসমাদর লাভ ক'রতে পারেনি, কিন্তু সব ক'টি ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব স্বীকৃত ও প্রভূত সমাদৃত হ'য়েছে। আর "দুই বেয়াই"-য়ের মহেন্দ্রপ্রতাপ চৌধুরী তো একটি প্রবল প্রতাপশালী চরিত্রাভিনয়ে বাঙলা পর্দার একটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি ব'লে সর্বজনের অভিনন্দন লাভ করবে।

* * *

আলোচনা ক'রতে ব'সে গোড়াতেই একটা চরিত্রের অভিনয় নিয়ে এতোখানি তারিফ করাটা হয়তো বিসদৃশ মনে হ'তে পারে, বিশেষ ক'রে যদি জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গল্পতে মহেন্দ্রপ্রতাপ মুখ্য চরিত্রও নয় আর সবচেয়ে বড়ো অংশও দখল করে নেই। বস্তুত মহেন্দ্রপ্রতাপের আবির্ভাব গল্পের ঠিক মাঝখান থেকে, কিন্তু তার পর তিনি একাই সব, এবং সব্বায়ের মনের সবটুকু এমনভাবে আঁকড়ে ধরেন যে, ছবি শেষে তাকে ছাড়া কিছু আর চিন্তায়ও আসে না, শোভাও পায় না। নামটা ধ'রে বিচার ক'রলে গল্প অনুযায়ী "দুই বেয়াই" বেখাপ্পা। মুখ্য চরিত্র হ'চ্ছে একটি বাপ-মা মরা মেয়ে, জবা। ওরই গল্প এটা এবং ছবিখানি আরম্ভও হ'য়েছিল "সাহসিকা" নামে। সে প্রায় বছর চার-পাঁচেক আগেকার কথা। কিন্তু ছবিখানি তৈরী হ'য়ে এতোদিন প'ড়েছিল, তারপর হঠাৎ নাম বদলে, অবশ্য ভোলটা পাল্‌টে নয়, "দুই বেয়াই" হ'য়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। বেশ জমাটি গল্পের উপাদান র'য়েছে এতে। তবে বিন্যাসের গোলমালে গোড়ার অর্ধেক অনেকটা এলোমেলো হ'য়ে প'ড়েছে। গল্পের ওপরে মায়া পড়ে কিন্তু মনের যেন সাড়া পেতে চায় না।

* * *

গল্পের অর্ধেক পর্যন্ত বেয়াইদের একজনের তো পাত্তাই নেই, আর এক-জনকে গোড়াতে একটি রহস্যময় ব্যক্তিমাত্র ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারা যায় না। বিদেশাগত ঐ ব্যক্তিটি তার বাপ-মা মরা ভ্রাতুষ্পুত্রীর সন্ধানে ছিলেন। গোড়ার অংশ একটি অনাথ আশ্রমের মেয়েদের নিয়ে, যার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে জবা। বাপ-মা মারা যাবার পর জবার মামা ওকে নিয়ে এসে তার বাড়িতে রাখেন, কিন্তু তারপর তিনি মারা যান। এর পর মাসী আর মামাতো ভাই বোনদের নির্যাতনে বালিকা জবা ওদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং পূর্বোক্ত ঐ রহস্যময় ব্যক্তির বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে পড়ে। বহু প্রশ্নের উত্তরে জবা একেবারেই তার মুখ খুললে না, অগত্যা ওকে থানায় জমা দেওয়া হ'লো এবং সেখান থেকে এক অনাথ আশ্রমে। প্রথম দিন অনাথ আশ্রমে জবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'য়ে গেলো শোভা নামে আর এক তারই বয়সী অনাথা আর আশ্রমের রসিকবন্ধু সাধনদার। শোভা ও জবা তাদের সখ্যতা অবিচ্ছেদ্য করে রাখার জন্য একটি গাছের গায়ে তাদের নাম খোদাই করে রাখলে।

দেখতে দেখতে বারো বছর পার হয়ে গেল। বড় হলেও মেয়েদের যা কিছু আদর-আবদার ওদের সাধনদার কাছে। ওদের খুশী করার জন্য সাধন একদিন একখানা দেহতত্ত্বের গান শোনাচ্ছিল, আশ্রমের পরিচালক এই বেয়াদপির জন্যে সাধনকে বরখাস্ত করে দিলেন। এরপর শোভা একদিন কঠিন রোগে পড়ে মারা গেলো। শোভার চিকিৎসাসূত্রে জবার সঙ্গে আশ্রমের ডাক্তারের আলাপ হলো। এর পর জবা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এক বৃদ্ধ ব্লাডপ্রেসারী রুগীর সেবার কাজ নিয়ে গেল। এইখান থেকেই গল্পের মোড় ঘুরলো।

* * *

চাকরী করতে বাড়িতে পা দিতেই একটা বিকট হুংকার আর ভীতসন্ত্রস্ত চাকরদের পলায়নরত দেখে জবা ঘাবড়ে গেলো। ও-বাড়ির পিসিমা অর্থাৎ রুগীর বিধবা ভগিনী জবাকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কর্তা মহেন্দ্রপ্রতাপের চর্ব্যচোষ্য খাওয়ার খুব বাতিক, কিন্তু ডাক্তারের নিষেধে সাগু-বার্লি ইত্যাদি ছাড়া তার কিছু খাবার নির্দেশ নেই। এই জন্যেই মহেন্দ্রপ্রতাপ সবায়ের ওপর উগ্রচন্ডী, যার ফলে তার ছেলে-মেয়েরা সব ও-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। জবা যখন পৌঁছয়, তখনও মহেন্দ্রপ্রতাপ ক্ষিপ্ত হয়ে বাসনপত্র ভেঙে হুংকার ছাড়ছিলেন তাকে ঐসব অখাদ্য খেতে দেবার জন্য। তবুও জবা সাহস করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মহেন্দ্রপ্রতাপ তার ওপরেও সমান ক্ষিপ্ত হয়ে হুংকার ছাড়তে লাগলেন, কিন্তু জবাকে দেখে কেমন যেন একটু নরম হবার চেষ্টা করলেন, হুকুম হলো জবা দুপুরে এসে ওকে বই পড়ে শোনাবে। যথাসময়ে জবা এলো। মহেন্দ্রপ্রতাপ জানালেন গল্প-উপন্যাসের মতো বাজে জিনিস তিনি পড়েন না, তার পড়ার বই আলাদা এবং তিনি এক-রকমেরই বই শুধু পড়েন। নির্দেশমতো জবা শেলফ থেকে একখানা বই নিয়ে বসলো। বই খুলে তারও বিস্ময়ের অন্ত রইলো না, কিন্তু ধমক খেয়ে জবাকে তা-ই পড়ে যেতে হলো। বইখানি নানারকম চর্ব্যচোষ্য রান্নার পাকপ্রণালী, সেলফের সব বইই তাই। জবা তাই পড়ে যায়, আর মহেন্দ্রপ্রতাপ চোখ বুঝে শুনতে শুনতে ঠোঁটে জিব ঘষে খাওয়ার আস্বাদ নিতে থাকেন। এইভাবে দিন যায়। জবার সাহস ও দৃঢ়তার কাছে মহেন্দ্রপ্রতাপকে খানিকটা ঝুঁকতেই হয়। একদিন হুংকারের মুখে মহেন্দ্রপ্রতাপ জবাকে আবাগীর বেটি বলে ফেলায় জবা বিক্ষুব্ধ হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। মহেন্দ্রপ্রতাপ বুঝলেন না, তার অপরাধ কোথায় তবুও তিনি অভিমান-ক্ষুব্ধ হয়ে, জবা চলে গেলে কারুর নিষেধ না শুনে যা-তা খেতে আরম্ভ করার ভয় দেখালেন। পিসিমাও জবাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। জবা সেবার থেকে গেলো। ওদিকে মহেন্দ্রপ্রতাপের মেয়েরা খবর পেলে যে, কোন এক মায়াবিনী তাদের বাবাকে বশ করে ফেলেছে এবং সব সম্পত্তি দখল করে নেবার চেষ্টা করছে। ওরা ওদের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এসে হাজির হলো। কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপ তাদের কথায় মোটেই টললেন না। দেখা গেলো, জবাদের অনাথ আশ্রমের সেই ডাক্তারই মহেন্দ্রপ্রতাপের পুত্র। রাগ করে জবা ডাক্তারকে জানায় যে, সে-ই ডাকিনী-মায়াবিনী, যাকে তারা ভাই-বোন মিলে তাড়াতে এসেছে। ডাক্তার তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু জবা কিছু না শুনেই চলে গেলো, ডাক্তারও বাড়ি ছেড়ে গেলো। তার বোনেরা রইলো এবং বাবার কাছে জবার নামে একটা কলংক রটিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ফল হলো এই যে, মহেন্দ্রপ্রতাপ উল্টে তার জামাইকেই গুলী করে মারতে গেলেন। মেয়েরা ও-বাড়িতে থাকা আর নিরাপদ মনে করলে না। ইতিমধ্যে একদিন জবা রাস্তায় বাউলবেশী ভিক্ষুক তাদের আশ্রমের সাধনদার দেখা পেলে। তারপর আর একদিন জবা নিজেকে এ-বাড়ির অশান্তির কারণ মনে করে হঠাৎ সাধনদাকে পেয়ে তার সঙ্গে গোপনে বেরিয়ে চলে এলো এবং এসে উঠলো সাধনেরই বস্তীর ঘরে। এখানে এসে জবা কাজের সন্ধান করতে থাকে। একদিন সাধন খবর নিয়ে এলো যে, প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক বিদেশাগত জবার এক কাকা জবার খোঁজ করছেন। এতোদিন পর জবা গেলো তার মামার বাড়িতে তার কাকার খোঁজ নিতে। তার মামী তাকে সন্ধান বলে দিলেন না। মামীর উদ্দেশ্য ছিলো জবার খবর চেপে যাওয়া, যাতে তার ছেলে ও মেয়ে ঐ সম্পত্তি লাভ করতে পারে। গোড়াকার সেই রহস্যময় ব্যক্তিই জবার কাকা, যে একদিন তারই দাওয়া থেকে জবাকে অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওদিকে জবা চলে আসার পর মহেন্দ্রপ্রতাপ নিজেকে বড়ো একা ও অসহায় মনে করতে লাগলেন। জবা হঠাৎ অসুখে পড়লো। সাধন গিয়ে তার পূর্ব-পরিচিত আশ্রমের ডাক্তারকে নিয়ে এলো চিকিৎসার জন্য। মহেন্দ্রপ্রতাপ খবর পেয়ে থাকতে পারলেন না, তিনি জবাকে দেখতে এলেন। এসে ভাঙা-কাঠের সিঁড়ি দেখেই তো রেগে টঙ; বাড়িওয়ালাকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য তিনি গর্জে উঠলেন। বস্তীতে অমন দীন অবস্থায় জবাকে দেখে তার মেজাজ গেলো আরও চড়ে। ঠিক সেই সময়ে পুরস্কারলোভী জবার মামাতো ভাইয়ের কাছ থেকে খবর পেয়ে জবার কাকাও সেখানে উপস্থিত। তাকেই বাড়ি-ওয়ালা মনে করে মহেন্দ্রপ্রতাপ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন তাকে 'গেট আউট' করে দিতে। কাকাও দমবার লোক নন, তিনিও সমানে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'গেট আউট' বলে। তারপর অবশ্য দুজনের পরস্পরের পরিচয় হলো। পরস্পরের বেয়াই সম্পর্ক পাতানো হলো। এর পরই এলো বাড়িওয়ালা হাসপাতালের এম্বুলেন্সের লোক নিয়ে জবাকে প্লেগ রুগী বলে চালান করে দিতে। এবারে দুই বেয়াই একসঙ্গে তেড়ে গেলেন। বাড়িওয়ালা প্রাণভয়ে দৌড়। মহেন্দ্র-প্রতাপ সবাইকে বাড়িতে এনে একটা ভোজের ব্যবস্থা করলেন। তার জন্যে জবা সেদিন তার বিশেষ প্রিয় সব খাদ্য প্রস্তুত করে নিজে সামনে বসিয়ে দিয়ে গেল। মহেন্দ্রপ্রতাপের লুব্ধ দৃষ্টি, কিন্তু খাবার তোলার জন্য হাতের আঙুলের যেন সায় নেই, টেবিলের ওপর ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে।

* * *

গোড়ার অংশে ঘটনাবলী উপস্থিত

বিষ্ণুপ্রিয়া — দেবকীকুমার বসু প্রযোজিত ও পরিচালিত "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন।

এবং দৃশ্য রচনায় দোষ-ত্রুটি সঙ্গতিরও অভাব। মহেন্দ্রপ্রতাপ ...ত হওয়ার আগে পর্যন্ত সাধনদা ...রখানি সুরচিত ও অতি-সুগীত যা মনকে ধরে রেখে দেয়। কিন্তু ...প্রতাপ আসা থেকে ছবির সে আর ...কৃতি। তরতর গতিতে একটার ...কটা নাটকীয় রসপুষ্ট দৃশ্যের পর উপস্থিত হয়ে লোকের মনে ...ম কৌতুক ও কৌতূহল জাগিয়ে ছবিকে এমনভাবে যবনিকার দিকে টেনে নিয়ে যায় যে, দেখার পর একটি অতি দুর্লভ আনন্দঘন চিত্রসৃষ্টি উপভোগ করার পরম অভিজ্ঞতাই শুধু উপলব্ধি করা যায়। আধাখেঁচড়াভাবে তোলা ছবির যত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি অসঙ্গতি সবই মহেন্দ্রপ্রতাপের হুঙ্কারের দাপটে কোথায় যে তলিয়ে যায়, তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না, আর খুঁজে খুঁজে মনে করে দেখবারও আর ইচ্ছেও জাগে না। আলোকচিত্রগ্রহণ স্ট্যান্ডার্ডের অনেক নীচে, শব্দ অনেক জায়গায় জড়ানো, বিরক্তিকর নায়ক চরিত্র, কিন্তু সে সব নিয়ে অনুযোগ প্রকাশ করার কোন অবকাশই থাকে না ছবিখানি দেখা শেষ হলে। বুনো বাঘের মতো রুক্ষ্ম ও হিংস্র প্রকৃতির মহেন্দ্রপ্রতাপ ছবিখানিকে শুধু বাঁচিয়েই দেন নি, তার হুঙ্কারের পিছনকার শিশুর মতো মন নিয়ে তিনি দর্শকমনকে সম্পূর্ণ জয়ও করে নেন। বলা যেতে পারে, ধীরাজ ভট্টাচার্য একাই মাৎ করে দিয়েছেন। অভিনয়ে আর কারুর নাম যদি করতে হয় তো জবার ভূমিকায় ছন্দা এবং সাধনদার ভূমিকায় স্বর্গত কুমার মিত্রের নাম। ছন্দা অতি সংযত ও দীপ্ত অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়ে তবেই অমন দাপুটে মহেন্দ্রপ্রতাপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছেন এবং সেটা যে কতো বড়ো কৃতিত্ব, তা মহেন্দ্রপ্রতাপের সামনে না পড়লে উপলব্ধি করা যাবে না। অন্যান্য অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে এতে আছেন অবনী মজুমদার, নৃপেন্দ্র মিত্র, নবদ্বীপ হালদার, পশুপতি কুণ্ডু, নৃপতি, ননী মজুমদার, প্রভা দেবী রেবা বসু, করালী, পূর্ণিমা, চিত্রা প্রভৃতি।

* * *

প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই লেখা চারখানি গান ছবিখানির ওপরে মোহ একটু বেশী করে বাড়িয়ে তুলবে। সুরযোজক পবিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং যাঁরা গেয়েছেন, তাঁরা ধন্যবাদ লাভ করবেন অনেকদিন পর সুরেলা মিষ্টি গান শোনবার সুযোগ করে দেবার জন্য। কলাকৌশলের আর কোন দিকের কাজের কোন প্রশংসা করা যায় না। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ করেছেন যথাক্রমে দিব্যেন্দু ঘোষ ও পরিতোষ বসু এবং শিল্পনির্দেশ দিয়েছেন স্বর্গত নির্মল মেহেরা বর্মণ।

খেলার মাঠে

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার অপ্রীতিকর গোলযোগ আদালত পর্যন্ত গড়াইবে বলিয়া যাহা আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম ফলতঃ তাহাই হইয়াছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনের ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণই সর্বপ্রথম কলিকাতা হাইকোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা একতরফা ইনজাংশনের বলে আই এফ এর পরিচালক-মণ্ডলী ও প্রতিযোগিতা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ রোধ করিয়া দিল্লীর ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য দল প্রেরণ করিয়াছেন। এমন কি পাকিস্থানের খেলোয়াড় ফাকরী ও নিয়াজ যাঁহাদের শীল্ড ফাইনাল খেলায় যোগদানের জন্যই এত গোল-যোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহাদেরও পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দলভুক্ত করিয়া দিল্লী প্রেরণ করিয়াছেন। আইনের "মারপ্যাঁচে" সকল সময়েই "হয়কে নয়" ও "নয়কে হয়" করা চলে। সুতরাং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ডুরান্ড কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান হইতে বঞ্চিত করিবার যে দূরভিসন্ধি হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া আমরা এতটুকুও বিস্মিত হই নাই। আদালতে যখন একবার বিষয়টি পৌঁছিয়াছে, তখন ইহার অবসান শীঘ্র হইবে না—এই কথাই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত করিয়াছে। কারণ আদালতের বিভিন্ন দিনের ঘটনা ও তাহার পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুই হইতে পারে, যাহার ফলে "সত্যাগ্রহ", "ধর্ম-ঘট", ইতঃস্ততঃ হাতাহাতি, মারামারি, গুন্ডামি প্রভৃতি হইলে কোনরূপ আশ্চর্য হইবার কিছুই থাকিবে না। খেলার মাঠ ও খেলার প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার পরিবর্তে আমরা কি দেখিতেছি ও কি দেখিব এই কথাই বার বার স্মরণে জাগিতেছে। এই কথা না বলিয়া আমরা পারি না যে, বাঙালার খেলার মাঠের, বিশেষ করিয়া ফুটবল খেলার মাঠের বর্তমানে যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহাতে অন্য কোন স্বাধীন দেশে হইলে জাতীয় সরকার এই খেলা বন্ধ করিয়া দিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করিতেন না। শহরের গন্ডগোল সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দলের পরাজয় ও ব্যর্থতা কেহই আর সহ্য করিতে চাহে না। খেলায় জয়ী হইতে হইবে, রেকর্ড সৃষ্টি করিতে হইবে ইহাই সকল দলের ও সকল দলের সমর্থকদের একমাত্র ধ্যানও জ্ঞান। ইহার ফলে বিভিন্ন স্থান হইতে ভাড়া করিয়া খেলোয়াড় আমদানী করিতে পর্যন্ত সুদূরে পল্লীর দল পরিচালক ইতস্ততঃ করে না। সেই ভাড়া করা দল যদি পরাজিত হয় তখন দেখা দেয় উষ্মা, "মার রেফারীকে", "মার অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের"। প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, তাহা হইলেই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, নির্যাতন, নিপীড়ন। খেলোয়াড়ী মনোভাব বলিয়া কোন কিছু যে আছে বাঙলার মাঠে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিক্ষিত, বয়স্ক লোকেরা পর্যন্ত এই সকল উচ্ছৃঙ্খল, অভদ্র, জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের সমর্থক হইয়া কথায় কথায় বলিয়া থাকেন "দেখে নেওয়া যাবে আদালত আছে।" ইহার পর কি করিয়া বলা চলে যে, বাঙালার খেলার মাঠে পবিত্রতা আছে, প্রীতি ও সৌহার্দ্যের স্থান আছে? এই শোচনীয় অবস্থা একদিনে হয় নাই, এক বৎসরে হয় নাই, দীর্ঘ কয়েক বৎসরে হইয়াছে। দেশের যাঁহারা কর্ণধার তাঁহারা ইহা দেখিয়াও এখনও পর্যন্ত বিভাবে যে নীরবতা অবলম্বন করিয়া আছেন তাহাই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

কলিকাতার ফুটবল খেলার বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি অবলোকন করিয়া বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি এখনও পর্যন্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অদূর ভবিষ্যতের চরম বিশৃঙ্খলতার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নীরবতা ভঙ্গ করা উচিত। এখনও সময় আছে, ইহার পর অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনা অসম্ভব হইবে। আই এফ এ কর্তৃপক্ষগণ আদালতে রীতিমত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন বলিয়া যাহা জানা গেল, তাহা অবস্থা আরও খারাপ করিবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের প্যারিসের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক মিঃ জিয়াউদ্দিনকে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যেও যে রাজনৈতিক চাল নাই তাহা নহে। পাকিস্থানের প্রতিনিধি ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কার্যকলাপের যে জঘন্য চিত্র এই সম্মেলনের সভায় তুলিয়া ধরিবেন তাহা যাহাতে না উঠে তাহার জন্যই স্বধর্মী একজনকে প্রেরণ করা হইয়াছে, ইহা অন্য কেহ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমরা পারি। একটা মিটমাটের ব্যবস্থা হইতে পারে, তবে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তথা ভারতীয় জাতীয় জীবনের উপর কালিমা যে লেপন করা হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আইনবিরুদ্ধ কার্যকলাপ যে হইয়াছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা

আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। হাওড়া জেলা দল এইবারের ফাইন্যাল খেলায় ২—০ গোলে নদীয়া জেলা দলকে পরাজিত করিয়া জেলা চ্যাম্পিয়ানসিপের কাপ লাভ করিয়াছে। হাওড়া জেলা দলের সাফল্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে একটি প্রশ্ন না করিয়া পারি না যে, এইভাবে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনায় কোন সার্থকতা আছে কি? যে সকল খেলোয়াড়গণ কোন দিন জেলার কোন খেলায় কি লীগ, কি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই, তাহাদের হঠাৎ আন্তঃজেলা প্রতি-যোগিতার সময় একত্র করিয়া দল গঠন করিলে জেলার ফুটবল খেলার উন্নতিতে কোনরূপ সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। বরঞ্চ আমাদের আশংকা হয় যে, জেলার বহু উৎসাহী খেলোয়াড়দের ইহাতে বিশেষভাবে হতাশ করা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহারা সারা মরসুম বিভিন্ন দলকে সাহায্য করিল অথচ প্রতিযোগিতামূলক খেলার সময় জেলার দলকে সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল, ইহা সহজভাবে যে গ্রহণ করিতেছে, ইহা পরি-চালকগণ যত জোর গলায় প্রচার করুন না কেন আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিব না। আমরা জানি, বহু খেলোয়াড় এইজনাই জেলার প্রতিযোগিতার সময় দূরে থাকেন।

আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা প্রবর্তনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, জেলার উৎসাহী খেলোয়াড়দের প্রতিনিধিমূলক খেলার জন্য তৈয়ারী করা। কিন্তু যেভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে ঐ উদ্দেশ্য কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না। আমরা এই প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি যে কলিকাতার মাঠে খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের জোর করিয়া আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার সময় নামাইলেই জেলার ফুটবল খেলার কোনই উন্নতি হইতে পারে না। নিম্নে পূর্বের আন্তঃজেলা বিজয়ী দলের নাম প্রদত্ত হইল—

১৯৪৭ সাল—২৪ পরগণা জেলা
১৯৪৮ সাল—চন্দননগর দল
১৯৪৯ সাল—২৪ পরগণা জেলা
১৯৫০ সাল—হুগলী জেলা
১৯৫১ সাল—নদীয়া জেলা
১৯৫২ সাল—২৪ পরগণা জেলা

কেট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃগণ রজত জয়ন্তী উৎসব সাফল্যমণ্ডিত বার উদ্দেশ্যে সারা ভারতের জনগণের মান শোচনীয় আর্থিক অবস্থা বিস্মৃত া বহু অর্থব্যয়ী বৈদেশিক ক্রিকেট দলের ব্যবস্থা করিবার জন্য উদ্যোগী ন একমাত্র আমারাই সাবধান করিয়া জানাই ভ্রমণ সার্থকতা লাভ করিবে না কণ্ট্রোল র্ডের কর্তৃপক্ষগণকে ভ্রমণকারী দলের ট ব্যয়ভার পর্যন্ত পূরণ করা সম্ভব ব না। আমাদের সেই সাবধান বাণীতে । কেহই কর্ণপাত করে নাই। বিশেষ য়া ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্তৃপক্ষগণের া ছিল প্রতিবারের বৈদেশিক ক্রিকেট ন যেরূপ প্রচুর অর্থ সমাগম হইয়াছে, ারেও তাহাই হইবে। কিন্তু তাহা হইতেছে যাহাও বা হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও কারী দলের আমেদাবাদ খেলায় পরাজয় ক্ষ্মৌর প্রথম টেস্ট ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় হিত হইয়াছে। বোর্ডের পরিচালকগণ কিছুটা চিন্তিত হইয়াছেন। ইহার উপর কারী দলের কয়েকজন খ্যাতনামা ায়াড়ও ভ্রমণের শেষ পর্যন্ত অবস্থান বেন না। উহাদের স্থানে যাঁহাদের াইবার চেষ্টা হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে ই আসিতে পারিবেন না। একে দল ড়াতালি দিয়া গঠন করা, তাহার উপর রায় ভাঙ্গাগড়া হইবে, ইহাতে সকলেই র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশা রাখিতে ন না। তবে এই দলকে ভ্রমণ শেষ বার পূর্বেই ফেরৎ পাঠান মোটেই যুক্তি-হইবে না। তাহাতে ভারতেরই দুর্নাম ব। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইতে তীয় কণ্ট্রোল বোর্ডের অব্যাহতি পাইবার াত্র উপায় হইতেছে অস্ট্রেলিয়া অথবা ড হইতে যে কোন উপায়ে হউক দুইজন তিনজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে আনাইবার থা করা।

দিল্লীর টেস্টের নাম পরিবর্তন

আগামী দিল্লীর টেস্ট ম্যাচ দ্বিতীয় টেস্ট ে না হইয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচ হিসাবে ষ্ঠিত হইবে। এমনকি লক্ষ্মৌর প্রথম ম্যাচে ভারতীয় দল যে সকল খেলোয়াড়-লইয়া গঠন করা হইয়াছিল, তাহাও বর্তন করা হইবে। লক্ষ্মৌতে ম্যাটিংয়ে লবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু দিল্লীতে ঘাসের চ খেলা হইবে। সুতরাং পিচ পরিবর্তন ায় দলও পরিবর্তন করিতে হইবে ইহা ই বাহুল্য। পরে কোন এক সময় যদি ম্যাটিং পিচে খেলার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে প্রথম টেস্ট ম্যাচের নির্বাচিত অধিকাংশ খেলোয়াড় খেলিবার সুযোগ পাইবেন। কোথায় সেই খেলা হইবে অথবা হইবেই কিনা তাহা ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ভ্রমণ উপ-সমিতি শীঘ্র স্থির করিবেন।

হোলকার বনাম রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল

রণজি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হোলকার ও রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলার বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, হোলকার দলের প্রথম ইনিংসের শেষ সময় এম জাগদেল ও তরুণ উদীয়মান খেলোয়াড় ধানওয়াড়ে নবম উইকেটে একত্রে ১৩০ রাণ সংগ্রহ করিয়া ভ্রমণকারী দলকে চমৎকৃত করিয়াছে। ভ্রমণকারী দল প্রথম দিনে সারাদিন খেলিয়া ৫ উইকেটে ৪১৭ রাণ করে ও ডিক্লেয়ার্ড করে এই আশায় যে, হোলকার দলকে অবশিষ্ট দুই দিনে সহজে পরাজিত করিবে, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। হোলকার দল দ্বিতীয় দিন সারাদিন খেলিয়া ৮ উইকেটে ২৪৬ রাণ করিলেও তৃতীয় দিনে ৩৫২ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করিয়া ভ্রমণকারী দলের জয়লাভের সকল আশা ও ভরসা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে। ইহা কেবলমাত্র এম এম জাগদেল ও ধানওয়াড়ের একত্রে নবম উইকেটে ১৩০ রাণ সংগ্রহের জন্যই সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে যে, এই ধানওয়াড়েই হোলকার দলকে ফাইনালে পরাজয় হইতে অব্যাহতি দিয়া বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত করে। দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা একদিকে উইকেট রক্ষা করার ফলেই হোলকার দলকে পরাজিত করিবার মত অবস্থা সৃষ্টি করিয়াও বাঙলা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। সেই ধানওয়াড়ে যে রজত জয়ন্তী দলের বিরুদ্ধেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি? খেলার ফলাফল:—

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের প্রথম ইনিংস:—৫ উইঃ ৪১৭ রানে ডিক্লেয়ার্ড (সিম্পসন ১২৫, মার্শাল ৪৩, এমেট ৬৭, ওরেল ৩৬, মিউলম্যান নট আউট ৮২, জি এডরিচ নট আউট ৫০ রান, ধানওয়াড়ে ৯২ রানে ২টি, সারভাতে ৮০ রানে ২টি, অর্জুন নাইডু ৭৬ রানে ১টি উইকেট পান।)

হোলকার দলের প্রথম ইনিংস:...৩৫২ রান (নিভসরকা ৪৯, সারভাতে ৭৬, জে ভায়া ৩১, এম জাগদেল ৬৭, ধানওয়াড়ে ৬১, ওরেল ৬৩ রানে ৩টি মার্শাল ৫৭ রানে ৩টি, রামাধীন ৭১ রানে ২টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল:—৩ উইঃ ১৬৮ রান (সিম্পসন ২৩, গিব ৪১, ব্যারিক ৫৬, মিউলম্যান নট আউট ২৩, এডরিচ নট আউট ১৯, সারভাতে ২৮ রানে ২টি, ডি গাইকোয়াড় ৪৫ রানে ১টি উইকেট পান।

প্রথম টেস্ট ম্যাচের দল

দিল্লীর প্রথম টেস্ট ম্যাচে পুনরায় পলি উমরিগারকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হইয়াছে। তবে দল এখনও সম্পূর্ণভাবে গঠন করা হয় নাই। তবে আমাদের যতদূর ধারণা লক্ষ্মৌর টেস্টের পূর্বের নির্বাচিত দলের মধ্য হইতে ওমপ্রকাশ ও জাসু প্যাটেলকে বাদ দেওয়া হইবে। ইঁহাদের পরিবর্তে এইচ আর অধিকারী ও গোলাম আমেদকে গ্রহণ করা হইবে। তবে ইঁহারা যদি খেলিতে স্বীকৃত না হন, তাহা হইলে কোন দুইজন তরুণ খেলোয়াড়কে গ্রহণ করা হইবে। প্রথম টেস্ট ম্যাচের ভারতীয় দলের সাফল্যের উপর অপর সকল টেস্ট খেলার ফলাফল নির্ভর করিতেছে। এই টেস্টে বিনু মানকড়ের বিশেষভাবেই দলে থাকা উচিত ছিল। তিনি পূর্ব-সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করিলে দলভুক্ত হইতে পারেন না।

অলিম্পিক

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভায় কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে না ইহা আমরা পূর্বেই জানিতাম; সুতরাং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দিল্লীর সভায় উহা পুনরায় স্থগিত করিয়া একটি উপসমিতি গঠন করিতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হই নাই। যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা হইতে স্বার্থান্বেষী কতকগুলি লোককে বিতাড়িত করা না যাইতেছে ততদিন ভারতের এইরূপ এক বিরাট ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের কোন কার্যই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হইতে পারে না। ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে পাণ্ডাগিরি করা, দেশের লোকেদের নিকট হইতে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা ও বিনা পয়সায় দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করা। দেশের খেলাধুলা বা ব্যায়ামের কোন বিভাগের উন্নতি কি উপায়ে হইতে পারে অথবা কিরূপ ব্যবস্থা করিলে উৎসাহী খেলোয়াড়, এ্যাথলীট, সাঁতারু, মল্লবীর, ভারোত্তোলনকারী প্রভৃতি দেশের সুনাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এই বিষয় এতটুকুও চিন্তা করেন না। ক্ষমতালাভ ইঁহাদের একমাত্র ধ্যান ও জ্ঞান। এইজনাই আমাদের মনে হয়, ভারত সরকারের উচিত এই বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড বা সংস্থা গঠন করিয়া দেওয়া।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২রা নবেম্বর—পাকিস্থান গণপরিষদে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, পাকিস্থান ঐশ্লামিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হইবে।

রেলওয়ের অর্থনৈতিক কমিশনার শ্রী পি সি ভট্টাচার্য আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, রেলওয়ে বোর্ড প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাহির হইতে ৭৫০টি ইঞ্জিন আমদানী করিতেছেন। জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও জাপানে ইতোমধ্যেই কতকগুলি ইঞ্জিনের ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে।

নগদ ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়া কলিকাতার জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশুসন্তানকে দুর্বৃত্তগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, শিশুটি গত ২৪শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে অপহৃত হয় এবং প্রায় একমাস পরে বৃন্দাবন হইতে তাহাকে উদ্ধার করা হয়।

অদ্য লক্ষ্ণৌ শহরের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগের সংবাদ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার ও কোষাধ্যক্ষের কুশপুত্তলিকা লইয়া মিছিল বাহির করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আজ কাণপুরের ছাত্রেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং কাণপুর শহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়।

৩রা নবেম্বর—আজ পাকিস্থান গণপরিষদে আগামী ২৫ বৎসরের জন্য সংবিধানের আওতা হইতে সর্বপ্রকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক আইনকে বাদ দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪ঠা নবেম্বর—বিগত জুলাই মাসে কলিকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় সাংবাদিকদের কার্যে বাধাদান ও ২২শে জুলাই ময়দানে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার ও প্রহারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত কমিশন কলিকাতা পুলিশকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। অদ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত রিপোর্টের অংশবিশেষ প্রকাশ করেন।

বিপুলসংখ্যক দর্শক সাধারণের সমাবেশে আজ প্রাতে কলিকাতায় গড়ের মাঠে হেলিকপ্টার বিমানের কসরৎ প্রদর্শিত হয়।

ভারত সরকার ডফলা খণ্ডজাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতঃপূর্বেই গুসার-স্থিত সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, সৈন্যবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কিছু সংখ্যক প্যারাসৈন্য নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

৫ই নবেম্বর—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী প্রশাসনের এক বিবৃতিতে আজ বলা হইয়াছে যে, ২২শে অক্টোবর তারিখে আবর পাহাড় অঞ্চলে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয় উহাতে আসাম রাইফেল বাহিনীর ৬ জন এবং অসামরিক সরকারী কর্মচারী ৪জন নিহত হইয়াছে, আসাম রাইফেল বাহিনীর ১৩জন সৈন্যের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্থানের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পাঁচ শ্রেণীর উদ্বাস্তুকে অন্তবর্তিকালীন ক্ষতিপূরণ দিবার পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন।

অদ্য লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌর অবস্থা স্বাভাবিক হইয়াছে এবং নৈশ কার্ফু প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

৬ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৭ই নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব সরকারের নূতন দপ্তর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

আজ মেদিনীপুরে ডাঃ অমিয়কুমার বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় চিকিৎসা সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়।

৮ই নবেম্বর—নংগল ও ডাকরা পরিকল্পনার সংগে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মচারীদের এক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসংগে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, আমরা চাই নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে এবং যথাসম্ভব দ্রুত ইহার বিকাশ করিতে। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশ ১০০ বৎসরে যাহা করিয়াছে, আমরা ১০ বৎসরে তাহা করিতে চাই।

বিদেশী সংবাদ

২রা নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটিতে বৃটিশ রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ সেলউইন লয়েড বলেন, ব্রহ্মে ১২ হাজার চীনা সৈন্যের মধ্যে মাত্র দুই হাজার অপসারণ করিয়াই নৈতিক দায়িত্ব শেষ করা হইয়াছে মনে করা জাতীয়তাবাদী চীনের পক্ষে অন্যায়।

৩রা নবেম্বর—অদ্য বৃটিশ পার্লামেন্টের উদ্বোধনকালে রাণী এলিজাবেথ চিরাচরিত প্রথায় বক্তৃতাদানকালে ঘোষণা করেন যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়কগণের মধ্যে যথাশীঘ্র বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য এখনও চেষ্টা করিতেছে। প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল বলেন যে, রুশ নায়কের সহিত সাক্ষাৎকার আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ হইতে পারে বলিয়া তিনি এখনও বিশ্বাস পোষণ করেন।

৪ঠা নবেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার আজ এই অভিযোগ করেন যে সোভিয়েট সরকার জার্মানী ও অস্ট্রিয়া সম্পর্কে চতুঃশক্তি বৈঠকে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। তিনি বলেন, জার্মানী সম্পর্কে এই মাসে লুগ্যানে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স যে প্রস্তাব করিয়াছে, তৎসম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়া সর্বশেষ যে নোট দিয়াছে তাহাতে ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে বলা যায়।

৬ই নবেম্বর—অদ্য ট্রিয়েস্তের রাজপথে জনতা ও পুলিশের মধ্যে বন্দুকের লড়াই চলিবার পর পুলিশ রাত্রিকালে সমগ্র ট্রিয়েস্ত নগরীতে অবরোধ সৃষ্টি করিয়া রাখে। মিত্রপক্ষীয় দখলকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গত দুই দিন যাবৎ হামলা চলিতেছে। আজ বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী ইতালীয়রা বৃটিশ পরিচালনাধীনে পুলিশ বাহিনীর প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে প্রকাশ্যভাবেই বন্দুকের লড়াই আরম্ভ হয়।

৬ই নবেম্বর—হিন্দ নগরের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন, বৃটিশ ও দক্ষিণ কোরীয় যুদ্ধবন্দীরা অদ্য তিনজন ভারতীয় সামরিক অফিসারকে চার ঘণ্টার অধিককাল যাবৎ প্রতিভূস্বরূপ আটক করিয়া রাখে।

আজ সারাদিন ট্রিয়েস্তের রাজপথে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলে।

৮ই নবেম্বর—আজ ব্রহ্ম হইতে দুই হাজার চীনা জাতীয়তাবাদী সৈন্যের অপসারণকার্য আরম্ভ হয়।

আজ সুলতানাবাদ দুর্গে পারস্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মোসাদেকের বিচার আরম্ভ হয়। ডক্টর মোসাদেক আদালতের ক্ষমতা অস্বীকার করেন এবং নিজেকে আইনসম্মত প্রধান মন্ত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন।
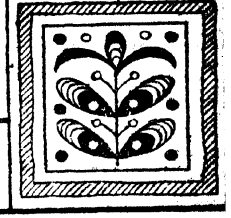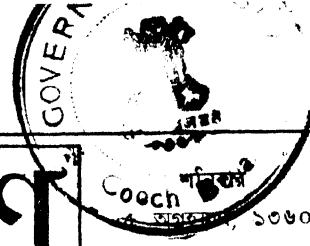
প্রতি সংখ্যা—৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাংগ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ম্পাদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

ক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ন্তাবিত পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি বন্ধে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে ধ্য হইয়াছেন যে, ইহা ভারত এবং শিয়ায় দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি রবে। বহুদিন যাবতই পাকিস্থান এবং মেরিকার মধ্যে একটা সামরিক চুক্তি পাদনের প্রচেষ্টার কথা শুনা যাইতে-ল, অধুনা ব্যাপারটা এতদূরে অগ্রসর য়াছে যে, পাণ্ডিতজী শান্ত ও ক্ষিপ্তভাবে ভারত এবং এশিয়ার পক্ষ তে এই সতর্কবাণী ঘোষণা করিবার য়োজনীয়তা বোধ করিয়াছেন। ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিবার উপায় নাই। ১৯৫০ লে জনাব লিয়াকৎ আলী যখন মেরিকা-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সেই ময়েই এই সামরিক চুক্তির কথাটা প্রথম ানা যায়। 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থায়' াকিস্থানকে টানিবার মার্কিণ-প্রচেষ্টার থা তো সর্বজনবিদিত, পাক-পররাষ্ট্র চিব জনাব জাফরুল্লা তো দলে ভিড়িবার ছাটা প্রকাশ্যেই একরূপ ব্যক্ত করিয়া লিয়াছিলেন, কিন্তু আরব-রাষ্ট্রগোষ্ঠীর রোধিতার দরুণ উক্ত প্রতিরক্ষা-সংস্থাটি স্তবে আকার নিতে পারে নাই। তাই কক পাকিস্থানের সংগে একটা ব্যবস্থা রিবার প্রয়োজন আমেরিকা বোধ রিয়াছে। ব্রিটিশ ও মার্কিন পত্রিকা-মূহের বিবরণ হইতে প্রস্তাবিত সামরিক ক্তি সম্পর্কে যে বিশেষ একটা প্রচেষ্টা লিয়াছে, তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। হু মার্কিন সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিমধ্যে পাকিস্থান ভ্রমণে আসিয়া গিয়াছেন। আর পাক সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চীফ এই ব্যপদেশে তুরস্ক ও লণ্ডন ভ্রমণ শেষ করিয়া আমেরিকায় সামরিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাসমূহ পরি-দর্শনে যখন রত ছিলেন, তখনই পাক-গভর্ণর জেনারেল গোলাম মহম্মদ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সংগে সাক্ষাৎ করেন। সমস্ত ঘটনা একই ইংগিত করে যে, পাক-মার্কিন একটা সামরিক চুক্তির প্রস্তাব অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। তাই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এই বিষয়ে সংশিলষ্ট পক্ষসমূহকে সতর্ক করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আপন পররাষ্ট্রনীতি ইচ্ছামত পরি-চালিত করিবার স্বাধীনতা স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্থানের অবশ্যই আছে, ইচ্ছা হইলে এমন কি আপন স্বাধীনতাও পাকিস্থান অপরের নিকট বন্ধক দিতে পারে, কিন্তু পাকিস্থানের নীতি ও কর্মব্যবস্থার যে প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, সে সম্বন্ধে ভারত নিশ্চয় চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। এই প্রস্তাবিত চুক্তির দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ভারতে এবং সমগ্র এশিয়ায় দেখা দিতে বাধ্য, কারণ উভয়ের স্বার্থ ইহার সংগে বিশেষভাবে জড়িত। খবর প্রকাশিত হইয়াছে যে, এই চুক্তিবলে পাকিস্থান আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর সামরিক সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, বিনিময়ে আমেরিকা পাইবে পাকিস্থানে সামরিক ঘাঁটি। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' লিখিয়াছেন, গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক প্রভাব ও প্রতি-পত্তি রক্ষার জন্য বেলুচিস্তানই হইবে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ বিমানঘাঁটি। পশ্চিমে তুরস্ক এবং পূর্বে সিংগাপুর এই দুই ঘাঁটির মধ্যবর্তী ফাঁকটুকু পূরণের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনই পাকিস্থানে ঘাঁটি পাইলে সিদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য, আমেরিকার আত্মরক্ষার জন্য পাকিস্থানে মার্কিন ঘাঁটির প্রয়োজন করে না, ভাবী বিশ্বযুদ্ধকে সম্মুখে রাখিয়াই এই প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থা। এই সামরিক চুক্তি তথা ঘাঁটির একমাত্র অর্থ হইতে পারে আক্রমণাত্মক। ইহার অর্থ দক্ষিণ এশিয়াকে দুই শক্তিগোষ্ঠীর শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্ররূপে পরিণত করা। ইহার অর্থ আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন করে না। পাকিস্থান হয়তো মার্কিন সামরিক সাহায্যে বর্ধিতশক্তি হইয়া কাশ্মীর-সমস্যার একটা মনোমত সমাধান লাভ করিবে বলিয়া প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবে। ছয় বৎসরেও কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান কেন যে ইংগ-মার্কিন পক্ষ হইতে দেন নাই, ইহার একটা কারণ এখন আরও স্পষ্ট হইয়াছে। কাশ্মীরে কোন ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ মার্কিনকে দিবার অধিকার পাকিস্থানের নাই, ইহা পণ্ডিতজী স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন। কাজেই, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি পাকিস্থানের কাশ্মীর-প্রাপ্তি অনায়াস ও সহজ করিবে, এই স্বপ্ন পরিত্যাগ করিতেই পাক-নায়কবৃন্দকে পণ্ডিত নেহরু ইংগিতে পরামর্শ দিয়াছেন। ভারত

এবং এশিয়ার প্রতিবাদ ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা করিয়া মার্কিনশক্তি যদি ইহার পরেও অগ্রসর হয়, তবে সে হঠকারিতার পরিণাম শুধু এশিয়াই নহে সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই ভয়াবহ হইবে। তাহা পণ্ডিত নেহরু সময় থাকিতেই আমেরিকাকে সতর্ক করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ইসলামী রিপাবলিক

পাকিস্থান গণপরিষদ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাষ্ট্রের নাম হইবে 'ইসলামী রিপাবলিক পাকিস্থান।' তাঁহারা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্যাকিস্থানের রাষ্ট্রপ্রধান কখনো অমুসলমান হইতে পারিবেন না, পাকিস্থানের কোন আইন-সভায় এমন কোন আইন প্রণয়ন হইতে পারিবে না যাহা কোরাণ এবং সুন্না-বিরোধী, পাকিস্থানে হিন্দু ও অপরাপর মাইনরিটির জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা থাকিবে এবং হিন্দু সমাজেও বর্ণ ও তপশীলী এই দুই ভাগে স্বতন্ত্র ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র রচনা যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতেই তুরস্কের প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দল শঙ্কিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, পাঁচশত বৎসর চেষ্টা ও পরীক্ষার পর তুরস্ক যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই ইসলামী রাষ্ট্র গঠন-স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর প্যাকিস্থানকে পাইয়া বসিয়াছে। তুরস্কের নেতৃবৃন্দ পাকিস্থানকে জানাইয়াছেন যে, ধর্মকে রাষ্ট্রের ত্রিসীমানা হইতে দূরে রাখিতে হইবে, 'ইসলাম ও কোরাণের যথার্থ স্থান মসজিদ, রাষ্ট্রতন্ত্র ও রাষ্ট্রপরিষদ নহে।' সর্বশেষে তাঁহারা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, গণতন্ত্রবিরোধী এই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্থান এশিয়ার অগ্রগতির মস্ত অন্তরায় হইয়া দেখা দিবে, 'ইসলামী রিপাবলিক পাকিস্থানের আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে কোন স্থানই থাকিতে পারে না।' একটি মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া হইতেও 'ইসলামী রিপাবলিক পাকিস্থান' সম্পর্কে ঠিক এই একই মন্তব্য ও আশঙ্কা জানানো হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার জনমত স্পষ্ট ভাষাতে এই কথাই জানাইয়াছে যে, পাকিস্থান যে রাষ্ট্রীয় মূর্তি গ্রহণ করিতে চলিয়াছে, তাহা ভারত এবং সমগ্র এশিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক। ইন্দোনেশিয়া এই প্রসঙ্গে পাকিস্থানের দেড় কোটি মাইনরিটি সম্পর্কে যে নীতি গৃহীত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিশ্লেষণের পর মন্তব্য করিয়াছে যে, ইহা 'নিগ্রো-নিপীড়ন নীতিরই পুনরাবৃত্তি।' ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মগ্ন হইয়াছে এবং মাইনরিটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বে ঠেলিয়া দিয়া পাকিস্থান যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ভারত এবং পাকিস্থানে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে। পণ্ডিত নেহরুর উক্তির গুরুত্ব পাক-নেতৃবর্গ উপলব্ধি করিবেন, সে আশা নাই। ভারত-বিভাগের মূল ভিত্তিই এই পাক-নীতি দ্বারা অপসৃত হইয়াছে, কিম্বা নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি লঙ্ঘিত হইয়াছে, ইহাও পাকিস্থানকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কোন লাভ নাই। পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং কায়েদে আজম জিন্না পাক-গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে তাঁহার প্রথম ভাষণেই ঘোষণা করিয়াছিলেন—'পাকিস্থান রাষ্ট্রে মুসলমান, হিন্দু ইত্যাদি বলিয়া কিছু নাই, আছে শুধু নাগরিক এবং সমান নাগরিক।' তাঁহার নীতি ও আদর্শশুদ্ধ কায়েদে আজম জিন্নাকেই আজ পাকিস্থানের নায়কবৃন্দ কবরচাপা দিয়াছেন, পণ্ডিতজীর বন্ধুত্বপূর্ণ উক্তি সেখানে অরণ্যে রোদনের অধিক ফলপ্রসূ হইতে পারে না।

পরলোকে ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু

ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ মর্মাহত হইয়াছি। স্বর্গত জানকীনাথ বসু মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র সুনীলচন্দ্র নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ ছিলেন। হৃদ্-রোগের বিশেষজ্ঞরূপে সর্বভারতে সুনীলচন্দ্র বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল, বসু পরিবারের সৌজন্য, অমায়িকতা এবং সর্বোপরি মানবতার উদার অনুভূতির সুনীলচন্দ্র সুযোগ্যভাবে অধিকারী ছিলেন। প্রীতি ও ভালবাসায় তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রাজ্যে সংখ্যালঘুর ভাষা

খড়্গপুরে আহূত নিখিল ভারত ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্মেলনের অনুষ্ঠানে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেই বিশেষ-ভাবে আলোচনা হইয়াছে। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁহার অভিভাষণে সংখ্যালঘুর ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য উক্তি করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের নীতিকে যতটাই সার্থক করিয়া তোলা সম্ভব হোক্ না কেন, বিভিন্ন রাজ্যগুলি কিছুতেই একভাষিক রাজ্যে পরিণত হইবে না। প্রত্যেক রাজ্যে কিছু না কিছু ভিন্ন ভাষী জনসমাজ বর্তমান থাকিবেই। সম্মেলনের সভাপতি মহাশয়ের অভিমত এই যে, এইরূপ অবস্থায় প্রত্যেক রাজ্য সংখ্যালঘু সমাজের জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া সেই সমাজের মাতৃ-ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তন করা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সমস্যার পূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা নাই। কারণ বিভিন্ন রাজ্যে যদি বিভিন্ন ভাষা-গত সংখ্যালঘু সমাজ বিশেষ একটি বা কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত থাকিত তবেই এই ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান কিছুটা সম্ভব ছিল। কিন্তু ভাষাগত সংখ্যালঘু সমাজ রাজ্যের সর্বত্র সাধারণ অধিবাসীর মতই ছড়াইয়া অবস্থান করে, কোথাও তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য এবং কোথায়ও তাহাদের সংখ্যা পরিমাণে কিছু উল্লেখযোগ্য। সুতরাং রাজ্যের নিম্নতম ও উচ্চতম প্রত্যেক শিক্ষালয় একাধিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের রীতি প্রবর্তিত রাখিবার কার্য অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এই প্রশ্নের সমাধানে জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য।
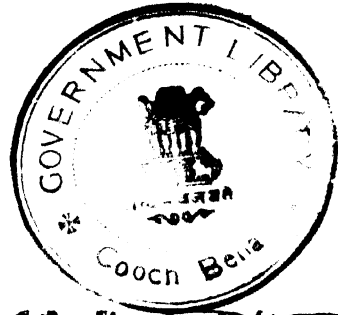
১।১০।১৯৪০

স্কেচ: শ্রীনন্দলাল বসু

ভিজে ভোর

দিনেশ দাস

ছ'দিন আগুন জ্বলে। ঠিক তারপরে
রবিবার ছুটিবার ভিজে-ভোর আনে।
চোখে মুখে ভিজে রোদ ভিজে হাওয়া ঝরে,
অলস তরল ভিড় চায়ের দোকানে।

পথে মোড়ে রকে তর্কের তুফান বাড়ে,
হঠাৎ হালকা খুশি উপ্‌চিয়ে পড়ে,
রুপালি মাছের ঘাই দিয়ে লেজ নাড়ে
ঘরে ফিরে জোট বাঁধে একা খেলা করে।

ছ'টি গদ্য লাইনের হ'লে মাথা হেঁট
সহসা সপ্তম ছত্র ছন্দে পরিণত—
একটি লাইনে যেন একটি সনেট।

বাঁধো এই লাইনের কয়টি অক্ষর
অনন্ত কালের কোলে মিনারের মত—
সূর্যের সময়ে এক অনন্ত প্রহর॥

বৈদেশিকী

মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকি-
নর মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি
াদনের উদ্দেশ্য নিয়ে কথাবার্তা
হ, তবে এখনো নাকি পাকাপাকি
় হয়নি। কিন্তু পাকাপাকি হতে হয়ত
বেশি বিলম্বও হবে না। এই
র ভিতর পাকিস্তানে মার্কিন ঘাঁটি
নের সর্ত থাকারও সম্ভাবনা আছে।
সংবাদে ভারত সরকার স্বভাবতঃই
ন্ত চিন্তিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী
ডত নেহরু গত রবিবার এক সাংবাদিক
য় বলেছেন যে, এইরকম চুক্তির ফল
ত দক্ষিণ এশিয়ার পক্ষে এবং
ষকরে ভারত ও পাকিস্তানের পার-
রক সম্বন্ধের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর
সুদূরপ্রসারী হবে। পাকিস্তান
মরিকার সংগে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ
া, বিশেষকরে পাকিস্তানে মার্কিন
ট স্থাপনের ব্যবস্থা হলে সামরিক
টকোণ থেকে সমস্ত দক্ষিণ এশিয়ার
স্থিতির অর্থাৎ strategic situa-
n-এর একটা বৃহৎ মৌলিক পরিবর্তন
। দুই শক্তি-রকের দ্বন্দ্বের বাইরে
ডত নেহরুর কল্পিত "Third
ea"-র সম্ভাব্য সীমানা আরো
চিত হয়ে যাবে, "ঠাণ্ডা যুদ্ধের"
র সবদিকে ভারতবর্ষকে ঘিরে এগিয়ে
সবে। এ-তো গেল একদিককার বিপদ
বশান্তির দিক থেকে। এ ছাড়া
শেষ করে ভারতবর্ষের নিজের একটা
পদ উপস্থিত। যদি আমেরিকার
হায্যে পাকিস্তানের সামরিক বলবৃদ্ধি
তে থাকে তবে ভারতবর্ষের পক্ষে
াসীন থাকা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়েই
হ'লে সেই অনুপাতে ভারতবর্ষকেও
জের সামরিক বলবৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে
ব। সে একটা বিকট সমস্যা, কারণ,
া দেশের থেকে এই উদ্দেশ্যে আর্থিক
হায্য না নিয়ে মার্কিন-সাহায্যপুষ্ট
কিস্তানের সংগে অস্ত্র-সজ্জার প্রতি-
গিতায় নামতে হলে ভারতের বর্তমান
চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদির
র্থনৈতিক ভিত্তি টিকিয়ে রাখা দায়
ব।

পাকিস্তানের সংগে এইরকম চুক্তি
তে গেলে ভারত গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত
অসন্তুষ্ট হবেন, মার্কিন কর্তৃপক্ষ একথা জেনেই এ-পথে অগ্রসর হয়েছেন। পাকিস্তান যদি নিজের এলাকার মধ্যে আমেরিকাকে ঘাঁটি স্থাপন করতে দিতে রাজী হয় তবে ভারতবর্ষের আপত্তি মার্কিন কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করবেন, এরূপ আশা করা যায় না। মার্কিন সরকার ভারতবর্ষের অসন্তুষ্টির ভয় বেশি কিছু করেন ব'লে মনে হচ্ছে না। এই থেকেই বুঝা যায়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক মর্যাদার পরিনাম কী। কার্যতও

ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট হয়ে এমন কী করতে পারে যাতে আমেরিকা ভয় পাবে? আমেরিকা পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করলে ভারতবর্ষ রাগ করে কম্যুনিস্ট পক্ষে চলে যেতে পারে এরূপ ভাবরার কোনো কারণ তো নেই। বড়ো জোর আন্তর্জাতিক বাগবিতণ্ডায় ভারতবর্ষ নিজের "নিরপেক্ষতার" সুর আরো একটু চড়াতে পারে। তা সে আমেরিকার সয়ে গেছে। ভারতবর্ষ যেমন ইউনো'তে ক্ষেত্রবিশেষে আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারে তেমনি আমেরিকাও তার দরকার মতো ভারতবর্ষকে যতদূর সম্ভব বে-খাতির করতে পারে। কোরিয়ার রাজনৈতিক কনফারেন্সে ভারতবর্ষকে আমন্ত্রণ করা না-করার বিতর্কে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসবে কিছু আসে যায় না। কোরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের কী রকম আকুলি বিকুলি, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে মার্কিন ঘাঁটির চেন ক্রমশঃ লম্বা হয়েই চলেছে তার জন্য কি কোনো আপত্তি করা সম্ভব হয়েছে? সে চেন স্পেন-গ্রীস-তুর্কী হয়ে পুবে এগুচ্ছে, এগুবেই। একেবারে ঘরের পাশে এসে পড়ল বলে অস্বস্তি-বোধ হতে পারে কিন্তু ভারত গভর্নমেণ্ট করবেন কী? রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থাকাও তো কঠিন, আমাদের বড়ো বড়ো পরিকল্পনাও যে সব মার্কিন অর্থনৈতিক ও অন্যান্যপ্রকার সাহায্যের সূত্রে বাঁধা।

যে-বিপদ পাকিস্তান ডেকে আনছে সেটা তার পক্ষেও পরিণামে সাংঘাতিক হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেকথা তাকে বুঝায় কে? পাকিস্তানের বর্তমান শাসককুল পাকিস্তানকে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে যে, এখন এইরকম কিছুর দ্বারাই তারা নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখার একমাত্র উপায় বলে মনে করছে। অবশ্য পাকিস্তানে বহু লোক বুঝছেন যে, এ-পথ মঙ্গলের পথ নয়। মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ কোনো কোনো দল ইতিমধ্যে প্রতিবাদের আওয়াজও তুলেছে কিন্তু এদের প্রতিবাদ কতদূর কার্যকরী হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ জনসাধারণকে বুঝানো হবে যে এই পথেই পাকিস্তানকে একটি প্রবল সামরিক শক্তিরূপে গড়ে তোলা সম্ভব, যাতে ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সব দাবী মানতে বাধ্য হবে। ভারতবর্ষ থেকে যে আপত্তি উঠেছে এইটাই প্রস্তাবিত চুক্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হিসাবে পাকিস্তানের সাধারণ লোকের সামনে ধরা হবে, তাদের বলা হবে যে, পাকিস্তানের বলবৃদ্ধি হবে এইজন্যই ভারতবর্ষ এই চুক্তির প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে। অন্ধ ভারত-বিদ্বেষের প্রোপাগান্ডার বন্যায় সুবুদ্ধি ভেসে যাবে বলেই মনে হয়।

এই অমঙ্গল প্রতিরোধের একটা চরম চেষ্টা ভারতবর্ষ করতে পারে, কিন্তু সেটা বর্তমান ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। সাধারণ কূটনৈতিক প্রতিবাদে আমেরিকা ভ্রূক্ষেপ করবে, সে আশা নেই। সুতরাং ভারতবর্ষকে এমন কিছু করতে হবে যাতে এই বিষয়টি সারা পৃথিবীর সামনে একটা বড়ো নৈতিক প্রশ্ন—issue-রূপে প্রতিভাত হয়। ভারতবর্ষের উচিত অবিলম্বে সমস্ত বারোয়ারী "শান্তি প্রচেষ্টা" থেকে সরে আসা। কোরিয়াতে "শান্তি" হবে আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-প্রাচ্যে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের নক্সা আঁকা হবে—এই প্রতারণার সঙ্গে ভারতবর্ষ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুক। ভারতবর্ষের ঘোষণা করা উচিত যে, যদি দক্ষিণ এশিয়ায় এই ধরণের সামরিক চুক্তির কারবার চলে তবে ভারতবর্ষ অবিলম্বে কোরিয়ার Neutral Nations Repatriation Commission-এর কাজ ছেড়ে দিয়ে কোরিয়া থেকে ভারতীয় রক্ষীবাহিনী ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। ভারত গভর্নমেণ্টকে তাহলে কনস্টিটিউশন্যালিজম-এর মিহি বুলি ত্যাগ করে কেবল ভারতবর্ষের নয়, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরও ডাক দিতে হবে এইরকম চুক্তির প্রতিরোধে। কিন্তু তাতে মুশকিল আছে। পুনর্গঠনের জন্য তাহ'লে বিদেশী সাহায্যের আশা ত্যাগ করতে হবে। তাহলে বর্তমান অনেক পরিকল্পনারই রূপান্তর আবশ্যক হবে। আমেরিকার সাহায্যের পরিবর্তে অন্য বিদেশী সাহায্যের আশা নিয়ে এপথে যাওয়া চলবে না। মোটকথা তাহলে ভরত গভর্নমেণ্টকে একেবারে একটা নূতন দৃষ্টি দিয়ে সব দেখতে হবে এবং এযাবৎ তাঁরা দেশের পুনর্গঠনকল্পে যে নীতি অনুসরণ করে এসেছেন কোনো কোনো দিকে তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তা কি তাঁরা পারবেন? যদি না পারেন, তবে যা হবে তা কল্পনা করা যায়—প্রথম আপত্তি জানানো হবে, তারপর ধরে নেয়া হবে যে, ব্যাপারটা ঘটবেই—ঠেকানো যাবে না, তারপর আমেরিকার সঙ্গে একটা আপোষ বন্দোবস্ত, অর্থাৎ পাকিস্তানের অস্ত্র-সজ্জা যদি বৃদ্ধি পায় তবে সেই অনুপাতে ভারতবর্ষেরও বাড়াতে হবে, তার খরচটা কোনোরূপে আদায় করা।

১৮।১১।৫৩

॥ দুই ॥
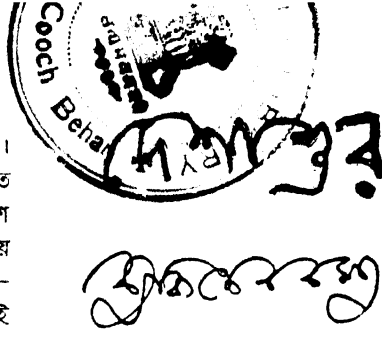
তি নটের সময় প্লেন ছাড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে জানতে [পার]লাম যে আমরা উঠে এসেছি তেত্রিশ [হাজা]র ফুট উঁচুতে, চলেছি ঘণ্টায় প্রায় [সাড়ে]-চারশো মাইল। জানতে পারলাম— [অর্থা]ৎ মানে, খবর হিসেবে জানলাম, এই [খব]রটা অন্য কারো সম্বন্ধে হ'লেও ক্ষতি [ছি]লো না। যেমন আমরা কাগজে পড়ি [যে] অমুক বৈজ্ঞানিক পার্থিব বায়ুমণ্ডল [অতি]ক্রম ক'রে বহু ঊর্ধ্বে বিহার ক'রে [এসে]ছেন, এও প্রায় সেই রকমেরই জানা। [তে]ত্রিশ হাজার, সাড়ে-চারশো', এই [কথা]গুলো আমাদের বুদ্ধির খাতায় [নির্লি]প্তভাবে টুকে নিলাম শুধু, উদাস[ভাবে] ব তথ্যের ঝুলিতে পুরে নিলাম, তার [রোমা]ঞ্চ, তার উত্তেজনা, তার ইন্দ্রিয়গত [উপল]ব্ধি—সমস্তই বাদ গেলো, এবং বাদ [গে]লো ব'লেই সম্ভব হ'লো ঘটনাটা। [এভা]রেস্টের চুড়োর চেয়েও উঁচুতে উঠে [যে] আমরা যে সুস্থ শরীরে টিঁকে [আ]ছি, স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিচ্ছি, [তা]ই বোঝা যায় কোথাও একটা ফাঁকি [আ]ছে। সেটা এই যে এরোপ্লেনের [ভি]তরকার আবহাওয়া সযত্নে নিয়ন্ত্রিত: [বাই]রে যদিও নির্বাত হিমলোক, তবু [এই] মস্ত ফাঁপা নিরেট মাছটার পেটের [ভিত]রে ঠিক ততটাই তাপ আছে, হাওয়া [আ]ছে, যতটা পাওয়া যায় সাড়ে-সাত [হাজা]র ফুট উঁচুতে উঠলে। অর্থাৎ, ঐ [তে]ত্রিশ হাজারটাই ফাঁকি, কথার কথা, [আম]রা আবহাওয়ার হিশেবে—যদিও আর[কো]নো হিশেবেই নয়—আছি মাত্র উটকা[মা]ড, কোনো শৈলশৃঙ্গে প্রথম পৌঁছবার [সম]য়ই হঠাৎ শীতের সুখকর স্পর্শটুকু [পা]ওয়া যাচ্ছে। তেমনি, ঐ সাড়ে-চারশো [মাই]লটাও আছে শুধু খাতায়-পত্রে, [পাই]লটের পঞ্জিকায়, আসলে আমরা [স্প]ন্দমান, শব্দায়মান নিঃস্রোত একটা [গতি]হীনতার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে আছি।

যে-প্লেনটায় চলেছি সেটা বিমান[বিজ্ঞা]নের ইদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে [খ্যা]ত, 'কমেট'-উপাধিধারী ব্যোমযান। [এই] যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হবার পর থেকে, বিশেষত কলকাতার কাছেই সম্প্রতি একটি বিরাট অপঘাত ঘ'টে যাওয়ায়, এইটে নিয়ে কাগজে এবং লোকমুখে বিস্তর আলোচনার প্রচার হয়েছে। বোধহয় ঐ অপঘাতের পর থেকে লোকেরা একটু বাঁকা চোখে এর দিকে তাকিয়ে থাকে, তাই এর গৌরবের কথা আরো বেশি চেঁচিয়ে বলার প্রয়োজন হ'লো। অন্তত কলকাতায় আমার ভ্রমণের ব্যবস্থার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিলো, তাঁরা, নিজেরা মার্কিণ হওয়া সত্ত্বেও, এই ইংরেজ তরণীর প্রশংসায় সুপ্রচুর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের মুখে শুনেছিলুম যে এই যান্ত্রিক ধূমকেতুর গতি নিঃশব্দ এবং স্পন্দনহীন, আভ্যন্তরীণ আরাম বিষয়েও নাকি অন্য কোনো নভোচারীর সঙ্গে তুলনাই হয় না। শুনে ভেবেছিলুম কী জানি কী ব্যাপার, দেখে নিরাশ হ'তে হ'লো। দেখতে-শুনতে (শুনতেও) অন্য যে-কোনো প্লেনেরই মতো, গড়নে এবং কলকব্জায় কিছু তফাৎ থাকলেও যাত্রীদের জন্য তেমনি আঁটোসাঁটো নিক্তি-মাপা ব্যবস্থা, সংকীর্ণ পরিসর, স্তম্ভিত সময়। আওয়াজ এবং আন্দোলন একটু হয়তো কম হয়, কিন্তু হয় না বললে অত্যুক্তিরও বেশি হ'য়ে পড়ে, সত্যের অপলাপ ঘ'টে যায়। অবশ্য ইনি একাধিক অর্থেই সবচেয়ে উন্নত তাতে সন্দেহ নেই, এত উঁচুতে আর-কোনো প্লেন উঠতে পারে না, এমন বেগও অন্য কোনোটার নেই, কিন্তু আগেই বলেছি—আপনার আমার তাতে কিছুই এসে যায় না। প্লেনে উঠে বসার পর সেটা ঘণ্টায় দু-শো মাইলই চলুক আর পাঁচশো মাইলই চলুক, আমাদের পক্ষে একই কথা, আমাদের অনুভূতি, অর্থাৎ অনুভূতির অভাবটা ঠিক একই রকম। যখন তিরিশ-হাজারি ঊর্ধ্বলোকে ইন্দ্রসভার গা ঘেঁষে চলেছি, আর যখন মাত্র পনেরো কিংবা কুড়ি হাজার ফুটে কিন্নরলোকে বিরাজ করছি, এ দুটো অবস্থার মধ্যেও কোনোরকম প্রভেদ বোঝার উপায় নেই। অতএব, যা-ই বলুক না বিজ্ঞাপনে, আপনি কোনদিক থেকে জিতলেন সেটা ঠাহর করা খুব শক্ত। এক, কলকাতা-লণ্ডন পাড়ি দিতে আপনার জীবনের সাত-সাতটি মহামূল্য ঘণ্টা আপনি বাঁচাতে পারলেন, এই অদৃশ্য এবং নির্বস্তুক লাভের থলিটাকে কোলে আঁকড়ে নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ সুখী হবার চেষ্টা করা যেতে পারে—তবে ঐ সাত ঘণ্টা সময় কোন কারণে মহামূল্য, সেটা বাঁচিয়েই বা আপনার কী সার্থকতা হ'লো, তাতে কোন সুকৃতি সাধন করলেন বা কোন আনন্দ উপভোগ করলেন, এ-সব অবশ্য আলাদা কথা।

অবশ্য আরো একটা লাভ এতে আছে, সেটা বলতে পারার সুখ, গল্প করতে পারার সুখ, সর্বাধুনিকের আস্বাদ নেবার সামাজিক এবং স্নাবিশ কণ্ডুয়নের তৃপ্তি। যারা সামাজিক জীবনে ধোপদুরস্ত হ'য়ে চলতে চায়, তারাই নব্যতমের প্রধানতম খদ্দের; খাওয়া, পরা, পড়া (অন্তত বইয়ের নাম শোনা), চড়া, সমস্ত বিষয়েই নতুন থেকে নতুনতরর পশ্চাদ্ধাবন ক'রে এরা যে কখনো ক্লান্ত হয় না তার কারণ এগুলো সামাজিক ক্ষেত্রে মূল্যবান, আর এদের কাছে সামাজিক মূল্যটাই চরম। বন্ধুমহলে ক্ষণিক গৌরব-লাভের জন্য, কথাবার্তার ফুটন্ত কেটলিতে হঠাৎ কয়েকটা বিস্ময়চিহ্নের বুদ্বুদ তোলার জন্য, কিংবা নেহাৎই প্রতিযোগিতায় অন্য কারো কাছে হেরে না-যাবার জন্য—শুধু এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম, প্রভূত অর্থব্যয় করে এরা, দেহ-মনে নানারকম কষ্ট সহ্য করে—বেড়াতে যায় (মনে-মনে বিরক্ত হয়ে) রোম এথেন্স ইস্তাম্বুলে, ক্লান্তিকর উপন্যাসের পাতা ওল্টায়, অন্তঃসারশূন্য সিনেমা দ্যাখে ব'সে-ব'সে, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে হালফ্যাশনের মহামূল্য চিকিৎসা করায়, তথাকথিত ভিটামিনে ভরা বিস্বাদ খাবার চিবোয়, আতস কাচের চশমা প'রে মনের আয়না ঢেকে দেয়,

দৃষ্টিশক্তিরও সর্বনাশ করে। আমি যদি এই ফ্যাশনজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতুম, তাহ'লে এই কমেটে চড়ে নগদ কিছু পাওনা জুটতো আমার—আর-কোনো কারণে নয়, এটা নতুনতম ব'লেই। আমেরিকাতে এসেও দেখেছি, আমি কমেটযাত্রী ছিলুম শুনে লোকেরা কৌতূহলী হ'য়ে, এমনকি একটু ঈর্ষুক চোখে, আমার দিকে তাকিয়েছে; এতে বোঝা যায় যে আজকের দিনে, অর্থাৎ এই বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের গোড়ার দিকে, এই ব্যোমযান বিস্ময়কর ব'লে বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সত্যি কি বিস্ময়কর?

এই কথাটাই—বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে হয়তো বিহার, হয়তো উত্তর-প্রদেশের উপর দিয়ে যেতে-যেতে, কোলে বই, চিঠি লেখার কাগজ, হাতে ঈষদুষ্ণ নিঃস্বাদ চায়ের পেয়ালা—এই কথাটাই ভাবছিলুম মনে-মনে। এই তো ভোগ করছি আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ একটি উপহার, মানুষের শক্তির একটা অবিশ্বাস্য অথচ অনস্বীকার্য প্রমাণের মধ্যে ব'সে আছি, কিন্তু, কিন্তু—তাতে হয়েছে কী? ভেবে দেখতে গেলে ব্যাপারটা এত বিস্ময়কর যে মানুষের প্রায় পাগল হ'য়ে যাবার কথা—কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিস্ময়ের শিহরণ কি অনুভব করলাম? কই, না তো। এর মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য এইটেই যে একটুও আশ্চর্যের ভাব লাগলো না; যে-রকম শুনেছি, ভেবেছি, এ তো ঠিক সেই রকমই, বরং কোনো-কোনো বিষয়ে একটু খাটো, একটু নৈরাশ্যজনক— এতে অবাক হবার কী আছে? এ যে অনেক, অনেক উঁচুতে উঠবে, অনেক, অনেক দ্রুতবেগে চলবে, এ-সব তো জানা কথাই, প্রথম থেকেই তা মেনে নিয়েছি আমরা, ধ'রে নিয়েছি স্বীকৃত ব'লে—এর মধ্যে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায়। বিস্মিত হওয়া যেতো যদি কখনো এমন-কিছু ঘটতো যেটা আমাদের হিশেবের মধ্যে ছিলো না, যেটাকে আমরা টিকিটের সঙ্গেই নগদ মূল্যে কিনে নিইনি;—যেমন ধরা যাক এঞ্জিনটা যদি হঠাৎ কোনো খেয়ালবশত গোঁ-গোঁ শব্দে গর্জন করার বদলে রিমঝিম অর্কেস্ট্রার মতো বেজে উঠতো, কিংবা যদি পেশাদার-হাস্যময়ী এয়ার-হস্টেস গতানুগতিক অনতিতপ্ত চায়ের বদলে মিশ্রি, পেস্তা, এলাচদানা আর হিরের গুড়ো মেশানো বাদশাহি সরবৎ পরিবেশন করতেন, তাহ'লে না-হয় একটু ন'ড়ে ব'সে, একটু চোখ তুলে অস্ফুট স্বরে বলা যেতো—'তাই তো!'

আসল কথাটা এই যে ম্যালথস-বর্ণিত কৃষিক্ষেত্রের মতো, এ-যুগের বিস্ময়ের ফসলেও প্রগতিশীল ক্ষীয়মাণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কথাটা হঠাৎ একটু অদ্ভুত শোনাবে, কেননা গত একশো-দেড়শো বছরের মধ্যে ফলিত বিজ্ঞান যত অসংখ্য এবং বিচিত্র রকমের বিস্ময়কর বস্তুর আমদানি করেছে, সভ্যতার ইতিহাসে এমন কখনো আগে ঘটেনি। কিন্তু সেইজন্যই—যেহেতু বিস্ময়ের বস্তু মানুষের সামনে বিপুল পরিমাণে পুঞ্জিত হ'য়ে উঠছে, ঠিক সেইজন্যই তার বিস্ময়ের বোধ কমতে-কমতে অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকলো। যখন প্রত্যেক দশ বছর, পাঁচ বছর, দু-বছর পর-পর কোনো-না-কোনো 'যুগান্ত-কারী' আবিষ্কারের উদ্গম হ'তে থাকে, এবং বছর-বছর, মাসে-মাসে, সপ্তাহে-সপ্তাহে নতুন থেকে আরো নতুনের, অদ্ভুত ছেড়ে আরো অদ্ভুতের প্রাচুর্যে মানুষের দম আটকে আসার দশা হয়, তখন তার অবাক হবার শক্তি আর থাকে না, আত্মরক্ষারই জৈব প্রয়োজনে মন তার নিজের চারদিকে অভ্যাসের শক্ত খোলশ গ'ড়ে তোলে। রোজ-রোজ উৎসব হ'লে মানুষ তাতে আনন্দ পায় না, রোজ-রোজ চেঁচিয়ে উঠে লম্ফ দেবার কারণ ঘটালে মানুষ শেষ পর্যন্ত চুপ ক'রেই ব'সে থাকে। আজকের দিনে হয়েছে ঠিক তা-ই; বিজ্ঞানের 'মিরাকল' যতই হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে এসে পড়ছে, একটার প্রতিধ্বনি না-মিলোতেই আর-একটার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, যতই জমকালোভাবে পরবর্তীটা টেক্কা দিচ্ছে আগেরটার উপর, ততই আমরা উদাসভাবে, নিঃসাড়ভাবে গ্রহণ করছি সেগুলোকে—যদি-না অবশ্য মনের মধ্যে সঙ্গে-সঙ্গে এই চিন্তার উদয় হয় যে এটার জন্য আগামী যুদ্ধ না জানি আরো কত বীভৎস হ'রে উঠবে। জুল ভার্নের, এমন কি এইচ জি ওয়েলস-এর সময়েও যে-কথা কল্পনা ক'রেও লোমহর্ষণ হ'তো, সেগুলো যখন বাস্তব হ'য়ে দেখা দিলো, তখন দেখতে-না-দেখতেই তাদের স্থান হ'লো দৈনন্দিনের মলিন তালিকায়—'in the dull catalogue of common things.'

অবশ্য এ-ক্ষেত্রে দেবদূতের পাখা যে কেটে দিয়েছে সে 'ফিলজফি' বা পরিজ্ঞান নয়—সেটা আতিশয্য, বাহুল্য, আশাতীত এবং অনেক সময় অনাবশ্যক প্রাচুর্য। যখন মনের মধ্যে কোনো বিষয়ে অভাববোধ জেগে ওঠে, কিংবা কোনো দুর্লভ ইচ্ছা বহুযুগের সঞ্চিত উত্তাপে ছটফট করে, তখন বিজ্ঞানের বলে তার তৃপ্তি ঘটলে মানুষ তা থেকে সত্যি-সত্যি আনন্দ পায়, বিস্ময়টাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে। এই রকম অনেক দুরাশা, অনেক অসম্ভবের আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ ক'রেই নবীন বিজ্ঞান মন পেয়েছিলো মানুষের, সনাতন ধর্মবিশ্বাসের উপর জয়ী হয়ে-ছিলো। কিন্তু এই জয়ের অধ্যায় অতীত হ'য়ে গেছে, বিজ্ঞান তার মনোহরণ যৌবন হারিয়ে বৈশ্যবৃত্তির সেবা করছে আজকাল, কান দুটোকে উৎসুক রেখেছে সামরিক হুকুমজারির দিকে। নিত্য নতুন সামগ্রী উদ্ভাবনে আজকের দিনে এই যে তার দুরন্ত ক্ষিপ্রতা দেখছি, তার পিছনে মানবসমাজের কোনো সত্যিকার চাহিদা নেই, আছে ব্যবসাবুদ্ধি, ধনের লোভ, যুদ্ধে জয়ী হবার প্রস্তুতি, বণিকের সঙ্গে বণিকের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতি-যোগিতার সংঘর্ষ। তাই খিদে না-জাগতেই খাবার এসে হাজির হচ্ছে, আর সেই ভোজও এমন বিপুল যে কোনটা ফেলে কোনটার দিকে তাকাবে, সে কথাও কেউ ভেবে পাচ্ছে না। ফলত, মানুষ আজকাল কোনোটার দিকেই তাকাচ্ছে না, যেটা সবচেয়ে সহজে হাতের কাছে এসে পড়ছে সেটাকেই কোনোরকমে মুখে তুলে চিবিয়ে চিবিয়ে ফেলে দিচ্ছে। অবস্থাটা ধনীর দুলালের মতো, অত্যন্ত বেশি উপচারের ভারে মনটা যার মরে গেছে, রাশি রাশি দুর্মূল্য খেলনাকে যে তার সম্পত্তি বলে ভাবতে শিখেছে, কিন্তু কোনোটা থেকেই এক ফোঁটা আনন্দ পাবার শক্তি যার নেই। আগে প্রয়োজন-বোধ জেগে ওঠে, তারপর সেটা মেটাবার ব্যবস্থা হয়, এই হলো স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু আধুনিক বৈশ্যবিধানে আগে সামগ্রীটাকে উপস্থিত করা হয়, তারপর

চাহিদা জাগিয়ে তোলা হয় অবিরাম
াপনের চাবুক মেরে-মেরে।
কালকার ছোটো-বড়ো যান্ত্রিক
াবন কোনোটাই এই অধৈর্যপ্রসূত
তা থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞানের যেটা
নার দিক, জ্ঞানের দিক, সেটাকে
ষে তেমন স্পষ্ট ক'রে আর দেখতে
চ্ছ না, বিজ্ঞান বলতে তার মনে পড়ছে
বধে, সুযোগ, আয়াসের লাঘব,
নের বৃদ্ধি, কিংবা কোনো অর্থকরী
াব আর নয়তো কোনো আণবিকতর
ত্রর আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ ধ'রেই
য়ছে যে বিজ্ঞানীর কাজই হ'লো—
ক্ষণ তিনি হনন-যজ্ঞের সমিধসংগ্রহে
ত না আছেন—তার জন্য সময়-বাঁচানো,
নি-বাঁচানো, আরাম-বাড়ানো, আমোদ-
গানো রাশি-রাশি খেলনা তৈরি করা।
না, নেহাৎই খেলনা, কেননা ওগুলো
পেয়ে সে যে দুঃখে ছিলো তা নয়,
পেয়েও যে কোন সুখ হ'লো, তাও
ঠিক জানে না। যন্ত্রের মতোই যন্ত্র-
লা সে ব্যবহার করে, ওগুলো থেকে
শ্রদ্ধা চ'লে গেছে, কোনোটাতেই
মনোযোগ নেই। যখন আজকের
ন কালকেই বাসি হয়ে যাবে, তখন
নিবিষ্ট হয়ে শক্তিক্ষয় করে কে।

একটা দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ঘরে
স দূরকে দেখবো, এই বায়না
মেরার ছবির সাহায্যে প্রথম যেদিন
লো সেদিন ভারি খুশি হয়েছিলো
ষ। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তার আরো
বদারঃ যে কাছে নেই তার সঙ্গে কথা
বো, যে-কথা বলা হ'য়ে গেছে সেটা
বার শুনবো। তাও সম্ভব হ'লোঃ
দর ঢেউ বাঁধা পড়লো মোমের থালায়,
চল করলো তারের মধ্য দিয়ে দূরে।
ষ মুগ্ধ বিস্ময়ে এই যন্ত্রগুলোকে
র্থনা করলে, আর সেই উচ্ছ্বাস
মতে-না-থামতেই ক্যামেরার ছবি
ন্ত হ'লো, তারপর সেই ছবির সঙ্গে
সূত্রে ধ্বনিও বাঁধা পড়লো একদিন।
ন্তু এতেও কুলোচ্ছে না, রেডিওটাও
ন প্রায় প্রাগৈতিহাসিক, ঘরে-ঘরে
লভিশন চাই; আর সিনেমার ছবিতে
য়কার লজ্জা-পাওয়া গালের রংটুকু
ন্তি যখন দেখানো গেলো, তখন
ীয় আয়তনটাই বা বাকি থাকে কেন।

আমরা যারা প্রাচ্যদেশে পেছিয়ে আছি, আমাদের উপর নতুনের এই দৌরাত্ম্য তেমন দুঃসহ নয়, ইওরোপের চাল-চলনও কিছুটা রাশভারি, কিন্তু আমেরিকায় শোনা যাচ্ছে তিন-আয়তনের সিনেমায় এরই মধ্যে অরুচি ধ'রে গেছে লোকের—ওটা 'চলবে' কিনা, সে-বিষয়ে ব্যবসায়ী মহল সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠছেন। আর এই নব্যতমকে নিয়ে কোথাও তেমন হুলুস্থুলও উঠলো না, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথম যখন রেডিও দেখা দিলো, কথা-বলা সিনেমা বেরোলো, তখন যেমন পৃথিবী ভ'রে উত্তেজনার ঢেউ দিয়েছিলো, সে-তুলনায় টেলিভিশন কিংবা তিন-আয়তনের আমদানিটাকে কেউ যেন তেমন ক'রে লক্ষ্যই করলে না। আসল কথাটা এই যে এগুলোর জন্য মানুষের মনের মধ্যে কোনো ইচ্ছে জেগে ওঠেনি; রেডিওয় গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে গায়ককে চোখে দেখার জন্য অতিশয় কাতর হ'য়ে পড়েনি কেউ, এমন কথাও কখনো কারো মনে হয়নি যে সরব এবং রঞ্জিত-সিনেমায় মানুষগুলোর তৃতীয় আয়তনটা নেই ব'লেই সব ব্যর্থ হয়ে গেলো। ছবিতে ঐ অভাবটা আমরা অনুভবই করি না—সেটাই ছবির মায়া—যেমন আমরা আশা করি না ভাস্করের গড়া মূর্তির গায়ে বর্ণপ্রলেপ। মূর্তির ধর্মই বর্ণহীনতা, ছবিও তার দুটোমাত্র আয়তনের মধ্যেই সুসম্পূর্ণ—তা সে অচল চঞ্চল যা-ই হোক না—বাস্তবের কোনো-একটা অঙ্গ বাদ দিয়েই বাস্তবকে সার্থকভাবে প্রকাশ করা হয়, কোনো শিল্পই মাছি-মারা নকলনবিশি করে না। যেটা বাদ পড়লো, সেটাকে নিজের মন থেকে ভ'রে তোলা মানুষের আবহমান অভ্যাস, তার উপভোগের জন্যই ঐ অবকাশটুকু প্রয়োজন। এই-যে তিন আয়তনের আজব সিনেমা, এটার উৎপত্তি হয়েছে দর্শকদের আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে নয়, বাণিজ্যের সম্প্রসারণের তাগিদে—উদ্ভাবকের আজ্ঞাবহ উর্বর মস্তিষ্কে। যে ভোগ করবে তার দিক থেকে চাহিদা ছিলো না, যে বেচবে তার গরজটাই বড়ো; তারই তাড়ায় যন্ত্রশিল্পীর এক দণ্ড ছুটি নেবার উপায় নেই। যে-শক্তি মানুষ আজ পেয়েছে—প্রচণ্ড শক্তি—সেটাকে নিয়ে সে কী করবে, আর কী করবে, তা যেন ভেবে উঠতে পারছে না; এলোমেলো, অস্থির, উদ্‌ভ্রান্তভাবে শুধু বানিয়ে যাচ্ছে, বাড়িয়ে যাচ্ছে: সবুর সয় না, ভাববার সময় নেই, 'কেন', 'কিসের জন্য', এই প্রশ্নগুলো নেহাৎ অবান্তর হয়ে গেলো. যে-কোনো উপায়ে শক্তির ব্যবহার করতে না পারলে সে যেন দম ফেটে ম'রে যাবে। ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগবান এরোপ্লেন পাঁচশো মাইল যাচ্ছে না কেন, তার জন্য কোনো সুস্থ মানুষের আক্ষেপ ছিলো না, আর যখন পাঁচশো মাইলও সম্ভবপর হলো, তখনও সেটা লোকেরা যেন প্রাপ্য ব'লেই মেনে নিলে—বেশি কিছু উচ্চবাচ্য করলে না। কেননা, যখন শোনা যাচ্ছে যে এই বেগ অচিরেই সাতশো কিংবা আটশোর কোঠায় পৌঁছবে, তখন মাত্র পাঁচশোতেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে কেউ বোকা ব'নে যেতে রাজি নয়। কিন্তু সাতশোতেই কি বিস্ময়ের ধুম প'ড়ে যাবে চারদিকে? ঠিক উল্টো; সাতশো, আটশো, হাজার হবে, আমাদের মনে চমক লাগবে আরো কম, কেননা যন্ত্র যতই আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর হচ্ছে, আমরা ততই নিঃসাড় থেকে নিঃসাড়তর হচ্ছি। তারপর—হয়তো তার খুব বেশি দেরিও আর নেই—মানুষ একদিন চাঁদে যাবে: কিন্তু তার আগে এমন আরো অনেক ঘটনা ঘটে যাবে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যন্ত্রের তেজ এমন আরো বিচিত্র উপায়ে বিচ্ছুরিত হবে, যে ততদিনে মানুষের মনের বিস্ময়ের তার ছিঁড়েই যাবে একেবারে, এবং যেদিন চাঁদের বরফে পা রেখে যাত্রীর দল বাড়ি ফিরে আসবে, সেদিন পৃথিবীসুদ্ধু খবর-কাগজ রেডিও সিনেমা টেলিভিশন এবং না-জানি-আরো-কত-কিছুর সমবেত চীৎকার সত্ত্বেও আমরা সকলাবেলার চায়ের পেয়ালায় আড়মোড়া ভেঙে শুধু বলবো—'তাই নাকি?'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছিলো চিনে চাষীর বিখ্যাত গল্পটা, যেটা আশা করি এতদিনে কারো অজানা নেই। নিচু হয়ে মাটি কোপাচ্ছিলো, মাথার উপর উড়ে যাচ্ছে এরোপ্লেন। একজন মার্কিন যেতে-যেতে বললে, 'দেখছো ওটা?' 'দেখছি তো।' 'ওটা ওড়ার কল। আমরা বানিয়েছি। তোমরা পারো ও-রকম?' 'ওড়ার কল? ওড়বার জন্যই বানানো হয়েছে—তা-ই না?' ব'লে বুড়ো ফের মাটি কোপাতে লাগলো। এইরকম কথা বলতে পারে এক নির্বোধ, আর বলতে পারে মহাজ্ঞানী, জ্ঞান যার পক্ষে প্রবৃত্তিগত, শিক্ষাসাপেক্ষ নয়। ওড়ার জন্যই যে-কল তৈরি হয়েছে সেটা তো উড়বেই, তাতে আর তাকিয়ে দেখার কী আছে—চিনে চাষির মনের ভাবটা এই-রকম। তাহ'লে তো এই কোদালটাও আশ্চর্য—এটা মাটি কাটবার জন্যেই তৈরি হয়েছে, আমি তা দিয়ে মাটি কাটছি। ভেবে দেখতে গেলে, এর উপরে কোনো কথা নেই। সত্যি-সত্যি বিস্ময়কর যদি বলতে হয় তো মানুষের সেই আদিম যন্ত্রগুলোকেই—লাঙল, চরকা, তাঁত, কুমোরের চাকা—এগুলোই সভ্যতার ভিত্তি, যার জোরে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে আশ্চর্য পরিণতি সম্ভব হয়েছিলো—এগুলোই সত্যিকার আবিষ্কার। এর পরে যা-কিছু হয়েছে, সব এরই সম্প্রসারণ, পরিবর্ধন, পরিবর্তন মাত্র। অফুরন্ত সম্প্রসারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে মৌলিক কতটুকু? পশুতে টানা লাঙল থেকে কলের লাঙল এক পা মাত্র দূরে, পদ্মানদীর ডিঙির সঙ্গে কুনার্ড কোম্পানির জাহাজের তফাৎটা শুধু মাত্রাগত, প্রকৃতিগত নয়। এতটা হতে পারলে আর-একটু হবেই, তারপর আরো একটু—এ যেন প্রায় ধ'রেই নেয়া যায়, অন্ধকার চিরে প্রথম আলো ফোটার পর হাঁটি-হাঁটি-পা-পা ক'রে মানুষের পথ চলাটা দৃশ্য হিসেবে রমণীয় হলেও সভ্যতার খোদ ভাঁড়ারে তার নতুন দান সত্যি কিছু আছে কিনা কে জানে। মানুষের প্রথম এবং পরম জয় সেইদিনই ঘটেছিলো যেদিন কৃষির রহস্য আবিষ্কার করেছিলো সে; মাটি কুপিয়ে আজকে বীজ পুঁতলে ছয় মাস পরে সেই মাটিতে তার অন্ন উৎপন্ন হবে, এই একটিমাত্র সূত্রের মধ্যে ধরা পড়লো তার দূরদৃষ্টি, গার্হস্থ্য-জীবন, ঋতুর সঙ্গে, নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয়, তার প্রার্থনা, তার পার্বণ—এক কথায়, তার জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, নীতি, শিল্পকলা। ঐ অস্পষ্ট অতীতে যেখানে মানুষ খুঁটি বেঁধেছিলো

ান থেকে এখনো সে স'রে যায়নি—
বা যদি-বা কোথাও একটু সরে গিয়ে
চ, সেটুকুই সে তার মনুষ্যত্বে জখম
ছে। আমরা এ-কথাই ভেবে অভ্যস্ত
এই 'বিজ্ঞানের যুগে' আমরা পূর্ব-
য়ের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধে
চ, কিন্তু এই বিশ-শতকী পশ্চিমি
তার সমস্ত পল্লবের ভার বাদ দিয়ে
ফলটুকুর দিকে তাকালে সত্যি কি
তফাৎ ধরা পড়ে? সভ্যতার
হাস-কথিত মাতৃভূমি প্রাচীন মিশরে
কমের বিভিন্ন গম আর যব উৎপন্ন
হ, মোহেঞ্জোদাড়োয় উৎকৃষ্ট বাথরুম
, চিন দেশের বিচিত্র-জটিল রন্ধন-
বিকাশ হয়েছিলো কেউ জানে
তে হাজার বছর আগে—আবার এই
ই, পণ্ডিতেরা অনুমান ক'রে
ন, প্রাচীনতর, আদিমতর কোনো
মগ্ন সভ্যতার দান, যার নাম লুপ্ত
গেছে, কিন্তু যার স্মৃতি জেগে
সকল দেশের ধর্মশাস্ত্রে কোনো-
নো প্রলয়পয়োধির বর্ণনায়, আর
যুগ ধ'রে প্রচলিত **আটলাণ্টিস**
দেশের কিংবদন্তীতে। এত অসংখ্য
র যন্ত্রপাতি নিয়েও বিশ শতক
কতটা অগ্রসর হয়েছে, তার হিসেব
গেলে অনেকবার মাথা চুলকোতে

তাছাড়া, যন্ত্র জিনিসটার নিয়মই
যে তার চতুরতম চেহারা, নিয়েও তার
বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যার
া মেজাজ নেই, মরজি নেই, ভুল
অনুপ্রেরণা নেই, বৈচিত্র্য নেই,
ন্য নেই, তাকেই বলে যন্ত্র। কিন্তু
যর মধ্যে যেহেতু একটা প্রাণপদার্থ
ক করছে, সেইজন্য সে এমন
সই ভালোবাসে যেটা একেবারেই
প'ড়ে চলে না, যার মধ্যে সে
া-একটা রহস্যের আভাস দেখতে
আমরা যে কোনো যন্ত্র দেখে
ক করি, প্রথম-প্রথম অবাকও হই,
মধ্যে অনেকটাই আমাদের ছেলে-
য আছে, শৈশবের উদ্বৃত্ত কিছু
া কৌতূহল। সেই কৌতূহল
যেতে দেরি হয় না, আর তারপরেই
দের উৎসাহের দম ফুরোয়। প্রথম
ও কেনার পর ওটাকে প্রায় জীবন
উৎসর্গ ক'রে দেয়া গেছে, এ-রকম অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই ঘ'টে থাকবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চালিয়ে দিয়েছি, বিকেলে কাজ থেকে ফিরেই ব'সে গেছি ওটার কাছে, নিশুতি রাতে আর সবাই যখন শুতে গেছে, অন্ধকারে ভূতের মতো বসে থেকেছি ওর আলো-জ্বলা মুখের সামনে, চুল-পরিমাণ কাঁটা সরিয়ে-সরিয়ে কান পেতে শুনেছি পৃথিবীর নানা দেশের ভাষা, গান, খবর, এবং ফাঁকে-ফাঁকে বোমার শব্দ, শেয়ালের ডাক, শাকচুন্নির কান্না—যা-কিছু ঐ যন্ত্রটা থেকে অযাচিতভাবে নিঃসৃত হ'য়ে থাকে। সত্যি, মনে-মনে বলেছি, ঐটুকু একটা যন্ত্রের মধ্যে সারাটা পৃথিবী ধরিয়ে দিয়েছে—কী বুদ্ধি মানুষের! কিন্তু যখন সবগুলো চাবি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মুখস্থ হ'য়ে গেলো, বার-বার শোনা হ'য়ে গেলো রোম, বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন, মস্কো, টোকিও, সাইগঁ, শোনা হ'লো বি. বি. সি.-র নাটক, জর্মানির বাজনা, ইতালিয়ান গান, তখন, তারপর—কেমন ক'রে বুঝলাম না, কিন্তু একদিন দেখা গেলো ওদিকে আর মন নেই আমাদের রেডিওর গায়ে ধুলো জমছে, কিংবা সেটাকে দখল ক'রে নিয়েছে বাড়ির নাবালকেরা; তারাও যে ঠিক শুনছে তা নয়, চালিয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গল্প করছে, এমনকি স্কুলের বই খুলে পড়তে ব'সে যাচ্ছে। রেডিওর মনোযোগী শ্রোতা কেউ কোথাও আছেন কিনা জানি না, ওটা দোকানিরা রাখে তাদের শূন্য সময় যে-কোনো একটা গোলমাল দিয়ে ভ'রে তোলার জন্য, আবার অনেক বাড়িতে দেখেছি রেডিওটাকে দিন-রাত্তির চালিয়ে রাখা হয়েছে—অবশ্য নিচু গলায়, রীতি-মতো বিনীতভাবে, যাতে ওটার অস্তিত্ব বোঝা যায় অথচ বড্ড বেশি শ্রুতিগোচরও হ'য়ে না পড়ে—আর বাড়ির লোকের কাজকর্ম কথাবার্তা সবই চলছে সেই সঙ্গে—এমনি সারাক্ষণ, আপনি অভ্যাগত গিয়ে বসলেন তখনও কেউ ওটাকে বন্ধ করবে না—যেন মাইনে-করা চাকর রেখেছে আমোদ পরিবেশনের জন্য; কেউ লক্ষ্য করুক আর না-ই করুক, তাকে খাটিয়ে তো নিতে হবে। সেই হ্যান্স অ্যাণ্ডারসেনের কলের পাখি আর আসল পাখির আশ্চর্য গল্প আর কি—আসল পাখির গান শুনতে হ'লে রাজপুরীতে ব'সে থাকা চলবে না, যেতে হবে শহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে, ছোট্ট আঁকাবাঁকা নদীটির ধারে, যেখানে জেলেরা মাছ ধরে, কাঠুরের মেয়ে বুনো ফল খেয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর যেখানে বাঁশগাছের উপর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে, আর সেই গাছেরই পলকা একটি ডালে ব'সে ছোট্ট নরম একলা পাখিটি সারা আকাশ গানে ভ'রে দেয়। জেলেরা কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, গান শুনবে ব'লে; কাঠুরে-মেয়ে বনের পথে থমকে দাঁড়ায়, গান শুনবে ব'লে; পূর্ণিমার চাঁদ পৃথিবীর উপর গভীর একটি স্তব্ধতা বিছিয়ে দেয়, গান শুনবে ব'লে। ততক্ষণে রাজপুরীতে কলের পাখির কালোয়াতির বৈঠক বসেছে, ক্যাবিনেট মিনিস্টররা ঘিরে বসেছেন চারদিকে, প্রোফেসর, এঞ্জিনিয়র, পাব্লি-সিটি অফিসার, কেউ বাকি নেই। অনেক

মাথা নাড়া, অনেক হাত-তালি, এন্তার বকশিশ; কিন্তু তারপর রাজা যখন রোগশয্যায়, আর কলের পাখি পুরোনো হ'য়ে পড়ে আছে, তখন ফিরে এলো বনের পাখি—সেই যাকে একদিন বিদেয় ক'রে দেয়া হয়েছিলো—এসে রাজার জানলায় ব'সে গান গাইলো সারা রাত, আর ভোরবেলা প্রসন্ন দেহ-মন নিয়ে রাজা উঠে বসলেন। এই অসুখটা শুধু গল্পের রাজার নয়, আমাদের সকলেরই, আধুনিক সভ্যতারই ব্যাধি এটা। ব্যাধি যখন কঠিন হ'য়ে ওঠে তখন তার আরোগ্যের জন্য আমাদের আদিম স্বভাবই জেগে ওঠে আবার; আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি অনেকবার, বিধ্বস্ত করতে চেয়েছি নানাভাবে, কিন্তু আমরা নিজেরাও জানিনি যে, সে ঠিক অবিচলভাবে অপেক্ষা করেছে আমাদের জন্য—অক্ষত, অম্লান, অনাক্রমনীয়—আমাদের স্বাস্থ্যের শুশ্রূষার, কল্যাণের সঞ্চয় নিয়ে, সংকটের দিনে আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে, ধ্বংস থেকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে, আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সেই যেখানে পথের ধারে বেগনি রঙের ফুল ফুটে থাকে, ছোটো ছেলে ছাগল-ছানার গলা জড়িয়ে খেলা করে, দুপুরবেলায় বারান্দায় ব'সে চাল বাছে মেয়েরা, উঠোনে রোদ্দুর হেলে পড়ে, হঠাৎ একটু ঝিরিঝিরি হাওয়ায় কবেকার কোন্ কথা যেন মনে পড়ে যায়—যেখানে সাধারণ, যেখানে জীবন, যেখানে আমাদের প্রাণের মূল, যেখানে আমাদের বিস্ময়, আমাদের আনন্দ, আমাদের প্রেম।

বিস্ময়, আনন্দ, প্রেমঃ মানুষের এই তিনটে বৃত্তি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, একই উৎস থেকে উৎসারিত এরা, একই বৃন্তের অমৃতফল। আনন্দেরই একটা লক্ষণ বা গুণ হ'লো বিস্ময়, আর প্রেমের আস্বাদেরই নাম হ'লো আনন্দ। যখনই আমরা বিস্ময় বোধ করি তখনই আমরা আনন্দিত হই, আর আমাদের সকল আনন্দ সঞ্চিত হ'য়ে আছে—আর কোথাও নয়, শুধু প্রেমে, তাকে যখন যে-নামেই ডাক না কেন। অপ্রত্যাশিত খারাপ খবরে, কিংবা কোথাও নির্ভর ক'রে নিরাশ হ'লে আমাদের মনে যে-ভাবটা জাগে সেটা বিস্ময়ের নয়, সেটা একটা আঘাত, চলতে-চলতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ার মতো একটা অপ্রস্তুত হওয়ার বেদনাদায়ক অনুভূতি। এইরকম ঘটনাকে ইংরেজিতে unpleasant surprise ব'লে থাকে, কিন্তু যেটা surprise মাত্র নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো এবং মহার্ঘ wonder, সেটা অবিচ্ছেদ্যভাবে আনন্দবোধের সঙ্গে জড়িত, এমন কোনো বিস্ময় নেই যেটা আনন্দের দূত হ'য়ে আসে না, এমন কোনো আনন্দ নেই যাতে বিস্ময়ের অংশ না আছে। এই বিস্ময়—এটা কী? কোথায় এর জন্ম, এর লালন, এর অলক্ষিত, অপ্রতিরোধ্য সঞ্চার? যেটা অদ্ভুত কিংবা অভাবনীয় সেটাতে বিস্ময় নেই, যেটা আজগুবি সেটাতেও না, যেটা অলৌকিক, অপ্রাকৃত, কিংবা যেটা বিমূঢ় ক'রে দেয়, সেটাও আমাদের বিস্ময়বোধের পরপারে। বিস্ময় আছে সাধারণের মধ্যে, স্বাভাবিকের পরিমণ্ডলে, যা জানি, যেটাকে দেখেছি, যেটা আমাদের অত্যন্তই পরিচিত এবং প্রত্যাশিত, সেটাকেই হঠাৎ কখনো নতুন ক'রে, তীব্র ক'রে, সম্পূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করি যখন, তখনই আমরা বিস্মিত হই, নন্দিত হই, ভালোবাসি। ঘোমটা স'রে যায়, মুহূর্তের মৃণালের উপর চিরন্তনের পদ্ম ফুটে ওঠে। যাকে আমরা সাংসারিক অর্থে সৌভাগ্য ব'লে থাকি তার সাধ্য নেই এই অভিজ্ঞতার ক্ষীণতম, সূদূরতম আভাস দেয়। লটারিতে হঠাৎ লাখ টাকা পেয়ে গেলে মানুষ উল্লসিত, উদ্ভ্রান্ত, অসুস্থ, নিশ্চিন্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সবই হ'তে পারে, কিন্তু আনন্দিত হয় না, কেননা আনন্দের আসন আমাদের হৃদয়ে, আর এই আকস্মিক, অনুপার্জিত, শ্রমহীন, প্রেমহীন সম্পদ হৃদয়ের রক্তে রূপান্তরিত হবার নয়। আর এই আনন্দের স্বাদ, তা কি কোনো যন্ত্র আমাদের দিতে পারে, না কি কোনো অলৌকিক শক্তি দ্বারাই সেটা সম্ভব? যন্ত্র, তা আমাদের তাক লাগিয়ে দেয়, থ বানিয়ে দেয়, একেবারে ছেলেমানুষের মতো হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকার দশা করে হয়তো, কিন্তু এমনিতর তাক লাগাবার চরম পরিণতিটা কোথায় সেটা বোঝা যায় চ্যাপলিনের ফিল্মে খাওয়ার কলের দৃশ্যটি মনে করলেই। তাক-লাগানো আরো অনেক ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে ব'লে শোনা যায়ঃ দাড়িওলা মেয়ে, দু-মাথা-ওলা জন্তু, পেরেক-খেকো যোগী; কিন্তু মানুষের চিত্ত বিকৃত হ'লেই এ-সব দেখার জন্য সে ভিড় করে, তার বিস্ময়বোধে উৎকটের স্থান নেই। শুধু উৎকট কেন, খুব নৈপুণ্যময় অস্বাভাবিকতাও বেশিক্ষণ সহ্য হয় না আমাদের, চমকপ্রদের আবেদন বড়ো ক্ষণিক। সার্কাসের কসরৎ বা ম্যাজিকের কারসাজি আশ্চর্য হিশেবে তো কিছু কম যায় না, অথচ সেগুলো উপভোগ করার শক্তি আমরা অনেকেই যে লজঞ্চুষ আর নিকারবোকারের সঙ্গেই জন্মের মতো পরিত্যাগ ক'রে আসি, তার কারণ ওতে শুধু চমক আছে, বিস্ময় নেই। তেমনি কোনো মহাপুরুষ যদি চাঁপাগাছের ডালে হঠাৎ একদিন জবাফুল ফুটিয়ে দেন, সেটাও হবে চমকপ্রদেরই চরম উদাহরণ, তা থেকে আমরা উত্তেজনা প্রচুর পেতে পারি, অমৃতের স্পর্শ পাবো না। যেটা কখনো হয় না সেটা হওয়া যত আশ্চর্য, তার চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য যেটা নিত্য হ'য়ে থাকে সেটাকেই আশ্চর্য ব'লে অনুভব করা। চাঁপা গাছে জবা ফুল ফুটুক, এটা হ'লো ছেলেমানুষি চাহিদা, কিন্তু চাঁপার ডালে যে-ফুল ফোটে সে-ফুল আমার মনের মধ্যেও ফুটুক, এই হ'লো সাধকের স্বপ্ন, কবির প্রার্থনা। আর প্রত্যেক মানুষ, জেনে কিংবা না-জেনে, এইরকম কোনো শুভক্ষণেরই প্রতীক্ষা ক'রে থাকে, যখন তার অভ্যস্ত, পুরোনো, গতানুগতিক জীবনের মধ্য থেকে ডিমের খোলা ভেঙে পাখির মতো বেরিয়ে আসে চিরকালের নতুন, যখন তার মুগ্ধ আত্মা ব'লে ওঠে—'আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হ'লো ক্ষয়। পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময় অন্তহীন।' সকলে বলতে পারে না, কিন্তু সকলের মধ্যেই এমনি ক'রে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা অন্তত না-থাকলে কি একজনও বলতে পারতো? হয়তো অজ্ঞাত, হয়তো অচেতন, কিন্তু অনতিক্রম্য আমাদের এই তৃষ্ণা, আর ক্বচিৎ কখনো সেটা মেটে ব'লেই আমরা তার অস্তিত্বটা জানতে পারি। যে-কোনো অভ্যাসের মধ্যে, নিয়মের মধ্যে, জড়তার মধ্যে এমনি এক-একটি মুহূর্ত এসে চারদিক আলো ক'রে তোলে, বাঁচিয়ে তোলে আমাদের হৃদয়ের

ন্যাকে। মনে করা যাক না স্ত্রীর পুরুষমানুষের ব্যবহার, সাংসারিক ন তার কতগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি . অধিকাংশ মানুষ অধিকাংশ সময় লোর উপরেই দাগা বুলিয়ে চলে, টা এত বেশি মুখস্ত হ'য়ে যায় যে, আর আলাদা ক'রে ভাববারই কারণ না। কিন্তু যে-পুরুষ স্ত্রীকে ' ব'লে ডাকে আর নিয়ম ক'রে দু-বার সিনেমায় নিয়ে যায় আর দু-বার বাপের বাড়ি পাঠায়, যে র সময় কিংবা মাইনে বাড়লে গয়না য় দেয় অথচ সব টাকা স্ত্রীর হাতে না, এমন কি কখনো হয় না যে সেও ন আপিস থেকে ফিরে চুপ্ ক'রে য়ে রইলো—তাকিয়ে রইলো সেই র দিকে, যে-মুখ সে ভেবেছিলো জীবন ভ'রে দেখছে, কিন্তু আজ লা এই মুহূর্তে প্রথমবার দেখলো। সে দেখতে পেলো, তার প্রয়োজনকে নর্ভকে, গৃহিণীকে নয়, প্রেয়সীকে ধু প্রেয়সীকেও নয়, ঐ শাড়ির রেখায় রের ফোঁটায় চোখের দৃষ্টিতে সেটাকে চিনতে পারলো। 'এই তো , অন্তহীন।'

মানুষ সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে কারগার থেকে মুক্তি। দিনের পর নিজের মধ্যে বন্দী হ'য়ে আছে সে, দেহের প্রয়োজনের মধ্যে, তার প্রয়োজ ভয়, লোভ, উৎকণ্ঠা আর উদ্দেশ্য-র উপায়ের মধ্যে, বর্তমানের স্বেচ্ছা-া আর ভবিষ্যতের বিশ্বাসঘাতকতার য়র মধ্যে—আমার অসুখ করবে না একটা বাড়ি কেনা যায় না কোনো-? হঠাৎ আয় ক'মে গেলে কী হবে—যা-কিছু ভাঁড়িয়ে এই বীর দালাল, কুশীদজীবী আর পন-লেখকরা তাদের বিরাট ব্যবসা য় তোলে। এই কারাগার থেকে যিনি জোরে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁকেই মহাত্মা বলি, বলি মুক্তপুরুষ। কোনো-কোনো প্রবল মানুষ এর া আর সইতে না-পেরে ঘর ছেড়ে য় পড়ে—বেরিয়ে পড়ে ত্যাগের, র, ব্যভিচারের পথে, ঝাঁপ দেয় দের মধ্যে, তান্ত্রিকের মত্ততায়, আত্মা-নের যূপকাষ্ঠে। কিন্তু সাধারণত মানুষের নিজের মধ্যে এমন শক্তি থাকে না, যাতে এই অবরোধ থেকে সে মুক্ত হ'তে পারে, এর জন্য বাইরের কোনো প্রভাব তার প্রয়োজন হয়, এমন একটি আবেগের তরঙ্গ, যা তাকে তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক থেকে ছিন্ন ক'রে তুলে নিয়ে যাবে জীবনের বিশুদ্ধ আস্বাদের কুমারী-বেলাভূমিতে, যেখানে কোনো দ্বিধা নেই, বাধা নেই, ভয় নেই, সব সহজ হ'য়ে গেছে। মানুষের যেটা যৌন কামনা, সেটা এই মুক্তিরই একটা উপায় ব'লেই তার মন্থন থেকে প্রেম নামক অমৃত উঠে এলো। মানুষের অন্যান্য কামনার সঙ্গে এই কামনার মস্ত তফাৎ এই যে, অন্যগুলিতে সে নিজেকে শুধু বাড়িয়ে তুলতে চায়, আর এটাতে বেরিয়ে আসতে চায় নিজের ভিতর থেকে, বলতে গেলে উৎসর্জন করে নিজেকে। কৃপণ তার জেলখানাটাকেই আরো বেশি মজবুত ক'রে তোলে, সে একেবারেই আত্মময়, আত্মসর্বস্ব, কিন্তু কামুক তার দুষ্ক্রিয়ার মধ্যেও অন্য একজন মানুষের কাছে আত্মাহুতি না-দিয়ে পারে না। আমরা যে সাহিত্য পড়ি, গান শুনি, চিত্রকলার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তাও এই মুক্তির আশায়; আমরা যাকে সাধারণ জীবন বলে জানি—যার দিকে আমরা কখনো তাকিয়ে দেখি না, শুধু তার উপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে প'ড়ে যাই—তা যে কত আশ্চর্য, কত রহস্যময়, কত ঐশ্বর্যে ভরা, সেই কথাটা ক্ষণিকের জন্য অনুভব করাই শিল্পকলার পুণ্যফল। সৌন্দর্য, তা নারীর হোক বা প্রকৃতির হোক, আমাদের মনের উপর তারও এই প্রভাব—এই বন্ধনচ্ছেদ, সত্তার বিস্তার, আর প্রকৃতির রূপ যেখানে অসীমের, চিরন্তনের আভাস এনে দেয়—যেমন সমুদ্র বা তুষারশৃঙ্গের সামনে—সেখানে আমরা যে মুগ্ধ হ'য়ে, বিহ্বল হ'য়ে তাকিয়ে থাকি, তাও নিজেকে অতিক্রম করারই আনন্দে, কোনো এক রহস্যের মন্দিরে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারার সার্থকতায়। অবশ্য এর জন্য যে পুরীতে বা দারজিলিঙে যেতেই হবে তাও নয়, তেমন মন থাকলে ঘরে ব'সেই সব পাওয়া যায়, 'একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির-বিন্দু' দেখেই সর্বশরীরে রোমাঞ্চিত হওয়া যায়। আশ্চর্য হবার সবচেয়ে আশ্চর্য গল্প যেটা আমার জানা আছে সেটাও এক চৈনিকেরই বিষয়ে—চিনে কবি শু, যিনি শান্তিনিকেতনে পথ চলতে-চলতে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'Look, Rabikaka, a dog!' এই তো সত্যিকার বিস্ময়বোধ। মনের তার যখন টান হ'য়ে বাঁধা থাকে, তখন পথের একটা কুকুরের মধ্যেও পাহাড় কিংবা সমুদ্র কিংবা মোনালিসার হাসির রহস্য ধরা পড়ে—আর সত্যি তো, এই পৃথিবীতে যা-কিছু প্রাকৃত তা-ই তো শাশ্বত, আর যা-কিছু সেই প্রাকৃতকে প্রকাশ করে তা-ই আমাদের অনুপ্রাণনার উৎস। ভাবতে অবাক লাগে যে, যন্ত্রের সদ্যতম, অলৌকিকতম কারসাজিও কত সহজেই বাসি হ'য়ে যায়, কিন্তু মানুষের ঘরে বার-বার যে-শিশু জন্মায়, আকারে-প্রকারে সেই তো সে একই রকম, অথচ বারে-বারেই সে অপরূপ। ভাবতে অবাক লাগে যে চাঁদ জিনিসটা তো অতিশয় পুরোনো, আর আমিও তো জীবন ভ'রে, কতবার ওকে দেখেছি তার অন্ত নেই, তবু তো তাতে ক্লান্তি এলো না কোনোদিন, তবু তো অমাবস্যার পর পশ্চিমের আকাশে চাঁদের ক্ষীণ, করুণ রেখাটি চোখে পড়লেই মনে হয় যেন কত বড়ো ঐশ্বর্য ফিরে পেলাম। ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথের গান, সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, অথচ বার-বার, হাজার বার নতুন ক'রে আবিষ্কার করছি কোনো-না-কোনো ইঙ্গিত, পংক্তি, কথা—এমন কথা, এমন সুর, যা এমনকি কানে শোনবারও প্রয়োজন করে না আর, চিন্তা করতেই চোখে জল আসে, বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে। আর রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়েই মনে প'ড়ে যায় আরো কত অফুরন্ত আশ্চর্য জিনিস আছে এই পৃথিবীতেঃ ভোরের হাওয়া, সন্ধ্যার আভা, দুপুর-রাতের বৃষ্টি, দুপুর-বেলার বৃষ্টি:—দমদম ছেড়ে প্রথম যখন উঠলাম, তখন বাঙলার দূরায়মান নিম্ন আকাশে নীল-কালো মেঘের কথা ভেবেও এখন অবাক লাগছে।......কিন্তু আপাতত আর বেশি অবাক হবার সময় নেই, প্লেন নামছে, দিল্লী এসে পড়লো, চিঠিটা শেষ ক'রে ফেলতে হয়।
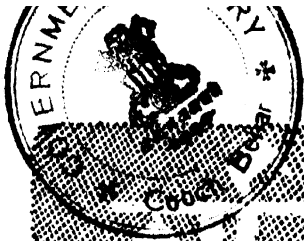
সৈয়দ মুজতবা আলী

ছয়

অবিশ্বাস্য। বরঞ্চ ইংরেজ সকাল বেলাকার বেকনআণ্ডা বর্জন করে দেবে, বরঞ্চ ইংরেজ বড়দিনে গির্জে কটু কারতে পারে, এমনকি, শাশুড়ীর জন্মদিনও ইংরেজের পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ক্লাব-গমন বন্ধ করা ইংরেজের পক্ষে হৌস-অব-কমনস্ পুড়িয়ে দেবার সামিল—মুসলমানের কলমা ভুলে যাওয়া, হিন্দুর গো-মাংস ভক্ষণ এর তুলনায় চুলে চিমটি কাটার মত।

ডেভিড, মেবল তিন মাস ধরে ক্লাবে যায়নি!

যে মীরপুরের ছোট মেম ডুমুরের ফুল, সাপের ঠ্যাঙ দেখেছেন বলে ক্লাবে দাবী করে থাকেন, তাঁকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল, মধুগঞ্জের তাবৎ খানসামা—বটলার, মেথর-ঝাড়ুদারকে ফালতো চা বখ্‌শিশ্ দিয়েও তিনি কারণটা বের করতে পারেননি।

এসব বাবদে সোজাসুজি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা ইংরেজের সর্বশাস্ত্রে বারণ। একমাত্র পাদ্রীদের কিছুটা হক্ক আছে। বুড়ো পাদ্রী সন্তর্পণে প্রশ্ন শুধিয়ে নিরাশ হলেন। বুড়ি মেম একবার ডেভিডের মফস্বল-বাসের সময় মেবলের সঙ্গে তেরাত্তির কাটান। চতুর্দিকে কড়া নজর ফেলে, এমনকি শেষটায় জিজ্ঞেসবাদ করেও কোনো খবর জোগাড় করতে পারলেন না।

বুড়ি বেদনা পেয়েছিলেন। তৃতীয় রাত্রিতে ছিল পূর্ণিমা। জানলা দিয়ে চোখে চাঁদের আলো পাড়তে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। পাশের খাটের দিকে তাকিয়ে দেখেন মেবল্ নেই। পা টিপে টিপে বারান্দায় এসে দেখেন মেবল্ ডেকচেয়ারে সামনের দিকে ঝুঁকে দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে—তার দীর্ঘ বাদামী চুল হাত মুখ ছাপিয়ে ফেলেছে। বুড়ি মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, চুলে আঙুল চালাতে চালাতে হঠাৎ চুলের ডগাগুলো ভেজা ঠেকলো।

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি পাদ্রী টিলার বহু তরুণী বিস্তর যুবতীর অনেক বুকফাটা কান্না দেখেছেন, কোনো কোনো স্থলে সলা পরামর্শ দিয়ে নানা দিকে নানা রকম কলকাঠি চালিয়ে এদের মুখে হাসি ফোটাতেও সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ নারীর বেদনা কি হতে পারে, সে সমস্যার সন্ধানে কোন্ দিকে হাৎড়াতে হবে তার সামান্যতম অনুমানও তিনি করতে পারলেন না।

বড় পাদ্রী সব শুনে বললেন, 'এসো, দুজনাতে মিলে প্রার্থনা করি।'

সোম একদিন ওরেলিকে প্রশ্ন শুধালো মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে, 'এনি ট্রাবল?'

উত্তরের জন্য মাত্র এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে সোম গুড বাই বলে বারান্দা থেকে নেমে, লিচুতলা দিয়ে, গেট খুলে বড় রাস্তায় নেমে গেল।

ওরেলি ভাবলে মাত্র দুটি কথা, 'এনি ট্রাবল!'

স্মরণই করতে পারলো না, তার জীবনে কখনো কোনো শক্ত ট্রাবল এসেছিল কি না, যেটাকে সে কাৎ করতে পারেনি। সে তাগড়া জোয়ান, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট না হলেও ভালো, গায়ের জোরে কমতি নেই, আর পাঁচটা ইংরেজের মত তিনটে কথা বলতে গেলে সাত বার হোঁচট খায় না—তার আবার ট্রাবল। হাঁ, একটা সামান্য ট্রাবলের কথা মনে পড়ছে বটে। এমনিতে তার মুখে শুধু খই ফোটে না, টোস্ট পর্যন্ত সেঁকা যায়, তবে প্রেমের ব্যাপারে একটু মুখচোরা বলে মেবলকে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে তার তিনটে রবির সন্ধ্যা লেগেছিল বটে, কিন্তু তারপরের অবস্থা দেখে সে থ—মেবল্ বাহাত্তর রবিবারের আগের থেকেই নাকি তাকে বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে ট্রুসোর ডিজাইন বানাতে লেগে গিয়েছিল।

ইস্কুলের ব্লু, চাকরীর জন্য পরীক্ষা, রাগবীতে একখানা পাঁজর গুঁড়িয়ে যাওয়া এসব ওরেলির কাছে কখনো ট্রাবল বলে মনে হয়নি। তার একমাত্র ভয় ছিল মেবল্ যদি তাকে গ্রহণ না করে। সেই মেবলকে পেতে তার তিনটে রববার—অর্থাৎ একুশ দিনের দিবারাত্র দুশ্চিন্তা—লেগেছিল বটে, কিন্তু আজকের তুলনায় সে কত সহজ। সেদিন পথহারা ওরেলির সামনে থেকে হঠাৎ যেন কুয়াশা কেটে যায়, আর সম্মুখে দেখে বসন্তের মধুরৌদ্রে, নীল আকাশের পটে আঁকা মেবল্। 'উতলা পবন বেগে মেঘে মেঘে' যেন তার খোলা চুল উড়ে উড়ে চলেছে। হাতে তার একটি ছোট্ট ফুল। তারই এক একটা পাপড়ি ছিঁড়ছে আর বলছে, 'হি লাভস্ মি', পরেরটায় বলছে, 'হি লাভস্ মি নট্' এই করে করে ভাগ্য-গণনা করছে সর্বশেষের পাপড়িতে

লাভস্ মি' না 'হি লাভস্ মি নট'-এ জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান মিলবে। ওরেলির মনে পড়ল, মেবল সেদিন কানের ডগায় চুমো খেয়ে বলেছিল, া সব সময়ই জানতুম, শেষ পাপড়ি লাভস্ মি'-তেই শেষ হবে। একদিন হ'ল না তখন রীতিমত হকচকিয়ে ম। পরে দেখি একটা পাপড়ি আগের ই ছিঁড়ে গিয়েছিল—টুকরো খানা া বোঁটায় লেগে আছে।'

সেসব দিন চলে যাওয়ার পর আজ জিজ্ঞেস করলে এনি ট্রাবল্!

ওরেলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

তারপর আরো তিন মাস কেটে ছে। এ তিন মাসের ভিতর আরো র্তন ঘটেছে। ওরেলিরা ক্লাব দূরে কারো বাড়িতে পর্যন্ত যায়নি। তার পরিষ্কার বোঝা গেল তারা চায়ও কউ তাদের বাড়িতে আসুক। শেষ ত এক পাদ্রী মেম ছাড়া আর কেউ লি টিলায় আসত না এবং তিনিও তেন যেন অতিশয় দায়ে পড়ে, অন্ধ-অন্ধকারে কোন্ এক ভবিষ্য অমঙ্গল া-আবছা বুঝতে পেরে মানুষ কম আত্মজনের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের খরদাহের নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ্ া-কোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বাজারের বেরসিক মারোয়াড়ি পর্যন্ত শের দিকে দু' একবার না তাকিয়ে ত পারে না, আর কলেজের মেয়েরা ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার না করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের মেলায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই ক আছে, ছেলেরা তো কলেজ পাসের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম, -শাদী মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে য়ে দেয়; মেয়েরাই শুধু অজানা ্যতকে অত খানি ডরায় না বলে বে-ার প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ তে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর া বাঁচিয়ে রাখে। তবে কি রবিঠাকুর ত্ত্বটা জানতেন, তাই ছেলেদের চেয়ে দের গান শিখিয়েছেন অনেক বেশী ।?

মধুগঞ্জে এসব বালাই নেই, রাড়ি নেই বললেও চলে, কলেজ নেই তাই কলেজের মেয়েও নেই। মধুগঞ্জী বালিকাদের বিয়ে হয়ে যায় চোদ্দ পেরতে না পেরতেই। এ বিষয়ে ওয়েলশ পাদ্রী সায়েবও নেটিভ বনে গিয়েছেন, রুথ্ মেরীদের ষোল পেরুতে না পেরুতেই বরের সন্ধানে লেগে যান। তাঁর যুক্তি; প্রাচ্যে মেয়েরা বিবাহযোগ্যা হয়ে যায় অল্প বয়সেই, এদেশে বিলিতি কায়দা মেনে নিলে শুধু অনর্থেরই সৃষ্টি হয়।

বিবাহ মাত্রই প্রেমের গোরস্তান কিন্তু শান্তির আস্তানা।

তাই এখানে কোনো তরুণী অকারণ বেদনায় কাতর হয়ে রবিঠাকুরের কবিতা-গান নিয়ে নাড়াচাড়া করে না। রবি-ঠাকুর তাই সে-যুগে মধুগঞ্জে অচল।

ঠিক সেই কারণেই প্রকৃতির সৌন্দর্য-বোধ মধুগঞ্জে মদনভস্মের মত শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ এখানকার লোক নববরষনে ময়ূরের মত পেখম তুলে নাচে না, আবার উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে দলে দলে নবীন মেঘ এসে যখন শহরের কদম বনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে তখনও মানুষ সেখানে বর্ষার মধুর দিকটা সম্বন্ধে অচেতন হতে পারে না। আর হবেই বা কি করে? প্রথম যেদিন মধু-গঞ্জে কদম ফুল ফোটে সেদিন তার গন্ধে সমস্ত শহর ম ম করতে থাকে। সে গন্ধে নেশা আছে—রায় বাহাদুর চক্রবর্তীর মত রসকষহীন মানুষকেও দেখা যায় বেড়িয়ে বাড়ি ফেরার সময় এক ডাল কদম হাতে নিয়ে ফিরছেন।

কিন্তু পূব বাঙলা আসামের সায়েবরা বর্ষাকালে প্রায় পাগল হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা বাগানের ছোট ছোট টিলাতে নির্জন বাসে থাকতে বাধ্য হয়। পাঁচ মাইলের ভিতরে একটা ইংরেজ নেই যার সঙ্গে দু'টি কথা কইতে পারে, দিনের পর দিন অনবরত বৃষ্টি, রাস্তা-ঘাট জলে-জোয়ারে ভেসে গিয়েছে ক্লাবে যাবার কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত গ্রামোফোন-বাজানো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে বেশীর ভাগ সায়েবরা এই সময় দিশী রমণী গ্রহণ করে। কেউ কেউ ম্যালিরায় তাদের শুশ্রূষা লাভ করে সেরে ওঠার পর, আর কেউ কেউ একটানা নির্জনবাসের ফলে হন্যে হয়ে গিয়ে।

ও-রেলির মাথায় ইস্ক্রুপগুলো জোর টাইট করে বসানো। বর্ষা তাকে কাবু করতে পারে না। তার উপর মেবল ও পাশের চেয়ারে বসে।

তবু বোঝা গেল, এ বর্ষা ও-রেলিকে পর্যন্ত অনেকখানি ঘায়েল করে দিয়েছে। ও-রেলি মুষড়ে পড়েছে।

সাত

মাদামপুরের বড় সাহেব বললেন, 'একথাটা আমি কি করে বিশ্বাস করি বলোতো, পার্সী। মেবল্ মিশুকে হোক আর না-ই হোক ওর মত ডিসেণ্ট গার্ল আমি জীবনে অল্পই দেখেছি। কলেজ পর্যন্ত পড়েছে, উত্তম রুচি। সে কি করে অতখানি স্টুপ করবে? তুমি ছাড়া অন্য কেউ একথাটা বললে তার সঙ্গে আমার হাতাহাতি হয়ে যেত।'

বিষ্ণুছড়ার সায়েবের বয়স যদিও কম তবু এ অঞ্চলে তার খ্যাতিপ্রতিপত্তি বিচক্ষণ লোক হিসেবে, আর পরচর্চা, গুজোব রটানো থেকে তিনি থাকেন সব সময়েই দূরে এবং আশ্চর্য, যারা এসব জিনিসে কান দেয় না পাকা খবর তারাই পায় বেশী এবং আর সকলের আগে। বললেন, 'আমার কাছে এখনো সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাকে তো বললুম, কিছুটা বিশ্বাস না করলে তোমার কাছে আমি কথাটা পাড়তুম না। অবশ্য, একথাও আমি বলবো, এসব জিনিস আমি শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করারই চেষ্টা করি।'

'তোমার মেম, মীরপুরের মেম, এরা সব জানতে পেরেছে?'

'নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত না। শার্লট জানতে পারলে আমাকে রাত তিনটেয় জাগিয়ে খবরটা দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মীরপুর ছুটত এমিলিকে টেক্কা মারবার জন্য—এ্যাণ্ড ভাইস-ভার্সা। তবে খুব বেশী দিন গোপন থাকবে না। সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক, যেসব মেয়েরা মেবলের রুচিশীল ব্যক্তিত্বের সামনে নিজে-দের ছোট মনে করতো তাদের জিভের লকলকানি খুব শিগগীরই আরম্ভ হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যের পর টেনিস লনের এক কোণে বসে দুই সায়েব অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ভাবলেন। মধুগঞ্জ অঞ্চলের ইংরেজ

কলোনির আসল সর্দার এ'রাই। বিষয়টি তাঁরা আলোচনা করেছিলেন সেই কর্তব্য বোধ থেকে—এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু করতে পারেন কি না।

শেষটায় মাদামপুর হুংকার দিলেন, 'বয়, দো ব্রা পেগ্।'

খবর কিম্বা গুজোব যাই হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক—গড্ ড্যাম্ সিরিয়স—মেবল্ নাকি নেটিভ বাটলারটার প্রতি অনুরক্ত!

ঐ মিশকালো, অষ্টপ্রহর মদে-মাতাল-রাঙা-চোখওলা হোঁৎকা লোকটার প্রতি মেবল অনুরক্ত, একথা কে বিশ্বাস করবে? একমাত্র 'স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও জানেন না' এ তত্ত্ব মানলে সব কিছুই বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য স্ত্রী-নিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে বরঞ্চ জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যায়, দেবতারা না হয় দেবী-দের চরিত্র চিনতে পারেন নি, তাই বলে পুরুষকেও তার স্ত্রী জাত সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিয়ে স্ত্রী-জাতকে অপমান এবং নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে লাঞ্ছনা করতে হবে?

কিন্তু এসব তো পরের কথা। প্রথমেই যেটা মনে আসে সেইটেই মাদামপুরের বড় সাহেব বিষ্ণুছড়াকে বললেন—'হাতাহাতি হয়ে যেত'। তার পর হুড়হুড় করে মনে আসে একসঙ্গে দশটা প্রতিবাদ; ওরেলির মত সুপুরুষকে ছেড়ে? এক বৎসর যেতে না যেতে? ওরেলির এতখানি আদর-যত্ন পেয়েও? ওরেলি কি তবে জানে না?

ঠাণ্ডা-মাথা মাদামপুর বললেন, 'পার্সী', তবে কি তাই তারা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছে?'

বিষ্ণুছড়া একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু মেলা-মেশাটা বজায় রাখলেই তো মানুষের সন্দেহ হত কম।

মাদামপুর দুই ঢোকে ডবল হুইস্কি খতম করে বললেন, 'মাই গড্, নেটিভরা জানতে পারলে লজ্জার সীমা থাকবে না। ওঃ!'

'তা ঠিক, তবে কিনা জিনিসটা যখন চা-বাগিচার ভিতরে আগেও হয়েছে তখন—'

মাদামপুর বাধা দিয়ে বললেন, 'সে হর শহর থেকে দূরে, বনের ভিতর, টিলার উপরে।'

'সেকথা ঠিক, কিন্তু পাদ্রী টিলার বাচ্চারা কোথা থেকে আসে সে-তত্ত্বও তো নেটিভদের অজানা নয়।'

মাদামপুর একটুখানি অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'সে তো সাধারণভাবে, যে রকম ধরো অনাথাশ্রম হয়। কিন্তু এখানে যে ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ যাকে চেনে। তা আবার এ এস পি'র মেম! মাই গড। আমি ভাবতুম, পুরুষরা এসব ঢলাঢলিতে যত-খানি নিচু হতে পারে, স্ত্রীলোকেরা ততখানি পারে না।'

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। দেখা গেল বিষ্ণুছড়া আর মীরপুরের মেম আসছেন। সাপে নেউলে গল্প করতে করতে আসছেন এ জিনিস প্রাণিজগতে কখনোই দেখা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এক লেঙোটার ইয়ার—উহুঁ, এক ফ্রকের সই। অথচ এ'রা আসছেন ইনি ও'কে ছোবল মারতে মারতে উনি এ'কে কামড় দিতে দিতে। চোখ লাল না করে, দাঁত না খিঁচিয়ে, ফণা না বাগিয়ে ঝগড়া করতে পারে একমাত্র মানুষই—অবশ্য স্ত্রী-লোকেরাই পায় মাইকেল ও-রেলি শীল্ড—পুরুষের কপালে কনসলেশন প্রাইজ।

গুজোবটা ছড়াতে কত দিন লেগে-ছিল বলা শক্ত। গুজোবের স্বভাব হচ্ছে যে প্রথম ধাক্কাতেই সে যদি কিছুটা সাহায্য না পায়, তবে কেমন যেন দড়কচ্চা মেরে যায়। ব্যাপারটা গুরুত্ব বুঝে মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়া যদি সেটার টুঁটি চেপে না ধরতেন, তবে কি হত বলা যায় না; এ স্থলে গুজবটাকে ফের চাঙ্গা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে বেশ একটুখানি সময় লেগেছিল।

মধ্যগঞ্জের 'আণ্ডাঘরে' গুজোব মাত্রেরই জন্মমৃত্যু জরাযৌবনের বেশ একটা সুনির্দিষ্ট ঠিকুজি আছে। গুজোবের জননী যদি মীরপুরের ছোট মেম হন, তবে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অবশ্য জানা কথা, বিষ্ণুছড়ার বড় মেম তখন আঁতুড় ঘরেই বাচ্চাটাকে নুন খাইয়ে মেরে ফেল-বার চেষ্টা করেন এবং আরো জানা কথা, বেশীর ভাগ স্থলেই বাচ্চা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে নুনটা খেয়ে ফেলে দিব্য ট্যাঁ ট্যাঁ করে দুধের জন্য আপন ক্ষুধা জানিয়ে দেয়। তার কারণ বিষ্ণুছড়ার বড় মেম পাঁঠা কাটতে চান তার পদ-মর্যাদার ভার দিয়ে—তিনি বড় মেম, মীরপুর ছোট মেম—আর মীরপুর কাটে ধার দিয়ে। তার উপর ক্লাবে ছোট মেমদের সংখ্যা বেশী, কাজেই তারা সদলবল সায় দেয় মীরপুরের কথায় কথায়—হায় কার্লমার্কস্ যদি আণ্ডাঘরে একটা ঢুঁ মেরে যেতেন, তবে তিনি 'পতি বুর্জুয়াজী' আর 'অৎ বুর্জুয়াজীর' আড়াআড়ি সম্বন্ধে কত তত্ত্ব কথা না রপ্ত করে যেতে পারতেন।

আবার বিষ্ণুছড়া যদি কোনো গুজোবের 'গড্‌মাদার' হন তবে সে বেচারীকে ষষ্ঠী-পুজোর দিন পর্যন্ত বাঁচতে হয় না।

মেবলের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তার সম্বন্ধে গুজোবটা বিষ্ণুছড়া ক্লাবে বাপ্তিস্ম করেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মীরপুর বললেন, এ গুজোব তার কানে এসেছে বহুদিন হ'ল। তিনি এটা একদম বিশ্বেস করেন নি। ও-রেলি বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছে ব'লে নেটিভরা হিংসেয় এইসব আজগুবি যাচ্ছেতাই রটাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে ময়না তদন্তে মেবলের গোপনতম অঙ্গবস্ত্রের সাইজ, রঙ কিছুই বাদ পড়লো না। সেদিন কিন্তু আরেকটু হ'লে মীরপুরই লড়াইয়ে হেরে যেতেন। কারণ, দেখা গেল, মেবলের সেদিনের হিংসুটে খাটাশমুখোগুলো পাইকারি হিসেবে জুটেছে বিষ্ণুছড়ার পিছনে। আরেকটু হ'লে মীরপুরকে রণে ভঙ্গ দিতে হ'ত, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তার ফিফ্‌থ্ কলাম জুটে গেল বিষ্ণুছড়ার বড় সাহেবের সাহায্যে।

এসব কেলেংকারি-কোঁদল মেমে করে সায়েবদের বাদ দিয়ে। আজ আলোচনা কিন্তু এতই তপ্ত-গরম হয়ে উঠেছিল যে, বিষ্ণুছড়ার বড় সায়েব কখন এসে এক পাশে দাঁড়িয়েছেন কেউ লক্ষ্য করেনি।

হঠাৎ এক সময় তাঁর স্ত্রীর কথা কেটে দিয়ে বললেন, 'শার্লট, তুমি যে কথা বলছো সেটা কি খুব রুচিসঙ্গত?'

তারপর আর পাঁচজনের দিকে একটুখানি বাও ক'রে, 'আপনারা আমাকে মাপ করবেন, ব'লে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেলেন।

সবাই থ। একে অন্যের মুখের
ক ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে। বরঞ্চ
 বিষ্ণুছড়া তার খাণ্ডার মেমের কথার
তবাদ না ক'রে কোট পাতলুন ফেলে
য় আণ্ডাখেলার টেবিলের উপর ধেই ধেই
র নেচে নেচে ধর্মসংগীত গাইতে
রম্ভ করতেন তবু আণ্ডাঘর এতখানি
শ্চর্য হ'ত না, কারণ এ-অঞ্চলে সবাই
নে, বিষ্ণুছড়া তাঁর মেমকে ডরান
ীদের স্ট্রাইকের চেয়েও বেশী। তাঁর
এতখানি দুঃসাহস হ'তে পারে সেকথা
পূর্ণ কল্পনাতীত। সবাই থ। না,
নয়—একেবারে দ, ধ, দন্ত্য ন—বর্ণ-
লার শেষ হরফ পর্যন্ত।

সম্বিতে ফেরার পর মীরপুরের ছোট
ম ফিস্ ফিস্ ক'রে এস ডি
র মেমকে বললেন নিশ্চয়ই এক জালা
ইস্কি খেয়েছে, বাঘের চর্বি'র সংগে
ক্টেল বানিয়ে।'

এস্ ডি ও'র মেমের সুরসিকা-
পে খ্যাতি ছিল। ক্লাব থেকে বেরতে
রতে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা ছবিতে
খেছিলুম, হুইস্কির পিপে থেকে
দা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা হুইস্কি চুইয়ে
রচ্ছে। এক ইঁদুর ছানা সেইটে
 চুক্ ক'রে চুষে হ'য়ে গিয়েছে বেহেড
তাল। লাফ দিয়ে পিপের উপর উঠে
স্তিন গুটিয়ে চিৎকার ক'রে বলছে,
ড্যাম্ ক্যাট্টা গেল কোথায়? নিয়ে
সো এইখেনে—আমি ব্যাটার সংগে
ড়বো।'

মীরপুর বললেন, 'ভালো গল্প;
কে বলতে হবে। আপিসের কাউকে
স্মিস্ করতে হ'লে সে সেই সাত-
কাল ছ'টার সময় হুইস্কি খেয়ে আপিস
য়।'

এস্ ডি ও-মেম বললেন, 'আজ রাত্রে
চারী পার্সীর ডিনার জুটবে না। ওকে
ট-লাকে' নেমন্তন্ন করলে হয় না?'
ঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে বললেন, 'ঐ দেখো,
ার্সীকে ফেলে বেটি মোটর হাঁকিয়ে বাড়ি
ওয়ানা হয়েছে। এই বয়সে পার্সী
চারীর কি ক'রে টাক্ হ'ল বুঝতে কষ্ট
য় না। তালুতে যে কুল্লে আড়াইখানা
ল আছে সেগুলোও আজ রাত্রে ছেঁড়া
বে।'

মীরপুর ততক্ষণে আপন ভাবনায় ডুব দিয়েছেন। গুজোবটা তিনি বিশ্বাস করেন নি। কিন্তু এই যে বিষ্ণুপুরের বড় সায়েব জিনিসটাকে এত সিরিয়সলি নিলে যে, মেমকে পর্যন্ত ধমকে দিলে—তবে কি?—কে জানে?

'গুড্ নাইট!'

'গুড্ নাইট!'

আট

বিষ্ণুছড়া আণ্ডাঘরে গুজোবটার উপর যে বম্-শেল ফাটিয়েছিলেন তার ধুঁয়ো কাটতে কটতে কেটে গেল পুরো তিনটি মাস। তাঁর সাহসকে পুরস্কার দেবার জন্যই বোধ করি গুজোবটাকে মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো হ'ল—সায়েবের উপর চ'টে গিয়ে বিষ্ণুছড়ার মেমও হপ্তা তিনেক ক্লাবে হাজিরা দেন নি—ও নিয়ে বহুদিন ক্লাবে আর কোনো আলোচনা হ'ল না। আর যত বড় রগ-রগে খবর কিম্বা পরনিন্দা, পরচর্চাই হ'ক মানুষ এক জিনিস নিয়ে বেশীদিন লেগে থাকতে পারে না। পারলে কোনো ছেলেই পরীক্ষায় ফেল হ'ত না, কোন আবিষ্কারই অনাবিষ্কৃত হ'য়ে থাকত না। ইংরেজিতে এই মনোবৃত্তিরই নাম, 'গ্রাস হপার মাইণ্ড্', প্রতি মুহূর্তে হেথায় লম্ফ, হোথায় ঝম্ফ। ইতিমধ্যে আবার লাকাউড়া বাগিচায় একটা খুন হ'য়ে গেল। কুলি সর্দারের ডপকা বউ—'মিস্ সাকাউড়া'—ডিস্পেনসারির কম্পাউণ্ডারের সংগে ইয়ার্কি-ফাজলামো করছিল ব'লে সে তার গলাটি কেটে, গামছায় বেঁধে থানায় নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে পেশ করেছে। পথে পড়ে চ্যাঙের খাল, তার সাঁকোতে এক পয়সা ক'রে 'পোল্' ট্যাক্স দিতে হয়। সর্দারকে বাধা দিতে সে বললে, সরকারী কাজে থানায় যাচ্ছে, তার ট্যাক্সো লাগবে না।

'কি সরকারি কাজ?'

সর্দার গামছা খুলে, মুণ্ডুটা দেখালে। সবাই নাকি দেখামাত্র পরিত্রাহি চিৎকার ক'রে চুংগীঘরের দরজায় হুড়কো মেরে জানলা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুই শিগ্‌গির যা, তোর ট্যাক্সো লাগবে না, এ সত্যই বড্ড জরুরী সরকারী কাজ।'

সর্দার নাকি এদের ভয় দেখে একটুখানি তাজ্জব মেনে গিয়েছিল। ধীরে সুস্থে মুণ্ডুটা ফের গামছায় বেঁধে হেলে দুলে থানার দিকে রওয়ানা দিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মরতুজা সাহেবের এজলাসে যখন সর্দার দাঁড়ালে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই মেয়েটাকে খুন করতে গেলি কেন?'

সর্দার বললে, 'করবো না? বেটি আমাকে বললে, 'দেখ সর্দার, আমার উপর তুই যদি চ'টে গিয়ে থাকিস তবে আর কোনো মেয়েছেলেকে নে না, এই দুনিয়াতে আমিই তো একহ-ইঠো লড়কী নই। আর তোকে যদি আমার ভালো না লাগে তবে তুইও তো একহ-ইঠো মর্দ নস; তুই বেছে নে তোর-টা, আমি বেছে নি হমার-ঠো।' ঐসী বেতমজী? হারামজাদী, আমার মুখের উপর এইরকম বেশরম বাৎ বললে। তাকে খুন করে আমি সরকারী কাম করেছি, হুজুর। আমাকে এরা বেহক্ হাজতে পুরে রেখেছে, আপনিই বলুন হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট সর্দারকে দায়রায় সোপর্দ করার সময় আসামীর দিকে তাকিয়ে ইংরিজিতে বললেন, 'দেয়ার ইজ এ লট্

অব ট্রুথ ইন ওয়াট দি গার্ল সেড্! ঐ খাঁটি কথাটি মেনে নিলে পৃথিবীতে খুনের সংখ্যা অনেক কমে যেত।'

এই নিয়ে ক্লাব মেতে রইল খুনের খবর পেঁছনর থেকে সর্দারের চোদ্দ বছর জেল পর্যন্ত। তারপর ঐ লাকাউড়া বাগিচারই ছোট সাহেব করলে আত্মহত্যা। কেন ক'রল তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। কেউ বললে, দেশে যে মেম সায়েবের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা-পাকি ছিল সে নাকি আর কারো সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে, কেউ বললে, সায়েব যে এদিকে এক কুলী-রমণীর কৃষ্ণালিঙ্গনে চব্বিশ ঘণ্টা চুর হয়ে থাকত সেই খবর শুনে সে রমণী অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে, কেউ বললে, তিনমাসব্যাপী ঝাড়া বাদলের ঠেলায় টিলার নির্জন বাসে ক্ষেপে গিয়ে মদ ধরে—তাও আবার কুলীদের ধান্যে-শ্বরী—তারপর দিবা রাত্তিরের সে মদের নেশার ছ' ঠ্যাঙওলা বাঘের দিকে সে অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে, শেষটায় বাঘ নাকি তার মাথার ভিতর ঢুকে যায়, চিৎকার ক'রে সেই ফরিয়াদ জানাতে জানাতে একদিন সেই বাঘকে আপন কানের ভিতর দিয়ে পিস্তলের গুলি চালিয়ে খুন করে।

ততদিনে ও-রেলিদের কথা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে। ক্লাব যখন গুজোবের তাড়িতে মত্ত তখন ও-রেলিদের বংশধর জন্মের খবর পেঁছিল পানসে শরবতের মতো। কেউ সামান্য চাখলে, অর্থাৎ জিজ্ঞেস করলে, তাই নাকি, কবে হ'লো? কেউ সামান্য ভুরু কোঁচকালে। মুরুব্বিরা বললেন, 'ভালোই হয়েছে, বাচ্চাই অনেক সময় বাপ-মায়ের মাঝে সেতু হ'য়ে দু'জনাকে এক ক'রে দেয়।'

শুধু বিষ্ণুছড়ার মেম বাঁকা হাসি হেসেছিলেন।

'সে হাসির অর্থ বলা কিছু শক্ত, কারণ এটা ব্যক্ত'—দু জাহাজের মাঝখানে তক্তা পেতে যেমন এ জাহাজে ও জাহাজে জোড় লাগানো যায় ঠিক তেমনি ঐ তক্তা তুলে ধাক্কা মেরে দু' নৌকোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়িয়েও দেওয়া যায়।

পয়লা বাচ্চার বাপ্তিস্ম করার সময় ক্যাথলিকরা ধুমধড়াক্কা করে বাঙালী ঠাকুরদার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশনের চেয়েও বেশী। মেবল কিন্তু সব-কিছু সারতে চেয়েছিল সাদামাঠাভাবে। ও'রেলি দেখা গেল ঠাকুরদা গোত্রের। সে চায়, পালা-পরব করতে। ওদিকে পাদ্রী জোনস্ সাহেব প্রটেস্টানট্—তিনি ক্যাথলিকের বাচ্চাকে বাপ্তিস্ম করবেন কি করে? এ যেন পাঁড় বোষ্টমের ছেলেকে শাক্ত দিচ্ছে মন্ত্রদীক্ষা—শ্মশানে মড়ার উপর মুখোমুখি ব'সে, মড়ার খুলিতে কারণ-ভর্তি-হাতে! ও'রেলি কিন্তু জোনস্কেই অনুরোধ ক'রলে বাপ্তিস্মের তাবৎ ব্যবস্থা করতে।

গড্-ফাদার অর্থাৎ ধর্ম-পিতার অভাব মধুগঞ্জে হ'ত না। মাদামপুরের বড় সায়েব, ডি এম, যে-কেউ আনন্দের সঙ্গে রাজী হ'তেন, 'পুয়োর ডেভিল—বেচারা —একলা-একলি মন-মরা হ'য়ে থাকে, ঐটুকুতে যদি সে খুশী হয় তবে হোয়াই নট্—নিশ্চয়ই—অফ কোর্স—অবশ্যি, অতি অবশ্যি।' কিন্তু ওদিকে দেখা গেল, ও'রেলি পাঁড় ক্যাথলিক। ক্যাথলিক বাচ্চার গড্-ফাদার হবে প্রটেস্টানট্! মন্ত্র যে খুশী পড়াক, বাপ্তিস্ম যে খুশী করুক, সে তো পাঁচ মিনিটের ব্যাপার; কিন্তু ধর্মবাপ তামাম জীবনের। সেখানে প্রটেস্টানট্ হ'লে চলবে কেন? কলমা যে খুশী পড়াক কিন্তু মুরুশীদ ধরার সময় দেখে-বেছে নিতে হয়।

ও'রেলি পরিবার বাদ দিলে মধুগঞ্জে আছে মাত্র একজন ক্যাথলিক—বাটলার জয়-সূর্য। ও'রেলিদের মতই একেবারে খাঁটী। ও'রেলি বললে, সে-ই হবে ধর্ম-বাপ। শুনে পাদ্রী সায়েব পর্যন্ত অনেক 'যদি' অনেক 'কিন্তু' অনেক 'ইউ নো হোয়াট আই মীন' অনেক 'বাট অফ কোর্স' ব'লে ইতি-উতি ক'রে মৃদু আপত্তি জানিয়ে-ছিলেন, এমন কি, কলকাতা থেকে তাঁর পরিচিত ভদ্র ক্যাথলিক আনাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন বলেছিলেন কিন্তু ও'রেলি একদম নেই-আঁকড়া,—ব'লে, ধর্মের চোখে সব ক্যাথলিকই বরাবর—পোপ যা, জয়সূর্যও তা।

ও'রেলির কথার কোনো জমা-খরচ পাওয়া গেল না। বাপ্তিস্মের বেলায় সে দিল দরিয়া—হেরেটিক প্রটেস্টানট্ই সই অথচ ধর্ম-বাপের বেলা সে কট্টর—ক্যাথলিক না হ'লে জর্ডনের জল অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। তখন 'বিদেশী ঠাকুর ছেড়ে দেশের কুকুর'। ওদের ভাষায় বলতে হ'লে 'মাই রিলিজিয়ন রাইট অর রঙ্, মাই মাদার—ড্রাঙ্ক অর সোবার।'

হ্যাঁ, 'ড্রাঙ্ক অর্ সোবার' কথাটা ওঠাতে ভালোই হ'ল। জয়সূর্য পৃথিবীর আর পাঁচ লক্ষ বাটলারের মত অধিকাংশ সময়ই থাকে ড্রাঙ্ক আর সোবারের মাঝখানে। আর মোকা পেলেই গুত্তো খেয়ে ড্রাঙ্কের দিকেই কাৎ। অবশ্য তাকে গড্-ফাদার হ'তে হবে শুনে তন্মুহূর্তেই বেচারার নেশা কেটে গিয়েছিল। গবেটের মত বিড় বিড় ক'রে কি একটা ব'লতে গিয়ে খেল ও'রেলির ধমক আর কড়া তম্বী,—অন্তত পরবের দিনটায় যেন সে সাদা চোখে গির্জায় যায়।

সে এক বিচিত্র বাপ্তিস্ম। মেবল দ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে অল্প অল্প কাঁপছে, ও'রেলি পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে, পাদ্রী সায়েব নার্ভাস, আর জয়সূর্য তার বরাবরের গির্জের পোশাক প'রে বিহ্বলের মত এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। সবাই ভাবলে, ব্যাটা আজও টেনে এসেছে।

একমাত্র সোমই ঠাণ্ডা মাথায় সব-কিছুর তদারক করল। পাদ্রী টিলার মেয়েদের বেশীর ভাগই জয়সূর্য জাতের —পরবের উৎকট দিক্টা শুধু তাদেরই চোখে ধরা পড়ল না।

বাপ্তিস্মের পরই কিন্তু গির্জে থেকে বেরিয়ে জয়সূর্য না-পাত্তা। সন্ধ্যের সময় সোম তাকে খুঁজে বের করল উজান গাঙের ঘাটে বাঁধা এক নৌকর ভিতর। দু' বোতল ধান্যেশ্বরী শেষ ক'রে বুঁদ হ'য়ে ব'সে আছে।

সব খবরই আড্ডা-ঘরে পেঁছল।

বিষ্ণুছড়ার মেম বললেন, 'ডিসগ্রেস-ফুল!'

মাদামপুর তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে বললেন, 'থাক! এবার থেকে ওদের আর একদম ঘেঁটিয়ো না। কাট্ দেম একদম ডেড্। কি যে হল, কি যে হ'চ্ছে কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

দিশী কথায় বলে ঐ বুঝলেই তো পাগল সারে।

(ক্রমশঃ)

গ্রামীন সংস্কৃতি ও শিক্ষা

শান্তিদেব ঘোষ

আ**মাদের** দেশে প্রচলিত কথায় বলে, ছেলেটাকে লেখাপড়া ানো হচ্ছে 'মানুষ' হবে বলে। এখানে নুষ' হওয়া বলতে এই অর্থ করা হয় যে ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল পাশ বে, ভাল মাইনের চাকুরী পাবে, ও া জমাতে যে জানে। এপক্ষে যার টা নেই, বা চাকুরীজীবনে যে তেমন তি করতে পারল না, সাধারণতঃ কেই আমরা বলি 'মানুষ' হল না।

এই কথাটার অর্থ যদিও আমরা াদের মত সহজ করে নিয়েছি, কিন্তু অর্থ আরো গভীর, আরো ব্যাপক। জনীয় গুরুদেবের ভাষায় একে বলা মনুষ্যত্বের সমগ্র বিকাশ। অর্থাৎ ৎকে জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে ও আনন্দ- প একত্র পাওয়াকেই মানুষ হওয়া । অথবা জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে ও ন্দরূপে প্রকাশিত যে বিরাট বিশ্ব, ুষ যে তারই অংশ বিশেষ, তার থেকে ছন্ন নয়, এই অনুভূতির উন্মেষই ুষের মনুষ্যত্ব।

নিজের জ্ঞানের নাগালে তিন রকমে রা জগৎকে পেতে পারি। এক হচ্ছে নীকদের দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপ- ক জানার দ্বারা পাওয়া, দ্বিতীয় হল ানিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে জাগতিক র স্বরূপকে প্রকাশ করে তাকে ত করার দ্বারা পাওয়া, তৃতীয় হল ট, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও অনুভূতির দ্বারা িতক আনন্দের নানা প্রকাশকে হৃদয়ে ন করার দ্বারা পাওয়া।

আনন্দের সম্বন্ধে জগৎকে পাওয়া তে আমরা বুঝি যে, এই বিশ্বপ্রকৃতি ছ একটি বিরাট আনন্দের প্রকাশ। শ, বাতাস, আলো, গাছপালা, ফুল- , পশুপাখী, নদনদী, অরণ্য, পাহাড় াদি নানারূপে, রঙে, বর্ণে, গন্ধে, ও শব্দে সর্বদাই সেই আনন্দময় পকেই প্রকাশ করে চলেছে। মানুষ ই সেই প্রকাশেরই একটি অংশ শষ। "মানুষ আপনার সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখতে পায়" বলেই শিল্পীর শিল্পে, কবির কাব্যে, সুরকারের গানে বাজনায়, নর্তকের নাচে মানুষের সেই- জন্যেই এত অনুরাগ।

এইভাবে জ্ঞানে, কর্মে ও আনন্দে মানুষ জগতে ব্যাপ্ত হবে, মনুষ্যত্বের এই লক্ষ্য। এইরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশের দ্বারা চিত্তের যে ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় তাকেই গুরুদেব বলেছেন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে আসে শান্তি, আসে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মসংযম আসে, এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে। মনুষ্যত্বের এই সত্যটিকে স্বীকার করে প্রাচীন ভারতের মানুষ তার সমাজকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। এর একটিকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যতক্ষণ মানুষ বলে নিজেকে পরিচয় দেবার স্পর্ধা রাখি।

মনুষ্যত্বের এই সত্যকে পরিপূর্ণ- ভাবে প্রথম স্বীকার করেছিলেন আমাদের দেশের তপোবনবাসী মুনি বা ঋষিরা। প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার মূলে ছিলো এই আদর্শটি। সেই তপোবনে যে ঋষিরা সাধনা করতেন, তারা ছিলেন গৃহী, সঙ্গে থাকতো তাঁদের স্ত্রী, পরিজন। শিষ্যেরা সন্তানের মত তাঁদের সেবা করত বিদ্যালাভের উৎসাহে। আশ্রমের গরু চরানো, দুধ দোয়ানো, বনেজঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করা, অতিথিসেবা ইত্যাদি আশ্রমের সব রকম নিত্যকর্ম তাদেরই করতে হতো। কঠোর দৈহিক পরিশ্রম ও নিয়মনিষ্ঠার জীবনের অবসরে এই আশ্রমবাসীরা গুরুর কাছে উচ্চতম নানা জ্ঞানের শিক্ষা পেতেন। এই শিক্ষা আজকালকার মত কেবলমাত্র বইপড়ার শিক্ষা নয়, তা ছিল তাঁদের দেহমন ও বুদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত শিক্ষা। এর মূলে ছিলেন গুরু, তাঁর জীবনই ছিল শিষ্যদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা। নিজের জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে গুরু আশ্রমের মধ্যে রচনা করতেন "কল্যাণের সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাস- মোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি।"

লোকালয় থেকে দূরে বিশ্বপ্রকৃতির নির্জন আবেষ্টনের মধ্যে এই আশ্রমগুলি গড়ে উঠতো। সেখানে অরণ্য, পাহাড়, নদী, সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি-দিন, চন্দ্র-সূর্য, পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাস, নানা ঋতুর বৈচিত্র্য কতভাবে, রসে, শব্দে, বর্ণে, গন্ধে আশ্রমবাসীদের মনে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর কার অনন্ত আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত করেছে। এইভাবে তপোবনের ঋষিরা চেয়েছিলেন প্রকৃতি তরুলতা, জীব- জন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করতে। মানুষ যে বিরাট এক-এরই একটি অতি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ এই অনুভূতির প্রতি ছিল তাঁদের লক্ষ্য। সেই কারণেই তখনকার নানা সমাজ তপোবনের জ্ঞান- চর্চার জীবনকে অতিবড় সম্মান দিত এবং আশ্রমগুরুকে বলত ঋষি।

দেশের জনসাধারণ সাক্ষাৎভাবে এই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ছিল না। কিন্তু আর একভাবে এই আশ্রম জীবনের শিক্ষা থেকে জনসাধারণ বিশেষ লাভবান হত। যখন ব্রহ্মচর্যের জীবন সমাপ্ত করে এই বিদ্যার্থীরা যৌবনে নিজেদের সমাজে ফিরে গৃহী হতেন, তখন সমাজ তাদের এতদিনকার আহরিত জ্ঞানকে নানাভাবে কাজে লাগাতেন। এবং এ'রাই হতেন তখন সেই সমাজের প্রকৃত চালক। তার পরে গার্হস্থজীবনে সংসার ও সমাজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিয়ে, বৃদ্ধ- বয়সে স্বামী স্ত্রীতে ফিরে যেতেন সন্যাস- ধর্মে, সেই তপোবনে, যাকে বলা হত বানপ্রস্থ। এইভাবে তাঁদের জীবনটি ছিল বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক একটি পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন। এরা মনুষ্যত্বের সাধনায় নিযুক্ত থাকতেন আজীবন, আর মানব সমাজ এদের এই সাধনার ফল ভোগ করত। সমাজের মঙ্গলার্থেই এ'দের জীবন ছিল উৎসর্গীকৃত। এ'দের আদর্শে

অনুপ্রাণিত সমাজে এমন কতগুলি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যে, সেই আবহাওয়ায় বাস করে তার ভালমন্দের একটা ছাপ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পড়তো।

তপোবনের শিক্ষায় বর্ধিত শিক্ষার্থীরা ছিলেন ধর্মভীরু, আধ্যাত্ম চিন্তাই ছিল তাদের জীবনের মূল ভিত্তি। এ'রা ইচ্ছা করলে আত্মোন্নতির চেষ্টায় একান্তে, সমাজের বাইরে, একলা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তা তারা করেননি। সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথা তারা কখনো ভোলেননি। সমাজের উপকারার্থে তাঁরা নানারূপ অধ্যাত্ম-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গণিতশাস্ত্র, অনিষ্ট-শাস্ত্র, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধপদ্ধতি, ভূগর্ভরত্ন-জ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (গন্ধদ্রব্যরচনা, নৃত্যগীতাদি), ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র ভালরকমে চর্চা করেছেন। সকলেই যে একসঙ্গে সবেরই চর্চা করতেন তা নয়। সামর্থ্য ও পছন্দ-মত বিদ্যার চর্চা হত। কেউ একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করেছেন, কেউ করেছেন একাধিক বিষয় নিয়ে।

এইরূপে ধর্মকেন্দ্রিক সর্বাঙ্গীন শিক্ষার ধারা আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগেও বৌদ্ধদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল। তক্ষ-শীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা থেকে শুরু করে আফগানিস্থান, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি নানা দেশে স্থাপিত ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত বিখ্যাত সব প্রাচীন বিদ্যা-কেন্দ্রগুলি তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। এইসব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রে ছিলেন গুরুরা, যারা মানবের কল্যাণের চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। গুরুদের জীবনকে আদর্শ স্বীকার করে দলে দলে ছাত্র আসত দেশ-বিদেশ থেকে সেই সব বৌদ্ধবিহারে। জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একত্র সাধনাই ছিল এইসব বিহারের আদর্শ। এইসব বিহারকে ঘিরেই তখনকার যুগের নানা-প্রকার উচ্চজ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, নৃত্যগীতবাদ্য বিকাশ লাভ করে। বৌদ্ধ মঠে নৃত্যগীতবাদ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল, তার পরিচয় পাই তিব্বতে, চীন, জাপান ও কোরিয়ার বৌদ্ধ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা। এই সব বিহার বা মঠের সন্ন্যাসীদের কেন্দ্র করেই সে যুগের চিত্রকলা, মূর্তি, স্থাপত্যশিল্প ভারতীয় সভ্যতাকে একটি বিশেষ গৌরবের আসনে বসিয়ে গেছে। এইসব বিহারগুলি সবই স্থাপিত হয়েছিল রাজ-ধানী থেকে দূরে, প্রকৃতির শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে তপোবন ও বৌদ্ধবিহার-গুলি সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের কল্যাণার্থে গড়ে উঠেছিল। এগুলি ছিল যেন মনুষ্যত্ব সাধনের এক একটি গবেষণাগার। আর সেই গবেষণার উদ্দেশ্যে যারা নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করতেন, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু। এখানকার সাধনা কেবল প্রাণহীন নোট মুখস্ত করার সাধনা নয়, বা কেবল বুদ্ধির দ্বারা বিচারের সাধনা এ নয়, এই সাধনা চলত জীবনচর্যার সঙ্গে, দেহের রক্তমাংসের সঙ্গে এক ক'রে নিয়ে। এবং এখানকার শিক্ষাকে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাণেরই অঙ্গবিশেষ বলে মনে করত। কেবল বক্তৃতার দ্বারাই গুরুরা নিজেদের কর্তব্য পালন করতেন না, তাঁরা সেই মত নিজের জীবনকেও আদর্শরূপে শিষ্যদের সামনে সব সময় ধরতে চাইতেন। এ ছাড়া আশ্রম বা বিহারের জীবনের মধ্যে এমন একটি অনুকূল আবহাওয়া তাঁরা রচনা করতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেই আবহাওয়াটির প্রভাবও বড় কম ছিল না। অর্ধেক শিক্ষা তার মধ্যেই তাঁরা গ্রহণ করতেন বিনা চেষ্টায়, বাকিটা গুরুর তত্ত্বাবধানে চেষ্টার দ্বারা। বিহার ও তপোবনের জীবন যে কিরকম সার্থক ছিল তার পরিচয় পাই সেই আশ্রমবাসী ঋষি ও বিহারবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা রচিত বিপুল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের নমুনা থেকে। বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের গুহাবাস বা বিহারের যে ভগ্নাবশেষ আজও আমরা দেখি তার থেকে তাদের মনুষ্যত্ব সাধনার সর্বাঙ্গীন পরিচয়ের একটি পরিষ্কার পরিচয় মেলে। বেশ অনুভব করি সে যুগের মনুষ্যত্ববোধ এ যুগের তুলনায় কতখানি উন্নত ছিল। এবং তা ছিল বলেই সে যুগের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য আজও আমাদের কাছে প্রেরণার বিষয় হয়ে আছে। এ যুগের আমরা প্রাচীন সেই সব গুহা বা বিহারের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে যাই বিস্ময়ে। এবং ভাবি মনুষ্যত্বের সাধনা কতখানি সফলতা লাভ করতে পারলে না জানি এমনটি সম্ভব।

পূর্বেই বলেছি এ'দের এই সাধনা ছিল সমগ্র মানবের মঙ্গলের সাধনা। তাই গ্রামকেন্দ্রিক প্রাচীন ভারতের সমাজে এই সাধনার ধারাকে এমনভবে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো যে, কোন গ্রামে বাস করে গ্রামবাসীরাও এই সাধনার ফল থেকে বঞ্চিত হতো না। কারণ তারা এটা জানতেন যে, সমস্ত মানব সমাজের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ তপোবনবাসী মুনি বা বিহারবাসী ভিক্ষু বা শ্রমণদের মধ্যেই যদি কেবল এই সাধনার কাজ বন্ধ থাকে তবে তা বিফল। সকলের জন্যে যে সাধনা চলেছে তার ফল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেইজন্যে গ্রামে সাধারণ জীবনের সঙ্গে ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নানা শিল্পকল ও অভিনয়ের একটা সহজ আবহাওয় রচনা করে দেবার চেষ্টায় তাঁরা ছিলেন এবং সে পথে কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

তপোবন ও বিহারের শিক্ষায় ছি কঠোর পরিশ্রমসাধ্য একটি সাধনা ধারা। অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে, ধ্যানে জীবনের সাহায্যেই তা প্রকাশ পেত সাধারণ মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করা ব আয়ত্ত করা সব সময় সহজ হত না গ্রামের জীবনে আমরা সে সাধনা আশ করতে পারিনা, কারণ সংসারের নানাপ্রকার আলোড়নের মধ্যে তাদের মন থাকে বিক্ষিপ্ত হয়ে। তাই এই সব সন্ন্যাসীরা গ্রামের সমাজের জন্যে এমন একটি পথ আবিষ্কার করলেন যে, সে পথে যদিও সন্ন্যাসী পরিচালিত বিদ্যালয়ের কঠোর সাধনা নেই, কিন্তু তাতে ক'রে দেওয়া হল মনুষ্যত্ব সাধনার পথে এগোবার সুযোগ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বস্তুনিরপেক্ষ ভারতীয় দর্শনের গভীর চিন্তা জনসাধারণের পক্ষে সহজে অনুভব করা সম্ভব ছিল না বলেই তাকে দেবদেবীতে রূপ নিতে হল, এবং তাদের ঘিরেই কত রকমের পৌরাণিক গল্পের মাধ্যমে সেই সব দুরূহ কথাগুলিকে ঘুরিয়ে বলা হল এবং প্রাচীন ভারতের বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠলো কেবল এই

। এ ছাড়া গ্রামজীবনে, দিন, মাস সরে নানাপ্রকার কাজ, অনুষ্ঠান ও ার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে মনুষ্যত্ব- । চিন্তাকে কত সহজেই না সমাজের এক করে দেওয়া হয়েছিল। আজ- বাইরে থেকে দেখতে সেই সব ঙ্গক অনুষ্ঠানের অনেক কিছুকেই ্যাক বলে মনে হলেও তখনকার ধর্মকেন্দ্রিক সামাজিক শিক্ষার পথে একেবারেই নিরর্থক ছিল না। । উৎসব অনুষ্ঠানের ও দৈনিক র্মের সাহায্যেই দেশের লোক এক- জ্ঞান, ধর্মচিন্তা, নানা শিল্প ত্য, গীতবাদ্য, নৃত্যে, অভিনয়াদিও সব উপলক্ষে নানাপ্রকার সাজসজ্জার । দিয়ে সৌন্দর্যবোধের একটা সহজ স্বাভাবিক আবহাওয়া তারা গড়ে ত পেরেছিলেন। এবং সব ক্ষেত্রেই রুচিবোধের একটা ভাল মান তাদের দেখা গিয়েছিল। এইভাবে একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করে গ্রামের জর মনকে মনুষ্যত্ববোধের পথে গ রেখেছিলেন। বলতে গেলে তীয় শিক্ষার পথে তপোবনের যুগ, ধযুগে প্রায় এক আদর্শে এবং এক ভারতকে নিয়ে গেল। এর পরে এল লমান যুগ তার ভিন্ন ভাবধারা নিয়ে। কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার প্রাচীন ঘাঁটি ন সরকারী সাহায্যের অভাবে ধ্বংস বটে কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার যে াটি তারা চালু করে গিয়েছিলেন বাসীরা তা হারালো না। গ্রামের শালা, টোল চতুষ্পাঠি নামে ছোট বড় । বিদ্যালয়ের সাহায্যে, পূজা পার্বণ, মোদ আহ্লাদ উৎসবাদি, নৃত্যগীত, । কথকতা, ব্রতাদির ভিতর দিয়ে ারণ শিক্ষার ধারাটি বয়ে চলতে ল। ভারতে মুসলমান সভ্যতা জিদকে কেন্দ্র করে কেবল মাত্র ধর্ম- ক্ষার দিকেই বিশেষ করে ঝুঁকে ছিল, জিদকে বা তাদের ধর্মগুরুকে কেন্দ্র র সর্বাঙ্গীন শিক্ষার বিকাশ লাভ রনি। শিক্ষার অনেক বিষয়কে তারা র্মের প্রভাব থেকে আলাদা করে নিয়ে- ল। যেমন চিত্রকলা, নৃত্যগীত তার ধ্য একটি। তা সত্ত্বেও মুসলমান যুগে মের প্রাচীন ধারাটি অব্যাহত রয়ে গেল, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘট্‌ল না। এ যুগে হিন্দুরা মন্দিরকে ঘিরে উচ্চতর জ্ঞানের সাধনার ধারাটি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে, তাতে আগের মত সর্বাঙ্গীন শিক্ষার চর্চার ধারাটি রইল না। দেশের রাজনৈতিক উত্থানপতন কত কি ঘটে গেল, তার ধাক্কায় বড় বড় জ্ঞানের বহু-কেন্দ্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হল, অথচ গ্রামে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেউ ধ্বংস করতে পারল না। সে রইল বেঁচে আপনার জোরে। সেইজন্যেই গ্রাম থেকে ডেকে নেওয়া হয়েছে জ্ঞানবীর, কর্মবীর, আনন্দের সাধক নানা শিল্পীদের রাজ-দরবারে, ধনীদের দরবারে। অনেক রাজা রাজধানীতে রাজসভা সাজাতেন গ্রাম থেকে গুণীদের ডেকে এনে। রাজধানীতে গুণী তৈরী হয়েছে এমন খবর খুব কমই শোনা যায়।

গ্রামের এই গৌরবময় প্রাধান্য মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্তই প্রায় অটুট ছিল। তা নষ্ট হতে শুরু করে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ থেকে এবং এই শাসন-ব্যবস্থা গত দুই শতাব্দীর মধ্যে গ্রামের জীবনকে সব বিষয়ে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে। বর্তমানে আমরা গ্রামের যে মৃতপ্রায় নিরানন্দময় জীবনযাত্রার
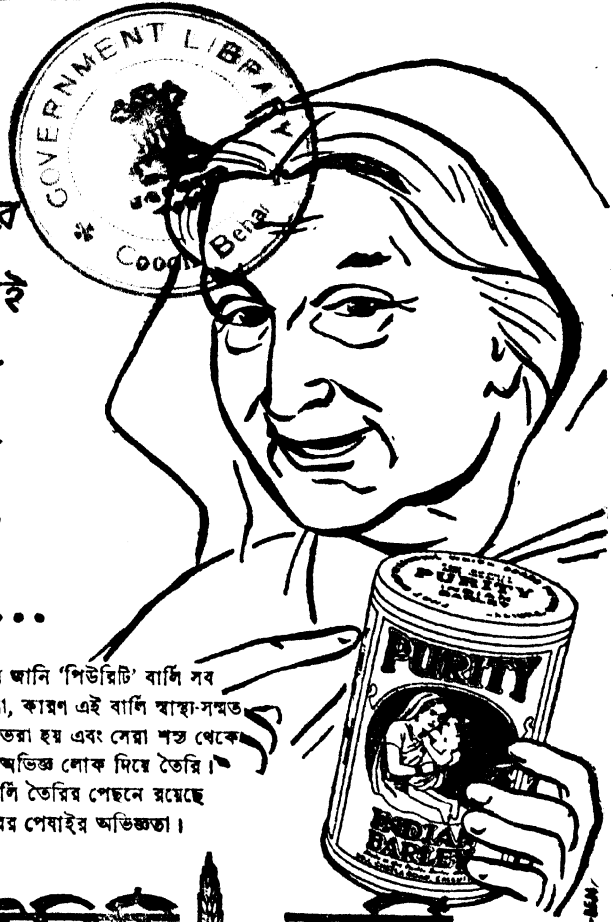
নমুনা দেখ্ছি এ হ'ল সেই কুশাসনের বিষময় ফল। এরাই গ্রামের স্বাবলম্বনের শক্তিকে ধীরে ধীরে খর্ব করেছে। এবং আজ গ্রাম সব দিক থেকে এমন অসহায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, দেখে মনে হবে যে, গ্রামকে বোধহয় তার পুরাতন গৌরবের আসনে আর বসানো যাবে না।

প্রাচীনদের সঙ্গে আমাদের দেশের ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষাধারার প্রধান পার্থক্য হ'ল এই যে, এ শিক্ষাপদ্ধতি সমগ্রভাবে সমাজের মঙ্গল কামনা বা মনুষ্যত্বের বিকাশের পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত নয়। জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একত্র সাধনার দ্বারা মানুষ গড়বার আদর্শ এর সামনে নেই। বড় আদর্শের কথা ছেড়ে দিয়েও আমরা যদি কেবল লেখা-পড়া জানার দিক্ থেকে বিচার করি তা'হলেও দেখ্তে পাবো যে, ইংরাজ রাজত্বের যুগে তারও কি রকম পতন হয়েছে। যে যুগে শতকরা ৭০।৭৫ জন লোক লিখতে পড়তে পারত, ইংরাজ যুগে তার সংখ্যা কম্তে কম্তে এসে দাঁড়াল শতকরা ৮।১০ জন মাত্র। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠল রাজধানীতে শহরকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে। সেখানে প্রাচীন যুগের মত মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সাধনা বন্ধ হ'ল। শুরু হ'ল শতকরা ৮।১০ জন দেশবাসীর মধ্যে সাধারণভাবে কতগুলি বই পড়ার বিদ্যার প্রচার, যার সঙ্গে জীবনের কোন যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষায় গুরুর জীবন শিক্ষার্থীদের জীবনকে কোন বড় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে না। পঠন-পাঠন চলে একনিয়মে, গুরু ও ছাত্রদের জীবনের গতি আর এক দিকে। জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একত্র যোগে যে মনুষ্যত্বের সাধনার কথা প্রাচীনেরা বলতেন, বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় তার কোন পরিচয় নেই। বই পড়া ও লিখ্তে পারলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ল ব'লেই আমরা মনে করি। মনে করি, শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে তার যোগ না থাক্লেও চলে। আরো মনে করি, এ শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের, আনন্দের চর্চার স্থান না থাকাই উচিত। যে কারণে এতদিন পর্যন্ত নৃত্য গীত-বাদ্য, অভিনয়ে ও নানারূপ শিল্পকলার চর্চা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কি সাধারণ বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেল না।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষা-পদ্ধতির গ্রামসমাজে কোন প্রভাব পড়েনি, কিন্তু এরই প্রাধান্যে গ্রামের প্রাচীন ধারার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও নষ্ট হ'য়ে গেল। শিক্ষা যে মনুষ্যত্ব সাধনারই প্রয়োজনে যুগে যুগে চালিত হয়েছে, বর্তমান যুগের ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেকথাটা সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। আমরা, আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ব'লে অহংকার করি, তারা ভারতের চিরকালের শিক্ষার আদর্শে যে কতখানি অশিক্ষিত তা ভাবা উচিত। আমাদের দেশের এ যুগের চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে কয়েকজন, এই কারণেই বারে বারে সতর্ক ক'রে ব'লেছিলেন যে, দেশের বর্তমান শিক্ষাধারা আমাদের মানুষ করে না, আমাদের কয়েকটা বই মাত্র পড়ায়। এই শিক্ষার পরিবর্তন আবশ্যক। ৫০ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুনভাবে প্রথম চিন্তা ক'রেছিলেন পূজনীয় গুরুদেব এবং হাতে কলমে সেই পথে কাজও শুরু করলেন তখনই এবং আজ বিশ্বভারতীকে যেভাবে দেখছি এ হ'ল তাঁর সেই চেষ্টার প্রকাশ মাত্র। বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়ে তিনি শিক্ষার যে আদর্শ প্রচার করলেন তার সঙ্গে প্রাচীন যুগের তপোবনের ও বৌদ্ধ বিহারের শিক্ষার আদর্শের বহু পরিমাণে মিল আছে। যেখানে ধর্ম, কর্ম ও আনন্দের একত্র প্রকাশকেই আদর্শ ব'লে মানা হ'ত।

অপূর্ণ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার
দিয়েছো আমার হাতে,
এই ভেবে আমি যতো খেয়া পারাপার
করেছি গভীর রাতে,
প্রতিবার তরী কান্নায় শুরু হয়,
কান্নায় ডোবে জলে—
হাসিমুখে কেন তবু হে বিশ্বময়
তোমার তরণী চলে?

তারপরে তীরে ফিরে আসি নিরালায়;
মূর্খ নেশায় ভাবি,
দূর থেকে তুমি আসবে অধীর পায়ে,
বলবেঃ 'আমার দেশে
তোর সেই খেয়া উজানে গিয়েছে ভেসে,
ফিরিয়ে আনতে যাবি?'

উত্তর দেবোঃ 'সেই তরী তুমি নাও,
ছিন্ন সে-পাল তুলে
আজ তবে শুধু একবার পাড়ি দাও
এ-নদীর কালো চুলে;
দেখি কোন্ ফুলে প্রফুল্ল করো তার
শোকার্ত শর্বরী—
এই পারে আমি বাসিফুল তুলি আর
বালির পসরা করি॥

॥ দশ ॥
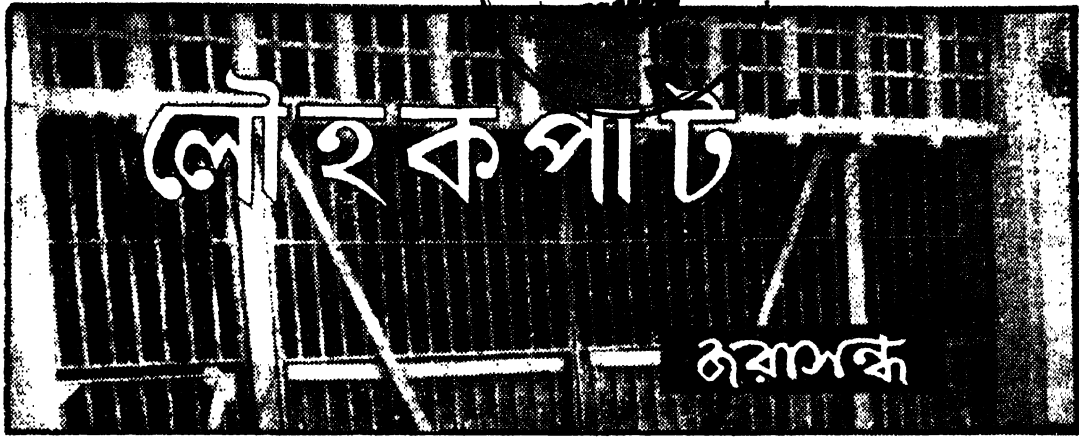
আফিসে এসে দেখলাম, ব্যস্ততা দেখাবার মত উপকরণ টেবিলে শষ কিছু সঞ্চিত নেই। অগত্যা ডাকের লটা টেনে নিয়ে উলটে পালটে ছিলাম। তাও এক সময়ে শেষ হয়ে ন। তখন সব শেষের চিঠিখানার দিকে থ রেখে চুপ করে বসেছিলাম।

গুণ গুণ করে কীর্তন ভাঁজতে তে হৃদয়বাবুর প্রবেশ। হেলমেটটা কটে ঝুলিয়ে দিয়ে আরাম করে পা ড়য়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেন এবং খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর ড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, য়টা যেন অত্যন্ত জটিল বলে মনে ছ মলয়বাবু। কী ওটা? Differen- l Calculus না Law of Relati- y?

আমিও গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম র চেয়েও জটিল।

—যথা?

—নোটিশ পাওয়া গেল, মহম্মদ র্তের কাছে যাবেন না: পর্বত মহাশয় ভযান করছেন মহম্মদের দরবারে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, ফিঙ্গার-প্রিন্ট কেসের সামী ভূপেশ সেনের বিচার হবে, জেলে। ন ডি ও লিখেছেন কোর্টের আয়োজন তে।

হৃদয়দা বললেন, এর মধ্যে জটিলত্যটা দেখলেন কোথায়?

বললাম, বিষয়টা তলিয়ে দেখুন। বিচারপ্রার্থী বন্দী প্রকাশ্য বিচারশালায় দাঁড়বার অধিকার পেল না—

—বিচারক নেমে এলেন তার বিচার করতে জেলখানায়, কেমন?—যোগ করলেন হৃদয়বাবু।

আমি বললাম, তাই তো দাঁড়াচ্ছে।

—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন, এর মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে, যার নাম administrative necessity.

—সেইখানেই তো আমার আপত্তি। শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজন যখন বিচারের আদর্শকে ডিঙিয়ে যায়, তখন আর যাই হোক, কোর্টের মর্যাদা রক্ষা পায় না। শাসনদণ্ডের কাছে মাথা নোয়ালো ন্যায়দণ্ড; এর চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে?

আপনি বড্ড বেশী তলিয়ে গেছেন, মলয়বাবু।

—না, হৃদয়দা, আমি একেবারে সারফেস্ থেকে দেখছি। সবাই জানে, আসামী যতক্ষণ বিচারাধীন, আইনের চোখে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। বৃটিশ ল'এর এই হচ্ছে গোড়াকার কথা। তার দোষমুক্তি প্রমাণের ভার তার নিজের ওপরে নয়, অভিযোক্তাকেই প্রমাণ করতে হ'বে যে সে অপরাধী। অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে সমর্থন করবার তার যে মৌলিক অধিকার, সেটা হবে নিরঙ্কুশ, এবং তার জন্যে তাকে দিতে হবে পরিপূর্ণ সুযোগ আর অবাধ সুবিধা। এই জেলের মধ্যে তার কোনটা সম্ভব, বলুন?

হৃদয়দা প্রতিবাদ করলেন না। অনুকূল শ্রোতা পেয়ে আমার উৎসাহ বেড়ে গেল এবং তারই ঝোঁকে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। শেষটায় বললাম, ইংরেজ পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে —অনুপম সাহিত্য, সুগভীর দর্শন এবং মহাশক্তিশালী জড়বিজ্ঞান। কিন্তু আমার মনে হয় তার সব অবদানকে ছাড়িয়ে গেছে একটা জিনিস, যাকে বলা যেতে পারে Rule of law· ব্যক্তির চেয়ে বড় বিধান এবং তারই কাছে নির্বিচারে মাথা নোয়াবে প্রাইম্ মিনিস্টার থেকে টম্ ডিক্ হ্যারি, —এটা হল British Jurisprudence-এর প্রথম কথা। অন্য দেশে যান। বেশী দূরে নয়, ইংলিশ চ্যানেল পার হ'লেই দেখবেন, অত বড় Revolution এর জন্মভূমি যে ফ্রান্স, সেখানেও আইনের চোখে সব মানুষ সমান নয়। সেখানে রাজপুরুষদের জন্যে বিশেষ আইন, তাদের বিচারের জন্যে স্বতন্ত্র বিচারশালা। একজন সাধারণ ইংরেজের চোখে সেটা শুধু বিসদৃশ নয়, অন্যায়। সাম্রাজ্যের স্বার্থ সেই ইংরেজকে আজ কোথায় টেনে নাবিয়েছে!

বক্তৃতার নেশায় লক্ষ্য করিনি, যে হৃদয়বাবুর পদযুগল ইতিমধ্যে কখন

টেবিলের তলা থেকে উপরে প্রমোশন লাভ করেছে। দেহের ভঙ্গী অর্ধশয়ান, চক্ষু মুদ্রিত এবং হস্তে অর্ধদগ্ধ সিগারেট।

—ঘুমুলেন নাকি, হৃদয়দা?

—ঘুমুতে আর দিলেন কই?

—একদম ঝিম্ ধরে গেলেন যে? সাড়া শব্দ দিন।

হৃদয়বাবু টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে এবার সোজা হ'য়ে বসলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, আপনার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এত গভীর যে কোনো রকম মন্তব্য করে বাচালতা প্রকাশ করবো না। আপনার বক্তৃতা শুনে অন্য একটা কথা মনে হ'ল। তাই শুধু বলবো। সেটা আমার একটা থিওরি। শুনে আবার হাসবেন না তো?

বললাম, যদি হাসি, বলতে হ'বে আপনার থিওরি সার্থক। পৃথিবীতে বেশীর ভাগ থিওরিই তো কেবল চোখের জলের সৃষ্টি করে গেছে। হৃদয়বাবু একবার চারদিকটা দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, আজ হোক, কাল হোক, ইংরেজকে একদিন জাল গুটিয়ে সরে পড়তেই হবে। সেদিন যদি কেরেস্ট থাকি, পেন্সন্ তো পাবো না নিশ্চয়ই; অথচ পেটের সংস্থান তো করতে হ'বে। তাই ঠিক করেছি একখানা ইস্কুল-পাঠ্য ইতিহাস লিখবো। তাতে একটা অধ্যায় থাকবে—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। কি কারণ? উত্তর—ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন। ইংরেজের সঙ্গে সত্যিকার বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেউ করে থাকে, সে তার নিজের ভাষা।......থিওরিটা মনঃপূত হ'ল না, কি বলেন?

আমতা আমতা করে বললাম, কেমন যেন বোধগম্য হচ্ছে না।

হৃদয়বাবু এবার নড়ে চড়ে বসে বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখুন তো একবার, ১৮৫৭ সালের পর ওদের রাজত্বের ভিৎ যখন পাকাপোক্ত হয়ে বসল, কত আশা করে এই ভাষাকে ওরা নিয়ে এসেছিল সেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপার থেকে! উদ্দেশ্য কি? একমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার। ভেবেছিল, এর কয়েকটা ডোজ পেটে পড়লেই নেটিভের রাজভক্তির বান ডেকে যাবে। বশংবদ কেরাণী সরবরাহের অভাব হ'বে না কোনোদিন। সেদিকে ওরা ভুল করেনি। কিন্তু কি জানি, কোথায় ছিল একটুখানি হিসেবের গোল। তাই ইংরেজি ইস্কুলের কারখানা থেকে কাতারে কাতারে কেরাণী যেমন তৈরি হ'ল, তার সঙ্গে বেরোল আর এক রকম জীব, আপনাদের ইকনমিকসের ভাষায় যাকে বলে by product; অর্থাৎ কয়লার খনি থেকে যেমন বেরিয়ে আসে দু' চারখানা কমল হীরে। এদের চেহারা একেবারে আলাদা। ডোজ-মাপা বিদ্যার বরাদ্দটুকু পান করেই তারা ক্ষান্ত হ'ল না, নিঃশেষে শুষে নিল পশ্চিম দিগন্তের বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডার; এবং তারই জোরে মোক্ষম আঘাত দিল সাম্রাজ্যের বুকের ওপর। এদের চিনতে পারছেন নিশ্চয়ই। এরাই হচ্ছে আপনার ঐ গোখলে, গান্ধী, সুভাষ, প্যাটেল, চিত্তরঞ্জন, জওহরলালের দল—কেরাণী-ফ্যাক্টরির মারাত্মক by product, ইংরেজি পণ্ডিতের গুরুমারা চেলা। টোল বা মক্তব থেকে এদের জন্ম হ'ত না কোনোদিন।

শুধু কি এরাই?—বলে চললেন হৃদয়বাবু, আমার মনে হচ্ছে ফ্যাক্টরি থেকে আসল মাল আর বেরোচ্ছে না। আজকাল যা কিছু আসছে, সবই ঐ by product. তফাৎ শুধু প্যাকিং মোড়কটার, কোনোটা খদ্দর, কোনোটা আবার খাকী—

বলে তিনি চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে একটু বিশেষভাবে তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি আপসোস করছিলেন না?—সেই ইংরেজ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! আপসোস আমারও হয়। তবে সেটা অন্য কারণে—কী ওরা চাইল, আর কী ঘটল! লোকে শিব গড়তে বাঁদর গড়ে। ওরা বাঁদর গড়তে গিয়ে শিব গড়ে ফেলল। বানাতে গেল আরো গোটা কয়েক হৃদয় সামন্ত, কপাল দোষে সেগুলো হ'য়ে গেল মলয় চৌধুরী।

হৃদয় দা নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন। খোদা বকস্, মোয়াজ্জেম হোসেন আরও কে কে তখন ঘরে ঢুকছে।

—কি খবর, হৃদয় দা, বড্ড ফূর্তি যে আজ?

—আরে ভাই, বল কেন? এত কষ্ট করে একখানা নতুন গান লিখলাম, তা মলয়বাবুর মোটে পছন্দই হল না। মুখখানা কি রকম তোলো হাঁড়ি করে বসে আছেন, দ্যাখ।

মোয়াজ্জেম হোসেন বললেন, কি গান লিখলেন, আমরা একটু শুনতে পাইনে?

হৃদয়বাবু চাপা গলায় কীর্তনের সুরে গাইলেন,

প্রভাতে উঠিয়া
হুঁকা হাতে নিয়া
কানু কহিলেন, রাই গো,
তোমার মালসাতে কি আগুন আছে?

একটা হাসির রোল উঠল।

কোর্ট বসল সুপারের ঘরে।

হাকিম সদ্য আমদানি বৃটিশ সিভিলিয়ান। বেশভূষায় চেষ্টাকৃত তাচ্ছিল্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। পাইপ সংযোগে দুর্বোধ্য ভাষাকে অধিকতর দুর্বোধ্য করবার যে মনিব-সুলভ প্রচেষ্টা, তাতে এখনো পুরোপুরি দক্ষ হ'য়ে ওঠেন নি। আসামী ভূপেশ সেন স্বদেশী মামলায় জেল খাটছেন। কিন্তু পুলিসের বিশ্বাস, ওটা তার একটা গৌরবময় আবরণ। আসলে সে অন্ধকারের জীব। অতএব কর্তৃপক্ষের হুকুম এল, তার আঙুলের ছাপ দিতে হ'বে পুলিসের খাতায়। ভূপেশ করল যথারীতি অস্বীকার। তারই জের এই মামলা।

হাকিম তার নবলব্ধ বাঙলায় প্রশ্ন করলেন, টুমি টিপ্ ডিটে অস্বীকার আছো?

ভূপেশ দু বগলে হাত পুরে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যাজিস্ট্রেট সুর চড়িয়ে বললেন, জবাব ডাও।

ভূপেশ নিরুত্তর। কোর্ট ইনস্পেক্টর অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সেদিকে ফিরে সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, Is your accused deaf and dumb, Inspector?

I am examining him, your Honour. ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলেন ইনস্পেক্টর। তারপর ভূপেশের দিকে ফিরে বললেন, কি মশাই, হাকিম কি বলছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?

ভূপেশ জবাব দিল ইংরাজিতে. পাচ্ছি। আপনার সাহেবকে বুঝিয়ে দিন,

দ্রলোকের কাছ থেকে জবাব পেতে হ'লে শেনের ভাষাও ভদ্র হওয়া দরকার।

হোয়াট!—রুখে উঠলেন সাহেব। ন্তু এবার প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, মি জানতে চাই তুমি টিপ্ দেবে কিনা?

ভূপেশ জবাব দিল, না।

—না দিলে কঠোর শাস্তি পেতে বে।

ভূপেশ হেসে বলল, বৃথা আস্ফালন করে, সেটা চটপট্ দিয়ে ফেললেই তো র।

এমনি করে চলল কিছুক্ষণ বাদানুবাদ। ক আই সি এস এস ডি ও, তায় গত। কালা আদমির ঔদ্ধত্য সহ্য বার কথা নয়, অভ্যাসও হয়নি। তিনি কোর্ট একথা সম্ভবত মনে রইল না। ং হুকুম দিয়ে বসলেন, Take his ger-impression by force.

ইনস্পেক্টর ইতস্তত করতে লাগলেন। র করে টিপ্ নেওয়া যদি চলত, হলে আর এত মামলা মোকদ্দমার য়োজন ছিল কি?

সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ একেবারেই ঙেগে পড়েছিল। বিকট চীৎকার করে লেন, পাকড়ো উসকো। দুজন কনস্টে- এগিয়ে এসে ভূপেশকে ধরতেই সে ক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ংকার দিল—'বন্দে মাতরম্'।

—সাট্ আপ্, ইউ স্কাউন্ড্রেল!— র্জে উঠলেন এস ডি ও।

উত্তরে এল পালটা গর্জন—মহাত্মা ন্ধীজী কী জয়!

জেলের ভিতর থেকে শত কণ্ঠে উঠল র প্রতিধ্বনি—মহাত্মা গান্ধীজী কী য়!

সাহেবের লাল মুখ থেকে মনে হ'ল ক্ত ফেটে পড়বে, আর চোখ থেকে ঠিকরে ড়বে আগুন। নীচের ঠোঁট সজোরে মড়ে ধরে একবার তাকালেন ভূপেশের দকে। পর মুহূর্তে সে দৃষ্টি নেমে ল টেবিলের উপর। সেখানে পড়ে ছল তার হাণ্টার। হঠাৎ সেটা তুলে নয়ে সপাং করে বসিয়ে দিলেন, াসামীর উদ্ধত কপালে। ভূপেশ ঘুরে পড়ে গেল, এবং দু' হাতে কপাল চেপে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলে উঠল হাত্মা গান্ধীজী কি জয়।

পঁচিশ হাত দূরে জেল গেট। খবর পেঁছিতে লাগল পঁচিশ সেকেণ্ড। তার- পর শুরু হল তাণ্ডব। গেট রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ল গেট-কীপারের পক্ষে। উপায়ান্তর না দেখে সে বাজিয়ে দিল পাগলা ঘণ্টী। ফতুয়া গায়ে চটি পায়ে ছুটে এলেন জেলর সাহেব। আর তার পিছনে ততোধিক বিচিত্র বেশে আমরা, তার অনুচরবৃন্দ। রাইফেল-ধারী স্কোয়াড গেট পার হয়ে থেমে গেল। সমস্ত রাস্তা জুড়ে লাইন করে বসে আছে বন্দীর দল। বন্দে মাতরম্ থেমে গেছে; কিন্তু সবারই মুখে উৎকণ্ঠা, চোখে উত্তেজনা। নেতৃস্থানীয় কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রথম লাইনে, গেটের ঠিক সামনেটায়। তাদেরই একজনকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, তালুকদার সাহেব, ব্যাপার কি বরেণবাবু?

ক্ষীণকায় বরেণবাবু তীক্ষ্ম কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ব্যাপার তো দেখতেই পাচ্ছেন। গুলী চালান, রাস্তা সাফ হয়ে যাবে। একটাকে তো ওদিকে সাবাড় করে এলেন।

—কাকে আবার সাবাড় কোরলাম? বলছেন কি আপনি?

বরেণবাবু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, আকাশ থেকে পড়লেন যেন মনে হচ্ছে। ভূপেশ সেন খতম—সে সুসংবাদ কি জানা নেই আপনার? ভূপেশ সেন খতম!—সত্যিই আকাশ থেকে পড়লেন তালুকদার। ফোর্স ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এবং গেটের বাইরে আসতেই ডিস্‌মিস্ করবার হুকুম দিলেন। সবাই মিলে ছুটে গেলাম আফিসে। কোর্টের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। হাকিম, পেস্কার, ইন্সপেক্টর, সিপাহী সব যেন ভোজবাজির মত উড়ে গেছে। মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে আসামী ভূপেশ সেন। কপালের ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দুচার জন জেলের লোক। ডাক্তার হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এল তুলো আর ওষুধ নিয়ে। পিছনে স্ট্রেচার হাতে দুজন সাধারণ কয়েদী।

ঘটনা যা ঘটবার ঘটে গেল। আমাদের কাজ হল রিপোর্ট দেওয়া। সে রিপোর্টের ভাষা কতটা জোরালো হলে জেলের তরফ থেকে উপযুক্ত প্রতিবাদ জানানো হবে, অথচ শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ক্রোধের উদ্রেক হবে না, এইটাই হল বিবেচনার বিষয়। প্রথম দিকটার উপর জোর দিলেন স্বল্পাভিজ্ঞ সুপার; যুদ্ধ- প্রত্যাগত উষ্ণ রক্ত ক্যাপ্টেন, মর্যাদা সম্বন্ধে যিনি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন; আর দ্বিতীয় বিষয়টা বিশেষভাবে আঁকড়ে রইলেন বহুদর্শী, শীতল- শোণিত, প্রৌঢ় জেলর, প্রেস্টিজের ফাঁকা বুলি যার কাছে একেবারেই অর্থহীন। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয়ে রিপোর্টের মুসাবিদা যখন ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় সাইকেল মারফৎ সুপারের নামে এক জরুরী চিঠি এসে উপস্থিত। এস ডি ও সাহেব লিখছেন, একটা বেয়াড়া এবং

বপজ্জনক আসামীকে দমন করবার জন্যে কোর্টের মধ্যেই কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল। জেল-সুপারের আফিসে বসে এই অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে হয়েছে বলে তিনি ক্ষমা চাইছেন এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছেন।

ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি চিঠিখানা তালুকদার সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, লোকটা একেবারে কাঁচা। ইটনের গন্ধ এখনো মুখ থেকে যায় নি, দেখছি। নিজের মৃত্যুবাণ পাঠিয়ে দিয়েছে নিজেরই হাতে,—বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ব্যানার্জি'র উল্লসিত হবার কারণ

এই কদিন আগেই ক্লাবের পান-তার মিলিটারী কৌলিন্যের প্রতি য় তাচ্ছিল্য দেখিয়েছে এই এবং উন্নাসিক সিভিলিয়ান। ক্রোশের জ্বালা মেটাবার সুযোগ া।

ঠিখানা পকেটস্থ করে বিজয়ীর নিয়ে তিনি ছুটলেন এই ছোট । উপরওয়ালা বড় হাকিম স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দর-সে তক্তে যিনি অধিষ্ঠিত, বিলাতি সিভিলিয়ান। কিন্তু অনেক। তাঁর মুখে ইটন বা র্ডের গন্ধ একেবারে লুপ্ত হয়ে উগ্র হয়ে উঠেছে খাঁটি এবং ন্তুর "ভারতীয়" গন্ধ। তাঁর দেহ-চর্মে এবং কেশ-বিরল দেশী সূর্যের সুদীর্ঘ প্রভাব-। চিঠিখানা তিনি নিঃশব্দে রলেন এবং ধীরভাবে পকেটে ন। তারপর ঘটনা সম্বন্ধে মোটামুটি আভাস গ্রহণ করে ও সৌজন্যে বিগলিত হয়ে , আপনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার ন, এজন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, । ব্যানার্জি। এ সব অপ্রিয় । আপনাকে আর বিব্রত হতে া। বাকী যেটুকু আমার হাতেই দিন। যা কিছু করবার, আমিই বলেই উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা দিলেন ব্যানার্জির দিকে। টা বুঝতে কষ্ট হল না। সুপার কলের পুতুলের মত সেই ত হাতখানায় কোনো রকমে একটা দিয়ে নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাণের' পরিণাম যে এই দাঁড়াবে, ও ভাবতে পারেন নি ক্যাপ্টেন র্জি।

তিশ্রুত "অ্যাকশনে" বিলম্ব হ'ল যথারীতি এনকোয়ারি কমিটি হ'ল। মেম্বর দু'জন—ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর সঙ্গে রইলেন কারা-গর বড় কর্তা, ততোধিক ঋানু-পক্ককেশ শ্বেতাঙ্গ আই এম্ এস্। য়ে তাঁরা দর্শন দিলেন আবার সেই রর ঘরে।

প্রথম আলোচনার বিষয় হ'ল, মেডিক্যাল সাক্ষ্য। রিপোর্ট রয়েছে দু'খানা। প্রথমটা দিয়েছেন ক্যাম্বেল-ফেরৎ এস্ এ এস্। দ্বিতীয়টা, লড়াই-ফেরৎ আই এম্ এস্। একজন নগণ্য জেল-ডাক্তার; আর একজন মহামান্য সিভিল সার্জন। তাঁদের মতের পার্থক্যও পদানুরূপ। আমাদের ডাক্তার লিখেছেন, ক্ষতের পরিমাণ তিন ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি গভীর। সম্ভবত লাঠি বা ঐ জাতীয় কোনো কঠিন বস্তু দ্বারা আঘাতের ফলে তার উৎপত্তি। সিভিল সার্জনের মতে, আঘাতের পরিধি এক ইঞ্চি দীর্ঘ, ½ ইঞ্চি প্রস্থ; উৎপত্তির কারণ—কোনো কঠিন বস্তুর উপর আকস্মিক পতন।

জেলডাক্তারকে তলব করা হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দু'খানা রিপোর্টই তার হাতে দিয়ে বললেন, এ সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?

ডাক্তার বললেন, নো, স্যার।

ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, রিপোর্ট দেখে মনে হ'চ্ছে আপনি ক্ষত পরীক্ষা করেছিলেন ২৪ তারিখে, আর সিভিল সার্জন ক'রেছেন ২৫ তারিখে। একদিনের ব্যবধানে কোনো আঘাতের এতখানি উন্নতি হ'তে পারে ব'লে আপনি মনে করেন? ডাক্তার জানালেন, এ বিষয়ে তাঁর কিছুই বলবার নেই। ইনস্পেক্টর জেনারেল বললেন, আপনার রিপোর্ট থেকে এই সিদ্ধান্তই আমাদের করতে হ'চ্ছে যে, হয় আপনার সাধারণ জ্ঞানের অভাব, নয়তো আপনি সরকারবিরোধী কোনো প্রভাবের অধীনে পরিচালিত হ'য়েছিলেন।

ডাক্তার বললেন, সে সম্বন্ধেও তাঁর কোনো বক্তব্য নেই।

আমাদের আফিসের দু'জন কেরাণী ছিল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সুপারের আদেশে তাদের একটা জবানবন্দী নেওয়া হ'য়েছিল এবং সে-কাজটা প'ড়েছিল আমার উপর। অত্যন্ত জোরের সঙ্গে তারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করেছিল। সুতরাং বিবৃতির ভাষাটাও ছিল অনুরূপ জোরালো। তার একটা নকল কমিটির কাছে পেশ করা হ'য়েছিল। সুতরাং কেরাণীদ্বয়ের ডাক পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন, আপনারা কদ্দুর লেখাপড়া করেছেন?

একজন বলল, সে ম্যাট্রিক পাশ করে আই এ পর্যন্ত পড়েছে, আর একজন জানাল, সে আই এস-সি পাশ করেছে।

—তাহ'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি, এ বিবৃতি আপনাদের নয়?

—আজ্ঞে, ওটা আমাদেরই স্টেটমেণ্ট্।

ম্যাজিস্ট্রেট বিস্ময়ের সুরে বললেন, এরকম ইংরেজি আপনারা বলতে বা লিখতে পারেন?

তারা জানাল, আমরা বাংলায় বলেছি; ডেপুটি জেলর মলয়বাবু সেটা ইংরেজিতে তর্জমা ক'রে লিখেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট আশ্বস্ত হ'য়ে বললেন, ওঃ তাই বলুন। মলয়বাবু ঠিকমত তর্জমা করলেন কিনা, সেটা অবশ্যই আপনাদের জানবার কথা নয়।

কেরাণীদ্বয় নিরুত্তর।

সকলের শেষে এলেন কোর্ট-ইনস্পেক্টর। আসামীর আকৃতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে বললেন, কেস্ সম্বন্ধে হাকিমের সঙ্গে আসামীর দু' চারটে কথা-কাটাকাটি হ'চ্ছিল। হঠাৎ লোকটা আস্তিন গুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এস ডি ও সাহেবের ওপর। আমরা তখনো এগিয়ে যেতে পারিনি। হাকিম উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে এমনি ক'রে ঠেকাতে গেলেন। তাঁর হাতে লেগে আসামী ছিট্‌কে পড়ল ঐ ধারে। ওখানে ছিল একটা টেবিল। বোধ হ'চ্ছে ঐ টেবিলটাই হবে। ওরই কোণে লেগে একটুখানি কেটে গেল কপালের এই ডান দিকটায়।

কমিটির মেম্বরদ্বয় পরস্পরের দিকে তাকালেন। উভয়ের মুখেই ফুটে উঠল একটা নিশ্চিন্ত তৃপ্তির ভাব। মনে হ'ল, এতক্ষণ তাঁরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। ইনস্পেক্টর তাদের আলোকের সন্ধান দিয়ে রক্ষা করলেন।

কমিটির রায় আপাতত মুলতুবি রইল। কিন্তু তাদের আসন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোনো সন্দেহ রইল না।

সাহেবরা চলে গেলে ইনস্পেক্টরও যাবার আয়োজন করছিলেন। জেলর সাহেব ডেকে বললেন, এত তাড়া কিসের?

আসুন না, একটু চা খাওয়া যাক্। ছোকরাদের মধ্যে কে একজন বলল, হ্যাঁ; বড্ড পরিশ্রম গেল আপনার। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন, স্যার।

সুধাংশু ব'লে উঠল, সত্যি, একখানা সিন্ যা দেখলাম; তার মধ্যে আবার সবচেয়ে সেরা পার্ট আপনার। বিবেকটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, দাদা?

কে একজন বলল, দাদার ওসব বিবেক টিবেকের বালাই নেই।

জেলর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করলেন। একটু ধমকের সুরে বললেন, আহা; থামনারে বাপু।

ইন্‌স্পেক্টর কিন্তু বিরক্তির লক্ষণ দেখালেন না। চায়ে চুমুক দিয়ে হাসি-মুখেই বললেন, বলতে দিন। ছেলে-ছোকরাদের কথা গায়ে মাখলে চলে না।

একটু থেমে চায়ের কাপে আরো গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে বললেন, বিবেকের কথা কে বলছিলে, ভাই? তুমি? "তুমি" বলছি ব'লে কিছু মনে করোনা যেন।

—না, না, মনে করবো কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

ইন্‌স্পেক্টর সিগারেট ধরিয়ে দু' একটা টান দিয়ে বললেন, বিবেক, সত্য-নিষ্ঠা, মহানুভবতা—ইত্যাদি বড় বড় বুলি তোমাদের বয়সে আমরাও অনেক ঝেড়েছি। তারপর দেখলাম, ওগুলো ঐ স্বদেশীওয়ালাদের খদ্দরের ঝোলাতেই মানায় ভাল। যারা কাজের লোক, অর্থাৎ সংসারে যাদের উপার্জন ক'রে খেতে হয় এবং দশজনকে খাওয়াতে হয়, তাদের ওসব বালাই থাকলে সত্যিই চলে না। চাকরি যখন করতে হবে তখন একমাত্র লক্ষ্য হবে উন্নতি, অর্থাৎ মনিবকে খুসী রাখা। গোটা দুই মিছে কথা ব'লে যদি সে কাজটা হাঁসিল করা যায়, দোষের তো কিছুই দেখি না।

সুধাংশু বলল, এ একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন দাদা। আপনার উন্নতি মারে কে? প্রমোশন বলুন, খেতাব বলুন সব আপনার হাতের মধ্যে। এসব কথার কোনো জবাব না দিয়ে ইন্‌স্পেক্টর বললেন, তোমাদেরও বলি, এ পথে যখন এসেছ, এই পথ ধ'রেই চল। দু' নৌকোয় পা দিও না। হঠাৎ একদিন কোথায় তলিয়ে যাবে, টেরও পাবে না। ঐ বিবেকের বোঝা সেদিন কোনো কাজেই লাগবে না।

হৃদয়বাবুকে খুঁজে পাওয়া গেল, জেলের পাশে একটা খেজুর গাছের ঝোপ ছিল, তারই এক কোণে।

—এখানে বসে কি করছেন, দাদা?

—ভাবছি।

—কী ভাবছেন?

—ভাবছি, আমার ইতিহাসখানা এবার আরম্ভ করা দরকার।

—এত শীগ্‌গির?

—শীগ্‌গির কোথায় দেখছেন? ওদের তো হ'য়ে এল। ঘুণে-ধরা বাড়ি ভেঙ্গে পড়তে আর দেরি নেই।

—ভেঙ্গে পড়বে! ঐ ইন্‌স্পেক্টরের মত লোহার পিলার ওদের কত আছে, তার খবর রাখেন?

—যতই থাক্, তবু আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, দিন ওদের ঘনিয়ে এসেছে। ভীরুর রাজত্ব বেশিদিন টেঁকে না, মলয়-বাবু।

—ভীরু?

হৃদয়বাবু সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন, ভীরু নয়? তের বছর আগেকার কথা স্মরণ করুন। ১৯১৯ সাল। নিরীহ চাষাভুষা, অসহায় নারী আর অবোধ শিশুর রক্তে ভেসে গেল জালিয়ানওয়ালা বাগ। আমরা যেমন ক'রে ইঁদুর মারি, ঘরের নর্দমা বন্ধ করে, ঠেঙিয়ে, ওরা তার চেয়েও অনায়াসে গুলি ক'রে মারল মানুষ। গুলি করতে যাদের পারলো না, তাদের পিঠে ভাঙল চাবুক। লাজপত রায়কে ধ'রে বুকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল প্রকাশ্য রাজপথে এমনি দিনের বেলায়। তারপরে এল এমনি ধারা এক কমিশন। মনে আছে কি বলেছিল জেনারেল ডায়ার? বুক টান করে বলেছিল, হাঁ আমি মেরেছি এবং বেশ করেছি। আরো মারতাম যদি গুলি ফুরিয়ে না যেত।

তার পেছনে এসে দাঁড়াল মাইকেল ওডায়ার। বললে Dyer is right। তারি প্রতিধ্বনি উঠল পার্লামেণ্টে, উঠল ওদের প্রেসে এবং অসংখ্য সভাসমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে। ভেবে দেখুন একবার বুকের পাটা! আমাদের রাজ্য আমরা যেমন ক'রে পারি শায়েস্তা করবো। এই তো পুরুষের মত কথা। আর আজ? সামান্য একটা লাঠির খোঁচা মুছে ফেলবার জন্যে কী রকম হিমসিম খেয়ে গেল এতগুলো জাঁদরেল আই সি এস আর আই এম এস এর গোষ্ঠী। ঐ ইন্‌স্পেক্টরটাকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে লুকিয়ে রইল জঘন্য মিথ্যার ধামা মাথায় দিয়ে। কি জন্যে? না গোটাকয়েক নিরীহ খদ্দরধারীর বাক্য-বাণের ভয়ে।

হৃদয়বাবুর কণ্ঠে এই ঝাঁজ এবং তাঁর সদাপরিহাসদীপ্ত মুখে এইরকম তীব্র ঘৃণার কুঞ্চন কোনোদিন দেখিনি। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। উনি তেমনি তিক্ত কণ্ঠে বললেন, জানেন মশাই, ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী একদিন দম্ভভরে এদেরই নাম দিয়েছিলেন স্টীল ফ্রেম। সে স্টীলের আর জোর নেই। তার আগাগোড়া মরচে ধরে গ্যাছে। অত বড় জাতটার গোটা মেরুদণ্ডটাই বেঁকে গেছে। রাজদণ্ড বইবার শক্তি আর নেই।

তাইতো বলছিলাম, এবার আমার বই শুরু না করবার আর কারণ দেখি না। হ্যাঁ, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কি কাজ, বলুন।

হৃদয়দা অনুনয়ের সুরে বললেন, আপনার জানাশুনো হোমরা চোমরা দু'চারজন নিশ্চয়ই আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তলায়। একটু তদ্বির তম্বির করবেন, ভাই। বইখানা যেন আমার উৎরে যায়। (ক্রমশঃ)

অবতরণিকা

গার ফ্ল্যাট। শহরের প্রধান সড়কের
াট বাড়ির একতলা। দেখলে মনে
ানে যে থাকে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে
বারেই উদাসীন। ডানধারে হলঘরে
দরজা, খড়খড়ি ভেজানো একটা
। বাঁধারে পেছন দিকে আর একটা
ম্যান্টল্‌পিসওয়ালা একটা ফায়ার
তার ওপরে একটা আরশী। একদম
দেরাজের ওপরে টেলিফোন।
ঝে মাঝে পথ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে,
তে ভেসে আসছে চলাচলের আওয়াজ
াটরের ভেঁপু।
গা রেডিও-র সামনে বসে চাবি নিয়ে
ন করছে। খানিকটা কাটাকাটা
জের পর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

। জার্মান সৈন্যারা সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র
'তে পিছু হ'টছে। ইলিথিয়া
ীমান্ত হ'তে চল্লিশ মাইল দূরে
কশনার এখন রেড আর্মির দখলে।
যখানে যেখানে সম্ভব ইলিথিয়ার
সন্যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে
অস্বীকার করছে। কয়েকটি বাহিনী
ইতিমধ্যেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছে।
ইলিথিয়ান নাগরিকেরা, আমরা জানি,
সাহিদয়েটের বিরুদ্ধে তোমাদের
অস্ত্র ধরতে বাধ্য করা হ'য়েছিল,
আমরা জানি, ইলিথিয়াবাসীদের
গভীর গণতান্ত্রিক মনোভাবের কথা,
আমরা......

ওলগা চাবিটা ঘুরিয়ে দিতে রেডিও
থেমে গেল। শূন্যের দিকে একদৃষ্টে
চেয়ে সে নিস্তব্ধ বসে থাকে। চুপচাপ।
দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হয়, ও চমকে
ওঠে। আরো শব্দ। আস্তে আস্তে
দরজার কাছে যায়। আরো শব্দ।

ওলগা। কে বাইরে?

হুগো। (বাইরে) হুগো।

ওলগা। কে?

হুগো। (বাইরে) হুগো বারিন।

স্পষ্টই বিস্মিত হোলেও ওলগা দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে।

হুগো। (বাইরে) আমার গলা কি তুমি চেন না? দরজাটা খোল।

ওলগা চট করে দেরাজের কাছে গিয়ে তা হাতে একটা জিনিস বার করে বাঁ হাতে নেয়, তারপর স্কার্ফ-এ হাতটা ঢাকা দিয়ে দরজা খুলতে যায়। আগন্তুক হঠাৎ যাতে কিছু না করতে পারে তার জন্যে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলেই চট করে পিছিয়ে আসে। বছর তেইশের ঢ্যাঙা চেহারার একটি ছেলে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে।

আমি। (দুজনে মুহূর্তকাল পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।) তোমার কি আশ্চর্য লাগছে?

ওলগা। তোমাকে এত অন্যরকম দেখাচ্ছে।

হুগো। হ্যাঁ, আমি বদলেছি। (চুপচাপ) কি, ভাল করে দেখা হয়েছে? (স্কার্ফের আড়ালে রিভলবারের দিকে দেখিয়ে) ওটাকে সরিয়ে রাখতে পার।

ওলগা। (রিভলবার না নামিয়ে) আমি জানতাম তোমার পাঁচ বছর হ'য়েছে।

হুগো। ঠিকই, পাঁচ বছর।

ওলগা। দরজা বন্ধ করে ভেতরে এস। কি করে বেরোলে?

এক পা পিছিয়ে যায়। পিস্তলটা ঠিক হুগোকে লক্ষ্য করে না হোলেও তারি দিকে মুখ করে ধরা। হুগো একবার সেদিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে চায়, তারপর ওলগার দিকে পেছন ফিরে দরজা বন্ধ করে।

তুমি কি পালিয়ে এসেছ?

হুগো। পালাব? আমি ত পাগল নই। ওরাই আমাকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিয়েছে। (থেমে) জেলে ভালভাবে থাকার দরুণ ছেড়ে দিয়েছে।

ওলগা। ক্ষিধে পেয়েছে?

হুগো। পেলে তোমার পছন্দসই হয়, তাইনা?

ওলগা। কেন?

হুগো। খেতে বসলে মানুষকে ভারি নিরীহ দেখায়। (থেমে) না, ধন্যবাদ, ক্ষিধেতেষ্টা কোনটাই আমার পায়নি।

ওলগা। হ্যাঁ কি না বললেই হোত।

হুগো। মনে নেই, আমি একটু বেশী বকি।

ওলগা। মনে আছে।

হুগো। (চারদিকে চেয়ে দেখে) সমস্ত কি রকম খালি খালি দেখাচ্ছে। অথচ সব কিছু যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। আমার টাইপরাইটারটা?

ওলগা। বিক্রী হ'য়ে গেছে।

হুগো। বটে? (চুপচাপ। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে) একদম খালি।

ওলগা। কি খালি?

হুগো। (এক সঙ্গে সব কিছুকেই দেখানোর ভাবে) এখানকার সব কিছুই। আসবাবপত্র যেন শূন্যে ভাসছে। ওখানে হাত দুটো বাড়ালেই আমার খুপরীর দুপাশের দেয়াল ছোঁয়া যেত। কাছে এস। (ওগলা নড়ে না) ভুলে গিয়েছিলাম, জেলের বাইরে মানুষরা ভদ্ররকম ব্যবধান রেখে চলে। মিছিমিছি কত না জায়গা নষ্ট হয়! ছাড়া পাওয়া কিন্তু ভারী মজার। মনে হয় যেন মাথা ঘুরছে। মাঝখানে একঘরের ব্যবধান বজায় রেখে কথা বলায় আমাকেও অভ্যস্ত হ'তে হবে।

ওলগা। তোমাকে ওরা কবে ছেড়েছে?

হ্যুগো। এইমাত্র।

ওলগা। এখানে সিধে চলে এসেছ?

হ্যুগো। আর কোথায় বা যেতে পারতাম?

ওলগা। কারো সঙ্গে কথা বলনি?

হ্যুগো। (তার দিকে চায়, হাসতে শুরু করে) না বলিনি। সব ঠিক আছে। (ওলগা একটু শিথিল হয়, হ্যুগোর দিকে চায়) আমাকে দেখে তুমি কি খুশী হ'য়েছ?

ওলগা। জানি না। (একটা গাড়ি হর্ন বাজিয়ে চলে যায়। হ্যুগো কেঁপে ওঠে। গাড়িটা পেরিয়ে গেল, ওলগা হিমচোখে তাকে লক্ষ্য করে।) তোমায় যদি সত্যিই ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহ'লে তোমার তো ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

হ্যুগো। (ব্যঙ্গের স্বরে) তাই নাকি? (কিছু যায় আসে না ভাবে কাঁধ ঝাকি দেয়। চুপচাপ) লুই কেমন আছে?

ওলগা। ভাল।

হ্যুগো। আর ল্যরাঁ?

ওলগা। সে—ওর বরাত খারাপ।

হ্যুগো। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কেন জানি না সব সময়ই ও মারা গেছে ব'লে আমার মনে হতো। এখানে নিশ্চয় অনেক অদলবদল হ'য়েছে?

ওলগা। এখন সব কিছুই আরও অনেক কঠিন। জার্মানরা এসে গেছে কিনা।

হ্যুগো। (নির্লিপ্তভাবে) বটে। কতদিন?

ওলগা। তিন মাস হোল। পাঁচ বাহিনী সৈন্য। এপথ দিয়ে তাদের হাঙ্গেরী যাওয়ার কথা, কিন্তু তারা রয়ে গেছে।

হ্যুগো। বটে। তোমাদের নিশ্চয়ই এখন বেশ কিছু নতুন সদস্য হ'য়েছে।

ওলগা। হ্যাঁ। এখন আর আগের মত ভাবে দলে ভর্তি করা হয় না। অনেক ফাঁক ভরাট করতে হচ্ছে। আমরা ......আমরা এখন কম কড়াক্কড়ি করি।

হ্যুগো। হ্যাঁ, বটেই তো। নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবে বই কি। (সামান্য উদ্বেগের সঙ্গে) কিন্তু, আসলে সব কিছু ত একই আছে?

ওলগা। (বিব্রতভাবে) তা......মোটামুটি একই আছে বই কি।

হ্যুগো। যাহোক, তুমি তো এখনো বেঁচে আছ। জেলের মধ্যে বোঝাই শক্ত যে, অন্যরা আগের মত বেঁচে চলেছে। আচ্ছা, তোমরা কখনো আমার কথা বল?

ওলগা। (অপটুভাবে মিথ্যে বলার চেষ্টা করে) কখনো কখনো।

হ্যুগো। আগের মতই রাতে ছেলেরা বাইকে করে আসে। তারা সব টেবিলের চারধারে বসে, লুই পাইপ ধরায়। তখন একজন বলেঃ এমনি এক রাতে ছেলেটা স্বেচ্ছায় বিশেষ কাজের ভার যেচে নিজের কাঁধে নিয়েছিল।

ওলগা। ওই গোছেরই কিছু।

হ্যুগো। তখন তুমি বলঃ কাজটা সে ভালভাবেই হাঁসিল করেছিল। কাউকে না জড়িয়ে, বেশ পরিষ্কার-ভাবে।

ওলগা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হ্যুগো। কখনো কখনো বৃষ্টিতে ঘুম ভেঙে যেত। নিজেকে বলতাম, হয়তো আজ রাতে ওরা আমার কথা বলবে। যারা মারা গেছে তাদের তুলনায় এইটেই ছিল আমার বড় সুবিধে। আমি ভাবতে পারতাম যে, তোমরা আমার কথা ভাবছো। (ওলগা না-ভেবেই হ্যুগোর একটা বাহু নিজের হাতে আড়ষ্টভাবে টেনে নেয়। তারা পরস্পরের দিকে তাকায়। ওলগা হাতটা ছেড়ে দেয়। হ্যুগো একটু শক্ত হয়ে যায়।) তারপর একদিন তোমরা পরস্পরকে বললেঃ ওর এখনো ছাড়া পেতে তিন বছর বাকী। যখন ও বেরিয়ে আসবে......(গলার স্বর বদলে যায়। ওলগার চোখ হতে চোখ না ফিরিয়ে)......যখন ও বেরিয়ে আসবে, তখন ওর পুরস্কার হিসেবে, আমরা ওকে কুকুরের মত গুলি করে মারব।

ওলগা। (চমকে পিছিয়ে যায়) তুমি কি পাগল হ'য়েছ?

হ্যুগো। (থেমে) ওরা কি তোমাকে দিয়ে আমার কাছে চকোলেট পাঠিয়েছিল?

ওলগা। কি চকোলেট?

হ্যুগো। গোলাপী বাক্সে লিক্যর চকোলেট। রাইশ ব'লে কার কাছ হ'তে ছ' মাস ধ'রে নিয়মিত পার্সেল পেতাম। ও নামে কারুকে জানি না, তাই ভাবতাম যে, পার্সেলগুলো তোমার কাছ হ'তে আসে, আর খুব ভাল লাগতো। তারপর পার্সেল আসা বন্ধ হোল। আমি ভাবলামঃ ওরা আমায় ভুলে গেছে। তিন মাস আগে একটা পার্সেল এল, একই লোকের কাছ হ'তে, তা'তে চকোলেট আর সিগারেট ছিল। আমি সিগারেট-গুলো নিলাম, আমার পাশের কুঠুরীর কয়েদী চকোলেটগুলো খেল। বেচারী খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়লো—ভারী অসুস্থ। তখন আমি বুঝতে পা'রলাম, তোমরা তাহ'লে আমায় ভোলনি।

ওলগা। হোয়েডেরারের বন্ধুদের ত তোমাকে খুব পছন্দ হবার কথা নয়।

হ্যুগো। সে খবর দেবার জন্যে তারা নিশ্চয়ই দু' বছর অপেক্ষা করতো না। না ওলগা, আমি ব্যাপারটা ভাল ক'রে ভেবে দেখার জন্যে অনেক সময় পেয়েছি। এর শুধু একটাই ব্যাখ্যা হ'তে পারে। প্রথমে পার্টি ভেবেছিল আমি হয়ত এখনো কাজে লাগতে পারি। পরে তারা মত বদলেছে।

ওলগা। (কোন কঠিনতা না দেখিয়ে) তুমি বড্ড বেশী বকো হ্যুগো। বড্ড বেশী। কথা না বললে তোমার মনেই হয় না যে, তুমি বেঁচে আছ।

হ্যুগো। আমি বড্ড বেশী বকি। আমি বড্ড বেশী জানি। আর তোমরা আমাকে কোনদিনই বিশ্বাস করনি। মোটমাট কথাটা তাই। (থেমে) তার জন্য অবশ্য তোমার কোনও দোষ দিই না।

ওলগা। হ্যুগো, আমার দিকে চাও। তুমি যা বলছো তুমি কি সত্যি তা' বিশ্বাস কর? (তার দিকে চায়) হ্যাঁ, তুমি কর। (উত্তেজিতভাবে) তাহ'লে এখানে আমার কাছে এলে কেন? কেন? কেন?

হ্যুগো। তুমি কখনো আমাকে গুলি করতে পারবে না, তাই। (ওলগার

তর রিভলবারটার দিকে চেয়ে মৃদু স) অন্তত তাই আমি ভেবেছাম। (ওলগা রুদ্ধভাবে রিভলআর স্কার্ফটা টেবিলের পরে ড় ফেলে দেয়।) দেখলে ত?

শোন হুগো, আমি তোমার গল্পের একটা কথাও বিশ্বাস রনে। আমি কোন নির্দেশ পাইনি। ন্তু যদি কোন নির্দেশ পাই হ'লে বরং জেনে রাখো যে, আমি র্দেশ মতই কাজ করবো। আর র্টির কেউ যদি প্রশ্ন করে, আমি দের বলবো যে, তুমি এখানে আছ। মার সামনেই তারা তোমাকে গুলি রে মারবে তা জানলেও বলবো। মার কাছে টাকাকড়ি আছে?

না।

আমি তোমাকে কিছু টাড়াকড়ি চ্ছি। তারপরে তোমাকে চ'লে তে হবে।

কোথায়? অলিগলি কিম্বা কের আড়ালে ঘুপটি মেরে বে'চে কতে? জল বড় হিম, ওলগা। ঘটে ঘটুক এখানে আলো আছে, তাপ আছে। এখানে খতম হওয়া নেক আরামের।

। হুগো, আমাকে পার্টির নির্দেশ ত কাজ করতেই হবে। শপথ ক'রে লছি, আমি পার্টির হুকুম তামিল রব।

। দেখলে তো আমি সত্যি কথাই লেছি।

। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

। না। (ওলগার অনুকরণ করে) আমি পার্টির হুকুম তামিল করব।" তামার এখনো অনেক শেখা বাকী আছে ওলগা। সংসারের সমস্ত দিচ্ছা নিয়েও তুমি যাই কর তা খনো পার্টির হুকুম মাফিক হয় না। "যাও, হোয়েডেরারের পেটে তনটে গুলি দেগে দিয়ে এস।" এত খুব স্পষ্ট, তাই না? আমি হোয়েডেরারের কাছে গেলাম, তার পটে তিনবার গুলিও করলাম। কন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল একেবারে অন্যভাবে। হুকুম—কোনো হুকুম ছিল না। খানিকটা পর্যন্ত খুব সহজ, তারপরে আর কোন হুকুম নেই। হুকুম টুকুম সব পেছনে পড়ে রইল। আমাকে একলাই এগিয়ে যেতে হোল, একেবারে একলাই খুন করতে হোল......অথচ কেন, তারপর তা' পর্যন্ত আমি জানি না। আমার ইচ্ছা করছে পার্টি যেন তোমাকে হুকুম দেয় আমায় গুলি করে মারতে। কি হয় শুধু তাই দেখতে, স্রেফ্ তাই দেখতে।

ওলগা। বেশ, দেখবে। (চুপচাপ) এখন তুমি কি করবে?

হুগো। জানি না, ভেবে দেখিনি। যখন জেলের দরজা খুলে দিলে ভাবলাম এখানে আসব, তাই এলাম।

ওলগা। যেসিকা কোথায়?

হুগো। তার বাবার কাছে। গোড়ার দিকে কখনো কখনো চিঠি লিখতো। এখন বোধ হয় আমার উপাধি আর ব্যবহার করে না।

ওলগা। তোমায় নিয়ে আমি এখন কি করবো আশা করছো? ছেলেরা কেউ না কেউ রোজই এখানে আসে। তাঁদের ইচ্ছে মত আসে, চলে যায়।

হুগো। তারা কি তোমার শোবার ঘরও ব্যবহার করে নাকি?

ওলগা। না।

হুগো। তাহ'লে আমি ও ঘরে যাচ্ছি। দেয়ালঘেষা তক্তাপোষে একটা লাল চাদরের ঢাকনা ছিল, দেয়ালমোড়ার কাগজে হলদে আর সবুজ রুইতনের ছক কাটা। দেয়ালে দুটো ফটো ছিল, একটা আমার।

ওলগা। সম্পত্তির হিসেব মেলাচ্ছ?

হুগো। না, স্মরণ করছি। এ সবের কথা অনেক ভেবেছি কিনা। দ্বিতীয় ফটোটা আমাকে অনেক দুর্ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে, কিছুতে মনে করতে পারতাম না ছবিটা কার।

পথ দিয়ে একটি গাড়ি যায়। হুগো চমকে ওঠে। দুজনেই নীরব। গাড়িটা থামে। একটা দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়। দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ।

ওলগা। কে?

শার্ল্। (বাইরে) শার্ল্।

হুগো। (ফিস্ফিস্ করে) শার্ল্ কে?

ওলগা। (ফিস্ফিস্ করে) আমাদের একজন।

হুগো। (তার দিকে চেয়ে) তাহ'লে?

সামান্যক্ষণ চুপচাপ। শার্ল আবার কড়া নাড়ে।

ওলগা। তাহ'লে, দাঁড়িয়ে আছ কিসের জন্যে? যাও, ভেতরের ঘরে যাও, তোমার সব স্মৃতিচিহ্ন মিলিয়ে দেখগে।

হুগো চলে যায়। ওলগা দরজা খোলে। শার্ল আর ফ্রান্ৎজ্ দাঁড়িয়ে।

শার্ল্। ও কোথায়?

ওলগা। কে?

শার্ল্। তুমি ত জান। শ্রীঘর ছাড়ার পর হতেই আমরা ওর পিছু নিয়েছি। (সামান্য চুপচাপ) ও কি এখানে নেই?

ওলগা। হ্যাঁ, ও এখানেই আছে।

শার্ল্। কোথায়?

ওলগা। ওখানে। (নিজের ঘর দেখিয়ে দেয়।)

শার্ল্। ভাল।

ফ্রানৎজ-কে অনুসরণ করার সংকেত করে পকেটে হাত দেয়, এক পা এগোয়। ওলগো পথ আটকে দাঁড়ায়।

ওলগা। না।

শার্ল্। বেশীক্ষণ লাগবে না ওগলা। ইচ্ছে হয় যদি একটু বাইরে ঘুরে এস। ফিরে এসে এখানে কাউকে কিম্বা কোন চিহ্নও দেখতে পাবে না। (ফ্রান্ৎজকে দেখিয়ে) সেইজন্যেই ওকে আনা।

ওলগা। না।

শার্ল্। আমাকে কাজটা চুকোতে দাও ওলগা।

ওলগা। তোমাকে কি লুই পাঠিয়েছে?

শার্ল্। হ্যাঁ।

ওলগা। সে কোথায়?

শার্ল্। গাড়ীতে।

ওলগা। যাও, তাকে নিয়ে এস। (শার্ল্ ইতস্তত করে।) আমি ওকে নিয়ে আসতে বলেছি।

শার্ল সংকেত করতে ফ্রান্ৎজ বেরিয়ে যায়। শার্ল আর ওলগা নির্বাক পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওলগা শার্লের চোখ হতে চোখ না সরিয়ে স্কার্ফ মোড়া রিভলভারটা তুলে নেয়। ফ্রান্ৎজ-এর সংগে লুই ঢোকে।

লুই। কি ব্যাপার? তুমি ঝগড়া দিচ্ছ কেন?

ওলগা। বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি করছো।

লুই। বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি?

ওলগা। এদের বাইরে যেতে বল।

লুই। বাইরে অপেক্ষা কর। আমি ডাকলেই এস। (তারা চলে যায়) বেশ, এখন বল কি বলবে আমাকে।

ওলগা। (কোমল গলায়) লুই, ও আমাদের জন্যে কাজ করেছে।

লুই। খুকী হোয়োনা ওলগা। ও সাংঘাতিক ধরণের লোক। ওর মুখ বন্ধ করতেই হবে।

ওলগা। ও কিছু বলবে না।

লুই। হারামজাদা যা বাচাল।

ওলগা। ও কিছু বলবে না।

লুই। ও যা তুমি ওকে সত্যিই সেভাবে দেখ কিনা আমার সন্দেহ আছে। তোমার চিরদিনই ওর পরে একটু টান আছে।

ওলগা। তোমারো চিরদিনই ওর পরে একটা আক্রোশ আছে। (থেমে) লুই, আমি এখানে আমার আবেগ অনুভূতি আলোচনার জন্যে তোমাকে ডাকিনি। আমি পার্টির স্বার্থের কথা ভেবেই বলছি। জার্মানরা আসার পর হতে আমাদের অনেক কর্মী মারা গেছে। এ ছোকরাকে আবার কাজে লাগানো যায় কিনা একবার না দেখেই আমরা একে হারাতে পারি না।

লুই। আবার কাজে লাগানো যায় কিনা? একটা ক্ষুদে লাগামছুট অ্যানার্কিস্ট, ঢংসর্বস্ব ইণ্টেলেক্চুয়াল, দায়িত্বহীন, খামখেয়ালী বুর্জোয়া, তাকে আবার ফিরে কাজে লাগানো যায় কিনা!

ওলগা। তবুও কুড়ি বছর বয়সে সেই মানুষই হোয়েডেরারকে তার দেহরক্ষীদের পাহারার মাঝখানে খুন করেছিল—একটা রাজনৈতিক হত্যাকে প্রণয়ঘটিত খুন ব'লে চালিয়ে দিয়েছিল।

লুই। সেটা সত্যিই কি রাজনৈতিক হত্যা? ব্যাপারটা কোনো দিনই ভালো ক'রে পরিষ্কার হয়নি।

ওলগা। ঠিক কথা। আমাদের এখন সেটা পরিষ্কার করা দরকার।

লুই। সমস্ত ঘটনাটাই দুর্গন্ধে ভরা। আমি লগির মাথা দিয়েও তা ছুঁতে চাইনে। তাছাড়া ওকে দিয়ে পরীক্ষা পাশ করানোর মত সময় আমার হাতে নেই।

ওলগা। আমার আছে। (লুই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে।) লুই, আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়ত এ ব্যাপারটায় বড্ড বেশী ব্যক্তিগত ভাব এনে ফেলছো।

লুই। আমার মনে হয়, তুমিও সেই একই ভুল করছো।

ওলগা। ব্যক্তিগত অনুভূতির কাছে আমাকে হার মানতে দেখেছো কখনো? আমি ত বিনাসর্তে ওকে বাঁচতে দিতে বলছি না। ওর জীবনের আমি কানাকড়িও দাম দিই নে। আমি শুধু বলছি যে, ওকে একেবারে মুছে ফেলার আগে আমাদের দেখা দরকার ওকে পার্টিতে আবার ফিরিয়ে আনা যায় কিনা।

লুই। পার্টি কখনো ওকে আর গ্রহণ করবে না। অন্তত এখন নয়। সে কথা আমার মত তুমিও জান।

ওলগা। ও ছদ্মনামে পার্টির কাজ করত। আমরা ছাড়া ওকে এখন কেউ জানে না। তোমার কি ভয় ও বড্ড বেশী বলে ফেলতে পারে? ওর পরে ভাল করে চোখ রাখলে ও কিছুই বলবে না। তুমি বলছ, ও ইণ্টেলেক্চুয়াল, ও অ্যানার্কিস্ট। হ'তে পারে, কিন্তু ও মরীয়া ধরণের মানুষও বটে। ওকে ঠিকমত লাগাতে পারলে, ও অনেক কাজে প্রধান দায়িত্ব নিতে পারে। ও তার একবার প্রমাণও দিয়েছে।

লুই। বেশ, তা তুমি কি বল?

ওলগা। এখন ক'টা বাজে?

লুই। ন'টা।

ওলগা। বারোটায় ফিরে এস। আমি এর মধ্যে জেনে নেব হোয়েডেরারকে ও কেন খুন করেছিল, আর এখন ওর মনের চেহারাটাই বা কেমন। যদি বুঝতে পারি ও আবার আমাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে আমি দরজার ফাঁক হতে তোমায় জানাব। আজ রাতের মত নিজের মনে থাকুক. কাল এসে ওকে কাজের নির্দেশ দিয়ে যেও।

লুই। যদি ওকে আর কাজে লাগানোর মত না মনে হয়?

ওলগা। আমি দরজা খুলে দেব।

লুই। মিছিমিছি একরাশ ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া।

ওলগা। ঝুঁকিটা কোথায়? বাড়ীর চার পাশে তোমার লোক আছে না?

লুই। চারজন।

ওলগা। তাদের রেখে যাও। (লুই নড়ে না) লুই, ও এককালে আমাদের জন্যে কাজ করেছে। ওকে একটা সুযোগ দিতে হবে।

লুই। আচ্ছা, আমি রাত বারোটার আসর। (ক্রমশ)

বিমল কর

দিল্লী দরবারের তোপের সঙ্গে সময় মিলিয়ে ছোট নাগপুর হিলরেঞ্জে
নামাইট দাগেননি ভরত চৌধুরী। তবু
য়টা মিলে গেল। হিজ্ ম্যাজেস্টি জর্জ
ফিফ্থের কানে অবশ্য সে শব্দ
পৌঁছোয়নি; সে খবরও। যথারীতি একটা
সেজ গিয়ে জমা পড়লো লর্ড হার্ডিঞ্জের
ন্তরে।

চৌবেরিডি সেক্সানে রেল লাইন
তার দুরূহ কাজ আসলে সেই দিন
কেই শুরু।

কনস্ট্রাক্শানের হেডকোয়ার্টার বসে-
লো চৌবেরিডিতে। সেখান থেকে টানা
মাইল লাইন পেতে নাগাল ধরতে

হয়েছে পাহাড়ের। এখন রেল কোম্পানীর কাজ চলছে সেই কাঁচা লাইন ধরেই। বেলাস্ট ট্রেনের সারি সারি ওপন্ ওয়াগন থেকে লাইন, এ্যাঙ্গেল, ফিস্প্লেট, নট, স্লিপার, পাথরের নুড়ি কাঁচা লাইনের দু' ধারে টাল হয়ে জমা হচ্ছে দিনের পর দিন। কাঁচা লাইনের হাত ধরে পা পা করে এগিয়ে আসছে পাকা লাইন। পথের দু'

পাশে খোলা জায়গায় তাঁবু পড়েছে কুলী কাবারীর। বন্ধুর ভূমির তিন চার ফার্লং অন্তর একটি করে শ্রমিক কুঞ্জ।

কুঞ্জই বটে। ঝোপ ঝাড় কাটা লালচে মাটিতে দু' চার হাত অন্তর ছড়ানো ছিটোনো সংসার। লোহার পাতের তার ঝোলানো উনুন, নোঙরা কাপড় আর লেংটি, একটি লোটা আর থালা। পুঁটলি বাঁধা চাল, আটা, নুন, ছাতু। সারাদিন শাবল, গাঁইতির কোপ্ চলে, বিশ-পঁচিশ জোয়ানের কণ্ঠে মাদত্ দেবার চড়া সুর জাগে থেকে থেকে। লাইন ঠেলে, মাটি কুপিয়ে পিটিয়ে, ঘাম ঝরিয়ে বিকেল শেষে সব চুপ। সারা দিনের ক্লান্তিতে ঝিমুনি

আসে ওদের। হপ্তার পয়সায় মেটের কাজ থেকে হাড়িয়া জুটে যায় হয়তো; দু'এক ছিলিম্ গাঁজাও।

সন্ধ্যের গোড়াগুড়িতেই রেল কোম্পানীর বিলোনো কাঁচা কয়লার পাঁজায় আগুন জ্বলে ওঠে। পেট ভরেছে ততক্ষণে, নেশাও লেগেছে একটু একটু। হাড় মাংসে সাড় এসেছে, স্বাদ এসেছে আবার। শূন্য প্রান্তরে মাদল ঢোল বেজে ওঠে, বাঁশির মেঠো সুর ছড়ায় হাওয়ায়। দিক্দিগন্ত ছাওয়া অন্ধকার ঘন হয়ে আসে একটু একটু করে। গভীর কালোয় সব কালো, সব নিস্তব্ধ। ঘুম নেমেছে। কাঁচা কয়লার পাঁজাই শুধু জ্বলছে দাউ দাউ করে।

ঘুট ঘুটে অন্ধকার আর থমথমে নিস্তব্ধতা ভেঙে রাতের মধ্যে মাঝে মাঝে অনেকগুলো কেরাসিন তেলের শূন্য টিন বেজে ওঠে, কয়লার পাঁজাটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিতার মত লেলিহান করে তোলে ওরা, দূরে বাঘের ডাক থেমে যায়, দূরান্তরে মিলিয়ে আসে ফেউয়ের চীৎকার।

মরূদ্যানের মত এই ছোট ছোট শ্রমিক কুঞ্জগুলি একে একে ছাড়িয়ে এলে ভোরের আলোয় হয়তো এসে পেঁাছোনো যাবে আর এক মায়াকাননে। রূপকথার গল্পে আছে, রাজপুত্তুর রাতারাতি তেপান্তর মাঠের মধ্যে সাত মহলা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে ফেলেছিলো; সৈন্য সামন্ত লোকলস্করে গিস গিস করছিলো সেই ধবলচূড় রাজপুরী। এও যেন তেমনি; বিশ শতকের বিজ্ঞান যাদুর কৌটো খুলে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গিবসন যেন বললেন, এ ঘোর অরণ্যে আমার পুরী গাঁথো, রাজ্যপাট বসাবো এখানে উপস্থিত। আর পুরী গাঁথা হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কাঁচা লাইন ধরে বেলাস্ট ট্রেন সাপ্লাই দিলে। ছাউনী পড়লো বিরাট; স্টোর বসলো, ছোটখাটো দপ্তর খুলে গেল, সাইডিং লাইন আর মাটি পেটানো প্লাটফর্ম, কাঠ-টিন দিয়ে গাঁথা দু দশটি কোয়ার্টার। একটি ছোটখাটো টেম্পরারী হাসপাতালও। উঁচু জমিতে ছোট ছোট শাল-মহুয়ার ঝোপ কেটে কুলী ধাবড়া বসে গেল তিন চার বিঘে জমি জুড়ে। বিশ্বকর্মার অনুচরে গিস গিস করে উঠলো পয়লা হল্ট।

সব দেখে শুনে মনে হতো, একটা বিরাট বাহিনী যেন ছাউনী ফেলে অপেক্ষা করছে। শিলা কঠিন, অরণ্য দুর্গম, পশু সঙ্কুল প্রাক ইতিহাস যুগের অতিকায় যে দানবটা থাবা মেলে বসে আছে সামনে, সমস্ত পথ রোধ করে তাকে আক্রমণ করবে; এই বাহিনী যে-কোন সুযোগ মুহূর্তে।

মিঃ গিবসন কাঁচা লাইনটা চৌবেরডী থেকে পয়লা হল্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সেই সুযোগটা করে দিলেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন হেড কোয়ার্টার ছেড়ে বন্য বরাহ শিকারে। মগজে ভরে নিয়ে গেলেন ড্রয়িং অফিসেই সেই কনস্ট্রাকশান প্ল্যানের নীল চার্টটা। শিকারের আর বিচারের নেশা যখন মগজে থিতিয়ে আসবে, তখন তিনি মগজ থেকে নীল চার্টটা মেলে ধরবেন। ইতিমধ্যে হাইওয়ে ব্রড গেজ লাইনের মাপজোপ, আঁকবাঁক কষে ঠিক করে রাখুক এ্যাসিস্টেন্টের দল, পাকা লাইন পাতুক। আর বসে বসে পাহাড় ফাটাক ফ্যাভরে কোম্পানী।

লাইন পাতার কাজটা রেল কোম্পানীর; পাহাড় ফাটানোর কাজ ফ্যাভরের। সেই সর্তে টাটকা সুনামওয়ালা সুইস কোম্পানীটা কনট্রাক্ট নিয়েছে। আসাম হিলস্এ সুন্দর কাজ করেছে ফ্যাভরে কোম্পানী, এখনো করছে সি পি আর মাদ্রাজে। সে তুলনায় ছোট নাগপুর হিলরেঞ্জ নেহাতই নাবালক। শুধুই পাহাড় ফাটানো; টানেল ফানেল নয়।

ফ্যাভরে কোম্পানীর পক্ষ থেকেই আক্রমণটা আরম্ভ করলেন ভরত চৌধুরী তাঁর পাঞ্জাবী আর পাঠান অনুচরদের নিয়ে। দিল্লী দরবারের তোপ দাগার সঙ্গে সময়টা আশ্চর্য ভাবে মিলে গিয়েছিলো।

তিরিশ পাউন্ড ডিনামাইট ঠাসা চার ফুট লম্বা দু' ইঞ্চি চওড়া বোমার আঘাতে একটা প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই আলগা হয়ে গেল; কয়েকটা টুকরো ছিটকে উঠলো শূন্যে, মাথা নুইয়ে দিলে ক'টা গাছও। আকস্মিক জখম পেয়ে বুনো পাথুরে হাড় আর্তনাদ করেছিলো। আর সে আর্তনাদে ছাউনী ফেলা কুলীর দল চমকে উঠেছে। ত্রাস লেগেছে পশুকুলে। সারা আকাশ পাখিদের ভীতার্ত তীক্ষ্ম কর্কশ ডাকে ছেয়ে গেছে সে দিন। রোষ কষায়িত দুটি জড় চোখ যেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে অর্বাচীন একটা মানুষের ধৃষ্টতা। ভরত চৌধুরী হয়তো গ্রাহ্যও করেননি সে দুটি ভর্ৎসনা ভরা চক্ষুকে। গাছ-কাটা সরু পথ দিয়ে ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে তিনি তাঁর পাঞ্জাবী কুলীদের সর্দার ব্রিজ সিংকে উপদেশ দিচ্ছিলেন স্টীল পয়েন্ট বোরিং আর এক ফুটি ছোট বোমাগুলো কি করে কাজে লাগাতে হবে। তারপর পাঁচ ফুটের গর্তে কি করে কুড়ি আর তিরিশ পাউন্ড ডিনামাইট ঠাসা বড় বোমা ভরতে হবে হুঁশিয়ারীতে।

ভরত চৌধুরী হয়তো আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করেননি। টাট্টু ঘোড়ার চেপে মাধো রায় বুনো ঝোপের আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলো তাঁকে। ফাঁকা জায়গায় নেমে আসতে ভরত চৌধুরীকে স্পষ্ট করে দেখা গেল। তীক্ষ্ম দুটি চোখে বিষ মিশিয়ে সেই শালপ্রাংশু দীর্ঘ দেহটা দেখলে মাধো রায়। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললে—'শালা বা-ঙা-লী—!' টাট্টুর পেটে জোর ঠোক্কর দিলে মাধো রায়, কিসের একটা আক্রোশে বেধড়ক চাবুক কষিয়ে দিলে ঘোড়াটাকে। চোখের পলকে শাল, নিমের বনের আড়ালে অদৃশ্য হলো কাঠের কারবারী মাধো রায়।

ক'দিন পরে ভরত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মাধো রায়ের। এতো তাড়াতাড়ি মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে বাঙালীটার সঙ্গে মাধো রায় ভাবেনি।

ভরত চৌধুরীর হাতের ছড়িটা ঠিক ছড়ি নয়; গুপ্তিই বলা যায়—আগায় তার লোহার পাত পরানো। বর্শার ফলার মত ছুঁচলো মুখ। দু দশ কদম হাঁটেন ভারত চৌধুরী; হঠাৎ দাঁড়ান, তাকান এদিক ওদিক, হাতের সেই বর্শামুখো লোহার পাত পরানো ছড়িটা দিয়ে পাহাড়ি মাটি খুঁচিয়ে দেন, পাথরের নুড়ি ছিটকে যায় দু একটা। আবার পথ হাঁটেন। হাঁটার তালে তালে কাঁধে ঝোলানো চামড়ার থলেটা দুলতে থাকে। গাছ কাটাচ্ছিলো মাধো রায়। একটানা ঠুক ঠাক শব্দ উঠছিলো সেই নিস্তব্ধ বনে; মাঝে মাঝে দু একটা তিতির ডাকছিলো আর বুনো টিয়ে

ড়ে যাচ্ছিলো আমলকি ঝোপের মাথার পর দিয়ে।

ভরত চৌধুরীকে দেখতে পেয়ে মাধো য় এগিয়ে গেল।—নমস্তে বাবুজী। াঙা বাঙলায় মাধো রায় বললে করজোড় থায় ঠেকিয়ে।

থামলেন ভরত চৌধুরী; চোখ তুলে াকালেন। একটা হাত ঠেকালেন কপালে।

পরিচয়টুকু দীনভাবে ব্যক্ত করে মাধো য় দু একবার কাশলো, ঘন গোঁফের দু াশে একটা কাষ্ঠ হাসি খেলিয়ে বললে, াবুজী আব তো এহি জঙ্গলী দেশে াপলোক দানা লাগালেন। দু দশ মাসে াামাম সাঁওতাল, কোল ভীলাভি ভদ্দর াদমি হয়ে যাবে। শহর বৈঠবে। হাদুরী আপনাদের!

—রেল লাইন পাতলে দেশ ভদ্র হয় াামায় কে বললে মাধোজী? ভরত ৌধুরী কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসলেন।

—বলবে কে বাবুজী, দেখলাম হামরা, ুনলাম ভি। দেয় মুঠ্‌ঠি করে টাকা াামালে লাঙ্গা আদমি ভি লুগা চড়ায়, রতা চড়ায়, দারু খায়। এ তো সাচ্‌ বাত্‌ াবুজী, দেহাতের গরীবরা পয়সার লালচে াঁ ছোড়বে, ক্ষেতি ছোড়বে, জাঙ্গল ভি। াহি জায়গার আধা মজুর তো আপলোক নয়ে লিলেন। হামার পেট আর দেশ া-ই বেদখল্‌, মাধো রায়ের মুখের হাসি ুছে গেছে কখন। বিজাতীয় একটা ঘৃণা ম থম করছে পাশুটে মুখে।

—দেশ? ভরত চৌধুরী মাধো রায়ের াথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন, চোখে চোখে াাকালেন কিছুক্ষণ, 'মাধোজী, এ দেশ াামার নয় শুধু, আমারও। কিন্তু এখন া তোমার, না আমার!' ছড়ির সরু াালো ইস্পাত মুখটা গেঁথে দিলেন াাটিতে ভরত চৌধুরী। আশ্চর্য একটা াত্তেজনায় কপালের ত্রিশূল শিরা চিহ্ন াপ্‌ দপ্‌ করে উঠলো, চক্‌ চক্‌ করে াঠলো নিষ্প্রভ ধূসর চোখ দুটো. 'রাজা াাদশার কবর দেখেছো মাধোজী? গোরের াপর নক্সা কাটে, গম্বুজ তোলে মিস্ত্রী-াজুর। আমাদের অবস্থাও তেমনি। কবর ায়ে গেছে আমাদের— বিলিতি মিস্ত্রীতে াক্সা কাটছে তার ওপর। কাটতে দাও, াামার আমার কি—?'

মাধো রায় কথাগুলো শুনতে শুনতে অবাক হলো। বোকার মতন তাকালো ভরত চৌধুরীর দিকে, পাগড়িটা হাত থেকে খসে পড়লো মাটিতে। তবু বেহুঁস কাঠের কারবারী মাধো রায়। বাঙালীটা বলে কি!

হাঁটতে হাঁটতে ভরত চৌধুরী বললেন, 'এখানকার লোক তুমি মাধোজী। সব চেনো-জানো। আমায় এ মুলুকটা তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে দাও।'

মাথা নাড়লো মাধো রায়। তাই দেবে ও। কিন্তু বাবুজী তুমিও একটা কাজ করো আমার। যা দেখছি, আর থোড়া দিন পরে জঙ্গলে গাছ-কাটার একটা লোকও আমি পাবো না। নদী পারের মজুরগুলো পর্যন্ত তোমার পাহাড় ফাটানোর পাথরের রাশি সাফ করতে এখানে এসে ছাউনী ফেলবে। তুমি সব মজুর নিয়ো না; ভুখা মরবো আমি বালবাচ্ছা নিয়ে। ক্ষেতখামার, কাঠের ব্যবসা সব যাবে আমার।

ভরত চৌধুরী শুনলেন বটে মাধো রায়ের কথা, কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন কুলী যোগাড়ের কাজটা তাঁর নয়—তাদের কোম্পানীরও নয়। তাদের কাজ শুধু পাহাড় ফাটানো। রাস্তা সাফ করাবে রেল কোম্পানী—গরজ তাদের, লোকলস্কর যোগান করবে তারা।

মাধো রায়ের মুখ শুকিয়ে গেল, বুকও।

লোহার ঘোড়া ছোটানো রেল কোম্পানীর শক্তি ও শয়তানীর সংগে এ'টে উঠতে পারবে কি মাধো রায়? হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে মাধো রায়।

আরো খানিকটা এগিয়ে এসে ভরত চৌধুরী বললেন, 'তুমি আমার তাঁবুতে এসো একদিন মাধোজী। দু চার দিনের মধ্যেই। গল্পসল্প করবো।'

—যাবো, বাবুজী। আলবৎ যাবো। মাধো রায় মাথা নেড়ে সায় জানালো, 'মগর আপনি তো বহু দূরে চলে এসে-ছেন, বাবুজী। ফিরবেন কি করে? বহুৎ রাস্তা যেতে হবে।'

—'তুমি তো দূর দূর যাও, মাধোজী! যাও না—?'

'হামার টাট্টু আছে।'

—'আমার পা আছে।' ভরত চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন। মাধোজীও। দুটো জংগলী পাখি কিচমিচ করে কুল ঝোপের ওপর এসে বসলো। ঠোঁট ঠোকাঠুকি করে আবার উঠে গেল নিমেষেই।

ভরত চৌধুরী তখন টাট্টুর মতই পথ হেঁটে চলেছেন। মাধো রায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো—স্বগতোক্তি করলে হঠাৎ, 'পাগলা!'

পয়লা হল্টের টেম্পরারী হাসপাতালের ডাক্তার অমল হালদার মনে করতো, ভরত চৌধুরী শুধু যে পাগল তা নয়, লোকটা আনলয়েল। আজকাল যে স্বদেশী হাওয়া এসেছে সেই হাওয়ার মানুষ তিনি। গ্রেট ব্রিটানিয়ার মহত্ত্বটুকু স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ। বৃটিশ জাত আর কতকগুলো বাঁদর—দুই যেন এক ভরত চৌধুরীর কাছে। এতোটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা অবহেলা ভালো লাগে না রেলের ছোট ডাক্তার অমল হালদারের। হাজার হোক তার চাকরীটাও তো আধা-সরকারী। মাথার ওপর সাহেবসুবোর দল। আনলয়েল হলে চলবে কেন?

তবু ছোকরা বয়সী অমল ডাক্তার ভরত চৌধুরীকে বাতিল করতে পারে না। লোকটাকে ভালো লাগে তার। অনেক কথা শোনা যায়, তাঁর মুখ থেকে, অনেক কাহিনী। কাঠের কোয়ার্টারের কোঠায় বসে ম্লান আলোয় নেশার ঘোরে সে কাহিনী শুনতে বেশ লাগে। অদ্ভুত লাগে ভরত চৌধুরীর সেই অনাত্মস্থ নাটকীয় ভূমিকা। শুনতে শুনতে অমল হালদারও যেন বিশশতকের পিছু হঠতে হঠতে অতীতের অনুজ্জ্বল রঙ্গগড়ের গুপ্তমন্ত্র প্রকোষ্ঠে এসে দাঁড়ায়।

শত্রু আক্রমণে রঙ্গগড়ের রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক বাহিনী বিধ্বস্ত। মন্ত্রণা রয়েছে কর্তব্য নির্ধারণের। প্রভাত সমাগমেই অগণিত শত্রুসৈন্য দুর্বার বন্যার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে রঙ্গগড়ের সমস্ত রত্ন ছিনিয়ে নিতে। ধনরত্ন যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু আসল রত্ন সিংহাসন, করন্ড-মুকুট-শোভিত, অলঙ্কৃত বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্তি। সে মূর্তির পরিণাম কি? বৌদ্ধ বিদ্বেষী শত্রুর হাতে রঙ্গগড়ের মঞ্জুশ্রী খন্ড বিখণ্ডিত হবে, করধৃত স-নাল পদ্ম পিষ্ট হবে অনাচারীদের পদধূলিতে। বোধিসত্ত্বের এ অবমাননা অসহ্য, অসম্ভব। উপায়—? বৃদ্ধ মহাসেনাপতির কুঞ্চিত ভুরু আরো নিবিড়ভাবে কুঞ্চিত হলো, কণ্ঠ কাঁপলো তাঁর যেন তীক্ষ্ম ধার দ্রুত সঞ্চালন অসি কাঁপছে শত্রু ব্যূহ মধ্যে, রাজকুমারী ভিক্ষুণী সুপর্ণা আজ মধ্য যামে মঞ্জুশ্রী মূর্তি সমভিব্যাহারে গড় পরিত্যাগ করে মধ্যারণ্যে যাত্রা করুক, মহারাজ। দ্বাদশ অশ্বারোহী রাজকুমারীকে রক্ষা করবে ও মূর্তিটি বহন করবে। মধ্যারণ্যের গুপ্ত গুহায় মূর্তিটি লুক্কায়িত রেখে অশ্বারোহীরা ফিরে আসবে গড় রক্ষায়। শত্রু-সৈন্যের হাতে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, রঙ্গগড় করতলগত হয় বিধর্মীদের, তবে ভিক্ষুনী সুপর্ণা মুদ্রা ও আপন সতীত্বের বিনিময়ে পিশাচ ও শবর জাতির সাহায্যে গুহা প্রবেশের দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দেবে।

অমল হালদার চমকে ওঠে। মঞ্জুশ্রী মূর্তি বহন করে কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে বন্ধুর পথ দিয়ে সেও চলেছে অন্যতম অশ্বারোহী হয়ে। রাজকুমারী ভিক্ষুণী সুপর্ণা নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত স্থির হয়ে বসে আছে অশ্বপৃষ্ঠে। নির্বাক, নিষ্পন্দ আর একটি মূর্তি বুঝি।

রঙ্গগড় রক্ষা পায় না। মঞ্জুশ্রী মূর্তি আর সুপর্ণা? মধ্যারণ্যের কৃষ্ণ গুহায় অনন্তকালের জন্য হারিয়ে যায়।

—বুঝলে হালদার, এই তোমার আমার স্বদেশ, বাঙলাই বলো আর ভারতবর্ষই বলো।

আবেগে ভরত চৌধুরীর গলার স্বর জড়িয়ে আসে।

তর্ক বেঁধে যায় ছোকরা অমল ডাক্তারের সংগে। অমল বলে, 'ধর্মের নেশায় কতকগুলো পশু ভিক্ষুনী সুপর্ণাকে বলিদান দিয়েছে, মানবজীবনের মূল্যকে নিষ্ঠুরের মত অস্বীকার করেছে। এর মধ্যে সংস্কৃতির কি আছে?'

—নেই? দপ্ করে জ্বলে ওঠেন ভরত চৌধুরী, 'বাচাল বালকের মত তর্ক করো না হালদার। চিন্তা করে দেখো, মনের উৎকর্ষ ছাড়া মানুষের মধ্যে ছিলো না মাটি পাথরের তালকে মূর্তিতে পরিণত করে, ভালোবাসে একটা জড় পদার্থকে, শ্রদ্ধা করে। আর সে শ্রদ্ধা ভালোবাসা সজীব রক্ত সম্বন্ধের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। মনের এই উৎকর্ষই সংস্কৃতি।

অমলও সহজে হঠে যায় না। ভরত চৌধুরীর সংগে মেতে ওঠে তর্কে। অমলের বলার কথা, প্রাচীন ভারতবর্ষ যাই করে থাকুক, সে গৌরবের আজ বাস্তব কোন মূল্য নেই। বর্তমানের সংস্কৃতি তার চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান।...ভরত চৌধুরী বর্তমানকে উপেক্ষা ভরে দূরে ঠেলে দেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের বর্তমানে কোন সংস্কৃতিই নেই। সংকর রূপের একটা চেহারাকে তো আর সংস্কৃতি বলা যায় না। যেমন ছাই আর আগুন। ছাই আগুনের অস্তিত্বকে স্বীকার করায় বটে, কিন্তু তা আগুন নয়। ছাই, ছাই; আগুন, আগুন। এরা স্বতন্ত্র। তেমনি ভারতবর্ষের মাটিতে এখন যা দেখছো তা সেই ছাই-ই। মুসলমানী আমলে সেই ছাই উড়িয়েছে তারা, এখন ইংরেজরা। ভূত সাজার পক্ষে, এই ছাই মাখাটা প্রশস্ত সন্দেহ নেই।

তর্কটা থেমে যায় মাধো রায়ের আগমনে।

—নমস্তে বাবুজী। চিনে চিনে ঠিক এলাম।

—এসো মাধোজী। এসো। বসো। এতো রাত করে এলে কেন—তোমার সংগে গল্প করবো কখন? চেনো এঁকে, রেলের ছোট ডাক্তার। হালদার, এই আমার মাধোজী।

অমল হালদার মাধোজীকে এখানেই ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। মাধোজীও জানে অমলকে। নমস্কারটা মাধো রায়ই আগে করলো, অমল পরে।

—থোড়া কাম ছিল ইধার, বাবুজী। দেরি হয়ে গেলো বহুৎ। আজ আর লৌঠতে পারলাম না। তাই চলে এলাম। কাল ফজিরে আপকো নিয়ে যাবো। চেনা-পায়ছানা কুলীকাবারী আছে হামার হিঁয়াপরই। রাতটো থেকে যাবো। মাধো রায় একটা কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে হাসলো।

—আমার এখানেও বিস্তর জায়গা আছে মাধোজী। এখানেই রাত কাটাও। মাংসটাংস খাও তো?

—না, না—মাধো রায় জিব কেটে মাথা ঢ়লো।

—মদ?

—রামজী! কানে আঙ্গুল দিলো ধো রায়।

ভরত চৌধুরী হো হো করে হেসে লেন।

—তোমার এই শুচিতা কিন্তু নার্যীয় মাধোজী। আচ্ছা, বসো তোমরা। মি তোমার জন্যে রোটি আর ভাজি রতে বলে আসি চাকরটাকে।

—আজব আদমি বাবুজী। মাধো য় অমলের দিকে তাকায়।

অমল যেন কি ভাবছে গভীরভাবে। টবিলের ম্লান আলোয় কাঠের ঠরীটাও কেমন দেখাচ্ছে যেন। ভরত চৌধুরীর যোগাড় করা যত পাথর, নুড়ি, াটির পুতুল, দু-চারটে ছোট ছোট ভাঙা ূর্তি, পেতলের ভাঙা ঘড়া, পাথরে খাদাই করা একটি গরুড় মূর্তি, ঘরের এক কোণে ধূপ পুড়ছে উগ্র গন্ধ, ম্যাপ ঝুলছে দেওয়ালে দুটি, টেবিলের ওপর একরাশ বই ডাঁই করা।

অমলের যেন হঠাৎ মনে হলো ভরত চৌধুরী মানুষ নয়, যক্ষ; অতীতের ধন আঁকড়ে পড়ে আছেন। মাধো রায়ের দেহের ছায়ার পাশে তাঁর ছায়া পড়ে বটে, কিন্তু মানুষটার মনের ছায়া পড়ে আছে রত্নগড়ে।

করেছে ভরত চৌধুরী। তখন আর্যাবর্তের ধূলিকণা যাদের পাদস্পর্শে স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়েছে, যাদের মনীষার মণিমঞ্জুষায় ফসল ফলেছে—তারাই ভরত চৌধুরীর আত্মীয়। পিতৃপুরুষের সেই সম্পদের এক মুষ্ঠিও যদি উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষা করার ভার পেয়ে থাকেন তিনি, তবে ভরত চৌধুরী ধন্য হয়েছেন।

প্রেতযোনির চেয়ে দেবযোনি শ্রেয়, গৌরবের। তোমরা তো প্রেত অমল হালদার। পিশাচ কুধার আর্যাবর্তের শ্মশানে বসতি স্থাপন করেছো। আমি প্রেত নই, যক্ষ। সেই অতীত থেকে নির্বাসিত হয়েছি, তথাপি আমার দেবযোনি।

—মাটি খুঁড়ে যদি আপনার অতীত আর্যাবর্তকে উদ্ধার করে দেওয়া যায়—সেই কঙ্কাল নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে বলতে পারেন? অমল হালদার একদিন সোজাসুজি প্রশ্ন করে ফেলে।

—ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে আমার

বিশ শতকের ইণ্ডিয়া যদি ভরত চৌধুরীকে মানুষ বলে স্বীকার করতে না চায়, না করুক; তার জন্যে কাতর হবেন না তিনি। তিলমাত্র মনোক্লেশও সহ্য করতে হবে না ভরত চৌধুরীকে কোনদিন, এর জন্যে কোন অভিমান কখনো মন জুড়ে বসবে না। ভারতবর্ষের মানচিত্রটা অমল হালদারের চোখের সামনে মেলে না ধরলে অমল হালদার বুঝতেই পারবে না, সে ভারতীয়—গ্রেট বৃটেনের দৌলতে অমলের এতটুকু বোধ জন্মেছে। কিন্তু ভরত চৌধুরী? ভরত চৌধুরীর চোখের সামনে প্রাচীন আর্যাবর্তের মানচিত্র খোলা পড়ে আছে—কম্বোজ থেকে সমতট। আসমুদ্র হিমাচল বেষ্টিত সেই প্রাচীন জনপদেই জন্মগ্রহণ

যে সবল সুস্থ কুলীগুলো মরছে, হাত পা মাথা উড়িয়ে চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ছে তোমার মডার্ন ডাক্তারী তাদের পক্ষে কোন্ প্রয়োজনে আসছে বলতে পারো? পাল্টা প্রশ্ন করেন ভরত চৌধুরী।

—প্রয়োজনটাকে আপনি এভাবে বিচার করছেন কেন? যারা মরতে চলেছে তাদের বাঁচাবার চেষ্টাই তো আমরা করছি। অনেকেই কি বেঁচে যাচ্ছে না আমাদের ডাক্তারীতে?

—আমার পাল্টা জবাবটও ঠিক তোমার মতন হালদার। প্রাচীন আর্যাবর্তের কঙ্কালগুলোর প্রয়োজন ভারতবর্ষের একটা কালচারাল অ্যানাটমি লেখার জন্যে। একটা মৃত সভ্যতাকে আর বাঁচানো যায় না; তবে চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত এখনো ক্ষীণ ধারায় যেটুকু টিকে আছে তাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা যায়।

খানিক পরে অমল বললে, 'মাধো রায়ের সঙ্গে এ অঞ্চল তো চষে ফেললেন। পেলেন নাকি কিছু!'

—না, কিছু না।

অমল হালদার উঠে পড়লো। রাত হয়ে গেছে। শীত করছে বেশ।

—শুনেছি এবার আমাদের দু নম্বর হল্টে গিয়ে বসতে হবে। যাবার সময় প্রশ্ন করলে অমল।

কি করে সম্ভব? যতটা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছি সেখানে হল্ট ফেলা মুশকিল। তবে আরও চার ফার্লংটাক এগিয়ে গেলে অনেকটা প্লেন ল্যান্ড পাওয়া যাবে। তখন তো এ রাজধানী তুলে নিয়ে যেতে হবেই হে, নয়তো কাজ বন্ধ।

যন্ত্রসভ্যতার দিগ্বিজয়কে ঠেকাতে পারলো না ছোটনাগপুর হিলস্। দুর্বলভাবে ঠেকা দিতে দিতে ছোটনাগপুর হিলস্ ক্রমশই পিছু হঠে যেতে লাগলো আর গিবসনের ফৌজ লোহার ঘোড়া ছোটার সড়ক ফেলতে লাগলো ঝপাঝপ্।

কনস্ট্রাকশানের প্রগ্রেস দেখে গিবসন সাহেব চমৎকৃত। ফ্যাডরে কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়ারও কলকাতায় বসে রিপোর্ট পড়েন এবং বিলের তলায় সই মারেন মহা আনন্দে। এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনীয়ার চৌবেরড়ী হেডকোয়ার্টারে বসে খেয়ে ঘুমিয়ে মদে মেয়েমানুষে দিন কাটাচ্ছিলো, চীফ ইঞ্জিনীয়ার তাকে পাঠিয়ে দিলো সি-পিতে। ভরত চৌধুরীর ঘাড়ে দায়িত্বটা পড়লো পুরোপুরি।

আক্রমণটা যেন দিন দিন আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। কেন? হলো কি ভরত চৌধুরীর। ব্রিজ সিং তার সাহেবের দিকে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে তাকায়। মাতাল হাতী দেখেছে ব্রিজ সিং, ক্ষ্যাপা হাতী, সাহেব তার তেমনি হয়ে গেছে। পাহাড় ফাটানো তো নয়—যেন জঙ্গলের বুক ফাটিয়ে সাহেব সোনার তাল খুঁজছে।

বাইরের এই চঞ্চলতা দেখে ভরত চৌধুরীকে বিচার করতে গেলে ঠকতে হবে। ভিতরে ভিতরে আশ্চর্য একটা জড়তা নেমেছে তাঁর। মরা শীতের মতন। হতাশ হয়েছেন তিনি, একেবারেই হতাশ। চোখের ওপর প্ল্যান, ম্যাপ খোলা পড়ে থাকে, তাঁবুর বাইরে শাল, শিশু, নিম, হরীতকীর শিশির-ভেজা পাতায় রোদ পড়ে চিকমিক করে, আকাশটা নীল হয়ে থাকে সারাদিন, জঙলী হাওয়ায় যেন বরফের কুচি ওড়ে। ভরত চৌধুরীর কিছু খেয়াল হয় না। দিনরাত একটানা ডিনামাইট ফাটছে, বিরাম নেই সে শব্দের। তবু বুঝি ভরত চৌধুরীর সেই অন্যমনস্কতা ভাঙে না, ধ্যান ছিঁড়ে যায় না টুকরো টুকরো হয়ে।

হুইস্কির নেশায় ছলছল করে ভরত চৌধুরীর দুই চোখ; ল্যাম্পের আলোয় তাঁর যাদুঘর ম্লানমুখে চেয়ে থাকে। হতাশ হয়েছেন ভরত চৌধুরী; ভীষণ হতাশ। এই দেশ, এই পাহাড়টা তাঁকে ভীষণভাবে হতাশ করেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি মুখ খোলাতে পারলেন না ছোটনাগপুর হিলস্-এর। একটা কথা বললে না এই প্রাক-ইতিহাস জড় পদার্থটা। ব্যক্ত করলে না তার ইতিহাস। বিস্মৃত অতীতকে কোন্ গহ্বরে লুকিয়ে রাখলো, কে জানে!

অমল হালদার সহানুভূতি জানিয়ে বলে, 'খুব ডিসএপয়েণ্টেড হয়েছেন, না দাদা?'

মাধো রায় আসে মাঝে মাঝে। শুকনো মুখ, গলায় যেন আর স্বর উঠতে চায় না।

—কি মাধোজী, তুমিও ঝিমিয়ে পড়ছো?

—কপাল বাবুজী। মাধো রায় কপাল দেখায়, 'যা ডর করেছিলাম তাই হল। আমার জানা পয়ছানা গাঁও গেরস্থিতে একভি জোয়ান মরদানা নেই; সব ইধার চলে এলো। কাঠের কারবারী বন্ধ; ক্ষেতিভি যায়। ইতনা লালচ্, ইতনা শয়তানি কি আচ্ছা বাবুজী?

ভরত চৌধুরী অন্যমনস্ক চোখে উঠে পড়েন। কাঁধে থলি ঝুলিয়ে, ছড়িটা হাতে করে বেরিয়ে পড়েন। শেষবারের মত চষে ফেলবেন এই পার্বত্য এলাকা। শেষবারের মত।

রোদের মিঠে আলোয় গা-ভেজানো একটা ময়ূর গলা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে ভরত চৌধুরীকে দেখে।

নিশান্তে একটি পলাতক নক্ষত্র হঠাৎ যেন দূরবীক্ষণে ধরা দিলো। ভরত চৌধুরীর ঝিমোনো রক্তে বিদ্যুতের ছোঁয়া; দপ্‌দপ্ করছে শিরা, স্নায়ুতন্ত্রে উচ্চগ্রাম সুর। ধূসর চোখ দুটিতে স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি। শালপ্রাংশু দেহটা দুর্গম শিলাপ্রাচীর তুচ্ছ করে, বনজ বাধা ডিঙিয়ে তরতর করে নেমে আসে নীচে।

অমল হালদারও খবরটা শুনে চমকে ওঠে প্রথমে। আর অবাক হয়ে যায় ভরত চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে। উত্তেজনায় চল্লিশ বছরের পেটানো দেহটা ঝড়ে কাঁপা তরুর মত কাঁপছে।

—চলো হালদার, তোমায় দেখিয়ে আনি। জীবনে এমন জিনিস তুমি দেখোনি। অপূর্ব!

অমল হালদার দেখে এলো। মাধো রায়ও বাদ পড়লো না।

জহুরীর চোখ নয়, রেলের ছো ডাক্তার অমল হালদারের। এ্যানসেণ্ট কালচারের মোহ নেই তার। তবু মুগ্ধ হয়েছে অমল; মনে মনে স্বীকার করেছে শিল্পের চমৎকারিত্ব।

মূর্খ মাধো রায় অবাক চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সেই উৎকীর্ণ মূর্তি, ধর্মভীরু মন তার প্রণাম জানিয়েছে করজোড়ে।

—লছ্‌মি-নারায়ণ হ্যয়, না বাবুজী?

ভরত চৌধুরী অন্যমনস্ক। মাথা নড়েছেন, মন তখন যুগযুগান্ত অতিক্রম করে ছুটে যাচ্ছে প্রাচীন আর্যখণ্ডে।

ভরত চৌধুরী যেন চৌবেরডি কনস্ট্রাকশানের পরিধি থেকে উধাও হয়ে গেলেন কোথাও. হঠাৎ। থেকেও তিনি নেই। কুলী-ছাউনী, স্টোর, কাঁচা রেল-লাইনের-পায়ে-বাঁধা লিভারপুলের যন্ত্র-দানব, সিটি-ধোঁয়া কিছুই আর চোখে পড়ে না তাঁর। ডিনামাইটের শব্দটাও বুঝি কানে যায় না।

হাড়-কাঁপানো শীতের রাত আসে, তাঁবুর মধ্যে কাঠ-কয়লার ছোট উনুন জ্বলে সারারাত, ল্যাম্পের শিখাটা পুড়ে পুড়ে ছোট হয়ে আসে, ভরত চৌধুরীর দুঘর নিঃশব্দে মানচিত্র খুলে ধরে। চড়া নেশায় মনের কপাট ভেঙে ভেঙে তিনি চলে যান পাল-সেন রাজাদের পুণ্যভূমিতে।

অমল হালদারের ডাক পড়ে আবার।

—উদ্ধার করলেন নাকি কিছু? টুল টেনে বসে অমল প্রশ্ন করে।

—খানিকটা করেছি। সুখবর জানাতে তোমায় ডেকে পাঠালাম। নাও, আগে একটু চা খাও।

—বলুন! চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে অমল প্রশ্নার্ত চোখে তাকায়।

—পাহাড়ের চূড়োটা তোমার মনে আছে, হালদার। একটু অদ্ভুত রকমের। একটা ছোট মেঘ যেন চূড়ার মাথার ওপর একপাশে বসে আছে। নীচেটা ফাঁকা। পাথরের এই চাঁইটার গায়ে কোন অজ্ঞাতনামা শিল্পী এই মূর্তি খোদাই করেছেন জানি না। বড় দক্ষ কারিগর ছিলেন তিনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভরত চৌধুরী থেমে একটা চুরুট ধরালেন, 'ও মূর্তি কিন্তু কোন দেবদেবীর নয়, আমার স্থির ধারণা, ঐ অঞ্চলের কোন শবরকন্যা ও রাজ-পুরুষের মধ্যে প্রেমলীলার এক কাহিনীকে শিল্পী রূপায়িত করেছেন অসামান্য দক্ষতায়।

—শবরকন্যা ও দেবকন্যা, আমার কাছে সব এক, দাদা। অমল হালদার—নিজের অজ্ঞতা জানিয়ে হাসলো।

অমল হালদারের অজ্ঞতা নিবারণের আশায় ভরত চৌধুরী তথ্য পরিবেশনে মুখর হয়ে উঠলেন।

—মূর্তির ক্ষীণ তনু ও ঊর্ধ্বাঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা বিচারে আমার মনে হয় এটি দ্বাদশ শতাব্দীর। রামপালের আমলের। বোধ হয় তখন এই অরণ্য-অধ্যুষিত এলাকার সমস্ত রাজা ছিলেন রাজা শূরপাল। রামপালের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের চেষ্টায় এঁরা সাহায্য করেছিলেন বলে মনে হয়। সেই সময় পার্বত্য জাতির সঙ্গে রাজসৈন্য ও রাজ-পুরুষের খুব একটা মাখামাখি হয়েছিলো। অসামাজিক যৌনসংসর্গ অবশ্য প্রশ্রয় পেয়েছে তখন। মূর্তিটি তারই স্মৃতি বহন করছে। তবে হালদার, এ শিল্পের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় কোন বাঙালী শিল্পী। বাঙালী শিল্পী না হলে এমন কমনীয়তা ও সূক্ষ্মতা আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ভরত চৌধুরী থামলেন না। আবেগ-ভরা কণ্ঠে পাল আমলের বাঙলার ঐশ্বর্যকে তিনি উদ্ভাসিত করে তুললেন। শীতের রাত্রে অনুজ্জ্বল তাঁবুতে একাদশ আর দ্বাদশ শতকের সৌরভ ভেসে এলো। রামপালের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি ছোট-নাগপুর হিলসের ডিনামাইট প্রকম্পিত বায়ুস্তরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল দূর-দূরান্তরে।

অমল হালদার যখন সম্বিত ফিরে পেলো তখন শালবনের মাথায় এক ফালি চাঁদ উঠেছে, কুয়াশায় ভেজা চাঁদ। শোঁ-শোঁ বাতাস বইছে, ঠান্ডা কনকনে হাওয়া।

কাঠের কারবারী মাধো রায় এতো-দিন ভেতরে ভেতরে আক্রোশে ফুঁসছিলো। রেল কোম্পানীর চাঁদি বিলোনো শয়তানির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে মুষড়ে পড়েছিলো খুব। হঠাৎ একটা সুযোগ হাতে আসতেই টাট্টু ঘোড়ার পেটে ঠোক্কর মেরে চাবুক কষিয়ে বেরিয়ে পড়লো। প্রতিহিংসার জ্বালা সারা গায়ে, স্বার্থের ইন্ধন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে মাধো রায়ের।

রক ব্ল্যাস্টিং-এর প্রগ্রেসটাও হঠাৎ কমে এলো। সারা দিনে কুড়ি পাউন্ড ডিনামাইটও দাগা হয় না। ভরত চৌধুরী নোট পাঠায় সদর দপ্তরে : হার্ড রক, রিস্কি পজিশান। লেবার ট্রাবল দেখা দিয়েছে।

মাধো রায় শালবনের আড়ালে, ছায়ায় ছায়ায় একটা ভূতের মত আসে-যায়। স্বয়ং দেবতা আছেন ওই পাহাড়ের ওপর; লছমি নারায়ণ। তাঁর সঙ্গে আছেন মারাং বুরু। স্বপ্ন দিয়েছেন দেবতা, ভর করেছেন ভরতু আর সিরু মাঝির ওপর। এসো তোমরা স্বচক্ষে দেখবে দেবতা। দেখবে চলো ভরতু আর সিরু মাঝিকে। খবরদার আর কেউ একটা পাথর ছুঁয়ো না এ পাহাড়ের। জান, প্রাণ, পুত্র, পরিবার কেউ আর বাঁচবে না তাহ'লে। গাই, গরু, ছাগল, ক্ষেত, খামারিতে তোমাদের আগুন ধরে যাবে। পালিয়ে যাও। এ ছাউনী ছেড়ে, পাহাড় ছেড়ে।......টাঙ্গি দিয়ে কে যেন কুপিয়ে সাবাড় করে দিয়েছে হেড সর্দারকে। ভোলা মাঝির ঘরে আগুন জ্বলে সব ছাই হয়ে গেছে। পালাও, পালাও।

এই সময়ই কেমন করে তিন-তিনটে পাঞ্জাবী অসুর এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে হাওয়ায় উড়ে গেল পাথরের টুকরোর সঙ্গে। ভরত চৌধুরী কি আঁক-জোঁক ভুল করেছিলেন? কে জানে!

ছাউনী ফাঁকা হ'য়ে আসছে দিন-দিন। মাধো রায়ের লছমি-নারায়ণ ভীষণ সদয়। কার যেন গায়ে গুটি বেরুলো হঠাৎ। স্বয়ং দেবতারই ক্রোধ।

ফাঁকা, ফাঁকা, চৈত্রের হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরছে, বন ফাঁকা, কুলী ছাউনীও ফাঁকা। আশ্চর্য একটা শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে ছোটনাগপুর হিলসে। কাঁচা লাইনটাও থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। গিবসন বোকার মত টহল দিয়ে যায়। মেসেজ আসে ফ্যাভরে কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছ থেকে। উত্তর পাঠায় ভরত চৌধুরী, নো লেবার।

অমল হালদার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এ শূন্যতা।

খুশী হয়েছে মাধো রায়। আর নদী পেরিয়ে, নয়, নদীর ওপারের বনে

গাছ কাটাচ্ছে মাধো রায়। আট কাঁচ্চার হাজরীতে। মরদ জোয়ানরা আগের মতই গাঁয়ে গাঁয়ে অলস হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ভরত চৌধুরী ব্র্যাণ্ডির নেশায় বিভোর হয়ে যাদুঘর আগলে বসে থাকেন। শূরপাল কি শবরকন্যা বিবাহ করেছিলেন?

ঠেকা দেবার চেষ্টা গিবসন কিছু কম করেন নি; কিন্তু তা শেষ সময়। হাট যখন ভেঙে গেলো তখনও আশা হারালেন না তিনি। নীল পাগড়ি মাথায়, ধোপদুরস্ত কোটে পেতলের ঝকমকে বোতাম আঁটা, কাঁচা চামড়ার দিশী নাগরা পায়—গিবসন অনুচররা বৈশাখ মাসের ঝাঁ-ঝাঁ রুদ্দুরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ালো। ফল হলো না কিছু। অনেক আলাদ্দীনের প্রদীপ-কাহিনী আকাশের তারার মতন ঝিক্-মিক্ করতে লাগলো বনজ ভূভাগে। কিন্তু সাহস হলো না কারও আবার এগিয়ে আসে মারাংবুরুর কোপদৃষ্টির সীমানায়। কোথাও কোথাও নীল পাগড়িকে মাত্র একদিনের জন্যে দেখা গিয়েছিলো—তারপর আর নয়। ফিরে আসতেও পারেনি তারা গিবসনী দুর্গে।

কিছু ছত্রিশগড়ি আর কুর্মি কুলি রিক্রুট করে আনতে আনতে বর্ষা এসে গেল। গিবসন সাহেব অর্ডার দিলেন, প্রথমে পাকা লাইনটা পেতে নাও, বর্ষায় কাঁচা লাইন ডেমেজ হতে পারে।

ভরত চৌধুরী নীরবে, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখে গেলেন সব। তাঁর পাঞ্জাবী কুলীর সংখ্যাও অনেক কমে এসেছে। 'অন্তত ত্রিশ জন পাঞ্জাবী কুলী পাঠাও,' তার পাঠালেন তিনি কলকাতা অফিসে, 'সি পি কনস্ট্রাকশানে কাজ করেছে, কাজকর্ম জানে এমন লেবার।'

ভাঙা হাট ভালো করে সাজিয়ে-গুজিয়ে বসতে বসতে শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে এলো। প্রচণ্ড বর্ষা নামলো হঠাৎ। এমন বর্ষা বহু বছর হয়নি নাকি এ অঞ্চলে।

অনেক দিন পরে হঠাৎ একদিন মাধো রায় ঝড়ো মূর্তি নিয়ে আবার হাজির। জলে সর্বাঙ্গ সিক্ত। গায়ে জামা নেই, চোখ গর্তে বসে গেছে। থর-থর কাঁপছে মাধো রায়। কোন রকমে ভরত চৌধুরীর তাঁবুতে পেঁছে লোকটা ডুকরে কেঁদে উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

জ্ঞান ফিরতে মাধো রায় যা বললে তা বড় মর্মান্তিক। বিশ সালের মধ্যেও এমন বান কখনো আসেনি বাবুজী, এমন ঝড়। নদীর ওপারে ওদের বসতি, এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে প্রায় পনেরো ষোলটি গ্রাম। মাঝরাতে প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে বান এলো, দুদিন, দুরাত এক-টানা ঝড় বয়েছে শোঁ শোঁ আর জল ফুলে ফুলে আছড়ে পড়েছে, ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঘর, বাড়ি, জোত, জমি, গরু, ছাগল, মানুষ। মাধো রায়ের বউ মরেছে, মেয়েটাকে নিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলো, পারলো না, বাচ্চা মেয়েটাও ভেসে গেছে।

—বলো কি, মাধোজী? ভরত চৌধুরীর বুকটা হঠাৎ কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

ঠিকই বলেছে মাধো রায়। নদী-পথ ধরেই যোগাযোগটা রক্ষা পেতো এ অঞ্চলের সঙ্গে ও অঞ্চলের। তা ছাড়া আর পথ নেই। অরণ্য ও পশুসঙ্কুল দুর্ভেদ্য জঙ্গল-ঘেরা একটি উপনিবেশ এক খণ্ড দ্বীপের মতন পড়ে আছে ওপারে। প্রাণের দায়ে মাধো রায় এবং আরও বিশ পঁচিশ জন সব ভয় তুচ্ছ করে উঁচু পাহাড়ে উঠেছে। জঙ্গল-পথ দিয়ে পালাতে পালাতে ভাগ্যক্রমে পেঁছে গেছে এখানে। তাছাড়া আর যারা তারা বন্যার জলে ভেসে গেছে। জঙ্গলে পালিয়ে
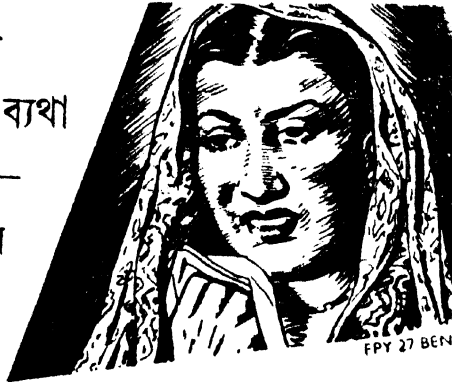
প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করছে যারা তারাও কি আর বাঁচবে, শের আছে, ভাল্লুক আছে, সাপ আছে। পেটভি তো আছে, বাবুজী। দানা না পড়লে ক'দিন বাঁচবে।

বানের খবরটা শুনলো সবাই। গিবসন সাহেব এসেছিলেন সুপারভাইজ করতে দু নম্বর হপ্তেই। অমল ডাক্তারও সঙ্গে ছিলো ভাগ্যক্রমে। ভরত চৌধুরী বললে মাধো রায়দের গ্রামের মর্মান্তিক কাহিনী। সব শুনে গিবসন সাহেব বাঁকা হাসি হাসলেন, 'হোয়াই, দে শুড হ্যাভ বিন সেভেড বাই দেয়ার মাউনটেন গডস্? ' তারপর তাঁর বেনিয়া চাল চাললেন ধূর্ততার, 'রামরাটনবাবু, য়ার্ক ফর দোজ লোকাল লেবারারস অ্যান্ড এজ ম্যাচ হেল্প পসবল্। আই উইল সেন্ড এন আরজেন্ট মেসেজ টু আপার গভর্নমেন্ট অথারিটি ফর হেল্প, মিঃ চৌধুরী এন্ড টু আওয়ার মিশনারিজ্। উই মাস্ট উইন ওভার দেম। পুয়োর স্যাভেজ লট্। দে আর ম্যাচ এসেন্সিয়াল ফর আওয়ার কন্‌স্ট্রাকশান ওয়ার্ক। ইজ ইনট্ ইট?'

ভারত চৌধুরী দম দেওয়া পুতুলের মত মাথা নাড়লেন। অমল ডাক্তার বললো এই মাথা নাড়া।

প্রশ্নটা তুললো অমলই, গিবসন সাহেবের কাছেই। বললে, 'মিঃ গিবসন হেল্প্ তুমি পাঠাবে কি করে?'

ভরত চৌধুরীও কল্পনা করেনি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ গিবসনের মনের মধ্যে এ পাহাড়ের সার্ভে আর লাইন-প্লটের চার্ট, প্ল্যান, ড্রইং জ্বলজ্বল করে ভাসছে সারাক্ষণ। কয়েক মিনিট চোট ছোট চোখ করে কি যেন দেখে নিলেন গিবসন। জবাব দিলেন, রক কাটিং যেখানে হচ্ছে সেখান থেকে স্ট্রেট ... তারপর নর্থ-ইস্ট রুট ধরে সে আউট্ ইলেভেন ফার্লং গেলেই না ওই জঙ্গলগুলোর আওতার মধ্যে পড়া ... চৌধুরী?

বিস্মিত বিবর্ণ দুটি চোখ মেলে ভরত চৌধুরী এবারও মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

—বাই দিস্ এইট মান্থস্ উই কুড হ্যাভ আওয়ার কাঁচ্চা লাইন দেয়ার। ইজ ইনট্ ইট্?

—ইয়েস। ভরত চৌধুরী শেষবারে মত মাথা নেড়ে হঠাৎ স্থানত্যাগ করলেন।

অমল হালদারের চোখের ওপর থেকে একটা পর্দা সরে গেল যেন হঠাৎ এতোদিন পরে।

সি পি থেকে ফ্যাভরে কোম্পানীর এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনিয়ার মিঃ নিকো আড়াই ডজন পাঠানী আর পাঞ্জাবী করিৎকর্মা গোলোন্দাজ নিয়ে চলে এলো। ছত্রিশগড়ি কুলী এলো আরও কয়েক গাড়ি রিক্রুট হয়ে।

গিবসনী মহানুভবতায় মিশনারী ফাদার তাঁর কালো চামড়ার সঙ্গোপাঙ্গো, গাধা, খচ্চরের পিঠে হেলপ্ বোঝাই করে রিলিফের কাজে বেরিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে বুভুক্ষুর দল একে একে আবার এসে জুটলো লেবার রিক্রুটিং সেডের তলায়। এবার মাধো রায়ই তাদের পুরোভাগে। লেবার কনট্রাক্ট নিয়েছে ও।

ভরত চৌধুরী তাঁর বাদুঘরে বসে শূরপালের রাজত্বকাল নির্ণয় করতে বার বার ভুল করেন। শবরকন্যার কুঞ্চিত কেশদাম, কেয়ুর, বলয়ের ছায়াটা বার বার কেঁপে ওঠে। সব ভুল হয়ে যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙলার স্বপ্ন ভেঙে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন ভরত চৌধুরী। ফ্যাভরের এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনিয়ার নিজের হাতে অপারেশনের ভার নিয়েছে। চল্লিশ জন পাঞ্জাবী অসুর তাঁর পিছনে। তিরিশ পাউন্ড ডিনামাইটের বোমাগুলো একটার পর একটা ফেটে যাচ্ছে। আর সামনে থেকে দলে দলে এগিয়ে আসছে তারাই যারা লছমিনারায়ণ আর মারাংবুরুর ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। এবার মাধো রায়ের নেতৃত্বে।

দুদিক থেকে সমানে চাপ, পিছনে বিংশশতাব্দীর মুঠো ভরা বারুদ আর শঠ রাজনৈতিক অস্ত্রসত্র সামনে ক্ষুধা ক্লিষ্ট বুদ্ধিহীন কতকগুলো মানুষ। মাধো রায়ের মত বেইমান যাদের নেতা। এর মধ্যে সংস্কৃতি শিল্প—?

অসম্ভব। ভরত চৌধুরীর গণ্ডাস্থি আবার কঠিন হয়ে ওঠে। ক্ষ্যাপা হাতির উন্মাদনা এলো মনে। জ্বলতে লাগলো দুই চোখ আর প্রাচীন আর্যরক্ত। দু পাশ থেকে দুই বিধর্মী তাঁকে আক্রমণ করেনি প্রাচীন আর্যাবর্তকেই আক্রমণ করছে যেন। অতীত বাঙলার ভূখণ্ডই আক্রান্ত। বাঙালী রামপালের তিনিও যে অন্যতম সামন্ত।

—আমি আর সিক্ নই, মিঃ রস সিকো। ভালো হয়ে উঠেছি। কাল থেকে আমিই চার্জ নিলাম। এসোসিয়েটেড ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে চার্জ নিয়ে নিলেন ভরত চৌধুরী।

ছোটনাগপুর হিলসের বন্য আত্মাও শিউরে উঠলো আবার, অনেকদিন পরে। লম্বা, রোদপড়া তামাটে একটা দ্বিপদ জীব সমস্ত পাহাড়টাকেই যেন উড়িয়ে, ভেঙে মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

—ইউ আর অপারেটিং সো হেভি ব্লাস্টিং, চৌধুরী? মিঃ রস সিকো আপত্তি জানান।

—হার্ড রক্। আর মাত্র তো কয়েক গজ মিঃ সিকো।

ভরত চৌধুরী দৈত্যের মত শেষ দিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। লাস্ট্ রাউন্ডে চল্লিশ পাউন্ডের ডিনামাইট ঠাসা দুটো বোমা পাশাপাশি ফাটাবার হুকুম দিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন। ব্রিজ সিং বলে, শেষবার যখন সে পলতেয় আগুন দেয় চুড়োর ওপর, পাথরের পাশে সাহেবের মাথাটা সে দেখেছে। সাহেব যেন দু হাত বাড়িয়ে কি ধরে ছিলেন।

অমল হালদার তারপর অনেক খুঁজেছে ভরত চৌধুরীকে কোথাও খুঁজে পায়নি; শবরকন্যাকেও নয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্বানুবৃত্তি)

আর জনপদ অংশের প্রধান নায়ক অখ্যাত অজ্ঞাত মানব একথার উল্লেখ আগে করিয়াছি। অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের সাক্ষাৎ নব্য বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে। ইতিপূর্বে মধুসূদন বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাগণকে আঁকিয়াছেন, তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারতের মাপের মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাদের আঁকিয়াছেন, তাঁহাদেরও অনেকের স্থান ইতিহাসের বড় দরবারে, অন্যেরাও সাধারণ মাপের চেয়ে বড়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে যাঁহাদের পাইলাম, তাহারা স্বতন্ত্র জাতের মানুষ; ইতিহাসে পুরানে তাঁহাদের উল্লেখ নাই, কাব্যের পাকা বনিয়াদ তাঁহাদের জন্য নয়; তাহারা সংসারের নামগোত্রহীনের দল, তাহারা কল্পনা-রাজ্যের হরিজন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝে তাহাদের দেখা পাই। কবিকঙ্কণে উপদ্রুত পশুগণের কাহিনী লিখিবার সময়ে ইহাদের কথাই ভাবিতেছিলেন; আবার ময়মনসিংহ গীতিকার বাঁশের বাঁশীতেই ইহাদেরই সুখ-দুঃখের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। নব্য বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি কলিকাতার মতো শহরে, সেখানে এই নামগোত্রহীনের প্রবেশপথ সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রাক্-রবীন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে ইহাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। একথা রবীন্দ্রনাথও জানিতেন।

তাঁহার ছোট গল্পের লিরিক অপবাদ খণ্ডন উপলক্ষ্যে কবি লিখিতেছেন—"অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কবি এত লেখেন নি, কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুচ্ছ গীতিধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগলো, আহা যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর না-জানি কি দশা হবে। কিম্বা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হ'ল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যাকিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতিধর্মী বললে ভুল করবে। ......ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।'[২৬]

বিষয়টি তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। 'আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পাননি বলে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এলো। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লী জীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লী জীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অ-সাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় হয়, তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে, তাই ভয় হয়, এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।'[২৭]

এই গল্পগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে 'সমাজ-চৈতন্য' নাই, এমন উক্তি নিশ্চয় কবির কানে গিয়াছিল নতুবা কেন তিনি বলিবেন—'সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহ তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানব-জীবনের সেই সুখ-দুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষি-ক্ষেত্রে পল্লী-পার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে কোন সামন্ততন্ত্র নয়, কোন . রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।'[২৮]

উদ্ধৃতিগুলির নির্গলিতার্থ করিলে দাঁড়ায় এই যে, বাংলা সাহিত্যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের ইহাই প্রথম নিঃসংশয় পদার্পণ। আর এ মানুষ কবির মনগড়া নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতার সূত্রে প্রাপ্ত। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মূল উপাদান-স্বরূপ ব্যবহার করিয়া তিনি জীবনের লীলাবিচিত্র রূপটিকে সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ছিন্নপত্র গ্রন্থখানি অবধানপূর্বক পড়িলে কবির দাবীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিবে না ইহার পত্রে কবির অনেক গল্প ও কবিতার একমেটে রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে

২৬। গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫৩৮—৫৩৯, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড।

২৭। গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫৩৭—৫৩৮ র,-র, ১৪শ খণ্ড।

কবির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিয়াছে বুর্জোয়া সংসর্গ দোষে গল্পগুচ্ছ অপাঙ্‌ক্তেয় হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২৮। গ্রন্থ পরিচয়, পৃঃ ৫৪০, র-র ১৪শ খণ্ড। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ—খে[য়া] দুর্লভ জন্ম, সামান্য লোক প্রভৃতি কবি[তা] (চৈতালি কাব্য)। সাহিত্যে "সমাজ চৈতন[্য] সম্পর্কিত প্রশ্নটির যথোচিত মীমাংসা ক[বি] করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যাহাদের না বুঝিব[ার] শক্তি অসীম খুব সম্ভব তাহাদের পক্ষে ই[হা] যথেষ্ট মনে হইবে না।

সেই একমেটে অভিজ্ঞতা কিভাবে বস্তুতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, বিবর্তনও অনায়াসে লক্ষ্যগোচর। কবি-জীবনের এই পর্বকে বার পক্ষে বইখানা একেবারেই রহার্য।

ল্লী অভিজ্ঞতার ভাসমান সব খন্ড চিত্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, া তাঁহার জীবনকে বিচিত্রতর ও তর করিয়া তোলে। তিনি কুঠি- র ছাদ হইতে কিম্বা বোটের জানালা দেখিতে পান—'এই নৌকো পার দেখতে বেশ লাগে। ওপারে তাই খেয়া নৌকোয় এত ভীড়। া ঘাসের বোঝা, কেউবা একটা , কেউবা একটা বস্তা কাঁধে করে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে ছ, ছোট নদীটি এবং দুই পারের ছোট গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরে- া এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্য- নের এই একটুখানি স্রোত, অতি ধীরে চলছে।'২৯

যাবার কখনো বা গ্রামের ঘাটে বধূ- রর একটি দৃশ্য দেখিতে পান। শেষে যখন যাত্রার সময় হ'ল, তখন ুম, আমার সেই চুলছাঁটা, গোলগাল বালা-পরা, উজ্জ্বল সরল মুখশ্রী টকে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, া বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে র ঘরে যাচ্ছে।'৩০

ই চিত্রখন্ড কবিচিত্তে সঞ্চিত হইয়া সময়মতো হয়তো 'সমাপ্তি' কারে প্রকাশিত হইয়া আসিবে।

াবার পূজার প্রারম্ভে আর একটি ড দেখিতে পান, প্রবাসী ঘরে তছে। 'দেখলুম একটি বাবু ঘাটের াছি নৌকো আসতেই পুরোনো বদলে একটি নূতন কোঁচানো পরলে, জামার উপর শাদা রেশমের নি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর নি পাকানো চাদর বহুযত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চললো।'৩১

পল্লী জীবনের সরল এই সব আভাস কবিচিত্তে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত দেয়— 'যতই একলা আপনমনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না।'৩২

এই সরলতার শিক্ষা কবির ছোট গল্প রচনার টেকনিকের উপরে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার মতো।

আগের কখনো কখনো ক্ষুদ্র পল্লী- জীবনের আভাস একটা প্রকান্ড পট- ভূমিকায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া কবি- চিত্তকে কেমন বিকল করিয়া দেয়, ছোট গল্পের সামগ্রী হঠাৎ মহাকাব্যের ভূমিকা গ্রহণ করে—'আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম, ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ পাওয়া শক্ত। বোধ হয়, এই রকমের একটা আনন্দ- ধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে, যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কাজকর্ম, সুখ- দুঃখ, উৎসব, আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী, কী বিপুল মানব সংসার।'৩৩

'সন্ধ্যা বেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান করছে, রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যারা চলছে, তাদের ব্যস্তভাব, গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোটাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। ......বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালো-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগম্ভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগলো। আমার শৈশব-সন্ধ্যা কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম।'৩৪

এই উক্তিটি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সময়কার কবিতা ও ছোট গল্পের মূল উপাদান প্রায় অভিন্ন, কেবল মনের গতিক অনুসারে কখনো ছোট গল্প, কখনো কবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

ছিন্নপত্র হইতে পল্লীর দুটি চিত্রখন্ড উদ্ধার করিয়া দিতেছি—এই জাতীয় পল্লীচিত্র তাঁহার ছোট গল্পে অবিরল।

"ছোটখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের ছাতওয়ালা বাজার, বাঁখারির বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশ ঝাড়, আম- কাঁঠাল, খেজুর, শিমুল, কলা, আকন্দ, ভেরেন্ডা, ওল, কচু, লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধ্যার সময়ে সাজাদপুরে এসে পেঁাছেছি।'৩৫

আবার—

'যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গল- গুলো জলে ডুবে পাতা-লতা-গুল্মে

২৯। ২৩ জুন, ১৮৯১, সাজাদপুর, [illegible]।

৩০। ৪ জুলাই ১৮৯১ সাজাদপুর, [illegible]।

৩১। অক্টোবর ১৮৯১ শিলাইদা ছিন্নপত্র।

৩২। ১৬ জুন ১৮৯২, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

৩৩। ২২ জুন ১৮৯২, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

৩৪ জুলাই, ১৮৯৪, ছিন্নপত্র।

৩৫। ৭ জুলাই ১৮৯৩, সাজাদপুর, ছিন্নপত্র।

পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা, পা-শরু, রুগ্ন ছেলে-মেয়েরা যেখানে-সেখানে জলে-কাদায় মাখামাখি, ঝাপাঝাপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপরে একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্য কর্ম করে যায়, তখন সে দৃশ্য কোনমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না, এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়।'৩৬

গল্পগুচ্ছের তলে তলে এইরূপ একটি অশ্রুকরণ অন্তঃসলিলা ধারাও বর্তমান।

এই সব ঝাপসা দেখার মধ্যে হঠাৎ এক-একটি চিত্র স্পষ্টভাবে ভাসিয়া ওঠে—'এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমন অকৃত্রিম! বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ-লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো। আমিই যেন এ-ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ-ভক্তিটি তো সামান্য জিনিস নয়।'৩৭

এই রকম লোকের মুখে কবি যেন পল্লী-সংস্কারকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পান; ইহার সরল ব্যক্তিত্বে সমষ্টির অস্পষ্ট নীহারিকা হঠাৎ নক্ষত্রের ব্যক্তিগত উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়।

ছিন্নপত্র বইখানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার এলবাম, কত রকম ছবি, কত রকম মানুষই না এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। সে সমস্ত উল্লেখ করিতে হইলে সমস্ত বইখানাকে উদ্ধার করিয়া দিতে হয়। সে রকম অসম্ভবে প্রবৃত্ত না হইয়া ছোট গল্প ও কবিতার মূল উপাদানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাদটীকায় তুলিয়া দিতেছি।'৩৮

৪

এতক্ষণ এই ভূখণ্ডের মানবিক সত্যের ও প্রাকৃতিক সত্যের কিছু বিবরণ দিলাম এবং সে বিবরণ যথাসাধ্য কবির ভাষাতেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন এই দুই প্রকার সত্যকে মিলাইয়া লইলে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প রচনার রহস্যের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিব। এই সঙ্গে যদি মনে রাখি যে, স্বল্পায়ত্ত রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং আরও যদি মনে রাখি যে, মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ প্রকাশেই কবির শ্রেষ্ঠ আত্মরতি; সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বা সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশকে তিনি গৌণ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে ছোট গল্প রচনার রহস্য আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কেবল মানবিক সত্যের উপাদানে গল্পগুলি রচিত হইলে ইহাদের স্বাদ সরলতর হইত, হয়তো বা অধিকতর জনপ্রিয়ও হইত। কিন্তু কবি সে সহজ পথ গ্রহণ করেন নাই; মানবিক সত্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সত্যের মিশাল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড়কলমে রচিত—ইহা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কবি নিজেই তাঁহার ছোট গল্প

৩৬। ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, দিঘাপতিয়ার জলপথে ছিন্নপত্র।
৩৭। ১১ মে ১৮৯৩, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।
৩৮। ছিন্নপত্র (১৩৩৫ সালের সংস্করণ)
(ক) পোষ্টমাস্টার পৃঃ ৬৪, ১৫৬, ২৯১
(খ) ছুটি গল্পের উপাদান ৭৯—৮২
(গ) বসুন্ধরা কবিতার ভাবটি ১৬৩ ১৬৪; ১৭০—১৭১,
(ঘ) সোনারতরীর আকাশ, ২১৪—২১৬,
(ঙ) গ্রাম্য সাহিত্য প্রবন্ধ ২৩০—২৩১,
(চ) মেঘ ও রৌদ্র, ২৬২—২৬৫,
(ছ) পদ্মা (চৈতালি) ২০৬, ৩২২—৩২৩।
(জ) নিশীথে গল্পের বর্ণনা, ৩২—৩৪
(ঝ) পণরক্ষা গল্পের বর্ণনা,
(ঞ) অক্ষমা, দরিদ্রা (সোনারতরী) ৫৪—৫৫,
(ট) সঙ্গী (চৈতালি) ৫৯
(ঠ) গানভঙ্গ (কাহিনী) ১৫৮
(ড) ইছামতী (চৈতালি) ২১৭, ৩০
(ঢ) শৈশব সন্ধ্যা (সোনারতরী) ২৬৮—২৬৯
(ণ) অন্তর্যামী (চিত্রা) ৩০২,
(ত) পুটু (চৈতালি) ৩২০,
(থ) কর্ম (চৈতালি) ৩৩৮—৩৩৯
(দ) পূর্ণিমা (চিত্রা)—৩৪৭—৩৪৮
(ধ) মধ্যাহ্ন (চৈতালী) ৭৬—৭৭
(ন) ক্ষুধিত পাষাণের উপাদান ২৯

র এই রহস্যময় কৌশলের বর্ণনা ছেন—আবার তাঁহার কথাতেই শোনা যাক্।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা লিখছি, খুব একটা আষাঢ়ে গোছের। একটু একটু করে লিখছি এবং ার প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক ানি আমার লেখার সঙ্গে মিশে। আমি যে সকল দৃশ্য লোক ও কল্পনা করছি, তারই চারিদিকে রৌদ্র, বৃষ্টি, নদী-স্রোত এবং নদী-র শর বন, এই বর্ষার আকাশ, ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারা। শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের ও সৌকর্যে সজীব করে তুলছে। পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও না। তারা কেবল কাটা শস্যই পায়, শস্যক্ষেত্রের আকাশ, বাতাস, । এবং শ্যামলতা সমস্তই বাদ পড়ে আমার গল্পের সঙ্গে যদি এই ক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত নদীটি এবং নদীর তীরটি এই ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি এমনি ভাবে তুলে দিতে পারতুম, তাহলে তার সত্যটুকু একেবারে সমগ্রভাবে মুহূর্তে বুঝে নিতে পারতো। টা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে, তা-ও পরকে দেবার ক্ষমতা মানুষকে দেননি।"৩৯

ন স্পষ্টভাবে, সুন্দরভাবে স্বয়ং যেখানে স্বীকারোক্তি করিয়াছেন, সমালোচকের আর কি কাজ পারে। কবির কথা আরও টা সে উদ্ধার করিয়া দিতে পারে

..."বাইরের জগতের একটা সজীব ঘরে অবাধে প্রবেশ করে, আলোতে। বাতাসে শব্দে, গন্ধে, সবুজ ল এবং আমার মনের নেশায় কত গল্পের ছাঁচ তৈরি হয়ে বিশেষত এখানকার দুপুর র মধ্যে একটা নিবিড় মোহ ......মনে আছে, ঠিক এই সময়ে বিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট মাস্টার গল্পটা লিখেছিলাম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারি-দিকের আলো, বাতাস ও তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ, তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে।"৪০

এবারে মেঘ ও রৌদ্র নামে, বিখ্যাত গল্পটির সৃষ্টিক্ষণের ইতিহাস শোনা যাক। ইহার অভিজ্ঞতাও পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতার অনুরূপ।

'গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখবো, তারা আমার দিন-রাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সংগী হবে, বর্ষার সময়ে আমার বন্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময়ে পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনা রাজ্যে অবতারণা করা গেছে। সবে মাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল, তাতে করে সম্প্রতি গিরি-বালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল।"৪১

নৈসর্গিক জগতের মতো রবীন্দ্র-নাথের জগৎও পঞ্চভূতের উপাদানে সৃষ্ট। তাহাতে অবশ্যই ক্ষিতি ও অপ্ আছে, আর স্বভাবতঃই সেগুলো বেশি স্পষ্ট, কিন্তু তেজ, মরুৎ ও ব্যোমও বর্তমান। সেগুলো তেমনভাবে চোখে পড়িতে চায় না, কিন্তু তাহাদের বাদ দিয়া বিচারে বসিলে বিচার অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

৩০শে আষাঢ়, ১৮৯৩ সালে সাজাদপুর হইতে লিখিত একখানি চিঠিতে কবি নিজের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কবিতা রচনাতেই তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান, কিন্তু ছোট গল্পও মন্দ লিখিতে পারেন না, আবার কতক ভাবকে ডায়ারি আকারেই লিখিতে ইচ্ছা যায়। সেই সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্রকলার প্রতিও একটা গোপন অনুরাগ তিনি পোষণ করেন। মোট কথা, 'মিউজদের' মধ্যে কোনটিকেই তিনি হাতছাড়া করিতে রাজি নহেন।

তাঁহার কবিতা ও ছোট গল্পের মধ্যে যে ভেদ তিনি করিয়াছেন, সে ভেদ বস্তুত আছে কিনা সন্দেহ, অন্তত যে পর্বের কথা বলিতেছি, সে পর্বে না থাকিবার মতোই। ছোট গল্পগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে নামিলে দেখিতে পাইব যে, একই বস্তু বা ভাব কখনো গল্পাকারে, কখনো কাব্যাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, আবার কখনো বা কতকটা কবিতায়, কতকটা গল্পে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার এই পর্বের অধিকাংশ কবিতা ও গল্প পরস্পরের পরিপূরক, এখানেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য। সেটুকু বুঝিবার জন্য তাঁহার গল্প রচনার কৌশল বোঝা দরকার—সেইজন্যই কিছু বিস্তারিতভাবেই তাহার আলোচনা করা গেল। এবারে ছোট গল্প-গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় নামা যাইতে পারে। (ক্রমশ)

। ২৮ জুন ১৮৯৫, সাজাদপুর,

৪০। ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪, সাজাদপুর ছিন্নপত্র।

৪১। ২৭ জুন ১৮৯৪, শিলাইদা, ছিন্নপত্র।

মোমের পুতুল

সন্তোষকুমার ঘোষ
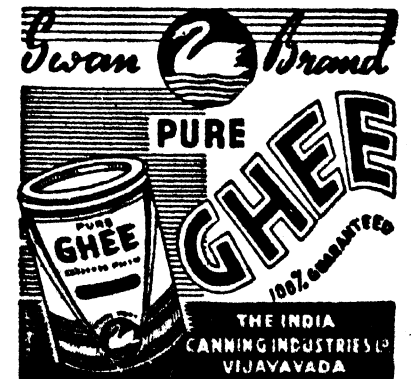
(২১)

'আমি বাঁচতে চাই না।' চিঠি লেখা শেষ ক'রে অতসী থামে হেড্-মিস্ট্রেসের নাম লিখল। অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'আমি বাঁচতে চাই না।'

সামনে শাদা দেয়াল, কোনদিন সেখানে বুঝি একটি ক্যালেণ্ডার ছিল, এখন নেই। হয়ত বছর ফুরিয়েছে, হয়ত না-ফুরোতেই পাতাগুলো ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ে গেছে। এখনও তার চিহ্ন আছে পুরনো একটা পেরেকে; ছোট্ট, কালো একটি কলঙ্কবিন্দু। অতসীর চোখ সেখানে। কিম্বা তার পাশে আরেকটি রক্তাভ আঙুলের ছাপে, যেখানে সে নিজেই কবে যেন একটা ছারপোকা টিপে মেরেছিল।

অতসীর চোখ সেখানে, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে, মনও সেখানে। কিন্তু সেখানে না, হয়ত কোথাও না। অতসী তার না-কিনারা ভাবনা আর লোনা কান্না নিয়ে বুঝি নিজের মধ্যেই ডুবে গেছে। চোখ দু'টি খোলা কিন্তু দৃষ্টিহীন।

খাম থেকে চিঠিটা খুলে অতসী আরেকবার পড়ল। ঠিক আছে। এই চিঠি হেড্-মিস্ট্রেসের হাতে পৌঁছে দিলেই জীবনের আরও একটি অধ্যায়ের ইতি হবে। লেডী সমাদ্দার স্কুলের টীচার নয়, আদিত্য মজুমদারের প্রচারিকাও না,—এর পর শুধু অতসী।

শুধু অতসী? কে সে। দেয়ালে দৃষ্টি রেখে অতসী নিজেকে, কিম্বা দেয়ালের কালো ওই লোহার ফোঁটাটাকে, প্রশ্ন করল। যে শুধুই অতসী ছিল তার মুখখানা আজকের স্কুল টীচার কিছুতে মনে করতে পারছে না। আলোড়িত জলের তলার প্রতিচ্ছবির মত সে কেবলি ভেঙে ভেঙে যায়, ছড়িয়ে পড়ে, সম্পূর্ণ, স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয় না।

অথচ এই দেহেই সে বাস করে গেছে। সে আগে ছিল, অতসী এসেছে পরে। খুঁজে খুঁজে, খুঁটে খুঁটে দেখছে পুরনো ভাড়াটের কোন চিহ্ন যদি প'ড়ে থাকে কোথাও; যদি সামান্য একটু স্মারক থেকে সেই নিরুদ্দিষ্ট মেয়েটির স্বরূপ চেনা যায়।

এই শরীরটারই চোখের জানালা দিয়ে সেই অনভিজ্ঞ কুমারী নির্নিমেষ বিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকত; ক্ষণে ক্ষণে আকাশ রঙ বদলে নতুন হয়, সোনালি ওড়না ফেলে বিকেল-রঙের শাড়ি পরে, দেখতে ভাল লাগত। কান পেতে শুনত রাস্তার প্রতিটি পায়ের ধ্বনি। একজনের চোখে চোখ রাখতে সুখে-পুলকে বুক কেঁপে উঠত। ভাবত স্বপ্ন, সাধ, সুখ আর প্রীতির কয়েকগাছি রঙীন সুতোয় জীবনটাকে এক গুচ্ছ ফুলের মত বেঁধে নেবে।

দেহকে সে ভেবেছিল দেবায়তন, মনকে স্মিত স্নিগ্ধ ঘৃতদীপ।

সেই কিশোরী কবে যে এই বাসা ছেড়ে নিরুদ্দেশ হ'ল, কেউ লক্ষ্য করেনি। নূতন যে ভাড়াটে এল, তার স্বপ্ন নেই, মোহ নেই, বিস্ময় নেই। লাবণ্য ঝরে গেছে, নিষ্পত্র শীতার্ত সত্তা নিজের চারপাশে পুরু একটা আবরণ রচনা করেছে। সতর্ক, সাবধানী, সন্দিগ্ধ। অনেক ঠেকেছে সে, অনেক ঠকেছে। এই দেহ কবে দেবায়তনের মত শুচি ছিল মনেও নেই। মনপ্রদীপের সলতে পুড়ে পুড়ে কালি হ'ল। শুধু তিক্ততা, শুধু গ্লানি, তবু অতসী মরতে চায়নি, পোড়া সলতেয় নতুন করে শিখা জ্বালাতে গেছে।

সেই শিখাটুকুও আদিত্য এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়েছেন। লুব্ধ শকুনির ডানা দিয়ে অতসীর সব কামনা-বাসনা আবৃত ক'রে রেখেছেন। এই অন্ধকারে অতসীর এতটুকু বাঁচবার সাধ নেই।

কাল আদিত্য চ'লে যাবার পর অতসী অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। আহারে রুচি নেই, আলোটা নিবিয়ে দিল, শুয়ে পড়ল বিছানায়।

বিছানা তো নয় ভাবনার ভেলা, ভেসে ভেসে অতসী কতদূর গেল হিসাব নেই। বিনিদ্র, স্থির চোখের পাতা দুটি জ্বলতে শুরু করেছে, কপালের কাছে অবাধ্য একটা শিরার টিপ্ টিপ্। তিনি তখনি সব ভাবনা একটা সংকল্পের আবর্তে প'ড়ে বার বার ঘুরপাক খেতে থাকল। ঠিক হয়েছে। এই ছোট সুখ সামান্য শখের নুড়ি কুড়োন আর না, পায়ে পায়ে স্বার্থের কাঁটা ফোটে, চারধারে চক্রান্তের রুদ্ধশ্বাস দেয়াল। এর বাইরে যেতে চায় অতসী, আদিত্যের শকুনি-ডানার আওতা ছাড়িয়ে রৌদ্রস্পর্শ পেতে চায়।

সে রৌদ্র যদি মৃত্যু হয়, তবুও। মৃত্যুও মুক্তি।

সকালে উঠেই আজ তাই অতসী চিঠি লিখতে বসেছে। সংক্ষিপ্ত কয়েকটা

থায় হেড্‌মিস্ট্রেসকে জানিয়েছে, আসছে স থেকে কাজে যাবার ইচ্ছে তার নেই।
সুধা একটু দূর থেকে দেখছিল তমাসিকে। কাল সারারাত উস্‌খুস্ রছে, আজ সকাল থেকেই কেমন যেন য়ে গেছে ফুলমাসি। মুখ ধোয়নি, ড়-কাপড়টা পর্যন্ত ছাড়েনি। ভেঙে-য় খোঁপা থেকে রুক্ষ রুক্ষ চুল উড়ছে, তমাসির ভ্রূক্ষেপ নেই, চিঠি লিখছে।
দিদিমা পাশে এসে দাঁড়ালেন।
'কী করছিস্।'
'চিঠি লিখছি।'
ঝুঁকে পড়ে দিদিমা চিঠিটা একবার লেন, কিছু বুঝলেন না।—'কাজে ব না?'
'ইস্কুলের তো ঢের দেরি।'
'ইস্কুলের কথা বলিনি।'
'ও, ইলেক্‌শনের।' অতসী মুখ ল মার দিকে চাইল।—'ইলেক্‌শনের জ আর করব না ঠিক করেছি।'
ইলেক্‌শনের কাজ করবি না! দিদিমা ক হয়ে চেঁচিয়ে উঠতেও ভুলে লেন। সুধাও দুরু-দুরু বুকে পেক্ষা করতে লাগল।
অতসী শুকনো গলায় বলল, 'তুমি ভাবছ জানি, মা। ভাবছ তোমার আর জন্মে তীর্থ দেখা হ'ল না। কী বে বল। প্রার্থনা করি, আসছে জন্মে ন কাউকে পেটে ধ'র যে, তোমাকে র্থদর্শন করাতে পারে।'
কঠিন আঘাতেও দিদিমার ধৈর্যচ্যুতি ল না। বললেন, 'তীর্থের কথা বছি না। ইলেক্‌শনের কাজ ছাড়লে কুলের চাকরিই কী থাকবে তোর।'
নিশ্চিন্ত গলায় অতসী বলল, কবে না। সেইজন্যে নিজে থেকেই ড়ছি।'
'নিজে থেকেই ছাড়ছিস' দিদিমা র নিজেকে ধ'রে রাখতে পারলেন না, র স্বরে ব'লে উঠলেন, 'হতভাগি, তুই ব কী। বুড়ি মা-র কথা না হয় ই ভাবলি, তুই নিজে কী করে বাঁচবি বে দেখেছিস্?'
'আমি বাঁচতে চাই না।' শান্ত, স্থির ঠ অতসী, একটু আগে দেয়ালকে বলেছিল, মাকেও তাই বলল। মন্ত্রের মত করে উচ্চারণ করল, 'আমি বাঁচতে চাই না।'

চিঠিটা হাতে নিয়েই সীতাদি খামটা ছিঁড়েছিলেন, পড়তে শুরু ক'রেই যেন হোঁচট্ খেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত হল, খাপ খুলে চশমাটা এঁটে নিলেন। তবু চিঠিটার দুর্বোধ্যতা গেল না। পড়তে পড়তে সীতাদির মুখে ছোট্ট একটু হাঁ দেখা দিল, বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে কিন্তু বাঁধান কয়েকটি দাঁত। শেষ লাইনে পেঁ'ছে সীতাদি দু' দু'বার নামটা পড়লেন, ব্যাঙ্কের কেরাণী যেমন ক'রে চেকের সই মেলায়, তেমনি ক'রে মেলালেন। তারপর চিঠিটা ভাঁজ ক'রে অতসীর দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছ?'
প্রশ্নের উত্তর চিঠিতেই আছে, অতসী চুপ ক'রে রইল।
সীতাদি ধীরে ধীরে বললেন, 'ভুল করছ, খুব ভুল করছ, অতসী। কোন কারণ নেই—'
'আছে।'
সীতাদি বললেন, 'কিন্তু কারণ তো তুমি দেখাওনি।'
অস্থির গলায় অতসী বলল, 'চিঠিতে কারণ দেখান যায় না, সীতাদি, সব কথা খুলে লেখা যায় না। আপনি দয়া করুন, চিঠিটা গ্রহণ করে আমাকে রেহাই দিন।'
'অন্য কোথাও কাজ ঠিক করেছ?
'না।'
'আশ্বাস পেয়েছ?'
অতসী আবার বলল, 'না।'
ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ। সীতাদি অস্ফুট গলায় প্রায় স্বগতোক্তি করলেন।
বয়স ষাটের কাছে, সীতাদিকে তার চেয়েও প্রাচীন দেখায়। হ্রস্বদৃষ্টি, গম্ভীর সর্বদাই চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। এই স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর ভার পেয়েছেন, সে আজ বছর কুড়ি হ'য়ে গেল, এর মধ্যে সীতাদি যদি কোনদিন হেসে থাকেন তো নিজের ঘরে, আয়নার সমুখে, দরজায় খিল তুলে। প্রকাশ্যে কখনও না। মাইনে বাড়লে না, স্কুলের কোন ছাত্রী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালেও না। দৃঢ়, অনড় গম্ভীর, এই মানুষটির সান্নিধ্যে রাশভারি ইন্‌স্পেকট্রেসরাও কেমন অসাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, জুনিয়র টীচারেরা তটস্থ থাকে।
'আমি এবারে যাই, সীতাদি।'
সীতাদি ক্ষণেক অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকবেন, বললেন 'যাও।' তারপর নতমুখ অপসৃয়মান অতসীর দিকে চেয়ে কী মনে পড়ল, ডাকলেন, 'শোন।'
অতসী ফিরে এল।

'আজকের সব ক'টা ক্লাশ নিয়েছ?' জিজ্ঞাসা ক'রেই বুঝি মনে পড়ল, অতসী পদত্যাগ করেছে, চিঠিটা এখনও ও'র হাতে। একটি অসুখী, রুক্লান্ত মেয়েকে দেখতে পেলেন। করুণা হ'ল। সীতাদি চিরকুমারী, সন্তানস্নেহ তাঁর কাছে ছবিতে-দেখা বইয়ে-পড়া দেশের মত, অস্পষ্ট একটা ধারণা মাত্র, তবু অননু-ভূতপূর্ব মমতা বোধ করলেন।

বললেন, 'ব'স। তোমাকে কয়েকটা কথা বলি।'

অতসী অনুদ্ধত কিন্তু স্থির স্বরে বলল, 'আপনি কী বলবেন জানি, সীতাদি। আমার মাও আমাকে ওই কথা বলেছিলেন। কী খেয়ে বাঁচব, এই তো। কিন্তু সীতাদি, আমি বাঁচতে যে চাই না।'

আস্তে আস্তে ওর পিঠে একটি হাত রেখে সীতাদি বললেন, 'চাও। বাঁচার সাধ আর মৃত্যুর সাধ দুই-ই মনের মধ্যে থাকে অতসী। প্রথমটা স্থূল, উচ্চারিত, ওপরে থাকে; দ্বিতীয়টা গোপনে, নীচে। কিন্তু ক্ষুধা, তৃষ্ণা জৈব নানা আকাঙ্ক্ষার মত মৃত্যুকামনাও সত্য, সেও মাঝে মাঝে মাথা তোলে। তাই ব'লে বেঁচে থাকার বাসনা সংগে সংগে লোপ পায় না। নইলে—নইলে' হঠাৎ কেমন থতমত খেলেন সীতাদি, কথার সুতো যেন ছিঁড়ে গেল—'নইলে আমি বেঁচে আছি কেন। এতখানি বয়স পেরিয়ে এলুম, মাথার চুলে কবে পাক ধরেছে। একটু ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গলায় মাফলার জড়িয়ে রাখি, পান ছেঁচে ছেঁচে খাই। সামান্য একটু ঝোল-ভাত, তাও আজকাল সয় না। তবু তো আমি, আমিও মরতে চাইনে অতসী। বলতে পার, আমি বেঁচে আছি কোন্ লোভে?'

'আপনি এই মেয়েদের ভালবাসেন।'

একটু চুপ ক'রে থেকে সীতাদি বললেন, 'হয়ত বাসি। আজ বাসি। এ-ভালবাসা কিন্তু একদিনে আসেনি অতসী, ধীরে ধীরে অর্জন করেছি। কৃপণের একটি একটি ক'রে টাকা জমানর মত এদের জন্যে মনে ফোঁটা ফোঁটা স্নেহ জমেছে। নইলে আমিও একদিন সংসার খুঁজেছিলাম; যে-হাত বেত ধরেছে সে-হাত দোলনা ঠেলতে চেয়েছিল। যাক্, সে আরেক গল্প। যেদিন টের পেলাম আমি ঠকেছি, সেদিন আমিও মরতে চেয়েছিলাম। মরিনি তো। তার বদলে নিলুম এই চাকরি। কী-যে ঘৃণা ছিল তখন, তোমাকে বোঝাতে পারব না। যখনই ভাবতুম সারা জীবন এই শুকনো মাস্টারি ক'রে কাটবে, গায়ে কাঁটা দিত। নিজের জ্বালা মেটাতে এই মেয়েদের মারতুম। বুকফাটা চীৎকার করত এরা, পায়ের উপর আছড়ে পড়ত, তবু ছাড়িনি। এখন বুঝি, ওদের মারিনি, মেরেছি আমি নিজেকেই।' বলতে বলতে সীতাদির চোখ জলে ভরে গেল, সামলে নিয়ে বললেন, 'আস্তে আস্তে জ্বালা আপনি জুড়োল, মনের ভিতরের অশান্ত খুকিটা যেন ঘুমিয়ে পড়ল। দেখলুম, সুখ শুধু একজনের কাছে নিজেকে উজোড় করে দেওয়াতে নয়, সকলের জন্যে কিছু-কিছু রাখাতেও। শান্তির পাখিটিকে খুশি হ'লে আকাশে উড়িয়ে দেওয়া যায়, আবার মনের মধ্যে ছোট্ট কৌটোয় বন্দী করেও রাখা চলে।' চিঠিটা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'এ-চিঠি আজ পেশ করব না। তুমি এখন উত্তেজিত। ভেবে-চিন্তে আমাকে তিন দিন বাদে জবাব দিও।'

সবে মাত্র গেট পর্যন্ত এগিয়েছিল, তখনও কম্পাউণ্ডের বাইরে পা দেয় নি, মায়া পিছন থেকে অতসীকে ধরে ফেলল। আঁচলে টান দিয়ে বলল, 'এই পোড়ামুখি, কোথায় পালাচ্ছিস?'

মায়া ইংরিজীর টীচার, বয়সে অতসীর কিছু বড়।

আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে অতসী বলল, 'পালাব কেন।'

'তবে যে একা-একা চলে এলি, কাউকে না বলে?'

অতসী বলল, 'এমনি। শরীরটা ভাল নেই, তাই।'

'মনটাও নেই, না?' মায়া চোখ টিপে বলল। যৌবনের বেলা গড়িয়ে বিকেল চলছে মায়ার, দেহের গঠন একটু থল-থলে, কিন্তু মুখখানার বয়স বাড়েনি, এখনও কচি, ঢলঢলে।—'আমি সব জানি। চল, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

চায়ে অতসীর আসক্তি ছিল না, কিন্তু মায়ার হাত থেকে সহজে রেহাই নেই; সুতরাং নিস্পৃহ কণ্ঠে বলতে হল 'চল।'

চায়ের দোকানে ঢুকল দুজনে, পর্দা-টানা আলাদা খুপরি বেছে নিল। সামান্য কিছু খাবারের ফরমাস করে মায়া তার চেয়ারটা টেবিলের যতটা সম্ভব কাছে টেনে, ঝুঁকে পড়ে অতসীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'য শুনেছি, সব সত্যি?'

'কী শুনেছিস।'

'এই,—এই তুই নাকি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছিস।'

'ধরে নে, দিয়েছি—'

মুচকি হেসে অন্তরংগ গলায় মায় বলল, 'ব্যাপারটা কী বল দেখি। বিয়ে করছিস?'

অতসী বলল, 'দূর!'

মায়া এটাকে স্বীকৃতি বলেই ধরে নিল। গরম চায়ে ফুঁ দেবার মত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।—'হিংসে হয় তোদের দেখলে।'

'হিংসে কেন।'

'এই তো দিব্যি ম্যাপ-আঁকান, অংক বোঝানর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলি আমাদের আর মুক্তি নেই—হাড়মাস এ সমাদ্দার ইস্কুলেই কালি করে চিতে উঠতে হবে।'

মায়ার ব্লাউজের-হাতা-ফাঁসান বাহু দিকে স্মিত চোখে চেয়ে অতসী বলল 'এই বা মন্দ আছিস কী—বেশ তে ফুলছিস।'

মায়া কপট রাগে বলল, 'তুই তে বলিবই। নিজে পালাচ্ছিস কিনা।'

হেড মিস্ট্রেসের ওখানে ভারি আব হাওয়াটা যেন অতসীর বুকে চেপে ছিল। এতক্ষণে, রেস্তোরাঁর এই নিরাল কোণে সহজ, চপল একটু ইয়ার্কি দিতে পেরে বেঁচেই গেল।

মায়া বলল, 'হেড মিস্ট্রেস কী বলল রে। মিশন-টিশন, বড়ো বড়ো কথ শুনিয়ে দেয়নি?'

অতসী বলল, 'দিয়েছে।'

মায়া হিতৈষীর গলায় বলল, 'ওসব য় কানও দিসনি। ওই পেত্নী নিজে মত বর জোটাতে পারেনি, তাই সব লকেই লেজ-কাটা হয়ে থাকতে ।'

অতসী নিরীহ গলায় বলল, 'বিয়ে লেই লেজ গজায় বুঝি।'

মায়া কুপিত হয়ে বলল, 'জানি না। র তো একবার হয়েছিল, লেজ কেটে দের দলে ভর্তি হয়েছিলি। আবার কে পড়তে চাইছিস। তোমার মহিমা বোঝা ভার।'

আলোচনার লঘু চাপল্য নিমেষে ট গেল, অন্ধকার নেমে এল অতসীর ধ। মায়া গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে ন, 'তা আদিত্য মজুমদারের মত ছিস? সে ইলেকশন শেষ না ই তোকে যে বড় ছেড়ে দিলে?'

কঠিন কণ্ঠে অতসী বলে উঠল, মানে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে চায়ের দোকানের টি ছেলে পেয়ালা সরাতে না এলে নের মধ্যে কী ঘটত বলা যায় না। সী চট করে নিজেকে সামলে নিল,— থেকে খুচরো কয়েক আনা টেবিলে ল উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—'চলি।'

সঙ্গে সঙ্গে মায়া ওর দু'হাত চেপে।—'মাপ কর, ভাই। হঠাৎ মুখ কে বলে ফেলেছি।'

আশেপাশের লোক ইতিমধ্যে চাইতে করেছিল, হাত ছাড়াতে গেলে মেচি আরও বাড়বে। অতসীকে ত্যা বসে পড়তে হল।

মায়া একটু পরেই শুরু করল, ক জোটালি বল। পয়সা আছে? র দেখতে?'

গম্ভীর গলায় অতসী বলল, 'মায়া, কথা বলো।'

অন্তরঙ্গ তুই'য়ের ঠান্ডা তুমি-তে ন্তর লক্ষ্য করে মায়া বলল, 'তুই ও রাগ করে বসে আছিস। বলেছি কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে ছে।'

অতসী গম্ভীর হয়ে বলল, 'মনে ষ রাখতে দোষ নেই, মুখ থেকে কালেই ত্রুটি, তোমাদের এই মোক

ভদ্রতায় আমি বিশ্বাস করি না মায়া।'

মায়া ধরা-ধরা গলায় বলল, 'কিছু মনে ক'র না, ভাই। ইস্কুলে তোমার কথা বলাবলি হচ্ছিল, চলে যাচ্ছ শুনে মনটা কেমন করে উঠল, ভাবলুম আসল কথাটা জেনে আসিগে যাই। যাচ্ছ ভাল, প্রার্থনা করি, আর কখনও ফিরে আসতে না হয়।'

'ফিরে আসতে হবে কেন।'

অভিজ্ঞ কণ্ঠে মায়া বলল, 'আমাদের সীমাকে মনে নেই। বিয়ে করল কলেজের এক ছোকরাকে, এক সংগে পড়ত, সেই থেকে ভাব। চাকরি ছেড়ে দিলে বিয়ের এক মাস আগে। বিয়ের পর বড় মুখ করে এক মাথা ঘোমটা আর চওড়া সিঁথের সিঁদুর দেখিয়ে গেল। ছ' মাস বাদেই আবার এসেছিল এখানেই। সীতাদি বললেন চাকরিটা আবার পাওয়া যায় কি না খোঁজ নিতে এসেছিল। ওর স্বামী লড়াইয়ের কী অফিসে কাজ করত, সেই অফিসশুদ্ধ উঠে যাচ্ছে। সীমার পেটে তখন একটা বাচ্চা,—ওর অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখ তো।'

'পেয়েছিল চাকরি?'

'এখানে পায়নি, অন্য কোথায় পেয়েছিল শুনেছি। অনেক হাঁটাহাঁটির পর। সেখানে আবার মেটার্নিটি লীভ নেই, এক মাস যেতে না যেতেই কাজে যোগ দিতে হয়েছিল, নইলে বিনে মাইনেয় উপোস দেবে কে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল সীমার—সেদিন দেখা হয়েছিল। চেনা যায় না, শরীরের এমন হাল হয়েছে।'

'আর ওর স্বামী?'

'বাড়িতে বাচ্চা রাখছে, বাজার করছে, বৌকে সন্দেহ করছে,—মাঝে মাঝে দু'জনের কথাবার্তা বন্ধ, বেশির ভাগ সময়েই ঝগড়া।'

আরো এক কাপ করে চা ফরমাস করে মায়া বলল, 'আমাদের রেখার কেস, অবিশ্যি আলাদা। সেও বিয়ে করেছিল, জানই তো, মোটামুটি ভাল অবস্থা দেখেই। গহনা পেল বাক্স ভর্তি, আলমারি বোঝাই শাড়ি। কাজ কর্ম নেই,—শুধু পায়ের ওপর পা রেখে হুকুম। আমরা প্রথম যেদিন দেখতে গেলুম, রেখার মুখ হাসিতে থৈ-থৈ, সারাক্ষণ ধরে ওর শ্বশুরবাড়ির গল্পই শুনতে হল। ......সেই রেখাও বছর না পুরতে চাকরির খোঁজে এসেছিল।'

অতসীকে 'কেন' জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দিতে মায়া এখানে একটু থামল। কিন্তু শ্রোত্রী প্রশ্নহীন নির্বিকার মুখে চেয়ে আছে, মায়া একটু হতাশই হল। নিজে থেকেই ফের শুরু করল, 'ভাবছ, স্বামী ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল? তা নয়। দুশ্চরিত্র ছিল? তাও না। রেখা আমাকে বলেছে সাতটা বাজতে না বাজতেই ওর স্বামী রোজ বাসায় ফিরেছে। ক্লাব, হোটেল, রেস, কোন কিছুর দোষ ছিল না।' বলবার ভংগী অকস্মাৎ রহস্যগাঢ় করে মায়া বলল, 'ওর স্বামী ওকে বাক্সে পুরে রাখতে চেয়েছিল।'

'বাক্সে!'

'বাক্স বৈকি। একলা কোথাও যাবার স্বাধীনতা নেই, স্বামী কি শ্বাশুড়ি যেদিন দয়া করে কোথাও নিয়ে যাবেন সেদিন রেখা বেরুতে পেত। দু'দিনে হাঁপিয়ে উঠল, এতদিন স্বাধীন-ভাবে রোজগার করেছে, কারও তোয়াক্কা রাখেনি। এই শিকলের ভার রেখা সইতে পারবে কেন। একদিন চুপে চুপে দুপুরে পালিয়ে এসেছিল। চাকরি চায়। চাকরি মানেই মুক্তি; চলাফেরার স্বাধীনতা, নিজের উপার্জন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সব কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল রেখা। বলেছিল —"সপ্তাহে একটা সিনেমা, মাসে একটা শাড়ি, ছ' মাসে নতুন গহনা আর বছরে একটি ছেলে, এর বাইরেও মেয়েদের যে কিছু চাইবার থাকতে পারে, সেটা ওরা, পুরুষেরা বোঝে না কেন। বলতে পারিস মায়া কেন ওরা আমাদের গন্ধভরা রুমালের মত শুধু বুক পকেটে পুরে রাখতে চায়। মাঝে মাঝে খুশিমত নাকের কাছে ধরবে, মেয়েমানুষ কি শুধু এই।"

নিজের টীকা যোগ করে মায়া অতসীকে বলল, 'আসলে কী জান, চাকরিটাও একটা নেশার মত। ওর স্বাদ যে মেয়ে পেয়েছে তার দৃষ্টি-ভংগীই গেছে বদলে; ঘর আর হেঁসেলে তার মন বসে না।'

'চাকরিতেই কি শান্তি আছে।' অতসী মৃদুকণ্ঠে বললে।

মায়া স্বীকার করল।—'নেই, কিন্তু মদ খাওয়াতেও তো নেই। তবু পুরুষেরা নেশা করে। না করে পারে না। আমাদেরও সেই দশা। ছেলের কাঁথা বদলান আর হাতা-বেড়ি ঠেলার মন খুইয়েছি, আবার বাইরে বেরিয়েও টিঁকতে পারিনে স্বস্তি পাইনে; ঘর গেছে, পথ জোটেনি, আমাদের, এ-কালের মেয়েদের, ট্র্যাজেডি কেউ বোঝে না ভাই।'

আড়াল থেকে কে সুইচ টিপে দিলে. ছোট খুপরিটা হঠাৎ ভরে গেল আলোয়। মায়া চমকে উঠে দাঁড়াল, ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'ইস, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চল, যাই।'

'চল।' অতসীও উঠে দাঁড়াল। অবশ পায়ে যন্ত্রচালিতের মত অনুসরণ করল মায়াকে।

(ক্রমশঃ)

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহনের স্থান

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারত সরকারের চেষ্টায় ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের একটি াঙ্গ ইতিহাস রচনা করিবার উদ্যোগ-য়াজন চলিতেছে এবং এই আন্দোলনে লার দান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও কলন করিয়া ইতিহাসের কাঠামো া ও সম্পাদনা-কার্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান ক্ত হইয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ার রমেশচন্দ্র মজুমদার। এই নিয়োগে আশা জাগিয়াছিল, নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের জয়পুর ধবেশনের ইতিহাস শাখার সভাপতি-প ডাক্তার মজুমদার যে ভাষণ াছেন, তাহাতে অনেক তথ্য সম্পর্কে নি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক যে সমস্ত ভমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভারত কারের তত্ত্বাবধানে যে ইতিহাস প্রণীত বে, তাহাতে বাঙলা সম্পর্কে যে বরণ থাকিবে, তাহার সম্পর্কে হতাশ য়া পড়িতে হইতেছে—বিশেষত রাম-হনের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে। হিন্দু-মুসলমানের অতীত সম্পর্ক বন্ধে এই হতাশা বেশি করিয়া দেখা য়াছে। রামমোহনের মৃত্যুর শতবার্ষিকী রক পালনের সময় এদেশের কয়েক-ন অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি রামমোহনকে দেশের জনসাধারণ যে সকল বিষয়ে থিকৃৎ হিসাবে স্বীকার করিয়া আসিতে-লেন, সেই সকল বিষয়েই অন্য এক-কজন ব্যক্তিকে উঁহার প্রকৃত দাবীদাররূপে প্রচার করিয়া রামমোহনের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই হইয়া তাহার কোনটিই টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতদিন পরে মজুমদার মহাশয় সেই সমস্ত দাবী কোনও প্রমাণ দাখিল করিয়া পুনরুত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, রাম-মোহনের মহিমা অযথা বড় করিতে গিয়া আমারা বাঙালী জাতিকে খাটো করিয়াছি।

রামামোহনের প্রতি আরোপিত সকল বিষয়েই যদি তিনি পথিকৃৎ না-ও হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত ব্যাপারে প্রথম দিকের যে তিনি একজন দিকপাল, সে বিষয়ে কেহই সন্দেহ প্রকাশ পর্যন্ত করিতে পারিবে না—ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। কাজে কাজেই এক-একটি বিষয়ে অন্য ব্যক্তি যদি প্রকৃত পথিকৃৎ বলিয়াও প্রমাণিত হইতেন, তাহা হইলেও রাম-মোহনের মত একজন দিকপালকে যাঁহার তুল্য সেকালে কেন একালেও কেহ জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, আমরা যদি উচ্চতর স্থান দিই, তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে খাটো করা হয় কিরূপে?

'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসুবিনয় রায়-চৌধুরী ডাক্তার মজুমদারের মাত্র তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত প্রামাণ্যরূপে কথিত ভারতের ইতিহাসে বর্তমান ভাষণের ঠিক বিপরীত মত যে ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। নিজ মত পরিবর্তনের অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সঙ্গত হেতু প্রদর্শন না করিয়া কেবল কতকগুলি উক্তি যে যুক্তি নহে, সেজন্য সুবিনয়বাবুর প্রতিবাদের মূল্য আছে। কিন্তু রমেশবাবুর পূর্বের নিজ উক্তি ভিন্নও যে রমেশবাবুর বর্তমান উক্তিগুলি যে ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচারসহ নহে, তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে যে অকাট্য প্রমাণসম্বলিত তথ্য আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন; কেননা, ডাক্তার মজুমদারের মত একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ঐতিহাসিকের উক্তি সাধারণ পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জাগাইতে পারে। কাজে কাজেই ডাক্তার মজুমদার মহাশয় রামমোহন সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি করিয়াছেন, একে একে সেগুলিকে যাচাই করিয়া দেখা যাউক।

মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন "সাধারণের ধারণা এই যে, তিনিই বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের জনক, প্রথম বাঙলা সংবাদপত্রের প্রচারক এবং প্রথম ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক। কিন্তু ইহার কোনওটিই সত্য নহে।" আমরা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিব যে, জনসাধারণের এই সকল ধারণা মিথ্যা তো নহেই, প্রত্যেকটি যে সকল সত্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সম্যক জ্ঞান সাধারণের নাই, এমনকি, এদেশের ঐতিহাসিক-গণেরও সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নাই।

প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনা সম্পর্কেই আলোচনা করা যাউক। রমেশবাবু বলিয়াছেন, "রামমোহনের কলিকাতা আসিবার পূর্বেই এখানে অন্যান্য বাঙালীরা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন ও তাহার ব্যবস্থা করেন।" সত্য বটে রামমোহন কলিকাতায় আসিবার পূর্বে কলিকাতায় রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণরাম বসু, আনন্দী-রামদাস ও শারবোর্ন সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন এদেশীয়দের ইংরেজি পড়াইতেন, কিন্তু সে পঠন-পাঠন কি শিক্ষা পদবাচ্য? এগুলিতে ইংরেজি প্রতিশব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ 'ঘোষাইয়া' কোনও রকমে কতকগুলি ইংরেজি শব্দ শিখাইয়া দেওয়া হইত, যাহার সাহায্যে

পঠন সমাপ্তে এই সকল ছাত্র কোনও রকমে আপনার মনোভাব সাহেব লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন মাত্র। ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে ঘোষাইবার ব্যবস্থা ছিল, তাহা এইরূপ, 'পামকিন লাউ-কুমড়া, কিউকুম্বার-শসা প্লাউম্যান চাষা', এই ভাবে পাঠ গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতেন অথবা পাদ্রীদের চাকুরিতে বহাল হইতেন অথবা ইউরোপীয় কারবারিদের দালাল হইতেন। চাকুরি করার উদ্দেশ্যেই লোকে এই সব পাঠশালায় পড়িত। এরূপ ইংরেজি-জানা লোক রামরাম বসু পাদ্রি টমাস ও পরে উইলিয়াম কেরীর বাঙলা ভাষার শিক্ষক হইয়াছিলেন এবং রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরিতে বহাল হইয়াছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এইরূপে বিদ্যার বলেই প্রথমে কাস্টম হাউসে ও পরে কলিকাতার বিশপ হিবারের নিকট কর্মপ্রাপ্ত হন। তাঁহাদের কাহারও সেই প্রথম চাকুরি গ্রহণকালে ইংরেজি ভাষায় ভাল দখল ছিল না, বরং অত্যন্ত কাঁচা ছিল। রামমোহনের সুহৃদ উইলিয়াম ডিগ্‌বী রামমোহনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচিত হন, সেই সময়ে রামমোহনের ইংরেজি জ্ঞান সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে,—

"could merely speak it well enough to be understood upon most common topics of discourse but could not write with any degree of correctness."

ডিগ্‌বীর অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিবার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য রামমোহনের ছিল ইংরেজি ভাষা ভাল করিয়া অধিগত করা। তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী রামমোহন অতি অল্প দিনেই তাহা ভালভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ডিগ্‌বী সে সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে,—

"acquired a correct knowledge of the language as to be enabled to write and speak with considerable degree of accuracy."

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক বাকিংহাম বলিয়াছেন যে,—

"I was delighted and surprised at his perfection of this tongue. In English, he is competent to converse freely on the most abstruse subjects and argue more closely and coherently than most men I know."

পাদ্রি ডাফ সাহেব তাঁহার "India and Indian Mission" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,—

"Except the Rajha himself, not one of his party could be said to have acquired a thorough English education."

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে সময়ে রামমোহনের শিষ্যদিগের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, হরিহর দত্ত ও নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি ছিলেন। রামমোহন নিজ অধ্যবসায়ের ফলে যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শন, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানে পারদর্শী হন। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য উচ্চশিক্ষার আস্বাদ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে লাভ করিয়া রামমোহনের প্রত্যয় জন্মে যে, উচ্চতর শিক্ষা—বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন ভারতের কল্যাণ নাই। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের সহিত জীবন-যুদ্ধে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে এই সকল বিদ্যায় ভারতবাসীকে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে এবং তাহা সেকালে ইংরেজি ভাষার মাধ্যম ভিন্ন সম্ভব ছিল না বলিয়াই উচ্চতম জীবনাদর্শের তাগিদেই রামমোহন রীতিমত ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পক্ষপাতী হন। এই ইংরেজি ঘোষাইয়া শিক্ষা দিলে চলে না, প্রকৃত ভাষাজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেই পাশ্চাত্ত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতির জ্ঞান অর্জন সম্ভবপর। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি লর্ড আমহার্স্টকে তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ পত্রটি লেখেন। সুযুক্তিপূর্ণ এই দাবীর জন্যই তিনি প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ। কিন্তু তাঁহার দাবী যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, দেশে বিক্ষোভ জাগিবার ভয়ে কি এদেশীয়, কি ইউরোপীয় কেহই তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই—তাঁহার দাবী স্বীকৃত হইতে আরও বারো বৎসর সময় লাগিয়াছিল। লর্ড রিপনের এডুকেশন কমিটি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—

"It took twelve years of controversy, the advocacy of Macaulay and the decisive action of a new Governor-General, before the Committee could, as a body acquese in the policy urged by him [Rammohan]."

কাজে কাজেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, রামমোহন কল্পিত শিক্ষানীতিই ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতি এবং এই উচ্চতর ও প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক রামমোহন রায়ই। পূর্বে দুই-একজন ঘোষানো বিদ্যার ফলে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলিবার আংশিক যোগ্যতা অর্জন করিতেন বলিয়া সেই শিক্ষাপদ্ধতির ধারক ও বাহকদিগকে ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ বলা চলে না। ইংরেজির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের কৃতিত্ব একমাত্র রামমোহনেরই প্রাপ্য, অপর কাহারও নহে।

রমেশবাবু আর একটি অতিশয় ভ্রমাত্মক উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যে হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহার প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোনই হাত ছিল না, বরং যখন এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।' হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রামমোহন প্রথম আপত্তি তুলিয়াছেন, এরূপ একটি উদ্ভট তথ্য রমেশবাবু কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন, জানি না। রামমোহন সম্বন্ধে জানা ও অজানা বহু সম-সাময়িক পত্রিকা ও পুস্তকাদি আমি পাঠ করিয়াছি; কিন্তু কুত্রাপি এজাতীয় তথ্যের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও দেখি নাই। যতদূর সন্ধান পাইয়াছি, তাহা হইতে সংশয়হীন চিত্তে বলা যায় যে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের শেষে আত্মীয় সভার এক বৈঠকে রামমোহনের সুহৃদ ডেভিড হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন এবং এই ব্যাপারে রামমোহন রায়ের পূর্ণ সমর্থন আছে জানিয়া এই সভার অন্যতম সদস্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের গোচরে আনিলে তিনি

াী হইয়া হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। রামমোহন রায়কেই এই ন্স অধ্যক্ষ নিযুক্ত করার কল্পনা করা হয়; কিন্তু প্রচলিত হিন্দু তর বিরুদ্ধে বৈদান্তিক ও ষদীয় ধর্মমত রামমোহন প্রচার চ কলিকাতার একদল প্রভাবশালী রামমোহনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। াহনের সহিত এই নব প্রতিষ্ঠানের রূপ সম্পর্ক থাকিলে তাঁহারা সহিত কোনও সংস্রব রাখিবেন না চ শিক্ষালাভের স্বার্থেই রামমোহন ব্যাপার হইতে সরিয়া দাঁড়ান। রর চরিতাখ্যায়ক হিন্দু কলেজের ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার হেয়ার ীতে এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, র সাহেব বুঝাইলেন যে, তিনি াহন) অধ্যক্ষতা লইতে ক্ষান্ত না প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় রামমোহন রায় উদার চরিত্র ছিল; দেশের হিত সর্বদা প্রার্থনা ন এবং আপন যশ অতি ক্ষুদ্র করিতেন। রামমোহন রায়ের এই া ঘোষণা হইলে যাঁহারা আপত্তি ছিলেন, তাঁহারা সকলে স্যার হাইড বাটিতে উপস্থিত হইয়া অর্থ-পূর্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন।"

য়ার ও রামমোহনের সহিত চাঁদের পরিচয় ছিল, সেজন্য ন না ইহার বিপক্ষে বলবত্তর প্রমাণ াওয়া যায়, ইহাই ইতিহাসগ্রাহ্য। া রমেশবাবু রামমোহনের হিন্দু জর বিরোধিতার তথ্যগত প্রমাণ ওয়া পর্যন্ত তাঁহার এই নূতন গৃহীত হইতে পারে না। হিন্দু জর ধর্ম ও নীতিজ্ঞানহীন শিক্ষা াহনের পছন্দ হয় নাই, সেজন্য যে শিক্ষা জাতির পক্ষে কল্যাণপ্রদ করিতেন, তাহা প্রদান করিবার মানসে ত নিজের অর্থে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দেই কলেজ স্থাপনের অত্যল্প পরে স্না হিন্দু স্কুল নামে একটি স্কুল ন করিলেন।

াই বিদ্যালয়ে নিজের পুত্র রমা-রায় ও আদরে পালিত পুত্র াামকে ভর্তি করিয়া দেন ও নিজের বিশিষ্ট বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে তদীয় পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রেরণ করিতে উৎসাহিত করেন। স্কুলের শিক্ষা যাহাতে সর্বপ্রকারে কল্যাণপ্রসূ হয়, সেইধারে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই স্কুলটিই সর্বপ্রথম বে-সরকারী উচ্চতর শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান। তাঁহার পূর্বে কেন, বহুদিন পর পর্যন্তও এরূপ উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাসমন্বিত ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা অনেক কেন, কোনও বাঙালী করেন নাই। সেজন্য রামমোহনকে শিক্ষা বিষয়ে গৌরবের স্থানে বসাইলে কাহাকেও 'ছোট' করা হয় না, বরং এরূপ আসন না দিলে কৃতঘ্নতাই হয়।

এ্যাংলো হিন্দু স্কুলে মিস্টার মোরক্রফ্ট, মিস্টার স্যাণ্ডফোর্ড আর্নস্ট, মিস্টার সাদারল্যাণ্ড প্রভৃতি শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্কুলটি যে সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ছিল, সে কথা সে সময়ের সংবাদ-পত্রগুলিতে বার বার স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ফরাসী চিন্তাবীর ভলটেয়ারের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার খ্যাতি তখন সবেমাত্র ফরাসী ভূখণ্ডের সীমানার বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ভারতে উহার পরিচিতি ছিল না বলিলেই চলে; কিন্তু সেই ভল্টেয়ারের পুস্তক হইতে বাঙলা তর্জমা এই স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্যের অন্তর্গত ছিল।

শুধু লর্ড আমহার্স্টকে পত্র লিখিয়া বা এই একটিমাত্র স্কুল স্থাপন করিয়া তিনি আপন কর্তব্য সমাধা করেন নাই। ইংরেজি পুস্তক হইতে বাঙলায় ভূগোল ও খগোলের তর্জমা করিয়া ছাত্রদের সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভের সুবিধা করিয়া দেন ও শিষ্য ব্রজমোহন মজুমদারকে ফার্গুসনের জ্যোতিষবিষয়ক পুস্তক অনুবাদে উৎসাহিত করেন। ইউস্টসকেরী একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হইলে তিনি তাহার জন্য জমি প্রদান করেন ও ডাফ সাহেবের স্কুল স্থাপনে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন।

রামমোহনের নিজে একটি স্কুল স্থাপনে রামমোহনের যে চিন্তাধারা প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে সে সময়ের ক্যালকাটা গেজেটে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লেখা হয় যে,—

"As a founder of the institution, he [Rammohon] takes an active interest in its proceedings, and as we know that he is not more desirous of anything than its success, as a means of effecting the moral and intellectual regenerative of the Hindoos."

কাজে কাজেই যদি তাহার পূর্বে কেহ অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে কোনও প্রতিষ্ঠান মারফৎ কিছু ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহাকে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক বলা চলে না। সমস্ত দিক বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, জাতির কল্যাণ সাধন আকাঙ্ক্ষায় রামমোহন নানাভাবে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন, সেইভাবে এবং সেরূপ দৃষ্টিকোণ লইয়া তাঁহার পূর্বে কেহই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করিতে চাহেন নাই। এই সমস্ত কারণেই তাঁহাকে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক বলা হয় এবং খুব সঙ্গতভাবেই বলা হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "Ram Mohon and Modern India"তে ঠিকই লিখিয়াছেন যে, "He took a prominent part in the great educational controversy between the orientalists and Anglicists, and sided with the latter. But for his opposition the clamour of the former for the exclusive pursuit of oriental studies would most probably have prevailed."

* '‘নিরপেক্ষ’ ইতিহাস রচনার সমস্যা’’

সবিনয় নিবেদন

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরীর দেশে (৭ই নবেম্বর, ১৯৫৩) প্রকাশিত "নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার সমস্যা" পড়লুম। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে জয়পুরের অধিবেশনে ডক্টর রমেশ-চন্দ্র মজুমদার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন সবটা পড়িনি এবং যেটুকু পড়েছি তাও খুঁটিয়ে নয়। ডক্টর মজুমদার এ যুগের একজন নামী ও প্রামাণিক ভারতীয় ইতিহাসকর্তা; তাঁর পক্ষে বা বিপক্ষে বলবার মতো পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা, বলা বাহুল্য আমার নেই। তবে মোটামুটি রায়চৌধুরী ম'শায়ের সঙ্গে আমি একমত; কেবল ভারতচন্দ্র সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন, যা এই চিঠির উপসংহারে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করব।

আমাদের দেশে পণ্ডিতেরা বাঙলা সাময়িকীতে বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হন না, বোধ হয় মনে করেন যা বাঙলায় লেখা হয় তা প্রাকৃত জনের জন্য, কাজেই তাতে প্রতিবাদ বা সমর্থন করা অর্থহীন চাইকি রীতিমতো প্রেস্টিজ-নাশক। রায়চৌধুরী ম'শায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ডক্টর মজুমদার কিংবা অন্য বাঙালী পণ্ডিতেরা তাঁর প্রবন্ধের জবাব দেবেন না, যদি দেন, তবে তিনিও আমরা—দেশের পাঠক-পাঠিকারা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব।

রামমোহনের মহিমা অযথা বড়ো করতে গিয়ে আমরা বাঙালী জাতকে খাটো করেছি—ডক্টর মজুমদারের এই মন্তব্যের তাৎপর্য কি জানিনে। রামমোহনকে ছোটো করে বাঙালী কোনো দিন বড়ো হবে না—এই আমার বিশ্বাস। ভারত পথিক রামমোহনকে প্রাঞ্জল-ভাবে বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা বাঙালী কখনো করেনি কাজেই তাঁর মহত্ত্ব সম্যকভাবে আজও সে বুঝতে শেখেনি। বরং তাঁকে হেয় করবার প্রচ্ছন্ন ও সযত্ন চেষ্টা আমাদের এক-শ্রেণীর পণ্ডিত ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিরাট ব্যক্তিত্বকে নাকচ করে কেবল ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে, হ্রস্ব দৃষ্টির ঠুলিতে, সীমিত পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত। রাজার যাবনী স্ত্রী, মাতৃদেবীর সঙ্গে বিষয়-আশয় নিয়ে মামলা-মোকর্দমা এবং আভিজাত্য ও বস্তুতান্ত্রিকতা বাঙালী ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেনি এবং তাঁর বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠার মর্ম তখনও বোঝেনি ও আজও বোঝেনা। সহানুভূতি নয়, রামমোহন সম্পর্কে আমাদের অনীহা মজ্জাগত। অলডুস হক্‌সলী কোথাও বলেছেন স্রেফ চরিত্রের জন্যে ডিস্রেলী কখনও ভারতবর্ষের জাতীয় নেতা হতে পারেন না। অনুরূপ রাজা রামমোহন নিছক যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিমত্তার জন্য বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় মানসে দাগ কাটতে পারেননি।

ভারতবর্ষে ধর্ম-প্রবর্তক, প্রচারক বা উপদেষ্টার অভাব কখনও ঘটেনি। কিন্তু রাম-মোহনের মতো আধুনিক বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর আগে বা পরে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, খৃস্ট-ধর্মের বানভাসি থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য, বাধ্য হয়ে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রবর্তন করতে হয়েছিল। প্রয়োজন না হ'লে, ধর্মের গতানু-গতিক পথে তিনি হাঁটতেন না। তাঁর আদর্শ যতীর আদর্শ নয়, সহজ সুস্থ বুদ্ধিমান হৃদয়বান আধুনিক মানুষের আদর্শ। তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের জন্মদাতা—ধর্মপ্রবর্তক, রাজনীতিক, সাংবাদিক পণ্ডিত, ভাষাবিৎ, সমাজ সংস্কারক বাঙলায় প্রথম প্যাম্ফ্লেট ও পলিমিক্স লিখিয়ে, বাঙলা গদ্যের জনক, বাঙলা বৈয়াকরণ, আন্তর্জাতিকতার হোতা—কি নন?

ফিলহাল ভারতবর্ষকে দু টুকরো করার অপরাধ ও পাকিস্থানের জন্মের জন্য তাবৎ সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, কংগ্রেস মুসলিম লীগ কেবল দায়ী নন, সে পরিবাদ ও আংশিক দায়িত্ব থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও মুক্ত নন। ভারতীয় মধ্যযুগের হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস আজও লেখা হয়নি, যেটুকু আমাদের ঐতিহাসিকেরা পাঠ্য কেতাবে লিখেছেন তা রাজ্য ও রাজার ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, লুটতরাজ, রক্তাক্ত অভিযানের পিচ্ছিলতায় ভরা। আজকের দিনে তাঁদের অ-হেতুক মুসলমান বিরাগ ও নাটকীয় লম্ফ-ঝম্প খুব সুস্থ বলে মনে করিনে। ইতিহাসের পূর্বতন ও বর্তমান সূরীদের দান অনস্বীকার্য তবুও আজকের ও আগামী কালের ভারতীয় নতুন ইতিহাস মান্ধাতা আমলের মনোভাব ও টেকনিকে না লিখলেই ভাল হয়।

ভারতচন্দ্র নিঃসন্দেহে 'রাজবৃত্তিপুষ্ট' কবি। কিন্তু তাই বলে তিনি 'স্বাধীন ও সত্য-ভাষী' নন, সুবিনয়বাবুর ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে এ অপবাদ স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। ছেলে-ভুলানো ছড়ার কবি বা কবিরা সত্যভাষী ও স্পষ্টবক্তা হন একথা মানি, তবে ভারতচন্দ্রের মতো একজন প্রমাণসই বাস্তবধর্মী কবি অপলাপী হবেন তাও মানিনে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর অনুগ্রহ, স্বপ্ন-প্রত্যাদেশ যাবতীয় অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক গালগল্প আছে আর এ নাহ'লে মঙ্গলকাব্য লেখা যায় না—কাজেই কবি তা দিয়েছেন; এবং সম-সাময়িক জীবনের বাস্তব ছবি দিতেও ভোলেননি। অতিপ্রাকৃত কল্পনা বাদে, বর্গীরা যে পশ্চিম বাঙলা লুটপাট করেছিল, দেশ মুঘল আর মারহাট্টার কল্যাণে অরাজক হয়েছিল, বাঙালী মেয়ের ইমান ইজ্জত যে ধূলিসাৎ হয়েছিল, এ বাস্তব তথ্য তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। আর সে যুগের দুঃখদুর্দশার কাহিনী খাঁটি ইতিহাসের উপকরণ, তা নিছক মায়া বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যপক্ষে প্রাকৃত ঘটনার বদলে অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে ইতিহাস বলে স্বীকার করা সাচ্চা ইতিহাস ব ঐতিহাসিকের ধর্ম নয়। বর্গী হিন্দু হলেও লুটেরা, তার একমাত্র ধর্ম লুণ্ঠন। বর্গীরা মুসলমান বিতাড়নের মুক্তিফৌজ হয়ে বাঙলায় আসেনি, হিন্দু রাষ্ট্র সংস্থাপন করতেও আসেনি, চৌথ আদায় করতে এসেছিল। এ সত্য অস্বীকার কে করবে?

হাতের কাছে অন্নদামঙ্গল নেই, ইচ্ছা মতো উদ্ধৃত করতে পারছি না। তবে প্রমথ চৌধুরীর রায়তের কথায় উদ্ধৃত অন্নদা-মঙ্গলের যাবতীয় লাইন টিপ্পনী সমেত তুলে দিলুম। প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের কাব্যে মুঘল ও মারহাট্টার শোষণের কাহিনীকে খাঁটি ইতিহাস বলে স্বীকার করেছেন, নয় বাঙলার "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" ও রায়তের দুঃখ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভারত-চন্দ্রকে সাক্ষী মানতেন না। আর ভারতচন্দ্রে অলৌকিক কাহিনী সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেননি, বোধ করি তা অলৌকিক কাহিনী বলেই।

"দেশ যে কতদূর অরাজক হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং ভারতচন্দ্র। মোগলে মারহাট্টায় মিলে বাংলার অবস্থা যে কি কর তুলেছিল, তার বর্ণনা অন্নদামঙ্গলের প্রথ সূচনাতেই পাবে। সে বর্ণনার কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

'স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুটি বাঙালার লোক করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হইল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ি॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙলার যে দশা হইল॥

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—খাঁ ইতিহাস।"

প্রমথ চৌধুরীর ভারতচন্দ্রের জন্য ব্যারিস্টারির শেষে, আমার মোক্তারি ঢাকের পিঠে ট্যামটেমি। এইখানে দাঁড়ি টানি

—পরিমল দত্ত, নতুন দিল্লী

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

চীন বাংলার গান নিয়েই আরম্ভ করি। আরম্ভ করতে হলে থেকেই করা ভাল, কিন্তু মুশকিল হ গোড়াতেই গলদ, অর্থাৎ াসই বা তেমন কই, আর তথ্যই াথায়? গবেষকরা চেষ্টার ত্রুটি ন না, কিন্তু মাথা খুঁড়ে বা মাটি ও তো সে যুগের বিশেষ কিছু পর্যন্ত বেরুলো না।

াঁদের আমরা আর্য বলি, তাঁরা পক্ষে বাংলা দেশ মাড়াতেন না। গলে ঘেরা অতি বদরকমের বেয়াড়া া ছিল এটা তাঁদের কাছে। উত্তর ত্তর কত রাজত্ব একে একে উঠল- তার ইতিহাস রয়েছে, কিন্তু র উল্লেখ তার মধ্যে প্রায় নেই ই চলে। মৌর্যযুগ থেকে গুপ্ত- া প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসে া কিছু পাওয়া যায় না। তার ী কাল থেকে কিছু কিছু খবর া অবশ্য জোগাড় করেছি, তবে সে া প্রধানত রাজনৈতিক সংবাদ, তার সাংগীতিক তথ্য আহরণ করা এক ধ্য ব্যাপার। তা সত্ত্বেও কিছু যে াওয়া গেছে তা নয়, ওরই মধ্যে টি ছবি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে, থেকে বোঝা যায়, বাংলা দেশ তের দিক থেকেও নেহাৎ পেছিয়ে না। তারই দু-একটা মেলে ধরা

ষ্টম শতাব্দীর কাহিনী। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের নাতি ীড় যেমনি ছিলেন বেপরোয়া, গুণী। চুপি চুপি একদিন য় পড়লেন একাই দেশভ্রমণে। ঘুরতে এলেন প্রাচীন বাংলার শহর পৌণ্ড্রবর্ধনে। তখনকার দিনে জ্জায় এই নগরটি ছিল বিখ্যাত। া আবার নগরসজ্জাটা একটু ঘটা করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ দেবালয় কেয় মন্দিরে উৎসব উপলক্ষ্যে। হতে মন্দিরে সহস্র প্রদীপ জ্বলে --প্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ নানা- মালায়, দীপালোকে উদ্ভাসিত— ন হবে রাজনর্তকী কমলার নৃত্যা- া। খবর পেয়ে জয়াপীড় এলেন কেয় মন্দিরে। তখন নর্তনপটীয়সী র নৃত্যানুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে।

মহারাজ জয়ন্ত মহার্ঘ্য আসনে বসে সে নৃত্য উপভোগ করছেন। নৃত্য দেখে ক্রমেই জয়াপীড় অভিভূত হয়ে পড়লেন। ভরতের শাস্ত্রানুযায়ী নিখুঁত নৃত্য। নর্তকী তার সমস্ত সাধনা এবং শক্তি প্রয়োগ করে একের পর একটি রসের অভিনয় করে যেতে লাগলেন। ভরত প্রবর্তিত রসস্ফূর্তির সার্থক এবং সম্যক প্রকাশ হল তার নৃত্যে। ছদ্মবেশী জয়াপীড় বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু বেশিক্ষণ আত্মগোপন করা সম্ভব হল না। রাজনর্তকী কমলার নজর পড়ল সেই সুকুমার কাশ্মীর রাজপুত্রের ওপর এবং কৌশলে তাকে নিয়ে এলো নিজের গৃহে। এর পরেও অনেক ইতিহাস আছে 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত মহারাজ জয়ন্ত তাঁর কন্যা কল্যাণী দেবীকে সমর্পণ করেছিলেন জয়াপীড়ের হাতে।

এই আখ্যায়িকা থেকে বোঝা যাচ্ছে সে যুগে আমাদের সংগীত উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ জনপদের সংগে সমানতালে পা ফেলে চলবার মত গৌরবান্বিত ছিল।

তার পরে এল পালরাজাদের আমল। পালরাজাদের যুগেই বাংলার সংগে সারা ভারতের সত্যিকার পরিচয়। কত জাতি এল গেল তাদের সংগে যোগাযোগ ঘটল, তাদের সাংগীতিক রূপও বাংলায় স্থায়ী-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। আমার তো মনে হয় মালব, গুর্জর, গান্ধার কর্ণাট প্রভৃতি বিখ্যাত রাগ এই সময়েই বাংলা দেশে পরিচিতি লাভ করে। নানারকমের বাদ্য-যন্ত্রও ইতিমধ্যে বাংলা দেশে প্রচলিত হয়েছে। প্রায় চব্বিশ রকমের বীণার নামই তো পাওয়া যায় যা প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হত। বিচিত্র এই নাম-গুলি—বিপঞ্চী, বল্লকী, চিত্রা, ঘোষবতী, পরিবাদিনী, শততন্ত্রী—এই রকম আরও অনেক। তাল যন্ত্র এমনি বিচিত্র—

মৃদঙ্গ, মর্দল, মুরজ, মন্দিরা। এর মধ্যে মুরজ আর মৃদঙ্গও ছিল আবার অনেক রকমের—পুরোনো বাঙলার পাথুরে মূর্তিতে এগুলির পরিচয় পাওয়া যাবে। বড় বড় উৎসবে যেখানে অনেকে গান করতেন, সেখানে বাজত ঢক্কা, ভেরী, পটহ, দুন্দুভি, ডমরু, ঝল্লরী কাঁসর—এই সব, আর তার সঙ্গে বাজত অনেক রকমের বাঁশী। মহারাজ রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরে নানা যন্ত্রের ঐক্যতান বাজত ঘরে ঘরে, আর তার সঙ্গে হ'ত উচ্চশ্রেণীর গীতানুষ্ঠান।

এর পরে সেন আমলে যখন বাঙলার দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে, তখনও গানের আসর হ'ত বেশ জমকালোভাবেই, বিশেষ করে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায়। সেন রাজারা ছিলেন উঁচু দরের গান-বাজনার পক্ষপাতী, তাঁদের মজলিসে ভারি ভারি রাগের আলাপ হ'ত। কবি জয়দেব ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার অলঙ্কার। তিনি গাইতেন সংস্কৃত গান হাতে তালি দিয়ে, আর তাঁর বিদুষী পত্নী পদ্মাবতী তাকে রূপায়িত করতেন নিপুণ নৃত্যে। এই সব গান গাওয়া হ'ত মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরী, কর্ণাট, ভৈরবী প্রভৃতি বড় বড় রাগে আর তার সঙ্গে সঙ্গত চলত রূপক, একতাল, যতিতাল, নিঃসার, অস্টতাল প্রভৃতি বেশ উঁচু দরের দেশি তালে। এখানে বলে রাখা ভাল, এসব গান কিন্তু ধ্রুপদ নয়—এসবই প্রাক্-ধ্রুপদীয় ব্যাপার। এ-গানের কায়দাকানুন বলতে গেলে আবার আর একটা প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়। সুতরাং সেটা আপাতত স্থগিত রইল।

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় একবার এলেন এক দিগ্বিজয়ী মহাগায়ক বুদ্ধন মিশ্র। একদিন রাজ-দরবারের শ্রেষ্ঠা গায়িকা বিদ্যুৎপ্রভা সুহৈ রাগের আলাপে আসর মাত করে দিয়েছেন, এমন সময় মিশ্র ঠাকুর আপনাকে ঘোষণা করে সভার গায়কমণ্ডলীকে আহ্বান করলেন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে। কেউ আর এগুতে চান না। নিজের প্রতিভার পরিচয়স্বরূপ তিনি গাইলেন পটমঞ্জরী রাগ। এমন মোক্ষম আলাপ করলেন যে, সভাশুদ্ধ স্তব্ধ, আর কারও সাহস নেই যে, তারপর স্বরবিস্তার করেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন অগত্যা তাঁকেই জয়পত্র দিতে উদ্যোগ করছেন, এমন সময় ছুটে এলেন জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী। তিনি বললেন, তাঁর স্বামীর গান না হওয়া পর্যন্ত জয়পত্র দেওয়া চলবে না। অতএব অপেক্ষা করতে হ'ল। ইতিমধ্যে সভার সনির্বন্ধ অনুরোধে পদ্মাবতী নিজেই ধরলেন গান্ধার রাগ। সেই আলাপের কাছে ম্লান হয়ে গেল মিশ্র ঠাকুরের পটমঞ্জরী। পদ্মাবতীই জিতলেন—তবু মেয়ের সঙ্গে পুরুষের দ্বন্দ্ব—সকলেই একটু ইতস্তত করছিলেন, এমন সময় এলেন জয়দেব। তিনি ধরলেন বসন্ত রাগ। রাগালাপ তিনি যখন শেষ করলেন, তখন নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হ'ল, কে শ্রেষ্ঠ। মিশ্র ঠাকুর মাথা হেঁট করলেন এবং বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন পরাজয়।

হিন্দু যুগে বাঙলার রাজসভায় এইটি হচ্ছে শেষ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরের খবর।

কলকাতায় আগামী সঙ্গীত অধিবেশন

শীতকালটাই হচ্ছে কলকাতায় সব-চেয়ে ভাল সময় সব দিক দিয়ে। যখন তখন বৃষ্টিতে কাজকর্ম, যাওয়া-আসার অসুবিধে নেই, যোগাড়-যন্তর করা যায় সুবিধে মতো—আর সবচেয়ে আরামদায়ক হচ্ছে দিব্যি ঠাণ্ডায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসে গান-বাজনার মধ্যে ডুবে যাওয়া। ওস্তাদিয়ানা আর গমক, তান, বিস্তারের একটা গরম আছে, তার ওপর বাইরের গরম আর জ্বালাতন করবে না এই সময়টা। সত্যি বলতে কি, এই সব অনুষ্ঠানে এক-এক সময় এমন সব গাইয়ে বাজিয়ের আবির্ভাব হয়, যাঁদের মাত্রাজ্ঞানের (অবশ্য লয়-তালের দিক থেকে নয়, কেননা, সেটা আবার এঁদের একটু বেশিই থাকে) একান্ত অভাব। ভাল লাগছে না, তবু তাঁদের ঘে-নে-নে-নে, দিম্-তা-না আর শেষ হয় না, তার ওপর হৃৎস্তম্ভনকারী গমক এবং গলা উঠছে না, তবু তানের দোহাই দিয়ে তার-সপ্তকে তারস্বরে চীৎকার—গ্রীষ্মকাল হলে এই কলকাতায় এসব ব্যাপার সহ্য করা কঠিন, তবু শীতকাল হলে অন্তত মেজাজটা অত খারাপ হয় না।

যেরকম খবর পাওয়া গেছে, তাতে এ বছরের বড় দরের জলসা ভাল হবে বলেই মনে হয়। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২৭শে নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরোপুরি সাত দিন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান, শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর, শ্রীমতী গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ রাণে, মৈনুদ্দিন ডাগার ও ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগার, পণ্ডিত রবি-শঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, প্রফেসর আব্দুল হালিম যাকব খান, গোলাম সাবের খান, প্রফেসর ইমতাদ আহম্মদ খান, ওস্তাদ আহমেদ জান থেরাকুয়া, কিষণ মহারাজ প্রভৃতি। এছাড়া এখানকার শিল্পিবৃন্দ তো আছেনই।

এর পরে হচ্ছে তানসেন সঙ্গীত সম্মিলনী ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ৯ই পর্যন্ত ভারতী চিত্রগৃহে। এখানে যোগ দিচ্ছেন রোশেনারা বেগম (লাহোর), মহারাষ্ট্র কোকিল শঙ্কররাও শরনায়ক (কোলাপুর), কণ্ঠে মহারাজ (বেনারস), কিষণ মহারাজ (বেনারস), আশুতোষ ভট্টাচার্য (বেনারস), আহমদ জান থেরাকুয়া (রামপুর), হাফিজ আলি খান (গোয়ালিয়র), শওকৎ হোসেন (বম্বে), বিলায়েৎ হোসেন খান (বম্বে), এমদাদ খান (বম্বে), ইমরাৎ খান (বম্বে), ইলিয়াস খান (লক্ষ্ণৌ), মুস্রে খান (লক্ষ্ণৌ), মোহনতারা অজানিকা (বম্বে), এম এ করদাকর (বম্বে), শ্রীমতী রাজন (মাদ্রাজ) ও শ্রীমতী জয়কুমারী। বলা বাহুল্য এঁরা সবাই যদি আসেন এবং দারে

নারা গোছের কাজ না করেন, তবে ানটি হবে বাস্তবিকই উপভোগ্য। কার শিল্পীদের মধ্যে যোগদান র মহম্মদ দবীর খান, অমর র্ধ, ধীরেন ভট্টাচার্য, রমেশ পাধ্যায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কানন, গোপাল পাধ্যায়, কালিদাস সান্যাল, াস ঝাস্তর, বিজন ঘোষ-দস্তিদার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, সগীরুদ্দিন, মহাপুরুষ মিশ্র, অরুণ অধিকারী, অনিল রায়চৌধুরী, হীরু গাঙ্গুলী, কেরামৎ আলি খান, মলিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূ চট্টোপাধ্যায়, গীতা সেন, গীতিকা সেন, মায়া মিত্র, ভারতী রায়, বি নাহা, অপর্ণা চক্রবর্তী ও মাস্টার বেণু। কিন্তু কলকাতার প্রথিতযশা আরও কিছু শিল্পী যেন বাদ পড়লেন—কেন বুঝতে পারা গেল না।

এছাড়া নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশনও হবে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীদের নিয়ে। ভারতবিখ্যাত শিল্পীদের আগমনে আরও কয়েকটি সম্মিলনী হয় তাদের প্রচার আগে থেকে হয় না, তবে এর মধ্যে মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মিলনীর অনুষ্ঠানটি প্রতিবারই মনোজ্ঞ হয়ে থাকে।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

ানুষের দেহ একটি যন্ত্র বিশেষ। দেহযন্ত্রের কোনও কলকব্জা বিকল মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। অবশ্য কয়েকটি যন্ত্র কিছু- জন্য বিকল হ'লেও মানুষ যদিও থ হয়ে পড়ে, কিন্তু কিছুদিন বেঁচে তও পারে। কিন্তু দেহের মধ্যে কয়েকটি যন্ত্র আছে যা কিছুক্ষণের বিকল হ'লেই মানুষ মারা যায়। নী" মনুষ্যদেহের মধ্যের এই য় যন্ত্র। রক্তের মধ্যের দূষিত পদার্থ নী ছেঁকে শরীর থেকে বাদ দেয়। পূর্ণবয়স্ক লোকের কিড্নীতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ১,২০০,০০০ নল ; এই নলগুলো এত সূক্ষ্ম যে, ীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া শুধু চোখে দেখাই না। দেখা গেছে যে, এই নলগুলো পর পর লম্বা করে জুড়ে দেওয়া তাহলে ৭৫ মাইল লম্বা হবে। নী যদি কোনও কারণে বিকল হয়ে তাহলে রক্তের দূষিত পদার্থ জমে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ডাঃ কিরউইন একরকম কৃত্রিম নী তৈরী করেছেন যদি কোনও ণ কোনও মানুষের কিড্নী বিকল তাহলে অস্থায়ীভাবে কিছু সময়ের ঐ কৃত্রিম কিড্নীর সাহায্যে কাজ ন যাবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে আসল নীর চিকিৎসা চলতে পারে। ডাঃ উইনের কৃত্রিম কিড্নীটি একটি বশেষ। শরীরের মধ্যের কোনও াহী শিরা বার করে ঐ যন্ত্রের মধ্যে চালনা করা হয় আর ঐ যন্ত্রের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় একটি পদার্থের মধ্যে দিয়ে চালান হয় সেই সময়েই কিড্নীর মত রক্তের দূষিত পদার্থ ছেঁকে বার হয়ে যায় তারপর ঐ রক্ত দেহের মধ্যে আবার চালনা করা হয়।
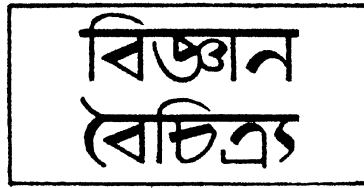
•

ফটোগ্রাফির পদ্ধতি যাঁদের জানা আছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে, ছবি তুলতে গেলেই আলোর দরকার। দিনের আলো পাওয়া যায় তো ভাল, না হলে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। ক্যামেরার সঙ্গে একটি রিফ্লেক্টার লাগান হয়, এতে একটি বালব থাকে, আর শাটারটি টেপার সঙ্গে সঙ্গে আলোটিও মুহূর্তের জন্য জ্বলে ওঠে এবং সেই মুহূর্তে ছবি উঠে যায়। এই রিফ্লেক্টারটি বড় জবড়জঙ্গ যন্ত্র, একে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করা বেশ কষ্টকর। আজকাল এই রিফ্লেক্টার বেশ ছোটখাট জিনিসে পরিবর্তিত হয়েছে। এটা পাখার মত মুড়ে ছোট করে নিলে বেশ সহজ বহনোপযোগী হয়। নতুন প্যাটার্নের রিফ্লেক্টারটি 'লাইকা' ক্যামেরার মত ছোট ক্যামেরাতেও স্বচ্ছন্দে লাগানো যেতে পারে। এটি খুব চকচকে এলুমিনিয়মে তৈরি নয়, ফলে এর থেকে বিচ্ছুরিত আলোটি চতুর্দিকে সমভাবে পড়ে। এই রিফ্লেক্টার ব্যবহার করার জন্য কোনও বিশেষ ধরনের বালব দরকার নেই। সমস্ত রিফ্লেক্টারটি ব্যাটারি-শুদ্ধ ওজনে মাত্র সাড়ে নয় আউন্স।

নতুন প্যাটার্নের রিফ্লেক্টারটি ভাঁজ অবস্থায়

রিফ্লেক্টারটি খুলে ক্যামেরার সঙ্গে ফিট করা হয়েছে

ট্রামে-বাসে

বিশু খুড়ো ট্রামে চড়িয়াই আমাদিগকে একটি জোর খবর শুনাইলেন। বলিলেন—"ব্যাঙ সাপ খেয়েছে, মুনিয়া পাখীর দাঁত গজিয়েছে এবং সর্বশেষ সংবাদে ট্রুম্যান কমিউনিস্ট দরদী হয়েছেন (?) ইত্যাদি সংবাদের চেয়েও অলৌকিক সংবাদ এসেছে এলাহাবাদ থেকে। শুনলাম সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে নাকি বক্তার অভাব হয়েছে। ধান ছড়ালেও কাকের অভাব হয় একথা বরং বিশ্বাস
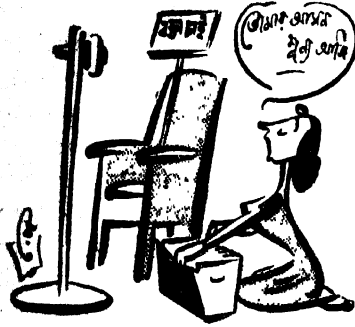
করা চলে কিন্তু বক্তিয়ার ঐতিহ্যে উজ্জ্বল এদেশে বক্তার অভাব"......খুড়ো সত্যই হতবাক হয়ে গেলেন।

* * *

সরকারী পরিকল্পনা কমিশন তিপ্পান্নটি পল্লী উন্নয়ন ব্যবস্থা সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"পল্লীর নন্দের পিসিদের ইথে কিছুই হবে না। কেন না তাঁরা জানেন যাহা বাহান্ন ছিল তাহা-ই তেপ্পান্ন"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চিকিৎসা সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ এ কে বসু বলিয়াছেন যে চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাবে রোগী হাসপাতালের সামনে রাস্তায় পড়িয়া মরে এমন দৃষ্টান্ত আমি পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসে পাই নাই। শ্যাম বলিল—"সেই জন্যেই তো আলেকজেন্দার বলে গেছেন,—সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র, এই দেশ"!!

* * *

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেধি বলিয়াছেন যে স্বাধীনতা অর্জন করিয়া জাতীয় জীবনে আমরা প্রথম "হার্ডলটি" পার হইয়াছি মাত্র।—"কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন না যে উপযুক্ত জকির অভাবে হার্ডল্ রেসটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে"—মন্তব্য করেন জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্রী।

* * *

বিশাখাপতনে "জলপুত্র" নামক ভারতীয় জাহাজ ভাসানের উৎসবে উৎপাদন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কে সি রেড্ডি মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতে ইস্পাতের পাত সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত জাহাজ শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বুঝলাম, জাহাজ সাগর জলে

ভাসলেও আমরা এখনও 'ছাগলছানা লাফিয়ে চলে'র যুগ পেরিয়ে আসতে পারিনি।"

* * *

পাকিস্তানের "ঐশ্লামিক রাষ্ট্র" আখ্যাকে তুরস্কের নেতৃবৃন্দ তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। রিপাবলিক পার্টির সভাপতি প্রসঙ্গত মন্তব্য করিয়াছেন—ঐশ্লামিক রাষ্ট্র হইলে কুসীদবৃত্তি নিষেধ করিতে হইবে, খাদ্যে যে ভেজাল দেয় তার প্রাণদণ্ড দিতে হইবে, তস্করের দক্ষিণ হস্ত কর্তন করিতে হইবে;—ইহারা সীমারেখা কোথায় টানিবেন? খুড়ো বলিলেন—"সীমা না টেনে ডুডু আর টামাক খাওয়া কি চলে না?"

* * *

জয়পুরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিকে মেবারের মহারাণা একখানা ঢাল ও একটি তরবারি উপহার দিয়াছেন।—"সম্মেলনের শেষে—গিয়াছে সাহিত্য দুঃখ নাই, আবার

তোরা যোদ্ধা হ—গানটি গাওয়া হয়েছে কিনা সে সংবাদ আমরা পাইনি"—বল্লেন বিশু খুড়ো।

* * *

পাক আইন সভায় মহিলাদের জন্য চৌদ্দটি আসন রিজার্ভ রাখা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"মহিলাদের জন্যে "বাসে" ক'টি আসন রিজার্ভ রাখা হয়েছে সে সংবাদ না জানা পর্যন্ত পাকিস্তানকে প্রগতিশীল বলা শক্ত"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

দিল্লীর কুতব মিনার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া যারা আত্মহত্যা করিয়াছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা সাত এবং মেয়েদের সংখ্যা পাঁচ। খুড়ো বলিলেন,—"সমান অধিকারের যুগে এই সংখ্যাবৈষম্য মেয়েদের পক্ষে লজ্জার কথা"। তারপর এই প্রসঙ্গের জের টানিয়া খুড়ো গান গাহিতে গাহিতে ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন—"আপনার মান রাখিতে জননী, আপনি লাফিয়ে পড়গো"!!!

শ্চমবঙ্গে লোকসংগীতের প্রচার ব্যবস্থা"

শয়,—গত ৩০শে আশ্বিন তারিখে
: "পশ্চিমবঙ্গে লোক-সংগীত প্রচার
সম্পর্কিত 'রংগজগত' বিভাগে
র মন্তব্য নিয়ে ১৪ই কার্তিকের
না' বিভাগে জনৈক শ্রীহরেন্দ্রপ্রসাদ
ুরীর একখানি পত্র প্রকাশিত হয়
: ২৭শে কার্তিকের সংখ্যায় এ বিষয়ে
ুখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে যার
কখানি লিখেছেন একজন সাহিত্যিক
ুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আহূত আলোচনা
উপস্থিত ছিলেন বলে জানিয়েছেন।
্যমন্ত্রী শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে
াচনা সভা ডাকেন তাতে বোঝা যাচ্ছে
বা সাহিত্যিক বলে নাম নেই তেমন
উপস্থিত ছিলেন, তার উদাহরণ পত্র-
শ্রী রায়চৌধুরী। তার চিঠিখানির
রকম একটা সুর যেন বেরিয়ে পড়েছে,
মনও-হতে পারে যে, যে-পরিকল্পনাটি
ার সংগে পত্রলেখকের প্রত্যক্ষ বা
যে-কোনভাবেই হোক স্বার্থ জড়িয়ে

রায় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে
ালোচনা বৈঠক করেন। দুবারই তিনি
ংগীত নৃত্যনাট্যাদির ব্যাপক প্রচারের
বশ্য তোলেন, কিন্তু কোনবারই একটা
স্পষ্ট পরিকল্পনা সামনে উপস্থিত
নদি। তাছাড়া তাঁকে প্রশ্ন করে
ট বিশদভাবে জানবার সুযোগও তিনি
প্রথমবার তিনি বলেন পরের বারে
প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং পরের বার
ারুর কোন প্রশ্ন থাকলে যেন আগে
াকে লিখে পাঠানো হয়। এইভাবে
পরিকল্পনাটি সঠিক এবং কি উপায়ে
াভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে সে
শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগে আলোচনা
রর কথা ব্যাপারটি যে তিনি কি করতে
ইটেই যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার
: বোধ করেননি। ডাঃ রায় দুবারই
য়ের পরিমাণের কথাটার ওপরেই জোর
লতি বাজেট কালের মধ্যে এক লক্ষ
বং পরের বাজেটে দুলক্ষ টাকা।
াপর 'রংগজগতে' শৌভিকের মন্তব্য
হওয়াতে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে একটি
শনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত
ঐ সংগে একথাও উল্লেখ করা হয় যে,
পনাটি বাঙলা দেশের শিল্পী ও
্যকগণ কর্তৃক অনুমোদিত। এতে
া আরও গোলমেলে হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
বাঙলার শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে
ারিতে অধিষ্ঠিত এমন বহুজন ডাঃ
বৈঠকে আহূত হননি বলে জানা
দ্বিতীয়তঃ আহূত হয়ে যাঁরা
ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকেও

আলোচনা

অনুযোগ উঠছে কোন পরিকল্পনাই পেশ করা হয়নি বলে। গত সংখ্যায় প্রকাশিত "জনৈক সাহিত্যিক"-য়ের পত্র থেকেই তা জানতে পারা যায়। যে পরিকল্পনার কথা শিল্পী সাহিত্যিকরা জানতেও পারলেন না সেটা তাদের অনুমোদন লাভ করেছে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

এদিকে বাজারের হাওয়াতে এ বিষয়ে অনেক কথাই ভেসে বেড়াচ্ছে। এগুলির সত্যাসত্য জানবার জন্যই এই পত্রের অবতারণা। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই লোক নিযুক্ত করা আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু লোক সংগীত, নৃত্য নাট্যাদির ব্যাপারে দীর্ঘকাল ধরে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক ও নাট্যকারের বহুজনের সংগে এ বিষয়ে কথা বলে জানা গেল যে, তাঁদের কারুরই এ পর্যন্ত ডাক আসেনি বা তারা শোনেনওনি। শোনা যায় বর্তমানে প্রচার দপ্তরে নিযুক্ত একজনকে এই পরিকল্পনার ভার দেওয়া হয়েছে মাসে হাজার বারশো মাইনের বরাদ্দে। শ্রীপংকজ মল্লিককে লোকসংগীত ব্যাপারে নিয়োগের কথা তো ডাঃ রায় নিজেই ঘোষণা করে দেন। শোনা যায়, বহুবাজার স্ট্রীটে মহলা দেবার জন্য একটা বাড়ী নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার এও শোনা যাচ্ছে যে, কলকাতার বর্তমান স্থায়ী নাট্যশালার একটি পশ্চিমবংগ প্রচার দপ্তর থেকে সরাসরিভাবে অথবা অন্যকে কণ্ট্রাক্ট দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা হচ্ছে। আবার একথাও কানে এলো যে মাঝে কোন একদিন নাকি জাতীয় নাট্যশালা উন্নয়ন সংঘ বা সমিতি বা ঐ নামের কোন এক সংস্থার এক প্রতিনিধিদল নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের অধিনায়কত্বে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সংগে সাক্ষাৎ করেছেন এবং এই সংস্থার হাতেই নাকি পরিকল্পনা অনুসারে নাট্য আন্দোলনে হেফজাতি ন্যাস্ত করা হবে। হয়তো এ সব কথার কোনটিই সত্যি নয়, কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে ডাঃ রায়ের প্রথম বৈঠক থেকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত পরিকল্পনার খসড়ার মধ্যে এমন অস্পষ্টতা বিদ্যমান যাতে নানা গুজব ওঠার ফাঁক দেখা দিয়েছে। স্পষ্ট সোজাসুজি এবং বিশদভাবে কিছুই জানা গেল না অথচ মার্চ পর্যন্ত এই বাজেটকালের মধ্যে এই চার-পাঁচ মাসেই লাখ টাকা খরচের বরাদ্দ হয়েছে। কাজেই সন্দেহ ও গুজব সৃষ্টি হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। এই সব সন্দেহের নিরসন হওয়া দরকার।

আরও একটা কথা। পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার ভার বিশ্বভারতীর হাতে ন্যাস্ত করা বিষয়ে আপনাদের শৌভিকের প্রস্তাবটিই যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ সরকারী বিভাগের হাতে থাকলে এর জন্যে আলাদা করে লোকজন নেওয়ার দরকার হবেই। তাতে একদিক থেকে লোক নির্বাচন নিয়ে বদনাম রটতে পারে, তাছাড়া লোক লাগাতে যে খরচ তাতে তো বরাদ্দ টাকায় কুলিয়ে ওঠাও সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। যে সকল সংঘ বা সমিতি বা প্রতিষ্ঠান লোক সংগীত, নৃত্য, নাট্যাদি নিয়ে মেতে রয়েছেন তারা কোন না কোন রাজনীতিক দলের প্রচার বাহিনীরূপেই কাজ করে যাচ্ছেন; তাদের কারুরই হাতে এ ভার দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং বিশ্ব-ভারতী ছাড়া আর কারুরই নাম করা যেতে পারে না। সমগ্র বিশ্বের কাছে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক বিশ্বভারতীর হাতে থাকলে পরিকল্পনাটির ওপরে সত্যি-কারের গুরুত্বের ছাপ পড়ে, দেশের শিল্পী সাহিত্যিকরাও উৎসাহ পান। এমন একটি বরণীয় পরিকল্পনা যা সত্যিই সমগ্র ভারতের মধ্যেই অনবদ্য, কিন্তু বাঙলার একজনও শিল্পী সাহিত্যিককে এ বিষয়ে অতি সামান্য উৎসাহও প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে না এতে বিস্ময়ের চেয়ে বোধ হয় ক্ষোভটাই বেশী প্রবল। ইতি, ভবদীয়—শ্রীঅরুণাংশু সেন। কলিকাতা।

রচনাবলী

বঙ্কিম-রচনাবলী—প্রথম খণ্ড। সমগ্র উপন্যাস। জীবনী ও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমন্বিত। সাহিত্য—সংসদ, ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দশ টাকা।

বঙ্কিম রচনাবলীর প্রথম খণ্ড, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত সমগ্র উপন্যাস, অর্থাৎ চৌদ্দখানি উপন্যাসের এই শোভন এবং সুন্দর সংস্করণখানি হাতে পাইয়া আমরা যুগপৎ পুলক এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। যেমন বাঁধাই, তেমনই ছাপা, কাগজ এবং মুদ্রণেও অপরিসীম তেমনই পারিপাট্য। বাস্তবিক পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের এইরূপ একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সরস্বতী প্রেস বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবযুগের উম্বোধন করিলেন। আমরা এতদিন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস সংগ্রথিতভাবে এত সুলভে এবং এইরূপ সুন্দরভাবে মুদ্রিত করা যে সম্ভব, ইহা কল্পনাও করিয়া উঠিতে পারি নাই। মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় এ জন্য সমগ্র জাতির ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে লাইনো টাইপে বাঙলায় মুদ্রণলিপি প্রচলিত হওয়ার ফলেই বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সব যুগের প্রবর্তনা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। নির্ভুল ছাপা, ঝকঝকে পরিপাটি অক্ষরে সুলভে এইরূপ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের বুক আজ আশা ও আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। বাঙলা ভাষায় লাইনো টাইপের প্রবর্তক এবং উদ্ভাবক স্বরূপে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলার মুদ্রণ শিল্পের সমুন্নতি সাধনার মূলে মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর সুদীর্ঘ সাধনার অবদান লাভের সৌভাগ্য যদি জাতির না ঘটিত, তবে বঙ্গ-ভারতীর অভিনব পূজার এই আড়ম্বরে আমাদের পক্ষে উল্লাস বোধ করিবার দিন আরও কতকাল পিছাইয়া থাকিত, কে বলিবে?

উপসংহারে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের লিখিত ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উপন্যাসসমূহের পরিচিতি পাঠ করিয়া সকলেই প্রীতি লাভ করিবেন। বাগল মহাশয় সুপণ্ডিত এবং সুলেখক। সংক্ষেপে কয়েকটি কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সুচিন্তিত, সারগর্ভ এবং প্রচুর প্রাণরসে আপ্লুত শ্রদ্ধায় সৌষ্ঠবান্বিত ভাষায় পরম উপাদেয় হইয়াছে। বাঙলার ঘরে ঘরে এমন গ্রন্থের প্রচার হইবে, আমরা এই আশা অন্তরে পোষণ করি। আমরা প্রকাশকদিগকে পুনরায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

অগ্নিযুগের শহীদ

বিপ্লব তীর্থে—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রলাল সরকার, বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

অগ্নিযুগে যে বিপ্লবী বাঙলার আবির্ভাব, অন্তিম অধ্যায়ে তাহাকেই দেখা যায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং পাহাড়তলীর সংগ্রামে আত্মপ্রকাশ করিতে। কিন্তু সেখানেই বাঙলার বিপ্লব-আন্দোলনের উপর যবনিকাপাত হয় নাই, বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' এই ত্রয়ী। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখ চট্টগ্রামের ঘটনা, চার মাস পরে ২৯শে আগষ্ট তারিখ ঢাকাতে বাঙলা পুলিশের বড়কর্তা লোম্যান সাহেব বিনয় বসুর গুলীতে নিহত এবং ঢাকার পুলিশ সুপার হডসন আহত হন। তারপর সেই বছরেরই ডিসেম্বর মাসের ৮ই তারিখ মধ্যাহ্নে বিনয়-বাদল-দীনেশকে আমরা দেখিতে পাই ইংরেজ শাসনের প্রধানতম দুর্গ রাইটার্স বিল্ডিং-এ, তাঁহাদের গুলীর মুখে কারাগারসমূহের ইনসপেক্টর জেনারেল কর্ণেল সিমসন নিহত হন, জুডিসিয়াল সেক্রেটারী নেলসন, সেক্রেটারী টয়সাম প্রমুখ আই-সি-এস বীরগণ আহত হন, বীরত্রয় রাইটার্স বিল্ডিংএর কক্ষে কক্ষে হানা দিয়া চলে, ভীতত্রস্ত ইংরেজ কর্তাদের সে এক করুণ চিত্র, যেন অকস্মাৎ সিংহের আক্রমণে মেষপালের দিক-বিদিককে প্রাণভয়ে পলায়ন। তারপর আরম্ভ হয় টেগার্ট-ক্রেগ-গর্ডন চালিত পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম—ইহাই বিপ্লবের ইতিহাসে 'অলিন্দযুদ্ধ' (Verandah Battle) বলিয়া খ্যাত ও কীর্তিত। শেষ গুলী ফুরাইবার পর বাদল (সুধীর গুপ্ত) সায়োনাইড বিষ গ্রহণ করিয়া ঘটনাস্থলেই মৃত্যুকে বরণ করে। বিনয় ও দীনেশ বিষ ভক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই আপন খুলিতে পিস্তলের শেষ গুলীটি বি
করেন। বিষ তাহাদের পাকস্থলীতে যা
পারে নাই, গুলীর আঘাতে উভয়েরই
হইয়া যায়। হাসপাতালে বিনয় নি
আঙ্গুলে মাথার ঘা খোঁচাইয়া সেপটিক ক
১৩ই ডিসেম্বর এই সিংহ শিশুর বা
মৃত্যু দেখা দেয়। দীনেশ চিকিৎসায় সুস্থ
বিচারে তাহার ফাঁসি হয়, ইংরেজ সরকা
শত সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন ভোরের সংব
পত্রে বাঙালী জানিতে পারে—"Dauntle
Dinesh Dies At Dawn."

এই বীরত্রয়ের অমর কাহিনীই ভূপে
বাবু গল্পের আকারে 'বিপ্লবতীর্থে' পরিবে
করিয়াছেন। এই অধিকার বিশেষভাবে তাঁহা
আছে। প্রথম তিনি বিনয়-বাদল-দীনেশ এব
তাঁহাদের দলেরই অন্যতম প্রধান নেতা
দ্বিতীয়—ভূপেনবাবু সাহিত্যিক ও চিন্তা
নায়ক। তাঁহারই পরিচালিত ও সম্পাদিত
'বেণু' পত্রিকায় বাঙলার বিপ্লবের একটা
অধ্যায়ে যুগশঙ্খ নিনাদিত হইয়াছে, শরচ্চন্দ্র
কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যাচার্যগণ
এই শঙ্খ-ঘোষণাকে শ্রদ্ধায় স্বীকৃতি দান
করিয়া গিয়াছেন। বাঙলার বিপ্লবের শেষ
অঙ্কে যে বীরত্রয় চরম মূল্য দিয়া গিয়াছে
দেশের স্বাধীনতার জন্য, তাহাদের সম্বন্ধে
প্রামাণ্য বিবরণ দিবার অধিকার ভূপেনবাবুরই
আছে, ইহা বিপ্লবী মাত্রেই স্বীকার পাইবেন।

গল্পের আকারে এই বিপ্লব-কাহিনী পরিবেষিত হইয়াছে, পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আসলে কাহিনীকে চলচ্চিত্রের উপযোগী করিয়াই রূপদান করা হইয়াছে। কোন শক্তিমান ব্যক্তি যদি এই বইখানাকে ছায়া-চিত্রে সার্থক রূপদান করিতে পারেন, তবে বাঙলাদেশ দধিচীর কোন অস্থিতে বজ্র নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা জানিবার সুযোগ পাইবে এবং এই বাঙলাতেই যে মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণদলের একটা আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, বিস্ময়ের সহিত নিজেদের সেই মহৎ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার স্মরণের সৌভাগ্যও বাঙলার হইবে।

পুস্তকের পরিশিষ্টে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' যে দলে ছিলেন এবং 'মেদিনীপুরে দীনেশ গুপ্ত' অর্থাৎ বি-ভি (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স) নামক প্রবন্ধ দুইটিতে এই অধ্যায়ের বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণ পাইবেন। এই দলের গুলীতেই মেদিনীপুরের পেডী-বার্জ-ডগলাস তিন তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রাণ দিয়াছে, এই দলেরই গুলীর আঘাতে আহত হইয়া ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ভিলিয়ার্স ভারত ত্যাগ করে, বাঙলার কুখ্যাত গভর্নর এডার্সন লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে এই দলেরই গুলীর আঘাতে আহত হয়। বিনয়-বাদল-দীনেশ বিপ্লবের যে সে অধ্যায়ের সূচনা করে, সেই অধ্যায়েই এই দলের মোট সতরজন তরুণ বীর ফাঁসিতে, গুলীতে

মৃত্যু বরণ করে। পুস্তকের শেষাংশে র সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসির সেলে থাকিয়া গুপ্ত মা-বোন-ভাইদের নিকট যে পত্র ছল, সেই পত্রাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। বলী হইতেই পাঠকবর্গ দেখিতে যে, কি ধাতুতে এই শক্তিমান চরিত্র হয়াছিল। পত্রাবলীতে তরুণ দীনেশের শক্তিরও বলিষ্ঠ একটি প্রকাশ দেখা শেষভাবে আজিকার তরুণ-তরুণীদের খানি আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ হৎ চরিত্র এবং মহৎ শক্তির অগ্নিদীক্ষা সুযোগ তাহারা এই 'বিপ্লব-তীর্থে' গ্রন্থখানির জন্য ভূপেনবাবুকে অভি-নাই।

া

া-কাঞ্চন — শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী। —এস কে মজুমদার, নলেজ হোম, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দড় টাকা।

দানন্দবাবুর জীবনের দীর্ঘদিন জেলে ছ, সেই সময়ে বিপ্লবী বন্ধুমহলে বি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন। আজ কবি-প্রতিভা বাঙলার সাহিত্য-সমাজে ও প্রতিষ্ঠিত। জগদানন্দবাবু ক কালের লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু সাবে তাঁহাকে 'আধুনিক'দের দলভুক্ত লে না। জগদানন্দবাবুর কবিতায় তা, চেষ্টাকৃত অস্পষ্টতা বা অর্থ-ইত্যাদি ত্রুটি একেবারেই নাই। জগদা-র কবিতায় মস্ত গুণ এই যে, বুঝা যায় এবং তাহা পাঠক হৃদয়ে প্রবেশপথ পাইয়া থাকে। সূক্ষ্ম ণে হয়তো ধরা পড়িবে যে, জগদানন্দ-কাব্য-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এবং ার প্রভাব রহিয়াছে। একজন মহাগুরু পরজন সমানধর্মী সমবয়সী বন্ধু। এই প্রতিভার প্রভাব জগদানন্দের কাব্যে ট হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও তদ্দ্বারা ম্লান হয় নাই। আলোচ্য বিভিন্ন সময়ে রচিত মোট সাতাশটি সংকলিত হইয়াছে। কবিতাগুলিকে ভাবে নাম দেওয়া যাইতে পারে— কবিতা, অবশ্য প্রেম শব্দটিকে বহু অর্থে এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, শুধু নর-নারীর প্রেম অথবা প্রকৃতি-নহে, স্বদেশপ্রেমও স্বভাবতই কয়েকটি র স্থান পাইয়াছে, যথা—বিবেকানন্দ-'কথা কও কথা কও' (নজরুল), 'যতীনদাস স্মরণে' 'শেরওয়ানী' ইত্যাদি। 'মণি-কাঞ্চন' কাব্যগ্রন্থে কবি ন্দের যে প্রেমিক রূপটি উন্ঘাটিত হ, তাহা মানুষেরই প্রেম সন্দেহ নাই, সে মানুষ স্বভাবে রাজবৈরাগী এবং পথের বাউল। এই নিরাসক্তি জগদানন্দ-বিপ্লবী জীবনেরই মূল সুর, তাহাই হয়তো তাঁহার কাব্যসৃষ্টিতেও আদ্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অনুস্যূত হইয়াছে বা রহিয়াছে।

এখন যদৃচ্ছ কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই 'মণি-কাঞ্চন'-এর কবিতার আস্বাদন পাওয়া যাইবে এবং পাঠকগণ তখন কবির কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে একটা ধারণা বা অনুমান করিবার সুযোগ পাইবেন।

'সুখ' নামক কবিতায় পুরাতন বক্তব্যই জগদানন্দবাবু গ্রহণ করিয়াছেন যে, সুখের জন্যই সকলের সকল চেষ্টা, সুখের জন্যই নিরন্তর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সকলে ধাবিত, কিন্তু তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এই সুখ-সন্ধানীদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'সুখের বসতি কোথা' বলিতে পার কি? তারপর এই সুখসন্ধান-চিত্রটিতে তিনি দুই ছত্রে অংকিত করিয়াছেন—

সম্মুখে সতত নাচে রূপ চিত্ত-হরা
সুখ স্বর্গ-মায়ামৃগ নাহি দেয় ধরা॥

অন্তিমে আসিয়া কবি মন্তব্য করিয়াছেন—

বসন্তের বৃন্তচ্যুত আশার মন্দার
সুখের সমাধি বক্ষে করে হাহাকার॥

'রূপ-তৃষ্ণা' কবিতায় সৃষ্টিকে কবি বলিয়াছেন— 'রূপ তৃষ্ণা-রাবণের চিতা।' কিন্তু এখানেই তিনি থামেন নাই, এই তৃষ্ণাকে তিনি 'পূজো' বলিয়াও দেখিতে পাইয়াছেন, যেমন—

প্রখর ভানুর করে দগ্ধ তনু, সূর্যমুখী, তবু—
বারেক তপন হতে আঁখি তার ফিরাবে না কভু॥

রূপের তৃষ্ণা-চিতা এই সৃষ্টি অবশেষে কবির দৃষ্টিতে প্রেমের হোমানলে রূপান্তরিত হইয়াছে দেখা যায়—

সতত সহস্র বিশ্ব সবিতায় করি আবর্তন
ব্রজাঙ্গনাগণ সম রসোল্লাসে করিছে নর্তন॥

প্রকৃতির চিত্র-অংকনে কবি জগদানন্দের তুলির কি রং ও রস, তার একটি নমুনা উদ্ধৃত হইতেছে 'বাদল সাঁঝে' কবিতাটি হইতে—

দোলে লম্বিত লটপট উতলা-বেণী
ঘন ঝটিকা বিকম্পিত বনানী শিরে,
কোন্ রিপুর নিধন ব্রতে যাজ্ঞসেনী
ভাসে কুন্তল এলাইয়া নয়ন-নীরে॥

প্রিয়-মিলনস্মৃতি সম্বন্ধে প্রিয়ার একটি চিত্র কবি এইভাবে অংকিত করিয়াছেন—

তুষারশুভ্র তোমার ললাট পটে
শ্রমজ জলের মুক্তাবিন্দু ঝলে,
ছল ছল জল সলাজ নয়ন তটে,
আঁখি পল্লব কম্পিত পলে পলে॥

পৃথিবী সম্বন্ধে কবির দুর্নিবার ভালোবাসা,

তবু চলে যেতে হবে:
এই ধরণীর স্নেহ-বন্ধন
ব্যথা আনন্দ হাসি-ক্রন্দন
হয়তো সোহাগে তখনো আমার
চরণে জড়ায়ে রবে—
তবু চলে যেতে হবে॥

পৃথিবী হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে কবি এই কথাই জানাইয়া যাইতে চাহেন—

"বাসিয়াছি ভালো, ভালো বাসিয়াছি মানুষের ভালবাসা।" ইহাই 'মণি-কাঞ্চন' কাব্যগ্রন্থের কবির প্রকৃত সত্য-পরিচয়।

উপনিষৎ—চিত্রিতা দেবী। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, কলিকাতা—১২। মূল্য—আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে ঈশ, কেন ও কঠোপনিষদের বাঙলা পদ্যানুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় বইখানির ভূমিকায় বলেছেন, "মূলের অর্থ যথাসম্ভব প্রসন্ন গম্ভীর ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায়, বিশেষত, বৈদিক সংস্কৃতে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি অর্জনের সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের নিকট এই অনুবাদ 'বরের' ন্যায় প্রতিভাত হইবে।" একথা প্রত্যেক পাঠকই স্বীকার করবেন। উপনিষদের অনুবাদ যে সহজ কাজ নয় তা বলাই বাহুল্য। তবু শ্রীমতী চিত্রিতা দেবীর অনুবাদ নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। প্রত্যেক উপনিষদের যে পরিচয় লেখিকা অনুবাদের আগে দিয়েছেন তাতে সাধারণ পাঠক বিশেষ উপকৃত হবেন। বইখানির প্রচ্ছদসজ্জা সুরুচির পরিচায়ক।

ভিক্ষাপাত্র : শ্রীরমেশচন্দ্র দে ঃ এস সি সরকার এণ্ড সন্স, ১।১।১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩, ৪।

দীপায়ন : শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ঃ বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, গ্রাম, কুলগাছিয়া, পোঃ মহিষরেখা, জেলা হাওড়া। প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ঃ চারি টাকা।

ভিক্ষাপাত্র কাব্যগ্রন্থে কবি মনের গভীর আন্তরিকতা সর্বত্র প্রকাশিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আন্তরিকতা আবার ধর্মানুসন্ধী। হয়তো সেই কারণেই আঙ্গিকের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি কবি অনেকটা উদাসীন। তা না হলে অনেক কবিতা হয়তো কাব্যাস্বাদে সার্থকতর হতো।

কাব্য-শরীরের ক্রম পরিণতিকে উপেক্ষা করে প্রাচীন রীতির আশ্রয়ে কাব্য রচনা করে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর কাব্য-সৃষ্টির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বক্তব্যকে সরল করে বলা। সেই কারণে প্রথম পাঠেই যে কোন লোক তাঁর কবিতা বুঝতে পারবে। কবিতাকে যারা দুর্বোধ্য কল্পনার অক্ষর-শরীর বলে ভয়ে পাশ কাটান তাঁরাও শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের কবিতা পড়ে আনন্দ পান। দীপায়ন কাব্যগ্রন্থে কবির সকল বৈশিষ্ট্যই সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন। তাঁর কাব্যের পাঠকরা পড়ে আনন্দিত হবেন।

সংগীত গ্রন্থ

ভজন-গীতিগুচ্ছ — শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

ভজন-গীতিকা—তৃতীয় খণ্ড। শ্রীহৃদয়-রঞ্জন রায়। গ্রন্থকার কর্তৃক ১৬২ লিনটন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৪ থেকে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

'ভজন-গীতিগুচ্ছে' দশটি ভজন গান, তাদের বাংলা ভাবার্থ এবং স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। এই গানগুলির সংগে ভাবার্থ দেওয়ায় ভজনগুলির অর্থ বুঝতে সকলের সুবিধা হবে। স্বরলিপিকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের "ভারতের সংগীত পরিচিতি" পুস্তক ইতিপূর্বে আমরা সমালোচনা করেছি। ভারতীয় সংগীতের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং ভারতের অন্যতম মহৎ সংগীত ভজন তিনি স্বরলিপির দ্বারা প্রকাশ করেছেন। এজন্যে তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন হবেন। নামদেব, হরিদাসস্বামী, কবীর, মীরা, মলুকদাস, নানক, দাদু, তুলসীবৃন্দা, পলটুদাস, ললিতাকিশোরী—এই দশজন সাধক ও সাধিকার দশটি ভজন গান ও তার স্বরলিপি এই বইটিতে আছে।

'ভজন-গীতিকা'-ও একটি সুসংকলিত ভজন-গানের স্বরলিপি-পুস্তক। এতে কবীর, মীরা, দাদু, সুরদাস, তুলসীদাস—এই পাঁচজন সাধক ও সাধিকার নির্বাচিত কুড়িটি গানের স্বরলিপি আছে। এ গ্রন্থেও প্রত্যেক গানের ভাবার্থ ও তদুপরি রাগ-রাগিণী দেওয়া হয়েছে। এতে স্বরলিপি দেখে গান তুলতে অনুরাগীদের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

গীতারতি—কথা শ্রীমুরারিমোহন সাহা, সুর ও স্বরলিপি শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

এই স্বরলিপি পুস্তকের গানগুলির রচয়িতা চিরাচরিত নিয়মে অর্থাৎ বাঁধা-ধরা ছকে গান রচনা করেছেন। এতে কবিত্বের স্পর্শ তেমন নাই, কিন্তু গানগুলি গীত হলে শ্রুতিকটু হবে না—ভাষা দেখে তাই মনে হয়। সুরকার ও স্বরলিপিকার একজন সংগীতজ্ঞ, তিনি এই স্বরলিপি রচনা করে সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন।

STUDENTS—Yuri Trifonov. Foreign Languages Publishing House, Moscow.

লেখক তাঁর স্বদেশের অনুরক্ত। স্বদেশা-নুরক্তি থাকা দোষের নয়, বরঞ্চ গুণেরই কথা। কিন্তু এ-অনুরাগের মধ্যেও মাত্রা থাকা দরকার। মাত্রাজ্ঞানের অভাবে পৃথিবীতে ছোট-বড় অনেক অঘটন ঘটেছে। সাম্প্রতিক একটি অঘটন ঘটে জার্মাণীতে—গত যুদ্ধের পরিণামে। এ-যুদ্ধটাও লেগেছিল দেশানু-রাগের জন্যই। হিটলার ছিলেন উগ্র দেশপ্রেমিক, তিনি তাঁর স্বদেশের কল্যাণ-কামনা করতে গিয়ে তাকে খানায় নিক্ষেপ করলেন। এ অঘটন ঘটেছে, আমাদের মনে হয়, মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। শুনেছি, হিটলার নাকি স্বভাষায় "আমার জার্মানি" বলতে গিয়ে চোখের জলে ভিজে যেতেন। বর্তমান উপন্যাসের লেখকও 'সোভিয়েট ল্যাণ্ডে'র অনুরক্ত, তিনি বলেছেন Moscow is a whole world মণ্ডুকও নিজের বাসস্থান-কূপকে পৃথিবী মনে করে—কিন্তু সে-কথাও কথা নয়। লেখক জীবন আরম্ভ করেন এরো-প্লেনের কারখানায় মিস্ত্রিরূপে ১৯৪২ সালে, ১৯৪৭ সালে তাঁর জীবনের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। বর্তমান বই তিনি ১৯৫০ সালে লেখা শেষ করেন এবং সেই বছরই এই বইয়ের জন্যে স্টালিন-প্রাইজ পান। এক্ষেত্রে লেখকের প্রতিভা আমাদেরও স্বীকার করতে হবে; সেইসংগে একথাও আমরা ভাবতে থাকব—প্রচার-পুস্তিকা ও সাহিত্য এক জিনিস কি না।

সচিত্র ইতিহাস

চিত্রে ভারতের ইতিহাস—প্রথম পর্ব। পশ্চিমবংগের শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা দশ আনা।

অতি সুন্দর আর্ট কাগজে ছাপা এই বইতে ভারতের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। এ বই হচ্ছে ভারত-ইতিহাসের প্রথম পর্ব—আদিযুগ থেকে মুঘল রাজত্বের অবসান পর্যন্ত। 'নিবদনে' বলা হয়েছে—"হাজারটি শব্দ অপেক্ষাও একটি ছবির দাম অনেক বেশী।" আমরা একথা বিশ্বাস করি; এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি। হাজার কথায় যা বোঝানো সম্ভব হয় না, একটি ছবির দ্বারা তা বোঝানো যায়, মানুষের মনের উপর চিত্রের প্রভাব যখন এতটা প্রবল, তখন সেই চিত্র-অংকনের সময় শিল্পীকে এবং তত্ত্বাবধায়ককে হাজার গুণ বেশি সতর্ক হতে হবে। অথচ এ বইতে সেই সতর্কতার অভাবই চিত্রের থেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। চিত্রগুলির বেশির ভাগই হয়েছে কার্টুন জাতীয়—এতে শিল্পনৈপুণ্যের বা শিল্প-সূক্ষ্মতার কোনো পরিচয় নেই। 'আদিম শিকারী' 'দ্রাবিড় জাতি' 'সিন্ধুসভ্যতা' ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে 'মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য', 'মধ্যযুগীয় শিল্পকলা' ইত্যাদির ছবি আর যাই হোক চিত্র হয়নি; এগুলি পুনরংকনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। মহেঞ্জোদারোর নারীমূর্তি মনুষ্যমূর্তি ও মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য ও শিল্পের নিদর্শন দেখে আমরা আতংকিত হয়েছি। এ অনেকটা হয়েছে শহরের কোনো ফুলবাবু লিখিত পল্লীসংগীতের মত। যে ছবি সুপ্রাচীন কালের নিদর্শন ব'লে খাড়া করা হয়েছে, সে ছবিতে হাল-আমলের কাঁচা তুলির টানই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। তা ছাড়া, আগেই বলেছি—এগুলি শিল্পকার্য হয় নি, স্থূলত্বই এতে বেশি প্রত্যক্ষ। জনশিক্ষার জন্যে এই বই বিস্তর ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এতে জনশিক্ষা ব্যাহত হবে এবং জনরুচি বিকৃত হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কার্টুনের দ্বারা মানুষের রুচি তৈরি হয় না, ওর দ্বারা বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধিতে সুড়সুড়িই শুধু দেওয়া যায়। কিন্তু এ-বই যখন এমন কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রকাশিত হয় নি, তখন এর পুনর্মুদ্রণ না হওয়াই ভালো এবং দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশের আগে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। আমাদের আরও একটা বিস্ময় এই যে, গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী নাকি এই বইয়ের চিত্র-শিল্পীকে নানাভাবে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন—'নিবেদনে' এইরূপ উল্লেখ আছে। রমেনবাবুর মত নিপুণ শিল্পী এই বইয়ের চিত্রগুলি অনুমোদন করেছেন জেনে আমরা বিস্ময়ের সংগে সংগে হতাশ হয়েও পড়েছি।

জীবনী

নেতাজীর জীবনবাদ—অনিল রায় প্রণীত। অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ, ৪৭-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹ আনা।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ বিপ্লবী-নেতা অনিল রায়ের 'নেতাজীর জীবনবাদের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অনিল রায় মনস্বী পুরুষ ছিলেন। সুলেখক হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৬ সালের মে মাসে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লেখক 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রে নেতাজীর জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন, আলোচ্য না সেই রচনারই সমষ্টি এবং সংগ্রহ। রায় মহাশয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের এবং সাধনাকে সমগ্রভাবে দেখিয়াছেন। সেইদিক হইতে ভারতের এই বিরাট সম্পন্ন স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের সাধনার দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিতে করিয়াছেন। লেখকের মতে সমন্বয়ের ই ছিল নেতাজীর জীবনের আদর্শ। দৈহিকের সহিত আত্মিকের, সমাজের ব্যক্তির, অর্থের সঙ্গে নৈতিক সমৃদ্ধির, র সহিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় রই ছিলেন পক্ষপাতী। বস্তুতঃ ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিই সাধনার প্রাণবীর্য তাঁহার অন্তরে ত করিয়াছিল। সাম্য বলিতে বহুরে ময় জীবনের বিকাশে তিনি সমন্বয়ই তেন। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র মনে প্রাণে র ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সকলকে করা এবং আপন করা লইয়াই ভারতীয় ার মূল শক্তি। প্রত্যুত ভারত কোন-অপর সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব র করিতে চাহে নাই। পক্ষান্তরে ীয় সংস্কৃতি ঐহিকতাকেও একান্তভাবে া করে নাই। ভারতের ঐতিহাই সে প্রমাণ। লেখক রায়ের মতে সুভাষচন্দ্র জীবনবাদের আদর্শেই কার্যতঃ াণিত ছিলেন। তিনি প্রকৃত কর্মযোগী । তাঁহার আদর্শ হিংসা এবং অহিংসা ুইয়েরই ঊর্ধ্বে কর্ম সন্ন্যাসে প্রভাবান্বিত এই জন্যই তিনি গান্ধীজীর স্তিকতা বা বৈরাগ্যবাদ সমর্থন পারেন নাই; সেইরূপ নাস্তিকবাদ-মার্ক্সবাদেরও তিনি বিরোধী এবং তাহা ব্যক্তি-জীবনের সর্বাঙ্গীন শাপযোগী সমন্বয়মূলক সমাজ-নীতির ূল নহে বলিয়াই বুঝিতেন। মানুষকে াসের জীবনের অভিমুখে লইবার দিকেই র্ক্সবাদের নীতি সুভাষবাদ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র মার্ক্সবাদ এবং ষ্ট নীতি উভয়েরই বিরোধী ছিলেন। ার রায় মহাশয় তাঁহার বহু বক্তৃতা এবং লী উদ্ধৃত করিয়া তাহা নিঃসংশয়িত প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ক্ষে তাঁহার যুক্তি অকাট্য। তিনি াছেন, গান্ধীবাদ, মার্ক্সবাদ ও ষ্টবাদ, এই তিনটি মত হইতে নেতাজীর দ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু এবং ভারতের ধর্ম বা স্বধর্মের উপরই তাহা ষ্ঠিত। নেতাজীর দার্শনিকতার মূলে ের অন্তরতম সত্তার নিবিড় সংযোগ বলিয়াই নেতাজীর আহ্বানে দেশে নূতন নর সাড়া জাগে। প্রত্যুত ভারতকে ন রাষ্ট্র হিসাবে যদি উন্নতি লাভ করিতে তবে তাঁহার আদর্শকেই অনুসরণ করিতে হইবে। লেখকের মতে সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শে বিবেকানন্দের প্রভাব অসামান্য-ভাবে কাজ করিয়াছে। রামমোহন এবং বিবেকানন্দের যে ঐতিহ্য ও সমন্বয়-বাণী যুগান্ত হইতে প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে, সুভাষচন্দ্র তাহারই বাহক। আধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে কর্ম জীবনের, দেহাতীতের সঙ্গে দেহের সমন্বয়ই তাঁহার জীবন দর্শনের মূল কথা। নানা মতবাদে বিভ্রান্ত বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতিতে "নেতাজীর জীবনবাদ" জাতির প্রকৃত পথ নির্দেশে সহায়ক হইবে।

মনীষীদের দৃষ্টিতে **স্বামী প্রণবানন্দ**—সম্পাদক স্বামী আত্মানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১নং রাসবিহারী এভিনিউ, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য সাধারণ ১৷৹ এবং বাঁধাই ১৷৷৹ টাকা।

যে সব মহাপুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা এবং তাহার মূলীভূত সার্বভৌম সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ সেই সব যুগাবতার মহা-পুরুষবর্গের অন্যতম। এদেশের শাস্ত্রকারগণ অবতার পুরুষবর্গের নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ইঁহাদের জীবন-লীলায় অতুল্য এবং অতিশয় বীর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ দেহীর পক্ষে তেমন প্রবল জ্ঞান ধর্মে এবং প্রেমের পরম বলের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ অতুল্য এবং অতিশয় বীর্য বৈভবে ইঁহারা স্বার্থ, সংকীর্ণ এবং নানারূপ কুসংস্কারে অভিভূত সমাজ জীবনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেন। ইঁহাদের প্রাণবলে ভারতের আত্মার অনাহত বাণী পুনরায় উদার এবং উদাত্তচ্ছন্দে স্বমহিমায় বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। জাতিকে নূতন জীবনের পথ তিনি দেখাইয়াছেন। দেশান্তব্যাপী গভীর অন্ধকার ও আলোর মধ্যে মনুষ্যত্বের অমোঘ মন্ত্র তাঁহার কণ্ঠে জাতি শুনিয়াছে। সম্পাদক স্বামী আত্মানন্দ স্বামী মহারাজ, সাধক পুরুষ, তিনি পণ্ডিত এবং জ্ঞানী। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বঙ্গের বিভিন্ন মনীষিবর্গ স্বামী প্রণবানন্দজীর স্মৃতি পূজায় যে সব অর্ঘোপচার বহন করিয়াছেন, তিনি তাহার ডালি সাজাইয়া আমাদের কাছে আনিয়া ধরিয়াছেন। বাঙলার চিন্তাশীল স্বদেশ-প্রেমিক সজ্জন-সমাজ এই মহাপুরুষ প্রশস্তি পাঠে পরম আনন্দ লাভ করিবেন এবং সমগ্র সমাজ এমন গ্রন্থের প্রচারে বিশেষভাবে উপকৃত হইবে।

উপন্যাস

অন্ধকাল—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সাহিত্য-ভারতী প্রকাশনী, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩ টাকা।

উপন্যাসখানি বিপ্লবের এক রোমাঞ্চকর প্রতিবেশের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। উপন্যাসের নায়ক সোমনাথের কথায় বইখানা পড়িতে বসিলে স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, 'দেবী চৌধুরাণীর পাল্লায় গিয়ে শেষটা পড়তে হল নাকি।' নায়িকা গৌরীর চরিত্রে দেবী চৌধুরাণীর ভঙ্গিমার যেমন আঁচ পাওয়া যায়, তেমনই ভবানী পাঠক এবং আনন্দ মঠের সন্তানদলের আধ্যাত্মিক একটি পরিবেশও অন্তরে আসিয়া স্পর্শ করে। রসোত্তীর্ণতার দিক হইতে বিচার করিলে এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এবং পার্থক্য বিস্তর রহিয়াছে; তথাপি মূল বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিতে লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। ভাব ঘন ভাষার কুহেলী জাল বিস্তার করিয়া আদর্শের নিবিড় স্পর্শে অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিবার কৌশল তিনি জানেন।

সাইমন কমিশন বয়কট আদর্শের সূত্রপাত হইতে উপন্যাসখানার সূচনা করা হইয়াছে। কিন্তু অতীতের ইতিবৃত্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়, ফলতঃ স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি এবং তাহার ভবিষ্যৎ পরিণতির উপর আলোক-সম্পাত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

লেখক প্রাক্-স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের ধারাটিকে ঘুরাইয়া কৃষক সমাজের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের রীতি-প্রকৃতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নায়িকা গৌরী পল্লী কৃষক সমাজের অধিনেত্রী এবং দেশ সেবাব্রতে দীক্ষিত সোমনাথ সেই ব্রতে তাহার সহকর্মী-স্বরূপে তাহার বিপ্লবী গুরু বিকাশ কর্তৃক নিযুক্ত হয়। খাল কাটিয়া পল্লীর উন্নয়ন সাধন কার্যে ইহারা আত্মনিয়োগ করে। পণ্ডিত মহাশয় ইঁহাদের উপদেষ্টা। গৌরী বা দেবী তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিতা। এই খাল কাটার প্রশ্ন লইয়া স্বরূপ নগরের জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ ঘটে। ঘটনাগুলি কাকদ্বীপ এবং সুন্দরবন অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের কথা অন্তরে জাগ্রত করে।

গ্রন্থকার কৃষক এবং প্রজা আন্দোলনের সমর্থক। তাঁহার মতে আন্দোলনের মূলে লোক-

হিতের পরম উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। দেশকে ভালবাসার অর্থই দেশের দরিদ্র, পীড়িত এবং শোষিত যাহারা তাহাদের প্রতি প্রীতির ভাব। তাঁহার মতে দেশের বর্তমান গভর্নমেণ্ট প্রজাদের স্বার্থের অনুকূলেই তাঁহাদের নীতি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বরূপে পুলিশ ইহার প্রতিকূলে। তাহারা শোষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে সর্বদা আগ্রহশীল এবং সর্বপ্রকার উচ্চ আদর্শ-বিবর্জিত। গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, শাসন বিভাগীয় উচ্চ পদস্থ রাজ-পুরুষগণের অযোগ্যতার ফলেই পুলিশ এইরূপ যথেচ্ছাচার চালাইতেছে। বস্তুতঃ ইংরেজের প্রভুত্বেরই অবসান ঘটিয়াছে, কিন্তু যে কাঠামোর উপর সেই সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, মূলতঃ তাহার পরিবর্তন ঘটে নাই। পুলিশ জমিদারদের সহযোগে প্রজা পীড়ন চালাইতেছে। পুলিশ ইনস্পেক্টার মিঃ ধাড়ার মুখে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"অনর্থক অশান্তি সৃষ্টি আর প্রজা পীড়ন, গভর্নমেণ্ট বরদাস্ত করিবেন না। যে যাই বলুক, আমাদের সরকারের নীতি এই। জেনে রাখবেন, জমিদারদেরও তাঁরা সুনজরে দেখেন না। তাঁরা জানেন, প্রজাদের আন্দোলনের জন্যে জমিদারেরা অনেকাংশে দায়ী। বুঝতেই পারছেন, আমাকে দুদিক রেখে কাজ উদ্ধার কর্তে হবে।'

সরকার বর্তমানে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা কৃষক এবং প্রজা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে কতটা সার্থকতা লাভ করিবে, উপন্যাসখানি জাতির দৃষ্টিকে সেই দিকে আকৃষ্ট করিবে এবং প্রজা আন্দোলনের অনুকূলে সমাজ-জীবনে সহৃদয়তা বোধ সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে। উপন্যাসখানির সর্বত্র উদার মানবতার আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। ক্ষান্তর রাধানাথ বিগ্রহ সেবার ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রাণতার অনুভূতির আলেখ্যটি বড়ই সুন্দর।

গোয়েন্দা কাহিনী

ছায়ামূর্তি : শ্রীস্বপন কুমার **:** প্রকাশক—শ্রীরণেন্দ্রকুমার শীল **:** পর্ণকুটীর **:** ৬, কামার-পাড়া লেন, বরাহনগর **:** বারো আনা।

চলন্ত ছায়া : শ্রীস্বপন কুমার **:** বিশ্ব-সাহিত্য প্রকাশনী **:** ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

ফিরোজা মুকুট রহস্য : শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় **:** শৈলশ্রী **:** ১১।১এ, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

যাত্রীরা হুঁসিয়ার : শক্তিপদ রাজগুরু **:** শৈলশ্রী **:** ১১।১এ, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট।

ছায়ামূর্তি এবং চলন্ত ছায়া পড়ে মনে হল ডিটেকটিভ গল্প লেখার মত সহজ কাজ আর কিছু নেই। একটি মাত্র ফরমূলা, সে ফরমূলার জন্য বিন্দুমাত্র বুদ্ধি-কল্পনার প্রয়োজন নেই, নিয়ে তাকেই নানাভাবে ঢেলে সাজলে নতুন নতুন বই হয়। একে গোয়েন্দা-কাহিনী না বলে গোয়েন্দা কাহিনীর সরল বোধিকা বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। এর মধ্যে আবার একখানা বই নাকি কলেজের ছাত্রদের জন্য। এখানেই সত্যিকারের উদ্ভাবনী শক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। এবার পাঠ্য পুস্তকের সরলার্থ লেখকরা সাবধান!

ফিরোজা মুকুট রহস্য বিদেশী গল্প অবলম্বনে লেখা। গোয়েন্দা কাহিনীর বিন্যাসে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের স্বাভাবিক নৈপুণ্য এখানে সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত না থাকলেও বইটি মোটামুটি সুখপাঠ্য। অবশ্য গল্পের কোন বিশেষ জটিলতা অথবা গোয়েন্দা-গিরির উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শনই এ বইতে নেই।

যাত্রীরা হুঁশিয়ার বইটিতে একটি সাধারণ ডাকাত সর্দারের গল্পকে বিশেষ পরিবেশে নতুন ভঙ্গীতে বলা হয়েছে। এখানেই বইটির যা কিছু বিশেষত্ব। তাছাড়া গল্পটিতে তথাকথিত গোয়েন্দা কাহিনীর রোমাণ্টের পরিবর্তে সন্ধ্যাবেলা ঠাকুমার কাছে বসে গল্প শোনার আমেজ আছে। আর সেই কারণেই যেটুকু নতুন আনন্দ পাওয়া যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

আলো আর আগুন—প্রবোধকুমার সান্যাল। মূল্য—৩্। ৪৯৯।৫৩

হে বিজয়ী বীর—বুদ্ধদেব বসু। মূল্য—৩৷৷০। ৫০০।৫৩

কান্না-হাসির দোলা—ভবানী মুখোপাধ্যায়। মূল্য—৩্। ৫০১।৫৩

কাঠ গোলাপ—নরেন্দ্র মিত্র। মূল্য—৩৷৷০। ৫০২।৫৩

লাজুকলতা — মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০। ৫০৪।৫৩

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা—নাভানা কর্তৃক ৪৭, গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৫্। ৫০৫।৫৩

স্বরলিপি-কৌমুদি—শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবিনয়কুমার বসু কর্তৃক মার্কেণ্টাইল ষ্টেশনার্স সিণ্ডিকেট, ৮৬, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০। ৫০৬।৫৩

মৃত্যুর পরপারে—নবরত্ন। শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ বসু কর্তৃক ৪০৫, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৷০। ৫০৭।৫৩

অবোধ্য শিশু—উমা চৌধুরী ও বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়। সলিল পাল কর্তৃক কিশোর-কল্যাণ কেন্দ্র, ১৩।২, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য—।০ আনা। ৫০৮।৫৩

A study of the New Indian Constitution—P. N. Bhattacharjee. Published from the Chatterji Publishers, 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta.

ছোটদের কবিকঙ্কন চণ্ডী—শ্রীগৌর-গোপাল বিদ্যাবিনোদ। চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷০। ৫১০।৫৩

পয়লা আবাদ (১ম খণ্ড)—মিথাইল শলোকভ। অনুবাদক—প্রফুল্ল চক্রবর্তী। দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য—৩্। ৫১১।৫৩

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

কোথায় কে প্লে-ব্যাক গায়ক-গায়িকা আছে, নামকরা কৌতুকশিল্পী আছে, কোথায় সব সংগতীয়া, সবাইকে ধরে এনে জমা করানো চাই। যারা যতো বেশি শিল্পীদের জমা করতে পারবে, তাদের ততো বেশি বাহাদুরী। তালিকা-ভর্তি নাম চাই, অনেক নাম। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যতোগুলো জলসা বসে, সে তুলনায় আলাদা আলাদা লোক নিয়ে কুলিয়ে ওঠার মতো শিল্পী-সংখ্যা অতো নেই; অবশ্য জনপ্রিয় শিল্পী-সংখ্যা, যাঁদের নাম শুনলেই লোকে ছুটে আসবে। ফলে একই শিল্পী নিয়ে টানাটানি পড়ে সব জলসাতেই; তাই সব জলসারই শিল্পী-দের নামের তালিকায় মোটামুটি একই নাম দেখতে পাওয়া যায়। একদিনে যদি তিন-চারটে জলসা বসে, তাহলে অধিকা[ংশ] শিল্পীকেই সব কটিতেই হাজির থাকতে দেখা যায়। একটা আসরের কাজ শেষ হবার আগে থেকেই আর এক জলসার উদ্যোক্তারা গাড়ি এনে হাজির; সেখানে পৌঁছেই হয়তো দেখা যায়, তৃতীয় জলসাতে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে লোক আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। এইভাবে গভীর রাত পর্যন্ত শিল্পীদের শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মাকুর টানাপোড়েনে ঘুরতে ফিরতে হয়।

[জল]সার মরসুমে শিল্পীদের লাভ

গত জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে [...]রিয়ার অতীন মেমোরিয়াল ক্লাবের [...]সায় কমিক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় [...]কাল কলকাতায় জলসার যে হিড়িক [...]া দিয়েছে, এর একটা কারণ বর্ণনা [...]ন। ভানুর মতে পাড়ার ছেলেরা তাদের [...]চিত গাইয়ে দাদাদের ধরে জলসা [...]য়, যাতে সে জলসায় ছেলেদের ভাবী [...]রা এসে উপস্থিত হয়, আর তারা বেশ [...] চোখ মেলে অনেকক্ষণ ধরে ভাবীদের [...]থ নিতে পারে। ভানুর বলার অতুল-[...] কৌতুকভঙ্গীতে কথাটা শুনে তখন [...]বত হাজার দেড়েক লোকই শুধু [...]তে ফেটে পড়েনি, আসন না পাওয়ার [...]ভাবে হট্টগোলকারি কয়েকশো লোকও [...]গ সঙ্গে শান্ত হয়ে তাদের সব [...]যোগ হাসির তোড়ে ভাসিয়ে দেয়। [...]কে হলেও কথাটা কিন্তু অমনভাবে [...]স উড়িয়ে দেবার নয়; একটা [...]নিতক সত্য এর মধ্যে অন্তর্নিহিত [...]ছে। এ-সত্যটা হলো শিল্পীদের নিয়ে।

* * * *

[...]বছর কতক হলো পাড়ার ক্লাবের [...]র্ক অধিবেশন বা অমনিধারা কোন [...]ত সম্মেলন হলেই একটা জলসার [...]য়োজন করার রেওয়াজ চলে আসছে। [...]ড়া জলসার বড়ো মরসুম হচ্ছে [...]পূজোর পর বিজয়া সম্মেলন থেকে [...]ম্ভ করে এক নাগাড়ে সরস্বতী পূজোর [...]কয়েক পর পর্যন্ত মাস কতক ধরে। [...]গ বড়ো বড়ো পূজোর অঙ্গনে জলসার [...]াগ হতো। এখন যতো সর্বজনীন [...]পূজো, ততো বিজয়া সম্মিলনী, [...]ীং ততো জলসা। একই দিনে [...]কাতা ও শহরতলীর ভিন্ন ভিন্ন [...]ায় আলাদা আলাদা জলসা বসে যায়। [...]য়া সম্মিলনীর চলন থাকতে থাকতে [...] জলসা বসাবার সুযোগ করে নিতে [...]রগ হন, তাঁরা পরে কালীপূজো, [...]তও সুযোগ না হলে জগদ্ধাত্রী [...]জা, অর্থাৎ কোন-না-কোন একটা [...]লক্ষ্য বাগিয়ে নিয়ে রৈ-রৈ করে চাঁদা [...]তু প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় শহরের [...]পীদের।

এসব জলসায় সবাই চান যতো সব [...]প্রিয়, আধুনিক গানের শিল্পীদের। [...]দ একটা জলসা করবেই করবে। এতে

'সঙ্গম'-চিত্রে কামিনী কৌশল

তাতে শিল্পীদের গলা বসে যাক, শরীর খারাপ হোক, সে বিষয়ে কোন জলসার উদ্যোক্তাদেরই কোন রকম ভ্রূক্ষেপই থাকে না—শিল্পীকে আসরে এনে বসিয়ে দেওয়া চাই, যেমন অবস্থাতেই ক।

* * *

অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, অধিকাংশ শিল্পীকেই বাধ্য হয়েই এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়—জনপ্রিয়তার অত্যাচার। এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এতো অত্যাচার সহ্য করতে হয় বেশির ভাগকেই একেবারে বিনা পারিশ্রমিকেই। জনপ্রিয় হবার এই হলো ফ্যাসাদ। পাড়ার পলিটি-ব্যুরোদের আদর-আব্দার রক্ষা না করে নিস্তার নেই। প্রায় অধিকাংশ পাড়াতেই পলিট-ব্যুরোদের এমনি উৎপাত; ওদের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে জনপ্রিয়তা রক্ষা করে চলা বড়ো সহজ কথা নয়। কিন্তু ওরা প্যাণ্ডেল সাজাতে, আলোয় আর সামিয়ানায় এবং ভাসানের মিছিলে বাজনা-বাদ্যি ও সঙের জন্য প্রচুর খরচ করে যাবে, কিন্তু জলসার শিল্পীদের পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু দেবার কথা হিসেবেই ধরে না। ওরা শিল্পীদের বিনয়কাতর দুর্বলতার খবর ভালো করেই রাখে। জানে, ঠিক সূত্র মারফৎ ধরাধরি করতে পারলে প্রত্যাখ্যাত হতে হবে না কোন জনের কাছ থেকেই। পাড়ায় এক গাইয়ে দাদা আছেন, তাঁকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানালে কেউ না বলতে পারবে না। কিংবা ছেলেরা হয়তো গিয়ে ধরলে পাড়ার বাসিন্দা কোন পত্র বা পত্রিকার সম্পাদক বা হোমরা-চোমরা কোন ব্যক্তিকে সে-পাড়ার জলসাটির জন্যে শিল্পী জোগাড় করে নিয়ে আসতে। কিংবা শিল্পীদের কাছে অনুরোধ নিয়ে হাজির হলো হয়তো কোন সহযোগী শিল্পী, হয়তো নামকরা কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী, কিংবা হয়তো মস্ত নামকরা কোন শিল্পপতির প্রতিনিধি, হয়তো কোন চিত্র-পরিচালক কিংবা সঙ্গীত-পরিচালক। এঁদের খাতির না রাখলে চলে না, আর এঁদের কাছে মুখ ফুটে পারিশ্রমিকও চাওয়া যায় না। এইভাবে অপরের আদর-আব্দার তুষ্ট করার জন্যই বাধ্য হয়েই বহু শিল্পীকে জলসায় যোগদান করতে হয়। যদিবা কোন জলসা পয়সা দেয়ও তো উচিত পারিশ্রমিকের চেয়ে তা অনেক 'কনশেসন' হারে। তা নয়তো বেশির ভাগকেই মোটরে চড়ে যাতায়াত, কিংবা কোনখানে পেটভরে খাওয়া-দাওয়া পেয়েই তুষ্ট হয়ে কেবলমাত্র পকেট ভর্তি হাততালি আর মুঠো মুঠো জনপ্রিয়তা সম্বল করে রাত কাবারে বাড়ি ফিরতে হয়। বরাৎ যার নেহাৎই মন্দ, তাকে হয়তো ফিরতে হয় বুকে নিন্দা ও গালির জ্বালা ভরে নিয়ে। এমনিধারা আসর পরিক্রমা করে বেড়াতে হয় অনেক শিল্পীকেই উপর্যুপরি রাতের পর রাত বেশ মাস কতক ধরেই। এই হিমেল রাত। আর গলা তো তেমন মহাশয় নন—বেশি চাপ পড়লেই ধরে বসেন। কতো সূক্ষ্ম ও স্পর্শাতুর তন্ত্রী নিয়ে স্বরের খেলা। সেতারই হোক, আর স্বরোদই হোক, যে কোন যন্ত্রই একটানা অবিরাম ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে ভেঙে কাবু হয়ে যায়—মানুষের গলার আর দোষ কি! গলায় সুর খেলুক বা না খেলুক, স্বর যতোই বিকৃত হোক, অক্লান্তভাবে একটার পর একটা জলসা চালিয়ে যেতে

"অভিশাপ"-এর একটি দৃশ্যে বিকাশ রায় ও মঞ্জু দে

তা না হলে পাড়ার সব পলিট-দের হাতে মান রাখা দায় হয়ে

* * * *

াগজে কাগজে, মাঝে মাঝে, কোন কোন র বিবরণীতে নিজের নামটা বের টাই অধিকাংশ শিল্পীর যাকিছু নগদ অর্থের বদলে ঐটেই যা া। কিন্তু এরকম চলবেই বা কেন? বা শিল্পীদের যথাপ্রাপ্য পারি-ক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হবে? ক তো শোনা যায়, কোন কোন ার নামে উদ্যোক্তারা হাজার হাজার চাঁদা তুলতে সক্ষম হন। চেয়ার, যানা, আলো, মাইক কোন কিছুর াই তাঁরা টাকা খরচ করতে কুণ্ঠিত না, কিন্তু যাঁদের নাম দেখিয়ে টাকা লা হয় এবং যাঁদের নিয়ে জলসা, াই শুধু 'অনারারি' থাকবেন! এ তো া বিচিত্র ব্যাপার! পুজোর সময় পুজো-সংখ্যার মরসুমে নামকরা সাহিত্যিক ও লেখকদের সকলেই রচনা দিয়ে পয়সা অর্জন করেন। যে কোন বিষয়েই মরসুম দেখা দিলে কারবারিরা বেশ কিছু করে নেবার সুযোগ পান। কিন্তু এই যে দুর্গাপুজো থেকে জলসার মরসুম চলে, তা থেকে গাইয়ে-বাজিয়েরাই বা কিছু অর্থ অর্জন করার সুযোগ থেকে কেনই বা বঞ্চিত থাকবেন! এইটেই ওঁদের রোজগারের একটা ভালো সুযোগ; তা নয়তো ও'দের চলবেই বা কি করে? এরকম চলতে থাকলে সেদিন ঐ ঢাকুরিয়ার জলসাতেই সন্দীপ সান্যালের কৌতুক নক্সাটির মতোই তো শিল্পীদের অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। সন্দীপ সান্যাল অবশ্য রঙ্গ করেই বলেন, বাঙলায় শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে হয়তো দেখা যাবে একদিন জগন্ময় মিত্র দুধ বিক্রী করছেন গান গেয়ে গেয়ে, পঙ্কজ মল্লিক ফেরী করছেন খবরের কাগজ, শচীন দেব-বর্মন বাজারে বসেছেন মাছ বেচতে, অহীন্দ্র চৌধুরী হয়েছেন বাস কণ্ডাক্টার, গায়ত্রী বোস হয়েছেন মেয়ে-পুলিশ, হরিধন ঘুরছেন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে, ধনঞ্জয় গেয়ে ফিরি করছেন কাঁচকলা ইত্যাদি। সন্দীপ সান্যাল অবশ্য কোন শিল্পীরই মান ছোট করার উদ্দেশ্যে এ-নক্সাটি রচনা করেন নি, ওপরে যাঁদের নাম করা হয়েছে, শুধু মাত্র তাঁদের কণ্ঠস্বরকে অনুকরণ করে একটা কৌতুক রসের অবতারণা করে নিছক লোককে হাসাবার জন্যই নক্সাটির পরিকল্পনা করেছেন। ভারি উপভোগ্য নক্সা। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ওর মধ্যে দিয়ে সন্দীপ সান্যাল শিল্পী-দের যাঁদের স্বর অনুকরণ করে কৌতুক করেন, তাঁরা না হোন, অন্য বহুজনেরই বোধহয় যেন ভবিষ্যতের একটা সত্যি রূপেরই আভাস সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ময়লা কাগজ"-এর একটি দৃশ্যে বিচিত্র রূপসজ্জায় ধীরাজ ভট্টাচার্য (মধ্যে), মাস্টার সুখেন (বাঁদিকে) প্রভৃতি।

খেলার মাঠে

ফুটবল

মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল দল এইবারের নিখিল ভারত ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হইয়াছে। মোহনবাগান ক্লাবের এই সাফল্যলাভ কেবল যে ক্লাবের সমর্থকদের প্রাণে আনন্দ ও উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে, সারা বাঙলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ফুটবল খেলোয়াড়দের স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগদান করিয়াছে। কারণ এই সাফল্য আন্তঃরাজ্য ফুটবল চ্যাম্পিয়ান বাঙলা ফুটবল দলের মান-সম্মান রক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গত দুই বৎসরের ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী। সেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অখ্যাত, সম্পূর্ণ নবাগত, অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত, দেরাদুনের ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমীর ছাত্রদলের নিকট অপ্রত্যাশিতভাবে ২—০ গোলে পরাজিত হইলে সারা বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়দের মাথা হতাশায় নত হইয়া পড়ে। এই ধারণাও সকলের মনে জাগে হয়তো বা বাঙলার ফুটবল খেলার সমাধি রচিত হইল। ঠিক এইরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল দল, যাহারা কলিকাতার মাঠে ফুটবল মরসুমে বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই, তাহারা একের পর এক ভারতের খ্যাতিমান শক্তিশালী দলকে পরাজিত করিয়া ডুরাণ্ড কাপ ফাইন্যালে উন্নীত হইল। মোহন-বাগান ক্লাব ইতিপূর্বেও ডুরাণ্ড কাপ ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে বিশেষ নূতনত্ব সৃষ্টি করিল না। ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই তরুণ খেলোয়াড় দল দেরাদুনের ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমীর ছাত্রদল। সকলে আশঙ্কা করিল মোহনবাগান ক্লাবও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ন্যায় পরাজয় বরণ করিবে। কিন্তু ফল দাঁড়াইল ঠিক বিপরীত। মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল দল কেবল খেলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিল না, শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমীর দলকে পরাজিত করিয়া বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত হইল। সারা বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড় ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন নৈরাশ্যের ছায়ার মধ্যে আলোকের সন্ধান পাইয়া পুনরায় আনন্দে ও উৎসাহে জাগ্রত হইল। সেইজন্য ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল খেলোয়াড়গণ কাপসহ বাঙলায় প্রত্যাবর্তন করিলে যে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরাও তাঁহাদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

নূতন শিক্ষা

তবে এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার ধুরন্ধর ফুটবল পরিচালকদের এক নূতন শিক্ষা হইল। খ্যাতনামা খেলোয়াড় আমদানী করিয়া দল পুষ্ট করা ছাড়াও যে অন্য পথ আছে, ইহা বোধ হয় তাঁহারা ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিয়াছেন। দেরাদুনের ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমী একটি সামরিক কৌশল শিক্ষার স্কুল। সারা ভারতের তরুণ ছাত্রগণই এই স্কুলে অধ্যয়ন করে। ইহাদের বয়স ১৮।১৯ বৎসরের অধিক হইবার উপায় নাই। কারণ ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই এই স্কুলে যোগদান করিতে হয়। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানে একজন কৃতী ফুটবল খেলোয়াড় ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহার চরম নিদর্শন এইবারের ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় পাওয়া গেল। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ অদূরভবিষ্যতে খেলোয়াড় আমদানী প্রথা বর্জন করিয়া দেশের তরুণ ও উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের শিক্ষা দিয়া উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী যদি করেন, তাহা হইলে কেবল যে খেলোয়াড়ের অভাব বাঙলা দেশ হইতে বিদূরিত হইবে তাহা নহে, গোপনে যে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইতে ফুটবল ক্লাবসমূহও রেহাই পাইবেন।

ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমী কিভাবে ফাইনালে উন্নীত হইয়াছে

প্রেসিডেন্টস স্টেট দলকে ৫—১ গোলে, ই আই আর দলকে ০—০, ৩—০ গোলে, ইস্টবেঙ্গল দলকে ২—০ গোলে ও ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ড দলকে ০—০, ১—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে।

মোহনবাগান কিভাবে বিজয়ী হইয়াছে

নিউ দিল্লী হিরোজ দলকে ২—০ গোলে, বাঙালোর ব্লুজ দলকে ১—০ গোলে, হায়দরাবাদ পুলিস দলকে ২—১ গোলে ও ন্যাশানাল ডিফেন্স একাডেমী দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে।

ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার ইতিবৃত্ত

১৮৮৮ সালে ভারত সরকারের বৈদেশিক সচিব সার হেনরী মর্টিমার ডুরাণ্ডের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তাঁহার নামে প্রথম খেলার প্রবর্তন হয়। তবে প্রতিযোগিতাটি কেবলমাত্র সামরিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ১৮৯৫ সালে হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল উপর্যুপরি তৃতীয়বার কাপ বিজয়ী হওয়ায় পুনরায় কাপ সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেয়। সার মর্টিমার ডুরাণ্ড নিজেই কাপ প্রদান করেন। ১৮৯৯ সালে ব্ল্যাক ওয়াচ উপর্যুপরি তৃতীয়বার বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়া পুনরায় কাপটি চিরতরে দখল করে। সার মর্টিমার ডুরাণ্ড পুনরায় কাপ প্রদান করেন ও সেই সময় স্থির হয় প্রতি বৎসর বিজয়ী দলকে একটি ছোট কাপ চিরতরের জন্য দেওয়া হইবে। ১৯০৪ সালে সিমলার বিভিন্ন সরকারী অফিসের কর্মচারিবৃন্দ ও ক্রীড়া-উৎসাহিগণ ১৫০০৲ টাকা মূল্যের একটি কাপ প্রদান করেন ও স্থির করেন যে, উপর্যুপরি তিনবার যে দল ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিবে, তাহাকে "সিমলা কাপ" দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহার পর হইতে কোন দলের ভাগ্যেই সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই। এই বৎসরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ঐরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে বলিয়া অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। সিমলার জনসাধারণ কেন এই প্রতিযোগিতা সামরিক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, এই লইয়া আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ফলে ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতের খ্যাতনামা জনপ্রিয় মোহনবাগান দলকে প্রতিযোগিতা কমিটি আমন্ত্রণ করেন। মোহন-বাগান ক্লাব উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াও সেমিফাইনালে শেরউড ফরেস্টার্স দলের নিকট পরাজিত হয়। ইহার পর হইতেই বেসামরিক দল একে একে ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে আরম্ভ করে। ১৯৪০ সালে সর্বপ্রথম বেসামরিক দল হিসাবে কলিকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উক্ত কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। ১৯৫০ সালে হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ ও ১৯৫১-৫২ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বেসামরিক দল হিসাবে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি কাপ প্রদান করেন ও বিজয়ী দলকেই ঐ কাপটি দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হয়।

ডুরাণ্ড কাপের পূর্ববর্তী বিজয়িগণ

১৮৮৮ রয়াল স্কট ফুজিলিয়াস; ১৮৮৯-৯০ এইচ এল আই; ১৮৯১-৯২ স্কটীশ বডারার্স; ১৮৯৩-৯৫ এইচ এল আই; ১৮৯৬ সামারসেট এল আই; ১৮৯৭-৯৯ ব্ল্যাকওয়াচ; ১৯০০-১ এস ডবলিউ বর্ডারার্স; ১৯০২ হ্যাম্পসায়ার রেজিমেন্ট; ১৯০৩ রয়াল আইস রাইফলস; ১৯০৪ নর্থ ষ্টাফোর্ডস; ১৯০৫ রয়াল ড্রাগানস; ১৯০৬-৭ ক্যামেরোনিয়ান্স; ১৯০৮-৯ ল্যাঙ্কস ফুজিলিয়াস; ১৯১০ রয়াল স্কট; ১৯১১ ব্ল্যাকওয়াচ; ১৯১২ রয়াল স্কট; ১৯১৩ ল্যাঙ্কস ফুজিলিয়ার্স; ১৯১৪-১৯ সাল কোন খেলা হয় নাই।; ১৯২০ ব্ল্যাক-ওয়াচ; ১৯২১ ৩য় উরস্টার্স; ১৯২২ ল্যাঙ্ক ফুজিলিয়ার্স; ১৯২৩ চেশায়ার রেজিমেন্ট; ১৯২৪ শেরউড ফরেস্টার্স; ১৯২৬ ডারহ্যাম এল আই; ১৯২৭ ইয়র্কস্ ও ল্যাঙ্কস রেজিমেন্ট; ১৯২৮ শেরউড ফরেস্টার্স; ১৯২৯-৩০ ইয়র্কস ও ল্যাঙ্কস; ১৯৩১ ডিভনসায়ার রেজি; ১৯৩২-৩৩ কিংস স্রপসায়ার এল আই; ১৯৩৪ বি কোম্পা সিগন্যালস; ১৯৩৫ বর্ডার রেজিমেন্ট; ১৯৩৬-৯ এড এস হাইলান্ডার্স; ১৯৩৭ বর্ডার রেজিমেন্ট; ১৯৩৮-৩৯ এস ডবলিউ বডায়ার্স; ১৯৪০ মহমেডান স্পোর্টিং; ১৯৪১-৪৯ কোন খেখলা হয় নাই। ১৯৫০ হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ; ১৯৫১-৫২ ইস্টবেঙ্গল।

এফ এ শীল্ড ফাইনালের পরিণাম

...সরের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের সম্পর্কে আমরা যেরূপ আশংকা ...লাম, ঠিক তাহাই দাঁড়াইয়াছে। ...ক এর কর্তৃপক্ষগণও আদালতে ...ঃ সাফাই গাহিবার জন্য রীতিমত ...ড় করিতেছেন। তিনজন বিশিষ্ট ... লইয়া এক উপসমিতি গঠিত ...। ইহারাই আইনজীবীদের সহিত আলোচনা করিয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ...কদের কিভাবে জব্দ করিতে পারা যায়, ... ব্যবস্থা করিবেন। দুর্ভাগ্য বাঙলার ... করিয়া বাঙলার ক্রীড়াজগতের যে এই অযাচিত অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব অবসান ... মত লোক কেহই বর্তমানে নাই। ...সেবিগণ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ... তিনিও নানারূপ ব্যাপারে এইরূপ ... যে এই দিকে একবারও ফিরিয়া ...বার সময় পাইতেছেন না। মন্ত্রী-...র মধ্যেও কেহ নাই যে, এইরূপ ...র সম্মুখীন হইতে পারে।

...খেলাধূলার প্রধান উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ ...। জীবনকে সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত অথচ সেই খেলার মাঠ দলাদলি, মারা-... চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার স্থান হইয়া ...। ইহাতে আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া ...ছি। অনেকে আশংকা করিতেছেন ...ী বৎসরে ফুটবল মরসুম একেবারেই ...হইয়া পড়িবে। এই আশংকা যে একে-...ঃ ভ্রান্তিমূলক তাহা নহে, তবে আমরা ...নার ফুটবল পরিচালকদের জানি ...রা নিজেদের স্বার্থের জন্যও নষ্ট হইতে ...ব না। কোন এক সভায় বহু বাগবিতণ্ডা ... হইলে, আই এফ এর সর্বময়কর্তা ...ত হতাশার সহিত উক্তি করিয়াছেন, ...চার খেলাধূলার দায়িত্ব শীঘ্রই গ্রহণ ...বেন, তখন অনেক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ...ত্ব থাকিবে না।" তাঁহার নিকট এই উক্তি ...দায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা খুবই ...ন্দিত হইব, যদি সরকার কেন্দ্রীয় স্পোর্টস ... গঠন করিয়া সকল খেলারধূলার পরি-...নার সংস্থার অস্তিত্ব লোপ করেন। এই ... প্রতিষ্ঠান দ্বারা উন্নতিকর কার্য হইতে ... না। ইঁহারা কেবল আছেন নিজেদের ...র্থসিদ্ধি করিতে দেশের বিভিন্ন খেলায় ...ড়াগিরি করিতে। ইংরাজ আমলে তোষা-...দের সাহায্যে ইহারা যে স্থান ...ধকার করিয়াছেন, তাহা হইতে বঞ্চিত ...তে চাহেন না বলিয়াই যত অপ-...র্বের সহায়ক হইয়া পড়িয়াছেন। ...তীয় জীবনের সহিত যাঁরা কোন দিন ...ড়ত ছিলেন না, তাঁহারা জাতীয় উন্নতি-...ক কোন কার্য করিবেন কি করিয়া? সেই-...া আমাদের মনে হয়, সারা দেশের ক্রীড়া-...দীদের উচিত আন্দোলন সৃষ্টি করা, যাহাতে সরকার ক্রীড়া সংস্থাসমূহের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। প্রত্যেক স্বাধীন জাতীয় সরকার ক্রীড়া সংস্থার কর্ণধার ও সেইজন্যই তাহাদের উন্নতির পথ সকল সময়েই উন্মুক্ত আছে। বাঙলা তথা ভারতে তাহা নাই বলিয়াই এই শোচনীয় অবস্থা।

দীর্ঘকাল পরে বাঙলা দেশে পুনরায় দীর্ঘদূর সন্তরণ অনুষ্ঠানের উৎসাহ দেখা দিয়াছে। তবে এই সকল অনুষ্ঠান যেভাবে ও যে সকল সাঁতারুদের লইয়া পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে বাঙলার সন্তরণের ভবিষ্যৎ উন্নতিতে সাহায্য না করিয়া চরম বিশৃঙ্খলার কারণ হইবে বলিয়াই আশংকা হয়। বিদেশে যে সকল দীর্ঘদূর সন্তরণ অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে কোন দিনই কোন দেশের কৃতী ভবিষ্যৎ উন্নতি হইবার যে সকল সাঁতারুদের সম্ভাবনা আছে, তাহাদের যোগদান করিতে দেখা যায় না। তাহা ছাড়া যোগদানের সুযোগ নাই। ঐ সকল দেশের সন্তরণ পরিচালকগণ প্রত্যেক সাঁতারুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ সজাগ। কিন্তু আমাদের দেশে সেইরূপ চিন্তা করিয়া বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার কেহই নাই। সকলেই আছেন হুজুগের উৎসাহে নিজেদের ভাসাইয়া দিয়া "নাম" কিনিবার তালে। অল্প দূরের সন্তরণে অভ্যস্ত সাঁতারুকে দীর্ঘ দূর সন্তরণে যোগদান করিতে দিলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ যে রুদ্ধ করা হয়, এই চিন্তা ইহাদের মনে একবারও উঁকি মারে না। ইহার উপর পরিচালকদের অত্যুগ্র পাণ্ডাগিরির মোহ এমনই অন্ধ করিয়া রাখে যে, প্রতিযোগিতা কিভাবে পরিচালিত হইল অথবা তাহাতে কোন বেআইনী কার্য হইল কিনা অথবা তাহার ফলে কোন সাঁতারু সাফল্য লাভ করিতে পারিল না কেন, তাহা দেখিবার জানিবার তাঁহাদের একেবারেই সময় নাই। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক দীর্ঘদূর সন্তরণ অনুষ্ঠানে কয়েকটা ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা প্রকৃতই পরিচালকদের অদূরদর্শিতার জন্য হইয়াছে, ইহা না বলিয়া আমরা পারি না। যাঁহাদের কোনদিন দীর্ঘদূর সন্তরণ অনুষ্ঠান সম্পর্কে এতটুকুও অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের অধিকার দান করাই অন্যায় হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা ঘটিলে খুবই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। আমরা আশা করি, বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণ এই বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিবেন।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ইহার অস্তিত্ব দীর্ঘকাল থাকিবে না, ইহা বহু পূর্বেই আমরা উল্লেখ করি, ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হয়, কিন্তু বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অবস্থা চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন, আমরা এতটুকুও বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া কিছু বলি নাই। প্রচুর অর্থ ও প্রচুর অবসর সময় ছাড়া এই খেলা চলিতে পারে না। যে দেশের প্রত্যেকটি লোককে অন্ন সংস্থান ও নিজ অস্তিত্বের কথা চিন্তা করিতে হয়, সেই দেশে এই খেলা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যত দিন রাজা মহারাজা ছিলেন ভারতের বহু ক্রিকেট খেলোয়াড় সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ হইবার সংগে সংগেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেশ বিদেশে অন্ন-সংস্থানের জন্য ছুটিতে হইতেছে। এইজন্যই এই বৎসরে বোম্বাইর তিনজন কৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড় এস পি গুপ্তে, ভি এল মঞ্জরেকার, ডি জি ফাদকারকে বাঙলার বিভিন্ন দলে যোগদান করিতে দেখা যাইতেছে। অন্যান্য যে সকল খেলোয়াড় আছেন, তাঁহারাও কে কোথায় মাথা গুঁজিবার স্থান পাইবেন, তাহার সন্ধান করিতেছেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা যখন সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এই খেলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব উচ্চ আশা পোষণ করা কি চলে। অনেকে বলেন, "কিং অফ গেমস" অর্থাৎ খেলার রাজা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির কথা চিন্তা করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া এই খেলা চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। খেলার প্রবর্তকগণ পর্যন্ত নিজ দেশে ইহার প্রচলন সমর্থনে পেশাদার বৃত্তি প্রবর্তন করেন, কিন্তু পেশাদারদের অর্থ দিবে কে, সেই চিন্তাই ইহাদের করিতে হইতেছে। অনেকেই ইহা স্বীকার করিবেন না জানি, কিন্তু যাহারা ভিতরের খবর রাখেন, তাঁহারা ইহা জানেন। সুতরাং এই খেলার জন্য ভারতে যাঁহারা বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতেছেন তাঁহাদের অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ হতাশ হইতে হইবে, এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট দল

ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের সহিত দিল্লীতে প্রথম বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক-মণ্ডলী নিম্নলিখিত খেলোয়াড়দের মনোনীত করিয়াছেন। এই মনোনয়ন যে ঠিক হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা কোন দিনই হয় নাই ও হইবেও না। সুতরাং এই বিষয় আলোচনা করাই নিরর্থক বলিয়া আমরা মনে করি। খেলোয়াড়গণ—পি উমরিগর (অধিনায়ক), এম এল আপ্তে, পি রায়, ভি এল মঞ্জরেকার, বিজয় হাজারে, সি ডি গোপীনাথ, জি এস রামচাঁদ, এন এম তামানে (উইকেট রক্ষক), অর্জুন নাইডু, গোলাম আমেদ ও এস পি গুপ্তে।

দ্বাদশ খেলোয়াড়—সি ডি গাদকারী। অতিরিক্ত—কে শ্রীনিবাশম, সূর্যনারায়ণ ও ডি গাইকোয়াড়।

ইহা ছাড়া পরে মি বোড়ে ও সুন্দরমকে আহ্বান করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৯ই নবেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার হৈমন্তিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। শিক্ষামন্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলারের কার্যকাল ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ছয়মাস বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করিলে বিরোধী পক্ষ হইতে উহাতে প্রবল আপত্তি জানাইয়া বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলারের বিরুদ্ধে চরম অযোগ্যতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয়দানের অভিযোগসমূহ উত্থাপিত হয়।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অদ্য ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার ছয়জন সদস্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ সাহায্য কমিশন গঠন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যথোপযুক্ত মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য কমিশন তত্ত্বাবধান করিবেন এবং দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেও উদ্যোগী হইবেন।

চন্দননগরের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জনমত নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীঅমরনাথ ঝা এই কমিশনের নেতৃত্ব করিবেন।

১০ই নবেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী এস কে বসু 'পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ বিল'টি উত্থাপন করেন। বিরোধী পক্ষ বিলটি সম্পর্কে আলোচনাকালে এইরূপ মন্তব্য করেন যে, জমিদারী উচ্ছেদ এই বিলের আদৌ লক্ষ্য নহে।

ভারত সরকার বিলাসপুর রাজ্যকে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য রাঁচি হইতে আট মাইল দূরবর্তী রামকৃষ্ণ নগরে রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা আরোগ্য নিকেতনে মহেশ ভট্টাচার্য ওয়ার্ড ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওয়ার্ডের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ও তাহার স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আদম সুমারী কমিশনার শ্রী আর এস গোপালস্বামী তাঁহার ১৯৫১ সালের আদম-সুমারী রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এবং কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, উহার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন।

১২ই নবেম্বর—অদ্য রাজ্য বিধান সভায় কলিকাতায় সাত আনা সের দরে রেশনের চাউল বিক্রয় সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরকালে খাদ্য-মন্ত্রী জানান যে, তাঁহারা এই চাউলের ভেজাল দূরীকরণের ভার বর্তমানে 'গৃহস্থদের শুভ বুদ্ধির' উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। খাদ্য মন্ত্রী আরও বলেন যে, সাত আনা সের দরে ইহার চাইতে ভাল চাউল পাওয়া যাইবে না।

১৩ই নবেম্বর—মহীশূরে মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর ডাঃ রামলিঙ্গ রেড্ডি আজ এক বিবৃতিতে বলেন যে, কুর্গের ১৮ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী ধনলক্ষ্মী অন্যান্য মানুষের মতই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি কখনই দীর্ঘদিন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করিয়া থাকেন নাই। তিনি কোন গোপন স্থানে অপরের অলক্ষিতে নিশ্চয়ই খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনের যে সমস্ত সংবাদ পাকিস্থানের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নয়াদিল্লীতে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে 'নামেদল ইণ্ডিয়া মুসলিম জমিয়ৎ' নামে একটি নূতন দল গঠিত হইয়াছে। পাকিস্থানের সংবাদপত্রসমূহ উক্ত সম্মেলনকে ভারত-বিরোধী প্রচারের মাধ্যমরূপে ব্যবহারের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে।

১৪ই নবেম্বর—অনুন্নত শ্রেণী কমিশনের চেয়ারম্যান কাকা কালেলকর অদ্য টিটাবরে (উত্তর আসাম) নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের নবম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী উদ্ভাবিত বুনিয়াদী শিক্ষানীতির রূপায়নে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট কিংবা রাজ্য গভর্নমেণ্টসমূহ কাহারও যথেষ্ট তৎপরতা নাই।

১৫ই নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু, পাকিস্থান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপন সম্পর্কে পাক গণপরিষদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, পাকিস্থান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইলে দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। পাকিস্থানের সংবিধান রচনায় সংখ্যালঘু সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ইহার ফলে পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তিনি তজ্জন্য অধিকতর উদ্বেগ বোধ করিতেছেন।

পাকিস্থান সরকার অদ্য করাচীর দৈনিক সংবাদপত্র 'ডন' এবং উহার সান্ধ্য সংস্করণ 'ইভনিং স্টার' পত্রিকার প্রতি যাবতীয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রচারিত একটি সরকারী ইস্তাহারে পত্রিকা দুইখানির বিরুদ্ধে "জন-স্বার্থবিরোধী" কার্যের অভিযোগ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৯ই নবেম্বর—সৌদি আরবের রাজা ইবন সৌদ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ রিচার্ড নিক্সন প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় একটি আক্রমণশীল ব্লক গঠনের ব্যাপারে ভারত, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়াকে জড়িত করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থকাম হইয়াছেন।

১০ই নবেম্বর—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার, স্যার উইনস্টন চার্চিল ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ জোসেফ লানিয়েল আগামী ৪ঠা হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বারমুডায় এক বৈঠকে মিলিত হইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

১১ই নবেম্বর—অদ্য তেহরাণে সৈন্যদল কর্তৃক মোসাদেক সমর্থক বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী চালনার ফলে দুই ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

১২ই নবেম্বর—ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ লানিয়েল অদ্য ফরাসী ঊর্ধ্বতন পরিষদে বক্তৃতাকালে দৃঢ়তার সহিত বলেন, ফ্রান্স কিছুতেই ইন্দোচীন ত্যাগ করিয়া আসিবে না।

অদ্য ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার ও পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ এক বৈঠকে মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করেন। প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানে কয়েকটি সামরিক ঘাটি প্রস্তুত করিতে চাহিতেছেন।

ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট এলপিডো কুইরিনো অদ্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মিঃ র‍্যামন ম্যাগসেসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন।

১৫ই নবেম্বর—যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো আজ এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, ত্রিয়েস্তের 'ক' এলাকা যেন কিছুতেই ইতালীকে অর্পণ করা না হয়। তিনি বলেন যে, উহার পরিণতি যে সংগ্রাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

াদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

ামিক গণতন্ত্রের স্বরূপ

মার্কিণ-প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ক্কার ভাষাতে জানাইয়াছেন যে, ক্স্থানকে সামরিক সাহায্য দেওয়া র্কে তিনি পাকিস্থানের গবর্ণর ারেলের সঙ্গে কোন আলোচনা করেন । পাকিস্থানের গবর্ণর-জেনারেল াম মহম্মদও বলিয়াছেন যে, আমে- কে পাকিস্থানে ঘাঁটি দেওয়া কিংবা র্নের সাহায্য লওয়া সম্বন্ধে কোন- আলোচনা হয় নাই। কিন্তু গোল য়া উঠিয়াছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্স্থানের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি ব্য লইয়া। পাকিস্থানের প্রস্তাবিত নতন্ত্র সম্বন্ধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উক্তি করিয়াছিলেন, করাচীতে সেজন্য কাভের সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্থানের র্র-জেনারেলও দুঃখ প্রকাশ করিয়া- । পণ্ডিত নেহরু পাক-শাসনতন্ত্রের কটি ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় এবং ন্ত্রবিরোধী বলিয়া অভিমত প্রকাশ ন, ইহাই অভিযোগের কারণ। ক্স্থানের গভর্নর-জেনারেল বলিয়া- . ইসলাম গণতান্ত্রিক ধর্ম। এই ধর্মের ীভূত তত্ত্ব উদার এবং অনুশাসন- হও উদারভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অস্বীকার করিলে ইতিহাস র্কেই নাকি ভুল সিদ্ধান্ত হয়। ধর্মের তত্ত্ব লইয়া ন প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করিতে া না; কিন্তু ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীর ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা স্বীকার করে ইতিহাসে এই সত্যও সুস্পষ্ট য়াছে। ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্মাব- ীদের সে ধর্মের বিধানে অধিকার ং মর্যাদা, ইসলামধর্মীয়দের উদারতার ভিত্তিতেই স্বীকৃত হয়। অন্য ধর্মা- বলম্বীরা ইসলামীয় রাষ্ট্রে জিম্মী। তাহাদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকা ইসলামের পক্ষে কর্তব্য এইমাত্র। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক অধি- কার, ঠিক এই বস্তু নয়। পাকিস্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্যের উদারতা কিংবা অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান অধিকার দাবী করেন এবং সেই দাবীর সম্বন্ধে ধর্মের কোন প্রশ্ন জড়িত করা হয়, ইহাও তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, তাঁহারা জানেন, ধর্মের সঙ্গে প্রশ্নটিকে জড়িত করিতে গেলেই সংখ্যা- গরিষ্ঠ দলের মনোভাব কার্যত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পাকের ভিতর গিয়াই পড়িবে, ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের গোঁড়ামির চাপে সংখ্যালঘু দলকে পিষ্ট হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকতার সংস্কারকে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন, এজন্য ধর্মগত সাম্প্রদায়িক সংস্রব হইতে মুক্ত করিয়া শাসনতন্ত্র সর্বজনীন মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হওয়া উচিত। পাকিস্থানের নিয়ামক- গণ যে এই সোজা কথাটি না বুঝেন, এমন নয়; কিন্তু সব বুঝিয়াও তাঁহাদিগকে ভাবের ঘরে চুরি চালাইতে হইতেছে। ইহার ফলে পাকিস্থানকেই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়িতে হইবে, আধুনিক উন্নতিশীল জগতে তাহার পক্ষে নানারূপ সমস্যা দেখা দিবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী সোজা সত্যটিই তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। সরলভাবে তাঁহার যুক্তি অনুযায়ী চলিলে পাকিস্থানেরই কল্যাণ ঘটিবে।

রেশনের চাউলের স্বরূপ

কলিকাতা এবং উপকণ্ঠবর্তী বাণিজ্য- প্রধান অঞ্চলে সরকারী রেশনের দোকান- গুলি হইতে যে শ্রেণীর চাউল সরবরাহ করা হয়, তাহার নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বিতর্কের কোন অবসর আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কিন্তু গত কয়েক- দিন ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই সম্পর্কে প্রচুর বাদবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। বিরোধিপক্ষ যতই বলিয়াছেন, ঐ শ্রেণীর চাউল মানুষের পক্ষে অখাদ্য, খাদ্যমন্ত্রী ততই দৃঢ়তার সঙ্গে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এ চাউল অখাদ্য নয়, তবে ইহার সঙ্গে কাঁকর- পাথর মিশ্রিত আছে, ইহা সত্য। খাদ্য- মন্ত্রী মহাশয়ের কাঁকর-পাথরেও আপত্তি নাই। তিনি গৃহিনীদিগকে কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া চাউল ঝাড়াই-বাছাই করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াই আত্মশ্লাঘা বোধ করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় চাউলের নিকৃষ্টতার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, এই শ্রেণীর চাউল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন হাত নাই। কারণ, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশ হইতে যে শ্রেণীর চাউল সরবরাহ

করা হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহাদিগকে লইতে হয়। বাড়তি চাউল বিক্রয়ের দোকানগুলিতে ভাল চাউল উপযুক্ত দাম দিলে রেশনের বিনিময়ে পাওয়া যাইত, শহরবাসীর পক্ষে ইহাতে কিছু বাঁচোয়া ছিল; কিন্তু সেদিন খাদ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকার হইতে লাইসেন্স লইয়া বাহির হইতে চাউল আনিয়া কলিকাতায় আমদানী করিবার ব্যবস্থা ৩১শে ডিসেম্বরের পর হইতে বন্ধ করা হইবে। ঐ তারিখের পর আর কাহাকেও লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। বস্তুত সরকারী রেশন ব্যবস্থার বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। নীতির ইহা এক নূতন খেলা। লাইসেন্স ব্যবস্থা এইভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের উপরে সম্পূর্ণরূপে অবিচার করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গ মফঃস্বল অঞ্চলে অপর্যাপ্ত চাউল থাকিতেও পশ্চিমবঙ্গকে বিভিন্ন রাজ্য হইতে অনেক ক্ষেত্রে অধিক মূল্য দিয়াও নিকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল ক্রয় করিতে হইবে, এ যুক্তির মূল্য আমরা বুঝি না। বিভিন্ন রাজ্যকে সাহায্য করাই এই ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য বোঝা যায়। ভিক্ষার চাউলের অবশ্য কাঁড়া আঁকড়া নাই; কিন্তু নিজের রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া অধিক মূল্য দিয়া অপর রাজ্য হইতে চাউল ক্রয় করিয়া সেই সব রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থ-সংরক্ষণের এই যে দায়িত্ব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং কলিকাতার রেশনভুক্ত অঞ্চলের হতভাগ্য অধিবাসীদিগকে নিকৃষ্ট পচা, দুর্গন্ধ, কোন কোন ক্ষেত্রে তিক্ত রস সমাযুক্ত অন্নই বা কেন অমৃতের মত মুখ করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য গলাধঃকরণ করিতে হইবে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বাঙ্গালী সমাজ এত বড় কি অপরাধ করিয়াছে, আমরা বুঝি না। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে পর্যাপ্ত চাউল থাকিতে অন্য রাজ্য হইতে অধিক মূল্য দিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর চাউল ক্রয় করিবার অধিকার ন্যায়ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সরকারের পক্ষে কর্তব্যবিমুখতাই প্রদর্শন করা হইবে। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

আইনসভার প্রতিনিধিদের দায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন আমডাঙ্গা থানার এলাকাধীন গদামারা হাটে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করিয়াছেন। রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার হৃদয়বান্ এবং জনগণের প্রতি সমবেদনা-সম্পন্ন পুরুষ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগ কি সত্য? রাজ্যপাল বলেন, দেশের লোককে বর্তমানে যদি পচা চাউল খাইতে হয়, রাজভবনের রন্ধনাগারে গেলে দেখিবেন, সেই চাউলের অন্ন সেখানেও পরিবেশিত হইতেছে। সুতরাং এক বিষয়ে পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের চাউল বণ্টনে এখন কোন বৈষম্য বরদাস্ত করা হয় না। কিন্তু সাধারণ লোককে যদি পচা চাউলই গলাধঃকরণ করিতে হয়, তবে তাহাদের এই নীতিকথায় সান্ত্বনা কোথায়? যাহারা ধনী, তাহাদের ভোজন-বিলাস যে সরকারী এই বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য অপূর্ণ থাকিতেছে এবং সাধারণ জনগণের জন্য তাহাদের সমবেদনাবোধ সম্প্রসারিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না। আইনসভার প্রতিনিধিদের কথা উল্লেখ করিয়া রাজ্যপাল বলেন, পূর্বে টাকার জোরে লোক ঠকাইয়া অনেকের পক্ষে আইনসভায় প্রবেশ করা সম্ভব হইত। এই সব ধনী আইনসভার আসন অধিকার করিবার পর নির্বাচকমণ্ডলী এবং দেশের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের কথা বিস্মৃত হইতেন; কিন্তু বর্তমানে দেশের লোকেরা নিজেদের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রতিনিধিদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন। আইনের দিক হইতে যুক্তিতে অবশ্য কোন ত্রুটি নাই; কিন্তু আইনসভার সদস্যপদ অধিকার করিবার পর, পূর্ববর্তী ধনীদের পক্ষে দেশের লোকের স্বার্থকে উপেক্ষা করিবার যে সুযোগ ছিল, বর্তমানে তাহার অভাব ঘটিয়াছে, একথা কেমন করিয়া বলা চলে? টাকার জোর আইনসভার বর্তমান সদস্যদের অনেকের না থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া পদ, মান ও প্রতিষ্ঠা লাভের প্রবৃত্তি হইতে তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন এবং দেশসেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, এমন প্রমাণ বা কোথায়? পক্ষান্তরে দেশসেবার দিক হইতে রাজনীতিক জীবন পূর্বে নৈতিক আদর্শ এবং ত্যাগের মহিমায় উন্নত ছিল, বর্তমানে তাহার অপহ্নব ঘটিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য দেশের লোকে সর্বদাই প্রস্তুত আছে। নিজেদের স্বার্থ না বুঝে তাঁহারা অনেকে নিরক্ষর হইলেও এতটা মূর্খ নয়; কিন্তু এদেশের রাজনীতিক সাধনার ধারা দেশের অন্তরের সংযোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই দুঃখের বিষয় এবং এ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব

সম্প্রতি আম্বালা শহরে নিখিল ভারত পুষ্টিকর খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে যথারীতি সুসম খাদ্য গ্রহণের জন্য দেশবাসীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সব আলোচনা গবেষণার বৈজ্ঞানিক মূল্য হয়ত কিছু আছে; কিন্তু পর্যাপ্ত খাদ্যেরই যেখানে অভাব সেখানে খাদ্যপ্রাণ প্রভৃতি যুক্ত খাদ্য গ্রহণে উপদেশ দেওয়ার কি সার্থকতা আছে, আমরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। বস্তুত খাদ্য যেখানে পর্যাপ্ত, সেখানে খাদ্য নির্বাচনের প্রশ্ন উত্থাপিত করা সেইখানেই শোভা পায়। পক্ষান্তরে যেখানে অধিকাংশ লোকের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য জোটে না, সেখানে খাদ্য নির্বাচনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা নিরন্ন দেশবাসীর প্রতি পরিহাসের মতই শোনায়। প্রকৃতপক্ষে প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস করাই প্রথম প্রয়োজন এবং সেগুলি যাহাতে সাধারণ লোকে ভেজালশূন্যভাবে পায়, তাহা করাই আগে দরকার।
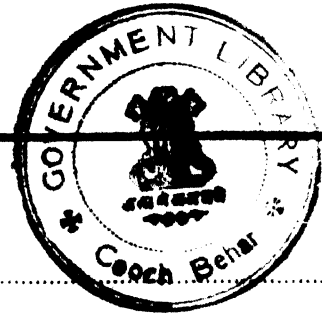
শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক পোস্টকার্ডে আঁকা এই দৃশ্যচিত্রটি ১৯১৯ সালের শান্তিনিকেতনের উত্তর প্রান্তের গোয়ালপাড়ার পথ। তালবনের মাথায় আষাঢ়ের নবীন মেঘের ঘনঘটা, পরিকীর্ণ দিগন্ত এবং প্রকৃতির সহজ সমারোহ এখন দালান-কোঠার আড়ালে চাপা পড়ে যেতে আরম্ভ করেছে।

আ-বাঁধা সমাজ

সুনীলচন্দ্র সরকার

১

বিছানা, ছাউনি, ঝাঁপে
তান্ত্রিক ফুৎকার কাঁপে,
করে উচাটনঃ—
গৃহের স্তবক ছিঁড়ে
ভেসে চ'লে এল ভিড়ে
মূর্তি, মুখ, মন।
তবু তো এখনো দেখি
উল্লিখিত হ'তে চায়
ঘরোয়া জটলা, ঝোঁক,
আকাঙ্ক্ষা, আওয়াজঃ
থামে গিয়ে অনিশ্চিতে,
বে-জরীপ এ জমিতে
পুরোণো ফুরোলো আজ।

২

খিদে ক্ষোভ ব্যাধি শোক
চোরাহাত, কাম-চোখ,
জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
এক অসম্ভব বা—তা
পুঁটুলি কম্বল কাঁথা
উঠেছে ফেনিয়ে!
কুলের, মূলের দাগ
মুছে সাফ হয়ে গেছে,
তবু দ্রুত বদলের
আ-বাঁধা সমাজ
ওদের উঠিয়ে কক্ষে
ছুটে চলে কোন লক্ষ্যে?
অচেনা টেনেছে আজ।

৩

দেখ কি নূতন চাপে
ওদের হৃৎপিণ্ড কাঁপে
প্রকাশ্য, অধীর,
ছেড়ে গ্রাম জমি জোত
আজ এই শ্রেণী-স্রোত
হয় পৃথিবীর;
নিরালা গাঁয়ের কোনো
চেনা পড়শীর ঘরে
এর এতটুকু হ'লে
দিত বুকে বাজ,
টানা দিগ্বলয়ে ঘেরা
সুন্দর মানালো এরাঃ—
নাটকে নেমেছে আজ।

৪

কড়া-ঠাঠ ট্র্যাজেডির
গম্ভীর সঞ্চার, মীড়,
এরা কি বা জানে,
দু' এক টঙ্কারে শোকে
বেয়াড়া বেসুরে ঝোঁকে,
ছেঁড়ে তিন টানে।
এরা যাকে চেনেও না
সেই বেদনার ব্যাধ
আজ বেরিয়েছে পথে
দিগ্বিজয়ী সাজ,
জেনে নয়, মেনে নয়,
এরা তারি তল্পী বয়ঃ
ঘটনা টেনেছে আজ।

৫

অতি বৃদ্ধ ইতিহাস
ছেড়েছে শয্যার আশ
ওঠে জোড় করে,
গূঢ় উদ্বেগের ধাঁজে
না-শোনা দামামা বাজে
সহরে সহরে।
তবু কারা প্রাণপণে
রশি ধ'রে বসে থাকে
দেগে দেগে পাকা করে
প্রত্যহের কাজ,
মেতে থাকে তুচ্ছতায়,
মানে না মনের রায়ঃ—
ঘটনা টেনেছে আজ!

৬

কবির কণ্ঠের দান
কাল বৈশাখীর গান
আজ পড়ে মনে,
তাই খুলে নিজস্বের
পেটীগুলি দেব এর
ভঙ্গুর চরণে।
উঁচু পাড়ে উঠে থাকা,
উঁচু হাতে কেড়ে রাখা
নিরালার কারুকলা,
আলাদা মেজাজ,
কামনা-কন্যারা সবে
বন্যায় লুণ্ঠিত হবে
ঘটনা টেনেছে আজ!

৭

কে খেয়েছে কালকূট,
হৃদয়ধনের লুট
সয়েছ নীরবে,
আহা, কে পড়েছে ভেঙে,
কে ছুটেছে চোখ রেঙে
শাসাতে ভৈরবে!
এ যে যুগান্তের ঝড়,
বহু জঞ্জালের সাথে
অনেক অমূল্য ধন
ছড়াবে দরাজ,
আহত বনের মত
আমাকে করেছে নতঃ—
ঘটনা টেনেছে আজ!

...কিস্তানের গভর্নর জেনারেল
... লণ্ডন থেকে এক বিবৃতিতে
...ন যে, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্ত-
মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি সম্পাদনের
কথাবার্তা চলছে ব'লে যে-সব সংবাদ
... বেরিয়েছে সেগুলি ভিত্তিহীন।
... নবেম্বর দিল্লীতে সাংবাদিকদের
পণ্ডিত নেহরু এ বিষয়ে যে মন্তব্য
... তার জন্য শ্রী গোলাম মহম্মদ
... উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তিনি
...ন যে, পণ্ডিত নেহরু এ বিষয়ে
...ত্য নির্ধারণের চেষ্টা না ক'রেই
...তামত প্রকাশ করেছেন। শ্রী গোলাম
... বলেছেন, এ ব্যাপারটা অবশ্য
... কিন্তু তা ব'লে বাইরের লোক
...স্তানের ঘরোয়া ও বৈদেশিক ব্যাপারে
ব'লতে আসবে, এটা পাকিস্তান
করবে না।

...য়াশিংটনে মার্কিন সেক্রেটারী অব
... শ্রীডালেস বলেছেন,—রয়টারের
...র্টে তাঁর নিজের ভাষা উদ্ধৃত
—বর্তমানে আমেরিকা পাকিস্তানে
...ন ঘাটি স্থাপনের জন্য অথবা
...স্তানকে সামরিক সাহায্য দানের
... চুক্তি সম্পাদনের আলোচনা চালাচ্ছে
... প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের
...দিক বৈঠকে প্রশ্নটা উঠ্‌লে তিনি
... বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন
...াষ্ট্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করার
...রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন কিছু
... না যা'তে পাকিস্তানের প্রতিবেশী
...দের মধ্যে চাঞ্চল্য বা হিস্টিরিয়া সৃষ্টি
... বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত বক্রোক্তিটি
...তর প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশেই করা
...ছে। একটা কাজ করতে করতে বাধা
... যেমন লোকে চটে যায়, শ্রী আইজেন-
...য়ারের কথার ভাব অনেকটা সেইরকম
হয়।

যাই হোক, এই তিনজনের কথা
...য়ে পড়লে বড়ো জোর এইটুকু ধরা
... পারে যে, চুক্তি সম্পাদন অত্যাসন্ন
চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী
...থায় কথাবার্তা যতদূর এগুনো
...র ততদূর এগোয়নি। কিন্তু কোনো
...বার্তাই যে হয়নি বা এখনো হচ্ছে না,

তা' মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে ভারত গভর্নমেণ্টের উদ্বেগ যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা'তে কিছু করার আগে ভারত গভর্নমেণ্টকেও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত করার প্রয়োজন আমেরিকা বোধ করবে। এই ব্যাপারের পরিণতি কোন্ কোন্ দিকে হ'তে পারে তার আলোচনা গত সপ্তাহের "বৈদেশিকী"তে কিছুটা করা হ'য়েছে। মোটের উপর, আশংকার কারণ কিছুই কমে নি; তা কমাতে হ'লে ভারত-বর্ষকে বৈদেশিক সাহায্য-নিরপেক্ষ আত্ম-নির্ভরশীলতার নীতির অনুশীলনে অধিকতর মনোযোগী হ'তে হবে।

* * *

আগামী সপ্তাহের শেষের দিকে বেরমুদায় তিন প্রধানের বৈঠক আরম্ভ হবে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট এবং বৃটিশ ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রীদের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে পৃথিবীর বিশেষ কী কল্যাণ হবে বুঝা যাচ্ছে না। এক দলের মত এই যে, চার প্রধানের অর্থাৎ উপরোক্ত তিনজন এবং সোভিয়েট প্রধান-মন্ত্রী ম্যালেনকভের সাক্ষাৎ আলোচনা হ'লেই পৃথিবীর ঝগড়াঝাঁটি মিটবার পথ হবে। আবার ম্যালেনকভের স্বদলের মত হ'চ্ছে যে, চারে কুলাবে না, পাঁচ চাই, অর্থাৎ কম্যুনিস্ট চীনের কর্তাকেও ডাকতে হবে। মজা হচ্ছে, যে-সব দেশকে "Great Power" ব'লে গণ্য করা হ'চ্ছে না তাদের নেতাদের মধ্যেও অনেকে এই তিন, চার অথবা পাঁচ চাঁইয়ের মিলনের জন্য উদ্‌গ্রীব, যেন এ'দের মধ্যে ভাব অর্থাৎ একটা ভাগাভাগি হ'লেই পৃথিবীতে চিরশান্তি ও চিরকল্যাণ নেমে আসবে! গত মহাযুদ্ধের সময়ে বড়ো-কর্তাদের মধ্যে যে-সব সাক্ষাৎকার ও চুক্তি হয়েছিল সেগুলির ফল কি পৃথিবীর

পক্ষে অবিমিশ্র শুভকর হয়েছে? পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও শান্তি এই তিন চার অথবা পাঁচজন রাজনৈতিকের খুশমেজাজী বার্তাচিতের অপেক্ষায় রয়েছে, একথা কল্পনা করতে মানুষের লজ্জাবোধ হয় না, এইটাই আশ্চর্য।

* * * *

একটি আন্তর্জাতিক নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে সুদানে নির্বাচন-পর্ব আরম্ভ হয়েছে। (এই কমিশনের চেয়ারম্যান হচ্ছেন ভারতের ইলেক্শন কমিশনার ডক্টর সুকুমার সেন)। নির্বাচনে ভোটার হচ্ছে সুদানীরা কিন্তু দ্বন্দ্বটা হচ্ছে বৃটিশ ও মিশরীয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে। নির্বাচনের প্রধান "ইস্যু" হচ্ছে, সুদান সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'তে চায়, অথবা মিশরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে থাকতে চায়। মিশরীয় গভর্নমেণ্ট চায়, সুদান মিশরের সঙ্গে যুক্ত হোক। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চায়, সুদান সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিক। বলা বাহুল্য, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আশা "সম্পূর্ণ স্বাধীন" সুদানে বৃটিশ স্বার্থ বজায় থাকবে। সুতরাং সুদানের নির্বাচনে ভোট দিচ্ছে সুদানীরা কিন্তু তাদের পিছনে দুদিক থেকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও মিশরীয় গভর্নমেণ্ট যে-যার কেরামতি দেখাচ্ছেন। মিশরের পক্ষপাতী দলের শক্তি যোগাচ্ছেন মিশরীয় গভর্নমেণ্ট এবং "সম্পূর্ণ স্বাধীনতার" পক্ষপাতী দলের পিছনে আছেন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট। এ অবস্থায় যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের অভিযোগ হচ্ছে যে মিশরীয় সরকার নানাভাবে নির্বাচনে সুদানীদের স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিচ্ছেন, অন্য পক্ষে মিশরীয় গভর্নমেণ্ট বলছেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যে দলকে খাড়া করেছেন তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে বৃটিশ কর্মচারীরা নানারকম জবরদস্তি শুরু করেছে যা'তে স্বাধীন নির্বাচন অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। দু'টি প্রদেশে নির্বাচন বন্ধ ক'রে দেয়ার জন্য মিশরীয় গভর্নমেণ্ট ইলেক্শন কমিশনকে অনুরোধ পর্যন্ত করেছেন, তবে কমিশন সে-অনুরোধ রাখেন নি। এ অবস্থায় নির্বাচনে যে-পক্ষেরই জয় হোক না কেন, অপরপক্ষ বলবে, নির্বাচন ঠিকভাবে হয়নি। তবে ইলেক্শন কমিশন যদি নির্বাচন চালিয়েই যান তাহ'লে নির্বাচনের ফল যাই হোক্, তা উভয়পক্ষকেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। সুদানের নির্বাচনপর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ ও মিশরীয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে সুয়েজ সম্পর্কে আলোচনা একরকম স্থগিত হ'য়ে আছে। সুদানের নির্বাচনে কোন্ পক্ষের জয় হ'লে সুয়েজ সমস্যার সমাধান অধিকতর সহজ হবে, তা বুঝা যাচ্ছে না। হয়ত যে-পক্ষই জিতুক তাতেই মুশকিল আরো বাড়বে; কারণ, যে-পক্ষ হারবে তারই মনোভাব আরো একটু বেশি অনমনীয় হবার সম্ভাবনা।

* * *

ফিলিপিনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে শ্রী কুইরিনো পরাজিত হয়েছেন। বিরোধী দলের (ন্যাশনালিস্ট পার্টি) প্রার্থী শ্রী র‍্যামন ম্যাগসেসে (Ramon Magsaysay) বহু ভোটাধিক্যে তাঁকে পরাজিত করেছেন। গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফিলিপিন যখন জাপানীদের দ্বারা অধিকৃত হয় তখন শ্রী ম্যাগসেসে গেরিলা যুদ্ধের নেতা হিসাবে খুব খ্যাতিলাভ করেন। সরকারী শাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করবেন, এই "ইস্যু"তে তিনি নির্বাচন লড়েছেন। ফিলিপিনের সরকারী দুর্নীতির কুখ্যাতি যে আদৌ অতিরঞ্জিত নয়, জনসাধারণ যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল শ্রী ম্যাগসেসের জয়লাভে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রী কুইরিনোর নিজের ব্যক্তিগত "রেকর্ড" যাই হোক্ না কেন, তাঁর আমলে সরকারী শাসনের যে অবস্থা হ'য়েছিল এবং শত শত কোটি ডলারের মার্কিন সাহায্যের যে-দারুণ অপচয় ও অপহরণ চলছিল, তাতে শেষ পর্যন্ত মার্কিন গভর্নমেণ্টও চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলেন। শ্রী ম্যাগসেসের নির্বাচনে বোধ হয় ওয়াশিংটনও খুশি হয়েছে।

২৫।১১।৫৩

এক মৃত্যু

আনন্দ বাগচী

আকাশ মৃত্যুরই মত নীল হয়ে আছে
দূরে কিংবা মেঘটার কাছে।
সূর্যস্বর ভেঙ্গে গেছে দিনান্তের মলিন মলাটে
পশ্চিমের ঘাটে ...
সময়ের সূর্যাস্ত এখন!
বাতাসেরও বিগত যৌবন,
কাঁপে না গাছের পাতা, পাখীর ডাকের মত মন্থর খুশীতে
এই এক দিগন্তের শীতে
ঘাসের ফড়িং কাঁদে পাণ্ডুবর্ণ রৌদ্রের ললাটে;
কান্না তার ঝিঁঝিঁর মতোন পায়ে হাঁটে!

আকাশ-গঙ্গার মত দিন,
-কোথায়? কোথায় গেল পাতাঝরা ফাগুন রঙিন?
সেইসব দিন নেই। নাম পার হলো তেপান্তর
অচ্ছুৎ মাঠের দিন, ঘাস, রোদ, বাতাসী প্রহর।
সে-বসন্ত নাই থাক, অতলান্ত বিস্মৃতির ফাঁকে
কথার ঝিনুকে খুঁজি মুক্তির মাণিক্য যদি থাকে।

ঝিনুক ঝিকিয়ে ওঠে কথার আস্বাদ ভালো লাগে,
মহুয়া-মুখের নাম যদি থাকে গাঢ় অনুরাগে!

শ্রীনন্দলাল বসু

সুশীল রায়
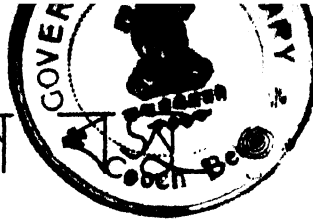
[আ]গামী ৩রা ডিসেম্বর শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর সত্তর বৎসর হবে।

[আ]মাদের কলরব-কোলাহলের সংসারে [এ]ক সময় এমন একজন মানুষ [আবি]র্ভূত হন, যিনি নিজেকে এইসব [কোলা]হল থেকে সরিয়ে পরমনির্বিকার-[ভাবে] নীরবে দিনযাপন করতে পারেন। [তপো]বন তপস্যার উপযুক্তই উপবন; [কিন্তু] পৃথিবীর এই কোলাহলের [মধ্যে] ব'সেও যিনি তপ করতে পারেন, [তাঁকে] কেবল তপস্বী বললেই সব বলা [হয়] না। আমাদের এই প্রলোভনে-ভরা [পৃথি]বীতে নির্লোভ ও উদাসীন মানুষের [অভাব] আছে। সে অভাব পূরণ করার [জন্যে]ও মাঝে মাঝে এক-এক জন আশ্চর্য [মানু]ষের আবির্ভাব ঘটে—যিনি সব [কিছু]কে উপেক্ষা ক'রে নিজের মনে [নিজে]র চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজের [কাজ] ক'রে যান; সে কাজের দিকে পাঁচ-[জনে]র দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক বা না হোক, [সেদি]কে ভ্রূক্ষেপ তাঁর নেই। যখন পাঁচ-[জনে] নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রচারের জন্যে [উদ্]যোগে রত হন, তখন এই নির্বিকার [মানু]ষটি আপন মনে বসে বসে নিজের [মনের] কাজ করে যান, নিজের মনের [তৃপ্তি]টাকেই তিনি নিজের কৃতিত্বের [পুরস্কার] ব'লে মনে করেন। এই মানুষ [সর্বদা]ই স্তব্ধ ও মৌন—নিজেকে নিয়েই [তিনি] বিভোর। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে [তাঁর] মনের প্রকৃতির আশ্চর্য রকম [মি]লি, তাই জনতার থেকে নিজেকে [দূরে]ত রেখে দিয়ে তিনি প্রকৃতির [সাধ]্যা করেন। এমনি এক অদ্ভুত মানুষ [হলে]ন শিল্পী নন্দলাল—শ্রীনন্দলাল

রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তি-[নিকে]তন এই শিল্পীর মনের উপযোগী [স্থান], তাঁর জীবনের এটা যেন শান্তির [নিকে]তন। ১৯২১ সাল থেকে নন্দ-লালের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিবিড় আত্মীয়তা। এই স্থানটিকে তিনি যেন পেয়েছেন তাঁর আত্মার আত্মীয়রূপে। এখানকার নিভৃত পরিবেশ, উদার নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, শালতালতরু-শ্রেণী, এবং গ্রাম-ছাড়া রাঙামাটির পথ শিল্পীর মনকে যেন একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির দুলাল নন্দলাল এই মনোরম পরিবেশে ব'সে মনের খুশিতে চর্চা করে চলেছেন শিল্পের। এই নিভৃত নিকেতনের সীমানা অতিক্রম ক'রে তাঁর খ্যাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কিন্তু তবুও তিনি নীরব, তিনি মৌন। নিজের খ্যাতি সম্বন্ধেও যেন উদাসীন। আপন মনে তিনি ধ্যান করে চলেছেন। কিসের এই ধ্যান? শিল্পের প্রতি তাঁর সমস্ত হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় প্রণত হয়ে আছে, দু-চোখে সেই বিনীত নমস্কারের ছায়াই যেন ধ্যানের রূপে দেখা দেয়।

কথা বলেন খুব কম, স্বভাব অত্যন্ত লাজুক, অচেনা কারো সঙ্গে দেখা হলে সংকোচে জড়িত হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের কথা তাঁর কাছে থেকে জেনে নেওয়া এই জন্যে সহজ নয়।

অভিমানহীন আড়ম্বরহীন একটি অতি সহজ জীবন যাপন করে চলেছেন নন্দলাল। আমাদের কলকোলাহলে ভরা পৃথিবীর সামান্যতম ছায়া এসে পড়ে নি তাঁর জীবনে কিংবা কর্মে। তিনি যেন নিসর্গেরই নন্দন, এবং এই নিসর্গই যেন তাঁর কাছে ভূস্বর্গ। এইজন্যেই তাঁর ধ্যানী মূর্তি দেখে মনে হয়, তিনি বুঝি স্বর্গসুখে বিভোর হয়ে আছেন। বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর উদাসীনতার কারণ সম্ভবতঃ এই।

বলা যায়, তুলির শিক্ষা তাঁর আছে, বুলির শিক্ষা নেই। মুখে তাই কথা নেই, কিন্তু তাঁর তুলি তাঁর হৃদয়ের অজস্র কথা অনবরত ব'লে চলেছে। ভারতের চিত্রকলার উৎকর্ষসাধনে তাঁর দানের কথা ভারত তাই কখনো বিস্মৃত হবে না। তিনি কেবল ভারতের শিল্পী নন, তার চেয়ে বড় কথা—তিনি একজন ভারতীয় শিল্পী। ভারতের আত্মার বাণী তাঁর নিজের হৃদয়ের বাণী হয়ে তাঁর তুলির রেখায় মুখর হয়ে উঠেছে। এইজন্যে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে।

স্কুল-কলেজে পড়ার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে নন্দলাল আদৌ বিদ্বান নন্, যেমন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। তিনি এফ এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর কলেজের পাঠ ত্যাগ ক'রে তিনি শিল্প-সাধনার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

নন্দলালের জন্ম মুঙ্গের-খড়্গপুরে। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ১৮ই অগ্রহায়ণ (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর)। এখানে তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু খাল-খননের কাজের পরিদর্শক ছিলেন। এই সময় শ্রীরাজশেখর বসুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা স্টেটের নায়েব। কিছুদিন পরে চন্দ্রশেখর বসুর সুপারিশে নন্দলালের পিতা দ্বারভাঙ্গা রাজস্টেটের স্থপতি নিযুক্ত হন। নন্দলালের জননী ক্ষেত্রমণিও ছিলেন সুরুচিসম্পন্না—নকশীকাঁথা সেলাইয়ে তিনি ছিলেন নিপুণা; খয়েরের পুতুল, মিষ্টান্নের ছাঁচ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতেন।

বালক নন্দলালের জীবনে পিতার ও মাতার প্রভাব পড়ে। তার উপর সে সময় তিনি একটা উন্মুক্ত উদার পরিবেশ লাভ করেন—দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে ও সীমাহীন সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে তাঁর জীবন বিকশিত হয়ে উঠবার জন্যে ব্যাকুল হয়। তিনি নিবিষ্ট মনে বসে বসে কুমোরদের মূর্তি-রচনার কাজ দেখতেন; দেখতেন এক-এক পিণ্ড মাটি কেবল আঙুলের চাপের কারসাজিতে কিভাবে এক-একটা আকার লাভ করছে। নন্দলালও কাদা নিয়ে বসলেন। কুমোরদের দেখাদেখি মূর্তি গড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁর হাতের মাটির ডেলা সত্যিই একটা মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে উঠল। বালক নন্দলাল সম্ভবতঃ নিজের হাতের কাজ দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। উত্তরজীবনে সামান্য এই মাটির কাজ যে খাঁটি শিল্পের পথ ধ'রে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, একথা হয়তো তখন তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মনকে তিনি চিনেছিলেন; চিনেছিলেন যে, এ মন ধরাবাঁধা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাবার মন নয়; এ মন একটা বেআড়া মন; সোজা আর সহজ পথ ধ'রে যাবার চেয়ে বাধা আর সাধনার পথ ধ'রে চলাতেই এর টান।

দ্বারভাঙ্গাতেই তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। সেখান থেকে তিনি যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর বয়স ষোলো। এখানে এসে তিনি ভর্তি হলেন সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে। স্কুলের ছাত্র তিনি, কিন্তু পুঁথির পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মন নেই, তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যত্র। সংস্কৃত পাঠ্যবইয়ের ব্যাকরণ জানার চেয়ে সেই বইয়ের গল্পের পাশে চিত্র-রচনাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। এখান থেকে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি। এনট্রান্স পাশ ক'রে তিনি মেট্রোপলিটনে (বিদ্যাসাগর কলেজে) ভর্তি হলেন। কিন্তু এফ এ পাশ করা আর হয়ে উঠল না। কী ক'রে হবে। পাঠ্য কেতাবে তাঁর মন কিছুতে বসত না। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার পাশে রঙিন চিত্রভাষ্য রচনা করতেন বসে বসে। চিত্র-সংবলিত তাঁর এই বইটি পরবর্তী কালে বিলেতে রোদেনস্টাইনের কাছে নাকি পাঠানো হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের উপযুক্ত চিত্রই সম্ভবত হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

এফ এ তিনি দু'বার ফেল করেন। অভিভাবকরা স্থির করলেন, তাঁকে অন্য কোনো বিষয়ে পড়ানোই ভালো। চিরাচরিত পাঠে তাঁর হয়তো মন বসছে না। তাই তাঁকে ডাক্তারি পড়ানের জন্যে চেষ্টা করা হল, কিন্তু কলেজে ভর্তি করানো সম্ভব হল না। অগত্যা, অন্য দিক দেখতে হল। নন্দলালকে ভর্তি করা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগে।

বাণিজ্যে নাকি লক্ষ্মী বাস করেন। লক্ষ্মীর আরাধনা করার অভিপ্রায় ছিল না নন্দলালের। তাই বাণিজ্য তাঁর মনে ধরল না। যাঁর চোখের ইশারা তিনি অনেক আগেই পেয়ে গেছেন, তিনি অন্য আর এক দেবী। মনে মনে হয়তো এতদিন নন্দলাল এঁরই উদ্দেশে বলে গেছেন—

যদি এতটুকু পাই ওই আঁখি-ইশারা
হব নিমেষেই নির্ঘাৎ লক্ষ্মীছাড়া।

অর্থকারী বিদ্যার নিকেতন ত্যাগ ক'রে তিনি অনর্থকারী বিদ্যার প্রতি ধাওয়া করলেন।

বাণিজ্য-কলেজের পাঠের জন্যে বই কেনার টাকা অন্যভাবে ব্যয় হতে লাগল। তিনি নানা শিল্পীর ছবি সম্বলিত সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন সেই টাকা দিয়ে পুরনো বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে। র‍্যাফায়েলের ও রবি বর্মার ছবি অনেক সংগ্রহ করলেন। তিনি ঠিক করলেন, বাণিজ্য-ক্লাশ ছেড়ে দিয়ে আর্ট স্কুলে গিয়ে ভর্তি হতে হবে।

নন্দলালের পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র। নন্দলাল তাই তাঁর এই ভ্রাতার কাছ থেকে অঙ্কনের দু-একটা পদ্ধতি শিখতে লাগলেন বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকী স্বভাবের কথা এবং অমায়িক ব্যবহারের গল্পও তিনি শুনেছেন। অবনীন্দ্রনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর মনের মধ্যে স্তূপ হয়ে জমে উঠেছে; এমন সময় একদিন তিনি সত্যেন বটব্যাল নামে আর্ট স্কুলের এক ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখে।

-"পড়াশুনোয় কিছু হল না বুঝি?
এসেছ ছবি আঁকা শিখতে?"
ীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম
ণ।

ই তিরস্কার কৃত্রিম, নন্দলাল তা
পারলেন। তাই স্থির হয়ে
ন তিনি। আর্ট স্কুলের ভাইস-
পাল অবনীন্দ্রনাথ। তিনি নন্দ-
নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।
সা করলেন, লেখাপড়া কতদূর করা
। এনট্রান্স পাশ শুনে তার
ফকেট দেখতে চাইলেন।
র্টিফিকেট তাঁর কাছে ছিল না।
চেষ্টার আর তদ্বিরে তা উদ্ধার
এবং সেই সংগে নিজের আঁকা
াণ্ডিল ছবি নিয়ে নন্দলাল চললেন
স্কুলে। নিজের আঁকা ছবির মধ্যে
টা তাঁর মৌলিক আঁকা ছবি,
টা বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবির
। আর্ট স্কুলে গিয়ে তাঁকে মুখো-
দাঁড়াতে হল প্রিন্সিপাল হ্যাভেলের।
ল ছবিগুলি দেখতে চাইলেন।
করা ছবিগুলি পছন্দ হল না
লের, তিনি ঐ গাদা থেকে বেছে
করলেন নন্দলালের মৌলিক ছবির
—মহাশ্বেতা। এই অংকন দেখে
হলেন প্রিন্সিপাল। তবুও রেহাই
তাঁকে পরীক্ষা করা হল। মন থেকে
ত বলা হল একটা ছবি। নন্দলাল
লেন সিদ্ধিদাতা গণেশ।
ছবিটা অবনীন্দ্রনাথকে দেখতে দেওয়া
অবনীন্দ্রনাথ জানালেন হাত পাকাই
। এর ফলে সিদ্ধি লাভ করলেন
াল। এটা হল তাঁর সিদ্ধিলাভের
সোপান। তিনি যেন তাঁর যশের
রের একটি ধাপ উঠে এলেন সেই
নন্দলাল ভর্তি হলেন আর্ট স্কুলে।
এনট্রান্স পাশ করার পরের বছরই
ালের বিবাহ হয়। জামাতার এইরূপ
ছাড়া কাণ্ড দেখে শ্বশুরকুল
লত ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যে
শিখলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ
নে অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা
র সম্ভাবনা আছে, সেই পথ পরি-
করে নন্দলাল কিনা একটা
চীন পথের যাত্রী হলেন! কিন্তু
র দুশ্চিন্তায় সান্ত্বনা দেবার ভাষা
নন্দলালের জানা ছিল না। তিনি তখন তাঁর অশান্ত জীবনকে প্রবোধ দেবার পথ পেয়ে গেছেন—এইটেই তাঁর কাছে তখন বড় কথা। তিনি তাঁর জীবনের সাধ মেটাবার জন্যে নিজেকে নিয়ে তখন ব্যস্ত।

নন্দলাল কিছুদিন ডিজাইনের ক্লাশে শিক্ষা লাভ ক'রে সরাসরি এসে গেলেন অবনীন্দ্রনাথের ক্লাশে। এ ক্লাশের আবহাওয়াই ছিল আলাদা। শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল না, ছিল বন্ধুর সম্পর্ক। গল্পের আনন্দের ও বৈঠকের মধ্যে দিয়ে নন্দলালের শিল্প-শিক্ষা চলতে লাগল। নন্দলাল ক্রমশঃ কয়েকটি চিত্র আঁকলেন— শরাহত মরাল-ক্রোড়ে শোকার্ত সিদ্ধার্থ, সতী, শিব-সতী, জগাই-মাধাই, কর্ণ, নটরাজের তাণ্ডব, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি।

ভগিনী নিবেদিতা এই সময় এক-দিন আর্ট স্কুলে এসে তরুণ শিল্পীর সংগে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর শিল্পের সংগেও। নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র দেখে নিবেদিতা অভিভূত হন এবং তাঁর চোখে চিত্রের মধ্যে যা ত্রুটি বলে তাঁর বোধ হয়েছিল অকপটে তা উল্লেখ করেন। নন্দলালের ছাত্রাবস্থায় আঁকা উপরোক্ত ছবি উত্তরকালে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর তুলি প্রথম অবস্থা থেকেই তাঁর বশে ছিল কতখানি। নন্দলালের মন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় মন, এতে আর সন্দেহ কি। তাঁর চিত্রের বিষয়-নির্বাচন থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

নন্দলাল আর্ট স্কুলে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই সময় স্কুল থেকে বৃত্তিও লাভ করেন।

নন্দলালের আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ছেড়ে যান। পার্সি ব্রাউন তখন প্রিন্সিপাল, তিনি নন্দলালকে আর্ট স্কুলেই শিক্ষকর্তার কাজ নিতে অনুরোধ করেন। ওদিকে অবনীন্দ্রনাথ অনুরোধ পাঠালেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে চিত্রাঙ্কন করার জন্যে। অবনীন্দ্রনাথের আহ্বান এড়ানো অসম্ভব। ছাত্র এসে উপস্থিত হলেন গুরুর পার্শ্বে। বছর তিন নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে এখানে ছবি আঁকায় রত থাকেন। এই সময় নন্দলাল ভগিনী নিবেদিতার **Indian Myths and Hindoos and Buddists** বইয়ের চিত্র অংকন করেন।

যে ভারতীয় সাহিত্যের ও পুরাণ-কাহিনীর দ্বারা তাঁর মন আছন্ন, এবং যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর চিত্রে, এবার নন্দলাল বহির্গত হলেন সেই ভারত-সন্দর্শনে, ভারতভ্রমণে। ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত শিবসতী চিত্রটি প্রদর্শিত হবার পর তিনি পুরস্কার স্বরূপে পেলেন পাঁচ শ টাকা। সেই টাকা তিনি ব্যয় করলেন সৎকাজে। পাটনা, গয়া, কাশী, আগ্রা, দিল্লি, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থান ঘুরে তিনি ভারতীয় শিল্প-কীর্তির সংগে চাক্ষুষ পরিচয় ক'রে মনের ঐশ্চর্য বাড়িয়ে এলেন। তারপর পুনরায় গেলেন দক্ষিণ ভারতে, তারপর কোনারকে। সারা ভারত ঘুরে তিনি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতি ও শিল্পকীর্তি দেখে মনের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তুললেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। সম্ভবত সেটা ১৯১০ সাল। বিলেত থেকে বৃদ্ধা লেডি হেরিংহ্যাম এলেন ভারতে। অজন্তা গুহাচিত্র নকল করার জন্যে। ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে তরুণ শিল্পী তাঁর সংগে গেলেন এই কাজের সহকারীরূপে। এইখানে এসেই নন্দলালের ভারতীয় মন যেন একটা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করল, এবং তাঁর মন ভারতীয় ধারার সংগে নিবিড় পরিচয়ে পরিচিত হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল।

এর পর নন্দলাল করেন আর একটি কাজ। ১৯১৯ সালে আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের আহ্বানে তিনি বসুবিজ্ঞান মন্দির অলংকৃত করেন মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত ক'রে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩২১-এর বৈশাখে) নন্দলাল সর্বপ্রথম যান শান্তিনিকেতনে। সেখানকার নিভৃত পরিবেশটি দেখে তাঁর মন অভিভূত হয়। কিন্তু তিনি তখন সেখানে থাকার জন্যে যান নি। পরে একদিন জোড়াসাঁকোয় বসে নন্দলাল যখন অংকনে রত ছিলেন, তখন

পিছন থেকে এসে রবীন্দ্রনাথ স্বস্নেহে তাঁকে শান্তিনিকেতনের সাধন-কেন্দ্রে যাবার জন্য বললেন। কবির আহ্বানে নন্দলাল রাজি হলেন, তিনি শান্তি-নিকেতনে গেলেন। তখন সেখানে কলা-ভবন গড়ে উঠেছে। নন্দলাল সেখানে গিয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু কলকাতায় তখন অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন সোসাইটী বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যকে ডেকে নিলেন এই কাজে। নন্দলালকে ছাড়তে হল ব'লে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ ক'রে তখন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—'আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে তুমি সেই চূড়া ভেঙে দিলে।'

কিন্তু এ চূড়া ভাঙবার নয়, এ চূড়া অভ্রভেদী হয়ে উঠবেই—এই হলো কালের নির্দেশ। কিছুদিন পরে নন্দলাল ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। সম্ভবত ১৯২১ সালে। নন্দলাল তাঁর সাধনার জন্যে এই কলাভবনকে একটি তপোবনরূপে মনে মনে গ্রহণ করলেন। এখানে আসবার কিছুদিন আগে তিনি বাগ গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল নিতে যান।

১৯২৪ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সংগে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। চীন, জাপান, দ্বীপময় ভারত তিনি ঘুরে আসেন। তারপর যান সিংহলে। তাঁর মনের ঐশ্বর্য এবং অভিজ্ঞতার পরিধি এতে ক্রমশই বিস্তারলাভ করতে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভারত-শিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত করেন, কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে তিনি কারুময় মঞ্চ ও তোরণ রচনা করেন, কংগ্রেসের পল্লী অধিবেশনে তিনি পল্লী-জীবনের বিভিন্ন দিক রূপায়িত করেন।

নন্দলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নন্দলালের মন গরীব মন নয়। সাধারণের অভ্যাসের বাঁধা জোগান-দার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।"

রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো ভালো না। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন। তাঁর লেখনী নিজের অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী।"

সেই যাত্রাপথ ধ'রে এগিয়ে চলেছে নন্দলালের তুলিকা। সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তিনি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন। যে কাল এখনো অনাগত, কিন্তু যে কাল তাঁর আয়ত্ত।

রচিত গ্রন্থাবলী

শিল্পকথা
শিল্পচর্চা
রূপাবলী। ৩ খণ্ড
ফুলকারী। ৩ খণ্ড
Ornamental Art
Pictures from the life of Buddha
Paintings
Six sketches of Nandalal Bose.

চিত্রিত গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজ পাঠ। ২ খণ্ড।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছড়ার ছবি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ১৩৫৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "নটরাজ ঋতু-রঙ্গশালা"। বিচিত্রা, ১৩৩৪ আষাঢ়
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, টাগডুমাডুম ডুম। ১৩৫১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুড়ো আংলা

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আরো কোনো কোনো গ্রন্থে নন্দলাল-অংকিত চিত্র আছে।

ওস্তাদ হাফিজআলী খাঁ

মনিকা দেবী

সংগীতের তীর্থভূমি গোয়ালিয়র। এরই রাজধানী লস্কর। এই রম শহরটির পাশ দিয়ে বয়ে ছে ছোট্ট একটি নদী, নাম তার স্বর্ণ-। কথিত আছে, বহুদিন আগে পুরী হ'তে এক মত্তহস্তী বাঁধন ড় পালিয়ে এসে ডুব দেয় এই নদীর । পায়ে ছিল তার লোহার শিকল—তু নদীর জলস্পর্শে লোহা সোণায় ণত হয়। তাই তার নাম হয় র্ণরেখা নদী।'

আজ কিন্তু নদীর সে রূপ আর । সেই স্ফীতকায়া স্রোতস্বিনী শীর্ণ ত শীর্ণতর হ'য়ে একটা নালার রূপ ণ কোরে ব'য়ে চলেছে বহু দূর ান্তরে। এর ঐতিহাসিক সত্যতা শকথার মত একে বেষ্টন কোরে আছে জও। একে দেখলে বিস্মৃতির অতল কে এখনও ভেসে ওঠে লৌহ-খলের স্বর্ণে পরিণত হবার অপূর্ব স্ময়কর কাহিনী।

এই অবিস্মরণীয় নদীর ওপর দিয়ে লে গেছে একটা সেতু। সেতুর মুখে কটা বিরাট প্রাচীন মসজিদ। এর াপত্য ও আকৃতি অন্যান্য মসজিদ থেকে কটু ভিন্ন। মসজিদটি দোতালা কিন্তু তে সিঁড়ি নেই। মসজিদটি একবার োখে পড়লেই এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নকে বেশ একটু সচেতন করে তোলে।

মসজিদের সংলগ্ন একটি প্রাচীন াড়ি, বড় রাস্তার ওপরেই এর অবস্থান। নে হয় বাড়িটি এককালে মসজিদেরই অংশ ছিল। এই বাড়ির রকে রোজই সকাল বিকালে দেখা যায় এক প্রৌঢ় ব্যক্তিকে। বিরাট বিশাল তাঁর বপু, লাল টকটকে রং, সুন্দর সুঠাম চেহারা—অনেকটা ঠিক 'হেন্‌রি দি এইট্‌থ্' (Henry VIII)-এর মত দেখতে। মাথায় কাঁচা পাকা চুলের মিশ্রণ—কিন্তু নিত্য নতুন তাঁর দাড়ির বাহার। কখনও দেখা যায় শ্বেত শ্মশ্রু—কখনও বা কালো কুচকুচে—আবার কখনও বা সোনালী রঙে রঞ্জিত। আকাশের রং দেখে যেমন দিনের অবস্থা বোঝা যায়—তেমনি এ'র মনের আকাশ প্রতিফলিত হয় দাড়ির রঞ্জিত আবেশে। শ্বেত-শ্মশ্রু নির্দেশ দেয় তাঁর চিন্তিত মনের—কালো শ্মশ্রু প্রকাশ করে তাঁর গাম্ভীর্যকে। রাজদরবারে যাবার পূর্বে তাঁর ব্যক্তিত্বকে, গাম্ভীর্যকে সুষ্ঠু-রূপে বজায় রাখার জন্য চলে শ্মশ্রুকে কালো কুচকুচে করার সমারোহ। আর সোনালী শ্মশ্রুতে বিভাসিত হয় তাঁর আনন্দমুখরিত হৃদয়খানি। একটা আরামকেদারায় বসে, গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে এক আনন্দ-উচ্ছল প্রৌঢ়ব্যক্তি ডুবে থাকেন আপন চিন্তায়। চিন্তিত অবশ্য তাঁকে খুব কমই দেখা যায়—অর্থাৎ কি-না শ্বেত-শ্মশ্রু দৃষ্টিগোচর বড় একটা হয় না। বড় রাস্তার ওপর দিয়ে যায় শহরের কত লোক। সবাই তাঁকে চেনে, পরিচয় তাঁর দিতে হয় না। পরিচয় পেতে হ'লে চেয়ে দেখুন ঠিক এ'র মাথার ওপরের দিকেই—বাড়ির গায়ে ঝুলানো একটা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড—সাদা, হলুদ ও সবুজ রং-এ লেখা—হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষা প্রচার করছে ইনি হোচ্ছেন স্বনামধন্য "ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ, সংগীতরত্নঅলংকার, আফ্‌তাব্-এ সরোদ। কোর্ট মিউজিশিয়ান, গোয়ালিয়র দরবার।" শহরের গণ্যমান্য লোকও পথ দিয়ে চলতে চলতে ওস্তাদকে জানায় সেলাম—আর ওস্তাদও প্রত্যভিবাদন কোরে কুশলবার্তা প্রশ্ন করেন এ'দের সবাইকে।

রাজদরবারে কোন অতিথি অভ্যাগত এলেই ডাক পড়ে ওস্তাদের। সম্মানিত অতিথির আদর অভ্যর্থনার মাঝে ওস্তাদজীর শ্রুতিমধুর অপূর্ব বাজনা এক অভূতপূর্ব আনন্দ-ব্যঞ্জনার সমাবেশ করে। মহারাণীকেও তিনি মাঝে মাঝে শিক্ষা দেন। দরবারে তাঁর খাতির কম নয়—একথা জানে সবাই—তাই অনেকেই আসে তাঁর কাছে মহারাজের নিকট নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাবার আপিল নিয়ে। এদের মধ্যে অনেকেরই রাজার কাছে আবেদন জানাবার সৌভাগ্য হয় না। তাই তারা ওস্তাদের কাছে আসে—তাঁরই মারফৎ মহারাজের কাছে অভিযোগ অনু-

সরোদ হাতে ওস্তাদ হাফিজআলী খাঁ

রোধ জানাতে। ওস্তাদজী কিন্তু এ'দের কাউকেই বিফল-মনোরথ করেন না—প্রতিবারই তিনি তাদের আশ্বাস দেন—এবার নিশ্চয়ই তিনি মহারাজকে এদের কথা জানাবেন। গতবার কোন অবশ্যম্ভাবী কারণ বশতই তিনি তাদের অভিযোগ মহারাজার কাছে পৌঁছে দিতে পারেননি। সকাল সন্ধ্যায়—প্রায় রোজই—এরকম আবেদনশীল দু'চারজন লোক তাঁর কাছে জমায়েৎ হয়।

বর্তমানযুগে সংগীত-জগতে সরোদ বাজনার দুই ধারার শিরোমণি আমরা দু'জনকে মাত্র জানি—একজন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ—অন্যজন ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ। একজন কঠোর তপস্যা, সাধনা ও কৃচ্ছ্রতাসাধনবলে বর্তমান সংগীত-জগতের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন প্রাচীন সংগীতকে—, প্রাচীন ও বর্তমানকে সমন্বয় সাধন করেছেন নিজের বিরাট শক্তি ও পাণ্ডিত্যের বলে। আর একজন হোচ্ছেন শিল্পী—আপন-ভোলা, আনন্দমদমত্ত, আপন খুশীবলে সৃজন করেন সুরের লহরী, মাতিয়ে তোলেন আপামর জনসাধারণকে সুরের অপূর্ব মাদকতায়।

সংগীত মহলের সবাই জানেন এই দুই ওস্তাদ প্রসিদ্ধ বীণাবাদক রামপুর দরবারের ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের শিষ্য। কথাটা একদিক দিয়ে সত্যি—এ'রা উভয়েই শিক্ষা নিয়েছেন একই গুরুর কাছে। কিন্তু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর সমস্ত জীবনকে সমর্পণ করেছিলেন গুরুর পদতলে এই শিক্ষা-প্রাপ্তির জন্য—আর রামপুরের নবাব স্বর্গীয় হামিদালী খাঁ ওস্তাদ হাফিজালী খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের কাছে সুরশৃঙ্গার শিক্ষা করতে। বছরখানেক মাত্র তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। দরবাড়ী কানাড়া, তিলোক কামোদ, ইমন কল্যাণ এবং গৌড়সারং—এই চারটি রাগেরই মাত্র বিশেষভাবে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ চিরদিনই একটু আরামপ্রিয় ও চঞ্চল প্রকৃতির। ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেবের কঠোর প্রকৃতি, নিয়মশৃঙ্খলা তাঁকে বাঁধতে পারলে না। তাই তিনি শীগ্গিরই ফিরে আসেন নিজের চিরলাস্যপূর্ণ আবাসখানিতে। এ'র পিতা ওস্তাদ নন্নে খাঁ গোয়ালিয়র দরবারের প্রসিদ্ধ সরোদ বাদক ছিলেন—তাঁরই পদ ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ পেয়েছেন। এ'দের ঘরোয়ানাই সরোদের মূল ঘরোয়ানা। এ'র পিতামহ ওস্তাদ মুরাদআলী খাঁর বহু শিষ্য দ্বারাই ভারতবর্ষে সরোদ বাজনার বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। বাঙলাদেশে ওস্তাদ আমীর খাঁই সরোদ বাদ্যযন্ত্রের প্রচার করেন। তিমিরবরণ, রাধিকামোহন এবং শিক্ষিত সমাজের অনেকেই তাঁর কাছে প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ওস্তাদ আমীর খাঁও ওস্তাদ হাফিজালী খাঁদের ঘরোয়ানার শিষ্য। ওস্তাদ হাফিজালী খাঁর ঘরের জিনিস বলেই এই যন্ত্র শিখতে তাঁকে কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। তাঁর হাতে সুরের যে অপূর্ব মিষ্টতা ক্ষরিত হয়, যে অতুল ভাবধারা সুরের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়—তা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতিগত গুণও বটে, আবার এ গুণ বংশপরম্পরায় চলে এসেছে বলেও এর বীজ তাঁর রক্তেও উপ্ত ছিল। তাঁর পিতা পিতামহ সুরের এহেন মিষ্টতার জন্যই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। খাঁ-সাহেব তাঁর মায়ের কাছেও এ বিষয়ে ঋণী। এ'র মাতা অপূর্ব মিষ্টকণ্ঠী এবং সুগায়িকা ছিলেন। রামপুর দরবারের অন্তঃপুরে তিনি প্রায়ই সংগীত ক'রে থাকতেন।

বর্তমানে আমরা ওস্তাদ হাফিজালী খাঁর যে বাজনা শুনি, তাতে আমরা ঠিক তাঁর তালিমী বাজনা অর্থাৎ যে ঘরোয়ানার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন—তার মূল আভাস পাইনে। পূর্বে তিনি যেখানেই বাজাতেন না কেন—সুরের যে কি একটা বন্যাপ্রবাহ ঢেলে দিতেন, তা' যাঁদের শোনবার সৌভাগ্য হয়নি—তাঁদের বোঝানো যাবে না। যন্ত্রের ওপর হাত দিতেই যন্ত্র যেন মিষ্টসুরে কথা ক'য়ে উঠতো। অতি অল্প সময়ের ভিতর রাগের সমস্তটা রূপ ফুটিয়ে রসগ্রাহীদের সামনে পরিবেশন করতেন। এ'র হাতের 'টিপ' এত মিষ্টি যে শ্রোতৃবৃন্দ নিমেষে অভিভূত হোয়ে পড়ত সে সুরের মোহন স্পর্শে—জনতার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিমেষে ঝরে পড়ত শিল্পীর পদপ্রান্তে। তাই তিনি শিক্ষা-লব্ধ বা শাস্ত্রীয় সম্মত বাদ্য বাজাবার দিকে ঝোঁক হারিয়ে ফেলেন—শিল্পীমনের ভাবালুতা নিয়েই তিনি বাজিয়ে যান। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর গুরুভাই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকে স্নেহভরে বলে থাকেন—"ভাইসাব, আপ্ তো হামেসা তালিমী ঢং পরহী বাজাতে"—অর্থাৎ আপনি চিরদিন তো কেবল শিক্ষানুযায়ী বাজনাই বাজান। তাঁর জবাবে ওস্তাদজী হেসে বলেন,—"ভাইয়া, হামকো তো আভিতক্ ওস্তাদ কী তালিম সে রুক্সৎ নহী মিলি। আপনী কারগুজারী দিখানে কো ফুরসৎ ক'হাসে মিলে—" অর্থাৎ আমার তো এখনও গুরুর শিক্ষা থেকে ছুটী হয়নি—নিজস্ব কীর্তি দেখাবার অবসর কোথায়?" উপরোক্ত ছোট্ট দুটি উক্তি দেখেই এই দুই সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদের সংগীতের প্রতি মনোভাব বোঝা যায়। এ থেকে অবিশ্যি একথা বুঝলে ভুল হবে যে, হাফিজালী খাঁ সাহেব শিক্ষালব্ধ বাজনা কখনই বাজান নি। আজ থেকে ৩০।৩৫ বছর আগে এই কলকাতা শহরের বুকেই যে বাজনা তিনি বাজিয়ে গেছেন তা যাঁরা শুনেছেন তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারা যায়। কী অপূর্ব জিনিস তিনি শুনিয়ে গেছেন। তাঁর তানতোড়া ও ঝালার সঙ্গে বাজাতে গিয়ে কত তবলচীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হোয়ে উঠেছিল। কলকাতায় একবার দর্শন সিং নামক বিখ্যাত তবলচী ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গত করেন। ওস্তাদ-জীর বাজনা যখন দ্রুতলয়ের চরমসীমায় ওঠে তখন হঠাৎ তবলচীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর বহুমাস তিনি বাড়ি থেকে ভয়ে বারই হননি।
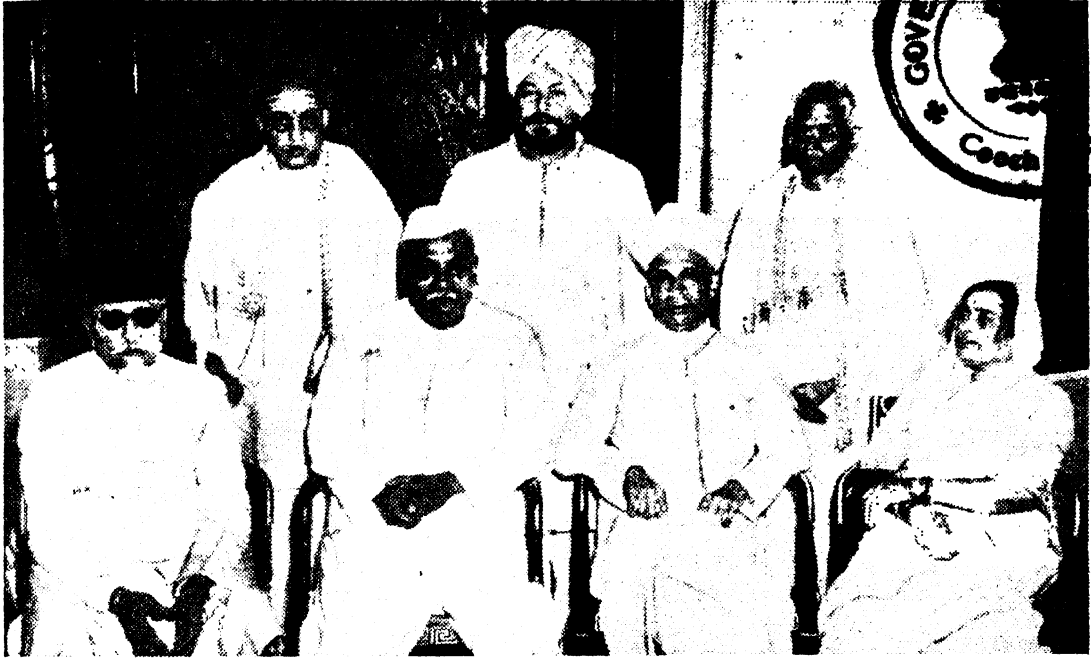
রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রীর সহিত চারিজন সংগীত-সাধক। বাঁদিক হইতে দাঁড়াইয়া : সেম্মাগুড়ি শ্রীনিবাস আইয়ার (কর্ণাটি কণ্ঠসংগীত), ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ (সরোদ), দ্বারম্ ভেঙ্কটস্বামী নাইডু। ডানদিকে উপবিষ্টা শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার (কণ্ঠসংগীত, বোম্বাই)। গত ১৫ই মার্চ নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ই'হারা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন

...শিষ্য ওস্তাদজী বলে থাকেন এরকম ...্য আল্লার আশীর্বাদ এবং ভাগ্যেরই ...চায়ক। মহাপুণ্য লাভ না করলে ...তের সাধনা করতে করতে এরকম ...্য হয় না।

ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ প্রথম যখন ...কাতায় আসেন তখন কলকাতায় ...ন্ন ওস্তাদের মধ্যে খুবই দলাদলি ...। কামামতুল্লা, কুকুম খাঁ, এমদাদ খাঁ ...তি সারা কলকাতার সংগীতের আসন ...ড়ে ছিলেন। বাইরে থেকে অন্য কেউ ...স এ'দের ওপর আপন প্রভাব বিস্তার ...র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে এমন ...ধ্য ছিল না। সে সময় কোন ...ক বা বাদককে কোন সভায় সংগীত ...তে হলে সঙ্গে করে আনতে হোতো ...লোয়ানদল এবং লাঠি সোটা। এদের ...ঙ্গ না আনলে কোন সভায় ...জাবার বা গান করার সাহস এ'দের ...ত না।

সংগীত-জগতের এহেন রেষারেষি দলাদলির মধ্যে এসে পড়েন হাফিজালী খাঁ সাহেব। কিন্তু ইনি নিজের প্রতিভাবলে এবং বংশপরম্পরাগত হাতের যে মিষ্টতা তারই গুণে শীঘ্রিরই এ'দের সবাইকে আপন কবলীভূত করেন। এক মুখে সবাই স্বীকার করে নিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে। সারা ভারত জুড়ে তাঁর কীর্তি ঘোষিত হয়ে পড়ল, বিশেষ করে বাংলাদেশে তাঁর ভক্তের দল ছিল অগণ্য। আজও দেশের অনেক সংগীত প্রেমিক তাঁকেই সংগীত জগতের আদর্শ ব'লে মেনে থাকেন। বর্তমানে তিনি যে ধরণের বাজনা বাজিয়ে থাকেন তাই দিয়ে তাঁকে বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি চিরদিন আরামপ্রিয়—বিলাসী। এখন তাঁর বয়সও হ'য়েছে, শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে। সংগীত জগত থেকে তিনি এখন নিজকে কিছুটা ছুটি দিতে চাইছেন। সংগীত প্রেমিকরা একরকম জোর ক'রেই তাঁকে আসরে নিয়ে যান। আগের মত তাঁর সেই মেজাজও নেই—প্রাণের সেই স্বতঃস্ফূর্ততারও লাঘব হয়েছে। তাই তাঁর বাজনায় পূর্বের সেই সাবলীলতা, প্রাণময়তার স্পন্দন পাওয়া যায় না। একটা রাগ নিয়ে বেশীক্ষণ তিনি এখন থাকতে চান না। ভাইপো আহমদ আলীকে নিয়ে তিনি বসেন বাজাতে, কিছুক্ষণ বাজিয়ে তারই ওপর ছেড়ে দেন প্রায় সম্পূর্ণভাবে। এতেই বোঝা যায়, তাঁর মনে নেই সেই আগেকার প্রেরণা—নেই সেই উৎসাহ। কিন্তু এখনও যদি কেউ তাঁর সঙ্গে সংগীত নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে বসে তবে তাকে তিনি এমন সুন্দর ক'রে রাগ-রাগিনীর বিভিন্ন স্বরূপ বুঝিয়ে দেন যে, শ্রোতার চোখের সামনে খুলে যায় একটা নতুন জগৎ। পূর্বের বিভিন্ন গায়ক-বাদকদের স্বরূপ, তাঁদের স্টাইল এ'র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আছে। ধ্রুপদ,

ধামার, খেয়াল, ঠুংরী ও টপ্পার বিভিন্ন ঢং তিনি কৌতুকভরে বর্ণনা করেন, গান গেয়ে বুঝিয়ে দেন বিভিন্ন রাগের বিভিন্নতাকে। অপরূপ মিষ্টি গলা এ'র, আর ইনি হচ্ছেন রসের আধার। তাঁর বলার ভঙ্গীটিও ভারী চমৎকার। রসিকপ্রবর যখন রস-রঙ্গ-ভরা কথাগুলো বলেন তখন সত্যি না হেসে পারা যায় না। যদিও তিনি সংগীত জগত থেকে ছুটি নিতে চাইছেন তবু মাঝে মাঝে তাঁর হাত থেকে সুরের এমন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায় যে, শুনলে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়। ইনি বলেন—রাগরাগিনীর স্বরূপ আর সুরের রস এখনই উপলব্ধি করতে পারছেন সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু মনের সঙ্গে দেহ ঠিক সমান তালে চলতে পারছে না—এই অসংগতিই তাঁকে সংগীত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনছে।

গুরুভাই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করেন। পাণ্ডিত্য, তপস্যা—সমস্ত দিক দিয়েই তাঁকে নিজের চাইতে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার ক'রে থাকেন। অনেক সময় নিজের ভাইপোকে আদেশ দেন—গুরুভায়ের কাছ থেকে কোন একটা বিশেষ রাগ সম্বন্ধে বিশেষ কোন জিনিস জেনে নিতে। প্রায় বছর দশ আগে রামপুরের নবাব এই দুই সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদকে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠান। সেখানে একদিন ওস্তাদ হাফিজালী খাঁ শ্রীটঙ্ক, ত্রিবেণী, রেওবা, ঘট, ঝিলাপ ইত্যাদি নানারকম কঠিন রাগ সম্বন্ধে গুরুভায়ের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন। এবং নিজের ভাইপো আহ্মদ আলী এবং পুত্র মুবারক আলিকে তৎক্ষণি সেসব শিক্ষা ক'রে লিখে নিতে আদেশ দেন। আর এর পুরস্কার স্বরূপ গুরুভায়ের শ্বেত-শ্মশ্রু কলপ দ্বারা রঞ্জিত ক'রে যুবক ক'রে তোলার প্রয়াস করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ হেসে বলেন—"কবরে পা দেবার সময় হ'ল ভাই, এখন আমার যুবক বানিয়ে কি হবে—"

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ যদি ওস্তাদ হাফিজালী খাঁর বাজনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন তবে তার জবাবে শ্রদ্ধাভরে ওস্তাদজী ব'লে থাকেন—"ও'র বাজনাকে তোমরা বুঝতে পারোনি বাবা—ইনি হ'চ্ছেন আসল শিল্পী। অতিবড় প্রেমিক না হ'লে, অন্তর সংগীত-রসে পূর্ণ না থাকলে এরকম মিষ্টি সুর হাত দিয়ে বেরোতে পারে না। ও'র অন্তঃকরণ ভারী কোমল, তাই এ'র বাজনাও হয় মধুর, সুন্দর। আর সরোদের আসল ঘর এ'দেরই—এরকম সরোদ আমি কারুর কাছেই শুনিনি।"

গুণীই গুণের কদর জানে; তাই উন্মুক্ত কণ্ঠে একে অন্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠতে পারে, তাই সেখানে আসে না কোন বিদ্বেষ-বিরূপতা।

বীরভূমঃ হাট জানবাজারে একটি সন্ধ্যা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মেঘের মালঞ্চঘেরা নীলাকাশে অসীম উদার
আঁকাবাঁকা চিত্রপটে আদিমের নানা ছায়া ভাসে
অস্পষ্ট রহস্যময়, কাঠফাটা মাঠে ফিরে আসে
বর্ষার ধারায় তৃপ্তি, রৌদ্রদীর্ণ মাটিতে আবার
সবুজের সম্ভাবনা; কৃষকেরা নবীন আশায়
হাটুজলে ব্যতিব্যস্ত, দগ্ধ তৃণ নবধারাজলে
সঞ্জীবিত, সঞ্চালিত; মাঠে-মাঠে হাসে কৌতূহলে
সঞ্জীবিত, সঞ্চালিত; মাঠে-মাঠে হাসে কৌতূহলে
তালের সুউচ্চ সারি, মেঘলোকে স্বাগত জানায়।

লাল মাটি কাঁকরের এই গ্রামে নির্জন বিকেলে
সংকীর্ণ সর্পিল পথে ঘুরে-ঘুরে ভিজে অবশেষে
কি ক'রবো তাই ভাবি; কী যেন এসেছি দূরে ফেলে
সমুখের ধানখেতে, প্রতীক্ষার প্রহরের শেষে
খুঁজে ফের পাবো নাকি? দূরে রেখে যন্ত্র-কলকাতা
জলজমা কাদা-ডোবা এই পথে খুঁজি সম্পূর্ণতা।
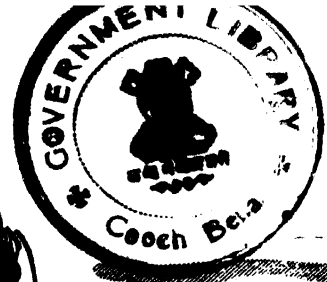
॥ **মান্য** ব্যাপার থেকে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল। আমি কিন্তু ...ও ছিলুম না পাঁচেও ছিলুম না। ...লে আমার ছিল হাফ-ফ্রি-শিপ্। তাই ... ভয়ে থাকতুম। কাজেই গণ্ডগোলটা ...য়ে উঠছে দেখেও যেন দেখিনি, এই-...ই কাটাচ্ছিলুম।

কিন্তু দৈব আমার প্রতিকূল। ...কে বিপাকে জড়িয়ে ছাড়লে।

সেদিন যথারীতি ক্লাসে গিয়েছি। ...ী বেয়ারা একটা চিরকুট নিয়ে ক্লাসে ঢুকল। বড় মণিবাবু বিজ্ঞান ...চ্ছিলেন, চিরকুটখানা পড়ে চশমা ...য়ে আমার দিকে চাইলেন।

বললেন, হেড্ মাস্টার মশাই ...াকে ডাকছেন। যাও।

চমকে উঠলুম। ক্লাস সুদ্ধ ছেলে আমার দিকে চোখ ফেরালে। সকলের মুখেই নির্বাক এক জিজ্ঞাসা, ব্যাপার কি? কি করেছিস?

কিন্তু কি যে আমি করেছি, ভেবে পেলুম না। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে রজনীকে জিজ্ঞেস করলুম। রজনী হেড্মাস্টার মশাই-এর খাস বেয়ারা। মেজাজ তাঁর চেয়েও চড়া। জবাব দিলে না।

কিছুদিন যাবৎ আমাদের ইস্কুলে গোলমাল চলছে। নতুন নিয়মে, ক্লাসে ক্লাসে লাইব্রেরী খোলা হ'ল। আমাদের ক্লাসে, ক্লাস এইট্-এ, ছেলে বেশী, দুটো সেক্শন। অথচ লাইব্রেরী হ'ল একটা। আর তা-ও থাকবে 'এ' সেক্শনে। 'বি' সেক্শনের ছেলেরা বেঁকে বসলে। 'এ' যে 'বি'-এর উপর এই সুযোগে ডাঁট নেবে, তা সহ্য করা যায় কিভাবে? 'বি'-এর ছেলেরা বললে, আমাদের জন্যে আলাদা লাইব্রেরী চাই। কর্তৃপক্ষ বললেন, তা কি করে হয়, প্রতি ক্লাসে একটি করে লাইব্রেরী, এই আমাদের 'গ্রাণ্ট্'। আর লাইব্রেরী হবে না। তবে, তোমাদের ক্লাস বড়, বেশী বই দিচ্ছি।

প্রস্তাবটা সেক্শন 'বি'-এর মনঃপূত হ'ল না। বললে, তবে লাইব্রেরীটা আমাদের ঘরে থাকুক। কারণ এই সেক্-শনেই ছেলে বেশী। তাদের সে দাবীও টিকল না। কর্তৃপক্ষ বললেন, বেশ, ছমাস এদের ঘরে থাক, ছমাস থাকবে ওদের ঘরে। এবার 'বি'-এর ছেলেরা রাজী হল। কিন্তু আরেকটা পাল্টা প্রস্তাব

দিলে, প্রথম ছমাস আমাদের ঘরে থাকবে।

এইবার কর্তৃপক্ষ গেলেন চটে। বার-বার 'বি'-এর ছেলেদের বেয়াদবি বরদাস্ত করা যায় না। বললেন, লাইব্রেরী 'এ' সেক্‌শনেই থাকবে। তাই থাকল। ফল-স্বরূপ 'বি' একজোট হয়ে লাইব্রেরী বয়কট করলে। শাস্তিস্বরূপ 'বি' সেক্‌শনের সমস্ত ছেলের আট আনা করে জরিমানা হয়ে গেল। ছেলেরা এক-জোট হয়ে জরিমানা দিতে অস্বীকার করলে।

আমি হাফ্‌-ফ্রিতে পড়তুম। যথাসাধ্য গোলমাল থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু জরিমানাটা আমার ঘাড়েও এসে চাপল। কোথা থেকে জরি-মানা দেব? বাবাকে বললে, কোনো কাজ হবে না। ছেলেদের হঠকারিতায় যদি তাদের উপর ইস্কুল থেকে জরিমানা করা হয়ে থাকে তো তা শোধ করবার দায়িত্ব গার্জেয়ানের নয়, ছেলেদের। আমার বাবা, এসব দিক থেকে বরাবর ছেলেদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ফাইনের কথা বলতেই বললেন, রোজগার কর। করে, ফাইন শোধ দাও।

হেড্‌মাস্টার মশাই-এর কাছে দর-বার করলুম। ফল হ'ল না। তাঁর এক কথাঃ নাই পেয়ে পেয়ে সব মাথায় উঠেছ। ইস্কুলের ডিসিপ্লিন ভাঙছ তোমরা। এবার সায়েস্তা না করে ছাড়ছি নে। ফাইন্ সব্বাইকে দিতে হবে। আইন সকলের জন্যই।

হেড্ মাস্টার মশাই কড়া লোক। সে আমলের রায় সাহেব। অনারারি ম্যাজি-স্ট্রেট্ সরকারী মহলে খুব দহরম মহরম। তাঁর আকাঙ্ক্ষা মহামান্য সম্রাটের কোনো জন্ম দিবসের খেতাব বিতরণ তালিকায় 'নাইটে'র ঘরে তাঁর নামটি দেখবেন। সামনের বছর সম্রাটের রজত-জয়ন্তী। এমনভাবে পালন করবেন, যা কি না জেলা শহর ছাড়িয়ে কলকাতায় গিয়ে ঢেউ তুলবে। ক্ষমতা থাকলে দিল্লীর দরবার অব্দি তা পৌঁছে দিতেন।

তাঁর ভয় ছিল স্বদেশীওয়ালাদের জন্যে। তাঁদের তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। ছোঁয়াচে ব্যাধির মত দূরে রাখতে চাইতেন। তাঁর ইস্কুলের ত্রি-সীমানার মধ্যে স্বদেশীওয়ালাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। সেটা তো 'গভর্নমেন্ট এইডেড্ হাইস্কুল' নয়, যেন খোদ সরকারী দফতরখানা। যতবার বিদেশী ম্যাজিস্ট্রেট্ এসে আমাদের ইস্কুল পরিদর্শন করে গেছে, ততবার আমাদের 'এইড্' বেড়েছে। এহেন ইস্কুলের ছাত্ররা কিনা কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হচ্ছে! ডিসিপ্লিন ভাঙছে! আর তা-ও কখন? যখন কি না সামনে জয়ন্তী। রায় সাহেবের ধারণা হ'ল স্বদেশী-ওয়ালারাই এর পেছনে আছে। শুধু জরিমানা করলে হবে কি না সন্দেহ।

মাইনের তারিখে সবাই মাইনে জমা দিলে, কিন্তু জরিমানা দিলে না। জরি-মানা না দেওয়ায় মাইনে নেওয়া হ'ল না। হৈ হৈ ব্যাপার। এমন ঘটনা ইস্কুলের ইতিহাসে প্রথম। রায় সাহেব নিঃসন্দেহ হলেন, স্বদেশী ঢুকেছে তাঁর ইস্কুলে। প্রত্যেকটি ছেলেকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে জেরা করেছেন। জানতে চেয়েছেন, কে এই উস্কানী দিচ্ছে? ভাল কথায়, ধমক দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে—হরেকরকমে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কে এই দুষ্কার্যের মূলাধার তা বের করতে পারেন নি।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চলেছি। এর আগে দুদিন প্রবল জেরা আমার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কারোরই নাম বলতে পারিনি। জানিনে, বলব কোত্থেকে?

হেড্ মাস্টার মশাই-এর ঘরে ঢুকতে বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। আমার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, আমি জানতে পেরেছি, কারা এই সব গোলোযোগ বাধাচ্ছে। ভেবোনা আমি অন্ধ। আমা'র সব দিকে নজর আছে। আমি জানি, তুমিও তাদের চেনো। এখন তোমার মুখ থেকেই তাদের নামগুলো জানতে চাই। বল।

আমার প্রাণ ততক্ষণে উড়ে গেছে। আমি কি করে এদের নাম বলব? নিজেই জানিনে, কেউ সত্যিই আমাদের উস্কানি দিচ্ছে কি না?

বলতে গেলুম। ভাল করে আওয়াজ বের হল না। প্রাণপণ চেষ্টা করে বললুম, আমি কিছুই জানিনে স্যর।

রায় সাহেব ধমক দিলেন, মিথ্যে বল না। তোমার চেহারা বলছে, তুমি জানো।

বললুম, সত্যি বলছি স্যর, আমি কিচ্ছু জানিনে।

রায় সাহেব আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর ডাক দিলেন, কেরাণীবাবু?

কেরাণীবাবু, ভাব দেখে মনে হল, প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, টপ করে বেরিয়ে এলেন। এই লোকটার কেন যে আমি বিষ নজরে পড়েছি, জানিনে। কিন্তু সর্বদা আমার পিছনে লেগে আছে। এমন কি কাল সন্ধ্যে বেলা, খেলা দেখে ফিরবার পথে, রাজারঘাটের চাতালটায় বসে যখন দিন্দার সঙ্গে কথা বলছিলুম, তখন দেখি সেখানেও কেরাণীবাবু একবার উঁকি মেরে গেলেন।

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কেরাণীবাবু বলুন তো, কি দেখেছেন?

কেরাণীবাবু গড়গড় করে যা বলে গেলেন, তার সার কথা হচ্ছে, স্বদেশী-ওয়ালারা জয়ন্তী উৎসব পণ্ড করবার ষড়যন্ত্র করেছে। দিন্দা তার পাণ্ডা। আর আমি হচ্ছি দিন্দার এজেণ্ট। গতকাল সন্ধ্যায় দিন্দা নাকি আমাকে নির্দেশ দিয়েছে, ছেলেরা যাতে কিছুতেই মাইনে না দেয়, তার ব্যবস্থা করতে।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লুম। ভয়ও হল। তার থেকেও বেশী হল ঘৃণা। কেরাণীবাবুর মুখখানা কেমন যেন ক্রূর ঠেকল আমার চোখে।

রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, এর পর তোমার কি বলবার আছে।

রায় সাহেবের গলার স্বরে কি যেন ছিল, যেন মনে হল একটা শীতল কথার স্রোত, আমাকে এক সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলুম। থরথর কাঁপতে লাগলুম। ঘামতে লাগলুম। আমি কিছু জানিনে স্যর। সত্যি কিছু জানিনে। মনে মনে অজস্র বার বললুম। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না।

রায় সাহেব বললেন, বেইমানের জাত। তোর বাবা হাতে পায়ে ধরে হাফ্‌-ফ্রি

য়ে নিয়েছে তোকে। নইলে নাকি
। পড়া হবে না। তা এই কি তার
দান? আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত।
রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। হাতে হাত-
পড়বে। গলায় পড়বে ফাঁসির দড়ি।
জানিস। বল, কি জানিস তুই
ন্দ্রের।

এমন অপমান, এত লাঞ্ছনা এর আগে
পাইনি। কোথায় ভয় ডর ভেসে
। সমস্ত শরীরে তখন অপমানের
লা। হেড্ মাস্টার মশাই-এর সামনা-
নি দাঁড়িয়ে চোখ তুলে কথা কখনো
নি। আজ সোজা তাঁর মুখের দিকে
লুম। চোখের দৃষ্টি হেডমাস্টার
ইকে টপকে তাঁর পিছনে গিয়ে
ল। মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের এক
াট রঙগীন আবক্ষ ছবি সেখানে
ানো। তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সঙ্গে
সাহেবের দাড়ির ছাঁটটির অবিকল
াটি সেই আশঙ্কাজনক মুহূর্তেও
ার নজর এড়ালো না।

আমরা স্বাধীন কি পরাধীন সে কথা
আগে কখনো আমার মনে হয়নি।
দশীওয়ালাদের কথা কানেই শুনেছি।
দেরকে কখনো দেখিনি। আমার ধারণা
ল তাঁদের দেখা যায় না। তাঁরা জেল-
া ব'লে ভয়ঙ্কর এক জায়গায়
কেন। সরকার বাহাদুরের তাঁরা দুষমণ
র ওয়ান। তাঁরা সাহেব দেখলে বোমা
ড়েন, আর গান করতে করতে ফাঁসি
। আমি সেই স্বদেশীওয়ালা হব কি
র? আমি তো জেলে থাকিনে, বাড়ীতে
কি। ইস্কুলে পড়ি। স্বদেশীওয়ালারা
ইস্কুলে পড়ে? আমার এক মামা
ল, নিতাই মামা, তাঁকে তখনো চোখে
খিনি, শুনেতুম, তাঁকে নাকি দুপুর
লা পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।
াৎ ধরল বলেই নাকি পারলে। নইলে
তাই মামাকে ধরা পুলিশের সাধ্য
ল না। তেল মেখে দুপুর বেলা
াগাছে উঠেছিলেন, আর খবর পেয়ে
লিশ এসে হাজির। ধরে ফেললে
তাই মামাকে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার
ঠনের সঙ্গে তিনি নাকি জড়িত
লেন। আমরা জানতুম ওরাই স্বদেশীর-
লর। ওরা সব পারে।

আমি কি পারি যে স্বদেশী হব? গুলী ছোঁড়া দূরে থাক, বৃটিশ সরকারের সাম্রাজ্য টলানো দূরে থাক ওই ফ্রেঞ্চ-কাট্ দাড়ি যাঁর, সেই মহামান্য সম্রাটের ছবিটা একটু নড়াবার ক্ষমতা কি আমার আছে? এই ইস্কুলের কারোর আছে?

রায় সাহেবের গালাগালিগুলো তখনো আমার কানে বাজছে... বেইমান ......কথাটার মধ্যে এমন কি তীক্ষ্ণতা আছে, যা ভীরুর রক্তেও উষ্ণতা জাগায়? ঢেউ তোলে? আমার বুকেও তুলল। তুলল বলেই মনে হ'ল, এই প্রথমবার মনে হ'ল, আমি পরাধীন। এক গোলাম।

রায় সাহেব গর্জে উঠলেন, কি জানিস বল।

আশ্চর্য, সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়লে আজো আশ্চর্য লাগে, কি করে সেদিন আমার অত সাহস হয়েছিল। কি করে, একটা টুঁ শব্দ না করেও অত আঘাত সহ্য করে গিয়েছিলুম।

রায় বাহাদুরের কথার একটা জবাবও সেদিন দিইনি। বেতের পর বেত খেয়েও চুপ করে ছিলুম। টুঁ শব্দ করিনি। শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।

শেষ পর্যন্ত আমাকে উপলক্ষ্য করেই শহরময় আলোড়ন সৃষ্টি হল। ইস্কুল থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হল। ইস্কুলে স্ট্রাইক হ'ল। যে স্বদেশী-ওয়ালাদের রায় সাহেব এড়িয়ে চলতে চাইতেন, তাঁদের হাতেই ঘটনার নেতৃত্ব চলে গেল। তাঁরাই এসে ছেলেদের পরিচালনা করলেন। দিন্দা সত্যিই পাণ্ডা বনে গেল।

একমাস হৈ চৈ গোলমালের পর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যস্থতায় আবার সব মিটমাট হয়ে গেল। আমাকে ফের ইস্কুলে ভর্তি করা হল। হাফ্-ফ্রি শিপ্ও বহাল রইল। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট্ নিজের টাকায় আমাদের সেক্শনে লাইব্রেরী করে দিলেন।

সব মিটে গেল। শুধু রইল পিঠের দাগ, মনের জ্বালা, কেরাণীবাবুর প্রতি ঘৃণা, আর স্বদেশীওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধা। দিন্দার আমি প্রিয়পাত্র হয়ে গেলুম।

বুঝতে পারতুম দিন্দার মনে এক প্রচণ্ড জ্বালা আছে। তারই দাহ দিন্দাকে অস্থির করে তুলেছে। আমার থেকে বয়সে দিন্দা খুব বেশী বড় ছিলেন না —বড় জোর বছর চারেক। কিন্তু মনের বয়সে আমাকে তিনি অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছিলেন।

আমরা প্রকাশ্যে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ করতুমনা। দিন্দা তা চাইতেন না। গঙ্গার ধার ধরে বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতুম শ্মশান ছাড়িয়ে। বর্ষার পরে পলিপড়া চড়ায় নব-উদ্গত অজস্র ঝাউচারা সেদিকটায় অরণ্য সৃষ্টি করে রেখেছিল। তারই আড়ালে কোনো এক জায়গায় দুজনে দেখা করতুম। সে কেমন ছায়াঘেরা জায়গা। সে কেমন রহস্যঘেরা জায়গা।

দিন্দা বলতেন, সাবধানে আসিস। আমার উপর সরকারী গোয়েন্দার নজর আছে। সেসব শুনে ভয় পেতুম। দিন্দার সঙ্গে যতক্ষণ থাকতুম, ততক্ষণ স্বস্তি থাকতনা, শান্তি থাকত না আমার মনে। কেবল মনে হ'ত, এই বুঝি কেউ এল, কেউ আমাদের দেখে ফেললে। এইরকম অস্থিরতা অনেকদিন ভোগ করেছি।

দিন্দা গল্প বলতেন, ক্ষুদিরাম, কানাইলালের, যারা সাহেব মেরে ফাঁসিতে ঝুলেছিল। গল্প বলতেন, চট্টগ্রামের বীর যোদ্ধাদের, যাঁরা চট্টগ্রামকে কয়েকটা দিন বৃটিশ শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে-ছিল, জালালাবাদ পাহাড়ে যারা লড়াই করেছিল বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে। আমার মনে পড়ত নিতাইমামার কথা। গর্বে বুক ফুলে উঠত। রক্তে উন্মাদনা জাগত।

ঝাউ গাছের রহস্যময় শরশরানির সঙ্গে দিন্দার চাপা স্বরের ফিসফিসানি মিশে মিশে যে এক অপূর্ব ছায়া ছায়া রহস্যলোক গড়ে উঠত তারই মধ্যে বসে বসে শুনতুম এক বিপ্লবী নরেন ভট্টা-চার্যের আশ্চর্য কীর্তি কথা। কোথাও মিঃ মার্টিন, কোথাও এম এন রায়—হরেক নাম, হরেক বেশ ধরে আমেরিকা মেক্সিকো বার্লিন মস্কো চীনে বিপ্লবের বারতা বহন করে নিয়ে চলেছে এক বাঙগালী যুবক। দিন্দার বলাটা এত সুন্দর হত

যে, চোখের উপর তা যেন ছবি হয়ে ভাসত।

দিন্দা, সেদিন, তখনো আসেননি। সেই নিবিড় ঝাউবনের মধ্যে একা বসে আছি। হঠাৎ দূরে থেকে পাতা সরানোর আওয়াজ। প্রথমে ভাবলুম, দিন্দাই বুঝি। কিন্তু এ তো দিন্দার পায়ের আওয়াজ নয়। তবে? হঠাৎ বুক ধুক্-পুক্ করে উঠল। তবে কি গোয়েন্দা? মুহূর্তে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলুম। পর মুহূর্তেই সামলে নিলুম। পকেটের মধ্যে একটা বড় পেন্সিলকাটা ছুরি থাকত, সেইটে খুলে হাতে নিয়ে বসলুম। আমার মনে হ'ল, এ কেরাণীবাবু ছাড়া আর কেউ নয়। তা যদি হয়—সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে প্রতিহিংসাবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল। দেখলুম দিন্দার সাহচর্যে কম লাভ হয়নি। আমার মধ্যে এরই ভেতর এক বিপ্লবীর অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সন্তর্পণে কে যেন এগিয়ে আসছে। একটা ঘন ঝোপের আড়ালে সরে গেলুম। পদ-শব্দ আরো কাছে এল। না, কেরাণীবাবু নয়, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, একটা শ্মশান-কুকুর।

দিন্দা এলেন।

বললেন, দ্যাখ কি এনেছি। খবরদার, কারো কাছে বলিস নি।

দিন্দা কাপড়ের তল থেকে একটা পুঁথি বের করলেন। হাতে লেখা পথের দাবী। শরৎবাবুর এই বইখানার কথা কিছুদিন যাবৎ দিন্দার কাছে শুনেছিলুম। সরকার পথের দাবী বাজেয়াপ্ত করে-ছিলেন। সেই নিষিদ্ধ বই দিন্দার কাছে দেখলুম। সেই মুহূর্তে আমার চোখে দিন্দা আর ক্ষুদিরাম এক হয়ে গেলেন।

পাঁচ ছয় দিন ধরে আমরা বইখানা পড়লুম। দিন্দা পড়লেন, আমি শুনলুম। দিন্দার সে তো পড়া নয়, মন্ত্রোচ্চারণ। দিন্দাকে ক্ষুদিরাম বলে মনে হয়েছিল, এর পর ধারণা বদলাল, তিনি হলেন সব্যসাচী। আর নিজেকে অপূর্ব নয়, মনে করলুম তলোয়ারকর। ইংরাজ সর-কারের ধ্বংস কামনায় দু'জনে মিলে প্রতিজ্ঞা নিলুম। পথের দাবী ছুঁয়ে বিপ্লব করবার শপথ নিলুম।

দিন্দার বাড়ি এই শহরে নয়, মাইল পাঁচ ছয় দূরের এক গ্রামে। দিন্দা এখানে যার বাড়ীতে থাকতেন, তিনি মস্ত বড় লোক, জমীদার, তার উপরে ছিলেন সর-কারী উকীল। দিন্দার দূর সম্পর্কের কি রকম যেন আত্মীয় হন।

দিন্দাকে ওরা আশ্রয় দিয়েছিলেন লেখাপড়া করবার জন্য। কিন্তু দিন্দা তার চেয়েও বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন।

নিজেই বলতেন, পড়াশুনা করলে পাশ করব, চাকরি করব। তারপর? বিয়ে থা করে সংসারে মন দেব। এই তো সোজা রাস্তা। কিন্তু এই কি জীবনের সব? এই কি আমার জীবনের সব?

বলতে বলতে দিন্দার মুখের রং বদলে যেত, ভাব পালটে যেত। সাধারণভাবে দেখতে গেলে দিন্দা সুপুরুষ। বয়সের তুলনায় বেশী সাবালক। লম্বা চওড়া দেহ। দীর্ঘ নাক, টানা চোখ, ফর্সা রং। তবে মুখখানা কোমল। কিন্তু সেই কোমল মুখখানা কখনো কখনো, বিশেষ করে এই সমস্ত বিষয় আলোচনার সময়ে কেমন যেন ক্রূর হয়ে উঠত, কঠিন হয়ে উঠত। সে মুখের দিকে চাইতে আমার ভয় ভয় করত। সেই মুহূর্তগুলোতে মনে হ'ত দিন্দার সঙ্গে একা একা যেন দেখা না করাই ভাল।

কিন্তু এসব তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। দিন্দার চোখে যেমন আগুন জ্বলত, তেমনি বইতো করুণার ধারা।

দিন্দার সে মূর্তিও ভুলবার নয়, কখনো ভুলতে পারবো না। তখন আমাদের মোটামুটি একটা দল গড়ে উঠেছে। দিন্দাই নেতা। আর আমরা তাঁকে অনুসরণ, না অনুসরণ বলব না, অনু-করণ করছি মাত্র গুটি কয়েক ছেলে।

মনোহর বলে একটি ছেলে আমাদের দলে জুটেছিল। দল বলতে সেটা এমন মারাত্মক কিছু নয়। আমরা সকলে একটা পাঠচক্র খুলেছিলুম। যত নিষিদ্ধ বই পড়তুম। আর আলাপ আলোচনা করতুম। মনোহরের ছিল তীক্ষ্ম মেধা। সে বলত, শুধু আলাপ আলোচনা আর পড়ায় সময় কাটালে কোনও লাভ হবে না। আমাদের মিশতে হবে লোকের সঙ্গে। তাদের দুঃখ, তাদের ব্যথা বুঝতে হবে। তাদের দুঃসময়ে সাহায্য করতে হবে।

কথাটা আমাদের মনে ধরল। আমরা সেবার কাজে লাগলুম। বে-ওয়ারিশ মড়া পোড়াই। আর যাদের সেবা শুশ্রূষার দরকার তারা খবর পাঠালে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে আসি।

কিন্তু বেশীদিন চলল না। মনোহরই ছিল এবিষয়ে সবচাইতে উৎসাহী। তারই হঠাৎ একদিন বসন্ত হল। আর সব থেকে খারাপ টাইপের। ওরা ছিল গরীব। চিকিৎসা করবার পয়সা ছিল না। আমরা সাধ্যমত চাঁদা তুলতে লাগলুম। কিন্তু তাতে আর ক'পয়সা ওঠে। রোগ বাঁকাপথ ধরল। বসন্তের গুটি উঠে আবার গায়ে বসে গেল। কি যন্ত্রণা! দিন্দা পাগলের মত হয়ে উঠলেন। যে করেই হোক মৃত্যুর মুখ থেকে মনোহরকে বাঁচাতে হবে এই যেন তাঁর প্রতিজ্ঞা। পাছে আমাদের দেহেও সংক্রমণ হয়, সেজন্য আমাদেরকে মনোহরের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। নিজেই সব করতেন। দিন্দার নিজের অবস্থাও ভাল না। তবু তাঁর যথাসর্বস্ব বিক্রী করলেন মনোহরের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু মনোহর বাঁচল না। তেইশ দিন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, একদিন দুপুরে মারা গেল। দিন্দা মনোহরকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

দিন্দার সঙ্গে উত্তরকালে আমার মতভেদ হয়েছে। দিন্দা আমাকে তাঁর 'পয়লা নম্বরের শত্রু' আখ্যা দিয়েছেন। দুজন দুজনের কাছ থেকে সরে এসেছি বহু—বহু দূরে। ইংরেজদের নাম মুখে আনতে দিন্দার মুখ ঘৃণায় যেমন ভাবে বিকৃত হয়ে যেত, ধনিকশ্রেণী সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে গেলে তাঁর চোখে জ্বলত যেমন প্রতি-হিংসার আগুণ, আজ আমাকে স্মরণ করতে গেলে তাঁর মনে সেইরকম ভাবই যে হয়, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবু কেন জানিনে, দিন্দার এই ছবিটাই—মৃত মনোহরের দেহটা দুহাতে সাপটে ধরে দিন্দা ফুলে ফুলে কাঁদছেন—সব্বার আগে আমার চোখে ভেসে ওঠে। এখনকার এই কঠিন কঠোর ভাবলেশহীন মানুষটিকে দেখে সে দিন্দাকে আর চেনা যাবে না সেটা বড় কথা নয়, সেই কোমল হৃদয়া

ার খ‍ুঁজে পাওয়া যাবে না, রাজ-
র কঠিন পেষণে তার যে বিনষ্টি
হ, সেটাই আফশোষের কথা।
টা মরে সেই দেহে জন্ম নিয়েছে
পলিটিসিয়ান্, আফশোষ শ‍ুধ‍ু তাই।

দিন্দার ছাত্রজীবন বেশীদিনের নয়।
ক্লাসে ওঠবার সংগে সংগেই তা শেষ
যায়। ও'কে ইস্কুল থেকে বিতাড়িত
হয়েছিল। তখন আমরা আরো
ক্লাসে পড়ি। দিন্দার বির‍ুদ্ধে অভি-
ছিল গ‍ুর‍ুতর। শরৎদাকে (আমাদের
ন টীচার) যখন ইস্কুলের মধ্যে
পুলিশ রাজদ্রোহিতার অভিযোগে
ার করে নিয়ে যায়, দিন্দা তার প্রতি-
ইস্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যেই 'বন্দে
ম্' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
তারপর থেকে দিন্দা আর গোলাম
র কারখানা (নামটা দিন্দার দেওয়া)
ন নি।
বলতেন, বড্ড অশোয়াস্তি লাগত।
ল। ওই খাঁচাটার মধ্যে দ‍ুদণ্ড
ও দম আটকে আসত। ঘণ্টার পর
ঘণ্টা কাটানো তো দ‍ূরস্থান। আর কেন
কাটাবো? কেরাণী বনতে? ওই
সাহেবগ‍ুলোর পা-চাটা কুকুর হ'তে?

দিন্দার চোখে বিদ‍্যুৎ খেলে যেত।
বহ‍ুদ‍ূরের কোথায় দ‍ৃষ্টি নিবদ্ধ করে
বলতেন, আজ নিজে বেরিয়ে এসেছি,
কাল তোরা আসবি, একদিন সমস্ত
ভারত বেরিয়ে আসবে। বিদেশী
শোষকদের ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে সাগর
পারে ফেরৎ পাঠাতে হবে। সেদিনকে
এগিয়ে আনাই আমার কাজ। ইস্কুল
ছাড়া আমার প্রথম বিদ্রোহ।

হঠাৎ দিন্দা একদিন ডুব দিলেন।
কোথায় গেলেন জানিনে। প্রায় দেড়মাস
দিন্দার কোনো খোঁজ পেলাম না। যে
বাসায় তিনি থাকতেন, ইস্কুল ছাড়বার
পর আর তাঁদের সংগে বনিবনা হচ্ছিল
না। দিন্দার কাছে সে কথা প্রায়ই
শ‍ুনতুম। তাঁরা অকারণে দিন্দাকে খেতে
পরতে দিতে নারাজ ছিলেন। তাঁরা বড়-
লোক, ইচ্ছে করলে দিন্দার মতো একশ'টা
লোককে অনায়াসে খাওয়াতে পারেন,
খাওয়াতেনও। তাঁদের অসম্মতি লোক
খাওয়ানোয় নয়, দিন্দাকে খাওয়ানোয়।
দিন্দার ধরণ ধারণ ওরা পছন্দ করতেন
না। দিন্দাকে না দেখে, দিন কুড়ি পরে,
একদিন ও বাড়ীতে তাঁর খোঁজ নিতে
গিয়েছিল‍ুম। কিন্তু তাঁরাও কোনো খবর
জানেন না বললেন।

পরীক্ষা এসে পড়ল। ইস্কুলের সংগে
একটা গোলমাল পাকিয়ে রেখেছি। হেড্
মাস্টার মশাই ফাঁক খ‍ুঁজছেন, তা তাঁর
কাজকর্ম দেখলেই বেশ বোঝা যায়।
কিছ‍ুদিন আগেই একটা সার্কুলার
দিয়েছেন, যারা প্রত্যেক পেপারে শতকরা
ষাট নম্বর রাখতে না পারবে তাদের ফ্রি-
শিপ্ কাটা যাবে। ব‍ুঝতে পেরেছিল‍ুম,
আমিই উপলক্ষ্য। আমার ভয় ছিল অঙ্কে
আর সংস্কৃতে। কাজেই বিপ্লব চিন্তা
ছেড়ে দ‍ুর্বল বিষয় দ‍ুটোতে কসে মন
দিল‍ুম। দিন্দার কথাও চাপা পড়ে গেল।

পরীক্ষার শেষ হতে আর দিন দ‍ুই
বাকী, দিন্দার এক পোস্ট কার্ড পেলাম।

বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দুটি কি তিনটি ছত্র লেখা—

টাইফয়েডে মরণাপন্ন হয়েছিলাম। দিন পনের পথ্যি করেছি। বড্ড একা। একবার আয় না।

ইচ্ছে হ'ল তখুনি চলে যাই। পরীক্ষা টরীক্ষা আর কি হবে দিয়ে। ইংরেজদের একটা গোলাম বাড়বে বৈ তো নয়। কিন্তু দিন্দার কাছে যা অনায়াস আমার কাছে তা অসম্ভব। পরীক্ষাটা তাই দিলাম, যথাসম্ভব ভালভাবেই দিলাম। পরদিন সকালেই দিন্দার গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম।

পথ চিনতুম না, রেল লাইন ধরে গিয়েছি, তাই মাইল খানেক বেশী ঘুরেছি। কিন্তু সে কথা মনেই পড়ল না। দিন্দার সঙ্গে কতদিন পরে আবার দেখা হবে, সেই উত্তেজনায় পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলুম।

খুঁজে খুঁজে দিন্দার বাড়ী বের করলুম। দিন্দা তখন চৌকীর উপর উঠে বসে বাটিতে করে দুধ না কি খাচ্ছিলেন। পাশে এক মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। দিন্দার মতোই দেখতে, তবে একটু রোগা। শুনেছিলুম, দিন্দার এক বালবিধবা দিদি আছেন। বুঝলুম, ইনিই।

দিন্দার একী চেহারা হয়েছে।

আমাকে দেখে বাটি থেকে মুখ তুলে হাসলেন। কিন্তু সে হাসি এত ম্লান যে তাকে মুখ ভ্যাংচানি বলে মনে হয়। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চওড়া হাড়ের উপর শুধুই চামড়ার ছাউনী, মাংস সব যেন ঝরে গেছে। গলাটা সরু হয়ে পড়েছে বলে মাথাটা অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে।

আমার হাতে রুমালে বাঁধা কয়েকটা কমলা লেবু ছিল।

দিন্দা সেটা দেখিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কি?

খুলে দেখে তো দিন্দার চোখ দিয়ে জল বেরোয় আর কি?

ছল ছল চোখে দিদিকে বললেন, দিদি, ওর কাণ্ড দেখলি? আর আমাকে একটা ফাঁপা ধমক দিলেন, এ পাকামি করতে তোকে কে বললে।

কিছু জবাব দিলাম না। দিদিকে প্রণাম করলুম। দিদি সস্নেহে বললেন, থাক্ ভাই। দিন্দার পাশে গিয়ে বসলুম। দিন্দা আবেগভরে আমার হাতে চাপ দিলেন।

বললেন, এতদিন দিদি আর ডাক্তার ছাড়া আর কারো মুখ দেখিনি। তোকে দেখে বাঁচলুম। হ্যাঁরে, পাঠচক্রটা উঠে গেছে না আছে?

লজ্জা পেলাম। দিন্দা আসবার সঙ্গে সঙ্গে তা উঠে গিয়েছিল। ঘাড় নেড়ে জানালুম, নেই, উঠে গেছে।

দিন্দা ম্লান কণ্ঠে বললেন, জানতুম।

এটা তিরস্কার না হতাশা, ঠিক বুঝলুম না। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হ'ল। সত্যি ওটা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে লাগলুম।

দিন্দা বললেন, তোরা ছেলেমানুষ, তোরা কি ওসব পারিস? আবার ওটাকে গড়ে তুলতে হবে। ভাবিস নে তুই, আমাকে একবার উঠতে দে, সব আবার গড়ে তুলব। তুই ভেবেছিস্, অসুখ হয়েছে বলে আমি চুপচাপ আছি? মোটেই নয়। কত প্ল্যান করেছি, সব এক এক করে কাজে লাগাতে হবে। ভারতের মাটিতে যতক্ষণ একটিও ইংরেজ থাকবে, ততক্ষণ স্বস্তি নেই। বিপ্লব চাই।

দিন্দার চোখে আগুন জ্বলে উঠল। মুখের ভাব কঠিন হয়ে এল, দৃষ্টি ভেসে গেল কোন সুদূরে। আমার হাত দুটো সজোরে দুহাতে চেপে দিন্দা চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, সশস্ত্র বিপ্লব চাই, আর্মড্ রিভলিউশন।

তারপরই মুখ গুঁজে পড়ে গেলেন। ভয় পেয়ে দিদিকে ডাকলুম। দিদি আর আমি দিন্দাকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম। দিদি দিন্দার চোখে জলের ঝাপটা মারলেন, আমি মাথায় বাতাস করলুম। দিন্দা একটু পরে সুস্থ হয়ে চোখ মেললেন।

ম্লান হেসে বললেন, গায়ে আর একদম জোর নেই। মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি কি না। একচল্লিশ দিন পরে ভাত খেয়েছি।

বললুম, চুপ করুন।

দিন্দা হাসলেন। বললেন, যারা আমার বাবাকে মেরেছে, আমার মাকে মেরেছে, আমার দেশকে পদানত করেছে, তাদেরকে যেদিন দেশ ছাড়া করবো, চুপ সেইদিন করবো।

শেষে দিদি ধমক লাগালেন। আমি চলে আসবার ভয় দেখালুম। তখন ঘণ্টাখানেকের মতো দিন্দা চুপ করলেন।

কিন্তু সারাদিন ধরে একটু একটু করে ওঁদের পারিবারিক ইতিহাস যা শোনালেন, সবটুকু জোড়া দিলে তা এক মহাভারত হয়ে পড়বে। বুঝলুম, দিন্দার মনে যে জ্বালা অহোরহ রয়েছে তার উৎস কোথায়।

দিন্দার যখন বার বছর বয়েস, আর দিদির বয়েস চোদ্দ, তখন দিন্দার বাবা

অ্যাক্সিডেণ্টে মারা যান। তিনি ন ইঞ্জিনিয়ার। সাহেবদের এক মিলে করতেন। প্রায় ছ'-সাত শ' টাকা ন পেতেন। একদিন কাজের সময় ং মেসিনের মধ্যে ডানহাতখানা ঢুকে ফলে বাহুমূল থেকে সেটা কেটে দিতে হয়। দিন্দার বাবা বছরখানেক মারা যান। ক্ষতিপূরণের কথা তুললে পানী আজকাল করে ঝুলিয়ে রাখে। ছিলেন খুব সাহেব ভক্ত। ওদের য় বিশ্বাস করে মামলা করেন নি। মারা যেতেই কোম্পানী ক্ষতিপূরণ অস্বীকার করে।

দিন্দার মা ছিলেন খুবই স্বিনী। তিনি কোম্পানীর নামে া রুজু করলেন। দুবছর মামলা । জমানো পুঁজি নিঃশেষ হ'ল, জমা বিক্রী হয়ে গেল। দিন্দার মা র পর একটা মামলায় হেরে ন। দিন্দার বাবার হাত মেসিনে পড়েছিল, কোম্পানী সেটা কার করলে। কোর্টেও তা প্রমাণ ।

মামলায় হেরে হেরে দিন্দার মা র অসুখে পড়লেন। দিদির বিয়েটা মতে এর মধ্যেই দিন্দার মা দিয়েছিলেন। বছর না ঘুরতেই সে হয়ে এল। মা আর এ শোক াতে পারলেন না। মারা গেলেন।

দিন্দা বললেন, মার শেষকথা কটা না কানে বাজে ভাই। মৃত্যুশয্যায় আমার দুটো হাত ধরে মা বলে- ন, দিনু তোকে রেখে যাচ্ছি আর শত্রুকে রেখে যাচ্ছি। হয় তুই, নয় জ, এদেশে দুজন যেন থাকিস নে ।

দিন্দা বললেন, ছ বছর হয়ে গেল। যেন মনে হয়, মা কাল মরল, লো এমন তাজা, রাত দিন বাজে। কি করব ভাই, হিংসায় অস্থির করে মারে। এই চিন্তা ছাড়া, আর কোনো কাজে মন পারিনে।

দিন্দা সেরে উঠল। আর ওঁর বাড়ী পারিনি। মাস ছয়েক পরে দিন্দা দন এসেছিলেন। সেইদিনই চলে গেলেন। শরীরটা মন্দ সারেনি। তবে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়া ভাব দেখলুম ওঁর। হয়ত ক্লান্তির জন্যই। ঘণ্টাখানেক একসঙ্গে ছিলাম। কিন্তু এবারে আর কথাবার্তা বিশেষ জমল না।

দিন্দাকে দেখে যতটা খুশী হয়েছিলুম, ততটাই হতাশ হলাম।

তারপর আমাদের গরমের ছুটি পড়ল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই মামাবাড়ী চলে গেলুম। মামাবাড়ী থেকে দিন্দাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলুম। তার মধ্যে না ছিল এমন জিনিস নেই। মামাবাড়ীর বর্ণনা। এখানে নতুন যে ছেলেটির সঙ্গে মাত্র আলাপ হয়েছে তাকে কি করে আমাদের ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক দলে আনা যায় তার পরামর্শ। দিন্দার নির্দেশমতো চলবার প্রতিজ্ঞা করে শপথ নিয়েছি, সেটা অব্দি তাঁকে জানিয়েছিলুম।

চিঠি ডাকে দেবার পর থেকে সে কি উৎকণ্ঠা নিয়ে গ্রামের ডাকঘরে প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি। কিন্তু জবাব আর আসে না। কেন? কি হ'ল? ঠিকানা ঠিক মতো লিখেছি কি? কত রকম চিন্তা যে আসত মাথায় তার ঠিক নেই। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, চিঠিখানা পুলিশের হাতে পড়েনি তো? সর্বনাশ! চোখে অন্ধকার দেখলুম।

(যতদিন না পুলিশের লাঠি খেয়েছি, ততদিন পুলিশের ভয়টা আমাকে ছাড়েনি। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছিল।)

পুলিশের ভয় ঢুকতেই আমার ঘুম মাথায় উঠল। ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলুম।

এমন সময় একদিন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় অপ্রত্যাশিতভাবে দিন্দার খবর পেলুম। ওদের গ্রামের এক ডাক্তারকে খুন করবার প্রচেষ্টার জন্য দিন্দার এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। দিন্দা খুন করতে গিয়েছে? দিন্দা? প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি।

কিন্তু বাড়ীতে ফিরে জানলুম ঘটনাটা সত্যি। কারণটাও জানলুম।

দিন্দার অসুখের সময় ডাক্তারটা ঘন ঘন ওদের বাড়ীতে আসত। সেই সময় দিদির সঙ্গে ডাক্তারের একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ডাক্তার দিদিকে বিয়ে করবে বলে ফুসলিয়েছিল। তারপর দিদির বাচ্চা হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ডাক্তার সরে পড়ে। দিন্দা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। দিদি ডাক্তারের পায়ে ধরে পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন ওকে বিয়ে করতে, অন্তত শুধু বিয়েটা করতে, ডাক্তারের ঘর করতেও চাননি। কিন্তু ডাক্তার সব কিছু অস্বীকার করে বসল। উপায়ান্তর না দেখে দিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। শোনা যায় সে বিষও নাকি ডাক্তারই দিয়েছিল।

দিদি মরবার দিন পাঁচেক পরই ডাক্তার বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। আর সেই দিনই নাকি দিন্দা ওকে খুন করতে যান। এক বাড়ী লোকের মধ্যে ডাক্তারের টুঁটি টিপে ধরেছিলেন।

উত্তরকালে দিন্দা সব চাইতে উগ্র বিপ্লবী হয়েছিলেন। তাঁর কৈশোরকালের সমস্ত রকম কোমলতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। মানুষকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছু দেখতেন না। যে জন্যে আমার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু সমস্ত রকম বৈষম্য স্বত্ত্বেও, এমনকি দিন্দারা আজ যদি রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পায়, কালই আমায় ফাঁসিতে ঝোলাবে, এ ধ্রুব জেনেও, যখনই দিন্দার পিছনের ইতিহাসটা আমার মনে পড়ে তখনই দিন্দার প্রতি সমবেদনায় মন ভরে ওঠে। এ অবস্থায় আমি পড়লে কি করতাম, কে জানে? রাষ্ট্রশক্তি যাকে আশ্রয় দেয় না, সমাজ যার উপর অন্যায় করে, তার বিপ্লবী হওয়া ছাড়া আর কি গতি?

চক্রদত্ত

প্লাস্টিকের যুগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এরপর আণবিক যুগের কথাই মনে হয় কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীতে আণবিক যুগকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারি না, বরং এক্ষেত্রে আমরা কাঁচের যুগের কথাই ভাবতে পারি। কাঁচের যুগের কথা মনে হলেই মনে হয় সে তো ক্ষণিকের জন্য হবে, কারণ কাঁচ যে ক্ষণভঙ্গুর। তবু এই ক্ষণভঙ্গুর কাঁচই মানুষের অনিত্য জীবনযাত্রায় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক হয়েছে। এমন দিন হয়তো শীঘ্রই আসতে পারে যেদিন মানুষ কাঁচের ঘরে বসে কাঁচের উনুনে রান্না করে খাবে— অবশ্য রাঁধবে যা তা কাঁচ নয় কাঁচা সব্জি। গৃহস্বামী হয়তো কাঁচের জামা জুতো টুপিতে সুসজ্জিত হয়ে পত্নীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবেন তিনিও কাঁচের সাড়ী, কাঁচের জুতায় সুশোভিতা। এর-পরেও হয়তো কর্তাকে কাঁচের ট্রেনে উঠিয়ে 'সি অফ' করে কাঁচের মোটরে গৃহিণী কাঁচের ঘরেই ফিরে এলেন। কর্তা অবশ্য প্রয়োজন বোধ করলে কাঁচের হেলিওকপটারেও উড়ে যেতে পারেন। এসব এখন রূপকথার মত শোনাচ্ছে কিন্তু এ যে অদূর ভবিষ্যতের কল্পনা তাও বুঝতে দেরী হয় না। বর্তমানেই আমরা কাঁচের ব্যবহার বহুক্ষেত্রে দেখতে পাই। মিঃ ফক্স নামে দক্ষিণ ইংলন্ডের এক ভদ্রলোক কাঁচের আঁশ দিয়ে একটি ২৭ ফুট লম্বা কাঁচের নৌকা তৈরী করেছেন। এটি ঘণ্টায় ১৭ 'নট' করে চলতে পারে। মিঃ ফক্স বলেন যে, কাঠের তৈরী নৌকার চেয়ে কাঁচের নৌকা অনেক ভালো কারণ ওজনে এটা হাল্কি হয়, কাঠের মত জল শুষে নেয় না আর পোকা লাগার ভয় থাকে না। তাছাড়া এই নৌকা তৈরী করতে কোনও নিপুণ কারিগরের দরকার হয় না। যে কোনও লোকই এই নৌকা তৈরী করতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে উপকূলরক্ষী নৌ-বহরে এই কাঁচের নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু নৌকা নয়, পরীক্ষামূলক-ভাবে কাঁচের মোটরও তৈরী করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এই-রকম মোটরগাড়ী জনসাধারণের ব্যবহারে লাগবে। এই কাঁচের আঁশ একটি অদ্ভুত আবিষ্কার বিশেষ। এক একটি আঁশ এক ইঞ্চির এক হাজার ভাগের একভাগ সরু হয় এমন কী এই এক হাজার ভাগ থেকে শুরু করে ৬০০০ ভাগের একভাগ মত সূক্ষ্ম আঁশও তৈরী হয়। সূক্ষ্ম আঁশগুলো রেজিনে ডুবিয়ে তারপর চাদর মত তৈরী হয়। এই কাঁচের চাদর থেকে যা কিছু তৈরী করা যায়। কাঁচের এই চাদর এলুমিনিয়মের চাদরের চেয়েও হাল্কা ও শক্ত। কাঁচের আঁশ দিয়ে সিল্কের সাড়ীর চেয়েও নরম ও পাতলা সাড়ী তৈরী হয়। কাঁচের কাপড়গুলো মোটেই ঠান্ডা নয় বরং গরম কাপড়ের পর্যায়ে ফেলা যায় কারণ কাঁচ একটি উত্তাপরক্ষাকারী বস্তু বিশেষ। কাঁচের কাপড় যে কোনও রঙের কিংবা যে কোনও ছাপের হতে পারে। কাঁচের কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতে হয় না কোনও একটা ভিজে কাপড় দিয়ে ঘষে মুছে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। পশম ও সুতি কাপড়ের মত বর্ষার দিনে কাঁচের কাপড় স্যাঁতস্যাঁতে হয় না। বর্তমানে এয়ারো-প্লেনের কাঠামোটা অবশ্য কাঁচের তৈরী হয় না তবে বহু অংশ কাঁচের কাপড়ে তৈরী হয়। এগুলো খুব মজবুত ও হাল্কা, তাপ প্রতিরোধক এবং যেমন তেমনভাবে ভাঁজা যায়। এইসব সুবিধার জন্য এয়ারোপ্লেনের ডানাগুলো, সার্সি ও মেজে তৈরী ইত্যাদি ব্যাপারে এই কাঁচের চাদর ব্যবহার করা হচ্ছে। বাক্স, চেয়ার, ফ্রিজিডেয়ারের ভেতরের আস্তরণ ইত্যাদি তৈরীর জন্যও কাঁচের চাদর খুব ব্যবহার করা হচ্ছে। কাঁচের আঁশ, চামড়া বা প্লাস্টিকের সঙ্গে মিশিয়ে জুতো, সুটকেশ, বেল্ট প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। কাঁচের ইট দিয়ে বাড়ী তৈরী করে দেখা গেছে যে, ঐ কাঁচের বাড়ী একটি কংক্রীটের বাড়ীর মতই মজবুত হয়। কোনও একটি কোম্পানী এই কাঁচের বাড়ী তৈরী চালু করেছে ইংলন্ডের একটি কারখানায়। কাঁচ দিয়ে মাছধরা ছিপ তৈরী হয়েছে আর ঐ ছিপ পৃথিবীর সর্বত্রই বেশ সমাদর লাভ করেছে। সাধারণ ছিপ যে ক্ষেত্রে সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে কাঁচের ছিপ সেক্ষেত্রে অত সহজে ভাঙ্গে না। এরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, ½ ইঞ্চি সরু একটি কাঁচের ছিপ দিয়ে একটি ২৫০ পাউন্ড মাছ ধরা যায়। কাঁচের সার্শিতে একটু অসুবিধা হয় কারণ সার্শির ওপর তুষার জমে গেলে সরানো শক্ত হয় সেজন্য আজকাল কাঁচের ওপর টিনের একটি পাতলা আস্তরণ লাগান হয় আর এতে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত করে দিলে তুষার গলে কাঁচ স্বচ্ছ হয়ে যায়। সার্শির কাঁচ হিসাবে ব্যবহারের জন্য আজকাল আর এক ধরণের নতুন রকম কাঁচ বার হয়েছে। এগুলো ঘরের 'স্কাইলাইটে' ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী কারণ এই কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যের তাপ শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে ঘরের মধ্যে সমান-ভাবেই যায়। সকালে সূর্যোদয়ের সময় কিংবা শীতকালে যখন সূর্যের তাপ কম থাকে তখন সমস্ত তাপটা বর্ধিত হয়ে ঘরের মধ্যে আসে আবার খুব গরমের দিনে সূর্যের সমস্ত তাপটা ঐ কাঁচের মধ্য দিয়ে ঘরে আসতে পারে না। ফলে দিনের সমস্ত সময়ে এমন কী সারা বৎসরের মধ্যে ঘরের উত্তাপের তারতম্য ঘটে না। সার্শির কাঁচই সমতা রক্ষা করতে পারে।

*

দোকানে গিয়ে এক চাঁই দুধ চাইলে আশপাশে অনেকেই হেসে উঠতে পারেন, কিন্তু আজকাল এই চাঁই বাধা দুধ বিক্রীর ব্যবস্থা হচ্ছে। জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই জমাট বাধা দুধের প্রচলন করেছেন। তিনি বলেন, তরল দুধের চেয়ে বাজারে এই দুধ নির্ভেজাল অবস্থায় পাওয়া যাবে। দুধ জমাট বাধানোর আগে একে প্যাস্তুরাইজড করে নেওয়া হয়। এই রকম চাঁই বাধা দুধের দামও কম হবে।

মিস অ্যাডভেঞ্চার

অনুসন্ধানী

কলকাতা থেকে মাইসোর চলেছি। রেলের কামরায় আশাতিরিক্ত রকমের লা সহযাত্রী জুটে গেল। ভদ্রলোক লা দেশের না হলেও বাঙলার নিকট বেশী, সস্ত্রীক ম্যাড্রাস চলেছেন নতুন নিয়ে। তাছাড়া তিনি ও আমি নেই এক কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আলাপ থাকলেও নাম শোনা ছিল আগে চই। সুদীর্ঘ পথ সুতরাং আলাপ জমে উঠল।

কথায় কথায় বনজঙ্গলের কথাও এসে ন, প্রশ্ন হল অরণ্যচারীদের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার আছে, তাই নয় কি? প্রশ্নের জবাব বড় মুশকিলের। গল্পে সব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী থাকে বে সে রকম ঘটে না। বিজন বনে অন্ধকার রাতে গাছে চড়ে যখন নীর নায়ক আত্মরক্ষার চেষ্টা করে; নীচে চিতাবাঘ আর উপরে অজগর যং আক্রমণ করে বসে, গাছ থেকে ক নায়ক হয়ত বাঘের পিঠের পরেই পড়ে, কিন্তু প্রাণে বেঁচে যায়, কারণ র তাড়া করে বাঘকে আর বাঘ কামড়ে সাপকে মাঝখান থেকে নায়কের প্রাণ যায়। বাস্তবে কিন্তু বাঘের দেখা সাপের লেখা থেকে প্রাণটা সত্যিই না, যদি বাঁচে তবে সেটা ঠিক অ্যাড-র হয় না।

আবু সাহেবের সিগ্রেট খাওয়া অভ্যাস র গল্প মনে পড়ে গেল। চার বন্ধুতে ঙ্গে চাকরি নিয়ে এসেছেন বিহার ও উড়িষ্যার জঙ্গলে, তখনকার দিনে ও দুটো রাজ্য একসাথে জোড়া ছিল। সারি সারি তাঁবু পড়েছে, তাতে একদিকে থাকে সাদা আদমি অপর দিকে কালোর দল। চার-জনের চারটে আলাদা তাঁবু হলেও, রাত কাটে চারজনের এক তাঁবুতেই কারণ সদ্য কলকাতা ছেড়ে এই দারুণ জঙ্গলে এসে বাঘের ডাকের ভিতরে একা একা আলাদা তাঁবুতে ঘুমনো অসম্ভব না হলেও, বেশ শক্ত।

তখন শীতকাল, সকাল নটা পর্যন্ত বনের ভিতরে ঘাসের উপরের শিশির শুকোয় না, আর মাথার উপরে গাছের পাতা থেকে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে টুপটাপ। আবু সাহেব চলেছেন ছোট একটি পাহাড়ী নদী অনুসরণ করে। সঙ্গে একদল জংলী লোক যদিও আছে, তবু পথ-প্রদর্শকের কাজ করছে ঐ নদীটি। নদীর দুধারে নিবিড় বন তার ভিতরে সব জায়গাই এক রকম দেখতে, সেখানে একবার পথ হারালে কোনও কপালকুণ্ডলা পথ দেখাতে আসবে না। চলেছেন নদীস্রোতের বিপরীত মুখে, ফিরতে হবে অনুকূল স্রোতে।

পাহাড়ী নদী, তার দুদিকে খাড়া পাড়; অরণ্যভূমি থেকে প্রায় বিশ হাত নীচে ঝির ঝির করে একটুখানি জলের ধারা চলেছে তাতে হয়ত পায়ের পাতা ডোবে না। স্বচ্ছ জল, তার নীচে কাদা নেই, আছে অসংখ্য পাথরের নুড়ি; সাদা, লাল, কালো, হলদে, আরও কত রঙের কিন্তু তার ভিতরে নামবার উপায় নেই; সংকীর্ণ নদীখাতের গর্ভে তখনও সকালের রোদ এসে পৌঁছয়নি, সুতরাং ভীষণ ঠাণ্ডা আর মশা তার মধ্যে বাসা করেছে, শীতের সকালে সেখানে নামা বেশ কঠিন।

মাইল কয়েক হাঁটবার পরে দেখা গেল নদীর অপর পারে অনতিদূরে এক পাথরের পাঁচিল খাড়া হয়ে আছে। সেইটি ভালো করে দেখবার জন্য আবু সাহেব চললেন নদীর অপর তীরে। খাড়া পাড় বেয়ে নামা বেশ কষ্টকর, ওঠাও সহজসাধ্য নয়। বহু আয়াসে অপর তীরের উঁচু পারে পৌঁছে একটু দম নেবার জন্য দাঁড়াতেই আবার বেদম হবার দাখিল হল।

সামনে দশ বারো হাত দূরে এক বাঘ দাঁড়িয়ে আছে

সামনে দশ বারো হাত দূরে এক বাঘ দাঁড়িয়ে আছে। চিতা নয় ডোরাদার, সুন্দরবনের সোদর ভাই না হলেও খুড়তুত-জ্যাঠতুত নিশ্চয়ই হবে, বিশ্রামে হঠাৎ ব্যাঘাত ঘটায় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। আবু সাহেব স্তম্ভিত, পালাবার পথ নেই, না মানুষের না বাঘের। বাঘের পিছনে পাথরের পাঁচিল সামনে মানুষ আর তারপরেই গভীর নদীখাত। ডাইনে বাঁয়ে পথ আছে, কিন্তু তা কাঁটা ঝোপে ভর্তি।

জংলীদের একজন মৃদুস্বরে বলল, "জ্বালাকাঠির বাক্সাটো দে"। পকেটে হাত দিয়েই মনে পড়ল যে দেশলাইয়ের বাক্সটি তাঁবুতে টেবিলের উপরে পড়ে আছে, ভুল করে সঙ্গে আনা হয়নি। অতি সন্তর্পণে একজন জংলী বসে পড়ল, ধীরে ধীরে শুকনো পাতা জড়ো করে কাঠে কাঠে ঘষে আগুন তৈরি করে লাগাল তাতে। এমন করে আগুন জ্বালতে প্রায় চার মিনিট সময় লাগে, আবু সাহেবের মনে হল যেন চার ঘণ্টা কেটে গেল। মানুষ ও বাঘ এতক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে ছিল, আগুন বেশ ভালো করে জ্বলে উঠতেই বাঘ দিল লাফ।

আবু সাহেবের ঘাড়ের 'পরে নয়, বাঁ দিকের কাঁটা ঝোপ পার হয়ে বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দুই সঙ্গী আবু সাহেবের দুই হাত ধরে বলল, "দেলা বোঁ" অর্থাৎ চল পালাই, তারপরেই ডান দিকের কাঁটা ঝোপ ভেদ করে দৌড়।

সেই দিন সন্ধ্যায় চার বন্ধুর পরামর্শ সভা বসল, আলোচ্য বিষয় বর্তমান পরিস্থিতিতে কি কর্তব্য? একজন প্রস্তাব করলেন যে, ধূমপান অভ্যাস করা হোক, তাহলে জঙ্গলের পথে দেশলাই নিতে কোনোদিন ভুল হবে না। সেদিন থেকে চলল সিগ্রেট খাওয়া, কিন্তু দিনে-দুপুরে বনের মাঝে বাঘের সামনে আগুন জ্বালবার আর দরকার হয়নি।

* * * *

পুরনো বি এন আর-এর আমদা-জামদা লাইন তখনো তৈরি হয়নি; মনোহরপুর স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে তখন ঐ অঞ্চলে যেতে হত। ওখানকার এক ছাউনিতে একবার এক মৌলবী সাহেব এলেন খাস কলকাতা থেকে। দুপুরের গুরুভোজনের ফলেই হোক কিম্বা প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই হোক ঠিক সন্ধ্যার পরেই মৌলবী সাহেবের একবার বদ্না হাতে যাবার দরকার হল। ছাউনির সাহেবি ব্যবস্থা ভদ্রলোকের পছন্দ নয়, তিনি বদ্না হাতে বাইরে চললেন। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত, চারিদিকে জঙ্গল, সকলেই বললেন যে, বেশী দূরে যাবার দরকার নাই সামনেই কোথাও বসে পড়ুন সকালে লোক ডেকে জায়গাটা পরিষ্কার করিয়ে ফেললেই হবে।

কিন্তু একটুখানি আড়ালের জন্য ভদ্রলোক ছাউনির কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে চলে গেলেন। ফিরতে দেরী দেখে সবাই আলো ও লোকজন যোগাড় করে তাকে খুঁজতে গেলেন। বেশী দূরে যেতে হল না, কাছেই দেখা গেল বদ্না ও লুঙ্গি আছে, কিন্তু তাদের মালিক নেই। সে রাতে যতদূর সম্ভব খোঁজা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে, পাওয়া গেল পরদিন সকালে ছাউনি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে এক ঝোপের ভিতরে। মৃতদেহের সবটা তখনো বাঘে খেতে পারেনি।

* * * *

মধ্যপ্রদেশের এক মালভূমিতে একবার কয়লা খোঁজা হচ্ছে। সে এক অদ্ভুত জায়গা, তার সবটাই প্রায় শিলং শহরের মতন উঁচু-নিচু; নালা কিন্তু সবই বেশ গভীর, তাদের কয়েকটিতে সূর্যের আলো ঢোকে না। এই সব খাতের ভিতরে বর্ষা

ল মাটি ও পাথর ধুয়ে নিয়ে গিয়ে লের কয়লার স্তর মাঝে মাঝে অনাবৃত রে ফেলেছে। কয়লার খোঁজ করতে হলে ই সব জায়গা সর্বাগ্রে দেখা দরকার। দী যেখানে কয়লা-স্তরের ঢালুর পেরীত মুখে প্রবাহিত সেখানে প্রায়ই চটখাটো জল-প্রপাত দেখতে পাওয়া য়। শুকনো নদীতে অবশ্য জল-পাত থাকে না, কিন্তু তার উচ্চতার নামগুসাটুকু থাকে। নরম কয়লা অথবা থের ক্ষয়ে যেয়ে এখানে ছোট-বড় গুহা , আর সেই গুহা হচ্ছে ভালুকদের ধান আস্তানা।

সেবারে চিরিমিরিতে (মধ্যপ্রদেশ) ঐ মে এক গুহার মধ্যে কয়লার খোঁজে কি মারতেই একসঙ্গে তিনটে ভালুক র ভিতর থেকে তেড়ে এলো, দুটো ড়ী আর একটা বাচ্চা। সেই সংকটময় হূর্তেও মনে পড়ে সুকুমার রায়ের অমর ছা—"আমি আছি গিন্নী আছেন, আছেন মার নয় ছেলে, সবাই মিলে কামড়ে দেব থো অমন ভয় পেলে"। কিন্তু বাঁচিয়ে ল তারাই যারা ভয় পেলো। দুজন জুরের কাঁধে লাঠিতে ঝোলানো এক লসী জল ছিল, তারা সেটা ফেলে দিয়ে লোবার জন্য নীচে লাফিয়ে পড়তেই লসীটা বিকট শব্দে ভেঙে গেল আর ই আওয়াজে ভয় পেয়ে তিন ভালুক ন দিকে পালালো। ধীরে ধীরে গুহা কে নীচে নেমে দেখা গেল, শুধু জল-হকদের একজনের পা মচকে গিয়েছে কী সবাই অক্ষত দেহে বিরাজমান।

জঙ্গলে ঘুরতে হলে মাঝে মাঝে কটু আধটু বেয়াড়া পরিস্থিতির মাঝে ড়তে হয়। একবার কিয়ঞ্ঝড় জেলার লন্দী নদীর পারে এক বিকেল বেলায় য়ে তাঁবু খাড়া হল। ঠিক সেই রাতেই টি বুনো হাতি এসে নদীর জলে খেলা রু করল, এত যে শীত তাতে তাদের ক্ষেপ নাই। ওদিকে তাঁবুর ভিতরে মনো অসম্ভব হয়ে উঠছে, কারণ, খেলতে লতে হাতিরা যদি তাঁবুকেও এক খেলার থী ভেবে নেয় তবে চিঁড়ে-চেপ্টা হতে কটুও দেরী হবে না।

আলো জেবলে, লরীর হর্ন বাজিয়ে, নারকম চেন্টা হল, কিছুতেই তারা যায় না, শেষে ইঞ্জিনের কয়েকবার গোঁ গোঁ আওয়াজ ও লরীর আলো তাদের দিকে ফেলতে তারা নদী ছেড়ে অপর পারের গ্রামে যেয়ে ঢুকল। সেখান দিয়ে যাবার সময় একখানা ঘর ভেঙে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু আমরা রক্ষা পেলাম।
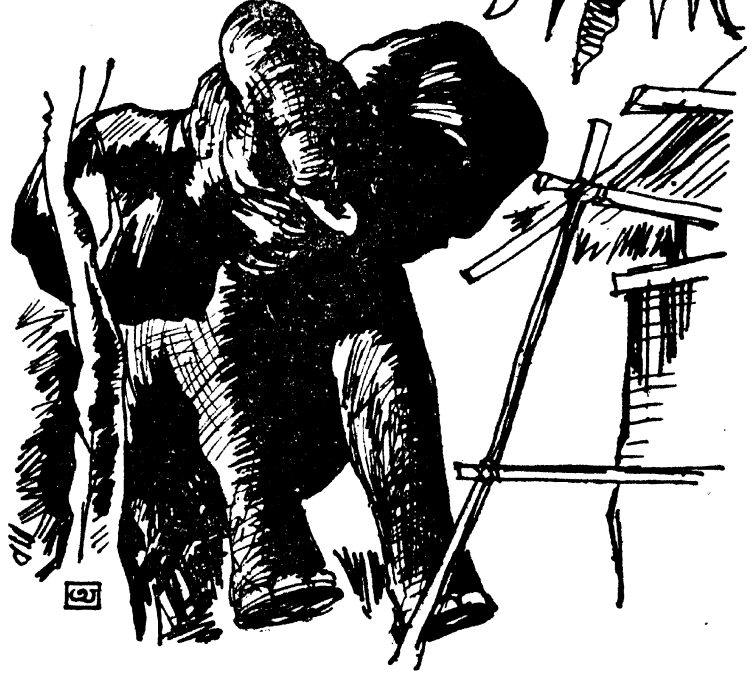
যাবার সময় একটা ঘর ভেঙে দিয়ে গেল

শুধু বুনো জানোয়ারেই ফ্যাসাদ বাধায় না কখনো কখনো পোষা জানোয়ারেও মুশকিলে ফেলে। ছাউনিতে কুকুর রাখা মানে চিতাবাঘকে নেমন্তন্ন করে আনা। কুকুর ও চিতার সম্পর্ক নাকি কুকুর ও বেড়ালের সম্পর্কের মত। কিন্তু এ সবের চেয়েও নিরীহ ফ্যাসাদ আছে।

বহুদিন পূর্বের কথা। উড়িষ্যার বোনাই রাজ্যের এক ছাউনিতে তখন কাজ চলেছে পুরাদমে। সার্ভেয়ার নিরাপদ-বাবুকে প্রতিদিন ছাউনি থেকে অনেক দূরে হেঁটে যেয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছুতে হয়। যাওয়া তত কষ্ট নয়, কিন্তু সারা-দিনের কাজের শেষে সাত-আট মাইল পথ হেঁটে ফেরা খুব ক্লান্তিকর। অনেক ভেবে নিরাপদবাবু স্থির করে ফেললেন যে একটি ঘোড়া কিনতে হবে, তাহলে পথ হাঁটার কষ্ট আর থাকবে না।

পানপোশের মেলা থেকে এক ঘোড়া কিনে আনা হল, কিন্তু ঘোড়ার জিন, লাগাম, প্রভৃতি পাওয়া গেল না। যাই হোক, ছাউনিতেই দড়ি-শিকল দিয়ে লাগাম তৈরি করা হল, জিনের বদলে এক চটের বস্তা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দিয়ে তার উপরে এক ছিপ্‌টি হাতে নিরাপদবাবু অধিষ্ঠিত হলেন, ঘোড়া টগবগিয়ে চলল।

আলগা চটের বস্তা বেশীক্ষণ ঘোড়ার পিঠে রইল না, কয়েক গজ যেতে না

যেতেই তা টুপ করে পড়ে গেল, কিন্তু নিরাপদবাবু তাতে নিরস্ত হলেন না, তিনি এগিয়ে চললেন। কর্মক্ষেত্রে যেতে হলে কোন্দ্রা নদী পার হয়ে যেতে হয়। ছোটপাহাড়ী নদী, দুদিকে সুউচ্চ পাড়, তলা দিয়ে ক্ষীণ স্রোতধারা অসংখ্য পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে এ'কে বে'কে চলেছে। পাছে ঘোড়া হোঁচট খায় তাই নিরাপদ-বাবু অতি সন্তর্পণে ঘোড়াকে নদীতে নামালেন। জল পার হয়ে ঘোড়া চড়াই উঠতে লাগল। সব রকম সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু এইবার নিরাপদবাবুর নিরাপত্তা আর বজায় রইল না।

ঘোড়া চড়াই বেয়ে উঠছে, তার সামনের দিক উ'চু আর পিছন দিক নীচু তাতে আবার জিন-রেকাব নাই। ঘোড়া যত উপরে ওঠে নিরাপদবাবু ততই ঘোড়ার পিঠে বসে পিছু হটতে থাকেন, এমনি করে পিছুতে পিছুতে এক সময় ঘোড়া ফুরিয়ে যেতেই—ধপাস। হাতের লাগাম ফস্কে নিরাপদবাবু একদম চিৎপটাং হয়ে পড়লেন, ঘোড়াও ভারমুক্ত হয়ে এক ছুটে আবার তাঁবুতেই ফিরে গেল।

খালি ঘোড়া দেখে ছাউনি থেকে লোকজন হৈ-হৈ করে ছুটে এসে নিরাপদ-বাবুকে চ্যাংদোলা করে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সেখানে দেখা গেল যে, হাড়টাড় কিছুই ভাঙেনি, শুধু বস্তা আর ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে ঘষা লেগে দুই পায়ের ভিতর দিকের চামড়া জায়গায় জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। ফার্স্ট্-এইড পাশ-করা মৈত্র মহাশয় নিরাপদবাবুর বন্ধু। তিনি বললেন, ঘোড়ার লোমে অথবা গায়ের ঘামে নানারকম বিষ থাকতে পারে, সুতরাং ঐ ছড়ে যাওয়াকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, এখুনি আইডিন লাগানো হোক।

একজন দৌড়ে যেয়ে আইডিনের বোতল নিয়ে এলেন, কিন্তু তুলোর বাণ্ডিলটা কোথায় আছে, খুঁজে পেলেন না। মৈত্র মহাশয় ইঞ্জিনীয়ার মানুষ, তিনি তাড়াতাড়ি এক থাবা কটন-ওয়েস্ট নিয়ে তাতে গব্‌গব করে খানিকটা আইডিন ঢেলে খুব করে ঘষে দিলেন নিরাপদবাবুর পায়ে।

জ্বলুনী শুরু হতেই নিরাপদবাবু চীৎকার করে লাফাতে লাগলেন, আর মৈত্র মহাশয় তার পিছনে উবু হয়ে সেই নৃত্যের তালে তালে ফু' দিতে থাকলেন সমানে। কিছুক্ষণ এই রকম ডুয়েট চলবার পর দুজনেই বেদম হয়ে শুয়ে পড়লেন, সেদিন আর কাজে যাওয়া হল না।

এখন অবশ্য মৈত্র মহাশয় ফু' দেবার কথা অস্বীকার করেন, বলেন যে, ফু' নয়, হাত-পাখা দিয়ে বাতাস করেছিলেন।
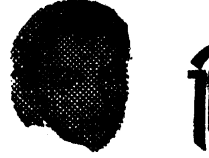
॥ এগারো ॥

বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীর চরম লক্ষ্য যেমন শ্রীবৃন্দাবন, আমাদের অর্থাৎ সেবকযাত্রীর পরম তীর্থ তেমনি ন জেল। ডিস্ট্রিক্ট আর স্পেশ্যাল লো যেন ওয়েসাইড্ স্টেশন। সেণ্ট্রাল টার্মিনাস। এখানে এলে মনে হবে, এইবার এসে পড়েছি। আমার প্রথম মোবারক আলি তাঁর ক্ষুদ্র পার্বত্য টর দিকে তাকাতেন আর বলতেন, ছা, এ আবার একটা জেল! চাকরি গেছে বটে সেই অমুক সেণ্ট্রাল । কর্নেল ম্যাকফারসন্ সুপারি- ণ্ট, গণপতি সান্যাল জেলর। সে দন—ইত্যাদি। বলতে বলতে চোখ তার সজল হ'য়ে উঠত। মুখের দীপ্ত আলো ফুটিয়ে তুলত সেই গৌরবময় দিন, আলি সাহেবের ন যারা এনেছিল "পরম লগন"। া এক দুর্বল মুহূর্তে একদিন আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর নের চরম আকাঙ্ক্ষা। রাজত্ব নয়, ় নয়, জমিদারি জায়গীরদারিও নয়, া একটি সেণ্ট্রাল জেলের জেলরের ন। কিন্তু হায়! এ আশা জীবনে পূর্ণ হয়নি। থাক্ সে

"স্বদেশী স্পেশ্যাল" থেকে সেণ্ট্রালে া প্রথম এলাম, মনে হ'ল, দীনেশ তের গ্রাম্য পাঠশালা থেকে আর একবার শহরের মিশনারী ইস্কুলে প'ড়তে এসেছি। এলোপাথাড়ী হট্টগোলের এলাকা শেষ হ'ল। ঢুকলাম এসে সুশৃংখল এবং সুসংবদ্ধ নিয়মের রাজ্য-সীমায়। দু'ধারে দীর্ঘ পরিচ্ছন্ন ব্যারাক। মাঝখানে প্রশস্ত বাঁধানো পথ। আশে পাশে সুবিন্যস্ত পুকুর, বাগান, ফুলের কেয়ারী। এখানকার যারা অধিবাসী, তাদের পোশাক অভিন্ন। জাঙ্গিয়া কুর্তা, কোমরে গামছা, মাথায় টুপি। তারা "ফাইলে" চলে, ফাইলে বসে, ফাইলে খায় এবং ফাইল করে ঘুমোয়। এদের দৈনন্দিন জীবন কতগুলো প্যারেডের সমাহার—ল্যাট্রিন প্যারেড্, বেদিং প্যারেড্, ফিডিং প্যারেড্, ওয়াশিং প্যারেড্ আরো কত কি প্যারেড্। সুদক্ষ সেনানায়কের মত এই প্যারেড্গুলো চালনা করে যে-সব কয়েদি-প্রধান, তাদের নাম মেট্। তাদের পরনে কুর্তার বদলে কোট, কোমরে চাপরাশ, পায়ে স্যাণ্ডাল্। এই মেট্-গোষ্ঠীই হ'চ্ছে কারা-শাসনের স্টীল-ফ্রেম্, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে বৃহৎ বৃহৎ জেলের ডিসিপ্লিন। আহারে, বিহারে, কর্মে এবং দুষ্কর্মে সাধারণ কয়েদির জীবনযাত্রা এই মেট্-রাজতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা মেটের ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, মেটের ডাকে জাগে।

সেণ্ট্রাল জেলের রাষ্ট্রতন্ত্রে সুপারের যে Sovereignty বা পূর্ণাধিপত্য, সেটা হ'চ্ছে De jure, ডি ফ্যাক্টো অধীশ্বর যিনি, তাঁর নাম চীফ্ হেড্ওয়ার্ডার বা বড় জমাদার। মেট্-রাজতন্ত্রের তিনিই কর্ণধার এবং তাঁর হাতে আসল শাসন-দণ্ড। সুপারের হাতে যে-শাসন, সেটা হ'চ্ছে Rule of Law, আর চীফের হাতে যে শাসন তার নাম Ruleof awe. প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয়টা যে অনেক বেশী কার্যকরী, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মুরুব্বি মহলে দ্বিমত নেই। লাঠির মাহাত্ম্য যে কতখানি জীবন্ত, এইখানে এসেই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম, এবং সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলাম, বঙ্কিমচন্দ্র যে লাঠি-প্রশস্তি গেয়ে গেছেন, এ যুগেও তার মধ্যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি পাওয়া যাবে না।

কারারাজ্যের প্রধান বিভাগ দুটি—General Department বা সাধারণ বিভাগ, আর Manufactory Department বা উৎপাদন বিভাগ। প্রথমটির উপর ন্যস্ত রয়েছে তার শাসকমণ্ডলীর পরিবহন এবং শাসিত বাহিনীর পরিচালন, তাদের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ডিসিপ্লিন। দ্বিতীয়টিতে জড়িত রয়েছে শিল্প বাণিজ্য এবং কর্ম-সংস্থান। সেণ্ট্রাল জেলগুলো শুধু জেল নয়, ছোট-খাট শিল্পকেন্দ্র, নানা শিল্পের মিলন-ক্ষেত্র—ঘানি, তাঁত, সতরঞ্চি, দরজি-শাখা, বাঁশ, বেত, কাঠ এবং লোহালক্কড়ের জড়াজড়ি। এখানে টাটানগরের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে আমেদাবাদ, বৌবাজারের

সঙ্গে খিদিরপুর। এ ছাড়া জেল-প্রাচীরকে বেষ্টন ক'রে র'য়েছে তার বিস্তৃত সব্জি-ক্ষেত।

সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ফোরম্যান্ পরিতোষবাবু খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। গর্বের সঙ্গে বললেন, সব তার নিজের হাতে গড়া। কিন্তু কী লাভ ভূতের বেগার খেটে? ডেপুটি-সুপার হবার পথ খোলা নেই কোনো কালা আদমির। ওটা শ্বেতচর্মের বিশেষ অধিকার, মগজের বর্ণ তার যাই হোক্। সব ওয়ার্কশপে পুরোদমে কাজ চ'লেছে। শুধু একটা দেখলাম, বন্ধ। পরিতোষ বললেন, এটা হ'চ্ছে পেতল কাঁসার কারখানা। ক'দিন আগেও এখানে দাঁড়ালে মাথা ধ'রে যেত এর ঠনাঠন শব্দে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি তৈরি হ'ত এখানে?

পরিতোষবাবু বললেন, বেশির ভাগ, ঘণ্টা—ছোট বড় নানারকমের গঙ্। জেলে জেলে যে-সব ঘণ্টা দেখেন, সব আমাদের তৈরি। শুধু জেল কেন, ইস্কুল, কলেজ, থানা, কাছারি, চার্চ এবং আরো কত জায়গা থেকে অর্ডার পাই আমরা। আপনার কলেজে যে ঘণ্টাটা বাজত, হয়তো সেটা আমরাই পাঠিয়েছিলাম একদিন।

—তা হ'বে। বোধ হয় সেই ঘণ্টার টানেই এখানে এসে প'ড়েছি।

পরিতোষবাবু হেসে উঠলেন। বললাম, কাজ বন্ধ কেন? অর্ডার নেই বুঝি?

—অর্ডার আছে বৈ কি? কিন্তু যোগেন নেই।

—যোগেন কে?

—যোগেন ছিল এখানকার Instructor, জেলে যাকে বলে ইর্সাপন্দার। সে ব্যাটা খালাস হ'য়েছে এই মাসখানেক। ওরকম পাকা কারিগর আর পাচ্ছিনে। তাইতো হাঁদাটাকে বললাম, অর্ডারগুলো ফেরৎ দাও, আর একটা সার্কুলার ক'রে দাও যে, ঘণ্টা আমরা আর দিতে পারবো না। ও কি বলে, জানেন? বললে, why? Let Jogen come. শুনুন কথা! যোগেন আসুক! আরে, যোগেন যদি আর চুরি না করে, তার যদি জেল না হয়, আমরা জোর ক'রে ধ'রে আনবো তাকে?

এই "হাঁদা" ব্যক্তিটি যে শ্বেতচর্ম ডেপুটি সুপার সেকথা বুঝতে অসুবিধা হ'ল না।

আরো কিছুদিন গেল। পেটা ঘণ্টার অর্ডার জ'মে উঠল। দু'চারটা তাগিদও আসতে শুরু করল। ডেপুটি সুপার বিব্রত বোধ ক'রলেন। যোগেনের দোস্ত ছিল মহীউদ্দিন। তাঁতে কাজ করে। তাকে ডেকে পাঠান হ'ল। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, যোগেনের কি হ'ল? সে আসছে না যে?

মহীউদ্দিন বলল, সে হামি বাহার না গেলে কেমন কোরে বোলবো হুজুর?

—টোমার আর কটোডিন বাকী আছে?

—একুশ রোজ সাব্।

—টিকেট লেয়াও।

মহীউদ্দিনের টিকেট আনা হ'ল। ডেপুটি সুপার উৎকৃষ্ট কাজের পুরস্কার স্বরূপ তার কুড়ি দিন special remission বা বিশেষ ধরণের জেল-মকুফ্ সুপারিশ করলেন। সুপারের মঞ্জুরি এসে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে, মহীউদ্দিন পরদিনই খালাস হ'য়ে গেল।

দিনসাতেক পরে যোগেন এসে সেলাম ক'রে দাঁড়াল সাহেবের আফিসে। পকেট-কাটার অপরাধে আড়াই বছর জেল। এইবার নিয়ে আটবার হ'ল তার শুভাগমন। সাহেব দেরাজ থেকে পেটা-ঘণ্টার অর্ডারগুলো বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললেন, টুমি বড্ড বডম্যাস আছে, যোগেন কর্মকার। এথ্না দেরি কাঁহে হুয়া?

যোগেন জবাব দিল না; মুচ্‌কে হাসল শুধু একবার।

পরদিন সকাল থেকেই ঘণ্টাওয়ালা-দের ঠনাঠন্ শব্দে যথারীতি মাথা-ধরা শুরু হ'ল পরিতোষবাবুর।

যোগেন দু'টো একটা নয়। বছরের পর বছর ধ'রে শত শত যোগেন এমনি ঘুরে ঘুরে আসে, ধরা দেয় এই লৌহ-তোরণের বাহু-বন্ধনে, সূর্যের চারদিকে যেমন করে ঘোরে গ্রহ আর উপগ্রহের দল। কী প্রচণ্ড আকর্ষণ! সারা জীবনেও এ পরিক্রমার বিরাম নেই। পাঁচবার, দশবার তো হামেশাই আসছে যাচ্ছে, বিয়াল্লিশ বার জেল খেটেছে, এমন এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এই সেণ্ট্রাল জেলের হাসপাতালে। প্রথম যেদিন আসে, তার বয়স ছিল দশ। চুরাশী বছর বয়সে এইখানেই পড়ল তার শেষ নিঃশ্বাস।

এদের অনেককেই দেখলাম। ভদ্র, বুদ্ধিমান, চটপটে, কাজের লোক এবং এমন সব কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী যার কোনো একটা অবলম্বন ক'রে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার অভাব হবে না জেলের বাইরে কোনো জায়গায়। কিন্তু সে প[illegible] এরা যায় না। জেলের ডাক এদের [illegible] দুর্নিবার।

রোজই এদের কেউ না কেউ [illegible] পাচ্ছে। মাতব্বর গোছের একজনকে একদিন পাকড়াও করা গেল। আ[illegible] থেকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে বললাম, [illegible] কোথাও নেই। একটা সত্যি কথা ব[illegible]

মহেশ দাঁতে জিব্ কেটে [illegible] পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, [illegible] কেলাসই হই আর যাই হই, হুজুরের কাছে কি মিথ্যে বলতে পারি?

—জেলে আসিস্ কেন?

মহেশ অসঙ্কোচে জবাব দিল, [illegible] ক'রে কি আর আসি বাবু? [illegible] পকেট মারতে গেলে হঠাৎ ধরাও পড়[illegible] হয় দু' একবার। হাত-সাফাই-এর ক[illegible] সবগুলো কি আর উৎরে যায়?

—পকেট মারিস কেন?

—শোনো কথা! পকেট না মার[illegible] খাবো কি?

—কেন? দেশে কত লোক [illegible] কাজ ক'রে খাচ্ছে। তোর মত এ[illegible] পাকা তাঁতীর কাজ জুটবে না?

মহেশ হেসে বললো, আপনি ভু[illegible] যাচ্ছেন, হুজুর, পুরনো চোর আ[illegible] আমার মত লোককে কাজ দেবে [illegible] আপনি বললেন, ব্যবসা কর্। কি[illegible] ব্যবসার গোড়ার কথা হ'ল বিশ্বা[illegible] পুরনো চোরকে বিশ্বাস করে কে[illegible] পুঁজি নেই; ধারে মাল পাবো না; [illegible] জিনিস বিক্রী ক'রতে গেলে লোকে ব[illegible] চোরাই মাল। ধ'রে নিয়ে যাবে থা[illegible] তারপর ঘুরে ফিরে আবার সেই জে[illegible]

লাম, কোনো Mill-এ গিয়ে চাকরি

–চাকরি দেবে কেন? চাকরি দূরের ভদ্দর লোকের পাড়ায় একটু আশ্রয় ও উপায় নেই আমাদের। গেরস্তের র ঘুম হবে না। ভলাণ্টিয়াররা ক'রে পাহারা দেবে। পুলিশ এসে ঘণ্টায় দরজায় ধাক্কা মারবে, সারা হাঁক ডাক ক'রবে বাড়ি আছি কিনা র জন্যে। তারপর, যদি কাছাকাছি ও একটা চুরি ডাকাতি কিছু হ'ল, দড়ি পড়বে আমারই হাতে।

আমি রেগে উঠলাম, দড়ি প'ড়লেই মগের মুলুক নাকি? প্রমাণ হবে তো?

প্রমাণ! বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল র মুখে, প্রমাণ কত চান? পাড়ার ন ভদ্দর লোক নিজের পকেট থেকে ভাড়া দিয়ে কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য না। হলপ ক'রে বলবেন, এই টকে সিঁদ কাটতে দেখেছি। কেউ , একে দেখেছি বাক্‌স মাথায় । সাপের সঙ্গে এক ঘরে বাস যায় হুজুর, কিন্তু দাগী চোরের এক পাড়ায় থাকা যায় না।

একথার উত্তর খুঁজে পেলাম না। অন্য পাড়লাম। বললাম, তাই বলে জীবন- এই জেলের কষ্ট—

মহেশ বাধা দিয়ে বলল, কষ্টটা নি কোথায় দেখছেন, স্যার? খাসা লা বাড়ি, তিনবেলা ভরপেট খাবার, মে জামাকাপড়, শীতের দিনে তিনটা কম্বল, অসুখ করলে তোফা পাতাল। দু'পাউণ্ড ওজন কমলে মাংস, দুধ ঘি'র দেবার ব্যবস্থা। কম আরাম আছে নাকি জেলের রে?

অবাক হ'য়ে গেলাম। বোকার মত ন করলাম, বলিস কি? জেলে তোদের হয় না?

—একটুও না। একটা কষ্ট শুধু । সেও সেই প্রথম প্রথম। আজকাল ও নেই।

—কি সেটা?

—হুজুর অপরাধ নেবেন না?

—না। তুই বল্‌।

—সেটা হচ্ছে নেশা। যতদিন গলার ফোকরটা তৈরি হয় নি, বড্ড কষ্ট গেছে। এখন আর ভাবনা নেই।

ফোকরের কাহিনী যা' শুনলাম বিস্ময়কর এবং ভয়াবহ। একটা সীসার বল গলার ভিতর একপাশে রেখে দিনের পর দিন তিল তিল করে তৈরি হয় এক গহ্বর। যন্ত্রণা তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে ভবযন্ত্রণা থেকে একেবারে মুক্তি পাবার সম্ভাবনা। এমনি করে বল গলায় আটকে দু-চারজন যে শেষ হয়ে যায় নি, তা নয়। মহেশের চোখের উপরেই একজন গেল সেবার। ফোকরের ঘা যখন শুকিয়ে যায়, বলটা ফেলে দিয়ে তার মধ্যে ওরা লুকিয়ে রাখে সিকি, আধুলি, গিনি, আংটি কিংবা সোনার চেন। এই গচ্ছিত সম্পত্তির বিনিময়ে আসে তামাক, বিড়ি, গাঁজা, চরস, কোকেন, আফিম, আরো কত কি নেশার উপকরণ। সে উপকরণ যারা জোগায়, আইনের কেতাবে তাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে এই সব নিষিদ্ধ বস্তুর প্রবেশ রোধ করা। বলা বাহুল্য, তাদের কর্তব্যহানির দোষ শুধরে যায় উপযুক্ত কাঞ্চন-মূল্যে এবং সে ভার বহন করে ঐ ফোকর গচ্ছিত ধনের একটা মোটা অংশ।

মহেশ আমার কৌতূহল বুঝতে পেরে তার ফোকর থেকে উগরে বের করল একটি গিনি। তারপর সেটাকে আবার স্বস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে আরো অনেক সুখ-দুঃখের কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সারা জীবন জেলে কাটিয়ে দিচ্ছিস, বৌ, ছেলেমেয়ের জন্যেও মনটা একবার কাঁদে না? ইচ্ছা হয় না, অন্য দশজনের মত তাদের নিয়ে ঘরসংসার করতে?

মহেশ বলেছিল, বৌ-ছেলে থাকলে তো মন কাঁদবে? ওসব ঝঞ্ঝাট আমাদের প্রায় কারুরই নেই।

বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম, সে কি! এত যে মেয়েছেলে আসে তোদের সঙ্গে দেখা করতে? দরখাস্তে লেখে অমুক আমার স্বামী, অমুক আমার স্বামীর ভাই।

মহেশ হেসে ফেলল—স্বামীটামী না বললে আপনারা দেখা করতে দেবেন কেন? আসলে বৌ নয় কোনোটাই।

একটু থেমে অনেকটা যেন আপন মনে বলেছিল, না-ই বা হ'ল বৌ এরাই আমাদের অসময়ের বন্ধু। রোগে-শোকে, আপদে-বিপদে এরা না টানলে আমাদের উপায় ছিল না। সেবার বসন্ত হ'ল ঐ রামদিন কাহারের। কী সেবাটাই না করলে বিমলি। লুকিয়ে রাখল নিজের ঘরে। কর্পোরেশনের লোক পাছে টের পেয়ে নিয়ে যায় হাসপাতালে। ওরি জন্যে রামদিন বেঁচে গেল। তারপর পড়ল ও নিজে। রামদিনটা হাসপাতালে খবর দিয়ে এল। অ্যাম্বুল্যান্স দেখে কী কান্না বিমলির। কান্দে আর বলে, আর বাঁচবো না, মহেশদা। নেহাৎ পরমায়ুর জোর ছিল মেয়েটার। প্রাণে মরল না, কিন্তু চোখ দুটো গেল। এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে। মেয়েগুলো সত্যিই বড় ভালো, হুজুর।

মহেশ চলে গেলে মনে পড়ল, কবে কোথায় যেন পড়েছি—বাইরে থেকে মানুষের ভালো করতে যাবার মত বিড়ম্বনা আর নেই। অথচ, এই বিড়ম্বনাই আমরা কোমর বেঁধে করে যাচ্ছি। এই "বি' ক্লাস" জেলঘুঘু পুরাতন পাপীদের উদ্ধার করবার জন্যে একদল লোকের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

যে-সব পণ্ডিত ব্যক্তি crime-এর বীজাণু নিয়ে মাথা ঘামান এবং সে পোকাগুলোর আসল বাসস্থান রক্তের মধ্যে না মাথার খুলিতে, এই মহাতথ্য সম্বন্ধে গবেষণা করেন, তাদের কথা বলছিনে। crime-এর জন্মস্থান যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া—এই পুরানো ধুয়া তুলে Heredity vs. Environment-এর সনাতন ঝগড়া আমদানী করে যারা মাসিক-পত্র-পাঠকের কান ঝালাপালা করেন, তাদের প্রসংগও আলোচনা করছিনে। আমি বলছিলাম তাঁদের কথা যাঁরা ক্ষেপে উঠেছেন জেল-রিফর্মের ধ্বজা নিয়ে। আহা! বড্ড কষ্ট কয়েদীগুলোর! কম্বলের জামাটা গায় ফোটে; দাও ওর নিচে একটা সুতী লাইনিং। কম্বল-শয্যার উপর বিছিয়ে দাও একখানা করে চাদর। মাছের টুকরোটা বাড়িয়ে দাও। ধনের বরাদ্দটা হাস্যকর—এক ছটাকের ১২৮ ভাগের এক ভাগ! ঐ হোমিওপ্যাথিক ডোজটা ডবল কর। বেচারীরা বিড়ি খেতে পায় না? ডিস্‌গ্রেসফুল! এক বাণ্ডিল বিড়ি বরাদ্দ হোক প্রত্যেকের জন্যে, কিংবা দাও একটা করে হুঁকো-কলকে। বড্ড একঘেয়ে জীবন ওদের। মাঝে মাঝে ঝাড় একটা করে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের লেকচার। একটা করে রেডিও সেট বসিয়ে দাও ওদের ব্যারাকের মাথায়। গান-বাজনা? অবশ্যই চাই। ম্যান্ ডাজ্ নট লিভ্ বাই ব্রেড অ্যালোন। সন্ধ্যার পরে কীর্তন করুক সবাই মিলে। মাঝে মাঝে জারিগান আর কবির লড়াই। অর্থাৎ জেলকে যেন কেউ জেল বলে বুঝতে না পারে। আহারে-বিহারে যতটা পার আরাম দাও। আহা! কি ভীষণ কষ্ট বেচারাদের।

হতভাগ্য কয়েদীর দুঃখে এই সহৃদয় রিফর্মারদের কোমল হৃদয় অহরহ বিগলিত হচ্ছে। কিন্তু বন্দীর হৃদয়ের খবর এঁরা পান নি কোনদিন। এদের একজনকে লক্ষ্য করেই বলেছিল মহেশ—সবচেয়ে অসহ্য আপনাদের ঐ ভিজিটর বাবুরা। এমন চোখে চাইবে, যেন আমরা সব কেষ্টর জীব। একবার এক বুড়ো এসে ধরল আমাকে—শুনলাম তিনি নাকি বারিস্টর—কেমন আছ? কি খাও? কি অসুবিধা তোমাদের? এমনি সব ন্যাকামি! গা জ্বলে গেল। বললাম, বাবু, জেলের মধ্যে কি খাই, সে খবর না নিয়ে জেলের বাইরে গিয়ে কি খাব, তাই নিয়ে একটু মাথা ঘামান। তাতেই অনেক বেশী উপকার হবে আমাদের। কথাটা বোধ হয় ভাল লাগল না বারিস্টর সাহেবের। হন্ হন্ করে চলে গেল। এরকম কত দেখলাম। ওদের যত দরদ উথলে ওঠে যতক্ষণ জেল খাটছি। বাইরে গিয়ে যখন ফ্যা ফ্যা করে বেড়াই, কেউ পোঁছেও না। দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, আর সবাই মিলে ফন্দী আঁটে কি করে এই জেল-ঘুঘুটাকে জেলে পুরে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

যোগেন-মহেশ এণ্ড কোম্পানীর অনেকগুলো মুখ আজ ভিড করে আসছে মনের কোণে। কেউ বেশ জ্বলজ্বলে; কেউবা ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে স্মৃতির অন্তরালে। এদেরই একজনের হাতে তৈরি আমার এই বেতের চেয়ারখানা। সংসারে যে-কটি আমার প্রিয়বস্তু আছে, তার মধ্যে এর স্থান ছোট নয়। এতকাল পরে আজও কোনো কোনো দিন নিঃসংগ সন্ধ্যায় এই চেয়ারখানা নিয়ে যখন আমার বাগানের কোণটিতে গিয়ে বসি, চোখের উপর ভেসে ওঠে কালো ছিপছিপে মজবুত গড়নের এক জোয়ান ছোকরা; হাসিহাসি মুখে বসন্তের দাগ; মাথায় ঢেউখেলানো বাবরি। নাম জিজ্ঞেস করলে বলত, রহিম সেখ, বেত-কামানের ওস্তাগর। অর্থাৎ তার পদমর্যাদা সম্বন্ধে সে নিজেও যেমন সচেতন ছিল, অপরকেও তেমনি সজাগ করে রাখত।

রহিম গাঁজা, বিড়ি, চরস, এসব স্পর্শ করত না। তার চেয়েও বড় নেশা এবং ঐ একটিমাত্র নেশা ছিল তার চুল। কেশ-প্রসাধনের জন্যে তেলের প্রয়োজন। সেটা নানা উপায়ে তাকে সংগ্রহ করতে হ'ত। সে তেলের কতক যেত তার মাথায়, আর বেশীরভাগ যেত জমাদারের পায়ে। তা না হলে কাঁচির মুখে কোন্-দিন উড়ে যেত তার সখের বাবরি। বলা বাহুল্য, তৈল-সংগ্রহের জন্যে তার ফোকর-ব্যাঙ্কের উপর যে চাপ পড়ত, গাঁজা-চরসের ধাক্‌কার চেয়ে সেটা বেশী বই কম ছিল না।

বি-ক্লাস বন্দীদের একটা সাধারণ ব্যাধি আছে, যাকে ওরা বলে ছোকরা-রোগ—নিপীড়িত যৌন-জীবনের কুৎসিত বিকৃতি। জেল-ক্রাইমের একটা বড় অংশের মূলে রয়েছে এই ছোকরা, যার জন্যে দায়ী বোধ হয় ওদের স্ত্রী-সংগ-বর্জিত দীর্ঘ কারাবাস এবং সেখানকার কলুষিত আবহাওয়া। এরই তাড়নায় কত কুটিল ষড়যন্ত্র, কত জঘন্য জীঘাংসা, কত আঘাত-প্রতিঘাতের বীভৎস লীলা প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে ঐ লম্বা ব্যারাকগুলোর গহ্বরে, সে ইতিহাস কোনোদিন লেখা হবে না।

হাসপাতাল থেকে রহিম শেখের জন্যে দৈনিক বরাদ্দ ছিল আধসের দুধ। কিন্তু রহিম তার বাহক মাত্র। যে-ভাগ্যবান্ সে দুধ উদরস্থ করত, তার বয়স ছিল ষোল সতের; দেহের রং মোটামুটি ফরসা এবং স্বাস্থ্য নিটোল। একে নিয়েই একদিন ঘনিয়ে উঠল মেঘ, এবং তার শেষ পরিণতি হল ছোরা বর্ষণ—রহিম আর পটলার মধ্যে প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলা। আঘাতের মাত্রার বেশীর ভাগ পড়েছিল রহিমের ভাগে। তাই শাস্তির বেলায় সুপার তার পাওনাটা একটু কমিয়ে ছিলেন। রহিমের ধারণা, সেটা সম্ভব হ'ল শুধু আমারই সানুগ্রহ হস্তক্ষেপের ফলে।

খালাস হ'বার কিছুদিন পর ও আমার সংগে দেখা করতে এল আমার বাড়ীতে। আমি তারই হাতের তৈরি আমার এই প্রিয় চেয়ারখানায় বসে কি একটা করছিলাম। রহিম খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, চেয়ারখানা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিলাম। জিনিসটা পছন্দসই হ'ল না। আচ্ছা, তার জন্যে কি? এবার এসে আর একটা করে দিচ্ছি—একেবারে নতুন ডিজাইন্। যতদিন বসবেন, রহিমকে মনে পড়বে।

আমি বল্‌লাম থাক, চেয়ারের দরকার নেই আমার। তোকে আর আসতে হ'বে না। কটা দিন অপেক্ষা কর। একটা ভাল কাজ জোটাতে পারবো বলে মনে হচ্ছে তোর জন্যে।

রহিম ব্যস্ত হ'য়ে বলল, না না, ı আপনি কখ্খনো করতে ন না।

তার আপত্তির বহর দেখে হেসে লাম, কেন রে? কাজের কথা শুনে পাচ্ছিস কেন?

রহিম সোজাসুজি বলল, দরকার আপনার কাজ খুঁজে। ওতে আমার কোনো উপকার হ'বেই না, বরং নি ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

অবাক হয়ে বললাম, আমি ফ্যাসাদে না কেন?

রহিম বারান্দার কোণে চেপে বসে । তবে শুনুন একটা গল্প বলি—

সেবার খালাস পেলাম জেল থেকে। ব চারটাকা বখ্সিস্ দিলেন। সেই । দিলেন দুদিনের খোরাকি বারো আর শেয়ালদ' পর্যন্ত একখানা র পাশ। মাথায় কি বদ্খেয়াল এল! কাতায় না ফিরে, মনে করলাম, ই একটা কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে যাবো। বেতের কাজ তো আগেই ম। এবার একটা পাকা ওস্তাগরের পড়ে সুতোর মিস্ত্রীর কাজটাও ভালো রকম রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। দিন কাজ খুজে বেড়াই, আর রাত্তির পড়ে থাকি ইস্টেশনে। দেখতে ত টাকা কটা ফুরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারাদিন কিছু পড়েনি। প্লাটফরমে বেড়াচ্ছি। একেবারে গা ঘেঁসে এক য়ারী বাবু চলে গেল। পকেটে এক- নোট। হাতটা নিস্পিস্ করে লোকটা এমন হাঁদা, নোটগুলো য়ে নিতে লাগত ঠিক এক সেকেন্ড্। সামলে নিলাম নিজেকে, কপালে থাকলে যা হয়। ভোরের দিকে, না ঘুম ভাঙ্গেনি, পিঠে এক জুতোর র। চোখ মেলে দেখি পুলিশের দার। বললাম মারছেন কেন খালি ।?

তবেরে শালা—বলে চুল ধরে টেনে । তারপর থানায়। ১০৯ ধারায় ন দিয়ে দিল। সেদিন ছিল রবিবার। রণ্ট সই করাতে হবে এস ডি ও বের বাসায়। আমাকেও নিয়ে চলল । শুনলাম হাকিমটা নাকি পাগলা। আসামী না দেখে ওয়ারেণ্ট সই করেনা।

বাড়ীর সামনে টেনিস খেলবার মাঠ। তারি একপাশে বেতের চেয়ারে বসে একজন মেয়েছেলে উল বুনছিলেন। ভাবে বুঝলাম, এস্ ডি ও সাহেবের পরিবার। অল্প বয়স; মুখ দেখলেই বোঝা যায় প্রাণে দয়ামায়া আছে। পাশে একখানা ছোট টেবিল। পুলিশ দুজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপছিল। সেই ফাঁকে একটু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে বললাম, মেমসাহেব, আপনার ঐ টেবিলটা পালিশ করা দরকার। মেহের-বানি করে যদি কাজটা আমাকে দেন। দুদিন খেতে পাইনি। প্রথমে উনি খানিকটা চমকে উঠলেন। পুলিশ দুটোও রা-রা করে ছুটে এল। তাদের হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে উনি এগিয়ে এসে বললেন, পালিসের কাজ জান, তুমি?

—জানি, মেমসাহেব।

দেশী হাকিমের পরিবারেরা—মেম-সাহেব বললে খুসী হন, এটা আমার জানা ছিল।

উনি বললেন, তুমি চুরি করেছ?

না, হুজুর। চারদিন হ'ল জেল থেকে বেরিয়েছি। কাজ খুজছিলাম। ইস্টেশন থেকে খালি খালি ধরে এনেছে।

মেমসাহেব ভিতরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে সাহেবকে সংগে করে ফিরে এলেন। তিনি এসে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তারপর

কোথায় কোথায় ফোন্‌ করে শেষটায় পুলিসদের হুকুম করলেন, আসামী ছেড়ে দাও।

প্রায় দশ বারো দিন ধরে ওদের সব ফার্নিচার পালিশ করে দিলাম। মাল-মসলা কেনবার টাকা আমারই হাতে ধরে দিলেন। আমিই সব কিনে নিয়ে এলাম। হিসাব দিতে গেলাম; নিলেন না। কাজ দেখে মেমসাহেব ভারী খুসী। এ কদিন খেতে তো দিলেনই, তার উপর বখ্‌সিস দিলেন দশটাকা।

এদিকে সাহেব আমার জন্যে কাজ খুঁজছিলেন। একদিন জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি কি কাজ জানো?

আমি হোলাম বেতের মাস্টার। মাইনে জানি, হুজুর। মেমসাহেব যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ওটা জেলে বসে আমিই তৈরি করেছিলাম।

—বটে!

ওখানকার কাজ শেষ হলে উনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শহরের বাইরে, কোন্‌ এক জমিদার এক ইস্কুল খুলেছিল, সেইখানে। বড়লোকের খেয়াল। ভদ্দর লোকের ছেলেদের ধরে হাতের কাজ শেখানো হচ্ছে—তাঁত, কাঠের কাজ, ছুরি কাঁচি তৈরি, বেতের কাজ এইসব।

আমি হোলাম বেতের মাষ্টার। মাইনে কুড়ি টাকা। এস ডি ও সাহেব বলে দিয়েছিলেন, তুমি যে জেল খেটেছ, একথা কাউকে বোলোনা। আমি মনে মনে হাসলাম। দাগী চোরের গায়ে জেলের গন্ধ লেগে থাকে,—একথা ওঁর জানা ছিলনা। ছোকরা হাকিম কিনা।

মাসখানেকের মধ্যেই পুলিশের চেষ্টায় সব জানাজানি হয়ে গেল। ছাত্ররা বলে বসল, আমরা জেলখাটা চোরের কাছে কাজ শিখবোনা। বুঝলাম, আমার চাকরি এবার খতম। মানে মানে সরে পড়ব ভাবছি, এমন সময় জমিদারের মেয়ের গলা থেকে হার চুরি গেল পুকুর ঘাটে। পুলিশ এসে ধরল আমাকে। পিঠেও বেশ কিছু পড়ল, সে তো বুঝতেই পারছেন। জমিদার মামলা চালাতে দিলেন না। আমাকে ডেকে নিয়ে এক মাসের মাইনে বেশী দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, জুতো দেখতে পাচ্ছিস?

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, পাচ্ছি।

—খবরদার! আমার জমিদারির ত্রিসীমানায় কোনোদিন পা দিয়েছিস্‌ তো পিঠের চামড়া তুলে নেবো, বুঝলি;

এবারেও ঘাড় নেড়ে বললাম বুঝেছি।

জমিদারবাবু হাঁক দিলেন, দারোয়ান!

দারোয়ান এসে আমার কান ধরে হিড় হিড় করে নিয়ে চলল। যাবার সময় কানে
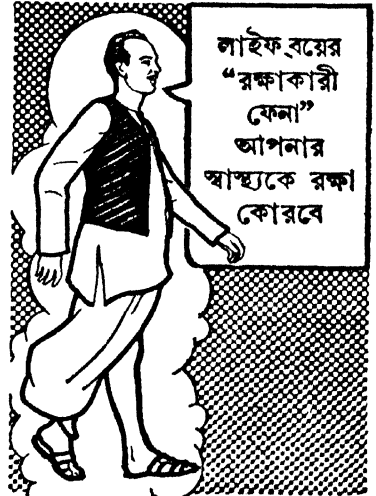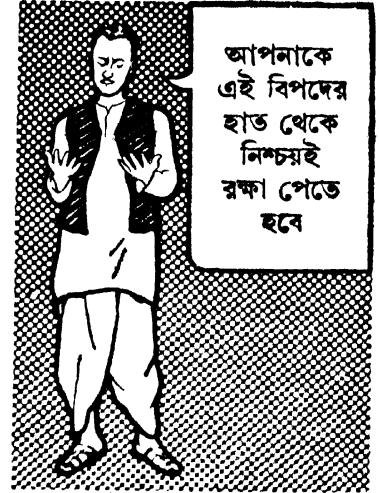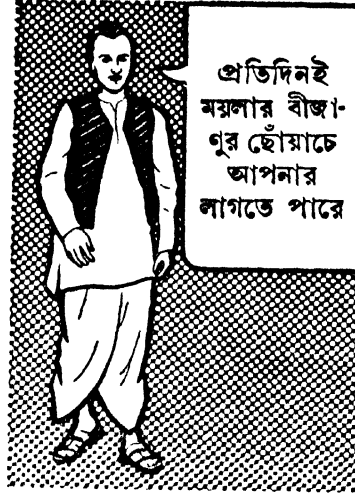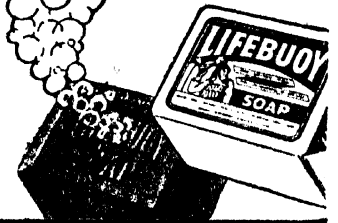
ন, বাবু বলছেন, যেমন জুটেছে একটা গলা এস ডি ও। ইস্কুলের মাস্টার ই। পাঠালো একটা দাগী চোর।

কাজকর্ম করে খাবার সখ এদ্দিনে টে গিয়েছিল। এবার নিজের পথ লাম। ইস্টেশনেই জুটে গেল একটা স্। পকেট ভারী করে চলে এলাম লকাতায়। কিছুদিন পরেই আবার এই রানা জেল"।

আমি বললাম, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলি; বলিস? —'সে কথা আর বলতে', গে সঙ্গে জবাব দিল রহিম, বাইরে কদিন থাকি, মনে হয় যেন পরের টী আছি। নিজের বাড়ীঘর বলতে যা চু, আমাদের ঐ জেল। জেলকে লোকে । করে বলে শ্রীঘর। কথাটা কিন্তু কবারে খাঁটি, স্যর।

—বেশ, তা যেন হ'ল। কিন্তু আমার ফ্যাসাদ হ'বে বলেছিলি যে?

রহিম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ঐ ন, আসল কথাটাই ভুলে গেছি। লকাতায় আসবার কদিন পরেই নার সঙ্গে দেখা চিৎপুরে। —জেল ক সবে বেরিয়েছে। তার কাছে লাম, এস ডি ও সাহেবের চাকরি া টানাটানি। একটা দাগী চোরকে লশের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়ীতে গা দিয়েছেন, ইস্কুলে চাকরি করে াছেন,—সাহেব কালেক্টর্ নাকি য় খাপ্পা। উনি আর এস ডি ও । সাধারণ হাকিম করে, কোথায় বদলি দিয়েছে। তাই তো বলছিলাম, স্যর, নো চোরের ভেজাল অনেক। আপনি নো এসব ঝঞ্জাটে জড়াতে যাবেননা। ী বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

রহিম চলে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাগুলো আমার মনের মধ্যে নড়ে বেড়াতে লাগল। অনেক কথার মধ্যে ার সে বলেছিল, আমরা দাগী। দের এ দাগ কি কোনো কালেও বনা?

উত্তর দিতে পারিনি। হয়তো এ র কোনো উত্তর নেই। মাঝে মাঝে হয়, দাগী ওরা নয়, দাগ পড়েছে দের চোখে, দাগ পড়েছে আমাদের -যে চোখ দিয়ে ওদের দেখি, যে মন ওদের বিচার করি, সেইখানে। আমরা ভদ্র মানুষ, সভ্য মানুষ, সৎ মানুষ। কোনোদিন ভুলিনা, এই লোকটা একদিন জেলের ঘানি টেনেছিল। সমাজের যে-স্তরে যে-স্থানটুকু সে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে ফিরে এসে দাঁড়াবার সুযোগ তাকে আমরা দিতে পারিনা কিছুতেই। একবার যে গেল, সে চিরকালের তরেই গেল। যে-ছাপ পড়ল তার কপালে, আমাদের চোখে সে কোনোদিনই মুছবেনা।

মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা। তখন কলেজে পড়ি। একটা কি সাহিত্য-সভাটভা উপলক্ষ্য করে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করবার সুযোগ জুটে গেল। ঘণ্টা-কয়েক ছিলাম তাঁর কাছে। তাঁর সৃষ্ট পতিতা চরিত্রের প্রসঙ্গ নিয়ে কী একটা মন্তব্য করেছিলাম। তিনি হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নেমে এল হাতে। তীক্ষ্ন চোখ দুটো কেমন উদাস হয়ে উঠল। সহসা যেন কতদূরে চলে গেলেন। কোথাকার কোন্ অলক্ষ্য বস্তুর দিকে চেয়ে মৃদু-কণ্ঠে বললেন, পতিতা! হ্যাঁ; ওদের নিয়ে অনেক কথাই উঠেছে, যদিও আমি সেটা ঠিক বুঝতে পারিনে। আমি যে ওদের অনেকের কথাই জানি। নিজের চোখে দেখেছি, এমন জিনিস ওদের মধ্যে আছে, যা বড় বড় সমাজে নেই। ত্যাগ বল, ধর্ম বল, দয়া, মায়া, প্রেম,—মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝি, ওদের মধ্যেও অভাব নেই।

একটু থেমে করুণার্দ্র কণ্ঠে বলে-ছিলেন, তা ছাড়া, কোনো মানুষ নিছক কালো, তার মধ্যে কোনো redeeming feature নেই, একথা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। ও আমি পারিনা।

বাইরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কেউ কোথাও নেই। একটি ছোট্ট বারান্দায় তাঁর সামনে পাশাপাশি বসে আমরা দুটি তরুণ ছাত্র। আমাদের দিকে না চেয়ে, অনেকটা যেন আত্মগত ভাবে, থেমে থেমে এই কটা কথা তিনি বলে গিয়ে-ছিলেন। আজ এতকাল পরে ঐ হতভাগা দাগী চোর রহিম সেখের দিকে চেয়ে মানব-দরদী কথাশিল্পীর সেই বেদনা-সিক্ত কথাগুলো মনে পড়ে গেল। ভাবছি, এরাও কি নিছক কালো? এদের মধ্যেও কি কোনো redeeming feature নেই?

শতাব্দীর ওপার থেকে টমাস হার্ডির মানসকন্যা টেস্-এর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। একটি রাত্রির মুহূর্তের দুর্বলতা তার জীবনে নিয়ে এসেছিল লজ্জা, কলঙ্ক আর অভিশাপ। সে দাগ যখন সারা-জীবনেও মুছে ফেলা গেলনা, তার আর্ত-কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল এক কঠিন প্রশ্ন—the recuperative power of Nature is denied to maidenhood alone? নিরন্তর ভাঙ্গাগড়াই তো প্রকৃতির লীলা। ছিন্ন শাখার মূল থেকে দেখা দেয় নব পত্রোদ্গম। অতবড় যে পুত্রশোক, তারও ক্ষত একদিন মিলিয়ে যায় মায়ের বুকে। অশ্রুধারা শুকিয়ে যায়, ফিরে আসে হাসির ঝলক। কিন্তু মুহূর্তের তরে খণ্ডিত হল যে কুমারীর কৌমার-ধর্ম, তার কালিমা রেখা কি কোনোদিন মুছবার নয়? প্রকৃতির অপরাজেয় সঞ্জীবনী-শক্তি এইখানেই শুধু ব্যর্থ হ'বে?

টেস্ তার প্রশ্নের জবাব পেয়েছে কিনা জানিনা। কিন্তু রহিমের প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। লৌহ যবনিকার অন্তরালে শত শত রহিমের চোখে ফুটে আছে ঐ একটি নির্বাক প্রশ্ন—আমাদের এ দাগ কি কোনোদিন মুছবেনা?

প্রাণপূর্ণ দরদ নিয়ে যদি ফিরে আসেন কোনো টমাস-হার্ডি কিংবা শরৎ চাটুয্যে, হয়তো এর জবাব একদিন মিলবে।

পনের বছর পরের কথা। ইতিমধ্যে গোটা সাতেক জেল ঘুরে আবার এসেছি কলকাতায়। আগের বছর বড় মেয়ে বিনুর বিয়ে দিয়েছি। জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব করতে হবে। সেই সব আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। গৃহিণীর বিশেষ ফরমাশ—এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম দেওয়া চাইই। দুপুর রোদ মাথায় করে বড়বাজার পোস্তায় গিয়েছিলাম আম কিনতে। ভীষণ ভিড়। অনেক দোকান ঘুরে বহু দরদস্তুর করে এক জায়গায় পছন্দ করে দাম দিতে যাচ্ছি —সর্বনাশ! মণিব্যাগ কৈ? এ পকেট ও পকেট বৃথাই হাতড়ে দেখলাম বারবার। আম ঐ পর্যন্তই রইল। ফিরবো যে, তার

ট্রাম ভাড়াটাও নেই। হ্যারিসন রোডের ফুটপাথ ধরে পূর্বদিকে পা চালিয়ে দিলাম।

সেলাম, হুজুর!

চমকে উঠলাম। গলাটা চেনা চেনা। তাকিয়ে দেখি, বেঁটে কালো কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একটা লোক। মাথায় ঢেউ খেলানো বাবরি।

কে, রহিম?

—হ্যাঁ, হুজুর। গরীবকে ভোলেননি, দেখছি।

কেমন আছিস, রহিম?

—ভালই আছি, আপনার দোয়ায়।

একটু তীক্ষ্ম চোখে আমার দিকে চেয়ে রহিম বলল, আপনাকে কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে, স্যর। শরীর ভালো আছে, তো?

গোটা পঞ্চাশেক টাকা ছিল ব্যাগটাতে। বড্ড মুষড়ে পড়েছিলাম। চেষ্টা করেও নিস্তেজ ভাবটা চাপা দিতে পারলাম না। বললাম, ভালোই আছি। তবে—

রহিম সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। আমি একটু হাসবার মত মুখ করে বললাম, মনিব্যাগটা চুরি গেল।

রহিম ব্যস্ত হ'য়ে বলল, কখন চুরি গেল? কোথায়? বললাম, ঐ আমপট্টীতে, এই আধ ঘণ্টাটাক হবে। যে যাক্। তারপর? তুই আছিস কোথায়? কাজটাজ কিছু—

রহিম সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আপনি দাঁড়ান বাবু, আমি এখুনি আসছি—বলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আমি সেইখানেই অপেক্ষা করে রইলাম। পনের মিনিট, কুড়ি মিনিট, আধ ঘণ্টা যায়। হঠাৎ মনে হল, এ কি করছি? একটা পুরোনো চোর কি বলে গেল, আর তারই কথায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি,—একজন পদস্থ সরকারী অফিসার! পা বাড়াতে যাচ্ছি, রহিম ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ফতুয়ার পকেট থেকে দুটো মনি-ব্যাগ বের করে বলল, দেখুন, কোন্‌টা আপনার?

আমি নিজের ব্যাগটা তুলে নিলাম।

রহিম বলল, খুলে দেখুন সব ঠিক আছে কিনা। দেখলাম, সব যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। আমার বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। বললাম, কোথায় পেলি? রহিম হেসে জবাব দিল, সে অনেক কথা, হুজুর। সব আপনি বুঝবেননা। ছোকরটা নতুন। আপনাকে তো চেনেনা। তবে ভারী বিশ্বাসী। সরায়নি কিছুই, গোটাটাই জমা দিয়েছে। সর্দারের কাছে গিয়ে আপনার কথা বলতেই তাড়াতাড়ি বের করে দিল। সর্দার এখন বড্ড ব্যস্ত। নৈলে নিজেই আসত। বলে দিল, বাবু যেন আমাদের কসুর মাপ করেন। আমি একখানা দশ টাকার নোট তুলে নিয়ে রহিমের হাতে দিতে গেলাম। সে দাঁতে জিব কেটে জোড় হাত করে দু-পা পেছনে সরে গেল। তারপর আমার পায়ে হাত ছুঁইয়ে বলল, কসুর আর বাড়াবেন না, হুজুর।

আমি আর পীড়াপীড়ি করতে পারলাম না। রহিম বলল, আম কিনতে এসেছিলেন এদ্দূর?

—হ্যাঁ। বড় মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে দিতে হবে। ঝুড়ি খানেক ল্যাংড়া আম; সবাই বললে পোস্তাতে সুবিধা হ'বে।

রহিম বলল, এখানে আম কেনা কি আপনার কাজ? চলুন আমি কিনে দিচ্ছি।

আমার উৎসাহ কমে গিয়েছিল। বললাম, থাক। ওদিক থেকেই না হয় নেবো।

রহিম বলল, আপনাকে বাজারে ঢুকতে হবেনা। কষ্ট করে এই মোড়টায় এসে একটু দাঁড়ান। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। —বলে আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই কুলীর মাথায় দু ঝুড়ি ল্যাংড়া আম নিয়ে সে ফিরে এল এবং একটা ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে চাপিয়ে দিয়ে গাড়োয়ানকে বলল, বাবুকে পৌছে দিয়ে আয়।

আমি আমের দাম জানতে চাইলাম। রহিম আবার জোড় হাত করল। বিরক্তির সুরে বললাম, না, না। সে কি হয়? খালি খালি এতগুলো টাকা তুই দিতে যাবি কেন? আর আমিই বা নেবো কেন?

রহিম সংকুচিত হয়ে বলল, আপনাকে দিইনি, হুজুর। আমার বিনু মাকে দিলাম। সেই কবে দেখেছি, আপনার চাকর নিয়ে আসত গেটের সামনে। দু বছরের মেয়ে; যেন বেহেস্তের পরী। সেই আমাদের ছোট বিনু মা আজ বড় হয়েছে। সাদী হয়েছে। গরীব রহিম আর কিই বা দিতে পারে? দুটো আম দিলাম আমার মাকে।

গলাটা আটকে গেল। চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

আমের দাম আর দিতে পারলাম না।

বাড়ী পৌছে গাড়ীর ভাড়া দিতে গেলাম। গাড়োয়ান সেলাম করে বলল, ভাড়া পেয়ে গেছি, বড়বাবু।

—সে কি! কে দিল ভাড়া?

—কেন, রহিম?

—না, না, সে হ'বেনা। ও টাকা ফিরিয়ে দিও। ভাড়া তোমাকে নিতে হ'বে।

গাড়োয়ান ভয়ে ভয়ে বলল, বলেন কি বাবু? ঐ রহিমকে আপনি চেনেন না? আস্ত পুঁতে ফেলবে আমাকে!

(ক্রমশঃ)

দিলওয়ারা

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কুলিকে বেশি বকশিশের লোভ দেখিয়ে আজমীঢ় স্টেশনের র্ড-রাখা অন্ধকার গাড়িতে এসে ছলুম। নিস্তব্ধ কামরা ফাঁকাই মনে দরজা থেকে দূরে মনোমত একটি ক ক্ষিপ্রগতিতে বিছানা বিছিয়ে পরম তৃপ্তিভরে সিগারেট ধরালুম। রেট-লাইটারের আলো তখনো নি; সেই আবছা অন্ধকারে দেখলুম র হাতল দু'হাতে পাকড়ে হেঁইও ও করে গাড়িতে উঠে এলেন এক-ঢ়া শেঠ আর শেঠানী। আলো অল্প ও. বরবপু দু'টি যা দেখলুম, তা অবধি পৌঁছতে পারবে বলে মনে না। মাধ্যাকর্ষণকে ধন্যবাদ। পৃথিবীর ক্তিটা হঠাৎ যথেষ্ট কমে গেলে কি কি ধা আর অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে নিয়ে ছেলেবেলা মাথা ঘামিয়েছি র। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বয়সে, গাড়ির কামরায় এ-হেন সহযাত্রীর গ বাংক দখল করতে পারলে কর্ষণ বিষয়ে একটিমাত্র চিন্তাই য় আসে এবং সে-চিন্তা এ-শক্তির সম্পর্কিত নয়। বেঞ্চিতে বসে লেন শেঠানী আর মাল তুলতে লেন শেঠজী। কুলিদের সঙ্গে মেচি. বচসায় অচিরেই কামরা সর-ম হয়ে উঠল। অন্ধকারটা ইতোমধ্যে এসেছে অনেকখানি; শেঠজীর াস্ততায় বিচলিত হয়ে গুটিকয়েক চল মাথা নিজ নিজ বেঞ্চিতে উঠে ছে দেখলুম। সম্ভবত আমারই মত ময়বিস্ফারিত নেত্রে সে-মাথাগুলি ঠজীর সামানের পরিমাণ দেখছে। র কাউকে যে এ-দরজা দিয়ে ভেতরে তে হবে না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ মে। নির্বাক মাথাগুলিও সম্ভবত এ ধান্তে পৌঁছে নিশ্চিন্ত মনে যে যার গায় শুয়ে পড়ল। অন্ধকারে হাতড়ে তড়ে শেঠজী দেখছেন, সব ক'টা মাল কমত উঠেছে কি না। আমার সাফিরিকালীন বিছানার পকেটে সর্বদাই টর্চ লাইট থাকে, তা বার করে দ্রলোককে সাহায্য করলুম। আলাপের ত্রপাত সেখানেই।

আজমীঢ়ে পুস্করজীর দর্শনে এসেছিলেন এই পুণ্যকামী দম্পতি। এখন চলেছেন আবু পাহাড়, অচলেশ্বর শিবের মন্দিরে। তারপরে যাবেন নাথদোয়ারা, তারপরে আর কোথাও। রাজপুতানার ভেতরেই বেশ কিছুদিনের এক তীর্থ-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন জীবন-সায়াহ্নে। জয়পুরে ব্যবসাপাতি আছে; ছেলেরা দেখছে। আবু পাহাড়ের জগদ্বিখ্যাত দিলওয়ারা মন্দিরগুলির কথা তুলতেই শেঠজী টুপি ভাঁজ করে হাওয়া খেতে লাগলেন। আমার অনভিজ্ঞতায় হয়ত একটু আশ্চর্যই হয়ে থাকবেন। বললেন, অচলেশ্বরের মাহাত্ম্যের কাছে কি আর দিলওয়ারার তুলনা হয় বাবুজী। কিছু মশহুর মার্বেলের কাজ আছে বটে দিলওয়ারায়, কিন্তু অচলেশ্বরে যে স্বয়ং কাশী-বিশ্বনাথজীর পায়ের বুড়ো আঙুল পুজো পায় দুবেলা। মছলি-ভোজী এই বঙ্গ-সন্তানের ধর্মভাব যদি কিছুমাত্র জাগ্রত করা সম্ভব হয়, বোধ করি, এই মহৎ উদ্দেশ্যে বুড়ো আঙুলের কিংবদন্তী তিনি আমাকে আদ্যোপান্ত শোনালেন। বেশ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

বশিষ্ঠ মুনি হিমালয়ে শিবের তপস্যা শেষ করে বর চাইলেন যে, অতঃপর তিনি যেখানে বসবাস করবেন, হিমালয়ের একটু অংশ সেখানে স্থানান্তরিত করা হোক। রাজপুতনার এ-অঞ্চল তখন সমতল প্রান্তর ছিল। অচিরে এক গগনচুম্বী পর্বত দেখা দিল সেখানে।

বিমল শাহের মন্দিরের না...

তেজোপাল ও বাস্তুপাল মন্দিরের খিলান

বশিষ্ঠদেব হাঁটাপথে এতদূর এসে আরাবল্লী পাহাড়ের চূড়ায় ডেরা বাঁধলেন, না হিমালয় থেকে পাহাড়ে বসেই বিশল্যকরণীর মত সবশুদ্ধ এখানে নীত হলেন, এই অতিশয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা করি-করি করেও করলুম না। একে ত মৎস্যাহারের কল্যাণে, পাঞ্জাব ছাড়া, ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বাঙ্গালীর সুনাম নরখাদকের পরেই, তার ওপর ঠাকুর-দেবতাদের মানহানিকর এসব কথা তুললে, আর কিছু না হোক এমন চাঞ্চল্যকর গল্পটা শুনতে পেতুম না। ঘন ঘন সায় দিয়ে যেতে লাগলুম। অন্ধকারকে ধন্যবাদ, অন্তত একজন অ-বাঙ্গালীর কাছেও যে বাঙ্গালীর সুপ্ত ধর্মপ্রবণতার প্রমাণ সেদিন দাখিল করতে পেরেছিলুম, তাতে আর সন্দেহ নেই।

যাই হোক, সেকালের দৈব পরিবহন-ব্যবস্থায় আধুনিক কালের রেল কোম্পানীর সব দোষ-গুণগুলিই সম্ভবত বিদ্যমান ছিল। বশিষ্ঠদেবের জায়গীর সেই হিমালয়ের টুকরোটি বেশ ভাঙাচোরা অবস্থায় রাজপুতানায় পেঁছিল। বশিষ্ঠের আশ্রমের কাছেই এক গভীর ফাটল সিধা পাতালে নেমে গিয়েছে। মুনির কামধেনু নন্দিনী একদা সেই গহ্বরে পড়ে চীৎকার জুড়ে দিলে। আশ্চর্য ঘটনা, নিজের ইচ্ছা পূরণ করবার কোন ক্ষমতাই কামধেনুর ছিল না। থাকলে, অবলীলাক্রমে ওপরে উঠে এসে ফাটলটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন হত। অথবা এমনও হতে পারে যে, শক্তি হয়ত ছিল, কিন্তু বুদ্ধিটা অনেক ক্ষেত্রে বংশগত ব্যাপার হওয়াতে... আর একটা বাঙ্গালীসুলভ চিন্তা চেপে গিয়ে সায় দিতে লাগলুম। নন্দিনীর কাতর চীৎকারে মুনিপ্রবর সরস্বতী নদীকে স্মরণ করলেন, আর অমনি সরস্বতীর স্রোতধারায় সেই গভীর গহ্বর ভরে গেল। সারস্বত লিফ্‌টে চেপে নন্দিনী ত ওপরে উঠে এল, কিন্তু বশিষ্ঠ দেখলেন, যে কোন সময়ে এ-দুর্ঘটনা আবার ঘটতে পারে। একটা স্থায়ী প্রতিকারের জন্য তিনি কৈলাসে শিবের শরণাপন্ন হলেন। শিব পরামর্শ দিলেন, হিমাচলের কাছে যাও, সে একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। বৃদ্ধ হিমাচল তাঁর পুত্রদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুনির দায় উদ্ধার করতে কে রাজী। কনিষ্ঠ পুত্র নন্দীবর্ধন স্বীকৃত হলেন, কিন্তু খোঁড়া পা নিয়ে এতদূর যাওয়াটাই তাঁর পক্ষে এক সমস্যার কথা হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে স্থির হল, নন্দীবর্ধনের বন্ধু, নাগশ্রেষ্ঠ অর্বুদ, তাঁকে বয়ে নিয়ে যাবেন এই সর্তে যে, অর্বুদের নামেই এ-পর্বতের নামকরণ করতে হবে। বশিষ্ঠ ও নন্দীবর্ধন রাজী হওয়াতে দুই ভলাণ্টিয়ার, অর্বুদ অর্থাৎ আবু পাহাড়ের সেই ফাটলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। অর্বুদকে আর দেখা গেল না (নামের জন্যে সাপেও কি না করতে পারে!); আর মাটির ওপরে জেগে রইল শুধু নন্দীবর্ধনের নাকের ডগাটুকু। এদিকে গহ্বরগত নাগশ্রেষ্ঠের ছটফটানিতে বশিষ্ঠ আশ্রমে ঘন ঘন ভূমিকম্প হতে লাগল। প্রতিকারটা পাকাপোক্ত কিছু হল না; নন্দিনীর প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে বশিষ্ঠের নিজের প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। মরিয়া হয়ে এবার তিনি কাশী-বিশ্বনাথকে স্মরণ করলেন। আর অমনি দেবাদিদেব মহাদেব বারাণসীধামের মন্দির থেকে ভূগর্ভ দিয়ে তাঁর এক পদ অর্বুদ পাহাড় অবধি প্রসারিত করে দিলেন। ঝাড়া সাত-আটশো মাইল অতিক্রম করে এসে সেই পায়ের বুড়ো আঙুল দেখা দিল আবু পাহাড়ের চূড়ায়। ভূমিকম্প বন্ধ হল। অর্বুদ পাহাড়ের এই অচলাবস্থার যিনি কারণ, সেই কাশী-বিশ্বনাথ অচলেশ্বর শিব নামে এখানে পুজো পেয়ে থাকেন। আবু শহর থেকে তিন ক্রোশ দূরে অচলেশ্বর মন্দিরে, পুণ্যকামীরা আজও একটি পাথর-বাধানো গর্তের মধ্যে অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। অন্ধকার সয়ে এলে, গর্তের মধ্যে হলদে রঙের একটি পাথর নজরে পড়ে—দেবাদিদেবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। ...শেঠানী শুয়ে পড়েছেন অনেকক্ষণ। শেঠজী বললেন, অচলেশ্বরের

ন্যার কাছে কি আর দিলওয়ারার ওঠে বাবুজী!

য়ার্ড থেকে গাড়ি ছাড়বার কোন ই নেই। অল্প কিছু যাত্রী সরে শেঠজীর মালপত্র ডিঙিয়ে য় শুয়ে বসে আছে। কাল খুব গাড়ি পৌঁছবে আবু রোড স্টেশনে। া থেকে বাসে, আঠারো মাইল দূরে, ল্লী পর্বতমালার সর্বোচ্চ চূড়ায় শহর। শেঠজীর কাছে রাত্রির মত নিয়ে বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়লুম।

*   *   *

ত্ক্ষণে আমাদের কামরাটিকে ন নিয়ে আসা হয়েছে; জুড়ে া হয়েছে মেলগাড়ির পেছনে; অন্ধকারে কত মরু-প্রান্তর পার এসেছি—কিছুই জানিনে। ঘুম এক আশ্চর্য সকালে। ট্রেন সিধা মুখী চলেছে। ডানদিকে, অদূরে ল্লী পর্বতশ্রেণী; এর কোন শিখরে শহর আর অপরূপ দিলওয়ারা গুলি, কে জানে! বাঁদিকে, রুক্ষ রের শেষে বহুদূরে ছাড়া-ছাড়া াধটা পাহাড় প্রত্যুষের তরল রে ফিকে নীল আকাশের গায়ে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য এখনও ের বহু নীচে; তবু তার তির্যক একরাশ ভাঙা মেঘ ধীরে ধীরে য় উঠছে। পূবদিকের জানালায় য়, সিধা দেড় হাজার মাইল দূরে, র আলস্যবিজড়িত কলকাতাকে পেলুম। অনেকদিন হল কলকাতা বেরিয়েছি ; থেকে থেকেই মন াল উধাও হচ্ছে ঘরের দিকে। জল দেওয়া হচ্ছে; প্রভাতী ভেদ করে ট্রাম চলতে শুরু এক-আধটা। জনবিরল রাজপথে কাগজ হকাররা দ্রুতগতি সাইকেল সে-কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে। দিনের তপ্ত কুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার তন্দ্রাজড়িত কলকাতা হাই তুলে ভাঙছে।......কুশল প্রশ্নের এক টানে শেঠজী আমাকে রাজপুতানায় য় নিয়ে গেলেন। আবু রোডে তে নাকি আর দেরি নেই।
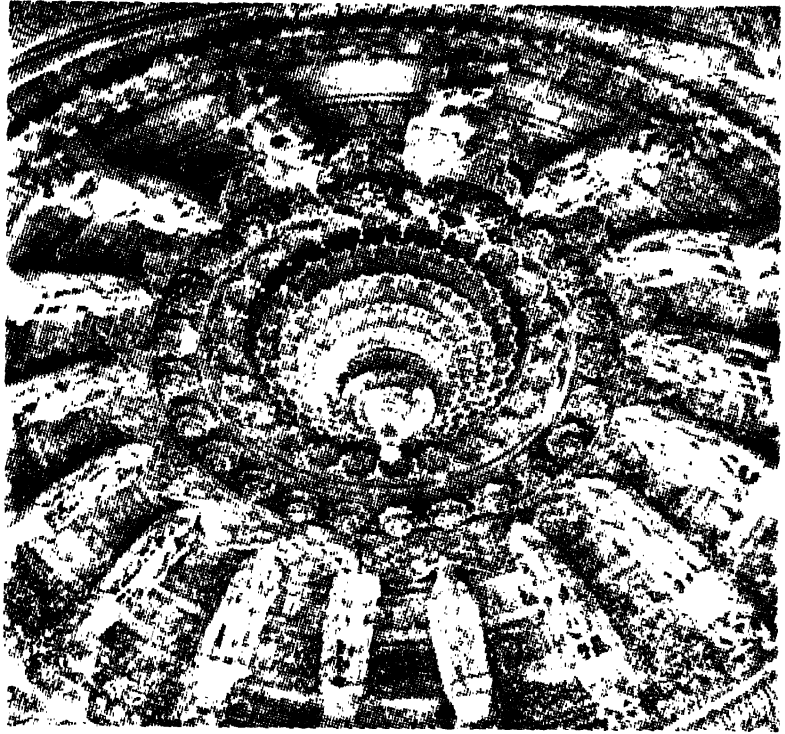
শিলিগুড়ি-দার্জিলিং বা গৌহাটী-শিলং সড়কের সঙ্গে আবু রোড থেকে মাউণ্ট আবু অবধি আঠারো মাইল পথের কোন তুলনাই হয় না। সম্বৎসরে এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র বিশ-ত্রিশ ইঞ্চি। গাছপালা আছে, কিন্তু শ্যামলিমা নেই। এই তামাটে হলদে অরণ্য পার হয়ে মেল-বাস ওপরে উঠতে লাগল। নীচে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে, শীর্ণ নদীর জলে রৌদ্রকিরণ প্রতিফলিত হয়েছে, এখানে-সেখানে আর রুক্ষ লাল মাটি হাহাকার করছে আকাশের দিকে তাকিয়ে। আবার শুরু হল আর একটা দিন; ক্ষমাহীন সূর্যের কাছে সেই পড়ে-পড়ে মার খাওয়া।

তেজোপাল ও বাস্তুপাল মন্দির : নাটমণ্ডপের ছাতের কারুকার্য

ড্রাইভারের পাশে বসেছি শেঠজী আর আমি। শেঠানী পেছনে 'লেডিজ সীটে'। ওদের দুজনকে এইটুকু জায়গায় ধরা মুশকিল হত; শেঠজীর কল্যাণে আমাদেরও ধরেছে কোনগতিকে। অসংলগ্ন গল্প হচ্ছে; জয়পুরের গল্প, আজমীঢ়ের গল্প। মাঝামাঝি রাস্তায় এসে, একটু সমতল জায়গার একপাশে বাস দাঁড়াল অনেকক্ষণ। ওপর থেকে নিম্নগামী বাসেরা যতক্ষণ না পার হয়ে যাচ্ছে, অপেক্ষা করতে হবে এখানে। কাছেই গাছের ছায়ায় অস্থায়ী চায়ের দোকান; চা খেতে নেমে এলুম। শেঠানীর চা গাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দিতেই ফল মিলল একেবারে হাতে হাতে। শালপাতায় মোড়া একরাশ লাড্ডু, পেঁড়া নিয়ে শেঠজী আর আমি গাছতলায় এক পাথরের ওপর এসে বসলুম। কাল রাত্রে অচলেশ্বরের কিংবদন্তীটা আগ্রহভরে শুনে যে বিচক্ষণতার কাজই করেছি, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলুম। গুরুজনেরা কি আর সাধে ঠাকুর-দেবতায় মতি রাখতে বলেন! আরও এক-আধটা উপাখ্যান শুনবার জন্যে মনটা বড় লালায়িত হয়ে উঠল। আবু শহরে এঁরা কোথায় উঠবেন, এখনও সঠিক জানিনে।

যদি ডাকবাংলোতেই ওঠেন আমার সঙ্গে? লাড্ডু, পেঁড়ার স্টক যে এই কিস্তিতেই খতম হল, এমন মনে করবার কোনই কারণ নেই। বাস আবার চলতে শুরু করলে কথাটা পেড়েই ফেললুম। আছে, দিলওয়ারা মন্দির সম্বন্ধেও একটা কিংবদন্তী আছে, তবে সেটা অচলেশ্বরের মত জমজমাট নয়।

গুজরাটের অরাসুর পর্বতে, দেবী অম্বিকার মন্দিরের সন্নিকটে বাস করতেন বিমল শাহ। জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের উপাসনার জন্য তিনি নাকি সেখানে তিনশো ষাটটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। ঈর্ষাপরবশ হয়ে দেবী অম্বিকা একদা বিমল শাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, কার প্রসাদে তিনি এ-মন্দির-গুলি নির্মাণ করেছেন। বিমল শাহ উত্তর দিলেন, তাঁর জৈন গুরুর প্রসাদে। তিনবার দেবী এই প্রশ্ন করলেন; তিন-বারই বিমল শাহ একই জবাব দিলেন। ক্রোধে রক্তবর্ণ হল দেবী অম্বিকার মুখ। আর অমনি প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে মন্দির-গুলি ভেঙে পড়তে লাগল। পাঁচটি মন্দির মাত্র অবশিষ্ট রেখে ক্রুদ্ধা দেবী নিরস্ত হলেন; বললেন, বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই ক'টি মন্দির লোকের কাছে ঘোষণা করুক, দেবী অম্বিকার কোপের পরিণতি কী ভয়াবহ। এদিকে ভূমিকম্পের শুরুতেই বিমল শাহের সাংসারিক বুদ্ধি কিঞ্চিৎ ফিরে এসে থাকবে; তিনি আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে পলায়ন করলেন। গুজরাটে অম্বিকার মন্দির থেকে রাজ-পুতানায় অর্বুদশিখর অবধি নাকি এক সুড়ঙ্গ পথ ছিল। অর্ধমৃত অবস্থায় বিমল শাহ সুড়ঙ্গের এপ্রান্তে এসে পৌঁছলেন। অম্বিকা একে দেবতা, তায় স্ত্রীলোক; কাজ হাসিলের ফন্দি-ফিকির তার জানবারই কথা। ক্ষণকাল পরে তিনিও আবু পাহাড়ে আবির্ভূতা হলেন। মিষ্টি করে বিমল শাহকে বললেন, তোমার ব্যক্তিগত কোন অনিষ্টই আমি করতে চাইনি, আর ভবিষ্যতেও কখনো করব না, যদি এই অর্বুদ চূড়ায় তুমি আমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দাও। সেই মন্দির—দিলওয়ারার দুটি বিখ্যাত দেবালয়ের একটি—আজও বিমল শাহের মন্দির নামে খ্যাত। প্রাঙ্গণের একপাশে, দেবী অম্বিকার পৃথক কক্ষে, ভীমা ভয়ংকরী অদ্যাবধি সভয়ে পূজিতা হয়ে থাকেন।

মাউণ্ট আবু পৌঁছতে আর দেরি নেই। রাখালেরা গরু-মহিষ নিয়ে শহরের দিকে ফিরছে। পথের দুপাশে অজস্র খেজুর গাছ; মাঝে মাঝে জলাশয়। শহরতলীর ছাড়া-ছাড়া বাড়ি পার হয়ে সহসা বাস এসে আবু শহরের টারমিনাসে দাঁড়াল। আমাকে প্রায় হতবাক্ করে শেঠজী ঘোষণা করলেন, তাঁরা অবিলম্বে অন্য বাস ধরে অচলেশ্বর রওনা হবেন। থাকবার সুবিধা হলে, সেখানে থেকেও যেতে পারেন দু-একদিন। ফিরতি রাস্তায় দিলওয়ারা দেখলেও হয়, না দেখলেও ক্ষতি নেই। তাঁদের প্রোগ্রামের সঙ্গে আমার ভ্রমণ-সূচী মেলান অসম্ভব। হায়, কোপনস্বভাবা দেবি অম্বিকা! এই একটু আগে নিছক মিষ্টান্নের লোভেই যে তোমার কিংবদন্তী শুনতে চেয়ে-ছিলুম, তা কি আর তোমার অগোচর আছে? বাক্স-বিছানা কুলির মাথায় চাপিয়ে ডাকবাংলোর দিকে অগ্রসর হতে হতে বারকয়েক পেছন ফিরে তাকালুম। মালপত্রের গাদার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শেঠানী; তার কোন্‌টিতে যে লাড্ডু, পেঁড়া ঠাসা তা ঠাহর করতে পারলুম না।

* * *

ডাকবাংলোর খানসামার কাছে পথের হদিস জেনে নিয়ে দিলওয়ারার উদ্দেশে বার হয়ে পড়লুম। শহরের উত্তর সীমায় মিলিটারী হাসপাতাল। গলায় স্টেথস্কোপ ঝুলিয়ে এক ডাক্তারবাবু কাজে চলে-ছিলেন। দূরে খেজুর বনের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট শাদা বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই দিলওয়ারা। কাছে এসেও মন্দিরগুলির আয়তনের নগণ্যতায় হতাশ হলুম। চূড়ার উচ্চতা চল্লিশ ফিটও হবে কিনা সন্দেহ। চূণকাম-করা বাইরের দেওয়াল ভাস্কর্যবিরহিত। এই প্রাথমিক নৈরাশ্যই সম্ভবত ভেতরে প্রবেশ করবার পর দর্শককে আরও বেশি অভিভূত করে ফেলে। শ্বেতপাথরের এত অজস্র ও সুনিপুণ কাজ দুনিয়ায় আর কোথাও নেই।

প্রথমেই বিমল শাহের মন্দির। প্রশস্ত অঙ্গনের মাঝখানে জৈন তীর্থংকর আদিনাথের কক্ষ। শিখর বলতে সামান্য যা আছে, তা এ-গৃহেরই ওপর। প্রবেশ-দ্বার আর আদিনাথের প্রকোষ্ঠের মাঝখানে নাটমণ্ডপ। অপূর্ব কারুকার্য-খচিত অনেকগুলি মর্মরস্তম্ভ ও ততোধিক কুশলতায় রচিত গুম্বজাকৃতি ছাদ দর্শককে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক করে ফেলে, শুধু একথা বললে সম্ভবত তার মনোভাবের সামান্যই ব্যাখ্যা করা হবে। দিলওয়ারা মন্দিরগুলির শ্রেষ্ঠতম সজ্জা এই নাটমণ্ডপে কেন্দ্রীভূত। মাদুরার মীণাক্ষী বা বেলুড়ের চেন্ন কেশবের মন্দিরে, শ্বেতপাথরের না হলেও, উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যমণ্ডিত বহু স্তম্ভ আছে, কিন্তু গোলাকার ছাদের আভ্যন্তরীণ সজ্জায় যে অসামান্য দক্ষতা দিলওয়ারায় নিয়োজিত হয়েছে, তার ধারে-কাছে আসতে পারে, এমন কিছুর অস্তিত্ব দুনিয়ায় নেই। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বিমল শাহের মন্দিরটির প্রশংসায় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে দিকপাল পণ্ডিত ফার্গুসন সাহেব বলেছেন—"জৈন দেবালয়গুলির মধ্যে প্রায় সর্ব-প্রাচীন ও স্থাপত্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ হওয়াতে, এই বিশিষ্ট শৈলীর ভূমিকা হিসেবে এ-মন্দিরটি শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, এর ঐশ্বর্য থেকে জৈন মন্দিরগুলি সেই দূর অতীতকালেও যে কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, তা প্রমাণিত হয়।" চতুষ্কোণ অঙ্গনের চারিদিক ঘিরে বাহান্নটি ছোট ছোট কক্ষ; প্রত্যেকটির প্রবেশপথে অপরূপ মর্মর ভাস্কর্য আর ভেতরে এক একটি জৈন তীর্থংকরের মূর্তি। এ কক্ষগুলির সামনে দিয়ে একটি নীচু ঢাকা বারান্দা অঙ্গন প্রদক্ষিণ করে এসেছে। এই দালানের ছাতেও শ্বেতপাথরের যে নক্সাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে, কারিগরির মুন্সিয়ানা ও ব্যঞ্জনার লালিত্যে তা অপূর্ব। প্রাঙ্গণের এক কোণে দেবী অম্বিকার মন্দির। আজও সেখানে নিয়মিত পূজা হয়ে থাকে আর পুরোহিত দর্শকদের বিমল শাহের উপাখ্যান গল্প করে শোনান।

দিলওয়ারার অবশিষ্ট দেবালয়গুলির ধ্য তেজোপাল ও বাস্তুপালের ন্দিরটিই সর্বাধিক বিখ্যাত। তীর্থংকর মিনাথের নামে এটি উৎসগীকৃত; গনমধ্যকক্ষে তাঁর নিয়মিত পূজা হয়ে ক। শিলালিপি থেকে জানা যায়, জোপাল ও বাস্তুপাল দুই ভাই ছিলেন ১২৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁরা এ মন্দিরটি র্মাণ করিয়েছিলেন। আয়তনে, কর্যের প্রাচুর্য ও নিপুণতায় ও বিশেষ নাটমণ্ডপের অসামান্য সজ্জায় এ ন্দরটিকে অনেকে বিমল শাহের ন্দরের থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। শো বছরের অগ্রসর চর্চার ফলেও পত্য-শৈলীর কোনো পরিবর্তন ন কিন্তু কঠিন মর্মরের মাধ্যমে যে অপরূপ লালিত্য বিকশিত হতে া তা এ মন্দিরটি না দেখলে কল্পনা ও শক্ত। নাটমণ্ডপের ছাদের বর্ণনায় ুসনের মত চুলচেরা বিচারকও ছেন—"প্রশংসার ভাষা হারিয়ে লক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে হয়। খান থেকে যে একটি অপরূপ পুষ্প- নেমে এসেছে সেটিকে কঠিন পাথরে ী বলে মনে হয় না; সেটি যেন স্ফটিকের কতকগুলি বিন্দু।"

* * *

মন্ত্রমুগ্ধের মত সারাদিন ঘুরে য়েছি এ মন্দির দুটিতে। যেদিকে ই, চোখ যেন আর ফেরানো যায় দেওয়ালে দেওয়ালে "শত্রুঞ্জয় ম্য" থেকে উৎকীর্ণ কত কাহিনী; গন্ধর্ব-কিন্নরের শোভাযাত্রা; অপরূপ ল্লবে সজ্জিত মর্মরস্তম্ভে কত তা সুরসুন্দরী। সূর্য মেঘে ঢাকা া, তাদের কোমল লালিত্য মন করে; আবার খোলা অংগনে যখন সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয় তখন য় ঝলমল করে ওঠে এই মর্মর ুলি। আলোছায়ার এই অতি র ক্রীড়া অন্য কোনো মন্দিরে ‍ কল্পিত হয়েছে বলে আমার নেই।

ম্বিৎ ফিরে এল এক মন্দির রক্ষকের াগে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এবার দুয়ার বন্ধ করা হবে। নতমস্তকে ফিরে এলুম। মন পড়ে রইল ঐ দুটি আশ্চর্য নাটমণ্ডপে। মিলিটারী হাসপাতালের কাছে এসে রাস্তা মোড় নিয়েছে। আবছা আলোয় শেষবারের মত দূরে দিলওয়ারাকে দেখলুম; জীবনের মধুরতম এক অভিজ্ঞতা যেন ফেলে এলুম ঐ ধূসর মন্দিরগুলির প্রাঙ্গণে।

মোড় ফিরতেই টের পেলুম, আজ সারাদিন স্নানাহার হয়নি। ডাকবাংলোর খানসামা সকাল থেকে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে এতক্ষণে যে আমার ওপর বিলক্ষণ খাপ্পা হয়ে আছে এমনই আন্দাজ করেছিলুম। ঘাড় নীচু করে পাকা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে সে বললে, তার এতদিনের চাকরিতে দিল-ওয়ারা দেখতে বেরিয়ে খাবার সময় ঠিক ঘড়ি ধরে ফিরে এসেছে এমন পর্যটক সে আজও দেখেনি।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্বানুবৃত্তি)

৫

গল্পগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্বে একটি কথা আর একবার মনে করাইয়া দিই। রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁহার সাহিত্যে পাশাপাশি দুটি ধারা বর্তমান, একটি সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ মানব সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আর একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উধাও হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার সমকালীন কবিতা ও গল্প মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, কবিতায় ঐ নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর, আবার গল্পে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ মানব সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর। এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ৪২

ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা ছাড়িয়া দিলে গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের প্রথম ছয়টি গল্প হিতবাদী পত্রিকার জন্য লিখিত। ছয় সপ্তাহ পরে কবি হিতবাদীতে লেখা বন্ধ করিয়া দেন, কারণ সম্পাদকগণ আরও হাল্কা জিনিস দাবী করিলেন। এই গল্পগুলির মধ্যে পোস্ট মাস্টার গল্পটি বাদে কোনটিকেই উচ্চাঙ্গের রচনা বলা যায় না। অপরের দাবীর সঙ্গে তাল রক্ষা করিতে গিয়া এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে, তবু সে দাবীকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইল না, লেখা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। নিছক সম্পাদকীয় তাগিদে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়ে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সেসব রচনা প্রায়ই উচ্চাঙ্গের শিল্প হয় নাই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমন একটি রচনা নৌকাডুবি। পোস্ট মাস্টার ছাড়া অন্য সব গল্পগুলিতেই সংসারের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ বলিবার চেষ্টা আছে, কবির কলম সংকুচিত। পোস্ট মাস্টার কবির কলমে লিখিত। কলিকাতাবাসী পোস্ট মাস্টারের আত্মীয়সংগহীন প্রবাস বেদনার অন্তরালে খুব সম্ভব কলিকাতাবাসী কবির প্রবাস যাপনের দুঃখও লুক্কায়িত ছিল—স্থান-কাল-পাত্রের বড় বেশি মিল আছে, কাজেই কথাটা ভাবিয়া দেখিবার মতো।

এবারে সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত হইল, এ কবির নিজের কাগজ, অপরের অভিরুচিমতো লিখিবার বিড়ম্বনা না থাকায় কবি কল্পনার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া চলিবার সুযোগ পাইলেন। সাধনার প্রথম গল্প খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। এটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের অন্যতম। কি পরিকল্পনার দুঃসাহসিকতায়, কি স্বল্পাক্ষরে চরিত্রচিত্রণে, কি দুরূহ মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সপ্ততাল ভেদে ইহার তুলনা হয় না। আর পদ্মা নদীর সজীব দুর্দাম চিত্র এই গল্পটিতেই প্রথম পাইলাম। ৪৩

আর অগ্রসর হইবার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া লই। রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি সময়ে যে কবিতা ও গল্প লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম মিল আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সেই মিলের সন্ধান ও সম্ভব হইলে তাহার রহস্যোদ্ঘাটন এই প্রবন্ধের একটি প্রধান লক্ষ্য। তবে সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে গল্প ও কবিতা ভিন্ন শ্রেণীর শিল্প বলিয়া অন্তঃস্থিত মিল অনেক সময়ে প্রকট নয়; গল্পে যাহা ঘটনা প্রবাহ, কবিতায় তাহাই হয়তো ভাবনায় প্রবাহিত; গল্পে যাহা বাস্তব, কবিতায় তাহাই হয়তো ভাবমাত্র। আবার অনেক সময়ে দেখা যাইবে যে, গল্পে যাহা সমর্থিত, কবিতায় হয়তো তাহার প্রতিবাদ। ইহাও এক প্রকার মিল, কারণ ঐ সমর্থন ও প্রতিবাদ পাশাপাশি মিলাইয়া লইলে কবির মনঃপ্রকৃতির সমগ্র রূপটি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আবার একথাও সত্য যে, এইরূপ মিল সন্ধানের নেশা একবার মাথায় চাপিয়া বসিলে হতভাগ্য সমালোচককে হাস্যকরতার পঙ্কে নিক্ষেপ করিতে পারে। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে নেশা প্রকাণ্ড একটা শক্তি, কিন্তু সমালোচকের পক্ষে অত বড় বালাই আর নাই।

সোনার তরী পর্বে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে একটা আষাঢ়ে গল্প, অবান্তর কথা ও একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প রূপকথার ছাঁদে লিখিত। সোনার তরী কাব্যের অনেকগুলি কবিতাও তাই। ৪৪

এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সেতুস্বরূপ কবির নিজের শৈশব স্মৃতি। নিজের শৈশবকে, শৈশবের রূপকথার মধুর স্মৃতিকে পুনরায় সচেতন প্রয়াসে সৃষ্টি করিয়া উপভোগ করিবার ইচ্ছাতেই গল্প ও কবিতাগুলির সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।* "তারপরে আমি ভাবলুম এই যে কোন উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে এবং বর্তমানকে দূরকালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।" কবির উক্তি তাঁহার গল্প ও কবিতা উভয়ত্র প্রযোজ্য। এই সঙ্গে গিন্নি গল্পটিও পড়া যাইতে পারে, কারণ ঐ গল্পের ভিত্তি কবির বাল্য জীবনের একটি তিক্ত স্মৃতি। ৪৫

৪২। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, গানে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর; আবার ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে তুলনায় উপন্যাসে সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর। এ বিষয়ের বিচারে তাঁহার ছোট গল্পের স্থান কবিতা ও উপন্যাসের মাঝামাঝি।

৪৩। জীবন স্মৃতি গ্রন্থে শ্যাম নামে যে বালক ভৃত্যটির বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে বালক রাইচরণের মিল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৪৪। বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা।

৪৫। ২৭ জুন, ১৮৯৪, শিলাইদহ, ছিন্নপত্র। শৈশব সন্ধ্যা কবিতাটিও এই ভাবের অনুষঙ্গরূপে পাঠ্য। একটি ক্ষুদ্র পুরাতন কথা (ভাদ্র, ১৩০০) গল্পটির সঙ্গে সোনার তরীর কণ্টকের কথা (কার্তিক, ১৩০০) কবিতাটি মিলাইয়া পড়িলে কবির লেখক জীবনের একটি নিঃশব্দ বেদনার পরিচয় পাওয়া যাইবে। একটা আষাঢ়ে গল্প পরবর্তীকালে তাসের দেশ নাটিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

* রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৯, ২২৮

দালিয়া একটি রোমাণ্টিক কাহিনী। নকার দিনে কোন রচনাকে অধঃপাতে তে হইলে ঐ রোমাণ্টিক শব্দটাই ষ্ট। তার উপরে কাহিনীটির মধ্যে টা রাজা আছে, কাজেই রোমান্স ও ার দ্বৈত সংসর্গ দোষে কাহিনীটি াঙক্তেয় হইবার জো হইয়াছে। এই প বর্ণিত ঘটনা নাকি সচরাচর ঘটে কাজেই কাহিনীটি রোমাণ্টিক। কিন্তু কি কোন কাহিনীর পক্ষে অপবাদ। াকে আমরা ঘটনাস্রোত বলি অর্থাৎ া কোন স্থানে স্থির হইয়া নাই। মান তথ্যের অবিকল নকল করিবার া থাকিলেও তাহা সম্ভব নয়, কোন কোন রন্ধ্রে তথ্যাতীত বন্যা জল য়া পড়িবেই। আর তাছাড়া আজকার আগামীকল্য কি রোমাণ্টিক বলিয়া হইবে না; শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনের ত্রীর মেস নিশ্চয় একসময়ে অত্যন্ত বাস্তব ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই কি ী ও তাহার মেস কল্পনার বস্তুতে ত হয় নাই?

"আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
দিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।"

জীবনের ধর্ম। হাতের কাছে যাহা , দূরে গিয়া পড়িতেই তাহা দিব্য- । রূঢ় পাহাড় দূরে গিয়া পড়িবামাত্র ম বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, তথ্য ও স আপেক্ষিক সত্য, একই বস্তুর বের অবস্থানান্তর মাত্র। এমন বস্তুকে ত্য বিচারের মাপকাঠি করা চলে লেখকের উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যের তা দ্বারা বিচার করা আবশ্যক। ালিয়া গল্পে অনেকগুলি রাজা ও াদী আছে সত্য। কিন্তু রাজকীয়তা ই কি লেখকের উদ্দেশ্য? ছদ্ম- রাজা ও রাজকন্যাদের অন্তরে যে ত সার্বজনীন মানবধর্মনিহিত ছিল, ই উন্মোচন কি কবির লক্ষ্য নয়? ানবধর্মের ক্ষেত্রে আরাকানের বুড়া আরাকানের রাজা এবং শা-সুজার ণ সমান। পোষাকে ও সামাজিক য় দুস্তর ভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ ইহার চেয়ে অটল রিয়ালিজম আর তে পারে? এই রিয়ালিটির উপরেই গল্প ও সাহিত্যের ভিত্তি। সাহিত্য বিচারের ইহাই তো মাপকাঠি হওয়া উচিত। নিয়তির মধুর পরিহাসে, নিষ্ঠুর বিদ্রূপও হইতে পারিত, ছদ্মবেশী পাত্র-পাত্রিগণের সার্বজনীন মানবধর্ম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। গল্পটির রোমাণ্টিক অপবাদ খণ্ডনের আশায় এতগুলি কথা বলিলাম বলিয়াই কেহ না মনে করেন যে, এটিকে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প মনে করি। কাহিনীর মধ্যে যেসব সম্ভাবনা ছিল, সেগুলির পুরাপুরি সদ্ব্যবহার করা হয় নাই, ফলে গল্পটির উপসংহার অকালে আসিয়া পড়িয়াছে, মনে হয় মাঝখানের অনেকগুলি পাতা যেন হারাইয়া গিয়াছে, কিম্বা মাঝখানের অনেকটা পদ লোপ পাইয়াছে। এরকম মধ্যপদলোপী গল্প রবীন্দ্র সাহিত্যে আরও পাওয়া যাইবে। কাহিনীর রোমাণ্টিকতা ইহার শ্রেষ্ঠত্বের অন্তরায় নয়, রোমাণ্টিক হইতে গিয়া কবি যথেষ্ট রোমাণ্টিক হইতে পারেন নাই, ইহাতেই গল্পটির রস ক্ষুণ্ন হইয়াছে।

কঙ্কাল গল্পটি সোনার তরী কাব্যের শৈশব সন্ধ্যা কবিতাটির সমমাসে লিখিত, শৈশব সন্ধ্যার স্মৃতি দুটি রচনাতেই বিদ্যমান 'এক বিছানায় শুয়ে মোরা সংগী তিন।' কিন্তু গল্পটির রসস্বরূপ ভিন্ন, তাহার সংগে লেখকের শৈশবের সম্বন্ধ বড় নাই। মুখ্যতঃ এটি ভৌতিক গল্প হইলেও, মৃত্যুর রহস্য ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইলেও, এমন মানবিক কাহিনী, এমন জীবন রহস্যপূর্ণ কাহিনী অত্যন্ত বিরল। জীবনের জয়ধ্বনি তুলিবার জন্যই কবি যেন ভৌতিক কণ্ঠকে আহ্বান করিয়াছেন। জীবনের সংগে মানুষের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র, অনেকটা প্রৌঢ়া স্ত্রীর সংগে স্বামীর সম্বন্ধের মতো। তাহার সংগে নিত্য খিটিমিটি বাধিতেছে, কিন্তু তাহার কাছে ফিরিয়া না আসিলেও স্বস্তি নাই। ঐ যে সৌন্দর্যদলফুল্ল মেয়েটি ক্রুদ্ধ অভিমানে একদিন মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, তাহারই প্রেতাত্মা আজ স্বর্ণময় স্মৃতির পিঞ্জরের চারিদিকে মুগ্ধ বিহংগের মতো পাখা ঝাপটাইয়া করুণ আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে। মৃত্যুর প্রতি নয়, জীবনের প্রতি সুগভীর আসক্তিই গল্পটির রসস্বরূপ। এই ভাবটি রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল ভাব। এই অশরীরী প্রেতাত্মা অনায়াসে বলিতে পারিত, আচরণের দ্বারা অবশ্যই বলিয়াছে, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' ৪৬

ত্যাগ গল্পটির নায়ক হেমন্ত পত্নী কুসুমকে ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া পুরুষোচিত কার্যই করিয়াছে। কিন্তু হেমন্তের মত গঠনে কুসুমের কোন কৃতিত্ব নাই, সে 'ভূমিতলে দুই হাতে তাহার (হেমন্তের) পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া' ছিল। কিন্তু বলাকা ও পলাতকা পর্বে এই গল্পটি লিখিলে কবি কুসুমকে অন্য ধাতুতে গড়িতেন, হতভাগ্যের মতো সে পায়ের উপরে পড়িয়া থাকিত না, খুব সম্ভব সে-ই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইত।

একরাত্রি একটি অপূর্ব সৃষ্টি, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি সুগীত সংগীতের মতো ধ্বনিত হইয়াছে! গল্পটির সংগে সমকালে লিখিত দুটি কবিতার মিল দেখিতেছি। ৪৭ গল্পের নায়ক সুরবালাকে একদিন ইচ্ছা করিলেই পাইত, কিন্তু না, সে গারিবল্ডি হইবে, কাজেই সুরবালাকে বিবাহ করিল না। তারপরে যখন অনুশোচনার দিন আসিল, তখন দেখিতে পাইল সুরবালার স্মৃতিটি কী মনোহর! আর হতভাগ্য সে কিনা আকাশের চাঁদ চাহিয়াছিল। আকাশের চাঁদ আকাশেই থাকিল, মাঝ হইতে একদা যাহা অনায়াস প্রাপ্য ছিল, দুষ্প্রাপ্য হইবামাত্র তাহা অপূর্ব মনোরমত্ব লাভ করিল! তাহার দুই কুলই গেল।

"মনের ভিতর কে বলিল, তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিত, এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে

৪৬। মুক্তির উপায় গল্পটিতে তামসিক সন্ন্যাসকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। এরূপ আরও দুটি উদাহরণ পাওয়া যাইবে, উদ্ধার ও তপস্বিনী গল্প। উদ্ধার গল্পটির সন্ন্যাসীর অধঃপতন চিত্রিত হইয়াছে, তাহার অন্তরে অবশ্যই তামসিকতা লুক্কায়িত ছিল, নারীর রূপাগ্নির শিখা তাহাকে বিবরের বাহিরে আনিয়াছে। পরবর্তীকালে মুক্তির উপায় কবি কর্তৃক নাটীকৃত হইয়াছে।

৪৭। এক রাত্রি (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)
পরশ পাথর (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯)
আকাশের চাঁদ (আষাঢ়, ১২৯৯)

একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না।"

তখন সে

"দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবন রেখা
অস্ত রবির সোনার কিরণে
নূতন বরণে লেখা।"

তখন সে

"দুই বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায়
ঐ জীবনের মাঝে"

তখন সে

"যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায়
তার কিছু বেশি নহে।"

তখন

"সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথায় সে চলিল ভেসে
শশির লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশিহীন দেশে।"

আবার পরশ পাথর কবিতাটির সঙ্গেও গল্পটির যেন মর্মগত মিল। পরশ পাথরের সন্ন্যাসীর মতো গল্পের নায়কও

"অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে
চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।"

নায়কের পক্ষে সুরবালাই পরশ পাথর। সেই নারীর স্পর্শে তাহার স্মৃতির মাদুলি সোনা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখন কি সে বুঝিয়াছিল। আজ বহুদিন পরে যখন পরশ পাথর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের অতীত, তখন সে মাদুলির রূপান্তর দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছে।

খ্যাপা সন্ন্যাসীর পুনরায় সন্ধানের সান্ত্বনাটুকু আছে, গল্পের নায়কের বুঝি তাহাও নাই। "ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবল্ডিও হই নাই, এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল, আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা" ঐ রাত্রিটিই তাহার পক্ষে স্বর্ণ মাদুলি, ঐ রাত্রিটির স্মৃতির দিকে তাকাইয়াই তাহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, অনুসন্ধানের সৌভাগ্য হইতেও সে বঞ্চিত, সে এমনি হতভাগ্য।

স্বর্ণমৃগ এবং গুপ্তধন প্রায় একই ধাতুতে রচিত, যদিচ পরবর্তী গল্পটি শিল্প সৃষ্টি হিসাবে অনেক বেশি সার্থক। স্বর্ণমৃগ একদিন রাম ও সীতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল, আজ আবার বৈদ্যনাথ ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইল। গুপ্তধন গল্পেও স্বর্ণমৃগের সেই একই লীলা, মৃত্যুঞ্জয়কে স্ত্রীপুত্র সংসার ছাড়া করিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছে। সংসারের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা সন্ধান করিতে হইবে, স্বর্ণের লোভেই হোক আর সন্ন্যাসের লোভেই হোক অন্যত্র দৃষ্টিপাত করিলে বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কাই সর্মাধক—এই যেন কবি বলিতে চান। স্বর্ণকারাগারে অবরুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় চিন্তা করিতেছে—"পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা সেই গোধূলির স্বর্ণ। যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পরে কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যা তারা এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যা দীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আরতি ঘণ্টা বাজিয়া উঠে।"

পৃথিবী যে এত সুন্দর আগে কি মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে তাহা পরিয়াছিল, অবজ্ঞার স্রোতে দূরে আসিয়া পড়িয়া তবে তাহা প্রকট হইল! অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস। এখানেও সেই আকাশের চাঁদ ও পরশ পাথরের ভাবটি রূপান্তরে উপস্থিত।

এবারে জয়পরাজয় গল্পটির সঙ্গে মানস সুন্দরী কবিতার তুলনা করিতে চাই। মানস সুন্দরীর মতো কবিতায় রবীন্দ্র প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ, জয়-পরাজয় সম্বন্ধে সে দাবী করা যায় না সত্য, কিন্তু এখানে শিল্প সার্থকতার বিচার হইতেছে না, হইতেছে ভাবগত ঐক্যের। এ দুটির রচনাকাল লক্ষ্য করিতে বলি, কাছাকাছি সময়।[৪৮] শিল্প স্রষ্টার মনের রহস্য যদি কিছু বুঝিয়া থাকি তবে তাহা এই; যতক্ষণ একটি ভাব পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে না পারিতেছে, ততক্ষণ তাহা শিল্পী বা কবি কর্তৃক বারংবার প্রকাশিত হইতে থাকে; সেই অসম্পূর্ণ প্রকাশ সৃষ্টির খসড়ামাত্র; তারপরে ভাবটি যখন চূড়ান্ত-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, ভাবটির আত্ম-প্রকাশ চেষ্টায় নিবৃত্তি ঘটে। জয়পরাজয় ও মানস সুন্দরীর মধ্যেও সম্বন্ধটা অনেকটা এই রকম। জয়পরাজয় যাহার আংশিক ও অসম্পূর্ণ প্রকাশ, মানস-সুন্দরীতে তাহারই চরম ও চূড়ান্ত সফলতা।

মানস সুন্দরী কবির মানসী, সে মানবীমাত্র নয়, সে 'কবিতা কল্পনালতা'। শেখর কবিরও একজন মানস সুন্দরী আছে, সে অদৃশ্য, অনায়ত্ত, কিন্তু তাই বলিয়াই কিছুমাত্র কম বাস্তব নয়। নক্ষত্র লোকের পানে যেমন ধূপসৌরভ ওঠে শেখর কবির সমস্ত কবিতাই তেমনি-ভাবে, তেমনি হতাশ আগ্রহে সেই রহস্যময়ীর পদ প্রান্তের দিকে উত্থিত হইয়াছে। কবির কাছে রাজা, রাজসভা, কাব্যদ্বন্দ্ব, কবি প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্তই অলীক, সত্য সেই অদৃষ্ট রহস্যময়ী, জীবন ও জীবনান্ত যাহার পারে নিঃশেষে নিবেদিত হইয়াছে। শেখর কবির সারা জীবনের কাব্য সঞ্চয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার সময়ে বলিতেছে,—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, হে সুন্দরী অগ্নিশিখা

৪৮। জয় পরাজয় কার্তিক ১২৯৯
মানস সুন্দরী, পৌষ ১২৯৯

…ই দিলাম। এতদিন তোমাকেই আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, …কেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহু-…মি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতে …হে মোহিনী বহিরূপিনী, যদি হইতাম তো জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া …, কিন্তু আমি তুচ্ছ, তৃণ, দেবী, …াজ ভস্ম হইয়া গিয়াছে।" মানস …র কবিও কবিতা কল্পনালতার …্য এই ভাবের কথা বলিতে …। আমার তো মনে হয়, দুই মাসের …ন লিখিত রচনা দুইটিতে মূল … প্রেরণা অভিন্ন; তফাতের মধ্যে … কাব্যে যাহা বিশ্বের কবিতারূপ, …তে তাহাই গৃহের বনিতা মূর্তি; …যে টুকু প্রভেদ, তাহা কবিতা ও … অর্থাৎ ভিন্ন শিল্পের দাবীগত …।

…বুলিওয়ালা গল্পটির সংগে যেতে …দিব কবিতাটির মর্মগত মিল …কৃত স্পষ্ট। ৪৯ দুটি রচনাতেই …ন্যার প্রভাবে অভ্যাসের জড়তা …পিতৃমন মুক্তি পাইয়াছে। 'যেতে …দিব'র শিশুকন্যার বেদনা বিশ্ব-…য় পরিণত হইয়াছে, আর মিনি ও অদৃশ্য পরিপূরক রহমতের কন্যা এক হইয়া বেদনার বিদ্যুৎ ঝলকে করিয়া দিয়াছে যে, কলিকাতার …ত নাগরিক ও অশিক্ষিত খুনে …ওয়ালার মধ্যে ভেদ যতই দুস্তর তবু এক পিতৃত্ববোধের মধ্যে …র সংগতি হইয়াছে। বিষয়টি লইয়া আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা কাজেই এখানে এইটুকুই যথেষ্ট।

…ুটি গল্পটি পোস্ট মাস্টার গল্পের পীঠ। শহরবাসী পোস্ট মাস্টার …াস্বজনহীন পল্লী প্রবাসে আসিয়া …াছে, আর ফটিক, পল্লী গাঁয়ের … মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন হইয়া শহরে পড়িয়াছে। দুটি অবস্থাই বেদনা-হইতে পারে, তেমন ক্ষেত্রে বেদনার আলাদা, স্বরূপ এক। একই বেদনাকে ক্ষেত্রে হইতে দেখিবার ইচ্ছায় পোস্ট মাস্টার গল্পটি লিখিবার বছর খানেক পরে ছুটি গল্পটি লিখিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। প্রথম গল্পটি লিখিবার সময়ে কবি শহরবাসীর পল্লী-প্রবাসের দুঃখই কেবল জানিতেন, কিন্তু এতদিনে পল্লী জীবনের সংগে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবার ফলে বিপরীত দুঃখটার প্রকৃতিও বুঝি জানিতে পারিয়াছেন। ৫০

সুভা গল্পটি ছুটি গল্পটির পরবর্তী মাসে লিখিত। পিঠোপিঠি গল্প দুটি যেন একইভাবের এ পিঠ ও পিঠ। মূঢ় ফটিক পল্লী জননীর কোল ছাড়িয়া আসিয়া কেমন যেন অসহায় ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ঠিক তাহার মৃত্যুর কারণ না হইলেও তাহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত ও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে। বোবা বালিকা সুভা পল্লীর গাছপালা পশুপাখীর সংগে মিলিয়া এক রকম সুখেই ছিল, অন্ততঃ দুঃখ কাহাকে বলে ঠিক জানিত না। এমন সময় বিবাহোপলক্ষে শহরে আনীত হইয়া, ফটিক আনীত হইয়াছিল, পাঠ উপলক্ষে, দুই-ই সমান নিষ্ঠুর হইতে পারে, বোবা বালিকা সুভা এবারে সত্য সত্যই মূঢ় হইয়া পড়িল। ঐখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহার পরে কায়িক মৃত্যু ঘটানো বাহুল্যমাত্র। ফটিক ও সুভা কেহই শহরের আবহাওয়ায় টিকিল না। "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্য কৌ।" গল্প দুটিকে এইভাবে বিচার করিলে পরস্পরের সান্নিধ্যে গভীরতর অর্থ-গৌরব পাওয়া যাইতে পারে।

সমাপ্তি গল্পের নায়িকা কপাল-কুণ্ডলার সগোত্র এবং ফটিক ও সুভার সহোদরা। তাহার মৃন্ময়ী নাম সার্থক, মাটি ও প্রকৃতির সংগে সে এমনি একাত্ম হইয়া আছে যে, অপূর্বর প্রণয়ের দিকে তাকাইবার সুযোগ পায় নাই। স্বামীর প্রেমকে উপলব্ধির জন্য বিচ্ছেদের গুরুতর আঘাতের প্রয়োজন তাহার ছিল, সেই আঘাতের ফলে তাহার যেন একটা চটকা ভাঙিয়া গিয়াছে, কেবল তখনই সে মাটির বাঁধন কাটাইয়া স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা দিতে পারিয়াছে। ফটিক, সুভা, মৃন্ময়ী তিনজনেই প্রকৃতির শিশু। এই গল্পগুলি পড়িলে বোঝা যায় যে, প্রকৃতির সুনিবিড় অন্ধ আকর্ষণ কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিমন নয়, তাঁহার কাহিনী স্রষ্টা মনও অনুভব করিতে শুরু করিয়াছে। কবির উপরে পল্লী-প্রকৃতি তাহার ক্ষুধিত পাষাণের প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পোস্ট মাস্টার লোকটা সত্যই চতুর ছিল, তাই এমন সর্বনাশা দেশ ছাড়িয়া পূর্বাহ্নেই সরিয়া পড়িয়াছিল। মাটির প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, পৃথিবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বরাবর একটা অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, এ গল্পগুলি তাহারই স্বাক্ষর, আরও স্বাক্ষর আছে, উজ্জ্বলতর স্বাক্ষর এক মাস পরে লিখিত বসুন্ধরা কবিতায়। ৫১

(ক্রমশঃ)

৪৯। কাবুলিওয়ালা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯
যেতে নাহি দিব কার্তিক ১২৯৯

৫০। দ্রষ্টব্য পত্র, সাজাদপুর ছিন্নপত্র, ৭৯ (১৩৩৫ সং)
৫০। ছুটি, পৌষ ১২৯৯
৫০। সুভা মাঘ ১২৯৯

৫১। সমাপ্তি, আশ্বিন, ১৩০০
বসুন্ধরা, কার্তিক, ১৩০০

অনুবাদঃ শিবনারায়ণ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

লুই চলে যায়। ওলগা শোবার ঘরের দরজাটা খুলে দেয়। হুগো বেরিয়ে আসে।

হুগো। ওটা তোমার বোনের।

ওলগা। কোনটা?

হুগো। অন্য ছবিটা। ওটা তোমার বোনের। (চুপচাপ) আমারটা নামিয়ে রেখেছ। (ওলগা কথা বলে না। হুগো তার দিকে চায়) তোমাকে যেন কিরকম দেখাচ্ছে। ওরা কী চাইছিল?

ওলগা। ওরা তোমার খোঁজে এসেছিল।

হুগো। ও। তুমি ওদের বলেছ আমি এখানে আছি?

ওলগা। হ্যাঁ।

হুগো। বুঝেছি। [বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করে]

ওলগা। আজ রাতটা ভারী চমৎকার। আর বাড়ির চারধারে লোকেরা অপেক্ষা করছে।

হুগো। তাই বুঝি? [টেবিলের ধারে বসে] আমাকে কিছু খেতে দাও।

[ওলগা রুটী, জ্যাম আর একটি প্লেট নিয়ে আসে। টেবিলে খাবার গুছিয়ে দেয়। হুগো বলতে থাকে।]

তোমার ঘর সম্বন্ধে আমি ঠিকই কল্পনা করেছিলাম। প্রত্যেকটা জিনিস আমার মনে ছিল। আমার মনে যে ছবি ছিল প্রত্যেকটা জিনিস ঠিক তেমনি রয়েছে। [থেমে] যখন জেলে ছিলাম ভাবতাম সবই বুঝি শুধু একটু স্মৃতি। এখন দেখছি সত্যিই ঘরটা রয়েছে, ওখানে, দেয়ালের ওপাশে। আমিত এই মাত্র ওর ভেতরে গিয়েছিলাম। তোমার ঘরের মধ্যে গেলাম, আমার স্মৃতিতে যে রকম দেখাত, তার চাইতে কিছু বেশী বাস্তব মনে হোল না। জেলের কুঠরীটা, তাও সব যেন একটা স্বপ্ন। আর হোয়েডেরারের চোখ দুটো—যেদিন আমি তাকে খুন করলাম। তোমায় কি মনে হয় আমি কোনোদিন আর জেগে উঠবো? হয়ত যখন তোমার বন্ধুরা গুলী করতে আসবে.........

ওলগা। তুমি যতক্ষণ এখানে আছ, তারা তোমায় ছোঁবে না।

হুগো। তুমি বুঝি তাদের এটুকু রাজী করিয়েছ? [গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়।] এক সময় না এক সময় আমাকে বেরোতে ত' হবে।

ওলগা। রোসো। রাতটা হাতে আছে। এক রাতের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

হুগো। কি ঘটার আশা করছ?

ওলগা। কত কি বদলাতে পারে।

হুগো। যথা?

ওলগা। তুমি। আমি।

হুগো। তুমি?

ওলগা। সেটা তোমার পরে নির্ভর করছে।

হুগো। [হেসে ওঠে, তার দিকে চায়, কাঁধ ঝাকি দেয়] বলে ফেল।

ওলগা। আমাদের মধ্যে আবার কেন ফিরে এসো না?

হুগো। [হেসে ওঠে] সে কথা শুধোবার খাসা একখানা সময় বটে।

ওলগা। কিন্তু ধর, যদি তা সম্ভব হয়। ধর, সব কিছুই যদি ভুল বোঝার জন্যে হয়ে থাকে? জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে, কখনো কি তা ভাব নি?

হুগো। না।

ওলগা। কি কথা ভাবতে তাহলে?

হুগো। যা করেছি তারি কথা। বুঝতে চেষ্টা করতাম কেন এ কাজ করলাম।

ওলগা। বুঝতে পেরেছিলে? [হুগো কাঁধ ঝাকি দেয়]। আচ্ছা, কি করে ব্যাপারটা ঘটলো—মানে তোমার আর হোয়েডেরারের? সত্যিই কি ও যেসিকার চারধারে ঘুর ঘুর শুরু করেছিল?

হুগো। হ্যাঁ।

ওলগা। তোমার তাহলে হিংসে হয়েছিল বল?

হুগো। জানি না আমি.... আমার ত মনে হয় না।

ওলগা। আমায় বল।

হুগো। কি বলব?

ওলগা। সব কিছু। একেবারে গোড়া হতে।

হুগো। সেটা এমন কিছু শক্ত নয়। এ কাহিনী আমার মুখস্থ। জেলে সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হতে শেষ পর্যন্ত রোজ উল্টেপাল্টে দেখতাম। কিন্তু এর মানে যে কি, সে হোল অন্য কথা। যদি দূর হতে দেখ, মনে হবে ব্যাপারটার মধ্যে কাজ-চলা গোছের একটা ঐক্য আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করেত যাও মুখের সামনে সব ছত্রাকার হোয়ে যাবে। আমি যে কয়েকবার গুলী ছুঁড়েছিলাম এটা শেষ পর্যন্ত সত্যি...

ওলগা। একদম গোড়া হতে শুরু কর।

হুগো। গোড়া হতে? সে ত' তুমি আমার মতই ভাল করে জান। তা ছাড়া সত্যিই কি কখনো কোন গোড়া ছিল? কাহিনী শুরু করতে পার ৪৩এর মার্চে লুই যখন আমায় ডেকে পাঠায় তখন হতে। কিম্বা

রো এক বছর আগে যখন আমি র্টিতে যোগ দিই তখন হতে। ম্বা তারো আগে আমার জন্ম ত। যাকগে, ধরা যাক ব্যাপারটার রু ১৯৪৩এর মার্চ মাস হতে...। থা বলতে বলতে আলো ধীরে ধীরে ন আসে।]

প্রথম দৃশ্য

দুবছর আগে, ওলগার ফ্ল্যাট। সময় ত। পেছনের দরজা হতে অনেকগুলো ঠস্বর ভেসে আসে, কখনো জোরে খনো আস্তে। বোঝা যায় ভেতরে নেক লোক উত্তেজিত হোয়ে কথা লছে।

হুগো টাইপ করছে। তাকে গত শোর চাইতে অনেক বেশী তরুণ খায়। ইভান ঘরের এধার হতে ওধার য়চারী করছে।

ু। শুনেছো?

। আঁ।

ু। টাইপ করা একটু থামাতে পারো না?

। কেন?

ু। ওতে আমার নার্ভাস লাগে।

। তোমাকে ত মোটেই নার্ভাস ধরনের লোক মনে হচ্ছে না।

ু। তা ঠিক। তবে এখন ও আওয়াজ শুনলে আমার নার্ভাস লাগছে। আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পার না?

া। [খুশী হোয়ে] নিশ্চয়—তোমার নাম কি?

ন্। আমার ছদ্মনাম ইভান্, তোমার?

া। রাস্কোলনিকফ্।

ন্। [হেসে ওঠে] এত প্রায় দেড়খানা নাম।

গা। এটা আমার পার্টি নাম।

ান্। নামটা কোত্থেকে খুড়ে বার করলে?

গো। একটা বইয়ের চরিত্র।

ান্। কি করেছিল সে?

গো। একজনকে খুন করেছিল।

ান্। বটে, তুমি কাউকে খুন করেছ নাকি?

গো। না [থেমে] তোমায় এখানে কে পাঠিয়েছে?

ইভান্। লুই।

হুগো। সে তোমায় কি বলেছে?

ইভান্। দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে।

হুগো। তারপরে?

ইভান্ হুগোকে প্রশ্ন না করার ইঙ্গিত করে। পাশের ঘর হতে নানা গলার আওয়াজ ভেসে আসে। তর্কের মত শোনায়।

ইভান্। ভেতরে ওরা ছাতার করছেটা কি?

ইভানের অনুকরণে হুগোও প্রশ্ন না করতে ইঙ্গিত করে।

হুগো। মুশকিল কি এ আলাপ বেশীক্ষণ চলতে পারে না। [চুপচাপ]

ইভান্। পার্টিতে কি অনেকদিন?

হুগো। '৪২ হতে। প্রায় এক বছর। রিজেণ্ট সাহিবয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পরই যোগ দিই........ তুমি কতদিন?

ইভান্। মনে করতে পারি না। বোধ হয় চিরদিনই মেম্বার ছিলাম। [থেমে] আমাদের খবরের কাগজ যে ছাপে, তুমি কি সেই লোক নাকি?

হুগো। হ্যাঁ। আমি, তাছাড়া আরো অনেকে মিলে।

ইভান্। তোমাদের কাগজ আমার হাতে অনেক সময় আসে। কিন্তু আমি পড়ি না। অবশ্যি দোষ কিছু তোমাদের নয়। তবে মস্কো রেডিও কি বি বি সি'র তুলনায় তোমাদের থাকে এক সপ্তাহের বাসি খবর।

হুগো। তা কি আশা কর? আমরাও অন্য পাঁচজনের মত রেডিও শুনেই খবর পাই।

ইভান্। আমি ত' নালিশ করছি না। তুমি তোমার কাজ করছ, ব্যস্। [চুপচাপ] কটা বাজে?

হুগো। দশটা বাজতে পাঁচ। [ইভান্ হাই তোলে] কি হোল?

ইভান্। কিছু না।

হুগো। তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

ইভান্। না, ভালই আছি। ঠিক আগটাতে চিরকালই আমার এরকম হয়।

হুগো। কার আগে?

ইভান্। কিছুর আগে না। [চুপচাপ] বাইকে চাপলেই সব ঠিক হয়ে যায়। [চুপচাপ] মনে হয় আমি মানুষটা এত নিরীহ একটা মাছিকে পর্যন্ত ব্যথা দিতে পারি না। [হাই তোলে]

ওলগা সামনের দরজা দিয়ে ঢোকে। দরজার কাছে একটা স্যুটকেস নামিয়ে রাখে।

ওলগা। [ইভান্‌কে] এটা তোমার জিনিস। ক্যারিয়ারে ঠিক বসবে তো?

ইভান্। দেখি। হ্যাঁ, ঠিক আছে।

ওলগা। দশটা বাজে। বেরিয়ে পড়। পাড়া আর বাড়িটার হিসেব বুঝে নিয়েছ ত?

ইভান্। হ্যাঁ।

ওলগা। ভালয় ভালয় যেন হয়ে যায়।

ইভান্। [চুপচাপ] একটা চুমো খাবে না?

ওলগা। নিশ্চয়। [তার দুগালে চুমো খায়।]

ইভান্। [স্যুটকেসটা তুলে নিতে দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়ায়, কৌতুকের স্বরে হুগোকে] চললাম তাহলে রাসকোলনিকফ্।

হুগো। [হেসে] গোল্লায় যাও।

[ইভান্ বেরিয়ে যায়।]

ওলগা। যাবার সময় ওরকম বলা তোমার উচিত হয় নি।

হুগো। কেন?

ওলগা। ও রকম বলা উচিত নয়।

হুগো। [বিস্মিতভাবে] তোমার এ সব কুসংস্কার আছে নাকি?

ওলগা। [বিরক্তভাবে] মোটেই না।

হুগো। [ভাল কোরে তার দিকে চেয়ে] ও কি করতে যাচ্ছে?

ওলগা। তোমার তা জানবার কোনো দরকার নেই।

হুগো। কোর্স্কের সেতুটা উড়িয়ে দিতে গেছে।

ওলগা। সেকথা তোমার শোনার কি দরকার? দুর্ঘটনা ঘটলে যত কম জান, ততই ভাল।

হুগো। কিন্তু ও কি করতে যাচ্ছে, তুমি তো জান।

ওলগা। [কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে] আমার কথা.........

হুগো। তা বটে। তুমি মুখ বন্ধ রাখতে জান। তুমি লুইয়ের মত, মেরে ফেললেও তোমাকে দিয়ে কিছু

বলাতে পারবে না। [কিছুক্ষণ নীরব] কিন্তু আমিই যে বলে ফেলব তার কি কোন প্রমাণ পেয়েছ? আমাকে পরীক্ষা না করলে আমি বিশ্বাসের যোগ্য কিনা কি করে জানবে?

ওলগা। পার্টি কিছু আর নৈশ-বিদ্যালয়ের আসর নয়। আমরা পরীক্ষা করে যাচাই করিনে, আমরা যাচাই করি প্রত্যেককে তার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী কাজে লাগিয়ে।

হুগো। [টাইপরাইটারটা দেখিয়ে] আর এটাই আমার সবচেয়ে সদ্ব্যবহার বুঝি?

ওলগা। রেললাইন কেমন করে ওপড়াতে হয় জান?

হুগো। না।

ওলগা। তাহলে? [চুপচাপ]। হুগো আরশীতে নিজের চেহারা দেখে।] নিজের রূপ দেখছো?

হুগো। দেখছি আমি আমার বাবার মত দেখতে কিনা। [থেমে] আমার যদি গোঁফ থাকতো তুমি আমাদের মধ্যে ফারাক করতে পারতে না।

ওলগা। (কাঁধ ঝাকি দিয়ে) কি হোল তাতে?

হুগো। আমি আমার বাবাকে পছন্দ করি না।

ওলগা। তা আমরা জানি।

হুগো। বাবা আমাকে বলেছিলো, "যৌবনকালে আমিও এক বিপ্লবী-দলে কাজ করতাম। তাদের কাগজের জন্য লিখতাম। আমার মত তোরও এ ভূত নামবে।"

ওলগা। আমাকে এ সব কথা বলছ কেন?

হুগো। কিছুর জন্যে নয়। আরশীতে চাইলেই এ-কথাগুলো আমার মনে পড়ে, তাই।

ওলগা। (আলোচনা ঘরের দিকে তাকিয়ে) ওখানে লুই আছে?

হুগো। হ্যাঁ।

ওলগা। আর হোয়েডেরার?

হুগো। তাকে চিনি না, বোধ হয় আছে। মানুষটা কে?

ওলগা। আইন পরিষদ ভেঙে দেবার আগে তার সদস্য ছিল। এখন পার্টির সম্পাদক।

হুগো। ভেতরে ওরা খুব গণ্ডগোল করছে। মনে হয় ঝগড়া হচ্ছে।

ওলগা। হোয়েডেরার একটা প্রস্তাবের পরে ভোট নেবার জন্যে কমিটির মিটিং ডেকেছে।

হুগো। কি প্রস্তাব?

ওলগা। আমি জানি না। আমি শুধু জানি লুই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে।

হুগো। (হেসে) লুই যদি বিরুদ্ধে হয় ত' আমিও বিরুদ্ধে। কিসের প্রস্তাব জানার কোন দরকার নেই। (থেমে) ওলগা, আমাকে সাহায্য করতে হবে।

ওলগা। কি সাহায্য?

হুগো। লুইকে বোঝাতে হবে যাতে কোন প্রত্যক্ষ কাজে আমাকে একটা অংশ দেয়। সবাই যখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে, তখন আমার কাজ শুধু লেখা। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

ওলগা। তোমার কাজেও তো ঝুঁকি রয়েছে।

হুগো। কিন্তু সে ঠিক এক ঝুঁকি নয়। (চুপচাপ) ওলগা, আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

ওলগা। সত্যি? কেন?

হুগো। বড্ড কঠিন।

ওলগা। তোমার তো বিয়ে হোয়েছে?

হুগো। তাতে কি?

ওলগা। তোমার বউকে তুমি ভালবাস না?

হুগো। নিশ্চয়, ভালবাসি বইকি। (চুপচাপ) যে বেঁচে থাকতে চায় না তাকে কাজে লাগানো উচিত। অবশ্য কিভাবে লাগানো যায়, তা যদি জানা থাকে। (চুপচাপ। আলোচনা-ঘর হতে চেঁচামেচি, চাপা আওয়াজ ভেসে আসে।) ওখানে অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে।

ওলগা। (উদ্বিগ্নভাবে) খুবই খারাপ। দরজা খুলে লুই বেরিয়ে আসে। সঙ্গে দুজন লোক, তারা দ্রুত সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

লুই। হোয়ে গেল।

ওলগা। হোয়েডেরার কোথায়?

লুই। বোরিস আর লুকাসের সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ওলগা। তাহলে?

লুই। (জবাব না দিয়ে কাঁধ ঝাকি দেয়। চুপচাপ) খানকির বাচ্চারা!

ওলগা। ভোট নিয়েছিলে?

লুই। হ্যাঁ। (থেমে) ওকে আলোচনা শুরু করার ক্ষমতা দেওয়া হোয়েছে। পরের সভায় নির্দিষ্ট সর্ত নিয়ে এলে ওর ইচ্ছেমতই সিদ্ধান্ত হবে।

ওলগা। পরের সভা কবে?

লুই। দশ দিনের মধ্যে। আমাদের হাতে এক সপ্তাহ সময় আছে। (ওলগা হুগোর দিকে দেখায়।) কি? ও, হ্যাঁ......তুমি বুঝি এখনো এখানে? (হুগোর দিকে চেয়ে আপন মনে আবার বলে।) এখনো এখানে........ (হুগো চলে যাবার উদ্যোগ করে) দাঁড়াও। তোমাকে হয়তো একটা কাজের ভার দিতে পারি। (ওলগাকে) আমার চাইতে তুমি ওকে ভাল জান। কতখানি দৌড়?

ওলগা। চলে যাবে।

লুই। ভেঙে যাবে না?

ওলগা। ভেঙে যাবে না নিশ্চয় জানি। বরং......

লুই। বরং কি?

ওলগা। কিছু না। ও ঠিক পারবে।

লুই। বহুৎ আচ্ছা। (থেমে) ইভান চলে গেছে?

ওলগা। পোয়া ঘণ্টা হবে।

লুই। আমাদের আস্তানাটা ঘেরের পাশেই পড়ে—ফাটার আওয়াজ এখান হতে শোনা যাবে। (চুপচাপ। হুগোর কাছে এসে) শুনলাম তুমি কাজ চাও?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। কেন?

হুগো। আমি ঐ রকম।

লুই। খাসা। মুশকিল কি, তুমি তোমার দুহাত দিয়ে কোন কিছুই যে করতে জান না।

হুগো। গত শতকের শেষের দিকে রুশিয়াতে এমন অনেক ছোকরা ছিল যারা পকেটে বোমা নিয়ে কোনো গ্র্যাণ্ডডিউকের আসার অপেক্ষায় সময় গুনতো। বোমা ফাটত, গ্র্যাণ্ডডিউক পৌঁছতো যমের দক্ষিণ দুয়ারে, ছোকরা বেচারীও অবশ্য যেত সঙ্গে। সেটুকুতো আমি পারি।

তারা ছিল অ্যানার্কিস্ট। তুমি
ও তাদেরই মত বুদ্ধিবাদী
নার্কিস্ট, তাই তুমি তাদের স্বপ্ন
। ইতিহাসের হিসেবে তুমি
াশ বছর পিছিয়ে আছ।

আমি তাহলে একজন অকর্মা।

ও হিসেবে তাই।

বেশ।

দাঁড়াও [থেমে] হয়ত, তোমাকে
কটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারি।

সত্যিকারের কাজ? তুমি সত্যি
শ্বাস করতে আমাকে?

দেখা যাক্। বোস। [থেমে]
াপারটা এইঃ একদিকে রয়েছে
ক্ষশক্তির অনুচর, রিজেণ্টের
াসিস্ত সরকার; অন্যদিকে শ্রেণী-
ীন সমাজ আর মুক্তির জন্যে লড়াই
রছে আমার পার্টি। দুয়ের মাঝখানে
াছে পেণ্টাগণেরা, জাতীয়তাবাদী
ার লিবেরাল বুর্জোয়াদের তারা
্রতিনিধি। তিনটে দল, তাদের স্বার্থ
ামূলে পরস্পরবিরোধী। তাদের
দস্যরা পরস্পরকে আপ্রাণ ঘৃণা
রে। [থেমে] হোয়েডেরার চায়
য, আমাদের সর্বহারার পার্টি
াসিস্ত এবং পেণ্টাগণের সঙ্গে হাত
মিলিয়ে কোয়ালিশন সরকার করে
ুদ্ধের শেষে ক্ষমতা দখল করে। সেই
উদ্দেশ্যেই সে আজ রাতে এই সভা
ডেকেছিল। এতে তুমি কি বল?

া। [হেসে] তুমি আমার সঙ্গে
ঠাট্টা করছ।

। কেন?

া। এ কখনো হতে পারে নাকি?

। গত তিনঘণ্টা ধরে আমরা এ
নিয়েই আলোচনা করছিলাম। যদি
বেশীর ভাগ সদস্য এই হাত-
মেলানোর নীতিতে সায় দেয় তাহলে
তুমি কি করবে?

া। তুমি কি আমাকে সত্যি সত্যি
এ প্রশ্ন করছ?

। হ্যাঁ।

গা। যেদিন প্রথম অত্যাচার কথাটার
মানে বুঝেছিলাম সেদিনই আমার
পরিবার বন্ধু সব ছেড়ে বেরিয়ে
এসেছি। তাদের সঙ্গে কোন
অবস্থাতেই হাত মেলাতে পারবো
না। [থেমে] তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা
করছ, তাই না?

লুই। কমিটি তিন ভোটের বিরুদ্ধে চার-
ভোটে হোয়েডেরারের প্রস্তাব সমর্থন
করেছে। আসছে সপ্তাহে হোয়ে-
ডেরার রিজেণ্টের দূতদের সঙ্গে
দেখা করবে।

হুগো। ওকে কি ঘুষ দিয়েছে?

লুই। জানিনে—তা নিয়ে আমার কোন
মাথাব্যথা নেই। বাস্তব-বিচারে ও
বিশ্বাসঘাতক—আমার পক্ষে তাই
যথেষ্ট।

হুগো। কিন্তু লুই...মানে, আমি অবশ্য
বুঝিনে কিন্তু...কিন্তু এ যে নিছক
পাগলামী। রিজেণ্ট আমাদের ঘেন্না
করে, আমাদের ধরার জন্য ফাঁদ পাতে,
সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্মানীর
পক্ষে হয়ে সে লড়াই করছে, আমাদের
লোকদের সে গুলি করে মেরেছে।
সে কি করে...?

লুই। রিজেণ্ট অক্ষশক্তির জয়ের
সম্ভাবনায় ভরসা হারিয়েছে। সে
এখন নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। যদি
মিত্রশক্তি জিতে যায় তাহলে সে
দুমুখো নীতি নিয়েছিল বলে
সাফাই গাইবার ফন্দী আঁটছে।

হুগো। কিন্তু আমাদের ছেলেরা...

লুই। আমি "পি এ সি"-র প্রতিনিধি;
"পি এ সি"-র সকলে হোয়েডেরারের
বিরুদ্ধে। কিন্তু তুমি তো জান
অবস্থাটা কিঃ "পি এ সি"-র সঙ্গে
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা মিলে "সর্ব-
হারাদল" তৈরী হয়েছে। সোশ্যাল
ডেমোক্র্যাটরা হোয়েডেরারের পক্ষে
ভোট দিয়েছে। তারা দলে ভারী।

হুগো। তারা কেন...?

লুই। হোয়েডেরারকে তারা ভয় করে
বলে।

হুগো। আমরা কি ওদের দল হতে বার
করে দিতে পারি না?

লুই। পার্টির মধ্যে ভাঙন্? অসম্ভব।
[থেমে] হুগো, তুমি সত্যি আমাদের
পক্ষে?

হুগো। আমি যা কিছু জানি তোমার
আর ওলগার কাছেই শেখা—আমার
সব কিছুই তোমাদের কাছ হতে
পাওয়া। আমার কাছে তোমরাই
পার্টি।

লুই। [ওলগা-কে] ও যা বলছে ওকি
তা বিশ্বাস করে?

ওলগা। হ্যাঁ।

লুই। চমৎকার। [হুগোকে] তুমি
অবস্থাটা বুঝতে পারছো। আমরা
বেরিয়ে আসতে পারবো না, অথচ
কমিটির ভেতর দিয়ে আমাদের নীতি
স্বীকার করাতেও পারবো না।
আসলে কিন্তু এটা শুধু
হোয়েডেরারের একটা চাল। হোয়ে-
ডেরার না থাকলে বাকী সবাই
আমাদের হাতের মুঠোয়। [থেমে]
গত মঙ্গলবার হোয়েডেরার পার্টির
কাছে একজন ব্যক্তিগত সেক্রেটারী
চেয়েছিল। একজন বিবাহিত ছাত্র।

হুগো। বিবাহিত কেন?

লুই। তা জানিনে। তুমি বিয়ে করেছ?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। তাহলে? কাজটা তুমি নিচ্ছ?
[তারা পরস্পরের দিকে মুহূর্তকাল
তাকায়।]

হুগো। [প্রত্যয়ের সঙ্গে] হ্যাঁ।

লুই। খুব ভাল। তুমি তোমার স্ত্রীকে
নিয়ে কালই রওনা হবে। ও এখন
থাকে এখান হতে মাইল কুড়ি দূরে
ওর এক বন্ধুর দেওয়া বাগান
বাড়িতে। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে
সেখানে তিনবেটা গুণ্ডা বাড়ি পাহারা
দেয়। তুমি শুধু ওর পরে নজর
রাখবে। তুমি পৌঁছলেই আমরা
তোমার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা

করব। রিজেণ্টের দূতদের সঙ্গে কোনক্রমেই ওর যেন দেখা না হয়। অন্ততঃ দ্বিতীয়বার যেন আর সাক্ষাৎ না ঘটে। বুঝতে পারলে?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। আমরা যে রাতে তোমাকে সঙ্কেত জানাব তুমি দরজা খুলে দেবে। তিনজন কমরেড গিয়ে কাজ হাসিল করে আসবে। তাদের সঙ্গে মোটর গাড়ী থাকবে। তারা কাজ সারার ফাঁকে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে কেটে পড়তে পার।

হুগো। ও, এই ব্যাপার! এই তাহলে সব! আমার যোগ্যতা শুধু ঐটুকু কাজের বলে তোমরা ভাব?

লুই। তুমি রাজী নও?

হুগো। না, মোটেই না। আমি তোমাদের হাতের পুতুল হতে রাজী নই। জানইত, আমাদের বুদ্ধিজীবিদেরও কিছু অহঙ্কার আছে। যে কোন কাজ হলেই কিছু আমরা নিই না।

ওলগা। হুগো!

হুগো। এখন আমার কথাটা শোন। আমার প্রস্তাব হলো এই। কোন যোগাযোগ নয়, কোন গুপ্তচর নয়। সমস্ত কাজ আমি একলা হাসিল করব।

লুই। তুমি?

হুগো। হ্যাঁ।

লুই। আনাড়ীর পক্ষে কাজটা যে একটু বেশী রকমের কঠিন।

হুগো। তোমার খুনে তিনজন হয়ত হোয়েডেয়ারের রক্ষীদের সামনে পড়ে যাবে—তারা সহজেই মারা পড়তে পারে। আমি যদি তার সেক্রেটারী হই আর যদি তার বিশ্বাস পাই, দিনের মধ্যে অনেক সময়ই তার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পাব।

লুই। [ইতস্তত করে] আমি কিন্তু...

ওলগা। লুই!

লুই। বল?

ওলগা। [নরম সুরে] ওকে বিশ্বাস কর। বেচারী একটা কিছু করার জন্যে ছটফট করছে। ও তোমাকে কিছুতেই বসিয়ে দেবে না।

লুই। তুমি ওর জামিন হোচ্ছ?

ওলগা। নিশ্চয়।

লুই। তাহলে বেশ। এখন শোন...

[দূরে বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ শোনা যায়]

ওলগা। কাজ হাসিল করেছে!

লুই। আলোগুলো নিবিয়ে দাও।

[তারা আলো নিভিয়ে জানলা খু[লে] দেয়। অনেক দূরে আগুনের আ[ভা] দেখা যায়।]

ওলগা। চমৎকার জ্বলছে। চমৎকা[র] খাসা, যেন বনফায়ার। ও তাহ[লে] কাজটা ঠিকমতই হাসিল করেছে।

[তারা সবাই জানালায় এসে দাঁড়ায়]

হুগো। হ্যাঁ। ঠিকমতই কাজটা হাসি[ল] করেছে। সপ্তাহ শেষ হবার আ[গে] তোমরা দুজনে এখানে এসে এমনি[] তর দাঁড়াবে, এমনিতর এক রা[তে] সংবাদের অপেক্ষা করবে। তোম[রা] উদ্বিগ্ন হয়ে আমার কথা বল[বে] আমি তোমাদের কাছে দরকা[রী] লোক হয়ে উঠবো। তোমরা ভাব[বে] কাজটা ও কতখানি গোছাতে পারলো[।] তারপর টেলিফোন বেজে উঠ[বে] কিম্বা হয়ত' কেউ দরজায় ক[ড়া] নাড়বে, আর এখন যেমন হাস[ছ] তেমনি হেসে তোমরা বললেঃ "[ও] কাজটা ঠিকমতই হাসিল করেছে।"

—— যবনিকা ——

(ক্রমশ[ঃ])

মিল

আরতি দাস

অনেক দিন,
অনেক দিন পরে,
নিজেকে মনে পড়ে;

চেনা চেনার আসে আভাষ
অনেক দিন পর,
সবুজ ঘাস ভরা আঙন
কোথায় সেই ঘর,
কারুর নয়, আমারি সেই ঘর!

আঙন ঘিরে নাই বা থাক্ হাওয়া,
নাই বা থাক্ ভোরের গান গাওয়া,
যদি কিছুই না হয়, হোক্
তবুও তার পর,
থাকে ত সেই চিরকালেই
আমার চেনা ঘর।

কত জনাই কত কী কয়,
বোঝেনা কেউ কিছু,
কেন যে রই অনেক দূর
পড়ে অনেক পিছু;
ভুলেই যাই আপন ঠাঁই
কোথায় সেই ঘর?
খুঁজি ত তাই,
দিশে হারাই
মানিনে জল ঝড়।
খুঁজি ত তাই
সকল ঠাঁই
এ মনে নির্ভর,
যে কথা কই
মানান সই
আমি, আমার ঘর।

সৈয়দ মুজতবা আলী

॥ নয় ॥

লমান শাস্ত্রে বর্ণনা আছে, লাশ গোর দিয়ে লোকজন চলে আসার রের ভিতর কি কান্ড-কারখানা

নে স্পষ্ট বলা আছে, ইয়োম্-য়ামৎ—অর্থাৎ প্রলয়ের দিন আল্লাতা'লার সামনে গিয়ে হবে। তিনি তখন সকলের করে ধার্মিককে পাঠাবেন স্বর্গে পাপীকে নরকে। এখন প্রশ্ন, কবে হবে তার তো কোনো হদিস যায় না, এই মুহূর্তেই হতে আবার এক কোটি বৎসর পরেও পারে—ততদিন অবধি গোরের মরাদের কি গতি হয়?

ান নয়—অন্য শাস্ত্র বলেন,—গোর আত্মীয়স্বজন চল্লিশ পা চলে পর দুই ফিরিশ্তা—দেবদূত—ভিতর ঢুকে তাকে জিজ্ঞেস তার ইমান (ধর্মমত) কি? সে টি মুসলমান হয় তবে তৎক্ষণাৎ ওঠে, 'আল্লা এক, আর মুহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ।' ফিরিশ্তারা শুনে খুশী হয়ে বলেন, 'তোমার ঠিক, কিন্তু এখনো তো কিয়ামতের দেরী আছে। ততক্ষণ অবধি ও এক গাছা তসবী। আল্লার নাম করো।' তারপর শাস্ত্র বলেন খুশী হয়ে তসবী হাতে নিতেই তোটি ছিঁড়ে গিয়ে তসবীর দানাগুলো কবরময় ছড়িয়ে পড়বে। সে তখন ব্যস্ত হয়ে দানাগুলো কুড়োতে না কুড়োতে দেখবে, কিয়ামতের শিঙে ফুঁকে উঠেছে—ছুটে গিয়ে আল্লার সামনে দাঁড়াবে আর সকলের সঙ্গে সারি বেঁধে।

আর যদি সে পাপাত্মা হয় তবে সে ইমান বলতে পারবে না। ফিরিশ্তারা তখন তাকে ধুনুরীরা যেমন তুলোর ভিতর যন্ত্র চালিয়ে দেয় ঠিক তেমনি তার সর্বসত্তা ছিন্নভিন্ন করে দেবেন—তুলোর মত সে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডময় ছড়িয়ে পড়বে। আবার সব কটা টুকরো জুড়ে দিয়ে ফিরিশ্তারা আবার ঐ প্রক্রিয়া চালাবেন। পাপীর মনে হবে, এ যন্ত্রণা যেন যুগ যুগ ধরে চলছে।

অথচ পুণ্যাত্মা হয়ত মরেছিল কিয়ামতের এক লক্ষ বৎসর পূর্বে; পাপাত্মা মরেছিল কিয়ামতের এক সেকেন্ড আগে।

অর্থাৎ পুণ্যাত্মার বেলা আল্লা এক লক্ষ বৎসরকে তার চৈতন্যের ভিতর এক সেকেন্ডে পরিণত করে দেবেন, আর পাপাত্মার বেলা এক সেকেন্ডকে লক্ষাধিক বৎসর।

আজকের দিনের ভাষায় তুলনায় দিতে বলা যেতে পারে পুণ্যাত্মার বেলা যেন তিন মিনিটের রেকর্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে এক সেকেন্ডে বাজিয়ে দেওয়া হল, পাপাত্মার বেলায় সেই রেকর্ডই বাজানো হল এক ঘণ্টা ধরে।

তাই বোধ হয়, হিন্দু পুরাণেও আছে, নরের এক লক্ষ বৎসরে ব্রহ্মার এক মুহূর্ত।

কিন্তু এ কি শুধু মৃত্যুর পরই? জীবিত অবস্থায়ও তো ঐ-ই। মিলনের শত বৎসর মনে হয় এক মুহূর্ত, আর 'ক্ষণেক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে' মনে হয় 'লাখ লাখ যুগ' ধরে সে যেন কোন্ সুদূরে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে।

'মোতির মালা' গল্পে তাই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের দুঃখ-দুর্দৈবের বর্ণনা মোপাসাঁ দিয়েছেন দশ ছত্রে আর মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত খুনীর তিনদিন মেয়াদের বর্ণনা দিয়েছেন য়ুগো পুরো একখানা কেতাব লিখে।

বাপ্তিস্ম পরবের পর চার বৎসর কেটে গিয়েছে। এ চার বৎসর মেবল্ ডেভিডের কেটেছে তসবীর দানা কুড়োতে কুড়োতে না তুলো-ধুনো হয়ে হয়ে তার খবর দেবে কে? কাজল-ধারা নদীর মত নিরবধি তাদের জীবনগতি সমুখ পানে ধেয়ে চলেছিল না সামনের নীল-পাথরী পাহাড়ের মত স্থাণু হয়ে পড়েছিল তাই বা বলবে কে? মধুগঞ্জ শুধু দেখল, যে-বারান্দায় সায়েব আর মেম বসে থাকতো, বাটলার রেকর্ডের পর রেকর্ড বদলে যেত সেখানে একটি চতুর্থ প্রাণী প্রথম দোলনায় শুয়ে তারপর পেরেম্বুলেটারে বসে এবং সর্বশেষে টলমল হয়ে হেঁটে হেঁটে বারান্দাটাকে চঞ্চল করে তুলল। যেখানে আর দুটি প্রাণী—জয়সূর্যকে ধরলে কখনো বা তিনটি—আপন আপন আসনে ধ্যানমগ্ন সেখানে এই নূতন প্রাণীটির আনাগোনার অন্ত নেই। কখনো সে মেবলের কোলে মাথা গুঁজে দুটি ক্ষুদে হাত দিয়ে তার উরু জড়িয়ে ধরে, মেবল তার কালো চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়, কখনো বা সে ডেভিডের আস্তিন ধরে টানাটানি আরম্ভ করে, তখন সে তার

দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর কখনো বা জয়সূর্যের গলা জড়িয়ে ধরে তার-ই কাছ থেকে শেখা গান ধরত—

'ক্-ক্-ক্-কেটি, হুয়েন দি ম্-ম্-মুন শাইনস্—'

একমাত্র ওরই জীবনে এখনো তসবী, ধনুরী কেউই আসে নি। 'সময়' কি বস্তু সে এখনো বোঝে নি—টেকোর ভয় নেই উকুনের।

বাচ্চা প্যাট্রিকের চতুর্থ জন্মদিনে ও'রেলিরা স্থির করলে, মেবল বাচ্চাকে নিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে বাসা বেঁধে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করবে। মধুগঞ্জের ইস্কুল দিশীর কাছে অক্সফোর্ড-সম হতে পারে, কিন্তু সায়েবের বাচ্চা যদি সেখানে ট্যাঁশ উচ্চারণ শেখে তবেই চিত্তির। বড় হয়ে সে বাপ-মাকে প্রতি সন্ধ্যায় অভিসম্পাত না দিয়ে উইস্কি-সোডা স্পর্শ করবে না, সে যে ইয়োরেশিয়ান নয়, সেকথা বোঝাতে গিয়ে গলদঘর্ম হতে হবে, বোঝাবার মোকা না পেলে সেই ঘর্মে ডুবে মরতে হবে।

টমাস কুক্, এমেরিকান এক্সপ্রেস, আর দুনিয়ার যত জাহাজ কোম্পানীর ছবির বিজ্ঞাপন, চটি বই, জাহাজের টাইম-টেব্লে ও'রেলির বারান্দা ভর্তি হয়ে গেল। হিন্দীতে বলে,

'বাঘ কা ভাই বাঘেরা
কুদে পাঁচ তো কুদে তেরা'

'বাঘ যদি দেয় পাঁচ লম্ফ, তবে তার ভাই বাঘেরা মারে তেরোটা।' বাঙলায় প্রবাদ 'ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে।' অর্থাৎ যাত্রী যদি কোম্পানিকে লেখে, আমি লন্ডন যাবো, তবে তারা যে শুধু ঐ জাহাজেরই খবরওলা চটি বইই পাঠায় তাই নয়, সঙ্গে পাঠায় আরেক হন্দর 'পথিক-দিক্-দর্শন'—তাতে আছে নরওয়ের ফিয়োর্ডে যেতে হলে কোন্ জামা-কাপড় অপরিহার্য, মধ্য আফ্রিকায় উঁট চড়তে হলে আগে-ভাগে ইনকোলেশন করিয়ে নিতে হয় কি না। ফলে সেই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্রের মাঝখানে বিলাতগামী জাহাজের বিশল্যকরণী খুঁজে বের করা হনুমানের—অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কর্ম নয়। ও'রেলি সেই অষ্টাদশ পর্বে উদয়াস্ত ডুব মেরে পড়ে রইল।

সোম এসেছিল একদিন সরকারি কাজে। কাগজপত্রের ডাঁই দেখে শুধালে, 'স্যর, গুষ্ঠিসুদ্ধ নর্থপোল চললেন নাকি? এর চেয়ে অল্প দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে তো মঙ্গল কিম্বা শনিতে ভ্রমণ করে আসা যায়।'

ও'রেলি এক তাড়া কাগজ সোমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'মঙ্গল-শনির কথা বলতে পারিনে, কিন্তু নর্থপোল যেতে হলে এসবের দরকার হয় না। সেখানে যাবার জন্যে কোনো স্টীমার-সার্ভিস নেই—আস্ত জাহাজ চার্টার করতে হয়। এখানে ঠিক তার উল্টো। কত সব অল্টারনেটিভ দেখো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবে, না কলম্ব থেকে, কিম্বা মাদ্রাজ থেকে? পি এন্ড ও নেবে, না মার্কিন জাহাজ, না জর্মন? ফরাসীও নিতে পারো—জাহাজগুলো বড্ড নোংরা, কিন্তু রান্না ভারি চমৎকার। তুমি কি একটা প্রবাদ বলো না, দি ডোম ইজ্ ব্লাইন্ড ইন্ দি ব্যাম্বু-জাঙ্গল্? আমার হয়েছে তাই।'

বহুকাল পরে সায়েবের তাজা-দিল দেখে সোম খুশী হ'ল। বললে, 'তাহলে সায়েব, অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—ইট্ দি বো স্ট্রিং টুডে—অর্থাৎ সবচেয়ে সস্তা জাহাজ নিলেই হয়।'

ও'রেলি বললে, 'দেখো সোম, আমাকে আর ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করো না। গোড়ার দিকে কিছু জানতুম না বলে তুমি তোমার আপন মাল গুড্ ওল্ড ইন্ডিয়ান উইজডম্ বলে পাচার করেছ বিস্তর। এখন আর সেটি চলছে না। আমার পন্চা টান্ট্রা, হিটোপ্ডেস্ পড়া হয়ে গিয়েছে। ধনুর ছিলে খেতে গিয়ে তোমারই শেয়ালের কি হয়েছিল মনে আছে?'

সোম ইস্কুলের ছেলেদের ভঙ্গীতে তড়াক করে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'খুব মনে আছে, স্যর! ছিলে ছিঁড়ে গিয়েছিল। তা যাবে না? আপনারাই তো বলেন, 'ডিম না ভেঙে মমলেট বানানো যায় না'।'

ও'রেলি বললে, 'ডিম দিয়ে মামলেড্ কি করে হয় হে? মামলেড্ তো হয় কমলালেবুর খোসা দিয়ে।'

'আজ্ঞে মামলেড্ নয়, মমলেট?'

'ও! অমলেট!'

'আজ্ঞে না। অমলেট হয় বিলেতে, বিলিতি ডিম দিয়ে। দিশী ডিমে হয় মমলেট। তা যখন মামলেড, মমলেটের কথাই উঠলো, ওসব তৈরী করেন মেয়েরা। জাহাজ বাছাইয়ের ভার মেমসাহেবের হাতে ছেড়ে দিলে হয় না?'

ও'রেলির মুখ কঠিন হল। সোমের দৃষ্টি এড়ালো না।

সুরসিক যদি বদমেজাজী আর খামখেয়ালী হয়, তবে তাকে নিয়ে বড় বিপদ। যন্ত্র চট করে বেসুরা হয়ে যায় আর তার বিকৃত স্বর সব-কিছু বরবাদ করে দেয়।

ও'রেলির 'হুঃ' বীণাবাদ্যের মাঝখানে প্যাঁচার কণ্ঠের মত শোনাল।

সোম বুঝলে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে ঢোঁড়া বেরিয়েছে। এইখানেই থামা উচিত, না হলে হয়ত কেউটে বেরুবে। কিন্তু হঠাৎ থেমে গিয়ে বিদায় নিলে সেটা হবে আরো বেতালা। একটুখানি ইতিউতি করে শুধালে, 'আপনি পোর্টে ওদের সী অফ্ করতে যাচ্ছেন তো?'

ও'রেলি বললে, 'না।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে, জিজ্ঞেস না করা সত্ত্বেও বললে, 'বাটলার পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে সে দেশে যাবে। অনেককাল ছুটি নেয় নি বলছিল।'

কণ্ঠে কিন্তু বিরক্তির সুর।

সোম না হয়ে আর কোনো নেটিভ হলে ভাবতো, এই সাদা-মুখোগুলোর মতিগতি বোঝা ভার, কিন্তু সোম মেলা ইংরেজ চরিয়েছে। সে অত সহজ সমাধানে সন্তুষ্ট নয়। বড় ভারী মন নিয়ে সোম বাড়ি ফিরল। ও'রেলিকে সে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছিল।

'সোনামুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই-চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল
দুই ভান্ড ভালো রাই-সরিষার তেল—

এই সব পর্বতপ্রমাণ মালপত্র নিয়ে আমরা সফরে বেরুই, আর সায়েবরা ঐ রকম মাত্র একটা সুট-কেস হাতে নিয়ে গটমট করে গাড়িতে ওঠে, তাই দেখে বাঙালীর ভারি ঈর্ষা হয়। কিন্তু

-কেসটির ভিতরকার মালপত্র তৈরী
ত গিয়ে সাহেবদেরও হিমসিম খেতে
। মোকামে পেঁছনর পর বাঙালী
দেখে ধুতির অনটন তাহলে সে
রা কাছ থেকে ও জিনিসটে ধার নিয়ে
ত পায়—এমন কি কুর্তাতেও খুব
ী আটকায় না—কিন্তু সায়েবরা কোট-
লুন ধার নিয়ে পরতে পারে না. ফিট
কি না সেটা মারাত্মক প্রশ্ন।

মেবলকে তাই বাচ্চার কাপড়-জামা
ী করাতে বেশ বেগ পেতে হল।
্যাসাগর অবধি আবহাওয়া গরম,
গঞ্জের জামা-কাপড়েই চলবে। কিন্তু
পরের জন্য যে গরম জিনিসের
াজন, সে তো মধুগঞ্জে পাওয়া যায়
তাই ফ্লানেল, সার্জ, টুইড আনাতে
শিলঙ থেকে, আর আনাতে হল
রর বুড়ো খলিফাকে। তাই নিয়ে.
রইল মেবল দিনের পর দিন, আর
ালি বাক্স-সুটকেস-হ্যাটকেসে সাঁটতে
ল জাহাজের লেবেল। যে বাক্স যাবে
বনে তার এক রঙ, যেটা যাবে স্টোর-
তার অন্য রঙ এবং যেটা হাতে
বে তার জন্য কোনো লেবেলের
াজন নেই। এই রামধনুর রঙের
চ ও'রেলি তো একবার মতিচ্ছন্ন হয়ে
র পিঠে লেবেল লাগিয়েছিল আর

বিদায়ের আগের সন্ধ্যায় জিনিসপত্র
ফিটফাট ছিমছাম হল। পরদিন
। ছ'টায় ও'রেলি মোটর হাঁকিয়ে
কে কুড়ি মাইল দূরে স্টেশনে
ছিয়ে দেবে। চাকর-বাকরদের বললে
যেন বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে
, কারণ পরদিন ভোরবেলা এসে
পত্র ওঠাতে তাদের সাহায্যের
াজন। কাম্পাউন্ডে রইল শুধু
ার—অন্য চাকরবাকরদের সেখানে
বাসের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পরদিন ভোরের দিকে বৃষ্টি হল।
।-বাকররা কোনোগতিকে ছ'টায়
লা পেঁছে দেখে সবাই চলে
ছে—গারাজ খালি, বাড়ি তালাবন্ধ।
লি সায়েবের সব-কুছ তাড়্ঘাড়ি,
ট, কাঁটায় কাঁটায়। চাকররা আন্দাজ
ল সামান্য পাঁচ মিনিট দেরিতে আসার

জন্য তাদের একটুখানি বকুনি খেতে হবে।

সায়েব ফিরল বেশ বেলা গড়িয়ে যাবার পর। আরদালি আসমৎউল্লা সায়েবের জন্য দু'খানা কাটলিস আর আলুসেদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু সে কিছু না খেয়ে সোজা দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সব-কিছু শুনে রায়বাহাদুর কাশীশ্বর চক্রবর্তী বললেন, 'আহা, বেচারা, এবারে একদম একা পড়ে গেল।'

তাঁর জুনিয়র তালেবুর রহমান বললেন, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। বাচ্চাটা বিলেত গেল বাঘ হয়ে ফিরে আসবার জন্য। তখন লাগাবে নেটিভদের উপর জোর ডাণ্ডা। এ-মুল্লুকে থাকলে তাদের তরে দরদী হয়ে যেত, ছাতির খুন ঠাণ্ডা আর দিলও মোলায়েম মেরে যেত।'

রায় বাহাদুর বললেন, 'সে কি কথা! ও'রেলির মত ভদ্রলোকের ছেলে কি কখনো বৈরীভাব নিতে পারে? কি বলো সোম?'

সোম বললে, 'আপনার ছেলের বিলেত যাওয়ার কি হল?'

রায় বাহাদুর বললেন, 'জানেন ব্রাহ্মণী।'

তালেবুর রহমান বললেন, 'সোম ভাবে সে একটা মস্ত ঘড়েল।'

ক্লাবে হ'ল অন্য প্রতিক্রিয়া। প্রায় সবাই বললে, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে। কেলেঙ্কারীটা তো চাপা পড়লো। এখন ক্লাবের ছেলে ও'রেলি ক্লাবে ফিরে এলেই হয়।

কিন্তু আরেকটি বৎসর কেটে গেল। ও'রেলি ক্লাবে এল না।

॥ দশ ॥

বাড়ির সামনের জ্যোতিষ্মান এবং অন্ধকারে মানুষের তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ ল্যাম্প-পোস্টটা সম্বন্ধেই যখন সে দুদিন বাদেই অচেতন হয়ে যায়, তখন অদৃশ্য ও'রেলিকে ক্লাব যে ভুলে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! কিন্তু যেদিন খবর এল ও'রেলি মধুগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে গিয়েছে, সেদিন ক্লাব তার সম্বন্ধে আরেক প্রস্থ আলোচনা করে নিলে।

মাদামপুর আর বিষ্ণুছড়াই প্রথম খবর পেলেন ডি এম'এর কাছ থেকে।

মাদামপুর বললেন, 'ভালোই হল। যাচ্ছে কক্সবাজার না কোথায়, সেখানে কেলেঙ্কারীটা হয়ত পৌঁছই নি এবং পৌঁছলেও সেটা বাসি হয়ে গিয়েছে। ওখানে গিয়ে হয়তো পুয়োর ডেভিল আবার নর্মাল লাইফে ফিরে আসতে পারবে। আমি সত্যি তাকে বড্ড মিস করতুম।'

বিষ্ণুছড়া চুপ করে রইলেন, 'ভালো মন্দ কিছু বললেন না।

মাদামপুর শুধালেন, 'কি হে, চুপ করে রইলে যে? হুইস্কি চড়েছে নাকি?'

বিষ্ণুছড়া বললেন, 'সাতটা ছোটায়? আই লাইক দ্যাট—আপনিও যেমন!' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া হয়ে বসে বললেন, 'আমি সেকথা ভাবছিনে। আমার কানে এসে সেদিন পেঁৗছল, মেবলরা নাকি আদপেই ইংলণ্ড পৌঁছয় নি।'

মাদামপুর বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু তারা পৌঁছল কি না তার খবর দেবে কে? মেবলের সঙ্গে ক্লাবের কারো তো এমন দহরম-মহরম ছিল না যে, বন্দর বন্দর থেকে পিকচার-পোস্ট-কার্ড পাঠাবে আর লণ্ডন পৌঁছে কেব্‌ল্। মোকামে পৌঁছে প্রতি মেলে স্কার্ফ, সুয়েটার আর গরম মোজা, প্যোর স্কটিশ উলে তৈরী! হোম মেড!'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, সায়েবের একটু চড়েছে—বয়স হয়েছে কি না, অল্পেই একটু কেমন যেন হয়ে যান—না হলে স্কার্ফ, সুয়েটারের কথা বলবেন কেন? ও বস্তু মধুগঞ্জে পরবে কে? সাদা চোখে এ ভুলটা করতেন না, হয়ত বলতেন টিনের বেকন, সার্ডিন। চেপে গিয়ে বললেন, 'কলকাতায় ও'শী'র সঙ্গে নর্থ ক্লাবে দেখা হয়েছিল, সে বললে, মেব্‌ল্ আর তার বাচ্চাকে সে মাস তিনেক আগে দেখেছে মসুরিতে, সঙ্গে ছিল ও'রেলি। তোমার মনে আছে কি না জানিনে, ও'রেলি তখন ছুটি নিয়ে মসুরি গিয়েছিল।'

এবারে মাদামপুর হা হা করে হেসে উঠলেন, 'কে বলেছে? ও'শী? ক'টা মেবল্ আর ক'টা ডেভিড্ দেখেছিল জিজ্ঞেস করো নি? ও তো সকালে খায় কড়া হর্স-নেক, দুপুরে জিন, সন্ধ্যায় রম্ আর রাত্রে হুইস্কি। সন্ধ্যায় দেখে থাকলে নিশ্চয়ই দুটো, আর রাত্রে দেখে থাকলে চারটে ও'রেলি দেখেছে। ক'টা মসুরি দেখেছে সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলে কি?'

বিষ্ণুছড়া বুঝলেন, এখন আর কথা কাটাকাটি করে কোনো লাভ নেই। তাই বললেন, 'সোমও বলছিল মেব্‌ল্‌রা লণ্ডনেই আছে।'

মাদামপুর আশ্চর্য হয়ে শুধালেন, 'সোম বললে? আশ্চর্য! ও তো কখনো কোনো খবর কাউকে দেয় না। মধুগঞ্জের বানান জিজ্ঞেস করলে ভাবখানা করে যেন সরকারি টপ্ সিক্রেট। আমি তাকে একদিন বলেছিলুম, 'ফাইন ওয়েদার, সোম।' মুখখানা করলে যেন আলীপুরের আবহাওয়া দফতর থেকে রিপোর্ট না এলে সে ঐ একস্‌ট্রিমলি কনফিডিয়েনসেল খবর কনফার্ম করতে প্রস্তুত নয়। তাই বলছি, সেলাম যখন বলেছে, তখন ওটা বাইবেল-বাক্য।'

কিন্তু বিষ্ণুছড়ারই ভুল। হঠাৎ চেয়ারখানা তার কাছে টেনে এনে মাদামপুর একটুখানি সামনের দিকে ঝুঁকে নিচু গলায় অত্যন্ত সাদা গলায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'কোথায় আছে, কোথায় নেই, ওসব খোঁচাখুঁচি করতে গেলে আবার সেই ধামা-চাপা ডার্টি লিনেন বেরিয়ে পড়বে। তাতে ইয়োরোপিয়ন কম্যুনিটির কি লাভ!' বরঞ্চ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নো নিউজই যদি হয়, তবে জানো তো প্রবাদ, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ।

বিষ্ণুছড়া অভয় পেয়ে বললেন, 'বিশেষ করে সোমের কথাই পাকি খবর। কিন্তু ও'রেলিকে একটা বিদায়ভোজ দিতে হবে না! ক্লাবে আসুক আর না-ই আসুক, চাঁদা তো ঠিক ঠিক দিয়ে গিয়েছে—এমন

টেনিসের একস্‌ট্রাও। চোরিটি-টির পয়সায়ও কামাই দেয় নি।' মাদামপুর বললেন, 'সাউন্ড করে ত পারো। কিন্তু আসবে কি?' এ সম্বন্ধে মাদামপুর এবং বিষ্ণু- মনে সন্দেহ জাগা কিছুমাত্র ভাবিক নয়। কিন্তু ও'রেলি তে রাজী হ'ল তবে ইঙ্গিত করলে ডিনারের বদলে মামুলী টী-পার্টি ই ভালো হয়। ক্লাব রাজী হল।

ক্লাবের প্রায় সবাই সেদিন হাজিরা ন। ও'রেলি সঙ্গে নিয়ে এল তার সামারসেট ডীনকে। চটপটে রা, সমস্তক্ষণ কথা কয় আর এক রট থেকে আরেক সিগরেট ধরিয়ে াইয়ের খর্চা বাঁচায়। ও'রেলি ক ক্লাবের সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় দিয়ে বললে ইনি স্কটল্যান্ড থেকে খাস তালিম নিয়ে তৈরী এদেশে এসেছেন, মধুগঞ্জ এ'র উপকৃত হবে।

ুজোর রটাতে, ফিসফাস-গুজগাজ ইংরেজ এবং বাঙালীতে কোন নেই, কিন্তু যাকে নিয়ে এসব করা াকে সোজাসুজি প্রশ্ন করাটা র অভ্যাস নয় এবং এটিকেটের খেলাফ। তাই মেব্‌ল্‌ সম্বন্ধে ও'রেলিকে মুখের উপর কেউ কোনো প্রশ্ন শুধালে না। একেবারে কোনপ্রকারের অনুসন্ধান না করাটা আবার মুরুব্বিদের পক্ষে ভাল দেখায় না। তাই বুড়ো মাদামপুর, ও এস্‌ ডি শ্রেণীর দু'একজন ও'রেলির পরিবারের খবর নিলেন কোনোপ্রকারের প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, অর্থাৎ শুদ্দু আশা প্রকাশ করলেন, মেব্‌ল্‌রা বিলেতে ভাল আছে নিশ্চয়ই। ও'রেলি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

মোটের উপর পার্টিতে কোনরকমের অস্বস্তি কিম্বা আড়ষ্টতার ভাব দেখা গেল না। ও'রেলি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কথা কইলে। বাঙলা দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রায় সব শহরেই ছোট-বড় দ'য়ের সৃষ্টি করেছে—কথাবার্তা হল সেই সম্বন্ধেই বেশী। ও'রেলি আইরিশম্যান, তাই সে বুঝিয়ে বললে, এসব আন্দোলন নির্মূল করা পুলিসের কর্ম নয়, বিলেতের পার্লামেণ্ট যদি সময়োপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে বই কমবে না। অবশ্য তার অর্থ এই নয়, পুলিশ হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি ফুঁকবে—সে তার কর্তব্য করে যাবে, তবে তারও একটা সীমা আছে।

মাদামপুর এ বাবদে কট্টর। কিন্তু ও'রেলি তার বক্তব্য এমনভাবে গুছিয়ে বললে যে, তিনি পর্যন্ত বাগান ফেরার সময় বিষ্ণুছড়াকে বললেন, 'পিটি, ছোঁড়াটার পারিবারিক জীবন সুখের হ'ল না। ওকে কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই। ছোঁড়ার মাথাটা ঘাড়ের সঙ্গে ঠিকমত স্ক্রু করাই আছে। আমি সত্যই প্রার্থনা করি, ও যেন জীবনে সুখী হয়।'

বিষ্ণুছড়াও সায় দিয়ে বললেন, 'হোয়াই নট্‌। ইট্‌ ইজ নেভার টু লেট্‌ টু বিগিন্‌ এগেন্‌।'

মীরপুরের মেম দরদী রমণী। তিনি ও'রেলিকে একবার এক লহমার তরে একলা পেয়ে তার ডান হাতে চেপে বলেছিলেন, 'ওরেলি, তুমি আমার ছেলের বয়সী, তাই তোমাকে বলি, জীবনটা একেবারে হুবহু জিগশো ধাঁধার মত—প্রথমবারেই সব কটা মেলাতে না পারলে নিরাশ হবার মত কিছু নেই। তোমার উপর আমার আশীর্বাদ রইল।'

ও'রেলি স্পষ্টই বিচলিত হয়েছিল। আধো-আধো ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়েছিল।

(ক্রমশ)

কল্প

সুনীল ভট্টাচার্য

মেঘ-রঙ তুমি রুদ্দুরে ঝলসাও
ঝর্ণার অবগাহনে মত্ত মন,
শান্ত ভোরের সামগানখানি গাও
হে অবাক পাখি পাখনায় ঢাকো বন।

সমুদ্র তুমি ঢেউ আনো কাল চুলে
উপল-শঙ্খে ধ্বনি তোলো নির্ভয়,
যৌবন রাগ উর্মিল উপকূলে
অয়ন-সূর্য-সংগীতে সুরময়।

হে আকাশ তুমি চুপি-চুপি কথা কও
প্রলাপী বিকারে বাঙ্ময় এই দেহ,
মনোবীক্ষণে তুমি ত স্বপ্ন নও
সৌর-চেতনা চূড়ায় তোমার স্নেহ।

হে পৃথিবী তুমি মায়াডোর দিয়ে বাঁধো
জীবন-বীণার তারে তোলো ঝঙ্কার,
উন্মুখ মন, এই পূর্ণিমা চাঁদও
দুর্লভ তাই চাই তারে বার বার।

হাতছানি দেয় স্নিগ্ধ মন্দাকিনী
আলো-ছায়া ডাকে ইশারায় প্রতিদিন,
অশ্রু আঁখির শুভ্র সুষমা চিনি
অন্তর তাই প্রেমে অন্তর্লীন।

২২

চাকরি শেষ পর্যন্ত ছাড়তে পারেনি অতসী।

বাড়ি ফিরে সেদিন দেখল সব অন্ধকার, এমনকি, লক্ষ্মীর পটের সমুখেও জ্বলেনি আলো। রান্নাঘরে শেকল তোলা। সিঁড়িটার নীচে দুটো বেড়াল পরস্পরের টুঁটি ছেঁড়াছেঁড়ি করছে।

শোবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অতসী ডাকল, 'মা।' সাড়া এল না। ডাকল 'সুধা!' ঝন্‌ঝন শব্দ হল, পালিয়ে যেতে যেতে গোটা-কতক ইঁদুর ওষুধের শিশি ফেলে দিল বুঝি। অতসীর হাত-ঘড়িটি অতি ছোট, সময় দেখতে হলে চোখের সমুখে নিয়ে আসতে হয়, কিন্তু এখন, এই আড়ষ্ট স্তব্ধ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, তারও ভয়ার্ত টিকটিক, ক্ষীণ হৃৎস্পন্দ গোনা গেল।

আশ্চর্য, আজ গলির গ্যাসের আলোটা জেবলে দিতে কি ওরা ভুলে গেছে।

এই নিদ্রিত-মৃত পটভূমিতে সে একা, চরাচরে আর কেউ জেগে নেই, কিছু বেঁচে নেই, অন্তত ক্ষণিকের জন্যেও এই রকম একটা অসুস্থ সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে অতসী শিউড়ে উঠল, পর-মুহূর্তেই সাহস দিল নিজেকে! একা যদি, তবে ভয় কেন, কাকে। মানুষের ভয় তো অপরকে, দ্বিতীয় প্রাণসত্তাকে। নিজেকেই কি শেষ পর্যন্ত ভয় করতে শুরু করেছে অতসী।

একবার ভাবল চীৎকার করে ওঠে, একটা আর্ত স্বরের শাণিত ছুরিতে এই স্তব্ধতার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে দেয়; আবার ভাবল পায়ের লাথিতে দূর করে দেয় এই ভালুক অন্ধকারটাকে। পা উঠল না, অতসী স্থির জেনেছে, এই জানোয়ারটা পদাঘাতেও দূর হবে না, হয়ত দু-পা সরে যাবে, তার পর থাবা তুলে, হিংস্র দাঁত বিস্তার করে অতসীকেই তাড়া করে আসবে। সেই ভয়াল রূপটি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতেই যেন অতসী চোখ বুঁজল।

চোখ মেলল অতসী, এবার মনে হল সে তো একা নয়। এই তো সে বিপুল, মহামহিম, এক আদিম পুরুষের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে। আভূমিনভ দীর্ঘ দেহ, নিশ্চক্ষু সেই পুরুষের সর্বাঙ্গ কাকোল-কালো আলখাল্লায় আবৃত, মুখে কথা নেই, হাতে একটিমাত্র ঘোলাটে-চাঁদ টর্চ। সেই টর্চ বার বার মুখে ফেলে সে বুঝি অতসীর বুকের কথাটিও পড়ে নেবে।

কণ্টকিত দেহ থরথর কেঁপে উঠল, কোনমতে দেয়াল ধরে অতসী সামলে নিল। কিছুটা শব্দ, হয়ত কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি করতে, পাপোষে বারকয়েক পা ঘষল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জ্বালিয়ে দিল আলো।

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে সুধা শুয়ে। জেগে আছে, না ঘুমিয়ে, বোঝবার উপায় নেই। বিছানার চাদরটা ময়লা, কোঁচকান, পাশে-রাখা টেবিলে একটা কাৎ হয়ে পড়া শিশি থেকে ওষুধ গড়িয়ে গড়িয়ে ঢাকনিটা ভিজে যাচ্ছে। মেজেয় ধুলো, এখানে-ওখানে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, আজ সারা দিন বোধ হয় ঝাঁটও পড়েনি।

অতসী আলগোছে কপালে হাত দিল সুধার। জ্বর তো নেই। চাপা গলায় আবার ডাকল, 'সুধা!'

পাশ ফিরলো সুধা, চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসে বলল, 'ফুলমাসি!'

অতসী ছাড়া এই মৃত-নিথর বাড়িতে এতক্ষণ যেন দ্বিতীয় প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, সুধা জেগে উঠে অতসীর ভয় ঘুচিয়ে দিল।

'এখন ঘুমোচ্ছিস, কিরে! মা কই।'

সুধার ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি, বললে, 'জানিনে তো ফুলমাসি। ও-ঘরে নেই?'

অতসী বলল, 'কী জানি, দেখিনি। ডেকে ডেকে কারও সাড়া পেলুম না গোটা বাড়িটা থমথমে, চুপ। ছোড়দা অফিস থেকে ফেরেনি?'

'ফিরেছিল তো ফুলমাসি। ছোটমামা আজ বেলা থাকতেই ফিরে এসেছিল তখন বোধ হয় তিনটে হবে। এসে ও-ঘরে ডেকে নিয়ে গেল দিদিমাকে দুজনে চুপে চুপে কী কথা হল, একটু পরেই দিদিমাকে কেঁদে উঠতে শুনলুম ছোটামামা কড়া গলায় ধমক দিয়ে উঠল 'চুপ কর।' খানিক পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল, বুঝলুম ছোটমামা নেমে যাচ্ছে।'

'আর মা?'

'দিদিমাকে আর দেখিনি।'

'মা আর আসেইনি এ-ঘরে? সন্ধ্যা-
া আলো জ্বলেনি, ওকে ওষুধ
ন্ত দিয়ে যায়নি?'
'দিদিমা রান্নাঘরে নেই?'
অতসী বলল, 'রান্নাঘরের দরজায়
ল তোলা।'
অস্বচ্ছন্দ, আড়ষ্ট কয়েকটি মুহূর্ত
ল। ততক্ষণ নারকেল গাছের পাতার
ক মাতালের চোখের মত ঘোলাটে চাঁদ
ক দিয়েছে, থেমে গেছে সিঁড়ির নীচে
বেরালের টুঁটি ছেঁড়াছেঁড়ি।
তুই ঘুমো।' আলোটা ফের নিভিয়ে
অতসী, বারান্দায় এসে দাঁড়াল।
কার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে,
ী ভেবে পেল না, প্রথমবার অত
পেয়েছিল কেন। রাতটা এখন আর
র কোন কৃষ্ণ শ্বাপদ নয়, বরং মৃদু
স্নায় ভিজে শাদা বেরালটি যেন,
শান্ত, নির্জীব। মাঝে মাঝে হিমের
য় তার রোঁয়াগুলো কেঁপে কেঁপে
উঠছে, বুকের ভিতর থেকে শব্দ
ঘর্ঘর। একটু কান পেতে থেকে
ী টের পেল, বেরালের বুকের
নয়, ওটা অনেক দূরে, সদর
য় ট্রামের চাকা টেনে টেনে চলার

নই বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল
ী, অনেকক্ষণ পরে অতি ক্ষীণ
কান্নার শব্দ এল কানে। একটানা
য়ে শ্রান্ত কণ্ঠ, ছেলে-পড়া
র কানা বেয়ে শীর্ণ একটি ধারা
াড়িয়ে যাচ্ছে। এই পুঞ্জ স্তব্ধতা,
অন্ধকারের মত, অন্ধকারের সঙ্গে,
তার অঙ্গ হয়ে, এই কান্নাও বুঝি এতক্ষণ
ছিল, অতসী শুনতে পায়নি।

ক্ষীণসুতো কান্নার রেখা ধরে ধরে অতসী উঠে এল ছাদে, চিলেকোঠার সামনে থমকে দাঁড়াল। সামনে, মেজেয় লুণ্ঠিত একটা কাপড়ের স্তূপ, আপাত-নিশ্চল, কিন্তু কান্নার উৎস যে ওখানেই, সন্দেহ নেই।

অতসী ডাকল, 'মা!'

কাপড়ের পুঁটলি নড়ে উঠল, নিমেষে কান্না গেল থেমে। মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মা, অতসীর পা দুটোর ওপর আছড়ে পড়লেন।

—'কী হয়েছে বল তো, মা।'

—'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলি অতসী? আমাকে সত্যি করে বল।'

শরীর কঠিন হয়ে উঠল অতসীর, পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। ও, এই। এর জন্যে এত।

অনেক দিনের পুরোনো, ঝাপসা একটা ছবি মনে এল। বিয়ের পর মাস না ফুরোতেই অতসী যেদিন ফিরে এসেছিল। সেদিনও সন্ধ্যা হিম-মলিন, গলিতে গ্যাসের আলো জ্বলেছে কি জ্বলেনি। যাবার দিন কত শঙ্খরব, উলু-ধ্বনি, কিন্তু অতসী ফিরে এসেছিল নিঃশব্দে। চৌকাঠের উপর আধো-অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে ভয়ে, মুদিতপ্রায় গলায় ডেকেছিল, 'মা।'

তখনো পরনে ছিল রক্তাম্বর, সীমন্ত জুড়ে সিঁদুর-রেখা।

মা চমকে উঠেছিলেন। ফিরে চেয়ে বলেছিলেন, 'একী, অতসী!' তাড়াতাড়ি আলো জেলে দেখেছিলেন মেয়ের মুখ। ত্রস্ত স্বরে বলেছিলেন, 'জামাই আসেনি?'

অতসীর মাথা নীচু, থরথর করে কাঁপছিল। জবাব দেয়নি।

জেরা চলেছিল অনেকক্ষণ ধরে। অতসী কোনটার উত্তর দিল কোনটার বা দিল না। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারল না, ভেঙে পড়ল, আকুল গলায় বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি মা, এখন আর কিছু জিজ্ঞাসা কর না। কাল সব বলব। এইটুকু শুধু জানিয়ে রাখি, শ্বশুরবাড়ি আর ফিরে যাব না।'

'আর ফিরবি না!' পা দুটি সরিয়ে নিয়ে মা দুটি মাত্র কথা উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন।

তারপর অতসী খুলেছিল রক্তাম্বর, সীমন্তের সিঁদুর মুছে ফেলেছিল।

সেদিন সে মার পা দুটি জড়িয়ে ধরেছিল, আজ মা আছড়ে পড়েছেন তার পায়ের কাছে, তবু দুটো দৃশ্যের মধ্যে কোথায় যেন সাদৃশ্য আছে।

'শশাঙ্কর চাকরি গেছে।' বিহ্বল অতসী মাকে একটু পরে বলতে শুনল।

'গেল কেন।'

'কী জানি। দুপুরে এসেছিল, খবরটা জানিয়েই উধাও হল, এখনও ফেরেনি।'

অতি সূক্ষ্ম ধারায় হিম ঝরছে আকাশ থেকে। সদর রাস্তার কোলাহলও যেন সংযত হয়ে এসেছে। কে যেন সারাদিন শব্দের কড়ির দান ফেলে ফেলে খেলছিল, এখন ফের সব কুড়িয়ে নিয়ে থলিতে পুরছে। একটা দিক্‌ভ্রান্ত রাত-পাখি নারকেল পাতায় মুহূর্তের জন্যে আন্দোলন তুলে ফের উড়ে গেল। অন্যমনা অতসী অলস চেতনা দিয়েও মাকে বলতে শুনল, 'এবারে কী হবে মা, আমরা উপোস করব? চাকরিতে আর তো ফিরে যাবিনি তুই?'

সঙ্গে সঙ্গে অতসী সেদিনের সঙ্গে আজকের কোথায় মিল, সেটা আবিষ্কার করল। সেদিন মা বলেছিলেন, 'শ্বশুর-

বাড়ি আর ফিরবি নে'; আজকের কথাটা তারই প্রতিধ্বনি।

একটু তফাৎও আছে। সেদিন মা শুধু অতসীর ভবিষ্যৎ ভেবেই ব্যাকুল হয়েছিলেন। তারপর এই ক'বছরে নানা আঘাতে, তাপে, মাতৃস্নেহের সবটুকু রস ঝরে গিয়ে মা আত্মসর্বস্ব আমসিতে পরিণত হয়েছেন। এখন ভাবছেন শুধু নিজের কথা, নিজের ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ? জীবনের তিনভাগ কেটে গিয়ে একভাগ মাত্র যার অবশিষ্ট আছে, তারও ভবিষ্যৎ চিন্তা? আছে বই কি। ভবিষ্যৎ নেই বলেই তো চিন্তা আছে। সীতাদির কথাটাও মনে পড়ল অতসীর, আদিত্য নীলাদ্রি সম্পর্কে যা বলেছিলেম, তা-ও। সব সাধের শেষ আছে, বে'চে থাকার নেই। সব ভালবাসা ফুরোয়, মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রীতি, পত্নীপ্রেম—একটির পর একটি পাতা খসে পড়ে—শেষ পর্যন্ত যে নগ্ন, নিষ্পত্র, গুঁড়িটা টি'কে থাকে, সেটা আত্মপ্রীতি। ফুলের ইন্দ্রজাল নেই, পাতার সজ্জা নেই, ফলের সমারোহও না; চঞ্চুক্ষত বাকল, কোটরে কোটরে সাপ, তবু সে মরতে চায় না, যায় না সূর্যস্নানের নেশা, সহস্র শিকড়ের জিহ্বা মেলে মৃত্তিকা-রস-পিপাসা।

চাকরি ছাড়ার সংকল্পের ভিত্তি কখন যে শিথিল হল, অতসী নিজেই টের পেল না।

শশাঙ্ক সেদিন বাড়ি ফেরেনি, পরদিন সকালেও না। বিকালের দিকে কয়েক মিনিটের জন্যে এসেছিল, হঠাৎ অতসীর মুখোমুখি পড়ে গেল।

'তোর কি এখন খুব কাজ আছে, অতসী।'

'না। কেন বল তো।'

শশাঙ্ক ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, বলল, 'তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'বল।'

অভয় পেয়েও শশাঙ্ক সাহস পেল না। রুক্ষ, বিপর্যস্ত চুলে একবার হাত বুলিয়ে আনল, আঙুল টেনে পরীক্ষা করল চোখের কোলের গভীরতা কত।

অতসী বলল, 'তুমি পারবে না ছোড়দা। আচ্ছা, আমিই জেরা করছি, তুমি শুধু জবাব দিয়ে যাও। তোমার চাকরি গেছে?'

সোজাসুজি প্রশ্নে শশাঙ্ক কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল। বলল, 'যায়নি, নোটিশ দিয়েছে।'

'ওই একই কথা হল। কেন দিয়েছে জান।'

'জানি।' বলে শশাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ সব দ্বিধা ঠেলে বলে উঠল, 'অতসী, তুই আমাকে বাঁচাতে পারিস।'

বাঁচান, আবার সেই বাঁচান। অতি তিক্ত যে কথাটা অতসীর মুখে এসেছিল, সেটা খানিকটা বাঁকা হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে অতসীর ঠোঁটে লেগে রইল। —'কী, করে।'

অতসীর ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে শশাঙ্ক কথাটা ব্যক্ত করতে পারল না। —আজ থাক অতসী, কাল বলব।'

অস্থির উদ্‌ভ্রান্তের মত শশাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতসী বিস্মিত হয়ে সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আয়নার সমুখে দাঁড়াল। তাকেও আবার এখনি বেরতে হবে।

শশাঙ্ক বলতে পারেনি, বলল কেতকী।

আদিত্যের বাড়ি থেকে বেরিয়েই দেখেছিল একটি মেয়ে গেটের বাইরে ঘোরাঘুরি করছে। ওকে দেখেই মেয়ে[illegible] সরে দাঁড়াল, কী যেন বলতে চাই[illegible] কিন্তু অতসী ততক্ষণে কিছুটা এগি[illegible] গেছে। খানিকটা গিয়েই মনে হল, [illegible] যেন পিছু নিয়েছে। ফিরে চেয়ে দেখ[illegible] সেই মেয়েটি।

কালো রঙটাকে ধূসর করবা[illegible] চেষ্টামাত্র নেই, রোগা, ভাঙা-ভাঙা গাল[illegible] কিন্তু চোখ দুটিতে তীব্র একটা জ্যোতি[illegible] বলল, 'আপনি—আপনিই কি অতস[illegible] মিত্র।'

অতসী বলল, 'হ্যাঁ। আপনার ক[illegible] চাই বলুন তো।'

আন্দাজেই অবশ্য ধরে নিয়েছি[illegible] মেয়েটির প্রয়োজন কী। দুঃস্থ মে[illegible] হয়ত ইলেকসনে ক্যানভাসার হতে চায়[illegible]

মেয়েটি বলল, 'আমার নাম কেতক[illegible] সোম। অতসীদি, আপনার সঙ্গে আম[illegible] কথা আছে। এই পার্কটায় একটু বসবেন[illegible]

আত্মীয় সম্বোধনে অতসী বিস্মি[illegible] ততোধিক বিব্রত হয়ে পড়ল। বলতে[illegible] হল, 'বেশ, আসুন।'

কেতকী বলল, 'আপনি বলবেন [illegible] আমি আপনার ছোট বোনের মত[illegible] অতসীদি, শশাঙ্কদা আমাকে আপন[illegible] কাছে পাঠিয়েছে।'

অতসীর বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছি[illegible] শশাঙ্ক, তার ছোড়দা, পাঠিয়ে[illegible] কেতকীকে!

চতুর কেতকী অতসীর মনের ক[illegible] বুঝে নিয়ে বলল, 'আপনি অবাক হচ্ছে[illegible] আমি শশাঙ্কদাকে কী করে চিনল[illegible] তাই না? শশাঙ্কদাকে আমরা অনেক[illegible] থেকে চিনি। উনি আর আমার দাদা [illegible] অফিসে কাজ করেন।'

অতসী বলল, 'ও।'

তীব্র কিন্তু কালো দুটি [illegible] অতসীর মুখের উপর রেখে কেত[illegible] কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কথার [illegible] হারিয়ে গেছে, মনে মনে খুঁজছে [illegible] দিয়ে ফের শুরু করা যায়। ঝরে-প[illegible] একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল কুড়িয়ে [illegible] কেতকী, শুকনো বিবর্ণ ফুলটির পাপ[illegible] খুঁটতে থাকল। তারপর হঠাৎ [illegible] দিয়ে বলে উঠল, 'শশাঙ্কদাকে নো[illegible] দিয়েছে জানেন অতসীদি।'

অতসী বলল, 'জানি।'

কেতকী বলল, 'কেন দিয়েছে জানেন আপনার জন্যে, অতসীদি।'
আমার জন্যে।' এতক্ষণ বিস্ময়মাত্র এবার অতসীর স্তম্ভিত হবার।
কেতকী বলল, 'আপনারই জন্যে। কদা যে অফিসে কাজ করেন, প্রভাত তার একজন বড় অংশীদার র তো। ও'রা কী করে টের পেয়েছে, ন আদিত্য মজুমদারের দলের লোক, হয়ে কাজ করছেন।'
তসী চটে উঠতে গিয়ে হেসে। —'অদ্ভুত বিচার তো। বোনের ভাই সাজা পাবে?'
কতকী হঠাৎ অতসীর হাত দুখানা করে চেপে ধরল। —'আপনি ত্য মজুমদারের কাজ ছেড়ে দিন দি, আমার, আমাদের সর্বনাশ ন না।'
মার সর্বনাশ, তোমাদের সর্বনাশ?' ী কেতকীর দুর্বোধ্য কথাটারই ক্তি করল।
থা নীচু করল কেতকী। ধীরে বলল, 'শশাঙ্কদা আমাকে বিয়ে ।'
তসীর হাত তখনও কেতকীর চ, দুর্বল, লিকলিকে, প্রস্ফুটশিরা হাত, কেতকী কাঁপছে। অতসী হলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে নিল না, পারল না।
কটু পরে কঠিন গলায় বলে উঠল, নিজেরাই এ-বিয়ে ঠিক করেছ

কেতকী চোখ তুলে তাকাল। কালো দুটি আঁখিতারকা এখন অশ্রুবাষ্পাভ, হয়ত সেই জন্যেই দৃষ্টি কিছু স্নিগ্ধ। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমার মা, বাবা, দাদা সব জানেন।'

'তোমার মা, বাবা, দাদা।' কী নিষ্ঠুরতায় যে পেয়েছে অতসীকে, তীব্র গলায় বলল, 'আর আমরা বুঝি কেউ না, কিছু না?'

অতসীর হাত দুটিতে আবার গভীর চাপ দিল কেতকী, অনুন্নত স্বরে বলল, 'অভিমানের সময় এটা নয় অতসীদি। আপনি যদি মুখ তুলে না চান, কালকেই শশাঙ্কদাকে পথে দাঁড়াতে হবে, আর, আর—'

'আর তোমাদের দুজনের একসঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হবে, না?'

কেতকী উত্তর দিল না কিন্তু ওর কালো, কোমল দুটি চোখ উপচে জলের কয়েকটি ঈষদুষ্ণ ফোঁটা অতসীর কর-পল্লবে টপ টপ করে পড়ল। অতসী হাত সরিয়ে নিল না, আচ্ছন্ন, অবসন্ন দেহে পার্কের সেই নির্জন কোণে বসে বড় রাস্তার দ্রুতবহ প্রাণস্রোতের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। গাড়ির পর গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলেছে, একটা রিক্সা বুঝি টক্কর খেয়ে পড়ল রাস্তার পাশে, মুহূর্তে সেটাকে ঘিরে ছোট খাটো ভীড় জমে গেল। পার্কের পাশে কখন একটা মোটর এসে থামল, পৃথুদেহ এক ভদ্রলোক নামলেন, শিষ দিলেন একবার, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। নেমেই কুকুরটা অলক্ষ্য কাকে তাড়া করে ছুটতে শুরু করেছিল, ভদ্রলোক তাড়া দিলেন, কুকুরটা অমনি থমকে দাঁড়াল, তেমনি লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে শুঁকতে থাকল ভদ্রলোকটির চটিজুতো।

'আশ্চর্য ট্রেনিং' কেতকী আপনমনে বলল।

কিন্তু অতসীর মনে হল, ট্রেনিং আশ্চর্য নয়, কুকুরটাও নয়, ভদ্রলোকই আশ্চর্য। নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ওই জন্তুটির সব ইচ্ছা, স্বভাবপ্রবণতা শৃঙ্খলিত করে রেখেছেন। ভদ্রলোকটির বিপুল দেহ ধীরে ধীরে ছায়ায় মিলিয়ে গেল, তবু যেন গেল না, সেখানে অতসী দেখতে পেল অন্য দুটি লোক; তাদের মুখ দেখা যায় না, কিন্তু ভঙ্গীটা অতসী চেনে। ওই ভদ্রলোকটির মত এ'রা প্রায়-ঐশী ক্ষমতার অধিকারী—একটু শিষ, একটু অঙ্গুলি হেলনে নিয়ন্ত্রণ করছে অতসী, কেতকী, শশাঙ্ক এবং ঈশ্বর জানেন, আরও কতজনের জীবন। তাঁদের নালবাঁধান জুতোর নীচে বশীভূত পশুবৎ অসংখ্য মানুষের ছোট ছোট আশা, বাসনা, ভালবাসা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

বহুদিন পরে মল্লিকাকে মনে পড়ল অতসীর। সেই গ্রামান্তরিত মেয়েটি অনেক ভাল আছে। সেখানে দৈন্য আছে, হীনতা নেই; ক্লেশ আছে, গ্লানি নেই। আর, সবচেয়ে যা স্বস্তির, আদিত্য মজুমদার আর প্রভাত মল্লিকেরা নেই।

(ক্রমশ)

স্মরণে

শোভন সোম

ঢেউ ওঠে, কত ঢেউ তটের আশ্রয়ে তার দু'হাত বাড়ায়
জানি সে হারায়।
কত দিন, কত রাত মুছে যায় এ' জীবন থেকে
রঙীন মুহূর্ত ক'টি চিরতরে চিহ্ন যায় রেখে
এই আসা, এই যাওয়া,—ভালবাসা, মান-অভিমানে
স্মৃতির পেয়ালা ভরে' রেখে যাওয়া অন্যকারো প্রাণে।
—শুধু স্মৃতি রেখে যাওয়া?—কিছু নয়, আর কিছু নয়?
স্মৃতিকে পণ্য করে কেবলি কী ফুরোবে সময়?
—ভুলে যাব? পারিনেতো।—চৈত্রের দুরন্ত বাতাসে
একটি শুকনো পাতা জানালার ধারে উড়ে আসে।

পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় জাতীয় নাট্যালয় পরিকল্পনা

শ্রীঅখিলেশ চন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গে লোকসংগীত প্রচার ও নাট্যালয়ের প্রসার সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উৎসাহে একটি পরিকল্পনার কথা নিয়ে সপ্তাহ কয়েক ধরে 'দেশ'-এ আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। এ নিয়ে বাজারে অনেকরকমের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দু'দিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেবার জন্য। পরে লোকসংগীত প্রচার বিষয়ে সংক্ষেপে একটি খসড়া পরিকল্পনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তাতেই জানিয়ে দেওয়া হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্ট সংগীত নৃত্যনাট্য সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু সাহিত্যিক শিল্পীদের, অন্তত কেউ কেউ, জানাচ্ছেন (দেশ, 'আলোচনা' বিভাগ, ১৪ই নবেম্বর '৫৩) যে তারা কোন পরিকল্পনাই জানতে পারেননি, সুতরাং তাদের অনুমোদন লাভের কথা উঠতেই পারে না। এই অবস্থায় গত ১৫ই নবেম্বর কয়েকজন নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক, শিল্পী ও নাট্যালয় স্বত্বাধিকারী মিলে একটি প্রতিনিধি দল ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাঙলা দেশের নাট্যালয় ও নাট্য আন্দোলনের উন্নয়ন বিধায়ক একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীছবি বিশ্বাস, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীশশির মল্লিক (স্টার থিয়েটার), শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায় (রঙমহল) ও শ্রী এন সি গুপ্ত (মিনার্ভা থিয়েটার)। মুখ্যমন্ত্রী সমীপে যে পরিকল্পনাটি পেশ করা হয় এবং যার ওপর ভিত্তি করে সেদিন আলোচনা হয়, সেই পরিকল্পনাটির রচয়িতা পশ্চিমবঙ্গ প্রচার দপ্তরের প্রডাকশন অফিসার এবং সাধারণ্যে নাট্যকার বলে সুপরিচিত শ্রীমন্মথ রায়। এই পরিকল্পনাটির নামকরণ হয়েছে "ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল ন্যাশনাল থিয়েটার" অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় জাতীয় নাট্যালয়। এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। সেদিন ডাঃ রায়ের কাছে এটি পেশ করা হয় মন্ত্রী-পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদন সাপেক্ষে এটি অনতিবিলম্বে কার্যকরি করে তোলার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা মন্ত্রী-পরিষদের অনুমোদন পেয়ে কার্যকরী করে তোলা আরম্ভও হয়ে গিয়েছে।

লোক-প্রমোদ কেন্দ্র

স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনাটির নামকরণ হয়েছে 'ফোক এণ্টারটেনমেণ্ট সেণ্টার' অর্থাৎ লোক-প্রমোদ কেন্দ্র। এই পরিকল্পনাটির জন্য মন্ত্রী-পরিষদ এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। পরিকল্পনাটি কার্যকরি করে তোলার জন্যে উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীপঙ্কজ মল্লিক এবং তাঁর সঙ্গে স্পেশাল অফিসাররূপে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীমন্মথ রায়। এদের ওপরে ভার পড়েছে নাটক ও নৃত্য দেখিয়ে বেড়াবার জন্য অনতিবিলম্বেই একটি ভ্রাম্যমান দল গঠিত করার। চব্বিশ জন পুরুষ ও মহিলা অভিনয় শিল্পী এবং বারো জন গায়ক ও বাদক থাকবে এই দলে। গভর্নমেণ্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন-পত্র বিচার করে এইসব শিল্পী সংগ্রহ করবেন (যদিও শোনা গেল আগে থেকেই শিল্পী সংগ্রহ আরম্ভই করে দেওয়া হয়েছে)। তবে এ বিষয়ে নতুন প্রতিভাবানদের উৎসাহিত করার দিকেই বেশী নজর দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনাতে আরও কতকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। থিয়েটার, যাত্রা, কথকতা, তরজা ইত্যাদি জন-প্রমোদরঞ্জক অনুষ্ঠান প্রযোজনা করার কথা আছে। পাঁচশালা পরিকল্পনাদি জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে এসবের আখ্যানভাগ গঠিত হবে। তাছাড়া এককালে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং জাতির জাগরণে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল সেইসব বাঙলা দেশের জনপ্রিয় জাতীয় সংগীতগুলির রেকর্ড তৈরী করা; যেসব নাটক-যাত্রাদি জাতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল সেগুলিরও রেকর্ড তৈরী করে গ্রামাঞ্চলে বাজিয়ে বেড়ানও এই পরিকল্পনার কার্যসূচীর মধ্যে রয়েছে। নাটকাদির মহলা দেবার জন্য উত্তর কলকাতায় একটি বাড়িও ভাড়া করা হয়েছে বলে জানতে পারা গেল।

সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দ যাঁরা ডাঃ রায়ের আমন্ত্রণে দু'দু'বার রোটাণ্ডা হলে সম্মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের ক'জনের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেল যে, লোক-সংগীত ও লোক-নাট্যের মাধ্যমে পাঁচশালা ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজগুলির বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাই শুধু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছে বলেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বা অন্য কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়নি। তাঁদের কোন মতামত না নিয়েই অথচ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাটি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অনুমোদন লাভ করেছে বলে প্রচার করা হয়েছে।

জাতিকে উদ্দীপ্ত ও উৎফুল্ল করে তোলায় লোক-সংগীত ও লোক-নাট্যের নিয়োগ বহু পূর্বেই হওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেসের জনসংযোগ পরিকল্পনা সূচীর মধ্যেও রয়েছে এই ব্যবস্থা। ভারতের অনেক রাষ্ট্র এ নিয়ে আগে থাকতেই কাজও করে চলেছে। তাই অনেকে মনে করেছেন যে আগামী কল্যাণী কংগ্রেসে এই ব্যাপারটা নিয়ে কোন কথা উঠলে যাতে জবাবদিহি করার জন্য সামনে দাঁড়াতে না হয় সেই লজ্জা থেকে বাঁচবার জন্যই এমন ঝটিতি ঐরকম একটা পরিকল্পনায় হাত দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ নিয়ে বিচার ও বাছাবাছির ঝামেলায় না গিয়ে যাকে তাকে নিয়ে কাজ শুরু

দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টত কিছুই যাচ্ছে না। কিন্তু এইমাত্র দেখা যে, যে-দুজনের হাতে পরি-াটি কার্যকরী করে তোলার ভার করা হয়েছে তাঁরা পরিকল্পনা-ুক্ত সূচীর কোন কোনটি সম্পর্কে । অভিজ্ঞ, কিন্তু সমস্ত পরি-াটিকে কার্যকরী করে তোলার তাঁরা বিজ্ঞ বলে বোধ হয় করা যায় না। কাজেই এ ও সম্ভবত অসমীচীন হবে না যে দিনই যখন সবুর করা গিয়েছিল ভেবেচিন্তে একটা পরিকল্পনার যে একেবারেই তর সইলো না তার ন অন্যরকমের কোন উদ্দেশ্য াই স্বাভাবিক। যাই হোক, আগামী ী কংগ্রেস অথবা দিল্লীর সংগীত একাডেমীর উদ্যোগে আগামী মার্চ প্রস্তাবিত নৃত্য সংগীতোৎসবের ভেবেও যদি কিছু হয় লও একটু কাজ হবে; অন্তত তর অন্যান্য অঞ্চল থেকে এবং তর বাইরেরও নানা দেশ থেকে যাঁরা বেন তাঁদের সামনে বাঙলার লোক-াত-নৃত্য তুলে ধরা যেতে পারবে, গতবার বালিগঞ্জে এ আই সি সি'র বেশনের চেয়ে হয়তো একটু ভাল-ই। উপস্থিত ঐ পর্যন্ত হলেও হয় ন্তু সেজন্যেও তেমন ব্যক্তির হাতে পড়েছে কোথায়?

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় জাতীয় নাট্যশালা ষ্ঠার জন্য পরিকল্পনাটিরও রচয়িতা মথ রায়। বারো দফার এই পরি-নাটির প্রথম দুটি দফায় জাতীয় লয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে াচনা করা হয়েছে। একটা জাতির রুজ্জীবনে মঞ্চ যে কতখানি সহায়ক পারে তার উল্লেখ করা হয়েছে মস্কো থিয়েটারের উদাহরণ তুলে ধরে। সূত্রে আমাদের দেশে ঐ রকম কোন ীয় প্রতিষ্ঠান না থাকায় পরিতাপ হয়েছে। একথা খুবই প্রণিধানযোগ্য বর্তমান জাতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার দেশের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নসাধারণের নৈতিক সহযোগিতা লাভ করার জন্য জাতীয় নাট্যশালার প্রয়োজন আজকেই সবচেয়ে বেশী।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আলোচ্য পরিকল্পনাটির তৃতীয় দফাতে প্রস্তাবিত জাতীয় নাট্যশালাটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"১। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ ও প্রচার;

২। অনুশীলন ও সূত্রনির্ণয়ার্থে লাই-ব্রেরী ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা;

৩। কালিদাস, ভবভূতি, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতির ক্লাসিকগুলির পুনঃপ্রচলন;

৪। জাতি-গঠন বিষয়ে নতুন নাটক পরিবেশন;

৫। অভিনয় মঞ্চকৌশল ও নাট্য-পরিবেশন কৌশল শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনে উৎসাহিত করা;

৬। সৌখিন নাট্যপ্রচেষ্টা, শিশু রংমহল, মুক্তপ্রাঙ্গণ থিয়েটার ও গ্রাম্য থিয়েটার গড়ে তোলায় উৎসাহদান করা;

৭। তথ্যাদি সমন্বিত সচিত্র অভিধান প্রভৃতি ভারতীয় নাট্যবিষয়ক গ্রন্থাদি প্রকাশ;

৮। প্রতি বৎসর বছরের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ব্যক্তিগতভাবে শিল্পী ও লেখকদের পুরস্কার ও সম্মান দেওয়া;

৯। দুঃস্থ ও ভ্রষ্টশক্তি শিল্পী ও লেখকদের সাহায্য তহবিল প্রতিষ্ঠা করা;

১০। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।"

পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য খুবই ভালো। দেশের নাট্য আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার অনেক প্রয়োজন ও কর্তব্য মেটাবার ভাব এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। পরিকল্পনার চতুর্থ দফাটিতে ঐ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কার্যকরী করে তোলার কথা বলা হয়েছেঃ

"বর্তমানে জাতীয় নাট্যালয়ের প্রধান কাজ হবে;

১। আধুনিকতম সরঞ্জামবিশিষ্ট একটি প্রথম শ্রেণীর নিজস্ব নাট্যগৃহ রাখা;

২। প্রখ্যাত প্রযোজকদের টাকা ধার দিয়ে তাদের নাট্যপরিবেশনে আর্থিক সাহায্যদান; সাধারণত নাটক প্রতি পাঁচ হাজার টাকা, যে টাকাটা কিস্তিবন্দী হারে শোধ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে প্রথম দাবী হিসেবে কেটে নেওয়া হবে। ঐ রকম নাটকের প্রথম দুটি অভিনয় জাতীয় নাট্যালয় মঞ্চে অনুষ্ঠিত করতে হবে; এই অভিনয় থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকে তিরিশ টাকা যাবে জাতীয় নাট্যালয়ে এবং বাকী সত্তর ভাগ পাবে প্রযোজক।

৩। ঐ দুটি অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রচার ব্যবস্থা করা;

৪। জাতীয় নাট্যালয় মঞ্চে সাধারণ্যের জন্য পরিবেশিত হবার আগে সংবাদপত্র ও সমা-লোচকদের জন্য একটি প্রাক্-অনুষ্ঠান অভিনয়ের ব্যবস্থা করা।

এই চতুর্থ ধারাটি সম্পর্কে কতক-গুলি প্রশ্ন জাগতে পারে। প্রথমত আধুনিকতম সরঞ্জামবিশিষ্ট নিজস্ব একটি নাট্যগৃহ রাখার মতো খরচটা আসবে কোত্থেকে? অবশ্য এবিষয়ে এই পরিকল্পনার ষষ্ঠ দফায় বর্তমানের জন্য একটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; পরে সেকথা নিয়ে আলোচনা হবে।

আলোচ্য চতুর্থ দফাটিতে বলা হচ্ছে যে, সুপরিচিত ও প্রখ্যাত নাট্যপ্রযোজক-দের নাটক পিছু পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়া হবে এবং ধ'রে নিতে হবে যে জাতীয় উন্নয়নমূলক নতুন নাটক পরি-বেশন করার জন্য। অর্থাৎ এই দফা অনুযায়ী "recognised producers of reputation" বলতে কেবল কলকাতার চারটি স্থায়ী মঞ্চ এবং তার বাইরে দু'একজন মাত্র নাট্যপ্রযোজকই পড়বেন। সারা দেশে নাট্য আন্দোলনকে প্রসারিত করার ব্যবস্থা তাহলে কি করে হচ্ছে? কলকাতার মঞ্চ চারটিকেই যদি আর্থিক সহায়তা দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তো তার জন্যে এমনি একটা পরিকল্পনার কি দরকার ছিল? —সরাসরিভাবে সরকারী তহবিল থেকে টাকা ধার দেবার ব্যবস্থা করে দিলেই তো ঝামেলা মিটে যেতো! নাট্য প্রযোজনায় নতুনদের উৎসাহিত করার উপায় এর মধ্যে নেই আর যদি এথেকে উপায় করে দেওয়াও যায় তো তার জন্যে ধরাধরি আর পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট সুযোগ করে দেওয়া রয়েছে। তারপর, জাতীয় নাট্যশালা থেকে টাকা ধার নিয়ে তৈরী করা কোন নাটক সাধারণ্যে পরিবেশনের আগে সাংবাদিক ও সমালোচকদের দেখা-বার কথা বলা হয়েছে অবশ্যই মতামত ও অনুমোদন পাবার জন্যেই। কিন্তু যদি মত বিরূপ হয়, সাংবাদিক সমালোচকদের অনুমোদন যদি লাভ করতে না পারে, তাহলে উপায়?

পঞ্চম দফাটি হচ্ছে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে। এতে মুখ্যমন্ত্রীর ওপরে ভার দেওয়া হচ্ছে একটি 'বোর্ড অফ ম্যানেজমেণ্ট' গঠিত করার জন্য যার চেয়ারম্যান থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এই বোর্ডের অন্তর্ভূক্তির জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাব করা হয়েছেঃ

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে:—(১) শিক্ষামন্ত্রী; **নাট্যশিল্প ও সাহিত্যের দিক থেকে**—(২) কলিকাতার মেয়র; (৩) শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী; (৪) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর; (৫) লালগোলার রাজা; (৬) শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; (৭) শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল (কৃষ্ণনগর); (৮) শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। **নৃত্যনাট্য ও সংগীত একাডেমীর দিক থেকে**—(৯) শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী; (১০) শ্রীউদয়শংকর; (১১) শ্রীশচীন সেনগুপ্ত। নাট্যকার—(১২) শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য; (১৩) শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত। **মঞ্চাভিনেতা**—(১৪) শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, (১৫) শ্রীনরেশ মিত্র, (১৬) শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, (১৭) শ্রীছবি বিশ্বাস, (১৮) শ্রীজহর গাঙ্গুলী। **মঞ্চাভিনেত্রী**—(১৯) শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, (২০) শ্রীমতী মলিনা দেবী। **গায়ক ও বাদক**—(২১) শ্রীপংকজ মল্লিক, (২২) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, (২৩) শ্রীঅনুপম ঘটক, (২৪) শ্রীতিমিরবরণ। **হাস্যরসিক**—(২৫) শ্রীরঞ্জিত রায়, (২৬) শ্রীনৃপতি দাশগুপ্ত। **মঞ্চপ্রযোজক**—(২৭) শ্রীমধু বোস, (২৮) শ্রীশম্ভু মিত্র, (২৯) শ্রী এন সি গুপ্ত, (৩০) শ্রীশিশির মল্লিক, (৩১) শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায়। **নৃত্যশিল্পী**—(৩২) শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান, (৩৩) শ্রীমতী সাধনা বসু, (৩৪) শ্রীমতী অমলাশংকর এবং (৩৫) শ্রীমণি বর্ধন।

ওপরে যে নামগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাদের মধ্যে অনেকের সম্পর্কেই আপত্তি উঠবে। সাংস্কৃতিক কোন রকম সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে কোনকালে যোগ নেই এমন লোক রয়েছেন। এমন লোক রয়েছেন যাঁরা সকাল বিকেল চব্বিশ ঘণ্টা, কোথাও কথা বলার একটু ফাঁক পেলেই কংগ্রেস, পণ্ডিত নেহরু ও গভর্নমেণ্টকে গালাগালি না দিয়ে ছাড়েন না। এমন লোক রয়েছেন যাঁরা নিজেরাই নাটক পরিবেশনের জন্য টাকা ধার পাবার উমেদার হবেন, কারণ পরিকল্পনা মতে যারা টাকা পাবার যোগ্য তাঁরা সবাই রয়েছেন এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে। আবার এদের মধ্যেই এমন নাট্যপ্রযোজকও আছেন যাঁরা নাটক করেন লোককে বর্তমান গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলার জন্যে—তারাও টাকা ধার পেয়ে যাবেন বোধহয়!—তা নয়তো তাদের ঠেকাবার ব্যবস্থা কোথায়? ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েদের কারুরই নাম নেই; অভিনয়শিল্পীদের যাদের নাম দেওয়া হয়েছে তাদের কারুর কারুর চেয়ে অনেক বেশী কৃতিশিল্পী ও কীর্তিমান শিল্পী আছেন যাঁদের নাম প্রস্তাবিত হয়নি। নাট্যকার ও সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা চলে। এমন কি কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করে তোলার মন ও মেজাজ তালিকাভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বেশীরভাগেরই নেই, আর এজন্যে সময় ব্যয় করবেন এমন লোকও ক'জনই বা পাওয়া যাবে এ'দের মধ্যে থেকে? নেহাৎই এলোপাথারীভাবে নামগুলি নির্বাচিত হয়েছে, এবং এমন সব নাম বাছা হয়েছে যাদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া জাতীয় উন্নয়নের জন্য কারুর মাথা ঘামাবার জন্যে ভারি দায় পড়েছে!—কোনদিনই তাঁদের ওদিক থেকে কোন উৎসাহই দেখা যায়নি।

পরিকল্পনার ষষ্ঠ দফাটি হচ্ছে উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ গঠিত বোর্ড অফ ম্যানেজমেণ্ট দ্বারা একটি কার্যনির্বাহক কমিটি নির্বাচিত করা।

সপ্তম দফাটিতে সুগম্য কোন স্থানে জাতীয় নাট্যালয়ের একটি আধুনিক ধারার এবং নবতম সরঞ্জাম বিশিষ্ট একটি নিজস্ব নাট্যগৃহ ও মঞ্চ থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে "হয় বর্তমানে স্থায়ী কোন মঞ্চ অথবা উত্তর কলিকাতায় বর্তমানে নির্মীয়মান একটি প্রেক্ষাগৃহ লীজ নেওয়া হোক। এমন কি মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রীট) উপস্থিত কাজে আসতে পারে।" এরপর মিনার্ভা থিয়েটারটি নিয়ে চালানোর খরচের একটা হিসাব পাওয়া যায় অষ্টম দফাতে। এতে ধরা হয়েছেঃ

"(ক) মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সংস্কার বাবদ—৩০,০০০৲ টাকা;

(খ) মঞ্চ সরঞ্জাম (বাদ্যযন্ত্র, আসবাব ইত্যাদি) বাবদ—১০,০০০৲ টাকা;।

(গ) সুপরিচিত প্রযোজকদের কোন নাটক বা প্রমোদ-প্রদর্শনী তৈরী করার জন্য সাধারণত ৫,০০০৲ টাকা করে ধার দেবার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা নিয়ে একটি কর্ম তহবি[ল] ব্যবস্থা করা।"

ওপরের হিসেব মতো ম[োট] ৯০,০০০৲ টাকা ছাড়া নবম দফাতে "মা[সিক] ১০,০০০৲ টাকা হারে ৬ মাসের জ[ন্য] একটা কার্যকরী মূলধন স্থাপন কর[ার] জন্য—৬০,০০০৲ টাকা" ধরা হয়েছে। অষ্টম ও নবম দফা অনুযায়ী মোট ১,৫০,০০০৲ টাকা লাগছে সেটা "পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট সরবরাহ করবেন ব[লে] আশা করা যায়।"

কি দেখে যে ঐ হিসেবটা দ[াঁড়] করানো হয়েছে তার কোন হদিশ ি[...] করে ওঠা মুশকিল। হালফিলেই স্ট[ার] থিয়েটারটি সংস্কার করতে ষাট হাজ[ার] টাকা খরচ হয়েছে; তাতেও সরঞ্জামে কিছুই আধুনিক করে তোলা যায়নি। মিনার্ভার অবস্থা আগের স্ট[ার] থিয়েটারের চেয়েও জঘন্য। মিনা[র্ভা] থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। ওটিকে হাতে নেওয়া ভা[...] কথাই। কিন্তু ওটিকে প্রথম শ্রেণ[ীর] আধুনিকতম সরঞ্জাম বিশিষ্ট নাট্যগ[ৃহ] ও মঞ্চে পরিণত করে তুলতে ৪০,০০[০] টাকাতেই কুলিয়ে যাবে, এটা কি ক[...] হিসেবে দাঁড়ায়? যদি ধরা যায় [...] মিনার্ভা থিয়েটারটি গ্রহণ না করে উ[ত্তর] কলকাতায় নতুন যে প্রেক্ষাগৃহ তৈ[রী] হচ্ছে সেটিকে গ্রহণ করা হবে—সেক্ষে[ত্রে] নতুন বাড়ি সংস্কার কাজের কোন খর[চ] লাগবে না, খরচ লাগবে শুধু সরঞ্জামে। তাহলে এরপরে একাদশ দফায় প্রেক্ষাগৃ[হ] ভাড়ার জন্য যে মাসিক দু'হাজার টা[কা] ধরা হয়েছে সে অংকটায় তাহলে কুলো[বে] কি করে? সুতরাং হিসেবটা মিনার্ভা থিয়েটার নেওয়া সাব্যস্ত করেই ধ[রা] হয়েছে, আর তা যদি হয় তাহলে সংস্কা[র] আর সরঞ্জামে বরাদ্দ চল্লিশের চেয়ে আর[ও] অনেক বেশী হাজার টাকা লাগবে—সে[টা] আসবে কিভাবে?

এরপর একাদশ দফাতে ন্যাট্যালয়[কে] চালাবার জন্য নিযুক্ত বিভিন্ন বিভাগে[র] কর্মীদের বেতন, বাড়িভাড়া, বিজ্ঞাপন, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ এবং মেরামতি কা[জ] বাবদ মাসিক ১০,০০০৲ টাকার একটি ফর্দ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রধা[ন]

ক্ষ অর্থাৎ বোর্ড অফ ম্যানেজ-
র সেক্রেটারী ও সংযোগরক্ষক নিযুক্ত
ব পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট। সর্বনিম্ন
। টাকা থেকে সর্বোচ্চ সাতশো টাকা
১ বেতনের হার দেওয়া হয়েছে। মনে
চলতি রঙ্গমঞ্চগুলিতে বর্তমানে
র যে হার প্রচলিত এখানেও প্রায়
হারই অনুসরণ করা হয়েছে। এই-
বছরে ১,২০,০০০, টাকা নাট্যালয়
র খরচ এবং সেইসঙ্গে বছরের
গুণীদের পারিতোষিক দেবার জন্য
০, টাকা ধরা হয়েছে। একুনে খরচ
ছরে ১,২৫,০০০, টাকা। এই অঙ্কের
নবম দফা অনুযায়ী ৬০,০০০,
অর্থাৎ নাট্যালয় চালাবার ছ'মাসের
। পাওয়া যাবে বলে ধরা হচ্ছে
বঙ্গ গভর্নমেণ্ট থেকে প্রাপ্তব্য
থেকে।

র পরের দফাতে অঙ্ক কষে আয়ের
। দেখিয়ে দেওয়া হয়েছেঃ

ক) অনুমোদিত সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়
মোদিত প্রাইভেট দলদের মঞ্চ ভাড়া
বাবদঃ মাসে ৮ দিন ৩০০, টাকা হারে
০০, টাকা;

খ) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শনিবার ও
র (দুটি প্রদর্শনী) সাধারণ প্রদর্শনী,
র সকালে এবং অন্যান্য ছুটির দিন
শরকুমার, শ্রীউদয়শঙ্কর, শ্রী পি সি
, শ্রীরঞ্জিৎ রায়, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান,
রঙমহল, আনন্দমেলা, ছোটদের
াড়ি, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন
প্রতিষ্ঠাবান প্রযোজকদের দ্বারা
ঠত প্রদর্শনী বাবদ বিক্রয়লব্ধ অর্থের
৩০, টাকা হারে—১২,০০০, টাকা;

গ) বিজ্ঞাপনের জন্য জায়গা ভাড়া বাবদ
৫০, টাকা মোট ১৬,২৫০, টাকা।
ং বছরে ১,৯৫,০০০, টাকা।

ওপরে আয়ের (খ) বিভাগে বিক্রয়-
অর্থের শতকে ৩০, টাকা পাওয়া
হিসেব করে মাসে (৪ সপ্তাহ) যে
০০, টাকা আয় ধরা হয়েছে সেটা
রে সম্ভব হতে পারে তারও একটি
ব করে দেখানো রয়েছে এই সঙ্গেঃ
ানুমানিক বিক্রয়—বুধবার একটি
ী—১,০০০, টাকা, বৃহস্পতিবার একটি
প্রদর্শনী—১,০০০, টাকা, শনিবার একটি
প্রদর্শনী—১,৫০০, টাকা, রবিবার দুটি
প্রদর্শনী—৫,০০০, টাকা, রবিবার সকালের
প্রদর্শনী—১,৫০০, টাকা। মোট—১০,০০০,
টাকা। সুতরাং মাসে (৪ সপ্তাহ)—৪০,০০০,
টাকা।

হিসেবটা বেশ খটোমটো। প্রথমত দিনের দিন এক একটি প্রদর্শনীতে আনু-মানিক বিক্রয়লব্ধ অর্থের যে পরিমাণ ধরা হয়েছে আজকালকার বাজারে প্রভূত জনপ্রিয় নাটক না হলে অতো টাকা বিক্রী হয় না। সপ্তাহে যদি দশ হাজার টাকা করে বিক্রী হতো তাহলে বর্তমান মঞ্চের কোনটিই দুরবস্থায় পড়তো না কিছুতেই। তারপর শ্রীশিশিরকুমার প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পী ও প্রমোদ অনুষ্ঠাতাদের প্রদর্শনী হবে বলে আগে থেকেই ধরে নেওয়া যায় কি করে? আবার এও দেখা যাচ্ছে যে, হিসেবে আগাগোড়া ধরা হয়েছে চার সপ্তাহে মাস অর্থাৎ আটচল্লিশ সপ্তাহে বছর—কিন্তু বছর হয় বাহান্ন সপ্তাহে। যাই হোক, এইভাবে গোঁজামিল দিয়ে দেখানো হয়েছে অষ্টম, নবম ও একাদশ দফা বাবদ বছরে খরচ ১,২৫,০০০, টাকা, এবং দ্বাদশ দফা অনুযায়ী আনুমানিক আয় ১,৯৫,০০০, টাকা, অর্থাৎ বছরে সরাসরি লাভ ৭০,০০০, টাকা। কেমন জলের মতো হিসেব! এ হিসেব কিন্তু জাতীয় নাট্যালয় নিজস্ব কোন নাটক পরিবেশন না করেই—এখানে ধরেই নেওয়া হচ্ছে যাদের টাকা ধার দেওয়া হবে তারা এই পরিকল্পনার আয়ের দফাতে নির্ধারিত দিন অনুযায়ী প্রত্যেকে তাদের প্রথম দুটি অভিনয় এই মঞ্চে অনুষ্ঠিত করে যাবেন। এতোটা নিশ্চিন্ত হওয়াতো বড়ো অদ্ভুদ কথা!

আসলে দেখা যাচ্ছে যে, এটা কোন পরিকল্পনাই নয়। সবই আন্দাজ ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ধরে নেওয়া। হাওয়ায় আশ্রয় করা। এযেন কোন সূত্র থেকে একটা টাকা আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—পঞ্চবার্ষিকী বা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রচার তহবিল থেকে হোক, ফোর্ড ফাউণ্ডেশন থেকে হোক বা গভর্নমেণ্টের খাস তহবীল থেকেই হোক। সেই টাকাটাকে যাতে খাটিয়ে নেওয়া যায় সেইজন্যেই তাড়াহুড়ো করে এমনি একটা বেমক্কা পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। এটাকে পরিকল্পনা না বলে একটা খরচ যজ্ঞের ফর্দ বলাই বোধহয় সমীচীন হবে।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ আরম্ভ করার জন্য ছ'মাস পর্যন্ত খরচের টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই নাট্যালয় নিজের পায়ে দাঁড়াবার অবস্থায় পৌঁছতে পারবে এ গ্যারাণ্টি তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

এ পরিকল্পনাটি কাজে খাটাবার ভার পড়ছে কার ওপর সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রচার দপ্তরের প্রডাকশন অফিসার শ্রীমন্মথ রায়ই এ ভার নিচ্ছেন বা পাচ্ছেন; বোর্ড অফ ম্যানেজমেণ্টে প্রস্তাবিত নামের তালিকায় তিনি না থাকায় এটা ধরে নেওয়া আরও সহজ, বিশেষ করে তিনিই যখন এই পরিকল্পনাটির রচয়িতা! অর্থাৎ শ্রীমন্মথ রায় লোকসংগীত সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা এবং নাট্যালয় সম্পর্কিত স্বরচিত পরিকল্পনা দুটিরই পরিচালক হচ্ছেন। এমনতরো কাজে শ্রীমন্মথ রায় অতি গুণী ও অভিজ্ঞদের মধ্যে যে একজন সে পরিচয় এপর্যন্ত তাঁর কোন কৃতিত্বে প্রকাশ পেয়েছে বলে তো মনে করা যায় না। কাজেই এ পরিকল্পনা দু'টি তাঁর হাতে কতটা সার্থক হয়ে উঠবে সেটা লক্ষ্যনীয়।

বাঙলা দেশে নাট্যালয়কে জিইয়ে এবং সর্বত্র প্রসারিত করে তোলার দরকার আজ খুবই। জাতিকে গড়ে তোলার কাজে, জনসাধারণকে নতুন দিনের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে তোলায় মঞ্চ একটা বড়ো এবং বলিষ্ঠ সহায়ক। কিন্তু যে পরি-কল্পনা হাতে নিয়ে যেভাবে কাজে নামা হচ্ছে তাতে ভরসা পাবার মতো কিইবা আছে?

আলোচনা

"এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহনের স্থান"

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহনের স্থান" নিবন্ধটি প্রকাশ করিয়া (৫ই অগ্রহায়ণ) আপনারা ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছেন। প্রভাতবাবু তাঁহার তথ্যবহুল যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদে ইতিহাসবেত্তা রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অপসিদ্ধান্ত ধূলিসাৎপ্রায় করিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। রমেশবাবুর উক্তি—"যে হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহার প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের কোনই হাত ছিল না, বরং যখন এইরূপ একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় তখন তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন"—কিরূপ অসার ও যুক্তিহীন তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি নিম্নে একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রখানি সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন চীফ জস্টিস স্যর হাইড ঈস্ট তাঁহার সহযোগী জজ্ হ্যারিংটন সাহেবকে লেখেন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে স্যর হাইড ঈস্টের বাসভবনে ১৪ই মে তারিখে যে পরামর্শসভা বসে তাহার বিবরণ দিয়া চীফ জস্টিস ঈস্ট লিখিতেছেন—

"Talking afterwards with several of the company, before I proceeded to open the business of the day, I found one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influence, was mostly set against Rammohun Roy (who has lately written against the Hindu idolatry, and upbraids his countrymen pretty sharply). He expressed a hope that no subscription would be received from Rammohun Roy. I asked, 'why not'? 'Because he has chosen to separate himself from us, and to attack our religion', 'I do not know', I observed, 'what Rammohun's religion is'—(I have heard it is a kind of unitarianism)—'not being acquainted or having had any communication with him; but I hope that my being a Christian, and a sincere one, to the best of my ability, will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking'.. He answered readily..'No, not at all; we shall be glad of your money; but it is a different thing with Rammohun Roy, who is a Hindu, and yet has publicly reviled us, and written against us and our religion.".…

"Upon another occasion I had asked a very sensible Brahmin what it was that made some of his people so violent against Rammohun. He said that they did not like a man of his consequence to take open part against them; that he himself had advised Rammohun against it; he had told him that if he found anything wrong against his countrymen, he should have endeavoured, by private advice and persuasion, to amend it; that the course he had taken set everybody against him, and would do no good in the end. They particularly disliked (and this, I believe, is at the bottom of the resentment) his associating himself so much as he does with Mussalmans, not with this or that Mussalman as a personal friend, but being continually surrounded by them, and suspected to partake of meals with them. They would rather be reformed by anybody else than by him." ["The Father of Modern India": Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume 1933 pp. 43-44].

হাইড ঈস্ট সাহেবের এই চিঠিখানিতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হিন্দু কলেজের পরিকল্পয়িতাদের মধ্যে রামমোহন যে শুধু ছিলেন তাহা নহে, কলেজ প্রতিষ্ঠার সহায়তায় তিনি অর্থদান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; নতুবা চীফ জস্টিসের ভবনে আহূত পরামর্শসভায় তাঁহার নাম উঠিত না এবং তাঁহার দান গ্রহণে আপত্তি হইত না। প্রচলিত ধর্মমত ও দেশাচারের বিরোধিতা প্রকাশ্যভাবে করাতেই রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী সমাজপতিগণ উগ্র মন-ভাব পোষণ করিতেন; বিশেষভাবে, মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা ও আহারাদি করাতে, তিনি তাঁহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। রামমোহন তাহা জানিতেন। পাছে তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা সমিতির সহিত সংযুক্ত থাকিলে, উহার ক্ষতি হয়, তাই তিনি সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কদাচ তিনি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ করেন নাই। এই অভিযোগ রমেশবাবুর কল্পনাপ্রসূত, অনৈতিকহাসিক অনৃত। পরলোকগত ইতিহাস-গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"Rammohun was the prime mover in founding the Hindu College. The leading Hindus of Calcutta disliked his association with it, as he was regarded by them as a heretic and more of a Mussalman than a Hindu. Rammohun, therefore, very wisely withdrew from the movement, lest the objects of the institution should be frustrated in consequence of his name appearing on the Committee of Management." [Journal of the Bihar and Orissa Research Society", June, 1930].

রমেশবাবুরও রামমোহন-বিরাগ কি সেই একই কারণে? তাঁহার জয়পুরে ভাষণে তাঁহার মুসলমান-প্রীতি দেখিয়া মনে হয় বুঝি তাই। আর সেই কারণেই কি তিনি রামমোহনের মহিমা অযথা খর্ব করিতে গিয়া 'বাঙালী জাতিকে খাটো' করিবার কাজে লাগিয়াছেন? তাঁহার সম্পাদিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সত্য কি এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

অমল হোম
১৬৯।বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

৭ই অগ্রহায়ণ,
১৩৬০।

ট খেলা

ার রাজা ক্রিকেট : বিনয় মুখোপাধ্যায় : ় পাবলিশার্স লিমিটেড; ২২, ক্যানিং লিকাতা—১: দু' টাকা।

লী প্রবন্ধকারের বিষয়-পরিধি বড় । সাহিত্য এবং রাজনীতি—এই বিষয়বস্তুর বাইরে তাঁরা পা ফেলতে কী এর কারণ জানিনে, কিন্তু ় আর সাহিত্য ছাড়া আরও অনেক-তুই যে পৃথিবীতে আছে সেটা জানি। । উৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনা চলতে পারে, াকের হাতে পড়লে সে-প্রবন্ধ আকর্ষক সম্ভাবনা। তার চাইতে বড় কথা, প্রবন্ধসাহিত্য তাতে সম্পন্নতর হয়ে

য় মুখোপাধ্যায়ের সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ রাজা ক্রিকেট' পড়েই এত সব কথা মনে বিষয়বস্তু আমাদের অপরিচিত নয়, াই পরিচিত বিষয়বস্তু নিয়ে বাঙলা-কখানি সম্পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার উদ্যম এই প্রথম। বিনয় মুখোপাধ্যায়কে থকে পথিকৃৎ-এর সম্মান দেওয়া যেতে বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি নতুন বষয়বস্তুর প্রবর্তন করলেন। সে-তিনি ধন্যবাদার্হ।

ট নিয়ে লেখা বই, কিন্তু লেখার হিত হয়ে উঠেছে। বইখানি লেখা অল্পবয়সীদের জন্যে। খেলাটাকে রা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারে, গ তাদের যাতে একটা অন্তরঙ্গ ঘটে, লেখক সেজন্যে চেষ্টার কোনো খেননি। একেবারে শুরুর থেকে রু করেছেন, তারপর জটিলতর লির সঙ্গে ধীরে ধীরে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। কোন্ বয়সের ছেলে কোন্ ব্যাট নিয়ে খেলব, কতরকম কায়দায় ার বোলিং চলতে পারে, বোলিংয়ের দ কিভাবে ফিল্ডিং সাজাতে হয়, কিছুই তিনি বাদ দেননি। পরিচ্ছন্ন ষায় সব-কিছুই তিনি বেশ গুছিয়ে তরুণ খেলোয়াড়রা এ-বই পড়ে উপকৃত হবেন। আর যাঁরা নিজেরা ় নন, ক্রীড়ারসিকমাত্র, তাঁরাও যদি ড়েন তো খেলাটাকে আরও ভালভাবে করতে পারবেন।

ানির প্রচ্ছদ খুব সুন্দর হয়েছে; ছবিগুলি আরও ভাল হতে পারত।

৪৯৩।৫৩

উপন্যাস—

চোর কাটা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : দীপনী, ২৩৫ বি টি রোড, কলিকাতা। দাম—২৲।

যে কোন গ্রন্থের যখন পুনর্মুদ্রণ হয় তখন 'নামপত্রে' বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করার রেওয়াজ আছে। 'চোর কাঁটায়' তার ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রম এবং ত্রুটি। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচ্য উপন্যাস, আজকের দৃষ্টিতে যেটিকে বড় গল্প বলতে হয়, তার পুনঃপ্রচার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি সুখবর এ-কথা স্বীকার করে নিয়েও যে কোন পাঠক বলতে বাধ্য হবেন যে এ বইয়ের এবং লেখকের অন্যান্য রচনারও, প্রধান মূল্য একটি বিশেষ কালের সাহিত্যধারার বিশেষ একটি অধ্যায় হিসেবে। চারুচন্দ্রের সৃষ্টি অতীত ঐতিহ্য হিসেবে সম্মানিত। কিন্তু আধুনিক ঐশ্বর্য নয়। অর্থাৎ প্রথম প্রকাশের তারিখটি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলে যে মন নিয়ে বইটি পড়া স্বাভাবিক প্রথম মুদ্রণের তারিখটির উল্লেখ না থাকলে সেই মন নিয়ে হয়তো সব পাঠক বইটি পড়বেন না। এক সময়, যখন বাঙলা সাহিত্য সাধারণভাবে গল্প উপন্যাসে শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার পাঠক মনকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর রচনা একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মূল্যে মূল্যবান। এবং সেদিক থেকে আলোচ্য উপন্যাসটির পুনর্মুদ্রণ করে প্রকাশক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন এ-কথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু আলোচনার প্রথমেই প্রকাশ তারিখ সম্পর্কে মন্তব্য করার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে 'উপন্যাস'টির কাহিনীটুকু জানলেই। পশুপতি ও মমতার ঘরে চুরি করতে এসে ধরা পড়লো ভদ্রসন্তান 'সাধু'। এবং পশুপতির লক্ষ্যভেদে সিঁধ কাঠির আঘাতে সে ধরাশায়ী হ'ল। তারপর মমতার মমতা চোর 'সাধু'কে ক্রমশ সাধুতে পরিণত করার চেষ্টা করতে করতে আবিষ্কার করলো তার পূর্বপরিচয় ও নিকট-তম সম্পর্ক। এবং শেষ পর্যন্ত "বড়লোকরাই গরীবের ধন চুরি করে, তারপর গরীব নিজের ধন ফিরে নিতে চাইলে তারা তাকে চোর বলে চোখ রাঙায়", এই দাঁড়ালো কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়।

কাহিনী যাই হোক্, বাস্তবধর্মী সাহিত্যিক হিসেবে সেদিন চারুচন্দ্র অভিনন্দিত হয়েছিলেন, পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছিলেন এবং বাঙলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমণের যাত্রারম্ভে তিনি সেদিন বনস্পতির ছায়া বিছিয়েছিলেন। তাই, তিনি আজ সমালোচনার ঊর্ধ্বে, তাই তাঁর রচনা আজ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত।

৪৭১।৫৩

নতুন ফসল, গৃহ-কপোতী—শ্রীসরোজ-কুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় কর্তৃক সাহিত্য ভারতী প্রকাশনী, ১৪নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩৲ টাকা।

বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যে বিধিমার্গের

একটা যুগ পড়িয়া গিয়াছে। বিভিন্ন মতবাদ ও বিবিধ ভাষ্য-পরিভাষ্যে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন একটা কচায়ন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে দেশের নরনারীর অন্তরের যে সুরটি মধুর, যে সুরটি গোপন এবং আপন, সহজ এবং সহজ বলিয়াই সরস তাহা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। বঙ্গবাণীকুঞ্জে নানা মতবাদের এই আখড়াইয়ের হট্টগোলের মধ্যে সরোজকুমারের 'গৃহকপোতী'র দ্বিতীয় সংস্করণখানি পাঠ করিয়া আমরা অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়াছি। সরোজকুমার কৃতী সাহিত্যিক এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথিতযশা। আমাদের পল্লী-জীবনের সঙ্গে তাঁহার প্রকৃত প্রীতির সংযোগ আছে। এদেশের মানুষকে তিনি বুঝেন, জানেন, এজন্য তাহাদের মনের গোপন কথাটিও সহজ করিয়া বলিতে পারেন। সরোজকুমারের সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই দিক হইতেই রসসমুচ্চয় এবং এই দিক হইতে তাহার সার্থকতা। সেই সৃষ্টিতে বাহিরের আড়ম্বর, উচ্ছ্বাস এবং কুটিল জটিল আবিল ও ফেনিল আবর্ত তেমন পরিলক্ষিত হয় না, প্রত্যুত বাঙলার অন্তরের রস-মাধুর্যই তাঁহার সৃষ্টির মূলে সত্তাস্বরূপে মন-প্রাণকে প্রীতির স্নিগ্ধ ধারায় উজ্জীবিত করিয়া তোলে। এদেশের মানুষকে আপনার করিয়া দেয়। সে সৃষ্টি সর্বজনীন একটি সুগভীর সমবেদনা এবং দেশের সাধারণ নরনারীর প্রতি সাংস্কৃতিক একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগায়। সরোজকুমার উপদেষ্টার আসন হইতে দূরে থাকিয়া এদেশের নরনারীর অন্তর মাধুরী আস্বাদন করিতে চাহেন এবং দেশবাসীকেও সেই রস আস্বাদন করাইতে তিনি উৎসুক। ময়ূরাক্ষী, গৃহ-কপোতী এবং সোমলতা সরোজকুমারের এই তিনখানি উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে এই তিনখানি পৃথক্ উপন্যাস নয়। এই তিনখানা উপন্যাসের সংযোগধারা অভিন্ন এবং তিনখানা উপন্যাসের ভিতর দিয়াই বাঙলার অন্তরের গভীর সুরটি তিনি বাজাইয়া তুলিয়াছেন। রসধর্মের সমুত্তরণের বিচারে এই তিনখানি উপন্যাসই অপরিচ্ছিন্ন লাবণ্যে উদ্ভিন্ন হইয়াছে।

বাঙলার বাউল কেমন কাহারা? বাউল সাধনার দার্শনিক তত্ত্বের সম্বন্ধে আমরা অনেকে কিছু কিছু পরিচিত আছি। এদেশের মনীষিগণ ইঁহাদের জীবনের দার্শনিকতার সম্বন্ধে অনেকে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু দার্শনিকতাই জীবন নয়, সরোজকুমার তাঁহার "গৃহ কপোতী"তে বাউল সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবনের সঙ্গে গম্ভীরভাবে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। উদার আধ্যাত্মিকভাবসমূহ তাহারা নিজেদের জীবনে কেমন সহজভাবে সত্য করিয়া লইয়াছে, সেই আলেখ্য তিনি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টিতে আরোপ নাই, আছে সহজ যে সত্য, সেই রস-সমুজ্জ্বল বস্তুটি। সরোজকুমারের সৃষ্টিতে আমাদের বুদ্ধির পাকই শুধু খেলে না, পরন্তু বাউলের জীবন্ত রূপটি আমাদের চোখের কাছে খোলে। রসসৃষ্টির প্রাণধর্ম এই প্রত্যক্ষতার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বাউলের সাধনা রসের সাধনা। সে সাধনা প্রেমের। বাউল রূপ, রসকে অস্বীকার করে না, পক্ষান্তরে রসের সাগরে সে মজিয়া থাকিতে চায়, রূপ সাগরে মীনের মত সে ডুবিবার জন্যই আকুল। রসময়ের বাউলের আখড়ায় আমরা এই সাধনার জীবন্ত রূপটি প্রত্যক্ষ করি। কলহাস্যময়ী ললিতা রসময়ের সঙ্গিনী। সংসারের সব আবিলতার ঊর্ধ্বে শতদলের মত উল্লসিত এবং উজ্জ্বল তাহার শোভা। রাধারাণীর সে দাসী অভিমানিনী; তাই 'ঠাকরুণ' সম্বোধনে তাহার আপত্তি। চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় সুরে সুরে উভয়ের মধ্যে চলে উত্তর-প্রত্যুত্তর—সুমধুর সংলাপ। গানে গানে ভাবের আদান-প্রদান। রসময় পণ্ডিত নয়, কিন্তু একান্ত সহজভাবেই সত্যকে সে উপলব্ধি করিয়াছে এবং জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সে সমাধান করিয়া ফেলিয়াছে। তত্ত্ব না বুঝিলেও সে সত্যে মজিয়াছে। তাই তাহার মুখে আমরা শুনি—'নারী আমার কাছে শুধু সাধনার উপকরণ। ওরা প্রকৃতির অংশ। ওদের না হ'লে পুরুষ সম্পূর্ণ হয় না। কথা হচ্ছে, ওরা নিজে বাঁধা না পড়লে, গায়ের জোরে বাঁধবার তো উপায় নেই। আবার কি জানেন? ওদের পাপ নেই। মা গঙ্গার জলের মতো আপনা থেকেই পবিত্র। শুধু পুরুষকে উদ্ধার করার জন্যেই ওদের পৃথিবীতে আসা। মা গঙ্গার মতো। একেই বলে লীলা।"

রসময় চৈতন্য চরিতামৃত প্রত্যহ পাঠ করে। সংস্কৃত সে জানে না। ব্যাকরণ বা অলঙ্কার শাস্ত্র নিশ্চয়ই তাহার পড়া নাই, কিন্তু মানুষের পরম মহত্ত্বকে সে অন্তরে একান্ত-ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে। তাই তাহার মুখে আমরা শুনি এমন কথা—"ভালোবাসা? রসময় ভিজ কেটে বললে, ভালোবাসব ভগবানকে। আর সবই সেই ভালবাসার উপকরণ।" তবে কি মানুষকে ভালবাসিতে নাই? "রসময় সহজভাবেই বললে, আমরা উদাসীন বাউল। আমাদের একমাত্র ভালো-বাসার বস্তু রাধামাধব।"

স্ত্রী পুত্র পরিজন? বন্ধুবান্ধব? আত্মীয়স্বজন? এসব মায়া নাকি?

রসময় এমন প্রশ্ন শুনিয়া জিভ কাটে, বলে, ""মায়া? আমরা তো মায়াবাদী নই বাবু-মশায়! ওড়াব কেন? সব থাকবে। সবই যে আমার রাধামাধবের পুজোর উপকরণ।"

স্বামী গৃহ-পরিত্যক্তা বিনোদিনী উপন্যাসখানির কেন্দ্রস্বরূপিনী। এ দেশের নারীর আদর্শকে অবস্থা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া এই নারী চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার বিচিত্রভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। কলঙ্ক? হোক্ না তাহা মিথ্যা। পুরুষের সাতখুন মাপ। কিন্তু নারীর কলঙ্কের কথা যদি একবার ছড়ায়, তবে তাহার স্থান কোথায়? কিন্তু নারী শক্তিস্বরূপিনী। বিনোদিনী নারীর মর্যাদায় উদ্দৃপ্তা—সে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। জমিদারের নায়েব কাম-কুক্কুর তাহার তেজের কাছে ভীত, সঙ্কুচিত। বিনোদিনীকে রসময় বাউলের আখড়া ছাড়িয়া আবার নিরুদ্দিষ্টের অভিসারে বাহির হইতে হইল! সে চলিল কোথায়? বোষ্টমের ভাষায়, সে নারী। মা গঙ্গা সে। পৃথিবীতে দেবীর অবতরণ। দাশু রায় এই দেবীরই বন্দনা গান করিয়াছেন—"জীবে দেখি দুরাশয়, নাশিবারে ভব ভয়, অবনী আইলা সুরেশ্বরী!"

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি—আলডুস হাকসলে। অনুবাদক—শৈলেশকুমার বন্দো-পাধ্যায়। মনীষা প্রকাশন, জামসেদপুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস ভবন, সাকচী, জামসেদপুর। মূল্য—২্। ৫১২।৫:

নীল শৃগাল—সুনীলচন্দ্র দাস। চিত্রা দ[illegible] কর্তৃক ৬, কংগ্রেস এক্জিবিশন রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৵০ আনা ৫১৩।৫:

হে মোর মানসী প্রিয়া—প্রবোধ সরকার। বাণীপীঠ গ্রন্থালয়, ৩৯।১, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা। মূল্য—২৷০। ৫১৪।৫

মিলন গোধূলি—প্রবোধ সরকার। বাণী পীঠ গ্রন্থালয়, ৩৯।১, রামতনু বোস লেন কলিকাতা। মূল্য—২৷০। ৫১৫।৫

চাঁদ ও চুমা—শ্রীসরলা বসু রায়। কথা সাহিত্য মন্দির, ১৬।এ, ডাফ স্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য—১৷০। ৫১৬।৫

প্রসাদের গল্প—শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত কথা-সাহিত্য মন্দির, ১৬।এ, ডাফ স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য—১।০। ৫১৭।৫

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বেঙ্গল পাবলি শার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিতঃ—

অপরাজিতা—নীলিমা দেবী। মূল্য—[illegible] ৫১৮।[illegible]

দক্ষিণ ভারতে—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য মূল্য—২৷০। ৫১৯।[illegible]

গোধূলি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। মূল্য—২[illegible] ৫২০।

সঙ্গিনী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। মূল্য—২[illegible] ৫২১।

শাখা-প্রশাখা—১ম ও ২য় খণ্ড—কানাই লাল ঘোষ। কানাইলাল ঘোষ কর্তৃক ১৩ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—২৷০, ২য় খণ্ড ৩৷০। ৫২২, ৫২৩

ট্রামে-বাসে

প শ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, ভাত তিক্ত হইলেও তা ...য় বলিয়া গণ্য হয় না। বিশ্বখুড়ো ...লন—"কথাটি হয়ত সত্যি, আয়ু-মতে তেতো হলো রুচিবর্ধক ও

...শক। তেতো অন্ন খেয়ে সত্যি ...ত পাচ্ছি অনেকেরই এখন আর ...র' বালাই নেই!!"

* * *

...দ্যমন্ত্রী মহাশয় একটি বড় সত্য কথা বলিয়াছেন। যে-কথাটা ...ন মনে মনে ছিল তাহাই সোজা বলিয়াছেন যে সাত আনা দরে এর ভাল চাউল পাওয়া যায় না। খুড়ো গল্প শুনাইলেন।—"কোন এক ...ংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদের চূণকামের ইংরেজী লিখেছিল work, গৃহশিক্ষক কথাটা শুদ্ধ দেননি। অভিভাবক ছেলের খাতা এই ভুল ইংরেজী কেন শুদ্ধ করে হয়নি জিজ্ঞেস করায় গৃহশিক্ষক মশাই, পাঁচ টাকা মাইনেতে ...াইনে ছিল মাসিক পাঁচ টাকা মাত্র) wash হয় না, Lime workই — —সুতরাং সাত আনা দরে ...ণি না হ'য়ে কি আর চামরমণি

* * *

...থাকী মা বাসি লুচি সম্বল করিয়া পরলোকে প্রয়াণ ...ন, ধনলক্ষ্মীর হাঁড়ি হাটে গিয়াছে। অতঃপর হায়দ্রাবাদে ...র আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি ...সর যাবৎ আহারাদি করেন না। সঙ্গে কথা বলেন না, প্রয়োজন ...শ্নের জবাব শেলটে লিখিয়া দেন। ...র অনুরাগীরা তাঁকে "যোগিনী" ...য়াছেন। — — — 'আমরা বামে কথাটা শুনেছি, অনুরাগীরা

এ সম্বন্ধে সতর্ক না হ'লে মাণিকমাও হয়ত ধোপে টি'কবেন না"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আ দমসুমারিতে জানা গেল, পুরুষের আয়ুষ্কাল পূর্বাপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হইয়াছে এবং তার ফলে বিধবার সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।—"এবং তার ফলে মাছের দর আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

প শ্চিমবঙ্গের রঙ্গমঞ্চকে আবার প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলার জন্য একটি "কেন্দ্রীয় জাতীয় নাট্যশালা" নির্মাণের পরিকল্পনা চলিতেছে।

প্রারম্ভিক আলোচনাসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"পশ্চিম-বঙ্গের বিধান-সভার রঙ্গমঞ্চের টেকনিক্ অনুসরণ করতে পারলে বেশ জম-জমাট থেটার হবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস"—বলেন বিশ্বখুড়ো।

* * *

ল র্ড সুইনটন্ মন্তব্য করিয়াছেন যে, পৃথিবী ভারতের কাছে ঋণী।—"কিন্তু ওয়াসিলের খাতায় (গান্ধীজীর ভাষায়) সবই Post-dated cheque"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

প শ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জনসেবার জন্য যুবকদের আহ্বান জানাইয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে সমস্ত কংগ্রেসীদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকার যুবকদের নাম প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। বিশ্বখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"যুবকদের মধ্যে কে কে নাম পাঠিয়েছেন তা এখনো জানা যায় নি, তবে তালিকার প্রথমদিকে শ্রীযুক্ত বিধান-চন্দ্র রায়, যাদবেন্দ্র পাঁজা, পান্নালাল বসু, হেমচন্দ্র নস্কর প্রভৃতি কয়েকজনের নামই এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে"!!

* * *

এ কটি সংবাদে প্রকাশ যে, হাতীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে বলিয়া সিংহল সরকার কৃত্রিম উপায়ে হস্তী প্রজননের ব্যবস্থা করিতেছেন।—"ভারতে হাতীপোষা খরচের বহর দেখে আমরা তো এরকম একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারিনে"—মতন্ব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

EMPLOYMENT Exchange-এর পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, না, রাজ্য সরকারের এই নিয়া কেন্দ্রীয় সংবিধানে একটি বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। খুড়ো সংক্ষেপে বলিলেন—"অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন, এ দায়িত্ব ভাগের মা অর্থাৎ বেকারদের নিজের"।

* * *

পা কিস্তানে আমেরিকার সামরিক ঘাটি নির্মাণ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সোবিয়েৎ কাগজ "ইজ্‌ভেস্তিয়া" মন্তব্য করিয়াছেন যে, নানাদিক হইতেই

পাকিস্তান আমেরিকাকে প্রলুব্ধ করিতেছে।—"বুড়ো শামু চাচা কী আর করবে,—একে ঐ সুর্মা আঁকা চাউনি বাঁকা, তায় ডাগর আঁখি"—শ্যামলাল গান ধরিয়া ফেলিল।

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

সংগীত নাটক একাডেমীর প্রয়াস

ভারতের সাধারাণ লোকের জীবনকে নৃত্য, সংগীত, নাটকের রসে মাতিয়ে তোলার বেশ একটা সাড়া পড়ে গিয়েছে রাজ্যে রাজ্যে। নানা অবস্থার চাপে পড়ে এদেশের লোকে আমোদ জিনিসটা প্রায় ভুলতেই বসেছিল। লোকের আত্মার ভাববিকাশের সত্যিকারের মাধ্যমগুলি, যাদের উদ্ভব দেশের মাটি ও জল বায়ুর সার সংযোগে, সেইসব দেশেরই নিজস্ব প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠা নাচ, গান, অভিনয়াদির চর্চা ও প্রদর্শনী অতীতের কোঠাতেই বিলীন হতে বসেছিল। লোককে আমোদ সরবরাহের যা কিছু ভার দখল করে রাখছিল সিনেমার ছবি—একটা কৃত্রিম জিনিস যা উপভোগ করা যায় কিন্তু তার মধ্যে আত্মাকে বিলিয়ে দেওয়া যায় না। এ দোষটা চলচ্চিত্রের কৃত্রিমতার জন্য নয়; চলচ্চিত্রের প্রকাশটা এতো যান্ত্রিক যে, সে পথ মানুষের প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি ও প্রেরণা বিকাশের সাবলীল পথ নয়। বিকাশের এই সাবলীলতা থেকেই উৎসৃত হয়েছে লোক-সংগীত, লোক-নৃত্য ও লোক-নাট্য ইত্যাদি। এর মধ্যেই পাওয়া যায় মানুষের প্রাণের স্পর্শ, এর মধ্যে দিয়েই মানুষ সত্যিকারের স্ফূর্তি পায়। এই স্ফূর্তিরই অভাব পড়ে গিয়েছিল অনেকদিন ধরে; একটার পর একটা রাজনীতিক ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ধাক্কায় তলিয়ে যেতে বসেছিল। হয়তো তলিয়েই যেতো যদি কোন কোন লোকের খেয়ালটা এবিষয়ে সজাগ হয়ে না উঠতো। এমনি কতকগুলি সজাগ মন দেশের ঐসব স্বতঃস্ফূর্ত উপাদানগুলিকে হৃতপ্রায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আবার সতেজ করে তোলার চেষ্টা করাতেই দিল্লীতে সরকারী উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংগীত নাটক একাডেমী। 'একাডেমী' কথাটায় অবশ্য কেমন একটা বিজাতীয় দ্যুতি রয়েছে—একেবারে এদেশেরই একান্তভাবে যা নিজস্ব সেইসব উপাদানের প্রচলন উৎসাহিত করার মুখেতেই একটা বিজাতীয় শব্দ লাগিয়ে নেওয়াটা বিসদৃশ এবং এনিয়ে আপত্তিও উঠেছে। যাই হোক, সেকথাটা এখানে বিবেচ্য নয়, এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠাটাই হচ্ছে বড়ো কথা এবং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে-আয়োজনের বিবরণই হচ্ছে এখানে জ্ঞাতব্য বিষয়।

*　　*　　*　　*

এই বছরেরই জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে নিউ দিল্লীতে এবং এরই মধ্যে কাজের মতো কাজ যে এর কর্তৃপক্ষ করে যাচ্ছেন সে খবর কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি একাডেমীর সভাপতি শ্রী পি ডি রাজমান্যার সমগ্র দেশের রসপিপাসু লোককে ও সর্বশ্রেণীর প্রমোদশিল্পীদের উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হবার মতো একটি খবর পরিবেশন করেছেন।

।মী বছরের মার্চ মাসে সংগীত, নৃত্য র একটি বিরাট উৎসব অনুষ্ঠানের র্তিনি জানিয়েছেন। ভারতীয় কলা ন্দ্রর ব্যবস্থাপনায় যে সংগীতোৎসব ষ্ঠিত হবে তাতে ভারতে প্রচলিত সকল ও প্রকারের সংগীত পরিবেশন করার । হবে। আর, গত দু'বছর ধরে । প্রবীণ ও বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের 'পতির সনদ প্রদানের যে প্রথা শিক্ষা াগ কর্তৃক প্রবর্তিত ছিল, ১৯৫৪ থেকে তার ভার পড়বে সংগীত নাটক ডেমীর হাতে; অবশ্য সনদ দেওয়া রাষ্ট্রপতিরই হাত দিয়ে। গণতন্ত্র স উপলক্ষে আগামী বছরের ২৬শে ২৭শে জানুয়ারী দিল্লীতে লোক- ত্যর একটি উৎসবেরও উদ্যোগ হচ্ছে ডেমীর পক্ষ থেকেই। যোগদানকারী ১ নাচিয়ে দলকে পুরস্কার দেওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবেও কৃতী নাচিয়েদের স্কৃত করা হবে। তা ছাড়াও আগামী রর গোড়াতেই বম্বে অথবা মাদ্রাজে টি নৃত্যোৎসব এবং কলকাতায় একটি ৎসব অনুষ্ঠানেরও পরিকল্পনায় ডেমী হাত দিয়েছেন। ভারতের সব রেই নাটক এই উৎসবে অভিনীত র সুযোগ পাবে। বাঙলার নাট্য- কদের একটা মস্ত সুযোগ আসছে র কৃতিত্ব দেখাবার। ভারতের সমস্ত ার নাট্যাভিনয়ের চেয়ে যে বাঙলা াখানি এগিয়ে রয়েছে তা সবারের খর সামনে তুলে ধরবার এমন সুযোগ কোনদিন আসেনি। বাঙলার পেশা- অপেশাদার নাট্যকার ও শিল্পীদের জন্যে এখন থেকেই তৈরী হতে হবে। চমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট একটি কেন্দ্রীয় ীয় নাট্যালয় পরিকল্পনার কথা প্রকাশ ছেন; তা নিয়ে কাজও আরম্ভ হয়েছে, তু সে ভরসায় না থেকে নাট্যাভিনয় সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের ক সচেষ্ট হলেই ভালো; যেনো লার এই নিজস্ব গৌরব আরও বড়ো ক্ষ প্রচারিত হতে পারে। শ্রেষ্ঠ নাট্য- বেশনের জন্য একাডেমী যে সনদ ও স্কার দেওয়া ঠিক করেছেন সেটা যেন লা নাটকই পায়। একাডেমীর সভা- ঃ শ্রীরাজমান্যার আরও জানিয়েছেন যে, ডেমী জাতীয় নাট্যশালা গঠনে উৎ- সাহিত করার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবার জন্য অনুরোধ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা হয়েছে তা এই তহবীল থেকে টাকা পাবার আশাতেই হয়তো।

* * * *

এছাড়া প্রতিষ্ঠা হওয়া থেকে এপর্যন্ত একাডেমী যে সমস্ত কাজ করেছে তারও একটি তালিকা শ্রীরাজমান্যার প্রকাশ করেছেন। গত গণতন্ত্র দিবসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত লোকনৃত্য উৎসবের দরুণ যে টাকা পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিত নেহরু তা থেকে বেশ একটা মোটা অঙ্ক একা- ডেমীর হাতে দিয়েছেন মণিপুরে নাচের একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। এই শিক্ষালয়ে মণিপুরী নাচ শেখানো অবশ্যই হবে তবে বেশী নজর দেওয়া হবে মণিপুরের উপজাতিদের নৃত্যগুলির ওপরে। ১৯৪৭ সাল থেকে এবছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্মিত ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি- খানিকে পুরস্কৃত করার কথা ঠিক হয়েছে। দেশের বড়ো বড়ো ওস্তাদদের সংগীত সংরক্ষণের জন্যও একাডেমী সচেষ্ট হয়েছে। এপর্যন্ত বিশিষ্ট সংগীতের প্রায় দুশোখানি রেকর্ড তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে কতকগুলি হচ্ছে ইমদাদ খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, গহরজান, আবদুল করিম খাঁ ও মালকাজানের পুরনো রেকর্ডের পুনর্মুদ্রন—যেগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য। অন্যান্য রেকর্ডের মধ্যে নতুন তোলা হয়েছে ভুপালের রাজবলী খাঁ ও কর্ণাটকের করাইকুড়ি সম্বশিবমের সংগীত যে দু'জন ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রপতির সনদ লাভ করেছেন। এ ছাড়া মাদ্রাজের বিচার- পতি টি এল ভেংকটরাম আয়ার কর্তৃক গীত বিখ্যাত সুরকার দীক্ষিতারের রচনা, শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ গীত 'হরি কথা কালক্ষেপম', মহীশূরের বেহালাবাদক চৌদিয়ার বাজনা ইত্যাদির বিশেষ রেকর্ড করে নেওয়া হয়েছে। মণিপুরের রাস- সংগীতও একাডেমী করে রেখেছে. আগে কখনও এ রেকর্ড হয়নি। এই সমস্ত রেকর্ড নিয়ে একাডেমীর মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। ভারতের সাংগীতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের আর একটি ব্যবস্থাও একাডেমী থেকে করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রাচীন স্বরলিপি বা সংগীত বিষয়ক রচনাদি আছে তারা যাতে সেগুলি মূল ভাষায় এবং ইংরাজীতে ছাপিয়ে প্রকাশ করতে পারেন তার জন্য আর্থিক সাহায্য দান। এ পর্যন্ত এই ধরণের যে প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য পাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে বরোদা বিশ্ব- বিদ্যালয় লাইব্রেরী, মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরী ও বিহার একাডেমী লাইব্রেরী।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট দল দিল্লীর প্রথম টেস্ট ম্যাচে রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১৫ রানে পরাজিত করিয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই সাফল্য আনন্দদায়ক ও প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে অপ্রত্যাশিত নহে। রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল যে বিশেষ শক্তিশালী নহে তাহা পুণার খেলাতেই প্রমাণিত হয়। ঐ খেলায় ভারতীয় একাদশ কতকগুলি তরুণ খেলোয়াড়-দের লইয়াই গঠিত হইয়াছিল। বহু কৃতি খেলোয়াড় উহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। শীঘ্রই বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হইবে। ঐ খেলায় ভারতীয় দলকে সমর্থন করিবার জন্য যে সকল খেলোয়াড় মনোনীত করা হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, পুনরায় রজত জয়ন্তী দলকে শোচনীয় পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য রীতিমত লড়াই করিতে হইবে। পরাজয় একরূপ অবশ্যম্ভাবী—খেলা যদি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়, রজত জয়ন্তী দলের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইবে।

কণ্ট্রোল বোর্ডের চিন্তার কারণ

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের বিশেষ উৎসাহের কারণ হইলেও ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকদের চিন্তিত করিয়াছে। এই দলের ভ্রমণ-ব্যবস্থা করিবার জন্য কণ্ট্রোল বোর্ডকে বহু সহস্র মুদ্রার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দল একের পর এক খেলায় পরাজয় বরণ করিলে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ এই দলের খেলা দেখিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবে না। ফলে হইবে এই যে, বহু স্থানেই দলের খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও সংগৃহীত হইবে না। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে এইরূপ অবস্থা যে দাঁড়াইবে ইহা আর কেহ উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমরা পারিয়াছিলাম ও সেইজন্যই কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণকে আরও কয়েকজন কৃতি বৈদেশিক ক্রিকেট খেলোয়াড় আমদানী করিবার জন্য অনুরোধ করি। আমাদের সেই সাবধানবাণী পরিচালকদের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা মনে করেন, সিম্পসনের দলে যোগদান করাতেই যথেষ্ট হইয়াছে। সেই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্তিমূলক তাহা দিল্লীর টেস্ট ম্যাচেই প্রমাণিত হইল। ইহার পর পরিচালকগণ কি করেন তাহাই দেখিবার ও জানিবার বিষয়।

(এম)

গোলাম আমেদ ও গুপ্তের কৃতিত্ব

দিল্লীর প্রথম টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের সাফল্যে গোলাম আমেদ ও এস পি গুপ্তের বোলিংই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। একরূপ ইঁহাদের মারাত্মক বোলিংই রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের শোচনীয় পতন সম্ভব করে। রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের কৃতি ও খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানগণ একের পর এক মাঠে অবতীর্ণ হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন। এই খেলোয়াড়-দের আগমন ও প্রত্যাবর্তন-দৃশ্য এই খেলার মাঠে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা দীর্ঘদিন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। গোলাম আমেদ উভয় ইনিংসে মোট ৮টি উইকেট ও এস পি গুপ্তে মোট ১২টি উইকেট দখল করিয়াছেন। টেস্ট পর্যায়ের খেলায় গোলাম আমেদ ও এস পি গুপ্তেকে এইরূপ সাফল্য লাভ করিতে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। পরবর্তী সকল টেস্ট খেলায় ইঁহারা এইরূপ সাফল্যলাভ করুন ইহাই আন্তরিক কামনা।

রামচাঁদের ব্যাটিং সাফল্য

ভারতীয় দলের সাফল্যে জি এস রামচাঁদের ব্যাটিংও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। দলের পতন মুখে দৃঢ়তার সহিত ব্যাটিং করিয়া ইনি যেভাবে নিজস্ব শত রান পূর্ণ করেন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইহার পরেই মাঞ্জরেকারের ব্যাটিংয়ের উল্লেখ করা উচিত। অতি অল্পের জন্যই মাঞ্জরেকার শতরান পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভারতীয় ক্রিকেট দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করেন। মাত্র ৭ রান হইলে পি রায় আউট হন, ইহাতে ভারতীয় দলের সমর্থকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়। মাঞ্জরেকার আপ্তের সহিত খেলিয়া অবস্থা পরিবর্তন করেন। ১১০ রান হইলে আপ্তে আউট হন। হাজারে খেলায় যোগদান করেন। সকলেই আশা করিতে থাকেন হাজারে পূর্বের খেলার পুনরাবৃত্তি করিবেন। ১৪৭ রানে মাঞ্জরেকার ও ১৪৮ রানে হাজারে বিদায় গ্রহণ করিলে ভারতীয় দলের বিপর্যয়ের সূচনা হয়। ঠিক এই সময় উম্রিগার ও রামচাঁদ একত্রে খেলিতে আরম্ভ করেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ২১৪ রান হয়। রামচাঁদ ৪৩ রান ও উম্রিগার ২৪ রান করিয়া নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিনের চা-পানের ২০ মিনিট পূর্বে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৮৭ রানে শেষ হয়। রামচাঁদ ১১৯ রান করিয়া আউট হন। ইনি ২৬৫ মিনিট খেলিয়া ১২টি বাউণ্ডারী ও ২টি ওভার বাউণ্ডারী সহ উক্ত রান করিতে সক্ষম হন। পরে রজত জয়ন্তী দল খেলিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে কোন উইকেট না হারাইয়া ৪২ রান করেন। সিম্পসন ২৭ রান ও মার্শাল ৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনে রজত জয়ন্তী দলের খেলোয়াড়গণ সূচনায় ভাল ব্যাটিং করিলেও মধ্যাহ্ন ভোজের পর হইতেই সুবিধা করিতে পারে না। মাত্র ৪ ঘণ্টার খেলায় রজত জয়ন্তী দলের প্রথম ইনিংস ১৯৮ রানে শেষ হয়। এস পি গুপ্তে একাই ৯১ রানে ৮টি উইকেট দখল করেন। রজত জয়ন্তী দল ১৮৯ রান পশ্চাতে পড়ায় "ফলো অন" করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে পারে না। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটে ৮৭ রান করেন। গোলাম আমেদ ১৮ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন।

চতুর্থ দিনে মাত্র আড়াই ঘণ্টার খেলার পর রজত জয়ন্তী দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৪ রানে শেষ হয়। গোলাম আমেদ ৫২ রানে ৬টি ও এস পি গুপ্তে ৮২ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল খেলায় এক ইনিংস ও ১৫ রানে বিজয়ী হন। খেলার ফলাফল:—

ভারত ১ম ইনিংস:—৩৮৭ রান (জি এস রামচাঁদ ১১৯, মাঞ্জরেকার ৪৬, উম্রিগর ৪৭, এম আপ্তে ৩০, গোপীনাথ ২৩, ফ্রাঙ্ক ওরেল ৬৫ রানে ৪টি, আর বেরী ৯০ রানে ৫টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী দল ১ম ইনিংস:—১৯৮ রান (সিম্পসন ৫৭, মার্শাল ৩৫, ওরেল ২৬, মিউলম্যান ২৪, এস পি গুপ্তে ৯১ রানে ৮টি ও গোলাম আমেদ ৪০ রানে ২টি উইকেন পান।)

রজত জয়ন্তী দল ২য় ইনিংসঃ—১৭৪ সিম্পসন ৫৯, ওরেল ৫৪, মিউলম্যান গালাম আমেদ ৫২ রানে ৬টি, এস পি ৮২ রানে ৪টি উইকেট পান।)

ভারতীয় দ্বিতীয় টেস্ট দল

আগামী ৩রা ডিসেবর হইতে বোম্বাইতে ও রজত জয়ন্তী দলের দ্বিতীয় ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ হইবে। এই খেলায় য় দলের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য াথিত খেলোয়াড়দের মনোনীত করা হঃ—

। আর উমরিগার (অধিনায়ক), বিজয় ', বিনু মানকড়, ভি এল মাঞ্জরেকার, া রামচাঁদ, সি ডি গোপীনাথ, এস পি এন এন তামানে, জি আর সুন্দরাম, প্যাটেল, সি ভি গাদকারী।

দেশঃ—ডি কে গাইকোয়াড়।

তিরিক্তঃ—কে এস শ্রীনিবাশম, অনিল ী ও সি জি বোড়ে।

রতীয় প্রথম টেস্ট দলে যে সকল াড় যোগদান করেন তাঁহাদের মধ্যে া, এম এল আপ্তে, অর্জুন নাইডু ও আমেদকে দ্বিতীয় টেস্ট দলে স্থান হয় নাই। অর্জুন নাইডু অথবা এম প্তেকে দলভুক্ত না করার যথেষ্ট কারণ কিন্তু গোলাম আমেদের দলভুক্ত না কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ও পি রায়কে দলভুক্ত করা উচিত পি রায় প্রথম টেস্ট ম্যাচে যে বলে হইয়াছেন তাহাতে কিভাবে এল বি হইতে পারেন ইহা কেউই উপলব্ধি পারেন নাই। দুইজন ওপনিং ব্যাটস-দল হইতে বাদ দিয়া দুইজন নূতন ড়কে দলভুক্ত করিতে ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। এই বিষয় ক্রিকেট বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী নে আদর্শ সৃষ্টি করিলেন বলিলে করা হইবে। এই নির্বাচন দ্বিতীয় চের ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রিল।

ল সুটিং

ীর ঐতিহাসিক লাল কেল্লার প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়ান-তযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। গত পেক্ষা অর্ধেক সংখ্যক রাইফেল তিযোগিতায় যোগদান করিলেও বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে। গত বৎসর ঙ্গের প্রতিনিধিগণ স্মল বোর

রেড ক্রশ সোসাইটির উদ্যোগে রাজ-ভবনে অনুষ্ঠিত শিশুপ্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রীমান পার্থসারথী সেনগুপ্ত

রাইফেল চালনায় কি পুরুষ, কি মহিলা, কি জুনিয়ার সকল বিভাগেই সকল গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন—এইবারেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি-দের সৌরাষ্ট্র, বোম্বাই ও সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিদের সহিত রীতিমত লড়িতে হইবে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল রাজ্যের কয়েকজন তরুণ রাইফেল চালক পূর্ব বৎসর অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। আধুনিকতম কৌশল শিক্ষার বিষয়েও ইহাদের বিশেষ উৎসাহ আছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিগণ স্মল বোর রাইফেল চালনায় ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া অবস্থান করিবে বলিয়া যাঁহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের শীঘ্রই উহা পরিবর্তন করিতে হইবে যদি না পশ্চিম বাঙলার উৎসাহী পুরুষ ও মহিলা রাইফেল চালনায় ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে করেন। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের রাইফেল পরিচালকগণ এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

আন্তর্জাতিক ডেওয়ার প্রতিযোগিতা

ভারতীয় রাইফেল চালকগণ সর্ব... ন্যাশনাল স্মল বোর এসোসিয়েশন অফ ইংলণ্ডের পরিচালিত আন্তর্জাতিক ডেওয়ার প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল যে সাফল্য লাভ করিবেন না এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম, তবে যেরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছে ইহা অপ্রত্যাশিত না বলিয়া পারা যায় না। ভারতীয় দল মোট ৮০০০ পয়েণ্টের মধ্যে মাত্র ৭৬৩৩ পয়েণ্ট সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আরও অধিক পয়েণ্ট পাওয়া উচিত ছিল। কেবল সম্ভব হয় নাই ন্যাশনাল রাইফেল এসোসিয়েশনের নির্বুদ্ধিতার জন্য। প্রতিযোগিতা ঠিক কি অথবা কিভাবে ইহা পরিচালিত হইবে তাহা ভারতের কোন রাইফেল চালকই শেষ দিনের অনুষ্ঠানের পূর্বে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন ন্যাশনাল রাইফেল এসোসিয়েশন ঘোষণা করেন যে, ভারত ডেওয়ার ট্রফি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। ঐ প্রতিযোগিতায় ক্যানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্থান প্রভৃতি যোগদান করিয়াছে। ইহার পরই এক মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে ঘোষণা করেন ট্রায়াল হইবে। অনুশীলন করিবার সুযোগ না পাইয়া ট্রায়ালের ফলাফল ভাল হইল না, ইহার পর দল নির্বাচিত হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও ঠিকভাবে অনুশীলন করিবার সুযোগ দান করা হইল না। ফলেই ভারত প্রতিযোগিতায় আশানুরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিতে পারে নাই। যোগদানকারী রাইফেল চালকগণ গড়পড়তায় ১৮·৩৫ পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছেন। অথচ আমেরিকা প্রতিযোগিতায় মোট ১৮ পয়েণ্ট নষ্ট করিয়াছে অর্থাৎ মোট ৭৯৮২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়াছে। ভারতকে ঐ স্তরে উপনীত হইতে হইলে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

সন্তরণ

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙলার সন্তরণ স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান যে খুবই নিম্ন-স্তরের হইয়া পড়িয়াছে তাহা এইবারের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সন্তরণ চ্যাম্পিয়ানশিপের ফলাফল হইতেই উপলব্ধি করা যায়। ইহার প্রতিকারের জন্য এখন হইতেই যদি সন্তরণ পরিচালকগণ স্ট্যাণ্ডার্ড বা মান উন্নতর করিবার জন্য সচেষ্ট না হন তাহা হইলে আশঙ্কা হয় আগামী এশিয়ান গেমসে ভারতীয় সাঁতারু দলে কোন বাঙলার সাঁতারুই স্থান লাভ করিবেন না। ইহা ...ন্ত দুঃখের বিষয়।

দেশী সংবাদ

১৬ই নবেম্বর—অদ্য লোকসভার শীত-কালীন অধিবেশন আরম্ভ হয়। অদ্যকার অধি-বেশনে অর্থদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ পুনর্বাসন অর্থসংস্থা (সংশোধন) বিল আলোচনার্থ উত্থাপন করেন। উদ্বাস্তুদের স্বার্থের পক্ষে এই বিলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পিকিং-এ ভারত ও চীনের প্রতিনিধিদের প্রস্তাবিত বৈঠক অনুষ্ঠানের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শের জন্য চীনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, সিকিমস্থ ভারতীয় রাজনৈতিক অফিসার ও তিব্বতস্থ কতিপয় ভারতীয় অফিসারকে নয়াদিল্লীতে আসিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৭ই নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জমিদারী উচ্ছেদ বিল সম্পর্কে দফাওয়ারী আলোচনাকালে সরকার পক্ষের এক সংশোধন প্রস্তাবক্রমে স্থির হয় যে, ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখের (১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি) মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সকল জমিদারী সরকারের আয়ত্তে আনীত হইবে।

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে উপমন্ত্রী শ্রী এম ভি কৃষ্ণাপ্পা জানান যে, পরবর্তী বৎসরে ভারতে ঘাটতি রাজ্যগুলিতে চাউলের চাহিদা হইবে প্রায় ১১ লক্ষ টন এবং উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি হইতে সংগৃহীত চাউলের পরিমাণ হইবে ১২ লক্ষ টন।

ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক বোম্বাইয়ের 'ফ্রী প্রেস জার্নাল'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী এস সদানন্দ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

কিষণগঞ্জে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ইসলামপুর রোম্যান ক্যাথলিক মিশনের অধ্যক্ষ রেভাঃ ইডো লাকেরলা নামক মাল্টার জনৈক মিশনারী এবং তাঁহার শিষ্য বলিয়া বর্ণিত পাইকু নামক এক ভারতীয় খৃষ্টানের বিরুদ্ধে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ৬ জন হিন্দু হরিজন বালকের শিখা কর্তন এবং মহাত্মা গান্ধী ও ভগবান শংকরের প্রতিকৃতি ভস্মীভূত করার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

১৮ই নবেম্বর—কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠবর্তী কল্যাণীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম অধিবেশন উপলক্ষে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হইতেছে। অনুমান তিন চার লক্ষ টাকা এই প্রদর্শনীর জন্য ব্যয় করা হইবে। আগামী ১৬ই জানুয়ারী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে।

আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, শিক্ষিতদের মধ্যে

সাপ্তাহিক সংবাদ

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ১৮টি রাজ্য তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের তদন্তকারী কর্মচারিগণ গত রাত্রে 'বিদেশের ছাপযুক্ত' প্রায় ৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা মূল্যের চার সহস্র তোলা স্বর্ণ আটক করেন। মধ্য বোম্বাইয়ের একটি মোটরে করিয়া এই স্বর্ণ পাচার করা হইতেছিল।

১৯শে নবেম্বর—উত্তর কলিকাতায় নিম-তলা শ্মশানঘাটে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাধিভূমি ভাঙিয়া পড়িবার আশংকা দেখা দিয়াছে। উক্ত চিতাস্থলের গংগাতীরবর্তী প্রাচীর গাত্রে একটি ৬ ইঞ্চি ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে।

২০শে নবেম্বর—গংগার স্রোতের প্রবল আক্রমণে বেলুড় মঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইয়াছে। বাঁধান ঘাটটি ইতো-মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে গংগাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রায় ১০০০ ফুট দীর্ঘ রক্ষা-প্রাচীরটির উত্তরাংশের কিছুস্থান ভাঙিয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণাংশের কয়েক স্থানেও ফাটল ধরিয়াছে। ফলে স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বাসভবন, স্বামীজীর মন্দির এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্যদের সমাধি-ক্ষেত্রটিও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, আবর পাহাড়ের তাগিন এলাকায় যে সশস্ত্র বাহিনী অগ্রসর হইতেছে তাহাদের প্রতিরোধ করিবার জন্য তাগিনরা সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২১শে নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় এক জরুরী প্রশ্নের উত্তরে খণ্ডজাতিদের সম্পর্কে সরকারী নীতি বিশ্লেষণ প্রসংগে বলেন যে, ২২শে অক্টোবর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর সুবর্ণশ্রী জেলায় ডফলাগণ কর্তৃক সরকারী দলের প্রায় ৪০ জন লোক নিহত হইয়াছে। খণ্ডজাতির লোকেরা অবশিষ্ট ৬০।৭০ জনকে আটক করিয়াছে। এপর্যন্ত তাহাদের মধ্যে ছয়জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নোনা ঝিল উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নেদারল্যাণ্ডের একটি ইঞ্জিনীয়ারি প্রতিষ্ঠানের উপর পরিকল্পনা প্রস্তুতের ভা অর্পণ করিয়াছেন।

২২শে নবেম্বর—অদ্য লোকসভার দক্ষিণ পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র এবং নবদ্বীপ কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভোট গৃহীত হয়। ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে দক্ষিণ পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্রে এবং পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের পরলোকগমনে নবদ্বীপ কেন্দ্রে লোকসভার শূন্য আসন দুইটি পূরণে জন্য এই উপনির্বাচন হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই নবেম্বর—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে ঘরোয়াভাবে ভারতকে জানাইয়া দেও হইয়াছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় "স্বাধীন বিশ্বের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের সহিত সামরি সাহায্যচুক্তি সম্পাদনের বিষয় বিবেচনা করিতেছে।

১৮ই নবেম্বর—প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার অদ্য সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পাকি-স্থানের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন কোন কাজ নিশ্চয়ই করিবেন না, যাহাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে অশান্তি বা আতংক সৃষ্টি হইতে পারে।

গতকল্য ঢাকায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অবিলম্বে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া দিবার এবং পূর্ববঙ্গে পাকিস্থান কর্তৃক গৃহীত ১৯৩৫ সালের আইনের ৯২ ধারা প্রয়োগ ও এই প্রদেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই সভা আহূত হয়।

১৯শে নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ আঁদ্রে ভিসিনস্কি ঘোষণা করেন, রাষ্ট্রপুঞ্জে কম্যুনিস্ট চীনের যোগদান ব্যতীত অমীমাংসিত আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের মীমাংসার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

২১শে নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের ৬০টি জাতি লইয়া গঠিত বিশেষ কমিটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বৈষম্যমূলক নীতি পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়। চিলির মিঃ হার্নান সান্তা ক্রুজ তিনজন লইয়া গঠিত কমিশনের রিপোর্ট কমিটিতে দাখিল করেন।

২২শে নবেম্বর—আগামীকল্য রোমে রাষ্ট্র-পুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রকাশ্য অধি-বেশন আরম্ভ হইতেছে। এই অধিবেশনে পেশ করিবার জন্য যে রিপোর্ট প্রণীত হইয়াছে তাহাতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্বের অধিকাংশ লোক এখন পর্যন্ত যথোপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পাইতেছে না।

প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৫

দেশ

শনিবার
১৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬০

DESH

SATURDAY, 5TH DECEMBER, 1953.

…ক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

…ী বন্দোবস্তের অবসান

…চমবঙ্গ বিধান-সভায় জমিদারী …ন পাশ হইয়াছে। ইহাতে সুদীর্ঘ … বৎসরের অধিককাল লর্ড কর্ন- … যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের … করিয়াছিলেন, তাহার অবসান … এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর …করিয়াই জমিদারী-প্রথা প্রবর্তিত …রেজ এদেশে নিজের প্রভুত্ব পাকা … উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে নানাভাবে … অবস্থার মধ্যে ফেলে এবং …শলে নিজেদের মা-বাপগিরির …ড়াইয়া দেয়। দেশের জমিদার …কে তাঁহারা এই প্রয়োজন পূর্ণ … অভিপ্রায়েই গড়িয়া তুলিয়াছিল। …ভ্যাম্পায়ার বাদুরের মত পাখার … এদেশের জনসাধারণকে ঘুম … এদেশের শোষণ এবং …র্ব সমভাবে চালাইতে থাকে। …রা বাঙলা দেশে ভাল অনেক …করিয়াছেন, এই যুক্তি অবশ্য …র ভিত্তিহীন নয়; কিন্তু …রণ এবং এদেশের জনসাধারণ … প্রধানত যে কৃষক শ্রেণীকে … তাহাদের নিঃস্বত্ব এবং বঞ্চিত … সুযোগ লইয়া তাহাদের প্রতি … বা তাহাদের কল্যাণ-সাধনের …যে আভিজাত্য, তাহা আমরা … নিষ্ঠুর এবং মর্মান্তিক বলিয়াই …র। ডাঃ রায় এই বিলের সমর্থনে … কিছু আশা প্রকাশ করিয়াছেন। …মতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হইবার … মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ব্যবসা- …র দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং …র লাটদারেরাও আরাম-বিলাসের জীবন ছাড়িতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু কথায় আর কাজে অনেক তফাৎ আছে, সরকার হইতে নূতন নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন না করিলে জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের দ্বারাই রাতারাতি দেশের অবস্থা ফিরিয়া যাইবে না এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দশাও দূর হইবে না। প্রত্যুত, মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের খাজনা আদায়ের বর্তমান স্বত্ব বিলুপ্ত হইলেই যে বর্গাদারী বা কৃষিমজুরগণ অধিকতর মনোযোগ সহকারে জমির উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হইবে, এরূপ ধারণা ভুল। ফলত যাহারা নিজেরা জমি চাষ করে, তাহাদিগকে যদি জমির উপর অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলেই দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য জোতদার এবং লাটদারদিগকেও এই আইনের আওতার মধ্যে লইয়া ফেলিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্যে ইহাদিগকেও রায়ত বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু জোতদার ও লাটদারেরা একশত বিঘা জমি হাতে রাখিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গে একশত বিঘার অধিক জমি হাতে আছে, এরূপ জোতদার বা লাটদারের সংখ্যা নিতান্তই কম। ইহাদের হাত হইতে যে জমি পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা বর্গাদার বা কৃষি-মজুরদের দাবী পূরণ হইবে, এমন আশা করা যায় না। "স্থাণুচ্ছেদস্য হি কেদারং" অর্থাৎ যাহারা জমি চাষ করে, জমির অধিকারী তাহারাই; এদেশের প্রাচীন নীতি-শাস্ত্রের ইহাই বিধান। সরকারকে দৃঢ়তার সঙ্গে পুরাপুরি এই কাজটি সম্পন্ন করিতে হইবে। বর্তমান বিলটি পাশ হইয়া গেলেও সে পক্ষে অনেক অন্তরায় রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি ভূমি-সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য একটি পৃথক ভূমি সংস্কার আইন পাশ করাইয়া লইবেন। কিন্তু এই কাজটি অনতিবিলম্বে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন এবং তাহার উপরও নূতন নীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

উপনির্বাচনের শিক্ষা

দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচকমণ্ডলী হইতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারতীয় লোকসভার প্রতিনিধিত্ব স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে সদস্যরূপে দাঁড় করানো হয়। ডাঃ পাল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষী পুরুষ। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় খ্যাতিমান্ পুরুষকে পাইয়া কংগ্রেস নিশ্চয়ই এই নির্বাচনে জয়লাভ করিবে। কিন্তু উপনির্বাচনের ফলে কংগ্রেস পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রীযুত সাধনচন্দ্র গুপ্ত বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন। বস্তুত এই পরাজয়ের মূলে কংগ্রেস পক্ষের ত্রুটি বিশেষভাবে রহিয়াছে। তাঁহারা নিজেদের প্রতিনিধির আন্তর্জাতিক খ্যাতির ভরসা কংগ্রেসের ঐতিহ্যের গর্বেই বোধ

হয় নিশ্চিন্তমনে ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে উৎসাহ-উদ্যমের সঙ্গে প্রচারকার্য পরিচালিত হয় নাই। শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাল সুপরিচিত হইয়াও এবং অনুকূল অবস্থা পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। নির্বাচনের উদ্যমের প্রথম দিকেই তিনি নির্বাচক-মণ্ডলীতে অনুপস্থিত থাকেন। নির্বাচনের প্রাক্কালেও তিনি সাধারণভাবে জন-সাধারণের সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য মনে করেন নাই। শুধু কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে কিছু আলোচনা করিয়াই নিজের কর্তব্য শেষ করিলেন। গণ-তান্ত্রিক নীতি কিন্তু ইহা নয়। নির্বাচক-মণ্ডলীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ স্থাপন করিতে হয়, তাহাদের কাছে নিজের নীতি বুঝাইয়া বলিতে হয়। এইভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন বিশেষভাবেই আছে। গণতান্ত্রিক দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও নির্বাচনে দাঁড়াইয়া এই কর্তব্য প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ন্যায় সর্বজনপ্রিয় জননায়কও নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে দক্ষিণ কলিকাতার নির্বাচক-মণ্ডলী উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও কংগ্রেস পক্ষের এই সব শৈথিল্যের জন্য ভোটদানে প্রেরণা বোধ করেন নাই। জন-গণের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধিই গণতান্ত্রিক শাসন-নীতির ভিত্তি, দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচন কেন্দ্রের বিগত উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষ যথোচিতভাবে এই মর্যাদাবুদ্ধি প্রদর্শনে নিজেদিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত

গত ১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভারত সরকারের নিকট অনুরোধ জানাইবার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায় স্পষ্ট ভাষাতেই এই কথা প্রকাশ করেন যে, ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের কোন প্রয়োজন নাই, এমন কথা তিনি কখনও বলেন নাই; পক্ষান্তরে এখনও তাঁহার এইরূপ ধারণা যে, এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে এবং সেসব বিষয়ের সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। ডাঃ রায় বলেন, তিনি শুধু ভারত সরকারকে এই কথা জানাইয়াছিলেন যে, তিনি নিজে ঐ তদন্ত পরিচালনা করিতে সম্মত হইতে পারেন নাই; কারণ ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, তিনি যে রিপোর্টই দিবেন, কোন কোন মহল হইতে সে সম্বন্ধে বিতর্ক উঠিবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় আবদুল্লা সরকারের কতক-গুলি আচরণ আশ্চর্যজনক বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহাদের ত্রুটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাব যথেষ্টরূপে সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তদন্তে রাজী হইতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গৃহীত প্রস্তাবে তাঁহাদের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যদি এখনও এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং জনমতের মর্যাদা রক্ষা করিতে তাঁহারা অগ্রসর হন, ভালই। আমরা তাহাই আশা করি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় লোকসভায় এই ধরণের একটি প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিয়াছে কি?

পরলোকে বি এন রাও

বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ স্যার বেনেগল নরসিং রাও পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আন্ত-র্জাতিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভারত একজন প্রতিভাবান্ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিনিধিকে হারাইল। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের বিভিন্ন পরিষদে তিনি ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপে যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রস্বরূপে ভারতের নিরপেক্ষতার মর্যাদা প্রবল শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বের চাপে পড়িয়া ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। ভারতের এই মহান্ কৃতী সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শিক্ষকদের দাবী

শিক্ষকগণের বেতন এবং মাগ্গী ভাতা বৃদ্ধির সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার দাবী রক্ষিত হইবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে সুনির্বাচিত কোন কথা দিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে শিক্ষকেরা ধর্মঘট করিবার বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। এই সংবাদ মোটেই ভাল নয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতা কমপক্ষে কত হওয়া উচিত, তাহার হার নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষকদের দাবী বেশী কিছু নয়। যাহাতে পর্ষদের সুপারিশ কার্যকর করা হয়, তাঁহারা ইহাই চাহেন এবং তাহা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষকগণের বেতন ও ভাতার হার বৃদ্ধি করিতে গেলে সরকারপক্ষকে শিক্ষার খাতে মোটামুটি ৯০ লক্ষ হইতে ১ কোটি টাকার বরাদ্দ করিতে হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষার খাতের ব্যয়ের তুলনা করিলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা বিভাগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শিক্ষাকে উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অন্য বিভাগের ব্যয় হ্রাস করিয়া শিক্ষকগণের সঙ্গত দাবী পূরণের ব্যবস্থাটা অন্ততপক্ষে করিতে পারেন। আগামী বাজেটে সেই ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন, আমরা ইহাই আশা করি। শিক্ষকগণের দাবীর প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি আছে এবং তাঁহাদের প্রতি কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সমবেদনাসম্পন্ন, পরন্তু এইরূপ ফাঁকা কথায় সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিবে, এমন আশঙ্কা আছে।

স্কেচ : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈদেশিকী
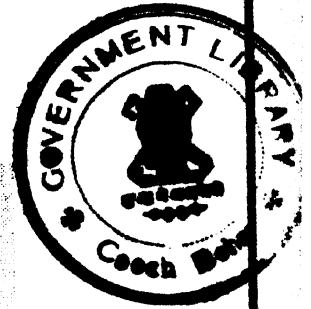
সুদানের নির্বাচনে ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টির জয় হয়েছে। নিম্নতন পরিষদ—হাউজ অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস এর অর্ধেকের বেশি ... আসন ইউনিয়নিস্ট পার্টি ... করেছে। ইউনিয়নিস্ট পার্টির জয়লাভে মিশর পুলকিত, কারণ ইউনিয়নিস্ট পার্টি সুদানের মিশরের পার্টির। প্রধান প্রতিপক্ষ উম্মা পার্টি সুদানকে মিশর থেকে আলাদা করে 'সম্পূর্ণ স্বাধীন' করতে চায়। অবশ্য এই 'সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' সুদান-বৃটিশ-স্বার্থরক্ষার বিশেষ অনুকূলে হবে বলে অনেকে সন্দেহ করে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট উম্মা পার্টির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, যেমন মিশরীয় গভর্নমেণ্ট করেছেন ইউনিয়নিস্টদের। ইলেকশনের ব্যাপারে নানারকম অন্যায় কার্য করার জন্য উভয় গভর্নমেণ্ট পরস্পরের প্রতি গুরুতর দোষারোপ করেছেন। উম্মা দলের পক্ষ থেকে এখন বলা হচ্ছে যে, এত গোলমাল করা হয়েছে যে, ইলেকশনের ফল নাকচ করার যোগ্য। উম্মা দল জয়ী হলে ইউনিয়নিস্টরাও নিশ্চয়ই এই রকম রব তুলত। যাই হোক নির্বাচনের ফল সব দলকেই মেনে নিতে হবে। এই নির্বাচনের ফল অনুসারে মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। শুনা যাচ্ছে নিম্নতন পরিষদে ইউনিয়নিস্ট পার্টির নিরংকুশ ভোটাধিক্য থাকা সত্ত্বেও তারা মন্ত্রিসভায় উম্মা দলের লোককেও স্থান দেবে, অর্থাৎ কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে। এ ব্যবস্থা হচ্ছে অন্তর্বর্তিকালের জন্য। অন্তর্বর্তিকাল তিন বছব চলবে। এই সময়ে বৃটিশ গভর্নর জেনারেল থাকবেন এবং তাঁর অনেকগুলি বিশেষ ক্ষমতাও (বিশেষ করে দক্ষিণ সুদান সম্পর্কে) থাকবে। এই অন্তর্বর্তিকালের অবসানে সুদানে যে স্থায়ী শাসনতন্ত্র কায়েম হবে, সেটা এখনো তৈরি হয়নি, সেটা তৈরি করবে যে বিধান পরিষদ, তার নির্বাচন পরে হবে।

সুদানের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রূপ কী হবে, সেটা বেশি নির্ভর করবে সেই বিধান সভার নির্বাচনের উপরে। তবে বর্তমান ইলেকশনে ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টির জয়লাভ হওয়াতে মিশরের সঙ্গে যোগরক্ষার দিকটা খুবই ভারী হোল সন্দেহ নেই। বর্তমান নির্বাচনের ফল বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে একটা হার এবং মিশরীয় গভর্নমেণ্টের পক্ষে একটা জিতের নিদর্শন অবশ্যই বলা যায়, তবে শেষ পর্যন্ত এই মিশর-বৃটিশ-সুদানী সমস্যার সমাধানের রূপটি ঠিক কী রকম হবে, তা এখনো বলা যায় না। ইউনিয়নিস্ট দল অবশ্য মিশরের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে চায়, কিন্তু এই যোগ কী রকম এবং কতটা হবে, সে বিষয়ে ইউনিয়নিস্ট দলেরও যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে বা দলের সকলে ঠিক একই জিনিস চায়, তা বলা যায় না। সুতরাং এই অন্তর্বর্তিকালে মতামত কোন্ ধারায় গিয়ে দানা বাঁধবে, সেটা অনিশ্চিত। এই সময়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টও যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন, তা নয়। উত্তর সুদানের তুলনায় দক্ষিণ সুদানে ইউনিয়নিস্ট দল অনেক কম আসন পেয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত ফল অনুসারে ইউনিয়নিস্টরা যে ৫১টি আসন লাভ করেছে, তার মধ্যে মাত্র বারটি হোল দক্ষিণে। দক্ষিণে মিশরীয় প্রভাব অনেক কম এবং অ-মুসলমান উপজাতীয়দের আধিক্য। সুতরাং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনে সুদানকে দুভাগ করার কল্পনাও যে কখনো কখনো উঁকি দেয়নি বা দিচ্ছে না, তা বলা যায় না। মুসলমান উত্তর এবং মুসলমান দক্ষিণের মধ্যে প্রভেদের কথাটার উপর বৃটিশ প্রচারকরা সর্বদাই জোর দিয়ে আসছে। ভারতবর্ষের বেলায় ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমব্লী গঠিত হবার পরেও কেমন করে ঘটনার স্রোতে দেশ-বিভাগ অনিবার্য হয়ে দেখা দিল, সে কথা স্মরণ করলে এখনো বলা যায় না, সুদানের ভাগ্যে কী আছে।

তবে মিশরকে একেবারে চটানো ইংরেজের স্বার্থ নয়। বৃটিশ স্বার্থ যথাসম্ভব বজায় রেখে মিশরের সঙ্গে একটা মিটমাট বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাম্য। জেনারেল নজীবও মিশরের জাতীয় মান বাঁচিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা মিটমাট চান। সুয়েজের সমস্যাটার যদি ইতিমধ্যে একটা সমাধান হয়ে যায়, তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট হয়ত সুদানে মিশর-বিরোধী নীতি অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করবেন না। অন্তর্বর্তিকালে সুদানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে চলে, তার উপর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে। ইউনিয়নিস্ট পার্টি উম্মা পার্টিকেও গভর্নমেণ্টে স্থান দিতে প্রস্তুত হয়েছে, এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা কোনরকম বাড়াবাড়ি না করে সাবধানে চলতে চায়। হয়ত মিশর গভর্নমেণ্টই এই পরামর্শ দিয়েছেন। ইউনিয়নিস্ট পার্টি অত্যধিক মিশর-দরদীপনা অথবা বৃটিশ-বিরোধী ভাব দেখালে উত্তর-দক্ষিণ বিবাদে উস্কে দেয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে সহজ হবে, এই আশংকা করেই হয়ত মিশর গভর্নমেণ্ট এই রকম পরামর্শ দিয়েছেন। এটা তাহলে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।

* * * *

মৌ মৌ দমনের নামে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কেনিয়াতে যে নৃশংস মনুষ্য-শিকার চালিয়েছে, বর্তমান কালে তার তুলনা নেই। কেনিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের, অর্থাৎ যে-রাণী 'Head of the Commonwealth', তাঁর নিজ গভর্নমেণ্টের খাসমহল। 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ডক্টর ম্যালানের কার্যকলাপের উপর আমাদের হাত নেই' —এক্ষেত্রে এরকম সাফাইও অচল। কেনিয়াতে যে-কাণ্ড চলছে, সেরকম কাণ্ড যে কমনওয়েলথের শীর্ষস্থানীয় গভর্নমেণ্টের দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারে, সেই কমনওয়েলথের সঙ্গে জুড়ে থেকে ভারতবর্ষ জগতে কী নৈতিক কীর্তি স্থাপনে সক্ষম হবে, বুঝা যায় না।

* * *

বেরমুদায় যাবার জন্য যখন তিন

লপত্তর গোছাচ্ছেন, ঠিক সে সময়ে ট গভর্নমেণ্ট বার্লিনে চার সচিবের সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব ঠি ছাড়লেন। ইতিপূর্বে লুগানে রাষ্ট্র সচিবের কনফারেন্স করার য প্রস্তাব আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নিকট লন, রাশিয়া তাতে স্বীকৃত হয়নি। রাশিয়া চীনসহ পঞ্চশক্তির বৈঠক লছিল। সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য বোধ হয়, কনফারেন্সের গুড়ে বালি দেয়া। াট গভর্নমেণ্টে একটা মিটমাট জন্য প্রস্তুত আছেন, এই ধারণার আবহাওয়া সৃষ্টি হলে বেরমুদায় মের ব্যাপারে অনেক বিষয়েই কোন ষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হবে। করে জার্মানসহ য়ুরোপীয় সৈন্য- জর্ডন সম্পর্কে ফ্রান্সের দ্বিধা র জন্য ফরাসী প্রধান মন্ত্রীর বেরমুদায় যে জোর চাপ দেওয়া লে সকলে মনে করছিল, রাশিয়ার চিঠির ফলে সেরকম চাপ দেওয়া সম্ভব হবে কি না সন্দেহ।

র্মানীর সম্বন্ধে ফ্রান্সের ভয় ই যাচ্ছে না। রাশিয়ার সঙ্গে যদি একটা মিটমাট হয়, যাতে জার্মানীকে স্বীকৃত করার প্রয়োজনের উপর কা জোর দিতে পারবে না, তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তাছাড়া ইন্দো- যুদ্ধের ভার ফ্রান্স এখন ঘাড় যেমন করে হোক নামাতে চায়। র সকল দলই এখন ইন্দোচীনের আশু অবসান চায়। তার জন্য মিনের সঙ্গে একটা আপোস ও ফ্রান্স এখন মনে মনে রাজী। ষয়ে রাশিয়ার সহযোগিতা পাওয়া ক। কেবল রাশিয়ার নয়, চীনেরও গিতা চাই। সেইজন্য চীনসহ পঞ্চ- পররাষ্ট্র সচিবের সম্মেলনের যে রাশিয়া করেছিল, তাতে ফ্রান্সের হয় আপত্তি হোত না, কারণ চীনকে দয়ে ইন্দোচীনের যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলে মিনের সঙ্গে আপোস করা সম্ভব কারণ ভিয়েৎমিন চীনের সম্মতি কোন রফায় আসবে বলে মনে হয় না। অবশ্য আমেরিকা ও বৃটেনের মত ছাড়া ফরাসী গভর্নমেণ্টেরও কিছু করার উপায় নেই।

২।১২।৫৩

ট্রামে-বাসে

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন যে, যুগের উপযোগী "স্পিরিট" মানিয়া চলাই হইবে তাহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী ভীড়ের আড়াল হইতে মন্তব্য করিলেন—"মেথিলেটেড্

স্পিরিট পর্যন্ত মানা যায় কিন্তু টমাটো রসের স্পিরিট মানা যে তাদের পক্ষে সত্যি শক্ত"!

* * *

পাক্ আইনসচিব জনাব ব্রোহী বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের কোন সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নাই। কথাটা তিনি পাক্ ঐশ্লামিক গণতন্ত্রের সমর্থনেই বলিয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহল বলেন যে, এই ব্রোহী নাকি একদিন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, কোরাণ ও সুন্নার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা সম্ভব নয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এতে অবাক্ হবার কিছু নেই; জনাব ব্রোহীর জন্যে যাঁরা আইনের খস্‌ড়া তৈরি করেন তাঁদের নির্দেশ হয়ত ছিল—অসত্যম ব্রুয়াৎ, অপ্রিয়ম ব্রুয়াৎ এবং মওকা বুঝে ওল্টা-পাল্টা ভি ব্রুয়াৎ, সুতরাং ব্রোহী নিমিত্তমাত্র"।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী খাদ্যশস্যে নাকি ধুতুরার বীজ পাওয়া গিয়াছে।—"ডাঃ ভাণ্ডড়ের দেশে ধুতুরা মেশান খাদ্য উপাদেয় মনে হবে মনে ক'রেই হয়ত তাঁরা এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পাক্ সরকার সরকারী বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য সমর্থন হইতে করাচীর "ডন" কাগজকে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাওয়া গেল।

—"ডন্ অগত্যা আর কী করবেন, নেহরুজীর ওপর এক হাত নিয়ে টেনে সম্পাদকীয় লিখে নিজের বিজ্ঞাপন নিজেই ছাপছেন, এতে টাকা আসে না বটে, তবে ঝাল হয়ত খানিকটা মেটে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ডাঃ জাগান ভারতে আসিয়া লোকসভার সদস্যদিগকে তাঁহার দেশের অবস্থা শুনাইয়াছেন।—"আমরা যতই গান ধরি ওগো দুঃখ জাগানিয়া তোমায় গান শোনাব, তাঁর

দেশের কর্তারা কিন্তু নীরব,—তারা বৃটিশ (সুতরাং) গায়না"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

নবদ্বীপ অঞ্চলে ধানভানা কল আমদানী বৃদ্ধিতে ঢেঁকিশিল্পের সমূহ বিপদ সমাসন্ন বলিয়া জনৈক পত্রপ্রেরক সংবাদ দিয়াছেন।—"কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, পত্রপ্রেরক নিশ্চয়ই জানেন ঢেঁকির স্বর্গে গিয়েও সুখ হয় না"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরুকে এ পর্যন্ত যাঁহারা যা উপহার দিয়াছেন সেইসব উপহারের সামগ্রী নাকি তিনটি ট্রাক্ বোঝাই করিয়া নেহরুজী এলাহাবাদের যাদুঘরের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। "আমরা শুনেছি, চিড়িয়াখনার উপযোগী অনেক জা-নর ("রূপদর্শীর" অসৌজন্যে) উপহারও তিনি পেয়েছেন, সেগুলোর একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারলে নেহরুজী নিশ্চয়ই নিশ্চিন্দ [illegible] করবেন"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রয়টার এই মর্মে এক সং[illegible] দিয়াছেন যে, নরেমবর্গে[illegible] শ্রীমতী শার্লট নামে এক মহিলা ভার[illegible] যোগ শিক্ষার জন্য আসিতেছেন। সংবা[illegible] প্রকাশ, শ্রীমতী নাকি কতকদিন হইতে একটি আকাশবাণী শুনিতেছিলেন। প্রথমদিন শুনিলেন, সেই বাণী বলিতে[illegible] —আমি তোমার সংগে আলোচনা করিতে চাই। আমার নিকট তুমি পৃথিবী[illegible] সমস্যার সমাধান পাইবে। তারপর একদিন শোনা গেল—আমি যা বলি তা লিখিয়া রাখ। সেইসব লেখার কতক অংশ ছাপা হইয়াছে। সর্বশেষ বাণীতে শ্রীমতী[illegible] ভারতে আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। "শ্রীমতী[illegible] অভিজ্ঞতার ফল "শার্লক হোমস্"-এ[illegible] মত বিক্রয় না হ'লেও শার্লট্ Home[illegible] এতে নিশ্চয়ই উপকৃত হবে। গোয়েন্দা[illegible] নেই কিন্তু তাঁর প্রচারের মহিমা এই আকাশবাণীরূপে এখনো জার্মানী[illegible] ভেসে আসে কিনা কে জানে।"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

আকাশে মাঝে মাঝে যে জ্যোতির্ময় উড়ন্ত চাক্‌তি পরিদৃষ্ট হয় [illegible] সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত গবেষক মেজর কীহো নাকি বলিয়াছেন যে, মংগল গ্রহের অধিবাসীরা এই উড়ন্ত চাক্‌তির সাহায্যে পৃথিবীতে পর্যবেক্ষক[illegible]

দল প্রেরণ করিতেছে।—"তাদের পর্যবেক্ষণের ফল হয়ত একদিন সংবাদপত্রে ছাপা হবে। উপস্থিত এই টুরিস্টদের জন্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশে আকর্ষণীয় প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করুন [illegible] না হ'লে বিলম্বে হতাশ হবার সম্ভাবনা আছে"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

ভর্নমেণ্ট প্লেসের বড় অফিস বাড়িটার সামনে দশটা বাজতে না ই পানের পঁটুলি নিয়ে এসে বসল এত সকালে বাবুরা পান খায় না। উ এসে যে তার জায়গা দখল করে তেমন আশংকাও নেই। তবু প্রমদা সকালেই আসে। বিক্রি তেমন হোক । হোক অফিসের সামনে সন্ধ্যা ঠায় বসে থাকে। বয়স বছর পঁয়-াক হবে। কিন্তু চেহারায় আরো বেশি লে মনে হয়। চুলে পাক ধরেছে। লম্বা দেহটা নুয়ে পড়েছে সামনের বেশ-বাসের ওপর কোন রকম লক্ষ্য চুলপেড়ে সাদা একখানা আধময়লা পরনে। গায়ে কোথাও কোন গয়না অথচ একটু যত্ন নিলে দেহ এখনো দেখায় প্রমদার, লক্ষ্য করলে চোখে বিগত যৌবনশ্রীর এখনো কিছুটা মেলে।

গ্য ভালো। অফিসে ঢুকবার আগে পঁচিশ বছরের দুজন যুবক আজ এসে দাঁড়াল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পান হবে?'

'হবে বাবা।'

'তাহলে দাও দুটো।'

সঙ্গীটি বলল, 'আঃ আবার আমার জন্যে নিচ্ছ কেন সুকুমার? আমি পান খাব না।'

সুকুমার বলল, 'আহা খাওনা শুভেন্দু, বেশ ভালো পান।'

শুভেন্দু বলল, 'তাহলে দাও। কিন্তু জর্দাটর্দা দিয়ো না যেন।'

প্রমদা পান সাজতে সাজতে যুবক দুটির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'জর্দা না খেলে দেব কেন বাবা।'

সুকুমার বলল, 'আমারটায় দাও। ওরটায় দিয়ো না। খাওয়া তো ভালো, জর্দার নাম শুনলেই আমাদের শুভেন্দুর মাথা ঘোরে।'

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ কি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দাম চুকিয়ে দিয়ে সুকুমার একটু সরে এসে সিগারেট ধরাল।

শুভেন্দু বলল, 'পানওয়ালীদের মুখে অমন বাবা বাবা শুনতে আমার বড় খারাপ লাগে।'

সুকুমার একটু হেসে বলল, 'কি করবে বল, ওর বাবু ডাকবার বয়সতো আর নেই।'

শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যাঃ। কিন্তু বয়স না থাকলেও তাকাবার ভঙ্গিটি প্রায় তেমনি আছে। পান সাজতে সাজতে আমাদের মুখের দিকে কিরকম করে বার-বার চাইছিল দেখলে তো?'

সুকুমার বলল, 'দেখেছি। শুধু তোমার মুখের দিকে নয়, তোমার আমার বয়সী সকলের মুখের দিকেই ও অমনি করে তাকায়। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। প্রমদা ওর জামাইকে খোঁজে।'

হাসতে গিয়ে সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

শুভেন্দু বিস্মিত হয়ে বলল, 'জামাই মানে?'

গলাটা একটু চড়ে গিয়েছিল

শুভেন্দুর। সুকুমার তার দিকে চেয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আস্তে হে আস্তে। শুনতে পাবে। চল এবার ভিতরে চল।'

রাস্তা পার হয়ে দুই বন্ধু অফিসে গিয়ে ঢুকল। একদল মেয়ে ঢুকল তারপর। তাদের পিছনে পিছনে আর একদল ছেলে। প্রমদা পানসাজা থামিয়ে তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল তারপর ফের নিজের কাজে মন দিল। শুনতে সে পেয়েছে। চোখের মত কানও আজকাল তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে প্রমদার। কে কি বলে না বলে সব সে বুঝতে পারে। প্রমদা সব দেখে, সব শোনে সব টের পায়। লোকে ভাবে আগের মত এখনো বুঝি তার মাথা খারাপই আছে। ওদের ভুল। প্রমদার মাথা অনেক দিন হোল ফের ঠিক হয়ে গেছে। আজকাল তার সব মনে পড়ে।

মনে পড়ে সেই কৃপানাথ দে'র গলি। দোরের সামনে রাতের পর রাত সেই আগন্তুকের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়ানো। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা-বাদল নেই পথে এসে দাঁড়াতেই হবে। মাস মাস ভাড়া না পেলে বাড়িওয়ালী ছাড়ে না। পোড়া পেটের তাগিদও কি কম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হোত না প্রমদাকে। মানদা মোক্ষদাদের তুলনায় ওর ঘরে লোকজন ঘন ঘনই আসত। রূপ স্বাস্থ্য বয়স বুদ্ধি দলের মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। নিত্য নূতন ধরণের সাজসজ্জা করত প্রমদা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর লেপে শাঁখা চুড়ি পরে কোন দিন কুলবধূ হোত, কোন দিন বা কুমারীর বেণী পিঠে লুটিয়ে পড়ত।

মানদা মুখ ঘুরিয়ে বলত, 'ঢং। তুই থিয়েটারে গেলেই পারিস। এখানে পড়ে মরছিস কেন।'

মালতী বলত, 'সোনাগাছিতে চলে যা। ছ' বছর বাদে [illegible] রাস্তার ওপর বাড়ি তুলতে পারবি। এই এ'দো গলিতে পড়ে মরছিস কেন।'

প্রমদা হেসে জবাব দিত, 'তোদের জ্বলে মরা দেখব বলে।'

তারপর তেইশ বছর বয়সে বকুল কোলে এলো প্রমদার। বাড়িওয়ালী বলল, 'এতদিনে তোর দুঃখ ঘুচলো পেরমো। পেট থেকে পড়তে না পড়তেই যা চোখমুখ বেরিয়েছে তোর চেয়ে লাখো গুণে রূপসী হবে। সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে খেতে পারবি।'

মোক্ষদা বলল, 'একেই বলে ভাগ্যি। আমাদের ঘরে ব্যাটা ছেলে পাঠিয়ে ভগমান ওকেই মেয়ে দিলে। দেবে না? সেও তো একচোখো পুরুষের জাত। সুন্দর মুখ দেখলে সেও ভোলে।'

কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল তা হলো না। বকুলের বছর সাতেক বয়স হ'তে না হ'তেই তাকে নিয়ে কৃপানাথ দে'র গলি ছেড়ে চলে এল প্রমদা। সোনাগাছিতে রূপোগাছিতে নয়, বেলগাছিয়ার বস্তী-বাড়িতে এসে বাসা বাঁধল।

নিজের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে। দু' দুবার যথাসর্বস্ব চুরি হয়েছে প্রমদার। একবার হতাশ প্রেমিকের ছোরার মুখ থেকে বেঁচেছে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে প্রমদার। এ পথ আর নয়। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দোতলা বাড়ির অল্পবয়সী বউটির স্বামী শাশুড়ী ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখের ঘরকন্না দেখতে দেখতে প্রমদা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে তার বকুলকে কিছুতেই সোনাগাছিতে পাঠাবে না সে, বোসেদের বউয়ের মতই একটি সোনার সংসার বকুলকে সে গড়ে দেবে।

বেলগাছিয়াতে এসে সধবার বেশ ছেড়ে ফেলল প্রমদা। পুরুষ সঙ্গে না থাকলে শাঁখা সিঁদুর নিয়ে অনেক কৈফিয়তের তলায় পড়তে হয়। তার চেয়ে সাদা থান আর সাদা সিঁথিতে আপদ কম। বহুনাথা থেকে একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা। এই বয়সেই সব সোহাগ, আহ্লাদ, সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলতে প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হলো। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমদা নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ওর সিঁথিতে সত্যিকারের সিঁদুর তুলে দেওয়ার জন্যে নিজের লোক দেখানো সিঁদুরের দাগ না হয় মুছেই ফেলল প্রমদা। তাতে দুঃখ কিসের।

বস্তীতে সবাই গৃহস্থ নয়। আধা-গৃহস্থও কয়েক ঘর আছে। দিনদুপুরে রাতদুপুরে ভুল করে কেউ কেউ প্রমদার দোরে এসেও হানা দিতে লাগল। কিন্তু ফের কোন ফাঁদে পা দেওয়ার মত মেয়ে নয় প্রমদা। জীবনে তার শিক্ষা কম হয়নি।

কয়েক পা এগিয়েই পাইকপাড়া। সেখানে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঠিকে ঝির কাজ নিল প্রমদা। বাসন মাজে, বাটনা বাটে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদলে কোলে তুলে নেয়। আর মনে মনে স্বপ্ন দেখে নিজে সে ঝি-গিরি করলেও বকুলকে সে এমনি একটি বড়লোকের বাড়ির বউ করে পাঠাবে।

শুধু ঝি-গিরির পয়সায় সংসার চলে না। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রে আগুন লেগেছে। দুপুর বেলায় পানের পুঁটলি নিয়ে প্রমদা অফিস আদালতের সামনে গিয়ে বসে। বিক্রি মোটামুটি মন্দ হয় না। অফিসের বাবুরা অনেকেই এসে ভিড় করে দাঁড়ায় চুণের বোঁটা হাতে নিয়ে গল্প করে।

একদিন ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার মেয়ে তো বেশ চালাক চতুর আছে। লেখা-পড়া শিখল কোথায়। ওকে কি স্কুলে দিয়েছ নাকি?'

প্রমদা লজ্জিত হয়ে বলল, 'না বাবু। বস্তীর সামনে নিমাই মুদির দোকান আছে। বই খাতা নিয়ে সেখানে যায়। পড়াশুনো পেলে বকুল আর কিছু চায় না। দিনরাত বই নিয়ে থাকে। রামায়ণ-মহাভারত ওর মুখস্থ।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুধু রামায়ণ-মহাভারত কেন। ও আরো অনেক বই পড়েছে। ওকে এবার ভালো একটা স্কুল-টিস্কুল দেখে ভর্তি ক'রে দাও প্রমদা। মুদি দোকানে ফেলে রেখ না। তোমার মেয়ে দেখতে তো অমনিতেই সুন্দরী। লেখাপড়াটা যদি ভালো ক'রে শেখে ওর বিয়ের জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যে দেখবে সে-ই ওকে পছন্দ করবে।'

প্রমদা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুট স্বরে বলল, 'সে আপনাদের আশীর্বাদ কর্তা।'

্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে আছে। সেখানে আধা মাইনেতে ক ভরতি করে দিল প্রমদা। স্কুলে নাম জিজ্ঞেস করায় বলল বকুলমালা

রদিন বকুল এসে বলল, 'আজকাল ময়েরা দাসী লেখে না মা। আমাদের : দিদিমণি রেজিস্টার খাতায় আমার কুলমালা দাস লিখে নিয়েছেন।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'রেজিস্টার! াবার কি রে!'

কুল হেসে বলল, 'বাঃ রে। রোজ যে ডাকা হয় ক্লাসে। স্কুলে গেলাম কি । না তার হিসেব রাখার জন্যে নামের আছে প্রত্যেক ক্লাসে।'

প্রমদা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও।'

াসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে চলল । ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল। স্কুল ছেড়ে ।

স্তীর সবাই বলল, 'আর কেন এবার । বিয়ে দাও।'

প্রমদা বলল, 'আমি তো অনেক দিন বলছি। কিন্তু মেয়ে যে কথা না।'

কত সম্বন্ধ এল, কত সম্বন্ধ হাত হোল. কিন্তু বকুল কিছুতেই বিয়ের বে সায় দিল না।

প্রমদা একদিন মেয়েকে ডেকে বলল, কি ভাবলি বল দেখি। বিয়ে থা ঘর-কালী করবিনে?'

কুল বলল, 'না মা, এই বেশ আছি।'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এই বেশ । তুই দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকবি আমি জীবনভর পরের বাড়িতে দাসী-করব, রাস্তায় বসে পান বেচব এই তোর ইচ্ছে?'

কুল কালো ব্যথাভরা চোখ তুলে । দিকে তাকাল, 'আমি তো তোমাকে ছ মা, ওসব কাজ ছেড়ে দাও।'

প্রমদা রাগ করে বলল, 'কেবল ছেড়ে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিলে চলবে কি শুনি। দু' বেলা অন্ন জুটবে কি ?'

বকুল বলল, 'আমি ট্যুইসন করব না, রবাকরি জুটিয়ে নেব। তবু তোমাকে কাজ করতে দেব না।'

তারপর সত্যিই যখন বকুল একটা র মাস্টারির খবর আনল, প্রমদা বাধা দিয়ে বলল, 'উ'হু' তা হবে না। তার চেয়ে তুমি যা করছিলে তাই কর বাপু। পাশ পরীক্ষা শেষ কর। ভাতের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

বকুল বলল, 'কিন্তু রাস্তায় বসে পান বিক্রি করতে তোমাকে আর আমি দেব না মা। কলেজে তো আমার মাইনে লাগে না। প্রিন্সিপ্যাল যে ট্যুইসনটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাতে সংসারের অনেক খরচ আমাদের চলে যাবে। তারপর বি এ-টা পাস করে কোন অফিসটপিসে ঢুকতে পারলে যা আনব কষ্টেসৃষ্টে আমাদের দুজনের তাতেই চলবে। তোমাকে আর আমি কষ্ট করতে দেব না।'

মেয়ের মুখের দিকে মমতাভরা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রমদা বলল, 'দূর পাগলী। আমার আবার কষ্ট কিসের। তোকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলেছি।'

বি এ পাস করবার কিছুদিন বাদেই চাকরি জুটিয়ে নিল বকুল। আগে থেকেই চেষ্টা-চরিত্র করছিল। কলেজের এক প্রফেসারের স্বামী সরকারী অফিসে ভাল চাকরি করেন। সেখানেই কাজ জুটল বকুলের।

পান বিক্রি আগেই বন্ধ হয়েছিল, চাকরি পাওয়ার পর ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঝি-গিরিও আর মাকে করতে দিল না বকুল।

প্রমদা বলল, 'কেন, পেটের জন্যে তুই খাটবি আর আমি খাটতে পারব না? আমার কি গতর গেছে?'

বকুল বলল, 'ও কথা কেন বলছ মা। এতকাল তো তুমিই আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ। এবার তুমি বিশ্রাম কর। নিজের ঘরসংসার দেখ।'

প্রমদা বলল, 'ঘরসংসার না ছাই। তোর বিয়ে হবে, জামাই আসবে; কোলজুড়ে ছেলেমেয়ে আসবে তবে তো আমার সংসার। তার আগে আমার সংসার কিসের রে?'

বলে মেয়ের দিকে তাকাল প্রমদা। একুশ-বাইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু বিয়ের কথায় ওর মুখে কোন রঙ লাগল না। চোখের পাতা লজ্জায় আনন্দে নেমে এল না।

মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বকুল মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, 'সে সব হবার নয় মা।'

প্রমদা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বকুল? ওকথা বলছিস যে।'

বকুল আস্তে আস্তে বলল, 'কেন বলছি তা তুমি নিজেই তো সব জানো।'

বকুল আর কোন কথা না বলে চোখ নামিয়ে নিল। একটু বাদে সে উঠে চলে যাচ্ছিল প্রমদা তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাতে তোর তো কোন দোষ নেই: তুই যে আমার পাঁকের পদ্ম বকুল। সেই দুঃখে তুই কেন বিয়ে করবিনে?'

বকুল বলল, 'আমার কোন দুঃখ নেই মা। আমার জন্যে তুমি ভেব না, আমি বেশ আছি।'

এবার বকুল উঠে গিয়ে কালো মলাটের একখানা ইংরেজী মোটা বই খুলে বসল। দুঃখে বুক ভেঙে যেতে লাগল প্রমদার। মেয়েরা হৈ চৈ করে, কত আনন্দ আহ্লাদ করে, কিন্তু বকুল সেই এগার বার বছর বয়স থেকেই ভারি গম্ভীর, ভারি বিষন্ন। বকুল প্রথম প্রথম তার বাপের খোঁজ করেছে, কাকা, মামা, দাদাদের খোঁজ করেছে। প্রমদা মেয়েকে বুঝিয়েছে, তারা কেউ বেঁচে নেই। বকুল তবু অবুঝের মত জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কি অসুখে মরল বাবা? শীলা লীলাদের মত আমার কি জ্যাঠামণি ছিল? তার কি নাম ছিল মা!'

ধৈর্যের সীমা আছে সকলেরই। প্রমদাকেও এক সময়ে বিরক্ত হ'য়ে বলতে হ'য়েছে, 'রাতদিন অত আমি বকতে পারিনে বাপু। যা বলেছি বলেছি। আর আমি কিচ্ছু জানিনে।'

কিন্তু প্রমদা না জানালে কি হবে, বকুল ক্রমে ক্রমে সবই জেনেছে। বস্তিতে কুট কচালো লোকের তো অভাব নেই। তাদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপে, ইশারা ইঙ্গিতে সবই বুঝতে পেরেছে বকুল। ঝগড়ার সময় প্রতিবেশিনীদের ভাষা আরও স্পষ্ট, আরও বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। বকুলের খেলার সঙ্গীরা পর্যন্ত খোঁটা দিয়েছে। বেশ্যার মেয়ে, তোর বাপের ঠিক নেই। তুই কেন খেলতে আসিস্ আমাদের সঙ্গে?'

প্রমদা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে গিয়েছে তাদের মারতে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে অকথ্য ভাষায় তাদের বাপ মার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। বকুল ব্যাকুল হ'য়ে তাড়াতাড়ি মাকে হাত ধ'রে ঘরে টেনে এনেছে। 'মা চুপ করো, চুপ করো।'

কিন্তু ক' বছর পরে সেই দুঃখের দিনগুলিও গেছে। নিজের কুলপরিচয়ের কথা, আত্মীয় স্বজনের কথা বকুল মাকে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার সঙ্গে বস্তির কারো আর ঝগড়া হয় না। কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতে যায় না বকুল। স্কুলে যায়, স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার বই নিয়ে বসে।

প্রমদা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, 'এত বই তুই কোত্থেকে পাস বকুল।'

বকুল জবাব দেয়, 'শহরে বইয়ের কি অভাব আছে মা? স্কুলের মেয়েদের কাছ থেকে আনি, দিদিমণিদের কাছ থেকে আনি।'

প্রমদা বলে, 'বই ছাড়া তুই কি দুনিয়ায় আর কিছু চোখে দেখতে পাস নে? লীলারা কেমন সুন্দর তাদের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে, তোর সঙ্গে বুঝি কারো ভাব নেই?'

'আছে।'

'তবে আনিসনে কেন তাদের?'

বকুল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ভয় করে মা। যদি তারা আমাদের ঘেন্না করে।'

প্রমদা হঠাৎ কোন কথা খুঁজে পায় না।

স্কুল থেকে ভালো পাশ ক'রে কলেজে ভর্তি হোল বকুল। কিন্তু মেয়ের স্বভাব বদলাল না। সেই বইয়ের রাশ, ঘরের কোণ আর নিজের মন নিয়ে পড়ে থাকে। দুনিয়ায় আর কিছুতে ওর কোন আসক্তি নেই।

ওর সমবয়সী শীলা লীলা দুজনেরই বিয়ে হ'য়ে গেল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে একজন ছেলে কোলে নিয়ে আর একজন পেটে নিয়ে বাপের বাড়ি এল বেড়াতে। প্রমদার সাজা পান খেয়ে তার ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে শ্বশুর-বাড়ির কত গল্প করল। শেষে লীলা হাসতে হাসতে বলল, 'মাসীমা, ওই গোমরামুখীকে এবার বিয়ে দিয়ে দিন। ওর যা ভাবভঙ্গি দেখছি, কবে যে ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে যাবে তার ঠিক নেই।'

সন্ন্যাসিনী হ'তে বাকিই বা কি। বকুল গয়নাগাটি কিছু পরে না, অত বড় চুলের গোছ মাথায়, কিন্তু ভালো করে যত্ন নেয় না। মেয়ে তো নয়, এ এক অনাসৃষ্টি।

প্রমদা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বকুল, লীলাকে দেখে তোর কি হিংসে হয় না?'

'হিংসে কেন হবে মা?'

'তুই কি চাস বল তো?'

বই থেকে মুখ তুলে বকুল মৃদু হাসে, 'সেই তো সমস্যা। কি চাইব বলো তো।'

প্রমদা বিরক্ত হয়ে বলে 'হাসিস নে বাপু, তোর হাসিতে আমার গা জ্বলে। কি চাইবি, তাও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? সোয়ামী, সংসার, গা-ভরা গয়না, কোলভরা ছেলে। মেয়েমানুষে দুনিয়ায় আর কি চায়।'

বকুল বইয়ের দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বলে, 'ওসব আমি কিছু চাইনে।'

প্রমদা গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'তা চাইবি কেন, পোড়াকপালী, হতচ্ছাড়ী। এ যে রক্তের দোষ, ঘর-সংসার তোর মন চাইবে কেন? কিন্তু তুই চাসনে আমি চাই। যেমন করে পারি জামাই আমি আনবই।' বকুল বই নিয়ে মায়ের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে।

রাগে জ্বলে যায় প্রমদা। ইচ্ছা করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ওই বইয়ের রাশ। বইতো নয়, শত্রু। ওই বইপড়া বিদ্যার জন্যেই মেয়ে তার এমন ক'রে পর হয়ে গেছে। ও কি ভাবে, কি চিন্তা করে, তা প্রমদা বুঝতে পারে না। এমন কি ওর মুখের ভাষা পর্যন্ত যেন আলাদা। অথচ এই মেয়েকে বুকে করেই এই মেয়ের সুখের জন্যেই প্রমদা অকালে নিজের সব সখ-আহ্লাদ ত্যাগ করেছে। একেক সময় তার মনে হয়, এর চেয়ে বকুলকে নিয়ে তার সেই কৃপানাথ দে লেনেই প'ড়ে থাকা ভালো ছিল। বাড়িওয়ালী মাসীর মেয়ে আলতার মত বকুলেরও সেখানে দ[illegible]

আদর থাকত। আর বকুলের খাতির বাড়ত প্রমদার। সব ফিকির-ফন্দী বকুলকে সে দিত। যেমন বাড়িওয়ালী মাসী তার মেয়েকে। হয়ত তাদের মধ্যে মাঝে চুলোচুলি খুনোখুনি হোত, এসব তো আর তার মা বিনী মাসীর প্রমদা হ'তে দেখেছে। কিন্তু মিটে গেলে আবার সুখ-দুঃখের স্রোত দুজনের মধ্যে. একজন আর র যত্ন করত, মাতাল হয়ে পড়ে বিছানায় তুলে দিত, খারাপ সেখ হলে প্রাণ দিয়ে সেবা মা মেয়ে কেউ কারো কাছে কিছু না। কেউ কাউকে ঘৃণা করত নিজের রক্তমাংসের মেয়েকে একেবারে পর করে পেত প্রমদা। বকুল র কাছ থেকে এমন দূরে দূরে পারত না, মনে মনে এমন ক'রে পারত না। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে দিয়ে আহাম্মুকিই করেছে প্রমদা। কলেজের পড়া শেষ করে চাকরি একমাস বাদে যখন মাইনের টাকা তার হাতে এনে দিল বকুল, মন অন্যরকম হয়ে গেল। সে যা করেছিল তা নয়। মেয়েটার মনে তাহলে মায়ামমতা আছে।

ই কি সব টাকা বকুল?'

হ্যাঁ মা সব।'

ও রে, সব দিলি? তোর নিজের কিছুই রাখলিনে?'

না মা, তোমার কাছেই সব থাক।'

সেখানি বিশ্বাস আলতা তার মাকে না। নিজের রোজগারের পুরো তো ভালো, অর্ধেক টাকা, সিকি সে মাকে প্রাণ ধরে দিত না না। তার চেয়ে প্রমদার বকুল গুণে ভালো, লক্ষ গুণে ভালো।

প্রমদা এগিয়ে এসে সস্নেহে মেয়ের তুলে ধরল, 'হ্যাঁরে বকুল আমি তোর কাছে রোজগার চেয়েছি, টাকা ?'

বকুল বলল, 'কিন্তু সংসারে টাকারও দরকার আছে মা।'

প্রমদা বলল, 'না কোন দরকার নেই। আমি যেমন ক'রে পারি আনব। ঝি-গিরি করব, পান বিক্রী করব। টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোর কাছে আমি টাকা চাইনে।'

বকুল মৃদুস্বরে বলল, 'তবে তুমি কি চাও।'

'কি চাই? হতভাগী, তা কি তুই এতদিনেও বুঝতে পারলিনে? আমি আমার জামাই চাই, ঘরভরা নাতি-নাতনী চাই। সেই দোতলা-বাড়ির বউয়ের মত আমি তোকে ভরা সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই যে বকুল।'

প্রমদার দু'চোখ জলে ভরে উঠল।

বকুল কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

তারপর খেতে বসে মাকে আনমনা করার জন্যে নিজের অফিসের গল্প শুরু করল। খুব বড় অফিস। ঠিক যে তেতলা বাড়িটার সামনে বসে প্রমদা পান বিক্রি করত, সেই বাড়ি। বকুলের মত আরো কত মেয়ে আছে সেখানে? শুধু মেয়ে? না শুধু মেয়ে না, ছেলেরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। মিলেমিশে কাজ করতে প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করত বকুলের, এখন আর করে না।

প্রমদা অবাক হয়ে বলে, 'বলিস কি? আমাকে একদিন দেখিয়ে আনবি?'

বকুল হেসে বলে, 'বেশ তো, যেয়ো একদিন।'

কিন্তু ওই কথাই। সত্যিসত্যি প্রমদাও যায় না, বকুলেরও তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন গরজ নেই।

তারপর মাস পাঁচছয় চাকরি করতে না করতেই মেয়ের বেশেবাসে চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রমদা। আগে পরত আটপৌরে মিলের শাড়ি, এখন রঙীন তাঁতের শাড়ি পরেই বের হয়। সে রঙ কখনো সবুজ, কখনো গোলাপী, কখনো হলদে। বকুলের নিজের গায়ের রঙ গৌর। ওকে সব রঙই মানায়। আগে চুলের রাশ ছিল যেন বাবুই পাখীর বাসা; এখন বকুল নিজেই বিনুনী করে। সে বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচ পর্যন্ত যায়। কোনদিন বা আলগা খোঁপা বাঁধে বকুল। তাতেও ওকে চমৎকার দেখায়। স্নো পাউডারের দিকে এতকাল মেয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন একেকটি করে সে সবও আসতে শুরু করেছে। সময় বুঝে নিজের হার, চুড়ি আর দুল মেয়েকে বের করে দিল প্রমদা। এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। কিন্তু বকুল কিছুতেই পারেনি।

এবার বলল, 'ওই সব ডিজাইন আজকাল কেউ পরে নাকি মা?'

প্রমদা মনে মনে হাসল, 'ভিতরে ভিতরে সব জ্ঞানই দেখি আছে মেয়ের।'

বকুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হাসছ যে।'

প্রমদা বলল, 'হাসলাম আবার কই। বেশ তো ওসব ডিজাইন পুরোন হয়ে গিয়ে থাকে, হালের নতুন ডিজাইন গড়িয়ে নে।' দু'বার বলবার পর নিমরাজী, তিনবারের বার পুরোপুরি রাজী হয়ে গেল বকুল।

তারপর ক্রমে মেয়ের চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে আরো অনেক কথা টের পেত প্রমদা। এ কেবল শাড়ি বদল নয়, মেয়ের ঘর বদলের দিনও এসেছে। বকুল আজকাল আর শুধু মনে মনে বই পড়ে না সুর করে ছড়া আওড়ায়। ছড়া বললে বকুল ভারি রাগ করে। ও বলে কবিতা বেশ না হয় কবিতাই হোল। তুই যা বলে খুশি হোস তাই বল। এতদিন বইয়ের শুকনো পাতা ছাড়া কোন দিকে মেয়ের লক্ষ্য ছিল না। এখন গোছায় গোছা নিয়ে আসে রজনীগন্ধার ডাঁটা। একদিন চোখে পড়ল বকুলের খোঁপায় লাল গোলা ফুল গোঁজা।

ও যখন ছোট ছিল এক বিছানা শুত প্রমদা। কিন্তু বড় হওয়ার পর মে নিজেই আলাদা বিছানা করে নিয়েছে কিন্তু সে বিছানাও প্রমদা নিজে পেতে দেয়। মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে মেয়ে বিছানার কাছে সেদিন একবার দাঁড়া প্রমদা, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞা করল, 'বকুল আমার কাছে ত লুকোসনি। বল না সে কে।'

তার পায়ের ধুলো আর একজন এসে নেবে। প্রমদা ভেবেছিল, ওরা দুজনে এক সংগে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেবে। সেদিন আর এল না। আজ না আসুক, একদিন আসবেই। যেমন ক'রে পারুক বকুলের বিয়ে দেবেই প্রমদা। বয়সের মেয়ে। শরীর সারতে ওর আর ক'দিন লাগবে।

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস্। কত দূরে?'

বকুল বলল, 'দূরে নয় মা। এই শহরের মধ্যে। খুব ভালো ডাক্তারখানা। ভারি যত্ন করে। টাকা পেলে তারা সব করে।'

প্রমদা বলল, 'আমাকে ঠিকানা দিয়ে যা। আমি দেখতে যাব।'

একটু ইতস্তত ক'রে একটুকরো কাগজে মাকে ঠিকানাটা লিখে দিল বকুল।

প্রমদা সেই কাগজখানা হাত পেতে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া।'

তারপর বাক্সর ভিতর থেকে একটা পুরোন কবচ এনে বকুলের বাহুতে যত্ন ক'রে বেঁধে দিয়ে বলল, 'এটা পরে থাকিস্ বকুল। আমাদের সেই বিনী মাসীর দেওয়া কবচ। আপদে বিপদে সকলেই এতে ফল পেয়েছে। তুই তো বিনী মাসীর কাছে গেলিনে। ও সময় কিন্তু তার নামটা স্মরণ করিস। ধন্বন্তরী আমাদের বিনী মাসী। পুরো নাম বিনোদিনী দাসী। মনে থাকবে বকুল?'

বকুল একটু হেসে বলল, 'থাকবে।'

দু'দিন বাদে সেই গোপন ডাক্তারখানার লোকই রাত্রির অন্ধকারে গোপন সংবাদ বয়ে নিয়ে এল। বকুলকে বাঁচানো যায়নি।

মাসকয়েকের জন্যে মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল প্রমদার। পোড়া অফিসের ঘরে ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে দাবী করত, 'কে আমার মেয়েকে খুন করেছ, বাপের বেটা হও তো বল। তাকে ফিরিয়ে দাও।'

গোলমালে কাজের ক্ষতি হয়। অফিসের দারোয়ান পাগলীকে জোর ক'রে বের ক'রে দিয়েছে। তারপর থেকে কিছুতেই তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয়নি।

বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকতে ঠুকতে মাথা ফের ঠিক হয়ে গেছে প্রমদার। পাইকপাড়ার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আবার সে ঠিকে কাজ নিয়েছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটলি নিয়ে অফিসের সামনে আগের মত ফের বসতে শুরু করেছে। তার বকুলের অফিস।

পান বিক্রি করতে করতে প্রমদা প্রত্যেকটি যুবকের মুখের দিকে তাকায়। তার ঝাপসা চোখে আর জ্বালা নেই। সে জানে, কোনদিন সে শোধ নিতে পারবে না। শোধ নিতে আর চায়ও না প্রমদা। কি হবে শোধ নিয়ে। যে গেছে তাকে কি আর ফিরে পাবে। শোধ নিতে চায় না প্রমদা। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। তার বকুল যাকে ভালোবেসেছিল তার মুখখানা কেমন। সে মুখের সংগে কি আর একখানা মুখের মিল আছে।

ছাই রঙের স্যুট পরা সেক্সনের ইনচার্জ শ্যামল সেন পান খায় না। পানওয়ালীর কাছে যাওয়ার তার কোন দরকারও নেই। তবু সহকর্মীদের ভীড়ের মধ্যে নিজেকে গোপন রেখে রোজ অফিসে ঢোকবার আর বেরোবার পথে একবার করে দূর থেকে শ্যামল পানওয়ালীর দিকে তাকায়। রোজই তার যায় ওর কাছে, ধরা দেয়। এই ছদ্মবেশ সে যে আর বইতে পারে না, সইতে পারে না। কিন্তু বকুলের মা'র সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় দেওয়ার মত সাহসই বা তার কই।

ভজন সংগীতে মুসলমান ভক্তগণের দান

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

...লার পদাবলী কীর্তন রচনায় সৈয়দ মর্তুজা প্রভৃতি মুসলমান ...গণের দান যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি ভজন-সাহিত্যে মধ্যযুগের মুসল-ভক্তগণের দানও অতুলনীয়। পরম কবীর, নানক, ধর্মদাস, রুইদাস ...র উদার মধুর ধর্মোপদেশের প্রভাব মধ্যযুগের অনেক ...ান ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া ...ল। ভারতীয় ভক্তিধর্মের আদর্শ ...গকে এমন অনুপ্রাণিত করিয়া-ভক্তি-সাধনার স্নিগ্ধ রসে তাঁহাদের ...তদল এমন বিকশিত ও সৌরভ-...ইয়াছিল, তাঁহাদের মধুর কণ্ঠ ...ক্তর সুরে এমন ঝঙ্কার তুলিয়াছিল ...র ভারতে আজও তাহার প্রতিধ্বনি ...় পাওয়া যায়। ভক্ত-কবি রহিম, ...ন, ইয়ারী সাহেব, দরিয়া সাহেব, ... কারিম-বক্স, বাজিন্দ, বুল্লেশাহ, ...রবেশ, লতিফ হুসেন, নিজামুদ্দীন ... কাজী আশরফ মহমুদ প্রভৃতি ...ন ভক্তগণ রচিত ভজন সংগীত-... আজিও ভারতের ভজনপ্রিয় ...র হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত ...দিতেছে। তাঁহাদের কয়েকজনের ...সংগীতের পরিচয় এখানে দেওয়া ...।

রহিম

...ন্দী সাহিত্যে রহিমের নাম ...চিত। তাঁহার রচিত সকল ভজনই ...ক্তিরসে উৎসারিত। নিম্নোদ্ধৃত ... থেকেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

...র আওন মোহনলাল কী।
...ছিনি কাছে কলিত মুরলি কর,
পীত পিছোরী সালকী॥
...ক তিলক বেকসরকো কীনে'
দুতি মানো বিধু বালকী।
...সরত নাহি' সখী, মো মানতে'
চিতওনি নয়ন বিমালকী॥
...কী হ'সনি অধর সুধরানিকী,
ছবি ছীনী' সুমন গুলালকী।
...সৌ দারি দিয়ৌ পুরইন পর,
ডোলনী মুকুতা মালকী॥
...প মোল বিন মোলনি ডোলনি,
বোলনি মদন গোপালকী।
...হ সুরূপ নিরখৈ সোই জানৈ;
ইয়া রহিমকে হালকী॥
(রাগশুদ্ধ কল্যাণ—তাল তেতালা)

রসখানি

...ক্ষমূলক সংগীত রচনায় রসখানি' সাহেবও রহিমের মতই সুপটু ছিলেন। তদরচিত গানও একটি এখানে নিদর্শন-স্বরূপ দেওয়া হইল।

দ্রৌপদী ঔ গণিকা, গজ, গীধ,
অজামিল সৌ কিয়ো সো ন পিহারো।
গৌতম গেহিনী কৈসে তরী
প্রহ্লাদকী কৈসে হরয়ো দুখভার॥
কাহেকো সোচ করে রসখানি,
কহা করিহই রবি নন্দ বিচারো।
কৌনকী সংক পরী হৈ জু মাখন
চাখনহারা হৈ মাখন হারো॥
(রাগ সংকরা—তাল তেতালা)

ইয়ারী সাহেব ও দরিয়া সাহেব

পরম সংত কবীরের সাধনাবলে যে শুধু মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পাইয়াছিল, তাহা নয়; অসংখ্য মুসলমান ভক্ত মিথ্যা সম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া কাজী ও মোল্লার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহারা কবীরের সম্প্রদায়িকত্বকে নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবীর ছিলেন সর্ব-মানব সর্ব-সম্প্রদায়-পূজ্য পরম পুরুষের পূজারী। সংগুরুর আশ্রয়ে শব্দযোগ ও নিবৃত্তি-মার্গের ভক্তি-সাধনাই কবীরের ধর্মোপ-দেশের অন্তরস্থিত মর্ম কথা। মুসলমান সংত ইয়ারী সাহেব ও দরিয়া সাহেব সেই শব্দযোগের পন্থায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের রচিত ভজনমালা হইতেই অনুভূত হইবে।

ইয়ারী সাহেবের ভজন

মন মেরে সদা খেলৈ নটবাজী,
চরণকমল চিত রাজী।
বিনু করতাল পখাওজ বাজৈ
অগম পংথ চড়ি গাজী॥
রূপবিহীন সীস বিনু গাওঐ
বিনু চরণন গতি সাজী।
বাঁস সুমেরু সুরতিকৈ ডোরী,
চিত চেতন সংগ চেলা।
পাঁচ পচীস তমাসা দেখহি'
উলটি গগন চরি খেলা॥
ইয়ারী নট ঐসী বিধি খেলৈ,
অনহদ ঢোল বজাওঐ।
অনন্ত কলী অতগতি অনমূরতি,
বাণক বণি বণি আওঐ॥
(রাগ সারংগ—তাল তেতালা)
গগন গুফামে' বৈঠিকে রে,
অজপা জপৈ বিন জীভ সেতী॥
ত্রিকুটী সংগম জোতি হৈ রে
তহ' দেখি লেওঐ গুরুজ্ঞান সেতী॥
সুন্ন গুফামে' ধ্যান ধরৈ অনহদ
সুনৈ বিন কান সেতী।
ইয়ারী কহৈ সো সাধু হৈ রে,
বিচার লেও ঐ গুরু ধ্যান সেতী॥
(রাগ খাম্বাজ—তাল কাহারবা)

দরিয়া সাহেবের ভজন

ইয়ারী সাহেবের চেয়ে তাঁহার গানে কবীর-ভজনের প্রভাব আরও বেশী। অনাহত শব্দ-সাধনাসম্ভূত আনন্দের অনুভূতি তাঁহার ভজনমালায় অধিকতর প্রকাশমান ঃ—

পতিব্রতা পতি মিলী হৈ লাগ,
জহ' গগন মণ্ডল মে' পরম ভাগ।
জহ' জল বিন ক'ওলা বহু অনন্ত,
জহ' বপু বিনু ভৌরা গুংজরন্ত।
অনহদ বাণী জহ' অগম খেল,
জহ' দীপক জরৈ বিন বাতী তৈল॥
জহ' অনহদ সব্দ হৈ করত ঘোর
বিনু মুখ বোলৈ চাত্রিক মোর।
জহ' বিন রসনা গুণ বদতি নারি,
বিন পাগ পাতর নিরত কারি॥
জহ' জল বিন সরওর ভরাপুর,
জহ' অনন্ত জোত বিন চন্দ সুর।
বারহ মাস জহ' রিতু বসন্ত,
ধরৈ ধ্যান জহ' অনন্ত সন্ত।
ত্রিকুটী সুখমন জহ' চুওঅত ছীর,
বিন বাদল বরসৈ মুক্তি নীর॥
অমরত ধাবা জহ' চলৈ সীর
কোই পীওঐ বিরলা সন্ত ধীর।
রারংকার ধুন অরূপ এক,
সুরত গহী উনহীকী টেক।
জন দরিয়া বৈরাট চুর।
জহ' বিরলা পহুচৈ সন্ত সুর॥
(রাগ দেশ—তাল তেতালা)

নাজীর, ইন্‌সা প্রভৃতি ভক্তগণের ভজনমালায় আবার কৃষ্ণলীলার বিষয় বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। নাজীর সাহেব শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ে দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন, আর প্রেমের ঠাকুর বালগোপালের বাল্যলীলা বন্ধুদের ডাকিয়া শুনাইয়াছেনঃ—

ইয়ারো সুনো ইয়ে দধিকে লুটৈয়াকা বালপন,
ঔ মধুপুরী নগরকে বসৈয়াকা বালপন।
মোহন সরূপ নৃত্য করৈয়াকা বালপন,
বনবনকে গোয়াল গৌওঐ চরৈয়াকা বালপন,
ঐসা থা বাঁসুরীকে বজৈয়াকা বালপন,
ক্যা ক্যা কহুঁ মৈঁ কৃষ্ণ কনহৈয়াকা বালপন।

ইন্‌সা সাহেব মহারাজ কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—

জব ছাঁড়ি করীল কী কুংজনকো
ওয়হাঁ দ্বারকা সে হরি যায় ছয়ে।
কলধৌতকে ধাম বনায় ঘনে
মহারাজনকে মহারাজ ভয়ে।
তজ মোরকে পংখ ঔ কামরিয়া
কছু ঔরহি নাতে হৈ জোড়লয়ে।
ধরি রূপ নয়ে কিয়ে নেহ নয়ে
অব গইয়াঁ চরাইওকো ভুল গয়ে।
(রাগ কাফী—তাল তেতলা)

আদিল সাহেব প্রেম-বিহ্বল কণ্ঠে ইষ্টদেবতা কৃষ্ণকে আবাহন করিয়াছেনঃ—

মুকুটকী চটক লটক বিম্ব কুণ্ডলকী
সোঁহকী মটক নেকু আঁখিন দেখাউরে।
এরে বনওয়ারী বলিহারী জাও তেরী মেরী
গৈল ফিন আয় নেকু গায়ন চরাই রে।
'আদিল' সুজান রূপ গুণকে নিধান কাহ্ন
বাঁসুরী বজায় তন তপন বুঝাউ রে।
নন্দকে কিসোর চিতচোর মোর পংখওয়ারে
বংসীওয়ারে সাঁওরে পিয়ারে, ইত আওরে।
(রাগ ঝাঁঝোটী—তাল তেতালা)

কাজী অশরফ মহম্মুদের ভজন বাঙলা কীর্তনের ঢঙে রচিত। হিন্দী-সাহিত্যে তাঁহার কবিতার মত অনুপ্রাস-মুখর ললিত ছন্দের ভক্তি-মধুর কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নাই। কবি চৈতীরাগে আপনার প্রভুকে ডাকিয়াছেনঃ-

ঠুমুক ঠুমুক পগ কুমুক কুঞ্জ মগ
চপল চরণ হরি আয়ে
হো হো চপল চরণ হরি আয়ে,
মোর প্রাণ ভুলাওন আয়ে
মেরে নয়ন ভুলাওন আয়ে
নিমিক ঝিমিক ঝিম
নিমিক ঝিমিক ঝিম
নর্তন পদ ব্রজ আয়ে
হো হো ভৃংগরংগ হরি আয়ে
মেরে প্রাণ ভুলাওন ইত্যাদি
অরুণ করুণ সম
ছিন্ন ভিন্ন তম
করণ বাল রবি আয়ে
হো হো করণ বাল রবি আয়ে।
মেরে প্রাণ ভুলাওন আয়ে ইত্যাদি।

অমল কমল কর
মুরলি মধুর ধর
বংশী বজাওন আয়ে
হো হো বংশীবজাওন আয়ে,
মেরে প্রাণ ভুলাওন ইত্যাদি
পুংজ পুংজ হর
কুংজ গুংজ ভর
ভৃংগরংগ হরি আয়ে
হো হো ভৃংগরংগ হরি আয়ে
মেরে প্রাণ ভুলাওন আয়ে ইত্যাদি।

ঝুন ঝুন দুল দুল
মংজুল বুলবুল
ফুল্ল মুকুল হরি আয়ে
হো হো ফুল্ল মুকুল হরি আয়ে
মেরে প্রাণ ভুলাওন ইত্যাদি
মেরে নয়ন ভুলাওন আয়ে॥

এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় ভারতী ভক্তিধর্মে দীক্ষিত মুসলমান সাধ সাম্প্রদায়িকতা বিদ্বেষমুক্ত একটা মহাজা গঠনের সাধনায় জীবনপাত করিয়াছেন পাত করেন নাই, জীবন সা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনে সাধক মুক্তকণ্ঠে হিন্দু-মুসলমা মিলনের গান গাহিয়াছেন। দীন দর তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ তিনি শুধু ভারতীয় ভক্তিমার্গ অবলম্ব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। হিন্দ মুসলমানদের সকল কলহ ভুলিয়া হইতে উপদেশ দিয়াছেন। দর সাহেবের সে উপদেশ কত মূল্য তাহা পাঠকমাত্রেই অনুভব করি পারিবেন।

হিন্দু কহে হম বরে মুসলমান কহে হম
এক মুংগ দো ফাড় হৈ কুণ জাদ কুণ কম
কুণ জাদা কুণ কাম কভী নাহিঁ করণ
এক ভগত হো রাম দুজা রহিম নসে
কহে 'দীন দরবেশ' দোয় সরিতা মিল
সবকা সাহেব এক, এক মুশিলম, এক হি

মুসলমান ভক্তগণের রচিত ভ গানের সামান্য পরিচয় মাত্র এখ দেওয়া গেল। মধ্যযুগের অস মুসলমান ভক্তের মরমী সাধনালব্ধ ভ সংগীত হিন্দী সাহিত্যকে সম করিয়াছে। বিভেদবিশ্লিষ্ট ভার এই ঘোর দুর্দিনে এই সকল মহাত্মা মহামুক্তি-সাধকদিগকে আমাদের শ্রদ্ধার স্মরণ করা উচিত।
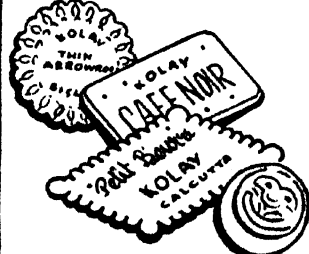
চিত্র প্রদর্শনী

ত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীতে একদিকে যেরূপ াদীদের কর্মতৎপরতা বাড়িয়া , অন্যদিকে সেইরূপ শিল্পিগণও র চিত্র প্রদর্শনী লইয়া ব্যস্ত হইয়া ছেন। গত এক মাসের মধ্যে নীতে অনেকগুলি প্রদর্শনী ত হইয়াছে যথা টেলিগ্রাফ শতাব্দী

পর্যাপ্ত ফসল'—ত্রিলোক কউল

ী (এখনও চলিতেছে), শ্রীরামনাথ চা ও ত্রিলোক কউলের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী (One man show) ও শিল্পিচক্রের চতুর্থ বার্ষিক চিত্র নী। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীতেই প্রচুর গম হইয়াছিল, এবং অল্প হইলেও কয়ের নমুনা হইতে বুঝা যায় যে, ন জীবনে চিত্রশিল্পের মূল্য যে নি, তাহা দেশের জনসাধারণ ধীরে উপলব্ধি করিতেছেন।

দীর্ঘ একশত বৎসর যাবৎ টেলি- এদেশে কিভাবে ধীরে ধীরে গড়িয়া ছে, টেলিগ্রাফ প্রদর্শনীতে প্রধানত নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও চার্টের মা দেখান হইয়াছে। কিন্তু পাছে ধারণের চিত্ত এই নীরস কলকব্জার হাঁপাইয়া উঠে, সেজন্য সরকার পক্ষ নীর প্রবেশ পথেই কয়েকটি ভিত্তি-চিত্র স্থাপন করিয়া সকলের, বিশেষভাবে শিল্পিবৃন্দের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কারণ জাতীয় সরকারের প্রচারকার্যে যে এদেশের শিল্পিগণ কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন, এই চিত্রগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ধীরে ধীরে এদেশে টেলিগ্রাফ কি প্রকারে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারই বিচিত্র ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে, অপরূপ বর্ণ-বিন্যাসে এই ভিত্তি চিত্রগুলিতে দেখান হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া নিখিল ভারত চারুকলা ও শিল্প সমিতির কয়েকজন উদীয়মান শিল্পী যে কয়-খানি চিত্র অংকিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই উপভোগ্য ও সেই জন্যই সেগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অন্য তিনটি প্রদর্শনীর চিত্রগুলি বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পার্শরিচা প্রধানত প্রকৃতির উপাসক। কারণ তাঁহার সমস্ত চিত্রই প্রাকৃতিক দৃশ্যমূলক; শিল্পিচক্রগোষ্ঠীর চিত্রাবলীর মধ্যে দেখা যায় পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও অতি আধুনিক শিল্পের বিকাশ এবং কউলের চিত্রে সন্ধান পাওয়া যায় নানা বর্ণের সমাবেশ ও বৈচিত্র্য।

ভারতের প্রধান সেনানায়ক জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র সিংজী নিখিল ভারত চারু ও কলা সমিতির হলে রামনাথ পার্শরিচার চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। রামনাথ বয়সে তরুণ। লেখাপড়া শেষ করিয়া সকলের মত তিনিও চাকুরীবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু অফিসের দৈনন্দিন, গতানুগতিক জীবন তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহার শিল্পরসিক চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে ও তিনি দিল্লীর সারদা উকিল আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। অফিসের কাজ শেষ করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় তিনি সেখানে নিয়মিত শিল্প শিক্ষা করেন ও স্বীয় প্রতিভা বলে শীঘ্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রদর্শনীতে রামনাথ ৯৭খানি চিত্র (জল রং) ও ২৯খানি স্কেচ পেশ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কয়েকখানি চিত্র তিনি প্রদর্শন না করিলেই পারিতেন,

'নিরালা পাইন'—রামনাথ পার্শরিচা

কারণ সেগুলির মধ্যে না আছে কোনো বর্ণচাতুরী বা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য। তবে অন্যান্য চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, রামনাথ প্রকৃতির পূজারী। কলকোলাহল মুখরিত শহরের গণ্ডীর বাহিরে, বিশেষ করিয়া শ্যামশোভা-সমন্বিত শৈলশিখর ভূমিই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সারা গিরি উপত্যকা সপ্ত বর্ণের বিচিত্র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে বা দিবাভাগে যখন অকস্মাৎ তন্দ্রাভারাক্রান্ত চক্ষু পল্লবের মত ধীরে ধীরে কুয়াসা নামিয়া আসিয়া চতুর্দিকে এক অপূর্ব মায়ালোক সৃষ্টি করে, তখন রামনাথ আর স্থির থাকিতে পারেন না। তাই তাঁর চিত্রের মধ্যে কেবলই দেখা যায় শৈলশিখরের উপর আলোক ও

ছায়ার অপরূপ সমাবেশ অথবা ক্রমবর্ধমান কুয়াসার মোহ ও মায়াজাল বিস্তার। সেই জন্যই "চাকরাতায় কুয়াসা" (Mist over Chakrata) চিত্রখানি সকলেরই চোখে পড়ে। লঘু বর্ণের সাহায্যে কুয়াসাচ্ছন্ন একটি পার্বত্যপথ তিনি অতিশয় মুন্সীয়ানার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। মাত্র স্বল্প রেখায় ও তদনুরূপ লঘু বর্ণের মধ্য দিয়া একটি পত্রবিহীন পাইন বৃক্ষ যে কিরূপে শৈলশ্রেণীর রাজসিক গাম্ভীর্য ও স্তব্ধ নীরবতা প্রকাশ করিতে পারে "নিরালা পাইন" (The Lone Pine) চিত্রে তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে 'গুলমার্গ' ও 'কুয়াসা' উল্লেখযোগ্য।

ফ্রী ম্যাসন্‌স হলে অনুষ্ঠিত শিল্পি-চক্রের প্রদর্শনীতে চিত্র ও মূর্তি শিল্প লইয়া মোট ৮২খানি দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। গোষ্ঠীর ২০জন সভ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ধনরাজ ভাগৎ (মূর্তি শিল্প), ভবেশ সান্যাল, দিনকর কৌশিক, কে এস কুলকার্নি, কানোয়াল কৃষ্ণ ও পি এন মাগোর নাম উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশই তৈলচিত্র ও তাহাদের বিষয়বস্তুর মধ্যেও বিশেষ কোনো নূতনত্ব নাই। উপরন্তু দুই একজন শিল্পীর কাজ দেখিলেই বোঝা যায় যে, তাঁহারা বিদেশী অনুপ্রেরণা লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, সুতরাং তাঁদের চিত্রে না আছে মৌলিকত্ব, না আছে প্রাণ। তৈল চিত্রগুলির মধ্যে ভবেশ সান্যালের "কাজের পথে" (Work-bound) চিত্রখানি উপভোগ্য। স্বাভাবিক বর্ণ সমন্বয়ের মধ্য দিয়া তিনি একটি মজুর রমণীর রূপ সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আলোক ও ছায়ার সমাবেশে "রিক্সাকুলী" চিত্রখানিতে পি এন মাগো দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। দিনকর কৌশিক অঙ্কিত চিত্রগুলি (জল রং) সর্বপ্রথমেই এই প্রদর্শনীর চোখে পড়ে। স্বল্প, সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ রেখা-নৈপুণ্য, সামান্য ও স্বাভাবিক লঘু বর্ণ সমন্বয় ও সর্বোপরি নিখুঁত ও নিজস্ব অঙ্কন ভঙ্গিমার দ্বারা শিল্পী 'কাশ্মীরা-বাদক' ও 'বেহালাবাদক' চিত্র দুইখানিতে সত্যই যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অঙ্কিত অন্যান্য চিত্রের মধ্যে

'জাগরণ'—ধনরাজ ভগত
(শিল্পীচক্র)

পণ্ডিত শ্রীনিবাসের 'মা ও ছেলে' এবং অবিনাশ চন্দ্রের 'নিশাকাল বাঁধ' ও কে এস কুলকার্নির 'নব দম্পতি'র নাম করা যাইতে পারে।

মূর্তি শিল্পের মধ্যে প্রদর্শনীতে যে বস্তুটি প্রথমেই সকলের চোখে পড়ে, সেটি ধনরাজ ভগতের 'জাগরণ' (awakening)। সিমেণ্ট কংক্রীটে প্রস্তুত এই বিরাট, রূপক মূর্তিখানি পাশ্চাত্য প্রভাবে গঠিত হইলেও নানা কারণে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুদীর্ঘ কাল মিথ্যা মোহ ও অন্ধকারের মধ্যে জীবনযাপন করিয়া সহসা যেন কেহ একদিন নবজীবনের সন্ধান পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে, শিল্পী এই ভাবটুকু রূপক মূর্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। কল্পনার বলিষ্ঠতা, স্থান সমন্বয়, নমনীয় গঠনকৌশল—সর্বোপরি শারীরিক ছন্দ ও অপরূপ প্রকাশ ভঙ্গিমা যেন এই মূর্তিটিকে একটি সংগীতের মূর্চ্ছনার রূপদান করিয়াছে।

ত্রিলোক কউলের প্রদর্শনী ফ্রী ম্যাসন্‌স হলে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিলোকও বয়সে নবীন ও প্রদর্শনীতে তিনি মোট ৫৪খানি চিত্র প্রদর্শন করেন। তন্মধ্যে ৫খানি তৈলচিত্র, ৪০খানি জল রঙে (Water colour) অঙ্কিত ও অবশিষ্ট কয়েকখানি কাঠ খোদাই (Wood cut)। প্রদর্শনীর সব কয়খানি চিত্র লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, শিল্পী প্রধানত জল রঙের পক্ষপাতী হইলেও তিনি সবক্ষেত্রে ভারতীয় অংকন পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। জল রঙ ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির সমন্বয়ে কয়েকটি চিত্রে তিনি একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেবলমাত্র গাঢ় পীত ও প্রয়োজনমত দুই একটি লঘু বর্ণ সমাবেশের সাহায্যে "পর্যাপ্ত ফসল" (Bumper Harvest) চিত্রে তিনি কল্যাণরূপা, হাস্যময়ী লক্ষ্মীদেবীর রূপক রূপদান করিয়াছেন। অপরূপ বর্ণ-বৈষম্য, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও অনাবশ্যক রঙ ব্যবহার পরিহার করার ফলে "দ্রুকজানে পপ্‌লার শোভিত কুঁড়ে ঘর' ' (Poplars and Huts, Drugjan) চিত্রখানি সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। তৈলচিত্রগুলি দেখিলে মনে হয় যে, শিল্পী এখনও এই ক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো ধারার সন্ধান পান নাই, তাই এগুলির মধ্যে কোনো মৌলিকত্বের আভাস পাওয়া যায় না। তবে 'জুনি গয়লানী' (Zooni The milk maid) চিত্রখানিতে তিনি ভারতীয় লোক-শিল্পকে ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে একটি নূতন রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

কাঠ খোদাইয়ে শিল্পী এখনও হাত পাকাইতে পারেন নাই, তবে 'ঝীলাম' ও 'কুড়ে ঘর' চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।

—চিত্রপ্রিয়

শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি আর্টিস্ট্রি হাউসে শিল্পী শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায়ের একটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পী হিসেবে তার একক আত্মপ্রকাশ এই প্রথম হলেও কোন কোন চিত্ররসিক মহল থেকে প্রশংসিত অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। যে শিল্পীর রচনা দেখলে সম্প্রতিকালের শিল্পাচার্যদের রচনা স্মরণ করিয়ে দেয়, নিঃসংশয়েই তার প্রতিভা প্রথম

[...]াই অসামান্য! এই সিদ্ধান্ত [...] করে নিতে পারলে অবশ্যই [...]য়া যেতো। কিন্তু দৃষ্টি-[...] বিভিন্নতার দরুণ অনেকেই [...]ই আত্মপ্রতারণায় রাজী হবেন [...]াঁরা মনে করেন আধুনিক [...] শিল্পকলার ক্ষেত্রে (যার [...] এখনো ফরাসী দেশ) নিত্য-[...] শিল্পতত্ত্বের উদ্ভব হচ্ছে, তাই [...]আধুনিক শিল্পভাবনার মূলতত্ত্ব [...] শিল্পসৃষ্টি যতোখানি সেই [...]নুবর্তী তা শিল্প হিসেবে [...] সার্থক. তাঁরা শ্রীমতী মুখো-[...] শিল্পসৃষ্টি দেখে অবশ্যাই [...] হবেন। অতি আধুনিক [...]াসীদের সবচেয়ে বড়ো দুটি [...] আধুনিক ফরাসী চিত্রকলা ও [...]আর্ট, এই দুই সম্পদের স্পর্শ [...]ার শিল্পে আছে। সুতরাং [...] থেকে বিচার করলে বাঙলা [...] তার আবির্ভাবের মূল্য যে অনেকখানি, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অবশ্য একটি সরল দৃষ্টিভঙ্গী, পরিচ্ছন্ন রূপ রচনা আর উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার, শিল্পরচনার এই গুণে তাঁর ছবি প্রথমেই দর্শককে আকর্ষণ করবে। দৃষ্টি আকর্ষণের এই সহজ কৌশলকে অতিক্রম করলে রীতি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে। অধিকাংশ ছবি দেখে হঠাৎ মনে হবে যে, দেশীয় পুতুলের বিশেষত্বটুকু তার ছবির গঠন-সৃষ্টির মূল রহস্য। কিন্তু দেশী পুতুলের সমগ্র ডিজাইনের ঐক্য যে একটি সুষম ছন্দের সৃষ্টি করে, তার আভাস দু-একটি ছবি ব্যতীত কোথাও লক্ষ্য করা গেলো না। তারপর দেশী পুতুলে গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে শিল্পীর ভাব কল্পনার একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক থাকে, সে রকম কোন ঐক্যসূত্রের পরিচয় অধিকাংশ ছবিতে দুর্লভ। দেশী পুতুলের রূপ-কল্পনার আদর্শ গ্রহণ এক্ষেত্রে নিছক শিল্পবিলাস বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অনেক ছবিতে প্যাটার্ন সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও কোথাও তা জমাট হয়ে ওঠে নি।

বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে শিল্পী যদিও গতানুগতিক, তবুও সময়ে সময়ে বিষয়ের বিকৃতি রীতিমতো হাস্যকর। ভারতনাট্যম ছবিটি কি শ্লেষরচনা (caricature) বলেই প্রতীয়মান হবে না? এই নৃত্য উল্লাসের মধ্যে চিত্র-রচনার কোন বিশিষ্ট গুণ উদ্ভাসিত হচ্ছে? 'মাতৃসম্ভাবিতা' ছবিটির মধ্যে কোন নন্দন সৌকর্য ধরা দিয়েছে?

বহুবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও কোন কোন ছবির মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিকোণে বিশিষ্টতা ধরা দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কলসী নিয়ে রমণী, শোক, শকুন্তলা, কালী প্রভৃতি ছবির উল্লেখ করা যেতে পারে। সমসাময়িক শিল্পমতবাদের যে মোহ আজ তাকে আচ্ছন্ন করে আছে, তার থেকে মুক্ত হলে অবশ্যাই তার কাছ থেকে আরো স্বকীয় সৃষ্টির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হবে। —সহস্রাক্ষ

[...]

[...]াসির দোলা : ভবানী মুখো-[...] ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং [...] ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। [...] টাকা।

[...]পন্যাসের প্রধান উপজীব্য প্রেম। [...] হয়তো বলে দেওয়া চলে, ঠোঁটে [...] সমাজের আত্মসচেতন একটি মেয়ের [...] ধ্যবিত্ত আদর্শবাদী ছেলের প্রেম, [...]বাহের পর পরস্পরকে সুখী করবার [...]ল বোঝা। ভুল বোঝার ট্র্যাজেডি [...]টল, শেষটায় আদর্শের বেদীতে [...] আত্মবলিদানে সর্বকিছু শেষ হয়ে [...]থায় বলে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু [...] কিছু বলে দিলে এ বইটির প্রতি [...]রা হবে। জীবনের অনেকখানি [...] থাকে, সেই প্রেম উপন্যাসের [...]হবে, এ কিছু বিচিত্র নয়। সেই [...]ব কোন্ পটভূমিকায় কেমন ফুটলো [...]ষ্টব্য। কান্নাহাসির দোলা উপন্যাসে [...] চৌধুরীদের প্রাচীন বাড়ির অভিনব [...]য় মিনতি আর জয়ন্তর প্রেম লেখক [...]রঙে এঁকেছেন, তার সবগুলোই [...]ণ্ধ নয়, কিন্তু বিভিন্ন রঙে সুন্দর [...]তা আছে।

নায়িকা মিনতির জবানিতে এ উপন্যাসের কাহিনী! চরিত্র বিশ্লেষণে মিনতির পটুতা এবং অপটুতা, দুটো বিষয়ই লেখকের রচনাশৈলী ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

বই-এর প্রচ্ছদপটটি ভারী সুন্দর। ছাপা পরিচ্ছন্ন। ৫০১।৫৩

অমর মিলন—ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য কর্তৃক ১ জয় ভট্টাচার্যের লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বাঙলাদেশের অন্যতম জননায়ক ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বজনপরিচিত ব্যক্তি। তিনি স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ, ত্যাগী কর্মী এবং সেবাধর্মের আদর্শে তাঁহার জীবন পরিনিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য উপন্যাস-খানিতে তিনি সেবার মূলীভূত প্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকারের মতে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।'' উপন্যাসখানিতে ডাঃ সুরেশচন্দ্র প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙলার বৈষ্ণবধর্মের এই রস-সাধনার মহিমার বিস্তার এবং বিকাশ সাধন করিয়াছেন।

গ্রন্থকার কাহিনী-বিন্যাসে প্রধানত রাজনীতিক আঙ্গিক ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু বৈষম্যমূলক বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনই তাঁহার লক্ষ্য। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে উপন্যাসখানির কাহিনীর অবতারণা। নবকুমার সাম্প্রদায়িকতান্ধ জনতাকে বীরবিক্রমে বাধা দিতে গিয়া প্রাণদান করেন। সোমেশের বাড়ী পদ্মা নদীর ধারে, একটি গ্রামের সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদ পাইয়া সে সেবাব্রতী কর্মিস্বরূপে চাঁদ-পুরে যায়। নবকুমারের মৃত্যুর সময় সে সেই বাড়ীতে উপস্থিত ছিল। এইভাবে নবকুমারের কন্যা ষোড়শীর সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটে। ষোড়শী এবং তাঁহার মাতা সোমেশের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লন। ক্রমে সোমেশের সঙ্গে ষোড়শীর সম্বন্ধ প্রগাঢ় হইয়া উঠে। ইতোপূর্বে সোমেশ কলিকাতার পাইকপাড়ার মোহিনীর সংশ্রবে গিয়া, তাহার ভালবাসায় পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহকে উপেক্ষা করিয়া সোমেশ বৃহৎ আদর্শের তাড়নায় চাঁদপুরে

গিয়া ষোড়শীদের পরিবারের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়ে। ষোড়শীর পিতৃব্য কলিকাতায় বাড়ী ঠিক করিয়া তাহাদিগকে কলিকাতা লইয়া আসেন। সোমেশও আসিয়া পুনরায় পাইকপাড়ার তরুণদের দলে ভিড়ে। পরে মোহিনীর সঙ্গে সোমেশের বিবাহ হইয়া যায়। এদিকে ষোড়শীর পিতৃব্য কিছু জমি কিনিয়া উদ্বাস্তুদের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সোমেশ সেই কলোনীতে যাতায়াত করিতে থাকে এবং ক্রমে ষোড়শীর প্রতি সর্মাধক আকৃষ্ট হয়। এইভাবে মোহিনীর সঙ্গে সোমেশের সম্পর্ক ক্রমশ ছিন্ন হইতে থাকে। সোমেশ ষোড়শীকে বিবাহ করিবে স্থির করে। মোহিনী ইহা বুঝিতে পারিয়া সোমেশের বাড়ী ছাড়িয়া নিজের বাড়ীতে চলিয়া যায়। পরে পুরীতে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার সুযোগ সে লাভ করে।

এদিকে ষোড়শী শিক্ষয়িত্রীর চাকুরী লইয়া বীরভূমে যায় এবং সেখানে সাঁওতালদের সেবায় প্রবৃত্ত হয়। অপরদিকে মোহিনী পুরীর কুষ্ঠাশ্রমের অধিনেত্রী। বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় নামক একটি যুবক এই কুষ্ঠাশ্রমে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া যায়। কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে করিতে মোহিনী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। বিজনকুমার ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে আপন করিয়া লয়—ত্যাগের ভিতর দিয়া, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছার ঊর্ধ্বে অমর-জীবনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

ওদিকে সাঁওতাল পরগণায় সেবাব্রতরতা ষোড়শী সাঁওতালদের জন্য ভূমি দাবী করিয়া অনশনব্রত অবলম্বন করে। পুলিশ গুলী চালায়, কয়েকজন হতাহত হয়। সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে ষোড়শীর ফটো প্রকাশিত হয়। সোমেশ সেই ফটো দেখিয়া বীরভূমে যায় এবং নিজেও অনশনব্রত অবলম্বন করে। ষোড়শীর মৃত্যু ঘটে,—অনশনব্রতী সোমেশের নিকট ষোড়শীর মৃতদেহ আনীত হইলে সেও শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সেবাসূত্রে মরণ-বরণের ভিতর দিয়া দুইটি জীবন এইভাবে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নিঃস্বার্থ সেবার আবেগ এবং আকুলতার আনন্দময় ছন্দ গ্রন্থকার চরিত্রগুলি সৃষ্টির ভিতর দিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব সাধনার কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার তাৎপর্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এক্ষেত্রে ষোড়শীদের প্রবীণ ভৃত্য ভজহরি নমঃশূদ্রের চরিত্রই প্রধান প্রেরণার উৎস। ভজহরি রাধাকৃষ্ণের নামে প্রেমে সর্বদাই আবিষ্ট অবস্থায় থাকিতেন। কৃষ্ণ-বিরহের জ্বালা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত। সময়ে ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তিনি বৈষ্ণব পদাবলী হইতে রসের গান কীর্তন করিয়া হৃদয়ের তাপ শীতল করিতেন। ষোড়শীর পিসিমা উমাশশী, এই ভজহরিকেই গুরুরূপে গ্রহণ করেন এবং নবদ্বীপে আশ্রম-বাসিনী হইয়া সেবাব্রতে নিমগ্ন হন। ষোড়শীর জীবনেও ভজহরির বৈষ্ণব-জীবনের প্রভাব সম্প্রসারিত হইয়াছিল। সোমেশ বিশুদ্ধ প্রেমের এই আকর্ষণেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বস্তুত মোহিনী কামভোগ চাহে, তাহার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের ইহাই কারণ। মোহিনী সোমেশের গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন সূত্রে উমাশশীর নবদ্বীপে অবস্থিতির কথা জানিতে পারে এবং তাঁহার বৈষ্ণব-জীবনের মাধুর্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এই সূত্রে সে ইহাও জানে যে, তিনি সোমেশেরই পিসিমা। মোহিনীর জীবনের ধারা পরিবর্তনের মুখে এইরূপে প্রত্যক্ষভাবে উমাশশী এবং পরোক্ষে ভজহরির মধুর জীবন তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

গ্রন্থকার রাজনীতিক আঙ্গিক যেভাবেই ব্যবহার করুন না—আমাদের তাহা বিচার্য নয়—আলোচ্য উপন্যাসখানিতে তিনি বাঙলার যাহা প্রকৃত প্রাণধর্ম, সকল শক্তির মূল উৎস যেখানে, তাহার প্রতি জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। সামাজিক বৈষম্য এবং অন্যায় ব্যবস্থাগুলির সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি জাতিকে সচেতন করিয়াছেন। ৪৭০।৫৩

প্রাচীন সাহিত্য

রাম-চরিত—ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম এ, পি এইচ ডি প্রণীত। সুরেশচন্দ্র দাস এম এ, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত 'রাম-চরিত' নামক কাব্যখানির ঐতিহাসিক মূল্যবত্তা এ দেশের মনীষী-সমাজে সুপরিচিত। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত এই কাব্যখানির তালপত্রে লিখিত একখানা পাণ্ডুলিপি নেপাল হইতে আনয়ন করেন। তৎপর গ্রন্থখানি লইয়া বাঙলায় ঐতিহাসিক গবেষণার নানাভাবে সূত্রপাত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর এই কাব্যখানি দ্ব্যর্থ-বোধক ভাষায় লিখিত। একপক্ষে তিনি রঘুপতি রামচন্দ্রের প্রশংসা কীর্তন, অন্যপক্ষে রাজা রামপালের কীর্তি কাহিনী বিস্তার করিয়াছেন। দুরূহ দ্বৈধভাবাত্মক এই কাব্যখানির সব শ্লোকের টীকা পাওয়া যায় নাই। অটীক অংশের ব্যাখ্যা লইয়া কঠিন সমস্যা সৃষ্টি হয়, কারণ রঘুপতি রামচন্দ্রের পক্ষীয় ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হইলেও সাত আট শত বৎসর পূর্বে লিখিত শ্লোকগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক এই তিনজন মনীষী মিলিতভাবে অটীক অংশের নিজেরা টীকা করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত টীকার সঙ্গে যুক্ত করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহা প্রকা[শিত] হয়। পরে সমগ্র গ্রন্থের ইংরেজী অনু[বাদ] প্রকাশিত হয়। তদনুযায়ী বাঙলায় আলো[চ্য] সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজা রামপালের যুগ বাংলা দে[শে] বিপ্লবের যুগ। রামপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রা[তা] বিগ্রহপালের প্রথম পুত্র রাজ্যভার গ্র[হণ] করিবার পর নীতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপে র[ত] হন। ইহার ফলে সামন্ত বিদ্রোহ ঘটে। রামপা[ল] এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। 'ভী[ম]' নামক কৈবর্ত ভূমিপতির জীবনাবসানে রা[ম]পালের বিশাল ভূজ কণ্ডুয়মান হইয়াছিল; কৈবর্তরাজ দিব্য বা দিব্বোক দ্বিতীয় মহী[]পালকে হত্যা করিয়া রাজা হন। র[াম]পাল মাতামহকুলের বান্ধবদের সাহা[য্যে] এই সব বিপর্যয় হইতে রাজ্যে শান্তি প্রতি[ষ্ঠা] করেন। দিব্বোক বরেন্দ্রের জনগ[ণ] দ্বারা নির্বাচিত হইয়া মহীপালের স্থ[ান] অধিকার করিয়াছিলেন, কোন কোন ঐ[তি]হাসিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, কি[ন্তু] গ্রন্থকার তেমন অভিমত সমর্থন ক[রি]তে পারেন নাই, কারণ সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণী[ত] রামচরিতে সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া য[ায়] না। কিন্তু দ্বিতীয় মহীপাল যে দুর্নী[তি]পরায়ণ ছিলেন, সন্ধ্যাকর নন্দীও এ ক[থা] স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুত রামপালের প্রশ[ংসা] কীর্তন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সু[তরাং] প্রজা-বিদ্রোহের প্রসঙ্গ চাপা দেওয়াই তাঁ[হার] পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নহে। সুপ[ণ্ডিত] গ্রন্থকার দিব্যকে রাজবিদ্রোহী বা অন্য কি[ছু] বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না; কি[ন্তু] "অনীতিকারম্ভরত" অর্থাৎ স্বেচ্ছা[চারী] রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে বিদ্রোহীর এ[ক] মর্যাদা আছে। সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহের মূ[লে] নিপীড়িত জনগণের সমর্থন থাকা দে[শের] বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে জাগ্রত জনসম[াজে] সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু বরেন্দ্রভূ[মি]তে তৎকালে ততটা গণতান্ত্রিক চেতনা জাগি[য়া] ছিল কিনা ইহার বিচার অন্য কথা; তাহা ঐতিহাসিকদেরই বিবেচ্য। সে বি[চার] আমাদের পক্ষে অনেকটা অবান্তর। একখানি ঐতিহাসিক দিক হইতে মূল্য[বান] গ্রন্থের মূল্য এবং সটীক অনুবাদ বা[ঙলা] ভাষায় প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার আমা[দের] একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়া[ছেন।] মনীষিগণ ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানকারী ই[তি]হাসের ছাত্রছাত্রীগণ এই কাব্য হইতে দে[শের] লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারে অনুপ্রাণিত হ[ইবেন] ইহাই আশা করা যায়। ৫৩০।

ছোট গল্প

বিভ্রান্ত বসন্ত : অবনী নন্দী। মা[] নন্দী কর্তৃক ময়মনসিংহ, পাকিস্তান [হইতে] প্রকাশিত। দাম আড়াই টাকা।

এগারোটি গল্পের শেষেরটির অনুযায়ী বই-এর নাম হয়েছে বি[ভ্রান্ত] বসন্ত। গল্পগুলো পড়ে লেখকের স্ব[]

ত্র বিষয় বলতে পারা যায় যে, ায় তাঁর সততা আছে, কিন্তু ধারণ নয়।' গল্পগুলির অধিকাংশই ক্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের মত শুধু কাকজ্যোৎস্না গল্পটিতে মতার পরিচয় পাওয়া যায়।
। ছাপা ভালো, প্রচ্ছদপটে রঙের টা বেপরোয়া না হলেই বোধ হয় ।।

প—অমূল্য রায়। প্রকাশক—ঃ বসু; ১৩ ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন কাতা—৬। এক টাকা চার আনা।
একটি কাব্যগ্রন্থ, মোট ন'টি কবিতা দওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেই ত কবির যে শক্তির পরিচয় পাওয়া ; আশা হয় নিষ্ঠা এবং অনুশীলন াকলে বাঙলা কাব্যসাহিত্যের আসরে তন্ত্র একটি আসন অধিকার করে বেন। তাঁর বিষয়বস্তু অসাধারণ নয়, ীও সহজ; তাতে সুন্দর একটি ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কে তিনি সহজ করে বলতে পারেন। ণে বিষয়বস্তুকে তিনি আকর্ষণীয় তে পারেন। প্রশংসার কথা, তাতে ই।
রূপ'-এর ছাপা বাঁধাই সুন্দর।
৫৩১।৫৩

দেশ

রে আলো (৩য় প্রবাহ): আলোক-শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ। শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যো-কর্তৃক অনুলিখিত এবং ১২।১ পতিতুণ্ডি লেন থেকে প্রকাশিত। টাকা বারো আনা।
' নামে পরিচিত শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথের লীর একটি সংকলন। শিষ্য ও ঙ্গে কথোপকথনকালে এই উপদেশা-ুলিখিত হয়। আমরা চোখ বুজে ন মনে করি সব অন্ধকার, আত্মপ্রত্যয় রে যদি চোখ মেলে তাকাতে পারি দখতে পাবো, জগতে অফুরন্ত সমারোহ। কদাচিৎ কোনো কোনো পুরুষে সেই আলোর সন্ধান পান, সেই সন্ধান দিতে চেষ্টা করেন। ীনৃপেন্দ্রনাথ সাধুপুরুষ, শক্তিমান তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, মন উদার, ভাষা সহজ। সবরকম পাঠকেরই বইটি াগবে।

সনা—শ্রীঅজিতকুমার মল্লিক প্রণীত। সংস্করণ। ডাঃ বিরলচাঁদ মল্লিক মনুষ্যত্ব সংস্থা, হাওড়া হইতে । মূল্য ২৲ টাকা।
; আপনাকে লইয়া মানুষ তৃপ্ত পারে না। অখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ন্ত শক্তি তাহার সঙ্গে যুক্ত হইবার আকুলতা মানুষের ভিতর রহিয়াছে। নিজেকে পূর্ণ করিবার প্রয়োজনেই পূর্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার প্রেরণা একান্তভাবে তাহাকে তাড়না করে। উপাসনার সাহায্যে জীবনের অপূর্ণতা সাধন সম্ভব নয়। গ্রন্থকার সাধক পুরুষ। তিনি সহজ ভাষায় সর্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে ভগবদুপাসনার ক্রম বা পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যাকুল আগ্রহই ঈশ্বরের কৃপালাভের উপায়। তিনি যে সকলেরই একান্ত আপন। গ্রন্থের পদ্যাংশে সর্বসাধারণের জন্য অত্যন্ত সরল ভাষায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং উন্নত জীবন লাভে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রহু গায়িত্রীর ব্যাখ্যাটিও সুন্দর। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ মনোরম। ৫৩২।৫৩

নয়াচীনের কথা

THE STRUGGLE FOR NEW CHINA—Soong Ching Ling. Foreign Languages Press, Peking.

১৯২৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৫২ সালের জুলাই—এই দীর্ঘ ছাব্বিবশ বছর ধরে মাদাম সান ইয়াৎ সেন যেসব রচনা লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন ও বিবৃতি দিয়েছেন এই বইটি তারই সংকলন। নয়াচীনের দীর্ঘকালীন আন্দোলন ও বিপ্লবের কাহিনী জানার জন্যে যাঁদের কৌতূহল আছে, তাঁরা এ-বই পড়ে তার একটা দিকের কথা কিছু জানতে পারবেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যে লড়াই, চীনাবাসীর ঐক্যের পক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গণরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধ ইত্যাদি বিবিধ ভাগে এই গ্রন্থ ভাগ করা। বইটি চীনের নবরাষ্ট্রের প্রচার-পুস্তিকা।

অনুবাদ সাহিত্য

ছোটদের **ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড**: শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত: শ্রীভারতী পাবলিশার্স: ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২: দাম দেড় টাকা।

ইংরেজী সাহিত্যে রবার্ট লুই স্টিভেন-সনের স্থানটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ক্ষয়রোগাক্রান্ত জীর্ণদেহ এই শিল্পী কল্পলোকের এক আশ্চর্য রহস্যনিকেতনের দরজা খুলে দিয়েছেন তাঁর লেখনী দিয়ে। জগত অবাস্তব হলেও অসত্য নয়। আজও পর্যন্ত আবালবৃদ্ধবনিতা স্টিভেনসনের সাহিত্যের সেই অদৃষ্টপূর্ব রহস্যলোকবিহারে পুলকিত। তাঁরই একখানি বিখ্যাত বই বাঙলায় ছোটদের উপযোগী করে অনুবাদ করেছেন শ্রীঅমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদ অনাড়ষ্ট। গল্পের গতি স্বচ্ছন্দ। গল্পের রহস্যময় আমেজটি প্রায় সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কর্তব্য সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন।
৩৮৮।৫৩

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সফল স্বপ্ন—এফ, প্যানফেরভ, অনুবাদক গিরীন চক্রবর্তী, চক্রবর্তী ব্রাদার্স, ১৬৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—৩৲। ৫২৮।৫৩

রাজনগর—ননীমাধব চৌধুরী, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—৪৲। ৫২৯।৫৩

সহজ রাজযোগ সাধন প্রণালী—স্বামী আত্মানন্দ তীর্থ কর্তৃক যোগাচার্য-আশ্রম, পোঃ—ত্রিবেণী, হুগলী হইতে প্রকাশিত, মূল্য—২৷৷৹। ৫৩০।৫৩

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ, ১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিতঃ—

ভিটিয়ার কাণ্ড—নিকোলাই নোসভ্, অনুবাদক—শেফালী নন্দী, মূল্য—২৷৷৹। ৫৩৪।৫৩

নয়া চীনে চল্লিশ দিন—ক্ষিতীশ বসু, মূল্য—৩৲। ৫৩৫।৫৩

মাও সে-তুং শৈশবে ও যৌবনে—এমি, সিয়াও, অনুবাদক—পরিমল চট্টোপাধ্যায়, মূল্য—৩৲। ৫৩৬।৫৩

ভাগবত ধর্ম—স্বামী ভূমানন্দ, শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র সিকদার কর্তৃক কালিপুর আশ্রম, কামাখ্যা—পোঃ, আসাম হইতে প্রকাশিত, মূল্য—২৲। ৫৩৭।৫৩

সন্ধানীর চোখে পশ্চিম—শেফালী নন্দী, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—২৷৹। ৫৩৮।৫৩

বিরূপাক্ষের বিচিত্র চরিত্র—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা, মূল্য—৩৲। ৫৩৯।৫৩

ক্ষয়রোগ কথা—ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, নিউ গাইড, ১২, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—৩৲। ৫৪০।৫৩

প্রদীপ
প্রোডাকশান্সের
শ্রদ্ধার্ঘ্য
রবীন্দ্রনাথের
শেষের কবিতা
পরিচালনা * মধু বসু
শ্রেষ্ঠাংশে
দীপ্তি রায় সাধনা বসু
চন্দ্রাবতী নির্মলকুমার
শুভারম্ভ শুক্রবার
৪ঠা ডিসেম্বর
চিত্রা * ইন্দিরা
লাইটহাউস
পরিবেশক
প্রভা পিকচার্স
অলকা — শ্যামাশ্রী — উদয়ন — নেত্র
(শিবপুর) (হাওড়া) (শেওড়াফুলী) (দমদম)
নিউ তরুণ — শ্রীদুর্গা — কৈরী
(বরানগর) (চন্দননগর) (চুঁচুড়া)
আজই আপনার আসন সংগ্রহ করুন

ঠাৎ প্রচণ্ড প্রলয় বা ভূমিকম্প হ'লে লোকালয়ে যে-রকম ত্রাসের , মানুষ যে-ভাবে বিভ্রান্ত হ'য়ে করে, চারিদিকে বিষম হুলু-ড় যায়, সেই রকম এক দারুণ র্ণ ব্যাপার ঘটেছিল একদা র অনেকগুলি শহরে এক-রণ শুনলে হাসবেন। রেডিওতে হচ্ছিল। সেই বেতার-অভিনয়ে এমন কতকগুলি আঙ্গিক করেছিলেন যার ফলে লক্ষ লক্ষ ভিনয় অভিনয় নয় মনে ক'রে হোয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দেশ-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল। মতো এবং শোনাবার মতো

জি ওয়েলস্-এর একখানি বই নাম, The War of the একদা কেমন করে মঙ্গল গ্রহ ভুত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আকার সৈন্যদল পৃথিবীতে ন প্রায় অর্ধেক ভূমণ্ডল ধ্বংস লেছিল, কেমন ক'রে অবশেষে পরাজিত ক'রে তারা জীবাণু-তে লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত তারই এক কাল্পনিক কাহিনী ীয় ভঙ্গীতে ও ভাষায় উক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। ধুনা চিত্রাভিনেতা অর্সন্ সেই কাহিনীকে বেতারের করে অভিনয়ের আয়োজন 'সংবাদ-প্রচার", "প্রত্যক্ষদর্শীর "বিশেষ ঘোষণা" প্রভৃতি রেডিওর লি তিনি তার অভিনয়ের মধ্যে হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। শান্তভাবে অভিনয় শুরু হ'ল। এক নাতিদীর্ঘ উদ্বোধনী-গ্রন্থকারের মর্মকথা হিসাবে স, বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে টন ঘটছে, বিজ্ঞান জগতে তুমুল র সৃষ্টি হয়েছে এবং গতি কোথায় কীভাবে নিয়ন্ত্রিত কান বিজ্ঞানবিদ্ বুঝতে পারছেন তারা আশা করছেন যে, শীঘ্রই

বেতারে তাজ্জব ব্যাপার

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কোন একটা বড় ঘটনা ঘটবে। বক্তৃতা শেষ হোলে এক "ঘোষক" আবহাওয়ার সংবাদ জানালেন দু'চার কথায়। তারপর গান-বাজনা শোনা যেতে লাগল।

দু' তিন মিনিট পরেই হঠাৎ বাজনা থেমে গেল এবং এক বিশেষ "সংবাদ" প্রচারিত হল। সংবাদে জানা গেল শিকাগোর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ এই মাত্র মঙ্গলগ্রহে উপর্যুপরি কয়েকবার তীব্র আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ দেখেছেন এবং সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের আভাসও পেয়েছেন। অতিশয় সন্ত্রস্ত বোধ করছেন তিনি।

পরক্ষণেই এক বিশেষ "সংবাদ" প্রচারিত হল। তাতে বলা হলঃ "এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে, ট্রেন্‌টনের বাইশ মাইল দূরে গ্রোভার মিল নামক স্থানে এক ধানের গোলার কাছে আকাশ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা পড়েছে। একশ' দুশো মাইল দূর থেকে তার তীব্র আলো আর পতনের ভীষণ শব্দ শোনা গেছে! অতঃপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ" শুরু হল। তিনি বলতে লাগলেন, তিনি সেই আগুনের গোলার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, অগ্নিময় পদার্থটা গোলাকৃতি নয়, লম্বা ধরণের প্রকাণ্ড চোঙার মতো, রুগীকে অক্সিজেন গ্যাস দেবার জন্যে যে ধরণের লোহার চোঙায় গ্যাস ভর্তি করা হয়, সেই রকম আকার, তার চেয়ে অনেক গুণ বড়। কী ভীষণ তার আকৃতি আর তার গা দিয়ে কী দারুণ উত্তাপ বেরুচ্ছে! লোকজন ছুটে পালাচ্ছে। চারিদিকে গোলমাল......"

সংবাদদাতা ক্ষণেকের জন্যে থামলেন, তার পর তারস্বরে পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন—"এ কী ভয়ংকর দৃশ্য দেখছি চোখের সামনে......জীবনে এরকম ব্যাপার দেখিনি......মঙ্গলগ্রহ থেকে যে চোঙাটা পড়েছে তার ভিতর থেকে কী যেন হামা-গুড়ি দিয়ে বেরুচ্ছে......কী ওটা?...... মানুষ তো নয়......হাত পা আছে ব'লে যেন মনে হচ্ছে......মুখ দেখা যাচ্ছে না... কালো মুখোশের ভিতর থেকে দুটো গোল আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে......চোখের মতো মনে হচ্ছে......একটার পর আর একটা......ক্রমাগত বেরুচ্ছে......প্রকাণ্ড ভালুকের মতো চেহারা......কী ভীষণ... আকার বর্ণনা করা যায় না......।"

কণ্ঠরুদ্ধ হল প্রত্যক্ষদর্শীর। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন "ঘোষক" বললেন— "ভয়ংকর সংবাদ জানাচ্ছি। মঙ্গলগ্রহের সাংঘাতিক দানবরা পৃথিবীতে নেমেছে। কয়েকজন পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হোয়ে তাদের ধরবার জন্যে এগিয়ে গিছল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক রোমাঞ্চ-কর ভয়াবহ ব্যাপার ঘটল। দানবদের কপাল থেকে এমন এক তীব্র রশ্মি বিচ্ছুরিত হল যার স্পর্শ পাবামাত্র পুলিশ ক'জন প্রাণ হারিয়ে মাটিতে পড়ল। আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতাও সেই আগুনের ছোঁয়া লেগে প্রাণ হারিয়েছেন।"

অতঃপর ঘন ঘন "সংবাদ" আসতে লাগল। মঙ্গলীয় অদ্ভুতদর্শন জন্তুরা চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। বিষাক্ত গ্যাসে আকাশ ভরে গেছে। মানুষ মরছে অনবরত। ইতিমধ্যে নিউজার্সির সেনাবাহিনী বেরিয়ে মঙ্গলগ্রহের রাক্ষসদের প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছে। চারিদিকে উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলা। সেই বিশৃঙ্খলার মাঝখান দিয়ে সৈন্যরা এগিয়ে গেল। কিন্তু এক অবিশ্বাস্য ভয়ানক ব্যাপার ঘটল। মঙ্গলগ্রহের সেই বিরাট চোঙাটার গায়ে হাত পা গজাল এবং সেটা ভীষণ গর্জন করতে করতে সৈন্যদের দিকে ধাবিত হল। তার চাপে পড়ে সৈন্যরা পিষে গেল, তার আগুনের তাপে তাদের শরীর ঝলসে কয়লা হয়ে গেল। সাত হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র একশ' কুড়িজন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হল।

সৈন্যদের শেষ করে সেই বিকটদর্শন ভয়ঙ্কর যন্ত্রদানব নিউ ইয়র্কের দিকে ছুটল। তার সংঘাতে সেতু ভেঙে পড়ল, বড় বড় অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে গেল. হাজার হাজার মানুষ সেই দানবের দেহ থেকে নির্গত বিষ-বাষ্পের ক্রিয়ায় প্রাণ ত্যাগ করল। নিউ ইয়র্ক শহরের ব্রডকাস্টিং অট্টালিকার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে একজন "ঘোষক" সেই সব ধ্বংস লীলার বিবরণ দিলেন। তিনি বলতে লাগলেন—'শত্রুকে দেখা যাচ্ছে দূরে। পাঁচটা ভীষণাকার চোঙা হাড্‌সনের ওপর দিয়ে আসছে। কোন কিছুই তাদের পথ রোধ করতে পারছে না। এই মাত্র আর এক ভীষণ দুঃসংবাদ এলো। মঙ্গলগ্রহ থেকে বিষ-বাষ্পভরা চোঙা দেশের নানা স্থানে পড়ছে......আর রক্ষা নেই......শহর ধ্বংস হোতে দেরী নেই......কালো কালো বিষের ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেছে......নরনারীর আর্ত চীৎকার চারিদিকে......ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাহাড়ের মতো আকার ধারণ করে এগিয়ে আসছে......এগিয়ে আসছে... আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না......।"

"ঘোষকের" কণ্ঠস্বর থেমে গেল। গম্ভীর গলায় আর একজন ঘোষণাকারী সংবাদ দিলেন—"এই মাত্র যে ঘোষকের কথা আপনারা শুনছিলেন, তিনি মঙ্গলগ্রহের বিষের ধোঁয়ায় দম আটকে মারা পড়েছেন।"

কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কর্তৃক সেই অভিনয় প্রচারিত হচ্ছিল। প্রায় ৬০ লক্ষ লোক সেই অনুষ্ঠান শুনেছিল, তার মধ্যে বিশ লক্ষ লোক অভিনয়কে সত্যি বলে মনে করেছিল। সেই বিশ লক্ষ নরনারীর বাস এক স্থানে নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরে ও নগরে। তাই তাদের বিশ্বাসের ফলে দেশের বহু স্থানে প্রচণ্ড ত্রাস, উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা এবং শোকের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল। পুলিশ ফাঁড়িতে, খবরের কাগজের আপিসে আর বেতার কেন্দ্রসমূহে আর্তকণ্ঠে টেলিফোন আসার বিরাম ছিল না। মঙ্গলীয় মৃত্যুদূত তাদের কাছে এসে পড়ল এই আতঙ্কে ক্রন্দনরতা মায়েরা তাদের শিশুদের বুকে জড়িয়ে ধরে ভগবানকে ডাকতে লাগল। লোকজন পাগলের মতো রাস্তায় বেরিয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। অনেকে ভিজে কম্বলে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে ঘরে শুয়ে কাঁপতে লাগল। ভিজে কম্বলে বিষের ধোঁয়ার ক্রিয়া রুদ্ধ হবে, এই ধারণা অনেকের মনে উদয় হয়েছিল। যাদের মোটর গাড়ি ছিল তাদের অনেকেই মোটরে চেপে দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে শহর থেকে দূরে পালাতে লাগল। সে এক ভীষণ ব্যাপার! রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ভীড়ের চাপে পড়ে কত মানুষ যে অজ্ঞান হয়ে গেল তার সংখ্যা নেই।

কয়েক মিনিট বাজনার পর বেতারে অভিনয়ের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হল। আধ ঘণ্টা ব্যাপী সেই দ্বিতীয় অঙ্কে শোনা গেল যে ধ্বংসের পর আবার জনপদগুলি ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠতে লাগল। মঙ্গলগ্রহের আক্রমণকারীরা নিহত হল। মানুষের সকল অস্ত্র তাদের প্রতি নিষ্ফল হবার পর, ভগবান যেসব উদ্ভিজ্জাণু পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছিলেন, তাদের দ্বারাই মঙ্গলীয় শত্রুরা নিহত হল। উদ্ভিজ্জাণু-বিষক্রিয়া মঙ্গলীয় বিষ-বাষ্পধরেরা সহ্য করতে পারলে না।

দ্বিতীয়ার্ধের সেই আশাদায়ক প্রচারকার্য তথা অভিনয় শোনার পরেও শ্রোতাদের আতঙ্ক যায়নি। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বহুক্ষণ অবধি ত্রস্ত আর্ত চীৎকা আর উত্তেজনায় আলোড়িত হতে লাগল সংবাদপত্রের আপিসে আর থানায় টেলি ফোন বাজার শেষ রইল না। রাত আ টার পর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তার বিভি স্থানের সম্পাদকদের জানালেন যে, দেশ ময় এই যে ছত্রভঙ্গ ব্যাপার তার মূ কোন সত্যিই নেই, War of the Worl নামক বইখানির বেতার অভিনয়ের ফ এই রকম অবিশ্বাস্য ঘটনাসমূহের সৃ হয়েছে।

একটি নাটক অভিনয় করতে গিয়ে এই রকম ধারণাতীত হুলুস্থুলে ব্যাপ ঘটবে তা বেতার কর্তৃপক্ষ স্বপ্নেও ভা পারেননি। বিব্রত বিমূঢ় অবস্থায় তাঁ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিশেষ ঘোষণায় জানা লাগলেন যে, শ্রোতারা অনর্থক আতঙ্কি হয়েছেন, যা শুনে তাঁরা বিচলিত হ ছেন, তা সত্যিকারের সংবাদ নয়, তা এক অভিনয়।

অভিনয়ের প্রযোজক অর্সন্ ও লেস্-ও এই অভিনয়ের আয়োজন ক সে রাতে কম বিব্রত ও বিপন্ন হন যখন লোক বুঝলে যে ব্যাপারটা আস সত্যি নয়, তখন মার মার শব্দে ধেয়ে এলো বেতার আপিসের দিকে কোথায় অর্সন ওয়েলেস্? দেখি এক বাছাধনকে! আমাদের এক নাগাড়ে ম ফন্দি! ছুটে এলো খবরের কাগজে সংবাদদাতারা বেতার কেন্দ্রে। ওয়েলে আর তাঁর সঙ্গীরা তখন আপিস বা এক অন্ধকার মহলে একটি রুদ্ধদ্বার ঘ আত্মগোপন করে বসে আছেন। অ রাত্রে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁ বাড়ি পালালেন।

যদিও শেষ পর্যন্ত মামলা আদাল পর্যন্ত পৌঁছায়নি, তাহলেও ওয়েলেস এর বিরুদ্ধে অনেকগুলি ক্ষতিপূরণ মামলা রুজু করা হোয়েছিল; সর্বসমে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। কাগজে কাগজে বহু লেখালেখি, অনেক দুঃখ প্রকাশ, সে সঙ্গে কিছু হাসি-মস্করা—কিছুদিন দে আর অন্য কথা ছিল না। অর্সন্ ওয়েলেস বেচারা তো বহুদিন লোকালয়ে মু দেখাতে সাহস করেননি!

অনুবাদ : শিবনারায়ণ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চও।

য়ডেরারের বাগানবাড়ীর মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ছোট্ট বাড়ী। একটা বিছানা, কটা কাবার্ড, আরামকেদারা, কেদারা। াবাবপত্রের ওপরে মেয়েদের নানা াাক পরিচ্ছদ ইতস্তত ছড়ানো। ােটা একরাশ স্যুটকেসের নীচে চাপা চছে।

সকা বাক্স প্যাঁটরা খুলছে। জানালা ়া একবার বাইরে দেখে, তারপর কোণে দাঁড় করানো "এইচ, বি" ক্ষর লেখা একটা বন্ধ স্যুটকেসের ছ যায়, সেটা টেনে নামায়, জানলা ়া বাইরে আর একবার দেখে নেয়, ়পর কাবার্ডে ঝোলানো ছেলেদের টা স্যুটের কাছে যায়। তারপর দ্রুত টকেসটা হাতড়ে তা হতে কিছু একটা করে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে া দেখে। আবার জানলার দিকে । তারপর তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা ় করে চাবীটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে া। হাতে যে জিনিসগুলো ছিল াতাড়ি তোষকের নীচে লুকিয়ে লে। হুগো ঢোকে।

। ভেবেছিলাম ,ওরা বুঝি কোনদিন ার **থামবে না। আমি যে এতক্ষণ** ়লাম না, **খুব একঘেয়ে লাগছিল?**

কা। ভয়নাক।

। কি করছিলে?

কা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

। ঘুমিয়ে পড়লে আবার **একঘেয়ে** াাগবে **কি করে?**

যেসিকা। স্বপ্ন দেখলাম যে, খুব একঘেয়ে লাগছে, তাই উঠে পড়লাম। তাইত বাক্স খুলতে লেগে গেছি। [বিছানা আসবাবপত্রের পরে এলোমেলো ছড়ানো কাপড় জামার স্তূপের দিকে দেখায়।]

হুগো। তাইত' দেখছি।

যেসিকা। কি রকম লোকটা?

হুগো। কে?

যেসিকা। হোয়েডেরার।

হুগো। হোয়েডেরার? নিতান্ত সাধারণ লোক।

যেসিকা। বয়েস কত?

হুগো। দু' বয়েসের মাঝামাঝি।

যেসিকা। কোন দুই?

হুগো। বিশ আর ষাট।

যেসিকা। লম্বা না বেঁটে?

হুগো। মাঝামাঝি।

যেসিকা। কোন বিশেষ চিহ্ন আছে?

হুগো। একটা নীলচে দাগ, একটা কাঁচের চোখ, আর একটা পরচুলো।

যেসিকা। চালাকী **করছ,** না? আমাকে খ্যাপানো **হচ্ছে।** ভাল করেই জান তাকে বর্ণনা করার সাধ্য তোমার নেই।

হুগো। খুব আছে।

যেসিকা। না, নেই। কি রং-এর চোখ বলত।

হুগো। পাঁশুটে।

যেসিকা। মৌমাছি, তোমার ধারণা সব মানুষেরই চোখের রং পাঁশুটে। মানুষের নীল চোখ থাকে, বাদামী চোখ থাকে, সবুজ চোখ থাকে, কালো চোখ থাকে। অনেকের আবার ফিকে বেগুনী রঙের চোখ পর্যন্ত থাকে। বলত, আমার চোখ কি রঙের? [চট্ করে হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে] দেখোনা কিন্তু।

হুগো। নীল।

যেসিকা। তুমি দেখে নিয়েছ।

হুগো। মোটেই না। তুমিই তো আমাকে সকালে বলেছ।

যেসিকা। বোকা কোথাকার। [কাছ ঘেঁষে] হুগো, ভাল করে ভেবে মনে করত, ওর কি গোঁফ আছে?

হুগো। না। [থেমে, একটু পরে জোরের সঙ্গে] আমি নিঃসন্দেহ, ওর গোঁফ নেই।

যেসিকা। [বিষণ্ণভাবে] যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম।

হুগো। [খুব ভেবে নিয়ে, জোরে] ও একটা ফুটকি ফুটকি মারা টাই পরেছিল।

যেসিকা। ফুটকি মারা?

হুগো। ফুটকি দেওয়া।

যেসিকা। যাঃ!

হুগো। ঐ যে...এই রকমের [বো-টাই বাঁধার ভঙ্গী করে]...বুঝলে না?

যেসিকা। আমি জানতাম, আমি ঠিক জানতাম। ও যতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তুমি শুধু ওর টাইয়ের দিকে চেয়েছিলে। হুগো—ও নিশ্চয়ই তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

হুগো। মোটেই না।

যেসিকা। নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।

হুগো। ও ভয় পাওয়াবার মত লোকই না।

যেসিকা। তাহলে ওর টাই-এর দিকে চেয়েছিলে কেন?

হুগো। ও যাতে ভয় না পায় তারি জন্যে।

যেসিকা। বুঝেছি। আচ্ছা, মৌমাছি, তাহলে তাই। আমি একবার ওকে একনজর দেখে নিই। তারপরে ও কেমন দেখতে যদি জানতে ইচ্ছে

করে, তাহলে শুধু একবার আমাকে জিজ্ঞেস কোরো। কি বলল?

হুগো। আমি ওকে বললাম আমার বাবা টোম্‌ক্‌ কয়লাখনির ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট্‌। আমি পার্টিতে যোগ দেবার পরে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে।

যেসিকা। ও কি বলল?

হুগো। চমৎকার।

যেসিকা। তারপরে?

হুগো। আমি ওকে খোলাখুলিই বললাম যে, আমি উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেছি। তবে এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে, আমি মোটেই বুদ্ধিসর্ব্বস্ব নই—সেক্রেটারী হিসাবে নকলনবিশী করতে আমার একটুও সংকোচ নেই। বোঝালাম যে, হুকুম মানা আর নিয়মের কড়াকড়ি মত চলাকে আমি আত্মসম্মানের ব্যাপার বলেই মনে করি।

যেসিকা। তাতে সে কি বললে?

হুগো। চমৎকার।

যেসিকা। এতেই দুঘণ্টা লেগে গেল?

হুগো। মাঝে মাঝে থামতে হয়েছে তো।

যেসিকা। তুমি নিজে অন্যদের কি বলেছ সে কথাই খালি আমাকে বল, অন্যরা তোমাকে কি বলে তাতো কখনো বল না।

হুগো। আমার ধারণা অন্যলোকের চাইতে আমার কথায় তোমার আগ্রহ বেশী।

যেসিকা। তাত' বটেই, সোনা। কিন্তু তোমাকে যে আমি জানি। অন্যদের যে আমি জানি না।

হুগো। তুমি কি হোয়েডেরারকে জানতে চাও?

যেসিকা। আমি সকলকেই জানতে চাই।

হুগো। হুঁ। ও নিতান্ত সাধারণ মানুষ।

যেসিকা। তুমি কি করে জানলে? তুমি ত' ওর দিকে চাওইনি।

হুগো। ফুটকিমারা টাই শুধু সাধারণ লোকেরাই পরতে পারে।

যেসিকা। গ্রীকসম্রাজ্ঞীরা তাদের বর্ব্বর সেনাপতিদের সঙ্গে ঘুমোত।

হুগো। গ্রীসে কোন সম্রাজ্ঞী ছিল না।

যেসিকা। বাইজান্‌টিয়ামে ত' ছিল।

হুগো। বাইজান্‌টিয়ামে গ্রীক সম্রাজ্ঞী আর বর্ব্বর সেনাপতি ছিল বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে কি করত তার কোন বিবরণ লেখা নেই।

যেসিকা। তা ছাড়া আবার কি করত? [একটু থেমে] ও তোমায় জিজ্ঞেস করল না আমি কেমন দেখতে?

হুগো। না।

যেসিকা। জিজ্ঞেস করলেও তুমি ত' কিছু বলতে পারতে না। তুমি জানই না।

হুগো। না। তাছাড়া ওর জন্যে মাথা-ঘামানোর সময় এখন ফুরিয়ে এসেছে।

যেসিকা। কেন?

হুগো। মুখ বন্ধ রাখতে পারবে?

যেসিকা। দুহাত দিয়ে রাখব।

হুগো। ও মরতে চলেছে।

যেসিকা। কেন, অসুখ করেছে?

হুগো। না, ওকে আততায়ীদের হাতে মরতে হবে। সব রাজনৈতিক নেতা-দের যেমন হয়।

যেসিকা। ও। [থেমে] তাহলে তোমার কি হবে মৌমাছি? তুমিও কি রাজনৈতিক লোক?

হুগো। নিশ্চয়।

যেসিকা। তাহলে রাজনৈতিক লোকের বিধবা কি করবে?

হুগো। স্বামীর দলে যোগ দিয়ে তার অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যাবে।

যেসিকা। ও বাবাঃ। আমি বরং তার কবরের পরে আত্মহত্যা করব।

হুগো। সে আজকাল আর কোথাও হয় না এক মালাবারে ছাড়া।

যেসিকা। বেশ, তাহলে শোন আমি কি করব। আমি তখন একজন একজন করে তোমার প্রত্যেক আততায়ীর কাছে যাব। তাদের আমি পাগলের মত আমার প্রেমে পড়াব। তারপর যখন তারা ভাববে যে, আমার দর্পী বেদনার্ত্ত মনে তারা বুঝি সান্ত্বনা দিতে পারে, তখন তাদের কালো কালো বুকগুলোয় আমি একটা করে ছোরা আমূল বসিয়ে দেব।

হুগো। কোনটাতে তোমার বেশী মজা লাগবে? তাদের খুন করতে না তাদের ফোসলাতে?

যেসিকা। তুমি একটা নিরেট অসভ্য।

হুগো। আমরা খেলছি কি খেলছি না?

যেসিকা। আমরা মোটেই এখন খেলছি না। বাক্স-পেটরাগুলো খুলতে দাও।

হুগো। ও এখন থাকগে।

যেসিকা। সব ত' খোলা হোয়ে গেছে তোমারটা শুধু বাকি। চাবীর গোছাটা দাও।

হুগো। তোমায় দিলাম যে।

যেসিকা। [দৃশ্যের গোড়ায় যে স্যুট কেসটা খুলেছিল সেটা দেখিয়ে] ঐটের দাওনি।

হুগো। ওটা আমি নিজে খুলব।

যেসিকা। মানিক, ও তোমার কাজ নয়।

হুগো। এ আবার তোমার কাজ কবে হতে হোল? তুমি কি এখন গেরস্থালী খেলা খেলছ নাকি?

যেসিকা। তুমি যে বিপ্লবী বিপ্লবী খেলছ।

হুগো। বিপ্লবীদের গেরস্থ বউয়ে কোন দরকার নেই।

যেসিকা। বিপ্লবীদের যে তামাটে মেয়ে বেশী পছন্দ। তোমার ওলগা সখীর মত।

হুগো। হিংসে?

যেসিকা। ইচ্ছে করছে। ও খেলা কখনো খেলিনি। খেলবে?

হুগো। তোমার যদি ভাল লাগে।

যেসিকা। বেশ। চাবীটা দাও।

হুগো। কখনো না।

যেসিকা। ও স্যুটকেসে কি আছে?

হুগো। ভয়ানক লজ্জার সে গুপ্তকথা।

যেসিকা। কি গুপ্তকথা?

হুগো। আমি আমার বাবার ছেলে নই।

যেসিকা। তাহলে তো তোমার খুব মজা হয় হুজুর। কিন্তু সে অসম্ভব তোমার বাবার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল বড্ড বেশী।

হুগো। মিথ্যে কথা! আচ্ছা যেসিকা তোমার সত্যিই মনে হয় আমি বাবার মত?

যেসিকা। আমরা খেলছি কি খেলছি না?

হুগো। খেলছি।

যেসিকা। স্যুটকেসটা খোল।

হুগো। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি কিছুতেই খুলব না।

যেসিকা। ওটা নিশ্চয়ই তোমার প্রণয়িনীর

[..]ত ঠাসা—নয়তো ফোটোতে।
[..] বলছি।
কখনো না।
খোল, খোল কিন্তু।
না, না, না।
তুমি কি খেলছ?
হ্যাঁ।
বেশ। তাহলে এবার আব্বা।
[..]য় এখন আর খেলছি না।
[..]রে খোল।
আব্বা নেই। আমি খুলব না।
না খুললে। আমি জানি ওতে আছে।
কি?

[..]। এই...এটা...[তোষকের নীচে [..] কিছু বার করে। তারপর [..]জের হাতদুটো হুগোর পিছনে [..]য় একতাড়া ফোটো নেড়ে দেখায়] [..]লো!

যেসিকা!

[..]। [বিজয়িনীর মত] তোমার [..]ল স্যুটে চাবী ছিল। আমি [..]নি তোমার প্রণয়িনী, রাজকন্যা, [..]াজ্ঞীটি কে? আমিও না, তোমার [..]মাটে মেয়েও না,—তোমার প্রেমিক [..]মি নিজে, সোনা, তুমি নিজে। বাক্সে [..]মার নিজের বারোখানা ফোটো [..]লে!

[..]। ফিরিয়ে দাও।

[..]। তোমার ঘুমঘুম কৈশোরের [বা]রোখানা ছবি। তিন বছরের, [..]বছরের, আট, বারো আর ষোল [ব]ছরের। তোমার বাবা তোমাকে বাড়ি[..]তে তাড়িয়ে দেবার সময়ে এগুলো [..]নয়ে এসেছিলে। এরা তোমার সংগে [..]ংগে সব জায়গায় ঘুরছে। নিজেকে [..]ক ভালটাই না বাস!

[..]। যেসিকা, আমি কিন্তু এখন [খে]লছি না।

[..]। ছ'বছর বয়েসে খুব শক্ত কলার [..]রতে। তোমার রোগা ছোট্ট গলায় [..]নশ্চয় খুব লাগত। বো-টাই, মখ[..]মলের স্যুট পরনে!

[..]। [এতক্ষণ চুপচাপ ছেড়ে দেওয়ার ভান করেছিল, হঠাৎ যেসিকার পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে] পাজী শয়তান মেয়ে! দিয়ে দাও, দিয়ে দাও বলছি।

যেসিকা। এই, ছেড়ে দাও! [দুজনে জড়াজড়ি করে বিছানায় পড়ে] এই, এই, দুজনেই মারা যাব যে।

হুগো। ওগুলো দিয়ে দাও আগে।

যেসিকা। বলছি হঠাৎ ছুটে যেতে পারে! [হুগো উঠে পড়ে। যেসিকা তার পেছনে লুকিয়ে রাখা রিভলভারটা দেখিয়ে] আমি বাক্সে এটাও পেয়েছি।

হুগো। দিয়ে দাও আমাকে।

রিভলভারটা তার হাত হতে নিয়ে নেয়। ঝোলানো স্যুটের কাছে গিয়ে চাবীটা বার করে, স্যুটকেস খুলে রিভলভারের সংগে ফোটোগুলো তুলে রেখে দেয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

যেসিকা। ও রিভলবার কিসের জন্যে?

হুগো। আমি সব সময়ে একটা সংগে রাখি।

যেসিকা। মিথ্যে কথা। এখানে আসার আগে তোমার কাছে কোনদিন রিভলবার ছিল না। কেন এটা সংগে রেখেছ?

হুগো। জানতে চাও?

যেসিকা। হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি করে বলো। তোমার জীবন হতে আমাকে সরিয়ে রাখার কোন অধিকার তোমার নেই।

হুগো। কাউকে বলবে না?

যেসিকা। কাউকে না।

হুগো। আমি এখানে হোয়েডেরারকে খুন করতে এসেছি।

যেসিকা। তুমি সত্যি অসহ্য, হুগো। বললাম না যে, মোটেই এখন খেলা করছি না।

হুগো। হাঃ! হাঃ! আমি খেলা করছি? না, সত্যি সত্যি বলছি? রহস্য...

যেসিকা। তুমি তাকে কেন খুন করতে চাও? তুমি তাকে চেন না পর্যন্ত।

হুগো। যাতে আমার বউ আমাকে খানিকটা গুরুত্ব দেয়।

যেসিকা। আমি তোমায় পুজো করব, লুকিয়ে রাখব, খাবার এনে খাওয়াব; তোমার গুপ্ত জায়গায় তোমাকে দেখাশোনা করব। আর যখন শেষটায় প্রতিবেশীরা আমাদের ধরিয়ে দেবে তখন সৈন্যদের ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে তোমাকে বুকে জড়িয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে বলব—"আমি তোমায় ভালবাসি..."

হুগো। এখন বল?

যেসিকা। কি?

হুগো। তুমি আমায় ভালবাস।

যেসিকা। আমি তোমায় ভালবাসি।

হুগো। ঠিক করে বল।

যেসিকা। আমি তোমায় ভালবাসি।

হুগো। ও ঠিক করে হোল না।

যেসিকা। হোল কি তোমার? খেলছ কি?

হুগো। না, খেলছি না।

যেসিকা। তবে আমাকে অমন করে বলছ কেন? অমনত' তুমি কর না।

হুগো। কি জানি। ভাবতে ভালো লাগে তুমি আমায় ভালবাস। এ আমার অধিকার, তাই না? তাহলে বল তাই। ভাল করে, সত্যি করে।

যেসিকা। তোমায় ভালবাসি। তোমায় ভালবাসি। না। তোমায় ভালবাসি। ধুৎ, চুলোয় যাও। তুমি কেমন করে বলতে শুনি?

হুগো। আমি তোমায় ভালবাসি।

যেসিকা। দেখলে তো। তুমিও কিছু আমার চাইতে ভাল করে বলতে পার না।

হুগো। যেসিকা, তোমায় এইমাত্র যা বললাম বিশ্বাস হোল না?

যেসিকা। তুমি আমায় ভালবাস?

হুগো। আমি হোয়েডেরারকে খুন করতে এসেছি।

যেসিকা। নিশ্চয়, আমি খুব বিশ্বাস করি।

হুগো। যেসিকা বোঝার চেষ্টা কর। একটু গুরুত্ব দাও।

যেসিকা। কেন গুরুত্ব দেব?

হুগো। সব সময়েই কি খেলা যায়?

যেসিকা। আমার গুরুগম্ভীর হতে ভাল লাগে না। তবু চেষ্টা করছি। না হয় গম্ভীর হবার ভান করছি।

হুগো। আমার চোখে চোখ রাখো। না, হেসো না। শোন। হোয়েডেরার সম্বন্ধে যা বললাম তা সত্যি। পার্টি আমাকে পাঠিয়েছে।

যেসিকা। আমি তা জানতাম। আগে কেন বলনি?

হ্যুগো। তাহলে তুমি হয়ত আমার সঙ্গে আসতে চাইতে না।

যেসিকা। কেন? এ তোমার ব্যাপার। এতে আমার কি?

হ্যুগো। কাজটা ত তেমন সুবিধের নয়। ...লোকটাকে বেশ কঠিন মাল বলে মনে হচ্ছে।

যেসিকা। আমরা ওকে ক্লোরোফর্ম করে কামানের মুখে বেঁধে দেব।

হ্যুগো। যেসিকা! আমি কথাটায় গুরুত্ব দিচ্ছি।

যেসিকা। আমিও তো দিচ্ছি।

হ্যুগো। না, তুমি গুরুত্ব দেওয়ার ভান করছ। নিজেই ত বললে।

যেসিকা। না, তুমি তাই বলেছ।

হ্যুগো। আমাকে বিশ্বাস কর। লক্ষ্মীটি, আমাকে বিশ্বাস কর।

যেসিকা। আমি সত্যিই গুরুত্ব দিচ্ছি এ যদি তুমি বিশ্বাস কর তবেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করব।

হ্যুগো। বেশ। আমি তোমায় বিশ্বাস করছি।

যেসিকা। না, তুমি বিশ্বাস করবার ভান করছ।

হ্যুগো। ঈশ্বর আমায় ধৈর্য দাও। যেসিকা...[দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ] ভেতরে এস।

যেসিকা দর্শকদের দিকে পেছন করে সুটকেসের সামনে দাঁড়ায়। হ্যুগো দরজা খোলে। শিলক এবং জর্জ মৃদু হাসতে হাসতে ঢোকে। তাদের বেল্টে ছোট মেশিনগান আর রিভলভার। চুপচাপ।

জর্জ। এই যে!

হ্যুগো। কি?

জর্জ। তোমাদের সাহায্য করতে এলাম।

হ্যুগো। কি জন্যে?

শিলক। বাক্স বিছানা খুলতে।

যেসিকা। তোমরা ত' বড্ড ভালোলোক। কিন্তু এ আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

শিলক। [চেয়ারের ওপর হতে একটা শায়া তুলে নিয়ে সামনে ধরে] এগুলো মাঝখানে ভাঁজ করতে হয়, তাই না?

জর্জ। শিলক্, রেখে দে এক্ষুণি। মগজে বদ্ মতলব ঢুকিয়ে দিতে পারে। [যেসিকাকে] দেখুন, ওকে মাপ করবেন। আমরা ছ'মাস হ'ল একটা মেয়ে মানুষের মুখ পর্যন্ত দেখিনি।

শিলক। কেমন যে দেখতে তা পর্যন্ত মনে করতে পারি না। [দুজনে যেসিকার দিকে চায়]

যেসিকা। তা, এখন মনে পড়ছে?

জর্জ। আজ্ঞে। একটু একটু করে।

যেসিকা। গ্রামে কি মেয়ে টেয়ে নেই নাকি?

শিলক। থাকতে পারে। আমরা এখান হতে বেরোই না।

জর্জ। আগের সেক্রেটারী রোজ রাতে দেয়াল টপকাত। একদিন সকালে দেখি একটা পুকুরে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। বুড়োকর্তা তাই ঠিক করলে এবারকার সেক্রেটারী বউ সঙ্গে করে আনবে। মানে, ফুর্তি-টুর্তি যাতে ঘরে বসেই করতে পারে।

যেসিকা। ভারী বিবেচনা ত'।

শিলক। আমাদেরও যে একটু ফুর্তি দরকার সে বিবেচনা তো দেখিনে।

যেসিকা। কেন?

জর্জ। কর্তা বলে যে আমাদের বুনো রাখা দরকার।

হ্যুগো। এরা হোয়েডেরারের দেহরক্ষী।

যেসিকা। কি জান, আমিও এটুকু আন্দাজ করেছিলাম।

শিলক [বন্দুক দেখিয়ে] এটার জন্য?

যেসিকা ওটার জন্যেও বটে।

জর্জ। তাব'লে মনে কোর না যে, আমরা একাজে পেশাদার। আমি নিজে আসলে ঘর-মেরামতী মিস্ত্রী। এটা পার্টির জন্যে বিশেষ কাজ ব'লে করছি।

শিলক। আমাদের দেখে ভয় পাওনি ত, কি বল?

যেসিকা। মোটেই না। তবে কি জান, আমার মনে হয় তোমাদের ও গয়না-গাঁটিগুলো খুলে রাখলেই ভাল হয়। ওই কোণে রেখে দাও না।

জর্জ। দুঃখিত।

শিলক। তা হয় না।

যেসিকা। ঘুমোবার সময়ও কি ওগুলো খুলে রাখ না?

জর্জ। আজ্ঞে না।

হ্যুগো। আমি যখন হোয়েডেরারের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই ওরা আগাগো[ড়া] পথ আমার পিঠে ওদের বন্দুকের মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়েছিল।

জর্জ। [হেসে ওঠে] আমরা ঐ রকম।

শিলক। [হেসে ওঠে] ওর একটু পা ফস্কালেই তুমি এতক্ষণে বিধবা। [সবাই হেসে ওঠে]

যেসিকা। তোমাদের কর্তা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়েছে।

শিলক। ভয় পাবে কেন, তবে বেমক্কা খতম হওয়া তার ইচ্ছে নয়।

যেসিকা। তাকে খুন করবে কেন?

শিলক। তা আমি জানবো কি করে? আমি শুধু জানি, কেউ তাকে মারার মতলব করছে। তার দোস্ত্‌রা এসে দিন পনের হবে তাকে সাবধান ক'রে গেছে।

যেসিকা। ভারী রোমাঞ্চকর ব্যাপার ত'!

জর্জ। আমরা পাহারায় আছি, বাস! কিছু না, ক'দিনেই তোমাদের অভ্যেস হ'য়ে যাবে। এমন কিছু চোখে পড়ার মত নয়। [ঘরের মধ্যে ঔদাসীন্যের ভান ক'রে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে। কাবার্ডের কাছে যেয়ে সেটা খুলে হ্যুগোর স্যুট্‌টা টেনে বার করে] বাঃ খুব জোর একখান পোষাক! পোকা ধরেনি ত'?

ঝাড়বার ভান করে, পকেটগুলো টিপে দেখে, তারপর কাবার্ডে আবার রেখে দেয়। যেসিকা আর হ্যুগো পরস্পরের দিকে তাকায়।

যেসিকা। আমরা সব বসছিনে কেন?

শিলক। না, না, ধন্যবাদ।

যেসিকা। আমি বসলে আপত্তি আছে? [সে আর হ্যুগো ব'সে পড়ে]

শিলক। [জানালার কাছে যেয়ে] চমৎকার দৃশ্য।

জর্জ। আরামের যায়গা।

শিলক। খাসা, কোন গোলমাল নেই।

জর্জ। বিছানা দেখেছ? তিনজনের শোয়ার মত।

শিলক। চারজনের—নতুন বিয়ের জোড়-শুতে বেশী জায়গা নেয় না।

জর্জ। কত জায়গা নষ্ট দেখ ত—আর অন্যদের কিনা শুতে হয় মেঝের উপর।

৷ এই চোপরাও—শেষে রাতে এরি স্বপ্ন দেখি আর কি।

কা। তোমাদের শোয়ার বিছানা আছে?

। [শিলককে দেখিয়ে] ও অফিসের সতরঞ্চির 'পরে শুয়ে ঘুমোয়—আর আমি বুড়ো কর্তার ঘরের বাইরে বারান্দায় ঘুমোই।

কা। খুব অসুবিধে হয় না?

। তোমার কর্তার হ'লে অসুবিধে হত—ও নরম জাতের মানুষ। আমাদের পক্ষে ওই ঠিক। মুশকিল কি, আমাদের নিজেদের ব'লে কোন জায়গা নেই। বাগানটা ব্যামোর আড়ৎ, তাই হলঘরেই আমাদের সময় কাটাতে হয়।

শলক নীচু হয়ে খাটের নীচে দেখে।

া। কি খুঁজছ ওখানে?

৷ ইঁদুর। [উঠে পড়ে]

া। একটাও দেখতে পেলে?

৷ না।

া। ভালই হয়েছে। [চুপচাপ]

কা। তোমরা তাহ'লে তোমাদের কর্তাকে একা রেখে এসেছ? অনেকক্ষণ তাকে ছেড়ে থাকলে যদি তার কেন বিপদ ঘটে?

। তার সঙ্গে লেঅ' আছে [টেলি-ফোন দেখিয়ে] কিছু ঘটলে সব সময়ই ফোন করতে পারে।

চুপচাপ। হুগো উঠে পড়ে, তার মুখ উত্তেজনায় ফ্যাকাশে, যেসিকাও উঠে পড়ে। হুগো দরজার কাছে যেয়ে দরজাটা খোলে।

া। যখন খুশী হয় এসো মাঝে মাঝে, এখানে সব সময়ই তোমরা স্বাগত।

। [দরজার কাছে ধীর পায় যেয়ে দরজাটা বন্ধ করে] আমরা যাচ্ছি। এই এক মিনিট। ছোট্ট একটা লোক দেখানো কাজ চুকে গেলেই যাব।

া। কি লোক দেখানো কাজ?

ক। ঘরটা তল্লাসী করতে হবে।

া। না।

না?

া। মোটেই তা করতে পাবে না।

। আহা, মেজাজ গরম কর কেন? এটা হুকুম।

হুগো। কার হুকুম?

শিলক। হোয়েডেরারের।

হুগো। হোয়েডেরার আমার ঘর তল্লাসী করার জন্য হুকুম দিয়েছে?

জর্জ। আচ্ছা, তুমি ত একটা মাথাওলা মানুষ, তবে এমন বোকার মত করছ কেন? আমরা খবর পেয়েছি দু'দশ দিনের মধ্যেই এখানে কেউ বন্দুক দাগার চেষ্টা করতে পারে। তুমিই বল এর পর কি আমরা কাউকে ভাল ক'রে তল্লাসী না ক'রে এখানে আসতে দিতে পারি? কে বলতে পারে যে, তুমিই-বা তোমার কোন খোপে খাপে দু'চারটে হাতবোমা কি আগুন-বাজী সাফাই ক'রে আননি। অবশ্য তোমাকে দেখলে সে ধরণের আদমী মালুম হয় না।

হুগো। আমার কথার সিধে জবাব দাও। হোয়েডেরার কি স্পষ্ট ক'রে আমার জিনিসপত্র তল্লাসী করার হুকুম দিয়েছে?

শিলক। [জর্জকে] স্পষ্ট ক'রে?

জর্জ। স্পষ্ট করে।

শিলক। এখানে আমাদের হাতের মধ্যে দিয়ে চোলাই না হ'য়ে কেউ আসতে পাবে না। এই হুকুম।

হুগো। আমি খানাতল্লাসী হ'তে রাজী নই। আমাকে বাদ দিয়ে তোমাদের হুকুম চলবে। এই শেষ কথা।

জর্জ। তুমি কি পার্টির লোক নও?

হ্যুগো। নিশ্চয়।

জর্জ। তাহ'লে সেখানে কি শিখিয়েছে তোমায়? হ্কুম যে কি জিনিস তা কি জান না?

হ্যুগো। তুমি যেটুকু জান আমিও সেটুকু জানি।

জর্জ। আর হ্কুম একবার দেওয়া হ'লে সে হ্কুম যে তোমায় মানতেই হবে, তা জান না?

হ্যুগো। জানি বই কি।

জর্জ। তবে?

হ্যুগো। আমি হ্কুম মানি, কিন্তু আমার আত্মসম্মান আছে। আমাকে হাস্যাস্পদ করার জন্য কোনো নির্বোধ হ্কুম দেওয়া হ'লে, তা আমি মানতে রাজী নই।

জর্জ। শ্নলি শিলক, হ্যাঁরে তোর আত্ম-সম্মান আছে নাকি?

শিলক। মনে ত হয় না? তোর?

জর্জ। ওসব আত্মসম্মান-টম্মান হ'তে হ'লে আগে লেখাপড়া শিখতে হয়।

হ্যুগো। তোমরা কেন ব্ঝতে পারছ না? আমি যে পার্টিতে এসেছিলাম সে ত' সব মান্ষ একদিন নিজেকে সম্মান করার অধিকার পাবে এই বিশ্বাসে।

জর্জ। শিলক, ওকে শিগ্গির চুপ করা, নইলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। মাথাওলা মশাই, আমরা অন্য ধাতের মান্ষ। আমরা পার্টিতে এসেছিলাম না খেয়ে না খেয়ে পেটে চড়া প'ড়ে গিয়েছিল ব'লে।

শিলক। যাতে একদিন আমাদের মত দ্নিয়ার সব শালা বেজম্মা পেট ভ'রে খেতে পায়।

জর্জ। শিলক, বাজে কথা রাখ। ঐটে দিয়ে শ্র্ করা যাক্।

হ্যুগো। আমার কোন জিনিস তোমরা ছোঁবে না।

জর্জ। তাই নাকি মাথাওলা মশাই? তা আটকাবে কেমন করে?

হ্যুগো। আমার কোন জিনিস যদি ছোঁও আমরা আজ রাতেই তাহ'লে এখান হ'তে চলে যাব। হোয়েডেরার তার নতুন সেক্রেটারী খ্ঁজে নিতে পারে।

জর্জ। তাই ত', বড্ড ভয় পেয়ে গেলাম।

হ্যুগো। বেশ, ভয় না হয় খানাতল্লাসী কর।
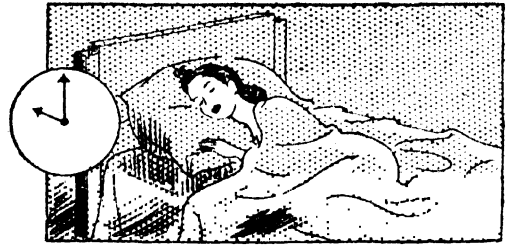
' মাথা চুলকোয়। যেসিকা সমস্তক্ষণ
ান্ত ধীরভাবে বসেছিল। এখন ওদের
ছ যায়।

।। তা, হোয়েডেরারকে একবার
ান করে দেখ না।

হোয়েডেরারকে?

। তোমাদের কি করা উচিত তার
ছে জানতে পারবে।

র্জ আর শিলক চোখে-চোখে
ামর্শ ক'রে নেয়।]

তা অবশ্যি করা যায়। [টেলি-
ানে যেয়ে রিসিভার তুলে] হ্যালো,
অ', বুড়ো কর্তাকে বল যে, আধ
পোটা আমাদের কাজ করতে দিচ্ছে
। কি? হ্যাঁ, খুব গরম গরম
ল ঝাড়ছে। [শিলককে] জানতে
ছে।

বেশ, তবে আমিও তোমায় ব'লে
খছি জর্জ, বুড়ো কর্তাকে আমি
লবাসি, কিন্তু তাব'লে এই বেজম্মা
র্টায়াটার জন্যে কর্তা যদি নিয়ম
ভেতে বলে—ভাবত, এখানে কাউকে
লাই না ক'রে ঢুকতে দিইনে,
ওনকে পর্যন্ত ঝেড়ে দেখি—না,
হ'লে এই রইল আমার কাজ।

আমারও সেই কথা। হয় আমরা
ঘর খানাতল্লাসী করব, নয়ত
রো এ কাজে ইস্তফা দিলাম।

হ'তে পারে আমার আত্মসম্মান
, তবু অন্যদের মত আমারো
টা অভিমান আছে।

হয়ত গোলিয়াত তোমার কথাই
, তবু স্বয়ং হোয়েডেরার যদি
জ এসেও তল্লাসীর হুকুম দেয়
ম তার পাঁচ মিনিট পরেই এ
ছেড়ে চলে যাব।

ায়েডেরার ঘরে ঢোকে]

রার। কি ব্যাপার?

লক এক পা পিছিয়ে যায়]

ও আমাদের তল্লাসী করতে
হ না।

রার। দিচ্ছে না?

ওদের যদি তল্লাসী করতে দাও,
ম চলে যাব। ব্যস্।

রার। তাই বুঝি।

আমাদের যদি ওকে তল্লাসী
ত না দাও আমরা চললুম।

হোয়েডেরার। বোস তোমরা। [তারা গজ গজ করতে করতে বসে] হ্যাঁ, দেখো হুগো, কোনো লোক দেখান নিয়ম নেই এখানে। আমরা এখানে সকলে বন্ধু।

চেয়ারের ওপর হতে একটা কাঁচুলী ও একজোড়া মোজা তুলে নিয়ে বিছানায় রাখতে যায়।

যেসিকা। ধন্যবাদ। [তার হাত হ'তে সেগুলো নিয়ে পুঁটুলি পাকিয়ে নিজের যায়গা হ'তে না নড়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়]

হোয়েডেরার। তোমার নাম কি?

যেসিকা। যেসিকা।

হোয়েডেরার। [তার দিকে তাকিয়ে] আমি ভেবেছিলাম তুমি দেখতে বুঝি কুশ্রী হবে।

যেসিকা। আমি দুঃখিত।

হোয়েডেরার। [তাকিয়ে থেকে] হ্যাঁ, দুঃখেরই কথা, ওরা কি তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করছিল।

যেসিকা। না, এখনো করেনি।

হোয়েডেরার। তা যেন করতেও দিও না। [একটা হাতলওয়ালা কেদারায় ব'সে] দেখ, এই যে খানাতল্লাসী, এতে কিছুই আসে যায় না।

শিলক। আমরা......

হোয়েডেরার। একেবারেই কিছু আসে যায় না। ওসব কথা পরে হবে। [শিলককে] ও কী করেছে? কী ওর অপরাধ? ওর পোশাক আশাক বড্ড বেশী ভাল? কেতাবী কথা বলে?

শিলক। ও আমাদের শ্রেণীর লোক না।

হোয়েডেরার। ওসব শ্রেণী-টেনির কারবার আমরা বাইরে রেখে এসেছি। [তাদের দিকে চেয়ে] তোমরা শুরু করেছ বেয়াড়াভাবে—আর [হুগোকে] তুমি ওদের চেয়ে কমজোরি ব'লেই এমন মেজাজ গরম করেছ। [শিলক এবং জর্জকে] তোমাদের সকালে মেজাজ ভাল ছিল না, তাই ওর 'পরে তার শোধ তুলছিলে। এরপর ওর সঙ্গে নানারকম চালাকী মস্করা শুরু করবে, আর হপ্তা না কাটতেই ওকে যখন চিঠি লেখার জন্য আমার দরকার হবে তোমরা এসে খবর দেবে যে, পুকুরের মধ্যে ওর লাশ পাওয়া গেছে।

হুগো। আমি পারলে তা আর হ'তে দিচ্ছি না......

হোয়েডেরার। এ তোমার পারা না পারার ব্যাপার নয়। আমি ব'লে রাখছি, অবস্থা যেন এমনতর না গড়ায়। এক সঙ্গে চারজন মানুষ থাকতে হলে, হয় তাদের পরস্পর মানিয়ে নিতে হবে আর না হয় এ ওর গলা কাটবে। তোমাদের এ ওর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে, বুঝলে।

জর্জ। [ভারিক্কি গলায়] মানুষের ভাল লাগা না লাগার পরে ত' আর কোন হাত নেই।

হোয়েডেরার। [জোর দিয়ে] নিশ্চয় আছে। বিশেষত যখন তার পরে কাজের ভার রয়েছে—তাও আবার সে কাজ একই পার্টির কর্মীদের সঙ্গে।

জর্জ। আমরা এক পার্টির লোক নই।

হোয়েডেরার। [হুগোকে] তুমি কি আমাদের একজন নও?

হুগো। নিশ্চয়।

হোয়েডেরার। তবে?

জর্জ। আমরা এক পার্টিতে থাকতে পারি, কিন্তু এক কারণে আমরা পার্টিতে আসিনি।

হোয়েডেরার। সবাই এক কারণের জন্যেই পার্টিতে আসে।

জর্জ। মাফ করতে হোল। ও পার্টিতে এসেছে গরীব লোকদের আত্মসম্মান শেখাতে।

হোয়েডেরার। বাজে কথা।

শিলক। ও নিজেই সে কথা বলেছে।

হুগো। আর তুমি এসেছ পেট পুরে খেতে পাবার জন্যে। তুমি ত' তাই বললে।

হোয়েডেরার। তবে? তোমাদের দুজনেই তাহ'লে একমত।

শিলক। কি রকম?

হোয়েডেরার। শিলক! তুমি কি ওকে বলনি যে, না খেয়ে থাকার কি লজ্জা? [শিলকের দিকে ঝুঁকে জবাবের অপেক্ষা করে। শিলক কিছু বলে না] বলনি যে, উপোসে উপোসে আর

কোন কথা ভাবতে পর্যন্ত পারতে না ব'লে পাগল হয়ে উঠেছিলে? যে কুড়ি বছরের একটা ছেলে শুধু দিনরাত পেটের কথা ছাড়া আরো অনেক কিছু ভাবতে চায়?

শিলক। ওর সামনে সে সব কথা বলার কোন দরকার ছিল না।

হোয়েডেরার। তুমি কি ওকে এসব কথা বলনি?

শিলক। তা দিয়ে কি প্রমাণ হোল?

হোয়েডেরার। তা দিয়ে প্রমাণ হয় যে, তুমি দু' মুঠো অন্ন চেয়েছিলে। কিন্তু তার সঙ্গে আরো কিছু চেয়েছিলে। ওর কাছে তারি নাম আত্মসম্মান। ও কী শব্দ ব্যবহার করেছে তা নিয়ে রাগ করো না। প্রত্যেকেরই নিজের খুশী মত কথা কইবার অধিকার আছে।

শিলক। আমি যা চেয়েছিলাম তার নাম মোটেই সম্মান নয়। ওর মুখে আত্মসম্মানের কথা শুনে আমার সারা গা রি রি ক'রে উঠল। ওর মাথার মধ্যে যে কথা আসে তাই ও ব্যবহার করে—ও সবকিছু ওর মাথা দিয়ে ভাবে।

হুগো। তা অন্য কি দিয়ে ভাবব, বলে দাও।

শিলক। ওটা যখন খ'সে পড়বে, মাথা-ওলা মশাই, তখন আর মাথা দিয়ে ভাবতে হবে না। সত্যি বটে, আমি চেয়েছিলাম, এই দিনরাত পেটের ভাবনা থামুক, ভগবান, হ্যাঁ একটু ক্ষণের জন্যে, শুধু একটু ক্ষণের জন্যেও যাতে অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারি। নিজের কথা ছাড়া আর যে কোন কিছু ভাবনা। কিন্তু তার নাম আত্মসম্মান নয়। সত্যিকারের ক্ষিধে কা'কে বলে তা পর্যন্ত কোনদিন জানলে না, অথচ এসেছ আমাদের কাছে নীতিকথা আওড়াতে। এ যেন সেই মস্ত মস্ত পরিবারের গিন্নীদের মত। আমার মা যখন মদ খেয়ে বেহুঁস হ'য়ে প'ড়ে থাকত, তখন তারা সব মাকে দেখতে আসত আর বলাবলি করত, মাগীটার একটু আত্মসম্মান নেই।

হুগো। মিথ্যে কথা।

জর্জ। জীবনে কোনদিন সত্যিকার ক্ষিধে কা'কে বলে তা টের পেয়েছ? সেই খাবার আগে হেঁটে নিয়ে ক্ষিধে তৈরী ক'রে তুমি ত' সেই ধরণেরই মানুষ।

হুগো। এই একবার তুমি খাঁটি কথা বলেছ। ক্ষিধে পাওয়া কি জিনিস তা আমি সত্যিই জানি নে। যদি দেখতে বাচ্চা বয়েসে কি সালসা সঞ্জীবনীই না খেয়েছি। প্রত্যেকবার খাওয়ার শেষে অর্ধেক খাবার থালায় ফেলে রাখতুম—কি অপচয়। ওরা তাই আমার মুখটা জোর ক'রে খুলে ধ'রে এইটে বাবার জনো, এইটে মার জন্যে, আর এটা আনা পিসীর জন্যে ব'লে চামচে সুদ্ধ খাবার আমার গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দিত। তা'তে কি হোল জান? আমি বাড়তে লাগলাম, কিন্তু গায়ে একটুও চর্বী লাগল না। তখন ওরা কশাইখানা থেকে তাজা রক্ত এনে আমাকে খাওয়াতে শুরু করল। আমার গায়ে একটুও রং ছিল না কিনা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি মাংস খাইনি। প্রত্যেক রাতে আমার বাবা বলত,—"ছেলেটার মোটে ক্ষিধেই হয় না......" প্রত্যেক রাত—ভাবতে পার? "খা, হুগো, খা, না খেলে যে অসুখ করবে।" আমাকে নিয়মিত কর্ডলিভার তেল খাওয়াত—বিলাসের একেবারে চরম। যখন রাস্তার কত লোক এক টুকরো মাংসের জন্যে নিজেদে বিক্রি করতে পর্যন্ত রাজী তখ আমাকে ক্ষিধে পাওয়ানোর জন্য ওষুধ খাওয়ান হোত। আমা জানলা হ'তে পথের সেই লোক দেখতাম, "আমাদের রুটি দাও" এ পতাকা ঘাড়ে নিয়ে তারা পথ দিয়ে চলেছে। আর তখন আমাকে এ খাবার টেবিলে বসতে হ'ত। খ হুগো, খা। এক গেরাস র চৌকিদারের জন্যে (সে তখন ধর্ম ঘট করেছে) এক গেরাস সেই ব জন্যে, ছাই গাদা হ'তে যে খা খায়; আর এক গেরাস ঠ্যাং ছুতোর বুড়োর নামে। ছাড়লুম। যোগ দিলুম পার্টি কিন্তু সেখানেও শুধু সেই পুনরাবৃত্তি; "সত্যিকারের ক্ষিধে তাই তুমি জান না হুগো, তুমি মাথা গলাও? তুমি বুঝবে করে? তুমি ত' ক্ষিধে কি তা না।" না! আমি কখনও সত্যিকা ক্ষিধের স্বাদ পাইনি। না, কোন না? কোনদিন না! বলতে কি করলে তোমাদের এই অভি বন্ধ হবে?

[চুপচাপ]

হোয়েডেরার। শুনলে ত' ওর কথা বেশ, এখন বল ওকে। বল শিলক ওকে কি করতে হবে? কি তোম প্রস্তাব? একটা হাত কেটে ফেলবে? একটা চোখ উপড়ে দেবে? ওর তোমায় দিয়ে দেবে? তোমা ক্ষমা পেতে হলে কি দাম দিতে ওকে?

শিলক। এতে ক্ষমা করার কি আছে

হোয়েডেরার। আছে বই কি। ও পার্টিতে অভাবের চাপে প আসতে পারেনি, তার জন্যে।

জর্জ। আমরা ত' তার জন্যে করছি না। কিন্তু আমাদের ম প্রকাণ্ড ফারাক রয়েছে। ও শখের কর্মী। ও এসেছে—আস একটা মস্ত আদর্শের ব্যাপার —আমরা এসেছি আমাদের উপায় ছিল না ব'লে।

(ক্রমশ)
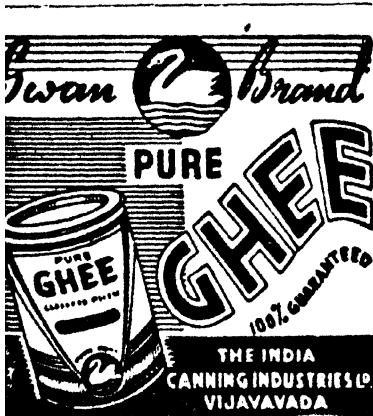
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্বানুবৃত্তি)

বারে আমরা গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ করিলাম; এখন ১৩০১ বা ইংরাজি ১৮৯৪ সাল; বয়স তেত্রিশ বছরের সীমা অতিক্রম ে, তিনি এখন চিত্রার কবিতাগুলি ছেন।

খনকার গল্পগুলিতে কেবল আর বিনের ছায়া নয়, নানাপ্রকার ক ও রাজনৈতিক সমস্যার ছায়া ছে দেখিতে পাইব। সেইজন্য লিতে কেবল কবিতার সংগে কবির অন্যান্য রচনার সংগেও া পড়িতে হইবে।

নধিকার প্রবেশ গল্প রচনার সংগে ীন একটি ঘটনার যোগ আছে রবীন্দ্র-জীবনী প্রণেতা প্রভাত ধ্যায় মনে করেন। তিনি ছেনঃ—"এই সময়ে (১৮৯৬) ন হইতে হামারগ্রেন নামে এক লিকাতায় আসেন। রাজা রাম-রায়ের ইংরাজি গ্রন্থাবলী পাঠ যুবকটি বাংলা দেশের প্রতি হন ও নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশের কোন সেবার কাজে জীবন করিবেন এই সংকল্প অন্তরে করিয়া এদেশে আসেন। নিরন্তর ম পরিশ্রম করিয়া অকালে তাঁহার হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা যে, হিন্দুর ন্যায় যেন তাহার দাহ-হয়।" একদল লোকের বিরোধিতায় অন্তিম ইচ্ছা পূরণ হয় নাই। দ্রনাথ ব্যাপারটি লইয়া 'বিদেশী থ ও দেশীয় আতিথ্য' নামে এক লেখেন (সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০১)" ......"এই মাসেই 'অনধিকার প্রবেশ' নামে গল্পটি লেখেন।"৫২

মেঘ ও রৌদ্র গল্পটি ১৩০১ সালের আশ্বিন-কার্তিক মাসে লিখিত। এই সময়ে কবিকে মফঃস্বলে থাকিতে হইত বলিয়া ইংরাজ কর্মচারীদের অত্যাচারের পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে পাইতেন। গল্পটির মধ্যে সেইসব অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ভাদ্র মাসে এইরূপ এক ঘটনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ তিনি লেখেন (অপমানের প্রতিকার, সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১)। ৫৩ শশিভূষণের জীবনস্রোত এক অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীর চক্রান্তে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেশের দুর্বলেরা যে কত দুর্বল, অসহায়েরা যে কত অসহায় এবারে যেন কবি বুঝিতে পারিলেন। ইহার কয়েক মাস আগে লিখিত "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় এই অপমানের বেদনা প্রকাশিত হইয়াছে।৫৪

অগ্রহায়ণ মাসে প্রায়শ্চিত্ত গল্পটি এবং পৌষ মাসে বিচারক গল্পটি লিখিত হয়—আগের বছর সমস্যা পূরণ ও শাস্তি গল্প দুটি লিখিত হইয়াছিল। ইহাদের সংগে পরবর্তীকালে লিখিত রাজটিকা* গল্পটিকে যদি গ্রহণ করি তবে দেখিতে পাইব যে, নানাবিধ সামাজিক সমস্যা কবির রচনায় ছায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে—গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ গল্প এই প্রভাব হইতে মুক্ত। "এবার ফিরাও মোরে" আকাঙ্ক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া কবি লোকজীবনের কাছা-কাছি আসিয়া পড়িয়াছেন।

এবারে এমন কতকগুলি গল্প ও কবিতার সম্বন্ধ বিচার করিতে উদ্যত হইয়াছি যে, যোগাযোগ সম্বন্ধে আমি নিজেই খুব নিশ্চিত নই। এখানে প্রমাণের চেয়ে অনুমানের উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে, বুদ্ধি অগ্রসর হইতে চাহে না, কিন্তু বোধ হাল ছাড়িয়া দিতে রাজি নয়। রসের বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে বোধের দাবী, প্রমাণের চেয়ে অনুমানের মূল্য কম নয়।

এখনে মানভঞ্জন, প্রতিহিংসা ও উর্বশী কবিতা আমার আলোচ্য বিষয়।৫৫

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী পৌরাণিকী বা বিদেশিনী নয়; পুরাণের বর্ণনা বা সুইনবার্নের কবিতার মধ্যে তাহার রহস্য নিহিত নয়; সে সব স্থান হইতে রহস্যোদ্ধার করিতে গেলে ভুল করিবার আশংকাই সমধিক। প্রসিদ্ধ কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার উর্বশী কবিতার বিচারে কবির প্রতি অবিচার করিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা। তাঁহার বক্তব্য এই যে, যে-উর্বশী নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ তাহার আবির্ভাবে "অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষো মাঝে চিত্ত আত্মহারা" কেন হইবে? মানব সম্বন্ধাতীত বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপিণী মানব মনে বাসনার ঢেউ জাগাইবে কেন? মোহিত-লাল মনে করেন যে, এখানে এই দ্বৈত-প্রেরণার ফলে কবিতাটিতে রসাভাস' ঘটিয়াছে। কবিতাটির মূল অন্যত্র সন্ধান না করিয়া রবীন্দ্রকাব্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে এরূপ অবিচার হইত না; কেননা, আগেই বলিয়াছি যে, উর্বশীর রহস্য রবীন্দ্রকাব্যেই সন্ধান করিতে হইবে। রবীন্দ্রকাব্যে পরবর্তীকালে যে "দুই

---

৫২ রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০৩—৩০৪। কিন্তু প্রভাতকুমার যে সাল উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে ঘটনার সময় ও গল্প রচনার সময়ের মধ্যে ব্যবধান ঘটে। ইংরাজি ১৮৯৬+৭=১৩০৩ বাঙলা সাল। গল্প রচনার কাল ১৩০১ শ্রাবণ। তবে ১৮৯৬ যদি ১৮৯৪ সালের মুদ্রাকর প্রমাদ হয় তবে মেলে বটে।

৫৩ রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০৫।

৫৪ এবার ফিরাও মোরে ফাল্গুন, ১৩০০।

*আশ্বিন, ১৩০৫।

৫৫ মানভঞ্জন বৈশাখ ১৩০২।
প্রতিহিংসা আষাঢ় ১৩০২।
উর্বশী অগ্রহায়ণ ১৩০২।

নারীতত্ত্ব" সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে উর্বশীতে তাহারই প্রথম অবচেতন প্রকাশ। নারীর এক মূর্তি প্রিয়া এক মূর্তি জননী, এক মূর্তি উর্বশী, এক মূর্তি লক্ষ্মী। কবির সচেতন প্রয়াস যাহাই হোক, উর্বশী কবিতাটি লিখিবার সময়ে তাঁহার অগোচরে এই দুই মূর্তির মিশাল ঘটিয়া গিয়াছে; সে একাধারে মানব সম্বন্ধাতীত, আবার মানব সম্বন্ধের অন্তর্গতও বটে। মনে হয় যেন, রহস্যময়ী কবিপ্রতিভা কবির আগোচরে তাঁহার লেখনীকে অনভীষ্ট পথে চালনা করিয়া কবিতাটি সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক মনে করি না, কারণ কবির নারীতত্ত্ব এই পথেরই সূচনা দিতেছে, এই তত্ত্বেই রবীন্দ্র-নারীতত্ত্বের পরিণতি। এখন এ কথাটি মনে রাখিলে কবিতাটি রসাভাসগ্রস্ত মনে না হইয়া পরিণামের আভাসগ্রস্ত বলিয়া মনে হইবে। চিত্রা কাব্যেই কয়েক মাস পরে লিখিত একটি কবিতায় এই তত্ত্বটি সচেতনভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।৫৬

মানভঞ্জন গল্পের গিরিবালা এবং প্রতিহিংসা গল্পের ইন্দ্রাণী দুইজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসামান্য, রূপে এবং ব্যক্তিত্বে। তবে প্রভেদ এই যে, গিরিবালার মধ্যে নারীর প্রেয়সীমূর্তি অধিকতর প্রকট, আর ইন্দ্রাণীর মধ্যে জননীমূর্তি; একজন স্বামী কর্তৃক অবহেলিত, অপরজন স্বামীর পরম নির্ভর; আর দুইজনেই সমান রহস্যময়ী এবং অনেক পরিমাণে কেমন যেন সাংসারিকতা হইতে বিবিক্ত। এখন ইহাদের দুজনকে একত্র মিশাইলে উর্বশীর একটা খসড়া পাওয়া যাইতে পারে। আমার মনে হয়, গিরিবালা ও ইন্দ্রাণীর মতো রহস্যময়ী নারী চরিত্রের রক্তকমলের উপরে পদক্ষেপ করিয়াই কবি উর্বশীর চিরন্তনী ও সর্বময়ী নারীমূর্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে ঠিক এরকম নারীচরিত্র ইতিপূর্বে আর তিনি সৃষ্টি করেন নাই।

ক্ষুধিত পাষাণ গল্প এবং স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতা পরপর সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়।৫৭

স্বর্গ হইতে বিদায়ের কালে বিদায়ী মানুষটি বুঝিতে পারিয়াছে যে, পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গ কত হৃদয়হীন ও অবাস্তব, স্বর্গের ইন্দ্রাণীর চেয়ে মর্ত্যের দীন কুটীরের প্রেয়সী কত বাঞ্ছনীয়, কারণ স্বর্গ যতই রমণীয় হোক তাহার সংগে মানব-হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। ঠিক এই রকম অবস্থা ও অবাস্তবতা ক্ষুধিত পাষাণের প্রাসাদের নয় কি? সেখানকার অবাস্তব রমণীয়তা তুলার মাশুলের হাকিমকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে কিন্তু কখনো আপন করিয়া লইবে না। এখানকার সুন্দরী ছায়াময়ীদের লাস্যময় ইংগিতের চেয়ে ওই পাগল মেহের আলির রূঢ় সতর্কবাণী যে অনেক বেশী সত্য, কারণ সেটা সম্পূর্ণ বাস্তব! এই হৃদয়হীন পাষাণের গ্রাস হইতে উদ্ধারের জন্য, এই অবাস্তব স্বর্গ হইতে বিদায়ের জন্য, মানব-হৃদয় স্পর্শলোলুপ মানুষটি সংসারে ফিরিয়া যাইবার আশায় ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিয়াছে—

"আমার উদ্ধারের কি কোন পথ নাই।"

এ সমস্তই আমার অনুমান মাত্র। সেই অনুমান বলিতেছে যে, আর কিছু নয়, দুটি রচনার মূলেই একটি ভাব সক্রিয় ছিল, অবাস্তবতার মোহময় স্বপ্নময় অলীক সৌন্দর্যময় কবল হইতে কবির উদ্ধারের ইচ্ছা।৫৮

অতিথি গল্পের তারাপদ স্পষ্টত সোনার তরী কাব্যের দুই পাখী কবিতার বনের পাখী। মনের খেয়ালে কয়েকদিনের জন্য কাঁঠালিয়ার জমিদারবাবুর স্নেহময় পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু "স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী কি পৃথিবীর নিকটে চলিয়া গিয়াছে।" খাঁচ পাখীর সংগে তাহার বিবাদ নাই কি মনে সর্বদা ভয়, 'কবে খাচায় রুধি দি দ্বার।'

এবারে সাধনা পত্রিকা বন্ধ হই গেল, কাজেই নিয়মিত গল্পের চাহি আর রহিল না। ভারতী পত্রিকার ভ গ্রহণ করিতে এখনো বছর দুই বিল তখন আবার নিয়মিত গল্প জোগাই হইবে, মাঝখানে বছর দুইয়ের ফাঁ গল্পের চাহিদা নাই অথচ মনে গল লিখিবার তাগিদ আছে, এতদিন নিয়ম গল্প লিখিবার পরে কলমের গল্পরচ প্রবণতা বেশ প্রবল, কাজেই এই ফাঁ কবি যে কবিতাগুলি লিখিয়া ফেলিয়ে তাহাদের অধিকাংশই কাহিনীমূ কাব্য।৫৯

অতঃপর ১৩০৫ সালের বৈশা হইতে ভারতীর সম্পাদকত্ব গ্রহণ করি তিনি আবার নিয়মিত ভারতীর জ গল্প লিখিতে শুরু করিলেন। এই বছ মোট সাতটি গল্প লিখিলেন।

দুরাশা রবীন্দ্রনাথের গল্প রচন ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। কিন্ত অনেকেই গল্পটির গৌরব রোমান্টি বলিয়া লঘু করিয়া দিতে চেষ্টা করে ইঁহারা বোধ করি মনে মনে রোমান্টিকে অনুবাদ করেন অবাস্তব। কিন্তু এই দু কি এক? অবাস্তব হইতেছে সেই ক যাহার মূলে জীবনের অসম্পূর্ণ ভ্রান্ত অভিজ্ঞতা। রোমান্টিক অবাস্ত নয়, তাহা এক বিশেষ পারিপার্শ্বি পরিকল্পিত অভিজ্ঞতা মাত্র, সে অভিজ্ঞত ফুল যত উচ্চেই ফুটুক না কেন, তাহ মূল রহিয়াছে লেখকের জীবনে লেখকের সময়ে। এক হিসাবে মেঘনাদ কাব্য, আনন্দমঠ উপন্যাস ও দুরাশা গ তিনটিই রোমান্টিক কল্পনার সৃষ্টি কারণ, এগুলি ভিন্ন পারিপার্শ্বিকে

---

৫৬ রাত্রে ও প্রভাতে, ফাল্গুন, ১৩০২।

৫৭ ক্ষুধিত পাষাণ, শ্রাবণ, ১৩০২। স্বর্গ হইতে বিদায়, অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

৫৮ মেহের আলির 'সব ঝুঁটা হ্যায়' সতর্কবাণীকে রূঢ় বাস্তবের ঘণ্টাধ্বনি বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

৫৯ (ক) চৈতালি, চৈত্র, ১৩০২, শ্রাব ১৩০৩; (খ) মালিনী, ১৩০৩; (গ) কাহিনী —গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, নরকবাস, সতী লক্ষ্মীর পরীক্ষা, ভাষা ও ছন্দ, ১৩০৪ (ঘ) কথাঃ—শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা, মস্তক বিক্র ১৩০৪; (ঙ) দেবতার গ্রাস, ১৩০৪।

ন ও দূরবর্তী সমাজের পটে পিত হইয়াছে। কিন্তু কাহিনী- া ছবি নয়, ছবির ফ্রেম। ছবির মূল লেখকগণের হৃদয়ে ও লেখক-সমকালে বর্তমান। নূতন ইংরাজি মাদকতা ব্যতীত মেঘনাদ বধ কাব্য মাথায় আসিত কি? নবজাগ্রত বোধের ঊষাকাল ব্যতীত আনন্দ-রকল্পিত হইতে পারিত কি? আর র কাছে সমাজের চেয়ে মানুষ া, জড় অভ্যাসের চেয়ে ধর্ম মহত্তর তাহারই কল্পনা, বদ্রাওনের নবাব র বেদনার স্বর্ণে এমন দিব্য মূর্তি পারিত। সাহিত্য রচনার ফ্রেম অসম্ভব স্থান হইতে গ্রহণ করিতে াই বলিয়া ফ্রেমের মূল্যে ছবির নিরূপণ করা উচিত হইবে না।

ক্রমেই আমার এই বিশ্বাস হচ্ছে যে, যাহাকে আমরা রোমান্স ালিজম বলি তাহাদের মধ্যে ভেদ বস্তুগত নয় যতটা দৃষ্টিগত।

রোশা গল্পটি ইতিমধ্যে লিখিত ী নাটের মর্মগত বিষয়ের দ্বারা ত। মালিনী, গান্ধারীর আবেদন, নরকবাস প্রভৃতি নাট্যকাব্যের মূল-াব ধর্ম জিজ্ঞাসা। ধর্ম কি—এই ঐ সব নাটকের পাত্র-পাত্রীগণকে ন্ত করিয়াছে। ধর্মের বহিরঙ্গ ও ঙ্গের মধ্যে যে একটি দ্বন্দ্ব বর্তমান মূলোচ্ছেদ করিতে কবি সাধ্যানু-চেষ্টা করিয়াছেন। এখানেও দেখি দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব সমাধান প্রচেষ্টার পরিণাম। বদ্রাওনের নবাব দুহিতা গিরিপথে চলিতে চলিতে অতল-খাদের প্রান্তে আসিয়া বলিয়া ছে—"যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি াম তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনন্ত।" তারপরে জীবনব্যাপী রত ধারণের কপালে করাঘাত করিয়া লিয়া উঠিয়াছে, "হায়, ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া া।" এ জিজ্ঞাসা, এ নৈরাশ্য কেবল ঐ হতভাগিনীর মাত্র নয়, স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকল মানুষেরই। এই জিজ্ঞাসা সর্বজনীন, সর্বকালীন। এর চেয়ে মহত্তর অভিজ্ঞতা আর কি হইতে পারে। এত বড় বাস্তব সত্যকে যাঁহারা রোমান্টিক বলিয়া তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের সাহসের প্রশংসা করিতে হয় বটে! এই গল্পকে যাঁহারা রোমান্টিক অবাস্তবতা মনে করেন, বুঝিতে হইবে ছবির ফ্রেমখানাকেই তাঁহারা ছবি বলিয়া মনে করেন।

সুপ্রিয় (মালিনী) এবং অর্জুন (চিত্রাঙ্গদা) রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু নবাব দুহিতা দেশ-ব্রতধারী কেশরলালের ব্রতভঙ্গ করিতে পারে নাই। কেশরলাল ও কচ সমান ব্রতনিষ্ঠ; দেবযানী ও নবাবদুহিতা সমান হতভাগ্য; বোধকরি নবাবদুহিতার দুর্ভাগ্যই অধিক, কেন না দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়া মনের অভিমান লঘু করিতে সমর্থ হইয়াছে, নিজেকে অভিশপ্ত করা ছাড়া নবাব দুহিতার হাতে আর কোন অস্ত্র ছিল না। এই "মুসলমান ব্রাহ্মণীকে" কবি নিষ্ফলতার এক অতলস্পর্শ খাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

১৩০৬ সালে ছোট গল্প পাই না, তার বদলে পাই কথা ও কাহিনীর অনেকগুলি কবিতা।[৬০] অর্থাৎ গল্পের স্রোতটাই গদ্যের কূল ছাড়িয়া পদ্যের কূল ঘেঁষিয়া চলিয়াছে এইটুকু-মাত্র প্রভেদ।

১৩০৭ সালে আটটি গল্প পাইতেছি। তন্মধ্যে ফেল ও শুভদৃষ্টির বিষয় এক; একটির সুর উচ্চগ্রামে বাঁধা, অপরটির সুর নিম্নগ্রামে বাঁধা। শুভদৃষ্টি গল্পের নায়ক কান্তিচন্দ্র দৈবক্রমে বোবা মেয়ের সঙ্গে বিবাহিত না হইবার পরে চিন্তা করিতেছে—"যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোন সুখ ছিল না, শুভদৈব-ক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।" আর ফেল গল্পের অন্যতর নায়ক নলিন নিজের অমনোনীত বালিকাকে অবশেষে অপরের ঘরে বধূরূপে যাইতে দেখিয়া ঈর্ষায় ও নৈরাশ্যে কপাল চাপড়াইয়া মরিয়াছে।

দুটি গল্পেরই মর্ম ভিন্ন আকারে আকাশের চাঁদের অনুরূপ।

এখন ১৯০১ সাল, কবির বয়স চল্লিশ বৎসর, তাহার আয়ুষ্কালের ঠিক মধ্যরেখা। এবারে তাঁহার ছোট গল্প রচনার ধারায় সত্যকার ছেদ পড়িয়াছে। ১৯০১ হইতে ১৯১২ সালের মধ্যে মাত্র আটটি গল্প পাইতেছি। ছোট গল্প রচনায় ছেদ পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু গল্প রচনায় ছেদ পড়ে নাই—কারণ এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনখানি উপন্যাস পাইতেছি —চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা। আগে যেমন দেখিয়াছি মাঝে মাঝে রবীন্দ্র-নাথের ছোটগল্পের ধারা ক্ষীণ হইয়া গিয়া কাহিনীমূলক কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে, এখানে তেমনি দেখিতেছি, ছোটগল্পের ধারা ক্ষীণ, তার বদলে উপন্যাসের ধারাটি প্রবল।

নষ্টনীড় রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প।[৬১] নষ্টনীড় যেন চোখের বালির খসড়া। চোখের বালি বহু শাখা প্রশাখায় জটিল, নষ্টনীড় আদর্শ ছোট গল্পের ন্যায় শরবৎ ঋজু গতি-সম্পন্ন। ছোট গল্পকে উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা উচিত হইবে না। কিন্তু একথাও সত্য যে, চোখের বালির উপ-সংহার অনেকের কাছে যেমন অতৃপ্তিকর ও অসন্তোষজনক মনে হয়, নষ্টনীড়ের উপসংহার সম্বন্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায় না। চোখের বালি মহৎ, কিন্তু নষ্ট নীড় স্বয়ম্পূর্ণ।

১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪) পাই সাতটি গল্প। এগুলি সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে (১৩২১-এ) পাই দুটি গল্প। আর ১৩২৪ সালে

---

৬০ পুজারিণী, অভিসার, পরিশোধ, সামান্য ক্ষতি, মূল্য প্রাপ্তি, নগর লক্ষ্মী, অপমান বর, স্বামী লাভ, স্পর্শমণি বন্দীবীর, মানী, প্রার্থনাতীত দান, রাজবিচার, শেষ শিক্ষা, নকল গড়, হোরি খেলা, বিবাহ বিচারক, পণ রক্ষা। বিসর্জন (কাহিনী)।

৬১ নষ্টনীড়, বৈশাখ—অগ্রহায়ণ, ১৩০৮ (১৯০১)।

একটি মাত্র গল্প পাইতেছি। এগুলিকে একত্র বিচার করিতে হইবে।৬২

প্রথমেই লক্ষ্য করিবার ব্যাপার এই যে, এগুলির বিষয়বস্তু নানাবিধ সামাজিক সমস্যা। প্রথমদিকে লিখিত পোস্টমাস্টার, ক্ষুধিত পাষাণ, একরাত্রি বা জয়-পরাজয়ের মতো একটি গল্পও ইহাদের মধ্যে নাই। কবির বিষয় এখানে আত্মকেন্দ্রী নয়, অন্য কেন্দ্রী। ঠিক পূর্ববর্তী পর্বের গল্পগুলিও তা-ই, কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটা বুঝিবার জন্য এই পর্বের কবি জীবন আলোচনার যোগ্য।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সালের মধ্যে কবির তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, বলাকা ফাল্গুনী আর পলাতকা এই সঙ্গে চতুরঙ্গের কথাও মনে রাখা যাইতে পারে।৬৩ এই সব গ্রন্থে নানা বিচিত্র ভাবের কথা থাকিলেও দুটি বিষয় অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। সংক্ষেপে সে দুটির নামকরণ করা যাইতে পারে—যৌবনের আহ্বান এবং নারীর মূল্য। একদা যে-যৌবনকে তিনি 'চল্লিশের ঘাট' হইতে বিদায় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফাল্গুনীতে তাহাকেই নূতন রসে, নূতন রূপে নিরাসক্ত যৌবন-রূপে লাভ করিলেন, বলাকাতে তাহাকেই একটি জীবনতত্ত্বরূপে আহ্বান করিলেন। আর চতুরঙ্গ ও পলাতকা কাব্যে অনন্য নির্ভর হইয়া নারীর পূর্ণমূল্য দান করিলেন।

উর্বশীতে নারীর একরূপ দেখিয়াছি, যে 'নহ বধূ, নহ মাতা, নহ কন্যা'; সে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, কিন্তু সে সংসারের কেহ নয়। মানস সুন্দরীতে নারীর আর একরূপ সে-ও সংসারের কেহ নয়। মানস সুন্দরী যদি হয় গৃহকোণের দীপ, উর্বশী আকাশের শশীকলা। রবীন্দ্রনাথের নারীর ধারণা পরিণতি লাভ করিয়াছে দুই নারী তত্ত্বে, যেখানে নারী একরূপে উর্বশী, আর এক রূপে লক্ষ্মী, অর্থাৎ এক রূপে প্রেয়সী ও অন্য রূপে জননী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গল্পে নারীর মাতৃমূর্তিরই প্রকাশ উজ্জ্বলতর। অবশ্য চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর মতো চরিত্রে প্রেয়সী মূর্তিই অধিকতর দীপ্যমান, কিন্তু তাহাদের পৌরাণিক পরিবেশের দূরত্ব হেতু এই দীপ্তি নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া বাস্তব সংসারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাস্তব চারিণী বিনোদিনীর রূপে প্রেয়সীর শিখাটি উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কবি যেন তাহাতে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাই তাহাকে ব্যস্তভাবে সংসার-ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিয়াছেন। নষ্টনীড়ের চারুলতা সম্বন্ধেও একথা অংশত প্রযোজ্য। সংসার হইতে সে অপসারিত হয় নাই বটে, তবে প্রদীপে যে তৈল জোগাইয়া আসিতেছিল সেই অমল দূরে প্রস্থিত হইয়াছে। মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে রাসমণি ও আনন্দময়ীর মাতৃমূর্তির স্নিগ্ধ গৃহ দীপটিই বেশি করিয়া নজরে পড়ে।

এবারে, এই গল্পগুলিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল, বাস্তবচারিণী নারীর প্রেয়সী মূর্তিই এবার দীপ্ততর হইয়া উঠিল। নারীর প্রেয়সী মূর্তির সন্ধানে কবিকে আর পুরাণের ভূগোলে প্রবেশ করিতে হয় নাই, ঘরের কোণেই তাহাদের আবিষ্কার করিয়াছেন। সমাজে বিনোদিনী ও দামিনীর সমাবস্থা, কিন্তু কিছুকাল আগে যে-কবি সত্বর হস্তে বিনোদিনীকে অপসারিত করিয়াছিলেন তিনিই নিপুণ হস্তে দামিনীর দীপে কামনার সুরভি তৈল ঢালিয়া দিয়াছেন। দামিনী তবু আধা সংসারী আধা সন্ন্যাসী, কাজেই এক্ষেত্রে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হইতেছে স্ত্রীর পত্রের মৃণাল চরিত্রটি, এতদিন যে-দীপ নীরবে নিভৃতে গৃহপ্রাঙ্গণ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, এবারে তাহা সংসারের চতুষ্পথকে আলোকিত করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছে। এই গল্পগুলির নারী উর্বশীও নয়, মানস সুন্দরীও নয়; মাতা, বধূ বা কন্যারূপে মাত্র মূল্যলাভের জন সে আদৌ ব্যস্ত নয়; নারীরূপেই তাহা জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা ইহাই তাহা ধারণা।৬৪ এবারে এই দুটি সূ যৌবনের আহ্বান ও নারীর মূল্য মনে রাখিয়া আলোচ্য পর্বের গল্পগুলিকে বিবেচনা করয়া দেখিতে হইবে।

হালদার গোষ্ঠীর বনোয়ারীলাল মনে মনে যৌবনের আহ্বান শুনিয়াছে যৌবনের ধর্ম অমিতব্যয়িতা। সে টাকা জন্য হাত বাড়াইয়া দেখিল দস্তর বাধা তখন সে ভাবিতেছে,—"একদিন এই ধন সম্পদে তাহারই অবাধ অধিকার জন্মিবে। কিন্তু, যৌবন কি চিরদি থাকিবে? বসন্তের রঙিন পেয়ালা তখন এ সুধারস এমন করিয়া আপনা আপনি ভরিয়া উঠিবে না; টাকা তখ বিষয়ীর টাকা হইয়া খুব শক্ত হই জমিবে, গিরি শিখরের তুষার সংঘাতে মতো; তাহাতে কথায় কথায় অসাবধানে অপব্যয়ের ঢেউ খেলিতে থাকিবে না টাকার দরকার তো এখনই, যখন আনন্দে তাহা নয়-ছয় করিবার শক্তি নষ্ট হয় নাই।"

বনোয়ারীলালের যৌবনের সার্থক পথের বাধা হইল বংশমর্যাদা নামে অদৃ অথচ অতিশয় বাস্তব একটি পদার্থ বংশমর্যাদার বিরুদ্ধে সে একাকী, তাহা বিপক্ষে সকলেই এমন কি তাহার স্ত্রী পর্যন্ত। পত্নী কিরণলেখার কা বনোয়ারীর মূল্য স্বামী হিসাবে তত নয়, যতটা বংশের সন্তান হিসাবে, বংশে ভিত্তি বাদ দিয়া স্বামীকে দেখিতে অভ্যস্ত নয়। অবশেষে গোষ্ঠীবিদ্রোহ বনোয়ারীলাল পরাজিত হইয়া একাকী "চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইল।"

এখানে যৌবনের আহ্বানে স্পষ্ট বংশ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব করিয়াছে। দ্বন্দ্বে যদিচ ব্যক্তির পরাজয় হইয়া কিন্তু মনে রাখিবার বিষয় দ্বন্দ্বটা। কার ইহা কবির ছোটগল্পে একটি নূতন সু

ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, পণরক্ষা গল্পের বংশী বংশরক্ষা করিবার আশাতে দিবারাত্রি খাটিয়া তিলে তিলে মরিয়াছে রসিক যদিচ গৃহত্যাগ করিয়াছিল,

---

৬২ হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা। তপস্বিনী, পয়লা নম্বর (চলিত ভাষায় লিখিত প্রথম গল্প)।
পাত্র ও পাত্রী।

৬৩ বলাকা ১৯১৬, ফাল্গুনী ১৯১৬, পলাতকা ১৯১৮, চতুরঙ্গ ১৯১৬ সালে। চতুরঙ্গ ১৩২১ সালে সবুজ পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

৬৪ এই প্রসঙ্গে বাঁশরী, দুই বোন মালঞ্চ আলোচ্য।

বনোয়ারীলালের মতো বংশের নয়, নিতান্তই দাদার বিরুদ্ধে। র রসিক বংশের আকর্ষণ স্বীকার স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে।

নর্মাণব ছেলে গল্পের প্রধান নায়ক মানুষ নয়, শানিয়াড়ির চৌধুরী নামে একটি গোষ্ঠী সম্ভ্রম। রণ মোহসিঞ্চনে তাহাকে লালন ছ, এমন কি রাসমণির মতো াণ নারীও তাহাকে ভুলিতে পারে গলীপদ ঐ বংশ গৌরব পুনঃ-ত করিবার চেষ্টাতেই অকালে বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

পতধনের মৃত্যুঞ্জয়ের অর্থাকাঙ্ক্ষার বনোয়ারীলালের অর্থাকাঙ্ক্ষার কত বনোয়ারী টাকা চায় নিজের জন্য, র বিলাসের জন্য, আর মৃত্যুঞ্জয় শে মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য। কারাগারের সমস্ত ঐশ্বর্য পাইলেও য় এক কণা অপব্যয় করিত না, বংশ সম্ভ্রম নামে দেবতার পায়ে করিয়া দিত। ঠাকুরদা গল্পটি এই বের আর একটি উদাহরণস্থল।

মেন্তী গল্পের পার্বতী হৈমন্তী হইয়াছে ব্যক্তিত্বের খোলা হাওয়ায়, র পরে আসিয়া পড়িল একান্ন-পরিবারের প্রাচীন দুর্ভেদ্য দুর্গে। াওয়া বদল তাহার সহ্য হইল না, লালিত শিশিরবিন্দু বংশমর্যাদার তপে শুকাইয়া উবিয়া গেল।

বাষ্টমী গল্পের বোষ্টমী গুরুর থানি লালসার ইঙ্গিতে স্বামী ও ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। কেন? যে সমাজে লোকে বংশ-রায় গুরুর কাছে নারীত্ব বিসর্জন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, সেখানে ীর ব্যবহার আতিশয্য মনে হইতে কিন্তু এ যে নূতন আবহাওয়া! ী নিজেকে বংশলতিকার একটি মাত্র মনে করিতে পারে নাই, ল সংসার ত্যাগ করিত না; সে কে স্বতন্ত্র একটি সত্তারূপে, নারী-দেখিয়াছিল তাই ঐ লালসার নে তাহার আশ্রয় পড়িয়া গেল, তখন ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় কি? স্ত্রীর পত্র' গল্পটির সঙ্গে পলাতকা র 'মুক্তি' কবিতাটির আন্তরিক মিল। মৃণাল স্বামীকে লিখিতেছে,—"আমি তোমাদের মেজবউ। আজ পনেরো বছরের পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস ক'রে এই চিঠি লিখছি, এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়।" এ স্বামীর কাছে স্ত্রীর পত্র নয়, পুরুষের কাছে নারীর পত্র, গল্পটির নাম নারীর পত্র হইতে পারিত।

পনেরো বছরের পত্নী-জীবনের অভিজ্ঞতায়, অনেক গ্লানি স্বীকার করিয়া, অনেক দুঃখ কষ্ট দেখিয়া মৃণাল বুঝিয়াছে যে, মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীত্বে নয়, নারীত্বে। পত্নীত্ব নারীত্বের অংশ মাত্র, পূর্ণতা নয়, আর পূর্ণতার সাধনাই জীবনের লক্ষ্য। মৃণালের সবল ব্যক্তিত্ব বৃথা বংশমর্যাদা, ও ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডী বিদীর্ণ করিয়া নারীত্ববোধের মুক্ত আকাশে আপন ব্যক্তিত্বের শতদলটি বিকশিত করিয়া ধরিয়াছে। সে লিখিতেছে—"কোথায় রে রাজমিস্ত্রির গড়া দেয়াল, কোথায় রে তোদের ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া; কোন্ দুঃখে কোন্ অপমানে মানুষকে বন্দী ক'রে রেখে দিতে পারে। ঐতো মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে। ওরে মেজো বউ, ভয় নেই তোর। তোর মেজো বউয়ের খোলস ছিন্ন হ'তে এক নিমেষও লাগে না। তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আকাশের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে।......আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।......আমি বাঁচলুম।"

মেজোবউ মরিয়া নারীরূপে নূতন জন্মলাভ করিল। এ আনন্দ মুক্তির, এ বাঁচা নারী জীবনের সার্থকতার।

পূর্বে যে দুটি সূত্রের কথা বলিয়াছি যৌবনের আহ্বান আর নারীর মূল্যবোধ, স্ত্রীর পত্র গল্পটিতে তাহাদের সঙ্গম ঘটিয়াছে। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের যে-আবহাওয়ায় মেজো বউয়ের যৌবন অবহেলিত ছিল শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া তাহার সৌন্দর্য সে দেখিতে পাইয়াছে, আর দেখিয়াছে যে স্বয়ং বিধাতা সেই সুন্দরী নারীর আস্বাদনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। মানুষ যদি নারীর মূল্য দিতে অসমর্থ হয়, বিধাতা কার্পণ্য করিবেন না। এই বোধের চরিতার্থতাতেই মুক্তি।

এই বিষয়টিই পলাতকাকাব্যে মুক্তি কবিতাতে নির্গলিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মনে হয় যেন পদ্যটি গদ্যের রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। মৃণাল কবি হইলে, ঐ কবিতাটি স্বামীকে লিখিয়া পাঠাইতে পারিত। আর শুধু 'মুক্তি' কবিতাটিই বা কেন, পলাতকার অনেক-গুলি কবিতা ঐভাবে ভাবিত।
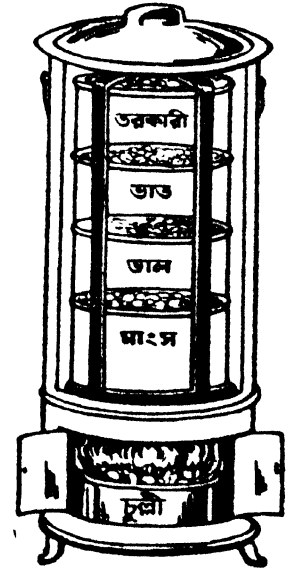
অপরিচিতা গল্পের কল্যাণী এবং তাহার পিতা শম্ভুনাথ সেন বাংলা দেশের যাবতীয় বর ও বরকর্তার সম্মুখে একটা স্পৃহনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। বিবাহটাই স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র পন্থা নয়, একথা শম্ভুনাথ সেন জানিত, কাজেই বরকর্তার অসহনীয় জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণ সে করে নাই। নারীর পক্ষে সংসারে যে অন্য দ্বার খোলা আছে এবং সে দরজাও মনুষ্যত্ব লাভের পরিপন্থী নয় কল্যাণী, পিতার উপযুক্ত পুত্রী তাহাই প্রমাণ করিয়াছে।

কোন কারণে কোন নারী স্বামী-পরিত্যক্ত হইলে আমাদের সমাজে তাহার সম্মুখের আর সব দরজা বন্ধ হইয়া যায়, খোলা থাকে কেবল পূজার্চনার এবং ব্রহ্মচারিণী সাজিবার পথটা। তপস্বিনী গল্পের নায়িকা ষোড়শীকে রবীন্দ্রনাথ সেই পথে বাহির করিয়া ঘটনা বিন্যাসের দ্বারা তাহার অবাস্তব হাস্যকরতা দেখাইয়া দিয়াছেন। যে স্বামীকে সে হিমালয়-বাসী যোগীরূপে ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া-ছিল হঠাৎ তাহার বিদেশী "কাপড়-কাচা কল কোম্পানীর ভ্রমণকারী এজেণ্ট" রূপে প্রত্যাবর্তন অনাবশ্যক রূঢ় মনে হইতে পারে, কিন্তু সমাজের পক্ষে এরূপ আঘাতের তখন প্রয়োজন ছিল, এখনো আছে।

গ্রন্থকীট স্বামীর হাতে 'পয়লা নম্বর' গল্পের নায়িকা অনিলার নারী-মর্যাদা পূর্ণ মূল্যে পায় নাই সে তাহার এক দুঃখ। আবার পাশের বাড়ীর সিতাংশুমৌলী তাহার অবহেলিত নারীত্বের প্রতি যে লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল সে তাহার আর এক দুঃখ। এখন এই দুই দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় দুইজনকে একই বাণীর দ্বারা অনুশাসন করিয়া গৃহ ছাড়িয়া সে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর আর পাঁচটিমাত্র গল্প পাই, এগুলিতে নানাভাবের কথা আছে।৬৫

নামঞ্জুর গল্প ও সংস্কার গল্পের বক্তব্য প্রায় এক। "অনেক বড় কথা কহা সহজ নয়; কিন্তু রাজনীতির উচ্ছ্বাসে বাস্তবের প্রশ্ন যখন আসে, তখনই দেখা যায়, মনুষ্যত্ব হইতে সংস্কার হয় প্রবল। না-মঞ্জুর গল্পের অনিল অমিয়াকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প, কিন্তু যেমন সে অমিয়ার হীন জন্মের ইতিহাস জানিল, শুকাইয়া গেল তাহার প্রেম, সংস্কারে ও রুচিতে বাধিল। সংস্কার গল্পেও উৎপীড়িত মেথরকে গাড়ীতে তুলিয়া রক্ষা করিতে সংস্কারে বাধা পাইল; খদ্দরধারিণী শ্রীমতী কলিকা স্বামীকে বলে—মেথরকে গাড়ীকে নিতে পারবো না।" ৬৬

বলাই গল্পটি শান্তিনেকতনে ১৩৩৫ সালে শ্রাবণ মাসে বৃক্ষ রোপণ উৎসব উপলক্ষে লিখিত ও পঠিত। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিতেছেন — "গল্পটি নিঃসন্তান ধনী খুল্লতাত কর্তৃক লালিত একটি পিতৃমাতৃহীন বালকের কাহিনী, যে তাহার নিঃসঙ্গ জীবনে উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত। ...ইহা ইতিহাস নহে, কিন্তু কবি বলেন যে, বাল্যকালে উদ্ভিদজীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয় মনের ভাব ঐ বালকটির মতো ছিল।" ৬৭

কয়েক মাস পরে লিখিত বনবাণী কাব্যের জগদীশচন্দ্র নামে কবিতাটিতে উদ্ভিদজীবনের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কের যে বর্ণনা কবি করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে বলাই গল্পের ঐ বিষয়ক বর্ণনার আন্তরিক মিল আছে এবং অনেক স্থলে সে মিল আক্ষরিকও বটে। ৬৮

চিত্রকর গল্পের গোবিন্দ ও তাহার বিধবা মাতা ছবি আঁকে। কিন্তু কাহারো কাছে তাহারা উৎসাহ পায় না, কারণ ও বিদায় পয়সা আসিবে না, তা-ছাড়া তাহাদের অঙ্কিত ছবিগুলোও অনেকের মত ছবির পর্যায়ভুক্ত নয়। দরিদ্র পরিবার-ভুক্ত মাতাপুত্রের শিল্পীজীবনের দুঃখের চিত্র সূক্ষ্ম করুণ রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। ৬৯

এই গল্প পাঁচটিতে শেষতম কোন একটি সাধারণ ভাবের সূত্র পাওয়া যায় না, নানা চলতি ভাবের ছায়াতে এগুলি বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

৬

এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক রচনার ভাবাত্মক যোগাযোগ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কোন একটি রচনার মধ্যে লেখকের সমগ্র মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, অংশবিশেষের পরিচয় মাত্র পাওয়া যায়। এখন সেই রচনাটির সঙ্গে লেখকের তৎকালীন অন্যান্য রচনা যোগ করিয়া লইলে মনের প্রকাশ পূর্ণতর হয়। তৎসত্ত্বেও সমগ্র মনের পরিচয় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তার কারণ প্রথমত মনের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল, তিন-চারমহলা বাড়ির মতো; তার উপরে রচনাতেই যে তাহার নিঃশেষ প্রকাশ এমন নয়, অনেক বাজে খরচ হয়, অনেক হাতে থাকিয়া যায়, সমগ্রের হিসাব সমগ্র রচনাতে কখনই পাওয়া যায় না। তবু যতটা বেশি পাওয়া যায়। সেই আশাতে ছোট গল্পের সঙ্গে সম-কালীন অনেক রচনাকে জোড়া দিয়া লইয়াছি। প্রধানত আমাকে কবিতা ও চিঠিপত্রের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, প্রসঙ্গত অন্যান্য রচনারও উল্লেখ করিয়াছি। এখন যদি কোন অধ্যবসায়ী সমালোচক তাঁহার গল্প-গুলির সঙ্গে সমকালীন সমস্ত শ্রেণীর রচনার যোগাযোগ স্থাপন করেন, তবে অবশ্যই রবীন্দ্র মানসের পূর্ণতর পরিচয় পাইবেন। তবে আমার বিশ্বাস, কবি-মনের যে মানচিত্র আমি আঁকিয়াছি তাহা নানা তথ্যে পূর্ণতর হইয়া উঠিবে মাত্র, কিন্তু তাহার আয়তনের ও প্রকৃতির কোনরূপ বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটিবে না।

(ক্রমশঃ)

৬৫। নামঞ্জুর গল্প ১৯২৫; সংস্কার ও বলাই ১৯২৮; চিত্রকর ১৯২৯ এবং চোরাই ধন ১৯৩৩ সাল।

৬৬। রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৫

৬৭। রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৭

৬৮। জগদীশচন্দ্র, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫। কৌতূহলী পাঠকগণকে এই দুটি অংশ মিলাইয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

৬৯। তিন সঙ্গীর অন্তর্ভুক্ত রবিবার গল্পের নায়কও চিত্রকর, তাহার ছবিরও সমজদার এদেশে নাই; তাহার ইচ্ছা সে একবার বিদেশে যাইবে ছবিগুলোর গুণ যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে। এই সব গল্পে কবির নিজ চিত্র সাধনার অভিজ্ঞতা ছায়াপাত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দীঘার সমুদ্র সৈকতে

শ্রীসুনীলকুমার সেন

...লার প্রধান স্বাস্থ্যনিবাস দীঘার ... দূরত্ব কল্‌কাতা হ'তে ১৫৩ ... দীঘার সমুদ্রতট বড়ই মনোরম ... কেউ কেউ বলেছেন এবং আজকাল ...ও কিছু কিছু দীঘা সম্বন্ধে খবর ...চ্ছে দেখে ছুটীতে দীঘা যাওয়াই ক'রে ফেল্‌লাম। চাকর সহ আমরা ...ন এক শুভদিনে বেরিয়ে পড়লাম। ...র আগে সেখানে থাকবার যায়গা ... মাথা ঘামাতে বেশ একটু হ'য়েছিল, ...ন থাকবার কি রকম ব্যবস্থা আছে ...ম্বন্ধে কোন সঠিক খবর আগে ... পেলাম না। রেল কর্তৃপক্ষকে ...সা ক'রেও সদুত্তর পাওয়া গেল না, ... অনেকে অনেক কথা বললেন। ...বললেন, দীঘা এখন পর্যন্ত বসোপ-...ী হয়নি, থাকবার যায়গার অভাব, ...র কেউ কেউ বললেন, ভাল ভাল ...ঘর হ'য়েছে, থাকবার কোনই অসুবিধা হবে না। তবে সবাই বললেন, সমুদ্রের দৃশ্য খুবই চমৎকার, গেলে ঠকতে হবে না। এটা আমরা অনুমান করলাম যে, থাকবার অসুবিধা হ'লেও মনের খোরাকের অভাব হবে না। আমরা হাওড়া থেকে কণ্টাই রোডের টিকিট কিনে পুরী প্যাসেঞ্জারে চেপে বসলাম। শেষ রাত্রে আমরা কণ্টাই রোডে পেঁছালাম, সঙ্গে সঙ্গেই কণ্টাই বা কাঁথি যাবার বাস মিলল। কণ্টাই রোড থেকে কাঁথি ৩৪ মাইল বাসেই যেতে হয়, রেল গাড়ির কোন ব্যবস্থা নেই। ভোরবেলায় আমরা কাঁথিতে পেঁছালাম। কাঁথি থেকে আলাদা বাসে দীঘা যেতে হয়। দীঘার বাস ছাড়তে দেরী আছে জেনে আমরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এখানে এসে শুনতে পেলাম, কাঁথির সুপরিচিত কংগ্রেসনেতা শ্রীসতীশচন্দ্র জানা মহাশয়ের দীঘাতে বাড়ি আছে এবং তিনি দীঘাতে প্রায়ই যাতায়াত করেন। আমরা দীঘা সম্বন্ধে খবরাখবর নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করা ঠিক করলাম। সতীশবাবু আমাদের দীঘা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বললেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে শ্রীসতীশচন্দ্র দিন্দা মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা করলাম, তাঁরও দীঘাতে একখানা বাড়ি আছে শুনেছিলাম। তাঁর কাছে গিয়ে শুনলাম যে, যদি তাঁর বাড়িতে অন্য লোক না থাকে তাহ'লে একখানা ঘর পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু প্রতিদিনের জন্য ৩৲ টাকা দক্ষিণা দিতে হয় এরকম ব্যবস্থা আছে। একখানা চিঠিও আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম এবং তাঁরই পরামর্শানুসারে কিছু চাল ডাল এবং ডিম সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। প্রায় ১১৷৷টার সময় আমাদের বাস দীঘার দিকে রওনা হ'ল। কাঁথি থেকে দীঘা ২২ মাইল এবং বর্তমানে এ রাস্তাকে পিচের করবার জন্য বঙ্গীয় পূর্তবিভাগ খুব তোড়জোড় করছেন—যায়গায় যায়গায় পিচের রাস্তাও হ'য়েছে। দু' পাশে ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে আমরা দীঘার পথে এগিয়ে চললাম।

...ীঘার সমুদ্রে মৎস্যসন্ধানী জেলের দল — ফটোঃ অজিত সোম
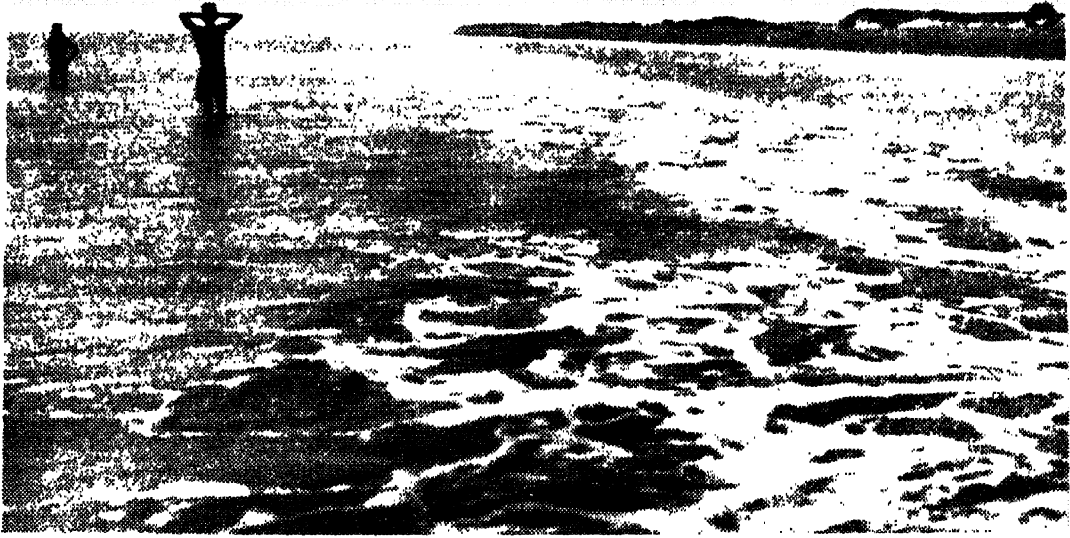
দীঘার সমুদ্র-সৈকত **ফটোঃ অজিত সোম**

দীঘার কাছাকাছি আসতে আমাদের নজরে প'ড়ল, 'সী ডাইক' বা সমুদ্রের বাঁধ। মাঝে মাঝে প্রবল জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনাজল এ সী-ডাইক পর্যন্ত এসে পড়ে। এ নোনাজল চাষ আবাদের খুব ক্ষতিকর। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিকে এ ক্ষতি থেকে রক্ষা করবার জন্যই এ ব্যবস্থা। সীডাইক দেখে আমাদের খুবই আনন্দ হ'ল কারণ আমরা সমুদ্রের প্রায় কাছে এসে পড়েছি। বেলা ১১টার সময় আমরা দীঘা এসে পে'ছিলাম। বাস থেকে নেমে চারদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মন মুগ্ধ হ'য়ে গেল। আশে পাশে পাইন্ বন এবং সামনেই র'য়েছে বীচি-মালা শোভিত বঙ্গোপসাগর। প্রাকৃতিক দৃশ্য কিছুক্ষণ উপভোগ করার পর আমাদের খেয়াল হ'ল, আমাদের ত' এখন বাসস্থানের খোঁজ করতে হয়। সামনেই দেখতে পেলাম গভর্নমেণ্ট ইন্সেপেকশন্ বাংলো কিন্তু এখানে আগে থাকতে ব্যবস্থা না করলে যায়গা পাওয়া যায় না এবং এর ব্যবস্থা করতে হয় আবার কাঁথি থেকে। অগত্যা এখানে থাকবার কথাও ভুলে যেতে হ'ল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি মিনিস্টার চিত্তবাবুর দীঘাতে একখানা বাড়ি আছে একথা আমরা আগেই শুনেছিলাম। সে বাড়ির খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, বাড়ি এখন খালি আছে এবং আমরা সেখানে উঠতে পারি। সেখানে আমরা তল্পি-তল্পা নিয়ে হাজির হ'লাম।

সমুদ্র-সৈকতে পে'ছে যে আনন্দ আমাদের হ'য়েছিল তা অবর্ণনীয়। এমন সুন্দর সমুদ্র সৈকত খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় দু'শ গজ চওড়া 'বীচ' মাইলের পর মাইল চলেছে—সমুদ্র স্বাভাবিকই শান্ত কেবল পাড়ের কাছে এসে তরঙ্গাঘাতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে। আমাদের দলে যারা কক্সবাজার কিম্বা পুরী গিয়েছিলেন তাঁদের কাছে দীঘার বঙ্গোপসাগরের প্রশস্তিকে অনেকটা অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'য়েছে। তেমন বড় বড় ঢেউ নেই, গর্জনও কম। সেজন্য যারা সমুদ্রস্নানে খুব অভ্যস্ত নয় তাদের কাছে আবার এখানে সমুদ্রস্নান খুব ভীতিজনক ব'লে মনে হবে না। যেদিকে চোখ ফেরান যায়, কেবল জলরাশি চোখে পড়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জলরাশি সূর্যালোকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু ক'রে দেয়। সমুদ্র সৈকতের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে বালিয়ারী স্তূপ বা বালির পাহাড়, মাইলের পর মাইল চলেছে এই বালির পাহাড়। বালির পাহাড় থেকে সমুদ্রের দৃশ্য মনপ্রাণকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। স্থানে স্থানে বালিয়ারী পাহাড়ের মধ্যে ঝোপ ঝাড় রয়েছে এবং কোন কোনও বালির পাহাড় আবার তৃণাচ্ছাদিত। বালির পাহাড়ের নীচে আছে যায়গায় যায়গায় কেওয়াবন দীঘার সর্বত্রই উ'চু নীচু যায়গা রয়েছে যথেষ্ট এবং এই ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে কেউ কেউ বাড়ি ক'রেছেন। দীঘাতে বাস থেকে নামতেই প্রথমে চোখে পড়ে স্নেইথ্ সাহেবের বাংলো, পাইন্ গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাদা রংয়ের বাড়িটাকে খুবই চমৎকার দেখায়। ফরেস্ট ডিপার্ট-মেণ্ট থেকে এই বালির পাহাড়ের পিছন দিকে খানিকটা যায়গা নিয়ে পাইন বন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ যায়গাটা

া জমি। এই পাইন বন দীঘার
ক সৌন্দর্যকে অনেকটা বাড়িয়ে
। কেবল গ্রামের দিক্‌টাই সমতল
এখানেই লোকের বসতি আছে।
াড়া সামনের দিকে বালিয়াড়ী
ড়র নীচে মাত্র কয়েকখানা বাড়ি
—শুনেছি কল্‌কাতার অনেকেই
কিনেছেন কিন্তু বাসস্থান নির্মাণ
নাই; সেজন্য সন্ধ্যার দিকে খুব
লোকজন চোখে পড়ে না। নাড়া-
র রাজবাটী দীঘাতে আর একটি
য় স্থান। 'দেবেন্দ্রলাল খাঁ মহা-
রসবোধকে তারিফ না করে থাকা
না। নিখুঁতভাবে তিনি তাঁর
দাপম বাড়িকে রূপসজ্জা দিয়েছেন।
নে মাঝে মাঝে তাঁর ছেলে এসে
থাকেন। এ বাড়িতে পশ্চিম
র রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি দীঘা
এসে উঠেছিলেন। শুনেছি,
মবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়ও
তে যায়গা নিয়েছেন, কিন্তু বাড়ি
হয়নি। কিছুদিন হ'ল দীঘাতে
হোটেল খোলা হ'য়েছে। এখানে
আনাতে এক বেলার খাবার পাওয়া
তবে কল্‌কাতাবসীর পক্ষে এ গ্রাম্য
লে বেশীদিন থাকা কষ্টকর। আমরা
কদিন ছিলাম, আমাদের প্রচুর ক্ষুধা-
হ'ত—এর কারণ অবিশ্যি দীঘার
াকর জলবায়ু। মনের আনন্দও যথেষ্ট
ছি। মাছ এখানে প্রতিদিনই সমুদ্র-
তে পাওয়া যায়। স্থানীয় জেলেরা
নবেলা সমুদ্রে জাল ফেলে এবং সমুদ্রে
করতে গিয়ে অনেকেই মাছ কিনে
ন। মাছের দামও খুব বেশী না। আমরা
নে থাকতে কল্‌কাতা থেকে আরও
লোক এসেছিলেন, সবাই দীঘার
সায় পঞ্চমুখ। সত্যি বলতে কি,
াদেশে দীঘার মত আর একটিও
দ্রতটস্থিত স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম
গা নেই। দীঘা বিদ্যাভবনের হেড্‌
টার মহাশয়ের মুখে শুনেছিলাম যে,
কালিদাস নাগ মহাশয় দীঘাকে
ণ্ডের ব্রাইটনের সঙ্গে তুলনা ক'রে
লছেন, দীঘা বাংলার 'ব্রাইটন্‌'।
কদিন বেশ আনন্দে কাটিয়ে আবার
্‌কাতায় একঘেয়েমির মধ্যে ফিরে
াম। এ প্রবন্ধ শেষ করার আগে
দীঘার সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে কিছু
আলোচনা করব।

দীঘা সত্যি অতি মনোরম যায়গা, যার উন্নতি আরও দ্রুত হওয়া উচিত ছিল। এ যায়গার যে আশানুরূপ উন্নতি হয়নি তার একমাত্র কারণ, দীঘা সম্বন্ধে বাঙ্গালী কখনই সচেতন হয়নি। বাঙ্গালী গিয়েছে কারমাটার, মধুপুর, গিরিধি এবং দেওঘরের উন্নতি করতে—সেখানে সে গিয়েছে চেঞ্জে পয়সা খরচ করতে ঘরের কোণের দীঘাকে উপেক্ষা করে, কারণ এ যায়গা বাংলাদেশের ভেতরে সেজন্য চেঞ্জের অনুপযোগী। কাজেই এখানে কোন ভাল হোটেল নেই, থাকবার কোন ব্যবস্থা নেই, রাস্তাঘাট ভাল নেই, আলোর অভাব। অথচ এ যায়গা নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অপরূপ। অনেকের মুখে শুনেছি যে, ভাল হোটেল চালাতে গেলে এখানে লোকসানই হবে, কারণ এখন পর্যন্ত যাত্রীর ভীড় খুব বেশী হয় না। বাংলা সরকার দীঘাকে উন্নত করবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন শুনেছি, কিন্তু এ পরিকল্পনা কতদিনে কার্যকরী হবে বলা যায় না; তবে শ্রীসতীশচন্দ্র জানা মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে, আগামী বাজেটেই নাকি দীঘার উন্নতি পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তোলার টাকা বরাদ্দ করা হবে। একথা শুনে অনেকটা আশান্বিত হয়েছি। উন্নতির প্রথম ধাপ হিসাবে গভর্নমেণ্ট পরিচালিত বা গভর্নমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত একটি হোটেল খোলা যেতে পারে, যেখানে লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থাও থাকবে। এও যদি সম্ভবপর না হয় তাহ'লে অবিলম্বে সাধারণের সাহায্যে একটি ধর্মশালা খোলার ব্যবস্থাও হ'তে পারে। সেখানে গিয়ে উঠে লোকে কিছুদিন থাকতে পারবে এবং নিজের খরচায় খাবার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবে। আর একটা অসুবিধা হ'চ্ছে যাতায়াতের। কণ্টাই রোড হ'তে বাসে দীঘা ৫৬ মাইল এবং খড়্গপুর হ'তে কাঁথি হ'য়ে ৮১ মাইল। কণ্টাই রোড হ'তে বাস কাঁথিতে আসে এবং সেখান থেকে আবার আলাদা বাসে দীঘা যেতে হয়—ভাড়া ৪৲-র উপর। খড়্গপুর হ'তে বাস আসে কাঁথি এবং সেখান থেকে আলাদা বাসে দীঘা যেতে হয়—ভাড়া ৫৲-র উপর। এ দু' রুটের ভাড়া খুবই বেশী। গভর্নমেণ্ট ট্রান্স-পোর্ট বিভাগ খড়্গপুর এবং কণ্টাই রোড হ'তে দীঘা পর্যন্ত অল্প ভাড়ায় বাস চালাবার ব্যবস্থা করলে সাধারণের খুবই উপকার হয়। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী অল্প পয়সায় চেঞ্জে যেতে পারে। দীঘাকে উন্নত ক'রে তুলতে পারলে এ এক অপরূপ যায়গা হবে এবং বাঙ্গালীর অর্থ বাঙ্গালীর ঘরেই থাকবে। দীঘা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে বেশী করে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং এর উন্নতির সম্বন্ধে প্রত্যেক বাঙ্গালীর যত্নবান্‌ হওয়া উচিত—এ যায়গা বাঙ্গালীর এক মহাসম্পদ।
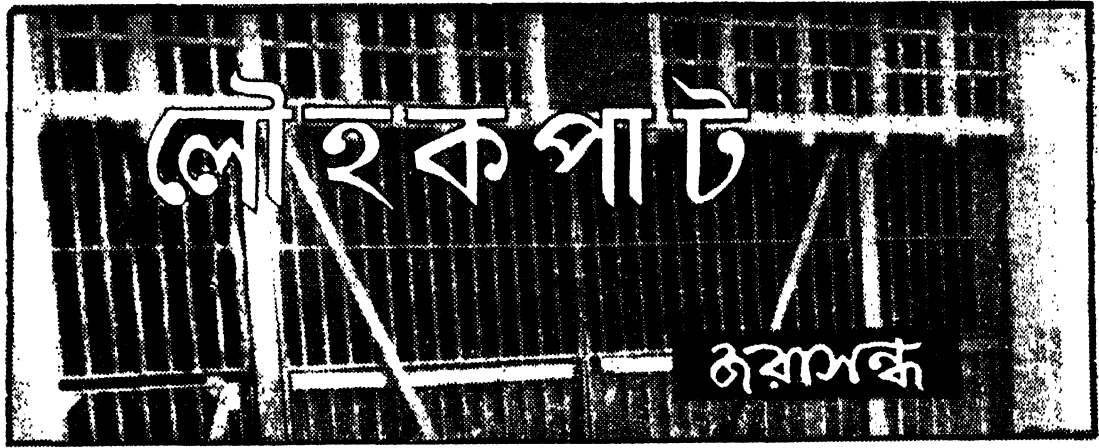
বারো

শুনেছি প্রাণী-বিজ্ঞান মতে চিংড়ী মাছ মাছ নয়। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিক মৎস্য-ভোজীর পক্ষে ব্যাপারটা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। কিন্তু এর চেয়েও চমকে যাবার কারণ ঘটল, যেদিন শুনলাম ভূতনাথ দারোগা দারোগা নয়। এ শুধু খবর নয়, এ একটা আবিষ্কার। রাম শ্যাম যদু থেকে আরম্ভ করে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ পর্যন্ত একটা গোটা মহকুমার মুখে যিনি একডাকে 'ভূতনাথ দারোগা', ভাবিনি সেই স্বনামধন্য পুরুষ একজন তুচ্ছ ডি-এস্-পি মাত্র। সরকারী পরিচয় যে আসল মানুষটির ধার দিয়েও যায় না, তারই আর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

ভূতনাথের দাপটে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়। অর্থাৎ গোরুচোর ফাজ্‌লা সেখ আর বাঘশিকারী দুর্দান্ত জমিদার কালু চৌধুরী একটা হাত কড়া পরে, একই দড়ি কোমরে বেঁধে একসঙ্গে কোর্টে আসে যায়। লঘু গুরু ভেদ নেই ভূতনাথ দারোগার কাছে। তাঁর শুভদৃষ্টি একবার যার উপরে পড়েছে, অর্থ এবং মুরুব্বির জোর তার যতই থাক, জেলের ঘানির সাতপাক তাকে ঘুরতেই হবে। যতবড় বেয়াড়া, খুঁতখুঁতে কিংবা উদার-পন্থী হাকিমই আসুন, ভূতনাথের আসামীকে বেকসুর খালাস দেবার মত কোনো ফাঁক পেয়েছেন বলে শোনা যায়নি।

খালাস অমনি দিলেই হল? —ভূত-নাথ বুক ফুলিয়ে বলেন তার ভক্তমহলে, ফৌজদারী মামলা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক। আইন কানুনের গলিঘুঁজির বালাই নেই। স্রেফ্ ঘটনা সাজিয়ে যাও। conviction মারে কে? কিন্তু ঘটনা মানে কি?—হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেন কোনো জুনিয়রকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যটি নেহাৎ উপলক্ষ। উত্তর দেন উনি নিজেই—ঘটনা মানে যদি বুঝে থাক—যেটা ঘটে, সুবল মিস্তিরের ডিক্সনারী ঘাড়ে করে ইস্কুল মাস্টারি করে খাওগে। পুলিশের চাকরি তোমার চলবে না। যা ঘটে নয়, ঘটনা মানে তোমার সুবিধের জন্যে যা ঘটা দরকার। এই যেমন ধর, বাঘাডাঙ্গার সতীশ কুণ্ডু হঠাৎ টাকার গরমে তেতে উঠেছে। তোমার এলাকায় বাস করে তোমারই সামনে ঘাড় উঁচু করে চলে। জব্দ করতে চাও? ফেলে দাও কোনো খুনী মামলায়।

কোনো ছোক্‌রা প্রবেশনার জিজ্ঞেস করে, কিন্তু, স্যর, কাছাকাছি কোথাও খুন তো একটা হওয়া চাই।

—কে বললে খুন হওয়া চাই? খুনের কোনো দরকার নেই; দরকার শুধু একটা লাস। দেশে এত লোক মরছে, আর একটা মড়া জোগাড় করতে পারবে না? আর কোথাও না পাও, হাসপাতালগুলো আছে কি করতে?

প্রবেশনারটি নাছোড়বান্দা। আবার প্রশ্ন করে, মড়া না হয় একটা জোটানো গেল। কিন্তু সেটা যে কলেরায় মরেনি, খুনের লাস, সেকথা প্রমাণ হবে কি করে?

ভূতনাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, কেন? ডাক্তার বলে একরকম প্রাণী আছে, শোনোনি কোনোদিন? ওরাই প্রমাণ করবে। ভগবান ওদের হাতে স্প্রিং লাগিয়ে দিয়েছেন; যেদিকে ঘোরাতে চাও, ঘুরবে। তবে, তার জন্য চাই কিছু তেল।

দু'একজন সিনিয়র গোছের অফিসর মাথা নেড়ে বলেন, ঐ যা বললেন, স্যর। ঐ তেলটাই হল আসল। ঐটি সংগ্রহ করাই একটু মুশকিল।

—কিচ্ছু মুশকিল নেই, সঙ্গে সঙ্গে বললেন ভূতনাথ, তেল আপনিই জুটে যায়। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, সতীশ কুণ্ডুর একটা বিপক্ষ দল আছে, নিশ্চয়ই, আর তার কর্ণধার হচ্ছেন জগৎ পাল কিংবা নিরঞ্জন সাহা। ওদের কাউকে শুধু ইঙ্গিতে জানতে দাও তোমার মতলবটা কি। তেলের পিপে মাথায় নিয়ে ছুটে আসবে। যত খুশী ঢাল। ডাক্তার যদি একটু নজর দেন, আদালতে গিয়ে দেখবে কলেরার পচা মড়ার পেট থেকে বেরিয়েছে বন্দুকের গুলি, কিংবা তার বুকে রয়েছে মারাত্মক ছোরার জখম।

এর পরে আর কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ থাকে না। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি অর্বাচীন পুলিশ মহলেও থাকে দু-একজন। তাদেরই কেউ এবার বলে বসে

, স্যর, লাস না হয় পেলাম, আর যে খুন তারও ডাক্তারি প্রমাণ পাওয়া কিন্তু খুনের সঙ্গে সতীশ কুণ্ডুকে ার মত সাক্ষী কোথায়?

ভূতনাথ সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে ঙ্গের হাসি মিশিয়ে বলেন, সাক্ষী আকাশ থেকে পড়ে না, বাপু, মাঠেও । না। ও জিনিসটা কষ্ট করে তৈরী হয়, আর তার জন্য চাই মাথায় মগজ আর বুকে খানিকটা সাহস। বলা বাহুল্য ভূতনাথের ভাণ্ডারে এ পদার্থের কোনোটারই অভাব নেই। জোরে সাক্ষী তৈরী আর আসামীর গরোক্তি আদায়, দুটোই তার কাছে তে। প্রথমে তোয়াজ তোষণ, তারপর গর্জন,—এইসব প্রচলিত পদ্ধতি আছেই, এ ছাড়া আছে তার কয়েকটা পেটেণ্ট কবিরাজি মুষ্টিযোগ।

—সাক্ষী কথা শুনছে না?

সহকারী বললেন, না, স্যর।

—কি বলে?

—কিছুই বলে না।

—তোমাদের যা করবার, করেছ?

—সবই তো করলাম।

ভূতনাথ গম্ভীরভাবে ব্যবস্থা দিলেন, যষ্টিমধুচূর্ণ এক পুরিয়া।

পুরিয়া যথারীতি সেবন করানো । অর্থাৎ একটি মধুবর্ষী বৃহৎ যষ্টি ীর পৃষ্ঠদেশে চূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু নির্বিকার। ভূতনাথের কাছে রিপোর্ট

—কি, সোজা হল না?

সহকারী হতাশভাবে মাথা নাড়লেন।

—দাও ডোজ তিনেক 'গুম্ফোৎপাটন ন'। যত নষ্টের মূল ব্যাটাচ্ছেলের হাজারী গোঁফ।

একজন কুস্তীগীর হিন্দুস্থানী হীকে এই মহৎ কার্যে নিয়োগ করা মিনিট পাঁচেক পরেই খবর এল, ী তৈরী।

শুধু সাক্ষী-বাগানো নয়, কনফেসন য় করতেও ঐ একই ব্যবস্থা। কিন্তু কটা দুর্ধর্ষ আসামী কখনো কদাচিৎ যায়, যাদের বেলায় গুম্ফোৎপাটন ন কিংবা শ্মশ্রুচ্ছেদন বটিকা হয়তো কার্যকরী হয় না। এরকম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তার শেষ এবং মোক্ষম আবিষ্কার,—মহানিমজ্জনী সুধা, চপেটাঘাত সহ সেব্য। শীতকালের গভীর রাতই হচ্ছে এ মহৌষধি প্রয়োগের প্রশস্ত সময়। তার উপর স্থানটা যদি পানা-পুকুর হয়, ফল অব্যর্থ।

ভূতনাথ ঘোষালের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, দেখা হয়ে গেল কার্যসূত্রে। আফিসে বসে কাজ করছি। ভারী জুতোর শব্দে মুখ তুললাম। যে ভদ্রলোক আমার টেবিলের ওপাশের চেয়ারখানা দখল করলেন, তার দৈর্ঘ্য ছ'ফুট এবং পরিধি পাঁচফুটের কম নয়। আমি জিজ্ঞাসু চোখে চাইতেই পাশে দাঁড়ানো পুলিশ অফিসারটি পরিচয় দিলেন—সদর ডি এস্ পি। ভদ্রলোক টুপিটা খুলতেই মাথা জোড়া বিশাল টাক চক্‌চক্ করে উঠল। আমি সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে বললাম, ও, আপনিই মিস্টার ঘোষাল? ভারী আনন্দ হ'ল।

—আনন্দ হল! —ছাদফাটানো হাসি হাসলেন ভূতনাথ; আমাকে দেখে কারো আনন্দ হয়, এই প্রথম শুনলাম মশাই আপনার কাছে। এদ্দিন তো জানতাম, এ রূপ দেখলে লোকে আঁৎকে ওঠে। —বলে পকেট থেকে একটা আধপোড়া মোটা সিগার বের করে ধরিয়ে কড়া ধোঁয়া ছাড়লেন।

ভূতনাথ অত্যুক্তি করেননি। প্রকাণ্ড একটা খাঁড়ার মত নাক, তার নীচে জমকালো পাকানো গোঁফ, সুগোল রক্তাভ চোখ, পানের রস আর সিগারের ধোঁয়ায় জারিত মোটা মোটা ঠোঁট, গোটা কয়েক গজদন্ত, এবং তার তলায় একখানা চওড়া চোয়াল। এ হেন আকৃতি আনন্দদায়ক তো নয়ই ঘোর আতঙ্কদায়ক। কিন্তু, আপনাকে দেখে ভারী আতঙ্ক হ'ল—একথা তো বলা যায় না কোনো সদ্য-পরিচিত আগন্তুককে।

সিগারটায় আরো গোটা কয়েক টান দিয়ে সহকারীকে বললেন, কই, তোমার কাগজপত্তর বের কর।

সহকারী একখানা কাগজ আমার সামনে রাখলেন—একজন হাজ্তি আসামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আবেদন। কাগজটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলাম। ভূতনাথ মাথা দুলিয়ে বললেন, আছে, মশাই, আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সই না নিয়ে আসিনি। সে-সব চলত আগেকার দিনে। যখন খুশী দেখা করেছি আসামীর সঙ্গে, দরকার মত বের করে নিয়ে গেছি থানায়, আবার পেঁাছে দিয়ে গেছি, যখন সুবিধা। পারমিশন তো দূরের কথা, একটা রসিদ-টসিদও চাননি জেলর বাবুরা। সেসব দিন আর নেই। আপনারা হলেন নব্যতন্ত্রের অফিসার। আমরাও তাই আটঘাট বেঁধেই কাজ করি। কই, আপনার মেট গেল কোথায়? একবার হুকুম করুন; নিয়ে আসুক বদ্মাসটাকে। এখানকার কাজ সেরে আবার কোর্টেও যেতে হবে একবার।

বলে, চেয়ারের উপর বিশাল দেহটা যতখানি সম্ভব এলিয়ে দিয়ে লম্বা হাই তুলে হাতে তুড়ি দিলেন।

আসামীকে আনানো হল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, সর্বাঙ্গে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন। দেড়মাস হাসপাতালে থাকবার পর কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে, কদিন হ'ল। মেট এবং আর একজন কয়েদির কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এসে বসে পড়ল। ভূতনাথ তার মুখের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে বললেন, তুমিই বদরউদ্দীন মুন্সী?

—হ্যাঁ, হুজুর। চিনতে পারছেন না?

—চিনবো কেমন করে বল? তোমার কীর্তিকলাপ অবিশ্যি জানতে বাকী নেই। কিন্তু চাক্ষুষ দেখা তো হয়নি কোনো-দিন।

—হ'য়েছে বৈকি? দেখা আমাদের হয়েছে, বড়বাবু। একবার নয়, দুবার।

—দুবার! বল কি? আমার তো মনে পড়ছে না। কোথায় দেখলাম তোমাকে?

—প্রথম দেখা আমাদের ছত্রিশ সালে কুড়ুলগঞ্জে ভুবন সা'র গদিতে। ডাকাতি করে পালাচ্ছিলাম। একেবারে পড়ে গেলাম হুজুরের পিস্তলের মুখে। গুলিও আপনি ছুঁড়েছিলেন। মাথা তাক করেই ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু মাথাটা নিতে পারেননি, নিলেন এই কানের পাশ থেকে একটুকরা মাংস। ভারী আপসোস হ'ল; কানের জন্যে নয়, হুজুরের জন্যে। এমন পাকা হাতের গুলিটা ফস্কে গেল!

ভূতনাথ হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, ফস্কে গিয়ে ভালোই হ'য়েছিল, ব'লতে হবে। তা না হ'লে আজ আমাদের দেখা হ'ত কেমন করে? খোদা যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন, কি বল? ভূতনাথের সুর হাল্কা। কিন্তু মুন্সী জবাব দিল গম্ভীর গাঢ় সুরে, আলবৎ। খোদা যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

ঘরের হাওয়া যেন হঠাৎ বদলে গেল। এবং মিনিট কয়েক কেউ কোনো কথা বলল না। তারপর ভূতনাথ আবার পূর্বসূত্রে ফিরে গিয়ে বললেন, আচ্ছা, এ তো গেল একবার। আর কোথায় দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে?

—ওরই ঠিক এক বছর পরে সোনা-ডাঙ্গার রমেশ ডাক্তারের বাড়িতে। নোটিশ দিয়ে ডাকাতি। একদল পুলিশ নিয়ে আপনি একেবারে রেডি হ'য়ে গিয়ে-ছিলেন। মতলব ছিল বদর মুন্সীকে ঝাঁক শুদ্ধ ডাঙ্গায় তোলা। কিন্তু দু' চারখানা ল্যাজা চালাতেই আপনার ফোর্স পালিয়ে গেল। হুজুর আশ্রয় নিলেন ডাক্তারের খিড়কির পুকুরে কচুরি পানার তলায়। আমার দলের লোকগুলো জানত, আপনিও সরে পড়েছেন। আমি কিন্তু জলের উপর হুজুরের ঐ গোঁফ জোড়া ভাসতে দেখেছিলাম। হাতে ল্যাজাও ছিল। কাজে লাগাইনি।

...একটু থেমে খানিকটা যেন শ্লেষ-জড়িত সুরে বলল মুন্সী, তা'হলেই দেখুন, হুজুর, খোদা যা করেন, ভালোর জন্যেই করেন।

ভূতনাথবাবুর মুখ দেখে মনে হ'ল, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। মুন্সীও সেটা লক্ষ্য করল এবং চোখে মুখে সামান্য একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, যাক্, ওসব পুরনো কথা। বাজে ব'কে খালি খালি আপনার সময় নষ্ট করবো না। এবার হুকুম করুন, এ গরীবকে হঠাৎ তলব করেছেন কেন?

ভূতনাথ চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগার টানছিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার আড়ালে তার মুখখানায় মনে হ'ল আষাঢ়ের মেঘ থম্থম্ করছে। আরও কিছুক্ষণ কালো ধোঁয়ার কড়া গন্ধ ছড়িয়ে সোজা হ'য়ে ব'সে বললেন, দ্যাখ বদরুদ্দিন, দেখা আমাদের হোক্ আর নাই হোক্, দুজন দুজনকে যে আমরা ভালোভাবেই চিনি, সেকথা তুমিও জান, আমিও জানি। কথার মারপ্যাঁচ আর বুদ্ধির লড়াই দেখিয়ে লাভ নেই। তোমাকে যা বলবো একেবারে খোলাখুলিভাবেই বলবো। তোমার কাছ থেকেও সেই জিনিসটাই আশা করি।

—মারপ্যাঁচ আমার মধ্যেও নেই, হুজুর। খুনীই হোক্ আর ডাকাতই হোক্, বদর মুন্সীর দিল শাদা। একথা তার দুশমনরাও অস্বীকার করবে না।

—আমিও সে কথা বিশ্বাস করি, মুন্সী; আর সেই বিশ্বাস আছে ব'লেই তোমার কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাইতে এসেছি। মুন্সী বিস্ময়ের সুরে বলল, সাহায্য! আমার কাছে?

—হ্যাঁ, তোমারই কাছে। আজ চৌদ্দ বছর ধ'রে পুলিশ তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছে; ধরতে পারেনি। শুধু পুলিশ নয়, বেসরকারী লোকেরাও কম চেষ্টা করেনি। তোমার দলের পেছনে তাড়া ক'রতে গিয়ে আজ পর্যন্ত তিনজন লোক প্রাণ হারিয়েছে, জখমও হ'য়েছে অনেক। কদমতলীর মাঠে তিন শ' লোকে ঘেরাও ক'রেও শেষ পর্যন্ত তোমাকে আটকাতে পারেনি। সেই বদর মুন্সী কিনা ধরা প'ড়ল জনকতক কোচাঝোলানো বরযাত্রীর হাতে, তার একটা ঘুষির মুখে যাদের গুঁড়িয়ে ছাতু হ'য়ে যাবার কথা। তোমাকে এখানে না দেখলে কথাটা বোধ হয় আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এমনিই হ'য়ে থাকে। এই দুনিয়ার নিয়ম। মহাভারতে আছে, অত বড় যে সব্যসাচী অর্জুন, তিনিও একদিন তাঁর গাণ্ডীবখানা তুলতে পর্যন্ত পারেননি।

বদর মুন্সীর ভারী গলার উত্তর এল, জানি।

—তা'হলেই দ্যাখ। সব নিয়তির খেলা। যা কিছু লম্ফ ঝম্ফ, সব দুদিনের। হঠাৎ একদিন এমনি ক'রেই তার শেষ হয়।

কটু থেমে ভূতনাথবাবু তেমনই ধীরে বললেন, তুমি সেরে উঠেছ, কথা। একরকম পুনর্জন্মই বলা ধড়ে যে তোমার প্রাণ ছিল সেদিন, তো কেউ বুঝতে পারেনি। মুন্সী কণ্ঠে বলল, ছিল না, হুজুর। প্রাণ পেয়েছি জেলর সাহেবের দয়ায়। আমার বাপ, আমার জন্মদাতা—সে মুখ তুলে তাকাল আমার।

ভূতনাথ বললেন, সে সবই আমরা ছি। কিন্তু যে-জীবন তুমি ফিরে ও'দের দয়ায়, তার বাকী ক'টা বোধ হয় ও'দের আশ্রয়েই কাটিয়ে হবে—শুনতে ভালো না লাগলেও ত্যি কথাটা জেনে রাখা ভালো।

মুন্সী হেসে বলল, সেটাও কি ন আমাকে মনে করিয়ে দেবেন বু? এই জেলের মাটিতেই যে ন আমার শেষ ঘুম আসবে, সেকথা জানি। তার জন্যে তৈরিও হ'য়ে।

ভূতনাথ উদাস কণ্ঠে বললেন, এই পরিণাম, আর সে-সম্বন্ধে তোমার যখন কোনো মিথ্যা আশাই নেই, আর মায়া কিসের? যাদের সঙ্গে হাত ধ'রে একদিন এই পথে পা য়েছিলে, তাদের পেছনে ফেলে এলে কেন? তাদেরও ডাক। সবাই নিজের ভাগ বুঝে নিক।

মুন্সীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়ল ভূত-র মুখের উপর। আস্তে আস্তে তার টের কোণে দেখা দিল আগেকার সেই কুণ্ঠিত হাসি। বলল, এই সাহায্যই আমার কাছে চাইতে এসেছেন, রে?

—শুধু চাইতে আসিনি, মুন্সী, হে বললেন ভূতনাথ, সে সাহায্য পাব ই ভরসা করি।

—তাহ'লে বুঝবো, বদর মুন্সীকে তে ভুল করেছেন বড়বাবু। আপনার খানি দামী সময় অনর্থক নষ্ট হ'ল থ আমার আপসোস হ'চ্ছে।

ভূতনাথের রূপ হঠাৎ বদলে গেল। ক্ষ কণ্ঠে বললেন, তার মানে, তুমি র কারো নাম করবে না?

উত্তরে মুন্সী শুধু হাসল একটু-খানি। তারপর উঠবার উদ্যোগ ক'রে বলল, হুকুম হ'লে এবার উঠতে পারি, বড়বাবু। আপনার কাজের ক্ষতি হ'চ্ছে। সে লোকসান আর বাড়াতে চাই না।... সেলাম, হুজুর।

ভূতনাথ তীব্র শ্লেষের সুরে বললেন, ভূতনাথ দারোগার মুষ্টিযোগগুলো আজও একেবারে অকেজো হ'য়ে যায়নি, একথা বোধহয় মুন্সী সাহেবের স্মরণ আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। তবে মুষ্টিযোগের ফল কি সকলের বেলায় সমান হয়, বড়বাবু? —বলে আর একবার সেলাম করে উঠে দাঁড়াল।

মুন্সী চলে যাবার পরেও খানিক-ক্ষণ ভূতনাথবাবুর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তাঁর মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সহকারীটি বললেন, আমি আগেই বলেছি, স্যর, ভালকথার পাত্তর ও নয়। রীতিমত ওষুধ চাই। সেই ব্যবস্থাই আমাদের এবার করতে হবে। আপনার 'নিমজ্জনী সুধা' কয়েক ডোজ পড়লেই বাপ্ বাপ্ করে পথে আসবে বাছাধন।

ভূতনাথ কটমট করে তাকালেন তাঁর সহকারীর দিকে, অতো সোজা মনে করো না। যে লোকটা কনফেশন করে, অথচ জড়ায়না কাউকে সে বড় কঠিন চীজ।

আমি বললাম, আপনার কথায় যদ্দুর বুঝলাম, লোকটা মহাপুরুষ। কিন্তু ধরা পড়ল কেমন করে?

—একেবারে মহাপুরুষের মত, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন ভূতনাথ, ধরা পড়ল, মার খেল ঠায় দাঁড়িয়ে, আর ঐ রকমের মার; তারপর করে বসল এক কনফেশন। শুধু ডাকাতি নয়, তার সঙ্গে মার্ডার এবং রেপ্। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই

যাকে বলে রহস্যময়। যাই হোক, আপনি ঠিকই বলেছেন, লোকটা মহাপুরুষ। কাজেই বেশ একটু কড়া নজরে রাখতে হবে। ডানায় যখন একবার জোর পেয়েছে হঠাৎ কোন্‌দিন্ বনের পাখী বনে চলে যাবে, টেরও পাবেন না।

সে বিষয়ে জেলের তরফ থেকে হুঁশিয়ারি এবং কড়াকড়ির ত্রুটি ছিল না। ভূতনাথের উপদেশে সেই ব্যবস্থা আর একটু দৃঢ়তর হল।

এই ঘটনার পর মাসখানেক চলে গেছে। মুন্‌সীকে বিশেষভাবে মনে করবার মত নতুন কিছু ঘটেনি। তারপর একদিন বিকালের দিকে সেল্‌-ব্লকের মেট এসে জানাল মুনস্‌সী আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—কেন?

—সে কথা হুজুরের দরবারে নিজেই নিবেদন করতে চায়।

আমার মেটটি কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানে এবং সাধুভাষার উপর তার গভীর অনুরাগ।

বললাম, আচ্ছা নিয়ে এসো।

মুন্‌সী এসে বসল আমার পায়ের কাছটিতে। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। সে কিছু বলল না, এদিক ওদিক চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল। তার উদ্দেশ্য বোঝা গেল। জনদুই কর্মী কার্যসূত্রে আমার আফিসে অপেক্ষা করছিল। তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে বললাম, বল, এবার।

মুন্‌সী আমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলল, বদর মুন্‌সীর মনের কথা এমন করে কেউ কোনোদিন বোঝেনি, হুজুর। আজ আবার এলাম এক নতুন আরজি নিয়ে।

—কি তোমার আরজি?

মুন্‌সী খানিকটা কি ভাবল। তারপর নিজের দুখানা হাতের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলল, গোস্তাকি মাপ করবেন, বড়বাবু। টাকাকড়ি সোনাদানা লোকে যতখানি চায়, যতখানি পেলে মনে করে সে বড়লোক, তার চেয়েও অনেক বেশী এই দুটো হাত দিয়েই তো লুটেছি জীবনভোর। কিন্তু কেড়ে যেমন নিয়েছি, ছড়িয়েও দিয়েছি তেমনি। পড়ে নেই কিছুই। যাদের কলজের ভেতর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম তাদের নিঃশ্বাসেই সব উড়ে পুড়ে শেষ হ'য়ে গেছে। আজ তাই মন আমার একেবারে হাল্‌কা। একটুখানি বোঝা শুধু রয়ে গেছে; উঠতে বসতে বুক চেপে ধরে। সেইটেই আজ হুজুরের পায়ের উপর ফেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই।

কথাটা স্পষ্ট বুঝতে না পেরে আমি নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রইলাম। মুন্‌সী আরো একটু কাছে সরে এসে হাত জোড় করে বলল, বলতে সাহস হয় না। কিন্তু না বলেও আমার উপায় নেই। হাজার পাঁচেক টাকা আমার লুকানো অছে এক জায়গায়। সেটা আমি হুজুরের হাতে দিয়ে যেতে চাই।

সবিস্ময়ে বললাম, আমার হাতে! আমি এ টাকা নিয়ে কি করবো?

—বিলিয়ে দেবেন, যেখানে খুশী। ইচ্ছা হয় কোনো ভাল কাজে খরচ করবেন। তবু মরবার সময় এইটুকু জেনে যেতে পারবো, বদরুদ্দিন ডাকাতের গোটা জীবনটাই বিফলে যায়নি। অনেক দয়াই তো হুজুর করেছেন এই খুনীটাকে। তার শেষ আব্দারটুকু পায়ে ঠেলবেন না।

সহসা উত্তর দিতে পারলাম না। তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তার গুপ্ত-ধনের ভার গ্রহণ আমার পক্ষে আইন-সঙ্গত নয়, নৈতিক দিক দিয়েও অসঙ্গত। এইজাতীয় অবাঞ্ছনীয় প্রস্তাব তার পক্ষে অন্যায় স্পর্ধা বলেই মনে হল। কিন্তু কি দেখেছিলাম, জানি না, সেই পরস্বাপ-হারী নরহন্তার মুখের উপর, কি শুনে-ছিলাম তার বেদনার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে, রূঢ় উত্তর আমার মুখে এসেও আটকে গেল। সোজা জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, নিজের লোক কি তোমার কেউ নেই যে, অতগুলো টাকা বিলিয়ে দিতে চাইছ?

মুন্‌সী একটু হেসে বলল, নিজের লোক! নিজের লোকের অভাব কি বড়-বাবু? সবাই আছে। তিন, তিনটা বিবি, ছেলেমেয়ে নাতী, নাতনী, তাদের আবার ছেলেমেয়ে। না আছে কে? আপনি বলবেন, কেউ তো আসে না একটু খোঁজ খবর নিতে। তবু তারা আছে। আরো কিছু টাকা আমার রয়ে গেছে, এ খবরটা জানাজানি হলেই আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে ধন্না দেবে আপনার ঐ জেলের মাঠে। এমন মড়া কান্না কাঁদবে, হয়তো আমার চোখেই জল এসে পড়বে। এই বুড়ো বয়সে অতোটা দরদ তো সইতে পারবো না। আপনার লোক মাথা খুঁড়ে মরবে, তাও চোখের ওপর দেখতে চাই না। কাজেই আমার এ টাকার কথা তারা কোনোদিন জানবে না।

—বেশ, তাদের না হয় না দিলে। কিন্তু টাকার দরকার তোমার নিজেরও তো কম নয়। অত বড় মামলা তোমার মাথার ওপর!

মুন্‌সীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে বলল, মামলার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টাই যদি করবো, তাহলে আজ এখানে আসবার কি দরকার ছিল, বড়বাবু?

তা বটে। ভূতনাথবাবুর কথা মনে পড়ল। মুন্‌সীর এই ধরা পড়া এবং স্বীকারোক্তির মধ্যে কী একটা রহস্য আছে। সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের কৌতূহল

াক, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করা
পক্ষে সমীচীন হবে না বলে চুপ
রইলাম। মনসুরী কিছুক্ষণ
া করে বলল, আরজি আমার মঞ্জুর
া, হুজুর?
নলাম, তোমার মনের কথা আমি
পারছি, মনসুরী। তেমনি তুমিও
ই বুঝতে পারছ, এ বিষয়ে
ক সাহায্য করা আমার পক্ষে
নয়। তবু একটা কথা জানতে
বলতো, তোমার ইচ্ছাটা কি?
তুমি দিয়ে যেতে চাও তোমার
াষ সম্বল? কি ভাবে, কার হাতে
তুমি শান্তি পাও?
নসুরী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না।
ষ্ট খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল শূন্য
ার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে
আপনি আমার বাপ, আমার
াতা। আপনার কাছে লুকোবার
কিছুই নেই। এ সংসারে একটা
আছে, যার হাতে এই সামান্য
তুলে দিতে পারলে আমার মনের
নেমে যায়। আমি মহানন্দে ফাঁসির
গলায় পরে হাসতে হাসতে চলে
পারি। কিন্তু একথাও জানি, সে
টাকা পা দিয়েও ছোঁবে না। যে
সর্বনাশ আমি তার করেছি, দুনিয়ার
টাকা ঢেলে দিয়েও তার কোনোদিন
হবে না।
টেবিলের উপর টেলিফোন ঝঙ্কার
উঠল।
হ্যালো।
কোর্ট থেকে খবর দিচ্ছে, জজসাহেব
জটিল মামলার এইমাত্র চার্জ
নো শেষ করেছেন। জুরীমহোদয়-
রজা বন্ধ করলেন। কখন খুলবেন,
করে বলা যায় না। অতএব
নীদের ফিরতে অনেক রাত হ'বার
বনা।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। জানালা
দেখা গেল দূরে আকাশের গায়ে
ান সূর্যের বর্ণচ্ছটা। সেইদিকে
গভীর নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল
ী। আমিও উঠলাম। লক্-আপ
র আয়োজনে অংশ গ্রহণ করতে
। যেতে যেতে বললাম, আবার কবে

আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর এল, যেদিন আবার হুকুম পাবো।

কয়েকদিন পরে তেমনি সময়ে সেই জায়গাটিতে বসেই শুনলাম তার অসমাপ্ত আত্মকাহিনী, নরঘাতক দস্যুর বিচিত্র জীবনের এক অপূর্ব অধ্যায়। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সেদিন বিপুল ঘনঘটা। আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘন ঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। মনে হচ্ছিল প্রলয় আসন্ন। সেইদিকে চেয়ে অনেকক্ষণ তন্ময় হ'য়ে বসে রইল মনসুরী। তারপর ধীরে ধীরে অনুচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে বলে গেল তার শত দুষ্কর্মের সুদীর্ঘ বিবরণ।

(ক্রমশঃ)

সৈয়দ মুজতবা আলী

পার্টি শেষ হতেই ও'রেলি নিয়ে গেল ডীনকে তার বাঙলোয়। ডিনার খেয়ে ও'রেলি তার ডেরা তুলে মোটরে যাবে স্টেশন, আর ডীন খাটাবে তার বাঙলোতে আপন ডেরা। চাকরী-জগতে সরকারি বাসা সম্বন্ধে এ-ই হচ্ছে এদেশে আইন—অবশ্য সাদা কালিতে লেখা।

ডীন সবেমাত্র বিলেত থেকে এসেছে, তার উপর সে বকর বকর করতে ভালোবাসে—এককালে ও'রেলিও গাল-গল্প জমাতে কিছুমাত্র কম ওস্তাদ ছিল না—কাজেই সে একটানা গল্প বলে যেতে লাগল। ও'রেলিরও ব্যবস্থাটা মনঃপূত হল, তাই যদি বা ডীন দু'একবার ভদ্রতার খাতিরে তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করালে সে তাতে সাড়া না দিয়ে উল্টে দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে তাকে আবার বকর-বকর করাতে তাতিয়ে দিলে।

ও'রেলির মালপত্র মোটরে তোলা হয়ে গিয়েছে—এখন তার ওঠবার সময় হ'ল দেখে ডীন শুধালে, 'এখানে ভালো করে কাজ চালাবার জন্য আপনি কোনো টিপ্‌স্ দেবেন কি? আমার তাতে উপকার হবে।'

ও'রেলি বললে, 'সেকথা যে আমি ভাবি নি তা নয় এবং দেবার মত টিপ্‌স্ থাকলে আমি অনেক আগেই এ প্রস্তাব পাড়তুম—'

ডীন বললে, 'সরি আমি বড্ড বেশী কথা বলি,—না?'

ও'রেলি বললে, 'নটেটোল। চুপ করে অন্যের কথা শুনলেই যে অপর পক্ষকে বেশী চেনা যায় তা নয়। অনেক সময় নিজে কথা বলে বলে অন্যের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয়—তার মাথা নাড়াতে, হাঁ না বলাতে, কোন্ প্রসংগে সে ইন্‌টরেস্ট নিচ্ছে, কোন্‌টাতে নিচ্ছে না—তাই দিয়ে মানুষ চেনা যায় অনেক বেশী। তার উপর সমস্তক্ষণ কথা বললে অন্য পক্ষ কোনো প্রশ্ন শুধাবার সুযোগ পায় না—যে প্রস্তাব তোলার ইচ্ছে নেই, সেটা বেশ এড়িয়ে যাওয়া যায়। মধুগঞ্জ লোক্যাল বোর্ড চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে চ্যাম্পিয়ন। অপ্রিয় কথা ওঠবার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি পাখি শিকার, ৯০ সালের ভূমিকম্প, আর গিরের ফিতে না ইঞ্চির ফিতে ভালো, এসব নিয়ে এমন গল্প জোতেন যে, তাঁর ঘর থেকে বেরনোই তখন মুশ্‌কিল হয়ে ওঠে।

সে কথা যাক্। আমি মাত্র একটা টিপ্ দেব। আপনার আপিসের সোম—তার সংগে তো আপনার আলাপ হয়েছে—বড় খাঁটি আর বুদ্ধিমান লোক। আপনি তো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে অনেক নূতন পদ্ধতি শিখে এসেছেন, সেগুলোর ক'টা এখানে কাজে খাটবে জানিনে, তবে একথা আপনাকে বলতে পারি সোম যেখানে ফেল মারে, সেখানে করার মত বড় কিছু একটা থাকে না। অন্তত আমি কিছু পারি নি।'

ডীন একটুখানি অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'দেখে তো কিন্তু বুদ্ধু বলে মনে হয়।'

ও'রেলি হেসে বললে, 'প্রিসাইসলি! ঐ তার একটা মস্ত রেস্ত। কিন্তু এদেশে অল্ দ্যাট স্টিনক্‌স ইজ নট্ রটন্ ফিস্—ঝল ঝল করলেই সোনা নয় হচ্ছে তার উল্টো প্রবাদ। বর্মাতে একরকম ফল আছে, তার গন্ধ পচা নর্দমার মত; কিন্তু একবার সে ফল যে খেয়েছে, তার ঐ ফলের জন্য নেশা হয় আফিমের চেয়েও বেশী। সোম ঐ বর্মী-ফল।'

'তাহলে গুড-নাইট।'

'গুড্-নাইট।'

॥ এগারো ॥

'খৃস্টালয় থেকে সদ্যাগত'—'ফ্রেশ্ ফ্রম ক্রিস্টিয়ান হোম'-ওলাদের এদেশে এসে বয়নাক্কার অন্ত থাকে না। এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায়—সুবো-শাম লেগেই আছে। তবু যত বড় উন্নাসিকই হোন না কেন, পুলিশ সায়েবের বাঙলোটি কিছুমাত্র ফেলনা নয়।

ডিনার খেয়ে দুজনাই এসে বসেছিল চওড়া বারান্দায়। বস্তুত ঐ বারান্দাটাই বাড়ির সবচেয়ে আরামের জায়গা। ও'রেলি চলে যাওয়ার পর ডীন বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে সিগরেটের তাজা টিন খুলে আরাম করে গা এলিয়ে বসল। লন্ডন ছেড়েছে অবধি জাহাজে ট্রেনে সর্বত্র হৈ-হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে তার সময় কেটেছে, দু-দণ্ড নিজের মনে নূতন নূতন অভিজ্ঞতার জমা-খরচ মিলিয়ে নিতে পারেনি—অথচ গুণীরাই জানেন যারা কথা কয় বিস্তর তারাই নির্জনতা খোঁজে শান্তজনের চেয়ে বেশি।

পেট্রোমাক্স জ্বলছে। তার আলো বারান্দার বাইরের অন্ধকার কিন্তু ফুটো

পারছে না। ওদিকে আবার গুমোট। আকাশ থমথম করছে। লো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে ফা দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া ডাইনে-বাঁয়ে, উপর-নিচে কোনো যেতে চায় না। এ অবস্থায় ধোঁয়া দিয়ে খাসা রিং বানানো মুখ থেকে বেরিয়েই রিংগুলো পিছনে আরেকটা সারি বেঁধে ক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন টখেকোরা আর সিগরেটের নেশা না—রিঙের নেশায় পিল-পিল করে পর চক্কর বের করতে থাকে। ্যাচেলাররা দেরিতে শুতে যায়, সবাই জানে, আর তামাকখোররা আরো দেরিতে। 'আরেকটা খেয়েই 'আরেকটা খেয়েই উঠবো' করে ঘুমে আর সিগরেটে যখন লড়াই জমে ওঠে তখন অনেক সময় লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমের নেয়, সিগরেটও চটে গিয়ে কার্পেট পোড়ায়।

ীনের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, হাত চেয়ারের হাতা থেকে খসে পড়ছে, ঢিলে আঙুল থেকে টটা খসি-খসি করছে, এমন সময়—মন সময় ডীন দেখে তিনটি —মূর্তি —কি বলি? —বেড-রুম বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় গেল। সে বসে ছিল বারান্দার প্রান্তে, বেড-রুম অন্য প্রান্তে—তার-ই গা-ঘেঁষে।

ীনের চোখে কাঁচা ঘুমের ছানি। ভিতর দিয়ে সব-কিছু যেন আবছা-, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখা কিম্বা যেন সিনেমার পর্দাতে ঢিলে সর ছবি।

তনটি মূর্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য র পূর্বেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে গিয়েছে। ডীন শুধু দেখলে টি দৈর্ঘে মাঝারি, দ্বিতীয়টি ছোট তৃতীয়টি বেশ লম্বা—ব্যস আর না।

সম্বিতে ফিরে ডীন ছুটে সিঁড়ি নামল। চতুর্দিকে ঘোরঘুট্টি ার, নিচের তলার ছাতা-ল্যাম্প া অনেকক্ষণ হল নিবিয়ে দিয়েছে, উপরের তলার আলো সেখানে পেঁছয় না। ডীন সদ্য বিলেত থেকে এসেছে—মফঃস্বলে টর্চের কি প্রয়োজন এখনো জানতে পারেনি। তার টর্চ নেই। ছুটে গেল গেটের কাছে; সেখানে রাস্তার ক্ষীণ আলোতে দেখলে, চতুর্দিক জনমানব-শূন্য।

সাপ, চোর, শেয়াল দেখলে আমরা চীৎকার করে চাকর-বাকরদের ডাকি, কারণ আপন দেহ রক্ষার জন্য এদের উপর আমরা নির্ভর করেছি যুগ-যুগ ধরে। বিলেতের লোক কাজকর্ম চালাচ্ছে বিনা চাকরে বহুকাল ধরে। তাই সম্বিতে ফিরেও ডীন চেঁচামেচি আরম্ভ করলে না। ধীরে ধীরে বারান্দায় ফিরে আবার চেয়ারে বসল।

আকাশ-কুসুম কেউ কখনো দেখেনি —সে শুদ্ধ কল্পনামাত্র; স্বপ্ন আমরা দেখি, কিন্তু তার পিছনে কোনো বাস্তবতা নেই; রজ্জু দেখে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন সে সর্প বাস্তব নয় বটে, কিন্তু ভ্রম কেটে যাবার পরও রজ্জুটিকে ধরতে-ছুঁতে পাই। ডীন যা দেখল সেটা এর কোনো পর্যায়েই পড়ে না। তাহলে কি সে বাস্তব জিনিস প্রত্যক্ষ করল? তাই বা কি করে হয়? বেড-রুমে তো কারো থাকার কথা নয়—ডিনার শেষ হওয়ার পর চাকররা চলে গিয়েছিল, ও'রেলি যাওয়ার পর উপরের তলায় তো সে একেবারে একা বসেছিল। তবে কি ওরা মেথরের দরজা দিয়ে বাথ-রুম বেড-রুম হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে

এল? ডীন চেক-আপ্ করে দেখলে, মেথরের দরজা ডবল বল্টে বন্ধ।

তবে কি মদ্যপান? অসম্ভব। খেয়েছে মাত্র ছোট্ট দু' পেগ—তাও ডিনারের আগে। দু' পেগে বঙ্গ-সন্তানেরই চিত্তচাঞ্চল্য হয় না—ও দিয়ে তো ইংরেজ কপালে তিলক কাটে।

ছুটোছুটি আর উত্তেজনায় ডীনের ঘুম ততক্ষণে ক্ষীণ নয়—লীন হয়ে গিয়েছে। বিছানায় ছটফট না করার চেয়ে বরঞ্চ চেয়ারে বসে প্রতীক্ষা করাই ভালো, যারা গেছে তারা ফিরে আসে কি না। পুলিশের লোক—প্রথম সম্বিতে ফেরা মাত্রই সে ঘড়ি দেখে নিয়েছিল এরা বেরিয়েছিল ১২টা ৩০ এবং ৩৫-এর মাঝামাঝি। যদি তারা নিতান্তই ফেরে তবে তো ফিরবে ভোরের আলো ফোটবার আগেই। ডীন পিস্তলটা সুটকেশ থেকে বের করে পেগ-টেবিলের উপর রেখে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘণ্টা চারেক সিগরেট পোড়ানোর পর লুপ্ত ঘুম ফিরে এল কিন্তু যাদের জন্য এত অপেক্ষা তারা আর এল না।

সকাল বেলা বেয়ারা বেড-টী এনে দেখে সায়েব চেয়ারের উপরে বেঘোর ঘুমে কাতর। শেষ সিগরেট হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেগ-টেবিলের বার্নিশ পুড়িয়ে দিয়েছে।

আরো একটু ক্ষতি হল ডীনের। সে দিনই আড্ডাঘরের বেয়ারা মহলে রটে গেল, নূতন সায়েব বোতল-বাসি-পিয়াসী। কেউ প্রশ্ন পর্যন্ত করল না, যে-বেয়ারা চা এনেছিল সে বোতল খালি পেয়েছিল না ভর্তি।

সকাল হতে না হতেই ভিজিটারদের ঠ্যালা। তাদের সঙ্গে লৌকিকতা করতে করতে ডীন ভাবছে আগের রাত্রের কথা। দিনের আলো প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডীনের কাছে রাত্রের প্রহেলিকা হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়াল। স্বপ্নের ঘোরে কিম্বা ঘুমের জড়তায় কি দেখতে কি দেখেছে তাই নিয়ে সে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি করলে—ইস্তেক পিস্তল বের করলে!. কী আশ্চর্য! এদেশে একটানা বিশ বছর কাটানোর পর অসহ্য গরম আর সুদীর্ঘ বর্ষার ঠ্যালায় ইংরেজের মাথায় ছিট জন্মায়—দেশে ফিরে গিয়ে তার ধকল কাটায় পুডিং দিয়ে খানা আরম্ভ করে আর সুপ দিয়ে শেষ করে। তাদেরই একজন, ডীনের এক মামাকে নিয়ে সে কতই না ঠাট্টা-মস্করা করেছে আর বেচারী মামা কিছু না বলতে পেরে শুধু হুম হুম করেছে। আর তার নিজের সেই অবস্থা এই প্রথম রাত্রেই। পিস্তল ওচায় স্বপ্নের পেট ফুটো করতে? তার হ'ল কি?

এমন সময় সোম এসে খবর দিলে, কাল রাত্রে তের-সতীতে জলে ডাকাতির খবর এসেছে। বোধ হয় গোটা তিনেক খুনও হয়েছে। সে অকুস্থান যাচ্ছে।

ইংরেজের বাচ্চা, নিজকে এতক্ষণে সংযত করতে শিখেছে। কোনো চাঞ্চল্য না দেখিয়ে শুধালে রাত কটায় কাণ্ডটা ঘটেছে? কি জানি, ঠিক বলা যাচ্ছে না, দুপুর কিম্বা শেষ রাতে।

সোম চলে গেল।

'টু হেল'—অর্থাৎ চুলোয় যাকগে বলে ডীন মধুগঞ্জের ম্যাপ মেলে গেজেটিয়র খুলে পড়তে বসল।

কিন্তু চুলোয় যাকগে বললেই যদি সব আপদ চুলোয় যেত তাহলে গোটা পৃথিবীটাকেই হামেহাল নরককুণ্ডের মত জ্বালিয়ে রাখতে হত। সন্ধ্যে হতে না হতেই দিনের বেলার হেসে-উড়িয়ে-দেওয়া আপদ ডীনের মনের ভিতর 'কিন্তু কিন্তু' করে ইতি-উতি করতে লাগল। ডিনারে বসে মনে হল কাল রাত্রের ঘটনা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতি-ভ্রমও নয়—ইংরিজিতে ভাবতে গেলে ইলুশন, ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন কিছুই নয়। প্রেসটিডিজিটেশনও নয় কারণ ঐ রাত সাড়ে চব্বিশটার সময় তাকে ম্যাজিক দেখিয়ে বোকা বানাতে যাবে কোন্ ভাঁড়?

বাগানের আম-জাম-লিচুর অন্ধকার ক্রমেই যেন বারান্দার দিকে গুড়ি গুড়ি এগিয়ে আসছে। প্রতিপদ আকাশের মেঘময় অন্ধকারও নেবে আসছে নিচের দিকে, দুই অন্ধকারের ভিতর কি যেন গোপন যোগ-সাজস রয়েছে। সেই নিরেট জমে ওঠা অন্ধকারের ভিতরদিয়ে গাছ-পালার মধ্যে সূক্ষ্ম—অতি-সূক্ষ্ম—ছিদ্র করে কাজলধারার উপর দিয়ে বেয়ে যাওয়া নৌকর ক্ষীণ প্রদীপের আলোক মাঝে মাঝে এসে পৌঁচছে বাংলোর দকে। কিন্তু সে আলোক চোখে পড়ে ঐ দিকে অনেকক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে। সে আলো তখন যেন চোখকে আরো কাণা করে দেয়—চতুর্দিকের অন্ধকার যে কতখানি পুঞ্জীভূত নিরন্ধ্র তখনই ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

অন্ধকারে মানুষ যেমন নিজকে সাহস দেবার জন্য শিস দেয়, পেট্রোমাক্সটাও ঠিক তেমনি মৃদু একটানা শাঁ-শব্দ করে যাচ্ছে আর ভয়ে মরছে হঠাৎ কখন অজানাতে অন্ধকার তার লম্বা আঙুল দিয়ে বাতির চাবিতে দম দিয়ে তার দম বন্ধ করে দেবে।

ডীন চাকর-বাকরকে বিদেয় দিয়ে পিস্তল কোলে নিয়ে বসেছে সিঁড়ির দিকে মুখ করে। টিপয়ের উপর রিস্ট-ওয়াচ।

রাত ঘনিয়ে এল। আগের রাত্রে ভোরের দিকে চোখের দু' পাতা জুড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, দিন কেটেছে নানা কাজের ঠেলায় এখন বারে বারে ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু আজতো সর্ব-চৈতন্য কোলম্যান মাস্টার্ডের মত তীব্র সজাগ রাখতে হবে। সে আজ মোটে মদ খায়নি, জাস্ট টু বি অন ১০০% সেফ সাইড।

ঘড়িতে বারোটা বেজেছে। ডীন ভাবলে, এবারে আরো সজাগ হতে হবে। রুমালটা ভিজিয়ে এনে চোখে বোলাবার জন্য এদিক ওদিক সেটা খুঁজছে এমন সময় হঠাৎ দেখে সেই ত্রিমূর্তি বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ডীন মন স্থির করে রেখেছিল দেখা মাত্র পিস্তল হাতে ছুটে গিয়ে ওদের ঠ্যাকাবে কিন্তু কাজের বেলায় এক মুহূর্ত দেরী হয়ে গেল—ছুটে গিয়ে যখন নিজে বারান্দায় নামল তখন ত্রিমূর্তি বাগানের বড় জামগাছটার কাছে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঘড়িতে দেখে তখনো বারোটা—অর্থাৎ সকালে দম দেওয়া হয়নি।

এবারে ডীন ছুটোছুটি করলে না, মাই গড বলে চাপরাশীর টুলে বসে পড়ল—ভীষণ বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না।

অনেকক্ষণ পর সে বেড-রুমে ঢুকল। ...তে নিদ্রা জাগরণে মেশা আসুপ্তির ... দিয়ে রাত কাটলো।

...কাল বেলা সোম এল। তিনটে নয়, ...থুন।

...সদিকে খেয়াল না করে ডীন ...ল 'সোম, এ বাড়ি ভুতুড়ে?'

...সোম বললে, 'জানিনে স্যার।'

...তুমি ভুত মানো?'

...না, স্যার।'

...তাহলে এ বাড়ি কিম্বা যে কোনো ...ভুতুড়ে হয় কি করে?'

...জানিনে স্যার।'

...ডীন বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি একটা ... আর তোমার প্যারা বস্ একটা ... গাড়ল—না হলে তোমাকে শার্লক ...সের মত ঠাওরালো কেন?' ঠিকই ...বোকাকে বুদ্ধিমান মনে করা, এ ...গাধা দেখে বলা এটা ঘোড়া। যে এ-...বলে সে যে শুধু গাধা চেনে না তা ...ঘোড়াও চেনে না।

...তারপর ডীন আরো পাকাপাকিভাবে ...ট বেঁধে ত্রিমূর্তির জন্য ত্রি রাত্রি ...ক্ষা করল কিন্তু তাকে নিরাশ হতে

...হের শেষে আই জি কে রিপোর্ট ...র সময় ডীন এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে ...কি-লিখব-না ক'রে ক'রে কি করে ...লখে ফেললে নিজেই বুঝতে পারলে ... ভাবলে ওটা কেটে ফেলি—সে ...ক্ষণ জানত, ইংরেজ এ সব কেচ্ছা ... নির্দম হাসাহাসি করে—কিন্তু ...লে আবার নূতন করে রিপোর্ট ...তে হয়, আর লেখালেখির ব্যাপারেই ...শ বাবাজীরা হামেশাই একটুখানি ...ল।

...যাকগে বলে শেষটায় পয়লা পাঠই ...য়ে দিলে।

...তিন দিন বাদে উত্তর এল। তার ...ছত্র, 'ড্রিঙ্ক লেস স্পিরিট।'

...ডীন খাপ্পা হয়ে বললে, 'ড্যাম দি ...রিট।'

॥ বারো ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জয় করে ইংরেজ ...র্বে তার ইতিহাস রচনা করেছে। যুদ্ধে ...র জর্মান তার সলজ্জ ইতিহাস লিখেছে। দুটোর কোনোটা থেকেই প্রকৃত সত্য জানবার উপায় নেই। তাই মনে হয়, ইংরেজের ইতিহাসটা যদি জর্মন লিখত এবং জর্মনেরটা ইংরেজ তাহলেও হয়ত খানিকটে সত্যের কাছে যাবার উপায় থাকত। কিম্বা যদি ভারতবাসী লিখত—কারণ সে যে এ বাবদে অনেকখানি নিরপেক্ষ সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

তাই চা-বাগানের আশপাশের বিশেষ করে মধুগঞ্জের লোক বিলক্ষণ জানে ইংরেজ তার শৌর্যবীর্য নিয়ে যতই লম্ফঝম্ফ করুক না কেন চা বাগিচার সায়েবদের ভিতর লেগে গিয়েছিল ধুন্ধুমার। তার ইতিহাস লেখা হয়নি, কোনো কালে হবেও না।

হাতিম-তাই না সিন্দবাদ কোন্ এক দেশে গিয়েছিলেন যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষ বুড়ো হয়ে কিম্বা অসুখ-বিসুখ করে মরে না। প্রতি সন্ধ্যায় সবাই এক জায়গায় ম্লান মুখে বসে কিসের যেন অপেক্ষা করে, আর হঠাৎ এক গম্ভীর ডাক শুনে ওদের একজন লাফ দিয়ে উঠে দূরদিগন্তে পালিয়ে যায়, কেউ তারপিছু নেয় না, সে-ও আর কোনো দিন ফিরে আসে না।

চা-বাগিচার বড় মেজো ছোট বেবাক সায়েব রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে বসে প্রতীক্ষা করেন, লড়াইয়ে যাবার জন্য বিলেত থেকে কোন্ দিন কার ডাক পড়ে। এবং কাজের বেলা দেখা গেল হাতিম তাই-এর গল্পের লোকগুলোর মত এঁরা পত্রপাঠ বিলেতের দিকে ছুট দেন না—এঁদের অনেকেই আছেন ডাক এড়াবার তালে। সিভিল সার্জেন ইংরেজ তার উপর কট্টর সাম্রাজ্যবাদী, তার কাছে স্বাস্থ্য খারাপের সার্টিফিকেট পাওয়া অসম্ভব, কাজেই এঁদের উর্বর মস্তিষ্ক তখন লেগে যায় নূতন নূতন ফন্দি-ফিকিরের অনুসন্ধানে। এক ভীতু তো সাহস করে বাঁ হাতের কব্জীতে গুলী মেরে সেটাকে জখম করে লড়াই এড়ালে। মাদামপুরে বিষ্ণুছড়া নিজেদের ভিতর লজ্জায় মাথা হেঁট করলে।

তারই মাঝখানে কে যেন খবর এনে দিলে ও'রেলি লড়াইয়ে যাবার জন্য নিজের থেকে প্রস্তাব পেড়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার রং রুটের অসুবিধা হবে বলে তাকে যেতে দিল না, কারণ সে ইতি-মধ্যেই জনপঞ্চাশেক বাঙালী ছোকরাকে রিক্রুট করেছে এবং তার ভিতর গোটা পাঁচেক টেররিস্টও আছে।

ও'রেলি সম্বন্ধে আর সব কথা ক্লাব এক মুহূর্তেই ভুলে গিয়ে এক বাক্যে বললে সাবাশ।

পুলিশের আই জি এসেছিলেন মধুগঞ্জ টুরে। ক্লাবে বসে ও'রেলির উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি শুনে নিজের ডিপার্টমেন্টের প্রতি গর্ব অনুভব করলেন। তার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলতে না বলতেই ক্লাবের নয়া-ঝুনো সব সদস্য দফে দফে তার গুণকীর্তন করলেন, এবং বিষ্ণুছড়ার ছোট মেমই বিগলিতাশ্রু হলেন সবচেয়ে বেশী।

ক্লাব ভাঙল অনেক রাত্রে। পরদিন কাইজারের খড়ের মূর্তি পোড়াবার সুব্যবস্থা করে। বেয়ারারা তাই নিয়ে নিজেদের ভিতর বিস্তর হাসাহাসি করলে। সায়েবদের বড়ফাট্টাই যে কী বেহদ বেশরম ফঙ্গাবেনে সে-কথা তারা লড়াই লাগার কয়েক মাস পরেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ওদিকে আবার তাদের যে-সব ভাই-বেরাদর সাতজন্মে কখনো লড়াই দেখেনি তারা যেতে আরম্ভ করলো ইরাকে। তাই নিয়ে পূর্ব বাঙলায় গান পর্যন্ত রচনা হয়ে গেল। সেপাই ফিরে এসেছে মেসপট থেকে দেশে; বউ জিজ্ঞেস করছে,

মিয়া, গেছলায় যে বসরায়,
দেখছ নি দালান?
ছোট ছোট সেপাইগুলি লাল কুর্তি গায়
হাটু পানিৎ লাম্যা তারা
পিস্তল মারাৎ যায়—
মিয়া গেছলায় যে বসরায়, মিয়া গে
(সম)!

এ গীতে তবু বরঞ্চ গ্রাম্য মেয়ের সরলতা আর কল্পনা শক্তির খানিকটা বিকাশ পেয়েছে কিন্তু সায়েবদের ছেলে-মানুষী কত চরমে পৌঁছে গিয়েছে তার প্রমাণ নেয়াবাগুলো পেল যেদিন মধু-গঞ্জের পাগলা চেঁচিয়ে গান ধরলে

মরি, রাই, রাই, রাই
জর্মনীরে ধরে এনে
হার্মনি বাজাই!

এ গানের না আছে মাথা না আছে কাঁথা—পাগলা জগাইয়ের 'গানে' কখনো থাকতও না—অথচ সায়েবরা গান শুনে ভাবলেন জগাই জর্মনির কান খুব করে মলে দিচ্ছে। পাগলাকে ডেকে এনে ক্লাবে তার 'নৃত্যসম্বলিত' গান শোনা হ'ল, প্রচুর বখশিশ দেওয়া হল, এবং তাকে একটা মেডেল দেওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনাও হল।

'বাঙাল' গাছে ফলে না, 'বাঙালে'র চাষ পূব-বাঙলার এক চেটে নয় তাই সায়েবদের, 'বাঙালপনা' দেখে বাঙাল বেয়ারাগুলো হাসলে জোর এক পেট আর পাগলা জগাইকে খেতাব দিলে 'জঙ্গীলাট'!

রাত্রে আই জি'র নিমন্ত্রণ ছিল ডীনের বাঙলোয়।

সুপ শেষ হতে না হতেই ডি এম-এর বাংলো থেকে জরুরী খবর এল 'স্বদেশী'দের আড্ডায় বোমা ফেটে দু'জনে মারা গিয়েছে—ডীন যেন তাড়িঘাড়ি ঘটনাস্থলে পেঁছয়। ডীন তাদের অভিসম্পাত দিতে দিতে খানা ছেড়ে উর্দি চড়ালে।

আই জি বাঙাল ভাষা বেশ শিখে গিয়েছিলেন। একা একা খানা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটাবার জন্য বাটলারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। এককালে বড়লোকদের যদি শখ হত ছোট লোকের সঙ্গে গল্প করার তবে তাঁরা ডেকে পাঠাতেন চন্দ্রবৈদ্যকে—মুখ চন্দ্রটিকে বিচক্ষণ বৈদ্যের মত খাপসুরৎ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নাপিত হুজুরকে দুনিয়ার নানা খবর নানা গুজব শুনিয়ে ওকিব-হাল করে তুলত। বিলেতে এখনো ও কর্মটি করে বাটলার এবং খানদানি সায়েবদের যারাই দিশী ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরাই এ-দেশে সেই রেওয়াজটি চালু রেখেছেন।

সায়েবের মতির গতি ধরতে পেরে খয়রুল্লা আলোচনা আরম্ভ করলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে—সায়েব সায় দিলেন, তারপর ভরসা দিলে লড়াই শিগগিরই খতম হয়ে যাবে—সায়েব শুধু 'হুঁ' বললেন—খয়রুল্লা কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, দিশী লোক বসরা থেকে বেশ দু' পয়সা বাড়িতে পাঠাচ্ছে—সায়েব আনন্দ প্রকাশ করলেন।

খানার শেষ পদ ছিল পনিবে রায়া আস্ত আণ্ডা। বহুকাল ধরে বিলেত

পনির আসছেনা বলে বড় সায়েব নিয়ে প্রশংসা এবং বিস্ময় প্রকাশ লেন। খয়রুল্লা দেমাক করে জানালে পনির বিলিতি নয়, এ জিনিস তৈরি মৈমনসিংহের অষ্টগ্রামে। বিদেশী র যখন এ-দেশে পাওয়া যেত সেই সেই ওরেলি সায়েবের মেম দিশী রের সন্ধান পেয়ে তাই দিয়ে এই ন সেভারি আবিষ্কার করেন। ল্লার মতে তাঁর মত পাকা রাঁধুনি শে কখনো আসেনি। সে তখন র্যের মেট—তার কাছ থেকে সে এ-সেটে বানাতে শিখেছে।

বড় সায়েব জানতেন মিসেস ওরেলি তে। তবু কথার পিঠে কথা বলার আপন মনেই যেন শুধালেন, 'তা সায়েব তো এখন বিলেতে?'

খয়রুল্লা একটুখানি চুপ করে থেকে ন, 'বোধ হয় তাই। তবে সঠিক কেউ ত পারে না। মীরপুর বাগিচার বলছিল তিনি মসুরি না শিমলে য়ে যেন।'

এবারে সায়েব একটুখানি আশ্চর্য য় বললেন, 'সে কি, হে? এই সামান্য ও সঠিক জানো না?'

খয়রুল্লার দিলে চোট লাগল। সে সাহেবের বেয়ারা হিসেবে জাত-দের ভিতর তার খুশ-নাম ছিল যে সে র সকলের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তাকে বড় সায়েব পষ্ট ইঙ্গিতে জানিয়ে ন সে একটা আস্ত উজবুক, দুনিয়ার খবর রাখে না। তার চেয়ে যদি তাকে খবর দিতেন যে সে এদিকে না, ওদিকে কিন্তু তার বিবি বিধবা গিয়েছেন, তা হলেও তার কলিজা নি ঘায়েল হত না। তাই ইজ্জৎ র জন্য বললে, 'সঠিক খবর তো পারেন শুধু ওরেলি সায়েবই। তা, তো কারো সঙ্গে কখনো কথা বলেন তাকে শুধাতে যাবে কে?'

ড় সায়েব খানদানী ঘরের ছেলে। মেমদের নিয়ে চাকরনফরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান না; আলো-ওদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে বললেন, বলেছো।'

খয়রুল্লাও পেটে আক্কেল ধরে। সায়েব বা কথার মোড় ফেরালেন, সে তার সামনে খাড়া করে দিলে একখানা নিরেট পাঁচিল।

বললে, সে বহু মেহন্নত করে ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ উত্তম কফি জোগাড় করে এনেছে, পারকুলেটরে সেটা চড়িয়ে রেখেছে, সায়েব যদি একটু মর্জি করেন?'

ডিনার শেষ হলে পর, খয়রুল্লা বললে, সে সায়েবকে সার্কিট হাউসে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নিচের তলায় অপেক্ষা করবে। কফি-লিকার-সিগার তিনটিই উত্তম শ্রেণীর ছিল বলে সায়েব তন্দণ্ডেই ডেরা ভাঙবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। জানালেন, তিনি একাই সার্কিট হাউস যেতে পারবেন।

রাত একটার সময় ডীন ফিরে এল। বড় সায়েবকে নিতান্ত একা-একা ডিনার খেতে হল বলে আবার দুঃখ প্রকাশ করলে।

বড় সায়েব সোজাসুজি জিগ্যেস করলেন, 'মিসেস ওরেলি এখন কোথায় তুমি জানো?'

ডীন হেসে বললে, 'কেন? আপনিও কিছু শুনেছেন নাকি?

'না, তো। আমি শুধু শুনেছি, তিনি বিলেতে না মসুরিতে সে-কথা কেউ জানে না। আমার কাছে একটু আশ্চর্য লাগল।'

ডীন বললে, 'লাগারই কথা। কিন্তু এ নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই। এর পিছনে আবার একটুখানি কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রয়েছে। মেবল এখান থেকে সরে পড়াতে কেচ্ছাটা প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।'

তারপর ডীন ক্লাবে যা-কিছু শুনে-ছিল সে-কথা তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে বললে, 'পাছে আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝতে পেরে এলোপাতাড়ি প্রশ্ন জিগেস করি, তাই মাদামপুরের সায়েব—এ অঞ্চলে তিনিই মুরুব্বি—আমাকে এখানে আমার আসার দিনই সমস্ত কথা খুলে বলে ইঙ্গিত করেন যে, এ ব্যাপার নিয়ে নাড়া-চাড়া করে কোনো লাভ নেই, ক্ষতিরই সম্ভাবনা। আমিও তাঁকে বলেছি, ব্রাদার অফিসারের ফেমিলি এ্যাফেয়ারে আমি কনসার্নড্ নই।'

বড় সায়েব বললেন, 'ঠিক বলেছ!'

আরো পাঁচ রকমের কথা হল—বিশেষ করে লড়াই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা। দুজনেই ইয়কশায়রের লোক, কাজেই দুজনারই পরিচিত অনেক লোকের প্রমোশন, জখম, বাহাদুরী, মৃত্যু নিয়ে অনেক সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা হল।

রাত প্রায় একটার সময় বড় সায়েব শেষ ক্রেম দ্য মাঁৎ খেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ বললেন, 'কই হে, তোমার ত্রিমূর্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?'

ডীন যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে বললে, 'আপনি বগদাদের কাজীর গল্প জানেন?'

বেমক্কা হঠাৎ কাজীর গল্প কেন উপস্থিত হল তার হদিস না পেয়ে বড় সায়েব বললেন, 'না তো।'

ডীন বললে, 'মুর্গী খেতে খেতে কাজী বাবুর্চীকে শুধালেন, মুর্গীর আরেকটা ঠ্যাং কোথায়? বাবুর্চী বললে, মুর্গীটার ছিল মাত্র একটা ঠ্যাং। কাজী বললেন, একঠ্যাঙী মুর্গী কেউ কখনো দেখেনি। বাবুর্চী বললে, বিস্তর হয়, সে দেখিয়ে দেবে। তারপর শীতকালে এক দিন আঙিনায় একটা মুর্গী এক ঠ্যাং পালকের ভিতর গুঁজে দাঁড়িয়েছিল—বাবুর্চী কাজীকে দেখিয়ে দিলে এক-ঠ্যাঙী মুর্গী। কাজী দিলেন জোর হাত-তালি। মুর্গী দুসরা ঠ্যাং বের করে ছুটে পালালো। কাজী বললেন, ঐ তো দুসরা ঠ্যাং। বাবুর্চী বললে, সেদিন খাওয়ার সময় তিনি হাত তালি দিলে দুসরা ঠ্যাংও বেরতো।'

বড় সায়েব বললেন, 'উত্তম গল্প, কিন্তু'—

ডীন বললে, 'এতে আবার কিন্তু কি? আপনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কম হুইস্কি খেতে—ত্রিমূর্তি হুইস্কির চোখে দেখেছিলুম কি না! আপনি যদি আচ্ছা করে আজ হুইস্কি খেতেন, তবে তার-ই 'হাততালিতে' ত্রিমূর্তি বেরিয়ে আসতো।

অথচ সায়েব খেয়েছিল পাঁচটা 'ব্রা'—বড়া।

মনে মনে ভাবলেন, 'ছোকরা তুখোড়।' বাইরে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, আসছে বারে না হয়, ম্যাকবেথের তিনডাইনির স্মরণে তিন বোতল খেয়ে ত্রিমূর্তিকে ইনভোক করা যাবে।'

ডীন বললে—'প্রাইস ওথ—তিন সত্যি।'

(ক্রমশ)

শার্ঙ্গদেব

ধ্রুবপদ

ধ্রুপদ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে—শুনে আসছি ধ্রুপদই হচ্ছে বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রধান সংগীত। এই শোনা থেকে জানার আগ্রহ হল, কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে যা মিলল শোনা কথার সঙ্গে তার খুব একটা মিল নেই। ছেলেবেলা থেকে তৈরি ধারণাটা আবার পাল্টাতে হল।

অনেকের কাছে কাথাটা হয়তো শুনতে ভাল লাগবে না, তবু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, বাংলার প্রাচীন গানের মধ্যে ধ্রুপদ তেমন উল্লেখ-যোগ্য নয়। প্রাচীন খুব কম বাংলা বইতেই ধ্রুপদ নামক এক শ্রেণীর গানের উল্লেখ আছে—আর যদিও থেকে থাকে সে কেবল উল্লেখটুকুই তার বেশি নয়। বস্তুত উনবিংশ শতকে আমাদের গানে নীতিবাগীশদের কড়া হস্তক্ষেপ না হলে ধ্রুপদের বিশেষ প্রচার হত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নীতি-নিষ্ঠ সংস্কারকেরা ধ্রুপদকে খুঁজে নিয়ে-ছিলেন, কেননা, ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য ছিল তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ প্রচার এবং জীবন-যাত্রার সবচেয়ে উপযোগী। সুতরাং তাঁদের মধ্যে অর্থাৎ সে যুগের প্রতিপত্তি-শালী এক শ্রেণীর মধ্যে ধ্রুপদ বেশ দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ধ্রুপদের মেজাজটা উৎকৃষ্ট এবং গম্ভীর সন্দেহ নেই, তবে সাধারণভাবে বাঙালীর মেজাজটা অত "সীরিয়াস" নয়, সে হচ্ছে আদতে টপ্পার মেজাজ—একটু হালকা অথচ সুন্দর রসঘন এবং কাব্য-ঘনও বটে। অতএব সংস্কৃত এবং ব্রজ-বুলিতে ঠাকুর দেবতার যে গান প্রায় নামাবলী হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজোর ঘরেই ব্যবহার করা হয়েছে, বাইরে আর তার প্রয়োজন হয়নি। সেই কারণেই অপর এক শ্রেণী যখন সুরসাল টপ্পার আমদানী করলেন তখন তার আদর হয়েছিল অনেক বেশি এবং তার সাহিত্যিক উৎকর্ষও উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুপদের অভ্যুত্থান কবে এবং কিভাবে ঘটেছে তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এখানে-ওখানে যেটুকু বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া যায় তার ওপর নির্ভর করে বেপরোয়া মতামত অনেকেই প্রকাশ করেছেন—শুধু মুখে নয়, ছাপিয়ে একেবারে "ডকুমেণ্ট" করে। একজন প্রবীণ অধ্যাপক মনে করেন ধ্রুপদ একটা সংকীর্ণ দেশী গান ছিল, সেটাকেই বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে মোগল দরবারে পেশ করা হয় এবং সেখান থেকে সে চড়ে বসল একেবারে ভারতীয় সংগীতের শীর্ষদেশে। ধ্রুপদ যে নেহাৎ লোকসংগীত ছিল সেটা প্রমাণ করতে তিনি অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করেছেন; যথা (১) লোকসংগীতে তানের অভাব, ধ্রুপদেও তানের বালাই নেই, (২) লোক-সংগীতের অর্থ হচ্ছে সাধারণত আধ্যাত্মিক ধ্রুপদও ধর্মভাবাপন্ন এবং (৩) গায়কীর (বিশেষ করে উচ্চারণ-পদ্ধতি) দিক থেকে বিচার করতে গেলে ধ্রুপদের সঙ্গে বাউল কীর্তনের মিল নিবিড়তর। তিন দফা যুক্তিই খাসা এবং লোকসংগীতের এবম্বিধ বিশ্লেষণও পাওয়া ভার। এর পরে এটুকু বল্লেই হত যে, লোকসংগীতে চারটে কলি আছে এবং ধ্রুপদের অনুরূপ গমকও আছে তাহলেই তুলনাত্মক আলোচনাটা একেবারে কমপ্লিট হত। ওটুকু বাদ পড়ে গেছে দুঃখের বিষয়, সে যাক—।

এখন কথা হচ্ছে একটা সংকীর্ণ দেশী গান নিশ্চয়ই উড়ে আসে নি, এটা নিশ্চয়ই কোন প্রচলিত গানের স্বাভাবিক পরিণতি এবং এর মধ্যে উঁচুদরের গানের লক্ষণও নিশ্চয়ই ছিল। আসলে সমস্ত অনুমানটার ভিত্তি হচ্ছে আইন-ই-আকবরির অভিমত। উক্ত কেতাবে বলা হয়েছে সেকালে আগ্রা-গোয়ালিয়র অঞ্চলে একরকম দেশী গান প্রচলিত ছিল, তিন-জন কলাবন্ত রাজা মানের তত্ত্বাবধানে সেই গানের কাঠামোকে বেশ রুচিসম্মত করে গড়ে তুললেন এবং এইটিই পরিচিত হল ধ্রুপদ আখ্যায়। বলা বাহুল্য, পরে মোগল দরবার এই ধ্রুপদকে পরম মহিমান্বিত করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ওঠে সেকালকার দেশী গান কি রকম ছিল? গানকে আগে সাধারণ-ভাবে প্রবন্ধ বলা হত। এই প্রবন্ধগুলি মোটামুটিভাবে ছিল ধ্রুপদেরই অনুরূপ। তাদের চারটে কলি ছিল—উদ্গ্রাহ, মেলা-পক, ধ্রুব আর আভোগ। অনেক সময় ধ্রুব আর আভোগের মাঝখানে আর একটা কলি থাকত তার নাম অন্তরা। এর মধ্যে গানের প্রথম পাদকে বলা হত উদ্গ্রাহ, মাঝামাঝি হচ্ছে ধ্রুব আর শেষ কলির নাম আভোগ। এই মাঝের ধ্রুব অংগটি হচ্ছে সংগীতে সবচেয়ে প্রধান। যে রকম গানই হোক না কেন, ধ্রুব অংশটি থাকবেই। প্রবন্ধ গান এক রকমের নয়, অনেক রকম তার রূপ আর সে সব ছড়িয়ে ছিল প্রত্যেক প্রদেশে বিভিন্ন আকারে। ক্রমে যখন বিরাট প্রবন্ধ সংগীতে বিকৃতি দেখা দিল তখন তার সংস্কার করবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। এই সময় নানা জায়গায় নানা রকম পরীক্ষা স্বভাবতঃই চলেছিল। অবশেষে সুপ্রাচীন সংগীতের সর্বাঙ্গ এবং অবশ্যিক অঙ্গ ধ্রুবকে প্রধান রেখে অপরাপর বাহুল্য এবং বিকৃতিকে বর্জন করে একটি সুসংস্কৃত গীতরূপ সংগঠিত হল যার আখ্যা ধ্রুবপদ অথবা শাস্ত্রীয় ভাষায় বললে ধ্রুবপ্রবন্ধ। এটি একটি বিরাট সংগীত-পদ্ধতিরই ক্রম-পরিণতি। এর ইতিহাস লোকসংগীতের প্রমোশন পাওয়ার ইতিহাস নয়।

এই ধ্রুবপদ সব জনপদে তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি। বাংলা দেশে মঙ্গলগান, পাঞ্চালী, কীর্তন এবং এ ছাড়া আরো অন্তত ছাব্বিশ রকমের প্রবন্ধ-গান প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে ধ্রুপদও ঠাঁই পেয়েছিল, তবে সে পোশাকিভাবে কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

অনেকে বলেন, প্রাচীন কীর্তনের সঙ্গে ধ্রুপদের গায়কীর মিল আছে এবং

কারণে বাংলা গানে ধ্রুপদের প্রভাব
স্বীকার্য। প্রাচীন কীর্তন শুনতে
একটা ধ্রুপদের মত লাগে এটা ঠিক,
তু সে ধ্রুপদ বলে নয়, প্রাচীন কালের
ধ্য গানগুলির সাধারণ আকৃতিই
একটা ধ্রুপদের মত ছিল। প্রবন্ধের
শই ছিল এ ধরণের আর বাংলা দেশে
লিতও ছিল অনেক প্রবন্ধ, যার
নি ঐ রকম ঠাস আর নিটোল এবং
ও কতকটা মন্থর। শ্রীচৈতন্যের এবং
পরবর্তীকালের কীর্তন সংগঠনের
বর্ণনা প্রাচীন বইতে পাওয়া যায়
ত তো ধ্রুপদের উল্লেখ নেই। ধ্রুপদের
একটা তেমন বড় প্রভাব থাকত
লে তার স্বীকৃতিও থাকত। বাজনা
বে পাখোয়াজের (যদিও কীর্তনে
য়োজ বাজত না) উল্লেখ বহু আছে
সাহিত্যে, কিন্তু সে ধ্রুপদের সঙ্গে
ত হিসাবে নয়, এমনি একটি বাদ্য
রে।

একমাত্র একটি বাংলা বৈষ্ণবগ্রন্থে
দের কথঞ্চিৎ উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি
হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে।
বলা হয়েছে তখনকার দিনে এক
গান ছিল যাকে বলা হত "ক্ষুদ্র-
" অর্থাৎ এখনকার দিনের কাব্য-
ত আর কি। ধ্রুবপদ এবং পঞ্চালী
লী) এই ক্ষুদ্রগীতগোষ্ঠীর
র্গত। গ্রন্থকার বলেছেন ধ্রুপদ
কার দিনে সংস্কৃত ভাষায় গাওয়া
তাই তার আখ্যা ছিল দিব্যগীতি।
বাঙালীর পছন্দ ছিল প্রাকৃত বা
ভাষার গানের দিকে যাকে বলা
মানুষগীতি।

এর থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়
ধ্রুপদ বাংলায় ছিল বিশেষ শ্রেণীর
প্রচলিত এবং বাদশাহী দরবারে
প্তি থাকাতে বাংলাতেও সম্ভ্রান্ত
অন্যান্য গানের মধ্যে তার একটা
ছিল, কিন্তু সাধারণভাবে
যেমন সে যুগেও তেমন এর
প্রচার ছিল না। নাটগীতি,
লী, মঙ্গলগান, কীর্তন প্রভৃতি
দিক থেকে নানা রসে পুষ্ট হয়েছে,
ধ্রুপদ বাংলায় সেভাবে বর্ধিত
। বাংলার প্রাচীন ধ্রুপদ সাহিত্যের
দিক থেকে নগন্য এবং সংগীতের দিক
থেকেও এতে বাঙালীর নিজস্ব ছাপ
তেমন করে পড়েনি যেমন আমাদের
অন্যান্য সংগীতে পড়েছে। বস্তুত
ধ্রুপদকে সাহিত্যে এবং রসে পরিপুষ্ট
করেছেন প্রাগাধুনিক যুগের রচয়িতাগণ
এবং তার পূর্বে সংস্কারকদের প্রেরণায়
ধ্রুপদ শ্রেষ্ঠ আসরের অন্যতম সংগীত
বলে পরিগণিত হয়েছে। তারও পূর্বের
বৃত্তান্ত স্বল্প যা আগেই বলা হল।

সর্বভারতীয় সংগীতোৎসব

খবর পাওয়া গেল ভারত সরকার
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সংগীত-নাটক অ্যাকা-
ডেমির উদ্যোগে আগামী মার্চ মাসে
একটি সর্বভারতীয় সংগীতোৎসব
অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সময়ই আবার
রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সংগীতজ্ঞদের
সনদ প্রদান করবেন। অ্যাকাডেমির
সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজামান্নার জানিয়েছেন
যে, উৎসবটির আয়োজন এবং সংগঠন
করবেন ভারতীয় কলাকেন্দ্র এবং যাতে
ভারতে প্রচলিত প্রধান প্রধান সবরকম
সংগীতাদি এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত
হয় এজন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

এ বৎসরের সংগীতজ্ঞদের সম্মানের
আয়োজনটা হবে অ্যাকাডেমির তরফ থেকে—
শিক্ষাদপ্তর এখন থেকে এসব ভার
অ্যাকাডেমির ওপরেই অর্পণ করবেন বলে
জানা গেল। তবে সম্মানটা অবশ্য
জানাবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র
প্রসাদ।

অ্যাকাডেমির কর্মতালিকায় শীঘ্রই
একটি বিরাট রকমের লোকনৃত্যের পরি-
কল্পনা রয়েছে। দিল্লীতে রিপাব্লিক
দিবসে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হবে এই
নৃত্যোৎসব। যে সম্প্রদায়ের নৃত্য উৎকৃষ্ট
হবে তাঁদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা
হবে, তা ছাড়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত
শিল্পীদের আলাদা ক'রেও পুরস্কৃত করা
হবে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ।

শ্রীযুক্ত রাজামান্নার ঘোষণা করেছেন
যে, গত বৎসরের লোকনৃত্যোৎসবের সঞ্চিত
তহবিল থেকে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু
এবার একটা বড় রকমের অংশ প্রদান
করবেন মণিপুরে একটি কেন্দ্রীয় নৃত্য-

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এই প্রতিষ্ঠানে উচ্চাঙ্গের মণিপুরী নৃত্য ছাড়াও উপজাতীয়দের মধ্যে যে সব নৃত্য প্রচলিত আছে সেগুলিও শিক্ষণীয় বিষয় হবে।

গত কয়েক মাসের মধ্যে অ্যাকাডেমির একটি প্রধান কাজ হয়েছে প্রধান শিল্পীদের সংগীত যাতে রক্ষিত হয় তার প্রচেষ্টা। এ পর্যন্ত অ্যাকাডেমি দুশো রেকর্ড তৈরি করেছেন, যার মধ্যে ইমদাদ খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, গহর জান, আবদুল করিম খাঁ এবং মালকা জানের অধুনালুপ্ত গানগুলিও রয়েছে। বলা বাহুল্য, এগুলি প্রাচীন রেকর্ডের নতুন সংস্করণ। শুধু উত্তর ভারতেরই নয়, দক্ষিণ ভারতেরও বহু দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড এইভাবে সংগৃহীত হয়েছে এবং নতুন করে রেকর্ড করাও হয়েছে। অ্যাকাডেমির উদ্দেশ্য এইভাবে যাবতীয় প্রসিদ্ধ রেকর্ডের একটি মিউজিয়াম স্থাপন করা।

এর মধ্যে আমাদের বাংলা দেশের রাধিকা গোস্বামী প্রমুখাৎ বিশিষ্ট প্রাচীন শিল্পীদের গান নিশ্চয়ই রক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু সুদূরে দিল্লী কি এই দুর্ভাগা বাংলার কথা অতটা ভাববেন?

অ্যাকাডেমির আর একটি প্রচেষ্টা হচ্ছে সংগীত সম্বন্ধীয় প্রাচীন পুঁথিগুলি যাতে ইংরেজি অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা করা। এই জন্য অবশ্যই যথোপযুক্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে নানা প্রতিষ্ঠানকে। যাঁরা সাহায্য পাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বরোদা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, মাদ্রাজ গভর্মেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরি, তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল লাইব্রেরি এবং বিহার অ্যাকাডেমি লাইব্রেরি।

কলকাতার, তথা বাংলার কোন প্রতিষ্ঠান সাহায্য পাবেন কি না, তার অভাস পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। অথচ কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কত পুঁথি রয়ে গেছে। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে অনেকগুলি সংগীতের পুঁথি আছে বলে জানি, এছাড়া আরও অনেক জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। বাংলার স্বনামধন্য সংগীতগ্রন্থ সংগীত-দামোদর আজ পর্যন্ত ছেপে বেরোয় নি অথচ তার পুঁথিও অনেকের কাছে আছে শুনতে পাই। এসব গ্রন্থ বের করবার সুযোগ কি বাংলা দেশ পাবে না? এই কলকাতা থেকেই সর্বপ্রথম সংগীত-রত্নাকর, সংগীত পারিজাত, সংগীত-দর্পণ ছেপে বেরিয়েছিল। রাজা শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের মূল্যবান সংগীত গ্রন্থের সংকলন আজ দুষ্প্রাপ্য, অথচ এইগুলি নয়াদিল্লীর রাজকীয় সংগীত অ্যাকাডেমির দৃষ্টির বাইরে পড়ে রইল। এসব সাহায্য কিভাবে দেওয়া হচ্ছে জানি না, কলকাতা, যা বর্তমানে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্র তার প্রতিষ্ঠানগুলি এসব খবর পেয়েছেন কি না, বা অ্যাকাডেমি তাঁদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রেখেছেন কি না সে খবরও আমরা কিছুই পাইনি। যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে বাংলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উক্ত অ্যাকাডেমির কর্মসূচী প্রস্তুত হয়েছে।

এই অ্যাকাডেমির সংগঠন এবং কিভাবে এর কার্যতালিকা নির্ধারিত হচ্ছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ ভারত সরকারের অবিলম্বে প্রকাশ করা উচিত। বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগারগুলিকেও এ বিষয়ে তৎপর হতে অনুরোধ করি।

এই বিষয়টির ওপর বিশেষ করে জোর দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, উত্তর ভারতের সংগীতের তবু একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের বৈশিষ্ট্যের দরুণ নানা স্মৃতি বহু তথ্য রয়ে গেছে যা দিয়ে পূর্বে সেখানে কি রকমভাবে সংগীত সংগঠিত হয়ে এসেছে তার অন্তত একটা পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের সংগীতের ইতিহাস তো মোটামুটি রক্ষিতই হয়েছে। সংগীত-শাস্ত্র প্রচারে আজ দক্ষিণ ভারতই অগ্রণী। বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ মাদ্রাজের বহু স্থান থেকে উৎকৃষ্টভাবে ছেপে বেরিয়েছে এবং নিয়মিত বেরুচ্ছেও। বলতে গেলে আজ সারা ভারত এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য মাদ্রাজের কাছে ঋণী। কিন্তু বাংলা দেশ এই ব্যাপারে অতি নৈরাশ্য-জনকভাবে পেছিয়ে আছে। বাংলার সংগীতের ইতিহাস নির্ধারণ করা অতি কঠিন ব্যাপার, কেননা, তার আবহাওয়া এবং ইতিহাস দুটোই কোন কিছু স্থায়ীভাবে রক্ষিত হওয়ার প্রতিকূলে গেছে। মধ্যযুগে বাংলার সংগীত যে কি রকম ছিল সেটা খুঁজে পাবার মত যথেষ্ট তথ্য এবং গ্রন্থাদি এখনও বেরোয়নি। কেবল মারামারি কাটাকাটির ভিতর দিয়েই এই ইতিহাসের পরি-সমাপ্তি ঘটেছে। তাই বাংলার গ্রন্থগুলি আগে প্রকাশিত হওয়া দরকার অথচ এদিকে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির লক্ষ্য নেই। জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য আমাদের সংগীতজ্ঞগণ তৎপর হবেন আর কবে?

সুরের খবর

২১শে নভেম্বর দক্ষিণী'র প্রাক্তন ...ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে 'দক্ষিণী' ...ন শিক্ষার্থী সংসদ গঠন করেছেন। ...র কর্মাধ্যক্ষ শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা ... ও কার্যসূচী প্রণয়নে সহায়তা ...ন। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এই ...দ থেকে "বসন্তোৎসব" পরিবেশিত ... নিম্নোক্ত কর্ম-সমিতি চলতি ...র জন্য নির্বাচন করা হয়েছেঃ ...পতি—শ্রীতড়িৎভূষণ বসু, যুগ্ম-সচিব—শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী শ্রীবীরেশ্বর বসু। অন্যান্য সদস্যগণ শ্রীমতী প্রতিমা গুপ্ত, শ্রীমতী উমা চৌধুরী, শ্রীমতী শক্তি চৌধুরী, ...তী ইলা দেব, শ্রীমতী সুরভি রায়-...রী, শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায় ও ...চিন্ময় দাশগুপ্ত।

* * *

কলকাতায় সংগীত সম্মেলন শুরু হয়ে গেছে গত শুক্রবার থেকে। উত্তর কলকাতায় রঙমহলে সম্মেলনের অধিবেশন চলেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেষ। তার পরদিন থেকেই শুরু হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতায় 'ভারতী' প্রেক্ষাগারে তানসেন সংগীত সম্মেলন। এই দুই সম্মেলনের শিল্পীদের তালিকা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এরপর ২৫শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন। সপ্তাহব্যাপী এই সম্মেলনে যোগ দেবেন কণ্ঠসংগীতে—কেশরবাঈ কেরকর, অঞ্জনীবাঈ লোলেকর, সর্দার-বাঈ কোর্দেকর, ডাঃ সুমতী মুতাতকর, ওঙ্কারনাথ, নিসার হোসেন, পালুসকর, আসাদ আলী খাঁ, সোহন সিং ও বলবন্ত সিং ভাট্।

যন্ত্রসংগীতে আছেন—আলী আকবর (সরোদ), অম্বাদাসজী (মৃদঙ্গ), মুস্তাক আলী খাঁ (সেতার), মিঞা বিসমিল্লা (সানাই), গোপাল মিশির (সারেঙ্গী), কুমারী শরণরাণী (সরোদ), ভি জি যোগ (বেহালা), অনোখেলাল (তবলা), শান্তা-প্রসাদ (তবলা) ও দত্তরাম (সারেঙ্গী)।

এছাড়া আছে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের নৃত্য, গুজরাটি গরবা ও মীরা ও কবীর সম্বন্ধে নৃত্যনাট্য।

* * * *

ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের উদ্যোগে গত বৎসরের মত এবারও পাকিস্তান ও ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে আগামী ১০ই থেকে ১২ই ডিসেম্বর ডোভার লেনে একটি সংগীত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

[২৩]

হয়ত মত বদলাত অতসীর। আদিত্যের পক্ষত্যাগে তার বিশেষ দ্বিধা হবার কথা নয়। সে তো চাকরি ছাড়তেই প্রস্তুত ছিল। কেতকীর কাছে সে তার রুক্ষ দিক্‌টাই উন্মোচন করেছিল, কিন্তু সেও বুঝি অভিনয় মাত্র। মনে মনে এই অসহায় ভীরু মেয়েটিকে ভাল না বেসে পারেনি। আহা, এখনও ঝড়-ঝাপ্‌টা খায়নি, আকাশে কালো মেঘ দেখেই ভয় পেয়েছে। সবে জলে নেমেছে, এখনও লোনা জল পেটে যায়নি, দূরে বড় ঢেউ দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছে অতসীকে। হায়রে, সারা জীবন যার হাবু-ডুবু খেয়ে কেটেছে, তার কাছেও কিনা একটি অনভিজ্ঞ কুমারী ভরসা খোঁজে, আশ্রয় চায়।

কেতকী কেঁদেছিল। টপ টপ কয়েক ফোঁটা জল, অতসীর করপল্লবে এখনও তার উষ্ণ স্পর্শটুকু লেগে আছে। তার নিজের জীবনে কোন স্বপ্নকুঁড়ি ফুল হয়নি, হয় ঝরেছে, নয় শুকিয়েছে, কেতকীরও কি তাই হবে। এই একটি লক্ষণ দিয়েই অতসী কেতকীকে তার নিজের দলের ব'লে চিনতে পারল। এক ধরণের ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়ে আছে, তাদের বলে মৃতবৎসা। অতসী-কেতকীরাও তাই, হয়ত অন্য অর্থে, যাদের সব কামনা, বাসনা, কল্পনা আর আশার শিশুরা চোখ মেলবার আগেই, ছোট ছোট হাত-পা তুলে খেলা শুরু করবার আগেই, আঁতুড়েই মরে।

যে-মুহূর্তে কেতকীকে অতসী আপন ব'লে চিনে নিল, অমনিই করুণার কুয়াসা কোথা থেকে এসে যেন তার চিত্ত ঢেকে দিল। কেতকী আর সে তো আলাদা নয়, সে-ই কেতকী, কেতকীই অতসী। নাই বা হ'ল সে নিজে সুখী, কেতকী হোক। সুখী হোক, পরিপূর্ণ হোক, সুন্দর হোক, প্রার্থনার মত ক'রে বার বার মনে মনে উচ্চারণ করল অতসী, একটা পূত অনুভূতি কণা কণা জল হয়ে চোখের পাতা ছাপিয়ে পড়ল। চির-অতৃপ্ত, বঞ্চিত একটি মেয়ে তার সুখ-কুঠুরির চাবি খুঁজে পেয়েছে। তারই মত আরেকজনের মধ্য দিয়ে, তার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে, সে সার্থক হবে। অনেক, অনেকদিন পরে অতসী অলক্ষ্য বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল, তার সব কেড়ে নিয়েছেন, একটুখানি বাকী রেখেছেন তবু। করুণা। পরের জন্যে এখনও চোখে জল আনতে পারে অতসী, এই ক্ষমতাটুকুই বা কম কী। এটুকুও খোয়ালে বেঁচে থাকাটা একেবারেই মিথ্যে হয়ে যেত।

শশাঙ্কর জন্যে অতসীর ভাবনা নেই। দায়িত্বজ্ঞানহীন তার এই ভাইটি বরাবরই পরিবার সম্পর্কে উদাসীন। যতদিন বাবা ছিলেন, ততদিন বিশেষ সমস্যা ছিল না। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে কলেজের খাতায় নাম উঠেছে, সে একটু আধটু পলিটিক্স বা দেশোদ্ধার করবে বৈকি। শশাঙ্ককে বাড়ির সকলে একটু প্রশ্রয়ের চোখে দেখত। আহা, করুক যে ক'দিন বাবা বেঁচে আছেন। সময়মত শুধরে গেলেই হল। বড়লোকের ছেলের চরিত্রদোষ ঘটেছে শুনলে পাড়ার মুরুব্বিরা যে-সুরে বলেন, 'বিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে', এ-ও কতকটা তাই।

বাবা মারা গেলেন, শশাঙ্কর তবু মতি ফিরল না। আগে তবু ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরত, এখন তাও ছেড়ে দিল। অথচ পলিটিক্সেও শশাঙ্ক সুবিধে করতে পারেনি। ও ছিল সেই জাতের কর্মী যারা দাদাদের ছাতাটা ছড়িটা ধরতেই অভ্যস্ত, সেই ছড়ির মাথা কবে সোনা-বাঁধান হয়ে গেছে লক্ষ্যও করেনি।

বাবা মারা যাবার পর একদিন কোথা থেকে এসে উদয় হল, বলল, কিছু টাকা দাও তো। বিজনেস্ করব। মা'র ইচ্ছে ছিল না, তবু ভয়ে ভয়ে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন। কী বিজনেস্ কেউ জানল না, লাভ হল, না লোকসান তাও না। ওদিকে সংসার খরচে একটি একটি করে টাকা কমছে। মা প্রমাদ গণলেন। অল্প স্বল্প যা কিছু জড়ো করে অতসীকে বিয়ে দিলেন। শশাঙ্ককে বললেন, 'এবার তুই একটা চাকরি নে।'

শশাঙ্ক বলল, 'রোসো, নিচ্ছি।'

শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে অতসী দেখে, সব বদলে গেছে। সংসারে হাঁড়ি চড়া দায়, কিন্তু সেটাই একমাত্র পরিবর্তন নয়। একটাও আস্ত শাড়ি নেই, মা'র গায়ে ছেঁড়া-ময়লা ন্যাকড়া উঠেছে তাও নয়। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে মা'র অন্তরে। এই কি সেই মা, যিনি একবার, অতসীর বড় একটা অসুখের

, ওর শিয়রে সমানে সাতদিন বসে
নে? খাওয়া না, নাওয়া না, শেষ
ত ফিট হয়ে পড়েছিলেন নিজে?
দী সুখী হবে ব'লে সর্বস্ব বাঁধা
তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন?

অল্প বয়স থেকে বার বার অতসী
র মত আবৃত্তি করেছে ত্রিষু লোকেষু
ত মাতৃসম গুরু—সেই মন্ত্রে বিশ্বাস
গেল।

শুধু তো দু' বেলা দু' থালা ভাতের
ে, তাই কি এত বদলে দেয় মানুষকে।
মাকে অতসী একদিন বলল, 'আমি
র করব।'

মারও মনের কথা বোধহয় তাই।
লন, 'কর।'

বয়স হবার পর থেকে চোখে-চোখে
রেখেছেন, নীলাদ্রির সঙ্গে সিনেমা
ফিরতে একদিন রাত হয়েছিল বলে
নির্মমভাবে মেরেছিলেন, সেই
সী স্কুলের কাজ সেরেও বাড়ি
রলে তবু কিছু বলেননি মা। খুশি-
গলায় বলেছেন, 'তোদের সেক্রেটারি
কে এম্পায়ারে নাচ দেখাতে নিয়ে
ছিল,—বলিস কী। অন্য মাস্টারনী-
চোখে টাটায়নি?'

জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে শ্রান্ত
য় অতসী বলেছে, 'টেরই পায়নি,
কেউ।'

একটা লোভের সাপ ছোবল তুলেছে
চোখে, স্পষ্ট অনুভব করেছে
সী। মা এগিয়ে এসে ওর মাথায়
রেখেছেন, আশীর্বাদের গলায়
ছেন, 'তোর উন্নতি হবে দেখিস।'
স্পর্শে অতসীর অশুচি মনে হয়েছে
কে। এক পো ক'রে দুধ বরাদ্দ
ছে অতসীর, দোকান থেকে মা নিজে
জন্যে পছন্দ করে শাড়ি এনেছেন,
ধনের সরঞ্জামও। অতসী আপত্তি
লে বলেছেন, 'আহা, এ-সবের দরকার
বৈকি। কী-ই বা এমন বয়স
র।'

দুধের স্বাদ তিতো হয়ে গেছে,
সেটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে
খছে অতসী। মাইনে বেড়েছে বৈকি,
র মাসেই বেড়েছে। খুশিতে ছোট
কিটির মত মাকে সারা বাড়ি ছটফট
র বেড়াতে দেখে অতসীর গায়ে কাঁটা
দিয়েছে। পাল্লার একদিকে নীতিবোধ,
শুচিতা, সন্তানের কল্যাণ, আরেকদিকে
গোটাকতক কাগজের নোট,—জীবনের
মূল্যনিরূপণের মান কি এই, শুধু এই।

এই, শুধু এই। নইলে হাসিমুখে
মা ওকে আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে
গিরিডি যেতে দিতেন না। শাড়ি ব্লাউজ
স্নো-পাউডার মা নিজ-হাতে সুটকেসে
তুলে দিচ্ছিলেন, অতসী চোখের জল
লুকোতে মুখ ফেরাল। চকিত হয়ে
মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁদছিস যে।'
আঁচলে চোখ মুছে হাসল অতসী।—'কই
কাঁদছি না তো। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি
যাবার দিনে তুমি আমার বাক্স গুছিয়ে
দিয়েছিলে, মনে আছে, মা? আজও
দিচ্ছ। দুটোর মধ্যে মিল বেশি, না
তফাৎ বেশি, ভাবছি।'

মা রাগ করলেন।—'তোর যত সব
বাঁকা-বাঁকা কথা।'

অতসী আর প্রশ্ন করেনি। ধীরে
ধীরে তৈরি করেছে নিজেকে। পুজোর
ফুল যেমন নদীর জলে লোকে ভাসিয়ে
দেয়, তেমনি ভাসিয়ে দিয়েছে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব,
ভয়, বিবেক, কোমলতা, সন্দেহ। ঢেউয়ে
ঢেউয়ে ফুলগুলি স্রোতের টানে ভেসে
গেছে, ঘাটে ব'সে নির্নিমেষ, নির্বিকার
চোখে দেখেছে অতসী।

আরতির সবটুকু সুরভিত ধূপ উপে
গিয়ে অঙ্গারের মত শুধু দাহ, শুধু
জ্বালা, শুধু ছাই তখন অবশিষ্ট আছে।

সেদিন কেতকী যাবার আগে প্রণাম
করবে ব'লে ওর পায়ের পাতা ছুঁতেই
চোখে জল এসেছিল অতসীর। সব তো
তবে যায়নি, ভাসিয়ে দেওয়া ফুলগুলির
কয়েকটি বুঝি আবার উজান ব'য়ে ঘাটে
এসে লেগেছে।

শশাঙ্কর জন্যে নয়, কেতকীর মুখ
চেয়ে অতসী হয়ত মত বদলাত, যদিনা
'জনদর্পণ' সম্পাদক জীবনতোষ ওকে
হঠাৎ ডেকে পাঠাতেন।

বাড়ি ফিরে অতসী সেদিন স্লিপ
পেল। জীবনতোষ বিশেষ প্রয়োজনে
পরদিন ওকে বেলা দশটায় অফিসে দেখা
করতে বলেছেন।

আবার সেই 'জনদর্পণ' অফিস,
কিন্তু এবারে আর অতসীর পা কাঁপেনি,
সোজা উঠে এসেছে ওপরে, এমন কি
স্লিপ না দিয়েই সম্পাদকের কামরার
কাটা-দরজা ঠেলেছে।

জীবনতোষ আজও চুরুট টানছিলেন,
তবে হাতে কলম নেই, টেবিলে কাগজ-
পত্রের স্তূপ, দু' পেয়ালা গরম চা পাশের
দেয়ালে অলস-মলিন ধোঁয়ার আল্পনা
আঁকছে।

দু' পেয়ালা চা, কেননা ঘরে দ্বিতীয়
এক ব্যক্তি ছিল। টেবিলের উপর ঝুঁকে
পড়ে জীবনতোষ তাঁর সঙ্গে ফিস্ ফিস্
ক'রে কী বলছিলেন, কাটা-দরজার
কব্জায় শব্দ হ'তেই চকিত চোখ
তুললেন, উষ্ট্রবৎ প্রলম্বিত কণ্ঠ সংবরণ
ক'রে চেয়ারের পিঠের কাছে নিয়ে
গেলেন। বললেন, 'আসুন।'

টেবিলের সামনে আর একটিমাত্র
আসন, আগন্তুকের পাশেই। অতসীকে
সেখানেই বসতে হ'ল।

আগন্তুককে দেখিয়ে সম্পাদক
বললেন, 'এ'কে চেনেন?'

অতসী এক্ষেত্রে ভদ্রতার কোড্ যা
বলে, অর্থাৎ না-জানাটা যেন অপরাধ,
এমনভাবে মাথা নাড়ল।

'প্রভাত মল্লিকের নাম শুনেছেন?'

'শুনেছি।'

'ইনিই সেই।'

অতসী প্রথামত হাত তুলে নমস্কার
করল, প্রভাত মল্লিকও করলেন। অতসী
বিব্রত বোধ করল, আদিত্য মজুমদারের
এই এক নম্বর শত্রুর মুখোমুখি বসতে
হবে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি!

প্রভাত মল্লিকের বয়স যতটা অনুমান
করেছিল তার চেয়ে কম, হয়ত ত্রিশের

কোঠায়। মাথাটাকে একটি টেঁড়ি ঠিক সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে, দু' পাশে ঢেউয়ের পর ঢেউ কুঞ্চিত কেশদাম। ধবধবে ফরসা হাতের নীচে নীল কয়েকটা স্পষ্ট রেখা—অভিজাতদের এই জন্যেই বুঝি নীল রক্ত বলে। চওড়া কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটার ফিতে সোনার, ডিবেটা হয়ত মহার্ঘতর কোন ধাতুর, পাশে-রাখা ছড়িটাকে আলগাভাবে স্পর্শ করে আছে দু'টি আঙুল, সে দু'টিতে দামী পাথরের ঝিকমিক। বড়লোকদের চোখে অতসী এক সময়ে দেখেছে সোনা-ফ্রেম চশমা, এখন বুঝি ফ্রেম না-পরাটাই দস্তুর। ফিনফিনে পাঞ্জাবীর হাতা কনুইয়ের কাছে উঁচু হয়ে উঠেছে, অতসীর বিশ্বাস, আস্তিন সরালে ওখানে গুটিকয় মন্ত্রপূত কবচের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মসৃণ একটি কেস থেকে প্রভাত সিগারেট বার করলেন, একটা বাড়িয়ে দিলেন জীবনতোষের দিকে, জীবনতোষ নিলেন না, বললেন, চুরুটের নেশা যে পেয়েছে, এসব জোলো জিনিসে সে সুখ পায় না।'

'খেজুরগুড়ের পাটালির পাশে চকোলেট?' খুব একটা বাহাদুরির উপমা হয়েছে ভেবে প্রভাত মল্লিক নিজেই হাসলেন, সিগারেটটা ধরিয়ে বললেন, 'কী দেখছেন বলুন তো। খবরের কাগজে আমার এমন পরিপাটি ছবি ছাপা হয়নি, —তাই?'

'আপনার ছবি আমি দেখিনি', অতসী বলল।

'ছবি দেখেননি? বলেন কী। আদিত্য মজুমদারের ওখানে আমার কুশ-পুত্তলিকা দাহ পর্যন্ত হয়েছে শুনেছি, আর আপনি ছবিও দেখেননি?'

অতসী দৃঢ়স্বরে বলল, 'না।'

প্রভাত কিছুক্ষণ অপ্রতিভের মত ব'সে রইলেন, হাতটা অকারণেই নাড়ালেন, বোধহয় পরখ করলেন আলোর সম্মুখে, ঠিক কীভাবে ধরলে আঙুলের হীরে-গুলো ঝিলিক দেয়।

সম্পাদকের দিকে চেয়ে অতসী বলল, 'কেন ডেকেছেন এখনও বলেননি।'

জীবনতোষ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চাইলেন প্রভাত মল্লিকের দিকে, প্রভাত ছড়িটা বার দুই মেজেয় ঠুকলেন। সিগারেটে জোর টান দিলেন, বোধহয় আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেতে বললেন, 'জীবনবাবু নন, অতসী দেবী, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আমিই চেয়েছি। আমি এবার ইলেকশনে নেমেছি, এটুকু বোধহয় জানেন?'

'জানি।'

'আমাদের পরিবারের কথাও শুনেছেন?'

'বিশেষ কিছু না, শুনেছি খুব প্রাচীন—'

প্রভাত হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, সেই জব চার্নকের আমল থেকে। আমার পূর্বপুরুষেরা গত শতাব্দীতে কলকাতার সমাজপতি ছিলেন। বাংলা থিয়েটার, বাংলা সাহিত্য—আজকাল আপনারা যাকে সংস্কৃতি বলেন—তার প্রতিটি আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষণ করেছেন, উনিশ শতকের যে-কোন ইতিহাসের পাতা ওলটালেই দেখতে পাবেন।' ছাই ঝেড়ে উদাস ধোঁয়া ছড়িয়ে প্রভাত বললেন, 'সংস্কৃতিটা এখন আর আমাদের হাতে নেই অতসী দেবী, ওখানে এখন প্লীবিয়ান অর্ধশিক্ষিতরা মুরুব্বিয়ানা করছে,—বার ভূতের রাজত্ব। আমি...... আমি তাই রাজনীতিতে নেমেছি; এখানে এখনও হয়ত আমাদের কিছু আশা আছে।'

অতসী কিছু বলে কিনা দেখে নিয়ে প্রভাত মল্লিক ফের বললেন, 'আমি একেবারে সেকেলে, দশ শালা বন্দোবস্তের আমলের জমিদার বাবুটি আছি ভাববেন না। শোনেননি, পৈতৃক প্রাসাদ ভেঙে হালফ্যাসানের ম্যানসন করেছি। বাগানবাড়ি তুলে দিয়ে সেখানে তুলেছি ছোট ছোট ফ্ল্যাট, শহরে কলোনি। আস্তাবলে চাবি দিয়ে কিনেছি শেষ-মডেলের মোটর, এককথায় একালের সঙ্গে সন্ধি করতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এখন আমার প্রশ্ন একাল আমাকে নেবে কিনা।'

কিছু একটা বলতেই হয়, তাই অতসী বললে, 'আপনার সন্দেহ আছে নাকি।'

প্রভাত বললেন, 'আছে, [illegible] ইতর জনের অতসী দেবী, নইলে আদিত্য মজুমদারের মত [illegible] আমার সঙ্গে যুঝতে ভরসা পায়।' বলতে বলতে কেমন একটা উত্তেজনা এল প্রভাত মল্লিকের কণ্ঠে, হিংস্রভাবে ছড়ি দিয়ে মেজেয় ঘা মেরে বললেন, 'আপনি জানেন আদিত্যর ঠাকুরদা আমাদের [illegible] খাতা লিখে যেত?'

'জানি না।' প্রতিদ্বন্দ্বিতা-[illegible] [illegible]টির উত্তেজনা লক্ষ্য করে অতসী কৌতুক বোধ করল।

'জানেন না, আপনি অনেক কিছুই জানেন না। আপনাকে কিছু কিছু জানাব বলেই ডেকে এনেছি। আদিত্য নিজেকে প্রচার করছে ত্যাগী দেশকর্মী বলে। আপনি জানেন, আদিত্য শেষবারে বন্ড লিখে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল?'

অতসী বলল, 'বামপন্থীরা তাই রটায় বটে।'

বিদ্রূপের সুরে হেসে উঠলেন প্রভাত। 'আদিত্যর প্রতি আপনার নিষ্ঠার প্রশংসা করি অতসী দেবী। কিন্তু আদিত্যর প্রতি যারা বাম, তারাই বাম-পন্থী, আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না।' আয়েস করে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে প্রভাত বললেন, 'আমি কি আদিত্যকে হিংসে করি অতসী দেবী। নেহাৎ আমার কুলজ্যোতিষী কোষ্ঠী বিচার করে পরামর্শ দিয়েছেন, নইলে আমি এই অসম সমরে নাবতুমই না।'

'অসম সমর বলছেন কেন?'

অসম নয়তো কী। কর্মী কোথা আমার। টাকা ছড়ালে কিছু লোক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আপনার [illegible]

...কর্মী কোথায় পাব বলুন। ...র লোক নেই অতসী দেবী, বিশেষ, ...ভ্রোটারদের মধ্যে কাজ করবার মত ... একেবারে নেই।'

...একজনকে এ-কাজে লাগিয়ে ...ছেন বললেন না?' জীবনতোষ ...ন কথা বলেননি, এবারে মুখ ...লেন।

...দিয়েছি তো।' অসন্তুষ্ট কণ্ঠে প্রভাত ...ন, 'আমার নায়েবের সুপারিশে ...কাডিউলিকে এ-কাজে লাগিয়েছি। ...জানেন জীবনবাবু, ওসব হল ...ফেল-কড়ি-মাখ-তেল ব্যাপার। ...ওরা হল অন্য টাইপের মেয়ে- ...সব সার্কেলে যেতে পারে না ...সেখানে অন্যরকম পোজ চাই।'

...ফেলে প্রভাত মল্লিক বললেন, ...কর্মী আমি একটিও পাইনি।' ...কাডিউলির সঙ্গে তার তুলনার ... অতসীর গায়ে লেগেছিল, সে ...শান্ত করে বসে রইল।

...কও বোধ হয় অস্বস্তি বোধ ...বললেন, 'ওসব থাক। মিস ... আপনি কাজের কথাটা এখনও ...নি প্রভাতবাবু।'

...এইবারে বলব।' টিপে টিপে ...ড মারার মত করে প্রভাত ছাই-...তে হাতের সিগারেটটা নেবালেন। ...কণ্ঠ ভাবালুতায় আর্দ্র হয়ে এসে- ... হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ... কিছু মনে করবেন না মিস মিত্র, ...কে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন ...। আদিত্য মজুমদার আপনাকে কত ...দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে?'

একেবারে সামনাসামনি আঘাতে ...সীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কোন- ...সামলে বলল, 'কোন কথা হয়নি ...মানে—'

অবিশ্বাসী গলায় প্রভাত মল্লিক ...লেন, 'বলেন কী। একেবারে বিনে ... শুধো কাজ। দেশের কাজে বেগার ...ছেন—নাকি?'

অতসী বলতে গেল 'বেগার নয়,' ... কী ভেবে কিছুই বলল না, চুপ ...রইল। টাকা নয়, কিন্তু আদিত্য ...ক কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা ...র বলা যাবে না কিছুতে।

প্রভাত গম্ভীর গলায় বললেন, 'টাকার পরিমাণটা জানতে চাই না। এই পরিশ্রমের বিনিময়ে আদিত্য আপনাকে নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবে কথা দিয়েছে। কিন্তু অতসী দেবী, আমাদের অফারটা যদি মেনে নেন, তবে, তবে হয়ত আমরা আপনাকে ঢের বেশি দিতে পারি।'

তীব্র স্বরে অতসী বলে উঠল, 'মানে?'

প্রভাত বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না, বলছি। অতসী দেবী, আপনার কাছে আমরা কয়েকটা খবর চাই।'

'কী খবর?' অতসী রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল।

ওর দিকে এক নজর চেয়ে প্রভাত বললেন, 'রাজি আছেন তা হলে। দ্যাটস এ রীজনেবল্ এ্যাটিটিউড। আদিত্যর অনেক দুষ্কৃতির কথা লোকের কানে গেছে। কিন্তু সেসব শুধু গুজব, ছাপলে মানহানি। আমরা কিছু প্রমাণ চাই— ডকুমেন্টারী এভিডেন্স।'

'প্রমাণ, কিসের প্রমাণ।' জালে জড়িয়ে পড়া প্রাণীর মত পাণ্ডুর অতসীর মুখ, অসহায় আর্তস্বর।

'সুবিধে পেয়ে কত পার্টনারকে ফাঁকি দিয়েছে আদিত্য, কোন ব্যাংকে লালবাতি দিতেও কাউকে বাকি রাখেনি। তা-ছাড়া কত মেয়ের সর্বনাশ—'

ভীত, ত্রস্ত, দ্রুত কণ্ঠে অতসী বলে উঠল, 'আমি এসব কিছুই জানি না।'

সম্পাদকের ইঙ্গিতে প্রভাত মল্লিক এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল বাড়িয়ে দিলেন অতসীর দিকে। অতসী অভ্যাস বশে অন্যমনস্কভাবে সেটা তুলে নিল, কিন্তু ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল শুধু।

প্রভাত মল্লিক ধীরে ধীরে বললেন, 'জানেন, কিন্তু জানাবেন না। ভুল করছেন অতসী দেবী। আগেই বলেছি, আমরা উপযুক্ত মূল্য দিতে রাজি আছি।'

'মূল্য?' শ্রান্ত, বিবশ অতসী শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারল।'

প্রভাত বললেন, 'মূল্য। নথি, প্রমাণ, বিবরণ আমাদের হাতে তুলে দিন, আমি আপনাকে পাঁচশো টাকা দেব।'

অতসী বলল, 'না।'

'সাতশো টাকা—হাজার?'

দৃঢ়স্বরে অতসী বলল, 'না।'

'তবে দু' হাজার? হেলায় সুযোগ হারাবেন না অতসী দেবী।'

'না, না, না।' স্থানকাল ভুলে চীৎকার করে উঠল অতসী, দৃঢ়তর কণ্ঠে বলল, 'টাকা নিয়ে কলংকের বেচা-কেনা আমি করি না।' তারপর বিমূঢ়, স্তম্ভিত প্রভাত মল্লিক বাধা দেবার আগেই উঠে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ মুখের রেখা কাটিকে ঢাকতে সম্পাদক চুরুট ধরালেন, সামনেই টেবিলের উপর কেস, তবু প্রভাত মল্লিক এ-পকেট ও-পকেটে সিগারেট খুঁজলেন, না পেয়ে দেশলাইয়ের একটা কাঠি নিয়ে মাথা নীচু করে বারুদটাই ভাঙলেন।'

অতসী দরজা পর্যন্ত এগিয়েছিল, প্রভাত মল্লিকও উঠে দাঁড়ালেন. একবার মনে হল অতসীর পথরোধ করবেন বুঝি। কিন্তু সেসব কিছু না, হাত নেড়ে নেড়ে প্রভাত ধীরে ধীরে শুধু বললেন, 'খুব ভুল করলেন, খুব ভুল করলেন। হয়ত কোনদিন এ-কথা বুঝবেন। আদিত্য মজুমদারকে আজ পর্যন্ত যে বিশ্বাস করেছে, সেই ঠকেছে অতসী দেবী।'

আদিত্য শুনে বললেন, 'ক্রিমিনাল। এই গ্যাংস্টারিজমের শোধ আমি নেব। ওদের পুলিশে দেব।'

অতসীর শরীর এখনও ঠকঠক কাঁপছে. ম্লান হেসে বলল, 'ওরা কিন্তু আপনাকেই পুলিশে দিতে চাইছে।'

'চাইছে, কিন্তু পারেনি। পারবে না। কোন প্রমাণ ওদের হাতে নেই।' আদিত্যর কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এল, একটি বেপথু দেহকে দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন, কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'ওদের হাতে প্রমাণ তুমি তুলে দাওনি। এ-কথা কখনও ভুলব না অতসী। উপকারীকে আদিত্য মজুমদার ভোলে না।' রুদ্ধতীর মুখ থেকে সিক্ত কয়েক গাছি চুল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এই কুৎসিত নাটকটা শেষ হতে দাও। তারপর নতুন জীবন রচনা করব। সেদিন, আমার কামনা আর কিছু নয়, শুধু আমার পাশে থেক, অতসী।'

(ক্রমশ)

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

এতদিন পর্যন্ত আমরা জানি যে, অন্ধের যষ্টিই একমাত্র অবলম্বন; আজকাল অন্ধের জন্য 'বৈদ্যুতিক চোখের' ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এ-চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পাবে না, শুধু বিপদ এড়াতে পারবে। 'সিগন্যাল কর্প' এক রকম আলো বার করেছে, এই আলো কোনও অন্ধজনের হাতে থাকলে ১৫ ফিট দূরের বাধা-বিপত্তি সম্বন্ধে সচেতন থাকা যায়। এই আলোর রশ্মিটা পনের ফিট মত দূরে পর্যন্ত

অন্ধের বৈদ্যুতিক চক্ষু

কোনও জায়গায় গিয়ে প্রতিহত হলে সেটা ফিরে এসে ঐ আলোর মধ্যের 'ফোটো-সেলে' আঘাত করে, তখন আলোটা থেকে ভ্রমরের গুঞ্জনের মত এক ধরণের আওয়াজ বার হতে থাকে কিংবা আলোটা হাতে ধরা থাকলে একটা কম্পন অনুভব করা যায়। বাধা স্থলের যত কাছে এগোন যায়, ততই বেশি করে সংকেত অনুভব করা যায়। বাধার বস্তুটি একটু নড়াচড়া করলে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু খুব দ্রুতগতিবিশিষ্ট হলে এই আলো বিশেষ কার্যকরী হয় না।

*

'গুড় ঢাললেই মিষ্টি হয়' যেমন জানা কথা, তেমনি জল ঢাললেই যে গাছ বাড়ে, এ কথাটা কারো অজানা নয়। জল না ঢাললেও যে গাছ বাড়তে পারে, এটাই কারো জানা নেই। আমরা সকলেই প্রায় জানি যে, গাছ মাটি থেকে শিকড় দিয়ে জলীয় অংশ সংগ্রহ করে পাতার মধ্য দিয়ে বাষ্পাকারে পরিণত করে। এইজন্য খুব শুষ্ক মাটিতে গাছপালা বড় একটা বাঁচতে পারে না। ক্যালিফোর্নিয়ার 'এয়ার হার্ট প্লান্ট রিসার্চ ল্যাবরেটরী' এই সব শুকনো জমিতে ফল ফলাবার ব্যবস্থা করছেন। এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, গাছ যেমন জলা মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে জল সংগ্রহ করে পাতা দিয়ে বাষ্প করে পাঠায়, তেমনি আবার পাতার ওপরে শিশির বিন্দুগুলি কাণ্ডের মধ্যে দিয়ে শিকড়ে পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে অসময়ের জন্যে মাটির মধ্যে কিছুটা জমা রাখা থাকে। শিশিরে গাছ তাজা হয়, এটা খুব নতুন তথ্য নয়, তবে এই শিশিরকণা গাছকে কতখানি তাজা রাখতে পারে, আর কতখানি জল সঞ্চয় করে, এটাই নতুন কথা। প্রফেসর ওয়েন্টের নির্দেশে এই তথ্য সম্বন্ধে 'এয়ার হার্ট ল্যাবরেটরীতে' পরীক্ষা চলে। বীট, টোমাটো, মটর, স্কোয়াস ইত্যাদি কয়েক রকম গাছের ওপর এই পরীক্ষা চালান হয়। এ'রা বলেন যে, শুকনো বা আধা-শুকনো জমিতে শিশির বিন্দুতে গাছ যত তাড়াতাড়ি তাজা হয়, জল ঢেলে অত তাড়াতাড়ি তাজা করা যায় না। ডাঃ ওয়েন্ট বলেন যে, এই সব শুকনো জমিতে গাছগুলো আশ্চর্যরকমভাবে শিশির বিন্দুর জল সঞ্চয় করে। এখানে গাছটা ওজনে যতটা, ততখানি জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এই পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, এই রকম শুকনো জমিতে কয়েক প্রকার গাছের পক্ষে জলের চেয়ে শিশিরকণাই বেশি উপকারী।

*

নতুন কোন কিছু আবিষ্কার হলেই মানুষ সেটা নিয়ে কিছুদিন নাচানাচি করে। যখন বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, গাছের পাতার 'ক্লোরোফিল' আমাদের পক্ষে খুব উপকারী, অমনি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে ক্লোরোফিলের প্রয়োগ হতে লাগল। এখন এই হুজুগে একটু মন্দা পড়েছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাজারে আর একটা জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'পারমাকেম'। এটা একটা বিশ্বজনীন প্রতিষেধক। এটা আই[illegible] নাইজড্ রূপো এবং অন্যান্য কার্যকরী বস্তু থেকে তৈরি। এর প্রস্তুতকারকেরা মনে করেন যে, এই পারমাকেমের সাহায্যে রোগ বহনকারী ব্যাক্টেরিয়া এবং ছত্রাক যেগুলো সব সময় টুথপেস্ট, প্রসাধনের দ্রব্য, কাগজ, প্ল্যাসটিক, রং, কাপড়, ব্যাণ্ডেজ এবং পোশাকে জন্মায় সেগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হবে। আর এই কারণে মানুষ এখন পারমাকেমের প্রয়োগ সব কিছুতেই চায়।

*

স্বাস্থ্যবিধি পড়ে ছোটবেলা থেকে দাঁত পরিষ্কার রাখার উপকারিতা ও না রাখার অপকারিতা সম্বন্ধে আমরা বেশ সচেতন হয়ে যাই। তবুও আজকালকার দিনের লোকেদের কথায় কথায় দাঁত খারাপ হয় আর কৃত্রিম দাঁত ব্যবহার করতে হয়। জনৈক দন্তবিশারদ বলেন যে যে অনুপাতে ক্রমশই লোকেদের দাঁত খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছে তাতে ৩০০০ খৃষ্টাব্দে বোধহয় কোনও মানুষেরই সুস্থ দাঁত দেখা যাবে না। কী কারণে মানুষের দাঁত এত খারাপ হচ্ছে তার কারণ নির্ণয় করতে না পারলে আর এই ক্ষয়িষ্ণু দাঁতের উদ্ধার সাধন সম্ভব নয়। বর্তমানে রেডিও এ্যাক্টিং আইসোটোপস্ ও ইলেক্ট্রোন্ মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দাঁত সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। অনেককাল ধরেই লোকে জানে যে, দাঁতের এনামেল মৃত টিস্যু, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, এতে অনেক জীবন্ত পদার্থও আছে। এই আবিষ্কার থেকে দাঁতের ক্ষয় বন্ধ করার একটি পথ পাওয়া যেতে পারে।

একটা বেহায়া আমোদবাজী

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সব-
…র সকলের. সবচেয়ে বড়ো লাভ
…ছে যদেচ্ছচারিতা। যা কখনো হয়নি
যা এদেশে ছিল না তারই মস্ত
…শে নানাজনের উৎকট ঝোঁক দিকে
… দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এর
…ী প্রকাশ দেখা যায় শিল্পকলা ও
…দের ক্ষেত্রে। রুচি ও শালীনতা
… কোন ভাবনার ধার দিয়েও কেউ
… না, দেশের ঐতিহ্য ও চারিত্রিক
…ষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায় কিনা তাও
… বিচার করে দেখতে চায় না কেউ।
… রকমের বেহায়া ও বেলেল্লাপনাই
… দিতে আরম্ভ করেছে এবং সবচেয়ে
…র্যের বিষয় হচ্ছে যে, জনসাধারণের
পথপ্রদর্শক, যাদের দেখে লোক
…বে তাদেরই আস্কারা ও উস্কানিতেই
… কিছু ঘটে যাচ্ছে। এমনি একটি
…ষ্ঠান হয় গত শনিবার হিন্দুস্থান
… রাজ্যপাল, কলিকাতার মেয়র প্রমুখ
পৌরশ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দের আস্কারায়
হিন্দুস্থান সম্মিলনীর উদ্যোগে।
…কে অভিহিত করা হয় বৃহত্তম
…নুষ্ঠান বলে। আসলে কিন্তু
…ছিল চেহারার মেলা। মাসখানেক
… থেকেই কাগজে কাগজে বড়ো বড়ো
…পন, রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার দিয়ে
…বে জনকতক চিত্রতারকার আগমন-
… জানিয়ে জানিয়ে লোকের কৌতূহল
…আনবৃত্তিকে চাবুকে চাবুকে উস্কে
…য় হয়। খুবই একটা আমোদের
… পাবার আশা দেখিয়ে শহর ও
…তলীর লোককে উচ্চকিত করে
…র পর ২৮শে নভেম্বরের সন্ধ্যা ৬টা
… গেলো হট্টগোল ও উত্তেজনার দাপট
…তে। তারপরের ঘটনা :

"৬টা ১০ মিঃ। প্রচণ্ড হৈহৈয়ের
… দিয়ে অশোককুমার এলেন এবং
…লেন আরও দশ মিনিট অপেক্ষা
…র জন্য, কারণ বম্বের শিল্পীরা গ্রান্ড
…টেলে আটক পড়েছেন। প্রায় সঙ্গে
…ই অশোককুমারের পাশে মঞ্চে এসে
…লেন যশোধরা কাটজু, পীস কান-
…ন ও শশিকলা। ওরা মঞ্চ থেকে
…তেই ওপরে উঠলেন দেব আনন্দ ও
…লা রমানি। দারুণ হৈহৈয়ের আওয়াজ

—শৌভিক—

প্যাণ্ডেলের পিছন দিকে। মঞ্চে চেহারার প্রদর্শনী।

"৬টা ১৫ মিঃ। মাইক টেস্ট হচ্ছে। লোক অধৈর্য। পিছন দিকের গেট ভেঙে অনেক লোক ভিতরে ঢুকে পড়েছে। হট্টগোল, ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি, সন্ত্রাস। বাইরের লোক আটকাবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়লো। ছবি বিশ্বাস মাইকে দাঁড়ালেন "বন্ধুগণ দয়া করে সুস্থির হোন, অভ্যাগতরা সকলে এসে গেছেন। চুপ না করলে অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে পারছি না।" ছবি বিশ্বাসও তাহলে উদ্যোক্তা-দেরই মধ্যে একজন। গোলমাল খাদের দিকে: অনিল বিশ্বাস টাইয়ের ওপরে অস্টারকোট পরা কেমন একটা বেতাল পোষাকে ছবি বিশ্বাসের পাশে এসে দাঁড়ালেন। টাইট-ট্রাউজার আর কাউবয়-শার্ট পরা বালিগঞ্জী আমেরিকানরা মঞ্চের ধারে, এপাশে-ওপাশে: মার ডান হাতে ঘড়ি-পরা পর্যন্ত। ওদেরই মধ্যে রয়েছেন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা, ভলান্টিয়াররা। তারকাদের চেহারা দেখতে এসে নিজেদের চেহারা দেখাবার দৃষ্টান্ত সারা প্যাণ্ডেলে ঝলমল করছে।

"৬-২০ মিঃ। কর্তৃপক্ষের একজন ঘোষণা করলেন: "আপনারা যে যার জায়গায় বসে পড়ুন, টিকিট চেক করা হবে।" গোলমাল বাড়লো। "আপনারা বসে পড়ুন, বসে পড়ুন, টিকিট হাতে নিয়ে........"

"৬-২৫। গোলমাল অবিরাম।

"৬-৩৫। লোক ধৈর্য হারাচ্ছে। ঘন ঘন হাততালি, অনুষ্ঠান আরম্ভ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য। অশোককুমার মঞ্চে উঠে পর্দা ফাঁক করে একবার ভিতরে গিয়েই বেরিয়ে এসে বললেন: 'ভিতরে যাওনের প্র্যাকটিস হচ্ছে। নমস্কার। প্রথমেই হোঁচট খেলাম। আমি সাহিত্যিক নই, বক্তাও নই। বহুদিন বাঙলার বাইরে বলে ভাষার ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। অনিল বিশ্বাস গাইছেন......"অতিথি এসেছে দ্বারে—কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাকে প্রধান অতিথি করার জন্য। এমনি ধারা আরও ফাংকশান হোক, যাতে সারা ভারতের সব জায়গার শিল্পী হতে পারেন, তাতে শিল্পীমন সার্থক হবে। শিল্পীদের ধন্যবাদ যাঁরা এসেছেন, ধন্যবাদ কলকাতার অতিথিপরায়ণ কলাবিদদের, যাঁদের সৌজন্য চিরকাল দেখে আসছি এবং ভবিষ্যতেও দেখবো। ধন্যবাদ।"

"৬-৪০। মহিলা গলায় অনুরোধ হট্টগোল থামাবার জন্য। ঘোষণাঃ ছায়া-নাট্যঃ পরিচালনা তাপস সেন, গান আশা ভোঁসলে ও মানা দে। 'হমদর্দ'এর গান, লেখা ও সুর অনিল বিশ্বাসের, এখানে তবলাও বাজাচ্ছেন অনিল বিশ্বাস। এক একটা ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছায়া পর্দায় আর সেই সঙ্গে গান। ৬-৫০শে শেষ।

"৭-৩। সেই মহিলা কন্ঠের ঘোষণা। "বম্বের শিল্পীরা নিজেদের পরিচয় দেবেন।" বম্বের শিল্পীরা মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে। রোগামতো একজন ম্যাজিক দেখাবেন বলে অনিল বিশ্বাসের চোখ বেঁধে দিলেন, তারপর ইঙ্গিত করে সামনে দাঁড় করালেন যশোধরা কাটজুকে এবং যশোধরার হাত থেকে একটা জিনিস নিয়ে অনিল বিশ্বাসের কাছে জানতে চাইলেন, বস্তুটি কি? অনিল কিচির-মিচির শব্দ করলেন। ম্যাজিশিয়ান বললেন অনিল ঠিক বলেছে, যশোধরার হাতে অমুক জিনিস। এইভাবে এক একজন শিল্পীকে সামনে এনে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—যশোধরার পর দেব আনন্দ, শীলা রমানি, শশিকলা, তালাত মামুদ, পীস কানওয়াল, সুরেন্দ্র, এস ব্যানার্জি, রাম সিং। ম্যাজিশিয়ানের নাম জানা গেল আনন্দ পাল—কে এবং কি করেন ভদ্দরলোক?

৭-১৫ মিঃ। মহিলা কণ্ঠ ঘোষণা করলেন। বম্বের সিনে মিউজি-শিয়ান্স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পি বালসারার পরিচালনায় অর্কেস্ট্রা আরম্ভ হলো। মাইক বসানোর দোষে বদ আওয়াজ বের হচ্ছে। বিলিতী ধাঁচের বাজানো। কর্কশ হারমোনিয়াম। ওপাশে মঞ্চের ডান দিক থেকে একজন সার্জেণ্ট এক ব্যক্তিকে গলা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বম্বের শিল্পীদের পর স্থানীয় শিল্পীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো না কেন?—বড়ো অপমানজনক ব্যাপার স্থানীয় শিল্পীদের পক্ষে। ভলাণ্টিয়াররা দৌড়ো-দৌড়ি করে গেটের দিকে যাচ্ছে। পিছনে ইট ছোঁড়ার শব্দ।

"৭-২০ মিঃ। কর্তৃপক্ষের একজন মাইকে বলছেনঃ "আমাদের পুলিস ও আপনারা যাঁরা পয়সা দিয়ে অনুষ্ঠান দেখছেন, তাঁরা আমাদের সাহায্য করুন। আপনারা সাহায্য না করলে ইট ছোঁড়া বন্ধ করা যাবে না এবং আমাদের তা বন্ধ করতেই হবে।" কি সাংঘাতিক কথা! প্যাণ্ডেলের ভিতরে তখন প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া। শঙ্কিত চাঞ্চল্য। পাঁচ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা টিকিটের দাম। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কখনো কোন ব্যাপারে একটি দিনের অনুষ্ঠানে টিকিটের এতো বেশী দাম শোনাই যায় নি—কিন্তু তবুও শ্রোতাদের নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই!

"হট্টগোলের মধ্যেই তালাত মামুদ গান আরম্ভ করলেনঃ 'মহব্বৎ তরীক'—শ্রোতৃমণ্ডলীঃ 'বাঙলা, বাঙলা'......কিন্তু গানে তালাত বিরত না হওয়ায় বাঙলার দাবী চুপ। ইট পড়ার আওয়াজ। ৭-৩০শে গান শেষ। এনকোরের প্রবল ধ্বনি। তালাত আবার গাইবেন বলে ঘোষণা করা হলো। ইটের শব্দ অবিরাম। হট্টগোল তীব্র। মাইকে ঘোষণাঃ 'আরও লাউডস্পীকারের বন্দোবস্ত হচ্ছে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। আপনারা একটুও গোলমাল করবেন না।' ইট পড়েই চলেছে।

"৭-৩৫ মিঃ। ঘোষিত হলো যে, বম্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্যাক্সোফোন প্লেয়ার মিস্টার রাম সিং, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট সিনে মিউজিশিয়ান্স এসোসিয়েশন, 'বহু চিত্র পরিচালনা করেছেন অর্থাৎ সুর দিয়েছেন' তিনি তাঁর বাজনা শোনাচ্ছেন। পিয়ানো বাজাচ্ছেন পি বালসরা; ইনি ১০ বছর অনিল বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করছেন, রাম সিং কাজ করছেন ১৮ বছর। বিলিতী গৎ বাজাচ্ছে, মাইক বসাবার ত্রুটিতে তাও বিকৃত শোনাচ্ছে। ইট পড়ার আওয়াজ নেই। সেই বিলিতী গৎই চলছে। ডানদিকে একটা গোলমাল। লোক কৌতূহলী, কলরবমুখর। স্থানীয় শিল্পীর কজন এলেন। পিছনে আবার ঢিলের শব্দ নিয়মিত তালে। অগাধ ধৈর্য শ্রোতাদের। স্যাক্সো-ফোন থামাবার জন্য হাততালি...... 'নো মোর, নো মোর'......ঢিল পড়া বাড়লো, পিছনে হট্টগোলও।

...বলে ঘোষণা হতেই বিপুল উল্লাসধ্বনি। পিছনদিকে উন্মত্ত উত্তেজনা। পাঁচ টাকার পিছনের সারি এতদূর যে মঞ্চের ওপর কিছু দেখা যায় না; লোকে চাইছে চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়াতে, উবু হয়ে ওর ওপরে বসতে, চেয়ার নিয়ে নাড়ানাড়ি নাচ দেখার সুবিধের জন্য...... পাঁচ টাকার টিকিটও বৃথা যাবে। ঢিল পড়ছে ধপাধপ। বেজায় গরম। ঢিল পড়া বাড়ছেই। পাশ থেকে এ্যাডভান্সের আগরওয়ালা বললেন, 'ব্যাপার শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম পাতার খবর না হয়ে দাঁড়ায়।'

৭-৫০ মিঃ। শশিকলা মঞ্চের ওপর দু-এক পদ নেচেই থেমে বেরিয়ে গেলো। রেকর্ড বাজছে বিলিতী গৎএর মতো। আবার এলো নাচতে নাচতে। রেকর্ডে গান হচ্ছে "ছম ছম ছম বাজে পায়েল" আবোল তাবোল হাত-পা দোলানো সার—তার ওপর লচকানো ছিনালী—হৈ হৈ আর থামবে কি? কতক লোকের পুলকোচ্ছ্বাস, কতক টিটকারি। কুৎসিত কোমর দোলানো বালিগঞ্জের নাকি বিশেষ রুচিবোধ, তাই ......'শেম, শেম......' ধপাধপ ঢিল আওয়াজ।

৭-৫৫ মিঃ। মাইকে আবেদন। 'আপনাদের কাছে আমাদের জোড়হাতে নিবেদন, আমরা গেটে গেটে স্পীকার বন্দোবস্ত করছি আপনাদের জন্য আপনারা দয়া করে চুপ করুন।' গেটে গেটে স্পীকার অর্থাৎ বাইরের লোকের জন্য, কিন্তু সে ঘোষণা ভিতরের লোকের কাছে কেন?...'আপনাদের গান শোনাবার ব্যবস্থা করছি......' —গোড়া থেকে তা করলে তো ঝামেলাই থাকতো না।

"৮টা। —'এবারে, এবারে আপনাদের গান শোনাবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়' প্রচণ্ড উল্লাসের বিস্ফোরণ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাঙলারই আর্টিস্ট, যদি তিনি অনেকদিন বম্বেতে রয়েছেন। পর্দা সরতেই হেমন্তকে উল্লাসে অভিনন্দন......নানা ফরমাশ, বোঝা যায় না। লোকের চেঁচানিতে হেমন্ত এগিয়ে এসে বসলেন ... গোলমাল থামলো তাতে......ফরমাশের অন্ত নেই। হেমন্ত উঠে মঞ্চের ওপরে চেয়ার সাজিয়ে তার ওপর হারমোনিয়াম রেখে উঁচু হয়ে

৭-৫৮ মিঃ। শশিকলার নাচ হবে বলতেই খুশীর কলরব......বোঝা গে

...নের লোক হেমন্তকে দেখতে পাচ্ছিল ...লেই গোলমাল। অনিল বিশ্বাস ...লেনঃ 'আপনারা হেমন্তবাবুকে তাঁর ...মতো গান গাইতে দিন। তা নয়তো ...ন্তবাবুর নিজের অনেক কিছু ...বার থাকতে পারে, তা আপনারা ...তে পারেন না।' হেমন্ত আরম্ভ ...লেনঃ 'পাল্কী চলে—' সব চুপ। ...স্তব্ধতায় মনে হচ্ছে না হাজার দর্শক ...রের বিরাট প্যান্ডেল, মনে হচ্ছে ...ট বৈঠকখানায় গান হচ্ছে। মাঝে মাঝে ...র শব্দ, অল্প। হেমন্ত চমৎকার ...রে গাইছেন। এই গানটা নিয়ে ...লা ছোট ছবি তো বেশ হয়— অমন ...র দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ...র চুপচাপ। গানখানি শেষ হলো... ...ড হাততালি।

৮-১০ মিঃ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ...নের কানে কি বলে গেলেন। ...ম্ভ হলো—'জাগ দরদে ইস্‌ক ...জাগ'.....উল্লাসধ্বনি উঠেই চুপ। ...—ঢিলও পড়ছে না.....বাইরে গেটে ...মাইক দেওয়া হয়েছে? ভারি ...ছেন হেমন্ত। অচঞ্চল শুনছে ...ই একেবারে খাদের সুরও স্পষ্ট। ...তে গান শেষ, প্রচন্ড হাততালি। ...র গাইবার জন্য অনুরোধ সবখান ...। এপাশ-ওপাশ থেকে কথা উঠছে ...'জাল' বলে। 'জাল' বলে ...র। আরম্ভ হলো "এ রাত এ ...'..." বেগে হাততালি উঠেই স্তব্ধ। ...নিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলী। ঢিল পড়ারও ...নেই। 'লহেরো কি হেঁটে পে...... ...রো কি হেঁটে পে'...হেমন্ত আমতা ...করছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী থেকে ...র কথা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ...।...একজন মঞ্চের সামনে কি ...লেন, বোধ হয় ঠিক হলো না......... ...থেকে শ্রী বেলা মুখোপাধ্যায় এসে ...কানে বলে দিয়ে গেলেন। গান ...লো, 'লহেরো কি হেঁটে পে ঢিমা ...রাগ হায়' গান চললো। থামতেই ...র প্রচন্ড হাততালি এবং আরও ...র জন্য অনুরোধ।

৮-২০ মিঃ। মাইকে কর্তৃপক্ষ ...নুরোধ করছেন ভলান্টিয়াররা যেন ...স না থেকে কাজ করে যান।......'এবার আপনাদের নৃত্য দেখাবেন শিল্পী গোপাল রেড্ডী, তিনি আপনাদের কথাকলিতে ময়ূর-নৃত্য দেখাবেন......তিনি এখন বম্বের অধিবাসী।' ঢিলের শব্দ আবার। গেটে কি স্পীকার বসেছে?

৮-৩০ মিঃ। মিনিট তিনেকে নাচ শেষ হলো হাততালির সঙ্গে।

৮-৩৩ মিঃ। 'এবার আপনাদের কাছে আসছেন বম্বের গায়ক-অভিনেতা সুরেন্দ্র।' সামনে দিয়ে বড়ো বেশী লোক চলাচল করছে। ভলান্টিয়াররা ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। মাইক বলছেঃ 'এটেনশন প্লিজ। মিস্টার পঞ্চানন ঘোষাল টু রিপোর্ট বালিগঞ্জ ও সি।' প্যান্ডেলের চালায় দুপদাপ ঢিল। মাঝে দীর্ঘ বিরতিতেই গোলমাল বাধে যতো।

৮-৩৫ মিঃ। অবিরাম ঢিল। লোক শঙ্কিত, অধৈর্য। গান আরম্ভ হলো, 'তেরী ইয়াদ কা দীপক জ্বলতা হায়।' গোলমাল একটু চুপচাপ। ঢিলের দুপদাপ কম। একটা স্পীকার কাঁধে করে গেটের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুপদাপ। ৮-৪৩শে গান শেষ, মৃদু হাততালি। ক্ষীণ রব 'আর একখানা', কিন্তু আর হলো না। মাইকের গলাঃ 'পঞ্চানন ঘোষাল কে আছেন, বালিগঞ্জের ও-সি ডাকছেন গেটে। পঞ্চানন এ-সি, গেটে বালিগঞ্জের ও-সি ডাকছেন, গেটে যান। হরেন পাকড়াশী বাড়ি চলে যান, বাবার খুব অসুখ......হরেন পাকড়াশী...

'৮-৪৫ মিঃ। 'এবার আপনারা শুনতে পাবেন, বম্বের প্রখ্যাত শিল্পী আশা ভোঁসলে এবং তারপর শুনতে পাবেন তালাত মামুদ ও আশা ভোঁসলের দ্বৈত গান। আশা গাইছেনঃ 'বাঁব প্রীতি ফুলডোর'। চুপচাপ লোক। মাঝে মাঝে তারিফের গুঞ্জন। তবুও ঢিল। অনিল বিশ্বাস তবলা, বালাসর হারমোনিয়ম। পিছন দিকে মোটর ইঞ্জিনের শব্দ, লোকে ফিরে দেখছে ব্যাপার কি। পাঁচ মিনিটে গান শেষ। মেসিনগানের মতো অবিরল তালে ঢিল পড়ছে মাথার চালে। বাইরে আট-দশজন ইতিমধ্যেই মাথা ফাটিয়েছে—প্যান্ডেলের ভিতরের খবর। প্রচন্ড ইষ্টক-বৃষ্টি চতুর্দিক থেকে। শ্রোতৃবৃন্দ চঞ্চল, সন্ত্রস্ত.....ভীষণ চেঁচামেচি। মঞ্চের ওপরে সবাই দাঁড়িয়ে উঠছে, পর্দা বন্ধ

হলো, উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে সকলে। বেজায় ধুপধাপ। অনুষ্ঠানের অবস্থা অচল। কিন্তু আরম্ভ করলেই তো হতো! শিল্পীদের মহলে বেশ চাঞ্চল্য। বম্বের শিল্পীরা চলে যাচ্ছে যেন। অনুষ্ঠান কি এখানেই খতম; সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা। মাইকের একটা দিক অক্ষম হয়ে পড়েছিল; মাইক টেস্ট হচ্ছে।......"লেডীজ অ্যান্ড জেন্টল-মেন"......'বাঙলায় বলুন......"আপনারা ভদ্রমহোদযরা যে যার আসনে দয়া করে বসুন। এবার শিল্পী-পরিচিতি আপনাদের সামনে উপস্থিত হবে। দয়া করে চুপ করেন তো কাজ আরম্ভ হবে। তরুণ বন্ধুগণ, আপনাদের কাছে কর-জোড়ে নিবেদন......ভদ্রমহোদয় ও মহিলা-বৃন্দ ও তরুণ বন্ধুগণ, আপনারা যে যার আসনে বসে থাকবেন, কেউ বাইরে যাবেন না। বাইরে যে গোলমাল হচ্ছে, তা পুলিস ও স্বেচ্ছাসেবক আয়ত্তে আনছেন। এবারে আপনাদের বাঙলাদেশের শিল্পী-দের সামনে হাজির করানো হচ্ছে।" স্বরটা চেনা। পর্দা সরতেই সামনে মাইকে দাঁড়িয়ে পরিচালক সুশীল মজুমদার আর শিল্পীবৃন্দ। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো—মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, মায়া মুখার্জী, নীলিমা দাস, স্বাগতা চক্রবর্তী, কবিতা সরকার, সুদীপ্তা রায়, সুমনা ভট্টাচার্য, শ্রীমান ছবি বিশ্বাস......(হো হো হো)। 'এর পর আমাদের অন্যান্য প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে, একটু পরে, দয়া করে।' অনেক আগেই এই শিল্পী-পরিচিতি করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, বম্বেরই সঙ্গে। এরা মাদ্রাজের শিল্পীদের আনান নি কেন? ৯-১০ মিঃ। রাজ্যপালের নাম প্রধান অতিথি হিসেবে রয়েছে, আরো রয়েছেন মেয়র নরেশ মুখার্জী প্রভৃতি শহরের বহু গণ্যমান্য লোকের নাম। এরা কেউই এলেন না কেন? আগরওয়ালা খবর নিয়ে এলো বাইরে কাঁদুনে-গ্যাস ছাড়া হয়েছে।

৯-১৫ মিঃ। "মীরা মজুমদারকে সুধীর বসু ডাকছেন স্টার এনট্রান্স গেটে, আপনি চলে যান।' গলাটা নীলিমা সান্যালের। একজনকে মাথা ফাটানো অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভিতরে মৃদু হট্টগোল, ধৈর্য আর থাকে না। ঢিলের ধুপধাপ আর নেই। অনেকে ফোড়ে গোছের লোক নিরর্থক ব্যস্ততায় ঘোরাঘুরি করছে; সব আসরেই ওরা অমনি ঘুরে বেড়ায়, কে জানে কি করে? 'এবার আপনাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দ্বৈত গান শোনাবেন তালাত মামুদ ও আশা ভোঁসলে।' মনেই ছিল না ওদের গানের কথা। বাঙলা গানের জন্য চীৎকার। গান আরম্ভ "রো রো বিত্তা জীবন সারা"—লোক চুপ। অনিল তবলা, রাম সিং স্যাক্সোফোন, বুলসারা পিয়ানো। ৯-২৫ শেষ। তারিফ, হাত-তালি। আবার বাঙলার জন্য কলরব। কিন্তু আরম্ভ হলোঃ 'এ্যায় মেরে দীল'। হাততালি, চুপচাপ। দুপাশে দাঁড়িয়ে বহু লোক, তার মাঝে মাঝে লাল পাগড়ীও। ঢিল নেই।

৯-৩৩ মিঃ। ঘোষণাঃ 'মীরা মজুমদার কে আছেন, তাঁকে নিতে এসেছেন সুধাময় বসু, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ম্যাগনোলিয়ার স্টলে......মীরা মজুমদার। এবারে গান শোনাবেন বম্বের আর একজন বিখ্যাত শিল্পী মানা দে। লোক উল্লসিত। গান 'দুনিয়াকে লোগোঁ কো হিম্মৎ সে কাম।' তবলা অনিল বিশ্বাস। বাঙলার জন্য অনুরোধ, 'পরিণীতা' বলে ফরমাশ। আরম্ভ হলোঃ "বলি রাধে রাণী"। আরও অনুরোধ। এবার হলো "কতদূর আর নিয়ে যাবে বলো।" পিছনে কে যেন চেয়ার ভেঙে পড়লো। গান তবুও জমলো খুব।

৯-৫০ মিঃ। মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা ভলান্টিয়ার ঘোরাঘুরি করছে কয়েকজন। —"এতক্ষণ আপনারা বম্বের শিল্পীদের নাচ-গান দেখলেন শুনলেন, এবারে আপনারা বম্বের শিল্পীদের গান শুনুন প্রথমে গাইছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।" দশটা বাজতে দশ। ক্ষিধে পাচ্ছে, কিন্তু দাম চতুর্গুণ। ঘোষণা "গদাধর দাসকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া থেকে এসেছেন। রঞ্জনা, এনা, সরস্বতী, পাপড়ি আপনাদের ম্যাগনো-লিয়ার সামনে খুঁজছেন। কল্যাণ রায়, পানু চ্যাটার্জি খুঁজছেন......" নারীকণ্ঠ ঘোষণা করে যাচ্ছে অনর্গল।

৯-৫৫ মিঃ। প্রতিমা গাইছেন 'মোরি নগরীয়া'। এখনই লোকের যতো চলা ফেরার সময়। দশটায় আর একখানির জন্য অনুরোধ......'জিন্দগী উসিকী হ্যয়'। বেশ তারিফ হলো। যন্ত্রের বিনা আড়ম্বরে শুধু হারমোনিয়ামেই তো এঁরা বেশ গাইতে পারেন। ...'হ্যালো, হ্যালো......এবার গাইবেন অখিলবন্ধু ঘোষ।' লোকে অটোগ্রাফের জন্যে ঘোরা-ফেরা করছে। 'মীরা চৌধুরী, পুতুল চৌধুরী আপনাদের খুঁজছেন, আপনা-দের বাপ-মা নিতে এসেছেন .. আর গদাধর দাস আপনাকেও যেতে বলা হচ্ছে। গান আরম্ভ 'ধীরি ধীরি ঝর্ণা বহে'। চমৎকার। শেষ হতে অনুরোধ। এবারে হলো 'আজি চাঁদিনী রাতে গো'। বাঙলা গানের পাশে হিন্দী গান! বাঙলার শিল্পীদের ওপর ছবি তোলার ফ্লাশ পড়ছে না, যেমন পড়ছিলো বোম্বাইদের ওপর ঘনঘন।

১০-১৫ মিঃ। শক্তিকুমার ব্যানার্জিকে খুঁজছেন......এবারে গান শোনাবেন সাবিত্রী ঘোষ।' অটোগ্রাফের জন্য ঠেলাঠেলি, ভীড়। অনেক লোক চলে যাচ্ছে। বম্বের শিল্পীরা তো কোন-কালে ভাগলবা। ও'রা এসেছিলেনই-বা কেন? ......'স্বরাজ ঘোষকে মঞ্জু দে ডাকছেন...'পর পর আরও ক'টি লোক খোঁজার ঘোষণা। ১০-২০তে গান 'রঙিলে কনইয়া'। এমন মিষ্টি গলা ক'জনের? কিন্তু লোক উঠতির মুখে। পরে অনুরোধে আরও ক'খানি গান 'কত কথা প্রাণে জাগে।'

১০-৩০ মিঃ। আমাদের...শৈলবালা গুহ, কৃষ্ণা গুহ আপনাদের ডাকছেন। পর পর অনেকের খোঁজা খুঁজি।........ 'ভলান্টিয়ারদের বলছি মানা দে'র গানের খাতা পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ পেলে দিয়ে যাবেন। ...এবারে আপনারা শুনে খুশি হবেন বীরেন ভদ্র আপনাদের সামনে আসছেন।'

১০-৩৫ মিঃ। —'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি বলছি বিরূপাক্ষের দপ্তর থেকে বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে আবির্ভূত হলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'আমার নামে বদনাম

ম নাকি মেয়েদের নামে...... আরম্ভ করলেন মেয়েদের ঠাট্টা করে ক হাসানো—হাসিতে সারা প্যাণ্ডেল ট পড়লো। হাসির হুল্লোড়। -৪৫শে শেষ। এখন প্রায় সবই বাঙালী , পুরুষ শ্রোতা। —'এবারে গান াবেন শ্যামল মিত্র। এখানে একজন ণ্টিয়ার মননকুমার সরকার, তার কাছে দে'র গানের খাতা আছে, দিয়ে যান।' পর চললো অমুককে অমুক ছেন ম্যাগনোলিয়ার ধারে। চললো য়েয়ে। গান আরম্ভ 'পথেই মোর ী।' বাঙালী আসর। এই সব আসরে লার শিল্পীদের কেমন মান দেয় নারা? বাঙলার শিল্পীরা আসেন এমন সব আসরে? খুবই সুজন ও'রা তেই হবে। বাইরের যাঁদের নাম ঘোষণা হয়েছে, তাঁদের তো অনেকেই সনি। ১০-৫০শে শ্যামলের দ্বিতীয় 'ভাইরে গংগা ঔর যমুনাকি'। লোক ই যাচ্ছে, কিন্তু গানটি হচ্ছে চমৎকার ও। গানের মাঝে এভাবে চলে-যাওয়া দের বড়ো অপমানজনক। আবার অমুক অমুককে ডাকছেন...অনেক ...উত্তপ্ত করে তুলছে মেজাজকে... ঠান থামিতে অমনি করে লোকের ঘোষণা করা......

১১টা। "এবারে আসছেন আপনাদের সুপ্রভা সরকার।" আবার সেই খবর। গান আরম্ভ হলো, 'তুমি কোন্ বাজালে বীণা'—ভারী জনপ্রিয় গান, আসর আরও ভাঙছে। অথচ বম্বের শিল্পীর এমন গলা আছে? র শিল্পীরা সবাই অমন প্রাণঢেলে রে গাইছেন, কিন্তু তাঁদের আর কই? দ্বিতীয় গান হলো, 'অন্তরে নাই।' প্রাণের অনুরাগে এ'রা গেয়ে যাঁরা আসর ছেড়ে চলে গিয়েছেন, জানতে পারলেন না, কি খুইয়ে ন।

১১-১৫ মিঃ। আবার সেই খোঁজ- । লোক ঠাট্টা ও বিরক্তি প্রকাশ । এবারও একগাদা নাম। বিরক্ত হয়ে লোক চলে যাচ্ছে। নাম তবু শেষ না, কতো অদ্ভুত নাম......আত্মারাম, মিত্র, ইত্যাদি...মানা দে'র খাতাটা শংকর মুখোপাধ্যায়ের কাছে দিয়ে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে...।' চললো ডাকাডাকি।

১১-১৮ মিঃ। এর পর গান শোনাতে এলেন নিখিল সেন—'মরমীয়া বাঁশী গো।'

'১১-২৮ মিঃ। 'এবারে গান শোনাবেন মানব মুখোপাধ্যায়।' লোকের মধ্যে কোন অনুরাগ নেই। তবুও অনেকে বসে আছে যদি আকস্মিকভাবে কিছু একটা এসে যায়। অবশ্য যাঁরা আছেন, শুধু ঐ পাড়ারই বা আশপাশের লোক, দূরের যাঁরা চলে গেছেন আগে। মানবকে হাততালি আর অনুরোধ করে আর এক-খানা গাওয়ানো হলো 'ছোড় দে'। ১১-৪০শে শেষ। আবার লোকের খোঁজখবর...'এবারে আসছেন ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।'—আবার নাম ডাকা। গান চললো 'ভালা তুমসে টক্‌রায়েগা'...অনেকদিন পর ধীরেন্দ্র মিত্র আরম্ভেই জমিয়ে দিলেন। গানের পাশ ঘে'ষে মাইক থেকে নীলিমা সান্যালের হাসির শব্দ ভেসে আসছে। কমপ্লিমেণ্টারির জায়গা প্রায়-খালি। আর কতক্ষণ চলবে? প্রায় ভাঙা হাট। অনুরোধে ধীরেন্দ্র মিত্র গাইতে লাগলেন 'শাওন আসিল ফিরে'। রাত বারোটা, এবারে উঠতেই হলো; লোক সব ঝিমিয়ে বসে আছে।'

* * * *

বাইরে আসতেই নজরে পড়লো গেটে, রাস্তায় পুলিশ ও সার্জেণ্ট ছড়াছড়ি। রাস্তায় চতুর্দিকে ইট-পাথর ভাঙা, কাঁচ ছড়াছড়ি। গেটে গেটে স্পীকারের সামনে নিরীহ শান্ত লোক দাঁড়িয়ে শুনছে। বাসে উঠে দূর থেকে হিমে ভেসে আসছে 'শাওন আসিল ফিরে, সে তো ফিরে এলো না'—শাওন ফিরে আসুক শিল্পি-গণকে দরদী করে তুলে; বাঙলার শিল্পীরাও এমনিই সুজন থাকুন চিরদিন, কিন্তু এমন বেহায়া আমোদবাজী আর যেন ফিরে আসে না কোনদিন।

* * * *

পরদিন সকালের কাগজে দেখা গেল, জনবারোর মাথা ফেটেছে, জনষাটেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাঁরা বাইরে গোলমাল করছিল। কিন্তু যাঁরা লোককে নাচিয়ে, উস্কানি দিয়ে উত্তেজিত করে ব্যবসা করবার জন্য এমন কেলেংকারির মুহূর্ত পাকিয়ে তুললেন, তাঁদের কি কোন দোষই নেই?

ক্রিকেট

ভারতের জাতীয় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ রাজ্যেরই ক্রিকেট পরিচালকগণ রাজ্যের সুনাম রক্ষার জন্য বহু পূর্ব হইতেই দল গঠনকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সকল পরিচালকগণের প্রচেষ্টা যে একেবারেই ব্যর্থ হয় নাই তাহা বিভিন্ন সমাপ্ত রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল হইতেই উপলব্ধি করা চলে। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ চিরকাল শেষ সময় দল গঠন করিয়া থাকেন। সুতরাং এইবারেও তাহা হইবে। এখনও পর্যন্ত এই বিষয় কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিতে না দেখিয়া এইরূপ ধারণা না করিয়া পারা যায় না। ইহাতে ফল হইবে এই যে, প্রতি বৎসরের ন্যায় বাঙলার দল ঠিক উপযুক্ত খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত হইবে না। এমনকি দলের খেলোয়াড়গণও পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে বিশেষভাবে বোঝাপড়া করিবার কোনই সুযোগ পাইবে না। ইহার যে প্রয়োজনীয়তা আছে ইহা বহুবার বহুভাবে উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু বাঙলার পরিচালকগণ তাহাতে একেবারেই কর্ণপাত করেন নাই। সেইজন্য এইবারে কিভাবে ও কোন্ সময় ইঁহারা দল গঠনে প্রবৃত্ত হইবেন তাহাই দেখিবার আশায় রহিলাম।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার যে সকল খেলা এই পর্যন্ত মীমাংসিত হইয়াছে তাহার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

(১) গত বৎসরের রণজি কাপ বিজয়ী হোলকার দল এক ইনিংস ও ২৪৫ রানে মধ্যপ্রদেশ দলকে পরাজিত করিয়াছেন।

মধ্য প্রদেশ ১ম ইনিংস—৭২ রান (অর্জুন নাইডু ৩৪ রানে ৫টি, এন ধানওয়াড়ে ৯ রানে ২টি উইকেট পান)

হোলকার ১ম ইনিংস ঃ—৪৬৪ রান (হীরালাল গাইকোয়াড় ৯১, মুস্তাক আলী ৯০, রঙ্গনেকার ৮৬, ধানওয়াড়ে ৬৪, অর্জুন নাইডু ৪৪, সালে ১৯১ রানে ৬টি, রহিম ৮০ রানে ৩টি উইকেট পান।)

মধ্যপ্রদেশ ২য় ইনিংসঃ—১৪৭ রান (সালে ৪৩, কেলকার ৩৯, এইচ গাইকোয়াড় ৩১ রানে ৩টি, সারভাতে ৩৮ রানে ২টি, অর্জুন নাইডু ৩৫ রানে ২টি উইকেট পান।)

(২) ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন প্রথম ইনিংসের খেলায় হায়দরাবাদ দলকে পরাজিত করে। খেলার ফলাফলঃ—

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ১ম ইনিংসঃ—২৪০ রান।

হায়দরাবাদ ১ম ইনিংসঃ—১২৫ রান।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ২য় ইনিংসঃ—৪ উইঃ ১৭১ রান।

হায়দরাবাদ ২য় ইনিংসঃ—৪ উইঃ ১৬৪ রান হয়।)

মহীশূর দল ৮ উইকেটে অন্ধ্র দলকে পরাজিত করিয়াছে। ফলাফল ঃ

খেলার মাঠে

অন্ধ্র—১ম ইনিংস—১৫০ রান (রামরাও ৪২, এস নাইডু ৩৩, সি এস নাইডু ২১, কস্তুরী রঙ্গ ৪৭ রানে ৩টি, আদিশেষ ১৬ রানে ২টি, ইঞ্জিনীয়ার ২৩ রানে ২টি উইকেট পান)

মহীশূর—১ম ইনিংস—২৯০ রান (ইঞ্জিনীয়ার নট আউট ৬১, সি এস নাইডু ১১৩ রানে ৬টি উইকেট পান)

অন্ধ্র—২য় ইনিংস—১৮৮ রান (সি কে নাইডু ৭৪, রাজু ২৮, কৃষ্ণা ৫১ রানে ৪টি, ইঞ্জিনীয়ার ৬৫ রানে ৪টি উইকেট পান)

মহীশূর—২য় ইনিংস—২ উইঃ ৪৯ রান।

গুজরাট প্রথম ইনিংসের খেলায় সৌরাষ্ট্র দলকে পরাজিত করিয়াছে। ফলাফল ঃ—

গুজরাট—১ম ইনিংস—২২৫ রান (দীপক সোধন ৬৯, জে সোধন ২৮, নরোত্তম ৯২ রানে ৫টি, নায়ালচাঁদ ৬০ রানে ৩টি উইকেট পান।

সৌরাষ্ট্র—১ম ইনিংস—২০৭ রান (সেলিম ১০৮, জসু প্যাটেল ৫৭ রানে ৬টি দীপক সোধন ৭৪ রানে ২টি উইকেট পান)

গুজরাট—২য় ইনিংস—(৮ উইঃ) ৩৬০ রান (পামনমল ১০০, দীপক সোধন ৭৮, কদম ৪০ রান নট আউট, লাম্ভা ৯৫ রানে ৩টি, নরোত্তম ১৭০ রানে ৩টি, নায়ালচাঁদ ৮৮ রানে ২টি উইকেট পান)

সৌরাষ্ট্র—২য় ইনিংস—(৯ উইঃ) ১৯২ রান (খাঁ ৫৪ রানে ৩টি, এম ভাট ৬০ রানে ৩টি উইকেট পান)

রজত জয়ন্তী বনাম রাজস্থান রাজপ্রমুখের দল

জয়পুরে ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের সহিত রাজস্থান রাজপ্রমুখের একাদশের তিনদিনব্যাপী এক ক্রিকেট খেলা হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। উভয় দলের ব্যাটসম্যানগণ প্রথম ইনিংসে খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে রজত জয়ন্তী দলের পক্ষে ফ্লেচার ও রাজপ্রমুখের দলের পক্ষে বিজয় হাজারে উল্লেখযোগ্য ব্যাটিং করেন। উভয় দলই বেশ শক্তিশালী করিয়া গঠিত হয় ও সকলে উন্নততর নৈপুণ্যের খেলা দেখিবার আশা রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলকেই হতাশ হইতে হইয়াছে। প্রথম টেস্ট ম্যাচের খেলায় রজত জয়ন্তী দলের ইনিংস পরাজয় উক্ত দলের ব্যাটসম্যানদের নৈরাশ্যজনক ব্যাটিং করিবার কারণ হইলেও রাজপ্রমুখ দলে উমরিগার, মানকড় প্রভৃতি খ্যাতনামা খেলোয়াড়গণ না খেলিতে পারিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। খেলার ফলাফলঃ—

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল ১ম ইনিংসঃ— ১৯৬ রান (এমেট ৪৭, ফ্লেচার ২৪, ব্যারিক ৫৯, জে এস ঘোড়পাড়ে ৬৪ রানে ৩টি, জাঠের রাজা ১২ রানে ২টি, পি উমরিগার ১৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

রাজপ্রমুখের একাদশ ১ম ইনিংসঃ— ১২৪ রান (বিনু মানকড় ৭৬, বরোদার মহারাজা ১৫, ঘোড়পাড়ে ১৩, লোডার ১৬ রানে ৪টি, বেরী ৫৬ রানে ৫টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল ২য় ইনিংসঃ— ৪ উইঃ ১৪১ রান ডিক্লেয়ার্ড (মার্শাল ২৬, ফ্লেচার ৪১, এমেট ৩৯, মানকড় ৪৬ রানে ২টি উইকেট পান।)

রাজপ্রমুখের একাদশ ২য় ইনিংসঃ— ৫ উইঃ ১১৫ রান (হাজারে নট আউট ৫৯, উমরিগার ১৬, ব্যারিক ১৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

বোম্বাই বনাম রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল

বোম্বাইতে ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল ও বোম্বাই দলের তিনদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলেও উভয় দলেই কয়েকজন খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বোম্বাই দলের আর বি কেনী ও এম ডি ইরাণী এবং রজত জয়ন্তী দলের এস লক্সটন ও বি এ বার্নেটের নাম উল্লেখযোগ্য। আর বি কেনী দলের পতন-মুখে দৃঢ়তার সহিত ব্যাটিং করিয়া ১৪২ রান করিবার পর আউট হন। ইহার সহিত এম ডি ইরাণী খেলিয়া ৬৮ রান করিবার পর আউট হইয়াছেন। শেষ সময় সি টি পতঙ্করের ৪২ রানও প্রশংসনীয় হয়। রজত জয়ন্তী দলের লক্সটন ও বার্নেট উভয়েই শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই খেলায় রজত জয়ন্তী দল ভ্রমণের সর্বাপেক্ষা অধিক রান সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছেন। ইতিপূর্বে হোলকারের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে ৪১৭ রান করেন। কিন্তু এই খেলায় ৭ উইকেটে ৫১০ রান করিয়াছেন। খেলা হিসাবে ইহা বেশ দর্শনযোগ্য হয়। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

বোম্বাই ১ম ইনিংসঃ—৩৩৮ রান (আর কি কেনী ১৪২, এম ডি ইরাণী ৬৮, সি পতঙ্কর ৪২, লক্সটন ৯২ রানে ৫টি, মার্শাল ৫৬ রানে ৪টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল ১ম ইনিংসঃ— ৭ উইঃ ৫১০ রান ডিক্লেয়ার্ড (এস লক্সটন ১২৩, বি বার্নেট ১১৪ রান নট আউট, সিম্পসন ৫৪, মার্শাল ৫১, এমেট ৭৫, মিউলম্যান ৩২, এস ডবলিউ সোহনী ৯২

৩টি, গোভাদিয়া ১১০ রানে ২টি ট পান।)

বোম্বাই ২য় ইনিংস:—৭ উইঃ ১৩২ রান গুপ্ত ২৭, কামাথ ৩৫, গোভাদিয়া ২১, ম্যান ৭ রানে ৩টি, ম্যাককনন ৩২ রানে উইকেট পান।)

বল

ীর্ঘকাল হইতেই বাঙলার ফুটবল পরি-দের কার্যকলাপ সম্পর্কে ভারতের রাজ্যের ক্রীড়া পরিচালকগণ বিশেষ ধারণা পোষণ করেন না। একরূপ ইহার ভারতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন আই শীল্ড প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন ফুটবল দলসমূহের মধ্যে যোগদানের ও উৎসাহ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার পর আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইস্টবেংগল ই এফ এ পরিচালকদের মধ্যে যে আইন শুরু হইয়াছে, তাহাতে যে কি অবস্থা সেই চিন্তায় আমরা অস্থির হইয়া ছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম, সরকারের তরফ হইতে এই দ্বন্দ্ব অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্বে প্রচেষ্টা হইবে। কিন্তু বর্তমানে বলিতে বাধ্য যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি- খেলার মাঠের বিশৃঙ্খলা, দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাধারণ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ করিয়া তুলে, ইহা করিবার মত শক্তিই ইহাদের নাই। ও ব্যায়ামকে সাধারণের সময় ক্ষেপণ বিনোদনের একমাত্র বিষয় ধারণা করিয়া নীরব আছেন, ইহা না বলিয়া আমরা না। ইহা সত্যই দুঃখের বিষয়। ভারতের শ রাজ্য সরকারের কর্ণধারদের মধ্যে সম্পর্কে চিন্তা করিবার অথবা সাহায্য লোকের অভাব নাই, কেবল বাঙলা তাহা বলা চলে না। বাঙলার অত্যন্ত বিষয় যে, সেইরূপ লোকের যথেষ্ট আছে। তাহা না হইলে খেলার মাঠের গণ্ডগোল এইরূপভাবে আদালত পৌঁছিত না। আদালত খেলার মাঠের মীমাংসা করিতে পারে, কিন্তু কখনও রোধ করিতে পারে না। প্রাঙ্গণে উভয়পক্ষ নিজ নিজ বহু কিছুই প্রকাশ করিতে বাধ্য যাহা সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে হওয়া কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে। পরিণাম হইবে এই যে, বাঙলার ফুটবল সারা ভারতের খেলোয়াড় ও ক্রীড়া- মনে যেটুকু শ্রদ্ধা বর্তমান ছিল, চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। এখনও যে এফ এ ও ইস্টবেংগল ক্লাবের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা নাই তাহা নহে, তবে উহা বংগ **সরকারের প্রতিনিধির পক্ষে যত- সহজ হইবে, অন্যের পক্ষে নহে।**

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৩শে নবেম্বর—আজ নয়াদিল্লীতে সংসদের উভয় পরিষদের সদস্যগণের নিকট বক্তৃতাকালে বৃটিশ গায়নার পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ছেদী জগন ও ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী মিঃ বার্নহাম বৃটিশ গায়নার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জনগণের পূর্ণতম সমর্থন কামনা করেন।

আজ লোকসভায় শ্রমমন্ত্রী কর্তৃক শ্রমিক-মালিক বিরোধ আইন সংশোধনকল্পে উত্থাপিত বিলটি বিবেচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, মালিকরা যদি শ্রমিক ছাটাই করেন এবং কলকারখানার কাজ বন্ধ রাখেন, তবে এই বিলে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২৪শে নবেম্বর—আজ লোকসভায় ধুতি (অতিরিক্ত শুল্কে আদায় বিলের আলোচনা-কালে মিলের নির্দিষ্ট "কোটার" অতিরিক্ত ধুতি উৎপাদনের শাস্তি হিসাবে অতিরিক্ত শুল্কে ধার্যের সমালোচনা করা হয়।

রাজ্য পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণাপ্পা জানান যে, ১৯৫৩ সালের আগষ্ট ও অক্টোবরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া হইতে আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের মধ্যে ধুতুরা বীজ পাওয়া গিয়াছে।

২৫শে নবেম্বর—ভারতে বৃটিশ শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনায় লর্ড কর্নওয়ালিশ বৈদেশিক স্বার্থের প্রয়োজনে ভূমি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ১৭৯৩ সালে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন, দেড় শতাধিক বৎসর পর তাহার অবসান সূচিত করিয়া অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ বিল গৃহীত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য বিধান-সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জনসাধারণে প্রকাশের জন্য নহে অথবা বিধান সভায় উহার আলোচনাও হইবার কথা নহে।

২৬শে নবেম্বর—লোকসভায় নবদ্বীপ নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী বিপুল ভোটাধিক্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া নির্বাচিতা হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে একটি বেসরকারী প্রস্তাবের মাধ্যমে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত শিক্ষায়তনসমূহের শিক্ষক-বর্গ সম্পর্কে বেতনের যে স্কেল ও মাগ্গী-ভাতা সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা রাজ্য সরকারের ১৯৫৪-৫৫ সালের বাজেটে কার্যকরী করিবার দাবী উত্থাপিত হয়। উক্ত দাবী সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, গভর্নমেণ্ট সক্রিয়ভাবে ও সহানুভূতির সহিত পর্ষদের উপরোক্ত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করিতেছেন।

২৭শে নবেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ১৯৫৩ সালের জুন মাসে কাশ্মীরে বন্দিদশায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাইয়া একটি বে-সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লোকসভার দক্ষিণ-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীসাধন গুপ্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস, জনসংঘ ও ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী তিনজনকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী সি সি বিশ্বাস অদ্য লোকসভায় পণপ্রথা বন্ধ করিবার জন্য আইন প্রবর্তনের আশ্বাস দেন।

২৮শে নভেম্বর—আজ লক্ষ্ণৌয়ে দেবনাগরী লিপি সংস্কার সম্মেলনে এক বাণী প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু দেশের বিভিন্ন ভাষার জন্য একটিমাত্র লিপির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

২৯শে নভেম্বর—কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ রপ্তানি উপদেষ্টা কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শীঘ্রই সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ভারতের একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনার বিষয় উল্লেখ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ রিচার্ড নিক্সন অদ্য বিমানযোগে মাদ্রাজে উপনীত হন। তিনি বলেন, ভারত-আমেরিকা বিরোধ সম্পর্কে যে সংশয় রহিয়াছে, ভারতে ৫ দিন অবস্থানকালে তিনি তাহার নিরসন করিবেন।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্মোৎসব

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে ভাগল-পুর জেলার কহোল গ্রামের শৈলদ্বীপে পরমারাধ্য শ্রীগুরু কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর জন্মোৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। গুরুপদরজপ্রার্থী শ্রীমৎ নরেশ ব্রহ্মচারীজীর অন্তরের স্বতঃউৎসারিত ভক্তির প্রেরণায় এই উৎসব প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

শুক্লা ত্রয়োদশী হইতে শ্রীকৃষ্ণ রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মহামহোৎসবে শৈল-দ্বীপে আনন্দের নিত্যনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিশাশেষে মঙ্গল আরতির পবিত্র বাদ্যধ্বনি, উদাত্তকণ্ঠের বেদমন্ত্র পাঠ, অসাম্প্র-দায়িক ভগবৎ উপাসনা, সুগায়কের ভজন-সঙ্গীত, মধুর পদাবলী কীর্তন, পূজার্চনা, চণ্ডীপাঠ সহ হোম, গুরুগীতা পাঠ, বাইবেল ও কোরাণ পাঠ, সন্ধ্যারতি সমবেত গুরু-বন্দনা, রামলীলা কীর্তন, প্রত্যহ বাল্যভোগে, মধ্যাহ্ন ভোগে ও সান্ধ্য ভোগে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে সহস্র ব্যক্তি, লক্ষাধিক দর্শনার্থী আসিয়াছিলেন।

ধর্মসভায় শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী অবধূত এম এ কর্তৃক অপূর্ব রাসলীলা বর্ণনা, শ্রীমৎ যোগেশজী ব্রহ্মচারী এম এ কর্তৃক ভারতীয় দর্শনের বিশ্লেষণ, প্রত্যেক নরনারীর শ্রবণ-মনকে তৃপ্ত করিয়া আনন্দ দিয়াছে।

গ্রন্থসাহেব পাঠ, চৈতন্য চরিতামৃত শচীদুলালের লীলারহস্য শ্রবণ এবং কীর্তন সুধাকর শ্রীগণেশচন্দ্র দে ভক্তিবিনোদ ও তদীয় সহধর্মিনী শ্রীমতী গীতা দেবীর যুগ্ম-কণ্ঠের শ্রীগুণ হরিগুণ কীর্তন সকলের মুগ্ধ করে।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে নবেম্বর—পশ্চিমী তিন্‌টি দেশ এক পত্রযোগে রাশিয়াকে জানাইয়া দিয়াছে যে অস্ট্রিয়া সংক্রান্ত অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য সোভিয়েট সরকার যে কেন প্রস্তাবই উত্থাপন করুন না কেন, তিনটি দেশ সযত্নে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

২৬শে নবেম্বর—অদ্য রাত্রিতে সোভিয়েট রাশিয়া তিনটি বৃহৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রের নিকট এক লিপি পাঠাইয়া বার্লিনে চতুঃশক্তি বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছে।

২৭শে নবেম্বর—কোরিয়ার প্রাথমিক সম্মেলনে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধিমণ্ডলীর দল-নায়ক মিঃ আর্থার ডীন অদ্যকার বৈঠকের শেষে বলেন, কম্যুনিস্টরা ২৬শে ডিসেম্বর শান্তি-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

গতকল্য রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটিতে সোভিয়েটের শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে উদযান বোমা, আণবিক বোমা এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার বিনা-সর্তে নিষিদ্ধ করার জন্য দাবী জানান হয়।

২৮শে নভেম্বর—মস্কোতে নবনিযুক্ত বৃটিশ দূত স্যার উইলিয়াম হেটার অদ্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ মালেনকোভের সহিত ২০ মিনিট কাল আলোচনা করেন। বৃটিশ দূতাবাস হইতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা আন্তরিকতার সহিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

পারস্যের পদচ্যুত ও বন্দী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক অদ্য রাত্রিতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছেন। মঙ্গলবার পর্যন্ত অনশনে থাকিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, [illegible] প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

দেশ
সংখ্যা ৬
শনিবার
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৬০
DESH SATURDAY, 12TH DECEMBER, 1953.

[সম্পাদ]ক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

[রাম]দাস বাবাজী

২৮শে অগ্রহায়ণ প্রখ্যাতনামা [বৈষ্ণবাচা]র্য, বৈষ্ণব সমাজের গুরু এবং [আচার্য] শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী [মহারাজ কল]কাতায় শ্রীল ভাগবতাচার্যের পাঠ-[বাড়িতে] নিত্যলীলায় অনুপ্রবিষ্ট [হইয়াছে]ন। বাবাজী শ্রীভগবানের নাম ও [প্রেম প্রচা]র এবং লুপ্ত বৈষ্ণবতীর্থ-[সমূহের] পুনরুজ্জীবন এবং সংরক্ষণকেই [জীবনের] মুখ্য ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিয়া-[ছিলেন।] প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তিনি [অসাধারণ] নিষ্ঠা-সহযোগে এই ব্রত পালন [করিয়াছে]ন। তপঃ-প্রভাবে তাঁহার জীবন [মহিমোজ্জ্বল] ছিল। তাহার শক্তি প্রতিবেশকে [তাঁহার আ]দর্শে অগ্নিময় করিয়া তুলিত। [তাঁহা]র সুমধুর কন্ঠের কীর্তনে পাষাণ [হৃদয়ও] বিগলিত হইত এবং সুরের ঝঙ্কারে [...] ভগবৎ-প্রীতির পুণ্য প্রবাহ [...] হইয়া উঠিত। প্রাণেন্দ্রিয় [...] যে পরম পুরুষার্থ বাবাজী [...]র তাহা প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। [...]ঙ্গে যে প্রাণের সংযোগ, সে-প্রাণ [...] নিঃশেষে দান করিতে চায় এবং [সেই দা]নেই আবার প্রাণের ব্যুত্থান ঘটে। [তাঁহা]র প্রাণ ভূমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, [তাই] অপরিম্লান তাঁহার দানের মহিমা। [...অ]নুভূতি রসে নিজেকে নিমগ্ন [করিয়া] তিনি এদেশের সমাজ-জীবনের [...]র সর্বাত্মসমর্পনের চিন্ময় আনন্দের [...]সাধনে অধিকার অর্জন করিয়া-[ছিলেন।] প্রাণ ঢালিয়া তবে [...] প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাঁহার [জীবনে] এই সত্যই উজ্জ্বল হইয়া [উঠিয়াছে]। বাঙলার সভ্যতা এবং [সংস্কৃতি]র মূলে বাবাজী মহারাজের [দান] অসামান্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রচারের দ্বারা তিনি বাঙালীর [...]ক সর্বভারতে সম্প্রসারিত করিয়া-ছেন এবং অখণ্ড ভারতের জাতীয়তা-বোধকে জাগ্রত করিতে সাহায্য করিয়া-ছেন। বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও বাঙলার সমাজ-জীবনকে তিনি সংহত রাখিয়া-ছিলেন। এমন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাধক পুরুষকে হারাইয়া বাঙালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। বৈষ্ণবাচার্য রামদাস বাবাজী প্রেমময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুর তিনি অতীত। সেই অমর-জীবনের অনুধ্যান করিয়া আমরা সর্বত্র সম্পূজিত, লোকবন্দিত বহুধা বিশ্রুতকীর্তি এই পরম বৈষ্ণবের স্মৃতির উদ্দেশে অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত ভারত সরকার কিছুদিন পূর্বে একটি তথ্য নির্ণায়ক কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটির সুপারিশগুলিকে ভিত্তি করিয়া এতৎসম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করাই ভারতের পুনর্বাসন সচিবের কলিকাতা আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। কমিটির রিপোর্টের কয়েকটি অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমিটির প্রধান অভিযোগ এই যে, পুনর্বাসন পরিকল্পনা রচনায়, অনুমোদনে এবং তদনুযায়ী সাহায্য প্রদানে বিলম্ব ঘটিয়াছে। বিলম্বের একটা প্রধান হেতু উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এবং নিম্নতম কর্মচারীদের মধ্যে কার্যের যোগাযোগ ও পরস্পরের সহযোগিতার অভাব। কমিটি বলিয়াছেন, এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১,৫০,০০০ একর জমি পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। বর্তমানে যে সকল উদ্বাস্তু আশ্রয়-শিবিরে আছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের জন্য এবং বর্তমান কলোনী-সমূহের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য আরও ৭৫ হাজার হইতে এক লক্ষ একর জমি প্রয়োজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেটুকু জমি উদ্বৃত্ত আছে, তাহার দ্বারা এই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নহে। সম্প্রতি জমি পুনরুদ্ধারের যে সকল পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ হইলে সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে ইত্যাদি। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আমাদের এই অভিমত যে, উদ্বাস্তুদের দুর্দশার সুযোগ লইয়া কাহাকেও শোষণ-পিপাসা পূর্ণ করিবার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য নয়। কলোনীর জমি দখল লইয়া এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। দীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া যাইবার পর সরকার এতদিন এ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। এই সব জমি দখলের পক্ষে তাঁহাদের বাধা দাঁড়াইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি দখলের প্রতিকূলে। পূর্বেই এই সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল এবং শাসনতান্ত্রিক বিধানের তদনুযায়ী সংস্কার সাধন করা কর্তব্য ছিল। সরকার এতদিনে এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন, শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু এই কাজ সম্পন্ন করিতে কত দিন লাগিবে, ভারতের পুনর্বাসন সচিব সে

সম্বন্ধে কোন কথা আমাদিগকে দিতে পারেন নাই। সুতরাং সত্বর যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, ইহা মনে হয় না; কারণ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার সন্তোষজনকভাবে সমাধান করিতে হইলে ভূম্যধিকারী শোষক সম্প্রদায়ের অর্থ-পিপাসার হিংস্রতাকে দলন করিয়া ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ এবং মানবাধিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করিবার মত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা আবশ্যক। তদুপযোগী দৃঢ়তা অবলম্বনে ভারত সরকারের অসামর্থ্য-বশেই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কালেও ইহার কোন সমাধান হইল না।

চন্দননগরের ভবিষ্যৎ

চন্দননগরের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে উক্ত নগর-বাসীদের অভিমত সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার ডাঃ অমরনাথ ঝা'কে সভাপতি করিয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। সম্প্রতি শ্রীযুত ঝা'র নিকট চন্দননগর-বাসীদের পক্ষ হইতে একটি স্মারকলিপি দাখিল করা হইয়াছে। এই স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গের এলাকার মধ্যে চন্দননগরের জন্য স্বাধীন সত্তা দাবী করা হইয়াছে। এই দাবীকে ভিত্তি করিয়া চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটির আগামী নির্বাচন বয়কট করা হইয়াছে। ৩৯ জন সদস্য-পদপ্রার্থী তাঁহাদের নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। চন্দননগরের এই ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন হইয়াছি এবং আমাদের পক্ষেই দুঃখের যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। স্মারকলিপিতে চন্দননগরের 'বৈপ্লবিক এবং জাতীয়তা-বাদমূলক ঐতিহ্যের গৌরবের উল্লেখ করা হইয়াছে।' সে গৌরব চন্দন-নগরবাসীর সর্বাংশেই প্রাপ্য, একথা কে অস্বীকার করিবে? আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পৃথক থাকিবার দাবী যাঁহারা উত্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা চন্দননগরের সেই বৈপ্লবিক এবং জাতীয়তাবাদমূলক ঐতিহ্যকেই ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাঙলার জাতীয়তাবাদের প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া-ছিল, একদিন চন্দননগর। কানাই-লালের জন্মভূমি চন্দননগর। এই নগরের আত্মদানী বীর সন্তানের শোণিতোৎসর্গে বাঙলার অগ্নিযুগের উদ্বোধন ঘটে। দেশমাতৃকার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অন্যান্য বীরের রক্তে এই পুণ্যভূমি সিক্ত হইয়াছে। চন্দননগরের সে বৈপ্লবিক বীর্যময় ঐতিহ্য কে বিস্মৃত হইবে? কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপিত বাঙলার প্রাণশক্তির সঙ্গেই চন্দননগরের সে বৈপ্লবিক বীর্যের সংযোগ ছিল, চন্দননগরের স্বাতন্ত্র্যে নয়। বস্তুত চন্দননগরের বর্তমান স্বাধীনতা ভারতের বৃহত্তর স্বাধীনতারই অঙ্গীভূত—বাঙলার জাতীয়তাবাদের এবং বৈপ্লবিক সাধনারই পূর্ণ পরিণতি। সুতরাং চন্দননগর যে পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, এ সম্বন্ধে কাহারো মনে কোন সন্দেহই ছিল না এবং এখনও নাই। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক, সর্বতো-ভাবেই চন্দননগর বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত এবং তাহার গৌরবে বাঙলা দেশ চিরদিন গৌরবান্বিত হইয়াছে। চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক বিষয়ে আগাইয়া গিয়াছে, সুতরাং পশ্চিম-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার সেই অগ্রগতি ব্যাহত হইবে, যাঁহারা এইরূপ যুক্তি উপস্থিত করিয়া চন্দননগরের স্বাতন্ত্র্য দাবী করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের যুক্তি সমর্থন করিতে পারি না। বৈপ্লবিক সংস্কৃতি এবং বাঙলার জাতীয়তাবাদের উদ্বোধক চন্দননগর সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির সঙ্গে যুক্ত হইয়াই চলিবে, ইহাই স্বাভাবিক এবং তাহাই চন্দননগরের অতীত ঐতিহ্যের পরিপোষক এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে অনুকূল। আমরা আশা করি, বিচ্ছেদবাদমূলক এই আন্দোলনের অবিলম্বে পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

রেশনের চাউলের সংস্কার

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, জানুয়ারী মাস হইতে কলিকাতা এবং উপকণ্ঠবর্তী রেশনভুক্ত অঞ্চলে ভাল চাউল সরবরাহ করা হইবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পূজার পূর্বেও কলিকাতায় আসিয়া আমাদিগকে অনুরূপ আশ্বাস দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহা[র] আশ্বাসানুযায়ী আমরা পরবর্তী মা[স] রেশনের দোকান হইতে ভা[ল] চাউলের আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু [সে] আশা ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহা[র] সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিও কতটা কার্যকর হইবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে সন্দে[হ] রহিয়াছে। তবে ইহা দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী রেশনের চাউলে[র] নিকৃষ্টতা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকা[র] করিলেও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী অভিযোগে[র] গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং রেশনে[র] দোকান হইতে যাহাতে ভাল চাউল সর-বরাহ করা যায়, সেজন্য কয়েকটি কার্যক[র] ব্যবস্থাও নির্ধারণ করিয়াছেন। প্রথমে উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ হইতে পশ্চিম-বঙ্গের রেশনভুক্ত অঞ্চলে চাউল সরবরা[হ] করা হইয়া থাকে। মধ্যপ্রদেশের সরকা[র] চাউলের পরিবর্তে ধান্য সরবরাহ করিবে[ন] প্রস্তাবে রাজী হইয়াছেন। উড়িষ্যা সরকা[র] অনেকটা আপত্তি করিবার পর পশ্চিমবঙ্গে কিছু ধান এবং কিছু চাউল সরবরা[হ] করিতে সম্মত হইয়াছেন। বিভিন্ন [রা]... হইতে প্রাপ্ত ধান্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ... চাউল করিয়া লইবেন। এই ব্যব[স্থা] অনুযায়ী কাজ হইলে রেশনে[র] অভিযোগের কারণ অনেকটা নি[রাকৃত হইবে] সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতেই ... সমস্যার একেবারে সমাধান হইবে তাহা মনে হয় না। মিলে ভা[ল] রকম ছাঁটাই হইলে চাউলের সঙ্গে ধান কিংবা তুষ থাকিবে না কিন্তু কাঁকর, পাথর প্রভৃতি ... রকমের অখাদ্য, আবর্জনা, এগুলি তো ভাল ছাঁটাইয়ের অভাবে চাউলের মধ্যে ... না। সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা এবং অনেকটা তাঁহাদের মধ্যে দুর্নীতি[র] প্রভাব এক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, একথ[া] স্বীকার করিতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্মচারীবর্গের এই অযোগ্যতা এবং দুর্নীতির গতিকে যদি রোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে রেশনভুক্ত অঞ্চলে[র] চাউল সম্পর্কিত অভিযোগের কারণ মূলত নিরাকৃত হইবে না। জন-সাধারণকে শোষণ করিবার যে চ[ক্র] বর্তমানে একভাবে ঘুরিতেছে, তাহ[া] অন্যভাবে আবর্তিত হইবে মাত্র।

শ্রীনন্দলাল বসু

বাংলার পুতুল

তুমি ও আমি

হরপ্রসাদ মিত্র

টরে টক্কা। টরে টক্কা। টরে টক্কা।
জ্ঞানের মাকুর টানাপোড়েন
নেইক জিরেন।
তুমি কোথায়?
তোমার তত্ত্ব গুহায় ঢাকা।

এদিকে এই মৌ নিয়ে যায় যে মৌমাছি,—
দুঃখ-সুখের জাফরি-ঘেরা মৌশুমী প্রাণ!
রোদে-ছায়ায়, হিমে-হাওয়ায় সূর্যমুখী!
সে-ই নিয়ে যায় আজকে তোমার স্বর্ণপরাগ।

অবোধ বুকের গভীর সুখের দিন চলে যায়।
টরে-টক্কা। টরে-টক্কা।—তুমি কোথায়?

আমি আছি অঘ্রাণের এই নশ্বরতায়।
মৃদুচেতন দুদণ্ড-কাল ফুরোয় যদি—
রেখো তোমার অনন্ত মন আকাশ জুড়ে।
রেখো তোমার অসীম ব্যাপ্তি নিরবধি।

টিপসই

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনন্ত হৃদয় আছে তোমার প্রতীক্ষায়
পদধ্বনি শুনি শুধু তোমার আসার
অনন্ত বিক্ষুব্ধ স্বাদ রয়েছে জরায়
যখন হিসেব করি ঃ ক'দিন বাঁচার
পরিসর পড়ে আছে।

তন্দ্রালগ্ন সূর্যালোকে হৃদয়ের কাছে
আসবে বলে কি আমি জ্বালাই তারকা?
একদল হাওয়া ছোটে ঃ উত্তরের দুর্নিবার ফাঁকা
তারপর শান্ত এক গ্রামান্তের প্রদোষ-সভায়
পাতা-পোড়া আগুনের আঁচে হাত সেঁকে
(রুটি যদি জোটে ভালো, নয়তো এমনিই)
পৃথিবীতে বাঁচবার টিপসই নিই॥

রেমুদায় তিন প্রধানের কনফারেন্স গেল। কনফারেন্সের শেষে যে ী ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছে কোনো নূতন নীতির কথা কিছু অবশ্য প্রকাশিত ইস্তাহার থেকে রের ব্যাপার সব বুঝা যায় না, যাবার নয়। এই বৈঠকের দ্বারা ইঙ্গ-ন-ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণতর সাধনের কাজ কতটা সফল হয়েছে, ত বলা যায় না, তবে আন্তরিক ঐক্য আর নাই বাড়ুক, মোটামুটি রিকা যে-নীতি চালিয়ে যেতে চায়, চালানোর চেষ্টায় সকলে সম্মত, শত ইস্তাহার থেকে এটা ধরে নেওয়া বার্লিনে চার শক্তির বৈদেশিক দের সম্মেলনের যে প্রস্তাব সোভিয়েট মেণ্ট করেছেন, তাতে সম্মতি জানানো হ, কিন্তু ন্যাটো (NATO) এবং পীয় সৈন্যবাহিনীর (European nce Community) পরিকল্পনা ন্ধ কোনোপ্রকার মত পরিবর্তনের দেওয়া হয় নি। বরঞ্চ বেশ জোর বলা হয়েছে যে, ন্যাটোর কাজ এবং পীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের পরি-ন্নাকে রূপ দানের চেষ্টা চলতেই । তবে NATO এবং EDC-র শ্য আত্মরক্ষা, তা থেকে কারো ভয় ার কারণ নেই। জার্মানদের সশস্ত্র দিলে তারা আবার কাউকে আক্রমণ ত পারে এরূপ ভয়ও অহেতুক, কারণ TO এবং EDC সর্বপ্রকার "এ্যাগ্রে-র"ই বিরুদ্ধে। এর ভিতরে বোধ হয় ইঙ্গিত আছে যে, যদি একটা মিট-হয়, তবে রাশিয়াকেও আক্রমণ থেকে করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে। এই প্রতিশ্রুতি দানের সঙ্গে আরো কটা মামলার ফয়সালা হয়ে যাওয়া । পাশ্চাত্ত্য শক্তিত্রয় য়ুরোপের বর্তমান াগকে স্থায়ী বলে স্বীকার করে নিতে ত নয়। জার্মানীর ঐক্যের প্রশ্ন তো ইছে, তা ছাড়া পূর্ব য়ুরোপীয় দেশ-লকেও সোভিয়েট-শৃঙ্খলমুক্ত করে ত হবে যাতে তারা আবার "স্বাধীন রূপে স্বাধীন জাতি"র মতো চলতে র। এই সব লক্ষ্য সাধন করতে হলে

বৈদেশিকী

...মূপারটাকে তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির পক্ষ থেকে রাশিয়াকে জানানো হয়েছে যে, ৪ঠা
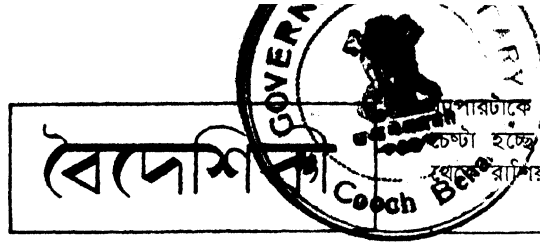
পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির সামরিক বল বৃদ্ধি করে যেতে হবে। পূর্বের চেয়ে বর্তমানে "এ্যাগ্রেশনের" ভয় অনেকটা কম দেখা যায়, "ফ্রি ওয়ার্লড"এর শক্তি বৃদ্ধি এবং নীতির দৃঢ়তার ফলেই তা হয়েছে, সুতরাং সেই শক্তি বৃদ্ধি করে যাওয়া দরকার—তার উপরই নিরাপত্তা ও শান্তি নির্ভর করছে।

অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য নীতির ধারা বের-মুদার পূর্বেও যা ছিল পরেও তাই রয়েছে। তবে বাইরে যা বলা হচ্ছে, ভিতরেও ঠিক তাই কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা নেই। দর কষাকষির সুবিধার জন্য হয়ত একটু বেশি বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। শক্তি বৃদ্ধির মহিমা যতটা প্রচার করা হচ্ছে, নিজেদের মনে ততটা বিশ্বাস নাও থাকতে পারে। য়ুরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের পথ এখনো বাধামুক্ত হয়নি। এই পরিকল্পনা ফরাসী পার্লামেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুর হওয়া এখনো বাকী। এ বিষয়ে ফ্রান্সের মনে প্রবল দ্বিধা রয়েছে। আগামী ১৭ই জানুয়ারী ফ্রান্সের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করার কথা। নূতন প্রেসিডেণ্টের কার্যভার গ্রহণ করার পরে আইন অনুসারে বর্তমান গভর্নমেণ্টকে পদত্যাগ করতে হবে। তার পর নূতন গভর্নমেণ্ট গঠিত হলে EDC চুক্তি পার্লামেণ্টে আলোচনার জন্য আসবে। ফ্রান্সের যে-রকম দ্বিধাভাব—এই দ্বিধা-ভাবের মূলে রয়েছে জার্মানীর ভয়—তাতে পার্লামেণ্টে আলোচনার সময়ে যদি রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তার এবং একটা মিটমাটের সম্ভাবনার আবহাওয়া চালু থাকে তবে EDC চুক্তিতে ফরাসী পার্লামেণ্টের সম্মতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে। সেইজন্যই সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট এই সময়ে বার্লিনে চার শক্তির বৈদেশিক মন্ত্রীদের বৈঠকের প্রস্তাব করে-ছিল। এই বৈঠকের প্রস্তাবটি সামনে ঝুলে থাকলে ফরাসী জনমতকে EDC-র পক্ষে আনা দুঃসাধ্য হবে। তাই

জানুয়ারী বার্লিনে বৈদেশিক মন্ত্রীদের বৈঠক করতে তাঁরা রাজী। এই প্রস্তাবে যদি সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট রাজী হন, তবে ফ্রান্সের নূতন গভর্নমেণ্ট গঠন প্রভৃতি ব্যাপারের পূর্বেই বার্লিন কনফারেন্সের পর্বটা মিটে যেতে পারে। কিন্তু রাশিয়া এই তারিখে রাজী হবে কি না, সন্দেহের বিষয়। এই তারিখে না হলে কনফারেন্সের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে, পাশ্চাত্ত্য ত্রিশক্তির পক্ষে এরকম বলা সম্ভব হবে না, তখন হয়ত কনফারেন্সের তারিখ অনেক বেশি দিন পিছিয়ে দেবার প্রস্তাব করা হবে, যাতে কনফারেন্সের কথাটা একটা দূরের ব্যাপার হয়ে পড়ে এবং ইতিমধ্যে ফ্রান্সকে দিয়ে EDC চুক্তি স্বীকার করিয়ে নেওয়া যায়। এই উপায়ে রাশিয়ার চাল কতটা ব্যর্থ করা সম্ভব হবে বলা যায় না।

জার্মানীর সম্বন্ধে ফ্রান্সের ভয় দূর করার জন্য বেরমুদা কনফারেন্সে নিশ্চয়ই চেষ্টা করা হয়েছে। জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের পরে আমেরিকা যদি য়ুরোপ থেকে বেশির ভাগ মার্কিন সৈন্য সরিয়ে নেয়, তবে জার্মানী য়ুরোপে আবার সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এইটাই ফ্রান্সের সবচেয়ে বড়ো ভয়। আমেরিকা এবং বৃটেন য়ুরোপে যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য রাখবে, এই প্রতিশ্রুতি পেলে ফ্রান্স অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারে। বেরমুদা কনফারেন্সের সমাপ্তির পরে যে সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছে, তাতে এই ধরনের একটা প্রতিশ্রুতিও আছে। তবে ফ্রান্সের পক্ষে EDCতে আপত্তি করে কতদিন থাকা সম্ভব? বেশি হোক, কম হোক, জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ ক্রমশ অনিবার্য হয়ে উঠছে। ফ্রান্স যদি EDCতে আপত্তি করে বসে থাকে, তবে পশ্চিম জার্মানীর স্বতন্ত্র পুনরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনাই বাড়বে। সেটা ফ্রান্সের পক্ষে আরো ভয়ের কারণ হবে। সে যাই হোক, জার্মানীকে আর খুব বেশি দিন চেপে রাখা সম্ভব হবে না। জার্মানীর ঐক্যসাধন বিলম্বিত হলেও পশ্চিম জার্মানীকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে রাখাও আর খুব বেশি দিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। রাশিয়ার সঙ্গে কনফারেন্সের প্রস্তাব সম্পর্কে যে উত্তর সোভিয়েট গভর্নমেণ্টকে দেওয়া হয়েছে, সেটা ডক্টর এ্যাডেনয়েরকে জানিয়ে এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই থেকেই বুঝা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পশ্চিম জার্মানীর খাতির কতটা বেড়েছে।

৩
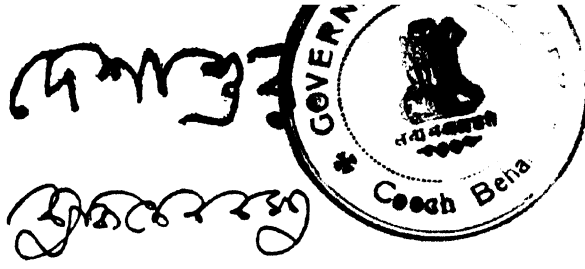
[এ]য়ার-হস্টেসের হাতে ডাকের চিঠি সমর্পণ ক'রে বাইরে নেমে …। আকাশ ভ'রে জ্বলজ্বল করছে …ল ঃ প্লেনের ভিতরকার হারেম-…ন আবছায়ার পরে পশ্চিম ভারতের …না কড়কড়ে রোদ্দুর যেন চোখ …য়ে দিলে। পড়ন্ত রোদ হলদে, … ঠাণ্ডা, মাইল জুড়ে মস্ত প্রান্তর …লিয়ে প'ড়ে আছে। গাছ কম, …র চেয়ে ধূসর বেশি, ধূসরের মধ্যে …র আমেজ, লোক নেই। একটু … নিয়েই নেমেছিলুম: এই সেদিন …তে থেকে গেছি, সেই সুবাদে …কে প্রায় আপন ব'লে দাবি করে-…ম মনে মনে—আমার এক-আধ টুকরো …তারা জীবন ওর পথের ধুলোয় কি …নেই, আমাকে চিনতে পারবে না? মাটিতে পা দিয়েই নিরাশ হ'তে …। যে-দিল্লিতে আমি থেকেছি, …ন মানুষ থাকে, মানুষের সঙ্গে …র দেখা হয়, এ তো সে নয়। …রের সীমান্তের বাইরে ঘণ্টাখানেকের … সরাইখানা এটা, শূন্যপথে পাড়ি …দিতে দাঁড়াবার এবং জিরোবার … বিবর্ণ ইস্টেশন। দিল্লি নয়, …ন এয়ারপোর্ট। আর এয়ারপোর্ট …—সেটা কোনো শহর নয়, কোনো …রও নয়, সেটা পৃথিবীর। সেটা …রই, হয়তো সেইজন্যেই কারোরই … সবখানেই একরকম—যে-কোনো … যে-কোনো শহরের সংলগ্ন হোক …কোনোটা বড়ো, কোনোটা ছোটো, কোথাও বেশি বা কম, কোথাও খুব …লো আর কোথাও একটু বেচারি-…—কিন্তু সেই একই রকম নকশা, …শ রেস্তোরাঁ স্নানের ঘর য়ুনিফর্ম-…কর্মচারী, একই রকম নিপুণ …ণ অভ্যর্থনা, ব্যবস্থার পরাকাষ্ঠা, …র শৃঙ্খল। দু-একটা বিষয় বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে রেল-স্টেশনও তা-ই, কিন্তু ভারতবর্ষে যিনি পাঁচশো মাইলও রেল-ভ্রমণ করেছেন তিনিই জানেন যে, অবয়বগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও স্টেশনগুলোর আবহাওয়া কী-রকম বদলে যায়—আর-কোনো কারণে নয়, তারা মাটির বুকে অধিষ্ঠিত বলেই। জল-বায়ুর অর্থে আবহাওয়ার কথা বলছি না;—দৃশ্যেরও বদল হয়; কোনো স্টেশন হয়তো নদীর উপর ব্রিজ পেরিয়েই, কোনোটি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, কোনোটি শান-বাঁধানো রাশভারি গাছের, কোনোটি গাছের ছায়ায় কুয়োতলায় অন্তরঙ্গ। মাটির ধর্মই ঘনিষ্ঠতা, তাই স্টেশন থেকেও দেশটার আর শহরটার কিছু-না-কিছু চোখেই পড়ে: হয়তো বাড়ি, হয়তো দোকান, টাঙা কিংবা সাইকেল-রিকশ, রাস্তার লোক, প্ল্যাট-ফর্মের ভিড়। কিন্তু এয়ারপোর্ট শহর থেকে দূরে, শহরের জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন, উপরন্তু সেখানে নেমে আপনি কোথায় দাঁড়াবেন কোথায় বসবেন কোন-দিকে যাবেন বা যাবেন না, এই সমস্তই কঠিন নিয়মের অধীন ব'লে জায়গাটার নেহাৎ ভৌগোলিক প্রকৃতিও ভালো ক'রে লক্ষ্য করার সুযোগ হয় না আপনার। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে কোনো দেশেরই স্থানীয় চরিত্র ফুটতে পারে না। যেমন য়ুনিফর্ম পরলে মানুষের নিজের ব্যক্তিত্বটি চাপা পড়ে, তেমনি যেটা প্রকাণ্ড প্রয়োজনসাধনের প্রকাণ্ড যান্ত্রিক ছাঁচে তৈরি হয়েছে, সেটাতেও কোনো দেশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। মানুষের বস-বাসের বাড়ি এক-এক দেশে এক-এক রকম (অন্তত এখন পর্যন্ত অনেক অংশেই তা-ই), কিন্তু কোবে থেকে কেণ্টাকি পর্যন্ত কারখানার সেই একই রকম চেহারা। এয়ারপোর্টেও তা-ই, একটা থেকে আর-একটাকে চিনে নেয়া শক্ত; এমনকি, স্থানীয় শৌখিন সামগ্রীর যে-সব নমুনা কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখে, সেগুলি পর্যন্ত একই রকম মনে হয়—মনে হয় এটা না এই আগের স্টেশনে দেখে এলাম? হয়তো সেই জিনিশই শহরের মধ্যে দোকানে দেখলে উজ্জ্বল হ'য়ে চোখে পড়বে, কিন্তু মানুষের প্রাণের সংসর্গ থেকে অপসারিত হ'য়ে সবই যেন শুকিয়ে যায়; মনে হয় এই যাওয়া, আসা, থামা, চলার টগবগে কড়াইটার মধ্যে কোন-কিছুই স্পষ্ট ক'রে দেখা যাচ্ছে না, একটা রক্তমাংসহীন আন্তর্জাতিকতার পাংশু ধোঁয়া উঠে-উঠে সব জিনিসের প্রাকৃত রূপ মুছে দিচ্ছে—শুধু জিনিশের নয়, মানুষেরও।

অতএব দিল্লিতে নেমেও দিল্লির স্বাদ কিছুই পাওয়া গেলো না। বাইরের ঘরে পাসপোর্ট জমা দিয়ে ভিতরে আসা, দুই খণ্ড বিস্কুটের সঙ্গে চা-পান, একজন বন্ধুকে টেলিফোনে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা, তারপর সেই নির্দিষ্ট পথ দিয়ে লাইন বেঁধে এগিয়ে যাওয়া, পাসপোর্ট সংগ্রহ, আকাশের তলায় বাইরে এসে দাঁড়ানো। আরো একটু দাঁড়াতে পারলে সুখী হতাম—কিন্তু সময় নেই, প্লেনে ফেরার হুকুম জারি হয়ে গেছে। প্লেন উড়লো, দেখতে-দেখতে দিনের আলো মিলিয়ে গেলো, রাত্রি নামলো আকাশে। দীর্ঘ হবে এই রাত্রি, দীর্ঘায়িত, ষোলো কিংবা সতেরো ঘণ্টা পর আবার ভোর হবে। চলেছি পশ্চিমে, যেদিকে সূর্য অস্ত যায়, যত যাবো, রাত ততই বেড়ে চলবে, পথে-পথে অনেক সূর্যোদয় হেলায় হারিয়ে কালকের দিনটাকে আমরা ধরতে পারবো একেবারে রোম পেরিয়ে লণ্ডনের পথে—অন্তত টাইমটেবিলে এই রকম বলছে। অর্থাৎ, পাঁজিকার একটা তারিখের মধ্যেই অনেকগুলো বাড়তি ঘণ্টা কেটে যাবে আমাদের—কিংবা হয়তো কোনো তারিখেই নয়, যেমন এই আকাশ-পথে বলতে গেলে স্থানের বাইরে চ'লে এসেছি, তেমনি প্রায় কালের বাইরেও ছিটকে পড়বো, এমন একটা অনিশ্চিত অস্পষ্টতার মধ্যে ডুবে যাবে যেখানে 'আজ' এবং 'কালে'র কোনো অভ্যস্ত ধারণা আর টেঁকে না। যারা এরোপ্লেনে প্যাসিফিক পেরিয়ে আমেরিকা থেকে চীন-জাপান যায়, তারা পথের মধ্যে মঙ্গলবারে ঘুমিয়ে বিষ্যুৎ-বারে জেগে ওঠে, আবার উল্টো পথে

একই তারিখ দু-বার ক'রে কাটাতে হয় তাদের। অবশ্য আমাদের দৌড় তত্টা লম্বা নয়, মাত্রই কয়েকটা ঘণ্টার তফাৎ নিয়ে আমাদের কারবার; কিন্তু মিনিটে-মিনিটে সময় যদি কেবল পেছিয়ে যায়, যদি ভোরবেলার নাগাল পেতে অপেক্ষা করতে হয় আমাদের হিসেবে দুপুরবেলা পর্যন্ত, তাহ'লে কোন্‌টা 'আজ' আর কোন্‌টা 'কাল' তা নিয়ে বেশ একটু দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় বইকি। সময়টা যে মায়া, এ-কথা পুরাকালের ঋষি থেকে হাল আমলের বিজ্ঞানী পর্যন্ত অনেকেই বলেছেন; বলা বাহুল্য, আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের মূল্যবান সাধারণ বুদ্ধির জোরে তা কখনো বিশ্বাস করিনি, কিন্তু তার অল্পস্বল্প প্রমাণ—ঠিক এলিয়ট বা টমাস মান-এর অর্থে না হোক, তবু ভাবিয়ে তোলার মতো প্রমাণ পাওয়া যায় এরোপ্লেনে উঠলে।

অবশ্য সময় নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মতো আপাতত কারো সময় আছে ব'লে মনে হচ্ছে না; সান্ধ্য প্লেন পানে-ভোজনে চঞ্চল। দ্বিতীয়টার চেয়ে প্রথমটাই বেশি: শুকনো নোন্তা যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে ককটেলের গ্লাশ। সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে পরিবেশনের নৈপুণ্য লক্ষ্য করছি, যারা খাচ্ছে তাদেরও তৎপরতা কিছু কম নয়। দৃশ্যটি ভালোরকম জ'মে উঠলো করাচি ছেড়ে যাবার পর যখন ডিনার দিলে: ট্রের উপর প্লাস্টিকের বাসনে খোপে-খোপে সাজানো আছে সব, সুপ থেকে চীজ পর্যন্ত কিছুই বাদ নেই; বেপথুমান প্লেনের অত্যন্ত সরু গলির উপর দিয়ে সুদর্শনভাবে টাল সামলে-সামলে চলেছে পরিচারক এবং পরিচারিকা—গায়ে তাদের শাদা কোর্তা, হাতে কফির পট, দুধের জগ, সুরার পাত্র; কফির পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে আপনার যদিবা জামার হাতায় ছলকে পড়ে, তাদের হাতে একটি ফোঁটা নড়চড় হবার জো নেই। আমরা যারা প্রাচ্যদেশীয়, আমাদের চোখে এই ভোজনকাণ্ড একটুখানি চমকপ্রদ ব'লে বোধ হয়। তার কারণ, আহার-বিষয়ে আমরা এখনো গার্হস্থ্যধর্মী, বেশ ধীরে-সুস্থে নিশ্চিন্ত মনে খেতে বসা আমাদের অভ্যাস; ওর মূল কথাটা যদিও পরিশ্রমের জন্য বলসঞ্চয়, আমরা ওটাকে আরাম এবং বিশ্রামেরই অংশ ব'লে ধরি। তাই তার পরিবেশের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বদল ঘটলে আহারের জন্য দাবিও আমাদের ক্ষীণ হ'য়ে আসে। অচেনা বিছানায় অনেকের ভালো ঘুম হয় না; আকস্মিক রকম নতুন জায়গায় ভালো ক'রে খেতে পারে না এমন মানুষেরও অভাব নেই আমাদের মধ্যে। যারা জাত যাবার ভয়ে কিংবা রোগের বীজাণুর ভয়ে (ও-দুটো প্রায় একই শ্রেণীর বিভীষিকা) পথে বেরিয়ে উপোস ক'রে কাটায় তাদের বিষয়ে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু তারা ছাড়াও অনেকে আছে যারা পথে-ঘাটে এক-আধবেলা না-খাওয়াটাকে কোনো অসুবিধে ব'লেই গণ্য করে না, কিংবা যাদের ভ্রমণজনিত উৎকণ্ঠা পানাহারে সকল ইচ্ছা হরণ ক'রে নেয়, কিংবা যারা অচেনা লোকের সামনে ব'সে মুখব্যাদন এবং চর্বণ করতে সংকোচ বোধ করে কিংবা যারা মনে-মনে ভাবে এই তো বেলা দুটো নাগাদ পৌঁছে যাবো, একেবারে স্নান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে তখনই খাওয়া যাবে। অর্থাৎ, খাওয়ার যেটা শারীরিক প্রয়োজন সেটাকে মানসিক তৃপ্তির জন্য অপেক্ষা করিয়ে রাখতে আমাদের আপত্তি নেই। এইটে হ'লো গৃহী মানুষের মনের ভাব। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে আজ অনেকদিন হ'লো, পৃথিবীটাকে লুঠ ক'রে নেবার প্রচণ্ড উদ্যমে তারা নিরন্তর ধাবমান, এই রকমের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র তাদের পোষায় না, মনের এ-সব বাবুগিরি ছেঁটে না-ফেললে তাদের কর্মকুশলতা ব্যাহত হয়। এইজন্য তারা যে-কোনো অবস্থায় একই রকম মনোযোগপূর্বক আহার করার কৌশলটি আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, চলতে-চলতে, মোটরে ব'সে, পার্কের বেঞ্চিতে—কিছুতেই তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে হানি হয় না, এমনকি ফুটপাতে হেঁটে যেতে-যেতে আইসক্রীম-ভক্ষণও আমেরিকায় শুধু নাবালক-মহলে আবদ্ধ নয়। যারা অত্যন্ত বেশি ব্যস্ত এবং চঞ্চল তাদের দৈহিক দাবিগুলো একেবারে তখন-তখনই হাতে-হাতে মিটিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়, কোনো অবসরের অপেক্ষায় তারা থাকতে পারে না; হোক না মাঝনদীতে, চলতি ট্রেনে, কিংবা তেত্রিশ হাজার ফুট উঁচুতে আইনমাফিক খিদের সময়ে আইনমাফিক খাওয়া তাদের চাই—এবং আইনমাফিক সন্তোষ-সহকারে তার সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতারও তাদের অভাব ঘটে না। এই দাবিটা পশ্চিমি মানুষের, আমরা ফাঁকে-তালে তার ফলটুকুমাত্র পেয়ে যাচ্ছি; বোধ হয় সেইজন্যেই ভালো ক'রে ভোগ করতে পারি না—মজ্জাগত প্রাচ্যদেশীয় দুর্বলতাবশত থেকে-থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই।

ঘণ্টা দুই পরে বাহ্‌রেন নামক একটা জায়গায় আমরা অবতীর্ণ হলাম। কোনো জন্মে আগে এর নাম শুনিনি। পারস্য-সাগরে একটা দ্বীপ, আরব মরুর অদূরবর্তী। নেমে দেখি, তপ্ত হাওয়ার হলকা বইছে যেন দান্তের নরকের দুর্ভাগাদের দীর্ঘশ্বাস। রাত্রেই এই, দিনের বেলায় না জানি কী। চেহারাও ছন্নছাড়া গোছের, লোকজন কম, যাত্রীদের ওঠা-নামা নেই, প্লেন নেহাৎ তেল নেবার জন্যই নামে এখানে। ভিতরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ইংলণ্ডের নতুন রানী এলিজাবেথের ছবি। একজন লোককে ধ'রে দু-একটা বাক্যবিনিময়ে কৃতকার্য হলাম। দ্বীপে আর-কিছুই নেই, মানুষ বড়ো থাকে না, কিন্তু পেট্রলের খনি আছে প্রচুর। এলিজাবেথের ছবির অর্থটা তৎক্ষণাৎ প্রতীয়মান হ'লো। শাবাশ বলতে হয় ইংরেজকে, পৃথিবীর কোন্ অখ্যাত কোণে কোন্ রত্ন লুকিয়ে আছে কিছুই তাদের চোখ এড়ায় না, তখনই সেখানে রাজত্বের জাল ছড়িয়ে দেয়—যত দুর্গম, অস্বাস্থ্যকর কিংবা বসবাসের অযোগ্য হোক না জায়গাটা। আমাদের দেশে নিশ্চয়ই আদ্যিকাল থেকেই চা জন্মেছে, অথচ এই সঞ্জীবনী পত্রিকার অস্তিত্বসুদ্ধু আমরা জানতুম না, যতদিন না ইংরেজ এসে আবিষ্কার করলে। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি, কিন্তু এই একটা বিষয়ে পূর্বপুরুষের উদাসীনতাও ক্ষমা করতে পারি না। পাণ্ডবেরা তো বনে-জঙ্গলে অনেক

ছেন, দ্রৌপদীর শ্রান্তি দূর করতে রও তো চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিলো এই শক্তিশালী সরস পাতাটির দৈবাৎ খোঁজ পেলেন না কোনোরকমে? হায়রে, তাঁরা বঙ্গদেশকে বর্জন ছিলেন, পুণ্ড্র পেরিয়ে উত্তরে ননি, আর চিত্রাঙ্গদার মণিপুরও (অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সম্প্রতি ত হওয়া গেলো) পূর্ব সীমান্তের পুরে নয়। অতএব অনার্যভূমির সেঁতে উপত্যকায় চা-দেবী প্রচ্ছন্ন রইলেন, জাভার রবারের মতো, বর্মার রাসিনের মতো, এই বাহ্‌রেন-দ্বীপের লের মতো—শ্বেতাঙ্গ মানুষের ভের হাতে, শক্তির হাতে, বীরত্বের দস্যুতার আঘাতে জেগে ওঠার জন্য। বাহ্‌রেনে চোখের কিংবা মনের পক্ষে তকর কিছুই পাওয়া গেলো না। র মধ্যে গরম, বাইরে কাঁকরের মতো য়া, ধুলোর কিংবা বালির ভারে শ আচ্ছন্ন—পৃথিবীর এই শূন্য ন্দ প্রান্তে কোনো প্রাগৈতিহাসিক ৎকায় জন্তুর মতো মস্ত উঁচু হ'য়ে ড়িয়ে আছে আমাদের এরোপ্লেন। সবুজ আলো জ্বলছে তার চোখে, গভীর সমুদ্রবাসী মাছের গায়ের জ্বলজ্বল করছে ঘুলঘুলিগুলো। কারে এই আলো-জ্বলা প্লেনের টি নতুন রূপ যেন দেখতে পেলাম—র সমুদ্রের বুকে উজ্জ্বল জাহাজটিকে রকম কল্পনা করি এও যেন সেই রকম ঠাৎ বোঝা গেলো, ওর মধ্যে মানুষের বড়ো দুর্জয় শক্তি সংহত হ'য়ে আছে, এঞ্জিনের ধ্বকধ্বকানিতে কত বড়ো র্জয় ঘোষণা। অচেনা দেশের নির্জন রাত্রিতে এরোপ্লেনটাকেই বন্ধুর মনে হ'লো আমার, আস্তে-আস্তে অন্তঃপুরে ফিরে গেলাম। রাত র হয়েছে, যাত্রীরা একে-একে ঘুমের তৈরি হ'লো, প্লেন চললো আরব-শর উপর দিয়ে।

যাঁরা খুব ব্যস্ত মানুষ, উঁচুদরের রপুরুষ কিংবা কোনো বাণিজ্যের ধার, তাঁদের কারো-কারো মুখে নেছি যে, তাঁরা সত্যি-সত্যি বিশ্রামের য় পান একমাত্র যখন ভ্রমণ করেন। ভ্রমণটা যদি কর্মসূত্রেও হয়, তবু এক-দিকের ঘূর্ণি থেকে আর-একদিকের আবর্তে গিয়ে পড়বার আগে মাঝখানে কিছু সরল স্রোত পাওয়া যায়—কিছু শূন্য সময়, বিশ্রামের সময়। একবার ট্রেনে উঠে বসলে এক রাত্রি বা এক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত, এদিকে-ওদিকে যা-ই হোক কিংবা না-ই হোক তাতে আপাতত কিছুই এসে যাচ্ছে না, সবটাকে বেশ শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়া যায় চটিজুতো আর পাজামা-পরা অবস্থার মধ্যে। আমি অবশ্য কর্মবীর নই; কিন্তু সম্প্রতি আমারও এটা অনুভব করার সুযোগ ঘটেছে যে, ভ্রমণ ব্যাপারটা শরীরের পক্ষে ক্লান্তিকর হ'লেও মনের পক্ষে বিশ্রাম-দায়ক। আবশ্যিক বিশ্রাম, কিছু করবার উপায় নেই ব'লেই বিশ্রাম—কিন্তু এই নিরুপায় অবস্থাটা যথাস্থানে উপস্থিত থাকলে ঘটতে পারে না, ঘটলেও সেটাকে মেনে নিতে পারে না কোনো মানুষ। আমার জীবনের ভাগ্যতারকা যখন ঊর্ধ্বাকাশে ছিলো, যখন যৌবনের নির্ভার দিনে সপরিবারে সবান্ধবে ভ্রমণ করেছি, তখন সেই ভ্রমণে ছিলো খুশির নেশা, ছুটির হাওয়া, প্রাণের উল্লাস। আর এখন মধ্যবয়সে নিঃসঙ্গভাবে জীবিকার জন্য ভ্রমণ করতে হচ্ছে, এখন এই চলার আস্বাদে আমার আনন্দ আর নেই, শুধু একটা বিষাদজড়িত বিশ্রাম আছে। বাড়ি থেকে যখন বেরোলাম, শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত সকলের জন্য কত ভাবনা, যত রকম দায়িত্বের সুতোয় জড়িয়ে আছি সবগুলোতে যেন একসঙ্গে টান পড়লো, ট্রেন ছেড়ে দেবার পরেও মন ফিরে-ফিরে ছুটতে লাগলো পিছন দিকে—ঠিক তো? হবে তো? কিন্তু এমনি ভাবতে-ভাবতেই বোঝা যায় যে, হাজার ভেবেও আমি আর কিছু করতে পারবো না, কিছুই করবার নেই আমার, জানবার নেই, বলবার নেই, যতক্ষণ না গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে চিঠিপত্র পাচ্ছি ততক্ষণ আমার আমিত্বময় পরিমণ্ডল থেকে আমার অস্তিত্বটা বিচ্ছিন্ন হ'য়েই থাকবে, আমি সেটা ইচ্ছা করি আর না-ই করি—এই কথাটা যখন বোঝা যায় তখন মন সব ভাবনা সরিয়ে দিয়ে উপস্থিতের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় নিজেকে—তখন বেঞ্চির কোণে হেলান দিয়ে বসি, বই খুলি, জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গাছপালার দিকে। এই উপলব্ধির একদিকে যেমন অসহায় লাগে নিজেকে, তেমনি সেই অসহায়তা থেকেই অন্য দিকে একটা অযাচিত এবং অনুপার্জিত মুক্তির ভাব জেগে ওঠে, ভিতরে-ভিতরে অনেকটা যেন রবিনসন ক্রুসোর মতো অবস্থা—তেমনি নিঃসঙ্গ, তেমনি স্বাবলম্বী, তেমনি বন্দী আর পরম স্বাধীন। অবস্থাটা সুখের তা বলতে পারি না, কিন্তু বাধ্য হ'য়েই নির্ভাবনা হ'য়ে মন যেন সেই সুযোগে মস্ত বড়ো বিশ্রামের ফালি আদায় ক'রে নেয়—কেমন একরকম ঝিম-ধরা আলস্যের মধ্যে কাটিয়ে দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

এরোপ্লেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ব'লে এরোপ্লেনে এই অনুভূতিটা আরো প্রবল। দিনে তবু নানারকম বিক্ষেপ ঘটে, পৌনঃপুনিক আহার প্রভৃতি কিছু-কিছু দৈহিক প্রক্রিয়া বাদ দেয়া যায় না—কিন্তু রাত্রিটা একেবারেই নিবিড়, অখণ্ড, অনবচ্ছিন্ন। আর এই রকম রাত্রি, যে-রাত্রি মুহূর্তে-মুহূর্তে দীর্ঘতর হচ্ছে, যেন এই প্লেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেছিয়ে যাচ্ছে কেবল, যেন সুর-লোকের কোনো লজ্জাহীন দম্পতীর তৃপ্তিহীন আলিঙ্গনের উপর অন্ধকারের আস্তরণটাকে অফুরন্তভাবে টেনে-টেনে দিচ্ছে। এই রাত্রির মধ্যে আর যেন কিছুই নেই, শুধু মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি, স্তব্ধতা, অন্ধকার, আর সেই পুনরাবৃত্তির শৃঙ্খলের গোঙানির মতো এঞ্জিনের এক-টানা গুঞ্জন। ঐ আওয়াজটা শুনতে-শুনতে পরে আর শোনাই যায় না—রেলগাড়ির শব্দের মতো পদ্য বলানো যায় না তাকে দিয়ে, খেলানো যায় না মগজের মধ্যে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে; অমন একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, বিরতিহীন ব'লেই আমাদের বুদ্ধিকে তা যেন নেশার মতো অবশ ক'রে দেয়, ছড়িয়ে পড়ে আমাদের চেতনার পরতে-পরতে সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, অপ্রতিরোধ্য কোনো সম্মোহনের মতো। বিশেষত রাত যখন ঘন হয়, রাত আর ফুরোয় না, না-জেগে না-ঘুমিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে কাটতে থাকে, তখন আর আওয়াজটাকে যেন আলাদা ক'রে অনুভব করাই যায় না; তা মিশে যায়

আমাদের তন্দ্রায়, ভাবনায়, ভাবনা-হীনতায়, ঝ'রে-ঝ'রে পড়ে অনবরত আমাদের অবচেতনে, আমরা তার মধ্যে ডুবে যাই।

বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, শুধু চাপা আলো গলি-পথের উপর, আর তারই আভায় আবছা দেখা যাচ্ছে মানুষ-গুলোকে। হেলানো চেয়ারে যে যার মতো আরামের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে; উলের ওড়নাটি কেউ জড়িয়ে নিয়েছে মাথায়, কারো বা পিঠের উপর ফেলা; কেউ হাঁটু মুড়ে কাৎ হ'য়ে রয়েছে, কারো মাথা ঢুলে পড়েছে কাঁধের উপর। লক্ষ্য করলাম, মেয়েরা প্রায় সকলেই বেশ গভীরভাবে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু পুরুষদের উশখুশ ভাব; মাঝে-মাঝে কাশির শব্দ, দেশলাইয়ের শব্দ, কখনো বা মাথার উপরকার রাত-আলো জেলে দিচ্ছে, বই খুলেই খানিক বাদে রেখে দিচ্ছে আবার। আমিও তা-ই;—যদিও কোনো-এক সময়ে নিশ্চয়ই এতটা ঘুমিয়েছিলুম যে বেইরুট কখন পেরিয়ে গেলো জানতেই পেলুম না, অন্তত এখন আর তার কিছুই মনে নেই। আমি জানলার ধারে আসন পাইনি, কিন্তু এক প্রান্তে পেয়েছি; আমার সামনে আর আসন নেই ব'লে পা দুটোকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছি আমার হাত-বাক্সটার উপর, হাঁটুর উপর বিছিয়ে নিয়েছি ওভারকোট; কোটের উষ্ণতায়, চোখের তন্দ্রায়, আর হঠাৎ-হঠাৎ প্লেনের ডুবসাঁতার দেবার মতো দুলুনিতে বেশ আরাম লাগছে। কিন্তু এই আরামটা শুধুই শারীরিক নয়। 'আমি আছি' আর 'আমি নেই', এই দুটোকে একই সঙ্গে অনুভব করার দুর্লভ বিলাসিতা এটা। 'আমি নেই', সেটাকে অনুভব করা ভাষাগত বিরোধের মতো শোনায়, কেননা, আমিই যদি না রইলাম তাহ'লে অনুভব করবে কে। কিন্তু যেমন ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে, এও সেই রকম। যেমন লিখতে-লিখতে রাত দুটোর সময়, কিংবা কোনো পার্টিতে বারোটা বাজলে, আমাদের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে অথচ আমাদের চেতনা একেবারে পরাস্ত হয় না, আমরা জানি যে, এখনো আরো খানিকক্ষণ আমরা উজান ঠেলে চলতে পারবো; কিংবা যেমন সকালবেলা ঘুম ভেঙেও ঘুমের কুয়াশায় লীন হ'য়ে থাকি আমরা, একটু-একটু স্বপ্নও দেখি আবার বাইরের শব্দও শুনি, আমাদের মূঢ়তাময় স্বপ্নটা যে স্বপ্নই সে-কথা ভেবে শান্তি পাই, তবু সেটাকে আরো একটুক্ষণ দেখবার ইচ্ছেটাও কাটাতে পারি না, হঠাৎ হয়তো মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে তলিয়ে যাই অথচ তখনো মনে-মনে জানি যে একটু পরেই উঠতে হবে—এও সেই রকম, হুবহু সেই রকম। তফাৎ শুধু এই—আর মস্ত তফাৎ এটা—যে এই জড়িয়ে আসার, ভেসে থাকার বিলাসিতায় এখানে কোনো বাধা নেই, বিরোধ নেই; একটু পরেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে নতুনতর কোনো মন্তব্য করতে হবে না, কিংবা দুটো কথাকে জিভের ডগায় নেড়ে-নেড়ে ওজন ক'রে তার মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে বসাতে হবে না কাগজের উপর; এ একে-বারেই মসৃণ, দায়িত্বহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ; সামনে প'ড়ে নেই সারাদিনের পরিশ্রম, নেই কোনো কর্তব্য না-করার ক্ষমাহীন অস্বস্তি; বিবেক থেকে, উদ্বেগ থেকে, প্রয়াসের অপরিহার্য নিপীড়ন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'য়ে এক উষ্ণ, নরম, মায়াময় আত্মবিস্মৃতির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে আছি। আমার মতো জীবন যাদের, যারা অনেকের কাছে অনেক কথা রাখতে পারেনি, নিজের কাছে অনেক কথা রাখতে পারেনি, যাদের শেষ-না-করা, আরম্ভ-না-করা, সাহস-না-করা কাজগুলো যে-কোনো সময়ে সামনে দাঁড়িয়ে দিন-গুলিকে অকথ্য অভিযোগে ভ'রে দেয়—তাদের পক্ষে এই রকমের বিস্মৃতি বিশেষভাবে আরামদায়ক, সন্দেহ নেই। বিস্মৃতি, কিন্তু চেতনার নিমজ্জন নয়। যদি প্লেনটায় শোবার ব্যবস্থা থাকতো তাহ'লে এই রাত্রিটাকে হত্যা ক'রে আমিও লুপ্ত হ'য়ে যেতে পারতুম—হয়তো। কিন্তু ব'সে-ব'সে ঠিক ঘুমোনো যায় না, অথচ একেবারে না-ঘুমিয়েও পারা যায় না; এই দোটানার মধ্যে আমি যেন আমার সত্তার ক্ষীণতম উপচ্ছায়াতে পরিণত হয়েছি, এই নৈশ যানের নীলচে মৃদু আলোর উপর আমার অস্তিত্বটা পাৎলা একটু ফেনার মতো কোনো রকমে ভেসে আছে মাত্র—তবু ভেসে আছে আর আমি সেটা জানতেও পারছি; আমার শারীরিক প্রকৃতি বিশ্রাম চাইছে অথচ এতখানি প্রশ্রয় পাচ্ছে না যাতে সেই বিশ্রামের অনুভূতিটাও হারিয়ে যায়। ঘুমে যখন হাত-পা ঝিমঝিম করছে তখনো হাত তুলে সিগারেট ধরিয়ে একই সঙ্গে ঘুমের আর সিগারেটের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে, আবার যখন মনে-মনে ভাবছি যে এখন নিশ্চয়ই ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে চলেছি তখনো ঐ সমুদ্রের বিখ্যাত নীলিমা চোখে দেখলুম না ব'লে উপযুক্ত রকম দুঃখিত হ'তে পারলুম না; ঘুমের আমেজ ভাবনাটাকে ঘোলাটে ক'রে দিলে। একবার উঠে বাথরুমের দিকে গেলুম ঃ যাত্রীদের বসবার ভঙ্গি নানা রকম অদ্ভুতভাবে বেঁকে-চুরে গেছে, পাশাপাশি চেয়ারে কুঁকড়ে গোল হ'য়ে ঘুমুচ্ছে বাচ্চা ভাই-বোন—কলকাতায় মা-বাবার কাছে ছুটি কাটিয়ে স্কুলে ফিরে যাচ্ছে তারা—আর পিছনের দিকে এইটুকু একটা টেবিলের সামনে ছোট্ট বেঞ্চিতে সোজা হয়ে বসে-বসে ঢুলছে প্লেনের পরিচারক আর পরিচারিকা, হাঁটুর উপর হাত রেখেছে তারা, মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকে যাচ্ছে, সারাদিনের পেশাদারি হাসির পরে তাদের মুখ এখন ভারি সরল, ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে।..... ক-টা বাজলো? কিন্তু থাক, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর কী হবে, আরো কতদূর রাত্রি আছে কে জানে, আর কলকাতায় এতক্ষণে বোধহয় ভোর হ'লো।

তবু শেষ পর্যন্ত রাত্রিটাকে অত্যন্ত বেশি দীর্ঘ মনে হ'লো না, মনে-মনে যে রকম হিসেব করেছিলাম তার চেয়ে দ্রুত বেগেই সময় কেটে গেলো। হাতে কিছু কাজ না-থাকলে সময়ের ভারে হাঁপিয়ে উঠতে হয়, এটাই আমাদের সাধারণ ধারণা, কিন্তু ভ্রমণের সময় এই নিয়মটা যেন উল্টে যায়। চলমান অবস্থার নিজেরই একটা সম্মোহন আছে, সেটা আমাদের সময়-চেতনাকে ক্ষীণ ক'রে দেয়; যে-কর্মহীনতায় স্বস্থানে আমাদের ঘণ্টাগুলিকে গলায় বাঁধা পাথরের মতো মনে হয়, চলতি পথে তারই জন্য সময় হ'য়ে ওঠে অতিশয় সরল, মসৃণ, নিষ্কণ্টক। কাজের অভাব মাত্রে

াও অভাব, ঘটনারও অভাব, ক গাঁটে-গাঁটে মনে রাখবার মতো ও অভাব; একটানা একভাবে লতে সময়ের ওজন যেন ক'মে মাণ-সাইজের চেয়ে ছোটো হ'য়ে ; দিল্লি-কলকাতার ছাব্বিশ ঘণ্টা যতই লম্বা হোক, একবার ট্রেনে নবার পর দেখতে-দেখতেই কেটে য়, অথচ দিল্লিতে পৌঁছিয়ে প্রথম যখন অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, য়, ঘুরতে হয় নানান জায়গায়— টাকে মনে হয় কতই লম্বা। কোনো নতুন জায়গায় প্রথম দু-অব্যবস্থার দিন খুব বেশি ভরপুর ারি মনে হয়, কিন্তু একবার বসার পর অভ্যাসের চাপে সময় কুঁকড়ে যেতে থাকে, হু-হু ক'রে ডারের পাতা খ'সে পড়ে; সময়টাকে তীব্র ক'রে আমরা অনুভব করি, ্রি খাটিয়ে নিই তাকে, চরম আদায় ক'রে নিই, যখন চলতে-কিছুক্ষণের জন্য থামতে হয় । কলকাতা থেকে লণ্ডন, আর থেকে নিউ ইয়র্ক আসতে নে যে ঘণ্টাগুলি আমার কেটে-এখন চিন্তা করলে মনে হয় সে ল্প খানিকক্ষণ মাত্র, কিন্তু লণ্ডন নিউ ইয়র্ক শহরে যে-সময়টুকু এসেছি, মাপতে গেলে ওরই প্রায় মান তার আয়তন, অথচ ঐ এক-দিনই অনেকগুলো দিনের মতো ়রে আছে মনের মধ্যে। তার সেখানে মানুষ ছিলো, ঘটনা ব্যস্ততা ছিলো। ঐ ব্যস্ততাটাই পক্ষে খুঁটির কাজ করে; তার ্য যেমন পীড়াদায়ক, তেমনি তার র অভাব ঘটলেও আমাদের মন ধরার কোনো অবলম্বন পায় না। ন প্রায় অনন্ত রাত্রির হাতে আত্ম-ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে আছি, ন যেন ধ'রেই নিয়েছি যে এই ভরা অন্ধকারের কোনো শেষ নেই, আধো তন্দ্রার মধ্যে পার্শ্ববর্তী কের গলা শুনতে পেলাম—'Just অলসভাবে তাকালাম বাইরে, ামাত্র তন্দ্রা ছুটে গেলো। অসংখ্য দেয়ালি জ্বলছে নিচে, হলদে, সবুজ, আলোর মালা, আলোর ঝাড়, ফাঁকে-ফাঁকে কালো-কালো রাস্তা-গুলো মনের মধ্যে হঠাৎ এক-একটা ভাবনার মতো দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, যদিও নিদ্রাময় নিষ্প্রদীপ বাড়িগুলো লীন হ'য়ে আছে ছায়ার মধ্যেই। রোম? রোম। 'সুন্দর শহর', ইংরেজের পক্ষে একটু আবেগ-ভরেই ভদ্রলোক বললেন। প্লেন ঘুরে-ঘুরে নামতে লাগলো, অদৃশ্য রোম আলোর ঢেউ তুলে-তুলে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, তারপর দূরে মিলিয়ে চোখ থেকে হারিয়ে গেলো। আবার শূন্যতা, আবার অন্ধকার; মুহূর্তের জন্য প্রায় মনে হচ্ছিলো ঐ আলো বুঝি মরীচিকা—কিন্তু না, একটু পরেই মাটি ছোঁবার নরম ঝাঁকুনিটুকু অনুভব করা গেলো, প্লেন দৌড়ে চললো তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো, প্লেন থামলো।

সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদের দৌড় রেস্তোরাঁর দিকে। তারা কেউ-কেউ ব্যাগ হাতে নিয়েছে, ক্ষিপ্রবেগে ঢুকে পড়েছে বাথরুমে, কোট খুলে শার্ট ছেড়ে, গেঞ্জি গায়ে দাড়ি কামাতে লেগে গেছে, প্রবলভাবে এক-একটি বেসিন অধিকার ক'রে হাত-মুখ ধুচ্ছে কেউ বা। এরা পয়লানম্বরি যাত্রী, ভ্রমণবিদ্যায় বিশারদ; যেখানে হোক, যেভাবে হোক, নিত্যকর্ম সেরেই নেবে, কুড়েমি কিংবা গড়িমসি ক'রে একটা সুযোগও হারাবে না। আমি অবশ্য ও-রকম উদ্যমের অধিকারী নই, অতখানি পারিপাট্যের উচ্চাভিলাষও নেই আমার; আমি আস্তে-আস্তে রেস্তোরাঁয় এসে প্রাতরাশের টেবিলে বসলুম। সেখানে খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে দ্রষ্টব্যও কিছু ছিলো। শাদা কোর্তা-পরা ইতালীয় পরিচারকরা, পাৎলা চুল, চওড়া কপাল, ফোলা-ফোলা লালচে-ছিটেওলা চোখ, কালিদাসের নায়িকাদের মতো যব-পাণ্ডুর গায়ের রং, আর তেমনি সৌরসেনী প্রাকৃতের মতো আধো-আধো নরম আওয়াজের ইংরেজি বুলি। সুশ্রী দেখতে—শুধু সুশ্রী নয়, রাশভারি, গম্ভীর; যদিও ঘরের মধ্যে তারা ভিন্ন আর-কেউ বোধহয় ইটালিয়ান ছিলো না, তবু ওদেরই জন্য জায়গাটার একটু অন্য রকম স্বাদ পাওয়া গেলো যেন। একটু আগে এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করেছি, তার সঙ্গে পাঠক দয়া ক'রে এটাকেও জুড়ে নেবেন; কোথাও-কোথাও, কখনো-কখনো এই তালগোল-পাকানো মনুষ্যতার পিণ্ডের ভিতর দিয়েও একটুখানি স্থানীয় আভা ফুটে বেরোয়—অন্তত রোমের এয়ারপোর্টে ব'সে আমার তা-ই মনে হ'লো।

এতক্ষণে রোমের ঘড়িতে ছ-টা বাজলো, আমার ঘড়িতে বেলা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতার মায়া কাটিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিলুম। না-দিলেও চলতো, কেননা, এখনো কোনো নির্ভর-যোগ্য সময়ের নাগাল পাইনি, লণ্ডনে গিয়েই আবার বদলাতে হবে। তবু কেমন দৃষ্টিকটু লাগলো আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, তার অগ্রগামিতা যেন স্পর্ধার মতো। তাছাড়া এমনি আমরা অভ্যাসের ফলে ঘড়ির দাস যে বহি-র্জগতের আচরণের সঙ্গে ঘড়ির ব্যবহার না-মিললে মানসিক আরাম পাই না। এই তো—এখনো রাত কাটেনি, ঘরে আলো জ্বলছে, এখন ঘড়িতে যদি আপিশ যাবার বেলা দেখায় তাহ'লে লাগে কেমন?

কিন্তু বাইরে এসে দেখি—ভোর। হঠাৎ কেমন অবাক লাগলো আমার; এত শিগগির ভোরবেলাকে যেন আশা করিনি। 'এত শিগগির'—তার মানেই 'এত দেরিতে'; দেরিটাই প্রত্যাশিত ছিলো ব'লে আরো কিছু দেরি হ'লেও অবাক হতুম না, এই তিন-চার ঘণ্টার দেরিটাই আমার প্রতীক্ষার দীর্ঘতার তুলনায় 'শিগগির'-এ পরিণত হ'য়ে গেছে। সত্যি, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি এই ভোর-বেলার জন্য, কিন্তু—বাইরে পা দেয়ামাত্র আমার মনে হ'লো—সার্থক হয়েছে এই অপেক্ষা। প্লেন যদি সময়মতো চলতো তাহ'লে রোম পেরিয়ে যেতুম রাত থাকতে; ভাগ্যে দেরি ক'রে চলছে, তাই তো এই ভোরবেলাটিকে পেলুম—অস্পষ্ট, অনির্ণীত, আকারহীন আকাশ-পথে না, শরীরময়ী পৃথিবীর বুকে, স্পর্শময় মাটির বুকে দাঁড়িয়ে, সুন্দরী ইটালিয়ার মাটিতে। ঠিক যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা এই দেশের প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য নমুনা না-হ'তে পারে, কিন্তু এ-ও সুন্দর। অবাধ প্রান্তর গড়িয়ে-গড়িয়ে মিশে গেছে আকাশে, মাঝে-মাঝে গাছপালার রেখা, দূরে আঁকাবাঁকা আবছা-নীল পাহাড়। অনায়াসে কল্পনা

করা যায় যে, দেশেই আছি—ঠিক বাংলা-দেশে না হোক, উড়িষ্যা বা সাঁওতাল পরগণার কোথাও, আর বাংলাদেশের অঘ্রাণ মাসের প্রথম মধুর স্পর্শের মতোই বন্ধুতাময় ঠান্ডার শিরশিরানি, শান্ত হাওয়া, তেমনি নরম নীল নির্মেদ আকাশ, যে-আকাশ এখন যেন আসন্ন আলোর চাপে একটু-একটু কাঁপছে ব'লে মনে হয়। অন্ধকার ভাঁজে-ভাঁজে খ'সে পড়লো, ম্লানভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো দিগন্ত, কোমল সোনালী গোলাপী রোদ আস্তে-আস্তে ফুটে উঠলো এরোড্রোমের শান-বাঁধানো কঠিন মেঝেতে, এরো-প্লেনের পালিশ-করা পাখার উপর ঝিলিক দিলো। এইমাত্র আর-একটা প্লেন নামলো, তার যাত্রীরা তাদের নানা-রকম চেহারা আর পোশাক নিয়ে ভিতরে চলেছে. আমার সহযাত্রীরা বাইরে এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। তাদের ব্যস্ততাহীন ভাব থেকে অনুমান করলুম আমাদের ধূমকেতুটি এখনই আবার রওনা হচ্ছে না। তাহলে একটু ঘুরে বেড়ানো যায়? এলুম পিছনের দিকে, পূব দিক সেটা। সেখানে শহর-তলির রাস্তা, দূরে দূরে গরীব ভাবের বাড়ি, গাছের সারি, টেলিগ্রাফের তার, দু-তিন মিনিট পর-পর লোকাল ট্রেন উজান-ভাটিতে ছুটে যাচ্ছে। এই সমস্ত —নতুন রোদে সোনালী-হয়ে-ওঠা প্রান্তরের মধ্যে, পায়রার বুকের মতো আকাশের তলায়। ভালো লাগলো আমার —ঐ ট্রেনগুলোকে বিশেষ ভালো লাগলো। পথিকের চোখে স্থায়ী জীবনের পরিচয় এনে দিলো এরা, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত, শিকড়-গজানো জীবনের ছবি—ঐ তো ট্রেনে চড়ে কাজে বেরোচ্ছে লোকেরা, রোজ যেমন বেরোয়, এই কথাটা চিন্তা করে আমার সাম্প্রতিক অস্থায়িতার মধ্যে সান্ত্বনার স্পর্শ পেলাম। ইচ্ছে হলো আরো কাছে গিয়ে ট্রেনগুলোকে দেখি, কিন্তু আমার সে-সাধে বাদ সাধলো এয়ার-পোর্টের একজন কর্মচারী। সে কী বললে আমি ঠিক বুঝলুম না, কিন্তু তার মুখের ভাবে সন্দেহ হলো আমি হয়তো অজান্তে কোনো নিয়ম-ভঙ্গ করছি। একটু পরে সে ফিরে এসে তার পক্ষে শ্রমসাপেক্ষ ইংরেজির সঙ্গে হাতের ভঙ্গি যোগ ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, আমার কর্তব্য হচ্ছে সহযাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো—এখানে নয়। জানি না এই প্রকান্ড চত্বরের মধ্যে আমি এই-টুকু একটা মানুষ এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকলে কার কী ক্ষতি হতো, কিন্তু ঐ গড্ডলিকার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেও মন সরলো না—অগত্যা যথাসম্ভব শ্লথ চরণে প্লেনের দিকেই ফিরে গেলুম, প্লেনে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলুম চারদিকে, চোখে-মুখে ঈশ্বরের মুক্ত হাওয়ার স্পর্শ নিলুম। ততক্ষণে উজ্জ্বল হয়েছে রোদ, দূরের পাহাড় নীল-ধূসর আকৃতি নিয়ে কাছে সরে এসেছে যেন, নদীর ওপারের রেখার মতো ঝিলমিল করছে নগ্ন দিগন্ত—সেখানে উড়ন্ত আর নামন্ত প্লেনের নাচের ভঙ্গী আকাশের গায়ে জাফরি কেটে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এই এখানে যখন আলোতে আর নীলিমায় মেশা ল্যাটিন স্বচ্ছতা, প্রায় বাংলাদেশের হেমন্তের সকাল, প্রায় রবীন্দ্রনাথের শরতের গানের অশ্রুত গুঞ্জন, ঠিক এমনি সময়েই শোনা গেলো, টিউটনিক উত্তরা-পথে গাম্ভীর্যের গুণ্ঠন নেমেছে, লন্ডন কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তারই ঘোর কাটাবার জন্য অপেক্ষা করছে আমাদের প্লেন। এটাও ভাগ্যের কথা—অন্তত আমার তাই মনে হলো—ব্রাউনিঙের কাম্পানাতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেলুম This morn of Rome and May—যদিও মে মাস নয়, আর রোম নগরেরও আভাসমাত্র চোখে পড়লো না, তবু এই সুন্দর সকালবেলাটির মধ্যেই ইটালির মানসমূর্তিকে মনে-মনে নমস্কার করলাম।

সুন্দর দিন, সত্যি। এখন প্লেন আবার চলছে, কিন্তু প্লেনের অবরোধের সংকীর্ণতাও এই উদীয়মান দিনের আভাকে একেবারে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, আকাশটাকে ঠিক দেখা না-গেলেও অনুভব করা যাচ্ছে, ঘুলঘুলির মোটা কাচের ভিতর দিয়ে এক-এক ফালি রোদ এসে পড়ছে কখনো কোনো ভাগ্যবানের কোলের উপর। চলেছি উত্তর দিকে, যে-কোনো মুহূর্তে কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আসতে পারতো, কিন্তু হয়তো আমরা কুয়াশার চেয়েও উপরে আছি বলে, কিংবা নেহাৎ ভাগ্য ভালো বলেই, আকাশে বদান্যতা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলে একেবারে আল্পস পর্বতমালা পর্যন্ত হঠাৎ এক সময় তাকিয়ে দেখি, নীচে ছড়িয়ে আছে রাশি-রাশি শুভ্রতার পুঞ্জ রোদের প্লাবনে উজ্জ্বল, কোথাও হাতি দাঁতের মতো ঈষৎ-বাদামি, কোথা শ্বেতপাথরের মতো ফিকে-ধূসর, আ কোথাও বা বিশুদ্ধ শাদা, তার নির্ম নির্মলতা যেন সূর্যের আলোর মধ্যে মিশে যেতে চায়। পাঁপড়ির পরে পাঁপ খুলে গেলো আমার চোখের সামনে—কিংবা দৃষ্টির তলায়, ভাঁজে ভাঁজে গড়িয়ে চললো চৈনিক দৃশ্যছবির মতো, কোনো অদ্ভুত স্থাপত্যের মতো রেখা, কোণ বঙ্কিমা নিয়ে ফুটে উঠতে লাগলো—ভঙ্গির পর ভঙ্গিতে, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গে পাহাড়ের গায়ে ধাপে-ধাপে আটকে আছে শাদা, ম্লান, পাঁশুটে মেঘ, যেন বাচ্চা-বাচ্চা ভেড়ার পাল পড়ে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, কিংবা যেন অসংখ্য নধর শিশু পীনস্তনী বিশাল কোনো মায়ের বুকে আঁকড়ে পড়ে আছে। রোদ, মেঘ আর তুষারে মেশা শুভ্রতার এক বিচিত্র বিস্তার দেখতে-দেখতে চললাম। এরোপ্লেনের অনেক নিন্দে করেছি এতক্ষণ, যেন তারই মহৎ প্রতিহিংসাস্বরূপ সে হঠাৎ তার ঝুলি থেকে এই তুষার-দৃশ্যটি বের করে আমাকে দেখিয়ে দিলে। তখনকার মতো হার মানতে হলো।

কিন্তু এর মধ্যেও ফাঁকি আছে। এই-যে দেখলুম, এর মানে কি দেখা হলো? আমি কি এর জোরে একথা বলবার অধিকারী যে, আল্পস পাহাড় আমি 'দেখেছি'? না। একে দেখা বলে না, এর নাম দৃষ্টিপাত—তাও যাকে বলে বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে, অক্ষরগত অর্থেও তা-ই ভাবগত অর্থেও তা-ই। অল্পক্ষণের জন্য দেখলুম বলেই খুঁত রয়ে গেলো তাও নয়, প্লেন যতক্ষণ ধরে আল্পসের উপর দিয়ে চলছিলো, তার ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশেও কখনো-কখনো সার্থকতম দেখার অভিজ্ঞতা ঘটে যায় আমাদের। প্রথম যখন সমু দেখেছিলাম, ভাবতে গেলে দেখা কাজটিতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু সেই এক মুহূর্তেই আমি অবিস্মরণীয়ভাবে অনুভব করেছিলাম-

লতে পারি সমুদ্রের সমুদ্রতা। করে আল্পস-এর স্বরূপ কি ধরা আমার মনে? না,—সে-রকম সম্ভাবনারও সমীপবর্তী হইনি। রণ, পরিপ্রেক্ষিতের ভুল। পাহাড় হয় মাটিতে দাঁড়িয়ে, উপরের চোখ তুলে, দেখতে হয় কেমন করে দিকে উঠে গেছে তার চূড়া, যাকে এতকাল বড়ো-বড়ো পাহাড় বলে সেগুলো কেমন কুঁকড়ে গিয়ে মেছে তলায়, প্রবল মেঘ দীন হয়ে নবেষ্টন করে আছে, আমাদের মস্ত জীবনের দিকে অনেক, অনেক কে অনির্বাণ, মহান, উদাসীন র দৃষ্টিতে চিরকাল ধ'রে তাকিয়ে ছে অথচ তারও উপরে জেগে আছে অপরিমাণ আর তারও চেয়ে নি আকাশ। কিন্তু সেই আকাশ পাহাড়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পথ যখন এরোপ্লেন চলে, আর সেই প্লেনে বসে মানুষ নীচের দিকে য় পাহাড় দেখে, তখন সেই দের দ্বারা পর্বতের মহিমা আমরা করি, অপমান করি তার আত্মাকে, করি তার সত্তার সার—কেননা, মহিমা বলে তুষার-শৃঙ্গের কিছুই থাকলো লিখতে-লিখতে আমার মনে পড়ছে দারজিলিঙের টাইগার হিল-এ দয় দেখতে গিয়েছিলাম। সূর্যোদয় জমেনি সেদিন, কিন্তু ভোরের আগে নে ঠাণ্ডায় ঐ রকম একটি জায়গায় দাঁড়াতে পারাটাই এত বড়ো চিত্ত-ধকর ঘটনা যে, সূর্যোদয়ের রঙের য় ভাগে কিছু কম পড়লো বলে সোস করিনি। আশ্চর্য সেই মোটরের জিলিপির প্যাঁচের মতো অবিরাম ছে, এক পাশে অতল গহ্বর, আর পাশে তরুশ্রেণীর নিবিড় অন্ধকার হেডলাইটে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে মাঝে। আরো আশ্চর্য সেই শেষ টুকু, যেখানে গাড়ি আর চলে না, কেড়ে-নেয়া বুক-ভেঙ্গে-দেয়া, ড়র চড়াই বেয়ে অনেকক্ষণ চলতে হয়, পৌঁছনো যায় সেই সমতল জায়গা-তে, যেখানে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে ধকারে দাঁড়িয়ে সূর্যের জন্য প্রতীক্ষা লোকেরা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য—ই জায়গাটাই। যখন আলো ফুটলো, তাকাতে গিয়ে চোখের যেন পলক পড়ে না। চারদিকে তুষার, চিরন্তন, নিরঞ্জন তুষার, চূড়ার পর চূড়া, নিষেধের পর নিষেধ, আহ্বানের পর আহ্বান। অপ্রতিরোধ্য আহ্বান, অনস্বীকার্য মহিমা। হিমালয়ের স্বপ্নময়, ধ্যানমগ্ন রূপটিকে সেদিন আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। এই রূপটাই তার স্বরূপ, এর সামনে এলে মানুষ যেন মুহূর্তের জন্য চিরন্তনের মুখোমুখি দাঁড়ায়, মাথা নিচু হয়ে আসে, আত্মনিবেদনের উন্মুখতা জাগে মনের মধ্যে। চোখের আনন্দের সঙ্গে মনের এই নম্র ভাবটিকেও মূল্যবান উপার্জন ব'লে ধরতে হবে। মানুষ শক্তিশালী, মানুষ এই সৃষ্টির অধিনায়ক, এই কথাটা জানতে পারা যেমন জরুরী, তেমনি মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ, কত দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ, এই কথাটাও মাঝে-মাঝে অনুভব করা প্রয়োজন—নয়তো জীবনের ভারসাম্য থাকে না। আজকের দিনে সেই ভারসাম্য উল্টে যাবার অবস্থা হয়েছে, আল্পস-এর দৃষ্টি-অন্ধ-করা কৈলাসকে এরোপ্লেন একটা খেলাঘরে পরিণত করে দিলে, বড়ো জোর একটু রমণীয় আমোদে; তার কাছে আর ছোটো হতে হলো না আমাদের, বরং আমরাই তার অত বড়ো উঁচু মাথাটার উপর দিয়ে চলে এলাম—শক্তির নিশেন উড়িয়ে, বঞ্চিত হয়ে, সদর্পে।

আর তাছাড়া আল্পস-এর সঙ্গে আমার চোখের মিলন খুব যে সুসাধ্য হয়েছিলো তাও বলতে পারি না। পার্শ্ববর্তীর কাঁধের উপর দিয়ে ঘাড় বাড়িয়ে, কখনো উঠে দাঁড়িয়ে, কখনো অন্য কারো চেয়ারের পিঠে হাত রেখে অশোভন ভঙ্গিতে দেহটাকে ন্যুব্জ করে—একসঙ্গে দুই দিকেই দেখবার চেষ্টায় আমিই প্রায় দ্রষ্টব্য হয়ে পড়েছিলাম। যাত্রীদের মধ্যে এতখানি চাঞ্চল্য আর-কেউ প্রকাশ করেনি, যদিও একজন ক্যামেরায় ছবি তোলার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে উদ্বেল হয়ে উঠছিলো থেকে-থেকে। আমি মনের ক্যামেরাতেই অধিকতর বিশ্বাসী ব'লে চোখ দিয়ে যেটুকু পারি দেখে নিলুম, তারপর—পাহাড় যখন শেষ হয়ে গেলো—ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলুম যে একটু পরেই ফ্রান্স এসে পড়বে, তারপর ইংলিশ চ্যানেল—ঐ সমুদ্রের জল একটুখানি চোখে পড়বে তো? এই রকম ভাবতে-ভাবতেই—অন্তত আমার তা-ই মনে হলো, যদিও আসলে নিশ্চয়ই বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছিলো এর মধ্যে—যেন ম্যাজিকের মতো মস্ত একটা শহর গজিয়ে উঠলো আমার চোখের তলায়—চারদিকের রাস্তা দিয়ে দাবার ছকের মতো ভাগ-ভাগ করা নিবিড় গৃহপুঞ্জ, ঢালু ছাদ, পথে লাল রঙের বাস চলেছে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব—খুব নিচু দিয়ে যাচ্ছে তো। কোন শহর? যাত্রীদের ব্যবহারেই এর উত্তর পাওয়া গেলো ঃ টুকিটাকি জিনিশ ভ'রে নিচ্ছে হাতব্যাগে, কোট প'রে নিচ্ছে, জুতোর অস্তিত্বহীন ধুলো ঝাড়ছে কেউ বা। এর মধ্যে এসে গেলো! কখন শেষ হলো ইউরোপের মহাদেশ আর সেই মহাদেশ আর বিটিশ দ্বীপের মধ্যবর্তী খালটুকুই বা কখন পার হলাম—কিছুই বোঝা গেলো না। হ্যাঁ, লণ্ডন নিশ্চয়ই—ঐ তো তার চিরাচরিত খ্যাতিরক্ষার জন্য আকাশ ঝাপসা হয়ে এলো, রোদ্দুর ম্লান, দক্ষিণের আলোর দাক্ষিণ্য উত্তরে অনধিকারপ্রবেশ করেনি, যেন কোনো নির্দিষ্ট সীমান্তরেখায় পারস্পরিক চুক্তি-অনুসারে বিদায় নিয়েছে। এ-কথা লণ্ডনের নিন্দার অর্থে বলছি না, বরং আমার লণ্ডনে নেমেই দেশটাকে বড়ো স্নিগ্ধ বলে মনে হলো; বাতাস মৃদু, আকাশ মেদুর, রোদ ঠাণ্ডা। ভালো লাগলো এয়ারপোর্টের আঙিনায় ঘনসবুজ ঘাস, ভালো লাগলো ইংরেজের নরম গলার পরিষ্কার উচ্চারণে ইংরেজি শুনতে। তখন স্থানীয় ঘড়িতে দশটা মাত্র বেজেছে, আমার হাতঘড়ির কাঁটা আর-একবার পেছিয়ে দিতে হলো। তারপর কাস্টমস সেরে, বাড়িতে টেলিগ্রাম ক'রে, প্লেন-কোম্পানীর বাস-এ চড়ে এয়ার-টার্মিনাসে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা প্রায় দুপুর। সেখান থেকে হোটেল। হোটেলের ঘরে এসেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, হাত বাড়িয়ে টেলিফোন তুললাম। চেনা গলার আওয়াজের সঙ্গে বিছানার নরম স্পর্শে আরাম ছড়িয়ে পড়লো শরীরে—বোঝা গেলো শরীরটা অনেকক্ষণ ধরেই দিগন্তের সমান্তরাল হবার জন্য উৎসুক ছিলো ভিতরে-ভিতরে। —কিন্তু শুয়ে থাকার সময় নেই, এখনই বেরোতে হবে, স্নানটা সেরে নেওয়া দরকার।

ইন্দ্রজিতের আসর

আজ কোনো কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে—আপনারা ভাবছেন, সব ফেলে দিয়ে এবার মানসসুন্দরীর আরাধনায় বসব। মোটেই তা নয়। আমি এমন অরসিক নই যে, হাতের কাছে মানুষ থাকতে হাওয়ায় মানসসুন্দরী হাৎড়ে বেড়াব। একে তো সে বয়স আর নেই, তা ছাড়া মানসসুন্দরীই কি আর আছে? এহেন র‍্যাশনাল যুগে (রেশনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই) মানসসুন্দরী থাকা স্বাভাবিকও নয়। সুন্দরী যথেষ্টই আছেন, কিন্তু সুন্দরী আর মানসসুন্দরী তো এক নয়। কারণ সুন্দরীকে সুন্দরী হতেই হয়, কিন্তু মানসসুন্দরীকে সুন্দরী না হলেও চলে। আর তাই যদি হয়, তবে যিনি যথার্থই সুন্দরী, তিনি সুন্দরী নাম ঘুচিয়ে মানসসুন্দরী হতে যাবেন কেন? রবীন্দ্রনাথ মিছিমিছি এত কাব্যিয়ানাও করতে পারেন! অনর্থক একটা ধোঁয়াটে কথা জুড়ে দিয়ে সুন্দরীদের মনে বিষম খট্‌কা লাগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য যাঁরা তেমন সুন্দরী নন, তাঁদের মনে হয়তো বা কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করে থাকবেন। তবে কিনা সেসব ভবীদের ভুলবার কথা, তাঁরা আজকাল বড় সহজে ভোলেন না। তাঁদের কাছে মানসসুন্দরীর চাইতে সুন্দরীর কদর বেশি। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতো ভালো-মানুষদের পেয়ে অনেক ধোঁকা দিয়েছেন। পড়তেন আজকের পাঠকদের পাল্লায় তো কেরামতি বোঝা যেত। এই তো সেদিন এক যুবক বন্ধুর সঙ্গে আমার বিষম তর্ক। বলছিলেন, আপনাদের রবি ঠাকুর মেয়েদের সম্বন্ধে মিষ্টি মিষ্টি অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু মেয়েদের যা হক্‌-এর প্রাপ্য, সেটি কখনো দেননি। এই দেখুন না কেন, নারীকে বলেছেন অর্ধেক মানবী তুমি। অর্থাৎ কিনা পুরো মানুষ নয়। পুরুষ না হলে বুঝি পুরো মানুষ হয় না? বুর্জোয়া মন যাবে কোথায়! শাস্ত্রে বলেছে অর্ধাঙ্গিনী। কই রবীন্দ্রনাথ তো শাস্ত্র বাক্য ছেড়ে এক পা-ও অগ্রসর হননি। তর্কে আমি মনে মনে হার স্বীকার করেছি, কারণ যুক্তিটা ন্যায়সংগত। ইংরেজ চালাক জাত। সেও নারীকে বলেছে অর্ধাঙ্গিনী, কিন্তু বলেছে বেটার-হাফ, অর্থাৎ দশ আনা ছ' আনা ভাগ করেছে। নারীর মান রেখেছে, মনও রেখেছে।

এই দেখুন কাণ্ড! এক মানস-সুন্দরী কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়েই এতখানি বক্তৃতা করে ফেললুম। শুধু বলতে যাচ্ছিলাম—আর সব কাজ রেখে, সব ফেলে আবার এই আপনাদের নিয়েই আসর জমাব। প্রায় সাত বছর আগে আপনাদের সঙ্গে আসর জমিয়েছিলাম। তারপরে মাঝে মাঝে যদিবা দেখা দিয়েছি, তাহলেও গত তিনটি বছর আসর থেকে বেমালুম গড় হাজির। এতদিনে অনেকে বোধ করি ভুলেও গেছেন। ভুলে যাবার কথাই তো। কতদিন আপনাদের দেখিনি, দুদণ্ড বসে খোসগল্প করিনি। তার ফল আমার পক্ষে অন্তত ভালো হয়নি। আপন লোককে যে ছেড়ে যায়, তাকেই বলে পরলোকগত। এ্যাদ্দিন পরে আমার কথা-বার্তা বোধ করি পরলোককী বাৎএর মতোই শোনাবে। দেখেছেন তো কথা শুরু করতে গিয়েই মানস-সুন্দরী এসে গেল। সে কি আমার কথা না অপর লোকের কথা। অপর লোকের কথাকেই বলে পরলোককী বাৎ। সত্যি বলতে কি, আজ বয়স নেই বললে কি হবে, বয়সকালে রবীন্দ্রনাথ যে মানসসুন্দরীর ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন, সে-ভূত আজও আমাদের ঘাড় থেকে পুরোপুরি নাবেনি। ঐ যে অর্ধেক মানবী কথাটা দিয়ে বন্ধুটি তর্ক করে গেলেন, সেই কথাটাও আমরা বয়সকালে মেনে নিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ নারীকে বলেছেন—অর্ধেক কল্পনা। আমরা আমাদের নারীকে শুধু অর্ধেক কেন বারো আনাই কল্পনা দিয়ে গড়ে নিয়ে ছিলাম। পাছে আমাদের কল্পনা কৃপণ প্রতিপন্ন হয়, সেই কারণে পত্নী নির্বাচনের বেলায় সুন্দরী খুঁজতে যাইনি। মুখশ্রী সুন্দর না হলেও ক্ষতি নেই, বর্ণ গৌর হবার প্রয়োজন নেই, নাক টিকলো নাই বা হ'ল। মানবীর দেহে যেটুকু অপূর্ণ ছিল, কল্পনা দিয়ে তাই পূরণ করে নিয়েছি। রূপ চাইনি, অপরূপকে চেয়েছিলাম। যে বন্ধু সত্যিকারের সুন্দরীকে বিয়ে করেছে, তাকে বরং অবজ্ঞার চোখেই দেখেছি। কারণ কিনা সে সুন্দরীর পায়ে মানসসুন্দরীকে বলি দিয়েছে। ভাবতুম, যে ব্যক্তি নারী দেহে বিধাতার দেওয়া সৌন্দর্যের উপরে নাড়া কোনো সৌন্দর্য আরোপ করতে অক্ষম, সে আবার পুরুষ কি, সে কাপুরুষ। তাকে পরম নিঃস্ব জেনে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছি। অবশ্য সেদিনের তর্কে বন্ধুর কাছে এসব যুক্তির অবতারণা করিনি। এ যুগের ছেলেরা কাব্যিয়ানা একেবারে সইতে পারে না। আমি গম্ভীর ভাবে ওঁর সব কথা শুনে নিয়ে বললাম, আপনি বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের ও কবিতার মানেটা ঠিক ধরতে পারেননি। ওর মধ্যে বেশ খানিকটা বিদ্রূপের খোঁচা আছে। বলতে চেয়েছেন, বিধাতা সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন নড়বড়ে হাতে। অসম্পূর্ণ রেখে ছেড়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ করবার ভার পড়েছে মানুষের হাতে। পুরুষ গড়েছে তোমায় সৌন্দর্য সঞ্চারি—কথাটার আসল মানেটা বুঝতে পেরেছেন তো? অর্থাৎ, বিধাতা নারীকে সৃষ্টি করেই খালাস। কিন্তু বিধাতাপুরুষ আর সংসারী পুরুষের পছন্দ তো এক নয়। সে বিধাতার সৃষ্টির উপরে রং বুলিয়েছে। অর্থাৎ কিনা কস্‌মেটিক সৃষ্টি করেছে পুরুষ মানুষ। যুবক বন্ধুটি এতক্ষণে খুশি হয়ে বললেন, হাঁ তাই যদি বলেন তো মানতে রাজি আছি।

ত্য কথা বলতে কি, ইদানীং মানস-, অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা বিষয়ে আমারও মতামতের পরিবর্তন হয়েছে। চোখে চাল্‌সে অবধি দিব্য দৃষ্টি খানিকটা ফিরে। থ্যাবড়া নাক এখন নিতান্ত বলেই মনে হয়, আর প্রমীলা দেবী নে রাগই করুন আর যাই করুন, মেয়ের (তবু যদি কালো হরিণ-হাত) কালো রং দেখে মনে আর া না।

দেখুন আবার কথার খেই হারিয়ে। সেই আমার পুরোনো স্বভাব। থা বলতে গিয়ে আরেক কথায় াই। আমার সব কথাই গড়-ঠিকানা, কোনোটাই গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছয় না। অথচ বলবার কথা কিছুই নেই। একটি মাত্র কথা, সেটাই গোড়াতে বলতে গিয়েছিলাম—আজ কোনো কাজ নয়, আজ শুধু আপনাদের নিয়েই আসর জমাব। মনে আছে বোধ হয়, বছরখানেক আগে একবারটি মাত্র আপনাদের আসরে উঁকি মেরেই নিতান্ত অভব্যের মতো সরে পড়েছিলাম। তখন ছিলাম বিষম ব্যস্ত-বাগীশ, কাজের ওজর দেখিয়ে পালিয়েছিলাম। এবার আর কাজ নয়, তাই বলে মানসসুন্দরীও নয়। বয়সকাল গিয়ে এখন বুঝতে পেরেছি, মানস এর চাইতেও বড় জিনিস আছে, সে মানুষ। নিতান্ত ব্যাকরণে বাধে বলেই, নইলে বলতুম, মানুষ-সুন্দরী। সত্যি বলতে কি, অনেক তো দেখলুম, কিন্তু মানুষের চাইতে সুন্দর আর কিছু দেখিনি। আর সত্যিকারের যে আড্ডাধারী মানুষ আমি তাকেই বলি নরোত্তম।

আজকে এখানটাতেই শেষ করি, নইলে আবার কোন্ কথায় এসে যাব। আজ শুধু দেখা-সাক্ষাৎটা হল, পরে রয়ে বসে আসর জমানো যাবে। আপনাদের মধ্যে অনেককেই নতুন দেখছি। আবার প্রথম আসরের পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে অনেককে দেখছি নে। ট্রামে-বাসে ও'দের কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় তো খবরটা দেবেন। বলবেন, লোকটা আবার এসে জুটেছে।

পৃথিবীর পথে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

এ জান্‌লা জ্যান্ত।
যে-দৃশ্য সারে সারে
চুপি চুপি উঁকি মারে
মনে হ'লো বারে বারে
কোনো অক্লান্ত
অদৃশ্য ছায়াহাত
করে যবনিকাপাত
পটখানি স'রে গেলে
কমলিনীকান্ত
আবার হাজির হয়
হাসে, ডাকে, কথা কয়—
অরুণিম আলো-লাগা
পূর্বের প্রান্ত
আবার দেখায় দিক্—
পুরোনোরই বার্তিক;
এ আকাশ দেয় দিক
কোনো অভ্রান্ত
সত্যেরি ইশারায়
দেখি চেনা চেহারায়
প্রতিরূপ আসে যায়
জানা নয় চেনা তবু
মঞ্চের প্রান্ত
এতটা যে মন-চোর
আগে কে তা' জানতো?
ব'সে ব'সে চেয়ে দেখি
এটা ঝুটো ওটা মেকি
জ্ঞানীরা বলেন ঠিকই
তাঁরা সাধু সন্ত।
চোখের সমুখভাগে
খালি যেন ধাঁধাঁ লাগে
ঘুলিয়ে খাচ্ছে পাক
কতো আদি অন্ত।
নিতি তারই অবসরে
কতো কল্পনা মরে
কাছে এসে দূরে সরে
অনেক দিগন্ত।
জান্‌লার ফ্রেমে আঁটা
চেয়ারে সময় কাটা
ঝিঁ-ঝিঁতে অবশ পা'টা
লাগে বড়ো শ্রান্ত।
বৎসর বারোমাসে
যতো প্রাণ ম'রে আসে
দেখি বিস্ময়ে ত্রাসে
এ জান্‌লা জ্যান্ত।

দীর্ঘ খেচরণের পরে ভূমিস্পর্শে যাত্রীর আপন দেহটি অস্বাভাবিক রকম লঘু বলে মনে হয়। ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে কার্ল মুনের সেকথা অজানা ছিল না। তার মনে আছে সে যখন প্রাহা থেকে আকাশপথে টুলায় নীত হয়েছিল—যাক্ সেকথা, কার্ল সেকথা মনেও আনতে চায় না আর।

দমদমে পৌঁছে কিন্তু মাটি ছুঁয়ে নিজেকে তার ভয়ানক রকম ভারী মনে হোলো। সঙ্গে জিনিসপত্র যে বেশি ছিল তা নয়, —কী করেই বা থাকবে? সেই নাৎসী পুলিস যেদিন এসে তার ঘর চড়াও করল খানাতল্লাসের অজুহাতে—থাক, একথাও কার্ল আজ আর স্মরণ করতে চায় না।

তবু, দমদমে নেমে কার্ল যেন তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারছিল না; যেন পিছন থেকে কেউ টানছিল, যেন বুকের কোনো বোঝা প্রতি মুহূর্তে তার গতিবেগ সংযত করছিল।

কার্ল জানতো, সত্যি পিছনের কোনো টান তার ছিল না। বুঝতে চায় নি যে, সেই ছিন্নমূল অবস্থার দুঃসহ মুক্তিই তার মনের অচ্ছেদ্য বন্ধন। ইতিপূর্বে সে "হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন" কথাটা শুনেছিল। বস্তুত, প্লেনে বসে সে ভেবে রেখেছিল যে, দমদমে নামতে কোনো কুলী (একথাটাও সে শুনেছিল) যদি তার দিকে এগিয়ে আসে তখন সে হেসে বলবে, "আই অ্যাম ট্র্যাভেলিং লাইট; উইদাউট দি হোয়াইট ম্যান'স বার্ডেন, য়ু নো!" তবু, ওই আগে যা বলছিলুম, কার্লের নিজেকে ভয়ানক ভারী মনে হচ্ছিল।

বিমান ঘাঁটিতে তাকে কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে কিনা কার্ল জানতো না। তবু সে আশা করেছিল যে, তার কলকাতায় থাকবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো একটা খবর তার জন্যে অপেক্ষা করবে। কে এল এম কোম্পানীর অফিসে খবর নিতে গিয়ে সে শুধু দেখল যে পর দিন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাড়িতে ককটেল পার্টির একটা নিমন্ত্রণপত্র ছাড়া আর কিছু নেই তার জন্যে। এই অনধিক আতিথেয়তায় কার্ল ক্ষুণ্ণ হোলো না, ভারতবর্ষের প্রতি বিরূপ হোলো না, ভারতবাসী জাতিটার উপর ক্রুদ্ধ হোলো না। গত কয়েক বছরে সে শিখেছিল মানবজাতির কাছে বেশি কিছু আশা না করতে। অল্পেই তুষ্ট হতে। বিতাড়িত না হ'লেই নিজেকে স্বাগত বলে মনে করতে। অপমান না পেলেই নিজেকে সম্মানিত অভ্যাগত বলে জ্ঞান করত।

কার্ল তাই কারো উপর রাগ করল না। কিন্তু একান্ত অপরিচিত পরিবেশে তার নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হোলো। দমদম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিমান ঘাঁটি নয়, কিন্তু এর গঠনভঙ্গি নিঃসন্দেহে আধুনিক। অন্যান্য বিমানবন্দরের মধ্যম এই অনুকরণটি দেখে বিরক্ত হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু বিস্ময় অসম্ভব। বিস্ময় লাগল অনতিদূরের ওই ভাঙা কুটীরগুলি দেখে। কার্ল তার য়ুরোপকে জানতো; এশিয়ায় চাকরি নেবার আগে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল প্রাচ্যের প্রাচীনতার জন্যে। কিন্তু দমদমে নেমে সে যে মিশ্রিত চিত্রের সম্মুখীন হোলো তার কাছে হার না মেনে উপায় নেই। এ যে এ-ও নয়, ও-ও নয়। বিচিত্র নয় যে, নূতন ও পুরাতনের এই বিস্ময়কর প্রতিবেশিত্বে, এশিয়া ও য়ুরোপের এই অদ্ভুত সংমিশ্রণে; নবাগত কার্ল মুন কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত বোধ করল।

অনিশ্চয়তা বাড়ল বিমান কোম্পানীর চৌরঙ্গী অফিসে এসে। এখন কোথায় যাবে কার্ল? কোন হোটেলে? দমদমে বাসের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় একটা হোটেল তালিকা এসেছিল কার্লের হাতে। নামের সামনে হোটেলের দৈনিক দক্ষিণার হারের উল্লেখ ছিল। কিন্তু দ্রুত দেশ পরিবর্তনের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে,

মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে পারস্পরিক ...পেক্ষ সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ হয়ে ...ডয়শমার্কের মানে বিচার করলে, ... পঁয়ত্রিশ টাকা কি খুব বেশি না ... কার্ল মুন কাগজ-কলম নিয়ে হিসাব বসে উৎসাহ পেল না। বিমান ...নীর অফিসের নিকটতম হোটেলে উঠল। দরকার হয় তো পরদিন সঙ্গে পরামর্শ করে আর কোথাও ...ওয়া যাবে। আপাতত বিশ্রাম করা

...ন্তিপ্রিয় লোকের পক্ষে দেহের ... মানেই মনের দ্বিগুণ খাটুনী। ...র মনে তাই নানা চিন্তা নানা কল্পনা ...ভীড় করল। বাঙলা দেশের শ্রমিকের ...তার কাজ, এবার সে তাই বাঙলা ...। রাজনীতির সঙ্গে আর কোনো ...যোগ রাখবে না। রাজনীতির ...ম্ভাবী পরিণতি যে বিরোধ সে ...ধ তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে ...ধও আবার ভদ্র যুক্তিবিনিময়ে সীমা-...থাকে না, বর্বর যুদ্ধে পরিণত হয়। ...দ্ধ আর তার রুচি নেই। তাই সে ...ড নিরপেক্ষ নেহরুর দেশে। এখানে ...জ করবে, ভাব করবে। আবার যদি ... য়ুরোপ বিভেদ ভুলে সভ্য হয়, ...য়তো কার্ল য়ুরোপে ফিরবে। ... ফিরবেই না। সে সম্ভাবনা সুদূর। ...ত, শান্তি চাইলে এশিয়ায় এসো, কার্ল এসেছে। এশিয়ায় কৃষির ... করে, শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে, কোটি ... দরিদ্রের দুঃখ মোচন করো। ... কালো, ব্রাউন চাষীর নগ্ন পাঁজর-... একটু মাংস দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা ...

কার্ল শান্তিদায়ী এই সমৃদ্ধ ভারত-...র কল্পিত চিত্র থেকে যথাসম্ভব ...না আহরণ করল। কিন্তু মন থেকে ...চিন্তাটা কিছুতেই দূর করতে পারল ...সে, য়ুরোপের পন্থা অনুসরণ করে ...ও যদি একদিন শিল্পগর্ভা হয়ে ... তবে তার পরদিন সেও হয়তো ...পেরই মতো যুদ্ধস্রাবী হয়ে উঠবে। ...শিল্পের সন্ততি অস্ত্রসম্ভার ধারণ ...র জন্যে থাকবে এশিয়ার অগণ্য জন-...গণ। য়ুরোপের সেদিন কী অবস্থা ? কার্ল এ আশংকাটি আসন্ন বলে

মনে করল না; কিন্তু শান্তিপূর্ণ ভারত-বর্ষে শিল্পগঠনে তার ভূমিকা যে সম্পূর্ণ-রূপে বিপন্মুক্ত, এই মোহ আর তার রইল না। বস্তুত, পয়ণ্ট ফোর বা কলম্বো প্ল্যান যদি তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যে পুরোপুরি সফল হয়, তাহলে তা কি পাশ্চাত্ত্যের আত্ম-হত্যারই সামিল হবে না? পুবের লোকেরা বিশ্বাস করে কী করে যে পশ্চিমের পূর্বোন্নয়নের পরিকল্পনা আন্তরিক? পুবের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়ে পশ্চিম নিশ্চিন্ত থাকবে কোন ভরসায়? অপর পক্ষে, দারিদ্র্যজর্জর পূর্ব যদি পশ্চিমের সহায়তা ব্যতীত আপনি একদিন রাশিয়ার হাত ধরে গাত্রোত্থান করে, তবে তো তার প্রতিহিংসাপ্রবণতা আরো সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাবে।

কোমল শয্যায় শুয়ে কার্ল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না সে এশিয়ায় এসে ভালো করছে কিনা। ভালো করলে, কার? এশিয়ার না য়ুরোপের?

মাথার উপর পাখা ঘুরছিল, কিন্তু তবু কার্ল জুন মাসের আর্দ্র গ্রীষ্মে ঘেমে উঠছিল। অবসাদে আচ্ছন্ন কার্ল উঠতে পর্যন্ত উৎসাহ পেল না, যদিও সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। কার্লের মনে হোলো যে, গোটা প্রাচ্যের সমগ্র মানবজাতিই বোধহয় এই উৎসাহশূন্য ক্লান্তির চাপে চিরকাল নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে। অবসাদক এই আবহই বোধহয় প্রাচ্যের সকল উচ্চাভিলাষের সমাধি হবে। বোধহয় সত্যি, শীতধন্য পশ্চিমের ভীত হবার কোনো কারণ নেই।

উঠে স্নান করে কার্ল বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হোলো। তিনশো তিরিশ নম্বর কামরা থেকে নেমে এসে একবার টেলি-ফোন করে তার নিয়োগকর্তা কোম্পানীর বড়ো সাহেবকে জানিয়ে দিল যে, সে নিরাপদে এসে পৌঁচেছে। কাল সকালে অফিসে দেখা করবে। বড়ো সাহেব, 'ওয়েলকাম টু ইণ্ডিয়া' বলে শুরু করে-ছিলেন, 'হ্যাভ এ গুড টাইম' বলে শেষ করলেন। কার্ল বেরুলে সন্ধ্যার চৌরঙ্গীতে।

নিয়ন লাইটের আলোয় কার্ল আর কল-কাতার শুভদৃষ্টি হোলো। সে ভারতবর্ষে এসেছিল মোটামুটি 'খোলা মন' নিয়ে, অর্থাৎ প্রায় কিছুই না জেনে। তাই কল-কাতার লোকেরা শহরের যা কিছু স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে কার্লের কাছে তাও বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে মনে হোলো। সামনের খোলা ময়দান কার্লের ভালো লাগল। কিন্তু সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে যে অসংখ্য ভিখারী ছিল তারাও তার দৃষ্টি এড়াল না। বিলাসী হোটেলের ঠিক সামনে এই বিবস্ত্র নিরন্ন ভিখারীর ভীড় আমরা কলকাতাবাসীরা আমাদের শহরের নির্জীব আসবাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করি, দ্বিতীয়বার ওদের দিকে ফিরেও তাকাইনে, কিন্তু বিদেশীর চোখে এই বৈসাদৃশ্য লুকানো থাকে না। তারা অবাক হয়, যেমন কার্ল হোলো; কিন্তু সে জানতো যে দারিদ্র্যমোচন অশ্রুবিসর্জন দ্বারা সাধিত হয় না, বক্তৃতাবর্ষণে তো নয়ই। একটু এগিয়ে কার্ল দু'চারজনের মুখে 'স্কুল গার্ল,' ভার্জিন নার্স,' 'নচ্ গার্ল' ইত্যাদি কথাগুলি শুনল। কিন্তু সে বিস্তর ভ্রমণ করেছে; তার অজানা নেই যে, ভিখারী যদিও সব দেশের পথেঘাটে নেই, সব দেশেই এঁরা আছেন। এই দফায় তাই কার্ল ভারতবর্ষের প্রতি বিরূপ হোলো না। দু'চারটে দোকানে, নেহাৎ কৌতূহলেরই বশে, দুয়েক বোতল বীয়ার খেয়ে কার্ল যখন তার হোটেলে ফিরল তখন তার ক্লান্ত মনে সমস্ত সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা নিতান্ত অস্পষ্ট অগোছালো ও অসমঞ্জস। প্রথম দমদমে নেমে জায়গাটাকে মনে হয়েছিল ইংরেজ-ধর্ষিতা ভারতীর জারজ সন্তান বলে। এখন কলকাতার কেন্দ্র পরিদর্শন করে সেই প্রথম দর্শন যেন আরো বেশি সমর্থন পেলো।

কার্ল তবু মেনে নিল। সে য়ুরোপের আবর্ত থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছে, এইটেই পরম সান্ত্বনা। এখানে এমন কোনো পার্কের কাছ দিয়ে তাকে হেঁটে যেতে হবে না, যেখানে বড়ো বড়ো হরফে লেখা থাকবেঃ **VERBOTEN.** এখানে যদি সে কোনো বৈষম্যের সম্মুখীন হয়, তবে তা হবে তার স্বপক্ষে। বৈষম্য তার পছন্দ নয়, কিন্তু তা শুধু অপরের প্রতি প্রযোজ্য হলে প্রতিবাদ মৃদু হয়। কার্ল ঘুমিয়ে পড়বার আগে আবার নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল যে ভারতে সে রাজনীতি করতে আসেনি।

পরদিন ব্যবস্থামতো সে নেতাজী

সুভাষ রোডে গেল অফিসে রিপোর্ট করতে। বেশিক্ষণ সময় লাগল না। দু' তিনজন ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় হোলো, বাকিটা হবে সেদিনই সন্ধ্যায় পার্টিতে। কার্লকে বুঝিয়ে দেয়া হোলো যে, তার কাজ বেশির ভাগ সময়েই থাকবে খড়্গপুরের কাছে একটা জায়গায়, সেখানে কোম্পানীর নতুন কারখানা হচ্ছে। ভয় নেই, খড়্গপুরে ভালো ক্লাব আছে। খোলা জায়গা। তাছাড়া মিডনাপোর জেমিন্ডারির কয়েকজন সাহেবও থাকেন কাছাকাছি। কলকাতাও কাছে। তাছাড়া, এখনি অবশ্য কারখানায় যেতে হবে না। অন্তত মাস-খানেক কলকাতার অফিসেই কাটাতে হবে। আজ আর অফিসে থাকবার দরকার নেই। বাকি দিনটা কার্লের ছুটি। সে ডিরেক্টরের ঠান্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"মিস্টার মুন!"

কার্ল পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একটি মেয়ে তাকে ডাকছে। ডিরেক্টরদের টাইপিস্ট ওই মেয়েটি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সুশ্রী। কার্ল দাঁড়াতেই মেয়েটি বলল, "খড়্গপুরে যাবার আগে যদি এক-বার আমাকে জানান দয়া করে। ওখানে আমার মা আর ছোটো বোন থাকে। ওদের জন্যে কিছু বুনে রেখেছি, আপনার হাতে পাঠাতে চাই। অবিশ্যি," মেয়েটি অনেক ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে বলল, "অবিশ্যি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন।" আরো বিনীত সুরে চোখ নামিয়ে বলল, "কোনো কষ্ট হবে না আপনার। আমি আগে থেকে ওদের জানিয়ে দেব। ওরাই আপনার বাংলো থেকে নিয়ে যাবে।"

দমদমে কার্ল যে রসিকতা করবার সুযোগ পায়নি, এখন সুবিধা পেয়ে তাই বলল, "কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। আমি বেশি বোঝা নিয়ে ভ্রমণ করছিনে। উই-দাউট দি হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, যু নো। আমি নিশ্চয়ই যাবার আগে আপনাকে জানাব। আপনি—?"

"আমি মিস লোপেজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারির স্টেনো-গ্রাফার। অনেক ধন্যবাদ।"

"নট অ্যাট অল" বলে কার্ল বিদায় নিল। তার আগে বলল, "আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছিলেন বিকেলের দিকে সুইমিং ক্লাবে গিয়ে মেম্বর হতে। ক্লাবটা কোথায় তাও জানিনে। তা—আপনি যদি আজ বিকালে"—

"অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মুন। কিন্তু"—

কার্ল বিব্রত বোধ করল। বোধহয় প্রথম পরিচয়েই এমন অনুরোধ এখানে অশোভন। ক্ষমা চেয়ে কার্ল চলে গেল। মিস লোপেজকে আর কিছু বলবারও সুযোগ দিল না।

সুইমিং ক্লাবে আর সেদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কার্ল অনুমোদিত পোষাক প'রে সন্ধ্যায় গেল ককটেল পার্টিতে। বড়ো মেম সাহেব এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কার্ল পর পর বহুজনের সঙ্গে অভিবাদন-বিনিময় করে একটা হুইস্কি হাতে করে এক ধারে দাঁড়াল। এর মধ্যে আবার কে একজন অতিথি এলে আবার পরিচয়ের পালা। কার্লের বড়ো সাহেব নবাগতের নাম করে বললেন, "আর, ইনি আমাদের খড়্গপুরের নতুন প্লান্টের বয়লার এঞ্জিনিয়ার, মিস্টার কার্ল মুন।"

অতিথি হেসে বললেন, "মুন, নট মার্ক্স!"

কার্ল না হেসে বলল, "কার্ল, নট গ্রাউচো।"

অতিথি আবার হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা কাষ্ঠহাসির মতো শোনাল।

মোদ্দা কথা, কার্লের ওই রসিকতাটা ভালো লাগেনি। সত্য বলতে কি, ওই পার্টির কোনো কিছুই কার্লের মনঃপুত হয়নি। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক মিলনেই অল্পাধিক কৃত্রিমতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় সমবেত অতিথিদের মধ্যে কার্লের যেন নিজেকে বড়ো বেশি আড়ষ্ট বলে মনে হচ্ছিল। যেন সে পথ ভুলে কোন গুপ্ত সমিতির গোপন সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে যার বিশেষ সাংকেতিক পরিভাষা তার অজ্ঞাত। যেন সে নীচু ক্লাসের ছাত্র থেকে উঁচু ক্লাসের বড়ো ছেলেদের খেলায় যোগ দিতে এসেছে। এ'রা সবাই কার্লের আগে প্রাচ্যে এসেছেন, তাই সবাই যেন নবাগতের স্বনিযুক্ত পৃষ্ঠ-পোষক। নতুন কোন মন্ত্রে যেন এবার কার্লকে দীক্ষিত করতে হবে। প্রেমের দীক্ষা নয়, ঘৃণার দীক্ষা।

কিন্তু একটা জিনিস দেখে কার্লের বড়ো ভালো লাগল। পার্টিতে অন্তত তিন জন ভারতীয় মহিলা ছিলেন। তাঁদের একজনের মধ্যেও সামান্যতম হীনতাবোধ ছিল না, সকলের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা করছিলেন সমানভাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে দু'চারটে প্রবন্ধ কার্ল কখনো কোনো কাগজে পড়েছিল, তা থেকে তার ধারণা হয়েছিল যে, শ্বেত এবং অশ্বেত সমাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এখন তার সে ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হোলো। ইংরেজরা, কার্ল ভাবল অন্তত নাৎসীদের মতো অসহিষ্ণু নয়। সদ্য স্বাধীন ভারতীয়দের সঙ্গে গতকালের প্রভুজাতির যদি এমন সৌহার্দ থাকে, তবে কেন ওই য়ুরোপীয় কাগজগুলি এমন অপপ্রচার করেছিল? আগেকার ইতিহাস কার্ল জানতো না, বর্তমান সৌহার্দের কারণ নির্দেশও তার সাধ্যাতীত, তাই সে ভুল বুঝল। ইংরেজদের উদারতায় মুগ্ধ হোলো। ভাবল, অন্তত এদিক থেকে বিচার করলে য়ুরোপ থেকে পালিয়ে এসে সে বেঁচেছে।

পরদিন আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল মিস্ লোপেজের সঙ্গে সাক্ষাতে। পূর্ব দিনের প্রত্যাখ্যানের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মহিলা কার্লকে বললেন, "আজ বিকেলে আপনি কী করছেন?"

"বিশেষ কিছু নয়। অফিস থেকে হোটেলে যাবো, তারপর—

"আমি সাতটায় আপনার সঙ্গে হোটেলে দেখা করব। অবিশ্যি, যদি আপনি অনুমতি দেন।"

"আমি অপেক্ষা করব। আমার রুম নম্বর"—

"আমি জানি।" মিস লোপেজ অন্তর্হিতা হলেন।

বারবারা লোপেজ মেয়েটি ভালো। কিছুদিন আগেও মফঃস্বলে ছিল, পড়েছে খড়্গপুর ইস্কুলে। বাপ সেখানে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করতো। বারবারার মনে আছে, তার বাবা নিজেকে য়ুরোপীয় বলে মনে করতো। যদিও, কোথাও সে য়ুরোপীয় বলে গৃহীত হোতো না। সে দুষতো বারবারার মাকে, তিনি একেবারেই

...া কন্যা। বিদেশীত্বের এই ...ন্মষী অভিমান বাবার মৃত্যুর ... ঘুচে গিয়েছিল। মিসেস লোপেজ ...মেয়ে দুটিকে নিয়ে ফিরিঙ্গির ...ভাবী নিঃসঙ্গতায় বাস করতেন প্রতিবাদে। ভারতীয় সমাজে ওদের ... ছিল না, সাহেবদের সমাজেও ঠাঁই ...া। দু'পক্ষেরই চোখ ছিল সুন্দরী ...বোনের উপর, কিন্তু বারবারা বা ...নে কেউই প্রশ্রয় পায়নি ওই রকমের ...ক অন্তরঙ্গতায়। ওদের বাবা মাকে ...দিনরাত্রি দুষতেন বলেই বোধহয় ... লোপেজের মন এমন কঠোর হয়ে ...ছল যে, তিনি তাঁর মেয়েদের অন্যান্য ...ঙ্গ ছোকরাদের সঙ্গেও মিশতে ... না। মৃদুতম অপমানে জ্বলে ...ন সমগ্র পারিপার্শ্বিকের উপর। ...ফিরিঙ্গিদের বলতেন, 'ওরা একাধারে ... এবং কাওয়ার্ডস্ঃ সাহেবদের পদ- ...করে, আর সুযোগ পেলে ভারতীয়- ...ভয় দেখায়। খবরদার, কখনো ওদের ...মাড়াবিনে।'

...সাহেবরা কী করল? মিসেস লোপেজ ... রেগে বলতেন, "আপন পিতৃ- ...সর দুষ্কৃতির প্রকাশ্য স্বীকারের ... নেই ওদের। ভেবেছে দু'চারটে ...ম্পিং হোমস করলে আর রেলওয়ে ...ট্মেন্টে দুটো চাকরি দিলেই সব ...র পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল! একদল ...রী যেমন ভাবে যে চুরি করে ...রাতি করে বুড়ো বয়সে দুটো ধর্ম- ...করে দিলেই ভগবানকে যথেষ্ট ঘুষ ...হোলো! আর, এখন তো আমরা ... মেম সাহেবরা দেশে গেলে সাহেব- ...নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে ধন্য হতে। দি ... বীস্টস্—আর আমাদের লজ্জার ...া বালাই-ই নেই।" মিসেস লোপেজ ...পারে থুথু ফেলতেন সশব্দে ও ...রে। সেই নিষ্ঠীবনের প্রতি বিন্দুতে ... পরিমাণ ঘৃণা ছিল।

...ভারতীয়দের জন্যে সঞ্চিত ছিল ...স লোপেজের ঘনতম ঘৃণা। 'ওরা ...চেয়ে বেশি অবজ্ঞার যোগ্য। প্রতি ...রে ওরা সাহেবদের নকল করবে; ..., শিক্ষায়, কথায়, ব্যবহারে, বেশে, ..., আহারে, সব কিছুতে। দে আর দি ওয়াণ্টে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানস। তবু ওদের জন্ম ধুতি আর শাড়ির মিলনে, তাই নিয়ে গর্বের শেষ নেই! আমাদের তবু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান না হয়ে উপায় ছিল না, কিন্তু ওরা ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হবে, তারপর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান-দের দেখে নাক উঁচু করবে, এটা সব চেয়ে অসহ্য! আমাদের দেশ নেই, জাত নেই। না থাক। কিন্তু কনগ্রেসীরা স্বরাজ পেলেও ওই বাবুদের সঙ্গে কোনো লোপেজ কখনো ভাব করবে না।' মিসেস লোপেজ তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত তিক্ততা এমনিভাবে ব্যক্ত করতেন, তাঁর কন্যাদ্বয়ের কাছে দিনের পর দিন। মেয়েরা মার হিংস্র তিক্ততা পায়নি, কিন্তু চার-দিকের তিনটি সম্প্রদায়কেই গভীর সন্দেহের সঙ্গে দেখতে ও এড়াতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

বারবারা যে কার্ল মনের সঙ্গে মাতৃ-দত্ত সতর্কতা ও প্রতিরোধের সঙ্গে ব্যবহার করেনি, তার কারণ কার্ল ইংরেজ নয়। তা নয়, তবে কী সে? বারবারা সেদিনই রাত্রে প্রিন্সেস থেকে বেরুবার সময় মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাত তখন একটা বেজে গেছে। কার্ল ট্যাক্সি নিয়ে-ছিল বারবারাকে পৌঁছে দিতে তার পার্ক স্ট্রীটের কোন বোর্ডিং হাউসে। কড়া আইন আছে ক্যাথলিকদের ওসব ওয়ার্কিং গার্লস' হোমসে। এমনিতেই ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবু, ট্যাক্সি থেকে নেমে জেলখানায় প্রবেশ করবার আগে বারবারা সরাসরি প্রশ্ন এড়িয়ে সুকৌশলে বলেছিল, "কার্ল, তোমাকে তোমার ভাষায় 'গুড্ বাই' বলব। কী বলব বলো।"

কার্ল ধরা দেয়নি। কণ্ঠে একটু তরল প্রণয়ের সুর এনে বলেছিল, "এমন কোনো ভাষা নেই যাতে তোমার কণ্ঠে 'গুডবাই' আমার কানে মধু বর্ষণ করবে। তার চেয়ে সভ্য মানুষের একমাত্র ভাষায় বলো, 'অ রাভোয়া'।" একটু থেমে, বারবারা কিছু বলবার আগেই, যোগ করেছিল, "তার আগে বলো, কাল তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? কখন?"

বারবারা মুহূর্তের জন্যে এই প্রত্যক্ষ প্রেমনিবেদনে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে তার মার ভীষণা মূর্তি ভেসে উঠল। তবু স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করতে বাধল। বলল, "পরে বলব।"

"পরে কেন?" কার্ল জানতে চাইল।

"বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন চলি কার্ল।"

বারবারার কণ্ঠে যে করুণ আন্তরিক-তার আমেজ ছিল তা কার্লকে স্পর্শ করল। কিন্তু সেই সুরেই তো সব বেদনার উৎস। রূঢ় হলে কার্ল মুহূর্তে বুঝে নিতো—'বলিতে হোতো না কথা'। কিন্তু প্রত্যাখ্যান যেখানে এমন গভীর বেদনার সঙ্গে জানানো হয়, যেন অনুরোধ না রাখতে পেরে কার্লের চেয়ে বারবারার ব্যথাই বেশি, সেখানে স্বভাবতই প্রত্যা-খ্যাতের মনে এই প্রীতিদায়ী সন্দেহ বাসা বাঁধে যে বাধাটা তাহলে অন্তরের নয়, বাইরের। অন্তরের বাধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বৃথা, আবেদন নিরর্থক। মানুষ তা নীরবে সহ্য করে, মেনে নেয়। নির্বিবাদে মানা শক্ত বাইরের বাধা। সে বাধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করলে শুধু প্রেমের পরাজয় ঘটে না, পৌরুষের অবমাননা হয়। জোরে 'না' বললে কার্ল বিনাবাক্যব্যয়ে বারবারাকে ছেড়ে চলে আসতো। আস্তে, যেন নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, 'না' বলাতে কার্লকে আবার বলতেই হোলো, "না, বারবারা, এখনি বলো। কী এমন কথা যা বলতে রাত ভোর হয়ে যাবে?"

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ দিয়ে সেই মধুর সন্ধ্যাটির সমাপ্তি ঘটাতে বারবারার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কার্ল যে ছাড়বে না! বারবারা তাই রুদ্ধনিশ্বাসে তার শেষ কথা বলে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে সেই মেরি'স হোমের দরজা খুলে ভিতরে ছুটে গেল। কার্লের সময় লাগল বারবারার কথাগুলির পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে।

ফিরবার পথে একা ট্যাক্সিতে বসে কার্ল মনে মনে বারবারার কথাগুলি বার-বার উচ্চারণ করতে থাকল: 'আমি ফিরিঙ্গি, কার্ল, আর তুমি য়ুরোপীয়ন। আমাদের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ।'

য়ুরোপীয়ন! কথাটা কার্ল প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ঘুরে

সুভাষ রোডে গেল অফিসে রিপোর্ট করতে। বেশিক্ষণ সময় লাগল না। দু' তিনজন ডিরেক্টরের সঙ্গে পরিচয় হোলো, বাকিটা হবে সেদিনই সন্ধ্যায় পার্টিতে। কার্লকে বুঝিয়ে দেয়া হোলো যে, তার কাজ বেশির ভাগ সময়েই থাকবে খড়্গপুরের কাছে একটা জায়গায়, সেখানে কোম্পানীর নতুন কারখানা হচ্ছে। ভয় নেই, খড়্গপুরে ভালো ক্লাব আছে। খোলা জায়গা। তাছাড়া মিডনাপোর জেমিন্ডারির কয়েকজন সাহেবও থাকেন কাছাকাছি। কলকাতাও কাছে। তাছাড়া, এখনি অবশ্য কারখানায় যেতে হবে না। অন্তত মাস-খানেক কলকাতার অফিসেই কাটাতে হবে। আজ আর অফিসে থাকবার দরকার নেই। বাকি দিনটা কার্লের ছুটি। সে ডিরেক্টরের ঠান্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

"মিস্টার মুন!"

কার্ল পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একটি মেয়ে তাকে ডাকছে। ডিরেক্টরদের টাইপিস্ট ওই মেয়েটি। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। সুশ্রী। কার্ল দাঁড়াতেই মেয়েটি বলল, "খড়্গপুরে যাবার আগে যদি এক-বার আমাকে জানান দয়া করে। ওখানে আমার মা আর ছোটো বোন থাকে। ওদের জন্যে কিছু বুনে রেখেছি, আপনার হাতে পাঠাতে চাই। অবিশ্যি," মেয়েটি অনেক ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে বলল, "অবিশ্যি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন।" আরো বিনীত সুরে চোখ নামিয়ে বলল, "কোনো কষ্ট হবে না আপনার। আমি আগে থেকে ওদের জানিয়ে দেব। ওরাই আপনার বাংলো থেকে নিয়ে যাবে।"

দমদমে কার্ল যে রসিকতা করবার সুযোগ পায়নি, এখন সুবিধা পেয়ে তাই বলল, "কিছুমাত্র কষ্ট হবে না। আমি বেশি বোঝা নিয়ে ভ্রমণ করছিনে। উই-দাউট দি হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, য়ু নো। আমি নিশ্চয়ই যাবার আগে আপনাকে জানাব। আপনি—?"

"আমি মিস লোপেজ, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারির স্টেনো-গ্রাফার। অনেক ধন্যবাদ।"

"নট অ্যাট অল" বলে কার্ল বিদায় নিল। তার আগে বলল, "আমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলছিলেন বিকেলের দিকে সুইমিং ক্লাবে গিয়ে মেম্বর হতে। ক্লাবটা কোথায় তাও জানিনে। তা—আপনি যদি আজ বিকালে"—

"অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার মুন। কিন্তু"—

কার্ল বিব্রত বোধ করল। বোধহয় প্রথম পরিচয়েই এমন অনুরোধ এখানে অশোভন। ক্ষমা চেয়ে কার্ল চলে গেল। মিস লোপেজকে আর কিছু বলবারও সুযোগ দিল না।

সুইমিং ক্লাবে আর সেদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কার্ল অনুমোদিত পোষাক প'রে সন্ধ্যায় গেল ককটেল পার্টিতে। বড়ো মেম সাহেব এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কার্ল পর পর বহুজনের সঙ্গে অভিবাদন-বিনিময় করে একটা হুইস্কি হাতে করে এক ধারে দাঁড়াল। এর মধ্যে আবার কে একজন অতিথি এলে আবার পরিচয়ের পালা। কার্লের বড়ো সাহেব নবাগতের নাম করে বললেন, "আর, ইনি আমাদের খড়্গপুরের নতুন প্লান্টের বয়লার এঞ্জিনিয়ার, মিস্টার কার্ল মুন।"

অতিথি হেসে বললেন, "মুন, নট মার্ক্স!"

কার্ল না হেসে বলল, "কার্ল, নট গ্রাউচো।"

অতিথি আবার হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেটা কাষ্ঠহাসির মতো শোনাল।

মোদ্দা কথা, কার্লের ওই রসিকতাটা ভালো লাগেনি। সত্য বলতে কি, ওই পার্টির কোনো কিছুই কার্লের মনঃপূত হয়নি। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক মিলনেই অল্পাধিক কৃত্রিমতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় সমবেত অতিথিদের মধ্যে কার্লের যেন নিজেকে বড়ো বেশি আড়ষ্ট বলে মনে হচ্ছিল। যেন সে পথ ভুলে কোন গুপ্ত সমিতির গোপন সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে যার বিশেষ সাংকেতিক পরিভাষা তার অজ্ঞাত। যেন সে নীচু ক্লাসের ছাত্র থেকে উঁচু ক্লাসের বড়ো ছেলেদের খেলায় যোগ দিতে এসেছে। এ'রা সবাই কার্লের আগে প্রাচ্যে এসেছেন, তাই সবাই যেন নবাগতের স্বনিযুক্ত পৃষ্ঠ-পোষক। নতুন কোন মন্ত্রে যেন এবার কার্লকে দীক্ষিত করতে হবে। প্রেমের দীক্ষা নয়, ঘৃণার দীক্ষা।

কিন্তু একটা জিনিস দেখে কার্লের বড়ো ভালো লাগল। পার্টিতে অন্তত তিন জন ভারতীয় মহিলা ছিলেন। তাঁদের একজনের মধ্যেও সামান্যতম হীনতাবোধ ছিল না, সকলের সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা করছিলেন সমানভাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে যে দু'চারটে প্রবন্ধ কার্ল কখনো কোনো কাগজে পড়েছিল, তা থেকে তার ধারণা হয়েছিল যে, শ্বেত এবং অশ্বেত সমাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। এখন তার সে ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হোলো। ইংরেজরা, কার্ল ভাবল, অন্তত নাৎসীদের মতো অসহিষ্ণু নয়। সদ্য স্বাধীন ভারতীয়দের সঙ্গে গতকালের প্রভুজাতির যদি এমন সৌহার্দ থাকে, তবে কেন ওই য়ুরোপীয় কাগজগুলি এমন অপপ্রচার করেছিল? আগেকার ইতিহাস কার্ল জানতো না, বর্তমান সৌহার্দের কারণ নির্দেশও তার সাধ্যাতীত, তাই সে ভুল বুঝল। ইংরেজদের উদারতায় মুগ্ধ হোলো। ভাবল, অন্তত এদিক থেকে বিচার করলে য়ুরোপ থেকে পালিয়ে এসে সে বেঁচেছে।

পরদিন আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল মিস্ লোপেজের সঙ্গে সাক্ষাতে। পূর্ব দিনের প্রত্যাখ্যানের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মহিলা কার্লকে বললেন, "আজ বিকেলে আপনি কী করছেন?"

"বিশেষ কিছু নয়। অফিস থেকে হোটেলে যাবো, তারপর—

"আমি সাতটায় আপনার সঙ্গে হোটেলে দেখা করব। অবিশ্যি, যদি আপনি অনুমতি দেন।"

"আমি অপেক্ষা করব। আমার রুম নম্বর"—

"আমি জানি।" মিস লোপেজ অন্তর্হিতা হলেন।

বারবারা লোপেজ মেয়েটি ভালো। কিছুদিন আগেও মফঃস্বলে ছিল, পড়েছে খড়্গপুর ইস্কুলে। বাপ সেখানে রেলওয়ে ওয়ার্কশপে কাজ করতো। বারবারার মনে আছে, তার বাবা নিজেকে য়ুরোপীয় বলে মনে করতো। যদিও, কোথাও সে য়ু-রোপীয় বলে গৃহীত হোতো না। সে দুষতো বারবারার মাকে, তিনি একেবারেই

স্থানীয়া কন্যা। বিদেশীত্বের এই ছেলেমানুষী অভিমান বাবার মৃত্যুর সঙ্গেই ঘুচে গিয়েছিল। মিসেস লোপেজ তাঁর মেয়ে দুটিকে নিয়ে ফিরিঙ্গির অবশ্যম্ভাবী নিঃসঙ্গতায় বাস করতেন বিনা প্রতিবাদে। ভারতীয় সমাজে ওদের আদর ছিল না, সাহেবদের সমাজেও ঠাঁই ছিল না। দু'পক্ষেরই চোখ ছিল সুন্দরী দুটি বোনের উপর, কিন্তু বারবারা বা ক্যাথলিন কেউই প্রশ্রয় পায়নি ওই রকমের সাময়িক অন্তরঙ্গতায়। ওদের বাবা মাকে অমন দিনরাত্রি দুষতেন বলেই বোধহয় মিসেস লোপেজের মন এমন কঠোর হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি তাঁর মেয়েদের অন্যান্য ফিরিঙ্গি ছোকরাদের সঙ্গেও মিশতে দিতেন না। মৃদুতম অপমানে জ্বলে উঠতেন সমগ্র পারিপার্শ্বিকের উপর। সহ-ফিরিঙ্গিদের বলতেন, 'ওরা একাধারে বুলিস এবং কাওয়ার্ডস: সাহেবদের পদ-লেহন করে, আর সুযোগ পেলে ভারতীয়-দের ভয় দেখায়। খবরদার, কখনো ওদের ছায়া মাড়াবিনে।'

সাহেবরা কী করল? মিসেস লোপেজ আরো রেগে বলতেন, "আপন পিতৃ-পুরুষের দুষ্কৃতির প্রকাশ্য স্বীকারের সাহস নেই ওদের। ভেবেছে দু'চারটে কালিম্পং হোমস করলে আর রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে দুটো চাকরি দিলেই সব পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল! একদল ব্যবসায়ী যেমন ভাবে যে চুরি করে জালিয়াতি করে বুড়ো বয়সে দুটো ধর্ম-শালা করে দিলেই ভগবানকে যথেষ্ট ঘুষ দেয়া হোলো! আর, এখন তো আমরা আছি মেম সাহেবরা দেশে গেলে সাহেব-দের নিঃসঙ্গতা ঘুচিয়ে ধন্য হতে। দি ডার্টি বীস্টস্—আর আমাদের লজ্জার কোনো বালাই-ই নেই।" মিসেস লোপেজ এর পরে থুথু ফেলতেন সশব্দে ও সজোরে। সেই নিষ্ঠীবনের প্রতি বিন্দুতে সিন্ধু পরিমাণ ঘৃণা ছিল।

ভারতীয়দের জন্যে সঞ্চিত ছিল মিসেস লোপেজের ঘনতম ঘৃণা। 'ওরা সবচেয়ে বেশি অবজ্ঞার যোগ্য। প্রতি ব্যাপারে ওরা সাহেবদের নকল করবে; কাজে, শিক্ষায়, কথায়, ব্যবহারে, বেশে, পানে, আহারে, সব কিছুতে। দে আর দি ওয়ার্স্ট অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানস। তবু ওদের জন্ম ধুতি আর শাড়ির মিলনে, তাই নিয়ে গর্বের শেষ নেই! আমাদের তবু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান না হয়ে উপায় ছিল না, কিন্তু ওরা ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হবে, তারপর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান-দের দেখে নাক উঁচু করবে, এটা সব চেয়ে অসহ্য! আমাদের দেশ নেই, জাত নেই। না থাক। কিন্তু কনগ্রেসীরা স্বরাজ পেলেও ওই বাবুদের সঙ্গে কোনো লোপেজ কখনো ভাব করবে না।' মিসেস লোপেজ তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত তিক্ততা এমনিভাবে ব্যক্ত করতেন, তাঁর কন্যাদ্বয়ের কাছে দিনের পর দিন। মেয়েরা মার হিংস্র তিক্ততা পায়নি, কিন্তু চার-দিকের তিনটি সম্প্রদায়কেই গভীর সন্দেহের সঙ্গে দেখতে ও এড়াতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

বারবারা যে কার্ল মুনের সঙ্গে মাতৃ-দত্ত সতর্কতা ও প্রতিরোধের সঙ্গে ব্যবহার করেনি, তার কারণ কার্ল ইংরেজ নয়। তা নয়, তবে কী সে? বারবারা সেদিনই রাত্রে প্রিন্সেস থেকে বেরুবার সময় মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছিল। রাত তখন একটা বেজে গেছে। কার্ল ট্যাক্সি নিয়ে-ছিল বারবারাকে পৌঁছে দিতে তার পার্ক স্ট্রীটের কোন বোর্ডিং হাউসে। কড়া আইন আছে ক্যাথলিকদের ওসব ওয়ার্কিং গার্লস' হোমসে। এমনিতেই ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তবু, ট্যাক্সি থেকে নেমে জেলখানায় প্রবেশ করবার আগে বারবারা সরাসরি প্রশ্ন এড়িয়ে সুকৌশলে বলেছিল, "কার্ল, তোমাকে তোমার ভাষায় 'গুড্‌ বাই' বলব। কী বলব বলো।"

কার্ল ধরা দেয়নি। কণ্ঠে একটু তরল প্রণয়ের সুর এনে বলেছিল, "এমন কোনো ভাষা নেই যাতে তোমার কণ্ঠে 'গুডবাই' আমার কানে মধু বর্ষণ করবে। তার চেয়ে সভ্য মানুষের একমাত্র ভাষায় বলো, 'অ রাভোয়া'।" একটু থেমে, বারবারা কিছু বলবার আগেই, যোগ করেছিল, "তার আগে বলো, কাল তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? কখন?"

বারবারা মুহূর্তের জন্যে এই প্রত্যক্ষ প্রেমনিবেদনে আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে তার মার ভীষণা মূর্তি ভেসে উঠল। তবু স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করতে বাধল। বলল, "পরে বলব।"

"পরে কেন?" কার্ল জানতে চাইল।

"বোঝাতে অনেক সময় লাগবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন চলি কার্ল।"

বারবারার কণ্ঠে যে করুণ আন্তরিক-তার আমেজ ছিল তা কার্লকে স্পর্শ করল। কিন্তু সেই সুরই তো সব বেদনার উৎস। রূঢ় হলে কার্ল মুহূর্তে বুঝে নিতো—'বলিতে হোতো না কথা'। কিন্তু প্রত্যাখ্যান যেখানে এমন গভীর বেদনার সঙ্গে জানানো হয়, যেন অনুরোধ না রাখতে পেরে কার্লের চেয়ে বারবারার ব্যথাই বেশি, সেখানে স্বভাবতই প্রত্যা-খ্যাতের মনে এই প্রীতিদায়ী সন্দেহ বাসা বাঁধে যে বাধাটা তাহলে অন্তরের নয়, বাইরের। অন্তরের বাধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বৃথা, আবেদন নিরর্থক। মানুষ তা নীরবে সহ্য করে, মেনে নেয়। নির্বিবাদে মানা শক্ত বাইরের বাধা। সে বাধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করলে শুধু প্রেমের পরাজয় ঘটে না, পৌরুষের অবমাননা হয়। জোরে 'না' বললে কার্ল বিনাবাক্যব্যয়ে বারবারাকে ছেড়ে চলে আসতো। আস্তে, যেন নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, 'না' বলাতে কার্লকে আবার বলতেই হোলো, "না, বারবারা, এখনি বলো। কী এমন কথা যা বলতে রাত ভোর হয়ে যাবে?"

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ দিয়ে সেই মধুর সন্ধ্যাটির সমাপ্তি ঘটাতে বারবারার বিন্দু-মাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কার্ল যে ছাড়বে না! বারবারা তাই রুদ্ধনিশ্বাসে তার শেষ কথা বলে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে সেই মেরি'স হোমের দরজা খুলে ভিতরে ছুটে গেল। কার্লের সময় লাগল বারবারার কথাগুলির পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে।

ফিরবার পথে একা ট্যাক্সিতে বসে কার্ল মনে মনে বারবারার কথাগুলি বার বার উচ্চারণ করতে থাকল: 'আমি ফিরিঙ্গি, কার্ল, আর তুমি য়ুরোপীয়ন আমাদের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ।'

য়ুরোপীয়ন! কথাটা কার্ল প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। য়ুরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে ঘুরে

মরেছে। কই, কেউ তো কোথাও তাকে য়ুরোপীয়ন বলে ডাকেনি। ইটালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, এমনকি ক্ষুদে বুলগেরিয়া বা রুমানিয়ায় পর্যন্ত সে বিদেশী বলে প্রথমে চিহ্নিত এবং পরে বিতাড়িত হয়েছে। স্বদেশ জার্মানি থেকে তো আগেই পালাতে হয়েছিল। আর এই ভারতবর্ষে এসে হঠাৎ সে কী করে তার য়ুরোপীয়ন পরিচয় লাভ করল? জার্মান বা য়ীহুদী বলে কেন ঘৃণিত হোলো না? ঘরে যে য়ুরোপীয় ঐক্য শুধু কথার কথা, বা বইয়ের কথা, বাইরে সেই স্বপ্ন কী করে এক নিমেষে বাস্তব হয়ে গেল? একবার কার্লের মনে হোলো যে, আন্তর্জাতিক সমস্যার এমন সহজ সমাধান থাকতে কেউ একথাটা এতদিন ভাবেনি কেন? সব য়ুরোপীয়ান কেন য়ুরোপ ছেড়ে প্রাচ্যে এসে এক হয়ে যায় না?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধনিবারণের এই হাস্যকর পন্থা উদ্ভাবন করে কার্ল আত্মতৃপ্তিতে বিভোর হতে পারল না, কেননা তখনো তার চিন্তার প্রধানা নায়িকা বারবারা। ওই পোড়া য়ুরোপীয় ঐক্যই তো তাকে বারবারার সঙ্গে এক হতে দিচ্ছে না! তবু, শোবার আগে কার্ল বারবারার আপত্তিকে কিছুটা অতিকৃত না মনে করে পারল না। একদিন আগেই তো সে তার বড়ো সাহেবের পার্টিতে অন্তত তিনটি ভারতীয়া মহিলা দেখে এসেছে। কই, কেউ তো তাদের অপাংক্তেয় মনে করেনি। আবার তাদের মধ্যে একজন তো একটি ইংরেজের স্ত্রী। সেই সন্ধ্যার আনুষ্ঠানিক কাষ্ঠত্বে কার্ল বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এই আন্তঃসামাজিক সৌহার্দে মুগ্ধ হয়েছিল। ঘুমোবার আগে কার্ল মনে মনে স্থির করল যে পরদিন অফিসে গিয়েই সে বারবারাকে তার পার্টির অভিজ্ঞতার কথা বলে বুঝিয়ে দেবে যে, সে ভারতবর্ষে আছে—দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়; যে কলকাতার সাহেবরা অশ্বেতদের সম্বন্ধে আদৌ অসহিষ্ণু নয়; যে তার নামও মুন, মালান নয়।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হোলো না। কার্ল অফিসে এসেই জানল যে, বড়ো সাহেব তাকে সেলাম দিয়েছে। লৌকিকতম অভিবাদনের পরে সাহেব বললেন, "মুন, কাল তোমায় খড়্গপুরে যেতে হবে।"

সাহেবের আদেশের রূঢ় সংক্ষিপ্ততায় কার্ল আহত হোলো। সেদিনকার পার্টিতে কার্ল যে অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তির অতিথি হয়েছিল, অফিসে এসে এ যেন সেই লোকই নয়। এই দুদিনের মধ্যে যেন ভীষণ কোনো কলহ হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। কার্ল তবু আস্তে আস্তে বলল, "কিন্তু আপনিই না বলেছিলেন যে, মাসখানেক কলকাতায় থাকবার পরে আমায় খড়গপুরে যেতে হবে?"

"মে বি আই ডিড্। কিন্তু আমি আবার ভেবে দেখেছি। এখনি যাওয়া দরকার।"

কার্ল তবু বলল, "কিন্তু আমি যে আরো কয়েক দিন কলকাতা থাকতে চাই।"

"সেইজন্যেই আমি আর চাইনে যে, তুমি কলকাতায় থাকো।" বড়ো সাহেব তাঁর বিরক্তি বা ক্রোধ কিছুই লুকোতে চেষ্টা করলেন না।

কার্ল ভেবে পেল না কী করবে। কলহে তার রুচি ছিল না। কলহের ফলাফল সম্বন্ধেও তার ভয়ের কারণ ছিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫, এই বারো বছরে তার পুরো আয়ুষ্কালের চব্বিশটা বছর অপচয়িত হয়েছে। বছরের শেষে ব্যবসায়ী যেমন তার আদায়ের আশাহীন পাওনাগুলি হিসাব থেকে মুছে ফেলে, কার্লের তেমনি বারোটি বছর 'রাইট অফ' করতে হয়েছে তার জীবনের খাতা থেকে। সেই ক্ষতির পরে আজ কার্লের প্রধান কাম্য নিরাপত্তা। টেকনিক্যাল কো-অপারেশন এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কল্যাণে কার্ল ভারতবর্ষে যে চাকরি পেয়েছে, তা হঠকারিতার বশে হারাতে সে উৎসাহী ছিল না। কিন্তু ইংরেজ সাহেবের ঔদ্ধত্য তার আরো বেশি অসহ্য লাগছিল সুপরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক কারণে।

ন্যুরেমবার্গের বিচারের সময় কার্লের প্রিয় স্বপ্ন ছিল একটা উলট পুরাণঃ চার্চিল-ট্রুম্যান-স্ট্যালিনের বিচার হচ্ছে, জয়ী হিটলার এই বিচারের আদেশ দিয়েছেন, আসামীদের অপরাধ তারা যুদ্ধ করেছে মানবতার বিরুদ্ধে। ফেয়ারলি প্লেসে ইংরেজ বণিকের অফিসে অপমানিত কার্লের একবার মনে হল যে, যুদ্ধের ফল একটু এদিক-ওদিক হলে হয়তো কার্লই আজ ম্যাগ্রেগরকে বলতো খড়্গপুর যেতে। এবং হয়তো ঠিক সমান উদ্ধত স্বরে, কিন্তু সেটা স্বপ্নই। কার্ল তাই অত্যন্ত সংযত মস্তিষ্কে বলল, "বেশ, কালই আমি খড়্গপুর যাব।"

ম্যাগ্রেগর আরেকটু প্রতিরোধ আশঙ্কা করেছিল। পরাভূত কার্লের নম্র সম্মতি সত্ত্বেও তাই ম্যাগ্রেগরকে এবার খুলে বলতে হল, "গুড্। আমি অফিসকে বলে দিয়েছি বার্থ রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করতে, আর খড়্গপুরেও টেলিগ্রাম চলে গেছে। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, তবে—"

ম্যাগ্রেগর একটু থামলেন। কার্ল ইঙ্গিতটার তাৎপর্য বুঝল না। অপেক্ষা করল। পরে সাহেবই ব্যাখ্যা করলেন, "তবে, খড়্গপুরেও য়ুরোপীয়ানদের একটু সাবধান হয়ে চলতে হয়। ওখানে বি এন আর-এর একটা বড়ো কারখানা ছিল, আর তার চারদিকে নানা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পল্লী গড়ে উঠেছিল। এখনো ওরা অনেকেই ওখানে রয়ে গেছে। আমার অবশ্য একটুও কালার-প্রেজুডিস নেই (কার্লের বুঝতে বাকি ছিল না, আছে), তাছাড়া এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের আমি আদৌ অবজ্ঞা করিনে (অর্থাৎ করি), আই ডেয়ার সে ওদের মধ্যেও ভালো লোক আছে (অর্থাৎ নেই), তবে কিনা য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে ওদের প্রকাশ্য সংস্পর্শে উভয় সম্প্রদায়েরই অমঙ্গল হতে আমি একাধিকবার নিজেই দেখেছি। তাই—"

কার্লের বুঝতে বাকি রইল না যে, গত রাত্রির প্রিন্সেসে যাবার খবর সাহেবের কানে পেঁছোতে বাকি থাকেনি। বারবারা বিদায় নেবার আগে কেন কেঁদেছিল, কার্ল এবারে তাও বুঝতে পারল। পদচ্যুতির ভয় এখনো কার্লের কণ্ঠরোধ করল, তবু সে না বলে পারল না, "বুঝেছি, কিন্তু আমি সেদিন আপনার পার্টিতে তিনজন ভারতীয় মহিলা দেখে ভেবেছিলুম যে, ওসব সংকীর্ণতা বুঝি আর—"

"আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছ, কার্ল। আমি ভারতীয়দের কথা বল-

ছিলুম না, আমি শুধু ওই এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সম্বন্ধে একটু—"

"তা বুঝেছি, কিন্তু ওই দুই সম্প্রদায়ের কাছে আসার ফলেই তো ওই ফিরিঙ্গিদের উৎপত্তি, তাই নয়?"

এই সহজ কার্যকারণের কথা ম্যাগ্রেগরেরও অজানা ছিল না, কিন্তু কথাটার এমন নির্লজ্জ উল্লেখ তার ভালো লাগল না। সে বলল, "ওটা হচ্ছে লজিক; কিন্তু তোমরা তো জানো, আমরা বৃটিশ জাতি লজিক মেনে চলিনে। হা—হা।"

এমন আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ম্যাগ্রেগর কথাগুলি বলছিল যেন অযৌক্তিক হবার মধ্যে কোনো গৌরব নিহিত আছে। কিন্তু সে-ও বুঝতে পারছিল যে, তর্কশাস্ত্রে তার অধিকার অপ্রচুর। তাই তর্কের শেষ করে বলল, "আসল কথাটা বলি, আমাদের কোম্পানীর একটা অলঙ্ঘ্য আইন এই যে, আমাদের কোনো য়ুরোপীয়ান এ্যাসিস্ট্যান্টকে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা যেতে পারবে না।"

কার্ল আইনের কথায় যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হলো। আইন দেখিয়ে কি কাজ করা যায়? না, কাজ করানো যায়? আর, আইনের কথাই যদি বলো, কই, তার কণ্ট্রাক্টে তো এমন কোন কথা নেই যে, তার বান্ধবীনির্বাচনের স্বাধীনতা থাকতে পারবে না? কার্ল চুপ করে থাকায় ম্যাগ্রেগরকেই আবার শুরু করতে হল, এবারে সুরটা শুভাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টার;

"কী জানো কার্ল, রাজনীতিতে আমি টোরি নই। লিবারেল। কিন্তু বাস্তববিস্মৃত উদারতা মূর্খতারই নামান্তর। বর্ণবৈষম্য আমি তোমারই মতো ঘৃণা করি। হয়তো তার চেয়েও বেশি। আমিও যখন বিশ বছর আগে প্রথম এদেশে এসেছিলুম, তখন এত শত বাধানিষেধে আমিও ঠিক এমনি বিরক্ত হয়েছিলুম। পরে ভেবে দেখেছি। দেখেছিও অনেক।"

অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়ে সংকীর্ণতার সমর্থনের সঙ্গে কার্লের পরিচয় ছিল। সবল, আত্মতৃপ্ত, স্ফীতোদর, পুষ্টদেহ, সংশয়মুক্ত, আত্মবিশ্বাসী এই সব ব্যবসায়ীদের ঠিক দার্শনিকের ভূমিকায় মানায় না। কিন্তু ম্যাগ্রেগরের শেষ কথাগুলি প্ল্যাটিটিউড হলেও কার্লের কানে ঠিক ততটা পুরানো বা বিশ্রী শোনাল না, কেননা, প্রচলিত পদ্ধতির পায়ে তার আত্মসমর্পণের কাহিনীর ক্ষুদ্র একটি অংশে কিছুটা আন্তরিকতা ছিল। বিরতির পরে ম্যাগ্রেগর আবার বলল, "সেদিন পেগি ক্লাব থেকে 'কিমোনো' না কী একটা উপন্যাস এনেছিল। প্রথম কয়েক পাতা পড়েই দেখি একটি প্রাচ্যাভিজ্ঞতাসম্পন্ন চরিত্র বলছে,

'Keep the breed pure, be it white, black, or yellow. Bastard races cannot flourish. They are a waste of Nature.'

পড়ে ভালো লাগল না কথাগুলি। কিন্তু হেসে উড়িয়েও দিতে পারলুম না। এদেশে আসবার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছিলুম। দেখেছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কালে, এমনকি, তার পরেও বেশ কিছুদিন, আমাদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। আমরা ওদের বাড়ি গেছি বিয়ে দেখতে বা পুজো বা নাচ দেখতে। ওরাও আমাদের বাড়ি এসেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তারপর কী হলো? বিচ্ছেদ ঘটল কি শুধু আমাদের দোষে? না কি শুধু হিন্দুদের স্লেচ্ছবিদ্বেষে? কোনোটাই পুরো ব্যাখ্যা নয়। ব্যবধান রচিত হয়েছে ইতিহাসের আজ্ঞায়, দু-চারজন বদমেজাজী সাহেবের ইচ্ছায় বা দশ-বারোজন শুচিবাইগ্রস্ত হিন্দুর জন্যে নয়। অন্যথা হবার উপায় ছিল না। অল্প-সংখ্যক লোককে যদি বৃহৎ কোনো গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য রক্ষা করতে হয়, তাহলে তা বন্ধুত্বের দ্বারা সাধ্য নয়। মনে তো আছে, প্রথম মহাযুদ্ধে আমরা তখন ফ্রান্সে। গড়খাইর এপার থেকে ওপারের জর্মানদের দিকে আমরা সিগারেট ছুঁড়ে দিতুম। ওই ভয়ানক যুদ্ধের মধ্যেও দুপক্ষে সেখানে কী এক অচ্ছেদ্য ঐক্য ছিল। কিন্তু এখানে অবস্থা একেবারে বিপরীত। এখানে—"

কার্ল বাধা না দিয়ে পারল না। বলল, "কিন্তু এখন তো আর তার প্রয়োজন নেই। এখন তো আধিপত্যের অবসান হয়েছে।"

"তা হয়েছে হয়তো। হয়তো কেন, বোধ হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার কথা শেষ করতে দাওনি। আমি যে দূরত্বের কথা বলছিলুম, তা শুধু আধিপত্যের জন্যেই অপরিহার্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যেও। সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যদি কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সম্মানিত হয়ে বাঁচতে হয়, তবে তার উদার হবার উপায় থাকে না। নর্মানরা আমাদের দেশে এসে আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিল? আর্যরা এদেশে এসে অনার্যদের ঘৃণা না করলে তারা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো না? মুসলমানরা যদি উঠতে বসতে হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে না দিতো যে, হিন্দু থাকার অনেক জ্বালা, তাহলে ভারতের বিশাল হিন্দু সমাজ কি তাদের গ্রাস করে ফেলত না? ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা যদি শূদ্রদের অস্পৃশ্য করে না রাখতো তবে তাদের আলাদা অস্তিত্ব থাকতো কি? না, কার্ল, তোমরাও য়ুরোপে তা করোনি: হিটলারের এই নালিশটা অন্তত পুরো-পুরি মিথ্যা ছিল না। আমি ব্রাহ্মণ বা ইহুদীদের দোষ দিইনে; আমাদেরও কেউ দোষ দিলে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারি না। মেজরিটি-পরিবেষ্টিত মাইনরিটির এ ছাড়া উপায় নেই, তা সে মাইনরিটির ধর্ম বা রঙ বা জাত যাই হোক না কেন। আমি—"

এমন সময় ম্যাগ্রেগরের টেলিফোনটা বেজে ওঠায় কথায় ছেদ পড়ল। ম্যাগ্রেগর ব্যস্ত মানুষ, এতক্ষণ বাজে কথা বলে অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে। টেলিফোনের ডাকে সে যেন আবার কর্তব্যের আহ্বান শুনতে পেল। টেলিফোন তুলে উত্তর না দিয়ে ডান হাতে মাউথপিসটা চেপে কার্লকে বলল, "আচ্ছা আবার দেখা হবে। খড়্গপুরে গ্রিফিথস তোমার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভালো লোক। বোধ হয়, একটু বেশি ভালো। আর সবাই তাকে হেড অব দি ফ্যাক্টরি বলে। ওটা ভুল। আমি বলি হার্ট অব দি ফ্যাক্টরি। হা—হা—। আচ্ছা। অল দি বেস্ট!"

যথারীতি করমর্দনের পরে কার্ল বিদায় নিল। ম্যাগ্রেগরের তিক্ত বক্তৃতার পরে আর তার বারবারার সঙ্গে দেখা করবার উৎসাহ ছিল না। এতক্ষণে সে

ঘুঝল, কাল রাত্রে বারবারা কেন কে'দেছিল, কেন সে তার আগের দিন সুইমিং ক্লাবে যেতে চায়নি। অফিসে নিজের ঘরে ফিরে কার্ল কিছুক্ষণ দু-চারটে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করল। বিশেষ কিছু করবার ছিল না। বসতে পারবার আগেই তাকে আবার চলতে বলা হয়েছে। বসে বসে কার্লের মনে হল যে, সেই দিনই খড়্গপুরে চলে যেতে পারলে ভালো হত। আরো একটা অসহ্য দিন এই কলকাতায় কাটাতে হতো না।

একটু পরে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বারবারা ঘরে ঢুকল। সে কার্লের টিকিট ইত্যাদি দিতে এসেছে। অতএব বলা বাহুল্য, কিছুই তার অজানা ছিল না। কার্ল দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, "সো, দ্যাটস দ্যাট।"

"আমি জানতুম, কার্ল, যে এইরকম কিছু হবে। কে জানে, বোধ হয় দুজনেরই ভালোর জন্যে।" এটুকু বলেই বারবারার খেয়াল হলো যে, তারা অফিসে, যে তাকে এখনি ফিরে যেতে হবে। সে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। একটু দাঁড়াল। কার্ল ডাকল না। বাধা দিল না। বারবারা চলে গেল।

একা বসে কার্ল ভাবতে লাগল। বারবারার কথা ততটা নয়, যতটা ম্যাগ্রেগরের কথাগুলি। অভিজ্ঞ ম্যাগ্রেগরের যুক্তি খণ্ডন করা শক্ত। তবু ব্যক্তিকে ব্যক্তি বলে কাছে না এনে কোন লেবেলওয়ালা সম্প্রদায়ের অংশ-হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখার মধ্যে কী যেন একটা অমানুষিকতা আছে। এ যেন শুধু অপরকে অপমান করা নয়, নিজের মনুষ্যত্বই যেন এতে খাটো হয়ে যায়। বারবারাকে কোনই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি, তবু কার্লের কেবলি মনে হতে থাকল যে, সে কাপুরুষের মতো বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। আপন সুবিধার জন্যে, চাকরি হারাবার ভয়ে, সে যেন নির্দয়ভাবে বারবারাকে বর্জন করেছে। ভালো লাগল না নিজের সম্বন্ধে এই রূঢ় কথাগুলি ভাবতে, কিন্তু চিন্তাগুলি মন থেকে দূর করতেও পারল না। সেদিন অফিস থেকে বেরুবার আগে কার্ল শুধু বারবারাকে বলে এল যে, পূর্বের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে বারবারার মার জন্যে জিনিসগুলি খড়্গপুর নিয়ে গিয়ে ঠিক পে'ৗছে দেবে। সে হোটেলে থাকবে না, কিন্তু বারবারা যেন বেয়ারার কাছে প্যাকেটটা রেখে আসে, উপরে ঠিকানা লিখে। বারবারা যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়েছিল। কার্ল যথারীতি বলেছিল যে, ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই।

এর পরে আর ওদের কলকাতায় দেখা হয়নি। (আগামীবারে সমাপ্য)

নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন

পঙ্কজ দত্ত
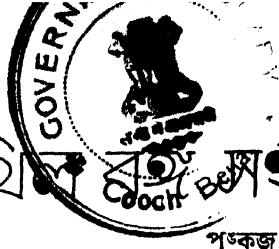
বামেঃ বিখ্যাত ঘরানার ধ্রুপদ গাইয়ে ভ্রাতৃদ্বয় 'ডাগরবন্ধু'। দক্ষিণেঃ তোড়ী রাগে আলাপরতা হুবলীর গঙ্গুবাঈ হাঙ্গল.

প্রায় চার বৎসর স্থগিত থাকার পর নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান ২৯শে নবেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতদিন ধরে আটটি অধিবেশনে উদ্‌যাপিত হয়। এই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং আজকাল নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন, নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলন এবং আরও বহু ছোট ছোট জলসা যে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে এবং বছরে বছরে সংখ্যায় বেড়েই চলেছে তারা সকলেই যে নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনী থেকেই প্রেরণা লাভ করেছে, একথা বলাই বাহুল্য।

ভারতের নানা জায়গার নাম করা বড়ো বড়ো ওস্তাদদের কলকাতায় এসে জলসা করে যাওয়ার রেওয়াজ অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। কলকাতায়ী রাজা জমিদারদের মধ্যে ওস্তাদদের আনানো নিয়ে বেশ পাল্লাপাল্লি চলতো এককালে। তবে সেসব জলসায় খুব সাধারণ লোকদের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হতো না। রাজা-রাজড়াদের ব্যাপারে রাজা-রাজড়ারাই এবং বিশিষ্ট নাগরিক-বৃন্দই শুধু নিমন্ত্রণ পেতেন। সাধারণত তাঁদেরই বৈঠকখানা, দরদালান, নাটমন্দির বা বাড়ির উঠোনে এইসব জলসার অনুষ্ঠান হতো। নগরীর সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে এ নিয়ে কোন সাড়া অনুভব করা যেত না। পাথুরিয়াঘাটার জমিদার বাড়িতেও এমনিধারা বড়ো বড়ো ওস্তাদদের আনিয়ে জলসা করা হতো। তারপর পরলোকগত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মার্গ সংগীতকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বার্ষিক সংগীত সম্মিলনী ও সংগীত প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। আগের আমলে দু'একজন ওস্তাদের জায়গায় সম্মিলনীতে নানা জায়গা থেকে অনেক ওস্তাদকে একজোট করার ব্যবস্থা হতো। প্রথম প্রথম সম্মিলনীর অধিবেশন হতো দু-তিন বা চারদিন ধরে। ক্রমশ শিল্পী সংখ্যা বাড়তে লাগলো এবং সংগে সংগে অধিবেশন সংখ্যাও। এবারের সম্মিলনী পুরো একটি সপ্তাহ ধরে আটটি অধিবেশনে শেষ হয়েছে।

রসগ্রাহীদের অভূতপূর্ব নিদর্শন

সংগীতের যে লোককে মাতিয়ে তোলার কি অদ্বিতীয় ক্ষমতা বর্তমান, অধিবেশনগুলিতে তার বেশ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। মার্গ সংগীতকে বাঙলার লোকে এমন প্রাণের সংগে গ্রহণ করেছে যে, একেবারে সন্ধ্যে থেকে খোলা রাস্তায় সারারাত ধরে হিম মাথায় করে গান শুনতেও দেখা গিয়েছে, প্রতি অধিবেশনে বহু হাজার লোককেই। প্রথম থেকেই রঙমহলের বাইরে দুটো বড়ো স্পীকার খাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেষ অধিবেশনে রঙমহলের সামনের রাস্তায়

সমের মুখে কথক নৃত্যশিল্পী শ্রীজমোহন

সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! ঐ অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচীতে কলকাতার সংগীত রসিকদের প্রিয় শিল্পীর কতকজন ছিলেন। অনুষ্ঠান আরম্ভের সময় ছিল সন্ধ্যা ছ'টা, কিন্তু তার আগে থেকেই বহুশত লোক এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করে। টিকিটের দাম অনেক, ন্যূনতম সাত টাকা, কিন্তু তাও ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ। টিকিট না পাওয়ায় ব্যর্থ রসিকবৃন্দ তবু ফিরে চলে যায় নি, তারাও মেয়েপুরুষে মিলে দাঁড়িয়ে পড়েছে টিকিট কেনার ক্ষমতা নেই যাদের, তাদের সংগে ভীড়ের মধ্যে। ভীড় বাড়তে বাড়তে রাত প্রায় দুটোর সময় রঙমহলের ভিতরের অংগন থেকে বাইরে প্রায় দুশো গজ জায়গা জুড়ে রাস্তায় লোকের এমন ঠাসাঠাসি যে কারুর পক্ষে দু'পা এগিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। ফুটপাতে, ট্রাম-লাইনে, দোকানের পৈ'ঠে-গুলিতে, আশপাশের বাড়ির বারান্দায় ছাদে সর্বত্রই লোক-ভর্তি। কেউ কেউ-বা বাড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে এসে, কেউ ঐখানেই একটা ট্যাক্সী বা রিক্‌সা ভাড়া করে তার মধ্যে বসে রয়েছে। এ এক অভূতপূর্ব অদ্ভুত দৃশ্য। সংগীতের ওপরে মানুষের এমন গভীর অনুরাগের পরিচয় অতি দুর্লভ দৃষ্টান্ত। অতো বিরাট জনতা, অতোখানি কষ্টকর অবস্থা, কিন্তু এতটুকু গোলমাল নেই; নিবিষ্ট সমাহিতভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ ওরই মধ্যে খবরের কাগজ জুটিয়ে তাই পেতে বসে সংগীত উপভোগ করেছে এবং সেই সংগে বাইরে স্পীকার লাগিয়ে ওদের তা উপভোগ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওরা অবশ্যই সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মনে মনে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়েছে এবং আর একবার তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে শেষ অধিবেশনের শেষ দিকে ঊষাকালে যখন জনতারই কতক ব্যক্তি বিশিষ্ট শিল্পীদের একবার চোখে দেখার জন্য সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের কাছে অনুরোধ জানাতে শ্রীঘোষ তাদের সে সুযোগ দিলেন প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দরজা খুলে দেবার আদেশ দিয়ে। পিল পিল করে লোক ঢুকে প্রেক্ষাগৃহের ভিতর ও বাইরে একাকার করে দেয়, কিন্তু এমনি নিঃসাড়ে যে গানের তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। বাইরের জনতা আদর্শ আচরণের পরিচয় দিয়ে যেমন ধন্যবাদার্হ হয়েছে, তেমনি প্রেক্ষাগৃহের ভিতরের দর্শকবৃন্দও রসগ্রাহীতার চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। ফলে এই আসরে সংগীত করেও যেমন আনন্দ পেয়েছেন সব শিল্পীই, তেমনি শ্রোতারাও নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে সংগীত উপভোগ করে তৃপ্তিলাভ করেছে।

ওস্তাদ আহমেদ জান (থেরাকুয়া)

সমগ্র অধিবেশনটিই বেশ সুষ্ঠু-ভাবেই পরিচালিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সূচীর প্রথমেই শ্রীতানসেন পাণ্ডের ধ্রুপদ গান অল্প সময়েই শেষ করিয়ে দেবার চেষ্টা হতেই একদল শ্রোতার দিক থেকে জোর গলায় আপত্তি আসে, কিন্তু ধ্রুপদ গানের প্রতি শ্রোতাদের অনুরাগ দেখে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দের সংগে শ্রীপাণ্ডেকে আবার গাইবার জন্য আসরে উপস্থিত করে দেন; এর জন্য শ্রীঘোষও শ্রোতাদের কাছ থেকে ধন্যবাদ লাভ করেন। এর পর থেকে আটটি অধিবেশনে কোন শিল্পীকেই সময় বেঁধে দেওয়া হয় নি এবং শিল্পীরাও যেমন যাঁর যতক্ষণ ইচ্ছে গেয়েছেন বা বাজিয়েছেন, তেমনি শ্রোতারাও যাকে যতক্ষণ ভালো লেগেছে, তাঁকে আসরে ধরে রেখে দিয়েছে এবং শিল্পী নেহাৎই ক্লান্ত ও অপারগ না হওয়া পর্যন্ত আসরে থেকেছেন।

সম্মেলনের নতুন ঝোঁক

নিখিল বংগ সংগীত সম্মিলনীর বাঙলার সংগীত ঐতিহ্যকে সর্বভারতীয় সংগীতের পাশে পরিবেশন করার ঝোঁক আগে থেকেই পাওয়া গিয়েছে, যেবার তাঁরা অধিবেশনে কীর্তন গানকে অন্তর্ভুক্ত করেন, সেবার থেকেই। এবারেও তাঁরা সূচীর মধ্যে একদিন কীর্তনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন এবং তার জন্য মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মনোহরসাঁই ধারার কীর্তনীয়া রসসাগর শ্রীরাধেশ্যাম দাসকে আসরে নিয়ে আসেন। ৭৪ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীদাসের কণ্ঠে কোন মিষ্টতা না থাকায় সমগ্র অধিবেশনের মধ্যে ঐ একটিই যা নীরস বস্তু পরি-বেশিত হয়। এবারকার উদ্যোক্তাদের একটি অতীব প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে, রবীন্দ্র-সংগীতকে মার্গ সংগীতের আসরে পর্যায়ভুক্ত করে দেওয়া। মোট আটটি অধিবেশনের মধ্যে চারটি অধিবেশনের সূচীতেই রবীন্দ্র-সংগীতকে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। রবীন্দ্র-সংগীত পরি-বেশন করার ভার দেওয়া হয় চারজন বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় গায়কের ওপরে; এ'রা ছিলেন শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীপঙ্কজ মল্লিক, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীসুচিত্রা মিত্র। এ'দের মধ্যে শ্রীপঙ্কজ মল্লিক অনুপস্থিত ছিলেন। ওপরের যে তিনজন আসরে উপস্থিত হন, তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের মাধুর্যকে পূর্ণমাত্রায় সামনে তুলে ধরে মার্গ সংগীতের এই আসরে রবীন্দ্র-সংগীতের অধিষ্ঠিত হওয়ার যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করে তো দিয়েছেনই, তাছাড়া রবীন্দ্র-সংগীতের অতুলনীয়তা এদেশের সংগীত-রসিকদের যে মর্ম অধিকার করে রেখেছে, তা গান শুনে শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসার প্রভূত উচ্ছ্বাস প্রকাশ থেকেই বুঝতে পারা যায়। এমনকি, এ'দের মধ্যে গানের জন্য শ্রীসুচিত্রা মিত্র একখানি সুবর্ণ পদকও উপহার লাভ করেন; পদকখানি উপহার দেন সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের পত্নী।

শিল্পকারিতার জন্য পুরস্কার

বিভিন্ন শিল্পী শিল্পকারিতায় অতি উচ্চধাপের পরিচয় দান করেন। অনেকের কৃতিত্ব সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কৃত হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধ্যে আছেন শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী (স্বর্ণপদক, দাতা শ্রীরণজিৎ বসু), ওস্তাদ আবদুল হালিম জফার খাঁ (স্বর্ণপদক, দাতা শ্রীগঙ্গাদাস ঝাওঁর), ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি (হীরকখচিত স্বর্ণপদক, দাত্রী সম্মিলন প্রতিষ্ঠাতা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের পত্নী), শ্যামল বসু (রৌপ্যপদক, দাতা শ্রীকুমার বসু), ওস্তাদ মৈনুদ্দীন ডাগার (স্বর্ণপদক, দাতা লালগোলার রাজা), ওস্তাদ আমীনুদ্দীন ডাগার (স্বর্ণপদক, দাতা শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), শ্রীব্রীজ-মোহন লাল (স্বর্ণপদক, দাতা শ্রীরবিশঙ্কর), পণ্ডিত মাধো সিং (স্বর্ণ-পদক, দাতা শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ), ওস্তাদ ইস্তাক আহমেদ খাঁ (স্বর্ণপদক, দাতা শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী), শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র (স্বর্ণপদক, দাত্রী শ্রীমন্মথ-নাথ ঘোষের পত্নী) ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর (স্বর্ণপদক, দাতা শ্রীভবেন্দ্রনাথ ঘোষ)। এছাড়া সংগীতের প্রতি অনুরক্ত কোন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি পণ্ডিত বিনয়াক রাও নারায়ণ পট্টবর্ধনের হাতে দেড় হাজার টাকা দান করেছেন কোন মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দেবার জন্য। বস্তুত কোন একবারের সম্মিলনীতে এতগুলি পুরস্কার ঘোষিত হওয়া বড়ো একটা দেখা যায় না। এই থেকেই বুঝতে পারা যায় নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীর এই ত্রয়োদশ বার্ষিক অনুষ্ঠানটি শিল্প-কারিতার বিকাশে কি পরিমাণ সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছিল। বাস্তবিকই অনেকেরই অনবদ্য কৃতিত্বের জন্য এ বছরের অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শিল্পীদের সাফল্য

এবার মোট ৯৬ জন সম্মিলনীতে যোগদান করেন। এ'দের মধ্যে বাইরে থেকে প্রধান শিল্পী ও সংগতকার মিলিয়ে এসেছেন ৪৯ জন। বহিরাগতদের মধ্যে গায়ক ছিলেন বারোজন এবং বাদক ও নৃত্যশিল্পী ছিলেন ৩২ জন। স্থানীয়

হীরাবাঈ বরোদেকর
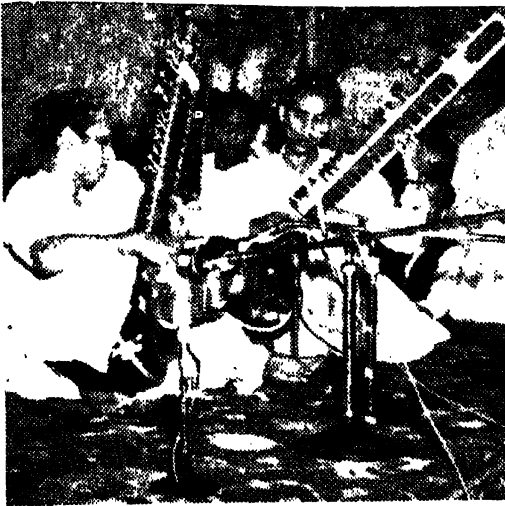
বামেঃ সেতারে সুর ও ছন্দের যাদুকর পণ্ডিত রবিশঙ্কর, দক্ষিণেঃ রাগ বিস্তারে তন্ময় সুধাকণ্ঠী খেয়াল ও ভজন গায়িকা সরস্বতীবাঈ রাণে (বম্বে)

বাঙলার গৌরব তারাপদ চক্রবর্তী

শিল্পীদের মধ্যে ছিল গানে ২২ জন এবং বাজনায় ২৩ জন ও নৃত্যে ২ জন।

বলা বাহুল্য, গানের দিক থেকে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলিই ছিলেন সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। গত বছর তানসেন সংগীত সম্মিলনীতে যোগদান করার পর দীর্ঘকাল তিনি কলকাতার বহু আসরে সংগীত-রসিকদের গান শুনিয়ে যান, গত বছরকতক ধরেই তিনি কলকাতায় আসছেন নিয়মিত, কিন্তু তবুও লোকের আশা মেটেনি। এমনিই জিনিস গান; তার ওপর বড়ে গোলামের মতো শিল্পীর কণ্ঠে। এ'দের ঘরোয়ানার শিল্প-কৃতিত্বের প্রথম পরিচয় কলকাতায় নিয়ে আসেন বড়ে গোলামের কাকা কালে খাঁ প্রথম মহাযুদ্ধের বছর ছয়েক আগে। তার আগে কালে খাঁ বছর কতক ছিলেন ঢাকাতে। কাকার কাছে ছাড়া বড়ে গোলাম 'জেনারেল সাহেব' নামে খ্যাত, ফতেশ আলি খাঁর পুত্র আশিক আলি খাঁর কাছেও তালিম নেন। বড়ে গোলামের ওস্তাদ ছিলেন তানরস খাঁর ঘরোয়ানার সাধক। গানে দরদ নিয়ে ফুটিয়ে তোলায় বড়ে গোলামের মতো ওস্তাদ কাউকে নজরে পড়ে না। আর তাই তিনি সংগীত-রসিকদের কাছে আজ সর্বাধিক প্রিয় গায়ক। তাছাড়া বড়ে গোলাম শ্রোতাদের মনের গতি চট করে ধরে নিতে পারেন।

এ-আসরে বড়ে গোলাম চতুর্থ ও শেষ অধিবেশনে গান করেন। প্রথম দিনে গান আরম্ভ করেন দরবারি কানাড়ায় খেয়াল গেয়ে। এবারে এসেছেন দুই ছেলেকে নিয়ে; একজন তান ধরতে আর একজন তবলায়। মিনিট কুড়ি আলাপের পর তিনি গান করেন প্রায় আধ ঘণ্টা। গত বছরের চেয়েও তাঁর গলা আরও বেশী মেজাজী। এর-পর তিনি আড়ানা, খাম্বাজ ও কালাংড়ায় পর পর তিনখানি ঠুংরী গেয়ে ভোরের আবহাওয়াকে মোহময় করে ঐদিনের অধিবেশন শেষ করেন। শেষ দিনের শেষ সূচীতে তিনি প্রথমে খেয়াল শোনান গুণকেলি রাগে; সকাল তখন পৌণে সাত। খেয়াল শেষ হতেই লোকের যতো ফরমাইশ, অনুরোধ। সন্ধ্যে থেকে তেরো ঘণ্টা পার করে লোকে তখনও আরও শোনার জন্য লালায়িত। ওস্তাদজীও লোককে খুশী করার জন্য একের পর এক গেয়ে শোনালেন তিনখানি ঠুংরী—"অব মোরি নৈয়া পার", "ক্যা করে সজনী" এবং অবশ্যই "বাজুবন্ধ খুল খুল যায়।"

ভীমসেন যোশী (পুণা)

কলকাতার শিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এবারে বিস্ময়কর শিল্পকারিতার পরিচয় দেন। শেষ দিনের অধিবেশনে হিন্দোল রাগে তাঁর "দ্রুমে দ্রুমে লতায় লতায় পাতায় পাতায়" গানটি সম্মিলন শেষ হবার পরও সে-আসরের শ্রোতাদের মনকে দুলিয়ে রেখে দিয়েছে। ছায়া-হিন্দোল রাগে বিলম্বিত লয়ে একখানি খেয়ালকে চল্লিশ মিনিট গেয়ে না থেমেই হঠাৎ অতি দ্রুত লয়ে "দ্রুমে দ্রুমে" আরম্ভ করে ধর্তাতেই শ্রোতাদের চমকিত করেও তোলেন এবং অত্যন্ত পুলকিতও। এই সংগে কেরামৎ আলির তবলা এবং সাগীরুদ্দীনের সারেংগীর সংগত মিলে গানখানি দীর্ঘকাল মনে থাকবার মতো একটি অনবদ্য সুরনিবিড় আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তোলে। এ গানখানি শেষ হতে প্রেক্ষাগৃহে পুলকোচ্ছ্বাসের যে প্রচণ্ড করতালি পড়ে অতোটা সমাদর ইদানীং কলকাতার কোন শিল্পীর বরাতে জুটেছে বলে মনে পড়ে না। এরপরই শ্রোতৃবৃন্দ ঠুংরীর জন্য অনুরোধ করাতে শ্রী চক্রবর্তী বিনয়ের সংগে জানান যে কলকাতার শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর গান প্রায়ই শোনেন, সুতরাং শ্রোতৃবৃন্দ যেন বহিরাগত শিল্পীদের গান বাজনা শোনাতেই নিবিষ্ট হন। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ সেকথা শুনতে না চেয়ে তাঁরই ঠুংরী শোনার জন্য মুহু-র্মুহু অনুরোধ জানাতে থাকে। বাধ্য হয়েই শ্রী চক্রবর্তী ঠুংরী ধরেন "পিয়া গয়ে পরদেশ"। চমৎকার ঠাট, মিষ্টি ছন্দ। শ্রী চক্রবর্তী কেবল বাঙলার শিল্পীরই গৌরব বাড়ান নি, সেই সংগে সমগ্র সম্মিলনীর মধ্যেই তিনি গানের দিকটাকে প্রভূত ঐশ্বর্যশালী করে তোলেন।

এবারে তিনজন নতুন শিল্পীর আবির্ভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা হচ্ছেন ওস্তাদ মৈনুদ্দীন ও আমীনুদ্দীন ডাগার ভ্রাতৃদ্বয় এবং পুণার পণ্ডিত ভীমসেন যোশী। তানসেনের গুরু হরি-দাস গোস্বামী প্রবর্তিত ডাগেরপাণি পদ্ধতির ধ্রুপদ গানের বৈশিষ্ট্য এই দুই ভাই আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীদের পর্যায়ভুক্ত। "ডাগার-বন্ধু" নামেও এরা পরিচিত। ইন্দোরের পরলোকগত নাসীর-উদ্দীন খাঁর এরা পুত্র। নসীরের পিতা

ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ

আল্লাবন্দে খাঁও ডাগেরপাণি পদ্ধতির সেরা গায়ক বলে এককালে পরিচিত ছিলেন। "ডাগেরবন্ধু"-রা আলাপ, ধ্রুপদ, ধামার ও হোরিতে দক্ষ। ছবছর বয়সে মৈনুদ্দীন পিতা নিসীরউদ্দীনের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করে তার দুই কাকা জয়পুরের রিয়াসুদ্দীন খাঁ এবং উদয়পুরের জিয়াউদ্দীন খাঁর কাছে সতের বৎসর তালিম নেন। ১৯৪৬ সালে তিনি যোধপুর মহারাজের দরবার গায়ক নিযুক্ত হন। আমীনুদ্দীনের শিক্ষা তাঁর দাদার কাছ থেকে। এরা দুভাই দিল্লীর হরিজন কলোনীতে মহাত্মাজীকে গান শুনিয়েছিলেন।

"ডাগর-বন্ধু" ভ্রাতৃদ্বয় চতুর্থ ও সপ্তম অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম দিনে ললিতা-গৌরি রাগে ধ্রুপদ শুনিয়ে তাঁদের শিল্পকৃতিত্ব কলকাতার রসিকদের সামনে তুলে ধরেন। ধীর সমাহিতভাবে একেবারে খাদ থেকে আরম্ভেই আবহাওয়াটা ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে। ভারী মিষ্টি গলা যা ধ্রুপদীদের কাছে দুর্লভ; খাদেও যেমন মিষ্টি তেমনি একেবারে চড়াতেও। আর গাইবার ভঙ্গীটিও ভারী সুন্দর। এমন ধ্রুপদ গান পেলে কে আর খেয়াল ঠুংরী শুনতে চাইবে! ছন্দের সাজে সুরের এমন বিস্তার ক্ষমতা বর্তমান ধ্রুপদীয়াদের মধ্যে আর কার আছে? ধ্রুপদের পর এ'রা পর পর দুখানি ধামার শুনিয়ে এই প্রথম আবির্ভাবেরই রসিকদের মনে স্থায়ী আসন পেতে নিতে সমর্থ হন। যদিও গোয়ালিয়র থেকে আগত মাধো সিংহার পাখোয়াজ গানের পর্দা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটু ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে বলে মনে হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনে এ'দের গানে সংগতে তবলা নিয়ে বসেন ওস্তাদ আহমদ্ জান (থেরাকুয়া)। এই দিন এ'রা সুরদাসি মল্লার রাগে সাদরা গেয়ে শোনান; ধ্রুপদেরই চাল। এর আগের দিনের এদের চমকপ্রদ কৃতিত্বের কথা প্রচারিত হওয়ায় এদিন এ'দের গান শোনার জন্য প্রেক্ষাগৃহ শ্রোতায় পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেক শ্রোতাই এ'দের দুজনকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে থাকে।

পুণার পণ্ডিত ভীমসেন যোশীকে প্রথম পাওয়া যায় পঞ্চম অধিবেশনে এবং তারপর আবার সপ্তম অধিবেশনে। গানে পণ্ডিত হবার পক্ষে বয়েস খুবই অল্প, মাত্র একত্রিশ। শ্রী যোশী কলকাতার আসরের পুরাতন শিল্পী শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ রাণে ও শ্রীমতী গঙ্গুবাঈ হাঙ্গালের গুরু সোয়াই গন্ধর্বের শিষ্য এবং কিরাণা ঘরোয়ানার শিল্পী। প্রথম দিনে শ্রী যোশী মিয়া-কী-মল্লারে খেয়াল গেয়ে শোনান। বলিষ্ঠ নিটোল গলা; ওপরে ও খাদে সমান মাধুর্যপূর্ণ। সুর বিস্তারে ও ছন্দে বৈচিত্র্য আছে আর আছে কিরাণা ঘরোয়ানার গমক তানের বৈশিষ্ট্য। প্রথম গানেই তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। খেয়ালের পর শ্রোতাদের অনুরোধের চাপে পড়ে তিনি একখানি ঠুংরী গেয়ে বেশ একটা দোলন এনে দিলেন। তাঁর ভারী, ভরাট অথচ মিষ্টি গলা সুরের সংগে শ্রোতার মনকে অন্তরংগ করে তোলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কিরাণা ঘরোয়ানারই সাধক-শিল্পী ছিলেন পরলোকগত আবদুল করিম খাঁ।

এ আসরে কিরাণা ঘরোয়ানার আরও

বামেঃ সেতারবাদক আবদুল হালিম জাফর খাঁ (বম্বে)। দক্ষিণেঃ সানাইবাদনরত ওস্তাদ নাজির হুসেন

তিনজন শিল্পী হচ্ছেন শ্রীমতী হীরাবাঈ বড়োদেকর, তদীয়া ভগ্নী শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ রাণে এবং হুবলির শ্রীমতী গঙ্গুবাঈ হাঙ্গাল। কলকাতার সঙ্গীত-রসিকদের কাছে শ্রীমতী হীরাবাঈ দীর্ঘ-কাল আগে থেকেই পরিচিতা; তাঁর সঙ্গীত গুণপনা সম্পর্কে নতুন কথা বলবার নেই। আবদুল করিম খাঁর সঙ্গে তিনি বরাবরই আসতেন এবং আবদুল করিম খাঁর বিশিষ্ট গায়নপদ্ধতির উত্তরাধিকারিণী হিসেবে রসিকজনের মনে অনেক উ‍ঁচু আসনে অধিষ্ঠিতা হয়ে আছেন। শ্রীমতী সরস্বতী রাণে দুটি অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী গঙ্গুবাঈও দুটি অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। কিরাণা ঘরোয়ানার আর একটি গানের অনুষ্ঠান হয় সমাপ্তি অধিবেশনে যাতে দ্বৈতভাবে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী হীরাবাঈ ও শ্রীমতী সরস্বতীবাঈ।

পণ্ডিত বিনায়করাও নারায়ণ পট্ট-বর্ধন সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন এবং কেবল প্রথম দিনের অধিবেশনেই গানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রী পট্টবর্ধনও কল-কাতার রসিক সমাজের কাছে পুরাতন এবং অতি প্রিয় শিল্পী। স্বর ও সুরের ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল খেয়াল, তরাণা ও ভজন গানে শ্রী পট্টবর্ধনের সমতুল শিল্পী খুবই কম আছেন। পঞ্চান্ন বছর বয়সের এই ওস্তাদ শিল্পী পাঁচ বছর বয়সে তাঁর কাকা কেশবরাও পট্টবর্ধনের নিকট শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তারপর বৃত্তি নিয়ে লাহোরে চলে যান বিষ্ণু দিগম্বরের কাছে শেখবার জন্য এবং তাঁর কাছে একাদিক্রমে বিশ বৎসর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবারের আসরে প্রথমে তিনি কৌশিকী কানাড়া রাগে একখানি খেয়াল শোনান এবং শেষ করেন শ্রোতাদের অনুরোধে "অব মৈ রাম কহী যাঁউ" ভজনখানি গেয়ে। শ্রী পট্ট-বর্ধনের গান প্রথম দিন থেকেই সম্মিলনীকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে।

বহিরাগত গাইয়েদের মধ্যে দিল্লীর ওস্তাদ মনওয়ার খাঁ ও তাঁর পুত্র হায়াৎ খাঁ শেষ অধিবেশনে খেয়াল গেয়ে শোনান। এ'রা আলি বক্স ও তাঁর পুত্র মসিদ খাঁ বা মস্তে খাঁর ধ্রুপদী ঘরোয়ানার অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর ওস্তাদ মুজফর খাঁর যথাক্রমে পুত্র ও পৌত্র। মালকোষ রাগে এরা খেয়াল গেয়ে শোনান; সুর বিস্তারে খানিকটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁরা দিতে পেরেছেন। এ'রা ছাড়া বাইরের গাইয়েদের মধ্যে আর ছিলেন আগ্রার ওস্তাদ বসীর খাঁ ও করাচীর ওস্তাদ বরকত আলী কিন্তু তাঁদের গানে উৎসাহিত হবার মতো কিছু পাওয়া যায়নি। প্রথম অধিবেশনের সূচী আরম্ভ হয় পণ্ডিত তানসেন পাণ্ডের ধ্রুপদ গান দিয়ে। কর্ণাটি পদ্ধতির সন্তান-মঞ্জরী রাগে তিনি গাইতে আরম্ভ করেন এবং আরম্ভ ভালোই হয় কিন্তু সময় সংক্ষেপ করার তাগিদ পেয়ে তিনি গান বন্ধ করে দেন। পরে শ্রোতা ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে গোলমাল বন্ধ হলে তিনি গাইতে বসলেন বটে কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনোজ্ঞ কিছু জমিয়ে তুলতে পারলেন না আর।

সরোদিয়া ইস্তাক আমেদ খাঁ (দিল্লী)

স্থানীয় গাইয়েদের অংশ

সম্মিলনীতে যোগদানকারী মোট ৩৪ জন গাইয়ের মধ্যে স্থানীয় শিল্পী ছিলেন ২২ জন। এ'দের মধ্যে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী তো কণ্ঠসঙ্গীতে সম্মিলনীরই শোভা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। শ্রীরমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীঅমর ভট্টাচার্য, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বাঙলার প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞরাই ধ্রুপদ গানের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। প্রায় সকলেই বাঙলার বৈশিষ্ট্য বিষ্ণুপুরে ঘরোয়ানার শিল্পী। এ'দের মধ্যে অঘোর চৌধুরী ও বিশ্বনাথ ধামারীর শিষ্য ৭৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীঅমর ভট্টাচার্য ষষ্ঠ অধি-বেশনে প্রথমে কল্যাণ রাগে ধ্রুপদ এবং পরে বসন্ত এবং পরোজে দুখানি ধামার শুনিয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করেন। বিষ্ণু-পুরের শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন উদ্বোধন করেন প্রথমে ধ্রুপদ এবং পরে মার্গসঙ্গীতের সুরে বাঁধা এক-খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে। মার্গসঙ্গীতের আসরে রবীন্দ্র সঙ্গীতকে প্রচলিত করায় শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়ে আসছেন। আর ধ্রুপদ গান শোনান পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধনে শ্রীশিশির গুহ ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

কলকাতার সুপরিচিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র পঞ্চম অধিবেশনে পুরিয়া ধানশ্রীতে এবং পরে বসন্ত রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। সঙ্গে থেরাকুয়ার সঙ্গত মিলে গান তিনি ভালোই জমিয়েছিলেন এবং শ্রোতারাও খুশি হন। ষষ্ঠ অধিবেশনে জ্ঞান গোঁসাইয়ের শিষ্য শ্রীনলিন মালাকরও অনেক দিন পর একটি সুন্দর ঠাট সামনে তুলে ধরে প্রশংসিত হন। শ্রী মালাকর গান শেষ করেন জনপ্রিয় রাগপ্রধান বাংলা গান 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল' গেয়ে। এই অধিবেশনেই শ্রী এ কানন কেদারাতে একটি খেয়াল এবং পরে একখানি ঠুংরী শোনান। শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী উমা দে, শ্রীমতী হেনা বর্মন, শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথ বসুও সম্মিলনীর বিভিন্ন অধিবেশনে গান শোনান, কিন্তু এ'দের মধ্যে এমনও কয়েকজন আছেন, যাঁদের এ-আসরে উপস্থিত না করলেই বেশি শোভনীয় হতো।

বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব শিল্প-মাধুর্য

বাদ্যযন্ত্রের দিক থেকে এবারের সম্মিলনীতে দীর্ঘকাল মনে থাকার মতো

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পকারিতার পরিচয় দিয়েছেন বেশ কয়েকজন। এ'দের মধ্যে নির্দ্বিধায় পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার বাজনারই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হয়। পণ্ডিত রবিশঙ্করের বাজনার কথা ছিল দুটি অধিবেশনে, কিন্তু শ্যালক আলি আকবর অনুপস্থিত হয়ে পড়ায় তাঁরও অনুষ্ঠান-সূচীর দুটির মধ্যে একটিতে তাঁকে বসতে হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম অধিবেশনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম দিনে তিনি পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে হিন্দোল-কেদারা বাজিয়ে শোনান; তাঁর সঙ্গে বসেন তাঁরই ছাত্র উমাশঙ্কর। নতুন কোন মৌলিক রাগ নয়, সোজাসুজি যেখানে যেমন খাপ খায়, হিন্দোল ও কেদারার ছন্দ মেলানো এই রাগ। দ্বিতীয় দিনে আবার নতুনত্ব পরিবেশন করেন কারভানি নামক এ অঞ্চলে অপরিচিত একটি কর্ণাটকী রাগ বাজিয়ে। শেষ দিনের অধিবেশনে তিনি বাজান মাড়োয়া ঠাটে ভাটিয়ার রাগ। তিন দিনই সুরের বিস্তারে

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ

যেমন, তেমনি ছন্দের বৈচিত্র্যের দিক থেকে পণ্ডিত রবিশঙ্কর এমন মোহনীয় শিল্প-রচনার পরিচয় দান করেন, যা কোন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পীর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। প্রতি বছরই তিনি নতুন রূপ সামনে এ'কে দেন, যা দীর্ঘ-কাল স্মৃতিকে আবিষ্ট করে রেখে দেয়।

সেতার বাজনায় এবার বম্বে থেকে একজন নতুন শিল্পীকে পাওয়া গেল ওস্তাদ আবদুল হালিম জাফর খাঁ। ইন্দোরের ওস্তাদ বাবু খাঁর কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে আবদুল হালিম ঐ ইন্দোরেরই ওস্তাদ মাহবুব খাঁর শিষ্য হন। জোড় ও গৎ-টৌড়ী ভঙ্গীর বাজনায় তিনি সুদক্ষ এবং ছন্দের কাজ অনবদ্য। সেতার ছাড়া বীণা বাদ্যেও তিনি সমান পারদর্শী। ভারী মনোরম মেজাজ ও ভঙ্গী, হাতও মিষ্টি। সম্মিলনীর তৃতীয় ও সপ্তম অধিবেশনে তিনি বাজনা শোনান। প্রথমে বাজান মধুমাধবী রাগ, তারপরে শোনান একটি দেহাতী সুর। এই প্রথম দিনেই তিনি তাঁর অনুপম সুরসৃষ্টিতে শ্রোতাদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত

কলকাতার জনসাধারণ সংগীতের কি দারুণ অনুরক্ত সম্প্রতি রঙমহলে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীর অধিবেশনকালে তারই একটি প্রমাণ এই ছবিখানি। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে পরদিন সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত শান্ত নিবিষ্টভাবে ফুটপাতের ওপরে সারারাত দাঁড়িয়ে বসে যে হাজার কয়েক শ্রোতা গান বাজনা শোনার আদর্শ আচরণের পরিচয় দেন এরা তারই একটি অংশ

করে তোলেন এবং দ্বিতীয় দিনে তিনি শ্রোতাদের আরও মাতিয়ে তোলেন। কলকাতার রসিকদের মনে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

এছাড়া সেতার বাজনায় ছিলেন আরও তিনজন শিল্পী—শ্রীবিমলাকান্ত রায়-চৌধুরী, পণ্ডিত রবিশংকরের ছাত্র উমাশঙ্কর এবং শ্রীমতী কল্যাণী রায়। সেতার ছাড়া আর তারের যন্ত্রের মধ্যে ছিল দিল্লীর ওস্তাদ ইস্তাক আহমেদ খাঁ, করাচীর ওস্তাদ ইয়াকুব আলি এবং স্থানীয় শিল্পী শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। ইস্তাক আহমেদ যতদূর মনে হয় কলকাতার আসরে প্রথম। দুটি অধিবেশনে তিনি বাজনা শোনান এবং বেশ ভাল ছাপই রেখে যেতে পেরেছেন। ইস্তাক আহমেদ পরলোকগত ওস্তাদ কেরামৎ-উল্লা খাঁর পুত্র; লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র দরবারের বাদক মিয়াঁ বাসাদ খাঁর শিষ্য নিয়ামৎউল্লা খাঁর পৌত্র এবং ওস্তাদ কেকৈব খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইস্তাকের অল্প বয়সকালে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর পিতার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত ওস্তাদ রফিক খাঁ, ওস্তাদ সফিউল্লা খাঁ ও কলকাতার শ্রীকালিদাস পালের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ওস্তাদ ইয়াকুব আলি দ্বিতীয় অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন, সম্ভবত ওস্তাদ আলি আকবরের জায়গায় কিন্তু কোন ছাপ দিতে পারেননি তিনি। তার চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ্য হয় চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রের বাজনা। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে রাধিকামোহন একজন বিশেষ সমাদৃত গুণী। পরলোকগত ওস্তাদ আমীর খাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে তিনি শিখতে থাকেন ওস্তাদ দবীর খাঁর কাছে। অধিবেশনে তিনি ছায়া-কামোদ শুনিয়ে শ্রোতাদের অনাবিল আনন্দ পরিবেশন করেন।

তারের যন্ত্রের মধ্যে বীণা ও সুর-বাহার বাজিয়ে শোনান শ্রীমোহিনী মিশ্র ও শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। বেহালা বাজনার কোন ব্যবস্থা সূচীতে ছিল না, তবে সপ্তম অধিবেশনে হঠাৎ দিল্লীর শ্রীসত্যদেব পাওয়ার উপস্থিত থাকায় তাঁকে দিয়ে বাজানো হয়; কোন বৈশিষ্ট্য ফোটেনি সে বাজনায়। এছাড়া একক সারেঙ্গী বাজিয়ে শোনান বম্বের পণ্ডিত রামনারায়ণ।

বাজনার দিক থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল তবলা লহরায়। বাইরেকার চারজন এবং স্থানীয় পাঁচজনকে নিয়ে মোট ন' জনের একক লহরার ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, ওস্তাদ আহমেদ জানই (থেরাকুয়া) ছিলেন এ'দের মধ্যে মুখ্য আকর্ষণ এবং তিনি তাঁর শিল্প-কারিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর অতুলনীয় পরিচয়ই ফুটিয়ে তোলেন। একক ছাড়া তিনি কয়েকজনের গান ও বাজনার সঙ্গেও সঙ্গত করেন। সঙ্গতে কিন্তু সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রকাশ করেন ওস্তাদ কেরামৎ আলি খাঁ। গাইয়ে ও বাজিয়েদের মধ্যে বড়ো ক'জনের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সঙ্গতে বসেন এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি অননুকরণীয় কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, তাঁর গুরুভাই ওস্তাদ আফাক হোসেন খাঁ, বম্বের ওস্তাদ সামসুদ্দীন এবং বেনারসের কিষেণ মহারাজও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলেন। বেশ প্রাণভরে তবলা শোনার সুযোগ পাওয়া যায় এবারের সম্মিলনীতে। ওস্তাদ কেরামৎ আলি, শ্রীশ্যামল বসু, শ্রীকানাইলাল দত্ত ও শ্রীমহাপুরুষ মিশ্রও তবলা লহরা বাজান। পাখোয়াজে লহরা শোনান গোয়ালিয়রের মাধো সিং এবং এখানকার শ্রীসুবোধ দে। শ্রীসুবোধ দে বাঙলার প্রবীণতম সঙ্গীতজ্ঞ-দের অন্যতম। বর্তমানে ৮৪ বছর বয়সেও তাঁর বাজনায় যথেষ্ট প্রাণশক্তির পরিচয় রয়েছে। আর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল শ্রীমণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারমোনিয়াম। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠুংরী বাজনা না হলে কলকাতার কোন সঙ্গীত সম্মিলনীই অসম্পূর্ণ মনে হয়। বর্তমানে হারমোনিয়াম বাজনায় লোককে মাতিয়ে তোলার ক্ষমতায়, অন্তত কলকাতায় তিনি অদ্বিতীয়। বোধ হয়, অভিনবত্ব আনার জন্য এছাড়া জাপানী বাজনা টাইকো-সোতোকে 'বুলবুল তরঙ্গ' নাম দিয়ে আসরে বসিয়ে দেওয়া হয়। অমন বিদেশী যন্ত্র এ-আসরে খাপ খায় না, আর বাদক শ্রী এম এস কুদরেতকরও এমন কোন শিল্পকারিতার পরিচয় দিতে পারেননি, যাতে ও-যন্ত্রটা উপভোগ্য হয়েছে বলা যেতে পারে। এছাড়া গান ও বাজনার সঙ্গে সঙ্গীতে বহিরাগত ও স্থানীয় মিলিয়ে প্রায় ত্রিশজন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

নৃত্য

নাচেতে এবার দিল্লীর তরুণ কথক-শিল্পী ব্রীজমোহন লাল একাই মাৎ করে দিয়েছেন। আচন মহারাজের পুত্র ব্রীজ-মোহনের নিকাশ ও তৎকারে সাঙ্গিত ভঙ্গী এবং তাল, লয় ও বোলে অতি ললিত শিল্প-মাধুর্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া নাচে আরও ছিলেন চৌবে মহারাজ, সিন্ধের কমলরাণী, বম্বের জয়কুমারী, শ্রীসত্যনারায়ণ এবং কলকাতার বেলা অর্নব ও অনুরাধা গুহ। এ'দের মধ্যে চৌবে মহারাজ এবং জয়কুমারী ছাড়া আর সকলকে নেহাৎই শিক্ষানবীশ পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হলো। এ'রা সকলেই কথকশিল্পী। ভারতের অন্যান্য ধারায় মার্গ নৃত্যেরও ব্যবস্থা আসরে করা উচিত ছিল।

উপসংহার

চার বছর বন্ধ থাকার জন্যই বোধহয় নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীর উদ্যোক্তা-দের অতোদিনের জমাট উৎসাহ এবছর উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। এবারে অধি-বেশন উদ্বোধন করেন পণ্ডিত বিনায়ক-রাও নারায়ণ পট্টবর্ধন; প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। এরা ছাড়া সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, লালগোলার রাজা, নাটোরের মহারাজা এবং শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ বক্তৃতা করেন। সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম জানিয়ে ওদের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। উদ্যোক্তাদের সুব্যবস্থা; গুণীশিল্পীর সমাবেশ এবং সমঝদার শ্রোতাদের নিবিষ্ট আচরণ মিলে সম্মিলনীকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে আগামী বছরের অধিবেশন সম্পর্কে ক'টি প্রস্তাব হচ্ছেঃ আরও বড়ো জায়গায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাতে বহু হাজার লোক অল্প দামে সঙ্গীত উপ-ভোগ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে টপ্পা ও শ্যামা সঙ্গীতের প্রবর্তন করা।
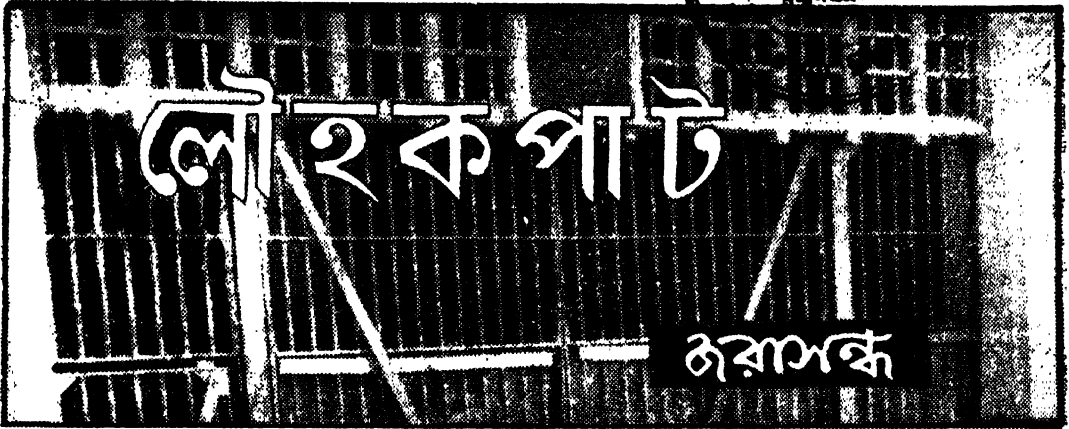
তেরো

আজ এতদিন পরে আমার কণ্ঠে তার পুনরুক্তি করতে গিয়ে মনে হচ্ছে এর চেয়ে হাস্যকর ব্যর্থতা আর হ'তে পারে না। তবু এইটুকু আমার সান্ত্বনা—নিজের ভাবা ও ভাষ্য দিয়ে তাকে আমি বিকৃত করিনি, ব্যাহত করিনি তার স্বচ্ছন্দ সারল্য। এ কাহিনীর কথা মুনসীর, সুরও তারই। আমি অক্ষম লিপিকার মাত্র।

মুনসীর কাহিনী শুরু হলঃ—

কালীগঞ্জের সীতানাথ দত্তের বাড়িতে ডাকাতি করবো—এটা আমাদের অনেকদিনের ইচ্ছা। লোকটা টাকার কুমীর, কিন্তু ভয়ানক ধড়িবাজ। টাকা পয়সা গয়নাগাঁটি বাড়িতে বিশেষ কিছুই রাখে না, সব থাকে ব্যাঙ্কে। মস্ত বড় কারবার। চারখানা গোরুর গাড়ী। সবগুলো তার নিজের কাজেই খাটছে দিনরাত। তার একখানার গাড়োয়ান করে ঢুকিয়ে দিলাম আমার দলের এক ছোকরাকে। সেই একদিন খবর নিয়ে এল, দত্তমশায়ের মেয়ের বিয়ে। ঐ একটিই মেয়ে। জামাইও আসছে বড় ঘর থেকে। বিয়েতে মস্ত ধুমধাম হবে। বড়লোক কুটুম্বও আসবে অনেক। বিয়ের রাতে হানা দিতে পারলে নগদে গয়নাতে হাজার পঞ্চাশের বুঝ যে পাওয়া যাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে দত্তমশায়ের দুটো বন্দুক আছে, হিন্দুস্থানী দারোয়ান আছে। বাড়ীতে লোকজনও থাকবে কম নয়। কাজেই আয়োজনটা বেশ বড় রকমের হওয়া দরকার। সেদিক থেকে অসুবিধা কিছু নেই। দল ঠিক করে ফেললাম। তাছাড়া—

এই পর্যন্ত বলে মুন্সী হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল ভাবছে, যেটা মুখে এসেছিল, তাকে মুখের বাইরে আনা ঠিক হবে কিনা। একবার আমার দিকে তাকাল এবং পরক্ষণেই যেন সব সংকোচের বাধা ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল, নাঃ লজ্জা করলে তো চলবে না। এ পাপমুখে সবই যখন কবুল করেছি হুজুরের কাছে, এটাও লুকোবো না।

হুজুর জানেন, এক একটা ডাকাতিতে কত বড় বড় গেরস্তকে আমরা পথের ফকির করে ছেড়ে দিই। দশজনে বলাবলি করে, লোকটার কি সর্বনাশ হয়ে গেল! বাইরে থেকে ঐটুকুই দেখা যায়, কিন্তু আসল সর্বনাশ যে কন্দুর গিয়ে পৌঁছোয় তার খবর আপনারা রাখেন না। লোকের ধনপ্রাণ কেড়ে নিয়েই আমরা ক্ষান্ত হই না, কেড়ে আনি মান, আর তার চেয়েও বড় জিনিস—মেয়েদের ইজ্জৎ। বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে, আর বৌঝিদের ধর্মনষ্ট হয়নি, এ রকম ঘটনা আমি অন্তত একটাও জানি না। শিকারীর দলে যেমন কতগুলো লোক থাকে, যারা বনবাদাড় ভেঙে পিটিয়ে হৈ হল্লা করে শিকার ধরবার সুবিধে করে দেয়, আমরাও তেমনি একদল গুণ্ডা নিয়ে যাই, যাদের কাজ হল, মার ধোর, খুন জখম আর চেঁচামেচি। এদের নজর রুপোর দিকে যতটা থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে রূপের দিকে। আমরাও তাই চাই। এগুলোকে দিয়ে আমাদের ডবল লাভ। গোটাকয়েক মেয়েমানুষের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে আসল কাজ হাসিল করে নিই; আর ভাগ-বাঁটোয়ারার বেলায় যা হোক কিছু দিলেই চলে যায়। দেখতে ভাল বলে দত্তবাড়ির মেয়েদের ডাক নাম ছিল। তার ওপর এই বিয়ে উপলক্ষ্যে শহর থেকে যারা আসবে, তারা তো আর এক কাঠি সরেশ। কাজেই গুণ্ডা আসতে লাগল দলে দলে। ওরি মধ্য থেকে বেছে বেছে একদল জোয়ান ছোকরা ঠিক করে ফেললাম।

শীতের রাত। বারোটার মধ্যেই বিয়ের গোলমাল মিটে গেল। যারা খেতে এসেছিল, সব চলে গেল। বরযাত্রী আর দূরের কুটুম্বরাও শুয়ে পড়েছে। এমনি সময়ে আমরা মার মার শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বাড়িটা ঘিরে ফেলা হ'ল প্রথম চোটেই। খোট্টা দারোয়ানগুলোর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। বরযাত্রীদের ঘর বাইরে থেকে বন্ধ করে, ঢুকে পড়লাম বাড়ির মধ্যে। মেয়ে মহলে কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল। বাছা বাছা লোক নিয়ে

উঠলাম গিয়ে দোতলায়। বাহাদুর লোক বটে সীতানাথ দত্ত। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে বেরিয়ে এসে বলল, তোমাদের সর্দার কে? মুখে রং টং মাখা ছিল। এগিয়ে গেলাম। দত্তমশাই বলল, এই নাও চাবি। ঐ ঘরে সিন্দুকে টাকা আছে। গয়নাও বেশ কিছু আছে। নিয়ে যাও। কাপড়-চোপড় আছে, তাও নিতে পার। মেয়েদের গায়ে যে সব গয়না আছে, তাও খুলে দেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।

—কি কথা?

—যদি হিন্দু হও, নারায়ণের দিব্যি, যদি মোছলমান হও আল্লার দিব্যি, মেয়েদের গায়ে যেন হাত দেয় না কেউ।—বলে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে দত্তমশাই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। ধরা গলায় বলল, ডাকাতের সর্দার হলেও তুমি মানুষ। আমারই দেশের মানুষ। তোমার ঘরেও মা-বোন বৌ ঝি আছে। এইটুকু শুধু তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি।

ডাকাতি অনেক করেছি, বড়বাবু। কান্নাকাটিও কম শুনিনি। ও সব আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু দত্ত-মশায়ের চোখের জলে মনের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। কথা দিলাম। বললাম, গয়নাগাঁটি খুলে দিয়ে মেয়েদের সব একটা ঘরে চলে যেতে বলুন। ওদের কোনো বিপদ নেই।

দত্তমশাই চলে গেল। আমি আমার দলবল জড়ো করে কড়া হুকুম দিলাম, টাকাকড়ি, জিনিসপত্তর যা পাও লুঠ কর। কিন্তু সাবধান, জেনানা হারাম।

কাজ শেষ হতে আধ ঘণ্টার বেশী লাগল না। সবাইকে নিচে যাবার হুকুম দিয়ে ভাবলাম, তেতলাটা একবার নিজের চোখে দেখে আসি। সীতানাথ দত্ত ঘড়েল লোক। কিছু আবার লুকিয়ে টুকিয়ে রাখেনি তো ওখানে?

তেতলায় একখানা ঘর। অন্ধকার। দরজা বন্ধ। জানালা দিয়ে টর্চ ফেলতেই আলো পড়ল একটি মেয়ের মুখের ওপর। চমকে উঠলাম। এ কে? কোত্থেকে এল ও? একেবারে অবিকল সেই। সেই নাক, সেই চোখ, তেমনি জোড়া ভুরুর উপর ছোট্ট একখানি কপাল। আমার কত আদরের নুরু। পরীর মত মেয়ে। আমার ছেলেবেলার দোস্ত ছিল মতীনা; কলেজে পড়ত তখন। সাধ করে নাম দিয়েছিল নুরজাহান। আট বছর আগে এমনি দামী বেনারসী পরিয়ে গা-ভরা জড়োয়া গয়নায় সাজিয়ে মাকে আমার পরের ঘরে পাঠিয়েছিলাম। আর ফিরে আসেনি।

মেয়েটা চিৎকার করে কাকে জড়িয়ে ধরল। টর্চ নিবিয়ে দিলাম। বেশ করে রগড়ে নিলাম চোখ দুটো। এ আমার কী হল? কি ভাবছি ছাই ভস্ম? কে ঐ মেয়েটা? সীতানাথ দত্তের মেয়ে? ওরি হয়তো বিয়ে হল খানিকক্ষণ আগে। আবার টর্চ জাললাম। ভারী ভারী গয়নার উপর জড়োয়ার পাথরগুলো ঝলমল করে উঠল। হাজার দশেক টাকার মাল। ভাগ্যিস, ওপরে এসেছিলাম। দত্তটা একনম্বর জোচ্চোর। ধমক দিয়ে বললাম, খুলে দাও গয়না। কে যেন মুখ চেপে ধরল। স্বর ফুটল না। নুরুর মুখখানা ভেসে উঠল চোখের ওপর। সেই আট বছর আগে শেষবারের মত দেখা বিয়ের সাজ পরা নুরজাহান। ঠোঁট দুটো যেন কেঁপে উঠল একবার। কি বলতে চায় সে? এ গয়না আমার নেওয়া হবে না—এই কথাই যেন শুনতে পেলাম তার মুখে।

ফিরে এলাম। সোজা নীচে নেমে গেট পার হয়ে ছুটলাম মাঠের দিকে। দলের লোকগুলো ঐখানেই কোথাও অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। মনে হল, কে যেন আমার ঘাড় ধরে ঠেলে নিয়ে চলেছে। খানিকক্ষণ ছুটবার পর হঠাৎ থমকে গেলাম। এ কী করছি! মাথাটা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল? এ রকম তো কোনো দিন হয়নি। সীতানাথ দত্তের দুটো মিষ্টি কথা শুনে বদরুদ্দিন ডাকাতের মন ভিজে গেল! কথার খেলাপ করে বসলাম নিজের দলের সঙ্গে। যে লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলাম ঐ

ছোঁড়াগুলোকে, তার ধারেও তারা ঘেঁষতে পেল না, আর সেটা আমারই জন্যে। এলাম ডাকাতি করতে। ফিরে যাচ্ছি দশ হাজার টাকার গয়না ফেলে রেখে। ভীমরতি আর কাকে বলে?

মাথাটায় বেশ কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়ে মনে হল যেন নেশার ঘোর কেটে গেছে। ঢুকলাম আবার দত্তবাড়ির ফটকে। সোজা তেতলায় উঠে গেলাম। ঘর খোলা। টর্চ জেবলে যা দেখলাম—

হঠাৎ আবার থেমে গেল মুন্সী। দুটো বড় বড় চোখ শূন্য, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ঐ ফাঁকা দেয়ালটার দিকে। ঐখানেই যেন ফুটে উঠেছে সেদিনের দেখা কোনো বীভৎস দৃশ্য। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি আবার সহজ হয়ে এল। দেয়াল থেকে চোখ নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, যা দেখলাম, আমার কাছে নতুন কিছু নয় বড়বাবু। সারা জীবন কত দেখেছি। খুন আর বলাৎকার—এইতো আমার পেশা। এই হাতে কত লোক গলা টিপে মেরেছি, ছোরা বসিয়েছি বুকে, ল্যাজার এক ঘায়ে খতম করেছি, রামদার এক কোপে নাবিয়ে দিয়েছি ধড় থেকে মুণ্ডু। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে। এতটুকু বুক কাঁপেনি। মাথাও ঘোরেনি একবার। মেয়েমানুষের সর্বনাশ? তাও কম করিনি। কত মেয়ে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, তবু রেহাই পায়নি। কত বড় বড় ঘরের ঝি বৌ এই পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে বলেছে, তুমি আমার ধর্মের বাপ, আমি তোমার মেয়ে। হাসি পেয়েছে সে-সব মড়াকান্নার বহর দেখে। কিন্তু আজ আমার এ কী হল? ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, মাথাটা ঘুরে গেল। দেয়াল ধরে সামলে নিলাম। দেখলাম দেয়ালের গা ঘেঁষে পড়ে আছে একটি জোয়ান ছেলে! রাজাবাদশার মত রূপ; পরণে বরের পোষাক। বুকের বাঁ দিকটায় বিঁধে রয়েছে একখানা ছোরা। সবটাই বসে গেছে, বেরিয়ে আছে শুধু বাঁট। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাসর ঘর আর তার মাঝখান জুড়ে ভেলভেটের জালিম। রক্তে ভেজা বিছানার একপাশে অসাড় হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে মেয়েটা, আর আমারই একটা জানোয়ার—। চুল ধরে টেনে তুললাম শুয়োরটাকে। মুখটা তার ঠুকে দিলাম দেয়ালের গায়ে। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ছুটল। চার-পাঁচটা দাঁত ভেঙে বেরিয়ে গেল। আর দু এক ঘা খেলেই সাবাড় হয়ে যেত শালা। কিন্তু ছেড়ে দিলাম। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করে কী লাভ? লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বারান্দায়।

ছেলেটির নাড়ী ধরলাম। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম। নেই। তারপর এগিয়ে গেলাম তার দিকে। মেয়ে তো নয়, যেন একরাশ কাঞ্চন ফুল। কে বলে নুরু নয়? এইতো আমার নুরজাহান। এত রূপ কি মানুষের হয়? বেহেস্ত থেকে নেমে এসেছে সীতানাথ দত্তের ঘরে। আমারি মেয়ে সে। আজ বিয়ের রাত না পোহাতে আমারি হাত দিয়ে এল তার সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে চরম সর্বনাশ।......

কিছুক্ষণ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বর্ষণ-মুখর বিষণ্ণ সন্ধ্যা। ঘনায়মান অন্ধকারে মুন্সীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। উঠে গিয়ে আলোটা জেবলে দিলাম। চমকে উঠলাম। বদর মুন্সীর চোখে জল! না; ভুল করিনি। দুটি রোগপাণ্ডুর গণ্ডের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নির্বাক অশ্রুধারা। বললাম, থাক, মুন্সী, এসব কথা বলে আর কি হবে? এতে আজ কারোই কোনো লাভ নেই। মুন্সী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, না, হুজুর, মেহেরবানী করে আর একটু শুনুন। লাভ থাক, আর নাই থাক, সব কথা আজ আমাকে বলতেই হবে। আপনাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলবো?

আমি সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে গুছিয়ে বসলাম। মুন্সী শুরু করল।

ঘরের কোণে একটা সোরাই ছিল। কয়েকবার চোখে মুখে জলের ছিটে দিতেই ও চোখ মেলে তাকাল। অনেক বছর আগে আমার নুরুও এমনি করে চাইত। কিন্তু কত তফাৎ। এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠে সংগে সংগে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল। ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ডাক্তার! একজন ডাক্তার চাই। ভুলে গেলাম আমি কে, কোথায় যাচ্ছি, ডাক্তার ডাকবার আমার কি অধিকার। শুধু মনে হল ডাক্তার ডাকতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। সিঁড়ির মুখেই আটকা পড়ে গেলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, মেয়েটি আমার কেউ নয়। আমি তাদের বাড়ি এসেছি ডাকাতি করতে, এসেছি তার সর্বনাশ করতে। আমারি জন্যে আজ ঐ এক ফোঁটা কচি মেয়ে দুনিয়ার সব কিছু হারিয়ে সংসারের বাইরে চলে গেল।

ভূতনাথবাবু মিথ্যা বলেন নি, হুজুর। যারা আমাকে ঘিরে ধরেছিল, ইচ্ছে করলে তাদের সবগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু হাত আমার উঠল না। কেবলি মনে হতে লাগল, এই শেষ। বদর মুন্সীর কবর খোঁড়া হচ্ছে। গিয়ে শুধু ঘুমিয়ে পড়া। লাঠি, সড়কি লোহার ডাণ্ডা—অনেক কিছুই চারদিক থেকে এসে পড়ছিল আমার মাথায় পিঠে, ঘাড়ে। যতক্ষণ পেরেছি, দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর কখন পড়ে গেলাম। আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন হল, চোখ মেলে প্রথমেই দেখলাম পাশে দাঁড়িয়ে লাল পাগড়ি। একজন মাথায় রুমাল বাঁধা দেশী মেমসাহেব ছুটে এল। বুঝলাম, নার্স। কাছে এসে আমার নাড়ী দেখল, তার-

পর একটা শিশি থেকে খানিকটা ওষুধ গেলাসে ঢেলে আস্তে আস্তে খাইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে একটু যেন বল পেলাম। অতিকষ্টে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায়?

—এটা সরকারী হাসপাতাল। ডাক্তার বাবুকে ডেকে দেবো?

হাত নেড়ে বললাম, চাই না। হাকিম—হাকিম চাই একজন।

একজন পুলিশের দারোগা এলেন। আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন হাকিম কেন?

—একরার করবো।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই একজন ম্যাজিস্ট্রেট এলেন। তখনো আমার জ্ঞান ছিল, কিন্তু কষ্ট হচ্ছিল খুব। একরারী আসামীর জবানবন্দী—কত ঝঞ্ঝাট, সে তো আপনি জানেন। লিখবার আগে তাকে সাবধান করে দিতে হবে, সময় দিতে হবে ভেবে দেখবার। হাকিমদের কত কি সব নিয়ম আছে। আমি বললাম, ওসব আইনকানুন চটপট সেরে ফেলুন, হুজুর। সময় বেশী দিলে এ জীবনে আর সময় হবে না।

বলবার কথা সামান্য। কোনোরকমে থেমে থেমে বলে গেলাম। সবটুকু বোধ হয় বলতে পারি নি। তার আগেই জ্ঞান হারিয়েছিলাম। তারপর কখন কি করে ওরা আমাকে হুজুরের আশ্রয়ে নিয়ে এল, কিছুই জানি না। সরকারী হাঁসপাতালের কর্তারা বোধ হয় মনে করেছিলেন, মড়াটা আর তাদের ওপর চাপে কেন? ফেলে দাও জেলের ঘাড়ে। কিন্তু তারা জানত না, এখানে আমার বাবা আছেন। তাঁরি দয়ায় আমার মরা ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

মুন্সীর কাহিনী শেষ হ'ল। আমি তার শেষ প্রসঙ্গের জবাব দিলাম। বললাম, এর মধ্যে আমার দয়া তো কোথাও কিছু নেই, মুন্সী। যেটুকু কর্তব্য, তাই শুধু করেছি। বরং কৃতিত্ব যদি কিছু থাকে, সেটা ডাক্তারের। সে যাক্। একটা কথা শুধু বুঝতে পারছিনে। অপরাধী তার কৃত-অপরাধ স্বীকার করেছে, এটা নতুন নয়, অদ্ভুত কিছুও নয়। কিন্তু যে অপরাধ সে করে নি, তারই বোঝা স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে হাকিম ডেকে হলপ করে বলেছে, এটা আমি করেছি—এ রকম তো কখনো শুনি নি। এর মধ্যে বাহাদুরী থাকতে পারে, কিন্তু একে সৎসাহস বলে না। ডাকাতি তুমি করেছ। তার সমস্ত দায়িত্ব তোমার। কিন্তু ঐ মেয়েটি আর তার স্বামীর উপর'যে জঘন্য অত্যাচার ঘটল সেদিন, তার দায়িত্ব তো তোমার নয়। সাধ করে এতবড় দুটো মারাত্মক
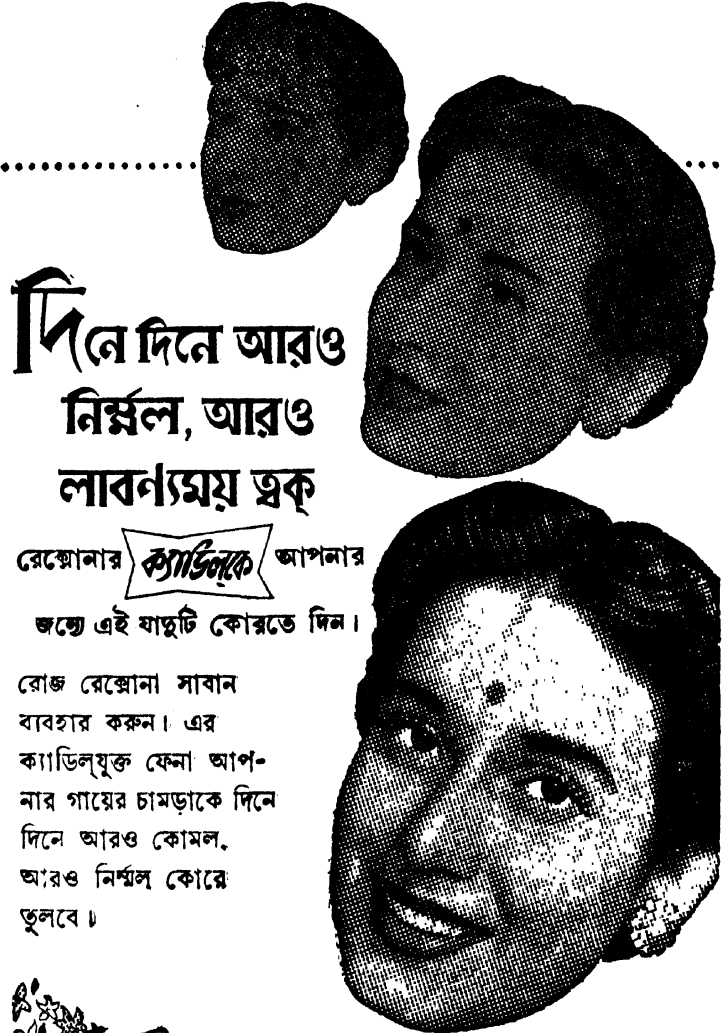
মিথ্যা অপরাধে নিজেকে জড়িয়ে ফাঁসির দড়ির সামনে গলা বাড়িয়ে দেবার সার্থকতা কোথায় আমি দেখতে পাইনে।

মনুসী বিনীত কণ্ঠে বলল, হুজুর জ্ঞানী লোক, আমি মুখ্যু ডাকাত। হুজুরের সঙ্গে তর্ক করা আমার গোস্তাকি। তর্ক আমি করছিনে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করতে পারিনে, মেয়েটার কপালে যা কিছু ঘটল, তার সবটুকুর মূলেই তো আমি। ঐ জন্তুটাকে আমিই তো জুটিয়েছিলাম। যে জন্যে জুটিয়েছিলাম, ঠিক তাই সে করেছে। চুক্তির বাইরে সে যায় নি। কথার খেলাপ যদি কেউ করে থাকে, সে আমি। সীতানাথ দত্তের কথায় ভুলে যে হুকুম আমি জারী করেছিলাম, সে অন্যায় হুকুম। ঐ গুন্ডাটা যদি সে মানা না মেনে থাকে, তার জন্যে তাকে দোষ দিই কেমন করে?

বুঝলাম, মন তার যে পথ ধরে ছুটে চলেছে, আমার ন্যায়-অন্যায়ের শুষ্ক লজিক সেখানে অচল। হয়তো ওর কথাই ঠিক। আর একথাও সত্যি যে, দৈবক্রমে ঐ মেয়েটার মুখে যদি ওর নুরুর মুখের আদল সেদিন চোখে না পড়ত, আজ আমার কাছে বসে বদর মুনসীর এ কাহিনী শোনাবার কোনো উপলক্ষ্যই ঘটত না। এ সংসারে ঐ নুরুই ছিল তার একমাত্র বন্ধন। সে বন্ধন একদিন অকালে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ক্ষত রেখে গিয়েছিল ঐ দানব-প্রকৃতি দস্যুর বুকের কোণে, সেটা হয়তো চিরদিন তার অগোচরেই থেকে যেত। হয়তো চিরদিনই এমনি কত শত সীতানাথ দত্তের মেয়ে তার লোভ আর লালসার আগুনে আহুতি দিয়ে যেত তাদের অনিন্দ্য রূপ, অমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, আর অত্যাজ্য সতীধর্ম। কিন্তু তা হল না। বদর মুনসীর বিচিত্র জীবন-নাট্যে দেখা দিল এক প্রলয়-রাত্রি। আট বছরের ওপার থেকে নববধূ বেশে ফিরে এল তার নুরজাহান। ফিরে এল, কিন্তু বদর মুন্সী তাকে ফিরে পেল না। তার নিজের হাত দিয়েই এল নির্দয় আঘাত। নির্মূল হয়ে গেল ঐ মেয়েটার স্বামী, সম্ভ্রম, তার নারী-জীবনের সমস্ত শোভা ও সম্পদ। নতুন করে মৃত্যু হল নুরজাহানের। আট বছরের পুরানো ক্ষত-মুখ থেকে আজ শুরু হয়েছে রক্তক্ষরণ। নিজেকে নিঃশেষ না করে এ বেদনার উপশম নেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশে মেঘাড়ম্বর স্তব্ধপ্রায়। বদর মুনসীর সেলের লৌহতোরণ অনেকক্ষণ আগে থেকেই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার নিশ্চয়ই মনে নেই; আমিও মনে করিয়ে দিই নি। জমাদার কয়েকবার নিঃশব্দে পায়চারী করে গেছে জানালার সুমুখ দিয়ে। এই দুর্দান্ত ডাকাতের জন্যে তাদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। তবু উঠব উঠব করেও যেন উঠতে পারছিনে।

মুনসী আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়ে ধীরে ধীরে বলল, হুজুর ফাঁসির দড়ির কথা বলছিলেন। ও জিনিসটাকে আর ভয় নেই। ফাঁসিতে যাওয়াই আজ সবচেয়ে ভালো যাওয়া। এক নিমেষে সব শেষ। কিন্তু এই তিলে তিলে মরা, এ মরণ তো আর সহ্য হয় না! না, এ আমার আপসোস নয়। জীবনে যা কিছু করেছি, যত পাপ, যত অন্যায়, তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। মৌলবী সাহেবেরা যাই বলুন, তার জন্যে তওবা করবারও কোনো চাড় নেই আমার মনে। বুকের ভেতরটা শুধু জ্বলতে থাকে, যখন ঐ মেয়েটার মুখ মনে পড়ে। রাতে ঘুম নেই, দিনে স্বস্তি নেই। সমস্ত শরীরে শুধু জ্বালা। হতভাগীর যা হবার, তা তো হ'ল। তারপর? সারাটা জীবন কেমন করে কাটবে ওর? যে শ্বশুরঘর ও দেখতেও পেল না, সেখানে জায়গা হবে না। বাপেরবাড়ির আশ্রয়, তাও হয়তো ছাড়তে হবে। আজ না হ'লেও কাল। বিয়ের রাতে বিধর্মী ডাকাত এসে যার ধর্মনাশ করে গেল, হিন্দুর ঘরে সে মেয়েকে কি চোখে দেখেন আপনারা, সে তো আমি জানি। ঐ রকম সব মেয়ের যা গতি, ওকেও কি সেই পথেই যেতে হবে? সন্ধ্যার পর সেজেগুজে দাঁড়াতে হবে ঐ বাজারের গলিতে? ওখানে যারা থাকে, তাদের কতজনকেই তো আমি জানি। এই রাস্তা ধরেই তারা একদিন ভেসে এসেছিল। ঐ ফুলের মত মেয়ে, কোনো দোষ যে করেনি, দুনিয়ার কোনো পাপের ছোঁয়াচ যার গায়ে লাগেনি, তাকেও গিয়ে পচে মরতে হবে ঐ দোজকের পাঁকের মধ্যে? আমার সর্বস্ব দিয়েও কি তাকে বাঁচাবার উপায় নেই?

এই নিষ্ফল প্রশ্নমালার আমি কি উত্তর দেবো? আমি শুধু নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম অগ্নি-গোলকের মত তার দুটো চোখের পানে। সর্বাঙ্গে অনুভব করলাম তার দাহ। প্রশ্নবাণ নিরস্ত হ'ল। কিন্তু তার উত্তেজিত ভগ্নকণ্ঠের দুঃসহ বেদনা সমস্ত ঘরময় অনুরণিত হয়ে ফিরতে লাগল।

মেয়েটার যে বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ আজ ওর কল্পনায় ভেসে উঠেছে, একদিন যে সে বাস্তবের রূঢ় রূপ ধরে দেখা দেবে না, কেমন করে বলি? কিন্তু সে পরিণাম যদি সত্যিই দেখা দেয়, মুনসী তাকে রোধ করবে কি দিয়ে? কি কাজে লাগবে ওর সযত্ন-সঞ্চিত গুপ্তধন?

একথাটা আমি যেমন করে বুঝেছি, এই বহুদর্শী অভিজ্ঞ দস্যু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তার চেয়ে কম বোঝে নি। কিন্তু মানুষের জীবনে বুদ্ধির স্থান কতটুকু? কটা প্রশ্নের জবাব সে দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত? কটা সমস্যার সমাধান? Rational animal বলে মানবজাতির পরিচয় আছে দর্শনের পাতায়। শুনতে পাই, এইটাই নাকি তার বৈশিষ্ট্য। সমগ্র জীব-জগতে মানুষ যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, তার মূলেও শুনি তার ঐ Rationalism. সেজন্যে গর্ববোধ করতে চান করুন। কিন্তু একথা অস্বীকার করি কেমন করে যে, আমার মধ্যে যতটুকু Rational তার অনেক বেশী animal?

জ্ঞানগর্বী মানুষ এই সহজ সত্যটা মেনে নিতে লজ্জাবোধ করে। বুদ্ধিজীবী বলে তার অহঙ্কারের অন্ত নেই। ন্যায়-শাস্ত্রের ধরাবাঁধা ফরমুলা দিয়ে সে বাঁধতে চায় তার দৈনন্দিন কর্মধারা। কিন্তু যখন ঝড় ওঠে, কোথায় থাকে তার Logical Syllogism? শত-ছিন্ন হয়ে যায় তার হিসাব-নিকাশের জটিল সূত্র। সেদিন যে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সে তার মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়; হেড নয়, হার্ট—যার রহস্যময় ভাষার নেই কোনো

আভিধানিক অর্থ, কোনো থিওরীর কাঠামোতেও যাকে বাঁধা যায় না।

মনুসীর জীবনে ঝড় উঠেছিল। তাই যে প্রশ্ন নির্গত হল তার বিক্ষত বক্ষ আলোড়িত করে, সেও এমনি অর্থহীন। নির্বিকার নৈঃশব্দে আমি শুধু তার শ্রোতাই রয়ে গেলাম। তার ব্যাকুল দৃষ্টি তখনো আমার মুখের উপর নিবন্ধ, সাগ্রহ উত্তর—প্রতীক্ষায় উন্মুখ। আমি দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালাম। রাত আটটা বেজে পনের। চোখ নামিয়ে তার দিকে ফিরে বললাম, জমাদার দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে এবার বন্ধ হতে হবে, মনুসী।

দিনকয়েক পরে ভূতনাথবাবু আবার এসে উপস্থিত। তেমনি হঠাৎ এবং হন্তদন্ত।

—কি ব্যাপার?

—মনুসীটাকে একবার আনতে পাঠান তো?

—নতুন ক'রে বাজিয়ে দেখবার মত পেলেন নাকি কিছু?

—একটা দাঁতভাঙ্গা গুন্ডা ধরা পড়েছে। সন্দেহ হ'চ্ছে ওরই দলের লোক। দেখি, কিছু বলে কিনা। ব্যাটাকে একটু একলা পেলে সুবিধে হয়।

—বেশ তো, তাই হবে।

পাশের ঘরে ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে ভূতনাথবাবু যখন বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ দেখে আশান্বিত হওয়া গেল না।

—সুবিধে হ'ল দাদা?

উনি মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, কিছু না কিছু না। very hard nut মশাই। আমারি দাঁত ভাঙ্গল, দাঁত ভাঙ্গাটার কোনো হদিস্ পাওয়া গেল না।

দাঁতভাঙ্গা লোকটা জেলে এসে গেল তার পরদিন। মনুসীকে এক সময়ে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি সেই?

মনুসী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, হুজুরের কাছে লুকোবো না। কিন্তু আর কাউকে তো একথা বলতে পারি না।

মাসখানেকের মধ্যেই মামলা শুরু হ'য়ে গেল। পুলিশের তৎপরতার ত্রুটি ছিল না। বদরুদ্দিন মনুসীর সহ-আসামী বলে একদল লোককে গ্রেপ্তার ক'রে চালান দেওয়া হ'ল। তাদের দেখে ওর হাসি আর ধরে না—এরা ছিল নাকি আমার সঙ্গে? কি জানি? ছিল হয়তো আগের জন্মে। এ জন্মে তো এর কোনোটাকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না।

আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে মনুসী কোনো উকিল দেয়নি। খুনী আসামী ব'লে সরকারী ব্যয়ে উকিল নিযুক্ত হ'ল। স্থানীয় বারের একজন উদীয়মান ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার। তিনি এসে পরামর্শ দিলেন, কন্‌ফেশনটা retract কর। বল, পুলিশের ভয়ে কি বলেছি, মনে নেই। মারের চোটে মাথা ঠিক ছিল না। এ মামলার কিছুই জানি না আমি। ব্যস্। বাকীটা রইল আমার হাতে। নির্ঘাৎ খালাস করে দেবো।

মনুসী হেসে বলল, ভয় নেই, বাবু। কন্‌ফেশন করলেও মামলাটা যাতে অনেক দিন চলে, সে ব্যবস্থাও আমি ক'রে রেখেছি। ফী আপনার মারা যাবে না।

মামলার প্রথম দিন পাঁচটার সময় কোর্ট যখন উঠতে যাবেন, মনুসী জোর হাত ক'রে বলল, ধর্মাবতার, আপনার এজলাসে আমাকে যে বসবার অনুমতি দিয়েছেন, তার জন্যে খোদা আপনার মঙ্গল করুন। আর একটা বেয়াদপি মাপ করবেন। বসে বসে আর ঐ এক-ঘেয়ে বক্তৃতা শুনতে শুনতে বড্ড ঘুম পেয়ে যায়। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, কসুর নেবেন না।

হাকিম প্রবীণ ব্যক্তি। বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে রইলেন তাঁর প্রধান আসামীর দিকে। যে-মামলাকে বলা যেতে পারে তার ফাঁসী-মঞ্চের প্রবেশদ্বার, তার কথা শুনতে গিয়ে ঘুম পেয়ে যায়, এরকম ঘুম বোধহয় তার দীর্ঘজীবনে আর কখনো দেখেননি।

এরি মধ্যে হঠাৎ একদিন বেলা এগারটার সময় ভূতনাথবাবুর আবির্ভাব।

সর্বনাশ হয়ে গেল, মশাই।

—কী হ'ল?

মনুসীকে একবার কোর্টে পাঠাতে হবে।

—কোর্টে যায়নি সে?

না। এই দেখুন না?

মনুসীর ওয়ারেণ্টখানা দেখালেন। জেল ডাক্তার লিখে দিয়েছেন তার উপর—unfit to attened Court.

বলবাম, অসুস্থ হ'য়ে পড়লে আর কোর্টে যায় কেমন ক'রে, বলুন?

—অসুস্থ মোটেই নয়। আপনি নিজে একবার খবর নিয়ে দেখুন। নিশ্চয়ই এটা ঐ কালকার ঘটনার জের।

—কালকার কোন্ ঘটনা?

ঘটনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন ভূতনাথবাবু, সেটা এইঃ—

মোকদ্দমার উদ্বোধনী বক্তৃতার পর দু'দিন হ'ল সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। মনুসী তো প্রথম থেকেই মামলা সম্বন্ধে উদাসীন। যতক্ষণ আদালতের কাজ চলে, কাঠগড়ার রেলিং-এ হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কাল যে সব সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া হ'ল তাদের মধ্যে একজন ছিল সীতানাথ দত্তের মেয়ে। তাকে যখন নিয়ে আসা হ'ল তখনো ওর যথারীতি নাক ডাকছিল। দু'চারটা প্রশ্ন করবার পর কখন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। ডকের দিকে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠল মনুসী। জবানবন্দীর মাঝখানেই কোর্টের দিকে চেয়ে জোর হাত ক'রে বলল, গোস্তাকি মাপ করবেন, ধর্মাবতার। আমার একরারনামাটা একবার প'ড়ে দেখুন। আমি তো সবই কবুল করেছি। সরকার পক্ষের যা কিছু চার্জ, এক কথায় মেনে

নিয়েছি সব। তবে আর একে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কেন? রেহাই দিন ওকে। আমি আবার বলছি; এই মেয়েটার চরম সর্বনাশের জন্য দায়ী আমি। ওর স্বামীকে খুন করেছি আমি, ওদের সর্বস্ব লুট করেছি আমি। আর বলাৎকার? হ্যাঁ, সেও আমি—আমি—উঃ —ব'লে হঠাৎ বুক চেপে ধ'রে ব'সে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

আদালত বন্ধ হয়ে গেল। মুনসীকে তারপর ধরাধরি ক'রে কয়েদির গাড়িতে ক'রে পাঠানো হ'ল জেলখানায়। মেয়েটাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। তার জ্ঞান ফিরে আসতে লেগে গেল দু' ঘণ্টা।

ভূতনাথবাবু বললেন, মেয়েটার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। তবু ডাক্তারের মত করিয়ে কোনো রকমে স্ট্রেচারে ক'রে কোর্টে নিয়ে এসেছি। যেমন ক'রে হোক, তার এভিডেন্স্‌টা আজকার মধ্যে শেষ করতেই হবে। এদিকে আসল আসামীই গরহাজির। ওর absence-এ তো trial চলতে পারে না। যেমন ক'রে হোক্ ওটাকে নিয়ে যেতেই হবে। সবাই অপেক্ষা করছে। কোর্ট ব'সে আছেন। ট্যাক্সি আমার সঙ্গেই আছে। বলেন তো এ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও করতে পারি।

ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, মুনসীর আবার কি হ'ল?

ডাক্তার চিন্তান্বিত মুখে মাথা নেড়ে বললেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কাল কোর্ট থেকে ফিরে অবধি খাচ্ছে না, কথাও বলছে না। সটান চোখ বুজে প'ড়ে আছে।

ভূতনাথ গর্জে উঠলেন, বদমাইসি, স্রেফ্ বদমাইসি, বুঝতে পাচ্ছেন না? মামলাটাকে মাটি করতে চায় শালা। ও জানে, মেয়েটা আজ ফিরে গেলে আর তাকে পাওয়া যাবে না।

আমি বললাম, ওর কনফেশনের পরেও কি মেয়েটির evidence একান্তই দরকার?

—দরকার বৈ কি? কনফেশনের support-এ যদি অন্য evidence না থাকে, ওর মূল্য কতটুকু? এখানে যদি বা সাজা হয়, হাইকোর্টে গিয়ে টি'কবে না।

ডাক্তারকে বললাম, কোনো রকমে পাঠানো যাবে না?

—পাল্‌সের যা অবস্থা, ভরসা করি না, স্যার।

ভূতনাথবাবুকে নিরাশ হ'য়েই ফিরতে হ'ল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা। জেলের ভিতরকার জনবহুল রাস্তাগুলো শূন্য-প্রায়। কয়েদিরা সব চ'লে গেছে যে-যার ওয়ার্ডে। রন্ধনশালার অহোরাত্র "মচ্ছব" আগলে থাকে যারা, তারাও তাদের কালি-ঝুলি মাখা জাঙ্গিয়া কুর্তা ছেড়ে, হাতা-খুন্তি আর ডাল-মন্থনের ডান্ডা সামলে ক্ষিপ্র হস্তে তৈরি হ'চ্ছে। জমাদারের দল "গিনতি" মেলাতে ব্যস্ত। ডেপুটি বাবুরা নিজ নিজ এলাকায় টহল দিচ্ছেন। লক্-আপ্ পর্বের সুশৃঙ্খল সমাপ্তির জন্যে সকলের মনেই উৎকণ্ঠা। আমিও চলেছি সদলবলে। প্রাচীর পরিক্রমা শেষ ক'রে পুকুর ধারে এসে পে'ৗছেছি, এমন সময় এক ভগ্নদূত এসে 'রিপোর্ট' দিল, টোটাল নেহি মিলতা হ্যায়। অজ্ঞাতসারেই কপালটা ঘেমে উঠল। জেলের চাপরাশ যার স্কন্ধে, তার কাছে এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর নেই। রুক্ষ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম হতভাগ্য দুর্মুখের দিকে। সে সকুণ্ঠ বিনয়ের সঙ্গে জানাল, একঠো কমতি হুয়া।

লক্-আপ ইয়ার্ডে এসে দেখলাম, কারো মুখে সাড়া নেই। সমস্ত ওয়ার্ড-গুলো দু'বার ক'রে গোনা হ'য়ে গেছে। ফল এক; অর্থাৎ একঠো কম্‌তি হুয়া। হিসাবমত হবে ১৩৪৩, হ'চ্ছে ১৩৪২। সকলেই নিঃশব্দে অপেক্ষমাণ—এবার কি হুকুম হবে। হুকুম হ'ল—Count again. ব্যারাকে ব্যারাকে আবার সাড়া পড়ে গেল। দুলাইন করে বসল কয়েদীরা। এবার শুধু জমাদার নয়, ডেপুটিবাবুরাও যোগ দিলেন গণনায়। দু, চার ছয়, আট......। একে একে সবাই আবার ফিরে এল লক্-আপ্ ইয়ার্ডে। মুখ অন্ধকার।

এবার বাকী রইল শুধু একটিমাত্র পথ—চরম এবং শেষ পন্থা, পাগলা ঘণ্টি। একটা টানা হুইসিল্। তারপরেই শুরু হবে সর্বব্যাপী তান্ডব। লাঠি আর বন্দুক কাঁধে অহেতুক উল্লম্ফন, গোটা পঞ্চাশেক মশাল জেলে সম্ভব এবং অসম্ভব স্থানে নিষ্ফল অনুসন্ধান, প্রাচীর বেষ্টন ক'রে পুলিশবাহিনীর ব্যর্থ আস্ফালন। অতঃপর দীর্ঘ লঙ্কাকান্ডের সমাপ্তি। শুষ্ক মুখে নতশিরে ভগ্ন-দূতের পুনঃপ্রবেশ।

—কি বার্তা?

—একঠো কম্‌তি হ্যায়।

বড় জমাদারের দিকে ফিরে বললাম, সবই তো হ'ল। আর কি? এবার শিঙ্গে ফুঁকে দাও—

—মিল্ গিয়া মিল্ গিয়া—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল এক ওয়ার্ডার।

—কোথায়, কাঁহা মিল্ গিয়া?—এক সঙ্গে আঠারোটা প্রশ্ন।

—ঐ গাছপর ঝুলতা হ্যায়।

চমকে উঠলাম, ঝুলতা হ্যায়!

হাসপাতালের পিছনে কম্পাউন্ড পাঁচিলের ধার ঘেঁসে একটা অনেককালের অশ্বত্থ গাছ। তারই ডালপালার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে দু'খানা পা। এগিয়ে গিয়ে সমস্ত দেহটাই দেখা গেল। ধুতি পাকিয়ে তৈরি হ'য়েছে লম্বা দড়ি। তার একটা দিক্ ডালে বাঁধা, বাকী দিক্‌টা ফাঁস দিয়ে গলায় জড়ানো।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঝুলন্ত দেহটাকে নামিয়ে আনা হ'ল। ডাক্তার এসে নাড়ি ধ'রে মুখ বিকৃত করলেন। জিভ্ বেরিয়ে এসেছে। চোখ দুটো ঠিক্‌রে পড়ছে। বীভৎস দৃশ্য। তবু প্রথম দৃষ্টিতেই চিনতে পারলাম।

জমাদারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ঘণ্টি...........সেণ্ট্রাল টাওয়ারের উপর থেকে "তিন ঘণ্টি" জানিয়ে দিল, সব ঠিক হ্যায়। (ক্রমশঃ)

[২৪]

টক, টক, টক।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসল সুধা, তরতর করে নীচে নেমে বলল, 'কে।'

জবাবে আরও তিনবার অংগুলি-সংকেত শুনল। ছিটকিনি খুলে সুধা সরে দাঁড়াল। ভিজে বর্ষাতিটা খুলতে খুলতে নিশীথ বলল, 'চিনতে পারছ না?'

সুধা অস্ফুট গলায় বলল, 'আপনি।'

নিশীথ বলল, 'সশরীরে। তোমার চিঠি আমি কাল পেয়েছি, সুধা। কলকাতা ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি প্রিমিয়ম নোটিশ, মেডিকেল জার্নাল, চাঁদার রসিদের নীচে চাপা—তোমার চিঠি।'

'চৌকাটে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন। ভিতরে আসুন।'

আকাশের দিকে চেয়ে নিশীথ বলল, 'না, বৃষ্টি আর নেই। অকালে কী উৎপাত বল দেখি। আকাশে মেঘ দেখে ভাগ্যিস ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। যাক, ডেকেছ কেন।'

সুধা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, 'নিশীথবাবু, নুপুর কোথায়।'

নুপুর, নুপুর? এমনভাবে নিশীথ নামটার পুনরাবৃত্তি করল, যেন সুধা একটা দুর্বোধ্য সংকেত শব্দ উচ্চারণ করেছে।

কিন্তু সুধা শুনলনা, না-ছোড় হয়ে জিজ্ঞাসা করতে থাকল, 'সত্যি করে বলুন নিশীথবাবু, নুপুরেরা কোথায়।'

তবু ধরা দিল না নিশীথ, অল্প-অল্প হেসে বলল, 'কেন এখানে নেই?'

'নেই সে তো আপনিও জানেন।' অসহিষ্ণু গলায় সুধা বলে উঠল, 'মিছি-মিছি আপনি লুকোচ্ছেন নিশীথবাবু, আমাকে ভোলাতে চাইছেন। দেখছেন না, আমি আর সেই খুকিটি নই।'

কয়েক মাস আগেকার তুলনায় এখন অনেক রোগা সুধা, কিন্তু ঢের লম্বা হয়েছে। পাণ্ডুর কপোল আর নীরক্ত নীল চোখের তারায় এসেছে পরণত শ্রী। সেই কৃশ-সুন্দর দেহ-ভঙ্গিমার দিকে বিমোহিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিশীথ শুধু বলল, 'দেখছি'।

সুধা বুঝল না, অবুঝ কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'কী দেখছেন।'

'তুমি আর খুকিটি নও।'

পাণ্ডুর মুখ ভরে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল, সুধা রাগ দেখাতে গিয়ে এক ঝলক হেসে ফেলল, সেই হাসি লুকোতে নীচু করতে হল চোখ। নত-বিব্রত মুখখানিকে দেখে নিশীথের মনে হল, ছুঁতে গেলে গুটিয়ে যায়, এ যেন সেই লতা।

ব্রীড়াবতীর ছড়ান মুখ কিছুক্ষণ পরে তুলে সুধা বলল, 'কই, বললেন না, নুপুরেরা কোথায়?'

নিশীথ বলল, 'আমি বুঝি শুধুমাত্র একটা ডাক হরকরা সুধা, সকলের খবর বয়ে নিয়ে বেড়াই? কই, আমার খবর তো জিজ্ঞাসা করলে না তুমি?'

সুধা বলল, 'কী আবার জিজ্ঞাসা করব, দেখতেই তো পাচ্ছি, ভাল আছেন।,

নিশীথ হেসে বলল, 'একেবারে ছেলে-মানুষের মত কথাটা বললে। চোখে ধরা পড়ে না এমন অনেক অসুখ মানুষের শরীরে লুকোন থাকে। শরীরের নীচে আরেকটা জিনিস আছে, তার নাম মন। তারও অনেক রোগ আছে। আমরা ডাক্তার, আমরা এ-সব জানি। যাক সে কথা। আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'পেয়েছিলাম' সুধা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আপনি ও-চিঠি কেন লিখেছিলেন নিশীথবাবু। মা আমাকে ভী—ষণ বকে-ছিল। বাবাও রাগ করেছিলেন।'

নিশীথ সকৌতুকে বলল, 'তুমি রাগ করনি তো?'

'আমি?' একটু ইতস্তত করল সুধা, বোধহয় ভেবে দেখল সে-ও রাগ করেছিল কিনা।—'না আমি রাগ করিনি। খুব ভয় পেয়েছিলাম। খুব কেঁদেছিলাম।'

'শুধু ভয় পেয়েছিলে? শুধু কেঁদে-ছিলে?'

সুধা চুপ করে রইল।

নিশীথ এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, 'কেন ভয় পেয়ে-ছিলে সুধা। ভেবেছিলে গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে যাব?'

সুধা বলল, 'না। ওখানে আমার কেবলই ভয় হত, আর বুঝি এখানে ফিরে আসা হল না। জানেন নিশীথবাবু ভেবে ভেবে আমার অসুখ করেছিল?'

'ওখানে ভাল লাগত না তোমার?'

সুধা নিঃসঙ্কোচে জবাব দিল, 'না।'

'আর এখানে?'

'এখানেও ভাল লাগে না' সুধা ধীরে ধীরে বলল, 'তবু মনে হয় এখানে অন্তত

বেঁচে আছি। আপনাকে হয়ত ঠিক বোঝাতে পারলাম না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। আমার বাবার মুখে শুনেছিলাম, একবার এক বাড়িতে উনি মুমূর্ষু এক বুড়ির শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলেন। বুড়ির কেউ নেই, মাঝরাত্রে সে-তো মরে গেল। তারপর সারারাত বাবাকে একা সেই মড়া আগলে রাত জাগতে হয়েছিল। গ্রামে থাকতে মাঝে মাঝে ভেবেছি ওখানকার জীবনটাও যেন সেই মড়ার শিয়রে রাত জাগার মত। নিশুতি রাত, মাঝে মাঝে নিজেরই বুকে হাত দিয়ে পরখ করতে হয় বেঁচে আছি কিনা।'

'এই তুলনাটার কথা শুনলে তোমার বাবা খুশি হবেন না, সুধা।'

সুধা চট করে কিছু বলতে পারল না, এবার আর কিছু খুঁজে না পেয়েই যেন বলল, 'নূপুরের ঠিকানাটা দিন?'

অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেল নিশীথ। —'নূপুরের তুমি সত্যিই খোঁজ চাও?'

উৎসুক সুধার মুখের দিকে চেয়ে নিশীথ ধীরে ধীরে বলল, 'নূপুর কার্শিয়াংয়ে আছে।'

কার্শিয়াং অনেক দূরে সুধা এইটুকু মাত্র জানত। জিজ্ঞাসা করল, 'আর ওর মা?'

'সে-কথা তোমার না জানাই ভাল।'

সুধা ছাড়ল না, নিশীথের হাত দু'টি চেপে বলল, 'বলুন, নিশীথবাবু বলুন। আমি সব বুঝি। আপনি নিজেই তো বলেছেন, আমি আর খুকিটি নই।'

স্যুট নিয়েই নিশীথ জানালার পাশে একটা তাকে বসে পড়ল। রুমাল বার করে মুছল কপালটা। —'তোমার দেহের পরিবর্তন দেখে বলেছিলাম। কিন্তু সুধা, পরিণত শরীরে অনেক সময় অপরিণত মন থাকে। আবার অপরিণত শরীরেও থাকে পরিণত প্রবীণ মন, যেমন নূপুরের ছিল। প্রথমটাকে আমরা বলি ন্যাকা, দ্বিতীয়টাকে পাকা।'

'আমি দুটোর কোনটাই নই, নিশীথবাবু। বলুন না আমাকে। নূপুরের মা কি ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে'—

'ডাক্তার চৌধুরী আমার সিনিয়র, সুধা। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানি তা হল এই যে, তিনি মাসখানেক হল কলকাতা নেই। ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চাকর খানসামা বাবুর্চি সব আছে। আরও কেউ আছে কিনা জানি না। অন্তত আমার জানবার কথা নয়।'

অরুচিকর প্রসঙ্গটা চাপা দিতে নিশীথ বলল, বৃষ্টি ধরেছে। আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে সুধা। নতুন একটা মোটর বাইক কিনেছি, চক্কর দিতে খুব চমৎকার লাগবে, দেখো।

সুধা বলল, 'ফুলমাসি এখুনি হয়ত ফিরবে। আজ থাক নিশীথবাবু, আরেক দিন।'

আশাহত স্বরে নিশীথ বলল, 'বেশ।'

বর্ষাতিটা এবার আর পরল না নিশীথ, ভাঁজ করে মোটর বাইকের ওপর রাখল। ঘড়িতে সময় দেখল একবার, স্পর্শমাত্র স্পন্দিতপ্রাণ ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠল। দরজার ভিতর থেকে সুধা উঁকি দিল যখন, বাইকটা আর নেই, তার সওয়ার নিয়ে পলকে অদৃশ্য হয়েছে, পিছনে একটা ঘন ধোঁয়ার রেখা শুধু রেখে গেছে।

সব ঠিক তেমনি আছে, নিশীথ, ফুলমাসি, আদিত্য মজুমদার। একটি মেয়ে শুধু হারিয়ে গেছে। কলকাতা আছে নূপুর নেই, এর চেয়ে অদ্ভুত কিছু সুধা ভাবতে পারে না। এখনও নূপুর মাঝে মাঝে ওর কাছে আসে, স্বপ্নে। মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা, সেই ঢাকনা মাঝে মাঝে সরিয়ে ওকে হাতছানি দেয়। জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় সুধা, চোখ দুটোকে বিশ্বাস হয় না, চেঁচিয়ে বলে, 'তুই এসেছিস, নূপুর, সত্যি?' চাদরটাকে এবার নূপুর পা অবধি ঠেলে দেয়। ভাঙা বাঁকা অপুষ্ট দুটি জানু, সেখানে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে নূপুর বলে, দেখেও চিনতে পারছিস না? এমন পা এ-শহরে আর ক'টি আছে।' তারপর এক সময় সুধা নিজেই যেন নূপুরের পাশে চলে গেছে, পিঠের নীচে বালিশ নিয়ে নূপুর তখনো আধশোয়া, পিঙ্গল চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চুলের পাশে, বালিশের নীচে কত যে বই ছড়ান, একটু একটু পড়ে নূপুর, মুচকি হেসে বলে, 'শুনবি, একটু?' শোনায়না কিন্তু, হাসতে হাসতেই বইয়ের পাতা মুড়ে রাখে। বলে 'কাজ নেই বাবা। তোমরা আবার ভা—লো মেয়ে।' 'ভাল' কথাটা বলবার সময় দুষ্টু-দুষ্টু চোখ দুটো বিস্ফারিত করে, ঠোঁট দুটোকে প্রথমে বিবৃত, পরে গোল করে আনে।

ভয়ে ভয়ে সুধা বলে, 'তুমি বুঝি ভাল মেয়ে নও ভাই?'

'ভাল মন্দ জানিনে, আমি এই শহরের মেয়ে। এই শহরের পনের আনা মানুষকে দেখিসনে, ভোগের শখ ষোল-আনা, কিন্তু পারে না, পায় না? শেষ পর্যন্ত নিজের কড়ে আঙুল কামড়েই খুশি থাকে? অক্ষম, বিকলাঙ্গ, অথচ লোলুপ। আমি তাদের সকলের প্রতিনিধি। সকলের পাপ মাথায় নিয়ে যীশু ক্রুসে উঠেছিলেন, শুনেছিস তো, আবার সকলের বিষ গলায় নিয়ে শিব নীলকণ্ঠ,—আমিও তাই। আমাকে দেখলেই এই কলকাতাটাকে দেখা হয়ে যায় সুধা।' একটু দম নেয় নূপুর, বিস্ফারিত চোখ দুটিতে হঠাৎ চকমকি জ্বলে ওঠে।—'ডাক্তার চৌধুরী আমাকে সারাতে এসেছিলেন, মা নিয়ে নিলেন তাকে। নিশীথ এল, কত ভরসা দিলে, কিন্তু সে পেয়ে গেল তোকে। কিন্তু তোকে বলে রাখি সুধা, আমাকে শুইয়ে রাখার এই ষড়যন্ত্র আমি ব্যর্থ করবই। সেরে উঠব, উঠব, উঠব। লুডো খেলতে বসে আজ পর্যন্ত দুইয়ের ওপর দান পড়ল না, ঘর থেকে বেরুতেই পারলুম না। একবার একটা ছক্কা তুলবই—সেদিন আমাকে তোরা কেউ রুখতে পারবি না।'

ব্যস্ত হয়ে সুধা বলতে চায়, 'কেন তোমাকে রুখব নূপুর'—কিন্তু কোথায়

নৃপুর। আহত অভিমানী মেয়েটা আবার পা থেকে মাথা অবধি শাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছে, ডেকে ডেকেও তার সাড়া পাওয়া যায় না। অপরাধীর মত আচ্ছন্ন হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে সুধা সম্বিৎ ফিরে পায়। কোথায় নৃপুর। সুধা উঠে বসেছে তার নিজের বিছানায়, ও-বাড়ির জানালা তেমনি বন্ধ, অলংঘ্য একটা নিষেধের মত। মাঝে মাঝে দরোয়ান খৈনি টিপে কর্কশ একটা গান গেয়ে ওঠে, নারকেল গাছের পাতায় জড়িয়ে গিয়ে অন্ধ একটা পাখি ছটফট করে, ডানা ঝাপটায়।

সেই জানালা একদিন সুধা সত্যিই খোলা দেখল। যেমন দেখেছিল স্বপ্নে। ও-বাড়ির জানালা খোলা, কিন্তু জানালার পাশে আধশোয়া সেই মেয়েটি নেই। গোড়ালি তুলে উঁকি দিলে সুধা নিদ্রামগ্ন একটি মহিলাকে দেখতে পেত।

কেউ এসেছে সন্দেহ কী। সকাল থেকেই দুমদাম শব্দ, বোঝা যায় বাক্স পেঁটরা নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলেছে। রকে ঠেস দিয়ে যে-দরোয়ানটা অলস হাতে খৈনি টিপত, সেও অদৃশ্য।

নৃপুরের দিকে সুধা আর কৌতূহল সামলাতে পারল না, ও বাড়ি চলে গেল। উপরে নৃপুরের ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু নৃপুর নেই। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে কে-একজন শুয়ে, বুক অবধি চাদরে ঢাকা, কিন্তু রক্তপদ্মাভ দুটি পায়ের পাতা খোলা। পা টিপে টিপে ফিরে আসবে, কিন্তু সিঁড়ির কোণে, নীচের ঘরটির কাছাকাছি আসতেই মনে হল কে যেন ওকে শিস দিয়ে ডাকলে। প্রথমে ভাবল পাড়ার কোন অসভ্য ছেলে, হয়ত পড়ো বাড়ির বসবার ঘরটা দখল করেছে। উপেক্ষা করে চলে আসবে, আবার শিসের ইশারা শুনল, সংকেতটা এবার আরও স্পষ্ট।

উঁকি দিয়ে দেখল, নৃপুর।

অল্প-আলোয় ধূসর-ধোঁয়াটে ঘর, ভিতরটা ভাল দেখা যায় না। এই ঘরে নরম সোফায় সুধা একদিন ডাক্তার চৌধুরী আর নৃপুরের মাকে গল্প করতে দেখেছে। সেই সোফার একটিতে এখন পুরু ধুলোর আস্তর, আরেকটিতে নৃপুর। স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু চকচকে সেই চোখ দুটিকে সুধা অমাবস্যার রাতেও বুঝি চিনে নিতে পারে।

চৌকাটে দাঁড়াতেই নৃপুর ওকে ডাকল। ভিতরে গিয়ে সুধা বলল, 'কবে এলে ভাই নৃপুর।'

নৃপুর সোফার এক পাশে আঙুল দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ব'স। জানালাটা খুলে দিতে পারিস, আলো আসুক। কাল এসেছি, রাত্রে। আবার কালই চলে যাব ভাই।'

'কালই চলে যাবে কেন?'

নৃপুর বলল, 'সে অনেক কথা। বলব, সব বলব। ওপরে গেছলি? মাকে দেখলি?'

'বিছানায় একজন ঘুমিয়ে আছেন দেখলুম। তোমার মা বুঝি?'

চাপা, সাবধান গলায় নৃপুর বলল, 'তুলে দিসনি তো। মার ভারি অসুখ ভাই। এখন শুধু রেস্ট চাই। যেটুকু ঘুমিয়ে থাকেন সেটুকুই ভাল।'

'অসুখ নৃপুর?'

'শরীরের অসুখ, মনের অসুখ। আমার নিজের শরীরের অবস্থা তো এই। কত দিক সামলাব বল তো।'

জানালা দিয়ে জ্বলন্ত রোদ পড়েছে সুধার মুখে। মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে নৃপুর বলল, 'কিন্তু তুই কী সুন্দর হয়েছিস সুধা।' লিকলিকে হাত দিয়ে নৃপুর সুধার কোমর জড়িয়ে ধরল।

নিশীথের মুখে স্তুতি শুনে সুধা আরক্ত হয়েছিল, কিন্তু নৃপুরের কাছে লজ্জা নেই। সরু দুটি হাত কোলে টেনে নিয়ে সুধা বলল, 'তুমিও তো সুন্দর নৃপুর।'

আর তখুনি ফশ্ করে জ্বলে উঠল নৃপুরের দুটি চোখ। সুধা স্বপ্নে যেমন দেখেছিল। দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে নৃপুর বলল, 'কোথায় সুন্দর। আমাকে ওরা সুন্দর হতে দিল কই। আমার বাইরেটা কালো, ভেতরটা তার চেয়েও কালো সুধা। অথচ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে নৃপুর বলল, 'আমি সুন্দর হতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি এখনও সুন্দর হতে পার, নৃপুর।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে দু' হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে নৃপুর বলল, 'পারি না, আর পারি না। আমি হেরে গেছি, ফুরিয়ে গেছি সুধা।'

সেই হাত দুটি সুধা যদি সরিয়ে দিত, দেখতে পেত, ঘাসের শিসে শিশিরের মত পল্লবপ্রান্তে উষ্ণ কয়েক ফোঁটা জল। ঝুঁকে পড়ে সুধা বলল, 'কী হয়েছে আমাকে এখনও কিন্তু বলনি নৃপুর।'

নৃপুর বলল, 'বলব। কাউকে না কাউকে এক দিন সব কথা বলতেই হয়। নইলে মানুষ মরেও শান্তি পায় না। খৃষ্টানেরা তাই শেষ দিনে ডেকে আনে পাদ্রীকে।' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধার দিকে চেয়ে নৃপুর বলল, 'পাদ্রীর চেয়ে তোমাকে বলে আমি বেশি শান্তি পাব ভাই।'

নৃপুরের পক্ষে বলাটা সহজতর করতে সুধা বলল, 'তুমি তো কার্শিয়ং গিয়েছিলে।'

গিয়েছিলুম, নৃপুর বললে, 'ওরা আমাকে পাঠিয়েছিল।'

'ওরা কারা ভাই' সুধা সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার চৌধুরী আর তোমার—'

নৃপুর অনায়াসে বলল, 'আর আমার মা। কিন্তু ওদের জন্যে তো ভাবিনে, ওরা যে এমন করবে সেজন্যে আমি তো তৈরি ছিলুম। কিন্তু নিশীথ এমন করল কেন।'

'কী করেছেন নিশীথবাবু' সুধা সসংকোচে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু প্রয়োজন ছিল না, নৃপুর নিজেই বলত। শুয়ে শুয়ে দু-হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখল নৃপুর, অনেকটা বক্তৃতা দেবার

ভঙ্গীতে। ধীর, অকম্পিত কণ্ঠে বলল, 'নিশীথ আমাকে ঠকিয়েছে।'

সুধা অস্বস্তিবোধ করল, গোপন একটু অপরাধ বোধ ওর মর্মে যেন হঠাৎ বিন্ধ হল তপ্ত সূচীমুখের মত, চমকে উঠল। কিন্তু সুধার মুখে রক্ত আছে কি নেই, চেয়ে দেখবার অবসর নূপুরের ছিল না, সে ছাতের দিকে একাগ্র লক্ষ্য রেখে বলে গেল, 'নিশীথ আমাকে ঠকিয়েছে। মা আর ডাক্তার চৌধুরী মিলে ঠিক করলে আমাকে কার্শিয়াং পাঠাবে। কত প্ল্যান ও'দের, কত উপদেশ। ওখানে কীভাবে থাকতে হবে, কত করে মাসোহারা পাব, এই সব। ও'দের মাসোহারার জন্যে চিন্তা ছিল না, বাবা আমাকে আলাদা করে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। মা আর ডাক্তার চৌধুরী প্ল্যান আঁটছে, আমি ওদিকে নিজের বন্দোবস্ত করছি। ঠিক জানি, আমাকে কার্শিয়াং যেতে হবে না। আমি আর নিশীথ পালিয়ে যাব, প্রথম বোম্বাইয়ে, সেখান থেকে সুযোগমত জাহাজে। বিদেশে পাড়ি দেব। সুস্থ হয়ে ফিরে আসব। নিশীথ আমাকে বিলিতি মেডিকেল জার্নালগুলো পড়তে দিত, দেখেছি তো ওদেশে আমার চেয়ে অনেক শক্ত কেস একেবারে সেরে গেছে।'

নিষ্ঠুরভাবে আঙুলের একটা ফোসকা নখে খুঁটতে গিয়ে নূপুর রক্ত বের করে ফেলল, সুধার দিকে চেয়ে ক্ষতের বেদনা লুকোতে ক্লিষ্ট হাসল। অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু নিশীথ এল না তো। সন্ধ্যার পর মা বাড়ি থাকে না, ফোন করে ট্যাক্সি আনালুম, কাঠের পায়ে ভর দিয়ে দিয়ে কোনমতে নীচে নামলুম, ড্রাইভারকে বললুম, দমদম। কিন্তু সেখানে নিশীথ ছিল না। পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায়, মিনিটের পর মিনিট ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু ইঞ্জিনটা ঘসঘস করছে। ঠাণ্ডা অন্ধকার, কনকনে হাওয়া। মাঝে মাঝে চড়া আলো জেলে দু-একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে ছুটে যায়, শাদা, সবুজ আলোর ফোঁটা-পরা দু-একটা প্লেন আকাশে উড়ে কাকে ধমকায়, দূরে দূরে লালচোখো ওয়ার-লেসের ভূতুড়ে খুঁটিগুলো। ড্রাইভারকে নিশীথের বর্ণনা দিয়ে বললুম, খুঁজে আন। একটু পরে খোলা প্রান্তরে লাউডস্পীকার থেকে থেকে নিশীথের নাম হে'কে গেল, কিন্তু নিশীথ এল না। ড্রাইভার ফিরে এসে বসল ওর আসনে, গাড়িটার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল, আবার বাড়ির পথ। চোরের মত বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম, ফিরেও এলুম চোরের মত। পরদিন সকালেই ওরা আমাকে কার্শিয়াং পাঠিয়ে দিলে।'

বিশ্রাম নিতে নূপুর দু'পল চোখ বুঁজে রইল, একটু পরেই অলস আরক্তিম দৃষ্টি মেলে বলল, 'তুমি ভাবছ কী লজ্জা, কী লজ্জা। কিন্তু লজ্জার তখনও একটু বাকী ছিল। কার্শিয়াং গিয়ে নিশীথের চিঠি পেলুম, লিখেছে, আইনের চোখে আমি বয়স্থা নই, পুলিশের হাঙ্গামা হত, সেই ভয়েই সে আসেনি। ভয়, ভয়। এক-রত্তি মেয়ের যে-সাহস আছে, এই অক্ষম পুরুষগুলোর সেটুকুও নেই কেন। মনে মনে বললুম, তোমাকে আর দরকার নেই নিশীথ, আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিতে পারব। তুমি তোমার স্ক্যাণ্ডালের ভয় আর কেরীয়ারের মোহ নিয়ে থাক। তখনও আমার রোখ যায়নি, সেরে ওঠার পণ ভূতের মত ঘাড়ে চেপে আছে। লজ্জার কথা কী বলব ভাই, স্যানাটোরিয়মের একজন ক্লার্ককে ভর করলুম। মাঝবয়সী টাক-পড়া হ্যাংলা একটা লোক, আমার বেডের আশেপাশে ঘুরঘুর করত, যে-কোন ছুতোয় আলাপ করতে পেলে বেঁচে যেত। ভাবলুম, মন্দ কী, আমার ভাল হয়ে ওঠা নিয়ে কথা। সীতা উদ্ধার হলেই হল, সহায় যে-কেউ হক না কেন, বানর কি, আর রাক্ষস কি। কিন্তু সে-ও আমাকে ঠকালে।'

প্রথম সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে ঘরে, কাদের বাড়ির কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় বাতাস কালো, ভারী। নূপুর কাশতে শুরু করল। হাপরের মত তলপেট ওঠা-পড়া করছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত; কণ্ঠায়, গালে জমাট রক্তের ছোপ। সুধা ওর বুকে হাত দিয়ে মালিশ করতে গেল, নূপুর প্রবল বিতৃষ্ণায় ওকে ঠেলে দিল। —'থাক, থাক, আর দয়া দেখাতে হবে না।' পরিপূর্ণ নিঃশ্বাসে ফুসফুস ভরে নিয়ে বলল, 'সে-ও আমাকে দয়া দেখাতে এসেছিল। ভরসা দিলে, অনেক পাহাড়ির সঙ্গে ওর জানাশোনা, টোটকা ওষুধে আমাকে সজীব করে তুলবে। বিলিতি চিকিৎসায় কিছু হবে না। সেরে ওঠার লোভে তখন আমি যে-কোন পাঁকে নামতে রাজি। ভগবান আমার শরীরের আধখানা নিয়ে রেখেছেন, বাকি আধখানা ওর কাছে তুলে ধরলুম, পুরোটা ফিরে পাব এই আশায়। দুটো নোট পাবে বলে এক-খানা নোট লোকে জোচ্চোরের হাতে তুলে দেয়, শোননি? এ সেই নোট ডবল করার বাজি। হারলুম সে-বাজি। নিশীথের মত এ-ও আমাকে নিয়ে শুধু খেলা করতে চেয়েছিল, আর কিছু না।'

তার দিয়ে মোড়া জানালা, ছোট ছোট চাকার মত রেখায় ভরে গেছে মেজে, দেয়াল, নূপুরের চাদর। আড়াল থেকে শিকারীরা যেন জাল ছুঁড়ে দিয়েছে ঘরে, ধরা প'ড়ে দু'টি কিশোরী ছটফট করছে। থমথমে অন্ধকার, চুপ। আলো
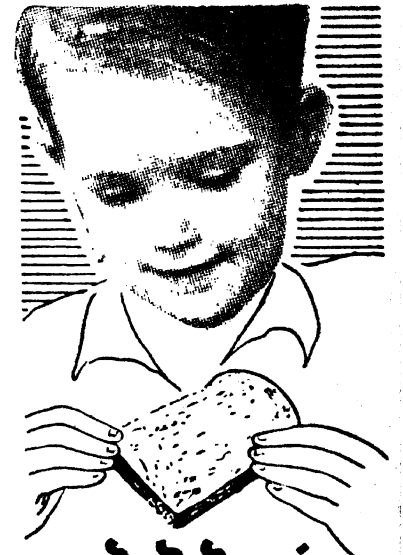
যদি কোথাও থাকে, তবে নূপুরের আঁখি-কোটরের দু'টি বিন্দুতে, শুকনো, প্রখর ছটায়।

হঠাৎ খিল খিল ক'রে হেসে উঠল নূপুর, বলল, 'মা-ও কিন্তু জেতেনি। আমার চেয়েও ঠকেছে।' বিকারগ্রস্ত হাসির সেই তোড়ে সুধার গায়ে কাঁটা দিল, দম বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে রইল, নূপুর এর পর কী বলে শুনতে।

নূপুর বলল, 'ডাক্তার চৌধুরীর কীর্তি তোমাকে গোড়া থেকে বলি, শোন। মাকে নিয়ে তুলল শহরতলীরই সাজান একটা বাড়িতে। বলল, এই আমার নতুন কুটির, তোমাতে আমাতে থাকব ব'লে তৈরি করিয়েছি। মা-র খুশি ধরে না, এক সপ্তাহ ধরে শুধু বাগান সাজালে, প্রাণ ভ'রে ফার্নিচারের অর্ডার দিলে। ডাক্তারকে বলল, এবারে চল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাই। ডাক্তার বলল, সবুর। নোটিশ দিয়েছি কাল, পিরিয়ডটা মেচিওর করুক। পিরিয়ড কেটে গেল, মা আবার ডাক্তারকে সেটা মনে করিয়ে দিল। এর পর দু'জনের দেশভ্রমণে যাবার কথা, সেটাও বাকি যে। ডাক্তার এবারেও বলল, সবুর। হাতে জরুরী কেস আছে ক'টা, সেরে নি। ধন্দ লাগল মা'র, ডাক্তারের সঙ্গে একদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। সেদিনই বিকেলে ডাক্তার এসে বলল, সুচারু, তোমার সঙ্গে সোসাইটির অনেক মেয়ের মাখামাখি, তাদের ক'জনকে একদিন ডাক না। আমার জনকয় বন্ধুকেও তাহ'লে ডাকি। মা বললে, বেশ ত। বিয়েটা হয়ে যাক, তারপরে। ডাক্তার জেদ ধ'রে বললে, না আগেই। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পেড়া-পীড়িতে মা রাজি হ'ল। একদিন সন্ধ্যা-বেলা গান বাজনার নাম ক'রে নিয়ে এল কয়েকটি মেয়েকে। ডাক্তারের বন্ধুরাও এল। খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে অনেক রাত হয়ে গেল। মা বললে, এবার ওদের ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। ডাক্তার বললে, ব্যস্ত কী। আরেকটু গান-বাজনা চলুক না। আমার বন্ধুদের গাড়ি আছে, তারাই সানন্দে ওদের বাড়ি পৌঁছে দেবার ভার নেবে। ত্রস্ত হয়ে মা বলল, না, না। সে হয় না। আমরা ওদের এনেছি, আমাদেরই কর্তব্য ওদের পৌঁছে দিয়ে আসা। ডাক্তার খট্‌খটে হেসে বলল, আমার কর্তব্য আমি জানি। আমার বন্ধুরা কি জানোয়ার না রাক্ষস, যে মেয়েগুলোকে খেয়ে ফেলবে। মা ভয়ে ভয়ে বলল, কী জানি।

ডাক্তার বলল, বেশ ত, এতই যদি তোমার ভয়, ওদের কেউ কেউ এখানেই রাতটা থাকুক না।

আতঙ্কে দু' হাত মাথায় তুলে মা বলল, না না, তা হয় না।

রুষ্ট হয়ে ডাক্তার বলল, বেশ, আজ তবে ওরা যাক, আসছে শনিবার ওদের আবার ডাকা যাবে। ব'লে দিও, সেদিন এখানেই থেকে যাবে।

—ওরা আসবে কেন।

—আসবে, আসবে। সোসাইটিতে তোমার এত প্রতিপত্তি, সবার তুমি পাইকারি মাসিমা, তোমার ডাকে আসবে না? মুচ্‌কি হেসে ডাক্তার বলল, জিজ্ঞেস করে দেখো, ওদের বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরের এই সন্ধ্যাটা নেহাৎ মন্দ লাগে নি।

মা'র বুকের ভিতরটা তখন বরফের মত জ'মে গেছে, কিন্তু আগুন ঝরছে চোখ দিয়ে। বলল, এই জন্যেই আমাকে এখানে এনেছ তুমি, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা এক্সপ্লয়েট করতে? এ-তো বেনামীতে একটা ব্রথেল—

কঠিন গলায় ডাক্তার বললে, যদি বলি তাই। তুমি কি ভেবেছিলে, শুধু ভালবেসে ঘর বেঁধেছি তোমার মত একটা বুড়িকে নিয়ে?

রুদ্ধশ্বাসে মা বলল, 'আমি বুড়ি!'

ডাক্তার হো-হো ক'রে হেসে উঠল, 'নয় তো কী। ভেনীসীয়ান কাচের আয়না আছে তোমার ঘরে, চেহারাটাও একবার দেখনি? আমাদের দেশে মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি, দ্বিতীয়বার কুড়ি ছুঁতে তোমার ক' বছর বাকি আছে, সুচারু?

নূপুরের গল্প শেষ হ'য়ে গেছে, সুধা টেরও পায়নি। অনেকক্ষণ কোন সাড়া না পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপরে, নূপুর?'

নূপুর বলল, 'আরও শুনবি? মা'র টেলিগ্রাম পেয়ে ফিরে এলাম, এসে দেখি এই অবস্থা। ডাক্তার চৌধুরী উধাও, মা'র ঘন ঘন মূর্ছা হয়, মাঝে মাঝে বেহুঁশের মত পড়ে থাকে। শুনলুম, নার্ভাস ব্রেকডাউন। দরোয়ানের ওপর কড়া হুকুম দিয়ে গেছে ডাক্তার চৌধুরী, মা'র ওপর নজর রাখতে, কোথাও যেন যেতে না পারে। তাকে ঘুষ খাইয়ে কাল রাত্তিরে আমরা দু'জন পালিয়ে এসেছি।'

রুগ্ন ধুকধুক বুকে একখানি হাত রাখল নূপুর, ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'কিন্তু এখানেও আমরা থাকব না, সুধা। কাল সকালেই চ'লে যাব। এই পা নিয়ে ওঠা-নামায় নানা ঝামেলা, তাই আর ওপরে যাইনি। দু'দিনের ব্যাপার তো, নীচের ঘরেই বিছানা পেতেছি।'

'কোথায় যাবে নূপুর?'

'আপাতত চেঞ্জে। সেখান থেকে হয়ত বিদেশে।' ক্লান্ত হেসে নূপুর বলল, 'এই শহরটা তো আমাকে সারিয়ে তুলল না, আমার মাকেও ঘর দিল না। এখানে আমাদের মায়ে-ঝিয়ের ঠাঁই হয়নি, দেখি অন্য কোথাও যদি হয়।' অবসাদে চোখের পাতা দু'টি নেমে এল, নিমীলিত নয়নেই নূপুর ব'লে গেল, 'আমি ঠিক জানি সুধা, কোন একটা জায়গায় সুস্থ, পুষ্ট, স্বাভাবিক একটি নূপুর আছে; হাসিমুখে আমার অপেক্ষা করছে। তার খোঁজে দরকার হয় তো পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি যাব।'

'আর ফিরবে না নূপুর?' আস্তে আস্তে সুধা জিজ্ঞাসা করল, উত্তর পেল না। নুয়ে পড়ে দেখল, শপথকঠিন দুটি ঠোঁট ঈষৎ-স্ফুরিত, অভিমানী একটি বুক অতি ধীরে ধীরে ওঠা-নামা করছে।

নূপুর ঘুমিয়ে পড়েছে। গলা পর্যন্ত শাদা চাদরে ঢাকা, ঠিক সুধা স্বপ্নে যেমন দেখেছিল। (ক্রমশ)

নোংরা হাত

জাঁ-পল সার্ত্র্

অনুবাদঃ শিবনারায়ণ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হোয়েডেরার। তোমার কি ধারণা ওরই কোন উপায় ছিল? অন্যের স্নিগ্ধের যন্ত্রণা সহ্য করা কি খুব সহজ?

জর্জ। কত লোকই ত খাসা সহ্য করছে।

হোয়েডেরার। সে তাদের কোন অনুভূতি কল্পনা নেই বলে। এ বেচারীর বিপদ হোল ওর সেটা বড্ড বেশী করেই আছে।

শিলক। বেশ কথা। আমরা ত ওকে কষ্ট দিতে চাই না। সোজা কথা আমরা ওকে পছন্দ করি না। এটুকু অধিকার নিশ্চয় আমাদের......

হোয়েডেরার। অধিকার? কিসের অধিকার! তোদের আবার অধিকারটা কি? কিছু অধিকার নেই। "আমরা ওকে পছন্দ করিনে।" ওরে হারামজাদারা? একবার আরশিতে নিজেদের চেহারাগুলো দেখে আয়, তারপর বুকের পাটা থাকে ত এসে ওই সব ন্যাক্যা ন্যাক্যা পছন্দ অপছন্দের কথা বুঝিয়ে দিস্। মানুষকে আসল যাচাই তার কাজ দিয়ে। সাবধান, আমি তোদের কাজ দিয়ে তোদের না যাচাই শুরু করি—কিছুদিন ধরে কাজ কর্মে বেশ ঢিলে পড়েছে।

হুগো। [চেঁচিয়ে উঠে] আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে না। কে তোমায় আমার হয়ে সাফাই গাইতে বলেছে? দেখতে পাচ্ছ না এতে কোন লাভ নেই—এ আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। যখন ওদের এই মাত্র আসতে দেখলাম ওদের চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। খুব কিছু মনকাড়া চেহারা নয়। আমার বাপ ঠাকুর্দা আমার আত্মীয়স্বজন যারা চিরদিন খুশীমত পেট ভরে খেয়ে এসেছে, ওরা তাদের পাপের জন্য আমাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাতে চায়। আমি তোমায় বলছি আমি ওদের চিনি; ওরা কোন দিনই আমাকে ওদের আপনার জন বলে মেনে নিতে পারবে না। ওদের মত আরও অনেকে আমার দিকে চেয়ে ঠিক ওইভাবেই হেসেছে। আমি লড়াই করেছি, নিজেকে নানাভাবে খাট করেছি, ওরা যাতে আমার অতীতকে ভুলতে পারে তার জন্যে যা কিছু করার দরকার সব করেছি। ওদের বার বার বলেছি, আমি ওদের ভালবাসি, হিংসে করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বৃথা চেষ্টা! আমার বাপ যে বড়লোক, আমি যে বুদ্ধিজীবী, গতর খাটিয়ে কাজ করতে পারিনে এমনি হারামজাদা। বেশ, ওদের যা ভাল লাগে ওরা তাই ভাবুক' আর ওরা ত' ঠিকই ভেবেছে। এটা হল শ্রেণীর প্রশ্ন।

[শিলক আর জর্জ পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকায়]

হোয়েডেরার। [তাদের দিকে চেয়ে] তাহলে? [শিলক ও জর্জ দুজনেই সম্বন্ধির সংগে ঘাড় ঝাঁকি দেয়] আমি তোমাদের সম্বন্ধে যতটা সাবধান থাকি ওর সম্বন্ধে তার চাইতে বেশী সাবধান হব না। আমি কাউকে ছাড়ি না। ও গতর দিয়ে কাজ করতে না পারুক—আমার কাজ করতে হলে বুঝতে পারবে কি কঠিন পাল্লায় পড়েছে। [বিরক্ত হয়ে] চুলোয় যাক কথা কাটাকাটি। ঢের হয়েছে।

জর্জ। [মনস্থির করে] বেশ। [হুগোকে] তবে তোমায় যে ভাল লেগেছে একথা বলতে পারছি না। তুমি যাই বল না কেন আমাদের মধ্যে এমন একটা তফাৎ আছে যে খাপে খাপে কখনও মিলবে না। দোষটা তোমার তা বলছি না। আমরা তোমাকে যাচাই করে দেখিনি। আমি তোমার কাজে কোন মুশকিল ঘটাব না। বেশ?

হুগো। [মিনমিনে গলায়] বেশ। [চুপচাপ]

হোয়েডেরার। [প্রশান্তভাবে] এই যে তল্লাশীর ব্যাপার......

শিলক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তল্লাশী.....মানে...

হোয়েডেরার। [কড়া গলায়] তোমাকে কে জিজ্ঞেস করেছে? [গলার স্বর সহজ করে হুগোকে] দেখ ভাই, তোমায় আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখো। আজ যদি আমি তোমার জন্য নিয়ম ভাঙি, কাল এরা আরেকজনের জন্যে নিয়ম ভাঙতে বলবে—আর শেষে একদিন কোন এক হারামজাদার পকেট হাতড়াইনি বলে তার হাতবোমায় সবশুদ্ধু স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। এখনত সবাই আমার বন্ধু, ধর এখন যদি ওরা ভদ্রভাবে অনুরোধ করে, তুমি কি ওদের তল্লাশী করতে দেবে?

হুগো। আমি......না দুঃখিত।

হোয়েডেরার। ও। [তার দিকে চায়] আর আমি যদি অনুরোধ করি? [চুপ চাপ] বুঝেছি, তোমার আবার নীতিগত ব্যাপার আছে। আমিও এটা নীতিগত ব্যাপার করে তুলতে পারি। কিন্তু নীতি আর আমি......

[থেমে] আমার দিকে চাও। তোমার কাছে কোন বন্ধ্ব আছে?

হ্বগো। না।

হোয়েডেরার। তোমার স্ত্রীর কাছে?

হ্বগো। না।

হোয়েডেরার। বেশ, আমি তোমায় বিশ্বাস করলাম। তোমরা দ্বজনে যেতে পার।

যেসিকা। দাঁড়াও। [তারা ফিরে দাঁড়ায়] হ্বগো, বিশ্বাসের পাল্টা বিশ্বাস না করতে পারলে অন্যায় হবে।

হ্বগো। কি?

যেসিকা। তোমরা সব কিছ্ব তল্লাশী করতে পার।

হ্বগো। কিন্তু যেসিকা......

যেসিকা। না কেন? শেষে ওরা ভাববে তোমার কাছে সত্যিই ব্বঝি রিভলভার আছে।

হ্বগো। নির্বোধ!

যেসিকা। তাহলে ওদের দেখতে দিচ্ছ না কেন? তোমার আত্মসম্মান ত বজায় রইল। আমরা ওদের দেখতে বলছি। [জর্জ আর শিলক তব্ব দরজার গোড়ায় ইতস্তত করে]

হোয়েডেরার। কি? দাড়িয়ে আছ কেন? শ্বনলে ত ওর কথা!

শিলক। ভাবলাম......

হোয়েডেরার। ভাবতে হবে না। যা করতে বলা হয়েছে কর।

শিলক। আচ্ছা, আচ্ছা।

জর্জ। এত সময় নষ্ট করে কি ফায়দা হোল?

[তারা আধা অনিচ্ছার সঙ্গে তল্লাশী আরম্ভ করে। হ্বগো যেসিকার দিকে বিমূঢ় দ্বষ্টিতে চেয়ে থাকে]

হোয়েডেরার। [শিলক ও জর্জকে] এ থেকে শেখো কেন অন্যদের বিশ্বাস করতে হয়। আমি সবাইকে বিশ্বাস করি। প্রত্যেককে বিশ্বাস করি। [ওরা খ্বঁজছে] করছটা কি? ওরা ভাল করে তল্লাশী করতে বলেনি, তবে? ভাল করে তল্লাসী কর। শিলক, কাবার্ডের নীচটা দেখ। এই ত'। ওই স্যুটটা বার করে টিপে টিপে দেখ।

শিলক। দেখেছি।

হোয়েডেরার। আবার দেখ। তোষকের নীচটা দেখ। এই ত', শিলক, ভাল করে দেখে নাও। জর্জ এ ধারে এসো। ওকে একবার চোলাই করে নাও। বেশী না, ওর পকেটগ্বলো ভাল করে টিপে ট্বপে দেখ। বেশ, এবারে প্যান্টের পকেট কটা। এই ত'। আর রিভলভার রাখার পকেটটা। চমৎকার।

যেসিকা। আমায় দেখবে না?

হোয়েডেরার। যদি তোমার ইচ্ছে হয়। জর্জ! [জর্জ নড়ে না] কি হোল? ওকে দেখে ঘাবড়ে গেলে নাকি?

জর্জ। না ত'। ঠিক আছে।

[ম্বখ লাল করে যেসিকার কাছে যায়, আঙ্গ্বলের ডগা দিয়ে তাকে আলতো করে ছ্বঁয়ে দেখে। যেসিকা হেসে ওঠে]

যেসিকা। এ যে দেখছি একেবারে রাণীর সখীর মত।

(শিলক ইতিমধ্যে যে স্যুটকেসে রিভলভার তাতে হাত দিয়েছে]

শিলক। বাক্সগ্বলো কি সব খালি?

হ্বগো। [গলায় জোর এনে] হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। [তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে] ওটাও খালি?

শিলক। [স্যুটকেশটা তুলে] না।

হ্বগো। ও......না, ওটা খালি নয়। তোমরা যখন ঢ্বকলে তখন আমি ওটা খ্বলতে যাচ্ছিলাম।

হোয়েডেরার। ওটা খোল।

[শিলক স্যুটকেশ খ্বলে তন্ন তন্ন করে দেখে]

শিলক। কিছ্ব নেই।

হোয়েডেরার। যাক্। তা হলে চুকে গেল। এবার যেতে পার।

শিলক। [হ্বগোকে] মনে রাগ রেখো না।

হ্বগো। না, তুমিও রেখো না।

যেসিকা। [ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, পেছন হতে] আমি হলঘরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবখন।

[তারা চলে গেল]

হোয়েডেরার। আমি কিন্তু তুমি হলে, ওদের কাছে বেশী ঘন ঘন যেতাম না।

যেসিকা। কেন? আমার ত মনে হয় ওরা ভারী লক্ষ্মী ছেলে। বিশেষ করে জর্জ। একেবারে ছেলেমান্বষ।

হোয়েডেরার। হ্বঁ! [তার কাছে যেয়ে] তুমি দেখতে খ্ববস্বরৎ—এটা সত্যি। তার জন্যে তোমার লজ্জা পেতে হবে না। কিন্তু অবস্থা যা, তাতে দ্বটো মাত্র সড়ক খোলা আছে। এক হোল, তোমার মন যদি তেমন বড় হয়, তবে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গেই ভাল ব্যবহার করবে।

যেসিকা। আমার মন ভারী ছোটো।

হোয়েডেরার। আমিও তাই ভেবেছিলাম। তাছাড়া ওরা এমনিতেই খাওয়াখায়ি করবে। এখন একমাত্র উপায় হোল তোমার স্বামী যখন ঘরে থাকবে না, তখন দরজায় খিল দিয়ে রেখো। কার্বকে খ্বলে দিও না। আমাকে পর্যন্ত না।

যেসিকা। ব্বঝেছি। তব্ব যদি কিছ্ব মনে না করেন, আমি তেসরা সড়ক বেছে নেবো।

হোয়েডেরার। যা তোমার ইচ্ছে। [তার দিকে ঝ্বঁকে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে] চমৎকার গন্ধ ত'। দেখ ছোঁড়াদের ওখানে যাবার সময় কোনো গন্ধটন্ধ মেখো না।

যেসিকা। আমি কোন সময়েই গন্ধ মাখিনে।

হোয়েডেরার। কি দ্বঃখ্ব। [ফিরে আস্তে আস্তে ঘরের মাঝখান পর্যন্ত হেঁটে যায় তারপর থামে। দ্বশ্যের আগাগোড়া তার চোখ তীক্ষ্ণভাবে ইতস্তত দেখে নিচ্ছে, যেন কিছ্ব একটা খ্বঁজছে। মাঝে মাঝে কিছ্বক্ষণ হ্বগোর পর চোখটা রাখছে, তাকে যাচাই করে নিচ্ছে।] বেশ তাহলে তাই। [থেমে] তাহলে তাই। [থেমে] হ্বগো, কাল সকাল দশটায় কাজে হাজিরা দেবে।

হ্বগো। হ্যাঁ, জানি।

হোয়েডেরার। [বিচলিতভাবে, চোখ তন্ন তন্ন করে সব জায়গায় খ্বঁজছে] ভাল, ভাল, ভাল। ঠিক। সব চমৎকার। সব ভাল যার শেষ ভাল। ওখানে দাড়িয়ে তোমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সব ঠিক আছে। আমরা আবার সবাই বন্ধ্ব হলাম, কেমন? সবাই স্বখী......[হঠাৎ] তোমাকে ভাই খ্বব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

হ্বগো। ও কিছ্ব না। [হোয়েডেরার খ্বব ভালো করে তাকে দেখে। হ্বগো বিব্রত ভাবে খ্বব চেষ্টা করে বলে] এই মাত্র যে......যে ব্যাপারটা হোল

তার জন্যে আমি......আমি ক্ষমা চাইছি।

হোয়েডেরার। [হ্যুগোর 'পর হতে চোখ না সরিয়ে] ও আমি এর মধ্যে ভুলে গেছি।

হ্যুগো। ভবিষ্যতে আমি আর আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের কারণ ঘটতে দেব না। আমি প্রত্যেক হুকুম অক্ষর মত মানবো।

হোয়েডেরার। একথা ত আগেই বলেছ। সত্যি তোমার শরীর খারাপ লাগছে না? [হ্যুগো জবাব দেয় না] যদি শরীর খারাপ ঠেকে বল, এখনো সময় আছে, আমি কমিটির কাছে তোমার জায়গায় অন্যলোক চেয়ে পাঠাতে পারি।

হ্যুগো। আমার শরীর ঠিক আছে।

হোয়েডেরার। বেশ, ভাল কথা। তাহলে আমি এখন আসি। তাছাড়া তুমি বোধহয় এখন একলা থাকতে চাও। [টেবিলের কাছে যেয়ে বইগুলো দেখে] হেগেল, মার্ক্স, খুব ভাল। লোরকা, টমাস, এলিয়ট! নামও কখনো শুনিনি [বইগুলোর পাতা উল্টে যায়]

হ্যুগো। ওরা সব কবি।

হোয়েডেরার। [আর একটা বই তুলে নিয়ে] কবিতা......কবিতা......আরও কবিতা। তুমি কবিতা লেখ?

হ্যুগো। না—না।

হোয়েডেরার। মানে লিখতে। [টেবিলের কাছ হতে সরে আসে। বিছানার সামনে থামে] ড্রেসিং গাউন দেখছি। নিজের ত তাহলে বেশ যত্নআত্তি কর। [তাকে একটা সিগারেট দেয়]

হ্যুগো। [ফিরিয়ে দিয়ে] ধন্যবাদ।

হোয়েডেরার। সিগ্রেট খাও না! [হ্যুগো মাথা নাড়ে] ভাল। কমিটির কাছে শুনলাম তুমি কোনো প্রত্যক্ষ কাজে কখনো অংশ নাওনি। সত্যি নাকি?

হ্যুগো। আমার পরে কাগজ বার করার ভার ছিল।

হোয়েডেরার। তা, শুনেছি। গত দু মাস একটা সংখ্যাও পাইনি। তার আগেও তুমি সম্পাদক ছিলে?

হ্যুগো। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। বেশ ভাল ভাবেই ত কাজ করছিলে। ওরা তাহলে এমন সুযোগ্য একজন সম্পাদককে শুধু আমার দরকারে ছেড়ে দিলে?

হ্যুগো। ওদের ধারণা তোমার কাজ আমি ঠিক মত করতে পারব।

হোয়েডেরার। ওদের খুব দয়া। কিন্তু তোমার কি ধারণা? তুমি কি তোমার আগের কাজ ছেড়ে এসে সুখী হয়েছে?

হ্যুগো। আমি......

হোয়েডেরার। কাগজটা—ওটা একরকম তোমার হাতে গড়া। তাতে অনেক ঝুঁকি ছিল, অনেক দায়িত্ব, এক হিসেবে একে তুমি প্রত্যক্ষ কাজও বলতে পার। [হ্যুগোর দিকে চায়] আর এখন তুমি আমার সেক্রেটারী? [থেমে] কেন তুমি এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে এলে? কেন?

হ্যুগো। আমি হুকুম তামিল করি।

হোয়েডেরার। সব সময়ে খালি হুকুমের কথা বোলো না। যারা ও ছাড়া আর কিছু বলে না আমি তাদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকি।

হ্যুগো। নিয়ম মানতে শেখা আমার দরকার।

হোয়েডেরার। বুঝেছি। বোধ হয় আমরা মানিয়ে চলতে পারব। [হ্যুগোর কাঁধের পরে হাত রেখে] শোন... [হ্যুগো হাত ছাড়িয়ে লাফিয়ে পেছনে সরে যায়। হোয়েডেরার নতুন কৌতূহল নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে। তারপর গলার স্বর তীক্ষ্ম, কঠিন] অ্যাঁ? [থেমে] হা! হা!

হ্যুগো। আমি......কেউ ছুঁলে আমার বিশ্রী লাগে।

হোয়েডেরার। [কঠিন দ্রুত গলায়] ওরা তোমার স্যুটকেশ খোঁজার সময় তুমি ভয় পেয়েছিলে কেন?

হ্যুগো। আমি ভয় পাইনি।

হোয়েডেরার। আমি বলছি তুমি ভয় পেয়েছিলে। কি আছে বাক্সে?

হ্যুগো। তোমার লোকরা ত' খুঁজে দেখেছে; কিছু পায়নি।

হোয়েডেরার। কিছু নেই? দেখা যাক। [স্যুটকেশের কাছে যেয়ে সেটা খুলে] ওরা বন্দুক খুঁজছিল। স্যুটকেশে বন্দুক লুকোনো থাকতে না পারে। কিন্তু কাগজপত্রও ত' থাকতে পারে।

হ্যুগো। কিম্বা একেবারে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র।

হোয়েডেরার। দেখ, একটা কথা ভাল ক'রে সমঝে নাও। যে মুহূর্তে হতে তুমি আমার তাঁবে এসেছ তখন হতে তোমার আর ব্যক্তিগত ব'লে কিছু নেই। [তার জিনিসপত্র হাতড়ে দেখে] এক রাশ শার্ট, প্যান্ট সব আনকোরা নোতুন। হাতে খুব রেস্ত আছে বুঝি?

হ্যুগো। আমার স্ত্রীর কিছু টাকা আছে।

হোয়েডেরার। আরে, এ ফোটোগুলো কি? [তুলে নিয়ে দেখতে থাকে। একটু পরে] তবে এই ব্যাপার, এই ব্যাপার। [আরেকটা ফোটো দেখে] ভেলভেটের স্যুট। [আরেকটা দেখে] জাহাজী কলার, মাথায় বেরেটুপি। খাসা একখানা খুদে ভদ্দর লোক বটে!

হ্যুগো। ফোটোগুলো আমাকে দিয়ে দাও।

হোয়েডেরার। শ্‌! [ওকে সরিয়ে দিয়ে] এই—তাহলে সেই একান্ত ব্যক্তিগত

জিনিসপত্র। তোমার ভয় হয়েছিল ছোকরারা বুঝি ওগুলো বার করে ফেলে।

হুগো। ওরা যদি ওই ছবিগুলোর পরে ওদের নোংরা থাবা রাখতো, ওদিকে চেয়ে হ্যা হ্যা করে হাসত...আমি...

হোয়েডেরার। যাক্, রহস্যের হদিশ মিলল। দেখলে ত' মুখে পাপের ছাপ পড়লে কি অবস্থা হয়। আমি ত' নিশ্চয় ভেবেছিলাম, অন্তত একটা হাতবোমাও তোমার কাছে লুকোন আছে। [ফোটোগুলোর দিকে তাকিয়ে] তুমি বদলাওনি। ছোট্ট রোগা লিকলিকে পা দু'টো... বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার কখনো ক্ষিধে পেত না। তুমি এত ক্ষুদে ছিলে ওরা তোমায় চেয়ারের পরে দাঁড় করিয়ে দিত, আর তুমি বুকের পরে হাত দু'টো ভাঁজ করে নাপোলিয়'র মত জগৎ পরিদর্শন করতে। বিশেষ সুখী ছিলে দেখাচ্ছে না। না......বড়লোকের ছেলে হওয়া সব সময়েই কিছু মজার নয়। জীবনের এই অশুভ আরম্ভ। আচ্ছা, যদি তোমার অতীতকে চাপা দিতেই চাও তবে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন। [হুগো অনির্দেশ্য ভঙ্গি করে] তুমি নিজেকে নিয়েই বড় বেশী সময় নষ্ট কর।

হুগো। আমি নিজেকে ভোলার জন্য পার্টিতে এসেছিলাম।

হোয়েডেরার। আর প্রতি মুহূর্তে নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছ যে, ভুলতে হবে। তা বেশ। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পদ্ধতি আছে। [ফোটোগুলো হুগোকে ফিরিয়ে দেয়] ভাল করে লুকিয়ে রাখ। [হুগো সেগুলো নিয়ে জামার ভেতর পকেটে রাখে] সকালে তা হলে দেখা হচ্ছে, হুগো।

হুগো। হ্যাঁ। শুভ রাত্রি।

হোয়েডেরার। শুভ রাত্রি, যেসিকা।

যেসিকা। শুভ রাত্রি।

[দরজার গোড়ায় এসে হোয়েডেরার ফিরে দাঁড়ায়]

হোয়েডেরার। খড়খড়িগুলো ভালো করে আটকিও আর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ো। বাগানে কে আছে না আছে বলা যায় না। এটা হুকুম।

[চলে গেল। হুগো দরজার কাছে যেয়ে খিল আঁটে, ছিটকিনি লাগায়]

যেসিকা। ঠিক বলেছিলে। লোকটা একেবারে সাধারণ। কিন্তু ফুট্কি মারা টাই ত' পরেনি।

হুগো। রিভলবারটা কোথায়?

যেসিকা। ভারী মজা লাগল, মৌমাছি। এই প্রথম তোমাকে সত্যিকারের মানুষদের মুখোমুখি দেখলাম।

হুগো। যেসিকা, রিভলবারটা কোথায়?

যেসিকা। দিলাপিয়ার, তুমি এ খেলার নিয়ম কানুন কিছু জান না। জানালা যে খোলাই রইল। বাইরে থেকে দেখা যায়।

হুগো। [খড়খড়ি বন্ধ করে ফিরে আসে] এখন?

যেসিকা। [বুকের কাঁচুলীর মধ্য হতে রিভলবার বার করে] তল্লাসী করার জন্যে হোয়েডেরারের একজন মেয়েলোকও রাখা দরকার। আমি দরখাস্ত করব।

হুগো। কখন সরালে এটাকে?

যেসিকা। তুমি যখন ওদের দরজা খুলে দিলে।

হুগো। আমি ভেবেছিলেম এবার তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লে।

যেসিকা। আমি আর একটু হ'লে ওর মুখের পরে হেসে ফেলতুম। "আমি তোমায় বিশ্বাস করি। আমি সকলকে বিশ্বাস করি। এ থেকে শেখ অন্যদের কি করে বিশ্বাস করতে হয়..." লোকটা ভেবেছে কি? ওসব বিশ্বাসের চালবাজী ছেলেদের বেলায়ই শুধু খাটে।

হুগো। বটে?

যেসিকা। তুমি আর কথা বোল না, মৌমাছি। তোমার যা অবস্থাখান হয়েছিল!

হুগো। আমার? কখন?

যেসিকা। ও যখন বললে যে, ও তোমায় বিশ্বাস করে।

হুগো। আমার মোটেই কিছু অবস্থা হয়নি।

যেসিকা। আলবৎ হয়েছিল।

হুগো। মোটেই হয়নি।

যেসিকা। আমাকে যদি কখনো কোনো খবসুরৎ লোকের সঙ্গে একা রেখে যাও তখন কিন্তু বল না, "আমি তোমায় বিশ্বাস করি"—এ আমি তোমায় আগে হ'তে সাবধান করে দিচ্ছি। ওসব বললে কিছু আর তোমাকে ঠকাতে আমার আটকাবে না। অবিশ্যি যদি আমার ঠকাতে ইচ্ছে হয়। বরং ঠিক উল্টোটাই হবে।

হুগো। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমি চোখ বুঝে চলে যাব।

যেসিকা। তুমি কি ভেবেছ ওই সব মস্ত মস্ত ভাবের কথা বলে আমাকে আটকাবে?

হুগো। নাগো, হিমকন্যে, না। তোমার বরফের হিমেই আমার আসল ভরসা। সবচেয়ে টগবগে রক্ত প্রণয়ীর আঙ্গুলও তোমার ও-হিমে জমে যাবে। সে যদি তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটু গরম করে তুলতে যায়, তুমি তার দু' হাতের ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়বে।

যেসিকা। বোকা কোথাকার। আমি মোটেই এখন খেলছি না। [অল্প একটু থেমে] খুব ভয় পেয়েছিলে?

হুগো। এখন? না। মনেই হয় না। ওরা তল্লাসী করছিল, আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এ একটা খেলা। আমার কাছে কোনো কিছুই খুব সত্যি বলে মনে হয় না।

যেসিকা। আমাকেও না?

হুগো। তুমি। [খানিকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নেয়] আচ্ছা বলত, তুমিও কি ভয় পেয়েছিলে?

যেসিকা। হ্যাঁ, যখন বুঝলাম যে, ওরা আমাকেও তল্লাসী করবে। আমি জানতাম, জর্জ আমাকে তেমন ছোঁবে না, কিন্তু শিলক আমার সব কাপড় খুলে দেখতো। রিভলবারটা পাবে বলে নয়, ওর ঐ হাত দিয়ে শরীর ঘাঁটবে ভাবতে ভয় করছিল।

হুগো। এ ব্যাপারে তোমাকে টেনে আনা আমার উচিত হয়নি।

যেসিকা। ওকথা মনেও এনো না। আমি বলে কবে থেকে একটু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার আশা করে বসে আছি।

হুগো। যেসিকা, এ মোটেই খেলা নয়। ও বিপজ্জনক মানুষ।

যেসিকা। বিপজ্জনক? কার কাছে?

হুগো। পার্টির কাছে।

যেসিকা। পার্টির কাছে? আমি ভেবেছিলুম ও বুঝি পার্টির নেতা।

হুগো। ও নেতাদের একজন। সেই জন্যেই ত'......

যেসিকা। থাক্, বোঝাতে হবে না। আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি।

হুগো। কি মেনে নিচ্ছ?

যেসিকা। [মুখস্থ বলার মত করে] আমি বিশ্বাস করি এ লোকটা বিপজ্জনক, একে সাবাড় করতে হবে, আর তুমি তারি জন্যে এসেছ......

হুগো। থাক্! [চুপচাপ] আমার দিকে চাও। এক এক সময় আমার মনে হয়, তুমি শুধু আমাকে বিশ্বাস করার ভাণ করছ, সত্যি করে তুমি আমায় বিশ্বাস কর না। অন্য সময়ে মনে হয়, তুমি আমায় সত্যি বিশ্বাস কর—কিন্তু ভাণ কর বিশ্বাস না করার। কোন্‌টে সত্যি বলত?

যেসিকা। [হেসে ওঠে] কোনটাই সত্যি নয়।

হুগো। [তার দিকে তাকিয়ে] যদি তোমার মনটা পড়তে পারতাম......

যেসিকা। চেষ্টা কর।

হুগো। [কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে] ফুঃ [থেমে] ঈশ্বর আমি একটা মানুষকে খুন করতে যাচ্ছি। কোথায় সেই ভাবনা একটা পাথরের মত আমার বুকে ভার হয়ে থাকবে। আমার মাথায় একটা বিরাট স্তব্ধতা নেমে আসবে। [চেঁচিয়ে] স্তব্ধ হও! [থেমে] লোকটার শরীর কি নীরেট দেখেছ? কি রকম প্রাণের শক্তিতে ভরপুর। [থেকে] সত্যি! সত্যি! একথা সত্যি! আমি সত্যিই ওকে খুন করতে যাচ্ছি—এ সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচটা বন্দুকের গুলি শরীরে নিয়ে ও মাটিতে পড়ে থাকবে। [থেমে] কি একখানা খেলা!

যেসিকা। [হাসতে শুরু করে] বেচারী ছোট্ট মৌমাছি আমার, তুমি যদি সত্যিই আমাকে বিশ্বাস করতে চাও যে তুমি খুনে ত' সেটা আগে নিজেকে বিশ্বাস করিয়ে নাও।

হুগো। তোমার মনে হচ্ছে না যে, আমি নিজে সে কথা বিশ্বাস করছি?

যেসিকা। একটুও না। তুমি তোমার অংশ খুব খারাপ অভিনয় করছ।

হুগো। আমি মোটেই অভিনয় করছি না, যেসিকা।

যেসিকা। তুমি আলবৎ অভিনয় করছ। তাছাড়া তুমি ওকে খুনই বা করবে কি করে? রিভলবার ত' আমার কাছে।

হুগো। ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

যেসিকা। না, কখনো না, কখনো না। আমি ওটা জিতে পেয়েছি। আমি না হ'লে ওটা ত' এতক্ষণে খোয়া যেত।

হুগো। বন্দুকটা দাও বলছি।

যেসিকা। উঁহু আমি দেব না। আমি হোয়েডেরারের কাছে যাব। যেয়ে বলব, দেখ, আমি তোমাকে খুশী করার জন্যে এসেছি। আর সে যখন আমায় চুমু খেতে থাকবে......[হুগো ভাণ করছিল যেন হাল ছেড়ে দিয়েছে এখন হঠাৎ এ দৃশ্যের গোড়াকার মত ওর পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বিছানায় পড়ে মারামারি, চেঁচামেচি, হাসাহাসি করতে থাকে। শেষটায় পর্দা পড়তে পড়তে হুগো রিভলবারটা ছিনিয়ে নেয়। যেসিকা চেঁচিয়ে ওঠে] এই, এই, সাবধান, ছুটে যাবে!

যবনিকা

(ক্রমশঃ)

সৈয়দ মুজতবা আলী

(তেরো)

লড়াইয়ের জন্য টাকা তোলার মতলবে ইংরেজ নানা ফন্দি-ফিকির চালালে—তারই একটা 'আওয়ার ডে', পূব বাঙলার এই প্রথম ফ্লেগ ডে। নেটিভরা বিদ্রূপ করে 'আওয়ার ডে' কে, নাম দিলে 'আওর দে' অর্থাৎ 'আরো দে'। ওদিকে ভারতবাসীদের কাছ থেকে এ-দুঃসংবাদ আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না যে, ইংরেজ ক্রমাগতই লড়াই হারছে। চতুর্দিকের অভাব-অনটনের সঙ্গে ইংরেজের গৌরব কমে যাওয়াতে পূব বাঙলায় আরম্ভ হল বাজার লুট। ইংরেজ ভয় পেয়ে গেল যে, একবার যদি এ-অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেটা ঠেকানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

দেখা গেল, ও'রেলির এলাকায় কোনো বাজার লুট হয়নি। আই জি গেলেন ঐ এলাকা পরিদর্শন করতে আর ও'রেলির কাছ থেকে সলা-পরামর্শ নিতে।

ও'রেলির বাংলোয় বসে আলাপচারি করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল দেখে সে সায়েবকে 'পট্‌লাক্' খেয়ে যেতে বললে।

খেতে বসে সুখ-দুঃখের আলাপ আরম্ভ হলো। বড় সায়েবের পরিবারও বিলেতে, তাই নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি নেই, তবে সান্ত্বনা এই যে, তাঁর স্ত্রী লড়াইয়ের কাজে যোগ দিয়েছেন আর বড় মেয়ে তো নার্স হয়ে ফ্রান্সে গিয়েছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সায়েব বললেন, 'লড়াইয়ে যে শুধু মানুষ জখম হয় আর মরে সেইটেই তো শেষ কথা নয়, কত পরিবার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তার কি কোনো স্টাটিসটিকস কেউ নেয়? তোমার বউ-বাচ্চা কি রকম আছে?'

'ভালোই।'

'চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছো তো?'

'হুঁ'। তারপর বলল, 'ও-সব কথা বাদ দিন। আমি আমার মনকে আদপেই বিলেতমুখো হতে দিই নে। যতটা পারি কাজকর্মে ডুব মেরে থাকি।'

বড় সায়েব বললেন, 'সরি! কিছু মনে করো না, ও'রেলি। আমি পরের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথা সচরাচর জিজ্ঞেস করিনে; নিজের দুশ্চিন্তারই আমার অবসান নেই।'

ও'রেলি চুপ করে রইল।

মাস দুই পর বড় সায়েব ডীনকে চিঠি লিখলেন,

'প্রিয় ডীন,

আমি বড় সমস্যায় পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি।

প্রায় দু' মাস হল আমি রাধাপুর মফঃস্বল যাই। সেখানকার অবস্থা খুব সন্তোষজনক সে খবর তুমি জানো—তার জন্য ও'রেলিকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হয়, সে-কথাও তোমার অজানা নয়। দেশে যে সে শান্তিরক্ষা করতে পেরেছে, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়, আমি মুগ্ধ হয়েছি অন্য কারণে।

ভারতবর্ষে একদিন আমাদের প্রাধান্য আর থাকবে না, এ জিনিসটা আমার কল্পনার বাইরে নয়, কিন্তু আমরা জর্মেনির কাছে পরাজিত হব এবং ফলে আমরা জর্মন হূনদের তাঁবেতে আসতে পারি, এ জিনিসটার কল্পনাও আমি করতে পারিনে। এ-লড়াই জেতার জন্য ভারতে শান্তি গৌণ—মুখ্য, ভারতকে এই যুদ্ধে আমাদের হয়ে লড়ানো। ও'রেলি এ-কাজটি তার এলাকায় অবিশ্বাস্যরূপে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে—তার কার্য-পন্থা ও সফলতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

তাই আমাদের সকলের কর্তব্য তাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা।

গতবার যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তার পরিবারের কথা উঠেছিল। আমার প্রশ্নের সামান্যতম উত্তর দিয়ে সে আমার দিকে যেভাবে তাকালে তাতে আমার মনে হল, এই বিষয় নিয়ে তার মনের কোণে এক গভীর বেদনা লুকনো আছে। আমার মনে হল, তার সম্বন্ধে আমরা যেসব গুজব শুনেছি, সেগুলোর কিছুটা তার কানে পৌঁচেছে এবং গুজবের বিরুদ্ধে লড়াই অসম্ভব জেনে চুপ করে সব অপবাদ সয়ে নিয়েছে।

হয়তো এটা বিচক্ষণের কর্ম। কিন্তু আমার মনে হল, এ-বিষয়ে আমাদেরও কর্তব্যবোধ থাকা দরকার। যে মানুষ তার সম্বন্ধে জঘন্য অপবাদ সহ্য করেও আপন দেশের জন্য অম্লানমুখে অবিশ্রাম খেটে যাচ্ছে—এবং খাটছে কাদের জন্য? যারা তার বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছে তাদেরই জন্য—তার মনের জ্বালা লাঘব করার জন্য যদি আমরা আমাদের কড়ে আঙুলটিও না তুলি, তবে আমরা যে নুন খেয়েছি তার উপযুক্ত নই। আর যদি আমাদের প্রফেসনের কথা তুলি তবে বলবো, 'তুমি আমি পুলিশ; অসৎকে সাজা দেওয়া যেমন আমাদের কর্তব্য, সজ্জনকে অন্যায় আক্রমণ

থেকে রক্ষা করা আমাদের ততোধিক কর্তব্য,—ভারতীয় পুলিশ একথা ভুলে গিয়েছে।'

আমি তাই স্থির করলুম, ও'রেলিকে না জানিয়ে তার স্ত্রীর অনুসন্ধান করে সত্য খবর মধুগঞ্জের ইয়োরোপীয় সমাজকে গোচর করার। এবং তারপরও কারো বিষ-জিভ যদি লকলকানি আরম্ভ করে, তবে রাস্কেলটাকে মধুগঞ্জের ক্লাব-হাউসের সিঁড়িতে চাবকে দেব।

মেবল এবং তার বাচ্চা কোন্ মাসে বিলেত গিয়েছিল সে খবর বের করে আমি বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, কলম্বো এমন কি চাটগাঁর বন্দরের সব প্যাসেঞ্জার লিস্ট তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করেও তাদের নাম পেলুম না।

ও'রেলিকে মসুরিতে নাকি মেবলদের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল—সব ক'টা ইয়োরোপীয় হোস্টেলে অনুসন্ধান করেও ওদের নাম পাওয়া গেল না, অথচ ও'রেলির নাম সাভয় হোটেলের রেজিস্ট্রিতে রয়েছে।

ভারতবর্ষের হিল-স্টেশনে কোনো ইয়োরোপীয় রমণীর পক্ষে নাম ভাঁড়িয়ে বেশি দিন কাটানো প্রায় অসম্ভব, ছদ্ম-নামে ছদ্ম পাসপোর্ট নিয়ে বিলেত যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সব দিক যখন ব্ল্যাঙ্ক বেরল তখন আমি মেবলদের বাটলারটার অনুসন্ধান করলুম সিংহলে তার গ্রামে। খবর এল, সাত বৎসর ধরে সে গ্রামে ফেরেনি।

তাই আমি বড় সমস্যায় পড়েছি।

তুমি কি মধুগঞ্জে অত্যন্ত সাবধানে এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করে কোন্ পথে এগতে হবে, সে সম্বন্ধে কিছু হদিশ দিতে পারো?

মনে রেখো, আমি এ যাবৎ সব অনুসন্ধান করেছি অতিশয় গোপনে, এবং বেশির ভাগ নিজে নিজেই—পাছে ও'রেলি খবর পেয়ে মর্মাহত হয় যে, আমও মধুগঞ্জের বক্সওয়ালাদের(১) মত কুচুটে। তুমিও সাবধানে কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য ও'রেলিকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করা। সে-কর্মে সফলতা নাও পেতে পারি, কিন্তু তাকে আরো দুঃখ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত হবে।

শুভেচ্ছাসহ

ডাড্‌নি।'

ঠিক সাতদিন পর বড় সায়েব ডীনের কাছ থেকে একখানি ছোট চিঠি পেলেন,

যতদূর সম্ভব শীঘ্র এখানে আসুন; সব আলোচনা মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন।'

বড় সায়েব খবর দিয়ে মধুগঞ্জে পেঁছিলেন। মোটরেই জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? ডীন উত্তর না দিয়ে শুধু ড্রাইভারের দিকে আঙুল দেখালে।

রাত্রে ডিনারের পর চাকরদের বিদায় দিয়ে ডীন বড় সায়েবকে তার স্টোর-রুমের তালা খুলে ভিতরে নিয়ে গেল।

সায়েব দেখলেন, টুকরো টুকরো হাড়ে জোড়া তিনটি কঙ্কাল। একটা বড়, একটা মাঝারি, আরেকটা ছোট্ট শিশুর।

তালা বন্ধ করে দু'জনে বারান্দায় ফিরে এলো। বড় সায়েব একটা নির্জলা বড় হুইস্কি খেয়ে জিগেস করলেন,

'কোথায় পেলে?'

'বাগানে লিচু গাছের তলা খুঁড়ে?'

'কি করে সন্দেহ হল?'

ডীন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আপনার চিঠি থেকে আমি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পেঁছিই যে, মেবলদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আমি অবিশ্বাস্য জিনিসে বিশ্বাস করে আপন অনুসন্ধান আরম্ভ করলুম—বরঞ্চ বলতে পারেন শেষ করলুম।

এ বাংলোয় প্রথম দু' রাত্রে আমি যে ত্রিমূর্তি দেখেছিলুম, সেগুলো আমার মন থেকে কখনো মুছে যায়নি। যে গছতলায় ছায়ামূর্তিগুলো হঠাৎ মিলিয়ে যায়, সে গাছটাকেও আমি স্পষ্ট মনে রেখেছিলাম। আপনার সব তল্লাসীই যখন নিষ্ফল হল, তখন আমি যে কাজ করলুম সেটা শুনলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমার গুরুরা হাসবেন, কিন্তু যে জিনিস আমি স্পষ্ট দেখেছি, যার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে জিনিস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে—আপনার কাছে—যতই অবিশ্বাস্য হক না কেন, আমার কাছে তা-ই বিশ্বাস্য, সে-ই আমার খেই।

জায়গাটা খোঁড়ার আরেকটা কারণ;—যদি কিছু না পাই, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারবো।'

বড় সায়েব দু' হাতে মাথা চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ ধরে।

ডীন সায়েবকে আরেকটা পেগ দিলে।

সায়েব শুধালেন, 'তোমার কি মনে হয়।'

ডীন কোনো উত্তর দিলে না, প্রশ্নটা যেন সে শুনতেই পায়নি।

এবারে সায়েব মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ কাজ যদি ও'রেলির হয়, তবে বলব, যথেষ্ট ন্যায়-সঙ্গত কারণ না থাকলে তার দ্বারা এটা কখনো সম্ভবপর হত না।'

ডীনও উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'খোঁড়াখুঁড়ি করার আমার তৃতীয় কারণ সেইখানেই। আপনার শেষ সিদ্ধান্ত যদি ও'রেলির সপক্ষে যায়, তবে এই কঙ্কাল-গুলো নিয়ে আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করতে পারবেন। এটা তো আপনার কেস।'

বড় সায়েব বললেন, 'মাই কেস! ও গড্।'

বড় সায়েব পরদিনই রাধাপুর গিয়ে সোজা উঠলেন ও'রেলির বাংলোয়। কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন,

'ও'রেলি, মধুগঞ্জে তোমার বাংলোর বাগান খুঁড়ে তিনটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমার কিছু বলবার আছে কি? কিন্তু তার পূর্বে তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি—তুমিও জানো— —'

সায়েব বাক্য শেষ করলেন না।

ও'রেলি তখন একটু শুকনো হেসে বললে, 'আমাকে কিছু সাবধান করতে হবে না। এই নিন।' বলে সে কোটের ভিতরের বুকের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে বড় সায়েবের হাতে দিলে।'

(ক্রমশঃ)

---

(১) টী-চেস্ট বা চায়ের বাক্স নিয়ে কারবার করে বলে চা-বাগিচার সায়েবদের অবজ্ঞার্থে অন্য ইংরেজ নাম দিয়েছে 'বক্স-ওয়ালা'। হিন্দী 'ওয়ালা' অব্যয় ব্যবহার করা অর্থ যে তারা 'হাফ-নেটিভ'।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ বারে অন্য একভাবে ছোট গল্পগুলির বিচার করিব। সব দেশের সাহিত্যেই রচনার শ্রেণীভাগ করিবার রীতি বর্তমান। কেহ বা রচনার বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেণীভাগ করেন, কেহ বা রচনার শিল্পপ্রকৃতি বা Form অনুসারে শ্রেণীভাগ করেন। আমার মনে হয়, এ দুটির কোনটিই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। বিশেষ যেখানে রচনার পরিমাণ প্রচুর এবং সমগ্রে মিলিয়া জীবনের পূর্ণতার আভাস দিতেছে, সেখানে কোন কৃত্রিম শ্রেণী নির্ণয় পন্থা অবলম্বন না করিয়া যতদূর সম্ভব জীবনের নিয়মকে অনুসরণ করা উচিত। মানুষ পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী আত্মীয় স্বজন ও অনুচর পরিচরের সংসারে জন্মগ্রহণ করে। শিশু জন্মিবামাত্রই কাহারো পুত্র, কাহারো নাতি, কাহারো ভ্রাতা, কাহারো আত্মীয় জ্ঞাতি। ইহাই তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ, ইহাই তাহার স্বাভাবিক ও প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ। মহৎ সাহিত্যের শ্রেণী নির্ণয়ে এই মৌলিক ধারাটিই অনুসৃত হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। হয়তো শিল্পরীতির বিচারে ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়, কিন্তু জীবননীতির বিচারে ইহাই স্বাভাবিক, কেননা যে-মহৎ সাহিত্যে জীবনচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে জীবনের নিয়ম অনুসরণ অবিধেয় নয়। যাই হোক, এ তত্ত্বের মূল্য যত সামান্যই হোক, এখানে রবীন্দ্র ছোট গল্পগুলির শ্রেণী নির্ণয়ে যতদূর সম্ভব ইহাকেই প্রয়োগ করিতে চাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হঠাৎ কোথা হইতে একটি বালিকার আবির্ভাব হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার মুখে প্রেম, করুণা ও মনুষ্যত্বের বাণী উচ্চারিত হইয়া মানুষের মনে একটা পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়।

বাল্মীকি প্রতিভা নাটকে বালিকার ছদ্মবেশে সরস্বতী আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির মনে করুণা সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। অবশেষে সরস্বতী স্বমূর্তিতে আগমন করিয়া বাল্মীকিকে বলিতেছেন—

"দীন হীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বন মাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন
কেন বৎস, শোন, তাহা শোন।"

প্রকৃতির প্রতিশোধের বালিকা রঘুর দুহিতাও ঠিক অনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্ন্যাসীর মনের উপরে। রঘুর দুহিতা আনিয়াছে প্রেমের বাণী।

রাজর্ষি উপন্যাসের ক্ষুদ্র বালিকা হাসি মন্দিরের পাষাণ সোপানবাহী রক্তধারার প্রতি অংগুলি নির্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এত রক্ত কেন? রাজা চমকিয়া অভ্যাসের জড়চিত্ততা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন, এখানেও বালিকার মুখে করুণার বাণী। এই সব বালিকা জানে না যে কি পরিবর্তনের সূচনা তাহারা করিয়া দিতেছে।[৭০]

মালিনী নাটকের রাজকন্যা মালিনী এবং সতী নাটকের রমাবাঈ কন্যা অমাবাঈও নূতন ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছে। তবে আগের উদাহরণগুলি হইতে এগুলি একটু স্বতন্ত্র, শেষোক্ত দুইজনের বয়স কিছু বেশি আর ইহাদের প্রচারিত বাণী তাহাদের জ্ঞানের অতীত নয়। যাই হোক, এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আরও সংগ্রহ করিতে পারা যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে, কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

গল্পগুচ্ছে এই শ্রেণীর অন্তত দুটি গল্প পাওয়া যায়, কাবুলিওয়ালা এবং দুর্বুদ্ধি। চার বছরের কন্যা মিনি এবং তাহার অদৃশ্য সঙ্গিনী রহমৎ কন্যা মিনির পিতার মনে একটি অননুভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। কলিকাতার ধনী শিক্ষিত নাগরিক ও অশিক্ষিত নরঘাতী কাবুলিওয়ালার মধ্যে ভেদ ঘুচিয়া গিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে 'সেও পিতা, আমিও পিতা।' দুর্বুদ্ধি গল্পের নায়ক ছিল পাড়াগাঁয়ের নেটিভ ডাক্তার এবং দারোগার ঘনিষ্ঠ সহায় ও বন্ধু। ইহাতেই তাহার জীবনীর একটা আভাস পাওয়া উচিত। তাহার বারো তেরো বছরের কন্যা শশী সদ্য কন্যাশোকগ্রস্ত ডাক্তারের প্রসাদপ্রার্থী বৃদ্ধ হরিনাথের অবস্থা দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল?"

কন্যার এই প্রশ্নটিই তাহার পিতার দুর্বুদ্ধির কারণ, যাহাতে তাহাকে দারোগার বন্ধুত্ব ও গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য করিল।

মিনি, শশী, হাসি ও রঘুর দুহিতা কেহই জানে না তাহাদের আচরণ ও বাক্য কি প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটাইয়া দিতেছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের এমন করিয়া মনুষ্যত্বের বাণীবাহক করিলেন কেন? হয়তো তাঁহার বিশ্বাস এই যে, জগৎ পারাবারের তীরে যে শিশুরা খেলা করে, জগৎ রহস্যকে তাহারা খেলার নুড়ির মতোই সংগ্রহ করে; এখন এই রকম দুই একটি নুড়ি যদি তাহারা সংসারের অভ্যস্ত জড়তার প্রতি লীলাচ্ছলে নিক্ষেপ করিয়া বসে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমার এই বক্তব্য কতখানি সত্য জানি না, তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া রাখিতেছি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার বিখ্যাত Ode to Intimation of Immortality কবিতার যে তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহার সংগে রবীন্দ্রনাথের "জগৎ পারাবারের তীরে" ক্রীড়মান

৭০ রজক-কন্যার কথায় লালাবাবুর সংসার ত্যাগ—ইহারই যেন বাস্তব দৃষ্টান্তস্থল।

শিশুর এই তত্ত্বের কতখানি মিল তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই শিশুতত্ত্বের সূত্রে বাহুল্য হইলেও মনে করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, শিশু ও বালক বালকবালিকার জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল ও সমবেদনা অসীম। স্বভাবতই গল্প-গুচ্ছের অনেকগুলি গল্প বালকজীবন সম্পর্কিত।৭১ এইসব গল্পের বালক নায়কগণ বিচিত্র প্রকৃতির। ছুটি গল্পের ফটিক আপন পরিবেশ হইতে ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া মারা গেল, আর অতিথি গল্পের তারাপদ নদীস্রোতে ভাসমান উদ্ভিদ, পাছে কোন বিশিষ্ট স্থান তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে তাই বিবাহের পূর্বদিন সে গৃহত্যাগ করিল।

ফটিকও একশ্রেণীর উদ্ভিদ এবং অধিকাংশ উদ্ভিদের মতোই পরিবেশচ্যুত হওয়াতে নিষ্ফল হইয়া মারা গেল। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ আবশ্যক। শিশুর অনুকূল পরিবেশ লাভই তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ, তাহার সদ্ভাব ও অভাব শিশুর পক্ষে জীবনমরণের কারণ হইতে পারে। তাঁহার শিক্ষা তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া ছুটি গল্পটি পড়িলে গল্পটি ও শিক্ষাতত্ত্ব দুইই পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

মাস্টারমশাই ও ভাইফোঁটা গল্প দুটির নায়ক বেণুগোপাল বা সুবোধ নয় সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রভাবেই গল্প দুটি গতিপ্রবণ এবং গল্পের নায়ক দুজনের মন সঞ্চালিত হইয়াছে। শেষ জীবনে লিখিত বলাই ও চিত্রকর গল্প দুটি প্রমাণ করে যে বালক জীবন সম্বন্ধে কবির কৌতূহল সমান অক্ষুণ্ণ ছিল, হয়তো বা বাড়িয়াই থাকিবে। ৭২

বালিকা বধূর দুঃখ আমাদের সমাজে একটি লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনা। প্রথম শ্বশুরকুলে গিয়া বালিকা বধূকে যে দুঃখ ও গ্লানি সহ্য করিতে হয়, প্রাচীন ও নব্য বাংলা সাহিত্য তাহার চাপা ক্রন্দনে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পেও তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। কবি-লিখিত প্রথম ছোট গল্পটি বালিকা বধূ নিরুপমার অশ্রুজলে করুণ। তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে বিবাহের পণ বাকি থাকাতে। এমন অবস্থায় সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে, অবহেলায় ও অ-চিকিৎসায় শ্বশুরকুল ত্যাগের একমাত্র পথে সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তার পরে 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।'

খাতা গল্পটিতে বালিকা বধূ উমার অবস্থাও সুসহ নয়, তবে নিরুপমার পরিণাম তাহার ঘটে নাই, তাহার হইয়া তাহার রচনাপূর্ণ খাতাখানি অনেক গ্লানি ও কটূক্তি সহ্য করিয়াছে।

সমাপ্তি ও শেষের রাত্রির মৃন্ময়ী ও মণিও বালিকা বধূ। বালিকা বধূর কাছে শ্বশুরকুল যে অসহ্য বোধ হয়, তাহার কারণ, যে শক্তির বলে সমস্তই সহ্য করা যায়, সেই প্রেম জাগ্রত হইবার আগেই কন্যার বিবাহ হয়। মৃন্ময়ী ও মণির দুঃখ অজাগ্রত প্রেমের দুঃখ। মৃন্ময়ী শ্বশুর-কুলে খুব বেশি অনাদর পায় নাই, মণি তো রীতিমতো আদরেই ছিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে তখনো প্রেমের জাগরণ না ঘটায় সমস্তই তাহাদের কাছে বিরস ও অর্থহীন মনে হইয়াছিল। মৃন্ময়ীর প্রেমের জাগরণ গল্পের সীমার মধ্যেই ঘটিয়াছে, কিন্তু মণির প্রেমের অরুণোদয় গল্পের দিগন্তের পরপারে।৭৩

হৈমন্তী ও অপরিচিতা গল্পের হৈমন্তী ও কল্যাণী বয়সে ঠিক বালিকা না হইলেও বালিকা বধূর দুঃখ ও দুঃখের সম্ভাবনা হইতে মুক্তি পায় নাই। বালিকা বধূর দুঃখের একটি প্রধান কারণ, স্বামীর অসহায় ক্লৈব্য। আমাদের সমাজের ছেলেরা অন্য ক্ষেত্রে যেমনি হোক, বিবাহের বেলায় রামের মতো সুপুত্র। তাহারা অসহায়ভাবে বধূর অপমান ও

---

৭১ গিন্নি, ছুটি, আপদ, অতিথি, মাস্টার মশায়, ভাইফোঁটা, বলাই, চিত্রকর প্রভৃতি।

৭২ শেষ জীবনে লিখিত ছড়া, ছেলে-বেলা, গল্পস্বল্প, সে প্রভৃতি পুস্তক তাহাই সূচনা করে।

৭৩ শেষের রাত্রি লিখিবার সময়ে আমাদের সমাজে মেয়ের বিবাহ-বয়স কিছু বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সময়ে লিখিত রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নারীর তুলনায় মণির বয়স কম বলিয়া মনে হয়।

অনাদর দেখে এবং অঙ্গুলিটি মাত্র উত্তোলন করে না। ইহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ধিক্কার। হৈমন্তীর স্বামী নিষ্ফল আক্রোশে নিজের প্রতি বলিয়াছে—'যদি লোকধর্মের কাছে সত্য-ধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা, তাহা কী করিতে আছে।' বংশ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিলে ব্যক্তিকে বিসর্জন দিবার শিক্ষাই পুরুষের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের মধুর ও প্রেমময় চিত্র বড় চোখে পড়ে না, যেখানে আছে পাত্রাপাত্রীর সেখানে গৌণ ভূমিকা। ইহার একটি কারণ, অনেক সময়ে দম্পতির জীবনে নানাবিধ জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িয়া দাম্পত্য সম্বন্ধকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এমন কয়েকটি ছোট গল্প পাই, যাহাতে দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য কোন আঘাতের দ্বারা ক্ষুন্ন হয় নাই। তারাপ্রসন্নের কীর্তি এমনি একটা গল্প। স্বামীর লেখক জীবনের ব্যর্থতা ভগ্নহৃদয় দাক্ষায়ণীর মৃত্যুর একটি কারণ হইলেও স্বামীর প্রতি তাহার বিশ্বাস ও প্রেম টলে নাই। স্বর্ণ-মৃগ গল্পের বৈদ্যনাথের স্ত্রীর মতো তারা-প্রসন্নও স্বামীকে স্বর্ণমৃগ শিকারে পাঠাইয়াছিল সত্য! আর সে কি স্বর্ণ-মৃগ! সব চেয়ে অনিশ্চিত ও চঞ্চল পুস্তক রচনা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থরূপ স্বর্ণমৃগ! বৈদ্যনাথ ও তারাপ্রসন্ন দুজনেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, অথচ অভ্যর্থনায় কী প্রভেদ!

দাম্পত্য প্রেমের আর দুটি গল্প প্রতিহিংসা ও চোরাইধন। গল্প দুটিতে দম্পতির সংলাপ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সঙ্কোচ বোধ হয়, মনে হয়, আর কান পাতিয়া শোনা উচিত হইবে না। এমন প্রেমমধুর, পরস্পরনির্ভর, দম্পতিচিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যে বিরল।

এই সূত্রে আর একটি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। সে-টাও দম্পতি-সম্পর্কিত কিন্তু কত ভিন্ন! হিন্দু সমাজে পুরুষের এক পত্নী বর্তমানে অনায়াসে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ এক জটিল সমস্যা। আইনের শাসন ও সামাজিক অনুশাসন এখনো ইহার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারে নাই। এখন বহু বিবাহ আর বড় ঘটে না সত্য, কিন্তু সে ছিদ্র পথটা আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয় নাই। সাহিত্যের কাজ সমস্যার সমাধান নয়, সমস্যার চিত্রণ। প্রাচীন কালে বহু বিবাহ সমস্যা ছিল না, স্বীকৃত ছিল, নব্যকালের কাছেই তাহা সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। নব্য বাঙলা সাহিত্যের অনেক লেখক এই সমস্যাটিকে নানা দিক হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্র সাহিত্যও তাহার ব্যতিক্রম নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি-পড়া নব্য মন

প্রাচীন সমাজের চিত্র আঁকিবার সময়ে অনায়াসে এক পুরুষের একাধিক পত্নীর ছবি আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু হাল আমলে আসিয়া ঘটনাচক্রে পুরুষের দুই বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেও তাহাদের একত্র ঘর করিতে দেন নাই। ইহা কেবল ইংরাজি-পড়া মনের ধারণামাত্র নয়। নারী স্বভাবতই এক ঘরে। এক রাজ্যে দুই রাজা সম্ভব হইলেও হইতে পারে কিন্তু এক গৃহে দুই পত্নী! অসম্ভব। মধ্য-বর্তিনী ও নিশীথে গল্প দুটি এই সমস্যার রবীন্দ্রভাষ্য। দ্বিতীয় বিবাহের পরে দক্ষিণাবাবু ও নিবারণের জীবন বিষময় হইয়া পড়িয়াছিল। নিবারণের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শৈলবালা মরিয়াও মরে নাই, অদৃশ্য খড়্গের মতো স্বামী-স্ত্রীকে ভিন্ন করিয়া মধ্যবর্তিনী হইয়া রহিয়াছে। আর প্রথমপক্ষের মৃত স্ত্রীর স্মৃতি দক্ষিণা বাবুকে উন্মাদ না করা অবধি ক্ষান্ত হয় নাই।৭৪

আর কয়েকটি গল্প আছে যাহাদের বিষয় ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্য।৭৫ আমাদের সমাজে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্য অতিশয় প্রবল, তাহার একটি কারণ একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, আর একটি কারণ পারিবারিক বন্ধনের ঘনিষ্ঠতা। অবিভাজ্য সম্পত্তি এই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়াছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া গেলে বন্ধনেও শিথিলতা ঘটে, কিন্তু ঐরূপ শিথিলতা ঘটিবার আগে ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধের উপরে একটা কঠিন টান দিয়া যায়, হৃদয় ফাটিয়া রক্ত পড়ে। ব্যবধান গল্পটি এইরূপ রক্তপাতের কাহিনী। নাবালক ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দিদি গল্পের নায়িকা দিদি আত্মদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক সময়ে আবার সম্পত্তিই ভ্রাতৃবন্ধন শিথিলতার কারণ ঘটায়, দান প্রতিদান গল্পে ছোট ভাই কৌশলে ইহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে—তাহার লোভ সম্পত্তির প্রতি নয়, দাদার হৃদয়ের প্রতি।

আমাদের সমাজ সংকীর্ণ, জটিল ও ব্যাপক পারিবারিক বন্ধনবহুল একটি বিচিত্র সংস্থা। এখানে দূর ও নিকট, জ্ঞাতি, আত্মীয় এবং নিকট-আত্মীয় বহু নর-নারীর বিচিত্র সমাবেশ। ইহাতে যেমন মাধুর্য আছে তেমনি সংকটও আছে, আর সবশুদ্ধ মিলিয়া একটি বৈচিত্র্য আছে। কোন বাঙালী লেখকের পক্ষেই ইহাকে অবহেলা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কজালকে অস্বীকার করেন নাই, বরঞ্চ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিচিত্র গল্পের সৃষ্টি

---

৭৪ এই প্রসঙ্গে দুই বোন ও মালঞ্চ আলোচনার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সমস্যার সঙ্গে 'দুই নারী' তত্ত্ব জড়িত বলিয়া মনে হয়। নারীর কাছে পুরুষে যুগপৎ মাতৃ-স্বাদ ও প্রিয়াস্বাদ প্রত্যাশা করে। কোন একটির পূরণ না হইলে, আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থায় প্রিয়াস্বাদ পূরণ হইবার আশা অল্প, দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা পুরুষ অভাব পূরণ করিয়া লইতে উদ্যত হয়। আমার বিশ্বাস, সমস্ত সমস্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। দক্ষিণাবাবু, নিবারণ, শশাঙ্ক ও আদিত্য সকলেরই জীবনে প্রিয়া-স্বাদ অনুভূতির স্থান শূন্য ছিল—সেই শূন্যতা পূর্ণ করিবার ইচ্ছাতেই নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিবারণ ও দক্ষিণাবাবুর দ্বিতীয়-পক্ষ গ্রহণ এবং আদিত্য ও শশাঙ্কের সেই উদ্যম। নীরজার মৃত্যুর পরে এবং অল্প পরে আদিত্য যে সরলাকে বিবাহ করিয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহমাত্র নাই। আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। আদিত্যর স্ত্রী ব্যতীত আর তিনজনের পত্নীই স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে প্ররোচিত করিয়া-ছিল। এই আত্মঘাতী বুদ্ধির কারণ কি? রবীন্দ্রনাথ একটি কারণ দেখাইয়াছেন, তিন-জনেই রুগ্ন ও রোগগ্রস্ত ছিল। ইহাই কি যথেষ্ট কারণ? ইহা স্বামীর প্রেমের একপ্রকার পরীক্ষা নয়তো? যাই হোক, বিষয়টি নারী মনস্তত্ত্ববিশারদগণের প্রণিধানযোগ্য।

৭৫ ব্যবধান, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, দিদি, দান-প্রতিদান, পণরক্ষা।

করিয়াছেন। দেবর ও ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ (নষ্টনীড়), শ্যালী ও ভগ্নীপতির সম্বন্ধ (রাজটিকা), জা-গণের সম্বন্ধ (জীবিত ও মৃত), পিতামহ ও নাৎনীর সম্পর্ক (ঠাকুরদা), শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্ক (প্রায়শ্চিত্ত) এবং বৈবাহিকদের সম্বন্ধ (দেনা-পাওনা, হৈমন্তী, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ) প্রভৃতি যাবতীয় সম্পর্ককে যথাযথভাবে কখনো মধুর স্বাদে, কখনো তিক্ত স্বাদে বাস্তবানুগরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সমস্ত গল্পই যে সমাজ রসোত্তীর্ণ তাহা নয়, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার দৃষ্টির সমগ্রতা এবং তথ্যানুগত্য।

এই সমাজে ভৃত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। সে বৃত্তিভুক্ মাত্র নয়, অনেক সময়েই হৃদয়ের স্নেহবৃত্তিরও অংশভুক্। সেই জন্যই এখানে পুরাতন ভৃত্য 'কেষ্টা' অনায়াসে প্রভুর জন্য প্রাণদান করিতে পারে। কিন্তু খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্পের রাইচরণ তাহার চেয়েও বেশি করিয়াছে। প্রাণ নয়, প্রাণাধিক পুত্রকে প্রভুর কাছে সমর্পণ করিয়া সে প্রভু-ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য গ্রাম্য পোস্ট মাস্টার বিদায় হইয়া গেলে (পোস্ট মাস্টার) রতনের কাছে সংসার এমন শূন্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

আমাদের সামাজিক প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপরে অনেকগুলি গল্পের প্রতিষ্ঠা। এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে গল্পগুলির পুরা রস আদায় করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ইহাও সত্য যে এই শ্রেণীর গল্পের ক্ষেত্র ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। গল্পগুচ্ছ যখন লিখিত হইতেছিল তখনো আমাদের সমাজে পল্লীর যে গুরুত্ব ছিল এখন তাহা কমিয়া আসিয়াছে। তখনো মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান আশ্রয় ছিল গ্রাম ও পৈতৃক জোত জমা ও বিষয়-সম্পত্তি। ইতিমধ্যে ভারসাম্য বিচলিত হইয়া মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহৎ এক অংশ চাকুরি বা বেকার জীবন অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধে একথা সর্বথা প্রযোজ্য না হইলেও গল্পগুচ্ছের জীবন পরিধি বঙ্গের যে অংশাবলম্বী তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সত্য, সেই সমাজের সুবৃহৎ এক অংশ আজ উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া গল্পগুলির ক্ষেত্রকে আরও সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। অতঃপর ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা লোপ পাইলে দানপ্রতিদানের মতো বা প্রতিহিংসার মতো গল্প লিখিবার আর হেতু থাকিবে না। গল্পগুচ্ছে দুটি বড় জমিদার বংশের কাহিনী আছে; কিন্তু দুটিরই ভগ্নদশা; জমিদারি প্রথা সমূলে লোপ পাইলে তখন অনেক ঘরেই নয়ানজোড় ও শানিয়াড়ির বাবুদের আবির্ভাব হইবে এবং এক পুরুষ পরে ঐ শ্রেণীর গল্প লিখিবার আর কারণ থাকিবে না।৭৬

এ সমস্তই সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গল্পগুচ্ছের সমগ্রতাকে আধুনিক পল্লী-বঙ্গের পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অনেক রচনায় পল্লীবঙ্গের চিত্র আছে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে, অনেকের লিখিত ধর্মমঙ্গলে ও মনসামঙ্গলে আছে, পূর্ববঙ্গ গীতিকাসমূহে আছে, গল্পগুচ্ছেও তেমনি পল্লীবঙ্গের আর একটি চিত্র। মধ্যযুগের সেই সব রচনার সঙ্গে অন্য বিষয়ে বা অন্য কারণে গল্পগুচ্ছের তুলনা করা উচিত হইবে না, পরিবেশ পরিবর্তিত, দৃষ্টি পরিবর্তিত, প্রাচীন ও নব্য লেখকের প্রতিভাতেও বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাচীন ও নব্য লেখক একই কাজ করিয়াছেন পল্লীবঙ্গের পুরাণ কথা লিখিয়াছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বাংলার আজ সম্যক্ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিছুকাল পরে গল্পগুচ্ছের বাংলা দেশেরও সম্যক পরিবর্তন ঘটিবে, তখন পাঠকে, আজ যেমন কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দর্পণে সেদিনকার বাংলাদেশকে দেখে, তখন গল্পগুচ্ছের নখদর্পণে পল্লীবঙ্গের একটি লুপ্তপ্রায় যুগকে দর্শন করিতে পারিবে। তখন গল্পগুচ্ছের সম্যক্ মূল্য লোকে বুঝিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে, যে পুরাণ কথা কেন কখনো পুরানো হয় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহাতে গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পকেই স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সারিয়া লই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ অতি প্রাকৃত গল্প একটিও লিখিয়াছেন কি না আমার সন্দেহ আছে। অতি-প্রাকৃত বলিয়া কথিত তাঁহার অধিকাংশ গল্পই রসোত্তীর্ণ কিন্তু সেগুলিতে যথার্থ অতি প্রাকৃতের রস আছে কি?৭৭

অতিপ্রাকৃত একটি বিশেষ রস। তাহাতে রোমাঞ্চ হইবে, গা শির শির করিয়া উঠিবে, পিছনে তাকাইতে ভয় হইবে অথচ সে লোভ সম্বরণ করাও সহজ হইবে না, আর গল্প পড়া শেষ

---

৭৬ ঠাকুরদা ও রাসমণির ছেলে॥ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অবশ্য লিখিত হইতে পারিবে।

৭৭ কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, মাস্টার মশাই॥

অনেকে আবার জীবিত ও মৃত এবং নিশীথে গল্পকেও অতি প্রাকৃত বলিয়া থাকেন। আলোচনা হইতে এ দুটিকে বাদ দিতে পারি।

হইয়া গেলে অন্ধকার ঘরে একাকী প্রবেশ করিতে দ্বিধাবোধ হইবে। আরও অনেক লক্ষণ থাকিতে পারে কিন্তু এইগুলিই অতিপ্রাকৃত গল্পের স্থায়ী লক্ষণ। কবির অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিতে এই সব লক্ষণ কি পরিমাণ আছে? কঙ্কালের প্রেতাত্মা এমন একটি মোহিনী কাহিনীর বর্ণনা করিয়াছে, তাহার মনে জীবনের সুখদুঃখের প্রভাব এখনো এমন প্রবল যে জীবনোত্তর রহস্যের আভাস সে বড় দিতে পারে না; গল্পটি রসোত্তীর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু সে রসকে অতিপ্রাকৃত মনে করি না।

ক্ষুধিত পাষাণ বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিন্তু তাহা কি সত্যই অতিপ্রাকৃত? মোহন তুলির সাহায্যে কবি আমাদের মনকে এমন এক কল্পনার স্বর্গে উত্তোলন করেন যেখানে সাংসারিক সুখ দুঃখ নাই, এবং সেই সঙ্গে যে গা ছমছম ভাব রক্তমাংসকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করে তাহাও নাই। গল্পটি পড়িবার সময়ে পাঠকে অনেক পরিমাণে অতীন্দ্রিয় সত্তা লাভ করে, পাঠকেই যেন অতিপ্রাকৃত হইয়া পড়ে, অতিপ্রাকৃতের আবার অতিপ্রাকৃতের ভয় কিসের? বরঞ্চ তাহার ভয় প্রাকৃতের, কখন এ মোহ ভাঙিয়া গিয়া প্রাকৃত জগতে ফিরিয়া যাই: এইরূপ একটা সূক্ষ্ম উদ্বেগ যেন তাহাকে পীড়িত করিতে থাকে। চিনি হইয়া গেলে আর চিনির স্বাদ পাওয়া যায় না। এই জন্যেই গল্পটিকে আমার অতিপ্রাকৃত বোধ হয় না।

মণিহারা গল্পে অলঙ্কার বিভূষিতা কঙ্কালের শিঞ্জিত পদধ্বনি মনে রহস্যাতুর ভাব জাগায় সত্য, কিন্তু গল্পের উপসংহার কি সেই ভাবটিকে ব্যঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দেয় না? গল্পের মধ্যে ঐ ঘটনাটিকে অতিপ্রাকৃত রসসম্পন্ন বলা চলিলেও সমস্ত গল্পটি মানুষের অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে বিশ্বাসকেই যেন অস্বীকার করিতেছে!

মাষ্টারমশাই গল্পের প্রথমাংশ যথার্থ অতিপ্রাকৃত রসের উদাহরণ স্থল। অন্ধকার রাত্রে, নির্জন মাঠের মধ্যে, বন্ধ গাড়ীর অভ্যন্তরে কায়াহীনের সেই দুটি উজ্জ্বল চক্ষু, পাশের জায়গাটির বাষ্পময় কায়াতে ভরিয়া ওঠা, কয়েক বৎসর আগে হরলালকে বহন করিয়া গাড়ীখানি মাঠের মধ্যে যে পথে আবর্তিত হইয়াছিল সেই পথ, সেই গাড়ী সেই রাত্রি সত্য সত্যই রোমাঞ্চ ঘটাইয়া দেয়, অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় সেই দুটি চক্ষু আমাকেও দেখিতেছে কিনা, পাশের জায়গাটি সত্যই ভরিয়া ওঠে নাই তো! ইহাই যথার্থ অতিপ্রাকৃতের লক্ষণ! কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাই মনে করি যে রবীন্দ্রনাথ আটখানা মাত্র অতিপ্রাকৃত গল্প লিখিয়াছেন, মণিহারার কঙ্কালের পদধ্বনিকে গণনা করিলে সওয়া একখানা। কিন্তু গল্প চারটি গল্প হিসাবে অতিপ্রাকৃত রসে সমৃদ্ধ হোক বা না হোক শিল্প হিসাবে যে রসোত্তীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই।
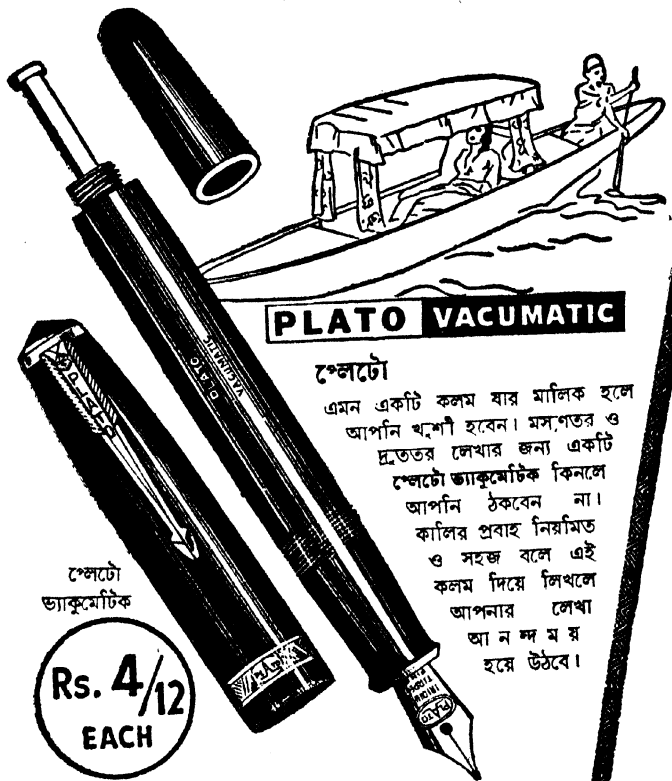
জীবিত ও মৃত এবং মহামায়া দুটি আশ্চর্যরকমের গল্প। প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিষয় গল্প দুটির মধ্যে কাহিনী বিন্যাসের চমৎকারিত্ব আছে, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সাধারণত যেমন অকিঞ্চিৎকর ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে, এগুলি তেমন নহে। কাহিনী বিন্যাস কৌশলকে রবীন্দ্রনাথ কখনো তেমনভাবে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু যখনি করিয়াছেন অপ্রত্যাশিত নিপুণতা দেখাইয়াছেন। জীবিত ও মৃত গল্পটির মূলে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। ৭৮ মহামায়া গল্পের ঘটনাটি সমসাময়িক নয়, সতীদাহ নিবারণের পূর্ববর্তী সময়ের। যদিচ গল্প দুটিতেই প্লটের বা কাহিনী বিন্যাসের অভিনবত্ব বর্তমান, তবু রস-কেন্দ্র কাহিনী নয়, কাদম্বিনী ও মহামায়ার বেদনা। সংসারের হাতে অবহেলা ও পীড়ন ছাড়া তাহারা আর কিছুই পায় নাই, তবু শ্মশান হইতে মুক্তি পাইবামাত্রই তাহারা আবার সেই সংসারেই ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো বৃক্ষে আর তাহাদের স্থান হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে, সে মরে নাই, আর মহামায়া সংসার ছাড়িয়া আবার কোন্ নিরুদ্দিষ্টতার মধ্যে প্রস্থান করিল। মানুষ শ্মশানস্থ হইলে তার পরে ঘরে ফিরিয়া আসিলেও রহস্যময় হইয়া বিরাজ করে, সংসারী মানুষ সে রহস্য সহ্য করিতে পারে না, কাজেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, এমন কি সর্বজয়ী প্রেমও এখানে শক্তিহীন। মনস্বিনী মহামায়া সংসার ত্যাগ করিয়া ঠিক পথই অবলম্বন করিয়াছিল, কারণ তাহার রূপদগ্ধ মুখ দেখিবার পরে রাজীব আর তাহাকে কখনোই আগের চোখে দেখিতে সক্ষম হইত না। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দুঃখ দিবার ও পাইবার চেয়ে সংসারবাস ত্যাগ করাই সুবিবেচনার কাজ ইহাই ছিল মহামায়ার ধারণা। রাজীবকে দীর্ঘতর দুঃখ ও আত্মগ্লানি হইতে রক্ষা করিবার জন্যই মহামায়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল, এখানে তাহার বিরাগের মূলেও অনুরাগ। রাজীব না হয় বাঁচিল। কিন্তু মহামায়া! তাহার চাপা দীর্ঘনিশ্বাস গল্পটির মধ্যে সমীরিত না হইলেও পাঠকের বুকের মধ্যে অনুভূত হইতে থাকে।

দৃষ্টিদান আর একটি আশ্চর্য করুণ গল্প। কুমুদিনী অন্ধ হইবার পরে স্বামীর সেবা ও সাহচর্য যখন আরও বেশি করিয়া পাইতে লাগিল, সেই কৃতজ্ঞতার বশে স্বামীকে আর একটি বিবাহ করিতে সে অনুরোধ করিল। কিন্তু শেষে স্বামী যখন বিবাহ করিতে যাত্রা করিতেছে তখন কুমুদিনী ভ্রমরের মতোই, প্রায় অনুরূপ ভাষাতেই বলিয়া উঠিল—"যদি আমি সতী হই তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনমতেই তোমার ধর্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এ বিষয়ে কৃষ্ণকান্তের উইল লিখিত হইবার পরে দেশের ধারণা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষ সুখী হইল ইহা লিখিতে সংস্কার পীড়িত বাঙালী লেখকের কলম কাঁপে, আর দ্বিতীয়বার বিবাহিত নারীর কথা এখনো লেখকে প্রবলভাবে, সম্পূর্ণভাবে কল্পনা করিতেই দ্বিধা বোধ করে। আগের দুটি গল্পের ন্যায় এখানেও দেখি কুমুদিনী এবং তাহার স্বামী ও সংসারের মধ্যে রহস্যময়তা একটি সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালের সৃষ্টি করিয়াছে। "সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।"

প্রতিহিংসা গল্পের নায়িকা ইন্দ্রাণী আর যাহাই হোক্, তেমন সামান্যা রমণী নয়, আবার সে দেবীও নয়। বাহিরের লোকের কাছে সে দেবতার ন্যায় দূরবর্তিনী, স্বামীর কাছে সামান্যা রমণী; ইন্দ্রাণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবত্ব ও নারীত্বের মধ্যে সে একটি ভারসাম্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই ক্ষমতার মূলে তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-প্রভাব। বস্তুত সে জয়কালী ও রাসমণির সগোত্র। ইন্দ্রাণীর স্বামীসান্নিধ্য-মিলন লীলায় ঐ দুটি নারী জীবনের অনঙ্কিত একটি চিত্র যেন দেখিতে পাই।

শাস্তি গল্পটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রবীন্দ্রনাথের কলম সামাজিক মর্যাদার মানে নিম্নতম একটি পরিবারের সুখ-দুঃখের একটা কাহিনীকে স্পর্শ করিয়াছে। গল্পটির রসোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে সকলে একমত না হইতেও পারেন কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে ইহার উল্লেখ না করিয়া উপায় নাই। ঠিক এই জাতীয় ঘটনা রবীন্দ্রনাথের স্বচক্ষে দেখিবার নয়, লোকমুখে শুনিয়া থাকিবেন, এখন সেই পরোক্ষ জনশ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া দিনমজুর রুই পরিবারের নরনারীর এমন সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কণে যে কতখানি শক্তির প্রয়োজন ভাবিলে বিস্ময়বোধ হয়। যাহারা প্রচণ্ডভাবে বাস্তব, ভাবের লঘু বাষ্পটুকুও যাহাদের মধ্যে বিরল এমন চরিত্র রবীন্দ্রনাথ যখনই আঁকিয়াছেন অসামান্যতা দেখাইয়াছেন, দৃষ্টান্ত পানুবাবু, কৈলাশ, হরমোহিনী, নরেন মিটার প্রভৃতি; গল্পগুচ্ছেও এরূপ চরিত্র যথেষ্ট আছে; রুই পরিবার তাহাদের অন্যতম।

(ক্রমশঃ)

---

৭৮ রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৯

নব নব সূর্যে

জীবনানন্দ দাশ

মানুষ সার্থক হয় মাঝে মাঝে, তবু
কত তার নিষ্ফলতারাশি।
এখনও উজ্জ্বলতর ব'লে মনে হয়
মৃত ম্যামথের পাশাপাশি
মানবকে;—তবুও নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তির জীবন
চারিদিকে ক্ষয় হয়ে আসে;
সকালের সম্ভাবনা মানুষকে সচকিত করে;
আলো ঠিক্‌রালে তবু চোখে এসে পড়ে

শেষ শূন্য,—কিছু নেই, বিকেল নিভছে।
যারা আশা করেছিল, কিংবা যারা আশা
করে নাই, যারা প্রাণে ভালোবাসবার
জ্ঞানী পরিভাষা
আয়ত্ত না ক'রে তবু প্রেম
চেয়েছিল প্রিয় নরনারীদের কাছে,
যারা শুধু বাঁচবার পথ চেয়েছিল,—
শিশিরে নিঃশব্দ হয়ে আছে।

সাধনায় হয়তো বা সত্য শুভ লাভ
হতে পারে—এরা কেউ কেউ
সেই আভা দেখেছিল, তবু
অন্ধ অন্নসমস্যার ঢেউ
এসে সব মুছে ফেলে গেছে;

ঘর বাড়ি সাঁকো মাঠ পথ
একদিন আধদিন ভাঙাগড়া হতে না হতেই
চিহ্ন নেই—সেসব মানুষ কেউ নেই।
জীবনের ঢের কাজ হ'য়ে গেলে তবু
ভাঙনের নদী এসে সমাজের দুই পার ক্ষয়
ক'রে তার অন্ধকার সমুদ্রের দিকে
ভেসে চ'লে গেছে মনে হয়।

তবু গঠনের কাজে ফিরে এসে মানুষের মন
আগেকার গ্লানিমার যে নিষ্ফলন
বার বার শেষ ক'রে দিতে চায় আর
সূচনায় আলো, তবু ভিতরে গভীর অন্ধকার?

অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হয়ে
রাত্রিদিন কাজ ক'রে চলেছে লোকের ইতিহাস;
মানুষ সমাজ দেশ ধ্বংস ক'রে তবু
জ্ঞান শান্তি বাস্তবতা প্রেমের আভাস

মাঝে মাঝে পাওয়া যায় যেন তার বিদ্যুতের কাছে;
যদিও আঁধার বড়—ইতিহাসে শোকাবহ
অন্ধ বেগ আছে;
সংকল্প প্রেরণা মূল্য উদাসীন শক্তির মতন
ভেঙে নব নব সূর্যে আলোকিত ক'রে তোলে মন।

চক্রদত্ত

'কেশ নারীর অর্ধেক বেশ।' সেইজন্য মেয়েরা তাদের চুল পরিপাটি রাখতে আর ঘন কালো কেশ চিকণতর করে তুলতে সদাই সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল চুল ওঠা রোগটা ব্যাপকভাবেই দেখা যাচ্ছে। অবশ্য চুলের বাহার শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় ছেলেদের ক্ষেত্রেও দরকার হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই চুল ওঠা নিবারণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। চুল ওঠার কারণ হিসাবে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও চেষ্টা করছেন। মানুষের নখের ওপর যেমন একটি পাতলা আস্তরণ থাকে চুলেতেও সেই রকম প্রোটীন জাতীয় পদার্থের একটা আস্তরণ থাকে এটাকে কেরাটীন্ বলে। সতের দিনের মধ্যে একগাছি চুল এক সেণ্টিমিটার মাত্র বাড়ে। এই বৃদ্ধিটা ডগার দিকে হয় গোড়ার দিকে বাড়ে না তবে ডগা কেটে দিলেও চুল বাড়তে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, চুল একটা জীবন্ত পদার্থ। একটি মানুষের মাথায় কয়েক লক্ষ চুল থাকে আর এই লক্ষ লক্ষ চুল নিঃশেষ হয়ে যায় কী করে তাই হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার বিষয়। আমেরিকায় চুল সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

*

কত নতুন নতুন মোটর গাড়ী দিনে দিনে বার হচ্ছে, তাদের ওপরের চেহারা আর চাকচিক্যও যেমন নতুনতর হচ্ছে ভেতরেও পরিবর্তন কম হচ্ছে না। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হচ্ছে কোথাও বা পুরান যন্ত্রই নতুন ছাঁচে ঢালা হচ্ছে। মোটর গাড়ীর ওপরের চেহারা যতই সুন্দরতর হচ্ছে যন্ত্রপাতির জটিলতা ততই বাড়ছে। মোটর গাড়ী ব্যাটারীর সাহায্যে চলে নতুন কথা নয়। আগের দিনে ঐ ব্যাটারীটা চালকের পায়ের কাছে বসান থাকতো সুতরাং ব্যাটারীর অবস্থা লক্ষ্য করতে চালকের কোনও কষ্ট ছিল না। আজকালকার ঝক্ঝকে চক্চকে গাড়ীর মধ্যে অমন একটা বিশ্রী জিনিস বসান থাকে না ওটাকে বনেটের নীচে ঢেকে ঢুকে রাখা থাকে। ফলে ব্যাটারী খারাপ হতে থাকলে চালকেরা সহজে বুঝতে পারে না আর বুঝতে হলে গাড়ী থেকে নেমে বনেট খুলে দেখ্তে হয়। এটা খুবই অসুবিধার
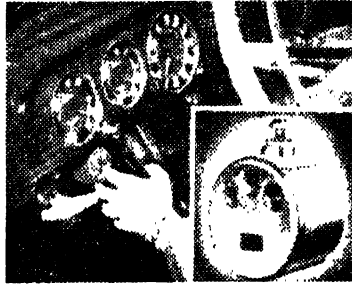
চালক "ব্যাটারী চেকার'টীর বোতাম টিপছেন। কোণে "ব্যাটারী চেকার'টী বর্ধিত আকারে দেখা যাচ্ছে।

কথা সন্দেহ নেই। আজকালকার নতুন গাড়ীতে এ অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। চালকের সামনে ড্যাশবোর্ডে ঘড়ির মত একটি নির্দেশক লাগান থাকে আর এতে ব্যাটারীর তিনটি সেলের জন্য তিনটি আলো থাকে। একটি বোতাম টিপলেই আলো জ্বলে এবং ঐ আলোর অবস্থা থেকে চালক ব্যাটারীর অবস্থা সম্যক বুঝতে পারে। এই আলো দিয়ে ব্যাটারীতে জল কতটা আছে, কতখানি চার্জ দিচ্ছে ও সেলের অবস্থা কীরকম সব বুঝতে পারা যায়। একটি মোটরের ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি চালু রাখতে যতখানি বিদ্যুৎ খরচা হয় এই নির্দেশকটি চালাতে তার চেয়ে কম বিদ্যুৎ খরচ হয়।

*

বঁটির গোড়ায় বসে তরকারি কাটতে গিয়ে যখন একটির পর একটি আলু কেটে কেটে দেখা যায় সবই পোকাধরা, তখন বিরক্তির আর শেষ থাকে না। মনে হয়, বাজার থেকে আলু আনা বন্ধ করলেই হয়, কিন্তু নিত্যকার খাদ্যতালিকা থেকে আলু একেবারে বাদ দেওয়াও অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা এই আলুর পোকার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার বহু চেষ্টাই করেছেন। কয়েকজন ফরাসী কৃষিতত্ত্ববিদ্ এক ধরণের নতুন রকম আলু আবিষ্কার করেছেন। এই আলুগুলি, আলুর পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী কলোরাডো পতঙ্গের আক্রমণ থেকে মুক্ত। এঁরা দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চল থেকে এক রকম ছোট ছোট বুনো আলু নিয়ে আসেন। এই আলুগুলো কখনও বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহার করা হয়নি, তবে এঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এ আলুতে কখনও পোকা ধরে না। কৃষিতত্ত্ববিদ্গণ এই আলু আর সাধারণ আলুর সংমিশ্রণে এক রকম নতুন বর্ণসংকর আলু উৎপন্ন করালেন। নবজাত আলুগুলি সাধারণ আলুর তুলনায় আকারে বেশ ছোট হলো, কিন্তু এগুলিও পেরুর আলুর মত 'পোকা ধরার' হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিশেষত, ঐ কলোরাডো পতঙ্গ কখনই এর ধারে-কাছে আসতে পারে না। দুইজন জার্মান বৈজ্ঞানিক এর থেকেই আরও উন্নততর আলু আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। হিডেলবার্গের এই বৈজ্ঞানিকদ্বয় আশা করেন যে, এই পেরুর আলুর সাহায্যে আরও নানারকম বর্ণসংকর আলু উৎপন্ন করাতে থাকলে শেষ পর্যন্ত পেরুর আলুর মত গুণবিশিষ্ট সাধারণ আলুর আকারের আলুও উৎপন্ন করাতে পারবেন।

ভ্রমণ কাহিনী

দক্ষিণ ভারত—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রণীত। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

দক্ষিণ ভারত এখন আর খুব দূরের পথ নয়। রেলপথ, বিশেষত বিমানবর্ত্মের কল্যাণে কন্যাকুমারী এবং কলিকাতা প্রায় 'এ-ঘর ও-ঘর' হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে ভ্রমণকাহিনীও বহু প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দূরত্বের উপর ভ্রমণ-কাহিনীর সাহিত্যিক সাফল্য যেমন নির্ভর করে না, তেমনই আবার ভ্রমণের লম্বা ফিরিস্তি বাঁধিয়াই বই লিখিলেই সার্থক ভ্রমণকাহিনী লেখা হয় না। চোখ থাকিলেই সব জিনিস চোখে পড়ে না, তজ্জন্য মনস্বিতার প্রয়োজন হয়, শ্রদ্ধাবুদ্ধি থাকা দরকার। প্রাচীন কবির একটা কথা এ সম্বন্ধে আমাদের মনে পড়ে। তিনি লিখিয়াছেন, 'দেখিবার কিছু নাই, তথাপি শোভন সেখানে সৌন্দর্য হেরে শুদ্ধ যার মন।" মন শুদ্ধ অর্থাৎ রসোপলব্ধির উপযোগী অনাবিল না হইলে ভ্রমণ-কাহিনীর ছন্দ জমে না। ব্যক্তিত্বের বাড়াবাড়ি এবং যত্রতত্র পাণ্ডিত্যের কসরৎ খাটাইতে গেলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়; বস্তুত ভ্রমণ-কাহিনীতে থাকা দরকার কৌতূহলোদ্দীপক একটা আনন্দের গতিবেগ—অপরের চিত্তকে লেখকের সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া লইবার সামর্থ্য, নিজের দেখাকে অপরের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ এবং জীবন্ত করিয়া তুলিবার উপযোগী অভিব্যক্তির সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ধারা। সার্থক ভ্রমণকাহিনীতে রসবৈচিত্র্যের একটি সুসমঞ্জস এবং সংযত রীতি ফলত পরিস্ফুর্ত হইয়া উঠে এবং দূর পাঠকের কাছে নিকট হয়, যাহা ছিল অজানা, পাঠকের পক্ষে তাহা জানা হইয়া যায়। সার্থক সাহিত্যের মূলে মুখ্যভাবে থাকে যে বস্তু—আত্মভাবের বিস্তার।

আলোচ্য ভ্রমণকাহিনীর লেখক চপলাবাবুর লেখায় রসবৈচিত্র্য এইরূপ সুসমঞ্জসভাবেই আগাগোড়া জমিয়া উঠিয়াছে; ছন্দের কোথায়ও পতন ঘটে নাই। পুস্তকখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করে উঠা যায় না। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের পবিত্র উদার এবং গাম্ভীর্যময় প্রতিবেশে লেখকের অন্তরে রসের যে সমুচ্চয় ঘটিয়াছিল, কন্যা-কুমারীর চরণপ্রান্তে গিয়া তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ একাকী এবং নিঃসঙ্গ অবস্থায় তীর্থদর্শনের সংকল্প লইয়া তিনি বাহির হইয়াছিলেন। এই একাকিত্বের চিন্তা প্রথমত তাঁহাকে পীড়িত করে। কিন্তু সেই উদ্বেগের মধ্যে বড় একটি সহায় তাঁহার মিলিল। প্রেমের ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণা তাঁহার
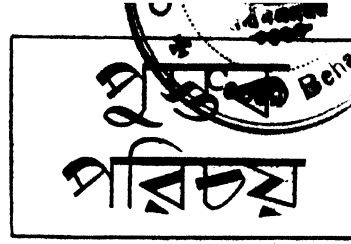
অন্তরে আলোকচ্ছটায় বিকশিত হইল। মহাপ্রভুর নামমন্ত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি চলিলেন। সুন্দরকে তিনি দেখিলেন, তাঁহার লীলারসে নিমগ্ন হইলেন। অনেকটা আবিষ্ট অবস্থার মত পৌঁছিলেন, বামে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং সম্মুখে ভারত মহাসাগর, তিন সমুদ্রের সম্মিলন-ক্ষেত্র, অপূর্ব সে দৃশ্য। লেখক মধুর ভাষায় দক্ষিণ ভারতের বনরাজীনীলা বেলা-ভূমির সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের বিশাল, বিরাট আত্মসত্তার উপলব্ধি তাঁহার লেখনী-কৌশলে চিত্তে উদ্দীপ্ত হয়। এ দেশের মুনি, ঋষি, কবিগণের বাঙ্ময় অনুভূতি মনোময় মূর্তিতে অন্তরে পরিস্ফূর্তি লাভ করে। দাক্ষিণাত্যের প্রতি তীর্থদর্শনে ভারতের আত্মসত্তার এই অখণ্ড চিন্ময় এবং মনোরম স্ফূর্তিই বলা যায় চপলাবাবুর ভ্রমণের বিশেষত্ব। অতীত যুগবাহিনী ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মর্মবাণীকে তিনি ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের প্রাণ কোথায়, তাহার অক্ষয় এবং অব্যয় যে সনাতন ধর্ম—তাহারই বা স্বরূপ কি, তিনি সেই কথাটি সমস্ত অন্তর দিয়া আমাদিগকে ছন্দোময় ভাষায় শুনাইয়াছেন। শুনিলে আরও শুনিতে ইচ্ছা জাগে, এমনই তাহা মধুর। "কিসের ভরসায় আপনি একা একা এইভাবে বাহির হইয়া পড়িতেছেন?" অরবিন্দ আশ্রম ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে এই প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"ভরসা একটা, "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" বলিয়া গীতায় একটা কথা আছে। কথাটা যে সত্য আমি তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি।" সে সাক্ষ্য তিনি দিয়াছেন, তাঁহার লিখিত 'দক্ষিণ ভারতে'ই সে প্রমাণ মিলিবে। ৫১৯।৫৩

যোগ সাধনা

সহজ রাজযোগ সাধন প্রণালী—শ্রীশ্রীমৎ কুমারানন্দ স্বামী কর্তৃক উপদিষ্ট এবং স্বামী আত্মানন্দ তীর্থ, যোগাচার্য আশ্রম, পোঃ ত্রিবেণী, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

রাজযোগ সকলের জন্য নয়—সহজ নয়, পক্ষান্তরে বৈরাগ্যবান্ ত্যাগী সাধকের পক্ষেই এই পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব; পুস্তকখানি পাঠ করিয়া এই সত্যই আমাদের অন্তরে সুদৃঢ় হইল। প্রকৃতপক্ষে সংগুরুর প্রত্যক্ষ কৃপা ব্যতীত পুঁথি পড়িয়া রাজযোগে সিদ্ধি অর্জন করা যায় না। গ্রন্থখানিতে শম, দম, নিয়ম প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ধারণা, ধ্যান, সবীজ সমাধি, নির্বীজ সমাধি, ষট্চক্রভেদ সব কিছুই আলোচিত হইয়াছে, উপদেষ্টার অধ্যাত্মসাধনায় উচ্চস্তরে সমুন্নতির ইহা পরিচায়ক, কিন্তু সাধারণের পক্ষে বাস্তব

জীবনে সেই সাধনা সত্য করিয়া তুলিবার পক্ষে দুরূহতা তদ্দ্বারা হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যুত মহানির্বাণতন্ত্র এবং শঙ্করাচার্যের রচনাবলী, মোহমুদ্গর, বিবেক-চূড়ামণি, বাক্যবৃত্তি, বিচারচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এই আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেগুলি অমূল্য। পুস্তকখানির মর্যাদা সেই দিক হইতে বিশেষভাবে রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সেই সব উপদেশ অনুসরণে চিত্তবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইলে তবেই রাজযোগ সাধনের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। ৫৩৩।৫৩

সর্বোদয় সমাজ

সর্বোদয় ও স্বতন্ত্র লোকশক্তি—আচার্য বিনোবা। অনুবাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডলী, বনানী, কলিকাতা ৩২। মূল্য তিন আনা।

গত মার্চ মাসে চাণ্ডিলে সর্বোদয় কর্মী-সমাজের পঞ্চম অধিবেশনে আচার্য বিনোবা ভাবে যে অভিভাষণ প্রদান করেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই অনুবাদ। আচার্য বিনোবা ভাবের এই অভিভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হইয়াছিল। তিনি ইহাতে সর্বোদয় সমাজের নীতি এবং আদর্শের কথা সহজ এবং সরল ভাষায় অভিব্যক্ত করেন। তাঁহার এই বক্তৃতাটিকে সর্বোদয় সমাজের দিগ্‌দর্শন বলা যাইতে পারে। আচার্য বিনোবাজীর অভি-ভাষণের মূল কথা হইল এই যে, রাজশক্তি অর্থাৎ সরকার অহিংসবাদে বিশ্বাসী হইয়াও কার্যত শাসননীতিতে তাঁহারা অহিংস হইতে সমর্থ হইতেছেন না। সেনা তাঁহাদিগকে রাখিতে হইতেছে। দণ্ড নীতিকে তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া চলিতে হইতেছে। সর্বোদয় কর্মীরা তজ্জন্য পৃথকভাবে নিজেরা কাজ চালাইয়া যাইতে চাহেন। দণ্ডনীতি যাহাতে সরকারকে প্রয়োগ করিতে না হয়, তজ্জন্য লোকশক্তি জাগ্রত করাই তাঁহার আদর্শ। বিচার-শাসন, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণ বুদ্ধি প্রণোদিত বিচার শক্তি জাগ্রত করিয়া তাঁহাদের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করা এবং কর্তৃত্ব বিভাজন অর্থাৎ সরকারের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণের সাহায্যে গ্রামগুলিকে নিজ নিজ প্রয়োজন বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ করাই তাঁহাদের কর্মনীতি। আচার্য বিনোবাজী ভূদান যজ্ঞ এবং সম্পত্তিদান যজ্ঞের মূলীভূত আদর্শেরও এই অভিভাষণে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে সর্বোদয় সমাজের আদর্শ এবং সাধনা প্রচারের নিতান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলত দেশের বুকের উপর শান্তিপূর্ণ পথে বিপ্লবের যে ধারা প্রবাহিত হইতেছে, বাঙালী সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন খোঁজ রাখে না। সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডলী এই অভাব পরিপূরণে অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী। পুস্তকখানি বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে, অনুবাদ বড়ই সুন্দর হইয়াছে। ৪৭২।৫৩

ধর্ম সংগীত

শতদল—করুণানন্দ প্রণীত। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী এম-এ কর্তৃক ঠাকুরবাটী ষ্ট্রীট, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভগবৎ-ভাব এবং ভক্তিমূলক গীতি গ্রন্থ। গানগুলিতে তত্ত্বের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা অধ্যাত্ম-ভাবের ভাবুক, তাঁহারা এগুলিতে আনন্দ পাইবেন। সংগীতের ভাষা সহজ, সরল এবং রচয়িতার সুগভীর আন্তরিকতার স্পর্শ এগুলিতে পাওয়া যায়। ৪৪৪।৫৩

সাধনা-গীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীললিতানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত। শ্রীহৃষীকেশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক দামোদর আশ্রম, রঘুদেবপুর পোঃ, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের বিরচিত প্রায় একশত সংগীত আছে। গানগুলি মাধুর্য-ভাবমূলক। এগুলিতে মনপ্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয় এবং ভগবৎপ্রীতি আনন্দময় ছন্দ অন্তরে সাড়া দেয়। প্রেমভক্তিপিপাসু ব্যক্তি-গণ এই সংগীতসমূহ আস্বাদনে প্রীতিলাভ করিবেন। ৪৮৭।৫৩

অগ্নিযুগের কথা

সন্নিধ (অগ্নি-যুগের বাস্তব ঘটনার কথা-চিত্র) : শ্রীজিতেশচন্দ্র লাহিড়ী : 'নমামি'

প্রকাশ মন্দির ঃ ৮।২, গোপ লেন, কলিকাতা ঃ দেড় টাকা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে বিপ্লবীরা একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের রচয়িতা। স্বাধীনতার সরকারী ইতিহাস তাঁদের কতটুকু মূল্য দেবে কে জানে কিন্তু প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে তাঁদের জন্যে স্মরণের স্বর্ণ-প্রদীপ জ্বলবে অনন্তকাল।

সমিধ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত জিতেশ লাহিড়ী সেই বিপ্লবীদের কথাই গল্পের মত করে বলেছেন। বহু অজ্ঞাত, অখ্যাত কর্মীর ইতিহাস যাঁদের খোঁজ হয়তো কোনদিনই করবে না, তাদের কথা ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার উচ্চতায় নিবিড় করে বলেছেন লেখক। সেই নিবিড় আবেদনটুকু পাঠক মনকেও স্পর্শ করে। এটা লেখকের সাফল্যেরই প্রমাণ। বইটি যে জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে তার নিদর্শন সংস্কারান্তরে। (৪০৩।৫৩)

ধর্মগ্রন্থ

শাস্ত্র-সংশয় নিরসন (প্রশ্নোত্তরমালা)—শ্রীভরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ বাটী শাঁকারী পোঃ বর্ধমান।

পুস্তকখানি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় নাই। আংশিকভাবে ইহা আমাদের কাছে মতামত জানিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই অংশে ভগবৎ-ভজন ও আর্তসেবা, অহল্যাকে অভিসম্পাত, অহল্যাদি প্রাতঃ-স্মরণীয় কেন? শম্বুকের শিরচ্ছেদন, বেদ-ব্যাসের জন্ম, যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন, দস্যুর নিকট সত্য গোপন, কুন্তী দেবীর পুত্রোৎপত্তি এই কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে। লেখকের বিচার ও বিশ্লেষণ ভঙ্গী বড়ই সুন্দর এবং যুক্তির সুসমীচীন বিন্যাসে তাঁহার পটুতা আছে। পুস্তকখানি পূর্ণাঙ্গ-ভাবে প্রকাশিত হইলে সংস্কারমুক্ত শাস্ত্র-নিষ্ঠিত উদারবুদ্ধি সমাজ জীবনে সম্প্রসারিত হইবে।

পরিণাম (একাঙ্ক নাটক)—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী প্রণীত। সৎগ্রন্থ প্রকাশনী, ৮।১-এম, হাজরা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

'ম্যায়সা দিন নেহি রহেগা'—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশাবলীর ইহা অন্যতম। মানুষ রক্তের জোরে কি ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কারে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন। আত্মভোগ তৃপ্তিতে প্রমত্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে পথ কোনদিনই তাহাকে শান্তি দিতে পারে না। পরিশেষে শরীর ও মন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং সে একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া কষ্ট পায়। "ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুবৈদ্য পায়, তবে সেই জীব তরে সংসার যায় ক্ষয়।" ছোট নাটিকাটিতে এই সত্যকেই রূপ দেওয়া হইয়াছে। পড়িয়া ভাল লাগিল। লেখাটিতে রচয়িতার কৃতিত্ব এবং স্বল্প কথায় ও সহজভাবে শুদ্ধ রস পরিবেশনে পাওয়া যায়। ৪৫৮।৫৩

শ্রীশ্রীচণ্ডী—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট। মূল্য—॥০ আনা।

'সুদর্শন' পত্রের সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীর আলোচ্য সংস্করণখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে শ্রীশ্রীচণ্ডী তত্ত্বের যে সব মর্ম এবং তাৎপর্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ। পুস্তকখানিতে চণ্ডীর মাহাত্ম্য হইতে আরম্ভ করিয়া দেবীসূক্ত, বিভিন্ন রহস্য অর্থাৎ মূল শ্লোকসহ চণ্ডীর সমগ্র পাঠক্রম প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই সুন্দর। পকেট সংস্করণের আকারে মুদ্রিত হওয়াতে হিন্দুর পক্ষে পরম পবিত্র এবং প্রয়োজনীয় এই পুস্তকখানি সর্বদা সঙ্গে রাখিবার পক্ষে সুবিধা হইবে।

বিবিধ

যোগবলে রোগ আরোগ্য—শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীবিমলশঙ্কর ধর এম এ, অধ্যক্ষ উমাচল প্রকাশনী কর্তৃক ৫৮।১।৭বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫, টাকা।

পরিবর্তিত এবং সংশোধিত ২য় সংস্করণ। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত সহজ যৌগিক ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য ও ছাত্র জীবন প্রভৃতি গ্রন্থ সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কতটা লোকপ্রিয় হইয়াছে, ৩ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থে গ্রন্থকার যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি, প্রকরণ নির্দেশ করিয়াছেন। রোগ প্রতীকারের জন্য ঔষধ গ্রহণের তিনি বিরোধী। তাঁহার মতে ঔষধ গ্রহণের ফলে অর্থের যেমন অপচয় ঘটে, তেমনই স্বাস্থ্য স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়। তিনি ঔষধ গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কোন প্রতীকারের যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। কোন রোগ, কিরূপ যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে এবং পথ্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে, পুস্তকে তাহা বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার রোগ নির্ণয় সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। যৌগিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে গ্রন্থকার সহজভাবে প্রাণায়াম করিবার পক্ষপাতী। গ্রন্থকারের প্রদর্শিত রোগ প্রতীকারের ব্যবস্থা দুরূহ নয় এবং সেজন্য উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্ষমতারও প্রয়োজন হয় না। বস্তুত দৈব শক্তি বা মন্ত্রবলের ব্যাপার কিছু ইহাতে নাই—বিজ্ঞানসম্মত এই চিকিৎসা পদ্ধতি। দেশবাসীর দৃষ্টি এ দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সুন্দর। ৫৪৩।৫৩

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ভাব-রূপা — কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত কর্তৃক, ৪৫।১বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২,। ৫২৪।৫৩

দিনগত—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—২॥০। ৫২৫।৫৩

কলকাতা কালচার—কালপেঁচা। দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—৪॥০। ৫২৬।৫৩

মা—ম্যাকসিম গোর্কি। অনুবাদক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দীপায়ন, ১, রাজা গুরুদাস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২,। —৫২৭।৫৩

বাংলার ইতিহাস সাধনা—প্রবোধচন্দ্র সেন, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ৩,। ৫৪১।৫৩

চলতি পথে—মৃণালকান্তি বসু, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি য়্যাণ্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—মূল্য ৩,। ৫৪২।৫৩

চীন দেখে এলাম—মনোজ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য ৩,। ৫৪৩।৫৩

কোরআন পরিচয় (উদ্বোধন খণ্ড)—ইবনে আওয়ালুদ্দীন আলী, হাফেজ মহম্মদ আজহার হাসান কর্তৃক ৪২, জাননগর রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য ।/০ আনা। ৫৪৪।৫৩

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব সঞ্চয়ন—শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী, স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী কর্তৃক সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ (জোরহাট) আসাম হইতে প্রকাশিত—মূল্য ২,। ৫৪৫।৫৩

ডায়েরী

সরকারের রয়েল ডায়েরী (৫,), ডিমাই ডায়েরী (৪,), ক্রাউন ডায়েরী (৩।০), লিটল্ ডায়েরী (১৮০), বাংলা ডায়েরী (১।৵০)। ইংরেজি ১৯৫৪ সালের জন্য। প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সনস্ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

সুপরিচিত পুস্তক প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও কয়েকখানি সুদৃশ্য ডায়েরী প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উল্লিখিত ডায়েরীগুলির একখানি করিয়া উপহার পাইয়াছি। ছাপা, বাঁধাই, উৎকৃষ্ট এবং প্রত্যেকখানিই নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ।

(১)
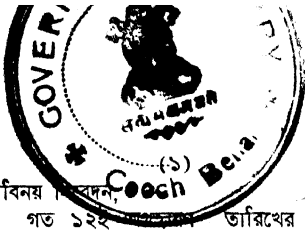
সবিনয় নিবেদন,

গত ১২ই ... তারিখের "দেশ" পত্রিকায় সুবিখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয় "এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহনের স্থান" আলোচনা প্রসংগে রামমোহন হিন্দু কলেজের "পরিকল্পয়িতাদের মধ্যে ছিলেন" এই কথা বলিয়াছেন; কিন্তু স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Journal of the Bihar and Orissa Research Societyতে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহনকে "Prime mover in founding the Hindu College"—'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোক্তা'—বলিয়াছেন। কোনটি ঠিক তাহা হোম-মহাশয় বলিয়া দিলে ভাল হয়।

ভবদীয়

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার

কলিকাতা
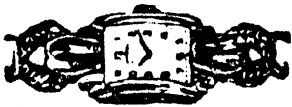
এজেণ্ট চাই

আলোচনা

(২)

সবিনয় নিবেদন—

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার প্রশ্নটা তুলিয়া ভালই করিয়াছেন; তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডেভিড হেয়ার সাহেব,—রামমোহন রায়ের গৃহে, তাঁহাদের বন্ধুগোষ্ঠির এক বৈঠকে। তাহার পর দুইজনই এক সংগে সেই কাজে লাগিয়া যান। তাঁহাদের সংগে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয়-সভার' কয়েকজন সদস্যও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্যার হাইড ঈস্ট, সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিসের বাসভবনে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে আহূত যে পরামর্শ সভার কথা আমি আমার পূর্ব পত্রে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূলে ছিলেন রামমোহনের সহযোগী বন্ধু, 'আত্মীয়-সভার' বিশিষ্ট সদস্য—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সেই হিসাবে তাঁহাকেই "prime mover"—'প্রধান উদ্যোক্তা'—বলিতে হয়। আমি সেই কারণেই বলিয়াছি রামমোহন হিন্দু কলেজের "পরিকল্পয়িতাদের মধ্যে ছিলেন"; তাঁহাকে 'প্রধান উদ্যোক্তা' বলি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু পরে ডেভিড হেয়ার সাহেবকেই হিন্দু কলেজের "আদি-কল্পক" বলিয়াছেন, "প্রধান উদ্যোক্তা" বলেন নাই। ["সংবাদপত্রে সেকালের কথা]

কিন্তু রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে "প্রধান উদ্যোক্তা" ছিলেন কি না ছিলেন সেটা আদৌ বড় কথা নয়। এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় দান যে, তিনিই প্রথম খুলিয়া দিলেন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ কালিমানিবিড় সংস্কারের পিঞ্জর-দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহির হইয়া না পড়িলে জড়স্তপুঞ্জের উর্ধ্বে, তাহার আকাশ কোনদিন আলোকের অভিনন্দন-গানে প্লাবিত হইবে না। তাই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাট আমহার্স্টের কাছে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাহাতে অত বড় সংস্কৃতজ্ঞ বেদান্তবিশারদ হইয়া নিজের উপার্জিত হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া বেদান্ত উপনিষদের স্বরচিত ভাষ্য ছাপাইয়া বিনামূল্যে তাহা বিতরণ করিয়াও তিনি বলিতে দ্বিধা করেন নাই—"সংস্কৃত ইস্কুল বসাইয়া, ছেলেদের ব্যাকরণ বেদান্ত পড়াইয়া কোন ফল হইবে না, —চাই এই ক'লকাতায় বিজ্ঞান-কলেজ, যেখানে য়ুরোপে শিক্ষিত অধ্যাপকেরা পড়াইবেন 'Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other usual sciences',—
—যেখানে থাকিবে এই সব বিষয় পড়াইবার জন্য বই, আর 'instruments and other apparatus' যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম।"

এই প্রসংগে এই কথাটুকু শুধু মনে রাখা দরকার যে, রামমোহন যখন এই চিঠি লিখেছিলেন (১৮২৩), তখন না অক্সফোর্ডে, না কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান শেখাবার ছিল কোন ব্যবস্থা।

"This he pleaded for 13 years before the foundation of the college of Chemistry, 37 years before the Faculty of Science was created in the University of London, and 46 years before the courses in science were established in any number in Oxford and Cambridge" —'The Father of Modern India': Rammohan Roy Centenary Commemoration Volume 1933, page 302.

রামমোহন রায় অবিসম্বাদীরূপেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তক। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সে কীর্তি মহত্তর।

অমল হোম

(৩)

মহাশয়,—সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ২১শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় সুবিনয়বাবু তাঁহার "নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার সমস্যায়" যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ও ডাঃ মজুমদারের কতকগুলি ভ্রান্তিমূলক যুক্তি-বিভ্রাটের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহার আশু মীমাংসা একান্ত প্রয়োজন। সুবিনয়বাবু তাঁহার সমগ্র রচনাটির প্রতিটি অংশে অখণ্ডনীয় যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ডাঃ মজুমদারের মত ঐতিহাসিকের আহৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে ও জনসাধারণের ইতিহাস শিক্ষার বনিয়াদ গঠিত হইয়াছে। সে শিক্ষার ভিত্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতির—তথা দেশের শিক্ষার যে অপরিসীম ক্ষতি হয় একথা ডাঃ মজুমদারের মত বিশিষ্ট ঐতিহাসিককে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রশ্নই উঠে না। তাঁহার "An advanced History of India"য় লিখিত এবং জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণের মধ্যে পার্থক্যের কি কারণ ডাঃ মজুমদার যেন সন্তোষজনক উত্তর দিয়া আমাদের মনের সংশয় অপনোদন করেন। ইহাই তাঁহার নিকট আমার বিনীত অনুরোধ।

—প্রসাদচন্দ্র দাশ, হাওড়া।

ট্রামে-বাসে

একটি সংবাদে প্রকাশ "কল্যাণীতে" অপরিণত বয়স্কদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি খেলা-খেলা কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—"আমাদের মনে হয় তার চেয়ে একটা খেলা-খেলা ইলেকশানের মহড়া হয়ত বেশি কার্যকরী হবে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

বেগম রেজিয়া নামে একটি মহিলাকে পাকিস্তানের প্রথম মহিলা-গুণ্ডা আখ্যার সম্মান দেওয়া

হইয়াছে।—"হিন্দুস্থান প্যারিটির প্রশ্ন তুলবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

অন্ধ্র বিধান সভায় মন্ত্রীদের বেতন মাসিক এক হাজারের পরিবর্তে পাঁচশত টাকা করার জন্য বিরোধী দল এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তুমুল বিতর্কের পর বিরোধী দল এই সম্পর্কে ভোট গ্রহণের দাবী জানান এবং ফলে এক ভোটে বিরোধী দলেরই জয় হয়। অতঃপর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবেন কি না এই প্রশ্ন করেন প্রজা সোসালিষ্ট দলের শ্রীপদ্মনাভ। আইন ও অর্থমন্ত্রী উত্তরে জানান যে মন্ত্রীদের পদত্যাগের কোন প্রয়োজনই নাই।—"অর্থাৎ বেতন হ্রাস হওয়ায় মন্ত্রিত্ব ছেড়ে কারুর শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ করার প্রয়োজন নেই" মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব* রফি আমেদ কিদোয়াই জানাইয়াছেন আগামী ইংরেজী বৎসরের প্রথম হইতে কলিকাতায় উৎকৃষ্ট চাউল সরবরাহ করা হইবে। জনৈক সহযাত্রীর—"এই নিয়ে ক'বার হলো, দাদা" মন্তব্যের উপর বিশুখুড়ো বলিলেন—"মন্ত্রী সাহেবের উক্তিটা ঠিক আশ্বাস নয়, পরিহাস মাত্র। কোলকাতায় বর্তমানে "দুই বেয়াই" চলছে কি না, তাই" ! !

* * * *

নিখিল বঙ্গ মহিলা খাদ্য সম্মিলনী কলিকাতা রাজভবনে একটি খাদ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।—"শুধু প্রদর্শনীতে চিঁড়ে ভেজে কি না বিদুর ভবনের অধিবাসীরা একবার পরখ করে দেখুন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

সদাচরণের জন্য শোনপুরে বন্দীদিগকে গণ্ডকে পুণ্যস্নানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।—"অসদাচারী

কংগ্রেসীদের প্রয়াগের পূর্ণকুম্ভে অনুরূপ ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না সে কথাটা একবার ভেবে দেখবেন" বলে শ্যামলাল।

* * * *

বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য বিহার সরকার একটি অভিনব ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন। তথাকার সেচ মন্ত্রী মহাশয়ের বাচনিক অবগত হওয়া গেল—প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বে যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে তাহাদিগকে কলেজে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হইবে না।—"বিয়েটা কোনরকমে একবার হয়ে গেলে, কলেজ—ফুঃ" মন্তব্য করিতে করিতে জনৈক কিশোর যাত্রী চলন্ত ট্রাম হইতে লাফাইয়া নামিয়া গেল।

* * *

একটি সংবাদে দেখিলাম বধিরদের শিক্ষকগণের ষষ্ঠ বার্ষিকী সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।—"বধিরতা সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের সাম্প্রতিক

অভিজ্ঞতা সুবিদিত"—সংক্ষেপে মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার নির্দেশ দিয়াছেন যে লোকসভার সদস্যারা ইচ্ছা করিলে সভাকক্ষে ঘুমাইতে পারেন, কিন্তু নাক ডাকাইতে পারিবেন না। শ্যামলাল একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিল—"যাঁদের নাক ডাকে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁরা নাকি শ্রীঅনন্তশয়নমকে তাঁদের নাক ডাকা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন"।

* * * *

বিশুখুড়ো সংবাদ শুনাইলেনঃ—"সভ্যতার সংকার" নামক ছবির শুভ মহরৎ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ছবিটির প্রযোজক শ্রীজনতা সর্বাধিকারী এবং পরিচালনা করিবেন শ্রী আরক্ষী বল। —বুঝিলাম, খুড়ো চিত্রতারকা প্রদর্শনীতে জনতার উচ্ছৃংখলতাকে ইঙ্গিত করিয়াই এই গল্পটি শুনাইয়াছেন।

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

আর একটি আমোদপ্রমোদের উদ্যোগ

গত সপ্তাহে নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীতে বক্তৃতাকালে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় প্রসংগতঃ জানান যে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে আর একটি "স্টারস অফ ইণ্ডিয়া" প্রদর্শনীর তিনি ব্যবস্থা করছেন এবং সেইদিনই তিনি দুপুরে বম্বের প্রতিষ্ঠাবান এক প্রযোজকের সংগে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার আগে ঐদিন বিকেলে বম্বের প্রযোজক শ্রীহিতেন চৌধুরীর সংগে কথা প্রসংগে জানা যায় তিনি সেদিন দুপুরে রাজ্যপালের সংগে কোন একটি ব্যাপারে সাক্ষাৎ করেছেন। দুটো ঘটনাকে এক করলে এই দাঁড়ায় যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যপাল আবার একটি "স্টারস অফ ইণ্ডিয়া" প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছেন এবং আগের বারের মতোই এবারও সম্ভবতঃ শ্রীহিতেন চৌধুরীই বম্বে থেকে একদল তারকাদের নিয়ে আসবেন এখানকার লোককে তাদের চেহারা দেখিয়ে রাজ্যপালের সাহায্য তহবীলে পয়সা তোলায় সহায়তা করার জন্য।

* * *

কলকাতায় তারকাদের নিয়ে এমন চেহারার মেলা বসানোর রেওয়াজ ছিল না কোনকালে। এখানে তারকারা স্বাধীনভাবে নির্ঝঞ্ঝাটে যত্রতত্র স্বাভাবিক আর পাঁচজনের মতোই চলাফেরা করতে পারেন। এখানকার লোকেরও তারকাদের সম্পর্কে তেমনি আচরণ। স্বাভাবিক মানুষের মতোই গণ্য করা হয় তাদের। কিন্তু বম্বের কথা আলাদা। ওখানে একটু নাম করেছেন এমন কোন তারকাদের কারুর পক্ষে সাধারণ্যে বের হওয়া খুবই ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার; আর বেশী নাম করা কেউ হলে তো একেবারে দাঙ্গা। ওখানে তারকাদের নিয়ে লোকে এতো মাতামাতি করে যে তাতে তারকাদের দৈহিক নিগ্রহও ভোগ করতে হয়—গাড়ীতে চড়ে থাকলে গাড়ী টুকরো টুকরো করে লোকে খুলে নিয়ে যায়; পারলে হয়তো লোকে দেহটাও খুলে নিতো, অন্ততঃ দেহ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া তো খুবই হয়। ভয়ে অনেক তারকা রাস্তায় বের হন বোরখা পরে, এবং বহু তারকা আছেন যারা বাড়ী থেকে কোন উপায়ে স্টুডিওতে যান এবং ফিরে আসেন—বাকী সর্বক্ষণ বাড়ীতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হন, আর নয়তো রাত্রির অন্ধকারে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করে টুক্ করে বাইরে কোথাও ঘুরে আসেন।

'জলজহীরা'তে মঞ্জু দে

দেবকীকুমার বসুর "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতে"-তে বিষ্ণুপ্রিয়া সুচিত্রা সেন

তারকা হওয়ার এই হচ্ছে মস্তো ফ্যাসাদ—আর পাঁচজনের মতো চলাফেরার স্বাধীনতা তাদের থাকে না। এও একপ্রকার আদি-বৃত্তিরই চরিতার্থতা, তা নয়তো কোন সুস্থ মানুষ চিত্রতারকাদের দেখবার জন্য দাঙ্গা বাঁধাবে এটা নেহাৎই প্রকৃতির ব্যতিক্রম।

* * *

দেশ ও সমাজের সেবা করে যারা মহত্ব অর্জন করেন, যারা অনন্যসাধারণ বীরত্ব দেখান, মোটকথা যাঁরা অনন্য-সাধারণ কিছু করেন তাঁরাই হন পূজনীয়; তাঁদের দেখবার জন্য যদি দাঙ্গা বাঁধে তাহ'লে লোকের একপ্রকার মতিগতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তারকাদের দেখবার জন্য যে ভিন্নপ্রকৃতির মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা বড়োই সাংঘাতিক। প্রমোদ সমাজজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ সন্দেহ নেই, এবং চিত্র-তারকারাও প্রমোদ বিতরণের সহায়ক হয়ে সমাজেরই সেবা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তাই বলে তারা মানুষের মধ্যে আদর্শ পুরুষ, এমন দাবী অতি দাম্ভিক তারকাও করবেন না। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পেশার আরও পাঁচজন যেমন আছেন তেমনি তারকারাও, তবুও ওদেরই চেহারা দেখবার ও দেখাবার জন্য আজকাল যে ধুম পড়েছে সেটাকে সৎবৃত্তি বলে ধরা যায় না। এটা সরাসরিই আদিবৃত্তি চরিতার্থতা—যারা ওদের চেহারা দেখে এবং তারকাদের মধ্যে যারা চেহারার মেলায় যোগদান করেন উভয়
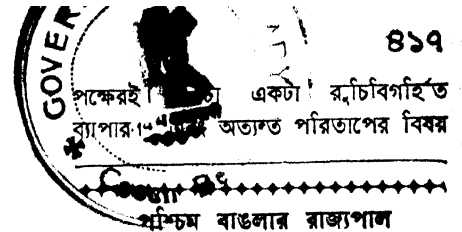
পক্ষেরই ... একটা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার ... অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়

যে, আমাদের রাজ্যপালই এ অঞ্চলে ঐ রকম চেহারার মেলা বসানোর প্রধান উদ্যোগী। আরও অনেক কথা মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে।

* * *

ভীড় করার জন্য যতো আস্কারা ও উস্কানি দেওয়া হয় শুধু বম্বের তারকা-দেরই ক্ষেত্রেই। অথচ মজার কথা হচ্ছে এই যে, বম্বের তারকাদের যে কেউ এ পর্যন্ত কলকাতায় এসেছেন তাদের সকলকেই বাঙলার তারকাদের শিল্প-কৃতিত্বকে তাদের চেয়ে ঢের উন্নত বলে অসংকোচে স্বীকার করতে দেখা গিয়েছে। বাঙলার শিল্পীদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাদের। অথচ বাঙলার শিল্পীদের ঐ সব চেহারার মেলায় হাজির করা হয় বম্বের তারকাদের চেয়ে তারা কতো নীচুধাপের তা দেখিয়ে দেবার জন্য যেন। বাঙলার শিল্পীদের চূড়ান্ত অসম্মান হয় এসব ক্ষেত্রে; অত্যন্ত বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যায়। তাছাড়া ঐভাবে বম্বে থেকে তারকা আমদানী করার মধ্যে নিন্দার্হ আরও বিষয় হচ্ছে এর দ্বারা জনসাধারণকে এইটেই যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, রুচি বিগর্হিত এবং আদিবৃত্তি চরিতার্থ তাতেই বম্বের তারকাদের দরকার। বম্বের শিল্পী-দের পক্ষেও এইরকম মার্কা-মারা হয়ে থাকা মোটেই সম্মানের নয়। চেহারার মেলায় যে কি মারাত্মক কান্ড ঘটে, তার সাম্প্রতিক পরিচয় হিন্দুস্থান সম্মিলনী; তাছাড়া একদল লোক এ নিয়ে ব্যবসা করারও যে সুযোগ করে নিচ্ছে, তারই বা প্রশ্রয় দেওয়া যায় কি করে? রাজ্যপাল আরও একটা চেহারার মেলা করতে যাচ্ছেন বলেই এই কথাগুলোর অবতারণা করা হলো। সুস্থমনা কোন ব্যক্তিই চায় না এমনধারা জিনিস; দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি এতটুকুও দরদ যার আছে, তাদের কেউই এ সব ব্যাপারে সায় দিতে পারে না। এ ঢঙ আমাদের দেশের নয়। কিন্তু তবুও তার উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এবং নির্লজ্জের মতো কোন কোন সংবাদপত্র এই সব প্রচেষ্টাকে বরণীয় বলেও উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করছেন।

* * *

সাধারণত এই সব ব্যাপারে কোন গোলমাল বাধলেই যতো দোষ গিয়ে পড়ে জনতার উচ্ছৃংখলতার ওপরে। কিন্তু আসলে জনতাকে যে উচ্ছৃংখল হবার জন্যই উস্কানি দেওয়া হয়, সেটা শেষ অবধি আর কেউ মনে করে দেখে না। তা নয়তো এই তো সেদিন হাজার কতক লোককে দেখা গেলো শান্ত সমাহিতভাবে সন্ধ্যে থেকে একনাগাড়ে চোদ্দ ঘণ্টা ধরে পরদিন সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীত শুনে গেলো উপরি-উপরি ক' রাত ধরেই। দাঙ্গা গোলমাল কিছুই নেই। হিন্দুস্থান সম্মিলনীতে যারা গন্ডগোল করেছিল, হয়তো গান শোনার জনতারই অনেকে। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাদের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া গেল, আর একদিকে পাওয়া গেল তাদেরই কুৎসিৎ মনোবৃত্তির—কি কারণে এই তফাৎ হলো, সেটাও প্রণিধানযোগ্য বিষয়।

ক্রিকেট

পৃথিবীর মধ্যে যতগুলি খেলা এই পর্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রিকেট খেলায় যতখানি ধৈর্য, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয়, অন্য কোন খেলায় তাহা হয় না। এই জন্যই এই খেলাকে স্নায়ুযুদ্ধের খেলা নামে অভিহিত করা চলে। বিশেষ করিয়া দীর্ঘদিন ব্যাপী টেষ্ট ম্যাচ বা প্রতিনিধিমূলক খেলা যে স্নায়ুযুদ্ধের চরম নিদর্শন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। ভারত ১৯৩২ সাল হইতে সরকারীভাবে টেষ্ট খেলায় যোগদান করিতেছে। ১৯৫২ সালের পূর্বে এই খেলায় কোনদিনই সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। যদিও ঐ সাফল্য ইংলণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় বিশ্বখ্যাতি সম্পন্ন ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে হয় নাই, তাহা হইলেও ভারত যে টেষ্ট খেলার সম্পূর্ণযোগ্য ইহাই ঐ সাফল্যের মধ্য দিয়া কিছুটা প্রমাণিত হয়। তাহা হইলেও এইবারের বে-সরকারী রজত-জয়ন্তী ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি দুইটি টেষ্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যেরূপ ব্যাটিং ও বোলিংয়ের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ধুরন্ধর ক্রিকেট পরিচালকগণ "ভারত টেষ্ট পর্যায়ের খেলার সম্পূর্ণ যোগ্য নহে" ইহা আর উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। ভারত ভ্রমণকারী রজত-জয়ন্তী দল বহু অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড় লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে অধিকাংশ খেলোয়াড়ই টেষ্ট খেলার অভিজ্ঞতা রাখেন। সুতরাং সেইরূপ দলের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইনিংসে বিজয়ী হওয়া ও শোচনীয় ইনিংস পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়া খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করা কমবড় কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। বিশেষ করিয়া বোম্বাইর দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যেরূপ অদম্য দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা ইতি-পূর্বে কোন ভারতীয় দলকে কোন টেষ্ট খেলায় প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। ভারত শোচনীয় পরাজয় বরণ না করিলেও পরাজিত হইবে, ইহা একরূপ সুনিশ্চিত ছিল। সেই-রূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মাত্র দুইজন খেলোয়াড় বিন্নু মানকড় ও হাজারে, অমিততেজ ও দৃপ্ত, অনমনীয় দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ দুইদিন প্রতিপক্ষের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ইহা স্মরণ করিলেই যে কোন ব্যক্তিরই ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে মাথা নত হইয়া পড়ে। সত্যই ইঁহারা ধন্য, ধন্য ইঁহাদের মানসিক শক্তি। এইরূপ কৃতী ক্রিকেট খেলোয়াড় যে দেশে বর্তমান সেই দেশে ক্রিকেট খেলার উন্নতি হইতে বাধ্য ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতেও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইবে না। আমরা এই কৃতী খেলোয়াড়দ্বয়কে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। ইঁহারা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিলেন।
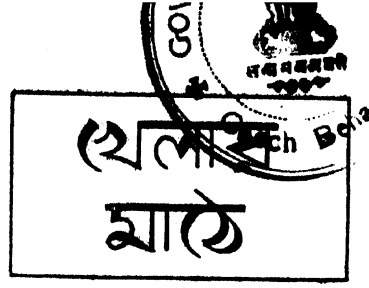
চারিজনের শতাধিক রাণ

এই দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে রজত-জয়ন্তী দলের দুইজন ও ভারতীয় দলের দুইজন মোট চারিজন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। তবে ইহা বলা কোনরূপ অন্যায় হইবে না যে, রজত-জয়ন্তী দলের খেলোয়াড়দ্বয় যেরূপ অবস্থায় শতাধিক রাণ করিয়াছেন, ভারতীয় খেলোয়াড়দ্বয়ের তাহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় খেলোয়াড়দ্বয়ই অধিক গৌরবের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। রজত-জয়ন্তী দলের পক্ষে শতাধিক রাণ করিয়াছেন রেগ সিম্পসন ও ব্যারিক। ভারতীয় দলের পক্ষে করিয়াছেন বিন্নু মানকড় ও সি ডি গাদকারী। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে উভয় দলেরই একজন করিয়া খেলোয়াড় ব্যারিক ও গাদকারী একই রাণ সংখ্যায় অর্থাৎ ১০২ রাণ করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকেন।

বোলিংয়ে সাফল্য

বোলিং বিষয় এই খেলায় যদি কাহারও প্রশংসা করিতে হয়, তাহা হইলে রজত-জয়ন্তী দলের লোডারেরই করা উচিত। তিনি উভয় ইনিংসেই কার্যকরী বোলিং করেন। ইহার পরেই মানকড়ের নাম উল্লেখ-যোগ্য। কারণ তিনি একাদিক্রমে বল না করিলে রজত-জয়ন্তী দল আরও অধিক রাণ করিতে সক্ষম হইতেন।

ভারতীয় দলের শক্তি হীনতা

ভারতীয় দল দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় শেষ পর্যন্ত খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের ও গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে যেরূপ শক্তিহীন হইয়া করিয়াছে, তাহা না বলিলে খুবই অন্যায় হইবে। এই দলের হাজারে খেলার প্রথমদিনেই আঙ্গুলে চোট পান, যাহার জন্য দ্বিতীয় দিনে তিনি ফিল্ডিং ও বোলিং করিতে পারেন নাই। গোপীনাথের খেলার প্রথম দিনেই মাংসপেশীতে টান লাগে ও তিনি সোজা হইয়া দৌড়াইতেই অসুবিধা বোধ করেন। প্রথম ইনিংসে এইরূপ অবস্থায় খেলায় মোটেই সুবিধা করিতে পারেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে পায়ের যন্ত্রণা কিছুটা উপশম হওয়ায় মাঞ্জরেকারকে রাণার গ্রহণ করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত অপূর্ব ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতীয় দলের তরুণ বোলার সুন্দররামও অসুস্থ হইয়া পড়ায় দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে খেলায় যোগদান করিতে পারেন নাই। ভারতীয় দলের এই শক্তিহীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই রজত জয়ন্তী দল ৫০৪ রান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না।

দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রজত জয়ন্তী দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রথম দিনের শেষে ৪ উইকেটে ২৮৬ রান হয়। সিম্পসন ১২৪ করিয়া আউট হন। মার্শাল ৩৮ রান ও ব্যারিক ১৪ রান করিয়া নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের চা পর্যন্ত খেলিয়া রজত জয়ন্তী দল ৬ উইকেটে ৫০৪ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করেন। ব্যারিক ১০২ রান ও বার্ণেট ৮ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ভারতীয় দল বিপুল রানসংখ্যার বিরুদ্ধে খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে মাত্র ২৬ রান করিতে সক্ষম হন। ভারতীয় দলের এই শোচনীয় সূচনা পরাজয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। উমরিগর ১৩ রান করিয়া নট আউট থাকে। তৃতীয় দিনে শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস চা-পানের পূর্বেই ১৫৩ রানে শেষ হয়। একমাত্র দলের অধিনায়ক উমরিগার অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করিয়া ৮৩ রান করেন। ৩৫১ রান পশ্চাতে পড়ায় ভারতীয় দলকে 'ফলো অন' করিতে হয়। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৫১ রান করে। মানকড় ২৮ রান ও মাঞ্জরেকার ১৫ রান করিয়া নট আউট থাকেন। ভারতীয় দল নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হন। চতুর্থ দিনের সূচনায় মাঞ্জরেকার আউট হন। হাজারে খেলায় যোগদান করেন। ইহার পর প্রকৃত স্নায়ুযুদ্ধের লড়াই শুরু হয়। বিন্নু মানকড় ও হাজারে রজত জয়ন্তী দলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চতুর্থ দিনের শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকে। মানকড়ের ১০৪ রান ও হাজারের ৫৭ রান হয়। ভারত এই সময়েও ১২৫ রান হইলে ইনিংস পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবে, এইরূপ আস্থা থাকে। পঞ্চম দিন বা শেষ দিনে খেলার অবস্থা চরম দাঁড়ায়। রজত জয়ন্তী দল জয়ী

ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক পলি উমরিগার ও রজত-জয়ন্তী দলের অধিনায়ক বার্ণেট খেলার পূর্বে টস্ করিতেছেন।

হইবার জন্য একে একে আটজন বোলারের সাহায্য গ্রহণ করেন। হাজারে ও মানকড় ২৫৩ রানের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করেন। তখন রজত জয়ন্তী দল জয়লাভের আশায় উৎসাহিত হন। কিন্তু গাদকারী ও গোপীনাথ সেই প্রচেষ্টায় চরম বাধা সৃষ্টি করেন। তাঁহারা যে কেবল ইনিংস পরাজয় হইতে ভারতকে রক্ষা করিলেন তাহা নহে, পঞ্চম দিনের শেষ পর্যন্ত নট আউট রহিলেন। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইল। ভারত টেস্ট পর্যায়ের খেলায় প্রথমটিতে বিজয়ী হওয়ায় একটি খেলায় অগ্রগামী রহিলেন। খেলার ফলাফল—

রজত জয়ন্তী প্রথম ইনিংস—৬ উইঃ ৫০৪ রান (সিম্পসন ১২৪, ব্যারিক ১০২ নট আউট, মার্শাল ৯০, লক্সটন ৫৫, মিউলম্যান ৫০, ওরেল ২২, ফ্লেচার ৩৫, মানকড় ৯১০ রানে ৩টি, সুন্দররাম ৫৮ রানে ১টি, রামচাঁদ ৬৪ রানে ১টি, গাদকারী ২৪ রানে ১টি উইকেট পান।)

ভারত ১ম ইনিংস—১৬৩ রান (উমরিগার ৮৩, বিজয় হাজারে ২৬, জসু প্যাটেল ১৫, জি রামচাঁদ ১২, লোডার ৫৩ রানে ৪টি, ওরেল ৩২ রানে ৩টি ও লক্সটন ৪২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংস—৫ উইঃ ৪৪৭ রান (মানকড় ১৫৪, গাদকারী ১০২ নট আউট, বিজয় হাজারে ৬১, গোপীনাথ ৬৭ নট আউট, রামচাঁদ ২৪, মঞ্জরেকার ১৮, লোডার ৪৩ রানে ৩টি, ওরেল ৭৮ রানে ১টি ও মার্শাল ৪৪ রানে ১টি উইকেট পান।)

ভারতের তৃতীয় টেস্ট দল

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় রজত জয়ন্তী ও ভারতীয় দলের তৃতীয় ক্রিকেট টেস্টম্যাচ আরম্ভ হইবে। এই খেলায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণকে মনোনীত করা হইয়াছে—

হিমু অধিকারী (অধিনায়ক), পি আর উমরিগার, বিজয় হাজারে, ডি জি ফাদকার,

আমেদ, পি রায়, সি গাদকারী, এস পি গুপ্তে ও পি সেন।

অতিরিক্ত—অনিল ল্যাম্কারী, আর বি কেনী ও বরোদার মহারাজা।

দ্বিতীয় টেস্টম্যাচের মনোনীত খেলোয়াড়গণের মধ্যে সুন্দররাম, গোপীনাথ, জসু প্যাটেল, তামানে ও বিনু মানকড়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের পরিবর্তে হিমু অধিকারী, পি রায়, পি সেন ও গোলাম আমেদকে গ্রহণ করা হইয়াছে। মনোনয়ন যে সম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছে বলা চলে না। তবে তাহা হইলেও খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহাতে এইরূপভাবে দল গঠন করা যুক্তিসংগত হইয়াছে বলা চলে। এই সকল টেস্ট খেলা বেসরকারী খেলা। সুতরাং খেলার ফলাফল আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের নিকট সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কেবল ভারতের প্রকৃত টেস্ট দল গঠনের প্রচেষ্টায় এইরূপভাবে প্রতি খেলায় খেলোয়াড় অদলবদল করা হইতেছে।

মানকড়ের দলভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু তিনি নিজেই খেলিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ও সম্পাদক খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণার পূর্বে মানকড়কে বার বার অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। মানকড় খেলিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। দেশের মান সম্মান যে খেলার সহিত জড়িত, সেই খেলায় যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। তিনি যদি আহত হইতেন অথবা অসুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে না খেলিলে কোনকিছুই বলিবার থাকিত না। খেলিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষায় যে খেলোয়াড় বিরত হন, তিনি যত বড়ই খেলোয়াড় হউক না কেন, সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত রাখা আমরা কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারি না। তিনি একেবারেই যদি অবসর গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কিছু বলা চলে না। তাঁহার অবসর গ্রহণের সংবাদ এই পর্যন্ত বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জন্য তাহার মূল্য আর কেহ দিতে পারে না।

বাঙলার খেলা পরিচালনায় দ্বন্দ্ব

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল আগামী ২৬শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার ইডেন উদ্যানে খেলায় যোগদান করিবেন। এই খেলার যাবতীয় ব্যবস্থা বেঙ্গল ক্রিকেট এসোসিয়েশন করিতেছিলেন। হঠাৎ ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা রজত জয়ন্তী ক্রিকেট খেলার সকল বন্দোবস্ত করিবেন কারণ তাঁহাদের মাঠেই খেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহার ফলে খেলা পরিচালনা লইয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বের পরিণাম হিসাবে ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি জে সি মুখার্জি সভাপতির পদ ত্যাগ

বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেকেই আশঙ্কা করিতেছেন, খেলা কলিকাতায় হইবে না। কিন্তু আমাদের যতদূর ধারণা খেলা হইবে। গত বৎসরও পাকিস্থান ক্রিকেট দলের খেলা পরিচালনা লইয়াও সি এ বি ও এন সি সির মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় ও শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয়। এই ক্ষেত্রে মিটমাট না হইলেও ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব সি এ বির কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহারা ইতোমধ্যেই ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবকে ২৮শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইডেন উদ্যান ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইতঃপূর্বেও একবার এই ধরণের নোটিশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এন সি সির উপর জারি করেন। তখন সি এ বির মধ্যস্থতায় বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উহা বন্ধ হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এন সি সির মদ্য পান ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ক্লাবের সভ্যসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ইহার উপর যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহারাও এই নোটিশ জারীর পর আর ক্লাবের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিবেন কি না বলা কঠিন। কারণ এই ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ সভ্য ও সভ্যাদের নিকট হইতে যে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা দেনা পড়িয়াছে। পাওনাদারগণ ঘন ঘন ক্লাবের কর্তৃপক্ষদের নিকট ধর্ণা দিয়াও কিছুই আদায় করিতে পারিতেছেন না। ফলে তাঁহারাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণাপন্ন হইয়াছেন। এই দিকে দেশের জনসাধারণ স্টেডিয়াম গঠন দাবীর রোল তুলিয়াছেন। ইহার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীরব থাকা সম্ভব হইতেছে না। সেই হেতু মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইডেন উদ্যানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াই সি এ বিকে খেলা পরিচালনার অধিকার দিবেন। যদি অধিকার স্বত্ব ২৮শে ডিসেম্বরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে না আসে, তাহা হইলে নিশ্চয় বাঙলার মুখ রক্ষার জন্য খেলা যাহাতে পণ্ড না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেনই। সেইজন্য খেলা বন্ধ হইবার আশঙ্কা করা অমূলক বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেডিয়াম গঠনের তোড়জোড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতায় একটি বিরাট স্টেডিয়াম গঠনের জন্য যে বিশেষ আগ্রহশীল, তাহা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মহাধিকরণের সম্মেলন হইতেই উপলব্ধি করা যাইতেছে। এই সম্মেলনে কলিকাতার পৌর-প্রধান শ্রীযুত নরেশনাথ মুখার্জি ও বাঙলার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের সকল রাজ্যেই স্টেডিয়াম গঠিত হইয়াছে। বাঙলা সকল খেলার ভারতের কেন্দ্রস্থল অথচ সেই স্থানে কোন স্টেডিয়াম নাই, ইহা অত্যন্তই লজ্জার

ভারতীয় একাদশ দল গঠিত

পুণার এক ভারতীয় একাদশ দল গঠিত হয় ও রজত জয়ন্তী দল ঐ দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। ঐ দলের অধিনায়ক ছিলেন কৃতী ব্যাটসম্যান মুস্তাক আলী। এই দ্বিতীয় খেলা নাগপুরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই খেলায় ভারতীয় একাদশের অধিনায়ত্ব করিবেন পি আর উমরিগার। অমরনাথের অধিনায়কত্ব করিবার কথা ছিল, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ নহেন বলিয়া খেলিতে স্বীকৃত হন নাই। এই দলে মুস্তাক আলী, ভি এল মাঞ্জরেকার, জি এস রামচাঁদ, দীপক সোধন, অনিল লাস্কারী, ডি ধানওয়ালে ও সূর্যনারায়ণ খেলিবেন। দলের অন্যান্য খেলোয়াড়গণের নাম পরে ঘোষণা করা হইবে। এই খেলার ফলাফল পূর্বের খেলার সমতুলা হউক, ইহাই সকলের কামনা।

টেনিস

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইন্যালে ভারত ৫—০ খেলায় শোচনীয়ভাবে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ান বেলজিয়াম দলের নিকট পরাজিত হইয়াছে। এই পরাজয় খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, তবে ইহার জন্য খেলোয়াড় নির্বাচকগণকে, এমন কি দেশের কয়েকজন কৃতী খেলোয়াড় বিশেষ করিয়া নরেশকুমার ও নরেন্দ্রনাথকে দায়ী করা যাইতে পারে। তাঁহাদের শেষ সময়ে ভারতের পক্ষে সমর্থনে অক্ষমতা প্রকাশ করায় কেবলমাত্র দুইজন খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র ও আর কৃষ্ণানকে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে। উপর্যুপরি দুই দুইবার ভারত পূর্বাঞ্চলের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দল না থাকায় সরাসরি আঞ্চলিক ফাইনালে খেলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন,কিন্তু ভবিষ্যতে আর পাইবেন না। কারণ সম্প্রতি ভারতীয় টেনিস এসোসিয়েশনের বৈদেশিক সম্পাদক শ্রীযুত বিনাডুরাইর বিবৃতি হইতেই তাহা উপলব্ধি করা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চল হইতে যদি তিনটি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ডেভিস কাপের পরিচালকমণ্ডলী ঐ অঞ্চলের কোন দেশকেই সরাসরি আঞ্চলিক ফাইনালে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।" সেইজন্য তিনি পূর্বাঞ্চলের সকল দেশকে সজাগ হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ভারতের টেনিস ষ্ট্যান্ডার্ড বা মান খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে, এই বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকারের জন্য বৈদেশিক শিক্ষক আনাইয়া যে ব্যবস্থা হইল তাহাও কেন কার্যকরী হইল না ইহাই আমাদের চিন্তার বিষয়। আমাদের যতদূর আশঙ্কা হয় ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও গলদ বা ত্রুটি আছে। যদি তাহাই না হইবে, তবে কেন উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়রা পূর্বের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের স্থান অধিকারের জন্য

দেশী সংবাদ

৩০শে নবেম্বর—আজ লোকসভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক সাহায্য সম্পর্কিত আলোচনার সংবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেলের বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই বিবৃতিসমূহ পরস্পরবিরোধী। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই, কিন্তু কিছুকাল যাবৎ বিষয়টি সম্পর্কে পাকিস্থান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

আজ লোকসভায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ (সংশোধন) বিল গৃহীত হইয়াছে। এই বিলে কলকারখানার কাজ বন্ধের জন্য কর্মহীন শ্রমিক ও ছাটাই-এর জন্য শ্রমিকদিগকে ক্ষতি-পূরণ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চা-বাগান প্রভৃতির শ্রমিকদের এই বিলের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কম্যুনিষ্টরা একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়।

১লা ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই আজ কলিকাতায় সাংবাদিকগণের নিকট বলেন যে, তিনি আশা করেন, আগামী বৎসরের প্রথম হইতেই কলিকাতায় উৎকৃষ্ট চাউল পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, আগামী বৎসরের জন্য কলিকাতায় চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে বিধান-সভায় গৃহীত পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী উচ্ছেদ বিলটি গ্রহণ করা হইলে পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী রাখা হয়। বিলের আলোচনাকালে রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রী এস কে বসু বলেন যে, বিরোধী পক্ষ হইতে মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্ষতিপূরণস্বরূপে দেয় নগদ অর্থের একাংশ পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়নের জন্য একটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা সরকার যত্ন সহকারে বিবেচনা করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অনাথ-আশ্রমে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত প্রায় ৫৬২ জন উদ্বাস্তু অনাথ শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদানের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ২৭টি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর তাহা অনুমোদন করিয়াছেন।

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে সহকারী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণে-শ্বরের মন্দিরের নিকট সামরিক ঘাটি স্থাপনের প্রস্তাবটির 'আপত্তিকর অংশগুলির' সংশোধন করা হইয়াছে। তিনি একথাও স্বীকার করেন যে, মন্দিরের নিকট সামরিক ঘাটি নির্মাণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট দক্ষিণেশ্বরবাসীরা আপত্তি জানাইয়াছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ঘোষণা করেন যে, ভারতের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সম্প্রসারণ হিসাবে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য আরও ৪৫ কোটি টাকা দেওয়া হইবে এবং ঘাটতি অঞ্চলে সাহায্য দিবার জন্য রাজ্যসমূহকে ৪০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইবে।

৪ঠা ডিসেম্বর—অদ্য শুক্রবার রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকায় বৈষ্ণবজগতের প্রখ্যাত গুরু ও সাধক রামদাস বাবাজী মহারাজ বরাহনগরস্থ পাটবাড়ীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। দেহরক্ষার সময় তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল।

অদ্য লোকসভায় কম্যুনিস্ট দলের নেতা শ্রী এ কে গোপালনের বেকার সমস্যা সংক্রান্ত প্রস্তাবটির আলোচনা আরম্ভ হয়। এই প্রস্তাবটিতে সরকারকে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি রোধ করিতে ও বেকারদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে।

৫ই ডিসেম্বর—আজ নয়াদিল্লীতে শ্রী নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। উহাতে দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে গৃহীত এক সুদীর্ঘ প্রস্তাবে ভারতের কোন কোন অঞ্চলের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সদ্য উদ্ভূত অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

ক্যাপ্টেন আর ডি কাটারি ভারতীয় নৌবহরের প্রথম ভারতীয় সহকারী প্রধান সভাপতি এবং ক্যাপ্টেন এ চক্রবর্তী বোম্বাইয়ের প্রথম ভারতীয় কমোডর ইনচার্জ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬ই ডিসেম্বর—আজ নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দুইদিবসব্যাপী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। ওয়ার্কিং কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান উপনিবেশিক আধিপত্য ও জাতি বৈষম্যের নিন্দা করিয়া এবং গণতন্ত্র ও বিশ্ব-শান্তির প্রয়োজনে উহার উচ্ছেদ দাবী করিয়া এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে নবেম্বর—ভারতের খ্যাতনামা রাজ-নীতিবিদ্ শ্রীবেনেগল নরসিং রাও ৬৬ বৎসর বয়সে আজ সকালে জুরিখে পরলোকগমন করিয়াছেন।

মিশরের সহিত সুদানকে যুক্ত করিবার পক্ষপাতী জাতীয়তাবাদী ইউনিয়নিস্ট দল সুদানের নির্বাচনে জয়ী হইয়াছে।

১লা ডিসেম্বর—পাকিস্থান আমেরিকাকে পাকিস্থানে বিমানঘাটি স্থাপন করিতে দিবার এবং মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থায় যোগদানের মনস্থ করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্থানের নিকট ঐ বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা দাবী করিয়াছে বলিয়া সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী 'তাস' জানাইয়াছেন। গতকল্য করাচীস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মারফৎ উক্ত প্রতিবাদলিপি পেশ করা হইয়াছে।

কেনিয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের ঘাটি বলিয়া বর্ণিত চিহ্নিত এবারডেয়ার অরণ্যাঞ্চলের উপর বৃটিশ বোমারু বিমান হইতে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পাঁচ শত ও এক হাজার পাউণ্ডের বোমা বর্ষিত হয়। লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, কেনিয়ায় যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তাহার ফলে চার্চিল সরকারের বিরুদ্ধে রক্ষণ-শীল দলের মধ্যে ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

রয়টারের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নাইরোবিতে সামরিক আদালতে ক্যাপ্টেন গ্রিফিথসের বিচারের সময় এইরূপ অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, মাউ মাউদের হত্যা সম্পর্কে বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ধুম পড়িয়া যায়। প্রত্যেক সৈন্যকে প্রতি হত্যা-কাণ্ডের জন্য পাঁচ শিলিং করিয়া পুরস্কার দেওয়া হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর—দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য মালান সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

৫ই ডিসেম্বর—গতকল্য বারমুডায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ ল্যানিয়েলের মধ্যে চারিদিন ব্যাপী সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

৬ই ডিসেম্বর—ভারত অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-সমস্যা লইয়া যে ক্ষোভ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র উক্ত ইউনিয়ন এমন কি আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না, যেখানেই অশ্বেতকায়-গণ আছে, সেখানেই উহা ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

২১ বর্ষ
সংখ্যা ৭

দেশ

শনিবার
৪ পৌষ, ১৩৬০

DESH SATURDAY, 19TH DECEMBER, 1953.

সম্পাদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রধানমন্ত্রীর সতর্ক বাণী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহর, গত ১৩ই ডিসেম্বর দুই দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। দুই বৎসর পর পণ্ডিতজীর পশ্চিমবঙ্গে আগমন। তিনি ময়দানে একটি জনসভায়, চেম্বার্স অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশনে, কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলনে এবং নৌ-ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসকর্মীদিগকে তিনি জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠতর সংযোগ সাধন করিতে উপদেশ দেন। বণিক সভায় ব্যবসায়ীদের জনস্বার্থের প্রতি অবহিত হইতে বলেন। আমেরিকার সহিত পাকিস্থানের সামরিক চুক্তির বিষয়টি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ময়দানের সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তিনি এমন সামরিক চুক্তির সম্ভাবনাতে আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পাকিস্থান এই চুক্তির কথা কতকটা অস্বীকার করিয়াছে বটে; কিন্তু আমেরিকা এবং পাকিস্থানের সে প্রতিবাদের ভাষার মধ্যে প্যাঁচ আছে। এই দুই দেশের অনেকে এমন উক্তি এবং বিবৃতি দিয়াছেন, যাহাতে দুই দেশের মধ্যে সামরিক চুক্তির সম্ভাব্যতাই সূচিত হয়। এমন অবস্থায় ভারত এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না। পণ্ডিতজীর এইরূপ মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের সংঘাতে এশিয়ার উপর হইতে সাম্রাজ্যবাদীদের কব্জী শিথিল হইয়া পড়ে। এশিয়ার কয়েকটি দেশ স্বাধীন হয় এবং অপর কয়েকটি স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। বর্তমানে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীর দল এশিয়ার এই নবজাগরণকে প্রতিহত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে ভারতের উপর কারণ, ভারতের স্বাধীনতা এশিয়ার নবজাগরণের মূলে প্রভূত প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। সুতরাং চারিদিকে বেড়াজাল ফেলিয়া ভারতকে দুর্বল করিয়া ফেলিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিনিচয় যে সর্বপ্রযত্নে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং তাহাদের সে অভিসন্ধির পরিচয় বহুভাবেই পাওয়া যাইতেছে। এইরূপ সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে ভারত কোনক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজ আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিজেদের ভিতরকার ভেদ-বিভেদ বিস্মৃত হইয়া সংঘবদ্ধ হওয়াই এক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই সতর্ক বাণী সমগ্র দেশকে সচেতন করিয়া তুলিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল

গত ৩রা ডিসেম্বর আচার্য নন্দলাল বসু ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আগামী ২০শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে শ্রদ্ধাদানের একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সেখানে তাঁহার চিত্রের একটি প্রদর্শনীও খোলা হইতেছে। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান আশ্রমিক সংঘ এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। শান্তিনিকেতন আচার্য নন্দলালের তপস্যার ক্ষেত্র এবং ইহাই তাঁহার অবদানের তীর্থভূমি। আচার্যের পদমূলে সমবেত হইয়া যে সব ছাত্র তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই উদ্যোগে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। কিন্তু নন্দলালের সাধনা শুধু শান্তিনিকেতনের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, তাহা সমগ্রভাবে জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং অর্ঘ্যদানের এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমগ্র জাতিরও সংযোগ রহিয়াছে। অনুষ্ঠানের কর্মসূচী তদনুযায়ী সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। মহতের পূজায় গোষ্ঠীগত নহে, সমগ্র জাতি সমুন্নত হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম আশ্রমিক সংঘ এই সত্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছে এবং তদনুযায়ী কর্মসূচী বিনির্মিত হইতেছে। এই উপলক্ষে তাঁহারা শিল্পাচার্যের জীবনী এবং তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে একটি অভিনন্দন-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। এই পুস্তকে আচার্য নন্দলালের জীবনী এবং শিল্প সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা থাকিবে এবং তাঁহার সম্পূর্ণ চিত্রাবলীর তালিকা থাকিবে। বস্তুত আশ্রমিক সংঘ যে দায়িত্ব লইয়াছেন, তাহা নিতান্ত লঘু নহে। ইহা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। এজন্য সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রমোহন

সেন, শান্তিনিকেতন হইতে শুধু সঙ্ঘের সভ্যগণের নহে, শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর সুহৃৎবর্গ এবং নন্দলালের কলানুরাগীদের সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সাহায্য কেবল আর্থিক আনুকূল্যের জন্য নয়, প্রস্তাবিত গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহ সম্পর্কেও বটে। নন্দলালের জীবন সম্বন্ধে কোন তথ্য, যেমন চিঠি-পত্র, টুকরো ঘটনা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি এবং কোন বিশেষ ছবি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর সাদরে গৃহীত হইবে। আচার্য নন্দলালের শিল্পকলা সম্বন্ধে রচনাও আহ্বান করা হইয়াছে। আমরা আশা করি দেশবাসী, এই মহৎ পূজার পূর্ণাঙ্গতা সাধনে আশ্রমিক সঙ্ঘকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

সাহিত্য-সংসদ ও সরকার

সম্প্রতি ভারতীয় রাজ্যপরিষদে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত এবং আধুনিক রীতিতে সেগুলির দ্রুত উন্নতি সাধনের উপায় বিনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। শিল্প-বিভাগের উপমন্ত্রী উত্তরে বলেন, এ কাজটি নবগঠিত সাহিত্য সংসদের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। তিনি ইহাও জানান যে, সংসদের কাজ সত্বরই আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোনীত সদস্যদের তালিকা ভারত সরকার ইতোমধ্যেই পাইয়াছেন। ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার উপরই অনেকখানি নির্ভর করে। কোন ধরা-বাঁধা সূত্র বা নিয়মাবলী প্রবর্তনের দ্বারা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব নয়; পক্ষান্তরে সেগুলি সাহিত্যের সাধনার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করিয়া থাকে। তবে মোটামুটি প্রস্তাবিত সংসদের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সংযোগের ঘনিষ্ঠতা সাধন এবং সামঞ্জস্য বিধানের পথ বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্বৎমণ্ডলীর সমবেত সাধনার দ্বারা অনেকটা সুগম হইতে পারে। ভারতের পক্ষে এ প্রয়োজন বিশেষ-ভাবেই রহিয়াছে একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষিত উক্ত সংসদটি কিভাবে পরিচালিত হইবে এবং তাহার কার্যক্রমই বা কি, সে সম্বন্ধে দেশের লোকে কিছুই অবগত নহে। উপ-শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি হইতে বোঝা যায়, ভারত সরকার এই সংসদের কার্যক্রম স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাঁহারা সংসদের সাহায্যে কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান, যদি ইহাই হয়, সমগ্র কার্যক্রমটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করা সরকারের উচিত এবং এইরূপ একটি গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্বন্ধে দেশের লোককে বিচার-বিবেচনা করিতে সুযোগ দান করা তাঁহাদের কর্তব্য।

খোলা বাজারে চাউল

খোলা বাজারে চাউল সম্বন্ধে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার সম্প্রতি দুইটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, খোলা বাজারে চাউল বিক্রয়ের জন্য ভারতের বাহিরে বিদেশে এবং ভারতের ভিতরে কেবল উত্তর প্রদেশ হইতে চাউল সংগ্রহ করা যাইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গের কোন স্থান হইতে চাউল ক্রয় করিতে পারিবেন না। এক্ষেত্রে সমস্যা দাঁড়ায় এই যে, ভারতের বাহির হইতে চাউল আমদানী করিতে গেলে যে দাম দিতে হয়, তাহাতে ব্যবসায় পোষায় না, উত্তর প্রদেশেও চাউলের মূল্য চড়া। পশ্চিমবঙ্গে এবার প্রচুর চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় চাউলের মূল্য প্রতি মণ ৭৷৷৹ টাকার নীচে নামিয়া গিয়াছে। এজন্য সরকার স্বয়ং সেখানে চাউল ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তথাপি ব্যবসায়ীদিগকে এই সব স্থান হইতে চাউল ক্রয় করিবার সুবিধা দেওয়া হইতেছে না কেন? অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থার ফলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিবার কৌশল প্রযুক্ত হইতে পারে, সরকার সম্ভবত এই আশঙ্কা করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে এইরূপ সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম-বঙ্গের কৃষকদের উপর অবিচার করা হইতেছে এইরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে অপেক্ষাকৃত কম দরে চাউল পাইবার সুবিধা থাকিতেও রেশনভুক্ত অঞ্চলের লোকেরা অধিক মূল্য দিয়া নিকৃষ্ট ধরণের বাহিরের চাউল লইতে বাধ্য হইবে, ইহাও সঙ্গত নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে সরকারী নীতি যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ বজায় থাকে এরূপ সর্বাধিক বিবেচনার সহিত পরিচালিত হওয়া উচিত।

সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য ভয়

পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের জন্য তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি জনাব শহীদ সুরাবর্দী সম্প্রতি ঢাকা শহরে একটি বিবৃতিতে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ আগামী নির্বাচনে প্রাধান্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মোল্লা-মৌলবী-দিগকে ভাড়াটিয়াস্বরূপে নিযুক্ত করিতেছে। মোল্লা-মৌলবীরাই পাকিস্থান ইসলামিক গণতন্ত্রের প্রাণধর্মের পরিচালন কর্তা, সুতরাং মুসলিম লীগ যে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবে, ইহা তো জানা কথা। ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার উপর যে শাসনতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ধর্মের ব্যবসা যাহারা চালায়, তাহাদিগকে হাতে রাখিতে পারিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। লীগ নেতাদের এ বুদ্ধিটুকু থাকিবে না, জনাব সুরাবর্দী কেমন করিয়া এই আশা করেন! পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন সার বুঝিয়া লইয়াছেন। তিনি পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, আগামী নির্বাচনে লীগ পক্ষ যদি জয়ী না হয়, তবে ইসলামিক গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিবে। বিরোধী পক্ষ সেক্ষেত্রে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দিয়া মিলিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবে? এইভাবে শাসনক্ষমতার অংশী-দার হইবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তাহাই যদি হয়, তবে আর পাকিস্থানের মাহাত্ম্য রহিল কি! সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে সমানাধি-কার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের জিম্মী বা অনুগ্রহ-প্রার্থীর পর্যায়ে পরিণত করিতে হইবে—ইহাই তো ইসলামিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য!
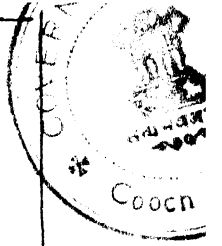
পাখিধরার ফাঁদ : শিল্পী—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। কিছুকাল যাবৎ ইনি মুসৌরীতে স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষকতার কাজে লিপ্ত রয়েছেন। গত ১৪ই ডিসেম্বর থেকে বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের শিল্পকলার একক প্রদর্শনী চলেছে। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের বোম্বাই শাখা এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা।

বেরমুদা কনফারেন্স শেষ ক'রেই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার সোজা নিউইয়র্কে এসে ইউনো'র জেনারেল এ্যাসেম্ব্লীর সামনে এক বক্তৃতা করেন। আমেরিকা কী পরিমাণ এ্যাটম বোমা ও অন্যান্য এ্যাটমিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও মজুত করেছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার একটি রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেন। এ্যাটমিক বিজ্ঞানে বৃটেন ও কানাডার উন্নতির কথাও তিনি বলেন। সঙ্গে সঙ্গে এবিষয়ে রাশিয়ার অগ্রগতির কথাও মিঃ আইজেনহাওয়ার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এ্যাটমিক যুদ্ধ বাধলে সেটা এক-তরফা হবে না। আমেরিকার উপর আক্রমণ হলে আমেরিকা অবশ্য শত্রুর দেশকে এ্যাটম বোমা দিয়ে ছারখার করে দিতে পারবে' কিন্তু আমেরিকাকে শত্রুর এ্যাটম বোমার আক্রমণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বাঁচানো সম্ভব হবে না অর্থাৎ আত্মরক্ষার যথসাধ্য ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও আমেরিকার উপরও এ্যাটম বোমা দু' পাঁচটা পড়বে। মানবজাতির পক্ষে এ্যাটমিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার জগতের উপর থেকে এই ভয়ের ভার লাঘবের জন্য একটি প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবের তাৎপর্য হ'চ্ছে এই যে, এ্যাটমিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণকর শান্তিমূলক কাজে লাগানোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। বৈদ্যুতিক শক্তির মতো এ্যাটমিক শক্তিকেও শিল্প প্রভৃতি সৃষ্টিমূলক কাজে লাগানোর পথ আবিস্কৃত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সী স্থাপনের প্রস্তাব করেন যার কাজ হবে এ্যাটমিক শক্তির শান্তিমূলক ব্যবহারের জন্য গবেষণাদি চালানো। তবে ফল সকল দেশেরই উপকারে আসবে। এ্যাটমিক শক্তি উৎপাদনের জন্য যে-পদার্থ আবশ্যক এ্যাটমিক বিদ্যায় অগ্রসর দেশ-গুলি চাঁদা করে তার একটা ভাণ্ডার এই আন্তর্জাতিক এজেন্সীর কাজের জন্য তৈরী করে দেবে এবং গবেষণার জন্য বিজ্ঞানীও সরবরাহ করবে। বর্তমানে আমেরিকায় অত্যন্ত কড়া নিয়ম আছে যাতে এ্যাটমিক বিদ্যাবিষয়ক কোনো তথ্য ভিন্নদেশীয় লোকের নিকট ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। মিঃ আইজেনহাওয়ার বলেন

যে, তিনি আশা করেন যে, মার্কিন আইন পরিষদ এই আইনের কঠোরতা হ্রাস করতে রাজী হবেন।

উত্তম কথা। কিন্তু এ্যাটমিক বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র তৈরীর ব্যাপারটার কী হবে? সেটা চলতেই থাকবে, সেটা বন্ধ করা নাকি এখন নিরাপদ হবে না। তাহ'লে মানুষকে এ্যাটমিক যুদ্ধের ভয় থেকে উদ্ধার করার কাজ কতটুকু এগুবে? এ্যাটমিক শক্তি উৎপাদনের মাল যার যার হাতে আছে তার ছিটে ফোঁটা মাত্র প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক এজেন্সীকে দেয়া হবে। নিজেদের ঘরে গবেষণার যা শ্রেষ্ঠ ফল তা নিজেদের কাজের জন্য গোপন রাখা হবে, মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে গোপন পাল্লাও চলতে থাকবে। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক এজেন্সীর কাজ যা হবে সেটা তুলনায় নিতান্তই একটা মনভুলানো ব্যাপার হবে। আসলে আমেরিকা এ্যাটম বোমা ত্যাগ করতে রাজী নয়। রাশিয়াও এ্যাটম বোমা তৈরী করছে কিন্তু অমেরিকার বিশ্বাস, পরিমাণে আমেরিকা অনেক এগিয়ে আছে এবং এগিয়ে থাকতে পারবে। পরিমাণের দিক দিয়ে এই সুবিধা আমেরিকা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। সেইজন্য যুদ্ধে এ্যাটম বোমার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে রাশিয়ার প্রস্তাবে আমেরিকা সম্মত হতে পারছে না। এ্যাটমিক ব্যাপারের উপর নজর রাখার আন্তর্জাতিক সুব্যবস্থা হচ্ছে না ব'লেই আমেরিকা সম্মত হ'তে পারছে না তা নয়। আমেরিকা মনে করছে যে, এ্যাটম বোমার ব্যবহার বর্জন করতে রাজী হওয়ার অর্থ হবে সোভিয়েট ব্লকের সামরিক শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। সোভিয়েট ব্লকের সৈন্যবল ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের তুলনায় অনেক বেশি। এ্যাটম বোমার পরিমাণ বা সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সেটা কাটানো যাচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ যদি এ্যাটম বোমার ব্যবহার বর্জনের নীতি স্বীকার করে নেয় তবে সোভিয়েট ব্লকের

তুলনায় চিরতরে হীনবল হয়ে পড়বে এই মুশকিলের আসান হতে পারে যদি উভয়পক্ষই কেবল এ্যাটমিক অস্ত্র নয় অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধেও একটা বর্জন নীতি অবলম্বন করতে স্বীকৃত হয় অবশ্য তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বোধ হচ্ছে পৃথিবীকে দেখানো যে, আমেরিকা শান্তিকামী। যাকে বলে "peace offensive" এটা তারই একটা নমুনা। মিঃ আইজেনহাওয়ারের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের বক্তৃতাকে কেউ "যুগান্তকারী" আখ্যা দিয়েছেন—সেটা প্রোপাগাণ্ডা। মার্কিন প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাব অনুসারে একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সীর সৃষ্টি হলেও তদ্দ্বারা কোন "যুগান্তর" উপস্থিত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

* * *

কোরিয়া সম্পর্কে রাজনৈতিক কনফারেন্স আহ্বান করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ডীন এবং চীনা ও উত্তর কোরিয়ান প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধ'রে পান-মুন-জনে যে "প্রাথমিক" আলোচনা চলছিল সেটা আপাতত ভেঙ্গে গেছে। বর্তমানে দুই পক্ষ পরস্পরকে গালাগালি দিতে ব্যস্ত। মিঃ ডীন বলেছেন যে, কম্যুনিস্ট পক্ষ কেবল টালবাহনা করছেন এবং তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিয়েছেন। তাঁরা এখনো বলছেন যে, ডক্টর সিংম্যান রী কর্তৃক যুদ্ধবন্দী-দের মুক্তিদানের ব্যাপারে মার্কিন কর্তৃপক্ষের যোগসাজস ছিল। মিঃ ডীন বলেছেন যে, কম্যুনিস্টপক্ষ যদি এই অপবাদ প্রত্যাহার না করেন তবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যেতে পারে না। মিঃ ডীন মার্কিন গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য আমেরিকায় ফিরে গেছেন। এদিকে কম্যুনিস্টপক্ষ বলছেন যে, আমেরিকায় চেষ্টা হচ্ছে যাতে রাজ-নৈতিক কনফারেন্স না বসে।

সময়ও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক কনফারেন্স শুরু হবার কোনো আশাই দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারটাও অচল অবস্থায় এসে

য়েছে। প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক বন্দীদের রে যাওয়ার পক্ষে "ব্যাখ্যা" শোনার ন্যও হাজির করা যাচ্ছে না। Neutral ations Repatriation Commission থ দেখতে পাচ্ছেন না, নিজেদের মধ্যে তবিরোধও পরিস্ফুট। সবচেয়ে মুশকিল য়েছে ভারতীয় পাহারাদার ফৌজের। দ্ধবিরতির চুক্তির সর্তানুসারে "ব্যাখ্যা" লের মেয়াদ হচ্ছে ৯০ দিন। তার মধ্যে -সব বন্দী ফিরে যাবে না তাদের বিষয়ে বেচনা করার জন্য রাজনৈতিক নফারেন্সকে ৩০ দিন সময় দেবার থা। তার মধ্যে যদি রাজনৈতিক নফারেন্স কোনো মীমাংসায় উপস্থিত তে না পারে তবে প্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক দ্ধবন্দীরা "অসামরিক আখ্যা" প্রাপ্ত বে অর্থাৎ তাদের মুক্তি দিতে হবে এবং রা যেখানে যেতে চায় তাদের সেখানে ওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। "ব্যাখ্যার" ন্য নির্দিষ্ট ৯০ দিনের মধ্যে "ব্যাখ্যা" র্য সমাধা হবার কোনোই সম্ভাবনা ই। তারপর ৩০ দিনের মধ্যে যে জনৈতিক কনফারেন্স শুরু হতে পারবে র আশাও সুদূরপরাহত। যেরকম বস্থা তাতে রাজনৈতিক কনফারেন্স াদৌ বসবে কিনা তাও অনিশ্চিত।

ক্ষিণ কোরিয়া গভর্নমেণ্ট বলছেন যে, ব্যাখ্যার" আরম্ভ থেকে ৯০ দিন গত ওয়ার পরে যদি রাজনৈতিক কনফারেন্স া মিলিত হয় তবে তখনই বন্দীদের ছেড়ে দতে হবে। বড়োজোর তারপর রাজ-নৈতিক কনফারেন্সের জন্য আর ৩০ দিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। যুদ্ধবন্দীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরে রাখা যাবে না। দ্ধবিরতি চুক্তিতে যে-যে সময় নির্দিষ্ট আছে তার চেয়ে বেশি দিন রাখা যাবে না। মার্কিন কর্তৃপক্ষেরও সেই মত। কম্যুনিস্টপক্ষের কথা হচ্ছে, চুক্তিতে উল্লিখিত "ব্যাখ্যা"দির সর্ত যদি ঠিকমত পালিত না হয়, অর্থাৎ যদি সর্তানুসারে 'ব্যাখ্যার" কার্যই না করা হয় তবে চুক্তিই ভঙ্গ হোল, সুতরাং সময়ের সর্তও তখন থাকে না। এখন ভারতীয় পাহারাদার সেনা করবে কী? যে-পক্ষের কথাই ঠিক হোক, ভারতীয় সেনা তো অনির্দিষ্ট-কালের জন্য কোরিয়ায় এই অবস্থায় থাকতে পারবে না। দুই পক্ষ যদি কোনো মীমাংসায় না আসেন তবে ভারত গভর্ন-মেণ্টকে নিজের কর্তব্য স্থির করতে হবে। সেটা করাও সহজ নয় কারণ যাই করা হোক, এক পক্ষ রুষ্ট হবেন এবং তার ফল কোরিয়ার শান্তির পক্ষে কী হবে বলা যায় না। ১৬।১২।৫৩

ট্রামে-বাসে

আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ নিক্সনের ছাঁটাইর (গদি হইতে নয়) প্রয়োজন সংবাদ পাইয়া পাকিস্তান নাপিত সমিতি নাকি বিনামূল্যে তাঁর চুল ছাঁটিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।—"মিঃ নিক্সন শেষ পর্যন্ত কী করবেন

জানিনে তবে একথা বলতে পারি যে দশ-আনা-ছ' আনা, এক-আনা পোনর-আনা এমন কি দরকার হলে শুধু ষোল আনা অর্থাৎ বেমালুম মুণ্ডন প্রভৃতি বাহারে-ছাঁটে পাক-নাপিতদের হাত বেশ পাকা। ছাঁটাইর শেষে দলাই-মলাই বা মাথায় হাত বুলনোতেও তারা ওস্তাদ, নিক্সন একবার মাথাটা বাড়িয়ে দিয়ে পরখ করতে পারেন"—মন্তব্য করেন আমাদের খুড়ো।

* * *

রাজভবনে খাদ্য প্রদর্শনীর পর ভালো সাজানো-গোছানো গৃহ প্রদর্শনীও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।—অতঃপর মা যা হইবেন তার একটা প্রদর্শনী হলেই আমরা গলা খুলে জয় হিন্দ্ করতে পারি" বলে শ্যামলাল।

* * *

মস্কোর প্রাভ্দা বলিয়াছেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছে; এখনও বিশ্ব-শান্তির জন্য সেইরূপ সহযোগিতা করিতে পারে।—"কিন্তু সেটি হচ্ছে না দেখে প্রাভ্দা প্রশ্ন করতে পারেন,—সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুরপাড়ে ঘর, এখন কেন গো মামী দুধে নেই সর"—ছড়া কাটিয়া মন্তব্য করিলেন এক সহযাত্রী।

* * *

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রাজনৈতিক কারণে অনশনের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। —"অর্থনৈতিক কারণে অনশনের তারিফ করা হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন খবর এখনো পাওয়া যায়নি" —বললেন বিশু খুড়ো।

* * *

পাক্-আমেরিকান মৈত্রী সংবাদে যে দুইটি দেশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে সে দুইটি হইল ভারত এবং রাশিয়া—বলিয়াছেন টাইমস্ অব্ করাচী।—"নিয়মিত চাবি এবং অয়েলিং হলে করাচী টাইমস্ ভালো টাইম দেয়" বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন শান্তি নামক গাছের চারাটি যে-কোন

মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে বাঁচে না—"সেই জন্যেই তো আমরা বরাবর সিন্ধ্রী সার ব্যবহারের পক্ষপাতী"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

তানসেন সঙ্গীত সম্মিলনীর ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন উৎসবে সভাপতি শ্রীযুক্ত বিনয় সেন মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে অন্তরে সঙ্গীতের স্পর্শ অনুভব করিতে না পারিলে জীবনে আনন্দের স্বাদ পাওয়া যায় না।—"কিন্তু পকেটে পয়সার স্পর্শ না থাকলে কী করে সঙ্গীত সম্মিলনীর গান শোনা যায় সে সম্বন্ধে কিছু বাৎলে দিতে পারলে আমরা উপকৃত হতে পারতাম। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনীর দর্শনী বড় বেশি উঁচুতে বাঁধা, তারা থেকে মুদারা পর্যন্ত নাবে না" বলেন এক সহযাত্রী।

সংগীত সম্মিলনীতে বরিশালের বিখ্যাত ঢোলবাদক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ নট্ট সকলকে ঢোল বাজাইয়া আনন্দদান করিয়াছেন।—"তাঁর বাহাদুরী আছে বলতে হবে। আজকালকার আসরে শুনেছি ঢোলের চেয়ে ঢাকের বাদ্যির কদরই বেশি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

মহামান্য আগা খাঁ শীঘ্রই করাচী সফরে আসিতেছেন। শুনিলাম এবার তাঁহাকে প্লেটিনাম দিয়া ওজন করা হইবে। বর্তমানে তাঁর ওজন পনের স্টোন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন,—"আগা খাঁ সাহেবের স্টাডের ঘোড়া আবুনাবাস্ কোলকাতা ঘোড়দৌড়ের মাঠে যা টাকা খেয়েছে, দামের দিক থেকে তা-ও বোধ হয় পনের স্টোন প্লেটিনামের সমান হবে। আমরা আদার বেপারি, আগা খাঁ আর আবুনাবাসের নামেই আমাদের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। সুতরাং রাংতা আর প্লেটিনামের ওজন-ফোজনের খবর আমাদের কাছে সবই এক!!"

* * *

শুনিলাম নেক্টাইর হিন্দী অনুবাদ করা হইয়াছে "কণ্ঠ লেঙ্গটি"। শ্যামলাল বলিল—"লেঙ্গটকে

কণ্ঠস্থানে উন্নীত করায় এ ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না!!"

জননী সারদেশ্বরী

শ্রীসরলাবালা সরকার

১৭৭৫ শকাব্দ, ১২৬০ সাল, ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা-সপ্তমী তিথি, রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল, ইংরেজি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে জননী সারদেশ্বরী স্বর্গত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন ১৩৬০ সাল, মায়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কেবল বাঙলাতেই নয়, ভারতের ও সমুদ্রপারেও সর্বত্র অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছে। অথচ মা বাঙলা দেশের পল্লীগ্রামের মেয়ে। কে-ই বা তাঁর নাম জানত? পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বৎসরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হ'ল লোকে তাঁকে বলত, ক্ষ্যাপা। দরিদ্র ঘরের মেয়ে বিয়েও দরিদ্র ঘরেই হয়েছিল। পিতার অত্যন্ত আদরের মেয়ে ছিলেন তিনি, গরিবের ঘরের মেয়ে ব'লে তাঁর অনাদর ছিল না। পিতাও ছিলেন অতি-সাধু এবং নিষ্ঠাবান। তাঁর পিতার পরিচয় একটি ঘটনাতেই জানা যায়। সে ঘটনাটি এই:—একবার মাঠের ধান পঙ্গপালে খেয়ে গেল, জয়রামবাটী আর তার কাছাকাছি সব অঞ্চলেই দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রামচন্দ্র সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, তবুও সেই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যেভাবে বুভুক্ষু জনগণের সেবা করেছিলেন, মায়ের কথাতেই তা জানা যায়। মা বলেছেন, "আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল। কলাইও ছিল। বাবা সেইসব ধান চাল করিয়ে কলাইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন, এই খিচুড়ি বাড়ির সকলে খাবে, আর যে যে আসবে তাদেরও দেওয়া হবে। আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে, সে আমার তাই খাবে।"

মা বলছেন, "এক একদিন এত লোক এসে পড়তো যে, রাঁধা খিচুড়ি ফুরিয়ে যেতো। তখন আবার খিচুড়ি চড়াতে হতো। আর সেই খিচুড়ি যেই ঢেলে দেওয়া হতো, লোকেরা সেই গরম খিচুড়ির পাতেই বসে যেতো। আমি তখন শিগ্‌গির জুড়াবার জন্য দু'হাতে পাখা নিয়ে বাতাস করতুম।"

এই বর্ণনাটির ভিতরে পিতা ও পুত্রী দুজনেরই কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

পৌষ মাসে মায়ের পাঁচ বৎসর পূর্ণ হ'ল, আর বিয়ে হল বৈশাখ মাসে। বিয়ের আগেই বর-কন্যার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। পল্লীগ্রামে চৈত্র মাসে বন-ভোজনের রীতি আছে। সারদামণির মা শ্যামাসুন্দরী অন্যান্য পল্লীবাসিনীদের সঙ্গে বনভোজনে গিয়েছিলেন। ছেলে-মেয়েরাও সবাই গিয়েছিল তাদের মায়েদের সঙ্গে। ঠাকুর তখন কামার-পুকুরে এসেছিলেন, তার বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। তিনিও বনভোজনে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের নাম ছিল গদাধর,

জননী চন্দ্রমণির সকলের ছোট ছেলে তিনি। তাঁর দাদা রামকুমার রাণী রাসমণির আমন্ত্রণে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীভবতারিণী বিগ্রহের পূজোর ভার নিয়েছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ গদাধরকেও সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে। কিন্তু গদাধর প্রথমে মন্দিরের কোন কাজ নিতে রাজী হন নি। এমন কি তখন মন্দিরের প্রসাদও গ্রহণ করতেন না, নিজে রেঁধে খেতেন।

চন্দ্রমণি লোকের মুখে শুনলেন, তাঁর গদাধর যেন ক্ষ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে। মন্দিরের কোন কাজ নিতে চায় না, খালি পাগলের মত গংগার ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়। সবাই পরামর্শ দিল—ছেলের বিয়ে দাও, তাহলেই ছেলের সংসারে মন বসবে, সমস্ত পাগলামী সেরে যাবে।

কিন্তু ক'নে ঠিক হ'ল এক পাঁচ বছরের খুকী। আর গদাধর নিজেই মনোনীত করলেন নিজের বিবাহের পাত্রী। বনভোজন থেকে ফিরে আসবার পর তিনি তাঁর মাকে জানিয়েছিলেন যে, জয়রামবাটীর ঐ ছয় বৎসরের বালিকাটিকেই তিনি বধূরূপে গ্রহণ করা স্থির করে ফেলেছেন।

বিয়ে হয়ে গেল। কন্যা তাঁর খেজুরতলার খেলাঘরে সংগিনীদের সংগে খেলায় মেতে রইলেন, বর চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

মা বলেছেন, "তখন পাকা খেজুরের সময়, খেজুরতলায় খেজুর কুড়াতাম। সিঁথের সিঁদুর পরবার সময় মনে পড়তো আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

মা বাপের-বাড়িতেই আছেন। ক্রমে বয়স বাড়ছে, মনেরও হয়তো কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। শ্যামাসুন্দরী একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন,—মার বয়স তখন সাত-আট বৎসরের বেশী নয়। সেই সাত বছরের মেয়ের উপরেই পড়লো সংসারের সমস্ত ভার। ছোট ছোট ভাই-বোন আছে, তাদের নিজে হাতে রান্না করে খাওয়ানো, স্নান করানো, কাপড় পরানো প্রভৃতি প্রতিটি কাজ নিজের হাতেই তাঁকে করতে হ'ত; তাছাড়া ছোট একটি ভাইকে পাঠশালায় দিয়ে আস্তে হ'ত, আবার সেখানে গিয়ে তাকে পাহারা দিতেও হ'ত। ক্ষেতে 'মুনিষ'জন কাজ করছে, তাদের জলখাবার দিয়ে আসতে হ'ত। কেবল ভাতের হাঁড়িটি নামানোর সময় বাবার ডাক পড়তো, কেননা ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারতেন না।

মধ্যে অল্পদিনের জন্য দু'বার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন। আর একবার যখন মা'র সাত বৎসর বয়স, তখন ভাগ্নে হৃদয়ের সংগে রামকৃষ্ণ জয়রামবাটী এসেছিলেন। তখন মন্দিরে মা ভবতারিণীর বেশ করবার ভার নিয়েছেন। হৃদয় সে সময় শ্বেত-পদ্ম দিয়ে মায়ের পা পুজো করেছিল, সেই কথাটি মা'র কেবল মনে আছে।

এর পর যে দু'বার কামারপুকুর গিয়েছিলেন, তখন স্বামী দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন, কাজেই স্বামীর সংগে তাঁর দেখা হয় নি।

তারপর দীর্ঘ ছয় বৎসর কেটে গেল। মনে মনে কত যে ছবি এঁকেছেন মা, প্রতীক্ষায় দিন গিয়েছে; কিন্তু স্বামীর সংবাদ আসে নি।

বহুদিন পরে আহ্বান এলো কামারপুকুর থেকে। গদাধর এতদিন পরে বাড়ি এসেছেন, চন্দ্রমণি লোক পাঠিয়েছেন বধূকে নিয়ে যেতে।

সেবার সাত মাস স্বামী ছিলেন কামারপুকুরে। এই সাতমাস যেন বহুদিনের অনাবৃষ্টির পর বারিবর্ষণ। এই সাতমাস যদিও তাঁদের দৈহিক কোন সম্পর্কই ছিল না, তবু সারদামণির অন্তর ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। মা বলেছেন, "তাঁর ভালবাসা আমার মনে যেন আনন্দের ঘট পূর্ণ করে দিল। তিনি যেন আমাকে একেবারে টেনে নিলেন, আপন করে নিলেন। সেই সাতমাস তিনি আমাকে কত যে শিখিয়েছেন। সংসারের প্রতিটি কাজ কিভাবে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হয়, এমন কি প্রদীপে সল্তেটি দেওয়া পর্যন্ত। কিভাবে লোকের সংগে ব্যবহার করতে হয়, অতিথি ও অভ্যাগতদের কিভাবে পরিতুষ্ট করতে হয়, এইসব প্রত্যেকটি বিষয় তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।"

মা এসব কথা বলতে গিয়ে তন্ময় হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, "আমি যেন কি সম্পদ পেলাম। দিনরাত মন উল্লাসে ভরে থাক্তো। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু আমি সব সময়ই তাঁর কথা মনে করে কি আনন্দে যে থাকতুম, তা বলে বোঝানো যায় না।"

মার এই মনের ভাব কেউ জানতে পারতো না, বরং সবাই তাঁর জন্য দুঃখ করতো। বলতো, "আহা, মেয়েটা স্বামী যে কি বস্তু, জানতেই পারলো না।" সব সময়ই তাঁকে স্বামীর নিন্দা শুনতে হত, যেমন শুনতে হয়েছিল সতীর শিবনিন্দা।

এক বছর গেল, দু-বছর গেল, স্বামী তো কোন সংবাদই নিলেন না। কত যে প্রতীক্ষা করে দিনগুলো কাটাচ্ছেন সারদা সেকথা কি তাঁর একবারও মনে হয় না? তিন বছরও যায় যায়। মা বলেন, "এই সময় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, একটা সুযোগ এল।"

১২৭৮ সাল। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রামের অনেক লোক গংগাস্নানের জন্য কলকাতায় যাবে। দক্ষিণেশ্বর তো পথেই পড়ে। মা তাঁর মায়ের কাছে বললেন, তিনিও গংগাস্নান করতে যাবেন।

রামচন্দ্র বোধ হয় মেয়ের মনের ভাব বুঝেছিলেন; তিনি নিজেই মেয়েকে সংগে নিয়ে যাত্রীদলের সংগে রওনা হলেন।

কিন্তু দীর্ঘ পায়ে-হাঁটা পথ। প্রথম দিনই পথের কাঁকরে সারদার পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। অন্য যাত্রীদের মত তিনি তাড়াতাড়ি চলতে পারেন না। তবু যথাসাধ্য চলছেন আর মনে মনে জপ করছেন "দক্ষিণেশ্বর, দক্ষিণেশ্বর।"

এই যে দক্ষিণেশ্বর, এ যে কত বড় তীর্থস্থান, তা কি আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি? কল্পনা করতে পারি কি যে, এক বালিকা চলেছে অনভ্যস্ত কঙ্কর-কণ্টক ক্ষত পদক্ষেপে এই তীর্থের পথে কী মনের ভাব নিয়ে?

মনের আবেগ যতই প্রবল হোক্, শরীর তা সইতে পারলে না, অসহ্য ব্যথা ও জ্বরে মা অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। সেই অচেতন-চেতনার মধ্যে দিয়ে একটি কথা বার বার তাঁর মনে আঘাত করতে লাগলো, "বুঝি হল না, বুঝি দক্ষিণেশ্বর যাওয়া তাঁর ভাগ্যে আর ঘটল না।"

স্বপ্নে দেখলেন, যেন একটি কালো মেয়ে এসে তাঁর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কালোর কিঃঅপূর্ব রূপ! কী নরম স্নিগ্ধ দুখানি হাত। যেন তাঁর শরীর জুড়িয়ে গেল। মেয়েটি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললে, "তুমি দক্ষিণেশ্বরে নিশ্চয়ই যাবে। ভয় কী তোমার?"

পরদিন জ্বর ছেড়ে গিয়েছে, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল। সেই দুর্বল শরীর নিয়েই সারদা পথে বের হলেন পিতার হাত ধরে। কিন্তু বুঝতে পারলেন, আবার জ্বর আসছে, তবে ভাগ্যক্রমে পথে একটা পাল্কী পাওয়া গেল।

রাত্রি নটার সময় সারদামণি তাঁর চিরবাঞ্ছিত তীর্থ দক্ষিণেশ্বরে এসে পৌঁছলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। রোগিণীকে তিনি সযত্নে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, নিজের বিছানার কাছেই তাড়াতাড়ি বিছানা পাতলেন। পাছে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর বেড়ে যায়, তার জন্যে কতই না ব্যাকুলতা!

মা বলেন, "কী আকুল হয়েই বলে-ছিলেন, 'এতদিনে তুমি এলে? আর কি আমার সেজবাবু আছে যে তোমার যত্ন করে?'"

তিন বৎসরের দুঃখ এক মুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল।

নহবৎঘরে ঠাকুরের মা চন্দ্রমণি দেবী থাকতেন, তিনি কামারপুকুর থেকে ছেলের কাছে এসে বাস করছিলেন।

সেই নহবৎঘর! যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন সে ঘরটি অবশ্য সকলেই দেখেছেন। উপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নহবৎখানা, আর নীচের তলায় সেই অন্ধকার কুঠ্‌রী! আলো বাতাসের পথ নেই, দুয়ার এত ছোট যে, ঢুকতে গেলে চৌকাঠে মাথা ঠুকে যায়। মা বলেছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের নবৎ ঘর দেখেছো তো! সেই ঘরেই থাকতাম। ছোট ঘর, আবার ঢুকবার দুয়ার এত ছোট যে, প্রথম প্রথম ঢুকতে গেলে মাথা ঠুকে যেত। শেষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। দরজার সামনে এলে মাথা আপনা থেকেই নীচু হয়ে যেত।"

সেই ঘরে মা ঠাকুরের সেবার আর শাশুড়ীর সেবার জন্য সংসার পাতলেন। পেরেক পুঁতে সিকে টাঙালেন। সিকেয় হাঁড়ির পর হাঁড়ি। ঘরের একপাশে কলসীতে মাছ জিয়োনো আছে। ঠাকুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খান। অন্ধকার থাকতে গঙ্গায় স্নান করে আসেন। রাণী রাসমণির ঠাকুরবাড়ী, মন্দিরের কর্মচারী, অতিথি অভ্যাগত, সাধুসন্ন্যাসী, লোকের অন্ত নেই। কিন্তু কেউই মা'র ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পায় নি। এমন কি ঐ নবৎ ঘরে যে একটি ছোট বউ থাকে এ খবরও অনেকদিন কেউ জানত না। দিনের বেলায় থাকেন নবৎ ঘরে, সমস্ত দিন খুঁটিনাটি সেবার কত কাজ। রাত্রে শাশুড়ীর নির্দেশে ঠাকুরের ঘরে যান, তাঁর শয্যার একপাশে সসঙ্কোচে স্থান গ্রহণ করেন।

ঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি গো, কী মনে করে এলে? আমাকে সংসারের পথে টেনে নিয়ে যেতে?"

কিন্তু সংসারের খবর সারদা কিছুই জানেন না। স্বামী তাঁর সবচেয়ে আপন জন, তাঁর প্রতিটি কথাই তাঁর ইষ্টমন্ত্র। স্বামীর সামান্য সেবা করবার অধিকার পেয়েই তিনি কৃতার্থ। চির জীবনই তাঁর এইভাবে গিয়েছে।

ঠাকুরেরও ভালবাসার অবধি ছিল না। আর সে ভালবাসা মা সব সময়ই মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। কামগন্ধহীন এই অপূর্ব দাম্পত্য প্রেমের তুলনা জগৎ-সংসারে অন্য কোনখানেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক শয্যায় রাত্রির পর রাত্রি যাপন করেছেন পতি আর পত্নী, অথচ দৈহিক সম্পর্কের চিন্তার ছায়ামাত্রও মা'র মনকে স্পর্শ করে নি। স্বামী কখনও থাকতেন সচেতন আবার কখনও বা ভাবসমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন, আর জননী সারদা অনু-গতা শিষ্যার মতো ঠাকুরের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, স্বামীর অমৃতমধুর কথাগুলি তাঁকে যেন সংসারের অতীত এক পরমা-নন্দের রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। তাই তিনি চাঁদের দিকে চেয়ে থেকেছেন জ্যোৎস্না রাত্রে। "চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাতে বলেছি, তোমার ঐ জ্যোৎস্নার মত আমার অন্তর নির্মল করে দাও।" মায়ের এই উক্তি। আবার তিনি বলেছেন, "রাত্রে যখন চাঁদ উঠতো, গঙ্গার জলে তার ছায়া পড়তো, তখন সেই ছায়া দেখে কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, চাঁদেও কলঙ্ক আছে আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।"

এইজন্যই সম্ভব হয়েছিল ১২৮০ সালে ফলহারিণী কালীপূজোর রাত্রে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাতার প্রতীক-রূপে সারদামণি দেবীকে ষোড়শী পূজো। এই পূজোর কথা অনেকেই জানেন।

ঠাকুর দেবী সারদামণিকে সেই রাত্রে পূজো করেছিলেন জগৎজননীর বিগ্রহ রূপে। যথাবিধি-সম্মত তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত সেই পূজো সম্পন্ন হয়েছিল। দেবী বিগ্রহরূপেই সেই পূজো গ্রহণ করেছিলেন। পূজোর শেষে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এতদিনের সমস্ত সাধনার ফল দেবীর পাদপদ্মে নিবেদন করে দিয়েছিলেন।

পূজো শেষে দেবী আবার তাঁর নিজের পূজারিণী রূপ মস্তকে ধারণ করে নবৎ ঘরে ফিরে এসেছিলেন।

এর পর পিতা পরলোকে গেলেন, মা সারদা আবার ফিরে এলেন বাপের বাড়ী, অসহায়া বিধবা জননীর কাছে।

ভাইরা সব ছোট ছোট, একমাত্র বড় ভাই কিছু উপার্জন করেন তাতে সংসার চলে না।

শ্যামাসুন্দরী বাড়ুয্যে বাড়ীর ধান ভানার কার্য নিয়েছেন, মা সারদাও মায়ের সঙ্গে ধান ভানেন।

এইভাবেই সেবার ভিতর দিয়ে মা সমগ্রজীবন তপস্যা করেছেন। যখন মার নাম প্রচার হয়ে পড়েছে, শিষ্য ও ভক্তগণ দলে দলে মার চরণ দর্শন করবার জন্য জয়রামবাটীতে গিয়েছেন অথবা বাগ-বাজারে উদ্বোধনে এসেছেন তখনও মা তাঁদেরই সেবা করেছেন, যাঁরা তাঁর দর্শনার্থী হয়ে এসেছেন। ভক্ত তার পদ-ধূলি গ্রহণ ও প্রণাম করবার পরই তিনি তাঁদের আহারের আয়োজন করবার জন্য অথবা আহার্য সংগ্রহের জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বের হয়ে গিয়েছেন। নিজে হাতে কাঠও কেটেছেন।

বিনা দ্বিধায় আগত শিষ্যার কাঁচা ছেলের ময়লা ন্যাকড়া কেচেছেন। তাঁর পক্ষে সেইটিই ছিল স্বাভাবিক।

মা অতি সরলা, মা গ্রাম্যকুমারী, কুল-বধূর ন্যায় অতি মৃদু আচরণ, অথচ

সর্বদা সঙ্কোচহীন সহজভাব। দ্বিতীয়-বার যখন তিনি পদব্রজে কামারপুকুর থেকে হাঁটা পথে দক্ষিণেশ্বরে যান তখনও সঙ্গীদের সঙ্গ হারিয়ে পথে বিপদাপন্ন হয়েছিলেন। আরামবাগ ছাড়িয়ে পথে তেলো-ভোলার মাঠ। ঐ প্রান্তর অতি বিস্তীর্ণ, জনবসতিও নেই। আবার মাঠে ডাকাতের ভয়ও আছে, তাই সঙ্গীরা সন্ধ্যার আগেই মাঠ পার হবার জন্য এগিয়ে গিয়েছে, মা একলা পিছনে পড়ে গেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে ফেলল। মাঠের পথ আর দেখা যায় না, তবুও মা যথাসাধ্য চলেছেন। এমন সময় পথে এক দস্যুর মতো ভীষণ আকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষের দেখা পেয়ে তাকে তখনই পিতৃসম্বোধন ক'রে বললেন, "বাবা, আমি পথ হারিয়েছি, তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন, সেইখানে আমি যাচ্ছি।' এই নিঃসঙ্কোচে অপরিচিতকে পিতৃসম্বোধন ও 'তোমার জামাই' কথাটিতে মায়ের সরল ও প্রীতিপূর্ণ মনের ভাবটি কি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। একটি মাত্র কথাতেই মা সেই অপরিচিত দস্যু ও তাঁর পত্নীকে যেমন অতি সহজে পরমাত্মীয় করে নিয়েছিলেন, কোন অতি সাহসিকা এবং বয়োধিকাও তা পারেন কিনা সন্দেহ।

এখানে যে ছবিটি আমাদের মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয় সেটি হচ্ছে—একটি সরলা গ্রাম্যবালিকা, স্বামী সন্দর্শনের আশায় আনন্দিতা ও উৎ-কণ্ঠিতা, অনভ্যস্ত পথক্লেশ তাঁকে ক্লিষ্টা করতে পারেনি, অথবা কোন আশঙ্কাই তাঁকে উদ্বিগ্ন করতে পারে না। আবার সবার উপরেই তাঁর এমন আত্মীয়ভাব যে সে আত্মীয়তার প্রভাব অতিক্রম করবার মত শক্তি কারও আছে কিনা সন্দেহ।

বিদেশিনী নিবেদিতা, তিনি ছিলেন মা'র 'খুকি'। আরও কত বিদেশী ও বিদেশিনী মা'র পরমাত্মীয় হয়েছেন তার সংখ্যা নেই। মা যখন দাক্ষিণাত্যে যান তখন সেই দেশবাসী ও দেশবাসিনী আবালবৃদ্ধবনিতা মাকে অতি আপনার করে পেয়েছিল, ভাষার জন্য আত্মীয়তার কোন বাধাই হয় নি।

মার সরলতা আবার সেই সঙ্গে গভীর বুদ্ধিজনিত অনুভূতি যেন অতি সহজে একসঙ্গে মিলে মিশে এক হয়েছিল। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখেছেন, 'দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় আমাদের পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীকে পান সাজিতে ও তাঁহার বিছানাটা ঝাড়িয়া ঘরটা ঝাট পাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে গেলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন এমন সময় ঠাকুর মন্দির হইতে ফিরিলেন যেন পুরোদস্তুর মাতাল। চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐভাবে টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীশ্রীমা'র নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমা তখন একমনে গৃহকার্য করিতে-ছেন, ঠাকুর যে তাঁহার নিকট ঐভাবে আসিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন নাই। এমন সময় ঠাকুর মাতালের মত তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?" মা পশ্চাৎ ফিরিয়া ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবা-বস্থ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত। বলিলেন, "না, না, মদ খাবে কেন?" ঠাকুর বললেন, "তবে কেন টলছি? তবে কেন কথা বলতে পারছি না? আমি কি মাতাল?" শ্রীশ্রীমা—"না, না, তুমি মদ খাবে কেন? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।"। ঠাকুর শুনিয়া "ঠিক বলেছ" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।"

আবার অন্যত্র:—

"ঠাকুর পাণিহাটিতে যাইবেন। মাও সঙ্গে যাইতে চাহেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। মায়ের সঙ্গিনীগণের যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মা যাইতে চাহিলেন না। ঠাকুর ইহাতে আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ও খুব বুদ্ধিমতী, যেতে চাইল না। গেলে পরে লোকে বোলতো হংস হংসী একত্রে এসেছে।

কিন্তু মা যেতে চান নাই কেন? সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, "উনি আমি যেতে চাই কিনা জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, কিন্তু "তোমার যেতে হবে" এ কথা তো বললেন না। এতে আমার মনে হল, না যাওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের মারোয়াড়ীভক্ত লছমীনারায়ণ ঠাকুরকে দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে ঠাকুর বলেছিলেন, "আমার মাথায় যেন কে করাত বসিয়ে দিল। মাকে, বল্লাম মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাতে এলি?"

তারপর ওর মন বুঝবার জন্যে ওকে ডাকিয়ে বললাম—

ওগো এই টাকা দিতে চাইছে, আমি নিতে পারবো না বলে তোমার নামেই দিতে চাইছে, তুমি নাওনা কেন, কি বল? শুনেই ও বললো তা কেমন করে হবে? আমি সে টাকা তো তোমার জন্যই খরচ কোরবো, আমি নিলে তো তোমারই নেওয়া হবে। কাজেই টাকা নেওয়া হতে পারে না। ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ)।

সাংসারিক কাজে মার অপূর্ব দক্ষতা। সেই ছোট ঘরটুকুর মধ্যে সব জিনিস গুছানো আছে। যখন ঠাকুরের আহ্বানে একে একে তাঁর বালকভক্তের দল দক্ষিণে-শ্বরে এসে গেল তখন মা তাদেরও সেবার ভার নিলেন। কোন্ ছেলেটি কি খেতে ভালবাসে কার কি দরকার, তা সব হাতে হাতে জুগিয়ে যান। বৃন্দা ঝির খাবারটি ঠিক করে রাখতেও তাঁর ভুল হয় না।

কিন্তু স্বামীর কাছে যাবার কতটুকু সুযোগ হয় তাঁর? নহবতের বারান্ডায় বাঁশের চেটাইয়ের বেড়া, সেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকেন ঠাকুরের ঘরের দিকে, যেখানে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আনন্দ রসে মত্ত হয়ে রয়েছেন।

তখন আর প্রত্যহ স্বামীর দর্শন মেলে না। মা বলেছেন, "মনকে বোঝাতুম মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস্ যে রোজ রোজ ও'র দর্শন পাবি?"

ঠাকুর শিষ্যদের পাঠিয়ে দেন মার কাছে, যার যা দরকার। রাশি রাশি পান সাজা, আবার হয়তো ঠাকুর এক রাশ পাট পাঠিয়ে দিয়েছেন শিকে বুনবার জন্যে। ঠাকুরের জন্মতিথিতে কলকাতা থেকে অনেক ভক্ত এসেছেন, ঐ ঘরের মধ্যেই মহোৎসবের রান্না বাঁধা হল, আবার স্ত্রীভক্ত যাঁরা এসেছেন সেই ঘরই ধুয়ে

মুছে মা রাত্রে বিছানা পাতছেন তাঁদের জন্য।

সংসারের শতকর্ম, তারই ভিতর মন রয়েছে সংসারের অতীতে মগ্ন হয়ে।

ঠাকুর দূরে থেকেও মার সম্বন্ধে সব সময়ই সচেতন। মার অতি প্রত্যূষে ওঠা অভ্যাস। কিন্তু হয়তো একদিন নবৎঘরের দোর খুলতে একটু দেরী হয়েছে, ঠাকুর তখনই দরজার কাছে জল ঢেলে জানিয়ে দিচ্ছেন, ভোর হতে দেরী নেই, ওঠবার সময় হয়েছে। আবার সারদার মাথা ধরলেও ব্যস্ত হয়ে ভাইপো রামলালকে বলেছেন "ও রামলাল, তোর খুড়ির যে মাথা ধরেছে।"

ঠাকুরের অপূর্ব সরলতার সংগে শ্রীশ্রীমার সরলতা তুলনা করলে একই ভাবের বলে মনে হয়।

ঠাকুরের অসুখের সময় যেমন সকলকে ছোট ছেলের মত জিজ্ঞাসা করতেন কি করলে অসুখ সারবে মাও সেই রকম নিজের অসুখের সময় ভক্ত শিষ্যদের বলতেন, "একি জ্বর হল বাপু? এ জ্বর কি আর সারবে নি? আমাকে যে একেবারে বিছানায় পেড়ে ফেললে। কি করি বল দেখি?"

আবার শশধর তর্ক চূড়ামণি ঠাকুরকে অসুস্থ গলায় মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে অসুখ সারাবার প্রস্তাব করলে ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, "পণ্ডিত হয়ে তুমি ও কি কথা বলগো। যে মন সচ্চিদানন্দকে অর্পণ করে দিয়েছি তা কি আবার ফিরিয়ে এনে হাড় মাসের খাঁচায় দেওয়া যায়?" বলে যেমন উত্তর দিয়েছিলেন মাও ঠিক সেই রকমই কেউ যদি অনুনয় করে বল্‌তো, "মা তুমি একবার নিজের মুখে বল যে অসুখ ভাল হয়ে যাবে তা হলেই তোমার সব অসুখ সেরে যাবে।" উত্তরে মা বল্‌তেন "তা কি আমি বলতে পারি মা, ঠাকুর যা করবেন তাইতো হবে। আমি আর কি বোলবো!"

এই অসুখের সময় উদ্বোধন অফিসে মায়ের জন্মতিথির দিনে মায়ের সেই ছবিটি মনে পড়ে। অবগুণ্ঠিতা মা দাঁড়িয়ে আছেন যেন একখানি প্রতিমা। ভক্তের পর ভক্ত এসে পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করছেন, সারদানন্দ স্বামী ঘড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দুয়ারের কাছে। বার বার বল্‌ছেন, "পাঁচ মিনিটের বেশি কেউ সময় নিও না, অনেক লোক গলিতে দাঁড়িয়ে আছে, সকলকেই সময় দিতে হবে।"

সারদানন্দ স্বামী প্রতিদিন স্নানের পর মাকে একবার প্রণাম করতে আসতেন মা অবগুণ্ঠন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অসুখের সময় আবার তিনিই যেভাবে মায়ের সেবা করেছেন, আর মা যেভাবে "শরৎ, শরৎ, বলে তাঁকে ডেকেছেন, ছোট মেয়ের মত আর তেতো ওষুধ খেতে পারি না বাবা বলে আবদার করেছেন, "বাবা, তোমার ঠাণ্ডা হাতটা একবার আমার পিঠে বুলিয়ে দাও বলেছেন— এ দেখে বেশ বোঝা যায় মা ও ছেলের মধ্যে অবগুণ্ঠনের দূরত্ব সে কেবল মার স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার প্রকাশ মাত্র, বাস্তবিক অন্তরে অন্তরে কোন দূরত্বই ছিল না।

—মার কলকাতায় একটি নিজস্ব বাসস্থানের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর লোকান্তরের পর স্বামী সারদানন্দ পূজ্য গুরু ভ্রাতার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন, ১নং মুখার্জি লেনে 'মায়ের বাড়ি'র প্রতিষ্ঠা হ'ল। আর সেই বাড়ি হল এক আনন্দের নিকেতন। মার কাছে সংসার-তাপিতা কত মেয়েই সেখানে আসতো শান্তি লাভের জন্য।

মা বলতেন, "সংসার হল আগুনের কুণ্ড, আর শীতল জল তো আছে মা তোমারই মনে। কারুর দোষ যদি না দেখ, যদি সবাইকে ভালবাস, ভালবেসে তার দোষ ত্রুটি বিচার কর তবে আর কোন অশান্তিই থাকবে না।"

একজনের একটিমাত্র সন্তান সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, দুখিনী মা এসেছেন মার কাছে তাঁর মনোবেদনা জানাতে। তিনি অশ্রুবর্ষণ করছেন, শ্রীশ্রীমারও চোখে জল। মা বল্‌ছেন "আহা, তাইত গা, একটিমাত্র সন্তান প্রাণের ধন, এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে মা কী করে প্রাণ ধরে থাকে বল দেখি?" মায়ের এই সমবেদনায় সন্তান বিয়োগিনী জননী তৃপ্তি পেলেন এবং মার কাছে ছেলের ছেলেবেলার কত কথা, ছেলে যে কত ভাল ছিল সেই সব কাহিনীও বলে চলেছেন, মাও মন দিয়ে তা শুনছেন আর বলছেন, "আহা, এমন সোনার ছেলে!'

আর একদিন অন্য একজন মহিলা যাঁর দুটি সন্তানই সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছে তিনি মায়ের কাছে বসে ছেলেদের কথা বলছেন, "মা, বিধবা হবার পর ওই দুটিকে মানুষ করে তুলবো এই ছিল আমার সাধনা। কত কষ্টেই না দিন গিয়েছে। সেই ছেলেরা আজ—সন্ন্যাসের পথে গেল। তাই ভাবি মা, সন্তানের যাতে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাইতো মায়ের কামনা। কি আছে সংসারে? ছেলে যদি পরম কল্যাণের পথ আশ্রয় করে তার চেয়ে মার আর বেশী আনন্দের কি আছে?" মা তখন সহর্ষে বললেন, "ঠিক বলেছ মা, ছেলে যদি পরম কল্যাণের পথ খুঁজে পেয়ে থাকে মার তার চেয়ে আর বেশী কামনা কি হতে পারে?"

মায়ের এই যে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ এর দুটি ভাবই তাঁর সমান আন্তরিক। একটিতে তিনি সন্তানহারা মায়ের দুঃখের সম-অংশিনী আবার অপরটিতে মা যে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের বিষয় বুঝেছেন, তা দেখে আনন্দিতা।

আনন্দময়ী বিরাজ করছেন দুই পাশে দুই সহচরী গোলাপ মা ও যোগীন মা, যেন ভবানীর দুই পাশে জয়া ও বিজয়া। তাঁরাও মায়ের ভাবেই বিভাবিতা। মায়ের সকল সন্তানই মনে করেন মা তাঁরই মা। একই চন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন সর্বত্র আলো দিচ্ছে, মার ভালবাসা সেই ধরণের ভালবাসা। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী-পিতৃহীনা দুঃখিনী রাধু পাগল মায়ের সন্তান, মা তার শত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করেছেন, সেই রকম তাঁর সকল সন্তানই তাঁর উপর অল্প বিস্তর অত্যাচার করেছে। সকলেরই নানা আবদার। ইদানীং ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে শরীর দুর্বল হয়েছিল, জয়রাম বাটীতে পল্লীগ্রামের দারুণ ম্যালেরিয়া। হয়তো মধ্যাহ্নে একটু বিশ্রাম করছেন এমন সময় একদল দর্শনার্থী ভক্ত এসে উপস্থিত হল। তারা হাঁটাপথে এসেছে, সকলেই পরিশ্রান্ত, মা তখনই বিশ্রাম ত্যাগ করে তাদের পরিচর্যার আয়োজন করতে গেলেন। এই সব ভক্তগণের জনে জনের নানা বাহানা, নানা আবদার। কেউবা মায়ের পা পূজো না করে জলগ্রহণ করবেন না, কেউবা মায়ের নিজের হাতের প্রস্তুত অন্ন ও তাঁর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না এইটিই তাঁর

সংকল্প; শত অবুঝ সন্তানের শত দাবী। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি করুণাময়ী স্নেহ-সুধায় সকলেরই চিত্তকে অভিষিক্ত ও পরিতৃপ্ত করছেন।

আবার তাঁর দৃঢ়তারও অভাব ছিল না। উদ্বোধনে তিনি যখন অসুস্থ তখন একদিন এক গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা মহিলা তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থিনী হয়ে এসেছিলেন. সেদিন আমিও উদ্বোধনে ছিলাম। মা খাটের উপর শুয়ে আছেন, মেয়েটি তাঁর চরণস্পর্শ করবার জন্য অগ্রসর হইতেই মা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলেন, বললেন "কর কী? কর কী? পায়ে হাত দিও না। তুমি গেরুয়াপরা সাধু মেয়ে পায়ে হাত দিয়ে আমাকে কেন অপরাধী করবে?

মেয়েটি দুঃখিতা হয়ে বলল, আমি যে অনেক আশা করে এসেছি আপনার কাছে দীক্ষা নেব বলে।"

মা বললেন, "ব্যস্ত হলে কি কিছু হয় মা? সময় হলে আপনিই হবে। দীক্ষা কি তোমার হয়নি? গেরুয়া কে দিয়েছেন? যাঁর কাছে সাধন পেয়েছ তাঁকেই ধরে থাক, সময়ে সব হবে।"

মেয়েটি তখন বললে, "গেরুয়া কেউ দেন নি, আমি নিজেই ধারণ করেছি। আর যে সাধন প্রণালী পেয়েছি তাতে মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

মা বললেন., "মা আমি আজ বড় অসুস্থ, কথাবার্তা বলতে পারলুম না বলে মনে দুঃখ কর না। কিন্তু এটি মনে রেখো গেরুয়া পরা খুব সহজ নয়। এই যে এক তলায় সব ত্যাগী ছেলেরা রয়েছে এরা ঠাকুরের জন্য সব কিছু ছেড়ে এসেছে, সাধু হবার অভিমানও ওদের নেই। ওদেরই গেরুয়ায় অধিকার। গেরুয়া যে আগুন, গেরুয়া পরার অধিকার কি যার তার হয়?"

মেয়েটি অনেক মিনতি করলেও তাকে পদস্পর্শ করতে দিলেন না।

মায়ের পায়ে বাতের ব্যথা ছিল সেজন্য মা পা ছড়িয়ে বসতেন, সে সময় হয়তো কোন সৌভাগ্যবতীকে নিজেই বলতেন "পাটা একটু টিপে দাও তো মা, বড় কন কন করছে।"

উদ্বোধনের বাড়ীর কাছে একটি ডালের গোলা ছিল, সেই গোলায় হিন্দুস্থানী স্ত্রী পুরুষ বাস করত। মা ঘরের পিছনের ঝুলন্ত বারান্ডায় বসে রোদ পোয়াচ্ছেন, ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করত তা দেখতেও ভালবাসতেন।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী তাঁর স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে মারছেন আর বৌটি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছে। মা এই কান্ড দেখে রেলিং ধরে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মাথার কাপড় খুলে পড়ল। স্বভাবতঃ মৃদুভাষিণী মা উচ্চৈঃস্বরে সেই লোকটিকে "লাঠি ফ্যাল মিনসে, খবরদার্ ওর গায়ে হাত তুলবিনে" বলে এমন প্রচণ্ড ধমক দিলেন যে লোকটি থতমত খেয়ে লাঠি ফেলে জোড় হাতে মাকে প্রণাম করে কোথায় পালিয়ে গেল আর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। এর আগে সে প্রায়ই বৌকে মারত, কিন্তু সেইদিন হতে আর কখনও বৌকে মারে নি।

"মাকে দেখে আপনার কী মনে হয়েছিল?" যাঁরা মাকে চোখে দেখেননি তাঁরা যদি এ প্রশ্ন করেন তার মধ্যে জানবার জন্য ব্যাকুলতাই অবশ্য প্রকাশ পায়। কিন্তু যারা চোখে দেখেছে সেই মাতৃমূর্তি, তারাই কি জানতে পেরেছে তাঁকে?

শুধু এইটুকুই জেনেছে তিনি এমন একজন যাঁর কাছে কোন সংকোচ থাকে না, সমস্ত মনটাই মেলে ধরতে পারা যায়। মানসিক সকল জটিলতার দ্বন্দ্ব যিনি একটি মাত্র কথায় মিটিয়ে দিতে পারেন যাঁর সান্নিধ্যে আসা মাত্র মন শীতল হয়ে যায় মার ইহাই প্রকৃত স্বরূপ।

আজ মাতৃমন্দির সে দিনের সম্পদেরই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। আজ তিনি দুর্লভা, আজ তিনি ধ্যানগম্যা।

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ রাত্রি ১টা ত্রিশ মিনিটের সময় চিন্ময়ী জননী মৃন্ময় ঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। জড় দৃষ্টি আজ তাঁকে দর্শনের অধিকার পায় না।

কিন্তু তাঁর এই আবির্ভাব, বাংলা দেশ যে আবির্ভাবে জগতের মধ্যে বরেণ্য হয়েছে, সেই আবির্ভাবের সার্থকতা অনুভব করবার ও অনুভূতিতে সেই আবির্ভাবের তাৎপর্য একান্তভাবে গ্রহণ করবার দিন সম্মুখে উপস্থিত, 'দিন আগত ঐ'।

লৌহকপাট

জরাসন্ধ

চৌদ্দ

রবিবার। বিকেল চারটা বেজে পঁয়ত্রিশ। সদলবলে ফাইল দেখছি। লাল ফিতে বাঁধা কাগজের ফাইল নয়; আইনের শিকলে বাঁধা মানুষের ফাইল। মানুষ; কিন্তু মানুষের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সজ্জন-সমাজ তাকে বর্জন করেছে, তার মানবতার দাবীকে করেছে প্রত্যাখ্যান। সংসারের সহজ এবং প্রকাশ্য পথ থেকে স্খলিত হয়ে তারা এসেছে দলে দলে অন্ধকার পিচ্ছিল পথ ধরে। ললাটে মুদ্রিত অপরাধীর পঙ্ক-তিলক। সেই সব মানুষের ফাইল দেখছি।

একপাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ লাইনটা একবার দেখে নিলাম। পরনে জাঙ্গিয়া, র্তা, কোমরে বাঁধা গামছা, মাথায় টুপি, বাঁ-হাতে টিকিট, ডান হাতটা ঝুলে আছে দেহের পাশ দিয়ে। বুকের উপর আঁটা অ্যালুমিনিয়মের চাকতি। সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডের এক-একটি জীবন্ত ধারা। ৩৭৯, তার পাশে, ৩০২ তারি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, ৪২০ কিংবা ৩৯৫—খুনী, তস্কর, নারী-ধভুক, দস্যু, প্রতারক, পকেট-কর্তকের বিচিত্র সমাবেশ। কিন্তু আমার চোখে এ বৈচিত্র্য অর্থহীন। 'এখানে আসিলে সকলেই সমান।' আমার কাছে রামের সঙ্গে শ্যামের যে তফাৎ, সে শুধু নম্বরের। রাম ৭৫৭, শ্যাম ১১০৪। তাদের অপরাধের বিবরণ আমি জানি না; জানি না তাদের প্রাক্-কারা-জীবনের কোন ইতিবৃত্ত। একথা আমার জানা নেই, রাম বলে যে লোকটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সে তার প্রতিবেশীর হাঁড়ি থেকে চুরি করেছিল একবাটি পান্তা ভাত, আর তার পাশে যে শ্যাম, সে তার প্রতিবেশীর আট বছরের মেয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে দেড় ভরি ওজনের সোনার হার। আমার কাছে তাদের একমাত্র পরিচয় —কয়েদী। এইটুকু মাত্র জেনেই আমি তাদের রিফর্ম করবার ভার নিয়েছি।

আমার কয়েদী বাহিনীর মনের খবর আমি রাখি না। তাই সবার উপরে আমার সমদৃষ্টি, সকলের প্রতি আমার সম-আচরণ। একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের যে দুস্তর ব্যবধান, আমাদের শাস্ত্র একথা মানে না। তার মতে রাম ও শ্যাম এক ও অভিন্ন। আহারে, বিহারে, কর্মে, অবসরে, শাসন ও শৃঙ্খলায় একই সূত্রে গাঁথা। মুড়ি এবং মিছরি একই পাত্রে রেখে একই ডিসিপ্লিনের পেষণ যন্ত্রে আমি তাদের গুঁড়িয়ে চলেছি। যে-বস্তু তৈরি হচ্ছে, তার স্বাদ, গন্ধ, অথবা বর্ণ সম্বন্ধে আমি নির্বিকার।

বর্তমানে আমি যে কার্যে রত, তার নাম সাপ্তাহিক 'ফাইল' পরিদর্শন। জানতে এসেছি কার কি অভিযোগ, কার কি নিবেদন, যদিও জানি, সত্যিকার অভিযোগ যদি কিছু থাকে, আমার কাছে তা অনুক্তই থেকে যাবে। কেননা, যাদের সম্বন্ধে অভিযোগ, আমারি পেছনে চলেছে তাদের দীর্ঘ প্রসেশন।

—নালিশ আছে বাবু—

প্রসেশন থেমে গেল।

—কি নালিশ?

বক্তা বোধ হয় সত্তরের গণ্ডি পার হয়ে গেছে। ঝুঁকে, কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে কোন রকমে ফাইলের শৃঙ্খলা রক্ষা করছে। টিকেটখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দ্যাখ তো বাবু, বয়স কত লিখেছে? তার পাশে যে কয়েদীটি দাঁড়িয়ে, দেখে মনে হয়, প্রায় একই বয়সী, তার টিকিটখানাও টেনে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলল, আর এটাও দ্যাখ।

কণ্ঠে উত্তেজনার আভাস।

বললাম, ব্যাপার কি, বল দিকিন?

—বলছি। বয়সটা আগে দ্যাখ।

সঙ্গে সঙ্গে অধীর প্রশ্ন—কি লেখা আছে?

এসব বেয়াদপি অসহ্য হল চীফ জমাদারের। খেঁকিয়ে উঠে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম বুড়োর দিকে তাকিয়ে, তোমার বয়স তো দেখছি ৭২ আর ওর ৬৫। তাহলে তো 'আইটার বাবু'* ঠিকই

---

* কথাটা "রাইটার" (writer) অর্থাৎ যে সব লেখাপড়া জানা কয়েদি এদের চিঠিপত্র দরখাস্ত ইত্যাদি লিখবার জন্য নিযুক্ত।

বলেছে। কিন্তু এ তোমাদের কিরকম বিচার বাবু? আমার ছেলের চেয়ে আমি মোটে সাত বছরের বড়?

—এ লোকটি তোমার ছেলে?

—আমার ছেলে না তো পাড়ার লোকের ছেলে?

এবার আর উত্তেজনা চাপা রইল না। পাশের লোকটি বিনীত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, হুজুর, উনি আমার বাপ। বয়স হয়েছে কিনা; মেজাজটা তাই একটু—

—তুই থাম—গর্জে উঠল বুড়ো। জেল খাটতে এসেছি বলে, যাকে জন্ম দিলাম, তাকে ছেলে বলতে পারব না?

নরম সুরে বললাম, না, না,। কে বললে, পারবে না? ওটা আমাদেরই ভুল হয়েছে।

ডাক্তারের দিকে তাকালাম। বেচারার বিশেষ দোষ নেই। বয়স নির্ধারণের ডাক্তারি প্রক্রিয়া কি আছে, জানি না। তবে এরা যে পিতাপুত্র, কেবলমাত্র চোখে দেখে একথা বলতে হলে রীতিমত দিব্যজ্ঞান থাকা দরকার। টিকেট দুখানা ডাক্তারের হাতে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, ডাক্তার চাপা গলায় বলছে, তুমি যে এই কচি খোকাটির বাপ, আগে বললেই পারতে।

বৃদ্ধের সুর চড়া—আমি আবার কি বলবো? তোমার আক্কেল নেই?

'নালিশের' বিষয়বস্তু বেশির ভাগই চিঠি। সাধারণ কয়েদী চিঠি লিখতে পায় দু মাস অন্তর একখানা। বাইরে থেকে যে চিঠি আসে তাদের নামে, তারও একটার থেকে আর একটার ব্যবধান—দু মাস। ডেপুটিবাবুরা টিকেট দেখে তারিখ গুনে গুনে চিঠি মঞ্জুর করে চলেছেন।

—একটা পিটিশন চাই, হুজুর, আবেদন জানাল এক ছোকরা। নাম পানাউল্লা।

—তোর আবার কিসের পিটিশন?

আশেপাশে ছোকরা মত যারা দাঁড়িয়েছিল, সবারই মুখে দেখলাম চাপা হাসি। পানাউল্লা একটু ইতস্তত করে বলল, চাচা লিখেছে, বৌ নাকি নিকা বসতে চায়।

আমি কিছু বলবার আগেই জবাব দিলেন আমার ডেপুটি খালেক সাহেব, নিকা বসবে না তো কি করবে? তুমি মেহেরবানি করে সাত বছর জেলে পচবে, আর কচি বৌটা তোমার পথ চেয়ে চেয়ে বসে থাকবে, না?

পানাউল্লা কিছুমাত্র দমে গেল না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, নিকা বসতে চায়, বসুক। কিন্তু ঐ গয়জদ্দি ছাড়া কি মানুষ নেই দেশে? আমি যদ্দিন ছিলাম, তখন তো ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেখিনি। নেড়িকুত্তার মত ন্যাজ গুটিয়ে বেড়াত। আজ আমি নেই বলে—

তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল হিংস্র পশুর চোখের মত। বুঝলাম, পানাউল্লাকে যে-বস্তু বিচলিত করেছে, সেটা আসন্ন পত্নী-বিচ্ছেদের আশঙ্কা নয়, তার চেয়েও গভীর এবং জটিলতর। দরখাস্ত মঞ্জুর করতে হল। তবু একবার জিজ্ঞেস করলাম, পিটিশন করে এ-নিকা তুই ঠেকাবি কি করে?

—নিকা ঠেকাতে চাই না, বললে পানাউল্লা, বছির দারোগাকে খালি জানিয়ে দেবো, পানাউল্লা সারা জীবন জেলে থাকবে না। ছাড়া একদিন সে পাবেই।

এর পরে যেসব পিটিশনের আবেদন পেলাম, তার মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই। বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র না খেয়ে মরছে; শত্রুপক্ষীয় লোকেরা অত্যাচার করছে, জমিদার খাজনার দাবিতে বাড়িঘর নিলামে চড়িয়েছে, প্রতিকার চাই। এই একই ক্লান্তিকর কাহিনী শুনে আসছি বছরের পর বছর, যেদিন থেকে এই চাপরাশ কাঁধে নিয়েছিলাম। প্রথম জীবনে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠত। নির্বিচারে দরখাস্ত মঞ্জুর করতাম; গরম গরম নোট লিখতাম তার উল্টো পিঠে, জাগাতে চেষ্টা করতাম নিষ্প্রাণ কর্তৃপক্ষের নিদ্রাগত কর্তব্য-বোধ। মনকে বোঝাতে চাইতাম, প্রতিকার একটা হবেই, যদিও কি সেই প্রতিকার, তার সঠিক চেহারাটা নিজের কাছেও কোনদিন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। আজ আর এই দুঃখের কাহিনী মনকে স্পর্শ করে না। তবু যন্ত্রের মত দরখাস্ত মঞ্জুর করি। কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে আর কোন মিথ্যা ধারণা পোষণ করি না।

বড় বড় মামলার সুদীর্ঘ শুনানীর পর সুবিজ্ঞ বিচারক যখন অপরাধীকে সাত, আট, দশ কিংবা বিশ বছরের জন্যে জেলে পাঠিয়ে দেন, আমরা অর্থাৎ সং, শিষ্ট এবং ভদ্র ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত হই, জজ সাহেব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর ন্যায়-বিচারের গুণকীর্তন ধ্বনিত হয়। কিন্তু একথা বোধ হয় তিনিও জানেন না, আমরাও ভেবে দেখিনি—এই কঠোর দণ্ডটা ভোগ করে কে? লোকটা জেলে গেল ঠিকই। এই জেলে যাওয়ার মধ্যে যে দুঃখ আছে, লজ্জা আছে, সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি আছে এবং তার চেয়েও বেশি আছে অসম্মান ও অপযশ, তাকে আমি ছোট করে দেখছিনে। স্বাধীনতা-হীনতা এবং প্রিয়জন-বিচ্ছেদের যে বেদনা সদ্য-কারাগতের দৈনন্দিন জীবন ভারাতুর করে তোলে, তার সম্বন্ধেও আমি সচেতন। কিন্তু শুধু এই কারণে যতখানি আহা-উঁহু আমরা বন্দীর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে থাকি, ঠিক ততখানি বোধ হয় তার প্রাপ্য নয়। নিজের চোখেই দেখেছি, যত দিন যায়, মহাকালের হস্তস্পর্শে মিলিয়ে আসে তার মনের ক্ষত, জুড়িয়ে আসে লজ্জা আর অপমানের গ্লানি, স্তিমিত হয়ে আসে প্রিয়-বিচ্ছেদের তীব্রতা। দুঃসহ দিন সহনীয় হয়ে আসে। অনভ্যস্ত জীবনের অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের তীক্ষ্ণ ধারগুলো আর খচখচ করে বেঁধে না। ধীরে ধীরে এই বন্দী-জীবনের সঙ্গ-বহুলে নতুন পরিবেশের মধ্যে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ। স্বধর্মী, সহকর্মী, সহযাত্রীদের জড়িয়ে ধরে নব-ঘনিষ্ঠতার অলক্ষ্য আকর্ষ। দেখা দেয় নবরূপী বন্ধুত্ব।

আরো দিন যায়। ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে গৃহের স্মৃতি, শিথিল হয়ে আসে বহির্জগতের আকর্ষণ। তারপর একদিন আসে, যখন জেলের এই কঠোর রূপটা তার চোখে বদলে যায়। এই সংকীর্ণ জগতের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনধারার মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। কদাচিৎ মনে পড়ে, এ তার গৃহ নয়, কারাবাস।

কিন্তু তাই বলে বিচারালয় থেকে যে দণ্ড সে বহন করে এসেছিল, সেটা

কি নিষ্ফল হবে? না। শুধু তার লক্ষ্য-স্থল বদলে যায়। সে দণ্ড ভোগ করে কতগুলো নারী ও শিশু, দণ্ডিত আসামীর উপর একদিন যারা ছিল একান্ত-নির্ভর, এবং যাদের পথের প্রান্তে বসিয়ে রেখে সে এই জেলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সে-দরজা পার হতে না হতেই নিজের জন্যে পেল সে অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা, পেল নতুন সমাজ, নতুন বন্ধন, আর তার কারাদণ্ডের সমস্ত কঠোরতা রয়ে গেল তার পরিত্যক্ত প্রিয়জনের জন্যে। জেলে যে আসে, সে তার শেষ সম্বল নিঃশেষ করেই আসে।

জানি, এর ব্যতিক্রম আছে। সুযোগ ও সুবিধা বুঝে মাঝে মাঝে কারাবরণের ব্যবসা করেন যারা, তারা আলাদা জীব। তাদের কথা আমি তুলছি না। তাদের কথাও বলছি না, যারা আমার আপনার এবং অন্য দশজন রাম-শ্যাম-যদুর বহু-দুঃখার্জিত সঞ্চয়টুকু বন্ধুবেশে আহরণ করে, ব্যাঙ্ক কিংবা লিমিটেড কোম্পানীর নামে সাততলা এমারত গড়ে লালদীঘির কোণে; তারপর হঠাৎ একদিন সেই ভবন-শীর্ষে একটি লালবাতি জ্বালিয়ে রেখে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, কখনো কখনো বা ছিটকে এসে পড়ে আমার এই অতিথি-শালায়। স্ত্রীর বেনামীতে রেখে আসে কোন অঞ্চলে বিশাল প্রাসাদ, সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের পাশ-বই, আর নিজের জন্যে সংগ্রহ করে আনে একখানা উচ্চ-শ্রেণীর প্রবেশপত্র। সেই সব ভাগ্যবান্ 'ডিভিশন বাবু' আমার লক্ষ্য নয়। জেলের অরণ্যে তারা মুষ্টিমেয় অতিবিরল বকুল কিংবা কৃষ্ণচূড়া।

আমি বলছিলাম, সেই সব শ্যাওড়া, কচু, ঘেঁটু আর বনতুলসীর কথা, সংখ্যায় যারা শতকরা আটানব্বই। প্রতিদিন দলে দলে এসে তারা ভিড় করছে আমার এই তৃতীয় ডিভিশনের লঙ্গরখানায়। এখানে আসবার আগে থানা থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা লড়েছে কোমর বেঁধে, উকিলের ঘরে পাঠিয়েছে বাক্স-প্যাটরা ঘটি-বাটি আর স্ত্রীর হাতের শেষ অলঙ্কার, মহাজনের গদীতে তুলে দিয়েছে ক্ষুধার্ত পরিবারের একমাত্র সম্বল—দু-চার বিঘা ধানের জমি, জমিদারের কবলে নিক্ষেপ করেছে বাপ-পিতামহের ভিটামাটি, আর বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী এবং শিশু-সন্তানের হাতে দিয়ে এসেছে দারিদ্র্য, অনশন আর লাঞ্ছনা।

কোর্ট যে শাস্তি দেন, আইনের ভাষায় তার নাম rigorous imprisonment, তার imprisonment অংশটাই শুধু পড়ে আমার কয়েদীর ভাগে, আর rigour বহন করবার জন্যে রইল তার বর্জিত আশ্রিত দল।

প্রতি রবিবার ভোর না হতেই সেই সব পিছনে ফেলে-আসা নারী ও শিশুর ভিড় জমে ওঠে আমার এই জেল-গেটের সামনেকার মাঠে। আমি আমার দোতলার বারান্দায় বসে তাদের দেখতে পাই। অসহায়, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি; মুখে নেই গৃহস্থের শ্যামল শ্রী। একদল ছন্নছাড়া যাযাবর। বিকেল চারটা বাজতেই শুরু হয় মোলাকাত। ছিন্নবসনা স্ত্রী এসে দাঁড়ায় ইণ্টারভিউ জানালার লোহার গরাদে-দেওয়া বেষ্টনীর বাইরে। তাকে ঘিরে দাঁড়ায় একদল ছোট ছোট উলঙ্গ কঙ্কাল। কোটরগত চোখের জলে অনশনক্ষীণ কণ্ঠ মিলিয়ে কয়েদী-স্বামীর কাছে বলে যায় তার একটানা দুর্দশার কাহিনী। ছোট ছেলেটা গেল একদিনের জ্বরে। না পেল ওষুধ, না জুটল পথ্য। সেয়ানা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে আজগর মুন্সীর ভাইপো। বড়ছেলেটা মাসখানেক হল উধাও। বাকীগুলো অপগণ্ড। বুড়ী এখনো মরেনি। জমিদারের পাইক দুবেলা শাসিয়ে যাচ্ছে মাস গেলেই ভিটে ছেড়ে দিতে হবে।

আমি আর কি করবো? —জানালার এ-ধার থেকে উদাস কণ্ঠে জবাব দেয় স্বামী। দেহে তার পরিচ্ছন্ন জেলের পোষাক। সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য, মুখে দার্শনিক গাম্ভীর্য।

এমনি করে বছর কেটে যায়। মাঝে মাঝে এসে ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ একই কাহিনী শুনিয়ে যায় স্ত্রী। তার পর আর আসে না তার হাড়সর্বস্ব ছেলের পাল নিয়ে। কে জানে, তার কি হল? বেঁচে আছে কিনা, সে খবর দিয়েই বা কার কি প্রয়োজন?

দণ্ডদাতা দণ্ড দিয়েই খালাস। তার কি এসে যায় কোথায় গিয়ে পড়ল তার উদ্যত মুষল, নির্মূল হয়ে গেল কোন্ সাজানো সংসার, নিস্তব্ধ হয়ে গেল কার কোলাহলমুখর গৃহ-প্রাঙ্গণ?

দিন যায়। দীর্ঘ দণ্ডকাল শেষ হয়। যে-লৌহ তোরণের প্রসারিত বাহু দণ্ডিত বন্দীকে নিঃশব্দে গ্রহণ করেছিল, সেই তাকে স-শব্দে বর্জন করে। গেটের বাইরে পা-দিয়ে মুক্ত পৃথিবীর অজস্র আলোর দিকে তাকিয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। পা-দুটো আড়ষ্ট হয়ে যায়। কোথায় এলাম? এ কোন্ দেশ? ঐ যে অবিশ্রান্ত জলস্রোতের মত বয়ে চলেছে জন-প্রবাহ, কোনোদিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর নেই, কিসের টানে, কোথায় চলেছে তারা? এক পাশে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে চেয়ে থাকে ঐ মোহাবিষ্ট জনতার দিকে। দশ বার পনের বছর এ বস্তু সে দেখেনি। সে ভুলে

গেছে জীবন-যুদ্ধের তাড়না। ভুলে গেছে, এই যে অগণিত মানুষ উদয়াস্ত কাজ করে যাচ্ছে, এদের চোখের সামনে রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, সমৃদ্ধি, সম্মান আর স্বাচ্ছন্দ্য চাই; শুধু নিজের জন্য নয়, প্রিয়জনের জন্যে। সেই আশার মোহ তাদের অন্ধবেগে চালিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রতিদিন নতুন করে জুগিয়ে যাচ্ছে কর্মপ্রেরণা। অক্ষুন্ন রেখেছে সতত-ক্ষীয়মান প্রাণ-শক্তি। এই মোহাবেশের উন্মাদনা সে পায়নি তার দশ বছরের বন্দী-জীবনে; অনুভব করেনি আত্মজনের জন্যে আত্ম-পীড়নের আনন্দ। অন্নবস্ত্র-আশ্রয়ের ভাবনা তাকে ভাবতে হয়নি। সে-সব দিয়েছেন সদাশয় সরকার, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন প্রিয়জনের দায় এবং দুশ্চিন্তা থেকে পূর্ণ-মুক্তি। তাকে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু কাজ করে খেতে হয়নি। সে কাজ তো কাজ নয়, শুধু হস্ত-পদ-সঞ্চালন। তার মধ্যে না ছিল প্রাণ, না ছিল প্রেরণা। জেলের কারখানায় সে ছিল একটা সজীব যন্ত্র—যে যন্ত্র সে চালাত, তারই একটা বৃহৎ অংশ।

এই চলমান জনস্রোতের পাশে দাঁড়িয়ে দশ বছরের কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সে দৃষ্টি পাঠাল পেছনের দিকে একদা যেখানে ছিল তার গৃহ। প্রাণপূর্ণ স্নেহনীড়। মনে পড়ল সবই; মনে পড়ল সবাইকে। কিন্তু বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠল না। মমত্ব বোধ চলে গেছে, অসাড় হয়ে গেছে দায়িত্বের অনুভূতি। বুকে হাত দিয়ে দেখল। হাতে ঠেকল একটা শুষ্ক নিরেট মরুভূমি। শ্রদ্ধা, প্রীতি ভালবাসার কোনো ক্ষীণ ফল্গু-ধারাও বইছে না তার অন্তস্থলে।

পাশে এসে দাঁড়াল এক সদ্য আহরিত কারাবন্ধু। তিন মাস জেল খেটে আজ খালাস পেয়েছে একই সঙ্গে। বলল, এখানে দাঁড়িয়ে যে? বাড়ী যাবে না? বাড়ী!—শ্লেষ বিকৃত কণ্ঠে বেরিয়ে এল উত্তর। ঠোঁটের উপর ফুটে উঠল এক অদ্ভুত ব্যঙ্গ হাসির কুঞ্চন-রেখা।

—নাও, বিড়ি খাও, এগিয়ে এসে হাত বাড়াল নতুন বন্ধু।

সেদিকে না তাকিয়েই বিড়িটা সে হাত পেতে নিল, ধরাল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ ঔদাস্যভরে ধোঁয়া ছাড়ল কয়েক-বার, তারপর পা চালিয়ে দিল যে-দিকে দু'চোখ যায়, মিশে গেল জনারণ্যের অন্তরালে।

ফাইলের পরেই কেস্ টেবল (case table). সেন্ট্রাল টাওয়ারের নীচে খোলা প্রাঙ্গণে আমার বৈকালিক আফিসের এক টুকরা। এই টেবিলে বসেই প্রতি সন্ধ্যায় আমি কেস লিখি কয়েদির টিকিটে। হরেক রকমের কেস্। কারো কম্বলের ভাঁজে পাওয়া গেছে দুখানা তামাক পাতা আর এক ডিবা চূণ; কারো "খাটনি" অর্থাৎ দৈনিক task পুরো হয়নি,—এক মণ ছোলা ভেঙে ডাল করবার কথা, ভেঙেছে ছত্রিশ সের বার-ছটাক; কেউ 'চৌকা' থেকে লুকিয়ে এনেছে দুটো পেঁয়াজ আর তিনটা লংকা; কিংবা গামছার বিনিময়ে হাঁস-পাতালের মেট-সাহেবের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে আধসের দুধ আর এক ছটাক চিনি।

এই সব এবং-এর চেয়েও গুরুতর কত কেসের তদন্ত করি, রিপোর্ট লিখি টিকেটের পাতায়, এবং পরদিন সকাল-বেলা আলামৎ-সহ অপরাধীদের হাজির করে দিই সুপারের দরবারে। আর একদফা শুনানির পর তিনি বিচার শেষ করেন। কাউকে দেন ডাণ্ডাবেড়ি, কাউকে হাত-কড়া, কাউকে বা পরতে হয় চটের কাপড় কিংবা সেলে বসে খেতে হয় চালের গুঁড়োর মণ্ড, আইনের ভাষায় যার নাম Penal diet.

"ফেকু গোয়ালা"—দরাজ-গলায় হাঁক দিল বড় জমাদার। একটা লোকের হাত ধরে নিয়ে এল "আমদানীর" মেট। আমার টেবিলের সামনে দাঁড় করাতেই গর্জে উঠল জমাদারের দ্বিতীয় হুকুম—সেলাম করো।

দেখলাম, চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল, ফুলেও উঠেছে অনেকখানি, আর জল ঝরছে অবিরাম।

—ও কি! চোখে কি হ'ল?

—চুন লাগায়া, আউর কেয়া? —জবাব দিল জমাদার।

—কিরে, চুণ লাগিয়েছিস চোখে?

—নেহি, হুজুর।

—চোখ লাল হল কি করে?

—বেমার হুয়া—বলে মুচকে হাসল।

দু'জন সহকর্মী সাক্ষী বলে গেল, দেয়াল থেকে চুনবালি নিয়ে ও ঘষে দিয়েছে চোখের মধ্যে, নিজের চোখে দেখেছে তারা। বলছে, হাসপাতাল যাবো'।

টিকেট উলটে দেখলাম, কয়েকমাস আগে খানিকটা সাবান না সাজিমাটি খেয়ে, আমাশা বাধিয়ে আর একবার পনের দিন পড়েছিল হাসপাতালে। ধমক দিয়ে বললাম, চোখে চুণ দিয়েছিস কেন?

—বারো সের গহুঁ পিষণে নেহি সক্তা।

—নেহি সক্তা! আব্দার পেয়েছ?

টিকেটের প্রথম পাতা খুলে দেখলাম ডাক্তারের নোট রয়েছে—হেল্থ—গুড, লেবার—হার্ড। জেলকোডের বিধানে এ হেন ব্যক্তির গম-পেষণের দৈনিক বরাদ্দ বারো সের। অতএব রিপোর্ট করতে হল।

কিন্তু চোখে চুণ দেওয়া তার একেবারে ব্যর্থ হ'ল না। আপাতত কিছুদিন হাসপাতালে আশ্রয় মিলবে। ফিরে এসে হাজির হ'বে বড় সাহেবের কাছে।

সকলের শেষে যাকে আনা হল, একটি সতের আঠার বছরের ছেলে। মুখের দিকে তাকালে চোখ ফিরিয়ে নিতে সময় লাগে। গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ আর অনিন্দ্য মুখশ্রী বলে নয়, সে মুখের প্রতি রেখায়, কপালে, ওষ্ঠে, চিবুকের বন্ধনীতে একটা সুস্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ, জেলখানার যেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এ কোত্থেকে এল? ঝগড়া-ঝাটি করে, কিংবা খুন-জখম করেও কখনো কখনো এসে থাকে দু-চারটি বড় ঘরের ছেলে। কিন্তু এর অপরাধ দেখছি চুরি। ৩৭৯ ধারায় ছ' মাস জেল।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চমক ভাঙল জমাদারের গর্জনে—এক নম্বর হারামী, হুজুর। ফাইল পর কভি নেই আয়গা। জিজ্ঞেস করলাম কেন? লাইনে আসনি কেন?

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্যার।

কথাটা বিশ্বাস হল না। মনে হল, আসল কারণ ঘুম নয়। বোধ হয় সবার সঙ্গে পংক্তিভুক্ত হয়ে দাঁড়াবার লজ্জাটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

—তোমার নাম কি?

—পরিমল ঘোষ।

—বাবার নাম?

—ঐ টিকিটেই লেখা আছে, সার।

রুক্ষ স্বরে বললাম, জানি। তবু তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই।

ছেলেটা এক মিনিট কি ভাবল, তারপর বলল, বিজয়গোপাল ঘোষ।

এ কোন্ বিজয়গোপাল? এক নামের কত লোকই তো দেখা যায়। কিংবা একি আমাদের সেই বিজয়ের ছেলে? জমাদারকে বললাম, উস্‌কো অফিসমে লেযানা।

অফিসে এসে সহকর্মীদের কাছ থেকে যে সব তথ্য পেলাম, আমার সন্দেহ সমর্থিত হল। বিজয় আমার বন্ধু এবং সহপাঠী। এম এ আর ল পাশ করে, প্রথমটা যেমনি হয়, আলিপুর কোর্টে হাঁটাহাঁটি। তারপর হঠাৎ সরকারী চাকরি নিয়ে চলে গেল মফঃস্বলে। সেই থেকেই ছাড়াছাড়ি। কার মুখে যেন শুনেছিলাম, কোন্ এক বিশাল বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করবার পর সে নাকি হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তার আত্মীয় বন্ধু মহলের সংস্রব থেকে। সত্যি মিথ্যা জানি না। আমিও কোনোদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার চেষ্টা করিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম। কে জানত এতকাল পরে এভাবে তাকে স্মরণ করতে হবে?

আমার কলেজের একটা গ্রুপ ফটো বাসা থেকে আনিয়ে পরিমলের হাতে দিয়ে বললাম, দ্যাখ তো কাউকে চেন কি না? সে চমকে উঠল, একি! এ ছবি আপনি কোথা পেলেন? এর মধ্যে যে আমার বাবা আছেন। বললাম, তোমার বাবার ঠিক পাশের লোকটিকে চিনতে পারছ?

—না তো।

—ভালো করে দ্যাখ।

বুদ্ধিমান ছেলে। আর একবার দেখে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল, আপনি?

বললাম, এখানে যেমন দেখছ, ঠিক এমনি একই সঙ্গে পাশাপাশি আমরা কাটিয়েছি আমাদের কলেজ হস্টেলের ছ'টা বছর। বিজয় আর আমি বন্ধু এবং সহপাঠী। বাইরের সম্পর্ক এইটুকু। কিন্তু যে সম্পর্ক চোখে দেখা যায় না, সেটা শুধু আমরাই জানতাম। সেই বিজয়ের ছেলে তুমি! আজ এইখানে—

ওর দিকে নজর পড়তেই কথাটা আর শেষ করা হল না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে উদ্গত অশ্রু রোধ করবার সে কি আপ্রাণ চেষ্টা! কিন্তু একটিবার মাত্র আমার চোখের দিকে চেয়ে সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়ে গেল। দু' চোখের কোল ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল জলধারা।

আত্মীয় স্বজন যদি কেউ জেলে এসে পড়ে, সংশ্লিষ্ট জেলকর্মীকে সেটা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে—এটা জেল-কোডের বিধান। আত্মীয়টিকে তখন অন্যত্র চালান দেবার ব্যবস্থা করতে হয়। পরিমল আমার আত্মীয় নয়, স্বজন বলতে যা বোঝায়, তাও নয়। তবু অনেক ভেবে ঐ আইনের আশ্রয় নিলাম। যাবার সময় সে বলল, এ ভালোই হল। আমিও ভাবছিলাম বলবো, আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিন।

হঠাৎ যেন ধাক্কা খেলাম। সেও আমাকে ছেড়ে যাবার জন্য ব্যস্ত! বললাম, কেন? তুমি যেতে চাইছিলে কেন?

পরিমল উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করলাম না। শুধু বললাম, যেখানেই থাক, একটা কথা আমার মনে রেখো। জেলের আইন-কানুনগুলো মেনে চলবার চেষ্টা করো। অনেক অনর্থক অসুবিধার হাত এড়াতে পারবে।

মাস চার-পাঁচ কেটে গেল। তারপর একদিন সকালের ডাকে একটা মোটা খামের চিঠি পেলাম। অচেনা হাতের লেখা। শেষ পাতায় সকলের শেষে নাম রয়েছে—হতভাগ্য পরিমল। সে যে আমাকে চিঠি লিখবে, কখনো ভাবতে পারিনি। আমাকে এড়িয়ে চলতেই সে চেয়েছিল, আর সেইটাই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সংসারের ক'টা ঘটনাই বা স্বভাবের নিয়মে ঘটে? (ক্রমশঃ)
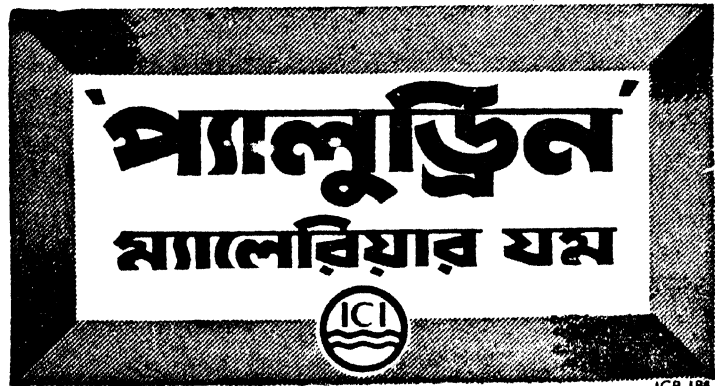
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সংসারে যত-সংখ্যক নরনারীর সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন আর কোন বাঙালী সাহিত্যিক করেন নাই. তাঁহার কাব্য নাট্য ও ছোট গল্পের পাত্রপাত্রীর একটা তালিকা ও বিবরণ প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয়। এখানে আমরা তাঁহার ছোট গল্পের পাত্রপাত্রী ও তাহাদের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, বৈচিত্র্যের বিচারেও ইহারা সত্যই বিস্ময়কর। ইহাদের মধ্যে বদ্রাওনের নবাবকন্যা হইতে হতভাগ্য রাইচরণ, শানিয়াড়ি ও নয়ানজোড়ের বাবুগণ হইতে দিনমজুর রুই পরিবারের নরনারী সকলেই আছে। সামাজিক শ্রেণীর সা হইতে নি পর্যন্ত স্বরগ্রামের সবগুলি সুরের স্পন্দনই যেন কবির স্পর্শকাতর লেখনীতে ধরা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যেমন শা-সুজার কন্যা আছে, তেমনি তাহার পালক পিতা বৃদ্ধ ধীবরও আছে; এ-আসর অতিশয় প্রশস্ত তাই এখানে গ্রামের বোস্টমী, ব্রাহ্মণ জমিদারের যবনী পত্র, প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী কাহারো স্থানের অভাব হয় নাই, এমনকি, ছায়াশরীরীগণ ও রূপ-কথার নরনারীগণও একান্তে স্থানলাভ করিয়াছে। কবি কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন নাই, নিজের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে মানুষের সুখ-দুঃখের কথাই লিখিয়া গিয়াছেন, আর যেহেতু মানুষ সামাজিক স্তরভেদে বিন্যস্ত, যথাসাধ্য সেই সব স্তরীয় মানুষের কথা বলিয়াছেন। মধ্যবিত্ত স্তরের গল্পই সংখ্যায় বেশি সত্য, তার কারণ ঐ অংশটাই কবির জ্ঞানের পরিধির মধ্যে অধিকতর উজ্জ্বল। কিন্তু তাই বলিয়া সমবেদনার তারতম্য ঘটে নাই। বদ্রাওনের নবাব দুহিতা ও রুই পরিবরের চন্দরা, নির্বোধ রামকানাই ও পরাজিত শেখর কবি সকলেই কবি-হৃদয়ের সমান সমবেদনার অংশ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের নরনারী সম্বন্ধে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য, আরও উল্লেখযোগ্য এইজন্যে যে, কোন কোন সমালোচক তাঁহাকে শ্রেণীবিশেষ বা বৃত্তিবিশেষের কবি বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

উপন্যাস ও নাটকের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সঙ্গে ছোট গল্পের চরিত্রের তুলনা করা উচিত হইবে না। আগেরগুলি যদি দর্পণের প্রতিবিম্ব হয়, শেষোক্তগুলি নখদর্পণের প্রতিবিম্ব। নখদর্পণের প্রতিবিম্বে থাকে সবই, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আলাদা করিয়া বুঝিবার উপায় থাকে না, অথচ তাই বলিয়া তাহাদের বস্তু-সত্যতা কম নয়। বরঞ্চ ছোট গল্পের চরিত্রের সঙ্গে কবিতার নরনারীর চরিত্রের তুলনা চলে; গল্প-গুচ্ছের নরনারীর সঙ্গে কথা ও কাহিনীতে বা পলাতকায় বা ঐ শ্রেণীর কবিতায় অঙ্কিত চরিত্রের তুলনা চলিতে পারে। পুরাতন ভৃত্য কবিতার কেষ্টার চরিত্র ক'টি রেখায় অঙ্কিত? অথচ মনে হয় কোন কথাটি বাদ পড়ে নাই। আবার পোস্টমাস্টার গল্পের রতনের চরিত্র অঙ্কনে কয়টি রেখা লাগিয়াছে? তাহার সম্বন্ধে ইহার বেশী আর কি জানিবার প্রয়োজন ছিল? কাবুলিওয়ালার মিনি আর দেবতার গ্রাসের রাখাল ন্যূনতম রেখায় অঙ্কিত হইয়াও প্রবলতম প্রভাব বিস্তার করে নাকি? পলাতকা কাব্যের মুক্তি কবিতা ও স্ত্রীর পত্র গল্পটির মধ্যে বাহনের প্রভেদ আছে, বাহিত সত্যের প্রকৃতি অভিন্ন। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, ছোট গল্পের নরনারীর এবং কাব্যের নরনারীর মধ্যে সৃষ্টি-কৌশলের সমত্ব থাকায় তুলনা চলিতে পারে; কিন্তু উপন্যাসের নরনারীর সঙ্গে কদাচ নয়। কেননা, প্রভূততম তথ্যের সাহায্যেই উপন্যাস উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, আর ছোট গল্পের দীপ্তি বাড়ে তথ্যের ন্যূনতমতায়; উপন্যাসে অনেক সময়ে অবান্তর কথাও রাখিতে হয়, ছোট গল্পে নিতান্ত আবশ্যক কথাটিকে রাখিতেও দ্বিধার অন্ত থাকে না; উপন্যাস শিল্পের প্রাণ গ্রহণে এবং আরও গ্রহণে আর ছোট গল্পের প্রাণ বর্জনে এবং আরও বর্জনে।

এখানে ছোট গল্পের চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা সহায়তা করিয়াছে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তাঁহার ছোট গল্পকে আমি গীতিধর্মী বলিতেছি বা গদ্য লিরিক আখ্যা দিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে যেখানে যে-কেহ ছোট গল্প লিখিয়াছে, সে কবি হোক বা না হোক এই রীতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। গীতি কবিতা ও ছোট গল্প দুই-ই তথ্যাল্পতা ও সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে গড়িয়া ওঠে। এখন কোন ছোট গল্প লেখক যদি উপরন্তু গীতি-কবিও হয়, তবে তাহার কিছু সুবিধা হইবার কথা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটি ঘটিয়াছে। আবার অন্যত্র তাঁহাকে অসুবিধাতেও পড়িতে হইয়াছে। ছোট গল্পের ও উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কন রীতির পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আগেই বলিয়াছি যে, উপন্যাসীয় চরিত্র তথ্যবহুল ও জটিল রেখায় গড়িয়া ওঠে। কিন্তু যদি কোন ঔপন্যাসিক মূলত গীতিকবি হন তবে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বভাববিরোধী বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। গীতিকবির মনে, রবীন্দ্রনাথের মনে তথ্যের প্রতি একপ্রকার অসহিষ্ণুতার ভাব আছে, জটিল রেখাজালে নিজেকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে একপ্রকার সংকোচের ভাব আছে। অথচ তথ্যবাহুল্য ও জটিল রেখাজালই উপন্যাসীয় চরিত্রের প্রাণ। এই আত্মদ্বিধার সংকটের জন্যই

রবীন্দ্র উপন্যাসের অনেক নরনারীর চরিত্র যাঁহাদের সূচনা রসোজ্জ্বল, তাহাদের উপসংহার কেমন যেন অতৃপ্তিকর। শুধু তাই নয়, যেহেতু উপন্যাসের ঘটনাবলী [illegible] পূর্ণাঙ্গ হইয়া ওঠে, তথ্য-বহুলতার প্রতি কবির পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম-বিমুখতার ফলে গোরা উপন্যাসখানি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্য সব উপন্যাসেরই উপসংহার কেমন যেন অসন্তোষজনক। এই কারণেই দর্পণের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব এবং নখদর্পণের ক্ষুদ্রায়ত প্রতিবিম্বের মধ্যে যে প্রভেদ স্বাভাবিক, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইলে মানিতে হয় যে, তাঁহার ছোট গল্পের চরিত্রগুলি উপন্যাসের চরিত্রগুলি অপেক্ষা সার্থকতর।

চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ লাল, কালো, সাদা প্রভৃতি কড়া রঙ ব্যবহার করেন না। রঙের পরিভাষায় বলিতে গেলে নীল, সবুজ বা ঐ জাতীয় মিশ্র কোমল রঙ ব্যবহার করিতে তিনি অভ্যস্ত। তাহার ফলে চট্ করিয়া তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি চোখে পড়ে না; এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য কড়া রঙে আঁকা ছবির মতো সেগুলি চক্ষুকে আঘাতও করে না; গল্পগুচ্ছের নরনারী যেমন বিলম্বে চোখে পড়ে, তেমনি প্রাতঃকালের শেফালির মৃদু সৌরভের মতো সায়াহ্ন অবধি স্মৃতিতে বিলম্বিত হইয়াও থাকে। সমস্ত উচ্চাঙ্গের শিল্পের রসাস্বাদের ন্যায় গল্পগুচ্ছের যথার্থ রসবোধ সাধনাসাধ্য ব্যাপার। উদাহরণযোগে তুলনা করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্রের মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ গল্প দুটি খুব জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ আর কিছুই নয়, অতিরঞ্জন, যাহাকে আমরা কড়া রঙের অপব্যয় বলিয়াছি। মহেশ বা অভাগীর স্বর্গের মতো ঘটনা আদৌ সম্ভব কি না, সে বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে। অন্তত গল্পগুচ্ছের ভূখণ্ডে বা উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে কখনোই ঘটিতে পারিত না। পশ্চিমবঙ্গের কোন অঞ্চলে এমন ঘটনা যদি সম্ভবও হয়, তবু তাহা সাধারণ অভিজ্ঞতার বস্তু নয়। একথা লেখক জানিতেন বলিয়াই কড়া রঙের পরে কড়া রঙের পোঁচ চালাইয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শিল্প-ক্ষেত্রে কখনো কখনো চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হয় সত্য, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত আঙুলটা না চোখে ঢুকিয়া যায়। এখানে সেই বিপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়া আমার আশঙ্কা। আর চোখে আঙুল ঢুকিয়া গেলে চক্ষুষ্মান্ পাঠকের আপত্তি হইবে, ইহাও খুবই সম্ভব। গফুর দারিদ্র্যের অনুরোধে প্রিয় গাভীটি বেচিতেছে বা সদ্যমৃত জননীর সৎকারের জন্য পুত্র ইন্ধনের অভাবে পড়িয়াছে, শিল্পসৃষ্টির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; কিন্তু জনপ্রিয়তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুঃখ-দুর্দশার ফাঁস আঁটিতে আঁটিতে লেখক পাঠকের প্রাণ কণ্ঠাগত এবং অশ্রু চক্ষুগত করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার চেয়ে অনেক কম চাপে হতভাগ্য মহেশের মৃত্যু হইয়াছিল। অভাগীর স্বর্গেও অতিরঞ্জনের ছড়াছড়ি। অভাগী মরিয়াছে, শিল্পকলা মরিয়াছে, পাঠকেরও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।[৭৯]

মহেশ ও অভাগীর স্বর্গের সঙ্গে গল্পগুচ্ছের শাস্তি বা দুর্বুদ্ধি গল্প

---

৭৯ এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ শরৎচন্দ্র মূলতঃ উপন্যাসিক। তথ্য বর্জন, সূক্ষ্ম রেখায় অঙ্কন তাঁহার ধর্ম নয়। উপন্যাসের তথ্য বাহুল্য ছোট গল্পের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অনেক স্থলেই তিনি শিল্পকে অতিরঞ্জনের কোঠায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

দুটির তুলনা করিলে সংযম ও অতিরঞ্জনে প্রভেদ বোঝা যাইবে। এ গল্প দুটির বিষয়ও দুঃখ-দারিদ্র্য এবং দুর্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচারে ফাঁসির আসামী চন্দরা স্বামীর দর্শন-প্রার্থনাকে একটিমাত্র শব্দে নাকচ করিয়া দিয়াছে। চন্দরা বলিয়াছে 'মরণ'। শব্দ একটিমাত্র, কিন্তু জলমগ্নের অন্তিম নিশ্বাসের মতো সমস্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিযোগ তাহাতে পুঞ্জিত। স্বল্পভাষী, অভিমানী, স্বামীগত প্রাণ চন্দরার যোগ্য উত্তর। কিন্তু এই দৃশ্যটি শরৎচন্দ্রের হাতে পড়িলে কি অবস্থা ঘটিত ভাবিতেও আতঙ্কবোধ হয়। এই প্রভেদের মূলে আছে একজনের সংযম আর অপরের অতিরঞ্জন।

আর দুটি গল্প গ্রহণ করা যাক। শরৎচন্দ্রের বামুনের মেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের সমস্যা পূরণ। দুটির ঘটনা অননুরূপ নয়। কিন্তু আর বড় মিল নাই। শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে' নামটিতেই Irony'র বা ব্যঙ্গের প্রবল ঘণ্টাধ্বনি করিয়া মেলার সার্কাসওয়ালার মতো দর্শককে নিজের তাঁবু কানাতের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আর গল্প সমাপ্ত হইবার আগে পর্যন্ত 'সমস্যা পূরণ' নামটির দৃঢ়মুষ্টি হইতে আসল রহস্যটি কিছুতেই উদ্ধার করা যায় না। লেখকের নিজের উপরে বিশ্বাস আছে, বদ্ধমুষ্টি দেখিলে লোকে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া তিনি ভয় পান নাই। আর শরৎচন্দ্র গোড়াতে টিকিটের পয়সা গুনিয়া লইয়া তবে পাঠককে তাঁবুতে ঢুকাইয়াছেন। পাঠককে যেখানে এমন ভয়, সেখানে অতিরঞ্জনই মনোরঞ্জনের প্রধান উপায়। তাই বামুনের মেয়ে গল্পটির পাতায় পাতায় 'শ্যামদেশের যমজ ভগ্নী,' 'ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের পুনর্জীবন লাভ" প্রভৃতির ন্যায় অতিরঞ্জনের ছড়াছড়ি। একটিমাত্র গল্পে এমন প্রভূত অতিরঞ্জন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘণ্টা বাজাইবার প্রয়োজন অনুভব করিলে রবীন্দ্রনাথ গল্পটির নাম 'যবনী-পুত্র' দিতে পারিতেন আর তাহাতে আসর রীতিমতো জমিয়া উঠিত। সে প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই, গল্পটিকে তিনি সংযমের সবুজে ও বৈরাগ্যের ধূসরে আঁকিয়াছেন। আর পাছে ইহাতেও আভাসে অতিরঞ্জন আসিয়া পড়ে, তাই উপসংহারটিকে অতিশয় সুকুমার একটি ব্যঙ্গের তির্যক-ছটায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন।

এ পর্যন্ত দেখিলাম যে, লঘুতথ্য, সূক্ষ্মরেখা এবং কোমল রঙের সাহায্যে ছোট গল্পের নরনারী চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিই উপাদানের সবটা নয়, আরও কিছু আছে। লঘু হাস্যরস, যাহাকে আমি অন্যত্র স্মিত
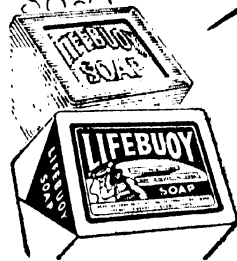
হাস্যরস বলিয়াছি, আর একটি উপাদান। স্মিতহাস্যরস যেন হাসির নীহারিকা; ক্ষীণভাবে, স্বচ্ছভাবে আকাশে ছড়াইয়া আছে; অনুভব করা যায়, কিন্তু স্পষ্টভাবে ধরাছোঁয়া যায় না; মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় তাহা সংহত হইয়া নক্ষত্রের দীপ্তি পাইয়াছে, আলঙ্কারিকেরা তাহাকেই বলিয়া থাকেন হাস্যরস। নীহারিকা ও নক্ষত্রের মধ্যে যে প্রভেদ, ঠিক সেইরকম প্রভেদ হাস্যরসে ও স্মিতহাস্যরসে। নক্ষত্রপ্রভ হাস্যরস গল্পগুচ্ছে আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপাদানরূপে কবি নীহারিকাসম স্মিত-হাস্য রসকেই ব্যবহার করিয়াছেন। স্মিত-হাস্যরসের প্রভাব সম্বন্ধে পাঠক সব সময়ে সচেতন হয় না, কিন্তু তাহার অগোচরে মনটি ভিজিয়া প্রসন্ন হইয়া ওঠে। যেভাবে গল্পটিকে গ্রহণ করা উচিত কিম্বা বর্ণিত নরনারীকে দর্শন করা উচিত, তাহার জন্য মনটা আপনা আপনি তৈয়ারী হইয়া থাকে। আলঙ্কারিকোক্ত হাস্যরস একসঙ্গে দেহ ও মনের হাসি, স্মিত-হাস্যরস কেবল মনের হাসি। কেবল গল্পগুচ্ছে নয়, প্রায় সর্বশ্রেণীর রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ স্মিত-হাস্যরসকে একটি উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, আর তাহার ফলে নিতান্ত নীরস বিষয়ও আশ্চর্য প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে। অনেক লেখক হাস্যরসকে কাপড়ের উপরে তোলা ফুলের মতো ব্যবহার করেন, তাহা কাপড়ের অংশ হইলেও কতক পরিমাণে ভিন্ন, তাহাতে কাপড়খানা সুন্দর হইয়া ওঠে সত্য, কিন্তু ফুলটাকে বাদ দিলে কাপড়ের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু স্মিতহাস্য অন্য বস্তু। তাহার সূক্ষ্ম সুতা কাপড়ের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত লম্বমান, এমন অনেক সুতা। কাজেই তাহাকে বাদ দিলে বহুল পরিমাণে কাপড়ের অস্তিত্বটাই লোপ পায়। কাজেই স্মিতরসের সঙ্গে কাহিনীর বা পাত্রপাত্রীর অঙ্গাঙ্গী যোগ, এতটুকুও আকস্মিক নয়।

গল্পগুচ্ছে তিনভাবে স্মিতহাস্যরসের ব্যবহার করা হইয়াছে; সংলাপে ঘটনা-বিন্যাসে ও চরিত্র পরিকল্পনায়। এখানে চরিত্র পরিকল্পনা প্রসঙ্গে স্মিতহাস্যরসের আলোচনা করিব। আমার তো গল্প-গুচ্ছের এমন একটি প্রধান নরনারী চোখে পড়ে না, যাহাদের চরিত্রে স্মিত-রসের কিছু মিশাল ঘটে নাই, তবে সে পদার্থ কোথাও স্বচ্ছ, কোথাও অনচ্ছ, কোথাও লঘু, কোথাও ঘনীভূত।

তারাপ্রসন্ন, সম্পাদক, কৈলাসচন্দ্র, ভবানীচরণ, অনাথবন্ধু, নরেন্দ্রশেখর, মিঃ নন্দী প্রভৃতি চরিত্রে এই রস অত্যন্ত ঘন, বেশ বুঝিতে পারা যায়, আর একটু ঘনীভূত হইলেই তাহা নক্ষত্রের সংহতি লাভ করিয়া হাস্যরসে পরিণত হইতে পারিত।

কখনো কখনো স্মিতরসের কৌতুকচ্ছটা তির্যকভাবে প্রতিফলিত হইয়া চরিত্র-গুলিতে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা দান করিয়াছে, যজ্ঞনাথ কুণ্ডু, দালিয়া, বৈদ্যনাথ (পুত্র-যজ্ঞ), প্রতিবেশিনী গল্পের নায়ক, প্রভৃতি উদাহরণ।

আবার কখনো বা দুরদৃষ্টিক্রমে স্মিতরস নিষ্ঠুরতার কাছে পৌঁছিয়াছে, নষ্টনীড়ের ভূপতি ইহার দৃষ্টান্ত। সে বেচারা যখন বিশ্বশ্রদ্ধচিত্তে বিশ্বের হিত-সাধনে ব্যস্ত ছিল, অদৃষ্ট তাহার গৃহসুখ লক্ষ্য করিয়া শ্লেষোজ্জ্বল শর-সন্ধান করিতেছিল এবং তাহাতে ভূপতির সম্পূর্ণ সহযোগিতা ছিল; শরটির নির্মাণ অদৃষ্টের হাতে, নিক্ষেপ ভূপতির হাতে।

প্রয়োজন হইলে স্মিতরস তিক্ত হইয়া উঠিতে পারে সত্য, কিন্তু মোটের উপরে তাহার স্বভাবটা স্নিগ্ধ। বালক যেমন নিজের উপরে প্রয়োগ করিয়া সদ্যক্রীত ছুরি খানার ধার পরীক্ষা করে, এমনভাবে পরীক্ষা করে, যাহাতে রক্তপাত হয় না অথচ কিঞ্চিৎ বেদনাবোধ হইতে থাকে, কর্তব্যের কঠোরতা ও সংযমের শাসনের মধ্যে আপসে পরীক্ষা কার্য সমাধান হয়, তেমনিভাবে অনেক নায়ক নিজের প্রতি স্মিতহাস্যরসের প্রয়োগ করিয়াছে, উদাহরণ এক রাত্রির নায়ক, ঠাকুরদা গল্পের "আমি", ডিটেকটিভ ও অধ্যাপক গল্পের নায়কদ্বয় এবং প্রতিবেশিনী দর্পহরণ, অপরিচিতা, হৈমন্তী, পয়লা নম্বর প্রভৃতি গল্পের নায়কগণ। গল্প-গুলি সবই নায়কমুখে বিবৃত। কখনো কখনো এই স্মিত-হাসি ঈর্ষার উপরে প্রতিফলিত হইয়া মৃত্যুমুখী বাণের ফলার মতো ঝকমক করিয়া ওঠে। কঙ্কাল গল্পের নায়িকার নিজ মুখে প্রদত্ত বিবরণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। চরিত্র পরিকল্পনায় স্মিতরসের ব্যবহারের উল্লেখ করিলাম, ইহার সঙ্গে সংলাপে ও ঘটনাবিন্যাসে স্মিতরসের ব্যবহার যুক্ত করিয়া লইলে গল্পগুচ্ছে স্মিতরসের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা হইবে, বুঝিতে পারা যাইবে গল্পগুচ্ছ পরিকল্পনার ইহা অন্যতম প্রধান উপাদান।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির বিষয়বস্তু কি এবং পাত্রপাত্রী কাহারা? অধিকাংশই অবজ্ঞাত জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখ, অধিকাংশ নরনারীই সামান্য সাধারণ নরনারী। দালিয়া বা দুরাশার মতো দু'চারটি গল্প ছাড়া কোথাও ইতিহাসের বৃহৎ অঙ্কপাতের চিহ্ন নাই, এমন কি ধনী ও অভিজাত নরনারীও বিরল। ইতিপূর্বে প্রসঙ্গান্তরে ছিন্নপত্রের যেসব অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে গল্প-গুলির বিষয়বস্তুর ও নরনারীর জীবনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিষয়বস্তুর ও নরনারীর সামান্যতা সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরঞ্চ কবিমনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ উজ্জ্বল ও অর্থময় হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। রবীন্দ্রকাব্যের দুটি আকাঙ্ক্ষার কথা কবি বারংবার

উল্লেখ করিয়াছেন, একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, আর একটি সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসারে অনুপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষা। গল্পগুচ্ছে শেষ আকাঙ্ক্ষাটির অপূর্ব চরিতার্থতা আবার সোনারতরী ও চিত্রার ন্যায় কাব্যে প্রথম আকাঙ্ক্ষাটির সফলতা—আর এই দুয়ে মিলিয়া একটি বিচিত্র পূর্ণতা। একদিকে মানসসুন্দরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, জ্যোৎস্না রাত্রে, উর্বশী, পূর্ণিমা, আবেদন, বিজয়িনীর ন্যায় কবিতা আর একদিকে পোস্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্তি, সভা, ছুটি, শাস্তি, খাতা, অনধিকার প্রবেশ, দিদি অতিথি প্রভৃতির ন্যায় গল্প। হঠাৎ দেখিলে এই দুই শ্রেণীর রচনাকে অসংগত মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের আপাতপ্রভেদ রবীন্দ্রকাব্যের পূর্বোক্ত আকাঙ্ক্ষাদ্বয়ের মধ্যে এক পরম সংগতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র কবি জীবনের এক কোটিতে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আর এক কোটিতে সুখদুঃখের সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, ইহাদের এক কোটিতে সোনার তরী ও চিত্রার অধিকাংশ কবিতার অবস্থিতি, আর এক কোটিতে গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পের অবস্থান। এইভাবে দেখিলে তবেই ইহাদের সম্পর্ক ও সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

পিতা যেমন অবোধ শিশুসন্তানের কার্যকলাপ দেখেন, স্মিত হাসারসের দৃষ্টিতে কবি তেমনি পল্লী নরনারীর জীবনলীলাকে দেখিয়াছেন এবং সহিষ্ণু স্নেহের সংগে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে লেখক ও লিখিত নর-নারীর জীবনের মধ্যে দুস্তর দূরত্ব, কিন্তু কবির সমবেদনার দূরবীক্ষণী দৃষ্টি তাহাদের কাছে আনিয়া দিয়াছে, শিল্প যে দূরত্ব ও নৈকট্যের যুগপৎ অপেক্ষা রাখে এইভাবে তাহার সমাধান হইয়াছে। এমন সমবেদনার সমদৃষ্টি রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যত্র বিরল। সোনারতরী কাব্যের শেষাংশে কতকগুলি চতুর্দশপদী আছে। সেগুলিতে সমবেদনা ও সহিষ্ণুতার অপূর্ব মিশ্রণ ও প্রকাশ।*

কবি মায়াবাদীকে বলিতেছেন—

"লক্ষ কোটি জীব ল'য়ে
এ বিশ্বের খেলা
তুমি জানিতেছ মনে
সব ছেলে খেলা।"

তারপরে—

"হোক খেলা, এ খেলায়
যোগ দিতে হবে
আনন্দ কল্লোলাকুল
নিখিলের সনে।
....
কেমনে মানুষ হবে
না করিলে খেলা।"

পুনরায়—

"তেমনি সহজ তৃষ্ণা
আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস
কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ"

কবি বুঝিয়াছেন—

"জানি আমি সুখে দুঃখে
হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন,"

পৃথিবীর সম্বন্ধে বলিতেছেন, গল্পগুচ্ছের পল্লী ভূখণ্ডের প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য—

"যেখানে এসেছি আমি,
আমি সেথাকার
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।"

এই ধরিত্রী কেমন?

"তাই তোর মুখখানি বিষাদ কোমল,
সকল সৌন্দর্য তোর ভরা অশ্রুজল।"

আবার আছে—

"জন্মেছি যে মর্ত্যকোলে
ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর
মুক্তি খুঁজিবারে।"

তবে কবির কর্তব্য কি?

"তোমার আনন্দ গানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু'একটি প্রীতি সুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে।"

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি সেই সাধারণীর, সামান্যার, অক্ষমার, দরিদ্রার 'প্রীতি সুমধুর" সুখের গান ও দুঃখের ক্রন্দন। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি সমস্তই এই কবি-অভিলাসের গদ্যময়ী টীকা।

তাহা হইলে দেখিলাম যে, গল্পগুলির বিষয়বস্তু জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখ। এ সম্বন্ধে কবির একখানি পত্র উদ্ধার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

"যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোন খোলা জায়গায় থাকা যায়, ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ ক'রে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হ'তে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে, কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য, অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড় সামান্য নয়, ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তবে ঘাসরূপে টিঁকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়, সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন ক'রে বটগাছ হ'বার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না এই-জন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হ'য়ে রয়েছে। বাস্তবিক বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বা চৌড়া কথার দ্বারা নয় কিন্তু প্রাত্যহিক ছোট ছোট কর্তব্য সমাধা দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। বীরত্বই বলো আর বীরত্বই বলো কোনটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। ব'সে ব'সে হাঁসফাঁস করা, কল্পনা করা, কোন অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা এবং ইতিমধ্যে সমুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর কিছু হ'তে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সংগে, বলের সংগে, হৃদয়ের সংগে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে পালন ক'রে যাবো, এবং যখন বিশ্বাস হয়তো তা করতে পারবো, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটখাটো দুঃখ বেদনা একেবারে দূর হ'য়ে যায়।"* (ক্রমশঃ)

---

* মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি ক্ষমা, দরিদ্রা ও আত্মসমর্পণ।

* শিলাইদহ, ১৬ জুন, ১৮৯২, ছিন্নপত্র।

(২৫)

নূপুরদের বাসা থেকে সুধা সেদিন যখন বাইরে এল, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ এখনও মেটেনি; জানত না, বিচিত্রতর একটা ঘটনা তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

চৌকাটে সবে পা দিয়েছে, হঠাৎ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। মাথায় ওর প্রায় সমানই হবে, ওরই মত রোগা, কিন্তু বড় নোংরা শাড়ি, হাত দুটোও তেল-চিটচিটে, ময়লা। সুধার শরীর ঘিন ঘিন করে উঠল, দু-পা পিছিয়ে গিয়ে তীব্র গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কে?'

'দিদি।'

গলির গ্যাসের আলোর হঠাৎ জোর বেড়ে গেছে, নাকি অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে, সুধা চিনতে পারল ঠিক।

'পীতু?' একটু আগে ঠেলে দিয়েছিল, এবার সুধা নিজেই ছুটে গিয়ে নোংরা শাড়ি আর ধুলোভরা হাতশুদ্ধ বোনকে জড়িয়ে ধরল—'পীতু তুই? কী করে কলকাতায় এলি পীতু, কার সঙ্গে এলি? কতক্ষণ এলি?'

একসঙ্গে তিনটে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না, পীতু শেষেরটাই বেছে নিয়ে বলল, 'এই খানিকক্ষণ।' একটু নড়ে সরে সুধার স্নেহপাশ থেকে নিজেকে চেষ্টা করল মুক্ত করতে।

'ভিতরে গিয়েছিলি?'

পীতু ঘাড় নাড়লে।

'কারও সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না তো!'

'সব ঘর দেখেছিলি? দিদিমা তবে বোধ হয় পুজো দিতে গেছে। একলাটি বাইরে বসে আছিস? সেই থেকে? আয় ওপরে আয়।'

দিদিমা বাড়ি ফিরে জপে বসেছিলেন, ওদের দেখতে পেলেন না। সুধা পীতুকে নিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এল, বিছানাটা দেখিয়ে বলল, 'বস।'

ধবধবে চাদর পাতা, পীতু সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুধা ফের বলল, 'বস না।'

'শাড়িটা যে বড্ড ময়লা, দিদি!'

সুধা আজ উদার হয়ে গেছে, বলল, 'তা হক, তুই ওখানেই বস।'

পীতু তবু রাজি হল না।—'এখানে তো ঘাট-টাট নেই দিদি, না? হাত-পা, মুখটুক ধুতে পেতাম যদি—'

সুধা হেসে বলল, 'ঘাট না থাক, কল আছে। চল তোকে হাত-মুখ ধুইয়ে আনি।'

নিজের ফর্সা একটা জামা দিল পীতুকে, ভাঁজ-করা একটা শাড়ি বার করল। তখনও অবাক ঘোর কাটেনি। কলঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'কিন্তু আমি ভাবতেই পারছি না পীতু, তুই এখানে এসেছিস। কী করে এলি, কে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

পীতু বলল, 'বলব দিদি, সব বলব। আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসি।'

কলঘর থেকে পীতু যেন একেবারে নতুন হয়ে বেরিয়ে এল। পথশ্রমের চিহ্ন এখন শুধু সিক্ত, কিন্তু সংকুচিত দুটি চোখ। অনভ্যস্ত হাতে মাথা সাবানের ফেনা লেগে আছে ঘাড়ের নীচে, গলার ভাঁজে, কানের গোড়ায়। এসেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল পীতু, দু হাতের পাতা চোখের উপরে রেখে আলোটা আড়াল করল। কিছুক্ষণ পরে হাতটা সরিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'দিদি, বাবা আসেনি?'

বাবা? সুধা কথাটা ভাল বুঝল না, 'বাবা এখানে আসবে কী রে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যে পীতু, সব খুলে বল।'

'এখানেও নেই!' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল পীতু, সুধা দেখতে পেল, ওর মুখের রঙ মুছে যাচ্ছে, থরথর কাঁপছে দুটি ঠোঁট। —'এখানেও নেই!' পীতু আবার বলল, 'কিন্তু আমি যে বাবাকেই খুঁজতে বেরিয়েছি দিদি।'

কয়েক মাস আগে হলে সুধা বিহ্বল হত, ভয় পেত, কিন্তু আবেগের বাড়াবাড়ি, বিকার দেখে দেখে স্নায়ু কঠিন হয়েছে, এই খানিক আগেও তো এমনি এক-জনকে ঘুম পাড়িয়ে এল। শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে সুধা টেনে তুলল পীতুকে, বিছানায় বসিয়ে দিল, কাঁধ ধরে পীতুকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'এসবের মানে কী, পীতু। বাবাকে খুঁজতে দেড়শো মাইল পাড়ি দিয়ে এই শহরে একা এসেছিস? বাবা ওখানে নেই?'

সুধার কাঁধে মাথা রেখে পীতু বলল, 'নেই। পনের-কুড়ি দিন থেকে নেই।'

'পনের-কুড়ি দিন।' আরেকবার কথাটা উচ্চারণ করে সুধা যেন সময়টার পরিমাপ নিতে চাইল। তার পাতুকে, হয়ত নিজেকেও, সান্ত্বনা দিতে বলল, 'তাতে কী হয়েছে। বাবা তো মাঝে মাঝে এমন যান। হয়ত পালা-টালা নিয়ে কোথাও গেছেন, গিয়ে আটকে পড়েছেন সেখানে। হয়ত ফিরে গিয়ে দেখবি ফিরেও এসেছেন, অনেক মেডেল, টাকা আর মালা নিয়ে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল পীতু। —'না দিদি, পালা নয়। পালা-টালার খাতা তেমনি বাড়িতেই বাঁধা আছে। ওসব লেখার পালা বাবা ক—বে চুকিয়ে দিয়েছেন, জানিস নে।'

লেখার পালা চুকিয়ে দিয়েছে নীরদ! চকিতে সুধার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল তাদের গ্রামের বিষণ্ণ একটি সন্ধ্যার ছবি। ঝিঁঝি একটানা ডেকে যায়, শেয়ালেরা থেকে থেকে। বারান্দার কোণে মাদুরের ওপর আসীন একটি লোক নুয়ে পড়ে পাতার পর পাতা লিখে চলে, সামনে একটি নিস্তেজ লণ্ঠনের আলো হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠে, দু-একটা বা পাতা উড়ে যায়। দু-হাত বাড়িয়ে লোকটি কুড়িয়ে নেয় সেগুলো, এদিক-ওদিক চায়, নিজের মনেই সদ্য-লেখা একটা গানের কলি গুন গুন করে ওঠে। তার দেহে শ্রান্তি, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, যত আনন্দ, যত জ্বালা, যত বেদনা শুধু চোখের পাত্রে সঞ্চিত রেখেছে। অন্ধকারে দরজার আড়ালে কাকে দেখতে পেয়ে গুন গুন থেমে যায়, নীরদ ডাকে, 'কে, সুধা? আয়, একটু শুনবি।'

জড়োসড়ো সুধা মাদুরের একপাশে বসে। আলোটাব ফিতে ছোট হয়ে আরও বেশি দপ-দপ করে, নীরদ উপুড় হয়ে নির্দিষ্ট পাতা খোঁজে, ঈষৎ লজ্জিত গলায় বলে, 'তোর ভাল লাগে সুধা, সত্যি করে বলবি কিন্তু।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'তোর মা তো কোনদিন শুনল না, তাই তোকে ডেকে ডেকে শোনাই।'

একদিন সুধা জিজ্ঞাসা করেছিল, এ-সব লিখে কী হয়, বাবা। লেখ কেন।'

প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল নীরদকে, অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারেনি। শেষে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'বড় শক্ত কথা বললি। কেন লিখি জানিনা তো। কিন্তু কেন নিঃশ্বাস নিই, তাও কি জানি। অথচ না নিলে বাঁচা যায় না। না লিখতে পারলে আমি মরে যেতাম সুধা।' একটু দম নিয়ে নীরদ বলল, 'না, ঠিক কথা হয়ত বলা হল না। মরে যেতাম না, তবে বোবা হয়ে যেতাম। বোবা মানুষ দেখেছিস, কথা বলতে চায়, পারে না, হাউমাউ করে ওঠে। লেখা বন্ধ হলে আমারও সেই দশা হবে। লেখার ভেতর দিয়ে আমি পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলি।'

সেদিন সুধা কিছু বোঝেনি, আজ সব মনে পড়ছে। পাতার পর পাতা ভরান নিঃশ্বাস নেওয়ার মত অভ্যস্ত, সহজ ছিল যার কাছে, সেই নীরদ লেখা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে সুধার বেশ কিছু সময় লাগল।—'বাবা আর লেখেন না?' প... জিজ্ঞাসা করল আবার।

পীতু বলল, 'না। শেষের দিকে ... মাথা খারাপ মত হয়ে গিয়েছিল। ... সবাই চুপে চুপে, ভয়ে ভয়ে ... তোকে গোড়া থেকে বলি।'

দিন পঁচিশেক আগে ডাক... একটা বইয়ের প্যাকেট দিয়ে ... পীতুদের বাড়ি। যেখানে চিঠি আসে ... ভদ্রে, সেখানে বইয়ের প্যাকেট? ... কম্পিত হাতে মোড়কটা খুলতে ... করল, ছেলে-মেয়েরা গোল হয়ে ... দাঁড়িয়েছে। কাগজের ভাঁজ সরে ... বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে মলাট, ... চেঁচিয়ে উঠল, 'এ-যে আমার বই।' ... গোল শুনে মল্লিকাও তখন এসে দাঁড়... কাছে।

দ্রুত হাতে পাতার পর পাতা ... গেল নীরদ, একটা জায়গায় থেমে ... জোরে চেঁচিয়ে পড়তে গেল ... পড়তে গিয়েই থমকে গেল। বিবর্ণ ... গেল মুখ, বইয়ের ভাঁজ বন্ধ করে ... নিজের নামটা ভাল করে দেখে ... আবার উল্টে গেল পাতা, আবার প... গেল কয়েক লাইন, এবারেও থেমে ... লে। আস্তে আস্তে বইটা মুড়ে ... শুকনো, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'এ... আমার বই নয়।'

পীতু বলল। 'তোমার নয়, কী ব... মলাটে তোমার নাম ছাপা আছে।'

নিস্তেজ গলায় নীরদ বলল, 'মল... টুকুই আমার।'

একটু পরে বইটা নিয়ে নীরদ আ... আস্তে বেরিয়ে গেল।

ফিরে এল যখন, তখন দুপ... নীরদের চোখ লালচে, পাটল, ঝাঁ... চুল, কোন দিকে তাকালে না, তাক থে... পুঁথিগুলো পেরে নিলে; ছাপান ... আরও দু' কপি এসেছিল, সব কুড়ি... মল্লিকার হাতে তুলে দিয়ে বল... 'এগুলো অনেকবার তুমি রাগ ক... ছিঁড়তে গেছ, আজ নিজে থেকে... তোমাকে দিলুম, এগুলো ছিঁড়ে কু... কুটি কর, পুড়িয়ে ফেল, উড়িয়ে দা... আমার কিছু বলবার নেই।'

মল্লিকা বলল, 'সে কি, এ-যে তোম... বই।'
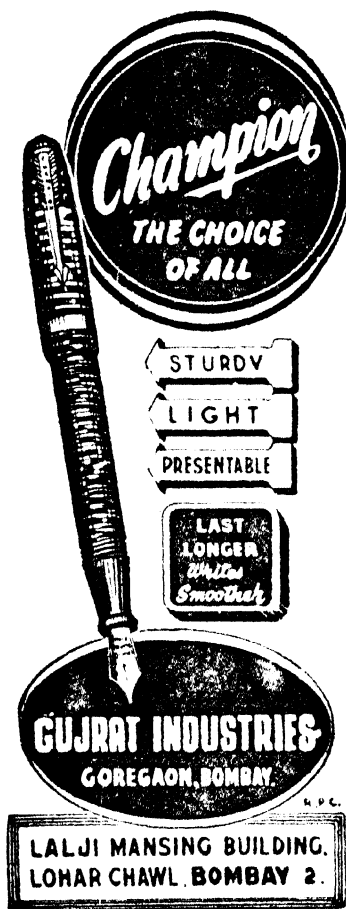
পাগলের মত হেসে উঠল নীরদ।—'কে বলেছে আমার। শুধু নাম, শুধু মলাট। পড়ে দেখ, ওরা সব বদলে দিয়েছে।'

'বদলে দিয়েছে কেন।' মৃঢ় গলায় মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল।

'সেই কথা জিজ্ঞাসা করতেই তো সেদিন চৌধুরীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনিও জানেন না। এ-বই তো ছাপতে দিয়ে গিয়েছিল ওঁর বন্ধু সেই কলকাতার সুধন্য রায়। পাতা উল্টে চৌধুরী মশাই বললেন, তাই ত, নীরদ, এ-সব কিছুই জানিনে আমি। তোমার ছিল যাত্রার পালা, এ-যে দেখছি থিয়েটারের বই। যাত্রা সেকেলে, এ-কালে চলে না, সুধন্য কলকাতার থিয়েটারের সব ব্যাপার জানে তো, সেই বোধ হয় বদলে দিয়ে থাকবে। বইটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এ-বই কলকাতার স্টেজে যখন অভিনয় হবে, খুব হাততালি পাবে, তোমার যশও বাড়বে দেখো। গাঁয়ের পালা-লিখিয়ে ছিলে, হবে দেশের নাট্যকার। আমি বললুম চাইনে আমি দেশের নাট্যকার হতে। যে-বই আমার নয়, সে-বই ভাঙিয়ে যশ চাইনে।'

'যশ চাও না?' মল্লিকা স্তম্ভিত হয়ে বলল।

নীরদ দৃঢ়স্বরে বলল, 'না। আমি তোমাকে বলে রাখলুম মল্লিকা, আমি কলকাতা যাব, খুঁজে বার করব সুধন্য রায়কে। সেই চোরের হাত থেকে আমার হারানো খাতাটিকে কেড়ে নিয়ে আসব। এই থিয়েটারের বই, তার থাকুক, আমার পালার খাতা আমি চাই।'

রুদ্ধশ্বাসে সুধা শুনেছিল। বলল 'তার পর। মা কী বললেন।'

'মা কিছু বলবার অবসরই পায়নি। বাবা যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিলেন তেমনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আর ফেরেননি।'

মিনিটের পর মিনিট কাটল, কেউ কোন কথা বলল না। না সুধা, না পীতু।

পীতু নিজে থেকেই শেষে বলল, 'মা-ও সেই থেকে পাগলের মত। ঘরে একটা চাল নেই, আমাদের যে কী-ভাবে কেটেছে তুই ভাবতে পারবিনে। বিনু-মিনুরা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ফিরেছে, মা তাদের ঠাস ঠাস করে মেরেছে চড়। ওদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে, মা ওদের তাই চেটে চেটে চুপ করে থাকতে বলেছে। বল্ দেখি, ওই নোনা জলে কারও পেট ভরে, না তেষ্টা যায়?'

সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আর বাচ্চাটা?'

'বাচ্চাটা তো নেই দিদি।' কতই না জন্ম-মৃত্যু দেখে দেখে যেন নির্বিকার হয়ে গেছে পীতু; একটা পুতুলমাত্র হারিয়ে গেছে এমন গলায় পীতু বলল 'বাচ্চাটা তো নেই দিদি।'

সুধা চমকে বলল, 'নেই?'

'না। বাবা যেদিন গেল তার পরদিন থেকেই ওর কী হল, বুকের ভেতর থেকে শব্দ উঠত ঘর-ঘর। চোখ লাল, পেট ফাঁপা, ছোঁয়া যায় না গা এত গরম।'

'ডাক্তার আসেনি?'

পীতু ধীরে ধীরে বলল, 'মা কোথা থেকে গাছের পাতা আর শিকড় বেটে খাইয়েছিল। ডাক্তার আসবে কোথা থেকে। মার হাতে একটাও যে টাকা ছিল না দিদি।'

এই আগেই সুধা নূপুরের কাছ থেকে এসেছে, সেই বিকলাঙ্গ মেয়েটির জ্বালার ছোঁয়াচ তখনও মনে একটু লেগে থাকবে। বলে উঠল, 'বিশ্বাস করি না, মা ওকে মেরে ফেলেছে।'

বিস্ফারিত চোখে পীতু চেয়ে আছে, সুধা তিক্ত স্বরে বলে গেল, 'খোঁজ নিয়ে দেখিস, মার আবার ছেলেপুলে হবে। সেটাকে ঠেকাতে পারেনি, খাওয়াবে কী, সেই ভয়ে-ভয়ে যেটা ছিল সেটাকে মেরে ফেলেছে। নইলে মা হয়ে কোলের ছেলেকে বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে দেয়, কোথাও শুনেছিস?'

পীতু শিউরে উঠল। তবু সুধাকে বোঝাতে, নিজের বিশ্বাসটুকু আঁকড়ে থাকতে, বলল, 'মার কাছে সত্যিই টাকা ছিল না দিদি।'

সুধা রূঢ় গলায় বলে উঠল 'মিথ্যে কথা। ওরা সব পারে। নিজের মেয়েকে ফেলে রাখে মাসির কাছে, ছেলেকে বিক্রী করে দেয়—' বলতেই বুঝি নীলুকে মনে পড়ল, সুধা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল 'নীলু কোথায় রে। চৌধুরীরা ওকে নিয়ে গেছে?'

'নিতে পারল কই।' পীতু বলল।

রাত-করাতের দাঁতে পড়ে মুহূর্ত-গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিটকে পড়ছে: পুজোর ঘরে ঘণ্টা থেমে গেছে কখন, দিদিমা হয়ত রান্নাঘরে ঢুকেছেন। দিদিমাকে জানান দরকার পীতু এসেছে, কিন্তু সুধার সে-কথা মনেই পড়ল না, বিছানায় পা মুড়ে বসে শুনে গেল পীতুর আরেকটা কাহিনী।

সুধা চলে আসবার পরই ও-বাড়ি থেকে নীলুকে নিয়ে গিয়েছিল। তখনও শাস্ত্রমত গোদানতর হয়নি, চৌধুরীরা শুধু দেখতে চেয়েছিল নীলুর ও-বাড়ি মন বসবে কি না।

প্রথম দিন নীলু সারা রাত কেঁদেছিল। ভুলিয়ে রাখতে ওরা ওকে বিস্কুট আর লজেন্স খেতে দিয়েছিল। তবু কেঁদেছিল।

শেষ রাতে পালিয়েছিল নীলু। দরজার গোড়া জুড়ে সেঁউড়িতে পাথরের সিংহ, কিছুতেই ভয় পায়নি। ভোরবেলা মল্লিকা ঘুম ভেঙে দেখে, ঠিক তার কোলটি ঘেঁষে শুয়ে।—এ যে নীলু।

বেলা হতেই ও-বাড়ি থেকে লোক-জন এল। কাড়াকাড়ি করল নীলুকে নিয়ে। নীরদ ধমক দিলেন: মল্লিকাকে জড়িয়ে নীলুর কী কান্না। মল্লিকা অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল,—চোখ দুটো জ্বলেছে না ভিজে গেছে কেউ টের পেল না।

তবু নীলুকে যেতে হয়েছিল।

সেদিন ওরা নীলুকে আরও আদর করলে, হাতে রসগোল্লা দিলে, পরিয়ে দিলে নতুন পোষাক। তবু নীলু ভুলল
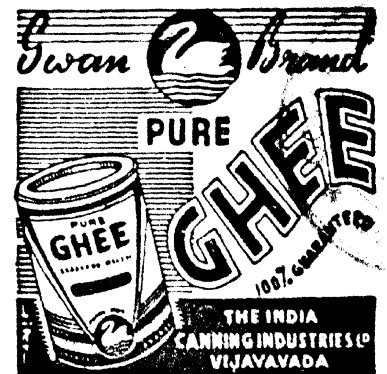
না, সেই রাত্রে সব পাহারা এড়িয়ে আবার পালাল।'

'আবার মার কাছে ফিরে এল?'

পীতু বলল, 'না দিদি। পীতু আর আমাদের বাড়ি ফিরে আসেনি। কোথায় গেছে কেউ জানে না। পরও হল না, আমাদেরও রইল না, নীলু হয়ত অন্য কোথাও, হয়ত এই কলকাতাতেই, কোথাও লুকিয়ে আছে দিদি।'

'খোঁজ নিসনি?'

পরদিন পীতু চৌধুরীদের সেই খ্যাপাটে ছোট গিন্নীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ওকে দেখেই ছোট গিন্নী হেসে উঠল। ডাকল, 'আয়। একটাকে তাড়িয়েছি, এবার বুঝি তোকে পাঠিয়েছে? রোজ একটা একটা বাচ্চা ধরে ধরে খেত, আমি সেই ডাইনি, না?'

হেসে কুটি-কুটি হল ছোট-গিন্নী। বলল, 'অন্তত চৌধুরীরা তাই ভাবে। না, না তা-তো না, ভাবে আমি ছো—ট্ট খুকিটি। প্রথমে আমাকে চেয়েছিল কতকগুলো পুতুল দিয়ে ভোলাতে। ভুললুম না, তখন আমার কোলে এনে দিল একটা পরের ছেলে। আরে, পরের ছেলে কখনও পোষ মানে। আমি নিজের ছেলে চাই।'

পীতুকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছোট-গিন্নী বলল, 'শুনেছিস ছুঁড়ি, আমি নিজের ছেলে চাই। আমার শাড়ি, জরি, গহনা গাঁটি সব বিলিয়ে দিতে রাজি আছি, যদি কেউ আমাকে একটি ছেলে দিতে পারে। চৌধুরী অনেক দিন আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে, আর ভুলছিনে। আমি নিজেই এবার বেরুব। পালাব এখান থেকে।'

ছোটগিন্নী পালাল। নীলুর ঠিক তিন দিন পরে। সেই থেকে প্রেমাংশু চৌধুরী ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকেন। বিষয়কর্ম দেখা নেই, মোসাহেবেরা গেলে বলেন, দূর, দূর। লোকে পুলিশে খবর দিতে বলেছিল। উনি রাজি হলেন না। ফসল ভাল হয়নি, প্রজারা ধন্না দেয়, গাঁ ছেড়ে দলে দলে পলাতে শুরু করেছে, চৌধুরী সব নায়েবের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করলে কখনও বলেন পাইক পাঠাও, কখনও বলে সব জ্বালিয়ে দাও।

গল্প শেষ করে পীতু বলল, 'জমিদারী এবার নীলাম হবে শুনছি। আবার কেউ বলে ওখানে আখের কল বসবে। ওখানে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।'

'তুইও তাই চলে এলি? বাবাকে খুঁজতে? এত পথ একলা এলি কী করে পীতু?'

কাউকে কিছু না বলে পীতু ট্রেনে উঠে বসেছিল। দুটো স্টেশন পার হবার পর পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে পীতু বলেছিল কলকাতার কিছু চেনে না, ঠিকানা জেনে নিয়ে তিনিই পৌঁছে দিয়ে গেছেন ওকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুধা বলল, 'চল পীতু, দিদিমাকে প্রণাম করে আসবি।'

অনেক দিন পরে সুধার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে পীতু সত্যিই এসেছিল কি না। পরদিন সকালে উঠে পীতুকে আর দেখতে পায়নি। অথচ স্পষ্ট মনে আছে, পীতু একা কলকাতা এসেছে শুনে দিদিমা চোখ বড় বড় করে চেয়েছিলেন। ফুলমাসি বাড়ি ফিরে এসে ওকে বকেছিল খুব। সেদিন বিছানা বড় করে পাতা হল, তবু সুধা আর পীতুকে শুতে হল ঘেঁষাঘেষি করে। শুধু রাত জেগে গল্প করবে বলেই নয়, বালিশও মোটে একটা। শিয়রের জানালা বন্ধ, একটু পরেই পীতু জানালাটা খুলে দিতে বলেছিল। জানালা খুলে দিল সুধা, তবু পীতু খানিক পরেই উসখুস করতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত নিজেই উঠে গিয়ে জল গড়িয়ে খেয়ে এল এক গ্লাস,—সুধা শুয়ে শুয়েই সব টের পেল। বিছানায় পা টিপে টিপে ফিরে এসে পীতু চুপ করে বসে রইল। সুধা ঘুমিয়েছে কি না পরখ করল একবার, জামাটা খুলে ভাঁজ করে রাখল বালিশের পাশে, গায়ে আঁচল জড়িয়ে গুটি সুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। এত খুটিনাটি যখন মনে আছে সুধার, তখন তো পীতু সত্যিই এসেছিল। সবটাই তো স্বপ্ন বা মায়া হতে পারে না।

তবু পরদিন সকালে পীতুকে দেখা যায়নি। রাত্রির অন্ধকারে এসে একটি ভেঙে-পড়া গ্রামজীবনের খবর পৌঁছে দিয়েই আবার যেন অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে।

বালিশের নীচে সুধা শুধু একটা চুলের কাঁটা কুড়িয়ে পেয়েছিল। কাঁটাটা তো আর স্বপ্ন নয়।

পীতু চলে যাবার তিন দিন পরে অতসী একদিন নীরদকে আবিষ্কার করেছিল। চৌরাস্তার মোড়ে,—উদ্‌ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত সেই লোকটিকে চিনতে এক পলক নজরই যথেষ্ট।

আদিত্য সলিসিটরের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন,—অতসী হঠাৎ গাড়ি থামাতে বলল। আদিত্য অবাক হয়ে বললেন, 'হঠাৎ'?

অতসী জবাব দিল না, তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল। নীরদ বুঝি লুকোতে চেয়েছিল, উপক্রম করেছিল ভীড়ে মিশে যেতে। কিন্তু অতসী সে-সুযোগ দিল না, একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ডাকল, 'জামাইবাবু!'

নীরদ মাথা নীচু করল।

অতসী বলল, 'কলকাতা এসেছেন অথচ আমাদের একবার খবরও নেননি?'

নীরদ বলতে চেষ্টা করল, সময় পাইনি, অনেক কাজ ছিল ইত্যাদি। অতসী কিছু শুনল না, হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল গাড়ীর পাশে। দরজা খুলে বলল, উঠুন।'

আদিত্য সরে বসে জায়গা করে দিলেন, তিনিও অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু এখন কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।

বাসার সমুখে এসে নেমে পড়ল অতসী সম্মোহিতের মত নীরদও নামল পিছে পিছে। আদিত্য গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আজ যাই, অতসী। কাল ফের দেখা হবে।'

ঘরে ঢুকেই অতসী দরজাটা ভেজিয়ে দিল। জলচৌকিতে নীরদকে বসতে দিয়ে বলল, বসতে দিলুম পিড়ে। শালিধানের চিড়ে নেই, নইলে জামাইকে তাও না-হয় দেওয়া যেত। এবারে বলুন তো জামাইবাবু, এসব পাগলামি করছেন কেন।'

(ক্রমশ

আদা বাঁড়ুয্যের কন্যা নেড়ীকে লইয়া কাঁচকলা গাঙ্গুলীর পুত্র বদাই অন্তর্হিত হইবার পর শহরে যে ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। ইতিমধ্যে বাঁড়ুয্যে শনিবার রাত্রির ট্রেনে বর্ধমান গিয়া চুপিচুপি মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া আসিয়াছেন। পনরোশত টাকাও বদাইয়ের হস্তগত হইয়াছে।

বদাই যে নেড়ীকে বিবাহ করিয়াছে, একথাটাও কেমন করিয়া শহরে জানাজানি হইয়া গিয়াছে। বাঁড়ুয্যেকে এ বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি সক্রোধে হাত-মুখ নাড়িয়া বলেন,—'আমার মেয়ে নেই, মরে গেছে।' মনে মনে বলেন—ষাট্! ষাট্!

গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—'বদাইকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি। হোক একমাত্র ছেলে। তবু ওর মুখ দেখব না।'

ডাক-গাড়ির ডাকাতির অবশ্য কিনারা হয় নাই।

২

গভীর রাত্রে বাঁড়ুয্যের সদর দরজা ভেজানো ছিল, গাঙ্গুলী নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন।

বাঁড়ুয্যে তক্তাপোশে বসিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, হুঁকাটি বেহাইয়ের হাতে দিলেন। গাঙ্গুলী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তারপর বেহাই, কেমন দেখলে?'

বাঁড়ুয্যের ভগ্নদন্ত মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি মুখ চোখাইয়া বলিলেন,—'দিব্যি মানিয়েছে ছোঁড়া-ছুঁড়িকে—ঠিক যেন হর-পার্বতী।'

গাঙ্গুলী বলিলেন—'আমারও দেখবার জন্যে মনটা হাঁচোড়-পাঁচোড় করছে—'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'এখন নয়। এখন তুমি দোকান বন্ধ করলে লোকের সন্দেহ হতে পারে। আর দু'দিন যাক।'

'হুঁ'—গাঙ্গুলী হুঁকায় অধর সংযোগ করিয়া টান দিলেন—'আর কিছু খবর আছে না কি?'

'খবর আর কি! তবে দেড় হাজার টাকায় কুলোবে না। জাঁকিয়ে দোকান করতে হলে আরও হাজার দুই টাকা চাই। তা ছাড়া সংসার খরচও আছে, বলতে নেই ওরা এখন সংসারী হল।—'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'তা তো বুঝছি; কিন্তু দু'হাজার টাকা পাই কোথায়? তুমি একটা মতলব বার কর না দাদা।' বলিয়া হুঁকাটি আবার বাঁড়ুয্যের হাতে ধরাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়া বাঁড়ুয্যে মুখ তুললেন—'শহরে একটা সার্কাস এসেছে না?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'হাঁ, শহরের ছোঁড়ারা মেতে উঠেছে। দু'টো বাঘ, তিনটে সাইকেল-চড়া মেয়ে, একটা বনমানুষ—'

'বনমানুষ?'

'হাঁ, প্রকাণ্ড বনমানুষ। দেখলে ভয় করে।'

বাঁড়ুয্যে আবার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে লাগিলেন।

৩

সার্কাসের দল ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠের একপাশে তাঁবু ফেলিয়াছে। তাঁবুর পিছনে জন্তু-জানোয়ারের আস্তানা। একটি ক্যাঙারু, কয়েকটি বানর, দু'টি লোম-ওঠা বাঘ এবং একটি বনমানুষ। বনমানুষটিই আসল দ্রষ্টব্য জীব। ভয়ঙ্কর চেহারা, মানুষের সহিত সাদৃশ্যই যেন তাহার চেহারাটাকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে।

জন্তু-জানোয়ার দেখিবার জন্য ছেলেদের ভিড় তো অষ্টপ্রহর লাগিয়াই থাকে, বুড়োরাও বাদ যান না। আদা বাঁড়ুয্যে সকালে অফিস যাওয়ার মুখে একবার উঁকি মারিয়া যান। বনমানুষের খাঁচার মধ্যে দুই-চারিটা ছোলাভাজা ফেলিয়া দেন। ছোকরাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন,—'নাম যদিও বনমানুষ, তবু শহরেই থাকে এরা। মানুষের পূর্ব-পুরুষ—হুঃ! পূর্বপুরুষ হতে যাবে কোন্ দুঃখে? মাসতুত ভাই। চেহারার আদল দেখে চিনতে পারছ না?'

ছেলেরা শ্লেষ উপভোগ করে। বনমানুষ ছোলাভাজা খুঁটিয়া খাইতে খাইতে গভীর ভ্রূকুটি করিয়া তাকায়।

অপরাহ্নে আসেন কাঁচকলা গাঙ্গুলী। ক্যাঙারুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছেলেদের ডাকেন,—'ওহে দ্যাখো দ্যাখো, ভাবছ এটা ক্যাঙারু, অস্টেলিয়ার জন্তু? মোটেই তা নয়। আমার পাশের বাড়িতে থাকতো, সার্কাসওয়ালারা ধরে এনে রেখেছে।'

সার্কাস বেশ চলিতেছে, ছেলে-বুড়ো সকলেই খুশী। তারপর হঠাৎ একদা রাত্রিকালে এক ব্যাপার ঘটিল। বনমানুষ খাঁচার তালা ভাঙিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

৪

পরদিন সকালবেলা গাঙ্গুলীর দোকানের সামনে আড্ডা জমিয়াছিল। বনমানুষ পালানোর গল্পই হইতেছিল; বনমানুষটা একেবারে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে, কোথাও তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।

বনমানুষ নিশ্চয়ই বনে গিয়াছে, আলোচনা এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এমন সময় পল্টু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আড্ডাধারীদের মাঝখানে বসিয়া পড়িল।

সবাই প্রশ্ন করিল,—'কি রে! কি রে পল্টু, কি হয়েছে?'

পল্টু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—'বনমানুষ!'

'কোথায়! কোথায়! তুই দেখেছিস্?'

পল্টুর বয়স পনরো-ষোল, একটু ন্যালা-ক্যাবলা গোছের। সে বলিল,—'আমার ময়নার জন্যে ফড়িং ধরতে বনের ধারে গিয়েছিলুম। ওরে বাবা, হঠাৎ আওয়াজ হ'ল—গাঁক! ওরে বাবা, ছুট্টে পালিয়ে আসছিলুম, একটা কুলগাছের ঝোপের আড়াল থেকে বনমানুষটা আমাকে খিম্চে নিলে। এই দ্যাখো।'

সকলে দেখিল পল্টুর নিতম্বের কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং ভিতরে চামড়ার উপর কয়েকটি রক্তমুখী আঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। আঁচড়গুলি বনমানুষের নখের আঁচড় হইতে পারে, আবার কুল-কাঁটার আঁচড় হওয়াও অসম্ভব নয়।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না, দেখিতে দেখিতে গাঙ্গুলীর দোকান শূন্য হইয়া গেল। গাঙ্গুলীও অসময়ে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে শহরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বনমানুষে পল্টুকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন অবস্থা করিয়াছে যে, পল্টুর প্রাণের আশা নাই। দিনে-দুপুরে শহর থম্‌থমে হইয়া গেল; রাস্তায় লোক চলাচল নাই, দোকানপাট বন্ধ। যাহাদের নিতান্তই কাজের দায়ে পথে বাহির হইতে হইয়াছে, তাহারা লাঠিসোঁটা লইয়া ভয়চকিতনেত্রে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে। যাহাদের ঘরে বন্দুক আছে, তাহারা দ্বার বন্ধ করিয়া বন্দুকে তেল মাখাইতে লাগিল।

৫

সার্কাস ম্যানেজারের থানায় তলব হইয়াছে, দারোগা তাঁহাকে ধমকাইতেছেন—'আপনার দোষ, বনমানুষ পালায় কেন? মনে রাখবেন, যদি কারুর অনিষ্ট হয়, আপনার হাতে হাতকড়া পড়বে।'

সার্কাস ম্যানেজার মিনতি করিয়া বলিলেন,—'হুজুর, আমার রামকানাই নিরীহ ভালমানুষ, মুখ তুলে কারুর পানে তাকায় না—'

'রামকানাই কে?'

'আজ্ঞে আমার বনমানুষের নাম রামকানাই।'

'বটে! খাসা রামকানাই আপনার। খবর পেলাম, পল্টু বলে একটি স্কুলের ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে।'

'আজ্ঞে হতেই পারে না। রামকানাই বেহদ্দ ভীতু। স্কুলের ছেলে দেখলেই কেঁদে ফ্যালে। ওরা ওকে ভারি বিরক্ত করে কিনা।'

'তা সে যাই হোক, চারিদিকে তল্লাস করুন। হয়তো বনের মধ্যে ঢুকেছে। আজই ধরা চাই।'

সার্কাস ম্যানেজার নিজের দলবল লইয়া জঙ্গল তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রামকানাইকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় ম্যানেজার ঢেঁট্রা পিটাইয়া পুরস্কার ঘোষণা করিলেন—যে কেহ রাম-কানাইয়ের খবর আনিতে পারিবে, সে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবে।

সকলে বন্ধ দ্বারের আড়াল হইতে ঢেঁট্রা শুনিল, কিন্তু এই ভর সন্ধ্যা-বেলা পঞ্চাশ টাকার লোভেও কেহ ঘর হইতে বাহির হইল না।

রামকানাই তখন আদা বাঁড়ুয্যের বাড়ীর পিছনদিকে একটা এঁদোপড়া ঘরের মধ্যে বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত চিনাবাদাম ভাজা খাইতেছিল।

৬

মিহিলাল নামক এক হিন্দুস্থানী স্যাকরা বাজারে দোকান করিত। সামান্য দোকান, রূপার কাজই বেশি। কিন্তু নিশুতি রাত্রে তাহার কাছে লোক আসিত, সোনার গহনা নামমাত্র দামে বিক্রয় করিয়া যাইত; মিহিলাল তৎক্ষণাৎ গহনা গলাইয়া সোণা করিয়া ফেলিত।

সে-রাত্রে মিহিলাল দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। খিড়্‌কির দরজায় খুট্-খুট্ শব্দ শুনিয়া ঘুম-চোখে উঠিয়া দরজা খুলিল। তারপর 'বাপ্‌রে!' বলিয়া একটি চীৎকার ছাড়িয়া সদর দরজা খুলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। খিড়্‌কির দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিল বিপুলকায় রামকানাই। রামকানাইয়ের পিছনে কেহ ছিল কিনা তাহা মিহিলাল দেখিবার অবসর পাইল না।

সকাল হইলে মিহিলাল কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া আসিল। দেখিল বন-মানুষ তাহার দোকান তচ্‌নচ্ করিয়া গিয়াছে; বিশেষত যে-ঘরে তাহার রান্নার হাঁড়িকুঁড়ি থাকিত সে ঘরের অবস্থা শোচনীয়। একটিও হাঁড়ি আস্ত নাই, চাল ডাল তেল ঘি আনাজ চারিদিকে ছড়ানো।

তাহার মাঝে মাঝে বনমানুষের পায়ের দাগ।

একটি হাঁড়িতে মসুর ডালের নীচে যাট্ ভরি সোণা লুকানো ছিল, সোণা নাই।—

মিহিলাল পুলিসে খবর দিল না। চোরের মায়ের কান্না কেহ শুনিতে পায় না। ব্যথিত চিত্তে ঘর দুয়ার পরিষ্কার করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি তাজ্জব ব্যাপার! বনমানুষও সোণা চেনে!

আশেপাশের দোকানদারেরা অবশ্য জানিতে পারিল, কাল রাত্রে মিহিলালের দোকানে বনমানুষ আসিয়াছিল; কিন্তু সোণার কথা কেহ জানিল না। মিহিলাল কিল খাইয়া বেবাক কিল চুরি করিল।

৭

সার্কাস ম্যানেজার পুরস্কারের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। যে-ব্যক্তি রামকানাইয়ের সন্ধান দিতে পারিবে সে একশত টাকা পুরস্কার পাইবে। কিন্তু তবু রামকানাইকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যগ্রতা কাহারও দেখা গেল না। মিহিলালের দোকানের খবরটা পল্লবিত হইয়া শহরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। মিহিলাল আর বাঁচিয়া নাই, বনমানুষ তাহার ঘাড় মট্‌কাইয়াছে।

বিকাল বেলা সার্কাস ম্যানেজার থানায় বসিয়া দারোগার ধমক খাইতেছিলেন এবং কাঁদো কাঁদো মুখে রামকানাইয়ের ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রের গুণগান করিতেছিলেন এমন সময় কাঁচকলা গাঙ্গুলী হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন—'দারোগাবাবু, বনমানুষের খবর পেয়েছি।'

ম্যানেজার লাফাইয়া উঠিলেন—'কৈ—কোথায়?'

গাঙ্গুলী একবার ম্যানেজারের দিকে চোখ ফিরাইয়া দারোগাকে বলিলেন,—'একশো টাকা পুরস্কার দেবার কথা। পাবো তো?'

ম্যানেজার একশত টাকার নোট পকেট হইতে বাহির করিয়া দারোগার সম্মুখে রাখিলেন—'হুজুর, এই টাকা আপনার কাছে জমা রইল, যদি রামকানাইকে পাওয়া যায় আপনিই এ'কে পুরস্কার দেবেন।'

দারোগা বলিলেন,—'বেশ। গাঙ্গুলীমশায়, বনমানুষ কোথায় দেখলেন?'

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'আজ্ঞে বনের মধ্যে। আমার বাড়ীর ছাদের ওপর থেকে দূরবীণ লাগিয়ে দেখলাম একটা গাছের তলায় কম্বলের মত পড়ে আছে। ভাল করে দেখি—বনমানুষ!'

ম্যানেজার বলিলেন,—'চলুন চলুন। আহা আমার রামকানাই দু'দিন না খেয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে—'

দলবল সহ ম্যানেজার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নির্দিষ্ট গাছের উদ্গত শিকড়ে মাথা রাখিয়া রামকানাই নিদ্রাগত। তাহার নাক ডাকিতেছে।

আফিমের মাত্রা বোধহয় একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অনেক ঠেলাঠেলির পর রামকানাইয়ের ঘুম ভাঙিল। সে উঠিয়া হাই তুলিল, আঙুল মট্‌কাইল, তারপর ম্যানেজারের গলা জড়াইয়া মুখ-চুম্বন করিল।

৮

নৈশ বৈবাহিক-সম্মেলনে কাঁচকলা গাঙ্গুলী বলিলেন,—'কেমন হল বেহাই?'

আদা বাঁড়ুয্যে বলিলেন—'খাসা হল। শাককে শাক তলায় মুলো। পুরস্কারের টাকাটা উপরি।"

গাঙ্গুলী বলিলেন,—'এবার তাহলে বেরিয়ে পড়ি। বদাই আর নেড়ীকে দেখবার জন্যে মনটা ছট্‌ফট্ করছে। এখন গেলে কেউ সন্দেহ করবে না, ভাববে পুরস্কারের টাকায় কলকাতায় ফুর্তি করতে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ। এবার দুর্গা বলে বেড়িয়ে পড়। সোণা সঙ্গে নিয়ে যেও।'

'নিশ্চয়। আচ্ছা বেহাই, মিহিলালের দোকানে যে সোণার তাল আছে এটা বুঝলে কি করে?'

বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—'শিকারী বেড়াল গোঁফ দেখলে চেনা যায়। মিহিলালের ওপর অনেকদিন থেকে নজর ছিল। ওর ঘরে বৌ আছে কিন্তু রাত্রে দোকানে শোয়। ব্যাটা ডুবে ডুবে জল খায়, বাইরে ছোট্ট দোকান করে রেখেছে, ভেতরে ভেতরে চোরাই মালের কারবার চালায়। ব্যাটা হর্তেল ঘুঘু।'

গাঙ্গুলী হাসিলেন,—'তা ভালই হল, চুরির ধন বাট্‌পাড়িতে গেল।'

আদা বাঁড়ুয্যেও কাঁচকলা গাঙ্গুলীর চোখে চোখ তুলিয়া মৃদুমন্দ হাসিলেন।

প্রণাম

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

এ মুগ্ধ হৃদয়-জোড়া
একটি প্রণাম,
হে মাটি,
তোমার ওই
পা-য়ে রাখলাম।

শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ সরকার

হাজারীবাগ বড়কাগাঁও রোডের সেভেনথ্ মাইল স্টোনের পূব দিকের কাঁচা রাস্তায় মোড় ফিরে ব্রেক কষে গাড়িটা। চৈত্রের শেষ ও বৈশাখের প্রথম। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু ধু ধু করছে শুষ্ক রুক্ষ প্রাণহীন অরণ্য প্রান্তর। জ্বলে যাওয়া শিশু শাল, বুনো কুল ও ডোয়ার্ফ বাবলার ঝাড়গুলো, পত্রহীন শাখা-প্রশাখা ও মেরুদণ্ড নিয়ে যেন সার সার কংকালের মত ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে আছে এক বিন্দু জলের আশায়। বিবর্ণ ঘাসের চামড়া পড়ে রোঁয়া ওঠা অতিকায় এক জানোয়ারের মত বিরাট প্রান্তরটা যেন বুকফাটা তৃষ্ণার অসীম যন্ত্রণায় ধুঁকছে। চৈতালী ঘূর্ণি একরাশ ধুলো বালি উড়িয়ে নিয়ে, শুকনো পাতার খড়ম বাজিয়ে ভৈরবীর বেশে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে গিয়ে মিলিয়ে যায় রুদ্র রুক্ষ প্রান্তরের বুকে।

তন্ত্র মতেই যাত্রার ভূমিকা রচনা করা হয়। বিলাতী বিয়ারের রুদ্ধ উত্তেজনা ফেনার আকারে উপচে পড়ে বোতলের মুখে।

পারহেরিয়া পেঁছিতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। খোড়ো চালের ছাদ ও নিপুণ হাতে নিকোন গিরিমাটির দেওয়াল নিয়ে পরিষ্কার তকতকে গ্রামখানা যেন পরম আরামে আদরে ঘুমিয়ে আছে শাল, মহুয়া ও অশ্বত্থ গাছের বিরাট বাহুগুলোর নীচে। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ফরেস্ট আপিসটা কোনদিকে জেনে নেওয়া হয়। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে যায় জঙ্গলকা অফিসের বাহ্যিক রূপ দেখে। গ্রামের বাইরে জনহীন এক প্রান্তরের উপর আটচালা গোছের এক ছাউনি বুনো বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গোয়ালঘরের দরজার মত ঠেকা দেওয়া এক দরজা অর্ধোন্মুক্ত অবস্থায় কাৎ হয়ে ইঙ্গিত জানাচ্ছে বাড়িটার রক্ষীশূন্য অবস্থার। গাড়ির হর্ন টিপে চারিদিকে টর্চের আলো ফেলা হয়। ত্রিসীমানায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। তীব্ররশ্মি অনর্থক ইতস্তত বিচরণ করে শুধু ধাক্কা খায় কণ্টকাকীর্ণ ছোট ছোট পাথরের টিলা আর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান কতকগুলো শাল, মহুয়া আর বিজু আম গাছের গুঁড়ির বুকে। আবিষ্কার করে শুধু আগাছায় ভর্তি রুক্ষ শুষ্ক, কঠিন অরণ্য প্রান্তর। চাকরকে বিছনাপত্র নামাবার নির্দেশ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়া হয়। দুখানা চিঠি বার করে নিকটবর্তী ফরেস্ট স্টেশনে পাঠান হয়। একখানা এই গাঁয়েরই লোকদের লেখা নরখাদক ব্যাঘ্রের অত্যাচারের সংবাদ জানিয়ে ডি, সি'র কাছে পাঠানো অভিযোগ পত্র। অপরখানা ডি, সি'র হুকুমনামা, পীড়িত এলাকার গভর্নমেণ্ট কর্মচারীদের প্রতি। শিকারের জন্যে প্রার্থিত যে কোন সাহায্য অবিলম্বে শিকারীর কাছে উপস্থিত করবার জরুরী নির্দেশ।

পরদিন সকালে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না যেন। বাহ্যপ্রকৃতি এমন অপরূপ রূপসম্ভার নিয়ে চোখের সমুখে দেখা দিতে পারে গত রাত্রির অন্ধকারে একথা কল্পনাও করা যায় নি। চারপাশে সবুজ পাহাড়ের পটভূমিকা। তারই মাঝে বিরাট প্রান্তরগুলো ধাপে ধাপে উপরে উঠে মিলিয়ে গিয়েছে রুদ্ররুক্ষ পাহাড়ের বুকে। ধূসর বর্ণের প্রান্তরগুলোর প্রতি চড়াই উৎরাইএ নূতন নূতন দৃশ্যের সমারোহ। রূপসী তরুণীর নবরূপ যেন প্রতিবার মুগ্ধ দৃষ্টি দর্শকের সামনে উপস্থিত করছে প্রকৃতি। গোটা কয়েক পাহাড়ী ঝর্ণার শীর্ণ জলধারা পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে নেমে এসে প্রান্তরগুলোর বুক চিরে এঁকে বেঁকে মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্তের কোলে। উর্বরা ধরিত্রী যেন আপন অন্তর চিরে স্তন্যদান করে সঞ্জীবিত করে তুলেছে প্রকৃতির এই অরণ্য সম্পদ। সীমাহীন অরণ্যসংকুল পাহাড় আর চারিদিককার নিস্তব্ধ নির্জনতা দেখে মনেই হয় না কিছু দূরেই অপেক্ষা করে আছে জনাকীর্ণ নাগপাশ মানুষকে বেঁধে ফেলবার সহস্র নাগপাশ মানুষকে বেঁধে ফেলাবার সহস্র উপকরণ সাজিয়ে।

সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠে। রাইফেল টেনে নিয়ে উঠে পড়তে হয়। বাঘটার পায়ের পাঞ্জার সন্ধান করতে হবে। পথ দেখিয়ে আগে আগে যেতে থাকে ফরেস্ট গার্ড বৈজু বৈগা—এই গাঁয়েরই এক পুরাতন শিকারী বাসিন্দা। নরখাদক সম্বন্ধীয় বহু তথ্য অকাতরে পরিবেশন করে সে।

গাঁয়ের সীমানার প্রায় কোল ঘেঁষে শুরু হয়েছে এক ছোট পাহাড়। পাতা ঝরে যাওয়া বুনো করঞ্জা, কেঁদ ও অজস্র কণ্টকাকীর্ণ আগাছার কংকালে ভর্তি। পাহাড়টার এক প্রান্তে অর্ধচন্দ্রাকারে বেনে ঘাসের সবুজ আবেষ্টনী। কোন অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার কোমল বাহুবেষ্টনীর স্নিগ্ধ পরিণতি বোধ হয়। তার পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমুখের এক পাহাড়ী নালা। বিরাট ক্ষতের মত এঁকে বেঁকে উপর থেকে নেমে এসেছে কালো পাথরের বুক চিরে।

মাথা নীচু করে পথপ্রদর্শক অগ্রসর হতে থাকে পাহাড়ী নালার শুকনো বালুস্তরের উপর দিয়ে। তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি তার যেন জরীপ করে চলে সমুখের প্রতিটি ইঞ্চি ভূমি। কোথাও তৃষ্ণার্ত ময়ূর জল খেতে এসে বিছিয়ে দিয়ে গেছে মৃদু পায়ের ছাপ। কোথাও ক্ষুধার্ত বন্যশূকের কোমল পলিস্তরের নীচে অবিশ্রান্ত অন্বেষণ করছে নাম না জানা কন্দমূল। কোথাও সতর্ক হরিণের চঞ্চল পদস্পর্শ কিছুদূর অগ্রসর হয়েই মিলিয়ে গিয়েছে উঁচু কিনারার উপর। কোন পাথরের উপর থেকে চীনি কলের সাহেব দু বছর আগে গুলি চালিয়েছিল এক চিতাবাঘের উপর। তিন-দিন পর উদ্ধার করা হয় সেই জানোয়ারটার মৃতদেহ। পচে গিয়ে গন্ধ ছেড়ে গিয়েছিল। সমুখে কিছুদূরে বনডুমুরের এক উঁচু গাছ। এরই ওপরে বছর কয়েক আগে ঘটে গিয়েছে মর্মন্তুদ এক কাহিনী।

বাঘের মড়ির (Kill) খবর পেয়ে তরুণ এক মিলিটারি সাহেব এই গাছের উপর মাচা বেঁধে বসেছিল, তার তরুণী মেমসাহেবকে নিয়ে। রাতের অন্ধকারে 'কিল্'এর উপর এল বাঘ, খাস্ রয়াল টাইগার। গুলী খেয়ে মরবার বদলে

চিরশয্যায় শায়িত নরখাদক। ক্রশ চিহ্নিত স্থানে এল জি ছররার পুরাতন ক্ষত আবিষ্কৃত হয় ও এই ক্ষত-জনিত আঘাতেই বোধহয় জানোয়ারটির বাঁ পাটি আংশিকভাবে বিকল হইয়া তাহাকে নরখাদকে পরিণত করে

ফিরে উঠল মাচার উপর। মাঝ রাতে পোপাতাড়ি গুলীর আওয়াজ শুনে মের লোকেরা ছুটে এল মশাল জ্বালিয়ে ন পেটাতে পেটাতে। মাচার উপর থেকে মাল দুটো মৃতদেহ। একটা বাঘের, রটা ব্যাঘ্রালিঙ্গনবদ্ধা ছিন্নভিন্ন কোমল এক দেহ। অপ্রকৃতিস্থ সাহেব নও মাঝে মাঝে গুলী চালাচ্ছে মরা টার উপর। থানার লোকেরা ছুটে এল দিন সকালে খবর পেয়ে। মৃতদেহটা রে চালান দিল একটা গরুর গাড়িতে পিয়ে। সাহেবকে পাঠাল তার সঙ্গে পাঁচজন চৌকীদার দিয়ে ঘিরে রেখে, প্রকৃতিস্থ, প্রায় উন্মাদ অবস্থায়।

শুকনো বালির আস্তরণ নিয়ে মাটার এক বাহু গিয়ে মিলেছে বেনে সের সবুজ আচ্ছাদনে। সবুজের সারি ন হাতছানি দেয় উত্তাপক্লিষ্ট পথিক-। আশ্চর্যজনক ঠাণ্ডা আবহাওয়া াগাটার। চারিদিককার প্রচণ্ড উত্তাপ ন কোন অদৃশ্য শাসনে স্তব্ধ শঙ্কায় ড়িয়ে আছে সবুজের সীমানার শীতল ণ্ডীর বাইরে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে িট নিবদ্ধ হয় সমুখের আধভেজা ত্রকাস্তরের উপর। কতগুলো বলিষ্ঠ য়ের একফালি সবুজের ভিতর বাঘের পায়ের পাঞ্জার তাজা নিশানা।

বনডুমুরের উপরই মাচা বাঁধা স্থির হয়। শিকারীর অনুসন্ধিৎসা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে তার প্রতিটি শাখা প্রশাখা। সতর্ক অনুভূতি দৃঢ়ভাবে আশ্বাস চায় ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার। এই গাছেরই কোন ডালে এখনও হয়ত লেগে আছে অজানা বিদেশিনীর সুকোমল দেহের উষ্ণ উত্তাপ। এই গাছেরই কোন পাতা হয়ত একদিন অশান্ত উত্তেজনায় হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিল বিম্বাধরোষ্ঠীর ওষ্ঠরক্তরাগের মৃদু স্পর্শ পেয়ে। এই সেই স্থান তারুণ্যের হঠকারিতা যেখানে চরম মূল্য দিয়েছে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায়।

আস্তানায় ফিরে এসে স্বচ্ছতোয়ার স্বচ্ছধারায় ক্লেদমুক্তি ঘটে বিলাতী সাবানের শুভ্র ফেনায়। ছায়াশীতল গাছের তলায় দড়ির খাটিয়া, সামারকুল গেঞ্জি ও ঢিলা পায়জামা সহযোগে মধুর স্নিগ্ধ রাজ্য সৃষ্টি করে। গ্রাম্য কৌতূহল ইতস্তত উঁকি মারে: ঘোমটার অন্তরালে চঞ্চল চক্ষু তীর্যক দৃষ্টি হানে কাঠ কুড়োবার কপট অভিনয়ে। ছোটদের ভীড় জমে গাড়িটার কাছে। শিশু কৌতূহল শঙ্কিত হরষে নিরীক্ষণ করে যান্ত্রিক বিস্ময়।

পরিচয় হয় শিকার গাইড দুহিতা ষোড়শী পার্বতীর সঙ্গে। উত্তেজিত নারী প্রগলভতা অনর্গল বিবৃত করে ব্যাঘ্র সম্বন্ধীয় নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী। কি করে নিরীহ গ্রামবাসীর এক অংশ পর পর অসহায়ভাবে নিহত হয়েছে এক নরখাদকের হাতে। কি করে নিকটবর্তী গ্রামের এক বধূ গভীর নিশীথে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে আসবার পথে শোচনীয়ভাবে নিহত হয়েছে নররক্তলোলুপ এক শয়তানের হাতে। কি করে নিকটবর্তী দুখানা গ্রাম আজ প্রায় সম্পূর্ণ মনুষ্য-বর্জিত ও প্রায় আরও বিশখানা গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত নররক্ত-লোলুপ এক অশুভ শক্তির আকস্মিক অভ্যুত্থানে। আর একটি বিশেষ ঘটনা সত্যই চমকপ্রদ। ঘটনার নায়ক তিতু নাম-ধারী এই গ্রামেরই অধিবাসী জনৈক গোপালক। ঘটনাটি ঘটেছিল এই গ্রামেই দিনকয়েক আগে। একদিন রাত্রিবেলায় মহুয়া ফলের প্রচুর রসাস্বাদনের মধুর পরিণতিতে আচ্ছন্ন তিতু তার কুড়েঘরের দাওয়ায় গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল। এমন সময় গোয়ালঘরে হুটোপুটির আওয়াজ শুনে প্রচণ্ড বিরক্তিতে উঠে পড়ে সে, কোন বন্ধনমুক্ত গোশাবকের অর্বাচীনসুলভ

আচরণের কথা ভেবে। লণ্ঠনটা তার হাতে তুলে দিয়ে তার বউও সংগে সংগে আসছিল ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে। গোয়ালঘরের দরজা খুলেই কিন্তু চক্ষু তার স্থির হয়ে যায়। লণ্ঠনের আলোতে একেবারে সোজা-সুজি দৃষ্টি বিনিময় হয় এক কেঁদো বাঘের সংগে; পিছনের বেড়া ভেংগে একটা বাছ্ছাকে ঘায়েল করেছে শয়তানটা। এই আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তিতু। কি করা উচিত তাড়াতাড়ি বুঝতে না পেরে বৌয়ের হাতেই লণ্ঠনটা ধরিয়ে দিয়ে সটান পশ্চাদপসরণ করে সে। বৌ পিছনে থাকার দরুণ ব্যাপারটা প্রথমে সঠিক উপলব্ধি করতে পারেনি বোধ হয়। হৃদয়ংগম করবার সংগে সংগে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যায় যেন। লণ্ঠন আছড়ে ফেলার আওয়াজের সংগে নারীকণ্ঠের পরিত্রাহি আর্তনাদ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে প্রতিবেশীদের দ্রুত আকর্ষণ করে। ব্যঘ্রপ্রবরও বেগতিক দেখে তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে।

সপ্রতিভ তিতু অবশ্য ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ একখানা লাঠি যোগাড় করবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তাকে তার দ্রুত পশ্চাদপসরণের সঠিক কারণস্বরূপে সকলের কাছে বর্ণনা করে ও পরদিন সকালে বাঘের পায়ের পাঞ্জার উপরই কয়েক ঘা লাঠির কসরৎ দেখিয়ে লাঠি-বন্ধ অবস্থায় বাঘটাকে একবার হাতের কাছে পেলে তার শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে সকলকে নিঃসন্দেহ করে কিন্তু বৌ তার কোন কথাই শুনতে রাজী হয় নি। সোজা বাপের বাড়ী গিয়ে তবে অন্ন গ্রহণ করে সে। স্পষ্ট জানিয়ে গিয়েছে, গোয়ালার মেয়ে দরিদ্রের ঘর করতে পারে, কাপুরুষের নয়।

অপরাহ্নে চায়ের মধুর গন্ধে আকৃষ্ট নাসারন্ধ্র উত্তেজিত করে শরীরের অবসাদ-গ্রস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে। দিবানিদ্রার গ্লানি বিসর্জন লাভ করে রজতশুভ্র ঝরণা নীরে বিজন বালুসৈকতে। পার্বতী কথিত নর-খাদক সম্বন্ধীয় কাহিনী পর পর চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

গভীর নিশীথে শ্বাপদসংকুল অরণ্যের সহস্র বাধা তুচ্ছ করে এক গ্রাম্য বধূ তার শ্বশুরবাড়ি কেরাডাডি গ্রাম থেকে ছুটে চলেছে তার বাপের বাড়ি সিক্রী গ্রামের দিকে, তার বিক্ষুব্ধ নারী অন্তরের সকল

বাসা উজাড় করে, মাতৃ অঙ্কের চিরনিরাপদ আশ্রয়ে স্থান নেবার মানসে। ক্ষতবিক্ষত চরণে বন্ধুর পথের বেশীর ভাগ অতিক্রম করে সে এসে প্রায় উপস্থিত হয় তার নিজ গ্রামের নির্জন প্রান্তে। আর কিছুদূর অগ্রসর হলেই দেখা যাবে তার চিরপরিচিত গ্রাম্যভূমি। সমুখের বনঢাকা চলা পথের বাঁ দিকে ওই যে উঁচু বেদী—ওরই নাম হল দেবীস্থান। ওই দেবীস্থান কত শিশির-ভেজা প্রাতে সে তার বাল্য সখীদের সঙ্গে তার কুমারী হৃদয়ের সকল কামনা উজাড় করে পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়েছে পাষাণ দেবতার পায়ে, অনন্যসাধারণ পতি লাভের আশায়। আর সামনে কিছুদূরে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে জারুল গাছের সারিগুলো—ওরই নীচে ছায়া ঢাকা সবুজ মখমলের মত জমির উপর সে তার বালিকা জীবনের অবসর মুহূর্তে তার বাল্য সখীদের সাথে কত না ছবি এঁকেছে তার ভবিষ্যৎ সংসারের রঙীন কল্পনাতে। আর তার কিনা আজ এই পরিণতি! তার সব কামনা, সব আরাধনা কি সত্যই বিফলে যাবে? পাষাণ দেবতা কি খালি মুখেই নন সত্যই পাষাণ?

পাষাণ দেবতা বোধ হয় সত্যই পাষাণ ছিলেন কারণ নিষ্ঠুর নিয়তি নিষ্ঠুরতর পরিণতি নিয়ে গুপ্তঘাতকের বেশে নিকটেই অপেক্ষা করেছিল। বধূটি জারুল গাছের ঘন অন্ধকার শ্রেণীগুলোর ভিতর প্রবেশ করতেই নিষ্ঠুর নিয়তি নরখাদক শার্দুলের বেশ নিয়ে হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র নারীকণ্ঠের আর্তনাদে নিস্তব্ধ বনের পরিবেশ খান খান হয়ে গেল।

সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে উচ্চকিত গ্রামবাসীরা ভীড় জমায় গ্রামের উপকণ্ঠে। সাহস করে না তারা সমুখের ঘন অন্ধকারময় বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর প্রবেশ করে তাদের এই আকস্মিক উৎকণ্ঠার সঠিক কারণ নিরূপণে। শুধু অশান্ত এক মাতৃহৃদয় গভীর উৎকণ্ঠায় আলুথালুবেশে ছুটে যেতে চায় সমুখের ওই ঘন অন্ধকারের মধ্যে। গভীর সুষুপ্তির মধ্যেও তার কানে প্রবেশ করেছে সেই আর্তস্বর। তাই সে নিজ সন্তানের অজানিত অমঙ্গলশঙ্কায় গভীর উদ্বেগে সে কাতর আকুতি জানায় গ্রামের সমবেত পুরুষের কাছে। তাদের

নরখাদক কর্তৃক উপদ্রুত ও সম্পূর্ণ রূপে মনুষ্য-বর্জিত গ্রাম পারহেরিয়া

পৌরুষের কাছে তার সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে সমুখের ওই ঘন অন্ধকারের যবনিকা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিয়ে তার সন্তানকে ভাবী অমঙ্গলের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে। কিন্তু বিফলে যায় সব। সঙ্গের পুরুষেরা শুধু জোর করে ধরে রেখে তাকে নিবৃত্ত করে অনিবার্য বিপদের নিশ্চিত সম্ভাবনার মুখ থেকে। তারপর রক্তাক্ত অর্ধভুক্ত দেহ নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে লোকনা ওঁরাও আর তার ভাই। লাটকনা গ্রামের বস্তীসংলগ্ন বনের ভিতর কাঠ কাটতে গিয়ে নরখাদকের হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে তারা। ভয়াবহ মৃত্যুর গভীর আতঙ্ক এখনও লেগে আছে তাদের সর্বদেহে।

ধীরে এগিয়ে আসে পারহেরিয়া বস্তীর সুন্দর সিং আর তার পুত্র। বস্তী সংলগ্ন বনের ভিতর জঙ্গল জরীপের কাজের সময় নরখাদকের হস্তে আচম্বিতে প্রাণ দিয়েছে তারা। সামনে এগিয়ে আসে পুণ্ডো গ্রামের সুজন সিং আর তার ভৃত্য ও পর পর আরও কত। একসার মৃত্যু পাণ্ডুর মুখ বিচারের দাবী নিয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে যেন। কঠোর মৃত্যুর দুস্তর পারাবার থেকে হিমশীতল সব কণ্ঠের উচ্চ কোলাহল ভেসে আসে যেন—বিচার চাই, বিশ্বমানবতার নামে প্রতিকার চাই। নারী হত্যার প্রতিকার চাই। ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিকার চাই।

অকস্মাৎ কাছেই কলহাস্যের আওয়াজ শুনে চমক ভেঙ্গে যায়। গ্রানাইট পাথরের কালো ও বনের সবুজ পটভূমিকার ওপর ভেসে ওঠে দুই চঞ্চল মূর্তি। পুরুষ ও নারী। আগে আগে পথ দেখিয়ে অগ্রসর হতে থাকে পুরুষটা চলার প্রতি ছন্দে ঘামে পালিশ করা বলিষ্ঠ দেহের ভিতর থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে গ্রীক ভাস্কর্য। পিছনে নারী স্বাস্থ্যবতী প্রাণোচ্ছল নিকষ কালো পাথরের মেয়ে। সাঁওতাল তরুণ-তরুণী জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরছে।

মূর্তি দুটো দাঁড়িয়ে পড়ে ঝরণার নির্জন কিনারাতে। পুরুষটা আঁজলা ভরে জলপান করে হাঁপাতে থাকে ছোট এক পাথরের ওপর। মেয়েটা মাথার বোঝা একপাশে নামিয়ে রেখে ছুটে যায় কিছু দূর জলের ভিতর। কোমর বেঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ে আঁজলা ভরে জল তুলে নিতে থাকে ঝরণার বুক থেকে। বক্ষোবাস খসে পড়ে তার শিথিল অঙ্গ বেয়ে। জলের উপর নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বোধ হয় লজ্জা পায় মেয়েটা। সিক্ত আবরণ বুকে তুলে ছুটে আসে ছেলেটার কাছে। অকারণে জল ছিটিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তাকে। হাসির ঝরণার ঢেউ গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায় কঠিন পাথরের বুকে।

পরদিন সকালে খবর আসে এখান থেকে প্রায় মাইল চোদ্দ দূরে কাটকমশান্ডা রোডের নাইনথ্ মাইল স্টোনের কাছে একটা 'মড়ি' হয়েছে। খবরটা পাঠান

সহযোগী পরিমল কুমার। বিহার স্টেট ইলেকট্রিকের ইঞ্জিনীয়ার ও বহু কুলীর মালিক। অতএব খবরের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখা যায় যে, সত্যই 'মড়ি' হয়েছে ও আততায়ীর পায়ের পাঞ্জার ছাপ ও নিহত 'মড়ি'র গলায় আততায়ীর দাঁতের দাগের ব্যবধান দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, আততায়ী রয়াল গোষ্ঠীভুক্ত। তবে 'মড়ি'টা নরখাদকের হাতেই নিহত হয়েছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। নরখাদকের অনুকূলে দুখানা মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমত বাঘের পায়ের পাঞ্জার ছাপ দেখে অনুমান করা যায় বাঘটার সম্মুখের বাঁ পাটি আংশিক ভাবে বিকল। দ্বিতীয়ত, বাঘটার শারীরিক সক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ দেখা দেয় তার 'মড়ি' করবার অদ্ভুত কৌশল দেখে। বাঘটা প্রথমে কৌশলে গরুটার পিছনের পায়ের গ্রন্থি দুটো কেটে দিয়ে সেটাকে চলৎ শক্তিহীন করবার পর তাকে হত্যা করেছে। সাধারণ বাঘ কখনই কৌশলে হত্যা করে না।

'মড়ি'টার কাছে মাচা বেঁধে সারারাত বসা হবে বলে স্থির করা হয়; কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় 'মড়ি'র কাছে মাচা বাঁধবার উপযুক্ত কোন গাছের সন্ধান না পাওয়া যাওয়াতে। উপায়ন্তর না দেখে চরম ব্যবস্থা হিসাবে জমির ওপরই বসা হবে বলে স্থির করা হল। এতে একটা বিশেষ সুবিধা আদায় করা যেতে পারে বলে মনে হয় কারণ বিপক্ষ আততায়ী যদি সত্যই নরখাদক হয় তাহলে নরদেহ দেখে সহজেই সে আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। 'মড়ি' থেকে প্রায় গজ ত্রিশেক দূরে একটা পাথরের চত্বরের উপর স্থান নেওয়া হয়। পরিমল কুমার বাঁদিকে আসন গ্রহণ করেন। কতগুলো কাঁটা গাছের ঝাড় ও পাতাসমেত কতগুলো গাছের ডাল কেটে নিজেদের চারিদিকে সজ্জিত করে ব্যূহ সুরক্ষিত করে নেওয়া হয়।

বিদায়ী সূর্যের ম্লান আলো ধীরে ধীরে রহস্যের আস্তরণ টানতে শুরু করে নিস্তব্ধ নির্জন অরণ্যভূমির ওপর। ঝিল্লিকুল নিশিথিনীর আগমন ঘোষণা করে। রক্তাক্ত 'মড়ি'টার উপর শকুনের দল তাদের শেষ আহারের উল্লাসে কলরবমুখর হয়ে ওঠে। বীভৎস পরিস্থিতি কুৎসিত আকার ধারণ করে। শব নিয়ে প্রতি মুহূর্তে প্রতীক্ষা করি আমরা এক অশুভ শক্তিপরীক্ষার অনিশ্চিত পরিণতির।

"ও-য়া-ওঃ" একটানা ভারী আওয়াজের ঢেউ ছুটে গিয়ে যেন ধাক্কা মারে কঠিন পাথরের বুকে। কোটরা হরিণ জল খেতে নেমে সতর্ক প্রহরা জানায় হিংস্র জানোয়ার দেখে। উচ্চকিত শকুনের দল সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় মহাশূন্যের কোলে। সতর্ক অনুভূতি তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ম হয়ে সক্রিয় করে তোলে উত্তেজিত স্নায়ুমণ্ডলীকে। হৃদপিণ্ডের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাই। সহসা সহযোগীর ডানহস্ত আমার বামজানুর উপর গভীরভাবে চেপে বসে গোপন ইশারা জানায় ডানদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রচণ্ড উত্তেজনায়। সহযোগীর দৃষ্টি পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

গোধূলির ম্লান আলোতে ঝোপের অন্তরালে সোণালী জমির উপর কাল ডোরাকাটা বিশাল শরীরের এক অংশ চোখে পড়ে। মাত্র কয়েক গজের ব্যবধানে বিরাট এক জানোয়ার থাবা গেড়ে উবু হয়ে বসে আছে আমাদের দিকে অপলক দৃষ্টি মেলে দিয়ে। সর্বমুখে তার ফুটে উঠেছে হিংস্রতার কুটিল আবেদন। ঝোপের আচ্ছাদন নিয়ে মূর্তিটা ধূর্ত সর্পিল গতিতে এগিয়ে আসে আমাদের দিকে। সোনালী সূর্যের ম্লান আলোতে ঝলমল করে ওঠে তার বুক আর পেটের সাদা লোমগুলো। সবল মাংসপেশীর সঙ্গে রক্তের ছোপ লাগা থাবা দুটো তীক্ষ্ম নখরের সঙ্গে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়ে থাকে। সাংঘাতিক দাঁতগুলো আর ধারালো জিভটা রূপোর সুতোর মত সরু সরু গোঁফের ভিতর থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে হিংসার অশান্ত উন্মাদনায়।

হলুদ চোখের আকর্ষণে ধীরে ধীরে যেন সম্মোহিত হয়ে যেতে থাকি। অদ্ভুত শীতল এক অনুভূতি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে আমাদের প্রতিটি সতর্ক ইন্দ্রিয়। কঠোর মৃত্যুর সোনালী দূত ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসে কাছে — আরও কাছে...আত্মরক্ষার সবশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় যেন।

তার পরের ঘটনাগুলো আজও আমার কাছে প্রচণ্ড এক দুঃস্বপ্নের মত ভেসে ওঠে যেন। হেভী রাইফেলের উগ্র কর্ডাইটের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে তীক্ষ্ম পাশবিক কণ্ঠের চিৎকারে নিস্তব্ধ বনের পরিবেশ খান্ খান্ হয়ে গেল। কি তীব্র সেই চীৎকার! তার রেশ আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত করে, প্রবল যাতনার বিক্ষোভে আজও আমার দুর্বল স্মৃতির চারপাশে প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে মরে যেন। তারপর কতক্ষণ সেখানে বসেছিলাম মনে নাই। নিস্তব্ধ বনভূমি তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের উত্তেজিত কোলাহলে। রক্তাক্ত মৃতদেহটা ঘিরে উত্তেজিত গ্রাম্যজনতা সন্ধান করে ত[illegible] হত্যাকারীর। পাথরের চত্বর থেকে নেমে পড়ি দুজনে। এতদিন পর ম্যানইটারটা মারা পড়েছে।

নরখাদক কর্তৃক নিহত অপরাপর ব্যক্তিদের তালিকা

	স্থান	পাত্র	অবস্থা
১।	মুগীটাঁড়	মোহনা গোয়ালা	ভক্ষিত
২।	কুসুম্ভা বস্তী	গুরিখয়া গোয়ালা ও ভ্রাতা	ভক্ষিত
৩।	চলচলইয়া (সেরৌনির নিকট)	সাঁওতাল মাতা ও শিশু	মাতা ভক্ষিত ও শিশু নিহত
৪।	পাবুড়া (কাটুকমশাণ্ডির নিকট)	রসিদ (১১ বৎসরের বালক)	ভক্ষিত
৫।	বরকাগাঁও	জনৈক স্ত্রীলোক (জাতিতে ভূগী)	
৬।	মাহুদি-পাহাড় (বরকাগাঁও)	রামস্বরূপ সিং	ভক্ষিত নিহত
৭।	পারহেরিয়া	শুল্ক বিভাগের ইনস্পেক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের পুত্র	আহত

(গবাদি পশুর সংখ্যা ৭১টি)

বিহার ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত তথ্য হইতে সংগৃহীত।

সংকরী

রঞ্জন

খড়্গপুরে এসেই কার্ল কারখানার কাজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল যে, মিসেস লোপেজের কাছে সেই প্যাকেট আর পৌঁছে দেয়া হয়নি। আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু ভেবেছিল সময় করে নিজেই যাবে। পনের দিন এমনি কেটে গেল। বেশি ভদ্রতা করতে গিয়ে না জেনে দ্বিগুণ অভদ্রতা করল। পরে একদিন মিসেস লোপেজ নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। কার্ল তখন বাড়ি ছিল না। ফিরে এসে মিসেস লোপেজের চিঠি পেলঃ "বারবারার চিঠি অনুযায়ী আমার প্যাকেটটা নিতে এসেছিলুম। আপনার চাকরের কাছে ওটা রেখে দিলে আমি আগামী শনিবার আবার এসে নিয়ে যাব। ইতি। (মিসেস) সি লোপেজ। পুনশ্চঃ আপনি যেন দয়া করে আমার বাড়ি আসবার কষ্ট করবেন না। আমি নিজেই আসব।"

বাড়ি যেতে নিষেধের মধ্যে কার্ল একটু মৃদু তিরস্কার আবিষ্কার করল। অন্যায়ও নয়, সত্যি তো সে দেরি করেছে। তাই সে সেদিনই সন্ধ্যায় মিসেস লোপেজের বাড়ি গেল। বাইরের গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল—মিসেস্ লোপেজ নয়, মিস্ লোপেজ। স্বয়ং বারবারা।

"আরে, বারবারা যে!"

বারবারা সবিস্ময়ে এবং তার চেয়েও বেশি সভয়ে বলল, "কার্ল? মা তোমাকে আসতে বারণ করেন নি?"

"করেছিলেন, কিন্তু আমি তো জানতুম না যে, তুমি—"

কার্ল তার কথা শেষ করতে পারবার আগেই দূর বারান্দা থেকে মিসেস লোপেজের কর্কশ ডাক এলো, "বারবারা!"

আর দ্বিতীয় কথা না বলে বারবারা তৎক্ষণাৎ ছোটো বাগানের সরু পথ ধরে বাড়ির পিছনে পালিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে, যেন কেউ তাড়া করেছে। পলায়িতা মৃগহরিণী যখন বাড়ির একেবারে পিছনে রান্নাঘরের কাছাকাছি চলে এসেছিল, তখনো তার কান ছিল বাইরের দরজার দিকে। কার্লকে অপমানিত হতে হবে, বারবারা তাই ভয় করছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সমান ভয় ছিল যে, তার মা কার্লকে দেখে মুগ্ধ হবেন, (যেমন বারবারা নিজে হয়েছিল) এবং কার্লকে তিনি আবার আসতে বলবেন। তখন আবার শুরু হবে, কী শুরু হবে কে জানে!

কিন্তু বারবারা শুনেছিলঃ

"আমি তো লিখে এসেছিলুম যে, আপনাকে আসতে হবে না। আমি—"

"হাঁ, কিন্তু আমি—"

"কিন্তু আমি নয়। সবাইকে আমি জানি। টপ টু বটম, কাউকে আমার জানতে বাকি নেই। কোনো না কোনো সময় ওদের সবাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।"

"কিন্তু আমি—"

"কিন্তু আমি নয়। আমি জানি কেন আপনি বা আপনাদের মতো লোক এখানে আসেন। আসেন শুধু এইজন্যে যে—"

"কিন্তু আমি—"

"কিন্তু আমি নয়। সব আমার জানা আছে।"

এবারে কার্ল আর তার অসহায় 'কিন্তু আমি' পর্যন্ত বলতে পারল না। কার্ল এমন রূঢ়তার সঙ্গে অপরিচিত নয়, কিন্তু দুয়ে প্রভেদ আছে। আগে য়ুরোপে সে যখন তাড়া খেয়েছে, তখন সে অপমান এসেছে ক্ষমতামত্ত অপর পক্ষ থেকে। মিসেস লোপেজের অপমান আহতের ঔদ্ধত্য, দুর্বলের অভিমান, নিজে অপমানিত হবার ভয়ে আগে থেকে আগন্তুককে অপমান করে আত্মরক্ষা। কার্ল তাই মিসেস লোপেজের বর্বরতায় ক্রুদ্ধ হতে পারল না। বরং করুণা হোলো। শান্ত স্বরে বলল, "মিসেস

লোপেজ, কেন জানিনে, কিন্তু এখন আপনি বড়ো উত্তেজিত রয়েছেন। আমার উপর অন্যায় করেছেন। আমি বরং পরে একদিন আসব। সেদিন দেখবেন, আমি সত্যি অত খারাপ নই। অন্যান্য যেসব সাহেবদের দেখে আপনি গোটা শ্বেতকায় জাতির উপর বিরূপ হয়ে আছেন, তারা যে আমার উপরও সমান বিরূপ! ভালো মজা, ওরাও আমায় নেবে না, আপনিও আমায় তাড়িয়ে দেবেন। ভালো!"

কার্লের করুণ হাসি মিসেস লোপেজের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি বললেন, "আমার বেয়াদবি মাপ করবেন। ফিরিঙ্গী হয়ে আপনার সঙ্গে এমন রূঢ় ব্যবহার কী করে করতে পারলুম, নিজেই বুঝে উঠতে পারছিনে। আমি—আমি কয়েকদিন থেকে ভয়ানক ক্লান্ত। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ি। তাই, তাই আবার সেই পুরানো যন্ত্রণাটা যেন—।" মিসেস লোপেজ হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেখানেই বসে পড়লেন। একবার বোধ হয় বারবারাকেও ডাকলেন, কিন্তু সে এত ক্ষীণকণ্ঠে যে, সে ডাক বোধ হয় তাঁর কন্যার কানে পৌঁছোল না।

কার্ল যখন মিসেস লোপেজকে ধরে তুলতে এলো, তখন দেরি হয়ে গেছে। বারবারা এসে কার্লের দিকে এমন ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে তাকাল যে, কার্লের নিজেরও মনে হোলো সে অপরাধী। সে দৃষ্টি ভুলতে কার্লের অনেক দিন লাগবে। তার চেয়েও অবিস্মরণীয় ছিল মিসেস লোপেজের অন্তিম দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতেও ক্ষমা ছিল না। ঘৃণা ছিল। ভয় ছিল। আর ছিল তীব্র অভিযোগ।

*

কার্ল তার পরে চেষ্টা করেছে বারবারাকে তার আন্তরিক সমবেদনা জানাতে, তার কাছে ক্ষমা চাইতে অকৃত অপরাধের জন্যে। বারবারা কোনো চিঠির জবাব দেয়নি। একবারও দরজা খুলে দেখা করে নি। এমনি করে কেটে গেল প্রায় পনের দিন। বারবারার মনে সান্ত্বনাহীন, প্রতিকারহীন ব্যথার বোঝা। কার্লের মনে আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিষ্ক্রিয় নিমিত্ত হবার ব্যথা। দু'জনেরই, বেদনা হোলো দ্বিগুণ ভারী, কেননা যার যার বোঝা নিঃসঙ্গ একাকিত্বে বহন করতে হচ্ছিল।

কিন্তু মৃত্যু নিরুত্তর, তাই তার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক অসম্ভব। মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। যারা পিছনে পড়ে রইল, তাদের আবার জীবনের সূত্র তুলে নিতে হয়, আবার ঠিক আগেরই মতো বাঁচতে হয়, যেন কোথাও কিছু হয় নি। সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতিটি মুহূর্তে মৃতের প্রতি ঘোর অবমাননা বলে মনে হয়, কিন্তু উপায় কী তা ছাড়া? বারবারাকে আবার তাই বেরুতে হোলো। সে স্থির করেছে খড়্গপুরের বাড়িটা বিক্রী করে দিয়ে আবার সে কলকাতার হস্টেলে থেকে চাকরি করবে।

কার্ল এ ক'দিন বারবারার কাছে আসতে পায় নি, কিন্তু খবর নিয়েছে রোজ। প্রথম সুযোগেই সে তাই বারবারার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, "শাস্তি তো দিয়েছ। এবারে জানতে পাব কি অপরাধটা কী?"

বারবারা উত্তর এড়িয়ে বলল, "দোষ আমার ভাগ্যের। তোমার অপরাধ কী?"

"বিশ্বাস করো। সত্যি আমি সেদিন তোমার মাকে এমন কিছু বলি নি, যাতে তিনি উত্তেজিত হতে পারেন। বরং—"

"না কার্ল, মিথ্যে নিজেকে দোষী করছ। তোমার কিছু বলতে হবে কেন? তোমার আবির্ভাবই যথেষ্ট। কেট্ যা করে গেছে তারপর আমি প্রতি মুহূর্তেই ভয় করছিলুম যে, মা এটা সহ্য করতে পারবেন না।"

কার্ল জানতো ক্যাথলিনের কীর্তি। সে কিছুদিন আগে একটি ফিরিঙ্গী ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করছে চক্রধরপুরে।

বারবারা বলতে লাগল, "সেইদিনই মা আমায় টেলিগ্রাম করলেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে। এসে দেখি মা প্রায় উন্মাদিনী। কেট বিয়ে করেছে, তাই থেকে জন্ম হবে আবার কতগুলি অবাঞ্ছিত ফিরিঙ্গী সন্তানের, তাদের আবার সারাজীবন সহ্য করতে হবে সব জাতির অবজ্ঞা, আবার তারা বড়ো হয়ে নিমেষে নিমেষে অভিশাপ দেবে মাকে—সারাদিন কেবল এই কথা!"

কার্ল শুনছিল। বারবারা ম্লান হাসির সঙ্গে শেষ করল, "তারপর মা'র ভয় হোলো যে, আমিও কবে এমনি কিছু করে বসব, আগাছার বীজ ছড়াব!"

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। কার্ল বিদায় নিল।

কারখানার পরে আবার পরদিন সন্ধ্যায় কার্ল এলো বারবারার বাড়ি। এমনি করে রোজ প্রায় দশ দিন। ধীরে ধীরে বন্যার জল সরে গিয়ে ডাঙার আভাস দেখা দিচ্ছিল, মৃত্যুর ছায়া সরিয়ে দিয়ে জীবনের আলো আবার হাসছিল। কার্ল একদিন স্বত্বাধিকারীর সুরে বলল, "তোমার কলকাতা যাওয়া হবে না।"

সুরটা বারবারার ভালো লাগল। মনে হোলো, সত্যি সে পুরোপুরি অসহায় নয়। তবু প্রশ্ন করল, "মানে?"

"মানে আমি এখানে একা এবং কোথাও আমার কেউ নেই। তুমিও একা এবং তোমারও কোথাও কেউ নেই। অতএব,—"

অতএবটা আর বিশদভাবে বলতে হয়নি। বারবারা সেদিন হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি, অন্তত প্রকাশ্যে। অন্তরে যদিও মুখর সম্মতি চীৎকার করে উঠেছিল।

তার পরের ভুলে-থাকা দিন ক'টির কথা ভুলবার নয়। কার্ল তার বড়ো সাহেবের উপদেশামৃত একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিল। বারবারাও মনে আনে নি, তার মা'র সহস্র নিষেধাজ্ঞা। ওরা দু'জন সেই ক'দিন একসঙ্গে বেড়িয়েছে যেখানে খুশি, যতক্ষণ খুশি। আড়ালে কেউ যদি হেসে থাকে, তা ওরা লক্ষ্যই করেনি। ওরা দু'জনে মিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জগৎ সৃষ্টি করেছিল, যেখানে বর্ণবৈষম্য ছিল না, জাতিভেদ ছিল না। বস্তুত কোনো সমস্যাই ছিল না। অ-বিবাহের অদৃশ্য বন্ধনে ওরা ছিল মুক্ত।

প্রথম বেসুরো ঘটনা ঘটল বিয়ের তিন দিন আগে। কার্ল তার কারখানার জন্যে কর্মী নিয়োগ করছিল। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে একদল ফিরিঙ্গী ছিল। সবাই তরুণ, বয়স ষোলো থেকে তিরিশের মধ্যে। কেউ বা কালো, কেউ ফর্সা;

কিন্তু সব কিছু মিলে ওই দলটার মধ্যে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য কার্ল লক্ষ্য করল, যা কারো ভালো লাগতে পারে না। অনেকদিন পরে আবার তার বড়ো সাহেবের কথা মনে হোলো; এরা সত্যি বোধ হয় কামনার অপসৃষ্টি, প্রকৃতির অপচয়। এরা কোনো জাতিরই গুণগুলি পায়নি, দু'জাতিরই দোষগুলি পেয়েছে। এরা না জানে ইংরেজি, না বাঙলা। এদের না আছে কর্মক্ষমতা, না চিন্তা-মগ্নতা। এইসব হতভাগ্য ছেলেগুলিকে দেখে কার্ল তার নিজের বিবাহের সম্ভাব্য সন্তানদের কথা ভেবে শঙ্কিত হোলো। বিয়ের আগে এদের দেখা যেন, কার্লের মনে হোলো, মারতে যাবার পথে মড়া দেখা।

কাজের শেষে বাড়ি ফিরেও কার্লের মনে দুর্ভাবনা রয়ে গেল। কার্লের বয়স অল্প, তার অভিজ্ঞতা বিস্তর। একটা মহাযুদ্ধ বয়ে গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে, নুইয়ে দিয়ে গেছে উদ্ধত একটা মহাদেশকে; সেই সঙ্গে কার্লের সমবয়সী সবাইকে। জীবনের উপর ওদের মোহ তাই নিতান্ত পরিমিত। ওরা যে বেঁচে আছে, তার একমাত্র কারণ ওরা যুদ্ধে মরে যায় নি। জীবন তাই ওদের কাছে মৃত্যুর ঋণশোধের বর্ধিত মেয়াদ মাত্র। মরে গেলে দেনা একসঙ্গে শোধ হয়ে যেতো, এখন তা কিস্তিতে কিস্তিতে শুধতে হবে—জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে এইটুকু শুধু ব্যবধান, এইটুকু মাত্র প্রভেদ। এটা এমন কী একটা মহামূল্য সম্পদ, যার জন্যে আরেকজনকে—বা তার চেয়েও বেশিজনকে—এই পৃথিবীতে ডেকে আনতে হবে? সম্মতি দূরে থাক, বিনা জিজ্ঞাসায় যাকে বা যাদের আনা হবে, তারা জীবন থেকে যে এক কণা আনন্দ পাবে, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি দুঃখ পেয়ে কি কার্লকে সারাক্ষণ অভিশাপ দেবে না? কার্লের সমস্যা আরো গুরুতর। সে নিজে এক অনিকেতনিক অভাগা। বারবারার অবস্থা তার চেয়েও শোচনীয়। বিবাহের দায়িত্ব নেবার সামর্থ্য ওদের কোথায়?

কার্লের ভালো লাগছিল না এই ভাবনাগুলি। কিন্তু না ভেবেই বা করে কী? সে বেরিয়ে পড়ল। বারবারার সঙ্গে সে সমস্যাগুলি স্থির মস্তিষ্কে আলোচনা করবে। আর সত্যি, সমস্যা তো তার একার নয়। বারবারারও। সমাধানের সন্ধান তাই দুজনের মিলিত প্রচেষ্টায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বারবারার বাড়িতে পৌঁছে কার্ল তার বিষণ্ণতা পরিহার করে হাসতে চেষ্টা করল ঠিক ঘরে প্রবেশ করবার পূর্ব মুহূর্তে। কিন্তু ঘরে এসে দেখল, বারবারা আরো বেশি বিরস বদনে বসে আছে। সে কার্লের চেয়েও বেশি চিন্তিত। কী তার দুশ্চিন্তা? কার্ল কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "ওই ছোট্টো মাথাটায় কী এমন বিরাট ভাবনা যে লম্বা মুখ করে বসে আছো?

বারবারা কার্লের হাত ধরে বলল, "সত্যি মনটা মোটেই ভালো নেই। জানো কার্ল, কাল রাত্রে মাকে স্বপ্নে দেখেছি।" বারবারা থামল। তার চোখে জল।

কার্ল কী বলবে ভেবে পেল না। বারবারার মাকে সে বেশি দেখেনি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সময় সে উপস্থিত ছিল, এক সময় তার মনে হয়েছিল যেন সে সেই মৃত্যুর আংশিক কারণ; কিন্তু তার বেশি জানতো না। বারবারার শোকে তাই সে বারবারার মতো কাঁদতে পারল না, যদিও কাঁদলে সে নিজেও শান্তি পেতো। প্রিয়ের দুঃখে ভাগ নিতে না পারাও দুঃখ। কার্ল চুপ করে রইল। তার সমস্যার কথা তুলতে দেরি হয়ে গেল।

বারবারা বলল, "স্বপ্নের সব কিছু মনে নেই। যা মনে আছে, তাও সব তোমায় বলতে পারব না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব, কার্ল? মাকে দেখে মনে হোলো এ বিয়েতে তাঁর মত নেই।" বারবারা আবার কাঁদল।

কার্লের মনে পড়ল তার সাম্প্রতিক দ্বিধা। বলল, "বারবারা, তুমি আমায় বলেছ তোমার মার মতামত। আমি নিজেও ভেবে দেখেছি।" কার্লের আর বলতে বাধছিল, তবু ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভুলের আশঙ্কা তার কণ্ঠে বল দিল। বলল, "আজো ভাবছিলুম সেই কথাই। তুমি কিছু মনে করো না, বারবারা, কিন্তু আমাদের বিয়ে সম্বন্ধে একটা কথা আজ তোমার সঙ্গে আলোচনা করব খোলা-খুলিভাবে। বলো কিছু মনে করবে না।"

"একটুও না।" বারবারা অভয় দিল, যদিও তার নিজের মনে ভয় ছিল, কে জানে কার্ল কী বলবে।

কার্ল বলল, "দেখো বারবারা, আমার কোথাও কেউ নেই। তোমারও সেই দশা। আমাদের জীবন আমরা একসঙ্গে কাটাব। আমরা বড়ো হয়েছি। বাইরের কে কী বলল, কোন ক্লাবে আমাদের জায়গা হোলো কি হোলো না, আমার কোন স্বজাতি আমায় জাতিচ্যুত মনে করল আর তোমার কোন স্বজাতি তোমায় জাতিত্যাগী মনে করল, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু খড়্গপুরে এই ক'দিন থেকেই দেখেছি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কী অবস্থা। দু'-পক্ষের অবজ্ঞায় বেচারীরা বাড়তে পর্যন্ত পারে না। এদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমার—"

কার্লের কথা শেষ হবার আগেই বারবারা বলল, "কী অদ্ভুত কোইন-সিডেন্স! আমিও তো সেই কথাই বলতে চাইছিলুম, বলতে পারছিলুম না। কাল স্বপ্নে মা আমায় যেন ভয়ানক বকছিলেন। আর কিছু মনে নেই। কিন্তু মার প্রধান ভয় যেন এই ছিল যে, তাঁর ও আমাদের যেসব অসুবিধার মধ্য দিয়ে বাঁচতে হয়েছে, আবার অন্যান্য কয়েকজনের জন্য সেই অসহ্য শাস্তির আয়োজন করা হচ্ছে।"

এত সহজে সম্মতি পেয়ে কার্ল উচ্ছ্বসিত হোলো। বলল, "তাহলে এই কথা রইল, বারবারা। তুমি আর আমি দুজনে মিলে মনে বংশের সুখের বরাদ্দের সবটুকু শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করব, অজাত মানুদের অংশ-টুকুও, তাই এর পরের মানুরা অজাতই থাকবে। ঠিক? রাজী?"

"রাজী"। চুম্বনের শীলমোহর পড়ল সেই শপথের উপর।

*

তার তিন দিন পরে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। গ্রিফিথস বেস্টম্যান হোলো। তাছাড়া আর কোনো ইংরেজ ও বিয়েতে যায়নি। ফিরিঙ্গিদের কাউকে ডাকা হয়নি। বারবারা প্রথম ক্রয়েচ্ছুর কাছে তার

বাড়ি বিক্রি করে কার্লের বাংলোয় উঠে এলো।

শুধু স্থানান্তর নয়। বারবারার মনে হোলো তার জন্মান্তর হয়েছে। কার্লেরও। কার্ল বলল, "সত্যি, ভাবতেই পারিনে আমার জীবনের এত দিন তোমাকে ছাড়া কি করে কাটিয়েছি। চলো, এই শনিবার দীঘায় বেড়াতে যাব।"

"চলো কার্ল। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে। কিন্তু কলকাতা অফিসের ম্যাগ্রেগর সাহেব এখনো কিছু লেখেননি?"

কার্লের কলকাতার কথা মনে ছিল না, ম্যাগ্রেগরের কথা তো নয়ই। বারবারা কথাটা মনে না করিয়ে দিলেই ভালো হোতো। তবু দুশ্চিন্তা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে কার্ল বলল, "ম্যাগ্রেগর যদি বাজে কিছু লেখে তো তুমিই আমার পদত্যাগ-পত্র টাইপ করে দেবে। আমি এঞ্জিনীয়র, আমাকে ওদের দরকার আছে।" স্বাধীন, দায়িত্বহীন কার্লের যে সাহস ও ভরসা ছিল না, এখন বারবারাকে পাশে পেয়ে সে যেন কাউকেই পরোয়া করে না। বলল, "তাছাড়া, গ্রিফিথস আমার বন্ধু, ও সব ঠিক করে দেবে।"

বারবারার সঙ্গে গ্রিফিথসের দেখা হয়েছিল। লোকটিকে বড়ো ভালো লেগে-ছিল তার। জাত্যভিমান নেই, কিন্তু তাই বলে অন্তরঙ্গতার আতিশয্যও নেই। নিয়ম মেনে চলে, কিন্তু সে শুধু অনিয়মের ঝামেলা এড়াতে। ফিরিঙ্গী-দের সম্বন্ধে তার লোক-দেখানো ভালো-বাসা নেই, আবার অবজ্ঞাও নেই। বিয়ে করেনি, কেননা না করেও দিব্য চলে যাচ্ছিল। আবার, ওই ঝামেলা এড়াতে। কার্ল যখন তাকে নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, তখন সে আপত্তি করেনি (কেননা আপত্তি বৃথা হোতো); উৎসাহও দেখায়নি, কেননা উৎসাহবোধ করেনি; মনে মনে ভয় ছিল যে, তার স্নেহাস্পদ কার্ল হয়তো মোহমুক্ত হলে এজন্যে অনুতাপ করবে, দুঃখ পাবে। বিবাহ যদি সমস্ত পারিপার্শ্বিকের ঊর্ধ্বে স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটা অস্তিত্ব হোতো, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু দু'দিন পরে—অকৃতদার গ্রিফিথস ভয় করছিল—নির্বান্ধব জীবনে ওরা হাঁপিয়ে উঠবে, যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে দরজা-জানালাহীন কক্ষে। তখন বারবারার মনে হবে, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্মো ভয়াবহ। জাতে উঠতে গিয়ে তার একূলও গেছে ওকূলও গেছে। কার্লের মনে হবে সামান্য একটা মুলোটো মেয়ের জন্যে সে তার সারা জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে। তখন কী হবে?

গ্রিফিথস এসব সন্দেহ কারো কাছেই কখনো প্রকাশ করেনি। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানে তার অনুৎসাহ গোপন থাকেনি। কার্ল অনেকবার চেষ্টা করেছে তাকে খুশি করতে, হাসাতে। কোনো না কোনো অজুহাতে গ্রিফিথস উল্লাস এড়িয়েছে। বারবারা তাই একদিন কার্লকে না জানিয়ে গ্রিফিথসের বাড়ি গিয়েছিল। অতিথি অপমানিত হয়নি, কিন্তু গৃহ-কর্তার অননুমোদনও গোপন রয়নি। বারবারা অস্বস্তি বোধ করছিল, কিন্তু মুশকিল এই যে, গ্রিফিথসের মতো লোকের উপর রাগ করা অসম্ভব। এমন লোকের নীরন্ধ্র ভদ্রতার উপর বিরক্ত হওয়া যায়, কিন্তু নির্ভর না করে উপায় থাকে না। নিরুপায় হয়ে বারবারা দু-চারটে বাজে কথার পরে অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আমাদের বিয়েতে আপনার সম্মতি ছিল না, তাই নয়?"

"আমার সম্মতি বা অসম্মতি অবান্তর।"

"তবু জানতে চাইছি।"

"আমি জানাতে চাইনে।"

"আচ্ছা, যা হবার তো হয়ে গেছে। এখন কী করতে বলেন?"

"আমার কাছে উপদেশ পাবেন না। কার্লের পত্নী হিসাবে কখনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে জানাবেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব। ক্ষমা করবেন, আমাকে কিন্তু একটু পরেই বেরুতে হবে।"

বারবারা আর কিছু না বলে বিদায় নিয়েছিল। আজ কার্ল যখন বলল, গ্রিফিথস তার বন্ধু, সে সব ঠিক করে দেবে, বারবারা আপত্তি করল না। কিন্তু কথাটা শুনতে ভালোও লাগল না। তা-ছাড়া বারবারা জানতো যে, গ্রিফিথস সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য কার্লকে আঘাত করবে।

কার্ল হঠাৎ বলল, "চলো আজ গাড়ি করে অনেক দূরে বেড়াতে যাই। ঘরে আর ভালো লাগছে না।"

কথাটা বারবারার ভালো লাগল না। আজ ঘরে ভালো লাগছে না। কাল ঘরই ভালো লাগবে না হয়তো। তখন বারবারা কী করবে? কী দিয়ে কার্লকে বাঁধবে? গত কয়েক দিন তার সেই শপথের কথা মনেই হয়নি; আজ মনে হোলো; মনে হোলো, আমার জীবনের চেয়ে আমার শপথ বড়ো নয়। আমার মা'র মৃত্যুও আমার জীবনের চেয়ে বড়ো নয়। আমি ঘর বেঁধেছি, আমার মায়ের প্রেতাত্মা এসে সে ঘর ভেঙে দেবে আর আমি কিছু করব না?

কার্ল এতক্ষণ বারবারার কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে বলল, "কী ভাবছ চুপ করে? যাবে না বেড়াতে?"

বারবারা ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছে। শিশুর মতো হেসে উঠে কার্লের গলা জড়িয়ে সে বলল, "চলো, অনেক অনেক দূরে বেড়াতে যাব আজ। সেই পানাগড় এরোড্রোমের কাছে আমেরিকানরা সুন্দর রাস্তা করে রেখে গেছে। সেখানে গিয়ে বসব অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক দিন ভালো ছেলে হয়ে থেকেছ, আজ পুরস্কার পাবে। যাবার সময় বিলিমোরিয়ার দোকান থেকে একটা হুইস্কি নিয়ে নেব। কেমন? আমিও একটু খাবো।"

কার্ল তৎক্ষণাৎ উঠে বিলিমোরিয়ার দোকানে টেলিফোন করল। ("না, না, পাইন্ট নয়, কোয়ার্ট")। সেই সঙ্গেই তার মনে পড়ল গ্রিফিথসের কথা। বারবারাকে জিজ্ঞাসা করল, "গ্রিফিথসকে সঙ্গে নেয়া যাক, কী বলো?"

"প্লীজ, আজ নয়। আরেক দিন। আজ শুধু তুমি আর আমি"। বারবারা উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করল না। সোজা, চলে গেল তৈরি হয়ে নিতে। তার আধ ঘণ্টা পরে তারা পানাগড়ের পথে। রাত তখন আটটা।

পানাগড় থেকে তারা যখন ফিরে-ছিল, তখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে।

*

ভোরে প্রথম চোখ খুললে কার্ল বলল, "উঃ, কাল কী করে গাড়ি চালিয়ে ফিরেছি তা ভগবানই জানেন।"

বারবারা পরম পরিতৃপ্ত হাসির সঙ্গে বলল, "আমিও জানি; কেননা আমিই গাড়ি চালিয়ে এনেছি, এবং নিরাপদে।"

"সত্যি? আমার কিছু মনে নেই। কমপ্লিট ব্ল্যাক-আউট!"

বারবারা আরো কাছে সরে এসে বলল, "তা কী হয়েছে? সঙ্গে তো আর কেউ ছিল না। আমি ছিলুম।"

"কিন্তু—"

"নাঃ, আমায় এবার উঠতেই হবে," বলে বারবারা তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করে স্নানের ঘরে চলে গেল। কার্ল একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল।

বৃথা চেষ্টা। পূর্বাপরসম্বন্ধযুক্ত ওই ক'টা ঘণ্টা কার্লের স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছে। জাল ফেলে তাদের ধরবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। মনে আছে, কার্ল আর বারবারা পানাগড় বিমান-অবতরণীর দক্ষিণে বাঁধানো একটা রাস্তার ধারে বসেছিল। ঘাসের উপর, কোনো কিছু বিছিয়ে নয়। মনে আছে, বারবারা তাকে একটা স্যানড্‌উইচ খেতে বলেছিল। কার্ল শুধু বলেছিল, 'ওয়ান থিং অ্যাট এ টাইম।' আর মনে আছে দু একটা টুকরো কথা। তারপর? তারপর আজ এই সকালে ঘুম থেকে ওঠা। মাঝখানে বিরাট শূন্য। কার্লের মনে হোলো ওর জীবন যেন এমন একটা বই যার শুরুটা আছে, শেষটা আছে—হারিয়ে গেছে মাঝের কয়েকটা পাতা। মনে পড়ল যে, এই অবস্থাটা আসলে ব্রহ্মাণ্ডের পারসীক বর্ণনার ঠিক বিপরীত, সেই মতে পৃথিবীর উপমা এমন বই যার গোড়ার পাতাগুলি ছিঁড়ে কোথায় উড়ে গেছে, আর শেষের পাতাগুলি নিরুদ্দেশ। তাইতো এই পোড়া পৃথিবীটাকে এমন দুর্বোধ রহস্য বলে মনে হয়! নিজের চিন্তায় ফিরে এসে কার্লের মনে হোলো ওর জীবনের খাতায় দু'বার যেন দুটো দুর্ঘটনা ঘটল। একবার যুদ্ধ এসে অনেকগুলি পাতায় এক রাশ রক্ত ছড়িয়ে গেল, সেই দাগ সত্ত্বেও কষ্টের সঙ্গে লেখাগুলি পড়া যায়, যদিও তা পড়তে আর রুচি নেই। আরেকবার সে নিজের নির্বুদ্ধিতায় তার জীবনের খাতার অনেকগুলি পাতায় কালো কালির দোয়াত উল্টে দিয়েছে যেন। এবারে কিছুই পড়বার উপায় নেই। কী হয়েছিল কাল রাত্রে?

বারবারা যখন স্নানের ঘর থেকে 'অ্যানি গেট য়োর গান' ছবির একটা গানের সুর গুনগুন করতে করতে বেরুল, তখন কার্লের নিজের বিষণ্ণতা আরো বেশি বিসদৃশ মনে হোলো। বারবারার আনন্দের অন্ত ছিল না। এত খুশী তাকে অনেক দিন দেখা যায়নি। সে আবার এসে কার্লের পাশে বসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, "কী, আজ কাজে যেতে হবে না? বেশ, উঠো না এখন। আমি বিছানায় তোমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি।" আবার বারবারা নাচতে নাচতে চলে গেল। কার্ল তার বিস্মরণের তলায় সমাধিস্থ হয়ে রইল। কী হয়েছিল কাল রাত্রে?

খাবার খেয়ে কার্ল শয্যা ছাড়ল। কাজে গেল, না গিয়ে উপায় ছিল না বলে। কী একটা অসহ্য অস্বস্তির বোঝা মনের উপর বহাল রইল সারা দিন। দুপুরে বাড়িতে খেতে এলো না। গ্রিফিথসের কাছে নিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে তারই বাড়িতে খেতে বসল। আশা, গ্রিফিথসের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

একথা সেকথার পরে কার্ল বলল, "কাল পানাগড় বেড়াতে গিয়েছিলুম বারবারাকে নিয়ে। ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।"

কৌতূহলশূন্য কণ্ঠে গ্রিফিথস বলল, "তাই বুঝি?"

"হ্যাঁ, ভারি নির্জন ও সুন্দর জায়গাটা।"

"হ্যাঁ, আমিও গিয়েছি দুয়েক বার।"

"কিন্তু জানো টোনি, আমার কিছু মনে নেই। বড্ডো বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।"

টোনি গ্রিফিথস হাসল। ভাবল, তবে কি এত শীঘ্রই বিবাহ থেকে পলায়নের প্রয়োজন হয়েছে? বলল, "ভালো, মাঝে মাঝে অধিকন্তু ন দোষায়।"

"না, আমি আতিশয্যের জন্যে অনুতাপ করছিনে। অদ্ভুত লাগছে এই জন্যে যে, একটা কিছু মনে করতে পারছিনে। কী করেছি, কী বলেছি, এক বর্ণও মনে নেই। নিজেকে বোকা মনে হচ্ছে। যেমন মনে হয় হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে পকেট থেকে কে কখন পার্সটা তুলে নিয়েছে। যদিও হয়তো, পার্সটায় বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার পকেটমার আমার কয়েকটা ঘণ্টা চুরি করে নিয়ে গেছে, জানিনে কী ছিল সেই ঘণ্টাগুলিতে!"

"সত্যি? কিন্তু বারবারাকে জিগ্যেস করো না। তার নিশ্চয়ই মনে আছে। না কি সেও—?"

"না, না, ও বিশেষ খায়নি। ও-ই গাড়ি চালিয়ে এনেছে। কিন্তু ওকে জিগ্যেস করলে ও যে শুধু হাসে, গুনগুন করে গান গায়। আর কিছু বলে না।"

"কী গান?"

"কে জানে, ওই আনি গেট য়োর গান না কী যেন! প্রশ্ন করলে উত্তরই দেয় না। হাসে।"

গ্রিফিথস মাংসের টুকরোটা মুখে দেবার আগে বলল, "আমি ব্যাচিলর। ওদের ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।"

কার্ল হতাশার সঙ্গে বলল, "সত্যি, এদের বোঝা পুরুষের অসাধ্য।" তারপর কার্ল কর্কশ জর্মানে কী কতগুলি প্রবাদ আওড়াল, তা টোনির কানে মেয়েদের কথার মতোই দুর্বোধ শোনাল।

বাড়ি ফিরে কার্ল দেখল বারবারা সেজেগুজে তৈরি। আবার বেড়াতে যাবে। এত সাজবার ও বেড়াবার উৎসাহ হঠাৎ এলো কোথা থেকে? যে বারবারার উপর মৃতা মিসেস লেপেজের কালো ছায়া সব সময় ব্যেপে থাকতো, আজ সেখানে এত আলো কে এনে দিলে? সেই ছায়াই বা কার্লের উপর স্থানান্তরিত হোলো কার নির্দেশে?

এমনি করে আরো দেড় মাস কেটে গেল। বারবারা কোন এক আপাতঅকারণ পুলকে উড়তে লাগল। কার্ল কী এক অজানা আশংকায় উত্তরোত্তর বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হতে থাকল। পরে একদিন গ্রিফিথসেরই পরামর্শে ওরা দীঘার সমুদ্রতীরে গেল দশ দিনের ছুটিতে।

*

ক্রমে সন্দেহের নিরসন হোলো।

বেচারী কার্ল! ঠিক যা ভয় করেছিল, ঠিক যা এড়াবার জন্যে পণ করেছিল, শপথ করিয়েছিল—ঠিক তাই ঘটল একটা মত্ত সন্ধ্যার মূঢ় অসতর্কতার জন্যে। কার্ল আরো বেশি বিমূঢ় হোলো এই জন্যে যে, তার কাছে যা অবিমিশ্র বিপর্যয় বলে মনে হচ্ছিল, অপর পক্ষের কাছে সেই একই দুর্ঘটনা অনাবিল আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছিল। এখন কী করবে কার্ল? তার নিজের ভুলের বোঝা যদি শুধু তার নিজেকে বইতে হোতো তাহলেও বোঝা যেতো। কিন্তু এ যে অন্যকে বহন করতে হবে! সারা রাত বারবারার পাশে শুয়ে কার্ল শুধু এই কথাই ভাবছিল, কিন্তু কূলকিনারা করতে পারছিল না। বাইরে সমুদ্র আপন মহাসঙ্গীতে মগ্ন ছিল।

বিনিদ্র রজনীর শেষে, ভোরে, কার্ল বারবারাকে বলল, সমুদ্র স্নানের জন্য তৈরি হতে। তৃপ্ত, শান্ত, পাণ্ডুর হাসির সঙ্গে বারবারা বলল, "কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি। আমি আজ স্নান করব না, আমার শরীরটা ঠিক ভালো নেই। তুমি স্নান করতে যাও, আমি বাইরে বারান্দায় বসে তোমার স্নান করা দেখব।"

কার্লের অস্বস্তি লাগছিল। বারবারার দৃষ্টি থেকে দূরে যেতে পেরে তাই সে নিষ্কৃতি পেল। সমুদ্রের ধারে, একেবারে জল ঘেঁষে বসল। অদূরে তরঙ্গরাশির সফেন উত্থান-পতন একবার মনে হচ্ছিল তিরস্কারের গর্জন বলে, পরক্ষণে তাকেই মনে হচ্ছিল অভিনন্দনের উল্লাস। দূর থেকে কার্ল পিছনে তাকাল বারবারার দিকে। একবার মনে মনে জিজ্ঞাসা করল, শপথে সে-ও তো স্বাক্ষর করেছিল! পরেই মনে হোলো—শর্ত মেনে ব্যবসা চলে, বাঁচা চলে কি? কার্ল আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। তাহলে বাঁচা মানে কি শুধু অযুক্তির পায়ে আত্মসমর্পণ? সে বাঁচা তো পশুর বাঁচা। কার্ল কি পশু?

কিন্তু তার আসল সমস্যা অন্য। বারবারাকে সত্যি কার্ল ভালোবাসে। সেজন্যে সে বহু বাধা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করেছে। প্রেমের মূল্য সে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অপরকে—। কার্ল এবার ভাবল, দেখা যাক না বারবারাকে তার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। কিন্তু কার্লের মুশকিল এই যে, সে নিষ্ঠুর হতে পারে না কারো প্রতি, এক নিজের প্রতি ছাড়া। সম্প্রতি সে বারবারাকে এমন খুশিতে উচ্ছল হতে দেখেছে যে, সেখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দুঃখ ডেকে আনতে কার্লের প্রাণ কাঁদছিল। শুধু উচ্ছল নয়, ঝর্ণা ইতিমধ্যেই সরোবরে রূপান্তরিত হয়েছিল। সহসা বারবারা তার বয়সোচিত চপলতা পরিহার করে কী এক অপরূপ পরিতৃপ্তিতে সমাহিত হয়েছিল। সে যেন আর মুখরা প্রবাহিনী ছিল না; সে এখন শান্ত সরোবর। অস্থির সন্ধান সমাপ্ত হয়েছে, এখন তার ধ্যান প্রতীক্ষা। ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামি শেষ হয়েছে, এখন অপেক্ষা ফলের।

কার্লের বিপদ এই যে, তার মধ্যে সমান্তরাল বিবর্তন ঘটেনি। না দৈহিক, না মানসিক। সমস্ত ঘটনাটার সে বাইরের দর্শক, সক্রিয় অংশীদার নয় যেন। বারবারার মতো সে সর্বকিছু সমগ্র সত্তা দিয়ে অনুভব করেনি। তাই বারবারার কাছে যা প্রত্যক্ষতই আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল, কার্লের কাছে তা দুরূহ সমস্যা। সমাধান কী? কার্ল আবার ভাবল, সে বারবারাকে তার শপথের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোলো, যদি বারবারা সহজেই রাজী হয়ে যায়? তখন বারবারা সম্বন্ধে তার কী ধারণা হবে? সেই ধারণা নিয়ে বাকি জীবন বারবারার সঙ্গে বাস করা যে আরো দুঃসহ হবে! কার্লের নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হোলো।

হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ এসে অসতর্ক কার্লকে ধরাশায়ী করে দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে সেই তরঙ্গ যেন কার্লের অনিশ্চয়তা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পর মুহূর্তে সে উঠে দাঁড়িয়ে দূর থেকে আরেকবার বারবারাকে দেখে নিল। মনে মনে বলল, নির্বোধ অনুকম্পায় আমার প্রয়োজন নেই। বর্তমানের সামান্য নির্দয়তা এড়াতে গিয়ে আমি ভবিষ্যতের জন্য বিরাট নিষ্ঠুরতা স্তূপীকৃত করব না। আমি দুর্বলচিত্ত ফিরিঙ্গি নই, আমি দৃঢ়মনা য়ুরোপীয়ান। কৌতূহলপ্ররোচিত কামোন্মত্ত মুহূর্তে বুদ্ধিবিচ্ছিন্ন, অপরিকল্পিত আকস্মিকতার মধ্যে হবে মনুষ্যজীবনের সৃষ্টি? সে সাধনার ধন নয়? সে প্রার্থনার উত্তর নয়? তবে সে কার্ল মুলের সন্তান নয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শুক্লা চতুর্দশী

সরিৎশেখর মজুমদার

দেওয়াল-পঞ্জী!
আজকে কি যেন তিথি?
তুমি না লিখেছো শুক্লা-চতুর্দশী?
মেঘবিষণ্ণ আকাশে কিন্তু, একি?
থমথমে গাঢ় কৃষ্ণপক্ষ লেখা!

কোন্‌টা সত্যি?

দীপ জ্বালাতেই দেখি,
স্বপ্নশিথিল আমার প্রিয়ার সহাশান্ত মুখে,
আহা! কতো চাপা বেদনাকরুণ রেখা!

অনুতাপে তার তপ্ত ললাটে ধীরে,
সেই দিয়েছি অধর-ছোঁয়া......
দেখি, মেঘকজ্জল নয়ন পেরিয়ে নামলো আচম্বিতে,
জল-চিক্‌চিক্‌ জোছনার মতো
একমুঠো মিঠে হাসি
তৃপ্তিস্মিত; প্রিয়ার অধর-তীরে!

মেঘের আড়ালে মিথ্যে হয় না শশী।
দেওয়াল-পঞ্জী! তোমার কথাই ঠিক,
আজ্‌কের তিথি,—শুক্লা-চতুর্দশী।

নোংরা হাত

জঁ-পল সার্ত্র্

অনুবাদঃ শিবনারায়ণ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

হোয়েডেরারের অফিস। দশদিন পরের কথা। অপরাহ্ন।

ঘরটি আনন্দপ্রদ, কিন্তু বাহুল্য-বর্জিত। ডানধারে একটা ডেস্ক। মাঝখানে বই কাগজপত্রে ভর্তি কার্পেটে-মোড়া টেবিল, কার্পেটটা মাটি পর্যন্ত এসে পড়েছে। পাশে বাঁ ধারে কোণাকুণিভাবে একটা জানলা, তা দিয়ে বাগানের গাছপালা দেখা যায়। পেছনে ডানধারে একটা দরজা। দরজার বাঁদিকে গ্যাসচুল্লীওয়ালা একটা রান্নার টেবিল। তার ওপরে একটা কফির পাত্র চাপানো।

ঘরে একা হুগো। ডেস্কের কাছে গিয়ে হোয়েডেরারের কলমটা তুলে নিয়ে দেখে। তারপর গ্যাসচুল্লীর কাছে গিয়ে শিস্ দিতে দিতে কফির পাত্রটা তুলে দেখে। নিঃসাড়ে ঘরে ঢোকে যেসিকা।

যেসিকা। করছ কি?

হুগো। [চট করে কফির পাত্রটা নামিয়ে রেখে] যেসিকা, তোমাকে না অফিসে আসতে মানা করা হয়েছে।

যেসিকা। কফির পাত্রটা নিয়ে কি করছিলে?

হুগো। তুমি এখানে কেন এসেছ?

যেসিকা। মেরী জান, তোমাকে দেখতে এলাম।

হুগো। বেশ, দেখা তো হয়েছে। এখন জলদি ভাগো। হোয়েডেরার এক্ষুণি এসে পড়বে।

যেসিকা। তোমায় না দেখে বড্ড একঘেয়ে লাগছিল মৌমাছি।

হুগো। এখন আমার খেলার সময় নেই যেসিকা।

যেসিকা। [চারিদিকে তাকিয়ে] ঠিক। তুমি এর কিছুই ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারনি। ছেলেবেলায় বাবার পড়ার ঘরে যেমন তামাকের বাসি-গন্ধ নাকে লাগত, ঠিক তেমনি এখানে। কোনো ঘরের গন্ধ কিরকম তা গুছিয়ে বলা এমন কিছু কঠিন নয়।

হুগো। কথা শোন......

যেসিকা। দাঁড়াও। [নিজের জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে কিছু একটা বার করতে করতে] এটা তোমাকে দেবার জন্যে এলাম।

হুগো। কিটা?

যেসিকা। এই যে! তুমি ভুলে গেছলে?

হুগো। আমি মোটেই ভুলিনি। আমি কখনো ওটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি না।

যেসিকা। ঠিক তাই। তোমার কখনো ওটা সঙ্গে না নিয়ে থাকা ঠিক নয়।

হুগো। যেসিকা তুমি বুঝছ না। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, তুমি এখানে আসবে না। যদি খেলতে চাও, স্টুডিও রয়েছে, বাগান রয়েছে।

যেসিকা। হুগো, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন আমি দু বছরের খুকী।

হুগো। সেটা কার দোষ? না, একেবারে অসহ্য করে তুলেছ। তুমি আমার দিকে না হেসে তাকাতে পর্যন্ত পার না। আমাদের দুজনেরই বয়েস যখন পঞ্চাশের কোঠায় পড়বে, তখন খাসা দেখাবে। এ আমাদের ছাড়তেই হবে। এ শুধু অভ্যাসের ব্যাপার; বদ-অভ্যাস। দুজনকেই এ অভ্যেস ছাড়তে হবে। বুঝতে পারলে?

যেসিকা। হ্যাঁ, পারলাম।

হুগো। তাহলে অন্তত চেষ্টা ত কর।

যেসিকা। আচ্ছা।

হুগো। ভাল। তাহলে প্রথমে এটা নিয়ে চলে যাও।

যেসিকা। সে আমি পারব না।

হুগো। যেসিকা!

যেসিকা। এটা তোমার, এটা তোমাকেই নিতে হবে।

হুগো। বললাম না, ওটাতে আমার কোন দরকার নেই।

যেসিকা। তাহলে এটা নিয়ে আমি কি করব?

হুগো। আমি কি জানি। যা ইচ্ছে করগে।

যেসিকা। তোমার কি ইচ্ছে, তোমার বউ বাকী সমস্ত দিনটা একটা রিভলভার পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াক?

হুগো। ঘরে ফিরে ওটা আমার স্যুটকেশে তুলে রেখে দাও।

যেসিকা। আমি এখন ঘরে ফিরতে চাই না। তুমি ভয়ানক স্বার্থপর।

হুগো। ত এটা এখানে না আনলেই তো পারতে।

যেসিকা। আর তুমি এটা সঙ্গে আনতে না ভুললেই তো পারতে।

হুগো। বলছি না যে, আমি মোটেই ভুলিনি।

যেসিকা। ভোল নি বুঝি? তবে কি তোমার কাজের নক্সা পাল্টে গেছে?

হুগো। না পাল্টায়নি।

যেসিকা। হ্যাঁ কি না? তুমি কি ওকে...

হুগো। শ্! হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু আজ না......

যেসিকা। হুগো, আমার মানিক, আজ নয় কেন হুগো? আমার যে বড্ড

একঘেয়ে লাগছে। যা বই দিয়েছিলে, সব পড়া হয়ে গেছে। সারাদিন হারেমের বাঁদীদের মত বিছানায় পড়ে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তাহলে যে ভয়ানক মোটা হয়ে যাব। দেরী করছ কেন?

হ্যুগো। তোমার সঙ্গে কথা বলাও অসম্ভব। তুমি সব সময়ই খালি খেলার তালে আছ।

যেসিকা। খেলা তুমিই করছ মশাই। আমাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে দশ দিন ধরে খুব ভাবভঙ্গী করে বেড়াচ্ছ, অথচ লোকটা এদিকে দিব্যি বেঁচে রয়েছে। এ যদি খেলা হয়, তবে সে-খেলার মেয়াদ বেশ একটু অতিরিক্ত রকমের লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পাছে কেউ শুনে ফেলে তাই সব সময়ে দুজনে ফিস ফিস করে কথা বলি। আর সব সময়ে আমাকে তোমার খেয়ালমত চলতে হয়, যেন তুমি পোয়াতী বউ।

হ্যুগো। তুমি ভাল করেই জান যে, এ মোটেই খেলা নয়।

যেসিকা। [নীরস গলায়] তাহলে ত আরো খারাপ। যারা মন ঠিক করার পরও সেইমত কাজ করে না, আমি তাদের ঘেন্না করি। আমাকে যদি তোমার কথা বিশ্বাস করাতে চাও, তাহলে কাজটা আজই চুকিয়ে ফেলতে হবে।

হ্যুগো। আজ সুবিধে নেই।

যেসিকা। [সাধারণ গলায়] দেখলে তো।

হ্যুগো। না, তুমি আমায় পাগল করে ছাড়বে। আজ কয়েকজন লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে আসছে। বুঝলে?

যেসিকা। ক'জন?

হ্যুগো। দুজন।

যেসিকা। তাদেরও ঐ সঙ্গে সাবাড় করে দাও।

হ্যুগো। অন্যরা যখন মোটেই খেলার মেজাজে নেই, তখন যে মানুষ তাদের সঙ্গে খেলা করার আব্দার ধরে, তার মত বে-আক্কেলে কেউ নেই। আমি ত তোমার কাছে কোন সাহায্য চাইনে; শুধু দোহাই তোমার, আমার কাজে বাগড়া দিও না।

যেসিকা। ভাল কথা, ভাল কথা। আমাকে যখন তোমার জীবন থেকে আলাদা করে রাখতেই চাও, তখন তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর। কিন্তু তোমার বন্দুক বাপু তুমি নিয়ে নাও। আর বেশিক্ষণ পকেটে রাখলে আমার পকেট বেঢপ হয়ে যাবে।

হ্যুগো। আচ্ছা, নিলে পরে তুমি চলে যাবে?

যেসিকা। নাও তো আগে।

হ্যুগো। [রিভলভারটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখে।] এখন যাও।

যেসিকা। এই এক মিনিট। আমি বুঝি আমার স্বামীর কাজের যায়গাটা একটু দেখতে পারি না। [হোয়েডেরারের ডেস্কের পেছনে যেয়ে] এখানে কে বসে? তুমি না ও?

হ্যুগো। [অনিচ্ছার সঙ্গে] ও বসে। [টেবিল দেখিয়ে] আমি ওখানে বসে কাজ করি।

যেসিকা। [কথায় কান না দিয়ে] এটা কি ওর হাতের লেখা?

[ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে নেয়]

হ্যুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। [খুব কৌতূহলের সঙ্গে] সত্যি?

হ্যুগো। রেখে দাও ওটা।

যেসিকা। দেখেছ ওর হাতের লেখাটা কেমন ওপর দিকে বেঁকে উঠেছে? আর অক্ষরগুলো মোটেই জোড়েনি।

হ্যুগো। তাতে কি হোল?

যেসিকা। তাতে কি হোল? এর গুরুত্ব নেই?

হ্যুগো। কার কাছে?

যেসিকা। ওর চরিত্র বুঝতে। যাকে খুন করতে যাচ্ছ, তার চরিত্রটা বুঝে নিতে ক্ষতি কি? দেখ না, প্রত্যেক কথার মাঝে কত ফাঁক! মনে হয়, যেন প্রত্যেকটা অক্ষর এক-একটা ছোট্ট দ্বীপ—আর শব্দগুলো এক-একটা দ্বীপপুঞ্জ। নিশ্চয়ই এর একটা মানে আছে।

হ্যুগো। কি মানে?

যেসিকা। আমি কি তা জানি! কি মুশকিল। ওর সব স্মৃতি, যে মেয়েলোকদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, ও কিভাবে প্রেম করে, সব এখানে লেখা রয়েছে। অথচ আমি তা পড়তে জানি না। ......আচ্ছা হ্যুগো, হাতের লেখা দেখে চরিত্র পড়ার বই একটা কেনো না। আমার মনে হচ্ছে, ওদিকে আমার ক্ষমতা আছে।

হ্যুগো। তুমি যদি এক্ষুণি চলে যাও তাহলে কিনে দেব।

যেসিকা। ওটা পিয়ানোর টুল, তাই না?

হ্যুগো। হ্যাঁ, ওটা পিয়ানোর টুল।

যেসিকা। [টুলে বসে বোঁ করে একপাক ঘুরে নিয়ে] তাহলে এইখানে ও বসে। ও বসে, তামাক টানে, কথা বলে, ছোট্ট টুলে মাঝে মাঝে একবার বোঁ করে পাক খেয়ে নেয়..

হ্যুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। [ডেস্কের পরে রাখা একটা মদের বোতল হতে ছিপিটা খুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকে।] ওকি মদ খায় নাকি?

হ্যুগো। একেবারে পাঁড়।

যেসিকা। কাজ করার সময়ে?

হ্যুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। কখনো মাতাল হয় না?

হ্যুগো। না।

যেসিকা। তুমি নিশ্চয়ই ও বললেও মদ খাও না। তোমার তো ওসব সয় না।

হ্যুগো। দিদি সাজতে হবে না। আমি জানি, আমি মদ খেতে, তামাক টানতে পারি না। কি গরম, কি স্যাঁতসেঁতে, কি খড়ের গন্ধ, কি কোন কিছুই আমার সহ্য হয় না।

যেসিকা। [আস্তে আস্তে] ও এখানে বসে, কথা কয়, তামাক টানে, মদ খায়, বোঁ করে পাক খায়......

হ্যুগো। হ্যাঁ, আর আমি......

যেসিকা। [গ্যাসের চুল্লীটাকে দেখিয়ে] ওটা কি? ও কি ওর নিজের রান্না নিজে রাঁধে নাকি?

হ্যুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। [হাসিতে ফেটে পড়ে] কেন? আমি যখন তোমার জন্যে রাঁধি ওর জন্যেও রাঁধতে পারি। ও তো আমাদের সঙ্গে খেতে পারে।

গো। তুমি ওর মত ভাল রাঁধতে পার না। তাছাড়া আমার মনে হয়, এ ওর ভাল লাগে। সকালে ও আমাদের জন্যে কফি বানায়। খুব চমৎকার কালোবাজার হতে কেনা কফি......

সিকা। [কফির পাত্রটা দেখিয়ে] ওটাতে?

গো। হ্যাঁ।

সিকা। আমি যখন এলাম, তখন কি তুমি ওটাই হাতে নিয়েছিলে?

গো। হ্যাঁ।

সিকা। কেন তুলেছিলে ওটা? কি খুঁজছিলে ওর মধ্যে?

গো। কি জানি। [থেমে] ও যখন ওটা ছোঁয়, তখন কিন্তু ওটাকে সত্যি জিনিস মনে হয়। [পাত্রটা তুলে ধরে] ও যা কিছুই ছোঁয়, তাই সত্যি লাগে। ও কফি ঢালে, আমি খাই, চেয়ে চেয়ে দেখি ও—ও খাচ্ছে—আর বেশ বুঝতে পারি, সত্যিকারের যে কফির স্বাদ, সে শুধু ওর মুখে। [থেমে] সেই সত্যিকারের স্বাদ মুছে যাবে। সত্যিকারের উত্তাপ, সত্যিকারের আলো। শুধু এটা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। [কফির পাত্রের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে]

সিকা। মানে?

গো। [হাত দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে] এই সব কিছু, আমার যত মিথ্যে। [কফির পাত্রটা নামিয়ে রাখে] আমি একটা বানানো জগতে বাস করছি। [নিজের ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়]

সিকা। হুগো!

গো। [চমকে] অ্যাঁ।

সিকা। ও মারা গেলে তামাকের এই বাসি গন্ধও মিলিয়ে যাবে। [হুগো কাঁধ ঝাঁকি দেয়] দরজার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তখন আর ঘরে গন্ধ থাকবে না। [হঠাৎ] ওকে মেরো না।

গো। তাহলে বিশ্বাস হল যে, আমি ওকে খুন করব? উত্তর দাও। বিশ্বাস হয়েছে?

য়েসিকা। জানিনে। সব কি রকম শান্ত এখানে। তাছাড়া ঘরের গন্ধটা ঠিক আমাদের বাড়ির মত।...... কিছুই হবে না! কিছু হতে পারে না। তুমি শুধু আমাকে ক্ষ্যাপাচ্ছ।

হুগো। এই, ও এসে গেছে। শিগ্গির জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাও। [টেনে বার করে দেবার চেষ্টা করে]

য়েসিকা। [বাধা দিয়ে] তোমরা দুজনে যখন একা থাক, তখন তোমাদের কেমন লাগে দেখব।

হুগো। [টানতে টানতে] এই তাড়াতাড়ি।

য়েসিকা। [চট করে] বাড়িতে আমি টেবিলের নীচে লুকিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাবার কাজ করা দেখতাম।

[হুগো বাঁহাত দিয়ে জানলাটা খোলে। য়েসিকা ঝট্ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের নিচে লুকোয়। হোয়েডেরার ঘরে ঢোকে]

হোয়েডেরার। ওখানে কি করছ?

য়েসিকা। লুকিয়েছি।

হোয়েডেরার। কেন?

য়েসিকা। আমি না থাকলে তোমাদের কেমন দেখায়, তাই দেখতে।

হোয়েডেরার। বেশ, দেখা ত' হয়েছে। [হুগোকে] ওকে কে আসতে দিয়েছে?

হুগো। আমি জানিনে।

হোয়েডেরার। ও তোমার স্ত্রী। সামলে রাখতে পার না?

য়েসিকা। বেচারী ছোট্ট মৌমাছি, ও ভাবছে তুমি বুঝি আমার স্বামী।

হোয়েডেরার। নয় বুঝি?

য়েসিকা। ও'ত আমার ছোট্ট খোকনভাই।

হোয়েডেরার। (হুগোকে) তোমাকে বিশেষ মানে না দেখছি।

হুগো। না।

হোয়েডেরার। পার্টির লোক হল পার্টির মেয়ে বিয়ে করাই ঠিক।

য়েসিকা। কেন?

হোয়েডেরার। কাজ করতে সুবিধে হয়।

য়েসিকা। তুমি কি করে জানলে আমি পার্টির মেয়ে নই?

হোয়েডেরার। এত' স্পষ্ট। [তার দিকে চেয়ে] তুমি এক প্রেম করা ছাড়া আর কিছু করতেই জান না...... কিছু করতেই জান না......

য়েসিকা। তাও ছাই জানি না। [হুগোকে দেখিয়ে] তোমার কি মনে হয় ওর পক্ষে আমি খারাপ?

হোয়েডেরার। এখনে কি আমাকে সেই কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছ?

য়েসিকা। না কেন?

হোয়েডেরার। আমার ধারণা তুমি ওর বোহিমেবী বিলাস। সব বুর্জোয়া পরিবারের ছেলেরাই তাদের হারানো বিত্তের এক আধ টুকরো স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে সঙ্গে আনে। কেউ আনে চিন্তার স্বাধীনতা, কেউ বা একটা টাই পিন। ও এনেছে ওর বউ।

য়েসিকা। তা বটে। তোমার ওরকম বিলাসের কোন দরকার নেই।

হোয়েডেরার। না, নেই [তারা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়।] এখন ওঠো, এখান হতে কেটে পড়। এ ঘরের মধ্যে আর কখনও যেন নাক ঢুকোতে না দেখি।

য়েসিকা। বেশ, যেমন তোমার অভিরুচি। থাকো তুমি তোমার পুরুষ-বন্ধুদের নিয়ে। [ভারিক্কী চালে চলে যায়]

হোয়েডেরার। তুমি কি ওকে সঙ্গে রাখতে চাও?

হুগো। নিশ্চয়।

হোয়েডেরার। তাহলে দেখো ও আর কখনো যেন এখানে না আসে।

যদি আমাকে একটা স্কার্ট আর একটা পুরুষের মধ্যে বাছতে হয় আমি পুরুষকেই বেছে নেব। কিন্তু আমার পক্ষে অবস্থাটা বেশী কঠিন কোরে তুল না।

হুগো। [হেসে] যোসিকাকে তুমি চেন না।

হোয়েডেরার। তা হবে। না চেনাই বোধ হয় ভাল। [থেমে] ওকে আর এখানে না আসতে বলে দিও। [হঠাৎ] কটা বাজে?

হুগো। চারটে বেজে দশ।

হোয়েডেরার। ওরা দেরী করছে। [জানালার কাছে যেয়ে বাইরে চায়, তারপর ঘুরে দাঁড়ায়।]

হুগো। কোন চিঠি আছে লেখবার?

হোয়েডেরার। না, আজ নেই। [হুগো যাবার ভাব দেখাতে] না, এখানেই থাক। চারটে বেজে দশ?

হুগো। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। যদি না আসে ওদের কপালে দুঃখু আছে।

হুগো। কে আসছে?

হোয়েডেরার। দেখতে পাবে। তোমারই জগতের মানুষ। [পায়চারী করতে করতে] আমি অপেক্ষা করা পছন্দ করি না। [হুগোর কাছে ফিরে] যদি ওরা আসে তবে কাজটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা যদি পেছোয়, তাহলে সব আবার গোড়া হতে শুরু করতে হবে। তার সময় যে আমার মিলবে মনে হয় না। তোমার বয়েস কত?

হুগো। একুশ।

হোয়েডেরার। তোমার এখনো ঢের সময় আছে।

হুগো। তুমি এমন কিছু বুড়ো হওনি।

হোয়েডেরার। না, আমি বুড়ো হইনি, কিন্তু আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। [বাগানের দিকে দেখিয়ে] ঐ দেয়ালের ওধারে অনেক লোক আছে, তাদের দিনরাত শুধু এক-ভাবনা, কি করে আমাকে সরাবে। আর সব সময়ে ত' কিছু সতর্ক থাকা যায় না। সুতরাং শিগ্গির হোক, দেরীতে হোক, ওরা আমাকে সরাবেই।

হুগো। তারা যে দিনরাত ঐ কথাই ভাবে বুঝলে কি করে?

হোয়েডেরার। তাদের মন শুধু এক রাস্তায় চলে।

হুগো। তুমি চেন তাদের?

হোয়েডেরার। না। একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেলে?

হুগো। না। [দুজনে শোনে] না।

হোয়েডেরার। তক্ষুণি ওদের একজন দেয়াল টপকে এধারে নাববে। একটা ভাল কাজ করার সুযোগ মিলবে কিনা।

হুগো। [আস্তে] ভাল কাজ......

হোয়েডেরার। [হুগোর পরে নজর রেখে] বুঝছ না, আমি যদি আমার অতিথিদের এখানে স্বাগত করতে না পারি, তাতে তাদের পক্ষে যে ভাল। [ডেস্কের কাছে যেয়ে একটা গ্লাসে মদ ঢেলে নেয়] খাবে এক পাত্তর?

হুগো। না। [থেমে] তুমি কি ভয় পেয়েছ?

হোয়েডেরার। কার ভয়?

হুগো। মরার ভয়।

হোয়েডেরার। না। কিন্তু আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। আমার সব সময়েই তাড়াতাড়ি। আগেকার দিনে অপেক্ষা করতে আমার আটকাতো না। কিন্তু এখন আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

হুগো। ওদের তুমি খুব ঘেন্না কর, তাই না?

হোয়েডেরার। কেন? নীতির দিক হতে রাজনৈতিক খুনে আমার মোটেই আপত্তি নেই।

হুগো। আমাকে দাও এক পাত্তর।

হোয়েডেরার। সত্যি? [বোতল হতে একটা পাত্রে মদ ঢেলে দেয়। হুগো হোয়েডেরারের 'পর হতে চোখ না সরিয়ে পান করতে থাকে।] কি ব্যাপার? আমাকে কি আগে কখনো দেখনি নাকি?

হুগো। না, আমি তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।

হোয়েডেরার। তোমার জীবনে আমি ত' একটা পথচলার চিহ্ন মাত্র—তাই না? অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ কালের ব্যবধান হতে আমা[কে] দেখছ। তুমি ভাবছ, 'মানুষটা[র] সঙ্গে বছর দুইতিন কাটা[নো] যাবে; তার পর ওকে খতম কর[ে] অন্য কোথাও গিয়ে অন্য কো[ন] কাজ করব।......

হুগো। আর কখনো অন্য কোন কা[জ] করব কি না জানি না।

হোয়েডেরার। বছর কুড়ি পরে তোম[ার] ইয়ারদের গল্প বলবেঃ 'পুরে[া] দিনে আমি যখন হোয়েডেরা[রের] সেক্রেটারী ছিলাম......।' বছ[র] কুড়ি পরে! ভারী মজা[র] তাই না?

হুগো। কুড়ি বছর......

হোয়েডেরার। কি?

হুগো। সে ত' দীর্ঘযুগ।

হোয়েডেরার। কেন? তুমি কি যক্ষ্মা রুগী?

হুগো। না। আর এক পাত্তর দা[ও]। [হোয়েডেরার ঢেলে দেয়] আমা[র] চিরদিনই বিশ্বাস আমি কখ[নো] বুড়ো হওয়া পর্যন্ত টিকবো না। আমারও খুব তাড়াতাড়ি।

হোয়েডেরার। সে অন্য জিনিস।

হুগো। না। [থেমে] এক এক সময় মনে হয় যদি মুহূর্তে সাবালক হ[য়ে] যেতে পারতাম তার জন্যে আম[ার] ডান হাতটা পর্যন্ত কেটে ফেল[তে] পারি। অন্য সময়ে মনে হয় আম[ার] এই নাবালক তারুণ্য আমি কখন[ো] অতিক্রম করতে চাই না।

হোয়েডেরার। সে যে কি জিনিস আ[মি] জানিই না।

হুগো। কি?

হোয়েডেরার। তরুণ হওয়া যে কি কোন দিন জানলাম না। শিশু ছিলা[ম] তার পরই হলাম পরিণত মানুষ।

হুগো। ঠিক আমার এটা একটা বুর্জোয়া ব্যাধি [হেসে ওঠে] প্রায়ই মারাত্ম[ক] হয়ে ওঠে।

হোয়েডেরার। তুমি কি চাও আ[মি] তোমায় সাহায্য করি?

হুগো। কি?

হোয়েডেরার। দেখলে মনে হয় তোম[ার] শুরুটা হয়েছে খারাপভাবে

আমি তোমাকে সাহায্য করলে খুশী হও?

গো। [চমকে উঠে] না, তুমি না। [তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে] আমাকে কারোর সাহায্য করা সম্ভব নয়।

য়েডেরার। [কাছে যেয়ে] আমার কথা শোন। [চট করে থেমে যায়। কান পেতে শোনে।] ওরা এসে গেছে। [জানালার কাছে যায়, হুগো তার অনুসরণ করে।] লম্বা মানুষটা হল কারম্বিক, পেণ্টাগণের সম্পাদক। মোটা লোকটা হল রাজকুমার পল।

গো। রাজ অভিভাবকের ছেলে?

য়েডেরার। হ্যাঁ। [তার মুখের চেহারা বদলে গেছে। সেখানে এসেছে নিস্পৃহ কাঠিন্য আর আত্মপ্রত্যয়।] অনেক মদ খেয়েছ, গ্লাসটা দাও। [গ্লাসের মদটা জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দেয়।] ওখানে যেয়ে বস, সব কথা মন দিয়ে শুনবে আর আমি মাথা নাড়লে নোট নেবে। [হোয়েডেরার জানালা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ডেস্কে এসে বসে। আগন্তুক দুজন ঢোকে। তাদের পিঠে বন্দুকের মাথা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ঢোকে জর্জ আর শিলক।]

ম্বিক। আমি কারম্বিক।

য়েডেরার। [না উঠে] জানি।

ম্বিক। আমার সঙ্গে কে আছে তাও জানো?

য়েডেরার। হ্যাঁ।

ম্বিক। তোমার পাহারাওয়ালাদের যেতে বল।

য়েডেরার। ঠিক আছে ভাই, তোমরা এখন যেতে পার।

[শিলক এবং জর্জ চলে যায়।]

ম্বিক। [ব্যঙ্গের স্বরে] খুব যত্নে রাখে দেখছি।

য়েডেরার। সম্প্রতি যদি একটু আধটু সতর্ক না থাকতাম, তবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হত না।

ম্বিক। [হুগোর দিকে ফিরে] ও কে?

য়েডেরার। আমার সেক্রেটারী ও এখানে থাকতে পারে।

কারম্বিক। [কাছে গিয়ে] আরে, হুগো বারিন না? [হুগো জবাব দেয় না।] তুমি এদের সঙ্গে কাজ করছ?

হুগো। হ্যাঁ।

কারম্বিক। তোমার বাবার সঙ্গে গত হপ্তায় দেখা হয়েছিল। বাবা কেমন আছেন শুনতে চাও?

হুগো। না।

কারম্বিক। তোমার জন্যেই বোধ হয় ভদ্রলোক মারা যাবেন।

হুগো। তাঁর জন্যেই যে আমি জন্মেছি এটা বোধ হয় নয়, এটা নিশ্চিত। আমাদের লেনদেনের হিসেব মিটে গেছে।

কারম্বিক। [গলার স্বর না তুলে] তুমি একটি ক্ষুদে বদমাস।

হুগো। আচ্ছা, বল ত'......

হোয়েডেরার। চুপ। [কারম্বিককে] আশা করি তুমি এখানে আমার সেক্রেটারীকে অপমান করার জন্যেই আসনি? দাঁড়িয়ে কেন? [তারা বসে।] ব্রাণ্ডি?

কারম্বিক। না, ধন্যবাদ।

রাজকুমার। আমার কোন আপত্তি নেই, বরং খুশীই হব। [হোয়েডেরার মদ ঢালে। হুগো তার গ্লাসটা রাজকুমারকে দেয়।]

কারম্বিক। এই তাহলে সেই বিখ্যাত হোয়েডেরার। [তার দিকে তাকিয়ে] তোমার দলের লোকেরা কাল আমাদের লোকদের পরে আবার গুলী করেছিল।

হোয়েডেরার। কেন?

কারম্বিক। একটা গ্যারেজে আমাদের গুলীগোলা বন্দুকের গুদাম ছিল। তোমার ছোকরারা ঠিক করলে সেটা নেবে। অতি সরল কারণ।

হোয়েডেরার। নিতে পেরেছে?

কারম্বিক। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। চমৎকার।

কারম্বিক। এমন কিছু বাহাদুরী নেই—আমাদের প্রতিজনে তারা ছিল দশজন।

হোয়েডেরার। জেতবার মতলব থাকলে সব সময়েই প্রতিজনে দশজন যেতে হয়।

কারম্বিক। এ আলোচনায় কোন লাভ নেই। আমরা পরস্পরের কথা কোনদিনই বুঝব না। আমরা এক জাতের মানুষ নই।

হোয়েডেরার। আমরা একজাতেরই মানুষ—কিন্তু এক শ্রেণীর নয়।

রাজকুমার। এসব ছেড়ে কাজের কথায় এলে ভাল হয় না?

হোয়েডেরার। নিশ্চয়। আরম্ভ কর।

কারম্বিক। আমরা তোমার প্রস্তাব শুনতে এসেছি।

হোয়েডেরার। কিছু ভুল করে থাকবে।

কারম্বিক। খুবই সম্ভব। তোমার তরফ হতে কোন প্রস্তাব আছে না ভাবলে আমি নিশ্চয়ই কষ্ট করে এখানে আসতাম না।

হোয়েডেরার। আমার কোন প্রস্তাব নেই।

কারম্বিক। ভালকথা। [উঠে পড়ে।]

রাজকুমার। আহা, রাগারাগি কেন। কারম্বিক, বোসো। এত বড় খারাপভাবে আরম্ভ হোল। আমরা কি একটু মন খুলে আলোচনা করতে পারি না?

কারম্বিক। [রাজকুমারকে] মন খুলে? ওর পাহারাদার কুকুরগুলো যখন বন্দুকের মাথা দিয়ে আমাদের এখানে ঠেলে ঢোকালে তখন ওর চোখ দুটো দেখেছিলে? এরা আমাদের মনে প্রাণে ঘেন্না করে। তোমার উপরোধে আমি এ সাক্ষাতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি এ থেকে কিছু লাভ হবে না।

রাজকুমার। কারম্বিক, গত বছর তুমি দুবার আমার বাবাকে খুন করাবার চেষ্টা করিয়েছিলে, তবু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছি। আমাদের পরস্পরকে প্রেম করার কোন হেতু না থাকতে পারে, কিন্তু যখন প্রশ্নটা জাতীয় স্বার্থের তখন ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দ-লাগাকে চাপা দিতে হবে বইকি। [থেমে] স্বভাবতই সে স্বার্থ যে ঠিক কি তা নিয়ে সব সময়ে আমরা একমত হতে পারি না। তুমি হোয়েডেরার, হয়তো বা

একটু বেশী একপেশে মন নিয়ে, শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য দাবী-দাওয়ার মুখপাত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছ। আমার বাবা এবং আমি দুজনেই সে দাবী দাওয়ার প্রতি চিরদিনই সহানুভূতিশীল—কিন্তু জর্মানীর উদ্যত হুমকীর সামনে আমরা সে দাবী-দাওয়াকে বাধ্য হয়েই পেছনে স্থান দিয়েছি। আমাদের মনে হয়েছিল যে দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখাই আমাদের প্রধান কর্তব্য—তাতে যদি জন-সাধারণের অপ্রিয় কোন বিধি-ব্যবস্থা করতে হয় তবুও।

হোয়েডেরার। অর্থাৎ রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

রাজকুমার। অন্যধারে কারস্কি আর তার বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে পররাষ্ট্র-নীতি বিষয়ে একমত ছিল না। বিদেশীদের সামনে ইলিতিয়ার অভ্যন্তরীণ ঐক্য এবং শক্তি প্রমাণ করা যে প্রয়োজন, একনেতার পেছনে একজাতি হয়ে দাঁড়ানো যে কত দরকার, তা বোধ হয় তারা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই তারা নিজেদের এক স্বতন্ত্র বেআইনী প্রতিরোধ দল গড়ে তুলেছিল। সেইজন্যেই তোমাদের মত এমন দুজন সমান সৎ, দেশভক্ত মানুষ কর্তব্যের স্বতন্ত্র কল্পনা করে পরস্পর হতে পৃথক হয়ে গেছলে। [হোয়েডেরার অশ্লীল-ভাবে হেসে ওঠে] মাফ করো—এর মানে?

হোয়েডেরার। কিছু না। বলে যাও।

রাজকুমার। আজ সৌভাগ্যবশতঃ এইসব বিরোধী ধারা এক স্রোতের টানে এসে মিলেছে। মনে হচ্ছে আমরা পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ব্যাপকতর বোধ অর্জন করেছি। আমার বাবা এই নিরর্থক সর্বস্ব[illegible] কর যুদ্ধ আর চালাতে চান [illegible] অবশ্য এখনো আমাদের স্বতন্ত্র[illegible] সন্ধি করার অবস্থা হয়নি, তবে [illegible] বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারি [illegible] আমাদের যুদ্ধ পরিচালনায় [illegible] আর অনাবশ্যক কোন উৎসাহ [illegible] দেখা যাবে না। কারস্কির [illegible] হতে সেও মনে করেছে অভ্যন্ত[illegible] বিরোধ দেশের শান্তির পরিপন্থ[illegible] আমরা দুপক্ষই জাতীয় ঐক্য [illegible] তুলে ভবিষ্যৎ শান্তির জন্যে প্রস্তু[illegible] হতে ইচ্ছুক। স্বভাবতই আমা[illegible] এই ঐক্য সম্বন্ধে বাইরে কোন ঘো[illegible] করা চলবে না, তাতে জর্মানীর ম[illegible] সন্দেহ জাগবে। কিন্তু বর্ত[illegible] কার্যকরী গুপ্ত দলদের মধ্যে গো[illegible] এ ঐক্য স্বীকার করা যেতে পারে [illegible]

(ক্রমশ

আলোচনা

"ওস্তাদ হাফেজ আলী খাঁ"

মহাশয়,

আপনার দেশ পত্রিকায় ১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৬০ সাল তারিখে প্রকাশিত "ওস্তাদ হাফেজ আলী খান" প্রবন্ধে মণিকা দেবী এমন কয়েকটি কথা লিখেছেন, যার আলোচনা আরেকটু খোলাখুলিভাবে হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রথম বক্তব্য, ওস্তাদ হাফেজ আলী খাঁ ৩৫ বৎসর পূর্বে দর্শন সিংএর মত একজন তবলচীকে পরাভূত করেছিলেন, তা স্বীকার করি না। হতে পারে দর্শন সিং তাঁর সঙ্গে বাজাতে বসে আর ওঠেন নি। মণিকা দেবী এইটুকু খোঁজ করেন নি যে, দর্শন সিংএর তখন বয়স কত ছিল। এবং কতক্ষণ একা একটি জোয়ান সরোদীয়ার সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞেরা এই কথা স্বীকার করবেন না যে, দর্শন সিং হাফেজ আলীর সঙ্গে তবলায় চৌদুনে উঠতে পারেন নি—চেষ্টা করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। বস্তুত দর্শন সিংএর বয়স তখন ৮৫/৮৬ বৎসর এবং শারীরিক অক্ষমতা হেতু তাঁর শ্বাস রোধ হয়েছিল। যদি গৌরব পাবার হয় তা দর্শন সিংই পেয়েছিলেন। কারণ তিনি ৮৫/৮৬ বৎসর বয়সে একক্রমান্বিন তিন ঘণ্টা পর পর ঠিকে লয়ের দুন, পরদুন, চৌদুন, মধ্য লয়ের দুন, পরদুন, চৌদুন এবং দ্রুত লয়ের পরদুনে উঠে চৌদুনে বাজাবার সময় শেষের দিকে হঠাৎ শ্বাসরোধ হয়ে মারা যান। তিনি যে তবলা ছাড়েন নি, এইটাই তাঁর কৃতিত্ব। সেই আসরে আমার পিতা **শ্রীরেবতীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়** এবং তাঁর গুরু স্বর্গীয় কালিদাস পাল মহাশয়ও (এসরাজী) উপস্থিত ছিলেন।

এক স্থানে মণিকা দেবী বলেছেন, "কাক্কাম ভুয়া, কুকুভ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ প্রভৃতি সারা কলিকাতার সঙ্গীত আসর জুড়ে ছিলেন।" এটাও মণিকা দেবীর প্রমাণ সাপেক্ষ তথ্য নয়, শোনা কথা। কারণ কলকাতার আসরে কুকুভ খাঁ, কাক্কাম ভুয়া নামে কোন ওস্তাদ আসেন নি। এসেছিলেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ (তানসেনের মেয়ের ধারা) ও কুকুভ খাঁ, কেরামতুল্লার সহোদর ভাই। তিনি লিখেছেন, "একবাক্যে সবাই স্বীকার করে নিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে" একথাও সত্য নয়; কারণ ওস্তাদ হাফেজ আলীকে সবাই তখন ঘৃণার চক্ষে দেখেছিলেন। ঐ ঘটনার পরদিন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ হাফেজ আলীকে বলেছিলেন, "বাতাইয়ে কোনসে রাগ হ্যায়?" এবং বিভিন্ন গৎ বাজিয়েছিলেন, কিন্তু হাফেজ আলী কোন উত্তরই দিতে পারেন নি। অবশ্য এটাও স্বীকার্য যে, তখন হাফেজ আলী যুবক মাত্র এবং পাণ্ডিত্যও ছিল কম।

শ্রীচিরঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়,
বাঁড়িশা।

নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকের সমস্যা

মহাশয়,

গত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহি[illegible] সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতির শ্রদ্ধেয় শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভা[illegible] ও তৎপরে সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বা[illegible] সম্পাদ্য প্রতিবাদলিপিগুলি পড়িলাম। রমে[illegible] বাবু তাঁহার ভাষণে যে স[illegible] নূতন নূতন তথ্যের পরিবে[illegible] করিয়াছেন, প্রতিবাদলিপিগুলিতে [illegible] তথ্যাদিকে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন ক[illegible] হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, আশ্চর্যের বি[illegible] এই যে, বৃটিশ ভারতের ঐতিহাসিকরা [illegible] রমেশবাবু যে সকল ঐতিহাসিক মত পো[illegible] করিতেন তাহার সহিত স্বাধীন ভার[illegible] ঐতিহাসিক রমেশবাবুর মতের বিরো[illegible] বাধিয়াছে। অথচ তাঁহার বর্তমান ম[illegible] বিরোধে এতগুলি প্রতিবাদলিপি প্রকা[illegible] হওয়ার পরও যে রমেশবাবুর ন্যায় পণ্ডি[illegible] ব্যক্তি নীরব থাকিবেন, ইহাও আমাদের [illegible] সহ্য হয় না। আমরা তাঁহার নিকট অ[illegible] নগণ্য শিক্ষার্থী, তাই তাঁহার নিকট সবিন[illegible] অনুরোধ, তিনি যুক্তি ও তথ্যের দ্বা[illegible] জানাইয়া দিন যে, তাঁহার পূর্বলিখি[illegible] ঐতিহাসিক মতটি প্রকৃত না গত সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণপ্রদত্ত মতটি প্রকৃত।

ইতি—

বিনীত

শ্রীইন্দ্রজিৎ সরকার।

আমি ভূতের মত ডরাতুম, আজ আমাকে সেই কলম ধরেছে। আমার একমাত্র দুঃখ, এ-চিঠি হয়ত কোনোদিন তোমার হাতে পৌঁছবে না। এটা হয়ত জবানবন্দীরূপে আদালতে পেশ করা হবে। যে অন্ন তোমাকে সাদরে আপন হাতে খাওয়াতে চেয়েছিলুম, সেটা পৌঁছবে তোমার কাছে, পাঁচশো জনের এ'টো হয়ে।

হ্যাঁ, আমার-ই কর্ম, আমিই করেছি। এর জন্য আর কেউ দায়ী নয়। আমি একাই দায়ী। আমি জানি, একমাত্র তুমিই জানতে পেরেছিলে যে, আমি দায়ী। তুমি আমাকে ধরিয়ে দাওনি কেন তারও আন্দাজ আমি খানিকটা করতে পেরেছি। বিশ্বের আদালতে আমাকে খাড়া না করে তুমি আমাকে তোমার নিজের আদালতে খাড়া করে হয়ত যথেষ্ট প্রমাণ পাওনি, হয়ত তোমার প্রত্যয় হয়েছিল যে, এ অবস্থায় পড়লে তুমিও ঠিক এইরকম ধারাই করতে, হয়ত ভেবেছিলে আমি তোমার ওপর-ওলা, ওপর-ওলার অপরাধের বিচার করবেন তাঁর ওপর-ওলা, গুরুর বিচার করবেন ভগবান, চেলার তাতে কিসের জিম্মেদারী। এ নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল নেই। জজ যখন আসামীকে খালাস দেয় তখন জজ কেন তাকে ছেড়ে দিল তাই নিয়ে মাথা ঘামায় কোন্ আসামী?

তুমি যে আমাকে হৃদয় দিয়ে খানিকটে বুঝতে পেরেছিলে সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, তুমি যেন অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে গুপ্তধনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলে, এইবারে আমি তোমাকে হাত ধ'রে বাকি পথটুকু নিয়ে যাবো। কিন্তু যদি গুপ্তধনের কলসী তখন ফাঁকা বেরোয়, কিম্বা যদি তার থেকে বেরয় কেউটে - - -? তখন তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আর তুমি যদি তখন তোমার রায় বদলাও তবে আমিও তোমাকে দোষ দেব না।

তাহলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি।

একদিন কথায় কথায় আমি তোমাকে আমার বাপ-মা সম্বন্ধে কি যেন সামান্য কিছু একটা বলি। তুমি সুযোগ পেয়ে এমন একটা প্রশ্ন শুধালে যার থেকে আমি আবছা-আবছা বুঝতে পারলুম, তুমি জানতে চাও আমি আমার রক্তে এমন কোনো দ্বন্দ্ব নিয়ে জন্মেছি কিনা যার তাড়নায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি অপরাধের পন্থা বরণ করলুম। এখানে বলে রাখি, সে স্থলে তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলে আমিও ঠিক সেই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করতুম। কারণ অপরাধী নিয়ে আমাদের কারবার। হয় তাদের গায়ে বদ-খুন,—না হয় তারা বড় হয়েছে বদ্ আবহাওয়ার ভিতরে। আজ আমার আর স্পষ্ট মনে নেই তবে এটুকু এখনো স্মরণে আছে যে, তুমি কিন্তু প্রশ্নটি করেছিলে এমনি সুচতুরভাবে যে, আমি কোনো অফেন্স্ নিই নি।

তাই বলে রাখি, আমি আমার বাবার যেটুকু দেখেছি তার থেকে এমন কিছুই মনে পড়ছে না যা দিয়ে আমার চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি ছিলেন খাঁটি আইরিশম্যান, অর্থাৎ দু' মুঠো অন্ন আর তিন পাত্তর মদের পয়সা হয়ে গেলেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে সোজা চলে যেতেন পাড়ার মদের দোকানে—তারপর তাঁকে আর এক মিনিটের তরে কাজ করানো যেত না। তুমি আয়ারল্যাণ্ডের মদের দোকান কখনো দেখনি, তাই তুলনা দিয়ে বলছি, সে হল কাশীশ্বর চক্রবর্তীর বৈঠকখানার মত। সেখানে কুটচৌমি আর গালগল্প ছাড়া অন্য কোনো জিনিস হয় না—মদ সেখানে আনুষঙ্গিক মাত্র। মেয়েদের সামনে এসব জিনিস ভালো করে জমে না বলে মেয়েরা 'পাবে' যায় না, চক্রবর্তীর বৈঠকখানায়ও তাদের প্রবেশ নিষেধ।

আমার বাবা ছিলেন গল্প বলায় ওস্তাদ, তাই তিনি ছিলেন 'পাবের' প্রাণ—চক্রবর্তীর বৈঠকখানায়ও শুনেছি সেই ব্যবস্থা।

তাঁর কোনো প্রকারের চরিত্রদোষ ছিল না, তাঁকে কোনো প্রকারের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে আমি কখনো দেখিনি। অথচ তিনি আমাকে জীবনে একটিমাত্র যে উপদেশ লক্ষাধিকবার দিয়েছেন সেটি —'ডেভিড, যা খুশী তাই করবি, কারো পরোয়া করিসনি।' কেন তিনি এ উপদেশ দিতেন জানিনে, এর ভিতর কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা সে তুমি ভেবে দেখো। মা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, তিনি মৃদু আপত্তি জানাতেন। বা তখন অন্য কথা পাড়তেন, কিন্তু যেদি ঝড় দুর্যোগে 'পাব' যেতে পারতেন সেদিনই আমাকে মজাদার কেচ্ছা-কাহি শোনাতেন এবং তার সবগুলোতেই ইঙ্গি থাকতো,—'যা খুশী তাই করো', এমন 'যাচ্ছেতাই করো।'

এ উপদেশ কিন্তু আমার মনের উ কোনো দাগ কাটতে পারেনি—অন্তত ত আমার বিশ্বাস।

এ ধরণের পরিবার আয়ারল্যা বিস্তর—এর মধ্যে কোনো বিদঘু নূতনত্ব নেই। এর থেকে আমি কে হদিস পাইনি—দেখো, তুমি পাও কি না

তবে কি বাইরের দূষিত আবহাওয় এমন কোনো পৈশাচিক ঘটনা যা দে আমি স্তম্ভিত হয়েছি, এবং সে স্তম্ভনের সময় আমার অজানাতে ঘটনা আমার হৃদকমলে ঢুকে গিয়ে দু কীটাণুর মত বছরের পর বছর ধ আমার সর্ব অবচেতন সত্তা বিষিয়ে দি দিয়ে শেষটায় হঠাৎ একদিন আমার মগ ঢুকে আমাকে বিবেকবুদ্ধিহীন উন্ম করে দিলো? কিম্বা কোনো মারাত্ম প্রবঞ্চনা—যে দেবীকে হৃদয়ের পদ্মাস বসিয়ে নিরবচ্ছিন্ন পূজা করেছি, হঠা দেখি সে মায়াবিনী, পিশাচিনী—আমা বুকের উপর বসে আমারই হৃৎপি ছিন্ন করে রক্ত শোষণ করছে? কিং প্রেমের দেউলের মমতা-প্রতিমা গোপ গোপনে বারাঙ্গনার আচরণ করছে—হঠা একদিন ধরা পড়ে গেল, আমার নিশ সংসার অন্ধকার হয়ে গেল?

না। আমার চোখের সামনে ঘটেনি শুনেছি। তা সে তুমিও শুনেছ, সব শুনে থাকে, বইয়ে পড়ে থাকে।

তবে কি উল্টোটা? অবিশ্বাস আত্মবিসর্জন, বহু যুগের বিরহদাহনে পর মধুময় পুনর্মিলন, সমরে লুপ পুত্রের গৃহপ্রত্যাগমনে মাতার বিগলি আনন্দাশ্রু সিঞ্চন?

না। তাও দেখিনি। সেখানে ইউ উইল ড্র ব্ল্যাঙ্ক!

তবে হাঁ, আমার জীবনের সবচে স্মরণীয় ঘটনা, মেবলকে দেখা, তাকে পেয়েও না-পাওয়া।

(ক্রমশ

নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

পংকজ দত্ত

গত বছর কলকাতায় সংগীতের বড়ো জলসার উদ্বোধন হয়েছিল নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মিলনীর অধিবেশন থেকে। আর, অপূর্ব শোভামণ্ডিত বহুবিধ সংগীত পরিবেশনের দিক থেকেও এই সম্মিলনীর অধিবেশনসমূহে কলকাতার সংগীতরসিকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে দিয়েছিল একদিক থেকে যেমন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এবং তাঁদের সঙ্গে মহম্মদ আমীর খাঁ ছিলেন, তেমনি ছিলেন অপরদিকে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি, শ্রীমতী সরস্বতীবাই রানে প্রভৃতি। ক'টা দিন সংগীত নিয়ে যে মাতনের সৃষ্টি হয়েছিল তা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি পরম আনন্দময় অধ্যায়-রূপেই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

এবারকার নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান কিন্তু গত বছরের গৌরবের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেনি। এবার প্রথমে হয়ে যায় নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীর অধিবেশন গত ২৯শে নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং তার ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ৪ঠা ডিসেম্বর আরম্ভ হয় তানসেন সংগীত সম্মিলনী। পর পর একনাগাড়ে সাত রাত্রি ধরে জেগে আবার আরও ছ'রাত্রি আর একটি সম্মিলনীতে হাজির থাকা দৈহিক সামর্থ্যের দিক থেকে খুব কম সংগীত-রসিকদের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হয়। এই কারণেই এবার তানসেন সংগীত সম্মিলনীর ওপরে লোকেরও ঝোঁকটা আগের বছরের মতো জোরালো হতে পারেনি। তাছাড়া শিল্পী সমাবেশেও নিখিল বঙ্গ সম্মিলনে ওজনে কিছু ভারীই ছিল এদের চেয়ে। মোট ছ'দিনে ছটি অধিবেশনের মধ্যে শেষ অধিবেশনটি ছাড়া বাকী পাঁচ দিনের অধিবেশনে এক আধ-জনের কাছ থেকে ছাড়া সংগীতে বেশ মেতে ওঠার মতো বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। শেষ অধিবেশনটিই শেষ পর্যন্ত যা এবারকার সম্মিলনীর গর্ব করার মতো একটা অধিবেশন দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছে। এবং এই অধি-বেশনের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বড়ে গোলাম আলিকে আসরে এনে বসানোতে। বড়ে গোলাম এসেছিলেন নিখিল বঙ্গ সম্মিলনে যোগদান করতে এবং শেষে এদের আসরেও গান গেয়ে এদের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী যোগসূত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেন। এবারের সম্মিলনীতে সাড়া পাবার মতো যা কিছুও বটে এবং

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী নিজের হাতেই তবলা বেঁধে দিচ্ছেন

মন রাখার মতো শিল্পকারিতা এই শেষ অধিবেশনেই পাওয়া যায়।

শিল্পী সমাবেশ

তানসেনের আসরে এবারে নতুন কজন শিল্পী এসেছেন বাইরে থেকে। মহারাষ্ট্র কোকিল পণ্ডিত শংকররাও সরনায়ক, বম্বের শ্রীমতী মোহনতারা আজীন্‌কা, লক্ষ্ণৌয়ের বেগম আখতার, ওস্তাদ মুস্তে খাঁ, সওকাৎ হোসেন, ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ, তাছাড়া ওস্তাদ বিলায়েৎ ও ইমরৎ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়, ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ, ওস্তাদ ইলায়েস খাঁ, পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ, ওস্তাদ আহমদ জান (থেরাকুয়া), ওস্তাদ গোলাম জাফর খাঁ প্রভৃতি বাইরের যে সমস্ত শিল্পীবৃন্দ যোগদান করে-ছিলেন তারা তাদের ঘরোয়ানার জোর এবং ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও খ্যাতিতে সকলেই বিশিষ্ট আসনের অধিকারী।

পণ্ডিত শংকররাও সরনায়ক কোলা-পুরের অধিবাসী। আল্লাদিয়া খাঁ ও আবদুল করিম খাঁর কাছ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন; ও অঞ্চলে তিনি 'মহারাষ্ট্র কোকিল' নামে প্রখ্যাত। বম্বের শিল্পী শ্রীমতী মোহনতারা আজীনকা ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁর শিষ্য জগন্নাথ বুয়ার কাছ থেকে সংগীত শিক্ষা করেছেন। ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁও এই আসরের শিল্পী ছিলেন। আগ্রার রঙ্গিলা ঘরোয়ানার শিল্পী তিনি। পিতা ওস্তাদ নাথন খাঁ গান শেখেন ভাস্কর বুয়ার কাছ থেকে। বিলায়েৎয়ের দুই খুল্লতাত মহম্মদ খাঁ এবং আবদুল্লা খাঁও প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ ছিলেন। রঙ্গিলা ঘরোয়ানার শ্রেষ্ঠ সাধক ফৈয়াজ খাঁ এদের আত্মীয় ছিলেন। বিলায়েৎ পিতার কাছ থেকে ছাড়াও আগ্রা ঘরোয়ানার নেতৃস্থানীয় সংগীতজ্ঞ কলহান খাঁ ও তার ভাই গোলাম আব্বাস খাঁর কাছ থেকেও তালিম নেন। এরা 'বোলতান' রূপায়ন বৈশিষ্ট্যে প্রসিদ্ধ। বিলায়েৎ সাবলীল ভঙ্গীতে আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার গানে যে উৎকর্ষ প্রকাশ

করেন তা তিনি আয়ত্ত করেন জয়পুরের ওস্তাদ কেরামৎ খাঁ ও মহম্মদ বক্সের কাছ থেকে। বেনারস সংগীত সম্মিলনীর কাছ থেকে বিলায়েৎ "সংগীত রত্নাকর" উপাধি পেয়েছেন। বহিরাগত শিল্পীদের গানের সূচীতে ছিলেন বেগম আখতার। এখন তিনি লক্ষ্ণৌয়ের কিন্তু এককালে কলকাতার আসরের নিয়মিত শিল্পী গজল গানেই তার বেশী জনপ্রিয়তা, কিন্তু ঠুংরী ও দাদরাতেও তার বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। 'পূরব' ও পাঞ্জাবী 'অংগ' দুই রীতিতেই তার সমান দক্ষতা।

গানের চেয়ে সম্মিলনীর আকর্ষণ বাদ্যযন্ত্রীদের সমাবেশেই বেশী ছিল। গোয়ালিয়রের হাফিজ আলি খাঁ অনেক বছর ধরে কলকাতার জলসায় নিয়মিত শিল্পীদের একজন। বংশপরম্পরায় সুখ্যাত সরোদী বংশে তার জন্ম। পিতা নান্নে খাঁ ও পিতামহ গোলাম আলি খাঁর সরোদ বাজনায় খুবই নাম ছিল। হাফিজ আলির প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ীতেই, তারপর তিনি বড়ে মহম্মদ হোসেন খাঁ এবং তৎপরে রামপুরের ওয়াজীর খাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঠুংরীর চাল তিনি শিক্ষা করেন ভাইয়া গণপৎ রাওয়ের কাছ থেকে। স্বর্গত এনায়েৎ খাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ কলকাতারই লোক বলা যায়, কিছুকাল ধরে তিনি বম্বেতে গিয়ে রয়েছেন। বিলায়েতের আসন এখন প্রথম

ভারতনাট্যম নৃত্যে দাক্ষিণী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রাজন

লখনৌ-এর বিখ্যাত তবলিয়া জনাব মুন্নে খাঁ

পর্যায়ের ওস্তাদ বাজিয়েদের সারীতে। তার হাতে ছোট ভাই ইমরৎ খাঁও চমৎকার তৈরী হচ্ছেন এবং গত বছর থেকে দু ভাই পাশাপাশি আসরে বসছেন। সেতার বাদক ইলায়েস খাঁ প্রথম জীবনে পিতা শকাওয়াৎ হোসেন খাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ ইয়ুসুফ খাঁর কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করেন। এরা হলেন কলপ্পী ঘরোয়ানার অন্তর্ভুক্ত। ইলায়েস মসিতখানি ও রাজখানি উভয় পদ্ধতিতেই ওস্তাদ এবং গৎকারিতে তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

কণ্ঠসংগীতে মোট কুড়ি জন শিল্পী সম্মিলনীর বিভিন্ন অধিবেশন মিলে যোগদান করেছিলেন এবং এঁদের মধ্যে বহিরাগত ছিলেন মাত্র পাঁচ জন। যন্ত্রসংগীতে তেমনি মোট আঠারো জন শিল্পীর মধ্যে বহিরাগত ছিলেন আটজন। অবশ্য কেবলমাত্র যাঁরা গান বা বাজনার সঙ্গে সংগতকার্যে ছিলেন তাঁদের আর এ সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়নি।

স্থানীয় শিল্পী

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে গায়ক ছিলেন দবীর খাঁ, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ভট্টাচার্য, চিন্ময় লাহিড়ী, কালিদাস সান্যাল, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কানন, বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মীরা চট্টোপাধ্যায়। এঁরা ছাড়া তিন জন ছিলেন প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে। যন্ত্রসংগীতে স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে কেরামৎ আলি ও সাগীরুদ্দিনের নামই উল্লেখযোগ্য। কেরামৎ আলি একক তবলা-লহরা শুনিয়েছিলেন একদিন, তা নয়তো ওঁরা দুজনেই প্রধান শিল্পীদের সংগতীয়ারূপে ছিলেন।

বৈচিত্র্য

বৈচিত্র্যের দিক থেকে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাঙলার নিজস্ব যন্ত্রবৈশিষ্ট্য ঢোল বাজনায় বরিশালের ক্ষীরোদ নট্ট। ৬৮ বৎসরের বৃদ্ধ শ্রীনট্ট গত বছর প্রথম এই সম্মিলনীতে যোগদান করেন। পাকিস্থান হবার পর এঁরা ভিটে ছেড়ে বর্তমানে গয়ো হাবড়াতে এসে বাস করছেন। বংশ পরম্পরায় এঁরা ঢোলবাদক। বনমালী গুণীর ঘরোয়ানার যজ্ঞেশ্বর গুণীর ইনি শিষ্য। এঁদের একটি নট্ট সম্প্রদায় ছিলো; বাজনাই এঁদের পেশা। বর্তমানে ক্ষীরোদ নট্টই একমাত্র ঢোল বাজানো রেখেছেন। শ্রীনট্ট ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর বাজনা শুনিয়ে নেতাজীকে মুগ্ধ করে তাঁর কাছ থেকে একটি খদ্দরের রুমাল, দশটি টাকা এবং আলিঙ্গন উপহার পান। রুমালখানি আজও তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্রীনট্ট যে ঢোলটি ব্যবহার করেন সেটি তিনি তাঁর গুরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন। বড় তালের ওপরে বাজানোতেই ইনি ওস্তাদ; অন্তত সময় পেলে অনেক রকমের কাজ দেখাতে পারেন। বৈচিত্র্যের দিক থেকে আর ছিল এম এস [illegible] জাপানী যন্ত্র

বিখ্যাত সিতারিয়া এনায়েৎ খাঁর সুযোগ্য পুত্র ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ; তবলা সংগত করছেন বেনারসের পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ

কোসোটা। নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীতেও তিনি বাজিয়েছিলেন। এ ধরনের সংগীতের আসরে ভারতীয় শিল্পীরাই বাজালেও এসব চুটকী গান ঠাঁই পাবার উপযুক্ত নয়।

নৃত্য আকর্ষণ

নাচের দিকে প্রকৃত আকর্ষণ বলতে ছিলেন মাদ্রাজের কে এন দণ্ডায়ুধপানি পিল্লাইয়ের শিষ্যা এম আর রঞ্জন, ভারত নাট্যমের সাধিকা। কথক নাচের জন্য ছিলেন জয়কুমারী। ইনি জয়পুর দরবারের বিখ্যাত শিল্পী চুণীলালজীর কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন এবং কথক শিল্পী ও তবলাবাদক জয়লালের পালিত কন্যা। এর আগেও জয়কুমারী কলকাতার আসরে নৃত্য প্রদর্শন করেছেন এবং এই বছর নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনীতেও নৃত্য দেখান। নৃত্যে স্থানীয় শিল্পী ছিলেন বালিকা ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়।

দৈনিক অধিবেশনসূচী

যথারীতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে ৪ঠা ডিসেম্বর সম্মিলনীর উদ্বোধন হয় ভবানীপুরের ভারতী সিনেমাতে। জলসার পক্ষে চমৎকার প্রেক্ষাগৃহ। কলিকাতা পৌরসভার কমিশনার শ্রীবিনয়কুমার সেন অনুষ্ঠানে সভাপতি হন এবং শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মৈত্র প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। যুগ্ম-সম্পাদকদের অন্যতম শ্রীকালিদাস সান্যাল সকলকে স্বাগতম জানান এবং আর একজন শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলনীর বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। প্রচার সম্পাদক শ্রীগৌরহরি চট্টোপাধ্যায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত সুরে তানসেন সংগীত সঙ্ঘের শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত গান দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়।

খেয়াল ও ঠুংরী গানে খ্যাতিমান এ কানন

প্রথম অধিবেশনের জলসা আরম্ভ করেন ওস্তাদ সগীর খাঁ। প্রথমে তিনি নাগধ্বনি কানাড়ায় ধ্রুপদ গেয়ে শোনান এবং পরে শোনান আড়ানাতে ধামার। অরুণপ্রসাদ সর্বাধিকারী (কেবলবাবু) তাঁর সঙ্গে পাখোয়াজে সংগত করেন। এর পর সূচীর মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ্য হয় ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁর সরোদের সঙ্গে কণ্ঠে মহারাজের তবলা সংগত। ভারতের এই দুই প্রবীণ ওস্তাদের পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিল্পনিপুণ মনকে রসানুভূতিতে আপ্লুত করে তুলেছিল। এ ছাড়াও কণ্ঠে মহারাজের ত্রিতালে একক তবলা লহরাও সম্মিলনীর প্রারম্ভিক অধিবেশনটিকে বেশ জমিয়ে তোলে। বিলায়েৎ হোসেন খাঁ আলাপ এবং পরেজে ধ্রুপদ ও সোহিনী রাগে ধামার গেয়ে শোনান। তাঁর সঙ্গে তবলা সংগত করেন কেরামৎ আলি। জয়কুমারী এই অধিবেশনে কথক নাচ দেখান। বিলম্বিত, দ্রুত ও তারানাতে এবং দরবারি কানাড়াতে খেয়াল শোনান কালিদাস সান্যাল এবং পরে তিনি শোনান খাম্বাজ রাগে একখানি ঠুংরী। আর স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন হিন্দোল রাগে খেয়াল গানে অপর্ণা

ঠুংরী ও গজল গানে প্রসিদ্ধ শিল্পী লখ্‌নৌ-এর বেগম আখ্‌তার

চক্রবর্তী এবং লীলাবতী রাগে সেতার বাজনায় মায়া মিত্র। এ'র বাজনায় প্রীত হয়ে মানুভাই ভিমানীর পত্নী একটি সুবর্ণপদক উপহার দেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় পণ্ডিত শঙ্কররাও সরনায়কের খাম্বাবতী রাগিণীতে খেয়াল গানের সঙ্গে; পরে তিনি গারা রাগে একখানি ঠুংরীও শোনান। গানে তবলা সঙ্গত করেন থেরাকুয়া এবং সারেঙ্গীতে সাগীরুদ্দিন। এই দুই সঙ্গতীয়াকে নিয়ে পরে মালকোষ রাগে বিলম্বিত লয়ে একখানি এবং নাগ-স্বরওয়ালিতে দ্রুত লয়ে আর একখানি খেয়াল গেয়ে চিন্ময় লাহিড়ীর কাছ থেকে একটি উপহার লাভ করেন শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমন কল্যাণ রাগে ইলায়েস খাঁর সেতার এবং মোহনতারা আজিনকার মিয়াকী মল্লারে খেয়াল ও ভৈরবীতে ঠুংরী এই দিনের আসরে উপভোগ্য অংশ ছিল। এ'দের সঙ্গে মুন্নে খাঁর তবলা সঙ্গত সুরের বিভূতি বাড়িয়ে দেয়। ভারত নাট্যমে নৃত্যের ছন্দলালিত্যে মনোরম শিল্পকৌশল দেখিয়ে মাদ্রাজের শ্রীমতী রাজন প্রশংসা অর্জন করেন। মাত্র ন বছর বয়সের ব্রততী মুখোপাধ্যায়ের মণিপুরী নাচও বৈচিত্র্য হিসেবে কম উপভোগ্য হয়নি। এ ছাড়া এই অধিবেশনে বিভূতি চট্টোপাধ্যায় মালকোষে সেতার বাজিয়ে শোনান; এ'র সঙ্গেও তবলায় সঙ্গত করেন মুন্নে খাঁ। দ্বিতীয় অধিবেশন পরিসমাপ্তি হয় এম এস কুরদের-করের জাপানী বাজনা শুনিয়ে।

তিনটি অনুষ্ঠান তৃতীয় অধিবেশনকে মনোজ্ঞ করে। ভাই ইমরৎ খাঁর সঙ্গে বিলায়েতের সেতার, চিন্ময় লাহিড়ীর খেয়াল ও ঠুংরী এবং ক্ষীরোদ নট্টের ঢোল। বিলায়েৎরা প্রথমে দু' ভায়ে মিলে গায়ত্রী রাগ শোনালেন, পরে বিলায়েৎ একা খাম্বাজ বাজিয়ে শোনান, সঙ্গে তবলাতে বসেন কেরামৎ আলি। দু' ভায়ের মিলিত বাজনার সুরবিন্যাসের মধুর বৈচিত্র্য কতো পাওয়া গেল। বাজাবার স্বচ্ছন্দ্য ভঙ্গী ছন্দের ঐশ্বর্য সামনে তুলে ধরে সারা প্রেক্ষাগৃহকে মোহাবিষ্ট করে দেয়। খাম্বাজটি বিলায়েৎ একাই বাজান।

৭৮ বৎসর বয়স্ক বরিশালের বিখ্যাত ঢুলি ক্ষীরোদ নট্ট

কেরামতও সঙ্গতে অসাধারণ শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে সকলকে মোহিত করে দেন। এ বছর ইতিমধ্যেই কেরামৎ কলকাতার আসরে বড়ো বড়ো গাইয়ে-বাজিয়েদের প্রায় সকলের সঙ্গেই তবলা বাজিয়েছেন এবং সকল ক্ষেত্রেই তিনি সঙ্গতের একটা আদর্শ সামনে তুলে ধরেছেন। এইদিন বিলায়েতের সঙ্গে তিনি একটানা দেড় ঘণ্টা বাজিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাঁর একক তবলা লহরা স্থগিত থেকে যায়। চিন্ময় লাহিড়ী রাগেশ্রী রাগে প্রথমে বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ে একখানি এবং পরে দ্রুত লয়ে নন্দ-কোষ রাগে একখানি খেয়াল ও খাম্বাজে একটি ঠুংরী শোনান। লক্ষ্ণৌর ম্যারিস কলেজ থেকে প্রধানত সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করলেও তিনি খলিফা খুরসীদ আলি, দিলীপচাঁদ বেদী ও নিসার হোসেনের কাকা ছোটে খাঁ বাহাদুরের কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভারী খুসমেজাজী গাইবার ভঙ্গী; সুরের সুন্দর আভরণ বানাতে পারেন। এ'র সঙ্গে প্রথম গানে চুণীলাল গাঙ্গুলী এবং পরে কেরামৎ আলি তবলা সঙ্গত করেন। ক্ষীরোদ নট্ট ঢোল বাজনা শুনিয়ে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করে তোলেন। আধা, একতালা ও ঝুমরা বাজিয়ে শোনালেন অদ্ভুত দ্রুত লয়ে। সৌকৎ হোসেন সাড়ে এগারো মাত্রায় উচ্চক তাল শোনান তবলাতে। মজিদ খাঁর ঘরোয়ানার শিষ্য ইনি। একটু ভিন্ন প্রকৃতির সৌকত চাল, টেকনিশিয়ান বেশ ভালো, মিষ্টত্ব কিছু কম। স্থানীয় জনপ্রিয় শিল্পী কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শেষের দিকে ভৈরবীতে খেয়াল ও ঠুংরী গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে খুশি করেন। এ ছাড়া সেদিন রামনারায়ণ মিশ্রের সারেঙ্গী এবং গীতা সেন ও যূথিকা সেনের চন্দ্রকোষ রাগে খেয়াল গান হয়।

চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ করেন রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শঙ্করাবরণ রাগে ধ্রুপদ গেয়ে। বিষ্ণুপুরী ঘরোয়ানার শিল্পবৈশিষ্ট্য তিনি সামনে তুলে ধরেন। এই দিন বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন বেগম আখতার ও হাফিজ আলি। সূচীর এই দুই অনুষ্ঠান বেতারে প্রচার করা হয়

ভারতবিখ্যাত সরোদিয়া ওস্তাদ হাফেজ আলী খাঁ পাশে উপবিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্র আমজাদ আলী খাঁ

সেজন্যে সূচী বদলও করা হয়; সেতারের জন্য তাড়াহুড়ো করতেও শ্রোতাদের কাছে বিরক্তিকর হয়। ফলে বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনার যে অনুষ্ঠান গোড়ার দিকে হবার কথা ছিল তাও গান-বাজনার বদলে মৌখিক [illegible] গিয়ে পড়ে রাত প্রায় একটায়। তাতো আলোচনা কোন রসিকদেরই খুশি করতে পারে না। আলোচনাও হলো তেমনি এলোমেলোভাবে এবং শেষের দিকে শ্রোতারা চেঁচিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে মাঝপথে আলোচনা থামিয়ে দেন।

বেগম আখতার ইমনে একখানি ঠুংরী এবং পরে একখানি গজল শোনান। তেমন রস পাওয়া গেল না, তাঁর সঙ্গে সঙ্গতে [illegible] খাঁর তবলা ও গোলাম জাফর খাঁর সারেঙ্গী শুনেই যা-কিছু তৃপ্তি আহরণ করে নিতে হয়। বেগমের গান শেষ হতেই সম্মেলন-সম্পাদক দু'জন, কালিদাস সান্যাল ও শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেতার মারফৎ [illegible] সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি [illegible]দের বাড়বার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদের অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলার জন্য সঙ্গীতরসিকদের ধন্যবাদ জানান। এঁদের পর হাফিজ আলি খাঁ সরোদে [illegible]রি, কানাড়া, মালকোষ, জিলা ও [illegible]ী বাজিয়ে শোনান। ওস্তাদ তাঁর ভাইপো আহমেদ আলিকে দিয়েই বেশি বাজালেন। কেরামৎ আলি আবার অদ্ভুত সঙ্গত করে গেলেন। এর পর কেরামৎ আলি তবলা লহরা শোনান। শঙ্কররাও সরনায়কের খেয়াল ও ঠুংরী অধিবেশনে যবনিকা পাত করে। সূচীর গোড়াতে শ্রীমান বেণু সেতার বাজিয়ে শোনান।

সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনা

আলোচনা আরম্ভ করে হাফিজ আলি বলেন কলকাতা সঙ্গীতকে যেভাবে গ্রহণ করেছে হিন্দুস্থানের আর কোথাও সে পরিচয় পাওয়া যায় না। সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থে অনেক ভুল থাকার কথা উল্লেখ করেন। ধ্রুপদ ও হোরির প্রভৃত প্রচলন হওয়া উচিত বলে তিনি বলেন শুদ্ধ ধ্রুপদের রূপ পাওয়া যায় ডাগরপানি পদ্ধতিতে। ধ্রুপদ গাইবার ভঙ্গীর মধ্যেও লালিত্য ফুটিয়ে তোলা দরকার; স্বরকে উৎকট করে গাওয়ার জন্যই ধ্রুপদ লোকের কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। হাফিজ আলি তাঁর গুরু উজীর খাঁর অনুকরণে কয়েক পদ গেয়ে ধ্রুপদ গাইবার ভঙ্গী দেখিয়ে দেন। এ ছাড়া হাফিজ আলি এক যন্ত্রের সঙ্গে আর এক যন্ত্রের, যেমন সেতারে সরোদে লড়াই দেখবার নিন্দা করেন। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধ্রুপদ গাওয়ার মধ্যে ভুলের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি বাংলা দেশের সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করে রাগ-রাগিণী নিয়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার আসরে ব্যাপক প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। কালিদাস সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে রমেশচন্দ্র জানান যে, শিক্ষা ও সাধনার অভাব ও ত্রুটির জন্য ধ্রুপদ ভাবগম্ভীর গান হওয়া সত্ত্বেও লোপ পেতে বসেছে। দোষ শ্রোতাদের নয়; ধ্রুপদে তান, অলংকার, গমক, মীড় সবই আছে, কিন্তু গাইবার দোষে তা প্রকাশ পায় না, তাই শ্রোতাদেরও ভালো লাগে না। বিলায়েৎ খাঁ দু' প্রকার সঙ্গীতপ্রিয় লোকের কথা উল্লেখ করে বলেন, একদল আছেন যাঁরা সত্যিই কিছু বোঝেন বা বোঝার চেষ্টা করেন, আর একদল আছেন যাঁরা বোঝার ভাণ করে যা-তা মন্তব্য করে বসেন। বিলায়েৎ কলকাতায় ব্যাপক সঙ্গীত-চর্চার কথা উল্লেখ করে বলেন ব্যক্তিগতভাবে তিনি কলকাতার আসরে বাজিয়ে যে আনন্দ পান অন্য কোথাও তা পান না। এর পর শৈলেন্দ্র বন্দ্যো-

বাংলার আরেকজন কৃতী গায়ক চিন্ময় লাহিড়ী

মহারাষ্ট্র-কোকিল শংকর রাও শরনায়ক। সঙ্গে তবলায় সংগত করছেন রামপুরের ওস্তাদ আ মেদজান (থেরাকুয়া)

পাধ্যায় রাগ-রাগিণী সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেন, কিন্তু শ্রোতারা তা শুনতে না চাওয়ায় বন্ধ করতে হয়।

শেষ দুটি অধিবেশন

পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হয় দুজন প্রতিযোগী, অচলা চক্রবর্তীর সেতার ও স্বপন চৌধুরীর তবলা লহরা নিয়ে। তারপর হিন্দোল কেদারা ও হিন্দোলে ধ্রুপদ ও ধামার শোনান ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। গানে এই অধিবেশনে আরও অংশ গ্রহণ করেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় রাগেশ্রীতে খেয়াল ও পরে ঠুংরী; বিজন ঘোষ দস্তিদার মুগ্ধ করেন জয়জয়ন্তীতে খেয়াল গেয়ে; বিলায়েৎ হুসেন খাঁ শোনান রামকেলিতে খেয়াল এবং মোহনতারা আজিনকা যোগকোষে খেয়াল ও কাফি ঠুংরী। আনন্দ পঞ্চম রাগে ইলায়েস খাঁর সেতার, মুন্নে খাঁর তবলা লহরা এবং শ্রীমতী রাজনের নৃত্য দিয়ে এই অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

ষষ্ঠ এবং শেষ অধিবেশনটিই এবারের সম্মিলনীর সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠান হয়। এইদিন বড়ে গোলাম আলি সূচীতে অংশ গ্রহণ করায় প্রেক্ষাগৃহ এবং রাস্তায়ও বিপুল জনসমাবেশ হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পাঁচখানি গান শোনান গোলাম আলি। প্রথমে খেয়াল শোনান বাগেশ্রীতে, তারপর বাহারে আর একখানি খেয়াল এবং শেষে শ্রোতাদের অনুরোধে "সবসে চাঁদ সিতারে", "হরি ওম তৎসৎ" এবং "ক্যা করে সজনী আয়ে ন বালম" গেয়ে তিনি হাতজোড় করে বিদায় গ্রহণ করেন। বেগম আখতার শ্রোতাদের দীর্ঘ-কাল অপেক্ষায় রেখে আসরে এসে বসেন। গোলাম জাফর সারেঙ্গী রেখে হার-মোনিয়াম নিয়ে বসলেন; ঠুংরীর হাত বেশ, চুমকীর কাজ দেখাতে লাগলেন। তবলা নিয়ে বসলেন মুন্নে খাঁ। আগের চেয়ে বেগম ভালোই গাইলেন। প্রথমে ঠুংরী "সুরতিয়া দেখে বিনা নহী চ্যেন", তারপর গজল "ভুলাকে মুঝপে উনকী নজর হো গয়ী" এবং "মোল বলমোয়া পরদেশীয়া।" বিলায়েৎ খাঁ ঝিঞ্জিট রাগে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন, কিন্তু মাইকের দোষে শব্দের অস্পষ্টতার জন্যে শ্রোতাদের মধ্যে থেকে গোলমাল সৃষ্টি হওয়ায় বিলায়েৎ আসর ছেড়ে যান। তাঁকে অনুরোধ করে ফিরিয়ে আনার পর ধরলেন খাম্বাজ; মিষ্টি ছন্দের দোলায় গোড়া থেকেই শ্রোতাদের মধ্যে আমেজ সৃষ্টি করে দিলেন। এতক্ষণ তবলাতে ছিলেন থেরাকুয়া। তৃতীয় রাগ তিনি আরম্ভ করলেন আহীর ভৈরোঁতে এবং এবার তিনি কণ্ঠে মহারাজকে সংগতের জন্য অনুরোধ করলেন। অল্প আলাপের পর গৎ আরম্ভ থেকেই চললো লয়ের লড়াই এবং বেশ রসাপ্লুত উত্তেজনার মধ্যে বাজনা শেষ হলো। শেষ অধিবেশনে এ কানন ও মীরা চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। এঁরা ছাড়া প্রশংসিত হন তবলা লহরায় থেরাকুয়া। অনুষ্ঠানের গোড়াতে হয় প্রতিযোগী ছবি সেনের সেতার ও মণীন্দ্র চক্রবর্তীর সরোদ। অমর ভট্টাচার্য পাহাড়ী রাগে ধ্রুপদ ও পরে ধামার শোনান।

গানের আসর

শাঙ্গর্দেব

অলবেংগল মিউজিক কনফারেন্স হয়ে গেল। মিউজিক ফেস্টিভেল বল্লেই ভাল হত কেননা যেটা হয়েছে সেটা জলসা—কনফারেন্স নয়। কনফারেন্স মানে হচ্ছে আলাপ আলোচনা বিচার বিবেচনা—কিন্তু সেটা আদৌ হয় নি। এসব জলসায় সে সব হবার উপায় নেই, হয়ে বোধ হয় লাভও নেই কেননা আলাপ আলোচনার ফলে যেটা ঠিক হবে সেটা সকলের গ্রহণযোগ্য হবে না একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। অতএব জলসাই ভাল, আলোচনার কাজটা না হয় স্কলাররাই করুন। তবে স্কলারদের নিয়েও মুশকিল কম নয়। সংগীতশাস্ত্রে সত্যিকারের স্কলার আমাদের দেশে খুবই কম কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে অথরিটি বলে প্রচার করেন এমন স্কলারের সংখ্যা কম নয়। অর্থনীতি, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, সংস্কৃত, সাহিত্য যাবতীয় বিষয়ের স্কলাররা ইদানীং সুযোগ পেলেই সংগীত সম্বন্ধে মন্তব্য করতে শুরু করেছেন। এটা ভরসার কথা নয় ভয়েরই কথা। এই তথাকথিত স্কলারদের বাদ দিয়ে আসল পন্ডিত এবং কর্মীদের কাছেই আবেদনটা পৌঁছবে এই আশা রাখি।

কথাটা কেন ওঠালুম বলি। দুঃখটা করেছেন অধ্যাপক ও সি গাংগুলী তাঁর A plea for the history of music নামক প্রবন্ধে যেটি প্রকাশিত হয়েছে এই কনফারেন্সের অফিসিয়াল প্রোগ্রামে। তিনি লিখেছেন— "In the so called conferences on Indian music which are nothing more or less than Jalsas, or music festivals—no serious attention is paid to the theoretical aspects of music and our average music lovers set no value on the theories of the fundamental principles on which the structures of our musical practices are based"। অতএব দায়িত্বটা পড়ছে স্কলারদের ওপর। উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা প্রসংগে অধ্যাপক গাংগুলী কিভাবে রাগের ইতিবৃত্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি যে প্রণালীটি প্রদর্শন করেছেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন জাতি এবং দেশ থেকেই প্রধানত রাগগুলি এসেছে এবং এইসব জাতি এবং দেশের ইতিহাস খুঁজে দেখলে রাগসমূহের ইতিহাসও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিছু উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে একাজে অগ্রসর হতে হবে। রাগের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক গাংগুলী যা বলেছেন তা স্কলারদের কাছে অজ্ঞাত নয়, তবু মূল্যবান এই দিক থেকে যে ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে পর পর এই রাগগুলির প্রাচীন রূপ বিচার করলে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাবে যার গুরুত্ব অনেকখানি। তবে, কথা হচ্ছে রাগের ইতিহাস এইভাবে আলাদা বিচার করা যায় কিনা এবং রাগগুলিকে সব সময় জাতি বা দেশের ওপর আরোপ করলেই সেটা সত্য এবং সংগত হবে কি না। এ বিষয়ে অধ্যাপক গাংগুলীর মতবাদের সংগে অনেকেরই বিরোধ ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাগের ইতিহাস এভাবে বিচার করবার আর একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে, ঠিক একটা জাতিকেই একটা রাগের জনক বলে স্বীকার করা যায় না। একই সুর বিভিন্ন দেশে গিয়ে কিছু কিছু ভিন্নরূপ ধারণ করে ভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে আসছে—অতএব ঝট করে অমুক দেশের অমুক জাতি এই রাগ সৃষ্টি করেছে এরকম সিদ্ধান্তে আসাটা সব সময় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিচায়ক নয়।

এই উপলক্ষে আর একটা ব্যাপার যেটা আমরা বরাবর অবহেলা করে আসছি সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। রাগ সম্বন্ধে আমরা যতটা মাথা ঘামাই সংগীতের অপর বস্তু সম্বন্ধে ততটা নয়। অবশ্য রাগই আমাদের সংগীতের প্রধান অংশ মানি, তথাপি রাগ সব সময় অনিবদ্ধ বা আলাপের ঢংএ গাওয়া হত না—একটা আকৃতি বা গানের ওপর রাগ পল্লবিত হয়ে আসছে বরাবরই। যেমন ধরুন আজকাল আমরা রাগকে আশ্রয় করি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি—এইসব গানে। প্রচীন যুগ থেকেও এই ধরণের বহু গান চলে আসছে। সংগীতশাস্ত্রের প্রবন্ধ অধ্যায়ে এইসব গানের বর্ণনা আছে। খোঁজ করলে দেখা যাবে এইসব গানও বহু বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে এসেছে। সুতরাং শুধু রাগই নয় বহু গানও এসেছে নানা বিচিত্র দেশ থেকে। আমরা যদি এগুলির অনুসন্ধান করি তাহলে ধ্রুপদের অব্যবহিত পূর্বযুগে কী ধরণের গান ছিল সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত হতে পারে আমাদের সংগীতে।

অধ্যাপক গাংগুলী একটু বেশি প্রাচীন ইতিহাসে গেছেন। উক্ত যুগের সাংগীতিক অনুসন্ধান যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, ঠিক মধ্যযুগের গান সম্বন্ধে আমরা কমই জানি। হিন্দু যুগের শেষ দিক থেকে আকবরের রাজত্বের পূর্বকাল পর্যন্ত গীতিরূপগুলি কেমন ছিল সেটা অনেকেই বলতে পারেন না। ধ্রুপদ যে কিরকমভাবে এসেছে সে সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। ধ্রুপদ মোগল দরবারে প্রতিষ্ঠিত হবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত যে বিভিন্ন দেশে আরও বহুপ্রকার উচ্চশ্রেণীর গীতপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তার খোঁজও আমরা রেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু খোঁজ করলে বহু তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ ও চর্যাপদের বিশদ বর্ণনা সংগীতশাস্ত্রে রয়েছে যা থেকে এ গান কিভাবে গাওয়া হত সেটা ভালভাবেই জানা যায়। মংগলগান কোন্ সুরে, কেমন করে গাওয়া হ'ত তারও বর্ণনা রয়েছে। এইভাবে আজ আমরা বহু তথ্যই সংগীতশাস্ত্র থেকে পাই যার সন্ধান অন্যত্র পাওয়া যায় না।

শ' তিনেক বছর আগে এই বাঙলা দেশেই বড় বড় গান বোঝাতে প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপক প্রভৃতি শ্রেণীর গানের প্রচলন

ছিল। ধ্রুপদ তখন দরবারি খাতির পেয়ে মাথা চাড়া দিয়েছে এবং কীর্তনেরও বিশিষ্ট গীতরূপ নির্ধারিত হয়েছে। শুদ্ধ প্রবন্ধ গাওয়া রীতিমত কঠিন ব্যাপার ছিল, কেননা এটি নিবদ্ধ গানের একটি শ্রেষ্ঠ রূপ। ধ্রুপদের মতো চারটে কলিতো এ গানে ছিলই তা ছাড়া ছটি আঙ্গিক স্পষ্টভাবে দেখাতে হত। ছটি আঙ্গিক কি কি?—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ আর তাল। 'স্বর' বলতে সা, রে, গা, মা প্রভৃতি স্বর বোঝায়। 'বিরুদ' হচ্ছে স্তুতি বা গুণ-বাচক আর 'তেনক' হচ্ছে মঙ্গলবাচক। আগে গানের আরম্ভে 'ওঁ তৎসৎ' এই ধরণের মঙ্গলসূচক কথাগুলি সুরে গাওয়া হ'ত ক্রমে এই রূপটি বিকৃত হয়ে 'দে রে না তোম্ নোম্ এইরকম অর্থহীন ভাষায় পরিণত হয়েছে। গানের আগে আলাপে আমরা এইসব শব্দ ব্যবহার করি। পাঠ বা পাট বলতে বোঝাতো তালবাদ্যের বোল, যেমন—ধাং ধাং ধুগ্ ধুগ্ ইত্যাদি। পদ বলতে বোঝায় যা অর্থ প্রকাশ করে তাকে। সব গানেই অবশ্য ছয়টি অঙ্গ থাকত না—ছয় থেকে দুই অঙ্গ পর্যন্ত নিয়ে গান করা হ'ত। এখানে এইরকম শুদ্ধ প্রবন্ধের পূর্ণলক্ষণ সংযুক্ত একটি গান উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—এর থেকে বোঝা যাবে সেকালে গীতরূপ কিরকম ছিল। গানটি প্রায় তিন শ' বছরের পুরোনো এবং এটাও লক্ষ্য করবেন সেই সময় পর্যন্ত জয়দেবের প্রভাব কতখানি ছিল আমাদের গানে।

জয় জগডবন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী
রাধিকাচন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী।
শ্যাম মনোরঞ্জিণী ধৈর্যভর ভঞ্জিণী
কঞ্জখঞ্জনমীন গঞ্জিমৃগলোচনী॥
কান্তিজিত দামিনী পরম অভিরামিণী
ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদমর্দিনী
মঞ্জু মৃদুহাসিনী ললিতকলভাষিণী
ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্ধিনী॥
সুভগশৃঙ্গারিণী নবনর্বাপহারিণী
বৃন্দাবিপিনবিনোদিনী গজগামিনী।
রাসরসরঙ্গিণী মধুরতরঙ্গিণী
সকলরমণীমণি নরহরিস্বামিনী॥
ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা বিত কতো থুয়া
দ্মিকি ত্রিগওতকতা তা থৈয়া।
সরি রিগম পমগ মম্ম গরি সাস্‌সাতি
অই তেন্না তে নাং তি অই ঐ আ॥

এরকম কত যে গান ছিল বলা যায় না—শুধু গান নয় তালও। প্রাচীন বাঙলার তথা ভারতীয় সঙ্গীতের শাস্ত্র-গুলিতে এদের পরিচয় মিলবে। উক্ত প্রাচীন বাঙলা গানটি যে যুগে প্রচলিত ছিল সেই যুগেই শাস্ত্রে 'ঝুমরি' বা আধুনিক ঝুমুর গানের উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয় এককালে ঝুমুর ভদ্রশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 'চর্চরি' বলে আগে একরকমের গান প্রাচীনকালে হোলি উপলক্ষ্যে গাওয়া হত—এখনও এ গানটার পরিবর্তিত কোন রূপ আছে কি না জানি না—তবে হোলির চাঁচরের মধ্যে নামটা রয়ে গেছে। এইভাবে 'পঞ্চালী' (আধুনিক পাঁচালী) ধ্রুবপদ প্রভৃতি বহু গীতরূপের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে অনেকগুলি এখনও রূপ পরিবর্তন ক'রে টিকে আছে।

তাই বলছি শুধু রাগের মধ্য দিয়েই নয়, বিভিন্ন গীতরূপ যা প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায় সেগুলিও তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে তাহলেই বেরুবে এ যুগের অব্যবহিত পূর্বে গান কিরকম ছিল। আর সঙ্গীতের দিক থেকে যদি গবেষণা করতে হয়, তাহলে এইরকম পূর্ণভাবে করাই ভাল, কেননা এখনও আমাদের সাঙ্গীতিক তথ্য এতটা সংগৃহীত হয়নি যাতে করে কেবলমাত্র একটি শাখার বিশেষ অনুসন্ধান করা যায়। এরকম করতে গিয়ে অনেকে বহু অসুবিধা ভোগ করেছেন কেননা খানিকটা অগ্রসর হয়ে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য পান নি যার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বাসের সঙ্গে আরও এগিয়ে যেতে পারা যায়। সুতরাং অনুসন্ধানটা পূর্ণাঙ্গ হওয়াই ভাল।

আসরের খবর

গত ২রা ডিসেম্বর শ্রীদামোদরদাস খান্নার বাসভবনে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় কলাবিদ্ সমিতির একটি সভা হয়ে গেছে। উপস্থিত ছিলেন শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, শ্রী ভি জি যোগ (লখনউ) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীশচীন-দাস মতিলাল, শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী, শ্রীরমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী জে ভি পিথ কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার, শ্রীধীরেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য, শ্রীবিজন বোস, শ্রী এইচ পি চ্যাটার্জি, শ্রীদামোদরদাস খান্না, শ্রী কে সি বড়াল, শ্রীদয়ারাম পোদ্দার, শ্রী জে পি কুঠারি।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আগামী ২৬শে ডিসেম্বর কলকাতায় অখিল ভারতীয় সংগীত কলা-বিদ মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসবে। একটি অভ্যর্থনা সমিতি তৈরি হয়েছে—সভাপতি শ্রীভূপতি মজুমদার যোথসচিব শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীদামোদরদাস খান্না।

অভ্যর্থনা সমিতির দপ্তর খোলা হয়েছে ৫১, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে (৩৩—১৫৩৯)। যে সব শিল্পী ও সংগীতা-মোদী রিসেপসন কমিটির সদস্য হ'তে চান তাঁদের উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার জন্য অনু-রোধ করা হয়েছে (সন্ধ্যা ৭—৯, শনি ও রবিবার বাদ)।

জানা গেল যে, রক্সী প্রেক্ষাগৃহে এ বৎসরের নিখিল ভারত সংগীত সম্মি-লনীর প্রথম অধিবেশনের পরের দিন ডাঃ কেশকরের সভাপতিত্বে কলাবিদ সম্মেলনের প্রথম বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

*

তানসেন সংগীত সম্মিলনীর অধি-বেশন সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী বড় আকর্ষণ নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনী। এটি আরম্ভ হ'চ্ছে আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে রক্সী প্রেক্ষাগৃহে।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বেতার ও তথ্যমন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকর সম্মিলনীর উদ্বোধন করবেন এবং রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় একটি অভিভাষণ দেবেন এই উপলক্ষে এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

*

গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় নাগপুর মহাবিদ্যালয়ের (মরিস কলেজ) 'বাংলা-সাহিত্য সমিতি'র উদ্যোগে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'ঋতু পরিক্রমা' মাধ্যমে প্রকাশ পায় ঋতু-চক্রের বিভিন্ন ভঙ্গিমা, বিভিন্ন রূপ—সুরে, ছন্দে ও কথায়। গানে, কবিতায়, অভিনয়ে, ছয়টি ঋতু মূর্ত হয়ে ওঠে মঞ্চে। সব গানগুলি রবীন্দ্র-সংগীত এবং শ্রোতাদের প্রচুর প্রশংসা পায়।

এ বছর একটু বিশেষ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এ বছরের অনুষ্ঠান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ঋতু উৎসব' অবলম্বনে পরিকল্পিত। এই গীতিনাট্যটির রচনায় ও পরিচালনায় সুজিতকুমার কুণ্ডু বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত নির্দেশনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ। সংগীত পরিবেশনায় সাহায্য করেন শ্রীসন্তোষ মুখার্জী ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বর্মণ। সমবেত সংগীতগুলি ছাড়াও যাদের গান বিশেষভাবে প্রশংসা পায় তাদের মধ্যে—শিবানী ব্যানার্জী, অমল রায়, মায়া চ্যাটার্জী, সিতাংশু ভাদুড়ী, রাণু ব্যানার্জী প্রভৃতিদের একক ও দ্বৈত গীতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ে সুজিত কুণ্ডু, টুলু ঘোষ, সিতাংশু ভাদুড়ী, তুষার ঘোষ ও দেবব্রত ঘোষাল বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

*

কলকাতা শহরে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা দেবার যে ক'টি প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মধ্যে নৃত্য-ভারতীর বিশেষ একটি স্থান আছে, সুনামও আছে যথেষ্ট। গত ৬ই ডিসেম্বর এরা নিউ এম্পায়ারে এক আড়ম্বরপূর্ণ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন তার মধ্যে মূল অনুষ্ঠান ছিল চিরপরিচিত রূপকথার কাহিনী 'সাতভাই চম্পা' এবং রবীন্দ্রকাব্য অবলম্বনে ও রবীন্দ্রগীতি সহযোগে 'ভানু সিংহের পদাবলী'। দুটিই নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ভারত নাট্যম, কথাকলি, তিলানা, মণিপুরী প্রভৃতি ভারতীয় নৃত্যের নমুনা দেখানো হয়। এইগুলির মধ্যে কথক এবং তিলানা নৃত্যে যথাক্রমে কুমারী রণিতা ঘোষ এবং কুমারী কেশোয়া দক্ষতার পরিচয় দেন। বেশ সাবলীল নৃত্যভঙ্গিমা তাদের। এইগুলির সংগে ছোট্ট মেয়ে জবা গুহ তার ময়ূর নৃত্যের দ্বারা দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। সাত ভাই চম্পার সর্বজন পরিচিত রূপ-কাহিনীটিকে সংগীতে নৃত্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নৃত্যভারতী নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সাতটি চাঁপার বোন পারুলের ভূমিকায় কুমারী নার্গিসের নৃত্যচপল ভূমিকাটি সকল দর্শকই উপভোগ করেছেন, তার নৃত্য জাড়্যহীন। নৃত্যভারতীর অপর একটি নৃত্যনাট্য চড়ুই-ভাতির মতই এটিও সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে।

'ভানু সিংহ' ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'ভানু সিংহের পদাবলী' অবলম্বনে নৃত্যভারতী একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। বিরহিনী রাধিকা কৃষ্ণের সংগে মিলনের জন্য ব্যাকুলা হয়ে রয়েছেন এবং যে পর্যন্ত কৃষ্ণের বংশীধ্বনি তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ না করল সে পর্যন্ত ব্যাকুলা রাধার প্রাণ আকুল হয়ে রইল। কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার আকুলতা রেবা দত্ত চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাঁর সখিদলও তাঁর সংগে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। নৃত্যসহযোগে রবীন্দ্রগীতিগুলিও সুগীত হয়েছে। সমস্ত নৃত্যানুষ্ঠানটি দেখে নৃত্যভারতীর প্রত্যেক সভ্যের ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সকলের সমবেতভাবে কাজ করবার ইচ্ছাটা বেশ সুস্পষ্ট। সাফল্যের জন্য পরিচালক শ্রীপ্রহ্লাদ দাস অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

কবিতা

ভাবরূপা—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২, টাকা।

ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ভক্ত এবং ভাবুক কবি। তাঁহার লিখিত আলোচ্য কবিতা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা নূতন আলোকের সন্ধান পাইলাম। তিনি রসের সাধক। তাঁহার লেখায় আগাগোড়াই রস-ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়; আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে তিনি রসের সমাহার এবং বিস্তারের একটি অতি নিগূঢ় রীতিকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিতাগ্রন্থে কবি শ্রীমতী রাধা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মীরা ও করমেতি ও যশোধারা এবং সর্বশেষে একটি পতিতা নারীর ভাবকে লইয়া তাহাকে রূপ দিয়াছেন। এই রূপ দেওয়ার রূপটি কিরূপ, এটি ঠিকমত বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব-দর্শনের বিভাবনার রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয়। কবি অবশ্য এই বিশ্লেষণ বা বিচারের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট হন নাই; কিন্তু এই কয়েকটি কবিতার ধারাতে রস প্রবাহের রীতিটি ধরা পড়িয়া যায়। বৈষ্ণব সাধকদের মতে বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, তিনি রসরাজ। আনন্দময়ী তাঁহার স্বরূপা শক্তি এবং তাঁহার সঙ্গিনীদল লইয়া তিনি নিত্য রসলীলায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহার সেই লীলারস প্রাজ্ঞ, তৈজস এবং বিশ্ব এই ত্রিধারায় পূর্ণতা লাভ করিতেছে; রসাতীত উৎস হইতে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। প্রাজ্ঞ অবস্থা বিশ্বাতীত, অপ্রাকৃত সম্পদ। সেখানে মহাভাবের খেলা—আলিঙ্গন, চুম্বন, অঙ্গে অঙ্গে এক হইয়া ঘেঁষাঘেঁষি মেলামেশি লীলা। এই লীলার অধিশ্বরী রাসেশ্বরী শ্রীরাধা। প্রিয় পরিরম্ভণের অখণ্ড মিলনের অন্তহীন বিরহের ভাব তাঁহার লীলা হইতে অনুলোম গতিতে তৈজস এবং বিশ্বের স্তরে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। আবার সেই লীলারই প্রতিলোম ক্রিয়ায় বিশ্বও তৈজস ভূমির জীবকে নিত্য আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। "প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভজে গোপাঙ্গনা হরিং" বিষ্ণু পুরাণে এ তত্ত্ব স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুত প্রাজ্ঞ অবস্থা ভাগবৎতত্ত্ব এবং "বিশ্ব তৈজসা জীবাঃ"।

কবি কালীকিঙ্করের শ্রীমতী রাধা এবং বিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রাজ্ঞ স্তরের রসলীলায় রীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে নিত্য মিলনে, নিত্য বিরহের উদ্দীপনা নিতুই নব নব রসের উদ্ভব—প্রভব বীর্য। মীরাবাঈ, করমেতি এবং যশোধারায় রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধার ভাবের অনুলোম রীতির গতি। তারপর একেবারে ক্ষিতি। পতিতা মাটির মেয়েতে কবি সেই প্রেমেরই সংবেদন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন সেখানেও প্রেমময়ী রাধা-

রাণীর খেলা। মধুর ভাবের সাধনার এই রীতি। শ্রীভগবানকে পতিভাবে সাধনা জীবনে সত্য করিতে হইলে এই দৃষ্টি লাভেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। নারীর মধ্যে প্রেমের মাধুর্যকে সে সাধনায় দেখিতে হয় এবং তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া সেই মাধুর্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। কবি নারীতে প্রেমের অভিনব দীপ্তি, নিত্য সুন্দরের পূজার অনন্ত আকুতি এবং শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুরের পূর্ণাঙ্গ রস সমাশ্রয়ের অব্যয় রূপটি উপলব্ধি করিয়াছেন।

নারীর লীলাতেই রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধার প্রেম বিলসিত; অনন্ত রূপ ও রসের রাজ্যে অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত কবি উপলব্ধি করিয়াছেন। এই ইঙ্গিতই ভাবকে রূপ দেয়। বস্তুত কামগন্ধের অতীত এই অনুভূতি। কবি শ্রীমতী রাধারাণী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া নিত্য মিলন এবং নিত্য বিরহের উজ্জীবন রসকে তাঁহার ভাবময় ভাষার ছন্দে উৎসারিত করিয়াছেন। মীরা, করমেতিবাঈ এবং যশোধারার আকুলতা এবং আত্মনিবেদনে উজ্জ্বল রস সাধনার ব্যাপ্তি চেতনাকে তিনি দীপ্তি দিয়াছেন। পরিত্যক্তা পতিতার মৌন-মুখে ভাষা দিয়া কবি শুনাইয়া দিয়াছেন, অনন্ত প্রেমের সেই আকুতি—বিরহ-মিলন-গীতি—"এত ভালবাসা-বাসি ভুলে গেল কেমনে সে প্রিয় ?"

পুস্তকখানির ভূমিকা স্বরূপে শ্রীমৎ-স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী বিরচিত মীরা সুধা স্বাদনম্ সংস্কৃত কবিতাটি পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভক্তিমতী মীরার সমগ্র জীবন-লীলা সাধক কবি মাত্র ১২টি শ্লোকে অপরূপ মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মীরার সাক্ষাৎকে তিনি যেভাবে মাত্র চারটি পদে রূপ দিয়াছেন তাহা মধুর হইতে সুমধুর। ভাষাকে ভাবঘন রূপ দেওয়াতেই কবিত্বের সার্থকতা, পুস্তকখানি এই দিক হইতে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বাঙলার রসিক সমাজ এই পুস্তক পাঠে প্রীতি লাভ করিবেন। ৫২৪।৫৩

চিকিৎসা বিজ্ঞান

ক্ষয় রোগ কথা—ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী প্রণীত। শ্রীসুকুমার ঘটক কর্তৃক ১২, বলরাম বোস স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, টাকা।

পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা স্বরূপে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই যে, ঠিক ডাক্তারী ধারা ধরিয়া উহা লিখিত হয় নাই, বাঙলা দেশের সামাজিক, অর্থনীতিক এবং পারিবারিক জীবনযাত্রা, আহার বিহার, খাদ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপক পটভূমিকা অবলম্বন করিয়া লেখক ক্ষয় রোগের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় আগাগোড়া লেখকের জনকল্যাণ সাধন প্রবৃত্তি এবং দেশের বর্তমান দুর্গতি অবস্থা সম্বন্ধে বস্তুর অভিজ্ঞতা এবং তৎপ্রতীকারে স্বদেশ প্রেমিকের সজাগ দৃষ্টির

পরিচয় পাওয়া যায়। দেশবাসীকে তিনি কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া সরকারকেও এদেশের সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে প্রণোদিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৫৪০।৫৩

যৌন বিজ্ঞান

নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশঃ দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশকঃ ঈগল পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা—২০; মূল্য আড়াই টাকা।

মানুষের জন্ম থেকেই যৌন সমস্যার শুরু হ'লেও কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে যৌন-সম্পর্কীয় কোন প্রকার আলোচনা পর্যন্ত গর্হিত ছিল। প্রাচীনকালে বাৎস্যায়নের এ বিষয়ে গ্রন্থ থাকলেও তা যে প্রামাণিক নয়, আধুনিক যৌনতত্ত্ববিদগণের বিশদ আলোচনায় তা বোঝা গেছে। বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের এ শাখাটি এক প্রকার অবহেলিতই ছিলো, কারণ এ নিয়ে আলোচনা করার পথে অন্তরায় ছিলো প্রচুর। জনগণের মনোভাব এ ধরণের আলোচনায় অনুকূলে ছিলো না, তা ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষারও সুযোগ ছিলো না। "চুপ চুপ" নীতির জন্য বিজ্ঞানোচিত আলোচনার অবকাশ ছিলো না বটে, কিন্তু যৌনতত্ত্বের অবৈজ্ঞানিক আর মূলত কামোদ্দীপক প্রচুর গ্রন্থে বাজার পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো। ফলে সত্য মিথ্যায় মেশানো ভীতিপ্রদ তথ্যে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানী পাঠকের দল বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন।

আশার কথা, আধুনিক সমাজ এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠেছেন। ফলে পুরাকালের বাৎস্যায়ন আর অনঙ্গমল্লের স্থানে ডক্টর পিল্লে, রাঘব রাও, আবুল হাসানৎ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিজ্ঞানসম্মত পুস্তক প্রকাশিত হ'য়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ। যৌন-সম্পর্কের ইতিহাস, প্রেম ও সহবাস, রতিজ রোগ, ভ্রূণ-হত্যা, গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি চিন্তাকর্ষক বিষয় সম্বন্ধে লেখক মনোজ্ঞভাবে যে আলোচনা করেছেন, তা যেমন বিজ্ঞান-সম্মত তেমনই সমাজের কল্যাণকর।

অবশ্য সমস্ত কিছু আলোচনা আর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হ'য়েছে, বিশেষ এক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। রাশিয়া এ সব বিষয়ে আদর্শ দেশ এমন একটা প্রতিপাদ্য মেনে নিয়েই গ্রন্থের শুরু। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর বিজ্ঞানের মূলসূত্রের পরিণাম মার্কসবাদ। যৌনজীবন সম্বন্ধে সোভিয়েটের যে পরিকল্পনা তার মূলে নাকি রয়েছে বিশেষ ক'রে এই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। সেইজন্যই লেখক এই বস্তুবাদীর দৃষ্টি নিয়ে যৌন-সম্পর্কের ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছেন।

অবশ্য বিশেষ এক মতবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানকে দেখতে গেলে যে দোষ ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, আলোচ্য গ্রন্থটি সে কলঙ্কমুক্ত নয়। তবু বলবো এ ধরণের পুস্তকেরও প্রয়োজন আছে। বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদে আস্থা বা বিশ্বাস গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত ব্যাপার, রচনায় তার প্রতিফলন হওয়াও বিচিত্র নয়, তবু জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ ধরণের পুস্তকের মর্যাদাও অবহেলার নয়।

এ জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রত্যেকেরই কাম্য। ২৫৭।৫৩

উপন্যাস

(১) মিলন গোধূলি (২) হে মোর মানসী প্রিয়া : শ্রীপ্রবোধ সরকার। বাণী পীঠ গ্রন্থালয়, ৩৯।১, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য প্রতিটি ২॥০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তক দুইটি প্রেমের উপন্যাস। প্রথম উপন্যাসটির কাহিনী অতি নাটকীয়, বিসদৃশ। নায়িকার বিবাহের রাত্রে নায়কের ছাদ টপকাইয়া প্রবেশ ও নায়িকাকে ক্লোরফর্ম জাতীয় কোন একটা পদার্থ শুঁকাইয়া দিয়া নায়কের পলায়নে যে কাহিনীর শুরু তাহার শেষ যথাযোগ্যই হইয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাসটির মধ্যেও লেখকের প্রতিভার কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ কোথাও দেখিলাম না। তথাপি প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় উপন্যাসটি ঈষৎ ভালোই বলিতে হয়। লেখক এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহাকে সাহিত্যের জাতে তোলা যায় না। "পিনিক্ মারা" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার শ্রুতিকটু। পুস্তকের ছাপা ভালোই। ৫১৫।৫৩, ৫১৪।৫৩

শাখা প্রশাখা (১ম) শাখা প্রশাখা (২য় খণ্ড) : শ্রীকানাইলাল ঘোষ। প্রকাশক—কানাইলাল ঘোষ ১৩-এ ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১ম খণ্ড ২॥০ টাকা, ২য় খণ্ড ৩॥০ টাকা।

বর্তমান উপন্যাসের লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত। সম্ভবত ইহাই তাঁহার প্রথম উপন্যাস রচনা। সে দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে একটি ঘরোয়া কাহিনীকে উপন্যাসের উপজীব্য করিয়া তিনি ভালোই করিয়াছেন। চরিত্রও খুব বেশি নাই। যথেষ্ট মনোযোগ দিলে উপন্যাস দুইটির ভালো হওয়ার অবকাশ ছিল। দুঃখের বিষয়, লেখক তাঁহার বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার জন্য উপন্যাস দুইটিতে নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। চরিত্র চিত্রণের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি তাহারা কথা বলে নাই, কাজ করিয়াছে। ফলে সব চরিত্রই প্রায় সমান—স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই। তথাপি ইহাদের মধ্যে বিনয় এবং মাধুরীর চরিত্র কিছুটা সার্থক। এই উপন্যাসের ভাষা সজ্জায় একটি বিশেষ ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল। বাঙলা ভাষায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণত কর্তৃপদের পরে হইয়া থাকে। কয়েক স্থানে ভাষা শ্রুতি-মধুর করার জন্যই লেখকরা ক্রিয়াপদকে কর্তৃপদের পূর্বে ব্যবহার করেন। কিন্তু বার বার এই ধরণের বাক্য রচনা করিলে তাহা অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। বর্তমান গ্রন্থদ্বয়ের লেখকের রচনা এই দোষে দুষ্ট। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ৫২২।৫৩, ৫২৩।৫৩

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সমালোচিত সাধনা গীতি (২য় খণ্ড) পুস্তকের ঠিকানায় ভুলক্রমে হুগলী জেলা ছাপা হইয়াছে। উহা হুগলী না হইয়া হাওড়া জেলা হইবে।

ক্রিকেট

ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল কোন খেলাতেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবে না এই উক্তি ভ্রমণ আরম্ভের সূচনাতেই আমরা করি, ইহাতে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। কেহ কেহ ক্রিকেট খেলার অনভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন, কিন্তু আমরা তাহাতে বিচলিত হই নাই। আমাদের সেই উক্তি যে কতখানি সত্য তাহা রজত জয়ন্তী দলের ভ্রমণের বিভিন্ন খেলা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ভ্রমণকারী দল এই পর্যন্ত ১১টি খেলায় যোগদান করিয়া ৩টি খেলায় পরাজিত ও সকল খেলা অমীমাংসিত। কোন একটি খেলাতেও বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি মনোনীত ভারতীয় একাদশের সহিত উপর্যুপরি দুইটি খেলায় যোগদান করিয়া পরাজিত হইয়াছে। প্রথম খেলা হয় পুণাতে ও রজত জয়ন্তী দলকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। দ্বিতীয় খেলা নাগপুরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও রজত জয়ন্তী দল চার উইকেটে পরাজয় বরণ করিয়াছে। রজত জয়ন্তী দলের পক্ষে খ্যাতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যান ফ্রাংক ওরেল শতাধিক রান করিয়াও দলকে পরাজয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই খেলায় ভারতীয় দলে তরুণ খেলোয়াড় হীরালাল ভোরা ব্যাটিং ও বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। উইকেটরক্ষক শ্রী নিবাসমের খেলাও দর্শনযোগ্য হয়। ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকগণকে উইকেটরক্ষক সম্পর্কে দীর্ঘদিন চিন্তা করিতে হইতেছে। আমাদের মনে হয়, বোম্বাইর তামানের পরিবর্তে শ্রী নিবাসমকে পরীক্ষা করিলে বোধ হয় যোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হবে। ইনি যে কেবল কৃতী উইকেটরক্ষক তাহা নহেন, উপযুক্ত দৃঢ়মতিসম্পন্ন ওপনিং ব্যাটসম্যান। রজত জয়ন্তী দলের বিরুদ্ধে ইনি দুইটি ইনিংসেই দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করিয়াছেন।

ভারতীয় একাদশ ও রজত জয়ন্তী দল

ভারতীয় একাদশ ও রজত জয়ন্তী দলের চারি দিনব্যাপী খেলা নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয় ও ভারতীয় একাদশ চারি উইকেটে বিজয়ী হন। খেলার ফলাফল:—

রজত জয়ন্তী ১ম ইনিংস:—৩০৯ রান (ওরেল ১৬৫, সিম্পসন ৯৭, ব্যারিক ১৬, দীপক সোধন ৭৯ রানে ৪টি, হীরালাল ভোরা ৬২ রানে ৩টি ও ধানওয়াড়ে ৭৫ রানে ২টি উইকেট পান।)

ভারতীয় একাদশ ১ম ইনিংস:—৩৫৪ রান (শ্রী নিবাসম ৬৭, মাঞ্জরেকার ৪৫, ভোরা ২৬, পি উমরিগার ৫৮, সূর্যনারায়ণ নট আউট ৫১, এস ধানওয়াড়ে ৪১, দীপক সোধন ৪১, আর বেরী ৬৪ রানে ৩টি, ব্যারিক ৭২ রানে ২টি, ওরেল ৬২ রানে ২টি, ম্যাককনন ৭২ রানে ২টি উইকেট পান।)

খেলার মাঠে

রজত জয়ন্তী ২য় ইনিংস:—১৮১ রান (ব্যারিক ২১, লক্সটন ১৫, ফ্লেচার নট আউট ৪১, রামচাঁদ ৩১ রানে ৩টি, ধানওয়াড়ে ৪২ রানে ৬টি উইকেট পান।)

ভারতীয় একাদশ ২য় ইনিংস:—৬ উইঃ ১৩৭ রান (শ্রী নিবাসম ২৯, মাঞ্জরেকার ৩৯, জি রামচাঁদ ২৭, লাস্কারী ২২, বেরী ৪৯ রানে ৪টি উইকেট পান।)

বাংলার ক্রিকেট খেলা পরিচালনা লইয়া দ্বন্দ্ব

বাংলার ইডেন উদ্যানে রজত জয়ন্তী দলের খেলা পরিচালনা বিষয় লইয়া সি এ বি ও এন সি সির পরিচালকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছিল তাহার দ্রুত অবসান দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন, কিন্তু আমরা হই নাই। কারণ, আমরা জানি, ইহাদের দ্বন্দ্বের ঠিক কারণ কি? অর্থনৈতিক সুবিধা এক দলের হইবেও অপর দল দেউলিয়া হইয়া সেই অর্থ সমাগম দূর হইত লক্ষ্য করিবে, উপভোগ অথবা কিছুটাও হস্তগত করিতে পারিবে না, ইহাই ছিল দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ। ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা হইতেই সকল গণ্ডগোলের অবসান হইল। ইহা হইবেই আমরা জানিতাম ও সেইজন্যই বলিতে সাহসী হইয়াছিলাম যে, রজত জয়ন্তী দলের খেলা বাংলায় হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই।

রজত জয়ন্তী দলের নূতন খেলোয়াড়

ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী দলের দুইজন খেলোয়াড় ফ্রাংক ওরেল ও রামাধীন শীঘ্রই দেশের খেলার প্রয়োজনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রত্যাবর্তন করিবেন। তাঁহাদের স্থান পূরণের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অস্ট্রেলিয়ার দুইজন টেস্ট খেলোয়াড় জ্যাক আইভারসন ও বিল জনস্টনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। বিল জনস্টন অনুমতি পান নাই। শীঘ্র পাইবেন কি না, জানা যায় নাই। তবে জ্যাক আইভারসন অনুমতি পাইয়াছেন। ইনি ২৬শে ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়া হইতে বিমানে রওনা হইয়া ২৮শে কলিকাতায় পৌঁছিবেন ও খুব সম্ভব তৃতীয় টেস্ট খেলায় ভারতের বিরুদ্ধে রজত জয়ন্তী দলে যোগদান করিবেন। ফ্রাংক ওরেলের তৃতীয় টেস্টের পূর্বেই চলিয়া যাইবার কথা ছিল, কিন্তু তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ করিয়া ৪ঠা জানুয়ারী বিমানে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং এই কৃতী খেলোয়াড়ের খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা আর নাই।

বাংলা বনাম উড়িষ্যা দলের খেলা

বাংলা বনাম উড়িষ্যা দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বাংলা ৫৪০ রানে বিজয়ী হইয়াছে। বাংলা দলের কৃতী টেস্ট খেলোয়াড় পি রায় উভয় ইনিংসে শতাধিক রান করিয়াছেন। অপর খেলোয়াড় পি সেনও শতাধিক রান করেন। বোম্বাইর গুগলী বোলার এস পি গুপ্তে বাংলার পক্ষে খেলিয়া উভয় ইনিংসে মোট ১১টি উইকেট দখল করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বাংলা দলের সাফল্য প্রশংসনীয় ও আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই, তবে উড়িষ্যা দলকে "ফলো অন" করিবার সুযোগ পাইয়াও না করানর অর্থ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। দুই দিনেই খেলা শেষ করিবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অযথা শক্তিহীন দলের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করিবার সুবিধা আছে বলিয়াই খেলিতে হইবে ইহার কোনই মূল্য আমরা দিতে পারিলাম না। বাংলা দলে এস পি গুপ্তের ন্যায় বোলার না থাকিলে উড়িষ্যা দলকে যে সহজে আউট করা সম্ভব ছিল না ইহা আর কেহ না উপলব্ধি করিতে পারিলেও আমরা পারি। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যদি বাংলা দলকে ফাইনাল পর্যন্ত খেলিতে হয় তাহা হইলে এইরূপ বোলিং শক্তি লইয়া সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য ক্রিকেট পরিচালকদের চিন্তা করিয়া ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ফলাফল:—

বাংলা ১ম ইনিংস:—৪৭৯ রান (পি রায় ১৭০, পি সেন ১২৭, শিবাজী বসু ৫৫, এন পরিজা ১২৩ রানে ৩টি, এন চক্রবর্তী ৩০ রানে ২টি উইকেট পান।)

উড়িষ্যা ১ম ইনিংস:—১১৮ রান (এ এস রাও ৩২, এস পি গুপ্তে ৪৩ রানে ৬টি ও এন চৌধুরী ৪৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

বাংলা ২য় ইনিংস:—৯ উইঃ ৩২১ রান (পি রায় ১৪৩, এম সেন ৪৬, কল্যাণ মিত্র ৩২, বি ফ্রাংক ৩০, এন চ্যাটার্জি ২০, বনবাসী পট্টনায়েক ৬৫ রানে ৩টি, রামপ্রকাশ ৯৩ রানে ৩টি, এস মহাপাত্র ৩৮ রানে ৩টি উইকেট পান।)

উড়িষ্যা ২য় ইনিংস:—১৪২ রান (এন বর্ধন ১৯, এন চ্যাটার্জি ২৯ রানে ২টি, এস পি গুপ্তে ২৯ রানে ৫টি উইকেট পান।)

বোম্বাই দলের সাফল্য

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম রাউণ্ডের খেলায় বোম্বাই দল ৮ উইকেটে বরোদা দলকে পরাজিত করিয়াছে। খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হইবে আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। বরোদা দলের পক্ষে একমাত্র হাজারে শতাধিক রান করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টায় দল পরাজয় হইতে অব্যাহতি পায় নাই। বোম্বাই

দলে মানকড় যোগদান করায় বিশেষ শক্তিশালী হয়। বরোদার মহারাজার উভয় ইনিংসে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংও উল্লেখযোগ্য। বোম্বাই দলে উমরিগার, রামচাঁদ প্রভৃতি যোগদান করিতে পারেন নাই। নতুবা দল আরও শক্তিশালী হইত। খেলার ফলাফল পূর্বে হইতে বলা খুবই অন্যায় সন্দেহ নাই। তবে যতদূর আশা হয়, এইবারের রণজি কাপ বিজয়ী বোম্বাই দলই হইবে। খেলার ফলাফল :—

বরোদা ১ম ইনিংস :—১১৭ রান (বরোদার মহারাজা ৫৬, সুন্দররাম ২৯ রানে ৩টি, মানকড় ৮ রানে ২টি, সোহনী ১৯ রানে ২টি ও লিলে ৪৪ রানে ২টি উইকেট পান।)

বোম্বাই ১ম ইনিংস—২৪৯ রান (এম কে মন্ত্রী ৮৭, গোভাদিয়া ৩৫, দেশাই ৩১, ভীন ৬৭ রানে ৪টি, সি ডি প্যাটেল ৪৬ রানে ৩টি, হাজারে ৫০ রানে ৩টি উইকেট পান।)

বরোদা ২য় ইনিংস :—২৫১ রান (হাজারে ১১৬, বরোদার মহারাজা ২৪, ভি গাইকোয়াড় ২৯, লিমারে ২৭ নট আউট, সোহনী ৫৯ রানে ৩টি, মানকড় ৪৯ রানে ২টি, লিলে ৫০ রানে ৩টি উইকেট পান।)

বোম্বাই ২য় ইনিংস :—২ উইঃ ১২২ রান (মানকড় ৪২, এম আপ্তে ৩৩, এম মন্ত্রী নট আউট ২৭, দেশাই নট আউট ১৭, সি প্যাটেল ২৪ রানে ১টি উইকেট পান।)

টেবিল টেনিস

ভারতীয় টেবিল টেনিস ক্রীড়াক্ষেত্রে বাঙলাই দীর্ঘকাল শীর্ষ স্থানের অধিকারী। সুতরাং এইবারেও ত্রিবেন্দ্রামের জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার বাঙলার পরিবর্তে বোম্বাই দলকে সাফল্যলাভ করিতে দেখিয়া সতাই আশ্চর্যান্বিত হইতে হইল। এমন কি ভারতীয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ও দলের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশিত হইলেও দেখা গেল বাঙলার সেই গৌরব আর নাই। দলগত ক্রমপর্যায়ে বাঙলা বোম্বাইর পরে স্থান লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত ক্রমপর্যায় বাঙলার প্রথম দিকে নামই নাই। রণবীর ভান্ডারী বা এম ব্যানার্জি যে স্থান লাভ করিয়াছেন, তাহা বাঙলার টেবিল টেনিসের যোগ্য স্থান নহে। কেন এই শোচনীয় অবস্থা বাঙলার হইল, ইহা অনুসন্ধান হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বাঙলার টেবিল টেনিস পরিচালকগণ যদি ইহার বিহিত ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে বাধ্য হইব। বাঙলায় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের অভাব নাই। বিশিষ্ট ক্লাব ছাড়াও অলিতে গলিতে পর্যন্ত টেবিল টেনিস খেলার উৎসাহ দেখা দিয়াছে। ইহার পরও কৃতী খেলোয়াড় সংখ্যা সংগ্রহ করিতে না পারার কোনই মানে হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় ন্যাশনাল স্পোর্টস কমিটি ইংলন্ডের একজন কৃতী টেবিল টেনিস খেলোয়াড় রারেন কেনেডীকে দিল্লীতে আনাইয়াছেন। উঁহাদের ইচ্ছা ভারতের উৎসাহী টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করা। এই বিষয় ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সম্পাদককে ব্যবস্থা করিবার জন্যও আহ্বান করা হইয়াছে। নিম্নে জাতীয় টেবিল টিনেস খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—বৃটিশ টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ের সাহায্য গ্রহণ করা। নিম্নে জাতীয় টেবিল টেনিস খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল

এস কে থ্যাকার্সে (বোম্বাই) ২৫—২৩, ২১—১৩, ১৫—২১, ২১—১৯ গেমে টি তিরুভেংগদমকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

ইউ চন্দ্রাণা ও ডি পি সোমায়া (বোম্বাই) ২২—২০, ১৮—২১, ২১—১২, ২২—২৪। ২১—১৮ গেমে এম ব্যানার্জি ও রণবীর ভান্ডারীকে (বাঙলা) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

মিস সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ও রণবীর ভান্ডারী (বাঙলা) ২১—১৬, ২১—১৩, ২১—১৩ গেমে উত্তম চন্দ্রাণা (বোম্বাই) ও মিসেস বিজয়া রাজাগোপালনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল

মিস সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ২১—১২, ২১—১৬, ২১—১১ গেমে মিসেস সি কে কে পিলাইকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইনাল

মিস সৈয়দ সুলতানা ও মিসেস বিজয়া রাজাগোপালন ২১—১৫, ২১—১৫, ২১—১৪ গেমে মিস ইনী স্যামুয়েল ও মিস মীনা পারাণ্ডেকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

—শৌভিক—

পর্দায় রবীন্দ্রকাব্য মহিমা

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' নিয়ে ছবি তৈরীর কথা উঠতেই সাহিত্য ও কাব্য এবং শিল্পরসিকদের মন আশঙ্কায় ভরে উঠেছিল। বিষয়বস্তুর জন্যে নয়, যে অনুপম বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস-খানির রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন, বিন্যাসে যে অপূর্ব ললিতভঙ্গী অবলম্বন করেছিলেন সেই অনবদ্যতার মহিমা ঠিক তেমনিই রেখে পর্দার প্রয়োজনকে তুষ্ট করে সুধীজনের আদর পাবার মতো ছবি হওয়া সম্ভব বলে প্রতীত ছিল না। আবার, পর্দায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব নয় বলে যাঁরা বিশ্বাস করতেন, তারাও আশঙ্কিত হয়েছিলেন কাজটা অতীব কঠিন বলে মনে করে নিয়ে। কিন্তু যে রচনার মধ্যে প্রাণের উচ্ছ্বাস রয়েছে, মানুষের প্রকৃতি রয়েছে, সুর ও শোভার পরিবেশ ভরে রয়েছে তা ছবিতে রূপান্তরিত হওয়ার অনুপযুক্ত কি করে হতে পারে? আর, সে-রচনার মহিমাকে যদি অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত করে নেওয়া যায় তাহলে তাকে সহজভাবে ছবিতে রূপান্তরিত করায় অসুবিধেও থাকতে পারে না। দরকার শুধু আন্তরিকতার; রচনার মানটা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে দেবার ঐকান্তিক নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা থাকলে পৃথিবীর কোন রচনাকেই ছবিতে রূপান্তরিত করে তোলা কঠিনও নয়, অসম্ভবও নয়। এই নিষ্ঠা এবং মূল রচনার সুর ও শোভা মনেপ্রাণে উপলব্ধির অক্ষমতাই রবীন্দ্র রচনাকে পর্দার ছবিতে অচল প্রতীয়মান করে রেখে দিয়েছে। তা নয়তো "শেষের কবিতা"র মতো কাহিনী ও কাব্য সমন্বিত সুরঝঙ্কৃত আবেগময় এমন রচনার চিত্ররূপ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশের কোন হেতু থাকতো না। বিশেষ করে যখন রচয়িতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই একে সোজা একটা গল্প হিসেবে ধরে নেবার জন্যেই বলেছেন, আর সেভাবে ধরতে পারলে পর্দায় "শেষের কবিতা"র রূপান্তরে সত্যিই জটিলতার বাধায় আটকা পড়তে হয় না। ছবিখানি যারা তৈরী করেছেন তারা রবীন্দ্রনাথের ঐ নির্দেশই মেনে চলেছেন—সহজ গল্প হিসেবেই তারা গ্রহণ করেছেন এবং মূল রচনার কাব্যিক পরিচ্ছদ ঠিক রেখে পরিবেশনও করেছেন সহজ গল্প বলার ভঙ্গীতেই। তাই "শেষের কবিতা" সকলের আশঙ্কাকে অমূলক প্রমানিত করে একটি সচ্ছন্দ এবং ছন্দোময় সুর ও রসসমন্বিত চিত্রসৃষ্টিতে

প্রকাশ পিকচার্সের "চৈতন্য মহাপ্রভু" চিত্রের নাম ভূমিকায় ভারতভূষণ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় নবাগতা সুমিত্রা

পরিণত হতে পেরেছে। মূল গ্রন্থের পাশে ছবিখানির মধ্যে ফাঁক নজরে পড়বে, কিন্তু ফাঁকি দেবার চেষ্টা দেখা যাবে না; অসংগতি যদিও বা কিছু নজরে পড়ে তো মূল ভাবের ব্যতিক্রম নজরে পড়বে না।

*　　*　　*

সহজভাবে গল্পটিকে পরিবেশন করাতেই চিত্রনির্মাণের মধ্যে অসাধারণত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। গল্পটি কাব্যের অলংকার দিয়ে সাজানো বাস্তবেরই চেহারা। এর অমিট্, বন্যা, কিটি, সিসি লিসি, গোঁসাই, কর্তা মা, কুমার মুখো, শোভনলাল প্রভৃতি কোন চরিত্রই অবাস্তব বা অতিবাস্তব জগতের কেউ নয়। এদের প্রকৃতির মধ্যে অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই। তবে এরা অসাধারণ রূপ পেয়েছে কাব্যের সুরসংযোগে। কাব্যের ছন্দে বাঁধা সহজ মানুষেরই আবেগ ও আবেদন রয়েছে এদের মধ্যে। এদের যে সমাজ, তা আমাদেরই দেশের সমাজ, রূপক কিছু নয়, দুর্বোধ্যতাও নেই কিছু। সোজা একটি প্রেমের গল্প।

*　　*　　*

অমিত রায় বিলাত ফিরেৎ ব্যারিষ্টার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে হয়ে দাঁড়িয়েছে অমিট্ রয়। ব্যারিষ্টারি করেনা কারণ বাপ যা পয়সা রেখে গিয়েছে তাতে অধস্তন তিন পুরুষ অধঃপাতে গিয়েও ফুরোতে পারবে না। অমিটের ঝোঁক অনন্যের সন্ধানে, সমস্ত আগ্রহ জীবনের রসাস্বাদনে। উল্টো কথা আর উল্টো কাজ করাই ওর বৈশিষ্ট্য। লোকে যা প্রশংসা করে সে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথকে সে ডেমোক্রেসীর যুগে অচল বলে ঘোষণা করে দেয়। আর সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নিবারণ চক্রবর্তীকে, অবশ্য সে ব্যক্তি সে নিজেই। বেসুরো গায়িকাকে সে আবার গাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। মেয়েদের সম্পর্কে তার উৎসাহ খুব, কিন্তু আগ্রহ বিশেষ দেখা যায় না। নিজেকে অসাধারণ মনে করতো বলে মনে মনে সে যে অপরূপার মূর্তি গড়ে রেখেছিল মেয়েদের মধ্যে সেই অনন্যাকে পাবার চেষ্টা করতো। এইভাবে সে অক্সফোর্ডে থাকাকালে কিটির প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিটির হাতে তার প্রণয়ের অংগুরীও পরিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিটির মধ্যেও সে তার অপরূপাকে হারিয়ে ফেললে। ছবিতে

গত মংগলবার মার্কাস স্কোয়ারে উদ্বোধিত কমলা সার্কাসের একটি দুঃসাহসিকা শিল্পী। স্নায়ুকে কাঁপিয়ে তোলার মতো রোমাঞ্চকর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু খেলার সমাবেশের দিক থেকে সার্কাসটি সমগ্র প্রাচ্যের মধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের শিল্পীদের অধিকাংশই তরুণী এবং ভারতীয়

গল্পের আরম্ভ এইখান থেকেই। রিমি বোসের বাড়ীতে পার্টি। সব মেয়ে আর মায়েদের লক্ষ্য অমিটের ওপরে। অমিট্ মন বসাতে পারে না কারুরই ওপরে এমনকি কিটিকেও সে উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল। কলকাতায় এদের মধ্যে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে অমিট্ নির্জনতার সন্ধানে শিলং গেলো। পথের বাঁকে অমিটের গাড়ী ধাক্কা লাগালে সামনের গাড়ীর সংগে। সামনের গাড়ী থেকে নামলো লাবণ্য।

[illegible]ষ্টিতেই যেন অমিট্ তার অনন্যাকে পে[illegible]লো। লাবণ্যর বাড়ীতে যাতায়াত চললো প্রতিদিন। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হলো। অমিতের কাছে লাবণ্য হলো বন্যা, আর লাবণ্যর কাছে অমিত হলো মিতা। একদিন অমিত নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করলে, প্রস্তাব স্বীকৃতও হলো। এই সময়েই অমিত লাবণ্যর কাছ থেকে একটি ভীরু ছেলের কাহিনী শুনলে। শোভনলাল লাবণ্যর বাবার কাছে পড়তে আসতো, লাবণ্যকে ভালোও বাসতো, কিন্তু সাহস ছিল না তা স্পষ্ট করে জ্ঞাপন করার। একদা লাবণ্যই শোভনলালকে অপমান করে বিদায় দিয়েছে। লাবণ্যকে নিয়ে অমিতের স্বপ্নের আর অন্ত নেই; বিয়ের আর কটা দিন মাত্র বাকী। এই সময়ে অমিতের বোন সিসি খবর পেয়ে কেটিকে সংগে নিয়ে শিলংয়ে এসে উপস্থিত হলো। লাবণ্য কেটির সংগে অমিতের পূর্বপ্রণয় ও প্রতিশ্রুতির অংগুরীয় দেখলে। এরপর অমিতের সংগে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেলো, এবং কিটিকেই গ্রহণ করার জন্য সে অমিতকে নির্দেশ দিলে। লাবণ্যের জীবনে আবার এসে উদয় হলো সেই ভীরু শোভনলাল।

*　　*　　*

বেশ সোজাভাবেই বলা গল্প এবং বলার মধ্যে চমৎকারিত্বের কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে। গল্পের অসাধারণত্ব প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত মনকে নিবিষ্ট রেখে একটা অনুরাগ সৃষ্টি করে দেয়। সাধারণ চলচ্চিত্রের দৃষ্টিসচকিত দুরন্ত ঘটনার সমাবেশ এতে নেই; এতে আছে কাব্যসমাহিত ভাষায় ভাব ও প্রকৃতির বিকাশ। সংলাপই এর বড়ো কথা, আর রবীন্দ্রনাথের সংলাপ অপার রসসাগরে মনকে নিমজ্জিত রেখে দেয়। ভাষা আর বলার ভংগীর ওপরেই এর নাটকীয়তা গড়ে উঠেছে। কাহিনীর আংগিক বৈশিষ্ট্যের সংগে ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যে সুসংগত পরিবেশ সৃষ্টির দিক থেকে চিত্রনাট্যরচনা ও পরিচালনায় একটা অনন্যসাধারণ কাব্যিক ও শিল্পিক অনুভূতির স্পর্শ লাভ করা যায় এবং এ অনুভূতিটা কলা-কৌশলেরও সর্বদিকেই অতি পরিস্ফুট। যা বহুর কাছে ছিল অভাবনীয় তা কাহিনীর বৈচিত্র্য, বিন্যাসলালিত্য এবং কলাকৌশলের সৌকুমার্যে পরি-

চালক মধু বসু একটি পরম বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ আবেশময় কাব্যমহিমায় পর্য্যবসিত করে তুলেছেন। ছবিখানির শেষের দিকে একটা খোঁচ অবশ্য মনে লাগে। সেটা হচ্ছে, কিটির সংগে অমিতের প্রণয়ের কথা জানবার পর লাবণ্য ও অমিতের যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো ছবি যেন ঐখানেই শেষ হয়ে যায়। এর পরে অমিতের কিটিকে গ্রহণ করে লাবণ্যের কাছে তাদের বিবাহের বার্তা পাঠানো; বা, লাবণ্যর জীবনে আবার শোভনলালের উদয়ে ওদের মিলন বার্তা অমিতকে পাঠানোর অধ্যায়টির প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। কারণ তা নাহ'লে অমিত ও কিটির জীবনের পরিপূর্ণতাকে সামনে তুলে ধরা যেত না। কিন্তু এই যে পরবর্তী অধ্যায় সেটা যেন এসে পড়েছে একটি স্বতন্ত্র আখ্যানের রূপ নিয়ে। এ অধ্যায়টিতেই অমিত ও লাবণ্যের জীবন-কাহিনীর পরিণতি ব্যক্ত হয়েছে, এটা দরকারও, কিন্তু বিন্যাস ত্রুটিতে কেমন যেন বাহুল্য মনে হয় এ অংশটি।

বলা বাহুল্য অমিতই এ কাহিনীর সব। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অমিতের সে ব্যক্তিত্ব, সেই অসাধারণত্বের ছটা ছবির এই অমিতের মধ্যে নেই, কিন্তু এ অমিতকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। চরিত্রটির ভাবব্যঞ্জনায় নবাগত নির্মলকুমারের আবৃত্তি সুলভ বাচনভংগী বেশ কাজে এসেছে এবং সেই জোরেই তিনি অমিতকে অনেকখানি প্রদীপ্ত করে তুলতে পেরেছেন। লাবণ্যর ভূমিকায় দীপ্তি রায়ই অভিনয়ের দিকটায় সবচেয়ে চিত্তস্পর্শী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এটি তারও সমগ্র চিত্রাভিনয়ে শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রন বলে অভিহিত করা যায়। কিটি, সিসি, লিসির বিপরীত প্রকৃতির চরিত্র, লাবণ্যর শান্তসমাহিত অথচ ব্যক্তিত্বে দুর্নিবার আকর্ষণশক্তি সম্পন্ন চরিত্র যা অমিতের মতো চরিত্রকে কাছে টেনে নিতে পেরেছে তাকে সংযত অভিব্যক্তিতে ও দরদী বাচনভংগীতে ফুটিয়ে তোলায় দীপ্তি রায় অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়ের দিকটায় কিটিই যা ছন্দোপাত ঘটিয়েছে, তাকে বড়ো বয়েসী বলে দেখায়। এ চরিত্রটি রূপায়িত করেছেন সাধনা বোস। অভিনয়ে আর সকলেই বেশ একটা মান রেখে গিয়েছেন, তবে বিশেষভাবে প্রশংসা করার জন্য নাম বেছে নিতে গেলে কুমার-মুখোর ভূমিকায় উৎপল দত্ত, গোঁসাইয়ের ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার, নরেনের ভূমিকায় বীরেন চট্টোপাধ্যায়, যোগমায়ার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী ও মিসেস ঘোষালের ভূমিকায় রেবা বসুর নাম চট্ করে মনে করা যায়। আর এতে অভিনয় শিল্পীদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, কালি সরকার, বনানী চৌধুরী, সমর রায়, শোভা সেন, নীলিমা দাস, রেণুকা রায়, মিহির ভট্টাচার্য, ডাঃ হরেন প্রভৃতি। এরা থাকাতেই চরিত্রগুলির অভিনয় বেচাল হতে পারেনি।

* * *

কলাকৌশলের দিক থেকে ছবিখানি কলকাতার ষ্টুডিওর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের নিদর্শন। আলোকচিত্রে জি কে মেহতা শিলংয়ের দৃশ্য সামনে তুলে ধরে ছবিখানিকে শোভান্বিত করে তুলেছেন, তেমনি আভ্যন্তরীন দৃশ্যরচনা ও পরিবেশানুগ আলোকসম্পাতে শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। চারখানি রবীন্দ্র সংগীত ছবির সম্পদের অংশ। রবীন্দ্র সংগীত পরিচালনা করেছেন অনাদি ঘোষ দস্তিদার এবং আবহসংগীত কালিপদ সেন। শিল্প-নির্দেশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কার্তিক বসু। লোকেন বসু এতে শব্দযোজনা করেছেন।

কল্পনার শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে বাঙলাতে "নিমাই সন্ন্যাস", "শ্রীগৌরাঙ্গ" ও "বিষ্ণুপ্রিয়া" নামে খানতিনেক ছবি এ পর্যন্ত তৈরী হয়েছে এবং একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে এই ছবি তিনখানির যখন যেখানি তোলার কথা প্রচারিত হয়েছে সংগে সংগে দেবকীকুমার বসুরও ঐ জীবনীটি নিয়ে একখানি ছবি তোলার পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছে। এবারও বম্বেতে "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু" তোলার কথা উঠতেই দেবকীকুমার তার "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" তোলার পরিকল্পনা জ্ঞাপন করেন। এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে একখানি ছবি তোলার অভিলাষ দেবকীকুমারের মনে স্থান পেয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক

তিনি তার পরিকল্পনাকে কার্যকরি করে তুলতে পারেননি। এতদিন পর তিনি সেই সুযোগ হাতে নিয়েছেন। এবং হিন্দীর সংগে পাল্লা দিয়ে জনসমক্ষে আগে হাজির করে দেবার তাগিদে তিনি মাত্র মাস তিনেকের মধ্যেই ছবিখানি তোলা শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য সময়ের পরিমাপে ছবির উৎকর্ষ নির্ধারিত হয় না, তবুও এখানে সে কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার পড়লো। তার কারণ চৈতন্যদেব বাঙলার ইতিহাসের অনেকখানিই অধিকার করে আছেন। উত্তরকালের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত তার প্রভাবেই মূর্ত হয়ে রয়েছে। এ প্রভাব বাঙলার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অলৌকিক ও অতুলনীয় কীর্তিবহুল বিরাট জীবন কাহিনী তাঁর; তাড়াহুড়ো করে শেষ করার উপায় নেই। সে ইতিহাসের সংগে মিল রেখে ছবি তুলতে গেলে সময় না লেগে পারে না।

* * *

দেখা গেল দেবকীকুমার বসু ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেবার মতো করে ছবিখানি তোলেন-নি। ছবির জন্যে গল্প একটা তিনি তৈরী করে নিয়েছেন, কিন্তু সেটা মূলতঃ তার নিজেরই কল্পনাপ্রসূত। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি চৈতন্যের মতবাদ ও ভাবধর্মকে প্রকাশ করার চেষ্টাই করেছেন। প্রকৃত মনুষ্যত্বতে জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চৈতন্যের যে ব্যাকুলতা - মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, থাকবে কেবল প্রেম ও মৈত্রীর সম্পর্ক—এইটাই হচ্ছে দেবকীকুমার বসু পরিকল্পিত কাহিনীর প্রতিপাদ্য। চৈতন্যের জীবনের এটা একটা দিক, কিন্তু তা দেখবার জন্য চৈতন্যের জীবনীর বাইরে গিয়ে কল্পনা থেকে কিছু আমদানীর প্রয়োজন ছিল না। যা ইতিহাস হয়ে রয়েছে তাকে পরিহার করে কাল্পনিক কিছু নিয়ে আসা মানে সত্যেরই অপলাপ। চৈতন্যদেবের সাম্য ও মৈত্রীর যে বাণী তাঁর জীবনের ঐ দিকটাই ছবিখানিতে পাওয়া যায় এবং তা মর্মেও পৌঁছয়, কিন্তু ওর সংগে ইতিহাসের কোন যোগ টেনে আনা চলে না।

* * *

গল্প আরম্ভ হয়েছে অস্পৃশ্যতার করুণ ঘটনা নিয়ে। নবদ্বীপের পথ দিয়ে ক'জন ব্রাহ্মণ হোমাগ্নি নিয়ে চলেছে। অন্ধ গুহক চণ্ডালের ছেলে বেণু পিতার হারানো দৃষ্টি ফিরে আনার বিশ্বাসে হোমাগ্নি স্পর্শ করতেই ব্রাহ্মণ চাপাল-গোপালের কোপ পড়লো বালকের ওপরে। ঠিক তখনি এক নটির শিবিকা এসে দাঁড়ালো পথ রোধ করে; পতিতা ব'লে ব্রাহ্মণরা তাকে পথ ছেড়ে দিতে বললে। কিন্তু নটি তা না শোনায় ব্রাহ্মণরা জগন্নাথ ও মাধবের স্মরণাপন্ন হলো। নগর কোটালের লোক এসে নটির বাহকদের প্রহার করে সরিয়ে দিলে। ব্রাহ্মণরা জানালে, চণ্ডাল বালক বা নটি স্পর্ধা পেয়েছে বৈষ্ণবদের প্ররোচনায়। এর পরই অত্যাচার আরম্ভ হ'লো বৈষ্ণবদের ওপরে। ঐ সময়ে নবদ্বীপে এলেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও ঈশ্বরপুরী। নটি অপমানিতা হয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে রাজা সুবুদ্ধি রায়ের এক ব্রত উদ্‌যাপনে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত সহস্র পদ্ম দান করে যেতে চাইলে। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বদলে নটি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে দান করতে চাইলে। নিত্যানন্দ বললেন, দীন হীন অস্পৃশ্য অনাথ আতুররাই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব এবং তিনি তাদেরই হাতে সোনার সুতোয় বাঁধা পদ্ম তুলে দিলেন। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণরা নগর-কোটালের স্মরণাপন্ন হ'লো। পাইক এসে মারধোর করে ওদের হাত থেকে পদ্ম কেড়ে নিলে। নটি নিজেকে বৈষ্ণবদের ওপর লাঞ্ছনার উপলক্ষ্য মনে করে আত্মবিসর্জন দিতে চাইলে। কিন্তু নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের আগমনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে বললেন তাকে। নিমাই ফিরলেন গয়া থেকে, মুখে অহোরহ কৃষ্ণ নাম। মাতা শচী দেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া এই ভাববৈলক্ষণ্যে বিচলিত হলেন। ব্রাহ্মণদের উস্কানিতে নগরকোটাল হুকুম দিলে, ঘরে ঘরে যেন কীর্তন না হয়। শ্রীচৈতন্য এটাকে শুভ ব'লেই মনে করলেন, কারণ ঘরের আগল ভেঙে নামগান ছড়িয়ে পড়বে পথে পথে। পথে নামগান বন্ধ করতে গিয়ে নগর-কোটাল জগাই মাধাই নিজেরাই কৃষ্ণভক্ত হয়ে পড়লো। চৈতন্যের শিক্ষাগুরু গদাধর মিশ্র নামগান সনাতন ধর্মবিরোধী বলে বাধা দিতে এলেন। নামের মাহাত্ম্য দেখাবার জন্যে তাকে শ্রীবাসের অংগনে এনে বসানো হ'লো। নামগানে সবাই মাতোয়ারা, সেই গৃহেই তখন মৃত্যু হ'লো শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রের। শোকার্ত মাতা ছুটে আসেন চৈতন্যের কাছে মৃত পুত্র কোলে নিয়ে। চৈতন্য কৃষ্ণনাম নিয়ে মৃত শিশুর মুখ দিয়ে জানালেন, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, মাতা নাই, আছেন শুধু ভগবান। গদাধর মিশ্র চমৎকৃত হলেন। এরপর চললো চৈতন্যকে নানাভাবে পরীক্ষা। ব্রাহ্মণ প্ররোচিত ব্যাধ তীরবিদ্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হ'লো। তান্ত্রিক সর্পবিষ পান করতে গিয়ে ব্যর্থ হ'লো। গুহক চণ্ডাল পুত্র বেণুর মৃত্যু হ'লো। গুহক পত্নী শিউলী বরাবরই চৈতন্যের বিরোধী ছিল,

এবার সে চৈতন্যকে অভিসম্পাত দিলে, মায়ের ব্যথা বুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার! এই অভিশাপের মধ্যেই চৈতন্য পথের সন্ধান পেলেন। সংসার ত্যাগ করে মানুষের দ্বারে দ্বারে নাম প্রচার করে বেড়াতে পারবেন তিনি এবার! হাহাকার ক'রে ওঠেন শচীমাতা, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু সব বন্ধন মুক্ত করে নিখিল বিশ্বপ্রেমের চিরন্তন প্রতীক হয়ে চৈতন্য একদিন গৃহত্যাগ করলেন।

ছবির নাম থেকে যাই মনে হোক, এতে গয়া যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত থেকে নিমাইয়ের জীবনকাহিনী আরম্ভ হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার অংশ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হবার পর বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করতে থাকেন, কিন্তু চিত্র-কাহিনীটিতে তা আগেই এনে ফেলা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই কল্পিত কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

* * *

কাহিনীর বিন্যাসে এলোমেলো ভাবটা অতিভক্ত বৈষ্ণবের মনেও বীতরাগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। জায়গায় জায়গায় গল্প বেশ খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। শ্রীবাস অঙ্গন, নিমাইয়ের বাসগৃহ এবং কোটালের গৃহ আর তার সামনের পথ ছাড়া দৃশ্য নেই। একই জায়গায় যেন সব ঘটনাই ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে। দেবকীকুমার বসু যে কথাটা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন তার সর্বজনীন আবেদন প্রভূত; চমৎকার কথায় তা তিনি বলতেও চেয়েছেন, কিন্তু তার জন্যে যে যথাযথ আঙ্গিক পারিপাট্য দরকার সেদিকটা যেন উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে। কীর্তন হবার কথা ছিল এছবির বিশিষ্ট সম্পদ কিন্তু সেদিক থেকেও মন নৈরাশ্যে ভরে ওঠে। খান দুই গান, মনে হলো সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া, তাই যা উপভোগ করা যায়। তাছাড়া দু' এক পদ করে অসংখ্য গানের মুখটুকুই আছে, তৃপ্তি পাবার মতো পরিপূর্ণতা কিছু পাওয়া যায় না।

* * *

চৈতন্যের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী চেহারা ও অভিব্যক্তির দিক থেকে কয়েক স্থানে মনকে অভিভূত করে তোলেন। অল্পকথার ক্ষেত্রে তিনি মোহিত হবার মতো ব্যক্তিত্ব যথাযথ ধরে রাখতে পেরেছেন, কিন্তু সংলাপ দীর্ঘ হলেই সে' ব্যক্তিত্ব কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে অন্যরকমের, লোকের ধারণার ব্যতিক্রম। এ চরিত্রতে অভিনয় করেছেন সুচিত্রা সেন। অনুভা গুপ্তাকে ভূমিকালিপিতে রাখার জন্যই যেন চণ্ডাল পল্লী শিউলী চরিত্রটির সৃষ্টি; বিচিত্র তার আচরণ। নটির ভূমিকায় নবাগতা নমিতা সিংহকে আড়ষ্ট লাগতে পারে, তবে অতো ছোট্ট ভূমিকার অভিনয়ে ক্ষমতা বিচার করা চলে না। নিত্যানন্দের ভাবালুতা ফোটাতে গিয়ে পাহাড়ী সান্যাল চরিত্রটিকে হাল্কা করে ফেলেছেন। তার ওপর কার মুখে একেবারে আলাদা স্বরের গান কানে বড়ো লাগে। অন্যান্য বহু চরিত্রে অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে আছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস, রবি রায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, ভূপেন চক্রবর্তী, বেচু সিংহ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, গোকুল মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ। কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্র-গ্রহণে বিশু চক্রবর্তী, শব্দযোজনায় লোকেন বসু, শিল্পতত্ত্বাবধানে সৌরেন সেন, শিল্পনির্দেশে কার্তিক বসু এবং সুরযোজনায় কমল দাশগুপ্ত ও গোবিন্দগোপাল।

জাতীয় নাট্য পরিষদ

গত শনিবার ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সেণ্ট টমাস স্কুল হলে জাতীয় নাট্যপরিষদ তিনটি একাঙ্কিকা অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। ইতঃপূর্বে এঁদের এই একাঙ্কিকার অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। যে পথে এঁরা পা বাড়িয়েছেন—সে পথে এঁদের সাফল্যও সুনিশ্চিত বলে মনে হয়। এঁদের অনুষ্ঠান দেখে এইটুকু বোঝা গেল যে ভাল নাটিকা বেছে নেবার মত রসসমৃদ্ধ মন আছে এঁদের, নতুন প্রয়োগ নৈপুণ্যের দিকে ঝোঁক আছে, অভিনয়ে আছে শক্তি ও আন্তরিকতা। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে এটাও জানা গেল যে, এঁরা একাঙ্কিকার অভিনয় নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। সেটাও নিঃসন্দেহে আশার কথা। নাট্যরূপ হিসাবে একাঙ্কিকা অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও বটেই, বাংলা সাহিত্যেও বেশ খানিকটা অবজ্ঞাত। অথচ সুলিখিত ও সুঅভিনীত হলে ক্ষুদ্রাবয়ব একাঙ্কিকাও যে দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখতে পারে তার পরিচয় পাওয়া গেল জাতীয় নাট্যপরিষদের সেদিনের দুইঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে। এঁদের এ প্রয়াস যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে তার পরোক্ষ প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উপরও পড়তে পারে অর্থাৎ সাহিত্যের অন্যতম শিল্পরূপ হিসাবে একাঙ্কিকা তার নিজস্ব স্থান করে নিতে পারে।

এঁদের অভিনীত তিনটি একাঙ্কিকার একটি শ্রীমতী চিত্রিতা গুপ্তা রচিত ও পরিচালিত 'শিল্পী' এবং অপর দুটি 'শহীদ' ও 'মানসী'র রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীতরুণ রায়—যিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও অভিনেতা। তিনটি একাঙ্কিকার রসও বিভিন্ন ধরণের। সূর্য মিত্র নামে খেয়ালী এক শিল্পীর জীবন নিয়ে লেখা 'শিল্পী'তে ব্যঙ্গের অবকাশ কিছু থাকলেও এর মূল রস গম্ভীর ও করুণ। পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণে পীড়িত শিল্পী মন ও তাকে ভালবেসে মালবীর যে দুঃসহ বেদনা তা দর্শকমনকে গম্ভীরভাবে ছুঁয়ে যায়। লেখিকার সংলাপ রচনার শক্তিও প্রশংসনীয়। অপরপক্ষে 'শহীদ' একটি রাজনৈতিক ব্যঙ্গ নাটিকা—আজকাল কথায় কথায় কারণে অকারণে যে অনশন ধর্মঘট করা হয় তারই একটা ব্যঙ্গাত্মক প্রতিচ্ছবি। তৃতীয় একাঙ্কিকা 'মানসী' নেহাৎই একটি উদ্দেশ্যবিবর্জিত প্রহসন—প্রেমের নামে পুরুষেরা যে আত্মপ্রতারণা ও ছলনা করে তারই হাল্কা নাট্য রূপায়ন। তিনটি একাঙ্কিকার অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় এক। অভিনয়ে প্রায় প্রত্যেকের উৎকর্ষই চোখে পড়বার মত। অভিনয়ে বিশেষ করে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন তরুণ রায়, স্বপ্না রায়, ধারা রায়, ধ্রুব গুপ্ত, লালা আলম, সুলভ মুখার্জি ও পরিমল রায়। এক-একটি দৃশ্যেই এক-একটি একাঙ্কিকার পরিসমাপ্তি। দৃশ্যসজ্জার আড়ম্বর ছিল না, বাঁধা ধরা সংগীতের অত্যাচার ছিল না—তবু সুন্দর অভিনয়ের গুণে ও সুষ্ঠু প্রয়োগ নৈপুণ্যে অভিনয়ানুষ্ঠান উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। সৌখীন নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে ভবিষ্যতে আরও কিছু আশা করতে পারি—এঁদের তিনটি একাঙ্কিকার অভিনয়ে এই প্রতিশ্রুতিই সেদিন পেলাম। "বসুবন্ধু"

শ্রীলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রথম ভক্তিমূলক চিত্র নিবেদন "মা লক্ষ্মী"-র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণী মায়ের মন্দিরে সুসম্পন্ন হয়েছে। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীকিরীটিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চিত্রের পৌরাণিক অংশ রচনায় প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত বৈষ্ণব দর্শনাচার্য শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয় প্রভৃত সাহায্য করেছেন। চিত্র গ্রহণের কাল আগতপ্রায়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৭ই ডিসেম্বর—অদ্য লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রীর সংসদ সচিব শ্রীসাদাৎ আলী খাঁ জানান যে, ১৯৫৩ সালের ১২ই নবেম্বর তারিখে পূর্ণিয়া জিলার মণ্ডলবস্তি গ্রামে জনৈক পাকিস্থানী পুলিশের গুলীতে জনৈক ভারতীয় নিহত হয়। করাচীস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার এই সম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাবড়া-বৈগাছিতে একটি বাজার নির্মাণের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এই বাজারে ২২১টি দোকান থাকিবে। পরিকল্পনার রূপায়নের জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

৮ই ডিসেম্বর—উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে আবর পাহাড়ে গত অক্টোবর মাসে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, উহার জন্য দায়ী তাগিনদের শাস্তি দিবার জন্য নিয়োজিত সৈন্যবাহিনী ও আসাম রাইফেল বাহিনীর সৈন্যদল তাগিন অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় পার্বত্য অধিবাসিগণ কোন বাধা দেয় নাই।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ রাজ্য পরিষদে বলেন, চীনা গবর্নমেণ্ট কাশগড়ে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলকে স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সিংকিয়াং নিষিদ্ধ অঞ্চল, এজন্য কোন বিদেশী মিশনের সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আগামী জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় "বি সি রায় পলিও ক্লিনিক ও অপঙ্গ শিশু হাসপাতালের" উদ্বোধন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতে এই হাসপাতালটি এই শ্রেণীর হাসপাতালের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে।

৯ই ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত একটি বিল গৃহীত হয়। এই বিল অনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা চন্দননগর এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইবে।

আজ রাজ্য পরিষদে শ্রমিক-মালিক বিরোধ (সংশোধন) বিল সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে শ্রমমন্ত্রী শ্রী ভি ভি গিরি স্বীকার করেন যে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ আইন অনুযায়ী বার্তাজীবীদের ন্যায় কয়েক শ্রেণীর কর্মীকে "শ্রমিক" আখ্যা দেওয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কাটজু আজ লোকসভায় বলেন, সম্প্রতি আলিগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনে যে সব ব্যক্তি জনসাধারণকে হিংসাত্মক আচরণে লিপ্ত হইবার জন্য উত্তেজিত করিয়া বক্তৃতা করেন, তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

১০ই ডিসেম্বর—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রী এস এন অগ্রবাল প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিপজ্জনক সম্ভাবনার বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলার জন্য কংগ্রেসের সকল ইউনিটকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

ভারতের বিখ্যাত বৈমানিক ক্যাপ্টেন নামযোশী বাঙ্গালোরে এক বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, গোয়ায় কয়েকশত সৈন্য ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করার সঙ্গে সঙ্গে গোয়ার বিভিন্ন সামরিক শিবিরে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। কয়েকজন পর্তুগীজ ইউরোপীয় সার্জেণ্ট ও অফিসার ছাড়া এই নূতন সৈন্যদলের সকলেই নিগ্রো।

১১ই ডিসেম্বর—আজ দেরাদুনে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে সামরিক চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনায় গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি পাইলে, শুধু ভারতে নহে, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্য-দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণাপ্পা বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের রেশনিং মিটাইবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ চাউল সরবরাহ করিবেন। এজন্য প্রতি মাসে ২০—৩০ হাজার টন চাউল প্রয়োজন হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাবের দ্বারা চন্দননগরের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির বিরুদ্ধে 'বিভেদ সৃষ্টিকারী' শক্তিসমূহের সহিত সহযোগিতা করিয়া কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ও শৃঙ্খলাভঙ্গ করিবার জন্য চন্দননগর কংগ্রেস কমিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর—গতকল্য শেষ রাত্রে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন কর্পোরেশনের একখানি মাদ্রাজগামী যাত্রিবাহী নৈশ বিমান নাগপুর বিমান বন্দর হইতে আকাশে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই ভূপতিত ও আগুন ধরিয়া ধ্বংস হয়। ফলে বিমানের ১০ জন যাত্রী ও তিনজন যন্ত্রী নিহত হইয়াছেন। একমাত্র বিমানের চালক রক্ষা পাইয়াছেন। নিহতদের মধ্যে ভারতীয় সংসদ সদস্য ও ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রী অন্যতম।

১৩ই ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য বিমানযোগে কলিকাতায় উপনীত হন। কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, পুনরায় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে ভারতবর্ষের পক্ষে বিচ্ছিন্ন থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বিশেষ করিয়া পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির সংবাদে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াই প্রধান মন্ত্রী ঐ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন।

ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এলেন আজ নয়াদিল্লীতে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদনের সময় এই চুক্তি সম্পর্কে ভারতের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ও বিবেচনা করিবে।

বিদেশী সংবাদ

৮ই ডিসেম্বর—বারমুডায় ত্রি-শক্তির রাষ্ট্রনায়কগণ অদ্য সকালে বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের চারিদিনব্যাপী অধিবেশন শেষ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র বার্লিনে রাশিয়ার সহিত আলোচনা করিতে তাঁহারা সম্মত হইয়াছেন। আগামী ৪ঠা জানুয়ারী যাহাতে বার্লিনে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠক আরম্ভ হয়, তজ্জন্য পাশ্চাত্য ত্রি-শক্তি অদ্য রাশিয়ার নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতায় করাচীর রাজনীতিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং শহরের রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে।

বৃটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ অলিভার লিটলটন অদ্য কমন্স সভায় বলেন, কেনিয়ায় মাউ মাউ দমন অভিযানের ফলে গত ১লা জানুয়ারী হইতে ২৮শে নবেম্বর পর্যন্ত ২,৮২২ জন আফ্রিকান নিহত হইয়াছে।

১০ই ডিসেম্বর—ইন্দোচীনে ফরাসী ও লাওসিয়ান সৈন্যবাহিনী গতকল্য লাওসের রাজধানী লুয়াং প্রাবাং-এর অনুমান ৭০ মাইল উত্তর-পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ ডিয়েংমিন ঘাটি দখল করিয়াছে বলিয়া আজ ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির প্রতিবাদ জানাইয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন সরকার যে লিপি পাঠাইয়াছিলেন, পাকিস্থান সরকার তাহা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া করাচীর ইংরেজী সাপ্তাহিক "কমেণ্ট" পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৴৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
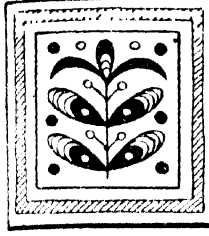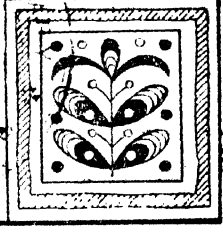
শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান জননী, ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জননী, বিশ্ব-জননীর আবির্ভাবস্বরূপিণী জননী সারদেশ্বরীর শ্রীচরণে আমরা তাঁহার শত-বার্ষিকী জন্মতিথি উপলক্ষে অশেষ প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। অমৃতবিধায়িনী তিনি। ভারতের মহীয়সী নারীর মুখ হইতে একদিন এই অমৃতের জন্য একান্ত আকিঞ্চন অভিব্যক্ত হইয়াছিল—'যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্য্যাং?' 'যাহা দ্বারা অমৃত লাভ হয় না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?' কোথায় এই অমৃত? চারিদিকে তো আমরা মৃত্যুরই বিভীষিকা দেখিতেছি। ঋষিকণ্ঠে অভয় বাণী ঝঙ্কৃত হইল—তাঁহারা বলিলেন, আছে অমৃত—তাহাই ঋত, তাহাই সত্য এবং সেই অমৃতেই জগৎ প্রসূত। কিন্তু সে অমৃত নিহিত রহিয়াছে কোথায়, কিভাবে? উপনিষদের বাণী, স্ব মহিমায়। বিশ্বের যিনি বীজ, তিনি নিজেকে নিজে আস্বাদন করিতেছেন। আর এই নিজবোধের বিস্তারেই অমৃতের সঞ্চার। এই প্রয়োজনে তাঁহাকে এক হইয়াও দুই হইতে হইতেছে। তিনি একাকী লীলা করিতে পারেন না। আর লীলা না হইলে ধর্মের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নহে। এক-ই দুই এবং দুই-ই এক, ভারতের অধ্যাত্মসাধনার এই তত্ত্বই আদি বীজ—নিজ বীর্যবৈভব। আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্তলীলায় ভারতের এই তত্ত্বই প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে ছাড়িয়া সারদেশ্বরী নাই। আর জননী সারদেশ্বরীকে ছাড়িয়া তাঁহার লীলামৃতরস আস্বাদন করাও সম্ভব নহে। শিবশক্তির এইভাবে যুগল মিলন, ইহাই ছিল এ যুগের প্রয়োজন; নহিলে ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে না, বিভ্রান্ত জগৎ মৃত্যুর দিকে যায়, ধ্বংসে পরিণত হয়। ঠাকুরের লীলায় যুগল-মিলনের এই মাধুরী এবং ইহার অন্তর্নিহিত চাতুরী, আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। নিতান্ত সাধারণ হইয়াও অসাধারণ মায়ের লীলা। বিশ্ব-জননীর অপ্রাকৃত নিরাবরণ চিন্ময় মূর্তি মা। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে মাতৃত্বই নারীতে সত্য, এই নিত্য লীলাই তিনি প্রকটিত করিয়াছেন, মাধুর্যে, মর্যাদায়, তেজে এবং তপস্যায়। নিত্য সমুন্নত মাতৃ-মহিমা আমরা সে লীলায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে মহিমা দেশ, কাল এবং পাত্রে অনাহত। আধুনিক এবং প্রাচীন, সব লইয়া নারীত্বের সে আদর্শ সনাতন। বস্তুত মাকে উপেক্ষা করিয়াই আমাদের যত দুর্গতি। আমাদিগকে এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্ব-জননী যিনি, তিনিই সারদেশ্বরীরূপে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া ডাকিয়া-ছিলেন আমাদিগকে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-লীলাই এই ডাক—পরম স্নেহের বাণী। সে বাণী আমাদের শ্রবণে বাজিয়া উঠুক, ফুটুক লীলা। তবেই মাকে পাইব এবং মাকে পাইয়া কৃতার্থ হইব। আমাদের ভয় ভাঙিবে, দুর্বলতা দূর হইবে। নিত্যানন্দ-করী, বরাভয়করী জননী সারদেশ্বরীর শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা। জাগ্রত হোন, তিনি ধাত্রী, পালয়িত্রী এবং রক্ষয়িত্রীস্বরূপে। তাঁহার নিত্য আবির্ভাব আমাদের জীবনে সত্য হোক্।

ভেজাল ঔষধের কারবার

ভেজাল ঔষধের কারবার দেশ ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যবসায়ের লাভ প্রচুর, অথচ সে তুলনায় বিপদের ঝুঁকি কম। সম্প্রতি ভারতের ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি সভা এসো-সিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স এই বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা গভর্নমেণ্টকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভেজাল ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় যেন একটি পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং উক্ত শ্রেণীর অপরাধের জন্য শাস্তির পরিমাণ যেন বৃদ্ধি করা হয়। বস্তুত এই শ্রেণীর যে সকল ব্যবসায়ীরা দেশের যেরূপ সর্বনাশ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে এদেশের গভর্নমেণ্ট যদি যথোচিত সতর্ক হইতেন, তবে অপরাধীরা অনেকটা সায়েস্তা হইয়া আসিত। কিন্তু এই শ্রেণীর অপ-রাধের গুরুত্ব এদেশের বিচারালয়ে স্বীকৃত হয় না। পরন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই অপরাধীরা লঘু শাস্তি পাইয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রেই ইহারা ধরা পড়ে না; কিংবা ধরা পড়িলেও পুলিশকে কিছু উৎকোচ দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। সুতরাং এমন লাভের ব্যবসা সহজেই যে জমিয়া উঠিবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? দুই বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই শ্রেণীর

অপরাধ দমনকল্পে ড্রাগ অ্যাক্ট সংশোধিত করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু এতাবৎকাল পর্যন্ত তাহা পালিত হয় নাই। এইরূপ একটি মারাত্মক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শাসকবর্গের ঔদাসীন্য বিশেষভাবেই নিন্দনীয়।

পাক-মার্কিন চুক্তি

যতই দিন যাইতেছে, পাকিস্থানের সঙ্গে আমেরিকার চুক্তির প্রশ্নটি ততই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ নানা প্রকার স্বীকৃতি, অস্বীকৃতি ও অস্পষ্ট স্বীকৃতির প্রহেলিকা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। তবে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি করাচীর সাংবাদিকদের বৈঠকে এ সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাপারটা কিছু স্পষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন, মার্কিন সামরিক সাহায্য সম্পর্কে আমাদের ঘরোয়া আলোচনা হইয়াছে, তবে এখনও তাহা চূড়ান্তরূপে স্থির হয় নাই। এই প্রসঙ্গে জনাব মহম্মদ আলী পাকিস্থানের রাজনীতিকদের চিরাচরিত কৌশলটি প্রয়োগ করিতে কসুর করেন নাই। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়া গাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভারতের চোখ রাঙ্গানিকে তাঁহারা ভয় করেন না। ভারত পাকিস্থানকে চোখ রাঙ্গাইতেছে জনাব মহম্মদ আলী এ পরিচয় কোথায় পাইলেন আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্তুত পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর উক্তির তাৎপর্য এখানে সুস্পষ্ট। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের জনসাধারণের মধ্যে একটা বিদ্বেষের ভাব তিনি জাগাইয়া তুলিতে চাহেন। ফলত ভারতের বিরুদ্ধে অকারণ উত্তেজিত মনোভাব পোষণ না করিয়া ধীর স্থিরভাবে এমন চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করাই পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্থানের রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন মার্কিন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য এশিয়ায় নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ। প্রস্তাবিত চুক্তির ফলে শুধু যে পাকিস্থানের স্বাতন্ত্র্য—মর্যাদাই নষ্ট হইবে, ইহা নয়। ইহার ফলে পাকিস্থান নানাভাবে আড়ষ্ট এবং পিষ্ট হইবে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সুযোগ আর থাকিবে না। পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হইবে এবং সে আঘাত হইতে ভারতও মুক্ত থাকিতে পারিবে না। সুতরাং

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত অবিশ্বাস্য এই সপ্তাহে প্রকাশিত হইল না। আগামী সপ্তাহ হইতে পুনরায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবে।

এমন ব্যাপারে ভারতের পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন থাকা সম্ভব নয়। বস্তুত ভারত পাকিস্থানকে চোখ রাঙ্গাইতে চায় না এবং সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, মার্কিন সাম্রাজ্য শক্তির সাহায্যপুষ্ট—পাকিস্থানকেও সে ভয় করে না। শান্তি এবং মানবতাই ভারতের আদর্শ; কিন্তু জাতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগে সে কুণ্ঠিত হইবে না।

সরকারী চোরাগোপ্তা-নীতি

আপত্তিজনক বিষয় প্রকাশ নিরোধক সংবাদপত্র বিধান সম্পর্কিত আইনটির মেয়াদ অর্ডিন্যান্সের জোরে দুই বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৩১শে জানুয়ারী এই আইনের মেয়াদ শেষ হইবার কথা ছিল। বিষয়টি লোকসভায় উপস্থিত না করিয়া সরকার পক্ষ এইরূপ চোরাগোপ্তা চালে অর্ডিন্যান্সের নীতি কেন অবলম্বন করিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব ডাঃ কাটজু তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। ১৯৫১ সালে মূল বিধান যখন উপস্থিত করা হয়, তখন তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীযুত রাজগোপালাচারী এই যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন যে, হিংসা এবং হিংসাত্মক কতকগুলি গুরুতর কাজে উত্তেজনাজনক লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই আইনটি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম যুক্তি ছিল এই যে, বিদেশী রাষ্ট্র, বিশেষভাবে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে আপত্তিকর লেখা প্রকাশ বন্ধ করার জন্য এইরূপ একটি আইন দরকার। কম্যুনিস্ট মতবাদ এবং সেই মতবাদের প্রচার বন্ধ করাও সরকার পক্ষের মতে আইনটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ডাঃ কাটজু এই আইনের পক্ষে বর্তমানে ঐসব পুরাতন যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন এই আইনের পূর্বেও বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, সম্প্রতিও ডাঃ কাটজুর এমন চোরাগোপ্তা চালের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের দায়িত্বসম্পন্ন কোন সংবাদপত্রই হিংসার কিংবা হিংসাত্মক ধ্বংসকার্যে প্ররোচনা দেয় না কিংবা কম্যুনিস্ট মতবাদ বা তৎসম্পর্কিত প্রচারকার্যও ভারতের রাষ্ট্র-বিপর্যয় সৃষ্টি করিবার মত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। দুই একটি সংবাদপত্র কোনও অসঙ্গত পথে চলিতে গেলে সাধারণ যে আইন আছে, তদ্দ্বারাই তাহা নিরোধ করা যাইতে পারে। বস্তুত জনসাধারণের প্রতিনিধির মতামতকে উপেক্ষা করিয়া এইভাবে অকারণ এবং অনর্থক সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের নীতিতে সরকার পক্ষের স্বেচ্ছাচারিতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এবং তাঁহারা কথায় কথায় গণতান্ত্রিকতার যে মহিমা কীর্তন করেন, তাহাই লঘু লইয়া পড়িতেছে। ভারত সরকারের এই ধরণের কাজে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভেরই সঞ্চার হইতেছে এবং সে পক্ষে সঙ্গত কারণ সরকার পক্ষই সৃষ্টি করিতেছেন।

স্কেচ — শ্রীনন্দলাল বসু

রাঁচীর মোরাবাদী পাহাড়: ১৯১৭ সালে আঁকা Post Card-এ চিঠি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত। পাহাড়ের কোলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহ, পাহাড়ের চূড়ায় তাঁরই উপাসনার মন্দির।

বৈদেশিকী

সামরিক কোর্টের "বিচারে" ইরাণের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মুসাদেক রাষ্ট্র-দ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। ডক্টর মুসাদেককে দোষী সাব্যস্ত না করেও কোনো উপায় ছিল না. আবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের জন্য যে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড, ডক্টর মুসাদেককে তা দেবার সাহসও জাহেদী গভর্নমেণ্টের নেই। ডক্টর মুসাদেককে ফাঁসি দিলে জনসাধারণের মধ্যে তার অতি গভীর প্রতিক্রিয়া হবে, কারণ জনসাধারণের মন থেকে ডক্টর মুসাদেকের প্রতিষ্ঠা সহজে মুছে যাবার না। বৃটিশ তেল কোম্পানীর নাগপাশ থেকে ইরানকে মুক্ত করার জন্য তিনি যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন ইরাণীজাতির ইতিহাসে তা একটি অক্ষয় সম্পদ, যদিও তাঁর কীর্তি এখন বিপন্ন এবং নিরাকৃত বৃটিশ প্রভাব আবার ইরাণে পুনঃপ্রবেশের পথ করে নিচ্ছে। ইরাণের কাছে ডক্টর মুসাদেক এখনও জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। তিনি ইরাণীদের আত্মসম্মান ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে ফাঁসি দেবার সাহস জাহেদী গভর্নমেণ্টের নেই, জাহেদী গভর্নমেণ্টের মার্কিন এবং বৃটিশ পরামর্শদাতারাও নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, ডক্টর মুসাদেককে মারলে তার ফল জাহেদী গভর্নমেণ্টের পক্ষে খুবই খারাপ হবে।

তা ছাড়া বৃটিশকে যদি ইরাণে আবার তামাক খেতে হয় তাহলে অন্তত নলচের আড়াল দিয়ে খেতে হবে। অর্থাৎ তৈল-জাতীয়করণের আইনের খোলসটা রেখে যা করার করতে হবে। সেইজন্যই তৈল জাতীয়করণের আইন পাল্টানো হবে না একথা বার বার বলা হচ্ছে জনসাধারণকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য। তৈল জাতীয়করণের জনক হলেন ডক্টর মুসাদেক। একদিকে তৈল জাতীয়করণের আইন পাল্টানো হবে না বলে আশ্বাস প্রদান এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে যদি ডক্টর মুসাদেকের প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা হোত তবে সাধারণ লোকের

কাছে ও ফাঁকিটা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে যেত।

সুতরাং শাহ ডক্টর মুসাদেকের বিচারকারী সামরিক কোর্টের নিকট একখানা চিঠি পাঠালেন। তাতে শাহ লিখলেন যে, কোর্ট যেন ডক্টর মুসাদেকের প্রতি অতিরিক্ত কঠোর দণ্ডাদেশ না করেন। ডক্টর মুসাদেক তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম বছরে যে-সব ভালো কাজ করেছেন সেই সব স্মরণ ক'রে শাহ তাঁকে ক্ষমা করেছেন। শাহের এই চিঠির দ্বারা সামরিক কোর্টের মুশকিল আসান হোল। সামরিক কোর্ট রায় দিলে যে, ডক্টর মুসাদেক ইরাণের রাজতন্ত্র ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য তাঁর মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য, কিন্তু শাহ তাঁকে ক্ষমা করেছেন, ডক্টর মুসাদেকের বয়স ৭০ বছরের উপর এবং জীবনের বেশির ভাগ সময়েই তিনি ইরাণীদের সেবাই করেছেন—এই সব কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোল না, তাঁর প্রতি তিন বছর নির্জন কারাবাসের হুকুম হোল। বলা বাহুল্য, ডক্টর মুসাদেক দয়া ভিক্ষা করার পাত্র নন। শাহের চিঠি যখন কোর্টে পড়া হয় তখনই তিনি চেঁচিয়ে বলেন যে, তিনি দয়া চান নি, কোনোদিন চাইবেনও না, তিনি কোনো অন্যায় করেন নি, বিচারকগণ যেন ন্যায়ানুসারেই তাঁদের রায় দেন। কোর্ট ডক্টর মুসাদেককে দোষী সাব্যস্ত করায় তিনি বলেন যে, তিনি এতে খুশী হয়েছেন, এতে তাঁর মান আরো বাড়বে, ইরাণবাসীরাও বুঝবে শাসনতন্ত্রের অর্থ কী। ডক্টর মুসাদেক বলেন, ইতিহাসের বিচারে ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে তাঁর জয় একদিন ঘোষিত হবেই।

ডক্টর মুসাদেকের উকিলরা বর্তমান রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু আসলে মামলাটা তো আর আইনের নয়, মামলাটা হচ্ছে রাজনীতির। জাহেদী গভর্নমেণ্ট মুসাদেককে ফাঁসি দিতেও অক্ষম, ছেড়ে দিতেও পারেন না। সুতরাং ধরে রাখার একটা ব্যবস্থা চাই। শাহের চিঠি কোর্টের পথনির্দেশক হোল। তাতে জনসাধারণকে তুষ্ট করার চেষ্টাও আছে, কৌশলে প্রোপাগান্ডাও আছে। শাহ ডক্টর মুসাদেকের প্রধান মন্ত্রিত্বের প্রথম বছরের কার্যের তারিফ করেছেন। সেই বছরেই তৈল জাতীয়করণের আইন প্রণীত হয়। সুতরাং শাহের চিঠিতে এই ইঙ্গিতের প্রয়াস আছে যে, শাহ এবং জাহেদী গভর্নমেণ্ট তৈল জাতীয়করণ বজায় রাখতে আগ্রহশীল।

জাহেদী গভর্নমেণ্টের যদি সহজ লোক-সমর্থনের উপর বিশ্বাস থাকত, তবে যেভাবে বর্তমান শাসকদের যাবতীয় সমালোচক ও বিরুদ্ধবাদীদের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তা হোত না। হাজার হাজার লোককে আটক করা হয়েছে। কেবল মুল্লা কশানিকে ধরতে জাহেদী গভর্নমেণ্টের এখনো সাহস হয় নি। কিন্তু যদি অন্য সমস্ত বিরুদ্ধবাদী নেতারা কারারুদ্ধ হন, তবে একলা কশানির পক্ষে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। জাহেদী গভর্নমেণ্ট আগেকার "মজলিশ" ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে ইলেকশন করার আদেশ দিয়াছেন, কারণ যে "মজলিস" ছিল, তার অধিকাংশ সদস্যই জাহেদী গভর্নমেণ্টের সমর্থন করতেন না। "মজলিসে"র মত নিয়ে করতে হলে বর্তমান অবস্থায় বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধের পুনঃস্থাপন কখনই সম্ভব হোত না। জাহেদী গভর্নমেণ্ট এমন একটি "মজলিস" চান, যার দ্বারা জাহেদী গভর্নমেণ্টের বর্তমান নীতি পুরোপুরি সমর্থিত হবে। বিরুদ্ধবাদীরা হয় কারাগারে, অথবা পলাতক; খবরের কাগজগুলি সব জাহেদী গভর্নমেণ্টের সমর্থনে লিখছে, না লিখে উপায় নেই। যে-সব কাগজ জাহেদী গভর্নমেণ্টের বিপক্ষে লেখার চেষ্টা করেছে, তাদের হয় সুর বদলাতে হয়েছে, অথবা একেবারেই বন্ধ হতে হয়েছে। এ অবস্থায় নির্বাচন এলে জাহেদী সরকারের আশা যে, একটি সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ "মজলিস" পাওয়া যাবে।

কিন্তু ইরাণীরা জাহেদী গভর্নমেণ্টের পরিকল্পনার বাইরে কিছুই করবে না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। মার্কিন সাহায্যের দ্বারা জাহেদী গভর্নমেণ্টকে কতকাল দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে, বলা যায় না। দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য করছি এই বোধ থাকলে লোকে অনেকদিন কষ্ট সহ্য করতে পারে সেই জন্য মুসাদেক-নীতির জন্য ইরাণীর কষ্ট স্বীকার করতে পিছপাও ছিল না কিন্তু দেশের গভর্নমেণ্ট যদি বিদেশী সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তবে সেই গভর্নমেণ্টের আদেশ লোকে স্বীকার করতে চায় না, বিদেশী সাহায্য দিয়ে কাজ চালাবার অভ্যাস হলে ক্রমাগতই বিদেশী সাহায্য চাইবার দিকে ঝোঁক হয় এবং বিদেশী সাহায্য হ্রাস বা বন্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই গভর্নমেণ্টের বিপদ ঘটে। সুতরাং আপাতত জাহেদী সরকারের উপর মার্কিন গভর্নমেণ্ট যতটা ভরসাই করুন না কেন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

ডক্টর মুসাদেকের কী হবে? তিনি কি সত্যই তিন বছর নির্জন কারাবাসে কাটাবেন? তাঁর বয়স ৭৪ বছর। তিন বছর নির্জন কারাবাসের দণ্ডভোগ করে তিনি জীবিত থাকবেন, এরূপ আশা করা যায় না। মনে হয়, তার পূর্বেই হয় তিনি মারা যাবেন অথবা এমন কিছু ঘটবে, যাতে তাঁকে আটক রাখা সম্ভব হবে না। এমন অবস্থাও আসতে পারে, যখন বন্দী মুসাদেকের সঙ্গে আবার কথাবার্তা চালানো আবশ্যক হবে। একদা মার্কিন গভর্নমেণ্টের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ডক্টর মুসাদেক ছাড়া ইরাণকে কম্যুনিস্ট-গ্রাস থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তেলের ব্যাপারে বৃটিশ স্বার্থহানিতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ডক্টর মুসাদেককে তাঁদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলে বিবেচনা করেন এবং যেন-তেন-প্রকারেণ মুসাদেককে খতম করার পক্ষপাতী হন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মার্কিন গভর্নমেণ্টকে এই মতে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন, তবে হয়ত পুরো ষোল আনা পারেন নি, এখনো আধ আনা বাকী আছে। সেটাও বোধ হয় ডক্টর মুসাদেকের প্রাণদণ্ড না হওয়ার একটা কারণ। কে জানে মার্কিন গভর্নমেণ্টের মনে হয়ত এখনো একটু এই ধারণা আছে যে, যদি কোনো সময়ে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন শাহ ও জাহেদী সামাল দিতে পারবেন না, তখন বুড়ো মুসাদেক কাজে লাগতে পারেন।

২৩।১২।৫৩

বাংলা সংস্কৃতির সন্ধিক্ষণ

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

যুগ সন্ধিক্ষণ

বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি আজ ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সন্ধিক্ষণ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন, তবে যদি বাঙালী জাতি বাঁচে ও তাহার কৃষ্টি নূতন পথ অনুসন্ধান করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত বাঙালী ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছিল। বাঙলার সাহিত্য যেমন সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল, যেমন বাঙলার কৃষ্টি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে এক অভিনব শিল্প-কলা-সংস্কৃতি গঠনের উপকরণ যোগাইয়াছিল, তেমনি রাষ্ট্রজীবনে বহু প্রখ্যাত অখ্যাত বিপ্লবীর অসীম সাহস ও আত্মদানপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দিকে ভারতবর্ষকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

ইহার ফলে হইয়াছে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ধূর্ত চালে বাঙলা প্রদেশের তিন বারের রাষ্ট্রিক সীমা পরিবর্তন।

নিজ বাসভূমে পরবাসী

সুদূর প্রবাস হইতে বর্তমান ইতিহাসের এই বিদ্রূপ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত ও শঙ্কিত। যে সীমানা বাঙলা দেশের প্রাচীন গঙ্গা পদ্মা যমুনা ও মেঘনার জলপ্লাবন ও ভাঙ্গাগড়ার খেলায় গড়িয়াছে, যে পরম্পরাগত ইতিহাস যাহা সমাজ ও কৃষ্টির বন্ধনে অটুট রাখিয়াছে, জনতার ভাষা ও সাহিত্য যাহাকে এতদিন সংরক্ষিত করিয়াছে, সে সীমানা বাঙালী জাতি রক্ষা করিতে পারিল না। পূর্ব অঞ্চলে কমলা সমাকীর্ণ কামরূপের নূতন উপনিবেশ ও কামাখ্যার প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র, পশ্চিম অঞ্চলে অভ্রভেদী ধবল শৃঙ্গের সানুদেশে পূর্ণিয়া হইতে জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত বন্ধুর উপত্যকা ও দক্ষিণে তালীবন শোভিত সন্দ্বীপ হইতে সমুদ্রকূলের বালেশ্বর—এই সমগ্র অঞ্চল বাংলার প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব। নূতন বিভাগে বাংলার অধিকাংশ অংশ অপরের হইয়াছে। নিজ বাসভূমে বাঙালী নূতন করিয়া প্রবাসী হইয়াছে। রাষ্ট্র আজ বাংলার সংস্কৃতির প্রতীক না হইয়া নিতান্ত দুর্বল, পরমুখাপেক্ষী।

উদ্‌বাস্তুর ক্লেশ

উপরন্তু আসিয়া পড়িয়াছে পূর্ববঙ্গ হইতে অন্তত ত্রিশ লক্ষ নিঃসম্বল নিপীড়িত উদ্‌বাস্তু, তাহাদিগের জীবনের সমস্ত আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া, যে দুই শতাব্দী ধরিয়া পুরুষানুক্রমে ক্রমবর্ধমান মূলধন ও পরিশ্রম পূর্ববঙ্গকে পৃথিবীর একটি অতিমনোরম, অতি-সমৃদ্ধ উদ্যানে পরিণত করিয়াছে তাহা দুর্বৃত্ত ও আততায়ীর হস্তে সমর্পণ করিয়া। ভারতের রাষ্ট্র এই নিদারুণ অপমান ও অত্যাচার সম্বন্ধে একেবারে হতবুদ্ধি, মৌন।

দূরদর্শী, অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্মঠ ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে উদ্বাস্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করিবার সময় পদ্মার ধারে ধারে উদ্বাস্তুসমূহের বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল সমাবেশ পরিদর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, জগতের ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় এরূপ জনতার ব্যাপক নির্যাতন ও উচ্ছেদ নিতান্ত বিরল এবং সমগ্র বিশ্বমানবের অন্তস্তল স্পর্শ করিবার বিষয়। ভারতীয় রাষ্ট্রের শান্তি ও সদ্ভাবের অজুহাতে এ মর্মন্তুদ ঘটনার দিকে বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে দেয় নাই।

রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ও সুভাষ বসুর বাংলা আপনার ক্লেশ ও অবমাননার কথা ভারত রাষ্ট্রের কর্ণগোচর করিতে পারে নাই। ভারত রাষ্ট্র তাই কাশ্মীর ও কোরিয়ার সমস্যাকে বাংলার উচ্চে স্থান দিয়াছে, আদর্শবাদ ও বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় আপনার অপমান ও প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

স্বল্পপরিসর বাঙলা

তবুও দুর্ভাগ্য আর কত বেশি হইত যদি স্বদেশ বলিবার তিলার্ধ স্থান বাঙালীর থাকিত না। বাঙালী যাযাবর ইহুদী জাতিতে পরিণত হয় নাই। ভারতের মানচিত্রে তবুও একটা স্বল্পপরিসর বাংলা আছে। উহার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা মহানগরীর লোকসংখ্যা হইতেছে ৫৫ লক্ষ ও হাওড়ার হইতেছে ৬ লক্ষ। অত বড় বিশাল নগরী ভারতবর্ষে আর নেই। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ কলিকাতা ও হাওড়ায় বসবাস করে। পশ্চিম বাংলায় এখন মানুষের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। প্রতি বর্গমাইলে এখানে ১২০০ লোকের বসবাস। সমগ্র ভারতের প্রতি বর্গমাইল লোকসংখ্যার তুলনায় ইহা চারগুণ। পৃথিবীতে এখন আর কোন কৃষি-নির্ভরশীল দেশ নাই যেখানে মানুষের এত ঘন বসতি।

বামনাবতারের একপাদভূমি

পুরাকালে বলির অত্যাচারে নির্যাতিত পৃথিবীর একপাদ জমি যাচ্ঞা করিয়া ভগবান বিষ্ণু তাঁহার বামন-অবতারে সমগ্র বসুধা সৌরজগৎ ও নিম্নজগৎ তাঁহার ত্রিপাদে আচ্ছাদন করিয়া মানবজাতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। জলধিমন্থনকারী সগর-সন্তানের বংশধর বাঙালীকে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিয়া বাংলার অখণ্ড বিশাল মনোময় রূপ পরিকল্পনা করিতে হইবে তাহার সমস্ত ইতিহাস ও সভ্যতার উত্থান-পতনের পারম্পর্য হইতে জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া।

মাটির দেশ অল্পপরিসর পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু মনোময় বাংলা তাহার পূর্ণ অবয়বে উদ্ভাসিত ও সংগঠিত হইলে বর্তমান ইতিহাসের বাঙ্গ ও রাষ্ট্রের লাঞ্ছনা বাঙালী ভুলিতে পারিবে। একপাদ জমির আধারে তখন জাতি বিশ্বসংসারে আপনার প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের পথ খুঁজিয়া পাইবে।

কলিকাতা ও পল্লী অঞ্চলের সুসমঞ্জস আদান-প্রদান

প্রথম কথা হইল ক্ষুদ্রতর পশ্চিমবঙ্গের যে ভীষণ অর্থনৈতিক ভারচ্যুতি ও অসমতা ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন। কলিকাতা ও উপকণ্ঠ শহরগুলির সহিত সমগ্র বাংলার পল্লী অঞ্চলের শিল্প,

যানবাহন ও বৈদ্যুতিক **শক্তির এমন** নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা যাহাতে নিতান্ত স্ফীতকায় কলিকাতা মহানগরী সমগ্র দেশ শোষণ করিয়া সমৃদ্ধি বৃদ্ধির পথ না খুঁজে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর সমতলভূমি হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ক্ষুদ্র কারখানা ও কুটিরশিল্পবহুল শহরতলী স্থাপন এবং উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বাসন, গ্রামীণ ও নাগরিক আর্থিক আদান-প্রদান নূতন করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে।

বাংলার আর্থিক অব্যবস্থা ও দুরবস্থা দূর করিবার প্রধান উপায় কলিকাতা নগরীর গুরুভার ও শোষণ হইতে সমগ্র বাঙলা দেশকে রক্ষা করা এবং এমন একটি আর্থিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাহাতে পল্লীর স্বাস্থ্যহানি ও দারিদ্র্য, কুটিরশিল্পের বিনাশ সাধন এবং পল্লীবাসীর অফুরন্ত শহর অভিগমন রোধ করিতে পারা যায়। পশ্চিম বাংলা জুড়িয়া এমন বৃহৎ সুসমঞ্জস পরিকল্পনা গড়িতে হইবে যাহাতে গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, জলাভূমি-বনজঙ্গলের ক্রমপ্রসারণ ও বহু জনপদের উচ্ছেদ যেভাবে বাংলাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করিয়াছে তাহার একদিক হইতে প্রতিরোধ হয় এবং কলিকাতা নগরীর আর্থিক জীবনযাত্রার সহিত একটা সার্থক সুসমঞ্জস বিনিময় স্থাপিত হয়।

সমবায় ও বিদ্যুৎ সরবরাহ

ত্রিশ লক্ষ উদ্বাস্তুর আকস্মিক আগমনকে একটা জটিল সমস্যা না ভাবিয়া বরং উহাকে নূতন আর্থিক পরিকল্পনার অভিনব উপকরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার গ্রাম ও নগর, কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়াছে এবং যাহা এখন বাঙালী জীবনের ক্ষয়রোগে পরিণত হইয়াছে, তাহা নিবারণের একটি প্রধান উপায় উদ্বাস্তুদিগের বর্তমান ও ভাবী বাহুবলের আশ্রয়ে নূতন কাঠামে আর্থিক ও সমাজজীবন সঞ্জীবিত করা।

বাংলা জমিদার প্রথা বিলোপ করিয়া এখন যে নূতন ভূমি-বণ্টন-ব্যবস্থা কল্পনা করিতেছে তাহাকেও এই ব্যাপক আর্থিক প্রগতির আধাররূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ভূমি বণ্টনের অনিবার্য দায়িত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। ভূমি বণ্টন হইতে বাঙলার কৃষি নূতন বল ও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। পশ্চিম বাংলায় চাষের জমির গড়পড়তা পরিমাণ দু' একরেরও কম। অথচ পাঁচ হইতে আট একর না হইলে কৃষকের পরিবার সংকুলান অসম্ভব। কৃষক পরিবারের *মধ্যে শতকরা চল্লিশজন দুই একর জমি বা আরও কম জমি লইয়া চাষ-বাস করে। এক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির ব্যবস্থা* না হইলে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি একেবারে অসম্ভব। ভাগচাষ বা দিনমজুর অবলম্বনে চাষ বা খণ্ড-বিখণ্ডিত বিক্ষিপ্ত জমিতে অগোছাল চাষ একদিকে যেমন কৃষি-প্রগতির অন্তরায়, তেমনি শ্রেণী সংঘর্ষকে শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত করে। জমিদারী বিলোপের পর বাংলার কৃষির পুনর্গঠন সমবায় প্রণালীতে না হইলে চাষী নূতন ভূমি সংস্কার হইতে সুফল লাভ করিতে পারিবে না। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগের সমাজে পূর্ণ একীকরণও অসম্ভব যদি আধিয়ার ভাগীদার প্রথা বা দিনমজুর নিয়োগ বন্ধ না হয় এবং ২৮ লক্ষ একর কর্ষণযোগ্য জমি যাহা এখন পতিত রহিয়াছে তাহা যদি উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত না হয়। প্রত্যেক গ্রাম্য সমাজ ভোট অনুসারে সমবায় কৃষি (Co-operative Farm) অথবা যৌথ কৃষি (Collective Farm) নির্ধারণ করিবে। তখন কৃষি অখণ্ডিত, প্রগতিশীল, বৈজ্ঞানিক ও শোষণমুক্ত হইতে পারে।

বাঙলার এই সংকট-সঙ্গমে আমাদিগের রক্ষাকবচ এক বাহুতে বিদ্যুৎ **সঞ্চার ও অপর বাহুতে সমবায় নীতি।**

বাংলার বাণী, ভারতের বাণী

ইহুদিরা দেশ হারাইয়া সংস্কৃতিবলে ভবঘুরে হইয়াও বাঁচিয়া আছে। দেশের প্রাণশক্তি রাষ্ট্র নহে, অধ্যাত্মবল। বিশেষত বাঙালী চিরকাল অতীন্দ্রিয় ও তুরীয়ের নিবিড় অনুভূতিকে পরিরক্ষণ করিয়াছে, উহা রূপায়িত করিয়াছে তাহার ধর্মে, সাহিত্যে, চারুকলায়, এমন কি পারিবারিক ঐক্য বন্ধনে ও জীবনযা[illegible]

অপর দিকে বাংলার [illegible] ও কল্পনায়, উহার সাহিত্যে ও চারুকলার রূপায়নে ভারতের নিগূঢ় অন্তরাত্মা অতি সুন্দরভাবে যুগে যুগে [illegible] করিয়াছে। বাংলার সরস্বতী [illegible] ভারতী।

বাংলার এই উদার মনোভাব ও ভাবুকতা তাহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ঐতিহ্যগত। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংঘর্ষময় নব-নাগরিক সভ্যতা বাঙালীর এই চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে কিছু পরিমাণে ম্লান করিয়াছে সন্দেহ নাই। সত্য যদি এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান পরিবেশের সংঘাতে বিলুপ্ত হয়, বাঙালী যদি আত্মবিস্মৃত হয়, তাহা হইলে তাহার বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি রহিল?

সাহিত্য ও মানবিকতা

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমরা সাহিত্যের ও সমাজের সম্পর্ক লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলাম। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বাংলা সাহিত্য অগ্রসর হইতেছে কিনা ঐ আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্য মানুষের শাশ্বত সত্য ও সৌন্দর্যের সন্ধান ও বিশ্বজনীনতা বাংলার ভাবধারায় আনিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের মানবিকতা বাঙালীর সমাজ ও চেতনাকে বহুদিক হইতে পরিপুষ্ট করিয়াছে এবং করিতে থাকিবে। প্রাচীন ও নূতন যুগের মধ্যস্থলে দীর্ঘকাল দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যে মানবিকতার আদর্শ আছে তাহার সহিত বিশ্বচেতনার নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার সুন্দর সমন্বয় করিয়াছেন।

কিন্তু ভারতের বিশেষত বাংলার **জীবন, আদর্শ ও কল্পনা বিংশশতাব্দীতে বিপ্লবের গতিতে রূপান্তরিত হইতেছে। এইজন্যই সংঘর্ষবিক্ষুব্ধ জনতার জীবনযাত্রা সার্বভৌম রবীন্দ্র সাহিত্য হইতে যথোচিত জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই।**

শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী যে দ্রুত পরিবর্তন ও আকস্মিক ঘটিয়াছে,. তাহা অভূতপূর্ব। রীতির গতানুগতিক সাহিত্যের এখন নূতন গণসাহিত্য গড়িয়া যাহা সংগ্রামের ক্ষুব্ধতায় ও অধীর, যাহা জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও জনতার প্রতি অসীম এবং যাহার বিশাল পটভূমি ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ নহে।

মধ্যে বাংলার জাগ্রত জন- অনুপ্রবেশ করিয়াছে পাশ্চাত্যের ও সাম্যবাদ। জাতীয় দুর্দশা সমাজের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও মধ্যে সাহিত্য দীন জীবনের ব্যর্থ ক্রন্দন, ধনীজীবনের সম্পদ ও আড়ম্বরের তিরস্কার বা জীবনের বিমূর্ত, অলীক বিলাস যাহা গণসাহিত্যের বাস্তব- প্রথম অভিব্যক্তি ছিল, তাহা আর সে কালক্ষেপ করে না।

মানবিকতার নূতন জয়গান

আমরা সাহিত্যে এখন আভাস পাইতেছি, নূতন মানবিকতার যাহা একটি চেতনার দ্বারা উত্তপ্ত ও সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমবেদনা ও প্রাণবন্ত, আন্তরিক ও শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখায় ভবিষ্যতের সূচনা সুন্দর পরিস্ফুট। সাময়িক সাহিত্যের প্রগতির পথ কৃত্রিম সীমাবদ্ধ জীবন ও রসের ত্যাগ করিয়া সমগ্র জনচেতনা নিগূঢ় রহস্য আস্বাদন ও যাটন। যদি সত্যকার বাস্তবনিষ্ঠা ও জনচৈতনা সাহিত্যিকের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রকাশ হইবে কার মত ছোট গল্প ও গীতিকবিতায় বরং কালজয়ী কাব্য ও উপন্যাসে, কি মহাকাব্যে ও মহানাট্যেও। বলা না, সাম্প্রতিক সাহিত্য মোটামুটি মূলক, প্রগতিশীল ও জীবনধর্মী।

কলিকাতা নগরীর মধ্যবিত্ত সমাজের সর ও আরামে জন্মগ্রহণ ও পরি-বর্ধিত হইয়া আজ বাংলা সাহিত্য বাস্তবিকই নূতন পথের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। মানবিকতার এই নূতন জয়গান শুনা যাইতেছে এমন সময় যখন বাঙালী সর্বস্বান্ত, অপমানিত, বিপর্যস্ত। গভীরতম দুঃখের দিনে ঝড় ও ঝঞ্ঝার উন্মত্ত রাত্রিতে যখন বাঙালী উলঙ্গ, ক্ষতবিক্ষত তখন তাহার একমাত্র সম্বল রহিয়াছে সাহিত্য। ঐ সাহিত্যই তাহাকে বহু ভাব ও কল্পনা, বহু সারস্বত নিষ্ঠা, আরাধনা ও ভক্তির তৈয়ারী বিচিত্র ও বিপুল মনোময় সমাবেশের সন্ধান দিবে যেখানে ভৌগোলিক বন্ধন নাই, রাষ্ট্রিক ব্যবধান নাই। বাংলার বিশ্বগ্রাহী, সাহিত্য-সৃষ্ট, মনোময় পরিবেশ নৈসর্গিক পরিবেশের মত কম প্রাণবন্ত কম নিশ্চেষ্ট নহে। তাহাই বাঙালীকে সংহতি ও সার্থকতার দিকে লইয়া যাইবে, যদি না সাময়িক দৈন্য ও অবসাদ, প্রাণধারণের ক্লেশ ও গ্লানি তাহার অন্তরের সাধনার অন্তরায় না হয়।

বাংলার সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ

বিপদের অমানিশায় নহে, অভ্যুদয়ের দীপ্ত মধ্যাহ্নেই বাঙালী জাতি অতীতে দেশদেশান্তরে মানবিকতার জয়গান শুনাইয়াছিল। তখন বরং ছিল ভারতীয় সভ্যতার মোসলেম-আক্রান্ত দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ অনিশ্চিত যুগ। ভারতের সেই তামস যুগে বারংবার বাঙলাকে কেন্দ্র করিয়া সভ্যতার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শিখা সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে আলোকিত করিয়াছিল। ভারতবাসী বাংলার মাটিতে এমন একটা মহান্ জীবনপ্রণালীর সন্ধান পাইয়াছিল, যেমন পাইয়াছিল পেরিক্লিশের যুগে এথেন্সবাসী এবং এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডবাসী। মহাযান বৌদ্ধধর্ম যখন প্রচার করিল, যে গঙ্গার বালুতটে অসংখ্য বালুকণার মত বিশ্বের অগণিত জীবের নির্বাণলাভ না হইলে বুদ্ধের মুক্তি নাই, এই সার্বজনীন সার্বজাতিক মহান্ ভাব বাংলাই তাহার উদার প্রাণে ধারণ ও বহন করিতে পারিয়াছিল। সেই যুগে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, দেবীকোঠ, বিক্রমপুরী, পণ্ডিত্য সংঘারামে দীপঙ্কর, শীলভদ্র শান্তরক্ষিত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র এশিয়ার প্রজ্ঞাদ্বারালোকে পূজনীয় পদ অধিকার করিয়াছিলেন। সুদূর যবদ্বীপে শৈলেন্দ্র সম্রাটের গৌড়ীয় পুরোহিত কুমার ঘোষ আর্য তারার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন বৌদ্ধ তান্ত্রিক দর্শন ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বাঙালীর অধ্যাত্মসাধন ও চারুশিল্পকলা নেপাল, তিব্বত, শ্রীক্ষেত্র, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোজে তাহার অতুলনীয় শালীনতা ও মরমীয়তার ছাপ প্রদান করিয়াছে। গৌড়ীয় স্থাপত্য রীতি যেমন শ্রীক্ষেত্র ও যবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছে তেমনি পাহাড়পুরের মন্দির-নির্মাণরীতি বিশাল বড়বদুর ও আঙ্গকরে পরিস্ফুট।

উহার প্রায় চার শতাব্দী পরে বাঙালী বণিক সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম ও চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরে সিংহল ও পূর্বদ্বীপপুঞ্জে মসলা বাণিজ্যে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। ঢাকা বা কাশিমবাজারের কার্পাস ও রেশমের বস্ত্রশিল্প ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং শুধু দ্বীপান্তর ভারতে, চীন, পারশ্য ও তুর্কীতে নহে, ইউরোপেও অতিপরিচিত ছিল।

আবার ঐ যুগে নবদ্বীপের প্রেমের কাঙ্গাল শ্রীচৈতন্য যে নূতন সাম্যমূলক ধর্ম ও সমাজনীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা জাতি, সম্প্রদায় ও দেশকে অতিক্রম করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশকে প্রেম-প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়াছিল।
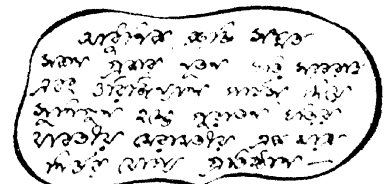
উহার দুই শতাব্দী পরে বাংলায় রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। বৈদিক ও ইসাহী, শাক্ত ও সুফী সাধন সমন্বয়ের দ্বারা রামমোহন যে সার্বজনীন ধর্মপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতেও আমরা পাই বাঙালীর সেই পুরাতন, সেই চির-নূতন মরমীয় দেশাতীত বাণী।

সার্বভৌম মরমিয়তা

কোথায় রইল জাতি ও সমাজের বন্ধন, স্বদেশের পরিধি, সংস্কৃতির ব্যবধান, যখন উদার সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাঙালী নেপাল, তিব্বত ও চীনের পাহাড় উল্লঙ্ঘন করিয়াছে এবং শ্রীক্ষেত্র, সুবর্ণদ্বীপ, শ্যাম, কাম্বোজে সভ্যতার অগ্রদূত হইয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছে?

শান্তরক্ষিত ও তাঁহার সহযোগী কমলশিলা ও পদ্মসম্ভারের নেপাল অতিক্রম করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার ও যবদ্বীপে গোড়ীয় কুমার ঘোষের বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম প্রচার পালযুগের বাঙালীর এশিয়া মহাদেশের নিকট চিরস্মরণীয় অবদান। শান্তরক্ষিত হইতে গুরুপরম্পরায় তিব্বত ও নেপালে বজ্রযান ও সহজযান যে প্রসারলাভ করিয়াছিল অন্তত চার শতাব্দী ধরিয়া তাহার উৎস বাংলা দেশেই ছিল। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী বাঙলার কৃষ্টি প্রসারের একটি সুবর্ণ যুগ, যখন বিক্রমশীলা, সোমপুর, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, পাণ্ডুভূমি, ত্রৈকুটক, দেবীকোট, বিক্রমপুরী, পণ্ডিতা, ফুলহরী, সঙ্ঘারাম হইতে বৌদ্ধধর্মের নববিধান ও দর্শন উত্তরের তিব্বত এবং দক্ষিণের শ্যাম, কাম্বোজ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বিপুল প্রসারলাভ করিয়াছিল।

সমস্ত উত্তর ভারত যখন তুর্ক আফগানের আক্রমণে ও অত্যাচারে বিধ্বস্ত সেই যুগেই বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ আয়োজন হইয়াছিল বাংলার মাটিতে—অধ্যাত্মক্ষেত্রে, সারস্বত চিন্তায় ও সাধনায়। কোথায় রইল হিন্দুত্বের গোঁড়ামি ও সমাজের বিধিনিষেধ যখন শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম সুদূর উড়িষ্যা হইতে আসাম, ছোটনাগপুর হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত কত না সুসভ্য ও অসভ্য জাতিকে, অপাংক্তেয় অস্পৃশ্য মুসলমান ও লাঞ্ছিত বৌদ্ধ দলকে সেবা ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।

বাঙালীর মর্মবাণী হইতেছে, দেশ নয়, রাষ্ট্র নয়, জাতি নয়, সম্প্রদায় নয়, দল নয়, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" সমগ্র বজ্রযান, সহজযান ও নাথগুরুর যুগসঞ্চিত সাধনার মূল তত্ত্ব চণ্ডীদাসের গীতিকবিতার মর্মস্পর্শী একটি পঙ্‌ক্তিতে কালজয়ীভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

ঐ গভীর, সূক্ষ্ম, মরমীয় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত মানবিকতা যে বাংলার বিশাল রাষ্ট্র অতিক্রান্ত মনোময় স্বরূপ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলার বাহিরে বাঙালী

অন্তত বাংলার বাহিরের চারটি অঞ্চলে বাংলার সাহিত্য ও অধ্যাত্ম সাধন এই সার্বভৌমিক মানবিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবনযাত্রার আলোচনা, রূপ, সনাতন, জীব প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্যের গভীর দার্শনিক গবেষণা এবং বহু সাধারণ বাঙালীর মরমীয় রহস্যময় আত্মনিবেদন বৃন্দাবনকে আজ বিশাল বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ব্রজধাম ভারতের পবিত্র তীর্থভূমিগুলির মধ্যে বাঙালীর একটি অপূর্ব দান। বাঙলার প্রাকৃতিক সীমাবন্ধন এখানে একেবারে পরাজিত, বাঙালীর ঐতিহ্যের দ্বারা, আত্মবিশ্বাস ও মরমীয় অনুভবের দ্বারা। বাঙলাদেশ হারাইয়াছে আজ তাহার উত্তরাঞ্চলের স্ফীতকায়া যমুনাকে। কিন্তু বাঙালীর অন্তস্তল প্লাবিত করিয়া

"নির্মল সলিলে বহিছ সদা
তটশালিনি, সুন্দরি যমুনে ও"

সেইরূপ বারাণসী বাঙালীর বার্ধক্যের উপাসনাক্ষেত্র ও দেহাবসানের শ্মশানভূমি। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা, দশাশ্বমেধ ঘাট ও মণিকর্ণিকা লইয়া সমস্ত জীবন ধরিয়া বাঙালী কত না নিবিড় ভক্তি ও আরাধনার কল্পনা করে। বাঙালীর অপরোক্ষ অনুভবের তৈয়ারী বারাণসীধাম। বৃন্দাবন ও কাশী বাঙলার প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে, প্রত্যেক গৃহে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, যেমন মন্দিরে মন্দিরে বিরাজিত রাধাকৃষ্ণ গৌরনিতাই, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা।

সুদূর রাজস্থানে গিরিপর্বতে বাঙালী নারী অম্বরের রাজমহিষী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার গৃহদেবতা শিলামাতার সেবা ও পূজার জন্য যশোহর হইতে একটি ভট্টাচার্য পরিবার আনীত হইয়াছিল। শিলাদেবীর বাঙালী পুরোহিতের দৌহিত্র সন্তান ছিলেন বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। ভারতের তিনি একজন প্রধান বৈজ্ঞানিক ও সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহারাজ জয়সিংহের শাসনকালে বিদ্যাধর ভট্টাচার্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া জয়পুর নগরের মনোরম নক্সা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। নগরনির্মাণের ইতিহাসে ইহা একটি অমূল্য অবদান। দেশের ও জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিক আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু বিদ্যাধরের মন্ত্রিত্ব বা নগরনির্মাণ নহে, বহু বাঙালী প্রবাসের বহু স্থানে, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি, রাজকার্য বা সমাজসেবা অসাধারণ কীর্তি লাভ করিতে পারিত না।

বহু বৎসর উপনিবেশের ফলে লক্ষ্ণৌর বাঙালীসমাজ হিন্দু মুসলমান সমন্বয়-সাধন-প্রসূত-কৃষ্টি হইতে এক বলিষ্ঠ শালীনতা লাভ করিয়াছে যাহা হইতে বাঙলার সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতুলপ্রসাদ সেনের ভাবাবেগের সরসতা, অনুভবের সূক্ষ্মতা ও কমনীয়তা এবং গীতিকবিতার চঞ্চল লাস্য বাংলার কাব্য সাহিত্যে নূতন শোভা ও বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। আমরা অতুলপ্রসাদের গানে পাই একটা আচম্বিত মিশ্রণ — বাঙালীর স্বভাবজাত চিত্তের উদ্দাম বিবর্তনের সঙ্গে গজল ও ঠুংরীর চপল মধুর ছন্দঝংকার, পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী ও বাউল সংগীতের বৈরাগ্য ও আত্মহারা ভাবের সঙ্গে উর্দু কবিতার অদম্য তৃষ্ণা ও মরুপ্রান্তরের তীক্ষ্ম অনুবেদনা। সেইরূপ প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদারের চিত্রাংকণে আমরা উত্তর ভারতীয় নারীর কমনীয় অংগভংগী ও নৃত্যের সুষমা এবং বেশবিন্যাসের শোভনতার পরচয় পাই। ভারতীয় চিত্রকলায় রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের জীবনযাত্রার মাধুর্য ও সরসতা তিনি

উজাড় করিয়া দান করিয়াছেন তাঁহার দেশ রীতির নানা চিত্রসম্ভারে। প্রদেশের কৃষ্টির সহিত নিরন্তর ভাবমূলক আদান-প্রদান না হইলে এইরূপ কৃষ্টি অসম্ভব। এই চারুকলার সৃষ্টির অন্তরালে যে সার্বজনীন মানবিকতা আছে তাহাই বহুসংখ্যক প্রবাসী বাঙালীর মধ্যে বিস্তৃত হইয়া বাঙালী জাতির শক্তির উৎস হইবে। বর্তমান খণ্ডতা ও সংকীর্ণতার সঙ্কট হইতে বাংলাদেশকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়, বাংলার বাহিরে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের শক্তি ও সাধনা।

মনোময় বাঙলা

হইলই বা আমাদের দেশ এখন অতি ক্ষুদ্র খণ্ড বিখণ্ডিত? বৃহত্তর বাঙালী সমাজ গঠন করিবে বাংলার বিশাল মনোময় রূপ, যাহা সুদূর অতীতে তিব্বত, চীন, যবদ্বীপ, শ্যাম ও কাম্বোজে পরম আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিল, নানা জাতি ও অসভ্য জাতিকে সত্য ও সৌন্দর্যের পথ নির্দেশ দিয়াছিল। প্রবাসী বাঙালী সমাজ যদি আপনার স্বকীয় বিরাট ঐতিহ্য ও প্রবাসের নিখিল সাহিত্য এবং ভাবধারা হইতে আবার পূর্ণ মানবিকতার সন্ধান পায়, যদি লক্ষ লক্ষ প্রবাসী বাঙালী বিভিন্ন প্রদেশে আপনার দেশ খুঁজিয়া পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের বিরাট সুন্দর মানস রূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যাহার ফলে বাঙালীর সঙ্গে অবাঙালীর মিতালি আরো নিবিড় হয়, তবে বাঙলার খণ্ডতা বাঙলার অঙ্গচ্ছেদ, বাঙলার সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ জীবন কোথায় রইল? বরং বাঙালী আবার নূতন মানবিকতার বিশ্বজাল সৃজন করিয়া রাষ্ট্রের অবিচার ও ইতিহাসের প্রবঞ্চনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। বর্তমান ক্রমবর্ধমান ধিক্কার, অপমান ও দুর্দশার মধ্যে বাঙালী জাতিকে ইহাই নৈরাশ্য ও আত্মগ্লানি হইতে উদ্ধার করিবে, আশা ও উদ্যমের দিক্‌দর্শন করিবেঃ

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর
মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই
দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে যাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি
ফিরি খুঁজিয়া॥"

বাঙালীর এ দেশ জয়ে অবাঙালীর সহিত দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নাই, আছে সদ্ভাব ও মৈত্রী, ইহার প্রেরণা বাঙালীর স্বার্থ নহে, তাহার মানবিকতা। ইহার ফলে বাঙালী কোন দেশেই প্রবাসী নহে, এবং সব দেশ মিলিয়া এমন মনোরম দেশ সে নির্মাণ করিতে পারে যাহা প্রাকৃতিক সীমা লঙ্ঘন করিয়া অসীম আকাশকে সর্বদেশের অভিলষিত অমৃতলোককে স্পর্শ করে।

শিশির-স্বপ্ন

কল্যাণ সেনগুপ্ত

...রের হাওয়ায় ছিন্নভিন্ন, তবুও মধুর ভুলে
তুমি কি দেখেছ এই পৃথিবীর গভীর মর্মমূলে!
এ মাটির দেহ ক্ষতবিক্ষত কত সূর্যের বাণে;
তুমি কি হৃদয় ঢেলে দিয়ে তাকে ভরে দেবে গানে গানে!

তোমার স্বরের সৌরভে কাঁপে কুঞ্জ বনস্থলী;
...প্রান্তরো কাঁপে অনুভবে, নিভৃতে পুষ্পকলি
তোমার আশায় উন্মুখ হয়ে দলগুলি মেলে ধরে;
তুমি ঝরো আর মমতায় নীল আকাশগঙ্গা ঝরে!

...যুগ আগে এই পৃথিবীর হৃদয়ের সম্পুটে
...মৃদু কামনা উঠেছিল নীল স্বপ্নের মত ফুটে,
তোমার বুকের যত ভালবাসা সবি তার দিকে রেখে—
...মো টলটলে মুক্তার মত আকাশসিন্ধু থেকে!

...র বিশ্বের ধমনী ব্যথায় যতবার হবে নীল,
ততবার তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোরো গানে গানে উর্মিল॥

শ্রীমতীর জন্যে

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমাকে ভালো লাগে তোমাকে বাসি ভালো
একথা দিয়ে যদি হৃদয়ে জ্বালি আলো
সাগর-নীল-কালো চোখের কাছে ঋণ
স্বীকার করে নিই কখনো কোনোদিন
মেঘলা দিনে কোনো মেঘলা কথা শোনো
হৃদয় চায় যদি জানালা খুলে দিতে
শ্রীমতী বলো তবে কার কী ক্ষতি হবে
কার কী ক্ষতি হবে কৃপণ পৃথিবীতে?

সোনার-রং-ধরা হরিণ-আশগুলি......
পুড়িয়ে পাখা যদি আগুনে নাই ভুলি
আকাশ যদি আসে তোমার চোখে নেমে
তোমার দেহমনে তোমার ভীরু প্রেমে
গুমোট রাতে কোনো আকাশে তারা গোনো
বারেক বলা কথা আরেকবার শোনো
হৃদয়-উত্তাপে দুচোখে ছায়া কাঁপে
পোহাও রাত কালো কুয়াশা-ঘন শীতে
শ্রীমতী বলো তবে কার কী ক্ষতি হবে
কার কী ক্ষতি হবে কৃপণ পৃথিবীতে?
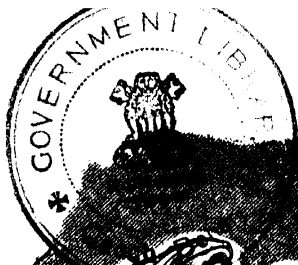
ডবল খরচ

প্রভাত দেবসরকার

সত্যশরণ মিত্র!

নামটা শোনা—শোনা, একই অফিসে কাজ করতো—দেশান্তরে কোন এক শাখায়।

সেই সূত্রে সহকর্মী। হাজার বারশোর একজন, নগণ্য কেরানী—ভাল বাঙলায় করণিক!

মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে সহকর্মীদের কাছে উদ্যোগী সহকর্মীরা আবেদন করলেঃ তাঁরা যেন আপনাপন সাধ্যমত অর্থ দিয়ে সত্যশরণ মিত্রের দুঃস্থ, বিপন্ন পরিবার-বর্গকে সাহায্য করেন। একজন সহকর্মী হিসাবে—

উদ্যোগী সাহায্য প্রার্থীদের হাতে আবেদনের কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে শশধর নিঃশব্দে নিজের কাজে মন দিলে।

যে দু'চারজন এগিয়ে এসেছিল, তাদের একজন বললে, আপনি কিছু লিখলেন না?

শশধর চোখ তুলে চাইলে, কোন কথা বললে না।

ছেলেটি আবার বললে, লিখুন যা হোক, এ্যানি এ্যামাউণ্ট!

এবার শশধর বিরক্ত হোল, চোখমুখ কুচকে বললে, কি লিখবো!

ছেলেটি কাকুতি ভরা সুরে বললে, যা হোক...আপনার যা খুশী!

শশধর মুখে বিড়বিড় করলে, বোধ হয় ছেলেটির নিয়াকড়েপনায় মনে মনে গালাগালি দিলে। রুষ্ট মনের ফেনা জড়ান কথায়।

ছেলেটি তবু নড়ে না। খয়রাতি রাই কুড়োতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অপেক্ষা করে। শশধর যেন দেখেও দেখে না।

কই, লিখুন?

দোহাইটা এমন যে, মুখের ওপর স্পষ্ট না বলে খেদিয়ে দেওয়া যায় না। আবার কিছু লিখে মানবতা দেখাবার মত মনের অবস্থাও নয়, কোথাকার সত্যশরণ তার জন্যে গ্যাট গচ্চা! কেন? আজ কালকার চাকুরে ছোকরাগুলোও হয়েছে তেমনি! কথায় কথায় কাগজ বাড়িয়ে ধরে—প্রতি মাসে জ্বালাতন! হুজুগ লেগেই আছে!

শশধর বিড়বিড় করে বললে, লেখবার কি আছে! যা হোক লিখে নিন—

বাকিটুকু শশধর উচ্চারণ করলে না—জ্বালাতন!

তাতেও কি আপদ কাটে! নাছোড় বান্দা ছেলেটি সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, কত এক টাকা? দু' টাকা?

হঠাৎ শশধরের কি হয় সৌজন্য বোধের সমস্ত বাঁধ ভেঙে যায়। খেঁকিয়েই ও... শেষ পর্যন্ত, কুড়িশ টাকা! যান, ... খুশী লিখুন, আপনাদের কি!

উদ্যোক্তা কিন্তু অনিচ্ছিত। ম... হ'লো শশধরের উষ্মায় একটু ... হাসলেও। কে জানে বিদ্রূপ না, তিরস্কার মুখের কাছে মুখ নিয়ে আগ্রহাতিশয়ে বললে, এক টাকাই যাক আপনার নামে

শশধর তেরিমেরি করে উঠলো, বললুম তো, তবু জ্বালাতন করবেন! বলে ঘুম হচ্ছে না, যত সব—

এবারে সাঙ্গোপাঙ্গ এগিয়ে এলঃ আপনিই বলুন ঘুম হয়? তিনি আমাদেরই একজন ছিলেন—বিদেশে-বিভূঁয়ে কিভাবে মরলেন ভদ্রলোক! এখন আমরা যদি না দেখি কে দেখবে?......পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে, বিধবা স্ত্রী......বোঝেন তো চাকরির সুখ! আমরা আর কতটুকু করতে পারি? সবাই মিলে যেটুকু......

নির্বিকার কণ্ঠে শশধর বললে, আর পাঁচজনের ঘাড় দিয়ে সেটুকুর না করলেই পারেন! ক'টা টাকায় তো আর দুঃখু ঘুচবে না সত্যশরণবাবুর পরিবারের—

তর্কের কথা! উদ্যোক্তারা বললে, তবু সেটুকু পারি। আমাদের একটা কর্তব্য আছে!

ছেলেমানুষদের কথায় হাসতে গিয়ে শশধর কঠিন স্বরে বললে, কর্তব্য! ঢের কথা আছে, ভিক্ষে দিয়ে কর্তব্যপালন করবেন!

ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতিবাদের গুঞ্জন ওঠেঃ লোকটা কি? মানুষ না, আর কিছু!

শশধরও মরিয়া হয়ে ওঠে, নিজের মনোভাবটা অদমিত রাখেঃ হুঁ, সারাদিন চাকরি করে ভারি কর্তব্য করতে পারেন সত্যবাবু, আপনারা চাঁদা তুলে কর্তব্য করবেন, দায়িত্ব নেবেন! ও আপনারাই ভাবতে পারেন, আমার দ্বারা হবে না!

বৃথা তর্ক! উদ্যোক্তারা আবেদনের কাগজখানা শশধরের সামনে থেকে টেনে নিয়ে আর একজনের দিকে এগোয়। কিন্তু এমনি স্পর্শকাতর যে তর্কে চিঁড়িয়ে ওঠে, বিতর্কে ম্লান হয়ে যায়। ঈর্ষাকাতরতার অপভাষণ কার বা সহ্য হয়!

উনি না-দেবেন, না দেবেন। তর্কের দরকার কি! সবাই তো আর ও'র মত হৃদয়হীন নন! ছি ছি।

অনুচ্চারিত ছিছিটা শশধর যেন শুনতে পায়। নিজের কাগজপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে গজ গজ করে, চাঁদা! চাঁদা! এ মরেছে দাও, সে পড়েছে দাও, অমুকের মেয়ের বিয়ে দাও, তমুকের অন্নপ্রাশন দাও! কেবল দাও, দাও—বারো মাস লেগেই আছে, একটা না একটা! তাকে কে দেয় তার নেই ঠিক, সে-ই কেবল দিয়ে যাবে! কেন? চাকরি করে মহা অপরাধ করেছে!

ওরা চলে গেলে শশধর হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে। নিজের মনে কোথায় যেন একটা অনুশোচনা বোধ করে সে। কি দরকার ছিল কথাকাটাকাটি করার, দিয়ে দিলেই হতো কিছু—দিতেই যখন হবে সেই! শুধু শুধু একটা অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেল! আর সবাই কি ভাবলে তার সম্বন্ধে!

অথচ কেন যে শশধর এমনি করে কিছুতে বুঝতে পারে না। এমনিতে সে লোক খারাপ নয়, সত্যিকারের হৃদয়হীনও নয়। পরের দুঃখে তারও দুঃখু হয়! তবু কেন যে সে অমন ক্ষেপে ওঠে চাঁদার কথা উঠলে!

চোখের ওপর ওরা সবার কাছে ঘুরে ঘুরে এখনো চাঁদা তুলছে। বোধহয় শশধরের কথাগুলো পালক-ঝাড়া করে দিয়েছে এতক্ষণ। জানাই আছে ও লোকটা অমনি! দেবে তো কত জানা!

শশধর মাথা হেঁট করে কাগজপত্তর খোলে। নিজের মনে যেন ছোট হয়ে যায় সে আরো। নিজের টেবিলে ওদের ডাকবে নাকি—বলবে আমার নামে দু টাকাই লিখে রাখুন? না, সে আরো লজ্জার! যা পারে ওরা করুক, যা ভাবে ভাবুক! সত্যশরণের জন্যে তার আর ঘুম হচ্ছে না! কোথাকার কে!

তবু যেন লোকটা কখন মনের সঙ্গোপনে এসে ঘেঁষে বসে। শশধর না কোনদিন দেখলেও নিজে থেকে সে দেখা দেয় মানসপটে। রোগারোগা কেমন যেন একরকম দেখতে, মেচেতা-পড়া মুখের ছাপটা কালি-চোষা কাগজের কলঙ্কের মত। সামনের কাগজের ওপর যদি নিজের ছায়াটা শশধর দেখতে পেতো তা হ'লে হয়তো চমকে উঠতো নিজের আর একটা প্রতিকৃতি দেখে।

'সত্যশরণ মিত্র তারই সমসাময়িক, ঘুরতে ঘুরতে কেউ কারো পাশে বসবার সুযোগ পায়নি—এই অফিসের কক্ষ পথে দুজনেই কিন্তু একদিন একই কারণে ঘুরতে বেরিয়েছিল!

কে জানে এ হারিয়ে যাওয়া না, ছিটকে কোথায় চলে যাওয়া! বদলীর চাকরিতে কে কোথায় বদল হয়ে যায় কে কার খোঁজ রাখে! তবু ভাল, আজ অফিসের এই সেদিনকার ছোকরাগুলো শুনেই লেগে পড়েছে—সত্যশরণের বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করতে অগ্রণী হয়েছে! ওরা প্রশংসার পাত্র!

সহসা চোখ দুটো শশধরের অকারণে ঝাপসা হয়ে আসে—সে তো কই পারল না ওদের মত আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে! চাকরি করতে করতে কি একটা মহৎ জিনিস যেন সে খুইয়ে ফেলেছে এই বিশ বছরে! সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা বোধে আর তেমন উত্তাপ নেই আগের মত। সব যেন কেমন বাঁধাধরা বিস্বাদ!

দেখতে গেলে তাদেরই মত বয়স্কদের এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত ছিল। সত্যশরণের পরিবারের দুরবস্থাটা তারা যেমন বুঝবে, ওরা আর কি বুঝবে! হুজুকে সব!

কাগজপত্তর বেঁধে বাইরে বেরতে সহকর্মী পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা। বয়েসের দিক থেকে দুজনে এক, চাকরির স্থায়িত্বেও। একথা সেকথার পরও শশধর কিন্তু নিজে থেকে কিছুতে সত্যশরণের জন্যে চাঁদা তোলার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে পারলে না। সে জানে পঞ্চানন হয়তো ছোকরাদের সঙ্গে তারই মত ব্যবহার করেছে, তবু জিজ্ঞেস করে যেন লাভ নেই—আত্মপক্ষ সমর্থনে সঙ্গী পেয়েও তৃপ্তি নেই।

এক সময় পঞ্চানন নিজে থেকেই বললে, সত্যটা মারা গেল!

শশধর অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলে। অকারণে সংকোচ বোধ করলে।

পঞ্চানন বললে, তুমি কি দেখেছো তাকে? সাজাহানপুরে যেবার বদলী হয়ে গেছলুম দেখেছিলুম...একেবারে লক্ষ্মী-ছাড়া! কত করে বললুম, চল দেশে ফিরবি—সেই তো চাকরি হওয়া থেকে বিদেশে আছিস! আশ্চর্য, আসতে চাইলে না—বললে বেশ আছি বিদেশে! এখন ছেলেমেয়ে পরিবারের দেশে ফেরবার অবস্থা নেই। এক নম্বর লক্ষ্মীছাড়া!

শশধর চুপ করে রইল। তার বলবার কিছু নেইও। আত্মীয় না, সহকর্মী!

পঞ্চানন বললে, তখন অমন সস্তার-গণ্ডা তখনি যা হাল দেখেছিলুম বলবার নয়—এক পাল ছেলেমেয়ে, আর ওতো অমনি! তবে হ্যাঁ, বউটা পেয়েছিল তপস্যা করে— ও না থাকলে সত্য কবে শেষ হয়ে যেত। সত্যি বলচি, দুঃখুটা আমার সেই মেয়েমানুষটির জন্যে হচ্চে। ও নেশাখোর গেছে বেশ হয়েছে। পরিবারের হাড় জুড়িয়েছে।

ইচ্ছে থাকলেও শশধর আগ্রহ প্রকাশ করে না। সত্যশরণের কোন উপকারেই সে আসতে পারবে না। আর এ তো দেখা যাচ্ছে, সত্যশরণ নিজেই নিজের সর্বনাশ করেছে, বউ-ছেলেকে পথে বসিয়ে গেছে! তার দায়িত্ব কি সহকর্মীদের? বেশ করেছে সাহায্য করতে সে অস্বীকার করেছে!

পঞ্চানন বললে, তবে লোকটা ডাকাবুকো ছিল, আর পাঁচটা কেরানীর মত মিউ মিউ করতো না! অমন যে রিমার সাহেব তাকেই একবার জব্দ করে দিয়েছিল—

সহকর্মীর সাহসে ঠিক শ্রদ্ধা নয়, কেমন যেন একটা কৌতূহল বোধ করে শশধর। রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে অপেক্ষা করে।

পঞ্চানন মজা করার মত বললে, আমি তখন সেখানে। রোজ দেখি সত্য দেরী করে অফিসে আসে, রোজই গালমন্দ খায়! ব্যাপার কি: কিচ্ছুই বলে না। একদিন কোথাও কিচ্ছু নেই—দু মাসের ছুটির দরখাস্ত করলে, বউএর বাড়াবাড়ি অসুখ। সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ছুটি রেকমেন্ড করবে না, সত্যও ছাড়বে না। শেষটা কি হবে দরখাস্ত এমনি সাহেবের টেবিলে পাঠিয়ে দিলে—ছুটি না মঞ্জুর হয়ে ফিরে এল! সত্য কিচ্ছু বলে না, সেই দেরী করে আসতে লাগল।

পঞ্চানন খানিকটা হেসে নিলে বিষম খাওয়ার মত।

একদিন করলে কি, সব ছেলেমেয়েগুলোকে অফিসে নিয়ে এসে বড় সাহেবের কামরার বাইরে গড়াগড় বসিয়ে দিলে। ওর মধ্যে একজন না দুজনের হাতে লজেঞ্জস, বিস্কুট দিয়েছিল, আরগুলো শুনবে কেন, মারামারি চেঁচামেচি আরম্ভ করলে, সত্য যেন কিচ্ছু জানে না, বেরাল বাচ্ছা চালান করার মত চুপটি করে সিটে এসে বসেছে। সাহেবের ঘর থেকে চাপরাসী ছুটে এল, সত্যশরণকো বোলাও। খানিক পরে দেখি সত্য হাসতে হাসতে ফিরে আসছে। কি ব্যাপার? ছুটি মঞ্জুর! সুপারিন্টেন্ডেণ্ট রামশরণ খুব জব্দ হয়েছিল! এক এক সময় এমন কাণ্ড করতো লোকটা—

রিমার সাহেবের প্রতাপের কথা জানা আছে শশধরের—রামশরণেরও কথা শোনা, ডিপার্টমেণ্টে এমন একটা পাজী লোক আর হয়নি। সত্যশরণ দুজনকেই জব্দ করেছিল। সময় সময় কেরানী কেঁচোরাও মাথা তোলে।

পঞ্চানন পঞ্চমুখ: আর একবার এমনি এক সাহেবকে দড়াম করে' মেরে দিলে—সে এক কাণ্ড! আরুভানকাজুতে ওকে বদলী করে দিলে, সত্য পিছপাও নয়, গেল চলে।

শশধর তেমনি চুপ। মৃতের গুণগানেও মনটা ভার হয়ে ওঠে।

কিন্তু—পঞ্চানন উপসংহার টেনে বললে, লোকটা যাকে বলে এক নম্বর ইরেসপন্‌সিবল্‌, ছেলেমেয়ের কথা একেবারে ভাবতো না। চিরকাল ছেলেমানষীই করে গেল! আরে কেরানীর কি ওসব সাজে?

কথাটা সত্যি হলেও শশধর সায় দিতে পারে না পঞ্চাননের মন্তব্যে। কোথায় যেন সত্যশরণের পক্ষে এই ছেলেমানষীর একটা যুক্তি আছে। এই 'ডোণ্টকেয়ার' ভাবের মানে। অলক্ষ্যে শশধর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

পাঁচটা বেজে সতের মিনিট। সেক্‌শন খালি। একে একে সবাই চলে গেছে। খালি চেয়ারগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে মতিভ্রমের মত। শশধর কাগজপত্তর গুটিয়ে উঠে পড়ল। আজ তার দেরী হয়ে গেছে— সাহেবের ঘরে 'স্পিক' কেস ছিল।

একা-একা হঠাৎ যেন ভয়ও করল। খালি চেয়ারগুলো অশরীরী প্রেতের মত; এই থাকা, এই না-থাকার অবান্তর প্রশ্নে মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল! সত্যশরণ সে-অফিসে যে চেয়ারটা দখল করতো সেটা নিশ্চয়ই এখনো খালি পড়ে আছে—কেউ দেখুক চাই নাই দেখুক।

সেক্‌শন থেকে বেরিয়ে করিডরের সামনে সাহেবের ঘরটা পেরোতেই পা দুটো শশধরের আটকে গেল। চাপরাসীদের বসবার ছোট্ট বেঞ্চটা খালি, ঘরের পর্দাটা গলায় দড়ির মত নিস্পন্দ।

সহকর্মী পঞ্চাননের মুখে শোনা সত্যর ছুটি আদায়ের ছবিটা স্পষ্ট চোখের ওপর ভেসে উঠলো শশধরের। শিশুপুত্র কন্যাদের হৈ-হল্লা, কান্না!

রিমার সাহেব জিজ্ঞেস করতে সত্য বলেছিল, কি করবো স্যার, ভেরি নটি!... নো ম্যানেজ, দেয়ার মাদার সিক্‌...নো লিং ...অফিস ওয়ার্ক কাণ্ট সাফার!

সাহেব বলেছিল, গেট আউট্‌ ব্লাডি, টেক্‌ এ্যাজ্‌ মাচ লিভ এ্যাজ্‌ ইউ লাইক্‌, গেট আউট্‌, গেট আউট্‌, হ্যারি আপ্‌!

সত্যি, স্ত্রীর অসুখ করলে এতগুলো ছেলেপুলে সামলে অফিসের কাজ বজায় করা একটা নগণ্য চাকুরের পক্ষে সহজ নাকি! এত বড় নিঃস্ব সংসারে ঐ তো একমাত্র সহায় সম্পদ কেরানীর!

সত্যশরণ সেদিন চালাকি করেনি, একটা মর্মান্তিক সত্য সহকর্মীদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছিল। কেউ বোঝেনি, সত্যশরণের কূট বুদ্ধির প্রশংসা করেছিল।

নিজের কথা ভাবতে গিয়ে শশধরের মাথাটা যেন হঠাৎ ঘুরে যায়। সত্যশরণের মত অবস্থা তাদের হাতে কতক্ষণ! কাপয়সার চাকরি, কি-ই বা এর ভবিষ্যৎ!

শশধর চোখ দুটো রগড়ে নিলে। সাহেবের ঘরের পর্দাটা নড়ছে চোখ-টেপা কৌতুকে। চাপরাশীটা ফিরে এসে মাথার পাগড়ি খুলে বেঞ্চের ওপর রেখেছে। ঘোমটা মুখো সরকারী বাড়িটায় ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

কালই দুটো টাকা ছোকরাদের হাতে দিয়ে দেবে শশধর। বেশি দেবার ক্ষমতা তার নেই, থাকলে নিশ্চয়ই এ অবস্থায় সে দিতো! সব মাপা-জোপা, একটি পয়সা এদিক ওদিক করবার ক্ষমতা নেই—কি মুশকিল, পাঁচজনের কাছে এত ছোট হতে হয়! তাদের বেঁচে থাকাই বৃথা!

পরের দিন ওরা আবার বেরুল চাঁদা তুলতে। প্রতিশ্রুত সাহায্য যা পায় কুড়িয়ে বাড়িয়ে। শশধর নিজের টেবিল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, ওরা তার দিকে আসে কিনা। না, ওরা ঘুরে গেল অন্য দিকে। একটি ছেলে যেন এগিয়ে আসছিল,

পেছন থেকে কে যেন তাকে বারণ করলে—ওদের মধ্যে চোখ টেপাটিপি হ'লো, ওরা এদিকে আর এলো না।

শশধর চোখ নামিয়ে কাজে মন দিলে। চোখ মুখ গরম হ'য়ে উঠলো। কাল কি বলেছে তার জন্যে ওরা যে এতটা অপমান করবে শশধর কল্পনা করতে পারেনি।

বয়েই গেছে না নিল। এই যাদের মনোবৃত্তি তারা করবে পরের ভাল! ভালই হ'লো ওদের মধ্যে সে নেই! হুঃ, দু' পয়সা ছুঁড়ে দিলেই অমনি বড় কাজ হলো!

কিন্তু পকেটের মধ্যে টাকা দুটো ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করছে। অনেক কষ্টের টাকা. সহকর্মীকে সাহায্য করবার জন্যে আজ বাজার পর্যন্ত সে করেনি। কেউ নিলো না, এই দুঃখু। ওরা না নিক, সে যে ক'রে পারে সত্যশরণের স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেবে। এ টাকায় তার কতটুকু দুঃখু আর লাঘব হবে? সে-দুঃখু তো ...রের সবাইকে সে আজ ভোগ ...রেছে! তবু সে বেঁচে আছে, ...কের শূন্য হাত কাল মাসকাবারে ...র্ণ হবে! কিন্তু সত্যশরণের পরিবার? ..., অসহায়ার পক্ষে হয়তো তা এখন ... টাকা!

পঞ্চাননের সঙ্গে একবার করিডরে ... হ'লো। অফিসের কথাই বললে ...। আজ সত্যশরণকে সে ভুলে ...। কি তার আর প্রয়োজন নেই। ... ভোলা হয়ে গেছে যখন তখন আর ... সহকর্মী হিসাবে এর চেয়ে বেশি ... কি কোথায় করা যায়! শশধর ...ননকে দোষ দেয় না, এই-ই চলে ...ছে, যতদিন কেরানীরা থাকবে ততদিন ... হয়তো। উপায় কি আছে?

এক সময় শশধর নিজে থেকে জিজ্ঞেস ...লে, ওরা কত তুললে?

হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ...নন বললে, কে জানে কত! কাজ ..., কম্ম নেই, দাও চাঁদা! বলে নিজে ... না খেতে—

তুমি দাওনি কিছু? শশধরের ...টা কেমন বিস্ময়াবিষ্ট মনে হয়।

ক্ষেপেচো! নিজে বাঁচি আগে! কই ... তো দেখি আমাকে আট গণ্ডা পয়সা! বিপরীত শোনায় পঞ্চাননের জবাবটা।

শশধর চুপ। বলবার কিছু নেই, কিন্তু নিজে কিছু দেয়নি ব'লে পঞ্চাননের মনোভাবটা সে অনুমোদন করতে পারে না।

পঞ্চানন কি ভাবে কে জানে, একটু থেমে নীচু সুরে বললে, আরে ভাই দিই কোত্থেকে? বুঝি দেওয়া উচিত, কিন্তু মিনস্ কোথায়! বললে বিশ্বাস করবে না, আজ বাজারটাই বন্ধ করতে হ'লো—এই করে যদ্দিন যায়। সত্য মরেচে না বেঁচেছে। কেরানীর আবার বাঁচা মরা!

শশধর মাথা নাড়ালে। কথাগুলো পঞ্চাননের কিছু বাড়ান নয়। হৃদয়-বৃত্তির উত্তাপটা দিনে দিনে কিভাবে যে নিভে যাচ্ছে!

পঞ্চানন এদিক ওদিক চেয়ে বললে, মাসকাবারের এখন কোথায় কি এর মধ্যে হাত ফাঁকা! ক'দিক সামলাবো!

পুরোন কথা নতুন করে বলাতে হয় প্রতি মাসেই। দুঃখের বোধ নাই থাক, একটা উদ্বিগ্ন অস্তিত্ব বোধ আছে—অন্ধকার ভবিষ্যৎ হাতড়ানর মত।

বলে' ফেলেই পঞ্চানন যেন কেমন হ'য়ে গেল, গোটা দুই টাকা ধার দিতে পার, মাইনে পেলেই দিয়ে দেব। বড্ড—

শশধর কোন সাড়া করলে না। পঞ্চানন অপ্রস্তুতের মত পা ঘষে এক সময় চলে গেল। বন্ধুদের অবস্থা সে জানে, চাইলেই যে পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশা সে করে না। যদি পাওয়া যায় এই আর কি!......

না, আর কোন ছলে শশধর সংগৃহীত চাঁদার সঙ্গে নিজের চাঁদাটা যোগ করে দিতে পারলে না। কিছুতেই মুখে উদ্যোক্তাদের বলতে পারলে না, এই নাও, পাঠিয়ে দিও! শুধু বাধ-বাধ নয়, কেমন

একটা অবুঝ অভিমানও বোধ করে সবার ওপর। সে কি বলেছে যার জন্যে ওরা তাকে এমন একটা মহৎ কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলে। দেবে না একথা তো সে একবারও মুখ ফুটে বলেনি।

ভালই হ'লো, টাকাটা বেঁচে গেল। ঐ তো পঞ্চানন দেয়নি, ওর কি হ'চ্ছে! দুঃখু করবার কিছু নেই। ঠিক আছে। পকেট টিপে একবার দেখে নিলে টাকা দুটো আছে কিনা। কি ভেবে একবার বার করে চোখের সামনে তুলে দেখলে। নোট দুটো একেবারে নেতা হ'য়ে গেছে—মনে হয় অচল।

ছুটি হ'তে ফেরবার পথে পঞ্চাননের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হ'লো। পা চালিয়ে শশধর পাশে এসে দাঁড়াল, পঞ্চানন থামলে।

হেসে শশধর বললে, চল, বাড়ি যাই।

অবাক গলায় পঞ্চানন বললে, বাড়ি তো যাচ্ছি! তার মানে?

শশধর জবাব দিলে না, হাসতে লাগল। পঞ্চানন সামনে এগোল।

খানিকটা পথ এক সঙ্গে এসে হঠাৎ শশধর জিজ্ঞেস করলে, টাকা পেলে?

পঞ্চানন ঘুরে দাঁড়াল। ডুবন্ত লোকের কুটি আঁকড়ান আগ্রহ তার চোখে মুখে। অস্ফুটে বললে, না!

শশধর চুপি চুপি পকেট থেকে টাকা দুটো বার করে বললে, এই নাও।

হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়ে পঞ্চাননের চোখ দুটো ছল ছল করে' উঠলো। কি বলবে সে ভেবে পেল না। সামনে গিয়ে বললে, ঠিক পয়লা দিয়ে দেব ভাই।

শশধর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যেদিন খুশী তোমার দিয়ো, ব্যস্ত হ'তে হবে না।

* * *

পাখা দিয়ে মশা তাড়িয়ে মশারীটা সন্তর্পণে ফেলে হাঁটু মুড়ে চারদিক ভাল করে' গুঁজে দিয়ে খাট থেকে নেমে শোভনা বললে, একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি, বলবো বলবো করে রোজই ভুলে যাই—

মশারীর তাঁবুর মধ্যে থেকে শশধর বললে, কি?

শোভনা বললে, সাবিত্রীদি'র কথা মনে পড়ে? সেই যে গো আমাদের বিয়ের সময় যে খুব রগড় করেছিল?—খুব হাসিখুশী! মনে পড়ছে না?

মশারীর ভেতর অন্ধকারটা বেশি, তালিতে তালিতে দম বন্ধ। শশধরের হয়তো মনে পড়ছে।

আমাকে চিঠি লিখেছেন, তাঁর বড় ছেলেকে যদি আমাদের বাসায় রাখি এ বছর ম্যাট্রিক দেবে! শোভনা যেন সব গোলমাল করে' ফেলছে বক্তব্যটার।

শশধর জিজ্ঞেস করলে, হঠাৎ আমাদের বাসায় কেন?

যেই ধরে শোভনা বললে, ওঁরা বিদেশে থাকেন......আজ ক'দিন হ'লো স্বামী মারা গেছেন—অনেককাল দেশ-ছাড়া! সবাইকে লিখে দেখছে, যদি আশ্রয় পাওয়া যায়! আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে কিনা।

শশধর উত্তর দিলে না। চেয়ে দেখলে, কোথায় যেন একটা সিঁদ কেটে মশা ঢুকে পড়েছে—পোঁ পোঁ সুরে টানছে।

শোভনা বললে, আমি কিন্তু থাকবার কথা বলে' চিঠি লিখে দিয়েচি। জানি তুমি এসব ব্যাপারে কখনো না করবে না! তা ছাড়া সাবিত্রীদির ঐ তো ভরসা!

শশধর যেন এতক্ষণ নিঃশ্বে[illegible] করে ছিল। দম ছেড়ে বললে, এখন কোথায় আছেন?

সাজাহানপুর! ঐখানেই তো [illegible] বাবু চাকরি করতেন! শোভনা [illegible] কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, ঢুকেছে বুঝি, অমন ছট্-ফট্ করচো

না, তুমি আলোটা নিভিয়ে [illegible] চোখে লাগছে! শশধর বিকৃত [illegible] বললে।

আলোটা নিভতে শশধর অন্ধ[illegible] চোখ চেয়ে দেখলে। মসীকৃষ্ণ অ[illegible] অন্ধকার, নিরন্ধ্র, নিচ্ছিদ্র! হঠাৎ [illegible] মাঝে স্পষ্ট যেন দেখা যায়, সত্য[illegible] বাবুর ছুটি আদায়ের দৃশ্যটা। [illegible] ভোঁতা ছেলেমেয়েগুলো দীন বেশে [illegible] মুখে অপেক্ষা করছে—সাহেবের [illegible] থেকে কখন ওদের বাবা ফিরে আ[illegible]

শশধর বালিশে মুখ গুঁজে [illegible] মুছে ফেলতে চায়। একটা [illegible] ঘাড়ে আসছেই! কোথাকার আত্মী[illegible] ঠিক নেই, উনি কথা দিয়ে বসে [illegible]

এক সময় খাট থেকে নেমে [illegible] জেলে শশধর নীচের বিছানাটার [illegible] চেয়ে দেখলে। শোভনা এরি [illegible] ঘুমিয়ে কাদা, কচি বাচ্চা দুটো [illegible] ঘাড়ে পড়েছে। শোভনা নিজের মশা[illegible] পর্যন্ত আজ খাটায়নি। আচ্ছা ঘু[illegible]!

দড়ি-দড়া ঠিক করে' নীচের বিছ[illegible] মশারীটা খাটাতে খাটাতে শশধরের [illegible] সময় মনে হয়, ভাগ্যে টাকা দুটো [illegible] ক'রে ওদের হাতে তুলে দেয়নি! [illegible] মত ডবল খরচ করে' ফেলেনি। [illegible] বেঁচে গেছে!

ইন্দ্রজিতের আসর

গতবারে বলেছিলাম আমার সব কথাই গর-ঠিকানা। যে কথাটা বলব বলে শুরু করি সে কথাটা শেষ পর্যন্ত আর বলা হয়ে উঠে না। কথাটা চলতে চলতে হঠাৎ মনের ভুলে সোজা রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ের গলিতে ঢুকে পড়ে। গন্তব্যস্থলে গিয়ে কিছুতেই পৌঁছয় না। সেইজন্যেই বলছিলাম আমার কথাগুলো অমিট্রায়ের ভাবী বধূর মতো গর-ঠিকানা মেয়ে—শেষপর্যন্ত ঘরে এসে পৌঁছয় না। আমার বেশির ভাগ লেখা সম্বন্ধেই বন্ধুরা বলেন, এহ বাহ্য, আগে কহ আর অর্থাৎ কিনা কি বা বলতে শুরু করেছিলে আর কোন কথায় বা এসে শেষ করলে।

এ দোষটা আমার এমনি মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, এখন এর একটা জবাব-দিহির প্রয়োজন হয়েছে। লেখার যে মূল দোষ—সেটা হচ্ছে লেখকের স্বভাব-দোষ। যে স্বভাব মলে যায় না সে স্বভাব লিখলে যাবে কেন? আসলে আমি লোকটাই গর-ঠিকানা। ঘর থেকে যখন বেরোই তখন একটা গন্তব্যস্থল মনে মনে অবশ্যই ঠিক থাকে। কিন্তু দেখলাম সেখানে যত সহজে পৌঁছনো তত সহজ নয়। আড্ডাধারী মানুষের ঐ বিপদ। আড্ডার ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম সকাল আটটায় অত্যন্ত জরুরী কাজে। গলির মোড়েতে পৌঁছতেই চায়ের দোকান থেকে ডাক এল, এই যে কোথায় চলেছেন? বসুন, আসুন।

নাঃ এখন সময় নেই, যাচ্ছি জরুরী কাজে।

আঃ এক কাপ চা বইতো নয়। আসুন, আমরাও এক্ষুণি উঠছি।

অতএব বসতে হল; কিন্তু মুশকিল এই যে, আমি বসতেই জানি উঠতে জানিনে। আড্ডা এমনি স্থান, যেখানে আর সবাই মুখর, কেবল সময় স্তব্ধ। বসে-ছিলাম বেলা আটটায় এক কাপ চা খেতে। যখন উঠলাম তখন বেলা এগারোটা। চা পর পর তিন কাপ হয়ে গেছে। দুনিয়ার বহুবিধ জটিল সমস্যারও মোটামুটি সমাধান হয়েছে। শুধু যেখানটায় যাওয়ার কথা সেখানটায় যাওয়া হয়নি যদিচ কাজটি সত্যিই জরুরী ছিল।
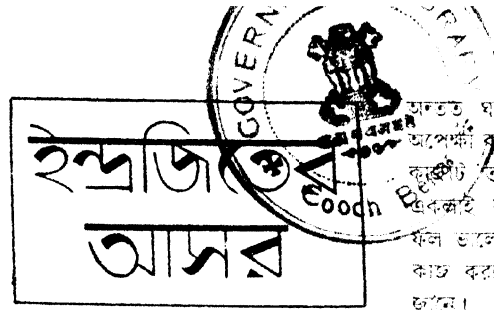
এমন ঘটনা আমার জীবনে অহরহ ঘটে থাকে। কোনো জরুরী কাজই আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা সমাধা হয়নি। অথচ তাই বলে কোনো কাজ আটকেও থাকে নি। জরুরী কাজের এই একটা সুবিধে যে ওর নিজেরই একটা তাগিদ থাকে। জানি আমাকে না পেলে ও আর কাউকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেবে। তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত হিসেবেও গরমিল হয় না। একটা কাজ না হয়েছে তো আরেকটা হয়েছে। আড্ডাটাও তো একটা কাজ। আমি যেখানটায় থাকি সেখানটায় একটি অত্যন্ত সুরসিক সমাজ আছে। তাঁরা এই মহৎ সত্যটি স্বীকার করেছেন যে নিছক আড্ডা দেওয়াটাও একটা মস্ত বড় কাজ। তাঁরা আমাকে শুধু বলে দিয়েছেন, তুমি যে কাজটি সব চাইতে ভালো পার সে কাজটিই আমাদের জন্যে কোরো। আমি সানন্দে তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়েছি—অর্থাৎ সেই থেকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন আড্ডা দিয়ে যাচ্ছি। আনাতোল ফ্রাঁসের গল্পে সরলপ্রাণ বাজিকর যেমন ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে যীশু-মাতার পুজো করেছিল আমি তেমনি আড্ডা দিয়েই আমার দেবতার পুজো সমাধান করি। আমি জানি আমার দেবতা তাতেই তুষ্ট হয়েছেন।

যদিচ কথা বলাটাই আমার প্রধান কাজ তথাপি কার্যত আমি কথায় এক কাজে আর। ঐ যে জরুরী কাজে যাচ্ছি বলেও পাক্কা তিন ঘণ্টা চায়ের দোকানেই কাটিয়ে দিলাম ওটি হচ্ছে আমার আদি এবং অকৃত্রিম স্বভাব। জরুরী কাজটা নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গেই ছিল এবং সেই ব্যক্তিটি তিন ঘণ্টা না হোক্ অন্তত ঘণ্টাখানেক নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসেছিলেন। অতঃপর জরুরী কাজটি তাঁকে আমার সাহায্য ব্যতিরেকে একলাই করতে হয়েছে। বোধকরি তাতে ফল ভালোই হয়েছে কারণ অকেজো মানুষ কাজ করতে জানে না, কাজ বাড়াতে জানে।

আমি যে কথামতো যথাসময়ে যথা-স্থানে পৌঁছতে পারি না তার জন্যে আমি খুব দুঃখিত কিম্বা লজ্জিত বোধ করি, এমন নয়। বরং আমার জন্যে আর পাঁচজন অপেক্ষা করে বসে আছেন ভেবে মনে মনে বেশ একটু আত্মতৃপ্তি বোধ করি। এই যে এতক্ষণে এলেন! আপনার জন্যে সেই কখন থেকে বসে আছি—এ ধরণের কথা শুনতে ভারি ভালো লাগে। ঠিক মনে নেই; বোধ-করি অস্কার ওয়াইলড্ বলেছিলেন, —the easiest way to make yourself important is to keep others waiting for you. আমি এই তত্ত্বটিকে জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে আমার এই স্বভাবের ফলে আমার উপরে বন্ধুদের আস্থা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে অর্থাৎ আমার সঙ্গে এখন আর পারৎপক্ষে কেউ কোনো এপয়েণ্টমেণ্ট করেন না। শুধু তাই নয়, আমার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে আরো যে সব উক্তি করে থাকেন সেগুলো মোটেই বন্ধুজনোচিত নয়। আপনাদের কাছে সব কথা খুলেই বলি। এখানটায় বাইরে থেকে নতুন কেউ এলে দু' একটা বিষয়ে নবাগতকে সাবধান করে দেওয়া হয় যথা—সাপ খোপের ভয় আছে, সন্ধ্যের পরে টর্চ না নিয়ে বেরোবেন না। দু একটা পুরোনো কুয়ো আছে, ভালো করে বোজানো হয়নি। দেখে শুনে চলবেন নয় তো কুপোকাৎ হবার আশংকা আছে। আর অমুকবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন। সাবধান ওঁর সঙ্গে কক্ষণো এপয়েণ্টমেণ্ট করবেন না। দেখা তো পাবেনই না, লাভের মধ্যে হয়রানির এক-শেষ হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, এসব কথা শুনে আমার মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখ

হয়েছে। দোষের মধ্যে তো ঐ একটু আড্ডা দেওয়ার অভ্যেস, তাতে যদি অত কথা শুনতে হয় তো আড্ডা দিয়েই বা কি সুখ? অথচ মজার কথা কি জানেন? আমি যে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে পারিনে তার মূলে এই এ'রাই। আড্ডা দিই কার সঙ্গে? এ'দের সঙ্গেই তো। তবে কিনা এ'রা আসেন, আড্ডা দেন, আবার কাজে চলে যান। সুখের বিষয় একজন যান তো আরেকজন আসেন। আমি, ঐ যে আমাদের দেশে বলে—যোগীরা যোগাসন ছেড়ে ওঠেন না, আমিও একবার আড্ডায় বসলে আড্ডা ছেড়ে কখনো উঠি না। ডক্টর জন্সন্ বলতেন, I want to fold my legs and have my talk out. ও'র বন্ধু ছিলেন জন্ ওয়েস্‌লি। পণ্ডিত ব্যক্তি আবার মজলিশি লোকও বটেন; কিন্তু ভয়ানক বাস্তববাগীশ মানুষ। জন্সন্ সবে পা গুটিয়ে বসে গল্প জমাতে যাচ্ছেন ওয়েস্‌লি সে মুহূর্তে উঠে পড়লেন—কাজের তাড়া আছে। জন্সন্ দুঃখ করে বলতেন, ও দুদণ্ড সুস্থিরে বসতে শিখল না। ওয়েস্‌লি অনেক কাজ করে গেছেন কিন্তু ডক্টর জন্সন্ জীবনভর শুধু আড্ডা দিয়ে যে অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন ওয়েস্‌লি তার শতাংশের একাংশ নয়। বেশ দেখতে পাচ্ছি আমার বন্ধুদেরও সেই দশা হবে। ও'রা সব কাজের লোক ব্যক্তি; কিন্তু দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত ক'জনে মনে রাখে। ইদিকে খুদে জন্সন্ হিসেবে আমার নামটা বাংলা দেশের ইতিহাসে চাই কি, থেকে যেতেও বা পারে। যাক্‌গে, আমার আবার নিজ মুখে নিজের গুণকীর্তন কারবার দোষ আছে। একটা দোষ ঢাকতে গিয়ে পাছে আরেকটা দোষ বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে এখানেই শেষ করছি।

চক্রদত্ত

"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে জগত" আর এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের খবরাখবরেরও পরিবর্তন ঘটছে। বিশেষত বিজ্ঞান জগতে নিত্য নতুন খবর পরিবেশন করা হচ্ছে। আজ যা সত্যি বলে জগতের কাছে পরিচিত কাল বৈজ্ঞানিকের চোখে তাই মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষরা জানিয়েছেন যে,

পিল্ট ডাউন ম্যানের মাথার খুলি

তাদের যাদুঘরে "পিল্ট ডাউন ম্যান" নামে জগদ্বিখ্যাত যে মাথার খুলিটা রাখা আছে সেটা সত্যি সত্যিই মানুষের কোনও পূর্বপুরুষের মাথার খুলি নয়। এ সম্বন্ধে এতদিন পর্যন্ত যেসব খবর সংগৃহীত হয়েছে সে সবই ধাপ্পা। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ডসোন নামে একজন উকিল এবং সখের নৃতত্ত্ববিদ্ সাসেক্স শহরের কাছে পিল্ট ডাউন গ্রামে মাটির নীচে থেকে এই মড়ার মাথার খুলি আর একটি দাঁত ও চোয়ালটি আবিষ্কার করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, এটি ৬০০,০০০ বছর আগের কোনও মানুষের মাথার খুলি। কেউ কেউ আবার সিদ্ধান্ত করেন যে, এই খুলি থেকে ডারউইনের "মানুষ-বাঁদর বাদ" তথ্যটির যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এই খুলিটার নাম দেওয়া হলো—"পিল্ট ডাউন ম্যান" আর এর নীচে লেখা হলো "ইয়ানথ্রোপাস্ ডসোনি"। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ডসোনের খাতিরও খুব বেড়ে গেল। ডসোন মারা গেলে পিল্ট ডাউন গ্রামে ওর সমাধির পাশে একটি মনুমেণ্ট তোলা হলো। বিজ্ঞানীদের সন্ধানী দৃষ্টিতে কিছু সন্দেহের আভাস রয়ে গেল। এরা সন্দিগ্ধ হয়েই অনুসন্ধান চালাতে থাকেন। বিশেষত এই খুলিটির চোয়ালের দিকটা বাঁদরের চোয়ালের মত দেখতে লাগে বলে প্রথম থেকে এদের সন্দেহ হয়। বৈজ্ঞানিকরা জানেন যে, বহু পুরান হাড়ের ওপর ক্লোরিন জমতে থাকে আর এর থেকেই বোঝা যায় হাড়টা কতদিনের পুরান। এরা লক্ষ্য করে দেখেন যে, খুলিটিকে যত প্রাচীন বলা হয়েছে ততটা প্রাচীন হলে যে পরিমাণ ক্লোরিন জমা উচিৎ ছিল ততটা জমেনি বরং এটাকে ৫০,০০০ বছরের পুরান মনে হয়। আর চোয়ালের হাড়টা বর্তমানের বাঁদরদের মত, খুব সম্ভবত ওটা ওরাংওটাং এর। এটাকে বেশী পুরান দেখানর জন্য এর ওপর রং করা হয়েছিল এবং দাঁতগুলোও অন্য একম দাঁত লাগান হয়েছিল যাতে কিছুটা মানুষের মত এবং কিছুটা বাঁদরের মত দেখতে হয়। যাইহোক কিভাবে যে, এই ধাপ্পাবাজী চলেছিল তা আর জানা যায় না। তবে বর্তমান জগতে আর এই "পিল্ট ডাউন ম্যানের" অস্তিত্ব থাকবে না।

*

প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত রকমেই না ব্যবহার করছে। বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে সম্ভব অসম্ভব কত কিছু করা হচ্ছে। ডাঃ লিওকাসা গ্রাঁদে বৈদ্যুতিক শক্তিকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন। মাটির মধ্যে বিদ্যুৎ চালনা করে তিনি ভিজে বেলে মাটিকে শক্ত এ'টেল মাটিতে পরিণত করেছেন। এইভাবে মাটির পরিবর্তন হওয়ায় এইসব ভুসভুসে মাটির মধ্যে দিয়েও স্বচ্ছন্দে বিনা খোঁটায় সুড়ঙ্গ ও খাদ খোঁড়া যায়। ডাঃ লিওকাসা গ্রাঁদে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, নদী থেকে মাত্র ৪০ ফিট্ দূরে এইরকম বিদ্যুৎ চালিত এ'টেল মাটিতে কোনও রকম ঠেকনা না দিয়েও প্রায় ২১ ফিট্ গভীর সুড়ঙ্গ

খোঁড়া যায়। এতে সুড়ঙ্গটি তো ধসে পড়ে না, এমনকি মাটি এত শক্ত হয়ে যায় যে নদীর এত কাছে থাকা সত্ত্বেও নদীর জল এখানে চুঁইয়ে আসতে পারে না। গত যুদ্ধের সময় ডাঃ গ্রাঁদের এই আবিষ্কার খুব উপকারে লাগে। এইভাবে সমুদ্রের তলায় সহজেই সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছিল এবং ঐসব সুড়ঙ্গের মধ্যে ডুবো জাহাজগুলিকে লুকিয়ে রাখা হতো।

*

কথায় বলে "ভিক্ষের চাল আবার কাঁড়া আকাঁড়া"। ঠিক এই কথাটি খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আজকাল লোকেদের যেমন জোটে তেমন খায়। এমন যে ভেতো বাঙালী তাদেরও অর্ধেক ভাত অর্ধেক রুটি খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে। অবশ্য রুটি কিছু অখাদ্যের পর্যায়ে পড়ে না; তবে এতে প্রোটিনের পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে পারলে আরও ভালো হয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা গমের মধ্যের প্রোটিনের ভাগ কিছুটা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন। দেখা গেছে যে, তরল নাইট্রোজেন গমের গাছের পাতার ওপরে ছিটিয়ে দিলে সেই গাছের উৎপন্ন গমে প্রোটিনের অংশ বেশী হবে। সাধারণভাবে গমে শতকরা নয় ভাগ প্রোটিন থাকে কিন্তু নাইট্রোজেন ছিটানোর ফলে সেক্ষেত্রে শতকরা ১৭ ভাগ প্রোটিন হয়।

*

সব শিশুদেরই "বাবার মত বড়" হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি প্রবল থাকে আর যেসব শিশু শেষ পর্যন্ত বাবার মত বয়সে এসেও যখন বাবার মত লম্বা হতে পারে না তখনই দুঃখের সীমা থাকে না। বস্তুতঃ, আজকালকার দিনের ছেলে-মেয়েদের বেশ একটু লম্বা দোহারা চেহারা তৈরী করাই একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা একটু খাটো ধরণের তাঁরা ভাবেন যে, পিটিয়ে পিটিয়েও যদি দেহটাকে একটু লম্বা করা যায়! এইসব বেঁটে মানুষদের দুঃখের দিনের অবসান হতে চলেছে। ১৯২১ সালে প্রফেসর হার্বার্ট ইভানস্ আবিষ্কার করেন যে, মাথার মধ্যে ছোট্ট পিটুইটারি গ্রন্থির দ্বারা দেহের বৃদ্ধি ঘটে আর ১৯৪৪ সালে তাঁরা এই গ্রন্থির নির্যাস বার করে চিকিৎসার কাজে লাগান। এঁরা প্রথমে জীবজন্তুর ওপরেই হর্মোন চিকিৎসার পরীক্ষা চালান। মানুষের ওপরও পরীক্ষা করেন কিন্তু তখন কোনও সুফল তো পাওয়া যায়ইনি, উপরন্তু উল্টো পাল্টা ফল হয়। পরে কয়েকজন ডাক্তারে মিলে হর্মোন চিকিৎসার দ্বারা মানুষকে লম্বা করার পরীক্ষা চালান। এঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এইভাবে হর্মোন চিকিৎসায় অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের দেহ লম্বা করা যায়। একটি সাড়ে চৌদ্দ বছরের মেয়ের এই হর্মোন চিকিৎসার ফলে সে লম্বায় চার বছরে সাত ইঞ্চি বেড়েছে। অন্য একটি ১৮ বৎসরের মেয়ে এই চিকিৎসায় তিন বছরে ২ই ইঞ্চি বেড়েছিল। এই হর্মোনটির নাম দেওয়া হয়েছে "সোমাটোট্রোপিন"। এই বিশুদ্ধ হর্মোন দানাবাঁধা অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। যে ল্যাবরেটরীতে এই ওষুধটি তৈরী হচ্ছে তাঁরা বলেন যে, এটি খুব অল্প পরিমাণ হচ্ছে এবং বাণিজ্যিকভাবে প্রচুর পরিমাণে পেতে কিছুদিন দেরী আছে।

*

শীতের দেশে যারা বাস করেন তাঁদের পক্ষে ধোয়ামোছার জন্য জল যত কম ব্যবহার করতে হয় ততই ভালো। বিশেষত হাত ময়লা হলে বারে বারে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করা শীতের দিনে এক বিপর্যয় ব্যাপার। জল ব্যবহার না করে হাতটা পরিষ্কার করার একটা ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। নব-আবিষ্কৃত একটি ক্রীম জাতীয় পদার্থের সাহায্যে হাত পরিষ্কার করার খুব সুবিধা হয়েছে। এই পদার্থটি দিয়ে হাতের যত রকম ময়লা তোলা যায় তাছাড়া, হাতে আলকাতরা, কাঠ-পালিশের রং, সাধারণ রং, তেল-চর্বি জাতীয় সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। ক্রীমের মত জিনিসটি হাতে লাগিয়ে ঘষতে থাকলে তরল হয়ে যায়, তখন হাতের ফাঁকে বা ফাটার মধ্যেও ময়লা থাকলে পরিষ্কার করে দেয়। এরপর একটা তোয়ালেতে হাতটা বেশ করে মুছে ফেললেই সব ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে জলের দরকার হয় না তবে ইচ্ছে করলে পরে জল ব্যবহার করতেও পারে। প্রতিবার হাত সাফ করতে এক চামচ মত এই ক্রীম লাগে। এটাতে সুবিধা এই যে, অন্য কোনওরকম হাত পরিষ্কারের রাসায়নিক পদার্থের চেয়ে কম প্রদাহকারী।।

*

ভোজনবিলাসী সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে তাতে দেখা যায় ভোজনবিলাসী একদা শ্মশানভূমিতে উৎপন্ন চালের ভাত খেয়ে মড়ার গন্ধ পেয়েছেন। এক্ষেত্রে বিলাসী ভদ্রলোকের অনুভূতি যত সূক্ষ্মই হোক না কেন কিন্তু সেটা সারমেয় জাতীয়। জিভের সাহায্যে খাদ্যের স্বাদের তারতম্য বুঝতে পারাই সত্যি-কারের ভোজনবিলাসীর লক্ষণ। বৈজ্ঞা-নিকেরা বলেন ভোজন সম্বন্ধে যে যেমনই বিলাসী হোক না কেন জিভের অনুভূতি প্রতি মানুষেরই অতি সূক্ষ্ম। এরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এক চামচ লবণ দশ গ্যালন জলে মেশানোর পরও মানুষের জিভে সেই জলে নোনতাস্বাদ লাগে। এক চামচ চিনি দু গ্যালন জলে মেশালেও জলটা মিষ্টি লাগে আবার চল্লিশ গ্যালন জলে এক চামচ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড্ মেশালে জলটা জিভে বেশ টক্ লাগে। এক চামচ কুইনাইন এক হাজার গ্যালন জলে মেশালে জলটা তিত হয়ে যায়। এই তিক্ত স্বাদের অনুভূতিটাই তীব্র। বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রাথমিক পরীক্ষার ওপর নির্ভর করেই মানুষের খাদ্য কি রকম স্বাদযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।

রঞ্জন

তিন

মন ঠিক করা এক কথা। সে অনুযায়ী কাজ করা আর। কার্ল লক্ষ্য করেছে, যখনই তার মধ্যে বুদ্ধি ও আবেগের দ্বন্দ্ব হয়েছে, প্রতিবারই বুদ্ধি পরাস্ত হয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে সে যা ঠিক করে, তা হঠাৎ কোন এক দুর্বলতা এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এটাকে দুর্বলতা বলতেও বাধে। দয়া কি দুর্বলতা? মমত্ববোধ কি নির্বুদ্ধিতা? অনুকম্পা কি ক্লীবতা? ভালোবাসার জন্যে, অন্যকে আঘাত দেয়া এড়াতে কেউ যদি নিজে আহত হয়, যদি তার জন্যে বুদ্ধির নির্দেশও অমান্য করতে হয়—তাহলে কি তাকে কাপুরুষ বলতে হবে?

কার্ল ভেবে কূল পায় না। উদাসীন, উন্মত্ত, কূলহারা সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে। সূর্যোদয় দেখে, সূর্যাস্ত দেখে। ঢেউ গোণে, ঢেউ শোনে। উদ্ধত কোনো তরঙ্গ যখন এগিয়ে আসতে থাকে, কার্ল ভরসা পায়; মনে হয়, দৃঢ় ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক ওই তরঙ্গ। পরে সেই ঢেউ যখন মায়ের কোলে শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে, কার্লের মনে হয় ওই অসহায় আত্মসমর্পণ বুঝি অবশ্যম্ভাবী। আশা বিদায় নেয়।

দশ দিনের ছুটির সাত দিন কেটে গেল এই অনিশ্চয়তার গোধূলিতে। রোজ রাত্রে বারবারার পাশে শুয়ে কার্ল অজাত শিশুর স্পন্দন শোনে। অনাগত সন্তানের গীতিময় পদধ্বনি শোনে। কিন্তু তার কানে তা ভীতিময় পদাঘাতের মতো শোনায়। বারবারার মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তরঙ্গতায় উৎসাহ থাকে না। কী এক কাম্য ক্লান্তিতে সে আনন কামনাহীন। কার্লের আপন উদ্দামতাকে পাশবিক বলে মনে হয়। বারবারার প্রত্যক্ষ প্রশান্তি আরো অসহ্য মনে হয়। বারবারা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আমার উপর রাগ করেছ, তাই নয়?"

কার্ল বলল, "না।" কিন্তু এই একটা বর্ণ বলতে তার এত দেরি হয়ে গেল যে যখন তা উচ্চারিত হোলো, তখন তার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার বাষ্পমাত্র ছিল না। আবার অনুনয়ের সুরে বারবারা বলল, "জানো, ডার্লিং, মাঝে মাঝে আমার নিজেরই উপর রাগ হয়। এত রাগ বোধ হয় তুমিও আমার উপর করো নি।" বারবারা কেঁদে ফেলল।

"রাগ করি নি।" কার্ল বলল দাঁতে দাঁত চেপে।

বারবারা আরো একটু কাছে সরে এসে বলল, "আমায় ক্ষমা করো কার্ল।"

কার্ল বারবারার দৃষ্টি এড়াল। কিন্তু তার স্বর শুনে কার্লের মনে হোলো, সত্যি যেন বারবারার প্রয়োজন নেই কার্লের ক্ষমায়। কোন এক প্রাপ্তিতে সে পূর্ণা। আর সব যেন তুচ্ছ। কার্লও।

বারবারা তারপর আর কিছু বলে নি। পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছে। ঘুম আসতে দেরি হয় নি। যে সমুদ্রের গর্জন প্রথম শুনলে মনে হয়, এর কাছে কোথাও ঘুমোনো অসম্ভব, তাই দু'দিন পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন সে কল্লোল যেন ঘুমপাড়ানী গান।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মনে নেই। অন্ধকারে হঠাৎ একবার ঘুমের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে বারবারা দেখল, বিছানায় কার্ল নেই। ঘুম ভেঙে গেল। জোরে বাতাস বইছিল। কাছাকাছি কোথাও আলো ছিল না, কিন্তু সমুদ্রের কালো জলে ফেনার সাদা হাসি জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। বারবারা হঠাৎ শুনল বাইরের বারান্দায় কে যেন কথা বলছে। কে এখন এই রাত্রে এই নির্জন সমুদ্রতীরে কার সঙ্গে কথা বলতে আসবে? কার্লই বা কোথায় গেল? কান পেতে বারবারা যা শুনল, তা কার্লের কণ্ঠে অবোধ্য কয়েকটা জর্মান কথা। কার্ল নিজের মনে কী বলছে এমন একা বাইরে দাঁড়িয়ে! বারবারা ডাকল, "কার্ল!"

কোনো সাড়া নেই। কার্ল আপন মনে কী বলে চলেছে। আস্তে। চাপা গলায়। ভয়, ভাবনায় বারবারার কণ্ঠরোধ হোলো। দ্বিতীয়বার কার্লকে ডাকতে পর্যন্ত পারল না। দূরে সমুদ্রের গর্জন কোন উন্মাদের আর্তনাদের মতো শোনাল। না, কোন পুত্রহারা মায়ের অবিরাম বিলাপ? বারবারা জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে রইল, গায়ের উপর চাদরটা টেনে দিল। যেন কিছু ঢেকে রাখতে হবে। যেন কিছু রক্ষা করতে হবে কোন শত্রুর হাত থেকে। এতক্ষণ সে ভয় পেয়েছিল। এখন যেন একা থাকাই বেশি নিরাপদ মনে হোলো। কাজ নেই কার্লকে ডেকে। বারবারা তো একা নয়।

হঠাৎ বিছানার পাশের অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে উঠল। সত্যি অ্যালার্ম! বারবারা চমকে উঠল। বারান্দা থেকে হঠাৎ কার্ল চেঁচিয়ে বলল, "কে?"

সশব্দে দরজা খুলে কার্ল ঘরে ঢুকল। অন্ধকার। সাদা বিছানার উপর বারবারা শুয়ে। কার্ল এগিয়ে এলো। বারবারা ভয় পেয়ে বিছানার একেবারে ধারে সরে গেল। কার্ল বসল বিছানার

উপর। অনেকক্ষণ দুজনের কেউ কোন কথা বলল না। ঘড়িটার অ্যালার্ম বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আর টিক টিক শব্দ ওই সমুদ্রের গর্জনকেও যেন ছাপিয়ে উঠছিল।

টিক টিক টিক টিক......

সময় যেন চলছিল না, বুঝি বা দাঁড়িয়ে থেকে লেফট রাইট, লেফট রাইট করছিল। প্যারেডে যেমন সৈন্যদের করতে হয়।

টিক টিক টিক টিক......

আর শোনা যাচ্ছিল, বারবারার নিঃশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ। বেঁচে থাকার কথাটা তার চেয়ে জোরে ঘোষণা করা যেন নিরাপদ নয়।

কার্ল আস্তে হাত বাড়িয়ে বারবারার হাতটা ধরল। বারবারা ভরসা পেল না। ভয় পেল। তবু জিজ্ঞাসা করল, "বাইরে কার সঙ্গে কথা বলছিলে, কার্ল?"

"বাইরে?" কার্ল থামল। তার গলা শুনে বারবারা অবাক হয়ে গেল। এ যেন কার্লের গলা নয়। অন্ধকারে কার্লকে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। অশরীরী ওই কণ্ঠ যেন তার স্বামী কার্লের নয়, যেন অন্য কোন অপরিচিত জগৎ থেকে অনাহূত অবাঞ্ছিত কোন অতিথি এসে বারবারার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। বারবারা হাতটা ছাড়িয়ে নিল কার্লের হাত থেকে।

হঠাৎ কার্ল আপন মনে বলল, "ঘড়িতে কে এই সময় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল?"

বারবারা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, "জানিনে তো। আমি তো দিইনি।"

"তুমিই দিয়েছ। তা নইলে মিসেস লোপেজ এমন ভয়ে ভয়ে ছুটে চলে গেলেন কেন?"

"কে চলে গেল?" বারবারা শুনেও শুনতে চাইল না।

"তোমার মা।" কার্ল বলল স্পষ্ট গলায়।

"মা?" বারবারা চেঁচিয়ে উঠল। মাতৃনামের মতো অপ্রীতিকর কিছু নেই আজ বারবারার কাছে। কিন্তু তিনি এলেন কোথা থেকে?

ভূতের গল্প শুনলে হাসি পায় দিনের বেলায়। রাত্রে, অন্ধকারে, নির্জন সমুদ্রতীরে সে কৌতুক থাকে না। বারবারা ভেবে পেল না কী করবে। হঠাৎ কার্লের সঙ্গে কেন দেখা হোলো তার মার? কার্লের কেন মনে হোলো তিনি এসেছেন? যে কার্ল ভুলেও কোন দিন তাদের বিয়ের পরে মিসেস লোপেজের নামোল্লেখ করেনি। কিন্তু বারবারা আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কার্ল সেই অদ্ভুত স্বরে বলে চলল, "আমি কথা দিয়েছিলুম। শুধু আমার নিজের কাছে নয়, তোমার মার কাছে। নিজেকে না হয় বোঝাতে পারতুম, কিন্তু মৃতের কাছে দেয়া কথা আমি ফিরিয়ে নেব কী করে? তুমিও তো কথা দিয়েছিলে, বারবারা।"

বেচারী জবাব খুঁজে পেল না। ভয়ে, ত্রাসে বলল, "আলোটা জ্বালো না, কার্ল।" নিজেই বারবারা হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা খুঁজতে চেষ্টা করল।

কার্ল তৎক্ষণাৎ জোরে বারবারার হাত চেপে ধরে বলল, "আলোর দরকার নেই, বারবারা।.....অনেক সময় অন্ধকারেই ভালো দেখা যায়। এখন সেই সময়।"

"কী বলছ তুমি?"

"কিছু না, ভাবছিলুম। আচ্ছা সেদিন যে ওই কালিম্পং থেকে প্রেহামস হোমের ছেলেগুলি এসেছিল সমুদ্র দেখতে, তাদের তুমি দেখেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কী মনে হয়েছিল?"

"কিছু না।" বারবারা আরো সরে গেল। কার্ল সজোরে তাকে কাছে টেনে আনল। আদরে নয়।

বারবারা আবার বলল, "কী হয়েছে তোমার, কার্ল?"

"কিছু হয়নি। কিছু হয়েছিল। ভুল হয়েছিল। এবার তার সংশোধন চাই।" কার্লের স্বর স্বাভাবিক, যদিও স্বাভাবিকের চেয়ে গম্ভীর ও কঠোর। অনিশ্চয়তার চাঞ্চল্য আর নেই। এবার এসেছে সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা। কার্ল বারবারাকে আরো কাছে টানল।

বারবারা বলল, "কার্ল, বলো কী করব। তোমার কোন কথা আমি শুনিনি।"

"সেই তো হয়েছে আরো বিপদ। সমস্ত সিদ্ধান্তের দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার উপর।...আমার দায়িত্ব আমি এড়াব না, বারবারা।" কার্ল বারবারাকে আরো কাছে টানল।

"বলো, আমায় কী করতে হবে।"

কার্ল কিছু বলল না। বারম্বার এই আনুগত্য ঘোষণার মধ্যে কার্ল আত্মরক্ষার ইঙ্গিত পেল। তবে কি বারবারা একা বাঁচতে চাইছে? এতক্ষণ কার্ল নিজেকে হত্যাকারী মনে করে নিজেকে ঘৃণা করেছে। এখন তার বাহুবেষ্টিত মেয়েটিকে মনে হোলো হৃদয়হীনা সন্তানহন্ত্রী বলে। এত সহজে যে অন্যকে—অন্যকে কেন, নিজের
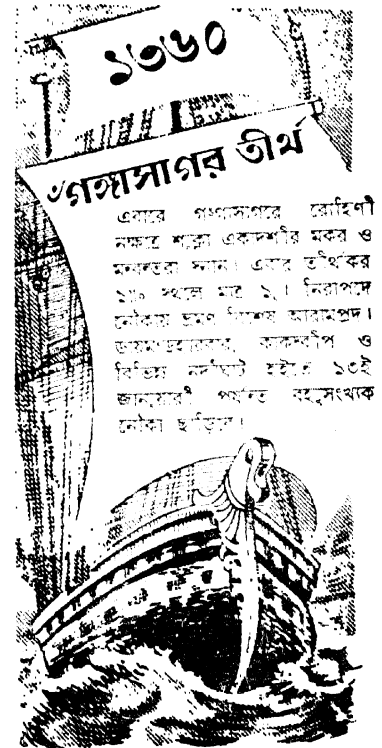
অপর অংশকে—বিসর্জন দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে রাজী, কাল সে তো কার্লকেও সমান ঔদাসীন্যে পরিত্যাগ করবে, যদি প্রয়োজন হয়। কার্ল প্রায় চেঁচিয়ে বলল, "তুমি ক্যাথলিক। তোমার প্রার্থনা বলে নাও।

"প্রার্থনা? প্রার্থনা কেন, কার্ল?"

"বলে নাও। বেশি সময় নেই।"

"কিসের সময় নেই, কার্ল?" বেচারী তখনো কিছু বুঝতে পারেনি।

"তোমার শেষ প্রার্থনা শেষ করে নাও।"

নৈরাশ্যের শেষ প্রান্তে পেঁৗছে বারবারা সামান্য সাহস পেল, বলল, "কার্ল, প্লীজ, তোমার কিছু করতে হবে না। আমি কালই চলে যাব। লাহোরে আমার কাকা আছে। সে আমায় একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবে। কেউ জানবে না তোমার কথা। আমার শিশুর নামে তোমার পরিচয় থাকবে না। তোমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। তোমাকে কেউ দুষবে না। আমিও দুষব না। শুধু আমায় ছেড়ে দাও।"

"তুমি দুষবে না। কিন্তু আমার নিজেকে আমি কী বলব?"

"কিছু বলবে না। আমার কথা ভুলে যাবে।"

"হা—হা—হা" কার্ল পাগলের মতো হেসে উঠল। "অ্যাজ ইফ ভুলে যাওয়া সোজা। অ্যাজ ইফ আমি ভুলে গেলেই সেই সঙ্গে ফ্যাক্টটারও অস্তিত্ব ঘুচে গেল। যেন আমি ভুলে গেলেই আমার ওই দুষ্কৃতি আর দিন দিন বাড়তে থাকবে না, যেন পরে ও বড়ো হয়ে আমাকে অভিশাপ দেবে না। যেন অভিশাপ না দিলেই আমার জীবন অভিশপ্ত হবে না।" প্রত্যেকটা বাক্যের সঙ্গে কার্লের গলা আরো উপরে উঠছিল। "আরো ভয়ানক কথা, যেন আমি অভিশপ্ত হলেই ওই মন আর অভিশপ্ত হবে না। যেন তুমি আমায় ক্ষমা করলেই সবাই পরে ফিরিঙ্গী মনকে ক্ষমা করবে, আদর করে কোলে তুলে নেবে, যেন তার জীবনে আবার সমস্ত সেই দুর্ভাগ্যগুলি হবে না যা তোমার ও আমার হয়েছে।"

চীৎকারের পরে কার্ল হঠাৎ যেন দপ করে নিবে গেল। খাটের উপর বসে বারবারার হাত দুটো নিজের গলায় ফাঁসির মতো জড়িয়ে নিয়ে খুব কাছে এসে বারবারার কানে কানে বলল, "বারবারা, তুমি আমায় ক্ষমা করো। এমন অন্যায় করেছি যার জন্যে ক্ষমা চাওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রতিকারের মূল্য যদি শুধু আমায় দিতে হোতো, এত দিন দ্বিধা করতুম না। কিন্তু আমি এমন কাজ করেছি যার উপর এখন আর আমার হাত নেই, এখন সে আপন শক্তিতে দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। আমি অসহায় দর্শক মাত্র। কিন্তু ওই অসহায় দর্শকের ভূমিকা আমার চরিত্রবিরুদ্ধ। আমি ওটা পারিনে।"

বারবারা মাতৃস্নেহে সন্দেহ-জর্জর কার্লকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। তার চোখের জল কার্লের পিঠ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। বারবারা লক্ষ্য করল, কার্লও কাঁদছিল।

কার্ল বারবারাকে শুইয়ে দিল বিছানার উপর। আস্তে আস্তে, পরম স্নেহে হাত দুটো এগিয়ে নিল বারবারার গলার দিকে। এঞ্জিনীয়রের বলিষ্ঠ কব্জির শিরাগুলি ফুলে উঠেছিল। তার চাপে আস্তে আস্তে বারবারার গলার শিরাগুলি। এইটুকু হাত দিয়ে অনুভব করা গেল। বাকিটা দেখা গেল না। বারবারার প্রথমে মনে হয়েছিল ওটা প্রেমের আলিঙ্গন। মত পরিবর্তনের বোধ হয় আর সময় পায়নি। বোধ হয় তার প্রয়োজনও ছিল। দুয়ে ভয়াবহ সাদৃশ্য।

টিক্ টিক্ টিক্......

*

গ্রিফিথসের সঙ্গে সরকারী কর্তাদের ভাব ছিল। কেউ কিছু জানতে পায়নি। ম্যাগ্রেগর সমবেদনা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল, যে সমুদ্র স্নানের ওই দুর্ঘটনার জন্য সে অতিশয় দুঃখিত। বারবারার বোন ক্যাথলিনও একটা চিঠি লিখেছিল সমবেদনা জানিয়ে। আর কেউ কিছু লেখেনি। লেখবার মতো কেউ ছিল না দুজনের একজনেরও।

কিন্তু কার্লের আর ভারতবর্ষ ভালো লাগল না। সে কণ্ট্রাক্ট বাতিল করে দিয়ে য়ুরোপে ফিরে যেতে চাইল। কোম্পানি আপত্তি করল না।

আবার সেই দমদমে কার্ল। এবারে শুধু গ্রিফিথস এসেছিল তাকে তুলে দিতে। বিদায়ের আগে এয়ারপোর্ট রেস্তরাঁয় দুজনে বসেছিল দুটো বীয়ারের সামনে। যে কথা দুজনেরই মনে ছিল, একজনও তা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিল না।

সময় হয়ে এলো। বীয়ারের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে কার্ল বলল, "টোনি, অন্তত তুমি বলো, আমি অন্যায় করিনি।"

গ্রিফিথস বলল, "ফরগেট ইট্।"

কার্ল বলল, "ননসেন্স! আমি পশু নই। ফরগেটিং ইজ ইম্পসিবল। বলো, অ্যাম আই ফরগিভন?"

গ্রিফিথস শেষ পর্যন্ত কার্লের প্রশ্নের উত্তর দিল না। কার্ল শুধু যাবার আগে বলল, "আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করিনে, তোমার ক্ষমায় কী হবে? কিন্তু যা করেছি তা না করলে নিজেকে আরো বেশি অপরাধী মনে হোতো। টোনি, অন্তত এই সান্ত্বনা রইল যে, আমার অপরাধের বোঝা বাকি জীবন আমার নিজেকে বইতে হবে, আর কাউকে নয়।"

গ্রিফিথস হেসে বলল, "বিমানে যাচ্ছ। লাগেজের লিমিট আছে। মাত্র চুরাশি পাউন্ড নেবে!"

গ্রিফিথসের শেষ হাসিতে ক্ষমা ছিল।

—সমাপ্ত—

পনের

চিঠিখানা আজ আমার হাতে নেই। সমস্ত যত্ন অগ্রাহ্য করে কোনো একটা কালের হিড়িকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। চিঠি নেই। তার প্রতি ছত্রের প্রতিটি কথা আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। কিন্তু তাকে বাইরে এনে রূপ দিতে পারি, এমন দিব্য শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। ফটোগ্রাফ যেমন চিত্র নয়, যে-চিঠিটা এখানে তুলে দিলাম, সেটাও তেমনি আসলের চিঠি নয়। তার অবয়বটা হয়তো রইল, রইল না তার প্রাণ-স্পন্দন। কত-দিন হয়ে গেল। তবু সেই হারিয়ে যাওয়া চিঠির অবলুপ্ত অক্ষরের বুকের ভিতর থেকে আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—

কাকাবাবু,

আপনার শেষ উপদেশ আমি একদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু আর পারলাম না। এই জেলে আসবার পর এই চিঠিই আমার আইন-ভঙ্গের প্রথম অপরাধ। সে অপরাধ কেন করেছি, কেন প্রকাশ্য রাস্তায় না গিয়ে এই গোপন পথের আশ্রয় নিলাম, এ চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়লেই বুঝতে পারবেন।

আমার এই চিঠি পেয়ে আপনি বিরক্ত হবেন কি না জানি না, বিস্মিত হবেন নিশ্চয়ই। যার চোখের সামনে থেকে পালিয়ে আসবার জন্যে একদিন অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, আজ তাকেই আবার এ দীর্ঘ কাহিনী শোনাতে যাবো, একথা কি আমিও কোনদিন ভাবতে পেরেছিলাম? কিন্তু কি করবো? যাকে ভালবাসি তাকে আঘাত দেওয়াই বোধ হয় আমার কপালের লিখন। তাই পালিয়ে এসেও পালিয়ে থাকতে পারলুম না। আমার হাত থেকে এখনো যে আপনার অনেক দুঃখ পাওনা আছে। এখনো যে আমার বলা হয়নি, কি করে' কোন্ ঘোর দুর্যোগের দিনে এই নরকের পথে প্রথম পা বাড়িয়েছিলাম, এতবড় সর্বনাশ কেমন করে সম্ভব হল, অতবড় বাপের কঠিন আদর্শ কেন আমাকে রক্ষা করতে পারেনি।

একথা জানি, সে কাহিনী যে শুনবে, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আমি ক্রিমিনাল। সংসারে আমার জন্যে দয়া নেই, ক্ষমা নেই, নেই কারো মনে এতটুকু সংবেদন। কিন্তু আপনাকে তো অন্য সবার সংগে এক করে দেখতে পারি না। এখানে বসেই আমি যে আপনার বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। যে জিনিস ওখানে সঞ্চিত হয়ে আছে, এ হতভাগার জন্যে, একমাত্র বাবা ছাড়া আর কারো কাছেই তা পাইনি। তাই তো লিখতে বসে আজ আপনা হতেই এ মুখ থেকে বেরিয়ে এল কাকাবাবু। আপনাকে কাকাবাবু বলে ডাকবার মত স্পর্ধা আমার হবে, এক মুহূর্ত আগেও ভাবতে পারিনি।

আমার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসে আমার বাবার কথা। আপনাকে সেদিন বলতে গিয়েও বলতে পারিনি। বাবা নেই। প্রায় আট মাস হল, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর এই অকালমৃত্যু যতবড়ই মর্মান্তিক হোক, একদিন হয়তো সইতে পারবো। কিন্তু যেভাবে, যে নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে তিনি তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এতবড় পাষণ্ড হয়েও এক নিমেষের তরে ভুলতে পারছি না। সে-কথা আমার কারো কাছেই বলবার উপায় নেই। তার সংগে জড়িয়ে আছে আমার মায়ের কথা—এমন কথা, যা উচ্চারণ করাও সন্তানের পক্ষে অপরাধ। সে শুধু রইল আমার বুকের মধ্যে। যত-দিন বাঁচবো, সে বোঝা আমাকে একাই বয়ে বেড়াতে হবে।

সেই ভয়ংকর দিনটা আজও চোখের উপর ভাসছে। বাবা হাওড়ায় বদলি হয়ে এসেছেন। শিবপুরে একটা বাড়িতে আমরা থাকি। কিছুদিন আগে থেকেই তিনি 'ব্লাড প্রেসার'-এ ভুগছিলেন। দারুণ সাংসারিক অশান্তি তার উপর বিষের মত কাজ করছিল। মাঝে মাঝে এত বাড়াবাড়ি হত যে, একনাগাড়ে পাঁচ-সাত দিন মাথা তুলতে পারতেন না। ছুটি নিলে সংসার চলে না। এই অবস্থাতেই তাঁকে কাজ করতে হত। সেদিনও কোর্টে বেরোবার আয়োজন করছিলেন। মা এসে বললেন, টাকার কদ্দুর হল? মাঝে আর তিনটি দিন বাকী। জিনিসটা দেখে শুনে কিনতে হবে তো?

বাবা জ্বতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, অতো টাকা তো জোগাড় করতে পারছিনে। ধারও মিলছে না কোনোখানে।

মা অবাক হয়ে বললেন, অতো টাকা মানে? অন্তত শ' পাঁচেক টাকা না হলে একটা চলনসই জড়োয়া নেকলেস হয় কি?

একটু থেমে বললেন, পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ঐ একটা মায়ের পেটের বোন। তার প্রথম মেয়ের বিয়ে। না গিয়ে এড়ানো যাবে না। তা তোমার হাতে যখন পড়েছি, বলতো খালি হাতেই যাবো!

বাবা টুপিটা তুলে নিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, আর তো কোনো উপায় দেখছিনে। আপাতত সংসার খরচের টাকা থেকে শ' খানেক দিয়ে যাহোক একটা—

"শ' খানেক!" মা একেবারে রুখে উঠলেন, বলতে একটু বাধলো না? তোমার না হয় মান-ইজ্জতের বালাই নেই, কিন্তু একশ' টাকার একটা জিনিস হাতে করে গেলে আমার বাবার মুখখানা কোথায় থাকে ভেবে দেখেছ?

আমি পাশের ঘরে ইস্কুলে যাবার আগে বই গোছাচ্ছিলাম। বাবার হঠাৎ নজর পড়তেই গম্ভীর গলায় বললেন, খোকা তুমি নিচে যাও। আমি তাঁর চোখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। এ কী চেহারা হয়েছে বাবার? বুঝলাম, এই মুহূর্তেই তাঁর শুয়ে পড়া দরকার। কিন্তু তার কথার অবাধ্য কোনোদিন হইনি। তাই কোনো কথা না বলে বই-খাতা নিয়ে নিচে নেমে গেলাম। আমার পেছনে বাবাও নামতে লাগলেন। মার গলা শোনা গেল, টাকার ব্যবস্থা না করেই চলে যাচ্ছ যে?

বাবা নিম্নস্বরে কি একটা বললেন। মার উত্তেজিত উত্তর নিচে থেকেই শুনতে পেলাম। রেগে গেলে মার জ্ঞান থাকত না, কি বলছেন আর কাকে বলছেন। যা বললেন, তার সবটা আমার কানে গেল না, যেটুকু গেল, তাও বলবার মত নয়। সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সিঁড়িতে একটা শব্দ শুনে ছুটে এলাম। দেখলাম, বাবা পড়ে আছেন। কপালের একটা ধার কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। জ্ঞান নেই। চাপরাশী আর ঠাকুরে চাকরে মিলে ধরাধরি করে তাকে কোনো রকমে উপরে নিয়ে গেল। আমি ছুটলাম ডাক্তার ডাকতে। ঘণ্টা দুই চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে এল।

কিন্তু সমস্ত বাঁ অংগটা অচল। তখনো বুঝিনি, মুহূর্তমধ্যে কত বড় সর্বনাশ আমাদের ঘটে গেল। বাবা চিরদিনের তরে শয্যার আশ্রয় নিলেন।

মাসের প্রথম তারিখে সমস্ত মাইনেটা বাবা মার হাতে ধরে দিতেন। কিন্তু সেটা ছিল আমাদের চোদ্দ পনের দিনের খরচ। বাকী মাসটা যেভাবে চলত, আপনি অনুমান করুন। সামান্য পুঁজি যা ছিল, আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই সম্ভব হল না। বাবা প্রথমে কিছুদিন ছুটি পেলেন। তারপর নামমাত্র একটা পেনসন দিয়ে সরকার তাঁকে একেবারেই ছুটি দিয়ে দিলেন। পেটের দায়ে তাঁকে তখন কত কি করতে হত। কখনো খবরের কাগজে প্রবন্ধ, কখনো আইনের বই-এর নোট লেখা। শুয়ে শুয়ে লিখতে পারতেন না। ডিকটেট্ করতেন, আমি ইস্কুলের ছুটির পর দু' ঘণ্টা করে রোজ লিখে দিতাম। তারপর যেতে হত প্রেসে। যা আসত, অতি সামান্যই।

সে কী জীবন! গল্প শুনেছি, শিব বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। দেবাদিদেবকে চোখে দেখা যায় না। আমি দেখেছি আমার বাবাকে। শিবের চেয়েও শান্ত; সর্বংসহা বসুমতীর চেয়েও সহিষ্ণু। এত বিষ, এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অপমান! উত্তরে একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে কোনোদিন বার হতে শুনিনি। আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। বাবা আমার মন বুঝতে পারতেন। কাছে ডেকে গায় হাত বুলিয়ে বলতেন, খোকা, পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় শেখা হল, সইতে শেখা। একথা কোনোদিন ভুলো না।

এই নিরবচ্ছিন্ন রোগশয্যায় আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র সঙ্গী। মাঝে মাঝে দু'একজন পুরানো সহকর্মী দেখা করতে আসতেন। মামুলি সান্ত্বনা দিয়ে চলে যেতেন। তার কোনোটাই বাবাকে স্পর্শ করতো না। দূর ছাত্রজীবনের একটিমাত্র বন্ধু তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে ছিলেন। কতদিন কতভাবে তিনি তাঁর কথা আমায় শুনিয়েছেন। তখন কি জানি, একদিন এমনিভাবে আমি তাঁর দেখা পাবো? সেই দেখা পেলাম, কিন্তু সময়ে পেলাম না কেন? যদি পেতাম, বাবাকে বোধ হয় এমন করে হারাতে হত না; আর আমিও আজ এই পাঁকের মধ্যে পড়ে ছট্‌ফট্ করতাম না।

এই সময়ে আমাদের সংসারে একটি নতুন মানুষের আবির্ভাব হল। মার কোন্ দূর সম্পর্কের দাদা। আমাদের মণীশ মামা। শুনেছি মার যখন বিয়ে হয়নি, দাদামশাই তাঁর এই আত্মীয়টিকে একদিন তাঁর মেয়েদের সংগে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এতকাল পরে এই নিখুঁত সাহেবি-পোষাক পরা ভদ্রলোক তাঁর একটা নতুন কেনা টু-সিটার অস্টিন চড়ে যখন তখন আমাদের বাড়ি চড়াও করে অতিশয় অন্তরংগ হয়ে উঠলেন। তার পর একদিন এঁকে উপলক্ষ করেই দেখা দিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। সেই কথা বলেই এ চিঠি শেষ করবো।

সেবার আমি ম্যাট্রিক দেবো। ইস্কুলে ভালো ছেলে ছিলাম। বাবার একান্ত ইচ্ছা - প্রথম দশজনের মধ্যে যেন দাঁড়াতে পারি। পাছে তাঁকে দুঃখ দিতে হয়, তাই পড়াশুনোয় কোনোদিন অবহেলা করিনি। সেদিনও নিজের ঘরে বসে জিওমেট্রি মুখস্থ করছিলাম। রাত প্রায় এগারটা। পাশের ঘরে বাবা। শরীরটা আবার কদিন থেকে বড্ড খারাপ যাচ্ছে। গোবিন্দ তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। অনেকদিনের পুরানো এই চাকরটি তখনো আমাদের ছেড়ে যায়নি। রান্নাবান্না থেকে বাবার দেখাশোনা সবই ওর হাতে। বাড়ির সামনে মোটর থামবার পরিচিত শব্দ শোনা গেল। গোবিন্দ উঠে গেল দরজা খুলতে। তারপরেই দেখলাম মণীশ মামা উপরে উঠছেন। বারান্দা পেরিয়ে সোজা বাবার ঘরে ঢুকলেন এবং সাবধানে একটা চেয়ারে বসে বললেন, বিজয়বাবু, ঘুমুলেন নাকি? বাবার বোধ হয় তন্দ্রা এসেছিল। একটু চমকে উঠে বললেন, কে?

—আমি মণীশ।

—ও, কি বলুন।

মামা একটু কেসে নিয়ে বললেন, বলছিলাম, সুরমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। একটা কোথাও চেঞ্জে টেঞ্জে যাওয়া দরকার।

বাবা শান্তভাবেই বললেন, কোনো অসুখ করেছে কি?

—না, অসুখ তেমন কিছু নয়। এই বাড়ির আবহাওয়াটা ওর তেমন সহ্য হচ্ছে না।

—কিন্তু চেঞ্জে পাঠাবার মত টাকা তো আমার নেই।

—টাকার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমিই ম্যানেজ করবো। সুরমার ইচ্ছা পরিমলও সংগে যায়। ওর পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বেরিয়ে পড়তে চাই। একটা বাড়ি টাড়ি তাহলে এখন থেকেই দেখতে হয়।

বাবা একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, আপনারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। পরিমলের যাওয়া হবে না।

—কেন হবে না, জানতে পারি কি? —এ প্রশ্ন করলেন মা। কখন এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, দেখতে পাইনি। বাবাও বোধ হয় টের পাননি। সেদিকে একবার তাকিয়ে বাবা বললেন, সে আলোচনা করে লাভ নেই। ওকে আমি যেতে দিতে পারি না। মা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, চব্বিশ ঘণ্টা রুগী ঘেঁটে ঘেঁটে ওর অবস্থাটা কি হয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আমার চোখের সামনে আমার ছেলেটাকে তুমি মেরে ফেলতে চাও?

বাবা আস্তে আস্তে বললেন, মণীশ-বাবু, আমাকে মাপ করবেন, রাত বোধ হয় অনেক হল। এবার একটু ঘুমোতে চাই।

মণীশ মামা কিছু বলবার আগেই মা চেঁচিয়ে উঠলেন, ও সব ভড়ং রেখে দাও।

আমার ছেলে আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাবো। দেখি, তুমি কেমন করে বাধা দাও।

মণীশবাবু বললেন, আমার মনে হয়, আপনি অন্যায় জিদ করছেন, বিজয়বাবু। ছেলেটা ক'দিন একটু ঘুরে আসবে, এতে আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে?

বাবা মিনিট কয়েক চুপ করে থেকে বললেন, আমার স্ত্রী-পুত্রকে চেঞ্জে পাঠাবার মত সংগতি যদি থাকত, অবশ্যই পাঠাতাম। তা যখন নেই, অন্যের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে চাই না। কিন্তু যেখানে আমার জোর খাটবে না, সেখানে বাধা দিতে গেলে লাঞ্ছনা ভোগই সার হবে। তাই আপত্তিটা শুধু পরিমলের বেলাতেই জানিয়ে রাখছি।

মামা সিগারেট ধরালেন। মার তিক্ত স্বর শুনতে পেলাম, অন্যের অনুগ্রহ! বলতে একটু চক্ষুলজ্জাও হলো না তোমার? এই অনুগ্রহ না পেলে কোথায় থাকত তোমার স্ত্রী-পুত্র, আর কোথায় থাকতে তুমি নিজে? তোমার বুঝি ধারণা, তোমার ঐ গোটাকয়েক পেনসনের টাকা আর ঐ নোট ফোট লিখে যা ভিক্ষে জোটে, তাই দিয়েই এই সংসারটা চলছে? এ অনুগ্রহ যে করতে চাইছে, সে আজ নতুন করছে না, অনেকদিন আগে থেকেই করে আসছে। তা না হলে আজ সবাইকেই পথে দাঁড়াতে হত।

মণীশ মামা বললেন, আহা! এসব তুমি কি বলছ, সুরমা? অনুগ্রহ আবার কোথায় দেখলে? এ তো আমার কর্তব্য। একেবারে ছেলেমানুষ! রেগে গেলে আর—

বাবার গম্ভীর কণ্ঠে ডুবে গেল তার নাকী সুর—কই, এসব কথা তো আমার জানা ছিল না। জানি, আমি আজ নিতান্ত দুঃস্থ এবং অক্ষম। কিন্তু অন্যের দয়ায় বেঁচে আছি, আমার একমাত্র সন্তান হাত পেতে পরের অন্ন গ্রহণ করছে, একথা তো আমি ভাবতেই পারি না।

শেষের দিকে তাঁর সুরটা এমন করুণ শোনাল যে, আমার চোখে জল এসে পড়ল। ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে বলি, না বাবা, আমরা এখনো পরের কাছে হাত পাতিনি। ও সব মিথ্যা কথা। কিন্তু যাওয়া হল না। জানতাম বাবা রাগ করবেন। একটুখানি থেমে উনি তেমনি ধীরে ধীরে বললেন, যা হয়ে গ্যাছে, তা তো আর ফেরানো যাবে না। তবে, এ অন্যায়ের এইখানেই শেষ। কাল ভোর থেকে সব ব্যবস্থাই বদলে যাবে।

বাঁ হাত অচল। শুধু ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বাবা বললেন, মণীশবাবু, আমার এবং আমার পরিবারের জন্যে আপনি যা করেছেন, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়। আপনার অনুগ্রহের দান থেকে আমাদের মুক্তি দিন।

বাবাকে ভালো করেই চিনি। কাল থেকে যে ব্যবস্থা তিনি করতে চাইছেন, সেটা যত কঠোরই হোক, তবু যে তার নড়চড় হবে না, সেটাও আমার জানা ছিল। এমনিতেই তাঁর খাবার বরাদ্দ এত সাধারণ যে, তার নীচে আর এক ধাপ নামতে গেলে, সেটা হবে অনাহার। অথচ সেই রাস্তাই যে তিনি ধরবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে তো আত্মহত্যার সামিল। সেই ভীষণ পরিণাম থেকে তাঁকে বাঁচাবার কি কোন পথ নেই? আমি তার একমাত্র সন্তান, একমাত্র বংশধর। যতই ছোট হই, অক্ষম হই, আমি কি শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকবো? পীড়িত, অভাবগ্রস্ত পিতার মুখে একমুঠো অন্ন তুলে দেবার ক্ষমতাও আমার নেই? এই তো, আমার বয়সী কত ছেলে পথে ঘাটে কতরকম কাজ করে খাচ্ছে। আমি ভদ্র ঘরে জন্মেছি বলেই তা পারবো না?

গভীর রাত পর্যন্ত নানা রকমের উদ্ভট কল্পনা মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি, পাঁচটা বেজে গেছে। খাতা থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে

নিয়ে লিখলাম, বাবা, ভেবে দেখলাম, সংসারের আয় বাড়াবার জন্যে আমারও কিছু রোজগার করা দরকার। সেই চেষ্টাতেই চললাম। আমার জন্যে ভেবো না। আশীর্বাদ করো যেন সফল হয়ে ফিরে আসতে পারি।

বাবার ঘরে যেতে সাহস হল না। পাছে তিনি জেগে ওঠেন, কিংবা তাঁর মুখের দিকে চোখ পড়লে আমার সকল সংকল্প ভেঙে যায়, তাই পড়ার টেবিলে চিঠিটা চাপা দিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

এর পরে যে জীবন শুরু হল, তার বর্ণনা দিতে গেলে এ চিঠি আর শেষ হবে না। সে চেষ্টা করবো না। ঘরের বাইরে এসে পৃথিবীকে দেখলাম এক নতুন রূপে। দেখলাম, নরক বলে কোনো আলাদা দেশ নেই। এই সংসারটাই একটা প্রকাণ্ড নরক। দেখলাম, মানুষ কত নীচ, কত কঠোর, কত নির্মম! দয়া নেই, প্রীতি নেই একবিন্দু সহানুভূতি নেই। আছে শুধু সন্দেহ, পীড়ন আর বঞ্চনা। ভিক্ষা চাইলে হয়তো সহজেই পেতাম। কিন্তু যার কাছেই বলেছি আমাকে একটা কাজ দাও, আমি খেটে খেতে চাই, সবারই চোখে দেখেছি অবিশ্বাস, শুনেছি কারো নীরব কারোবা সরব মন্তব্য—কোনো মতলব আছে ছোকরার।

দুদিন পেটে পড়ল শুধু কলের জল। অনেক ঘুরে, অনেকের দুয়ারে ঢুঁ মেরে এক দোকানে জুটল খাতা লেখার কাজ। খোরাক আর পনের টাকা। হাতে স্বর্গ পেলাম। মাস গেলেই প্রথম মাইনের টাকাটা মনি অর্ডার করে পাঠালাম বাবার কাছে। লিখলাম, এই টাকাটা দিয়ে ফল আনিয়ে নিও। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। আমি ভাল আছি। সুবিধা হলেই গিয়ে তোমাকে দেখে আসবো।

কিছুদিন পরে মালিকের বাক্স থেকে পঞ্চাশ টাকা চুরি গেল। সন্দেহ পড়ল আমার উপর। বিশ্বাস যখন গেল তারপরে আর সেখানে থাকা চলে না। বেরিয়ে পড়লাম। এবার জুটল এক চায়ের দোকানে বয়-এর কাজ। টেবিলে টেবিলে খাবার যোগানো। কাটল কিছুদিন। একদিন একখানা প্লেট ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল। অকথ্য ভাষায় বাপ তুলে দিল গালাগালি। আবার পথ। সেখান থেকে মোটরের কারখানা। সে চাকরি টি'কল না। মাতাল মিস্ত্রীটার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হত। তার কুৎসিৎ ঘনিষ্ঠতা সহ্য হ'ল না। এর পরে জুটলাম গিয়ে এক দেশী মদের দোকানে। কাজ, মদ বিক্রী। মাইনে তিরিশ টাকা। বেশ কিছুকাল কাটিয়ে দিলাম।

কতবার কতভাবে পাঁকের স্পর্শে এসেছি। কিন্তু পাঁক গায় লাগতে দিইনি। কিছু টাকা হাতে করতে পেলেই বাবার কাছে ফিরে যাবো, এই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কারো পরামর্শ, কারো কোনো প্রলোভন সে লক্ষ্য থেকে আমাকে নড়াতে পারেনি। এতদিন পরে এই মদের দোকানের বারান্দায় এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ পেলাম একদিন, যার কাছে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলুম না। জানি না, কি যাদু ছিল তার চোখে তার কথায়, তার হাতের স্পর্শে। স্রোতের মুখে

তৃণের মত আমি তার ইচ্ছার তোড়ে ভেসে চলে গেলাম।

দোকান বন্ধ হবার পর বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে ছিলাম। সে এসে বসল পাশটিতে। যেন কতদিনের বন্ধু, এমনিভাবে হাত ধরে বলল, তোমায় তো এখানে মানাচ্ছে না, ভাই। তুমি এ রাস্তায় কেমন করে এলে?

অনেকদিন পরে মানুষের কণ্ঠে যেন একটু দরদের আভাস পেলাম। সে আমার চেয়ে বোধ হয় বছর চার পাঁচের বড় হবে। কিন্তু তার পাশে নিজেকে মনে হল শিশু। একটা ভালো হোটেলে নিয়ে গিয়ে সে প্রচুর খাওয়ালো। তারপর ট্যাক্সি করে নিয়ে গেল বেড়াতে। একদিন, দু-দিন, তিন দিন। তারপর এক নিভৃত সন্ধ্যায় গঙ্গার ঘাটে বসে তাকে খুলে বললাম আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী। সে নিঃশব্দে শুনল সব কথা। তারপর সস্নেহ কণ্ঠে বলল, তুমি ঠিক করেছ, ভাই। এছাড়া আর পথ ছিল না। কিন্তু এই মাতালের দোকানে মদ বেচে তো বাবার দুঃখ ঘোচাতে পারবে না। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার পথ বাৎলে দেবো।

তার সঙ্গ নিলাম।

সে রাতটা আমার চোখের উপর ভাসছে। অত্যন্ত শরু গলি। অন্ধকার পথ, দুপাশে নোংরা জঞ্জাল। টর্চের আলোয় কোনো রকমে এগিয়ে যাচ্ছি। একটা পোড়ো মতন বাড়ী। সেটা ছাড়িয়ে ভেতরের দিকে আর একটা প্রকাণ্ড জীর্ণ কোঠা। সামনের দিকটা ভেঙ্গে পড়েছে। ভাঙ্গা স্তূপের পাশ দিয়ে এক ফালি পথ। অতি কষ্টে পার হয়ে ডানদিকে পেলাম একটা সিঁড়ি। যেমন স্যাঁৎসেতে, তেমনি অন্ধকার। উঠছি তো উঠছিই। তার যেন আর শেষ নেই। সে আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক হোঁচট খেয়ে, অনেক মোড় ঘুরে শেষ পর্যন্ত এসে পেঁছিলাম একটা হল মতন ঘরে। একঘর লোক। বিশ্রী ভাষায় আলাপ করছে, আর মাঝে মাঝে হাসছে বিকট কদর্য হাসি। এ কোথায় নিয়ে এলে? ভয়ে ভয়ে বললাম তাকে। সে উত্তর দিল না। হাত ধরে নিয়ে গেল পাশের একটা ঘরে। মোম বাতির আলোয় দেখলাম, একটা লোক খাটিয়ায় শুয়ে বিড়ি টানছে। বয়স হয়েছে; কিন্তু দেখতে গুণ্ডার মত।

আমার বন্ধু বলল, এনেছি, ওস্তাদ।

—এনেছ? বেশ, এদিকে নিয়ে এসো।

তেমনি হাত ধরেই সে আমাকে আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে গেল। লোকটা উঠে এসে আমার মুখের কাছে মুখ এনে খানিকক্ষণ কি দেখল। তারপর বলল, বাঃ খাসা মাল এনেছিস রে। ঠিক আছে। ও পারবে।

ধেনো মদের উগ্র গন্ধে গা পাক দিয়ে উঠল। পিছন ফিরে বন্ধুকে আর দেখতে পেলাম না। আর কোনোদিন দেখতে পাইনি।

পরদিন সকালেই বুঝলাম, কোথায় এসেছি। পকেটমারদের প্রধান ট্রেনিং সেণ্টার। বন্ধুটি একজন পাকা আড়কাঠি। আমি নতুন রংরুট। আমাকে নজর বন্দী করে রাখা হল। কিছুক্ষণ পরেই ওস্তাদ ডেকে পাঠালেন। কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন, ভয় কিসের? তোমার মত কত ছেলে আছে আমাদের দলে। সকলের সঙ্গে আলাপ সালাপ করো। খাও-দাও ফূর্তি কর। আর মন দিয়ে কাজ শেখো। ভাল করে শিখতে পারলে এরকম লাইন আর নেই। রাতারাতি বড়লোক। আচ্ছা সব চাইতে কাকে বেশী ভালবাস বলত?

বললাম, বাবাকে।

—বেশ। বল দিকিনি, 'বাবার নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি,-দল ছেড়ে কোনো-দিন যাবো না; দলের কোনো কথা কারো কাছে প্রকাশ করবো না।' বল—।

প্রতিজ্ঞা করলাম। এমনি করে আমার দীক্ষা হ'ল।

মাসখানেক ট্রেনিং দিয়েই ওরা আমাকে রাস্তায় পাঠাতে শুরু করল। পালানোর উপায় নেই, পেছনে ভিড়ের মধ্যে ওদের গার্ড। বেগতিক দেখলে ছোরা চালাতে দ্বিধা করবে না। হাতে খড়ি শুরু হল। সারাদিনে কিছু কেস দিতেই হবে। তা না হলে নানারকম নির্যাতন। কিন্তু ভাগ্য-ক্রমে সেটা আমাকে বেশী সইতে হয়নি। দক্ষ এবং বিশ্বস্ত কর্মী বলে অল্প দিনেই আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। যা পেতাম সব জমা দিতে হত সর্দারের কাছে। আমার প্রাপ্য ছিল খোরাক পোষাক আর সামান্য কিছু হাতখরচ।

গহর বলে একটা লোক ছিল আমাদের দলে। আমাকে সত্যিই ভালবাসত। একদিন আড়ালে গিয়ে বলল, তুমি কি বোকা! যা পাও সবই দিয়ে দিচ্ছ! কিছু কিছু সরাতে হয়। তা নৈলে তোমার রইল কি? আমরা সবাই কি করছি দেখতে পাওনা?

সেকথা আমি জানতাম। তার বিপদটাও কম ছিল না। একদিন একটা ঝুঁকি নিলাম। এক ভাটিয়া ভদ্রলোক বাসে উঠতে যাবে। ভীষণ ভিড়। মানি ব্যাগটা সরিয়ে নিয়ে আমিও সরে পড়লাম। নিরাপদ জায়গায় এসে ব্যাগ খুলে দেখলাম, দুখানা হাজার টাকার নোট। ব্যস্। আর নয়। এবার ফিরতে হ'বে।

কতকাল পরে বাড়ী ফিরছি। রাত প্রায় দশটা। কড়া নাড়তে গিয়ে বুক কাঁপছে। মনে হল অনেক দূরে চলে গেছি, অনেক নীচে নেমে গেছি। এবাড়ী আমার নয়। মাথা উঁচু করে এখানে ঢুকবার অধিকার আমার চলে গেছে। তারপর ঢুকে কি দেখবো, কে জানে! এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল। সামনেই গোবিন্দ। আমাকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে দাদাবাবু? এ কি চেহারা হয়েছে

তোমার? তার মুখ চেপে ধরে বললাম, চুপ চুপ্‌। বাবা কেমন আছেন?

গোবিন্দ চোখ মুছতে মুছতে বলল, আর কেমন! তুমি যাবার পর থেকেই একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আর মাথা তুলতে পারেন না। বুকের অবস্থাও খুব খারাপ। কোন্‌দিন প্রাণটা বেরিয়ে যায়।

—মা কোথায়?

গোবিন্দ সেকথার জবাব দিল না। বাইরে যেতে যেতে বলল, তুমি ওপরে যাও। আমি চট করে একটা সোডা নিয়ে আসছি।

বাবার ঘরে উঠে শিউরে উঠলাম। চোখ বুজে পড়ে আছেন—বাবা নন, বাবার কঙ্কাল। পায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলেন, কে!

—আমি, বাবা।

—খোকা? এ্যাদ্দিনে এলি? বড্ড ভুল করেছিলি বাবা। আয়, কাছে আয়।

কাছে যেতেই ডান হাতটা কোনো রকমে তুলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তার বুকের উপর মাথা রেখে চোখের জল আর রাখতে পারলুম না। অনেকক্ষণ সেইভাবে পড়ে রইলাম। চোখের জলের ভিতর দিয়ে আমার মনের সব তাপ সব পাপ যেন গলে বেরিয়ে গেল। হালকা হয়ে গেল বুকটা। তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুই বড় হবি, মানুষ হবি, এইতো আমার একমাত্র সাধ। কিন্তু এ তুই কি করলি, খোকা? দশ বিশ টাকায় আমাদের কি উপকার হ'বে বল? আর তার জন্যে তুই এমন করে নিজেকে ক্ষয় করে চলেছিস? তোর সবগুলো মনি অর্ডার আমি তুলে রেখে দিয়েছি। কাঁচ ছেলের এত কষ্টের রোজগার আমি পেটের দায়ে খরচ করবো?

আমি উঠে বসে বললাম, এবার অনেক টাকা এনেছি, বাবা। সকাল হলেই সবচেয়ে বড় ডাক্তার ডেকে আনবো। তোমাকে শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠতে হবে। তারপর চল, আমরা একটা চেঞ্জে গিয়ে থাকি।

মনি-ব্যাগটা খুলে নোট দুখানা বের করলাম।

সেদিকে একবার তাকিয়েই বাবার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। রুদ্ধ স্বরে বললেন, একি! এত টাকা তুই কোথায় পেলি? আমি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

—কে দিয়েছে, বল? আমার কাছে লুকোসনে। বল, কে দিয়েছে?

অতখানি বিচলিত হ'তে বাবাকে কখনো দেখেনি। ভয়ে ভয়ে বললাম, কেউ দেয়নি; আমি পেয়েছি।

—কি করে, কোত্থেকে পেয়েছিস?

আমি নিরুত্তর।

বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, চুরি করেছিস?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার মুখে এল না।

বাবা একেবারে ভেঙে পড়লেন। —চোর! আমার ছেলে চোর! হা ভগবান এও আমাকে দেখতে হল!...

দুর্বল দেহ থর থর করে কাঁপছে। চোখদুটো মনে হল যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে। অদম্য উত্তেজনায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে চান। কী সর্বনাশ! আমি তাড়াতাড়ি ধরে শুইয়ে দিয়ে শীর্ণ মুখখানা দুহাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম, বাবা, তুমি চুপ কর, ঠাণ্ডা হও। এ টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো, ফেলে দেবো। তোমায় ছুঁয়ে বলছি, একাজ আর করবো না। তুমি স্থির হও......

আর বলতে হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেলেন। চিরদিনের মত স্থির। আমি কি ছাই তখনো বুঝতে পেরেছি? যখন বুঝলাম, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গেল। সেই নিস্পন্দ দেহের উপর লুটিয়ে পড়লাম।

শেষকৃত্য যখন শেষ হল, তখনো সূর্যোদয় হয়নি। সকলের অলক্ষ্যে শ্মশান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সেই মনি-ব্যাগটা পকেটেই ছিল। সোজা থানায় গিয়ে সেটা জমা দিয়ে বললাম, আশা করি, মালিককে দেখলে চিনতে পারবো।

ভাটিয়া ভদ্রলোক থানায় ডায়রি করিয়ে রেখেছিলেন। তাকে ডেকে পাঠান হল। চিনলাম। তিনিও তার ব্যাগ এবং নোট সনাক্ত করলেন।

আমার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস দায়ের হল। কোমরে দড়ি এবং হাতে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে গেল।

হাকিমের বোধ হয় দয়া হয়েছিল আমাকে দেখে। প্রথম অপরাধ বলে একটা দণ্ড নিয়ে ছেড়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু ছাড়া পেয়ে কোথায় যাবো আমি? কার জন্যেই বা যাবো? বললাম, এটা আমার প্রথম অপরাধ নয়। এ অপরাধ অনেকবার করেছি; ধরা পড়িনি। পুলিশ আমাকে সমর্থন করল। তাদের খাতায় আমার নাম ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট যেন বাধ্য হয়েই ছ' মাসের জেল দিয়ে দিলেন।

ছ'মাস শেষ হয়ে এসেছে। খালাসের আর তিন দিন বাকি। কিন্তু যা চেয়েছিলাম, তা পেলাম কই? কোথায় আমার শাস্তি? কোথায় আমার প্রায়শ্চিত্ত? আমি তো শুধু চোর নই, আমি পিতৃহন্তা। সে মহাপাপের দণ্ডভোগ তো আমার শেষ হয়নি। কোনো দিন হবে কিনা, তাও জানি না। যদি হয়, সেই দিন আপনার কাছে ফিরে যাবো।

হতভাগ্য পরিমল।

সে আর ফিরে আসেনি।

(ক্রমশ)

জাঁ-পল সার্ত্র্
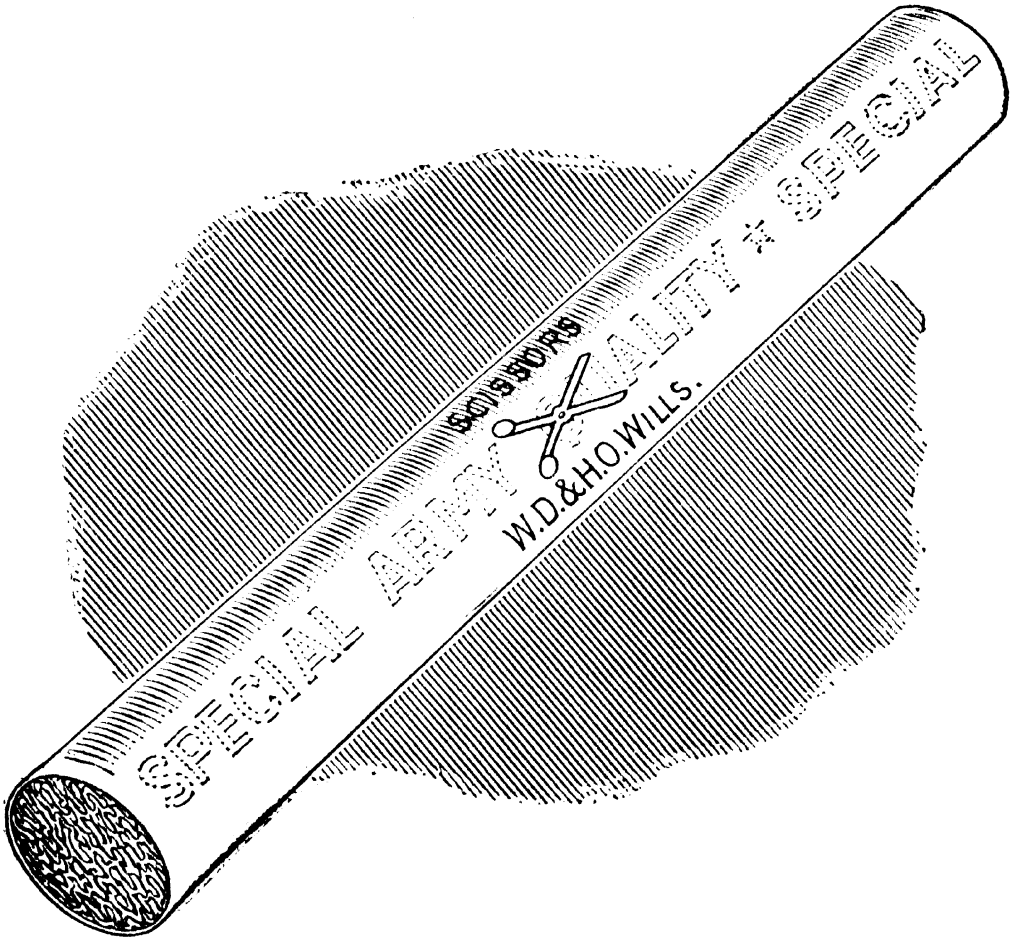
অনুবাদঃ শিবনারায়ণ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হোয়েডেরার। সুতরাং ?

রাজকুমার। মোদ্দা কথা হ'ল এই। আমাদের ভেতরে এই নীতিগত ঐক্যের সুসংবাদটা তোমাকে দেবার জন্যে কারস্কি আর আমি এখানে এসেছি।

হোয়েডেরার। তাতে আমার কি ?

কারস্কি। ঢের হয়েছে -মিছে সময় নষ্ট হচ্ছে।

রাজকুমার। [না থেমে] না বললেও চলে যে, এ ঐক্য যতখানি সম্ভব ব্যাপক করতে হবে। যদি সর্বহারার দল আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়......

হোয়েডেরার। কি তোমাদের সর্ত ?

কারস্কি। জাতীয় যে গুপ্ত কমিটি আমরা গঠন করতে যাচ্ছি তাতে তোমাদের তরফ হতে দুজন সদস্য থাকতে পারে।

হোয়েডেরার। ক'জনের মধ্যে দুজন ?

কারস্কি। বারোজন।

হোয়েডেরার। [ভদ্রকৌতূহলের ভান করে] বারোর মধ্যে দুজন ?

কারস্কি। রাজ অভিভাবক তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে হতে চারজনকে মনোনীত করবেন। পেণ্টাগণ থেকে আসবে ছজন। কমিটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করে ঠিক করা হবে।

হোয়েডেরার। [বিদ্রূপের স্বরে] বারোর মধ্যে দুই!

কারস্কি। চাষী নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশই পেণ্টাগণের পক্ষে; তারা হ'ল ধর মোট দেশবাসীর শতকরা সাতান্ন ভাগ। তার সঙ্গে প্রায় সমস্ত শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যোগ দাও। শ্রমিকরা দেশের শতকরা কুড়িভাগও হবে না—আর তাদের সকলেই কিছু তোমাদের পেছনে নেই।

হোয়েডেরার। না। বলে যাও।

কারস্কি। আমরা আমাদের দুই গুপ্তদলকে মিলিয়ে নতুন করে গড়বার ব্যবস্থা করব। তোমার লোকেরা পেণ্টাগণ দলের সব ব্যবস্থায় সহযোগিতা করবে।

হোয়েডেরার। অর্থাৎ আমার সৈন্যরা পেণ্টাগণের মধ্যে লোপ পেয়ে যাবে।

কারস্কি। মিটমাট হবার এই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা।

হোয়েডেরার। অন্যকথায় শত্রুপক্ষকে সমূলে নিপাত করে তার সঙ্গে মিটমাট করা। এরপরে অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে আমাদের মোটে দুটো আসন দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত। বরং তাতে দু'দুটো আসন ফালতু বেশী দিয়ে ফেলছ—ও দুটো আসন কারুরই প্রতিনিধিত্ব করবে না।

কারস্কি। ইচ্ছে না হয় মেনো না।

রাজকুমার। [তাড়াতাড়ি] কিন্তু যদি মানো তবে সরকার প্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের কার্ড সম্বন্ধে '৩৯-এর আইন কানুন রদ করে দিতেও পারে।

হোয়েডেরার। কি ভয়ানক প্রলোভন! [টেবিলে ঘুঁষি মেরে] ভালো। এখন আমরা পরস্পরকে চিনে নিয়েছি, এবারে কাজ শুরু করা যাক্। আমার সর্ত তাহলে শোন। সর্বোচ্চ কমিটিতে ছ'জন সদস্য থাকবে। সর্বহারা দলের তাতে তিনটে আসন—বাকী তিনটে তোমরা যেভাবে খুশী ভাগবাঁটোয়ারা করতে পার। গুপ্তদলগুলো সব স্পষ্ট পরস্পর হতে স্বতন্ত্র থাকবে। কেন্দ্রীয় কমিটির ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো ব্যাপারে তারা যুক্তভাবে কাজে অংশ নেবে না' মানতে হয় মানো, নয়তো ইতি।

কারস্কি। তুমি কি মস্করা করছো ?

হোয়েডেরারর। ইচ্ছে না হয় মেনো না।

কারস্কি। [রাজকুমারকে] আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম এ লোকদের সঙ্গে কখনো কোন মিটমাট সম্ভব নয়। আমাদের হাতে রয়েছে দেশের দুভাগের তিনভাগ টাকা, অস্ত্রশস্ত্র, শিক্ষিত আধা সামরিক বাহিনী—তাছাড়া আমাদের দলের শহীদেরা আমাদের যে নৈতিক প্রাধান্য দিয়েছে সে কথা ছেড়েই দাও। আর এরা, কানাকড়ির সামর্থ্য নেই এই একমুঠো লোক, একেবারে বেপরোয়া দাবী করে বসল কি—না কেন্দ্রীয় কমিটিতে ওদের সংখ্যাধিক্য দিতে হবে।

হোয়েডেরার। তাহলে ? তোমরা গররাজী ?

কারস্কি। আমরা গররাজী। তোমাকে ছাড়াও আমাদের চলবে।

হোয়েডেরার। ভাল কথা—তাহলে ভাগো। [করস্কি মিনিটকাল ইতস্তত করে, তারপর দরজার দিকে এগোয়। রাজকুমার কিন্তু নড়েনি।] কুমারের দিকে চেয়ে দেখ কারস্কি, ওর তোমার চাইতে বুদ্ধি বেশী। ও এর মধ্যেই বুঝতে পেরেছে।

কুমার। [কারস্কিকে মৃদুভাবে] আমরা

একেবারে বিবেচনা না করেই ওর প্রস্তাব ফেলে দিতে পারিনে।

কারস্কি। [উত্তেজিতভাবে] এ কোনো প্রস্তাবই না—এসব নির্বোধের দাবী। এ আমি আলোচনা করতে রাজী নই। [কিন্তু নড়ে না]

হোয়েডেরার। '৪২ সালে পুলিস আমাদের লোক তোমাদের লোক দুপক্ষেরই পেছনে ধাওয়া করেছিল। তোমরা তখন রাজ-অভিভাবকের পরে আক্রমণের চেষ্টা চালাচ্ছিলে, আমরা সামরিক উৎপাদন বানচাল করছিলাম। তবু পেন্টাগণের কোনো ছেলের সঙ্গে আমাদের দলের কোনো ছেলের দেখা হলে একজনের দেহ পথের ধারে নর্দমায় গড়াত। হঠাৎ আজ তোমরা চাইছ, তারা সবাই পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরে একেবারে বন্ধু বনে যাবে। কেন?

কুমার। দেশের কল্যাণের জন্যে।

হোয়েডেরার। '৪২ সালে যা কল্যাণ ছিল আজ তা আর কেন কল্যাণ নেই? [থেমে] রুশেরা স্টালিনগ্রাডে পাউলুসের বাহিনীকে হটিয়েছে আর জর্মানরা যুদ্ধ হারতে শুরু করেছে—সেইজন্যে কি?

কুমার। এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধের বিবর্তনের ফলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না……

হোয়েডেরার। ঠিক উল্টো। আমি জানি তুমি বেশ বুঝতে পেরেছ। আমি জানি তুমি ইলিতিয়াকে বাঁচাতে চাও। কিন্তু তুমি চাও এই বর্তমানের সামাজিক বৈষম্য আর শ্রেণীগত সুযোগসুবিধেনির্ভর ইলিতিয়াকে বাঁচাতে। যখন মনে হয়েছিল জর্মানরা জিতবে, তোমার বাবা তাদের দলে ভিড়েছিল। আজ ভাগ্যের চাকা উল্টে গেছে। তাই সে আজ রুশিয়ার সঙ্গে বনিবনা করার জন্যে ভারী ব্যস্ত। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই।

কারস্কি। হোয়েডেরার, জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে আমার দলের অনেকে প্রাণ দিয়েছে। আমাদের সুবিধে স্বার্থ রক্ষার জন্যে আমরা শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, একথা বললে সইব না।

হোয়েডেরার। জানি কারস্কি, পেন্টাগণ জর্মানবিরোধী। সেদিক থেকে তুমি নিরাপদ। হিটলার যাতে ইলিতিয়া আক্রমণ না করে রিজেন্ট তার জন্যে তাকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তুমিও সে রুশবিরোধী ছিলে—রুশের সৈন্য তখন অনেক অনেক দূরে ছিল কিনা। "ইলিতিয়া—একা ইলিতিয়া"—ও ধুয়ো আমার খুব জানা। দুবছর ধরে জাতীয় বুর্জোয়াদের তুমি এই ধুয়ো শুনিয়ে এসেছ। কিন্তু রুশবাহিনী ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে, একবছরের মধ্যে তারা আমাদের মাঝখানে এসে পড়বে, ইলিতিয়া তখন আর এত একা থাকবে না। তাহলে? তাই তোমার নতুন নিরাপত্তার দরকার পড়েছে। কি সুবিধেই না হত যদি তাদের বলতে পারতে—পেন্টাগণ তোমাদের হয়েই লড়েছে আর রিজেন্ট দুমুখো খেলা খেলছিল। মুশকিল কি, তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। কি করবে তারা? অ্যাঁ? কি করবে তারা? শেষ পর্যন্ত আমরা ত' তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম।

কুমার। ভাই হোয়েডেরার, রুশিয়া যখন বুঝতে পারবে যে আমরা সত্যিই…

হোয়েডেরার। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, একজন ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর আর এক সংরক্ষণশীল পার্টি তাদের জয়-লাভে সাহায্য করার জন্যে 'সত্যিই' ছুটে এসেছে, তখন তারা যে একেবারে কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠবে এমন ত' মনে হয় না। [থামে] রুশিয়ার বিশ্বাস বজায় রেখে এসেছে শুধুমাত্র একটি পার্টী; শুধু একটি পার্টীই যুদ্ধের সমস্ত কাল ধরে তার সঙ্গে সংযোগ রেখে এসেছে, একটি পার্টীই সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে দিয়ে তার কাছে দূত পাঠাতে পারে, তোমাদের এই ক্ষুদ্র ঐক্যকে নিরাপত্তা দিতে শুধু একটি পার্টীই পারে,—সে আমাদের পার্টী। রুশেরা এখানে এসে আমাদের চোখ দিয়েই সব কিছু দেখবে। [থেমে] বুঝতে পারছ? আমরা যা বলি তোমাদের তা মানতেই হবে।

কারস্কি। আমার এখানে আসতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল।

কুমার। কারস্কি!

কারস্কি। তুমি যে আমাদের আন্তরিক প্রস্তাবের জবাবে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করবে এটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

হোয়েডেরার। বলে যাও। কোঁ কোঁ কর খানিকটা। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। সড়াকিতে গাঁথা শুয়োরের মত কোঁ কোঁ করবে বইকী। কিন্তু এও মনে রেখোঃ যদি আমরা আগে হতে একসঙ্গে কাজ করতে পারি তবে রুশ সৈন্য আমাদের সীমান্তে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা—অর্থাৎ তোমরা আর আমরা একসঙ্গে—সব ক্ষমতা হাতে নেব। কিন্তু আজ যদি আমাদের মতে মিল না হয় তবে যুদ্ধের শেষে শুধু আমার পার্টীই একলা দেশ শাসন করবে। এখন বেছে নাও।

কারস্কি। আমি…

কুমার। [কারস্কিকে] গায়ের জোরে ফল হবে না। আমাদের বাস্তববাদীর মত অবস্থাটা বিবেচনা করতে হবে।

কারস্কি। [কুমারকে] ভীতু কোথাকার। নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে ষড়যন্ত্রের জালের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছ।

হোয়েডেরার। জাল কোথায়? তোমার ইচ্ছে হলে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পার। কুমারের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে তোমাকে আমার কোন দরকার নেই।

কারস্কি। [কুমারকে] তুমি নিশ্চয়ই এভাবে......

কুমার। কি ব্যাপার? যদি এ ঐক্যে তোমার আপত্তি থাকে ত' আমরা তোমায় যোগ দিতে বাধ্য ত' করছি না। তবে আমার সিদ্ধান্ত তোমার পরে নির্ভর করে না।

হোয়েডেরার। বোধহয় বলবার দরকার করে না যে রিজেন্টের সরকারের সঙ্গে আমাদের পার্টীর চুক্তি হলে যুদ্ধের শেষ দিকে পেন্টাগণের অবস্থা কঠিন হয়ে উঠবে। এও বলার দরকার করে না যে, জর্মানরা হেরে গেলেই আমরা পেন্টাগণকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠেপড়ে লাগব। কিন্তু তুমি যখন তোমার হাত দুটো একেবারে পরিচ্ছন্ন রাখতেই চাও.....

কারস্কি। তিন বছর ধরে আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি। আমাদের এই আদর্শের জন্যে হাজার হাজার তরুণ প্রাণবলি দিয়েছে। আমরা পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছি। আর এ সব কেন করলাম? না, যাতে এক অন্ধকার রাতে জার্মান পার্টী রুশ পার্টীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের গলা কাটতে পারে।

হোয়েডেরার। নাকী কান্না রাখো কারস্কি। হারা তোমাদের নিয়তি, তাই তোমরা হেরেছ। "ইলিতিয়া, একা ইলিতিয়া......" জবরদস্ত সব শত্রুশক্তিতে ঘেরা ছোট্ট একটা দেশকে এ আওয়াজ তুলে রক্ষে করা যায় না। [থেমে] আমার সর্ত মানবে কি?

কারস্কি। এ সর্ত মানবার অধিকার আমার নেই—আমি ত' একা নই।

হোয়েডেরার। আমার তাড়াতাড়ি আছে কারস্কি।

কুমার। ভাই হোয়েডেরার, আমরা বোধ হয় ওকে ভেবে দেখার জন্যে কিছু সময় দিতে পারি। যুদ্ধ ত' এখনি শেষ হয়ে যায়নি, আর আমরা কিছু একেবারে আমাদের শেষ হপ্তায় এসে পৌঁছইনি।

হোয়েডেরার। আমি আমার শেষ হপ্তায় এসে পৌঁছেছি। কারস্কি, আমি তোমায় বিশ্বাস করব। আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, এ আমার একটা মূল নীতি। আমি জানি তোমার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করা দরকার, কিন্তু আমি এও জানি যে, তুমি তাদের বোঝাতে পারবে। তুমি যদি মোটমাট আমার এ প্রস্তাবের নীতিটা আজ মেনে নাও, আমি কাল আমার অন্য কমরেডদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।

হ্যুগো। [হঠাৎ উঠে পড়ে] হোয়েডেরার!

হোয়েডেরার। কি?

হ্যুগো। এতবড় আস্পর্ধা তোমার?

হোয়েডেরার। চুপ!

হ্যুগো। তোমার কোন অধিকার নেই। ওরা......ভগবান, ওরা ত' সেই একলোক। সেই আমার বাবার কাছে যারা আসত......সেই নির্বোধ বার্থ মুখগুলো......ওরা এখানেও আমার পিছু নিয়েছে। তোমার কোন অধিকার নেই......এরা সব জায়গায় গলে ঢুকে পড়ে, সব কিছুকে বিষাক্ত করে তোলে—ওরা আমাদের চাইতে প্রবল......

হোয়েডেরার। চুপ করলে?

হ্যুগো। তোমরা দুজন আমার কথা শোন—ও যদি এই ঐক্য চালাবার চেষ্টা করে, পার্টী কিছুতেই ওকে সমর্থন করবে না। ও যে তোমাদের চুনকাম করতে পারবে ভরসা কোর না—পার্টী ওকে সমর্থন করবে না।

হোয়েডেরার। [অন্য দুজনকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করে] ওর কথায় কান দিও না। এ একেবারে বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া।

কুমার। ঠিক, কিন্তু লোকটা বড্ড হল্লা করছে। তোমার পাহারাওয়ালাদের ওকে বাইরে বার করে দিতে বল না।

হোয়েডেরার। কি যা তা বলছ! ও নিজেই যেতে পারে! [উঠে হ্যুগোর কাছে যায়]

হ্যুগো। [পিছিয়ে] আমায় ছুঁও না। [পকেটে রিভলভারে হাত রেখে] আমার কথা শুনবে না? তুমি আমার কথা শুনবে না?

[সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। জানলার কবাট দুটো হিঞ্জ হতে ছিঁড়ে ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ে]

হোয়েডেরার। শুয়ে পড়! [হ্যুগোকে চেপে ধরে মাটীতে ফেলে দেয়। অন্য দুজন উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। লেয়', জর্জ, শ্লিক ছুটে ঢোকে]

লেয়'। কোথাও লেগেছে?

হোয়েডেরার। [উঠে দাঁড়িয়ে] না। এখানে কারো কি লেগেছে? [কারস্কিও উঠে পড়ে] তোমার যে রক্ত পড়ছে।

কারস্কি। ও কিছু না। কাঁচের টুকরো।

শ্লিক। হাতবোমা।

হোয়েডেরার। বোমা কিম্বা হাতবোমা হবে। কিন্তু ছোঁড়াটা একটু কমজোরে হয়েছিল। বাগানটা ভাল করে দেখ।

হ্যুগো। [জানলার দিকে ফিরে নিজের মনে] হারামজাদারা, ওহ্, হারামজাদারা! [লেয়' আর জর্জ জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ে]

হোয়েডেরার। [কুমারকে] আমি এই রকমই একটা কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। কিন্তু ওরা এই বিশেষ মুহূর্তটা বেছেছে বলে আমি

"সত্যিই
সহজ...
লাক্স টয়লেট্
সাবান মেখে
আরও সুন্দর হওয়া"
আখ্তার
জাহান
বলেন

দুঃখিত।

কুমার। আমার বাবার প্রাসাদের কথা মনে পড়ছে। কারস্কি! এ কি তোমার দলের কেরামতি না কি?

কারস্কি। পাগল হয়েছ!

হোয়েডেরার। ওরা আমাকে লক্ষ্য করে ছ‍ুঁড়েছিল—এর লক্ষ্য আমি ছাড়া আর কেউ নয়। [কারস্কিকে] দেখলে ত' সতর্ক হওয়া ভাল কেন? [তার দিকে চেয়ে] কিন্তু তোমার যে বড্ড রক্ত পড়ছে।

যেসিকা। [হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকে] হোয়েডেরার কি মারা গেছে?

হোয়েডেরার। তোমার স্বামী নিরাপদে আছে। [কারস্কিকে] লেয়ঁ তোমাকে ওপরে আমার ঘরে নিয়ে যেয়ে ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে। তারপর আমরা আমাদের আলোচনা চালাতে পারব।

শিলক। তোমরা সকলেই ওপরে চলে যাও—ওরা আবার একবার চেষ্টা করতে পারে। লেয়ঁ যতক্ষণ ওষ‍ুধ লাগাবে, ব্যান্ডেজ বাঁধবে, ততক্ষণ তোমরা তোমাদের আলাপ আলোচনা করতে পার।

হোয়েডেরার। ঠিক। [জর্জ এবং লেয়ঁ জানলা দিয়ে ফিরে আসে] কি হোল?

জর্জ। পকেটবোমা। বাগান থেকে ছ‍ুঁড়েই হাওয়া হয়েছে। দেয়ালটায় চোট লেগেছে খানিকটা।

হ্যুগো। হারামজাদারা।

হোয়েডেরার। চল, ওপরে যাই। [তারা দরজার দিকে এগোয়। হ্যুগো অনুসরণ করতে যায়।] তোমাকে আসতে হবে না। [পরস্পরের দিকে তাকায়। হোয়েডেরার ফিরে অন্যদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়]

হ্যুগো। [দাঁতে দাঁত চেপে] হারামজাদারা!

জর্জ। কি?

হ্যুগো। যারা বোমাটা ছ‍ুঁড়েছে। তারা হারামজাদা! [মদ ঢালতে যায়]

শিলক। একটু ঘাবড়ে গেছ, এ্যাঁ?

হ্যুগো। ফুঃ।

শিলক। তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। গুলিগোলার মুখোমুখি এই প্রথমবারই ত'। আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে।

জর্জ। একটা কিছু জানলে। শেষ পর্যন্ত এতে আজেবাজে ভাবনা হতে মন চলে আসে। তাই না শিলক?

শিলক। তা একটু নতুনত্ব আনে, ঘুম ছুটিয়ে দেয়, গুটোনো পা দুটো ছড়িয়ে দেয়।

হ্যুগো। আমি মোটেই ঘাবড়াইনি। আমি রেগে গেছি। [মদ খায়]

যেসিকা। কার পরে রেগেছ, মৌমাছি?

হ্যুগো। যে হারামজাদারা বোমা ছ‍ুঁড়েছে।

শিলক। পাতলা চামড়া কিনা। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

জর্জ। এ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওরা না থাকলে আমরাও এখানে থাকতাম না।

হ্যুগো। দেখছ, সবাই কেমন শান্ত, খুশী, সবাই কেমন হাসছে। ও লোকটার শুয়োরের মত রক্ত ঝরছিল। তবু কেমন মুখটা মুছে হেসে বললে, ও কিছু না। ওরা সব সাহসী পুরুষ। দুনিয়ার সবসে পাজী নেড়িকুত্তার বাচ্চারা—তাদেরো সাহস আছে—যাতে তাদের পুরোপুরি ঘেন্না না করতে পারি। [বিষণ্ণভাবে] এতে মানুষের মাথা খারাপ হবে না। [মদ খায়] সংসারে দোষ আর গুণ ঠিকভাবে বাঁটা হয়নি।

যেসিকা। তুমি ত' ভীতু নও, মানিক!

হ্যুগো। আমি ভীতু নই, কিন্তু আমি সাহসীও নই। আমার স্নায়ু একটুতেই বিচলিত হয়ে ওঠে। যদি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারতুম আমি শিলক হোয়ে গেছি! চেয়ে দেখ ওর দিকে। আড়াইমণি মাংসের স্তূপে সুপুরীর মত ক্ষুদে একটু মগজ। ওই ক্ষুদে সুপুরী থেকে রাগদুঃখের খবর পাঠায়, কিন্তু সে খবর মাংসস্তূপের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যায়। একটু সুড়সুড়ি লাগে হয়তো—বাস।

শিলক। [হেসে ওঠে] শুনলে কথা।

জর্জ। [হেসে ওঠে] মন্দ না। [হ্যুগো মদ খায়]।

যেসিকা। হ্যুগো!

হ্যুগো। অ্যাঁ?

যেসিকা। আর মদ খেও না।

হ্যুগো। কেন? আমার ত' আর কিছু করবার নেই। আমার দায়িত্ব চুকে গেছে।

যেসিকা। হোয়েডেরার কি তোমাকে বরখাস্ত করেছে?

হ্যুগো। হোয়েডেরার? হোয়েডেরারের কথা কে বলছে? ওই ঠিক পথঃ আমার মত ছোকরাকে দিয়ে যদি কিছু করাতে চাও, তাহলে প্রথমে তাকে বিশ্বাস কর। হোয়েডেরার সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছে ভাবতে পার—কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। খুব কম লোক সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। [মদ খায়, তারপর শিলকের কাছে যায়] বুঝলে না, কেউ ধর তোমাকে খুব গোপন একটা কাজের ভার দিয়ে পাঠালো, তুমি মরার বাড়া করে তা পালন করতে গেলে, আর ঠিক যখন সে কাজটা হাসিল করতে যাচ্ছ তখন টের পেলে তারা তোমার সততার এক কানাকড়িও দাম দেয় না, তারা অন্যলোক দিয়ে সেই কাজ করিয়ে নিয়েছে।

যেসিকা। চুপ করবে! আমাদের ঘরের ব্যাপার নিয়ে কি বাজারে ঢাক পেটাবে নাকি?

হ্যুগো। ঘরের ব্যাপার! হা! হা! [ব্যঙ্গ করে] খাসা মেয়ে একখানা!

যেসিকা। ও আমার কথা বলছে। এই দু'বছর ধরে আমাকে শোনাচ্ছে—আমি নাকী ওকে বিশ্বাস করিনে।

হ্যুগো। কি একখানা মাথা তোমার,

এ্যাঁ? কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। আমার মুখের ভাবেই নিশ্চয় কোনো দোষ আছে। [যেসিকাকে] বল আমায় তুমি ভালবাস?

যেসিকা। এদের সামনে না।

শিলক। আমাদের গ্রাহ্য কোর না।

হুগো। ও আমায় ভালবাসে না। ভালবাসা কি তাই ও জানে না। ও যে স্বর্গের পরী! বাইবেলের সেই নুনের থাম।

শিলক। নুনের থাম?

হুগো। না, মানে বরফের মূর্তি। ওর সঙ্গে যদি প্রেম করতে যাও দেখবে গলে মিলিয়ে গেছে।

জর্জ। যাঃ! কি যে বল!

যেসিকা। এই, চল, বাড়ি চল।

হুগো। দাঁড়াও। শিলককে একটু উপদেশ দিয়ে যাই। আমি যে শিলককে বড্ড ভালবাসি। ওর গায়ে জোর কত আর ও মোটে কখনো ভাবে না। কি শিলক, কিছু উপদেশ শুনতে চাও?

শিলক। অগত্যা। যদি না থামো ত' আর কি করব?

হুগো। শোন, বেশী ছেলেবয়সে বিয়ে কোর না।

শিলক। না, এখন আর সে ভয় নেই।

হুগো। না, না, শোন। খুব ছেলেবয়সে বিয়ে কোর না। কি বলছি বুঝতে পারছ? খুব ছেলেবয়েসে বিয়ে কোর না। আর, যা করবার সামর্থ্য নেই তার দায়িত্ব নিও না। পরে তা বড্ড ভারী হয়ে ওঠে। সব কিছুই ভারী। জানিনে লক্ষ্য করছ কিনা, তরুণ হওয়া মোটেই আরামের না। [হেসে ওঠে] বিশ্বস্ত গোপন কাজ! আচ্ছা বল ত', এর বিশ্বাসটা কোথায়।

জর্জ। কি গোপন কাজ?

হুগো। হুঁ, বাবা! আমাকে এক গোপন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

জর্জ। কি গোপন কাজ?

হুগো। ওরা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমি অভেদ্য। [আরশীতে চেয়ে দেখে] অভেদ্য! ভাবলেশহীন মুখ—পাশের লোকটার মুখ থেকে আলাদা করতে পারবে না। কিন্তু এত চোখে পড়ার কথা, ঈশ্বর, এত চোখে পড়ার কথা।

জর্জ। কি?

হুগো। যে আমার পরে বিশেষ কাজের ভার পড়েছে।

জর্জ। শিলক?

শিলক। হুঁ......

যেসিকা। [অবিচলিতভাবে] মিছে মাথা ঘামিও না। ও আসলে বলতে চাইছে আমার একটা বাচ্চা হবে। আরশীতে দেখছে ওকে ছেলেপুলের বাপের মত দেখায় কিনা।

হুগো। চমৎকার! ছেলেপুলের বাপ তাই বটে, তাই বটে! ছেলেপুলের বাপ! ও আর আমি কথা না বলেই দু'জনে দু'জনকে বুঝতে পারি। অভেদ্য; কিন্তু চোখে পড়ার কথা ......যে আমি ছেলেপুলের বাপ

কিছু না কিছু ত' চিহ্ন থাকবে। কোন বিশেষ ভংগী—মুখে একটা কোন আস্বাদ—বুকে কোন একটা কষ্ট। [মদ খায়] হেয়েডেরারের জন্যে দুঃখু হচ্ছে! কেন? বলছি—ও আমায় সাহায্য করতে পারত। [হেসে ওঠে] বেটারা ওপরে বকবক করে চলেছে আর লেয়' কারাস্কির শুয়োরের মত নোংরা মুখটা ধুয়ে দিচ্ছে। তোমরা সবাই কি ভুতু? আমাকে গুলি করে মারছ না কেন?

শিলক। [যেসিকাকে] তোমার সোয়ামীটির বাপু মদ না খাওয়াই উচিত।

জর্জ। একদম সামলাতে পারে না।

হুগো। বলছি আমাকে গুলি কর। এটা তোমাদের কাজ। শোন—ছেলেপুলের বাপ কখনো সত্যিকারের বাপ হয় না। কোনো খুনে কখনো সবটাই খুনে নয়। তারা ভান করছে, বুঝলে? শুধু মরা মানুষে সত্যি সত্যি সবখানিই মরা। বাঁচব কি বাঁচব না, অ্যাঁ? আমি কি বলতে চাই বুঝতে পারছ। মাথার ওপরে ছ' ফুট জমি মুড়ি দিয়ে একটা মরা দেহ হওয়া ছাড়া সত্যিকারের আর কিছুই আমি হতে পারিনে। আমি বলছি, এ সবই একটা খেলা। [আচমকা থেমে যায়] আর এ সবও একটা খেলা। সব কিছু! যা কিছু আমি বলছিলাম। তোমরা বোধ হয় ভেবেছ যে, আমার সব আশা-ভরসা ফুরিয়ে গেছে? মোটেই না। আসলে আমি আশা-ভরসা ফুরোনোর খেলা খেলছিলাম। আচ্ছা, আমাদের পক্ষে কখনো কি এ খেলা থামানো সম্ভব?

যেসিকা। আমার সংগে আসবে কিনা?

হুগো। দাঁড়াও। না। জানি না।

যেসিকা। [তার গেলাস ভরে দেয়] বেশ, তাহ'লে মদ খাও।

হুগো। খুব ভাল। [মদ খায়]

শিলক। ওকে মদ দেওয়া বুদ্ধিমতীর কাজ হচ্ছে না।

যেসিকা। তা'তে তাড়াতাড়ি চোকান যাবে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি? [হুগো গেলাস খালি করে। যেসিকা আবার ভরে দেয়]

হুগো। কি যেন বলছিলাম? খুনের কথা বলছিলাম কি? তার মানে শুধু আমি আর যেসিকাই জানি। আসলে এখানে এর ভেতরে বড্ড বেশী কথা কাটাকাটি চলেছে। [নিজের কপালে চড় মারে] আমি শুধু চাই নীরবতা। [শিলককে] তোমার মাথার ভেতরটা না জানি কি সুন্দর! একটু শব্দ নেই, শুধু নিশুতি অন্ধকার রাত। তোমরা চার পাশে এমন বোঁ বোঁ করে ঘুরছ কেন? হেসো না, আমি জানি, আমি মাতাল হয়েছি। আমি জানি, আমি জঘন্য। তবে তোমাদের বলি। যে চক্করে পড়েছি তা'তে পড়তে আমার একটুও সাধ নেই। না মোটেই সাধ নেই। একটুও সুবিধের চক্কর নয়। ঘুরুনি থামাও। শুধু দেশ-লাই-এর কাঠিটা জ্বালার অপেক্ষা। শুনতে অবশ্য তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ কাজ তোমার করতে হোক এ আমি কখনো চাইবো না। দেশলাই-এর কাঠি, ব্যস্। শুধু কাঠিটা জ্বালিয়ে দেওয়া। আর তারপর আমাকে নিয়ে সবাই মিলে ফুটি-ফাটা হয়ে উড়ে যাওয়া। অকুস্থলে না-থাকা আর প্রমাণ করতে হবে না। শুধু নীরবতা আর অন্ধকার রাত ছাড়া আর কিছু নেই। অবশ্য যদি মৃতরাও খেলা করে, তাহ'লে বলা যায় না। ধর কেউ মরে গেল, আর তারপর দেখি কি, না মরালোকেরা অন্য কিছুই না, আসলে জ্যান্তলোকেরাই মরা মরা খেলছে। দেখব, আমরা দেখব। শুধু কাঠিটা একবার জ্বালিয়ে দিলেই হল। সেইটেই হল সংকটের মুহূর্ত। [হেসে ওঠে] ভগবানের দিব্যি, একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, নইলে আমিও যে লাট্টুর মত বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করব। [ঘুরতে চেষ্টা করে। একটা চেয়ারে ধপ্ করে পড়ে যায়] দেখছ ত', সভ্য শিক্ষার কত গুণ। [মাথাটা ঝুলে পড়ে। যেসিকা কাছে যেয়ে দেখে]

যেসিকা। এতক্ষণে চুকল। একটু ধরবে, ওকে বিছানায় তুলে নিয়ে যাব?

শিলক। [যেসিকার দিকে চেয়ে মাথা চুলকোয়] ভারী অদ্ভুত কি সব কথা বলল।

যেসিকা। [হেসে ওঠে] আমি ওকে যেমন চিনি তুমি ত' তেমন চেন না। ওর কথায় কান দিও না। ওর কথার কোন মানে নেই। [শিলক আর জর্জ হুগোর দু' পা আর কাঁধ ধরাধরি করে তোলে আর তারি সংগে নেমে

(ক্রমশঃ)
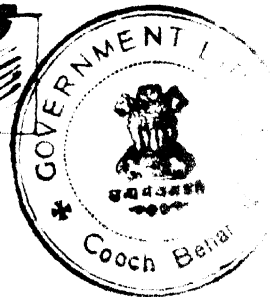
মোমের পুতুল

সন্তোষকুমার ঘোষ

[২৬]

সেদিন ছাতে দাঁড়িয়ে সুধা দেখেছিল আদিত্য মজুমদারের গাড়িটা ওদের বাড়ির সমুখে এসে দাঁড়াল। প্রথমে নামল ফুলমাসি, তার পিছনে মাথানীচু নীরদ। সুধা নীচে নেমে এল তাড়াতাড়ি, ততক্ষণে ফুলমাসি ওর বাবাকে নিয়ে বাইরে ঘরে ঢুকেছে। ছাত থেকে একতলায় পৌঁছতে এক মিনিটও লাগেনি, কিন্তু দরজা পর্যন্ত এসে সুধার আর পা সরল না; ভিতরে যাবে কি যাবে না ঠিক করতেই মিনিট দুই কেটে গেল।

টের পেল ফুলমাসি বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, টুল পেতে দিয়ে কী একটু ঠাট্টা করল বাবাকে, তারপর হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি এসব পাগলামি কেন করছেন বলুন তো, জামাইবাবু?'

দরজার আড়াল থেকে সব শুনল সুধা। ভিতরে আর যাওয়া হল না।

অনেক পরে নীরদকে আস্তে আস্তে বলতে শোনা গেল, 'দিব্যি তো লুকিয়ে ছিলুম, আমাকে আবার কেন টেনে আনলে অতসী।'

অতসী বলল, 'আশ্চর্য আপনার বিবেচনা।'

নীরদ প্রতিবাদ করলেন না, সরল সহজ হেসে বললেন, 'তা একটু আশ্চর্য বটে।'

সেই নিশ্চিন্ত হাসির রকম দেখে অতসীর শরীর জ্বলে গেল। উনুনে-রাখা কেৎলির মত ফোঁস-ফোঁস করে বলল, 'বাড়িঘর ফেলে এসেছেন, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভাবছেন, দিনকতক গা-ঢাকা দিতে পারলেই বেঁচে গেলেন। ঠিক উটপাখিদের মত। জানেন, কচি এক ফোঁটা মেয়ে আপনার খোঁজে এসেছিল? দিদি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেছে জানেন?'

'পাগল হয়ে গেছে?' নীরদ তবু চঞ্চল হলেন না, মৃদু-মৃদু হেসে বললেন, 'পাগল হয়ে গেছে? তবে তো মল্লিকা বেঁচে গেছে।' অতসীর রুষ্ট-বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বক্তব্যটা শেষ করলেন, 'আমি তো অনেক চেষ্টা করেছিলুম পাগল হতে, পারলুম না।' দীর্ঘ চুল-গুলো আঙুল দিয়ে বিন্যস্ত করে নীরদ বললেন, 'পাগল হতে পারলেই লোকে নিজেকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে। জানলে অতসী, তার আগে একটা মোহের খোলশে স্বরূপ ঢাকা থাকে।'

এবার অতসী আর নিজেকে সামলাতে পারল না। তীব্র গলায় বলে উঠল, 'থিয়েটার—থিয়েটার। আপনার এতখানি বয়স হল জামাইবাবু, এত ঘা খেলেন তবু জ্ঞান হল না। এখনও টের পেলেন না, জীবনটা নাটক নয়। আমার দিকে চেয়ে বলুন তো, কেন কলকাতা এসেছেন, কেন সব দায়িত্ব অস্বীকার করে পালিয়ে ফিরছেন।'

'পালিয়ে ফিরছি না তো', নীরদ ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি এসেছি সুধন্য রায়কে খুঁজতে।'

'কী হবে তাকে দিয়ে।'

'সে আমার খাতা চুরি করেছে। খাতা ফেরৎ পেলেই দেশে ফিরে যাব।'

'পালার খাতা। সেই পালা, সেই নাটক', অতসী হতাশ গলায় বলল, 'আশ্চর্য জামাইবাবু, আপনি এখনও বুঝছেন না, এ-সবে পেট ভরে না। বেঁচে থাকাটা নাটক-লেখার চেয়ে শক্ত ব্যাপার। এর চেয়ে আপনি যদি—'

এতক্ষণ নীরদ চুপ করে শুনছিলেন, হঠাৎ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কি বলবে জানি অতসী। এর চেয়ে আমি কোন একটা চাকরি-বাকরি নিলে অনেক নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারতুম, না?'

অতসী বলল, 'এখনও সময় আছে।'

চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন নীরদ।—'না অতসী, আর সময় নেই। আজ আমার বয়স হল প্রায় পঞ্চাশ, সারাটা জীবন এই লেখা নিয়ে কাটালুম। আজ তোমরা বলছ সে-সব লেখা নয়, খেলা, কিছু হয়নি। হয়ত খেলা, আমি নিজেও তা টের পাচ্ছি। কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে সাহস পাই কই অতসী। এতদিনের সব কিছুর ওপর ঢাঁড়া টেনে আবার নতুন করে সব শুরু করব, সে-শক্তি কই, সে-বয়স কই আমার। অর্ধভুক্ত, অভুক্ত থেকে অনেক রাত জেগে যা-কিছু লিখেছি, এতদিনে নিশ্চিত জেনেছি তার সব বাজে, লোকে তা নেবে না। কিন্তু জেনেও বাকি কটা দিন আমাকে তাই আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, মা যেমন করে মরা শিশুকে আগলে থাকে, দেখনি? যখনই তাকে ছিনিয়ে নেয়, অমনি মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। জীবিত ভ্রমে যতটুকু সময় সে মৃত

শিশুকে ধরে থাকে, ততটুকুই তার শান্তি।'

একটু থেমে নীরদ বললেন, 'ভাবছ, ফের বক্তৃতা করছি। একটু করতে দাও, বাধা দিও না। সকলে মিলে যে লেখা-গুলোকে অস্বীকার করেছে, আমি নিজেও সেই সুরে সুর মিলিয়ে তাকে অস্বীকার করতে পারব না, অতসী। সে বড় নিষ্ঠুরতা হবে। কানা-খোঁড়া ছেলের পিতৃত্ব যে অস্বীকার করে সে অমানুষ। এই ভুল নিয়েই আমাকে বাকি ক'টা দিন বাঁচতে হবে। তাই কলকাতা এসেছি। সুধন্য রায় আমাকে শুধু খাতা ক'টা ফেরৎ দিক, আর কিছু চাইব না, কিছু না। আবার সেই গ্রামে ফিরে যাব।'

'তবু পথ বদলাবেন না?' অতসী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল।

'পথ?' নীরদ ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'না অতসী, বদলাব না। ধর কোথাও যেতে বেরিয়েছ, খানিকটা এগিয়ে দেখলে দু'টো রাস্তা গেছে দু'দিকে। একটা বেছে নিলে। অনেকটা এগিয়ে গেলে, মাইলের পর মাইল, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তবু পথ ফুরোয় না। হঠাৎ কারও মুখে শুনলে, এ-টা ভুল পথ। ঠিক রাস্তায় যেতে হলে অনেক, অনেক মাইল পিছিয়ে আবার এগোতে হবে। তখন ক'জন আছে অতসী, যারা সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়বে না? ক'জন আছে যারা সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন দেহ নিয়ে অন্ধকারে আবার ঠিক পথের খোঁজে যাবে বলে তৈরি হতে পারে?'

'ভুল পথের ধুলোতেই বসে থাকবেন?'

ম্লান হেসে নীরদ বললেন, 'আগেই তো বলেছি উপায় নেই। আর, ভুল কি একটা অতসী, কত ভুল যে করেছি ঠিক নেই। আজ তোমাকে খোলাখুলি সব বলি। কোনদিন সংসারের দিকে চাইনি, শুধু লিখেছি। মল্লিকাকে ঠকিয়েছি। ভাবতুম আমি স্রষ্টা, শিল্পী,—আসলে কী স্বার্থপর ছিলুম তুমি জান না। রাত জেগে লিখেছি। ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠেছে, তাদের কর্কশ গলায় ধমক দিয়েছি। যাকে কিছু দিইনি, সেই মল্লিকা ভয়ে-ভয়ে ওদের নিয়ে বাইরে গেছে, হিমে-ভেজা উঠোনে পায়চারি করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে ওরা ঘুমোয়নি, মল্লিকা ভেতরে আসতে সাহস পায়নি চাপা গলায় কেঁদেছে, টের পেয়েছি, তবু ওকে ডেকে আনিনি। লিখেই গেছি, শুধু কি সৃষ্টির মোহে, 'অতসী?'

অতসী জবাব দিল না, নীরদ নিজেই বলে গেলেন, 'তখন ভেবেছি তাই। এখন বুঝেছি, সেটা ছিল খ্যাতির মোহ। তখন কি জানি আমার ভেতরে দু'জন আলাদা হয়ে গেছে? একজন শিল্পী, সব ভুলে শুধু রচনা করেছে; আরেকজন লোভী, মনে মনে ফুলের মালা আর হাততালির জন্যে লোলুপ হয়েছে।'

চোখের পাতা ভিজে উঠল নীরদের, গাঢ় স্বরে বললেন, 'সেই কাঙালটাই শেষ পর্যন্ত জিতেছিল, শিল্পীকে পিষে মেরেছিল, নইলে, বেশ তো ছিলুম, সুধন্য রায়ের হাতে হঠাৎ কেন খাতাগুলো সঁপে দিতে গেলুম। কেন অর্থ, কেন যশ কামনা করলুম অতসী, না করলে সব তো এমন একদিনে ভুল হয়ে যেত না।'

নীরদ চুপ করলেন, দু'হাতে মাথা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন। রাত্রিকরাতের বাণে বিদ্ধ একটা পাখি কিছুক্ষণ ছটফট করে যেন একেবারে চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে নীরদ বললেন, 'সুধাকে একবার ডাক তো অতসী, একবার দেখি।'

নীরদ সেদিনই চলে গিয়েছিলেন। সুধাকে নিয়ে অতসী যখন ঘরে ফিরে এল, নীরদ তখন অন্যমনস্ক, কাউকে দেখতে পাননি।

অতসী বলল, 'জামাইবাবু, সুধা এসেছে।'

সুধার চোখে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন নীরদ, ব্যাকুল হয়ে মেয়ের হাত দু'টি টেনে নিলেন মুঠিতে।

কোন কথা হয়নি। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে নীরদ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'চলি।'

'মার সঙ্গে দেখা করবেন না?'

নিমেষমাত্র ইতস্তত করলেন নীরদ বললেন, 'না থাক।'

শশাঙ্কর সঙ্গে অতসীর ঝগড়া হয়ে গেল এরও দিন দুই পরে।

অতসী বাইরে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল, শশাঙ্ক ভিতরে উঁকি দিয়ে বলল, আসব অতসী? একটু জরুরী পরামর্শ ছিল তোর সঙ্গে।'

অতসী বলল, 'এস।'

ঘরে বসবার আসন নেই, শশাঙ্ক সোজা জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, বাইরের দিকে চেয়ে বলল, 'কেতকীর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'কী ঠিক করেছিস।'

অতসী হেসে ফেলল।—'ঠিক তো করবে তোমরা। তোমাদের নাকি বিয়ে হবে, সব ঠিকঠাক? আমাকে উলু দিতে হবে এই তো। ঠিক সময়ে দিয়ে দেব দেখো, কিছু ভাবতে হবে না।'

শশাঙ্ক গম্ভীর গলায় বলল, 'ঠাট্টা নয় অতসী।'

অতসী বলল, 'ওরে বাবা, ঠাট্টা কি করতে পারি। তুমি গুরুজন, তাতে আবার বোমার দলে ছিলে। কী রাশ-ভারি ছিলে তখন। আমাকে নভেল পড়তে দেখে একবার শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলে, মনে নেই? তখন তো তোমাকে শুধু গীতা আর মোহ-মুদ্গর পড়তে দেখেছি ছোড়দা। কী হ'ল সে-সব বই,—পুড়িয়ে ফেলেছ?'

'ইয়ার্কি রাখ্।' শশাঙ্ক ধমক দিয়ে উঠল, 'তুই আদিত্য মজুমদারের কাজ করবি কিনা বল। এখনও প্রভাত মল্লিক তোমাকে কাজে নেয় অতসী, তুই যদি তার হয়ে ক্যাম্পেন করতে রাজি হ'স।'

কঠিন হয়ে অতসী বলল, 'তা আর হয় না ছোড়দা। অনেক দূর এগিয়েছি, আর ফেরা যায় না। আর, প্রভাত মল্লিকের বিশেষ করে আমাকেই চাই কেন বল তো। কর্মী চাই, বেশ তো, তোমার কেতকীকে ক্যাম্পেনের কাজে ভিড়িয়ে দাও না।'

অন্ধকার মুখে শশাঙ্ক বলল, 'তুই কিছু বুঝিস না অতসী। এ কি কেতকীর কাজ।'

অতসীর মুখও কাল হয়ে গিয়েছিল, সেই কালিমা ঢাকতেই সে বুঝি জোরে জোরে হেসে উঠল।—'তোমাকে ধন্যবাদ ছোড়দা, অন্তত স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে পেরেছ। কেতকী কুলবধূ, লক্ষ্মী, ইলেক্‌শনের দালালির মত নোংরা কাজ তাকে মানায় না, এই তো?'

অপ্রতিভ শশাঙ্ক বললে, 'তা কেন, তা কেন। আমি বলছিলুম কি, কেতকী একেবারে ছেলেমানুষ—'

দপ করে জ্বলে উঠল অতসীর চোখ, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অতি ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমিও একদিন ছেলেমানুষ ছিলুম দাদা।'

শশাঙ্ক অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'তুই সব কিছুরই বাঁকা অর্থ করছিস। এই সোজা কথাটা কেন বুঝতে পারছিস না, আমাদের দু'জনকে সুখী হতে দেবার চাবী তোরই হাতে রয়েছে,—আমি, আমি দাদা হয়ে তোকে বলছি।'

রূঢ় গলায় হেসে উঠল অতসী।

'মোহমুদ্গর যখন তোমার বালিশের পাশে থাকত, সে-বই লুকিয়ে আমিও পড়েছি ছোড়দা। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র এমনভাবে মুখস্থ করে নিয়েছি, আজও ভুলিনি। তুমি কিন্তু শ্লোকগুলো একেবারে ভুলে গেছ?'

শশাঙ্ক বলল, 'অর্থাৎ?'

'মার মুখের দিকে চাওনি, আমার কথা ভাবনি, শ্বশুরঘর ঘুচিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম, তখনও সংসারের জন্যে আমাকে খাটিয়ে নিতে তোমার বাধেনি। আজ সেই-তুমি কেতকীর মায়ায় পড়ে গেছ দেখে এত দুঃখেও আমার হাসি পাচ্ছে ছোড়দা।'

শশাঙ্ক বলল, 'শ্বশুরবাড়ি তোর ঘুচে গিয়েছিল সে-জন্যে আমি দায়ী নই অতসী।'

'জানি, তুমি বলবে দায়ী আমার ভাগ্য। কিন্তু তোমাদেরও দায়িত্ব একটু-খানি আছে বৈকি। নেহাৎ লেখাপড়া না জানা পল্লী বালিকাটি ছিলুম না, বাবা লেখাপড়া কিছুদূর শিখিয়েছিলেন, আমার চোখ ফুটেছিল। তবু কেন আমাকে নিজের পথ বেছে নিতে দিলে না। দিনের পর দিন এক একটি পাত্রপক্ষ এনে দাঁড় করিয়েছ। তারা চুল খুলিয়ে, হাঁটিয়ে আমার পরীক্ষা নিয়েছে। একটা শিক্ষিত মেয়ের সঙ সেজে পণ্য হয়ে পরের সমুখে দাঁড়ানর কী যে গ্লানি, কোনদিন তোমরা বোঝনি, বুঝতে চাওনি। এ-যেন পা দু'খানা বড় হয়ে গেছে, তবু তাকে ছোট মাপের জুতোয় ঢোকানর চেষ্টা। তুমি জান না ছোড়দা, ওরা যখন আমার হাতের তেলো টিপে টিপে নরম কিনা পরীক্ষা করত তখন আমার সারা শরীর জ্বলে গেছে, বার বার নিজের মৃত্যুকামনা করেছি। টাকা দেখে একটা মাঝবয়সী দুশ্চরিত্র লোকের হাতে তুলে দিলে, সে-ঘর করতে আমার রুচিতে বাধল, দু'দিনেই পালিয়ে এলুম।'

শশাঙ্ক গর্জন করে উঠল,—'মিথ্যে কথা। নিজের দোষ ঢাকতে তুই ওই কথা রটিয়েছিস। আমি আসল কথা জানি। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই তোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

অতসী ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। —'তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

শশাঙ্ক নির্দয় গলায় বলল, দিয়ে-ছিল। তুই যখন এত কথা বললি তখন

আমিও সব ফাঁস করে দি। ওরা কী করে টের পেয়েছিল সেই বাউণ্ডুলে নীলাদ্রি ছোঁড়াটার সংগে তোর মাখা-মাখির কথা। মানী বংশ, সহ্য করবে কেন। তোকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তুই ফিরে এসে সে-কথা স্রেফ চেপে গিয়েছিলি।'

ক্লিষ্ট হেসে অতসী বলল, 'আশ্চর্য তোমার খবর সংগ্রহের প্রতিভা। তুমি পুলিশের গোয়েন্দা হলে না কেন ছোড়দা?'

এতক্ষণ প্রার্থীমাত্র ছিল, হঠাৎ শশাংকর সাহস বেড়ে গেছে। শাসন করার সুরে বলল, 'ও-সব ফাজলামো থাক। তুই আদিত্য মজুমদারের কাজ ছাড়বি কিনা বল।'

অতসী বলল, 'না।'

'না? এত তেজ তোমার?'

দৃঢ়তর স্বরে অতসী বলল, 'হাঁ, এতই তেজ। এই তেজ তোমার মনিব প্রভাত মল্লিককে পর্যন্ত দেখিয়ে এসেছি, ছোড়দা, তুমি তো তার বরখাস্ত চাকর মাত্র।'

ভ্রূ কুঞ্চিত করে শশাংক বলল, 'এতই টান? আদিত্য মজুমদার তোমাকে কী দেবে, শুনি?'

'শুনবে? তবে শোন। প্রভাত মল্লিককে বলিনি, কিন্তু তুমি হাজার হলেও আমার ভাই, তোমাকে বলি। নিজের সুখের স্বপ্নে তুমি অন্ধ হয়ে গেছ ছোড়দা। আর কারুরও যে স্বপ্ন থাকতে পারে, সাধ থাকতে পারে, সে-কথা তোমার মনে ঠাঁইও পায় না। অনেক ঠেকে ঠেকে আমিও আমার সুখের পথ চিনে নিয়েছি। আদিত্য মজুমদার আমাকে বিয়ে করবে।'

হো-হো করে হেসে উঠল শশাংক, একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ওর মুখটা পর্যন্ত কুৎসিত হয়ে গেছে। ঢেউয়ের-পর-ঢেউ হাসি আঘাত করল ঘরের দেয়াল, একটা হঠাৎ-বাতাসে দরজার পর্দাটা প্রবল ভাবে নড়ে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'অসভ্যতা কর না', অতসী বলল।

হাসি থামিয়ে শশাংক বলল, 'একটু আগে তুই আমাকে স্বার্থ-অন্ধ বলেছিলি কিনা, তাই হাসলুম। আমি যদি স্বার্থ-অন্ধ, তুই তবে স্বপ্ন-কানা। আদিত্য মজুমদারের মহিমার থৈ এখনও পাসনি।'

'কী বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল, ছোড়দা।'

শশাংক বলল, 'আদিত্য তোকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে আছিস, কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখেছিস, এই প্রতিশ্রুতি সে আরও কতজনকে দিয়েছে?'

অতসী বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা। তোমরা ঈর্ষ্যার বশে যা-তা রটাচ্ছ।'

'ঈর্ষ্যা, তোকে ঈর্ষ্যা? না অতসী, যত অভাবগ্রস্তই হই না কেন, আমরা পুরুষ। বড় জোর অন্য কোন পুরুষের ঐশ্বর্যকে ঈর্ষ্যা করি, স্ত্রীলোকের সৌভাগ্যকে কখনও না। যা জানি তার আভাসমাত্র তোকে দিয়েছি।'

থর থর করে কাঁপছিল অতসী, রুদ্ধ-স্বরে বলল, 'কী জান।'

নিষ্ঠুর, অবিচল গলায় শশাংক বলে গেল, 'জানি যে আদিত্য মজুমদার বিবাহিত।'

'কোথায়—কোথায় তবে সেই স্ত্রী?'

'ঠিক জানিনে, শুনেছি পশ্চিমে কোন স্বাস্থ্যাবাসে আদিত্য তাকে পরি-ত্যাগ করেছে।'

'আর', কম্পিত কণ্ঠে অতসী বললে, 'আর কী জান, ছোড়দা?'

'জানি যে কোন স্বনামধন্যা অভি-নেত্রীর সংগে আদিত্যের ঘনিষ্ঠতা আছে। ওদের এক সংগে দেখেছে কলকাতায় অন্তত এ-রকম দু'শো লোক আছে, কিন্তু তুই এমন চোখ বুঁজে আছিস—কোন খবরই রাখিসনে অতসী।'

মনের জোর হারিয়েছিল, তাই বুঝি অতসী গলায় সবটুকু জোর ঢেলে দিয়ে বলল, 'বিশ্বাস করি না। করলেও কেয়ার করি না। আদিত্য মজুমদার আমার সংগে কথার খেলাপ করতে সাহস পাবে না।'

'এত জোর?'

'এতই জোর। তুমি এতক্ষণ যা বললে, সে-সব গুজব মাত্র, কিন্তু আদিত্যের অনেক কীর্তির প্রমাণ আমার কাছে আছে। প্রয়োজন হলে সে-সব প্রকাশ করতেও পেছ-পা হব না।'

ক্রূর হেসে শশাংক বললে, 'সবাইকে বলে যাবি পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি? কিন্তু তুই নিজেও তো রেহাই পাবিনে। কলংকের ছিটে তোর নিজের গায়েও কিছু লাগবে অতসী।'

অতসী বলল, 'লাগুক। স্বদেশী আমলে যারা রাজপুরুষদের গুলী করতে যেত, তাদের অনেকে পুলিশের গুলীতেও তো মরত। মেরে তবে মরত। আমি মরবার জন্যে তৈরিই আছি ছোড়দা।' বলতে বলতে হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে ফেলল অতসী, প্রায় আদেশের সুরে বলল, 'বকে বকে আমার মাথা ধরে গেছে। ছোড়দা, তুমি এবার যাও তো।'

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কবির এই আকাঙ্ক্ষা ও সংকল্প গল্পগুলিতে বর্ণিত নরনারীর জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আবার তাহাদেরই কাহারো কাহারো জীবনে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। এক রাত্রি গল্পের সেকেণ্ড মাস্টার হঠাৎ মস্ত একটা বীরপুরুষ হইয়া উঠিবার আশায় যে ছোট সুখকে অবহেলা করিয়াছিল একদিন সেই ছোট সুখই করুণ মুখে দুর্লভ পুষ্পমঞ্জরী হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুক্তির উপায়ের ফকিরচাঁদ জীবনের সুখদুঃখের সংগে বনিবনাও করিতে না পারিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে। সম্পাদক আপনার কন্যাকে অবহেলা করিয়া সম্পাদকীয় কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়া সার্থকতালাভ করিবে ভাবিয়াছিল। আর আমাদের অনাথবন্ধু (প্রায়শ্চিত্ত) "কোন অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করার" ফলে নিজেকে ও নিজ পত্নীকে কি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছিল। সম্পাদকীয় কীর্তিলোভে শোচনীয় পরিণামের আর একটি উদাহরণ নষ্ট নীড়ের ভূপতি। আবার গুপ্তধনের লোভে সংসারের সহজলভ্য সুখকে অবহেলার অপর একটি দৃষ্টান্ত মৃত্যুঞ্জয়।

মোটের উপরে গল্পগুচ্ছের পুরুষ চরিত্রগুলিতেই এই ভাবটি কিছু প্রবল। বোধ করি, ইহা পুরুষ চরিত্রের একটি লক্ষণ, হাঁসফাঁস করিয়া মরিবার, হস্তগতকে উপেক্ষা করিয়া অনায়ত্তের সাধনা করিবার, "কবিত্বের" ও "বীরত্বের" খ্যাতিকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়তো পৌরুষের সহিত অভিন্ন। সেইজনাই বোধ করি বীর ও কবিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তাই বলিয়া নারীর নীরব বীরত্বও সামান্য নয়, তাহা চোখে পড়িতে চায় না বলিয়াই, খ্যাতির প্রত্যাশা করে না বলিয়াই হয়তো তাহার মূল্য বেশি। অনাথবন্ধুর পত্নী ও মাতা কি দুরবগাহ দারিদ্র্যের মধ্যে বীরোচিত ধৈর্য রক্ষা করিয়াছে। মহামায়া দগ্ধ মুখমণ্ডলের উপরে পূর্ণাবগুণ্ঠন টানিয়া সুখ প্রত্যাশাহীন গৃহকর্ম সমাপন করিয়া গিয়াছে আর সুরবালা দগ্ধ ললাটের উপরে অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া বৃদ্ধ পতির সেবা সৌকর্য সাধন করিয়াছে। শাস্তি গল্পের চন্দরা, মেঘ ও রৌদ্রের গিরিবালা, নিশীথে গল্পের দক্ষিণাবাবুর প্রথম পক্ষের পত্নী, দিদি গল্পের দিদি সকলেই নীরব স্বকর্তব্য সাধনের সার্থক দৃষ্টান্তস্থল, ইহাদের মধ্যে চন্দরা, দিদি ও দক্ষিণাবাবুর প্রথম পক্ষের পত্নী তো এমন নীরবে আত্মবিসর্জন করিয়াছে যে, লোকখ্যাতি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। এই সংগে আরও তিনটি নারীচরিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাসমণির ছেলের রাসমণি, শেষের রাত্রির যতীনের মাসি এবং তপস্বিনী ষোড়শী। রাসমণি কি অসীম ধৈর্যের সংগে বহুমুখী প্রতিকূলতার সংগে লড়াই করিয়াছে, কি অনন্ত কৌশল ও স্নেহের সমস্যা যতীনের মাসির আর কি অপার নিষ্ঠা ষোড়শীর। এগুলি যদি বীরত্বের নিদর্শন না হয় তবে আর বীরত্ব কাহাকে বলে।*

অবশ্য কোন কোন নারী চরিত্রে ইহার ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু জীবনেই যে ব্যতিক্রম আছে। স্বর্ণমৃগ গল্পে দেখি বৈদ্যনাথের স্ত্রী লোভের তাড়নায় স্বামীকে গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় গৃহছাড়া করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকাম বৈদ্যনাথ সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আর একটি ব্যতিক্রম নামঞ্জুর গল্পের অমিয়া এবং সংস্কার গল্পের কলিকা। ইহারা দু'জনেই রাজনৈতিক কর্মিনী। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের অর্থবোধ সহজ। রাজনীতি এমন একটি ক্ষেত্র যাহা মেয়েদের পক্ষে দীর্ঘকালের অভ্যাসের দ্বারা সহজ নয়, অন্তত আমাদের দেশের পক্ষে সহজ নয়। স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র হইতে নামিয়া মেয়েদের এখানে প্রবেশ করিতে হয়। যে-সহজ পূর্ণতার মধ্যে মেয়েরা স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত তাহা নষ্ট হইবার ফলে তাহাদের প্রকৃতিতে এই ব্যতিক্রমটি ঘটিয়াছে। খুব সম্ভব দীর্ঘকালের আচরণের দ্বারা তাহারা এই অপরিচিত ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে আবার এখানেই একটি সহজ সুষমা ও পূর্ণতা তাহারা লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু তার আগে একটা বিকৃতির অবস্থা অতিক্রমণ অপরিহার্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্র সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। সেখানেও নারী চরিত্রের ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রীর পত্রের মৃণাল ও পয়লা নম্বরের অনিলার চরিত্রদ্বয়ে কবি ইহার ক্রিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাদের ব্যবহারে ও সিদ্ধান্তে তাহাদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা জন্মে, কিন্তু সে শ্রদ্ধা রাসমণি বা যতীনের মাসির প্রতি যে-শ্রদ্ধা তাহা হইতে ভিন্ন। পূর্বোক্ত দু'জনের প্রতি মনুষ্যত্বের শ্রদ্ধা, শেষোক্ত দু'জনের প্রতি নারীত্বের শ্রদ্ধা। নারীর পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবী আমাদের সমাজে নূতন, তাই মৃণালকে অনেক কথা ঝাঁজের সংগে বলিতে হইয়াছে, বেশ সহজভাবে বলিতে পারে নাই। এখানে তাহারা অবশ্যই মহত্ত্বের পথ ধরিয়াছে কিন্তু স্বাভাবিক পূর্ণতা দেখি রাসমণিতে ও যতীনের মাসিতে তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত। হয়তো কালক্রমে রাজনীতি ক্ষেত্রের মতো ইহাও নারীর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে—তখন এখানেই তাহাদের চরিত্র এমন পূর্ণতা লাভ করিবে যাহা পুরুষের পক্ষে দুর্লভ।

এখন বুঝিতে পারা যাইবে, গল্পগুচ্ছের নারীচরিত্রগুলি কেন সমধিক উজ্জ্বল। ছোট খাটো কর্তব্য সমাধা এবং ছোট খাটো সুখদুঃখের চক্রাবর্তন পালনের দ্বারা তাহারা এমন একটি সম্পূর্ণতা ও সৌষম্য লাভ করিয়াছে

---

* ছিন্নপত্র পৃঃ ২৩৫

যাহা পুরুষ চরিত্রে একান্ত বিরল। পুরুষ চরিত্রগুলি হয়তো বৃহত্তর কিন্তু নারী চরিত্রগুলি পূর্ণতর। বহুধাতুর ও বহুভাবের সমাবেশে পুরুষ চরিত্রগুলি জটিল, নারী চরিত্র সে তুলনায় সরল। এই সরলতাও পূর্ণতার একটি কারণ। কারণ যাহাই হোক, গল্পগুলির নারী চরিত্র পুরুষ চরিত্রের চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল ও সার্থক ইহাতে বোধ করি মতদ্বৈধ নাই।

আর উজ্জ্বল ও সার্থক গল্পগুচ্ছের বালক-বালিকা চরিত্রগুলি। রতন, মিনি, ফটিক, শুভা, মৃন্ময়ী, উমা, গিরিবালা, নীলকান্ত, তারাপদ, শুভ-দৃষ্টি গল্পের বোবা মেয়েটি, কালীপদ, সুবোধ, বলাই, গোবিন্দ প্রভৃতি বালকবালিকার চরিত্র যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সার্থক। ইহার একটি কারণ নারীর মতো বালকবালিকাগণও সহজ, স্বাভাবিক অথচ সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, এখানে পূর্ণতালাভ কঠিন নয়। কিন্তু কোন কারণে তাহারা সেই পরিবেশচ্যুত হইলে প্রাণের ভান্ডার হইতে ছিন্ন হইয়া মারা পড়ে, দৃষ্টান্ত, শুভা ও ফটিক। আবার উমা ও গিরি-বালা অন্য একরূপ বিড়ম্বনার দৃষ্টান্ত। গিরিবালা চরিত্র অংকন উপলক্ষে রবীন্দ্র-নাথ বলিয়াছেন যে, মানবস্বভাবের সংগে প্রকৃতির রঙ, রস ও স্নেহ মিশাইয়া তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। একথা তাঁহার অধিকাংশ বালকবালিকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শুভা, ফটিক, রতন, মৃন্ময়ী বা বলাই কাহাকেও আমরা স্নেহময়ী প্রকৃতির পটভূমি ছাড়া ভাবিতেই পারি না। বালকবালিকারা সহজেই প্রকৃতির কাছে রহিয়াছে।*

স্মিতহাস্যরস যেমন গল্পগুচ্ছের নর-নারীরূপ চরিত্র বসনের একটি তন্তু, তেমনি আর একটি তন্তু প্রকৃতি। স্মিত-হাস্যরসের মতো এ বিষয়টিও সর্বত্র অংগুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেওয়া যায় না। মৃন্ময়ী, শুভা, গিরিবালা বা বলাইয়ের ক্ষেত্রে প্রভাবটা স্পষ্ট, কিন্তু অনত্র তেমন নির্দেশযোগ্য নয় সত্য কিন্তু সমবেদনশীল পাঠকমাত্রেরই পক্ষে তাহা অনুমানযোগ্য। মোট কথা এই যে, প্রকৃতির রঙ, রস, রূপ, সূক্ষ্ম ইংগিত ও সংকেত, অদৃশ্য অথচ অনুমানগম্য স্নেহ প্রভাব এই গল্পগুলির অন্যতম প্রধান উপাদান।

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষের অহম্মন্যতারূপে প্রবৃত্তিকে কবি মনুষ্যত্ব-লাভের সবচেয়ে কঠিন বাধা মনে করেন।* অহম্মন্যতার ফলে মানুষের শ্রেয়োলাভের পথ বন্ধ হয়, অপরের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিকৃত হয় এবং বিশ্বের মধ্যে তাহার যে সহজ ও স্বভাবসংগত স্থান আছে সেখান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সে মানসিক ও আত্মিক একঘরে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। লোভের পথে, ক্রোধের পথে, কামজ প্রবৃত্তির পথে, বংশমর্যাদা রক্ষার পথে অহম্মন্যতা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। আবার যে-ব্যক্তি অহম্মন্যতার দুর্গে আবদ্ধ আছে কখনো কখনো আকস্মিক আঘাতে সে জাগ্রত হইয়া উঠিয়া মুক্ত উদার আকাশের তলে পেঁছিয়া আপনার স্বরূপটি বুঝিতে পারে। মিনির পিতা শিক্ষা, দীক্ষা ও পরিবেশের ফলে অহম্মন্যতার দুর্গে বাস করিতেছিল, হঠাৎ রহমতের কন্যাবাৎসল্য সেই দুর্গের প্রাচীর ফাটাইয়া দিতেই সে এমন একটি উদার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল যেখানে 'সেও পিতা, আমিও পিতা' এই সত্যটি বোঝা শক্ত নয়। আর্ত শূকরশাবকের মৃত্যুভয় জয়কালীর ভ্রান্ত শুচিতাবোধকে মুহূর্তে বিদীর্ণ করিয়া দিল, অহম্মন্যতার কবল হইতে সে রক্ষা পাইল বলিয়াই অপবিত্র পশুটিকে দেব মন্দিরে স্থান দিতে পারিয়াছিল। আবার নয়নজোড়ের কৈলাশচন্দ্র এবং শানিয়াড়ি ভবানীচরণ ভ্রান্ত বংশমর্যাদাবোধের দ্বারা আপনাদের মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল এমন সময়ে ঘটনাচক্র আসিয়া সেই মোহ ছেদ করিল; ভাবী নাত জামাইয়ের নতি স্বীকার এবং কালীপদর মৃত্যু সেই ঘটনাচক্র। ভ্রান্ত বংশমর্যাদাবোধ অহম্মন্যতার একটি প্রধান কারণ, গুপ্ত ধন, পণরক্ষা, হালদারগোষ্ঠী, ভাইফোঁটা ত্যাগ প্রভৃতি গল্প তাহার আরও দৃষ্টান্ত। সমস্যাপূরণ গল্পের কৃষ্ণগোপাল এতদিন যে সত্য গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার কারণ অহম্মন্যতাই বাধাস্বরূপ ছিল। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা স্বর্ণমৃগ, সম্পত্তি সমর্পণ প্রভৃতি গল্প লোভজ অহম্মন্যতার উদাহরণ। আবার কামজ অহম্মন্যতার উদাহরণ হইতেছে মধ্যবর্তিনী, নিশীথে, উদ্ধার ও বিচারক প্রভৃতি গল্প। ফল কথা দেখা যাইবে যে অহম্মন্যতাই নানারূপে এবং নানা নামে মনুষ্যত্বের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। অধিকাংশ মানুষই সেই সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সারা জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কখনো কখনো কাহারো কাহারো জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যাহাতে সেই গন্ডীপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, তাহারা মুক্তি পাইয়া মনুষ্যত্বের রাজপথের উপরে আসিয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, মানুষ যখন নিজেকে একান্তভাবে দেখে তখনই অহম্মন্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু মানুষ যদি চরাচরের মধ্যে এবং মানবসমাজের মধ্যে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেখে তবে এই আপদের কবলে আর পড়ে না, সে বাঁচিয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন—"এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি, চারদিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি ক'রে কাল মেরামত ক'রে পরশু দিন বিক্রি ক'রে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত

---

* আগে একবার ওয়াড্সবার্থের প্রকৃতি-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে তাঁহার অংকিত বালক-বালিকগণকে প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত করিয়া আঁকিয়াছেন তাহাতে আবার ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতিতত্ত্বের কথা মনে আনিয়া দেয়। এই সূত্রে তাঁহার Lucy ও অন্যান্য অনেক বালক-বালিকা গিরিবালা, ফটিক, শুভা মৃন্ময়ী প্রভৃতির সহোদর সহোদরা। মিলটা কতখানি আকস্মিক, কতখানি আন্তরিক ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য।

* অহম্মন্যতা শব্দটি ব্যাকরণ হিসাবে সিদ্ধ নয়। পণ্ডিতম্মন্যতা হয় কিন্তু অহম্মন্যতা হয় না। নাই হোক কিন্তু শব্দটিতে আমার বড় প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অহংকার বা আত্মম্ভরিতা বলিলেও চলিত যদি না বহু প্রয়োগে তাহাদের অর্থের ব্যাপকতা ও শিথিলতা ঘটিয়া না যাইত। অহম্মন্যতার অর্থ করিতেছি মানুষের অহং যেখানে সর্বে-সর্বা হইয়া উঠিয়া তাহার শ্রেয়োলাভের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়।

হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখিনে।"*

কবির মতে এই বিশ্ববোধের ভাবটি উপলব্ধি সহজ, আবার তাঁহার মনের সহজ প্রবণতাও বিশ্ববোধ উপলব্ধির প্রতি। এখন খুব সম্ভব এই দুয়ে মিলিয়া পরিবেশের অনুকূলতা এবং মানসিক অনুকূলতা, গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে এমন একটি স্বাভাবিক পূর্ণতা দান করিয়াছে যাহা রবীন্দ্র গদ্যসাহিত্যের অন্যত্র সর্বদা সহজলভ্য নয়। কি চরিত্র চিত্রণে, কি ঘটনা বিন্যাসে, কি মানুষে প্রকৃতির টানা-পোড়েনে কাব্য বয়নে এই সহজ পূর্ণতার ভাবটি লক্ষ্য করিবার মতো এবং তাহার কারণটিও অনুধাবনযোগ্য।

এবারে গল্পগুলির প্লট বা কাহিনী বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। দেখা যায় যে, কাহিনী বিন্যাস ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত তিনটি পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন গল্প গীতি-কবিতার প্যাটার্নে বা ছাঁচে গঠিত।* একটি ভাব বা একটি অনুভূতিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ লেখক দিয়াছেন, ঘটনার গুরুত্ব ও নরনারীর সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমাইয়া দিয়াছেন পাছে সহজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। পোস্ট মাস্টার, এক রাত্রি, সুভা, শুভদৃষ্টি, খাতা, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পে কাহিনী বিন্যাসের কৌশল প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক এখানে আবেগের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া স্রোতোমুখে ভাসিয়া চলেন নাই, আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে সচেতন শিল্প-বুদ্ধির দ্বারা কাহিনীটিকে সাজাইয়া লইয়াছেন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি সমর্পণ, দালিয়া, দান-প্রতিদান, সমস্যা পূরণ, প্রায়শ্চিত্ত, বিচারক, অধ্যাপক, দৃষ্টিদান, কর্মফল ও নষ্টনীড় প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর গল্প শেষ জীবনে লিখিত, তাহাদের সাধারণ লক্ষণ অনেকটা সূত্র ও তাহার টীকাভাষ্যের অনুরূপ। একটা উদাহরণ দিতেছি—"এই পরিবারটির মধ্যে কোনরকমের গোল বাধিবার কোন সংগত কারণ ছিল না। অবস্থাও সচ্ছল, মানুষগুলিও কেহই মন্দ নহে, কিন্তু তবু গোল বাধিল।" ইহাই যেন গল্পটির সাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়—সমস্ত গল্পটি যেন এই সূত্রটির টীকা ও ভাষ্য। স্বভাবতই এমন গল্পে তত্ত্ব প্রাধান্যলাভ করে, আর বেশি বয়সে তত্ত্বটাকে যে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছা করে, সেটা বেশি বয়সের ধর্ম। শেষ বয়সে লিখিত হালদার গোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, বোষ্টমী, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প, সংস্কার, বলাই, চোরাই ধন প্রভৃতি গল্প সূত্র ও সূত্রের ব্যাখ্যামূলক।* অবশ্য সব ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু মোটের উপরে পূর্বোক্ত তিনটি পন্থাকে সাধারণ নিয়ম বলিয়া গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।

পোস্ট মাস্টার, এক রাত্রি বা সুভা গল্পগুলিকে প্রথম পন্থার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় বলিয়াছি। অবান্তর ভার ও ঘটনার অবান্তর শাখা-প্রশাখা বর্জিত গল্পগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি সুগীত সংগীতের মতো ধ্বনিত হইয়াছে। পোস্ট মাস্টার গল্পটিতে একটি দ্বিধার ভাব আছে, রতন ও পোস্ট মাস্টার দুজনের দুঃখ বর্ণনার ফলে গল্পটির মধ্যে একটি ফাটলের রেখা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এক রাত্রি বা সুভায় সে দ্বিধা নাই, একরাত্রির নায়কের এবং সুভার দুঃখ বর্ণনাতেই গল্পের আরম্ভ ও শেষ—ঐ দুঃখ বর্ণনার ছলেই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য গল্প-গুলিও অল্পবিস্তর এক রীতিই অনুসরণ করিয়াছে।

কাহিনী বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথের তেমন মনোযোগ কখনো ছিল না। উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রেই এই মনোযোগের অভাব সবচেয়ে বেশি গোচর হয়। কিন্তু কাহিনী বিন্যাস সম্বন্ধে ছোট গল্পগুলিতে তিনি আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর আদর্শরূপে খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, নষ্টনীড় বা কর্মফলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তৃতীয় শ্রেণীর অধিকাংশ গল্পই শেষ বয়সে লিখিত। আত্মব্যাখ্যা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যার ইচ্ছায় ইহাদের জন্ম। ইহা কবির শেষ বয়সের উপন্যাস ও নাটক সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কিন্তু নাটকে ও উপন্যাসে যাহা আতিশয্যে পরিণত হইয়া অনেক সময়ে রসহানি ঘটাইয়াছে, ছোট গল্পের ক্ষেত্র স্বল্পায়ত বলিয়া তত্ত্বব্যাখ্যা ও আত্মব্যাখ্যার প্রবৃত্তি তেমন বিড়ম্বনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কি পদ্যে, কি গদ্যে স্বল্পায়ত ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথের দোসর নাই।

এখানে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের গীতিধর্মী অপবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। অনেকে তাঁহার গল্পগুলিকে গীতিধর্মী বলিয়া সংক্ষেপে কাজ সারিয়াছেন, আবার অনেকে কাব্য-ধর্মী বলিয়াছেন। কিন্তু প্রথমেই পরিষ্কার করিয়া লওয়া দরকার যে, গীতিধর্ম বা কাব্যধর্ম এক বস্তু নয়। কাব্যধর্ম কাব্যের সাধারণ গুণ, গীতিধর্ম বিশেষ এক শ্রেণীর কাব্যের গুণ; এ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। কাব্যধর্ম কাব্যমাত্রেই বর্তমান বলিয়া গীতিকাব্যেও বর্তমান, কিন্তু গীতিধর্ম সব কাব্যে থাকে না, কেবল গীতিকাব্যেই থাকে। এখন যদি বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প কাব্যধর্মী, তাহাতে একপ্রকার সত্য বোঝায়, আর ওগুলো লিরিকধর্মী তাহাতে আর একপ্রকার সত্য বোঝায়।

সত্যই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর রচনার ন্যায় তাঁহার ছোট গল্প-গুলিও কাব্যধর্মী। কাব্যের বিশেষ গুণ বলিতে যাহা বুঝি যেমন কল্পনার

---

* শিলাইদহ, অক্টোবর, ১৮৯১, ছিন্ন পত্র। এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের আরও কয়েকখানি পত্র দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩৯, ১৪৬, ২৬৯, ২৭২, ২৮২ (১৩৩৫ সংস্করণ)

* ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে গল্পগুলিকে গীতি ধর্মী বা লিরিক বলিতেছি। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

* কেবল শেষ বয়সের ছোট গল্পগুলি নয় দুই বোন, মালঞ্চ, চার অধ্যায় প্রভৃতি খণ্ড-উপন্যাসও একই প্যাটার্নে গঠিত।

প্রাচুর্য, অলংকার বহুলতা প্রভৃতি তাঁহার অন্যান্য শ্রেণীর রচনার মতো ছোট গল্পে অবশ্যই আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কপাল-কুণ্ডলা কাব্যধর্মী, ভিক্টর হুগোর Toilers of the Sea কাব্যধর্মী; কাব্য-ধর্ম ভাবাত্মক রচনার পক্ষে সব সময়ে দোষ নয়। কাজেই কাব্যধর্ম রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের পক্ষে দোষ নয়, তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, ইহা তাঁহার ছোট গল্পে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে যাহা অন্যান্য লেখকের ছোট গল্পে দুর্লভ।

কিন্তু গীতিধর্মী অপবাদ এত সহজে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, কারণ গল্পের পক্ষে গীতিধর্ম সব সময়ে গুণ নহে।

গীতিধর্ম কি? গীতি কবিতা বা লিরিক স্বল্পায়ত রচনা, কিন্তু আয়তনের সংকীর্ণতা কি লিরিকের অপরিহার্যতম লক্ষণ? খুব সম্ভব নয়। হোক বা না হোক, উহার উপরে তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায় না। এখন ছোট গল্প আকারে সাধারণত স্বল্পায়ত হয় বলিয়াই কি তাহা লিরিক বা গীতিকাব্যের সগোত্র? আগেই, বলিয়াছি রচনার আয়তন অবশ্যই একটা লক্ষণ কিন্তু তাহার উপরে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

লিরিক বা গীতি কবিতার অপরি-হার্যতম গুণ হইতেছে রচনার উপরে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ। অন্য শ্রেণীর রচনাতেও লেখকের ব্যক্তিত্ব ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু রচনার পক্ষে তাহা অবশ্যম্ভাবী নয়, বরঞ্চ অনেক সময়েই দোষের কারণ। কিন্তু গীতিকাব্যে উহা অত্যাবশ্যক মাত্র নয়, উহাই গীতিকাব্যের প্রাণ। অন্যান্য শ্রেণীর কাব্যের প্রাণদান করিয়া থাকেন লেখক, কিন্তু গীতিকাব্যের মধ্যে তিনি নিজেই যেন ঢুকিয়া প্রাণস্বরূপে বিরাজ করেন। গীতিকাব্যের কবি সমস্ত জগৎকে আত্মপ্রক্ষেপের দ্বারা আবিষ্ট করিয়া দেখেন, সমস্তই তাঁহার পক্ষে মন্ময়, এখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। ইহাই গীতিকবিতার অপরিহার্যতম গুণ।

এখন কোন রচনায় লেখকের আত্ম-প্রক্ষেপ থাকিলে তাহাকে গীতিধর্মগুণে সমন্বিত বলা চলে। কিন্তু রচনার ভাবোচ্ছ্বাস মাত্রই গীতিধর্ম নয়, সে ভাবোচ্ছ্বাস লেখকের ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস হওয়া দরকার। শেক্সপীয়রের নাটকে অনেক স্থলে ভাবোচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু তাহা পাত্রপাত্রীর চরিত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যায় নাই বলিয়া লিরিক ভাবোচ্ছ্বাস নয়। পাত্রপাত্রীর চরিত্রের সীমানার মধ্যে উত্থিত ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যধর্মী হইতে পারে, কিন্তু কখনো গীতিধর্মী নয়।

গল্পগুচ্ছের ছোট গল্পে অনেক স্থলেই ভাবোচ্ছ্বাস আছে। একটি উদাহরণ লইতেছি। জয়-পরাজয় গল্পে পরাজিত শেখর কবির মৃত্যুপূর্ব উক্তি একটি মনোরম ভাবোচ্ছ্বাস, অনেকেই ইহাকে গীতিধর্মী বলিবেন। কিন্তু বিচার্য বিষয়, এই ভাবোচ্ছ্বাস কি শেখর কবির চরিত্রকে লঙ্ঘন করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে? আমার তো সেরূপ মনে হয় না। কিন্তু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কেন না, লেখক নিজেও কবি, এক বয়সে তাঁহাকেও শেখর কবির ন্যায় অযোগ্যের হাতে অবহেলা সহ্য করিতে হইয়াছে। এখন অবস্থা-সাম্যে শেখর কবির খেদকে লেখকের খেদ বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঐ খেদোক্তি শেখর চরিত্র হইতেই ধ্বনিত হইয়াছে, লেখকের কণ্ঠ হইতে নয়।

স্বয়ং কবি কঙ্কাল ও ক্ষুধিত পাষাণকে গীতিধর্মী বলিয়াছেন। * কিন্তু আমার সেরূপ মনে হয় না। কঙ্কালের কাহিনী স্বপ্নদৃষ্ট, দ্রষ্টাকে লেখক বলিয়া ধরিলেও কাহিনীর সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বকে অভিন্ন মনে করা যায় না। ঐ কাহিনী স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে objective বা জগতাত্মক। জীবদেহে সঞ্চরমান বীজাণু যেমন দেহ হইতে ভিন্ন, ইহাও অনেকটা তেমনি। ক্ষুধিত-পাষাণ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। ঐ যে অদ্ভুত লোকটি, অজ্ঞাতনাম স্টেশনের ওয়েটিং রুমে কয়েকটি মাত্র ঘণ্টার জন্য যাহার সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা, তাহার মুখে কাহিনীটি একটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। গল্পগুচ্ছের আর এমন কোন পুরুষ চরিত্র মনে পড়িতেছে না, যাহার মুখে কাহিনীটি বেখাপ না শোনাইত। কল্পনাপ্রধান বলিয়াই কাহিনীটিকে গীতিধর্মী বলিব কেন? লেখকের ব্যক্তিত্বের সহিত সংগতি থাকিলে বলিতে পারিতাম, তেমন কোন সংগতি তো চোখে পড়ে না।

দুরাশা গল্পের নায়িকা বদ্রাওনের নবাব কন্যার মুখে অনেক ভাবোচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু সে কি চরিত্রের সম্ভাবনাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে? স্ত্রীর পত্র গল্পে মৃণালের পত্র সমস্তটাই একটা সুদীর্ঘ ভাবোচ্ছ্বাস, কিন্তু তাহার বীজ কি মৃণাল চরিত্রের মধ্যে নিহিত নয়?

আসল কথা গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পে গীতিধর্ম বিদ্যমান, কিন্তু যত বেশি মনে করা হয়, তত নয় এবং যেগুলিকে সাধারণত তাহার উদাহরণ মনে করা হইয়া থাকে সেগুলিও নয়।

গীতিধর্মের আতিশয্যের ফলে যেখানে চরিত্রের কার্যকলাপ আপন সীমানাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, তেমন দু'একটি উদাহরণ দিতেছি। অধ্যাপক গল্পটি। ঐ গল্পের নায়ক নিষ্ফল কবি যশঃ প্রার্থী বলিয়া লেখক কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা বিশ্বাস করি। উক্ত কবি যশঃ প্রার্থী যে-ভাষাতে এবং সূক্ষ্ম সুকুমার কবিত্ব ঘন যে-ভাবের পথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কল্পনার যে অভাবিত প্রাচুর্য তাহার উক্তির বাঁকে বাঁকে; মানুষের মনের অন্ধিসন্ধির যে পরিচয় তাহার উক্তির ছত্রে ছত্রে, আর শুধু তা-ই নয়, নিজের প্রতি ব্যঙ্গ করিবার যে-দুঃসাহস তাহার পক্ষে

* রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৫৩৮।

সুলভ, এসব কি ব্যর্থ কবি যশঃ প্রার্থীর লক্ষণ! কাহারো ভুল করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই! ঐ লোকটি বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখক। আর কিছুই নয়, লেখকের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিজের ব্যক্তিত্ব ঐ লোকটির ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। গল্পটি নায়ক কর্তৃক কথিত না হইয়া লেখক কর্তৃক কথিত হইলে এই ভ্রান্তি ঘটিত না। যে-বর্ণনা, যে-ভাষা, যে-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের মুখে বিশ্বাসযোগ্য হইত, ব্যর্থ কবি যশঃ-প্রার্থীর মুখে তাহাই অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। লেখক কখন যে ঐ লোকটির মধ্যে আত্মপ্রক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই অবগত নন। গীতিধর্মের আতিশয্যই এই বিড়ম্বনার কারণ।

আর একটি উদাহরণ মণিহারা গল্পটি। মণিমালিকার বিয়োগান্ত জীবন কাহিনী একজন জীর্ণ শিক্ষকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষক যে অপরূপ নিপুণতার সহিত স্ত্রীপুরুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহা একান্ত অসঙ্গত এবং তাহার জন্য, অর্থাৎ তাহার মুখে এইসব কথা শুনিবার জন্য লেখক পাঠককে প্রস্তুত করিয়া লন নাই। আমার মনে হয়, এখানেও উক্তি ও জ্ঞান চরিত্রের সীমানাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। উক্ত শিক্ষককে দেখিয়া গল্পের নায়কের মনে কোলরীজের বুড়া নাবিকের কথা জাগিয়াছে। কিন্তু কোলরীজের নাবিক একটি শব্দের দ্বারাও নিজের সম্ভাবনাকে লঙ্ঘন করিয়া যায় নাই। আমার বিশ্বাস, এখানেও কবির আত্মপ্রক্ষেপ এই বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে।

মোটের উপরে এই রকম দু'চারটি ছাড়া ব্যতীত লিরিক বা গীতিধর্মের আতিশয্য হেতু শিল্প স্খলনের দৃষ্টান্ত আমার তো চোখে পড়ে না। রবীন্দ্র প্রতিভা মূলত গীতিধর্মী বলিয়া কোন কোন সমালোচক গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে গীতিধর্মের টানা অভিযোগ আনিয়া থাকিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

গল্পগুচ্ছে অন্য শ্রেণীর দোষ যে কিছু কিছু না আছে তা নয়। কিন্তু গল্পের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিলে সে সব দোষ নগণ্য বলিয়া মনে হইবে।

বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যের সমগ্র পাঠ করিয়াছি এমন বলিতে পারি না, কিন্তু একরকম কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারি যে, রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য আছে, যাহা সমশ্রেণীর সাহিত্যিকের রচনায় বিরল। গ্রাম্যতা দোষ, প্রাদেশিকতা দোষ, আতিশয্য দোষ প্রভৃতি নাই বলিলেই হয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যে-মন এই সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে কল্পনার উচ্চাকাশে তাহা একটি দিব্য গরুড়ের মতো আপনাতে আপনি বিধৃত হইয়া অচঞ্চল-ভাবে বিরাজমান। সাহিত্যের রূপ হইতে মনের স্বরূপ বোধ যদি সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এমন সহজ সংস্কার-মুক্ত মন সাহিত্য জগতে বিরল। সেই একই মনের সৃষ্টি তো গল্পগুচ্ছ। তাই ইহার গল্পগুলিতে সহজ স্বচ্ছতা, ভড়ঙহীনতা এবং সংস্কারমুক্তির ভাব দুর্দমন।

গল্পগুচ্ছে করুণ রস যথেষ্ট আছে, কিন্তু করুণ রস কদাচিৎ অতি করুণতায় বা ভাবালুতায় পরিণত হইয়াছে। মাস্টার মশাই, পণরক্ষা, কর্মফল বা পুত্রযজ্ঞ প্রভৃতি গল্পের উপসংহার কতক পরিমাণে ভাবালুতা দোষ (Sentimental) বলিয়া আমার মনে হয়। যদি অপর কাহারো সেরূপ মনে না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা আমারই দৃষ্টি বিভ্রম।

আর কতকগুলি গল্প আছে, যেমন সদর ও অন্দর, উদ্ধার, দুর্বুদ্ধি, ফেল, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ প্রভৃতি এগুলি যেন লেখকের অমনোযোগের সৃষ্টি। অকালে গর্ভাশয়চ্যুত সন্তানের মতো ইহারা রুগ্ন, যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত মাংসে গঠিত নয়। এরূপ হইবার কারণ রবীন্দ্রজীবনীতে বিবৃত হইয়াছে।* এক সময়ে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহে কিছুদিন ছিলেন। তখন প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করিয়া নূতন গল্প তাঁহাকে শোনাইতে হইত, এই গল্প-গুলি সেই দৈনিক দাবীর মুখে লিখিত বলিয়াই এমন রক্তাল্পতা দোষদুষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস। আমার মনে হয় তাঁহার বিশ্বাস অমূলক নয়।

উদ্ধার গল্পটি সম্বন্ধে সাহিত্য (পৃঃ ৬১৯, ভাদ্র ১৩০৭) যে মন্তব্য করিয়াছিল, তাহা রবীন্দ্র জীবনীতে উধৃত হইয়াছে।* "রবীন্দ্রবাবুর গৌরী" অমেঘ বাহিনী বিদ্যুল্লতাই বটে, তাহার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষের উপর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার সমস্তটা কখনই কল্পনার কারায় ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। গল্পটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, গল্পের কঙ্কাল বলিলেও চলে। এই পঞ্জরপিঞ্জরে তিনটি প্রাণী...। অতি ক্ষুদ্র গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে তিনজনের স্থান পর্যাপ্ত নয়। কবি কেবল রেখায় গল্পটি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে আখ্যানবস্তুর একটা অস্পষ্ট আভাস-মাত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে। ছায়ালোক সম্পাতে আর একটু পরিণত হইলে গল্পটি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারিত।"

এই মন্তব্য উদ্ধার গল্প সম্বন্ধে কেবল সত্য নয়, ঐ সঙ্গে উল্লিখিত সব কয়টি গল্প সম্বন্ধে সত্য। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতেই নিষ্ঠাবান শিল্পী, কিন্তু কখনো কখনো ঘটনাচক্রজাত অমনোযোগের ফলে নিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, গল্প কয়টি তাহারই উদাহরণ।

মেঘ ও রৌদ্রের উপসংহার আমার কাছে অসন্তোষজনক মনে হয়, যেন ভাবালুতার কুয়াশায় ঝাপসা। গল্পটির সূচনা লিরিক বা গীতির প্যাটার্নে; কিন্তু তারপরেই উহা কাহিনীবিন্যাস চাতুর্যকে অনুসরণ করিয়াছে; শেষ পর্যন্ত এ দুই রীতির মধ্যে একটা সমন্বয় করিতে পারিলে হয়তো ভালোই হইত; কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় উপসংহারে আবার গীতির প্যাটার্নে ফিরিয়া আসিবার নিষ্ফল চেষ্টায়—রসহানি, এক্ষেত্রে ভাবালুতা দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা।

তবে যখন স্মরণ করি যে, গল্পসংখ্যা চুরাশি, বৈচিত্র্য ততোধিক; দোষগুণ সমন্বিত বাঙলার পল্লীজীবনের ইহা এক বিচিত্র পুরাণস্বরূপ, তখন এই সামান্য দোষগুলিকে চন্দ্রের কলঙ্কের মতো চন্দ্রের গুণের পরিবর্ধক বলিয়াই মনে হয়। (ক্রমশঃ)

---

*রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩৬৯,

*রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৯,

ডোভার লেনের সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠান

রাজ্যেশ্বর মিত্র

দুটি বড় বড় সংগীত সম্মিলনীর পর বাছা বাছা কয়েকজন শিল্পী নিয়ে উচ্চাংগ সংগীতের আসর বসেছিল তিন নম্বর ডোভার লেনে। ব্যাপারটিকে উদ্যোক্তাগণ সান্ধ্য মজলিস (Soiree) বলে অভিহিত করলেও নেহাৎ ছোট-খাটো ব্যবস্থা হয়নি। বিরাট মণ্ডপে বহু জনসমাবেশ হয়েছে, বাইরেও লোক-সংখ্যা কম ছিল না, মাইকের দৌলতে তাঁরাও তৃপ্তির সংগে গান বাজনা শুনেছেন। পর পর তিনটি অধিবেশনে ভারতবিখ্যাত বহুশিল্পীর সংগীত স্বল্প ব্যয়ে শোনবার সুযোগ দিয়ে এই অনু-ষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন এবং সুব্যবস্থার জন্য সাধুবাদ অর্জন করেছেন।

এই সংগীত অনুষ্ঠানটি কনফারেন্স নয় পুরোপুরি জলসা। সুতরাং আমরাও খুব মজলিসিভাব নিয়েই উক্ত অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছি। অনেক শিল্পীর কণ্ঠের অবস্থা এই কদিনের সংগীত চর্চায় বিশেষ দুর্বল এবং অবরুদ্ধপ্রায়, তথাপি তাঁরা সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকেই এক ঘণ্টার ওপর গীতালাপ করে শুধু শ্রোতাদের খুশিই করেননি, নিজেদের বৈশিষ্ট্যও রীতিমত বজায় রেখে গেছেন। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এইটাই প্রধান লক্ষণ, যে কোন অবস্থাতেই হোক মাত্র দু একটি কাজেই তিনি দিয়ে যাবেন তাঁর মুন্সিয়ানার পরিচয়—ছাই চাপা হলেও আগুনের অস্তিত্ব অনুভূত হবেই।

ডোভার লেনের আসরে গানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকর, শ্রীমতী সরস্বতী রাণে, শ্রীমতী হেনা বর্মণ, ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীমতী গংগুবাঈ হাংগল শ্রী এ কানন, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ। যন্ত্র সংগীতে ছিলেন আবদুল হালিম জাফর খাঁ, শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ, ওস্তাদ হাফেজ আলী এবং ইমরাট খাঁ। নৃত্যানুষ্ঠানে ছিলেন শ্রীমতী অরুন্ধতী ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী জয়কুমারী। তবলা বাজিয়েছিলেন কেরামতুল্লা খাঁ, শ্রীমহাপুরুষ মিশ্র, শ্রীকিষেণ মহারাজ, আহমেদ জান থেরাকুয়া এবং সামসুদ্দিন খাঁ। সারেঙ্গী বাজিয়েছেন শ্রীরামনারায়ণ এবং শ্রীমন্নু মিশ্র। এছাড়া হারমোনিয়মের সংগতও ছিল।

প্রথম রাত্রির আসরে গাইলেন শ্রীমতী সরস্বতী রাণে, শ্রীমতী হীরাবাঈ এবং শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী। শ্রীমতী সরস্বতীর কণ্ঠ খুব সুরেলা। প্রত্যেক স্বরে তাঁর স্থায়িত্ব বেশ নিপুণ। এই কারণে তিনি এবারে কলকাতায় প্রশংসা অর্জন করেছেন। দ্রষ্টা শিল্পীর পর্যায়ে তিনি এখনও উন্নীত হননি, তবে তাঁর শিল্প-দক্ষতায় আমরা আশান্বিত হয়েছি।

হীরাবাঈ এবৎসর ভালই গেয়ে গেলেন। তিনি শিল্পিজীবনের পূর্ণতায় এসেছেন নতুন করে তাঁর কাছ থেকে পাবার আশা আমরা করি না। তাঁর অনুপম ভংগীতে বহু গান শুনলুম, তবু মনে হচ্ছে তাঁর কণ্ঠস্বরে, উদ্দীপ্ত গায়ন ভংগীতে কথঞ্চিৎ ক্লান্তি এসেছে। শ্রীমতী হীরাবাঈ এবং তাঁর ভগ্নী শ্রীমতী সরস্বতী দুজনে খেয়াল, ঠুংরী ছাড়াও দুটি ভজন শোনালেন। এঁদের ঘরের ভজনে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা সাধারণ শিল্পীর পক্ষে ফোটানো শক্ত। আজকাল ভজন খেয়ালের ঢঙে গাওয়া হচ্ছে। ধ্রুপদ ভংগীম ভজনও শুনেছি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর উদাত্ত কণ্ঠে। এঁরা যেভাবে ভজন গান, সেটাতে ঠুংরির প্রভাব সমধিক। এমনকি অনেক সময় পাক্কা ঠুংরিই হয়ে দাঁড়ায় এঁদের ভজন। হীরাবাঈ যেভাবে মীরার নামাংকিত ভজনটি শোনাচ্ছিলেন, তাতে পুরোপুরি ঠুংরির আমেজ এসেছিল, কিন্তু তথাপি রসগ্রহণে কিছুমাত্র বাধা হচ্ছিল না। তার কারণ তাঁর অনুপম গায়নভংগী, গাম্ভীর্য এবং কণ্ঠস্বরে আকুল আকুতির প্রকাশ। এই জিনিসটা বড়ে গোলাম আলীর "হরি ও' তৎসৎ" টাইপের গান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শনিবার রাত্রি শেষে গোলাম আলীর কণ্ঠে উক্ত গানটি শুনতে শুনতে একথাই বারবার মনে জাগছিল যে, হীরাবাঈ যেখানে ঠুংরির উচ্ছ্বাসে ভজনের রূপ তার দরদ ফুটিয়ে তুলছিলেন, সেখানে গোলাম আলী একই ঠুংরির কৌশল প্রয়োগ করে ওঙ্কারের গাম্ভীর্যের কাছাকাছিও আসতে পারছিলেন না। গোলাম আলী ঠুংরিকে খুব রঙীন ক'রে তুলতে পারেন, কিন্তু তার বেশি যেতে পারেন না, হীরাবাঈ ঠুংরিকে আরও উচ্চতর রসে অভিষিক্ত করতে পারেন, তার প্রমাণ বহুবার দিয়ে গেছেন, এবারও দিলেন।

খেয়াল এবং ঠুংরির মারফৎ ভজনে রসসৃষ্টি করা যায়, সেটা সকলের দেখা হল, কিন্তু টপ্পার প্রয়োগেও যে উচ্চাঙ্গ শিল্পসৃষ্টি করা যায়, সেটা কেউ দেখালেন না। দেখাতে পারতেন একমাত্র বাংলার প্রবীণ শিল্পিবৃন্দ কিন্তু কোথায় তাঁরা, কে তাঁদের খোঁজ রাখে? বাঙলা টপ্পায় ভাবাত্মক গানের অভাব নেই এবং তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, এমন শিল্পীও আছেন অথচ এপর্যন্ত একটা সম্মিলনীতেও এমন একজন শিল্পীকে দেখা হল না। মনে আছে একবার এক গানের আসরে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী টপ্পায় একটি ভজন গেয়ে শ্রোতাদের চোখে জল এনে দিয়েছিলেন এবং গানটি মামুলি ত্রিতালে নয় অতি অবলীলাক্রমে গেয়ে গেলেন ঝাঁপতালে। আজকাল গানের আসরে তালবৈচিত্র দেখা যায় না—একঘেয়ে ত্রিতাল ছাড়া আর কোন তালের পরিচয়ই পাওয়া যায় না। এই কারণেও অনেক সময় আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর অত্যন্ত একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে। বাঙলা গানের কথা ওঠালুম এই কারণে যে, বাইরেকার বাছা বাছা শিল্পীদের আমরা আহ্বান করি তাঁদের গায়নরীতি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরাও আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ জিনিস দেখে যান, এটাও কি আমাদের পরিকল্পনায় আসা উচিত নয়? বাঙালীদের কণ্ঠে মামুলি হিন্দি চালে হিন্দি গান শুনে এই সব বহিরাগত শিল্পীবৃন্দ বাঙলার সুরশিল্প সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারেন না এবং এঁদের

এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা এই কলকাতা থেকে প্রচুর টাকা আহরণ করে কলকাতার সমঝদার এবং গায়কদের সম্বন্ধে অতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করে চলে যান। এছাড়া আমাদের সঙ্গীত শিল্পের অনেক কিছু আমরা নিজেরাই জানি না। সাধারণ্যে এইগুলি প্রচার করার উপযোগিতা আমাদের সঙ্গীত পরিবেশকেরা আর কবে বুঝবেন? এ দুঃখটা আমার একার নয়, শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকের মুখেই অনুরূপ অনুযোগ শুনেছি। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের পরে সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ এই সেদিনও আমাকে দুঃখ করে জানালেন, বাঙলার সঙ্গীত-শিল্প তাঁদের বিশেষ আবেদন সত্ত্বেও অবহেলিত হয়ে আসছে। এই সব কনফারেন্সে এবং জলসাগুলিতে।

যাক আসরের পূর্ব প্রসঙ্গেই ফিরি। প্রথম আসরের শেষ গান গাইলেন শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, রাত তখন তিনটে। তাঁর গাইবার কথা ছিল প্রথম রাত্রিতে, কিন্তু নানা বিশৃঙ্খলায় অবশেষে তাঁকে গাইতে হল শেষ রাত্রে। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর গলা বেশ বসে গেছে। কিছু ক্ষণ পরেই গাইতে বসলেন তিনি। এ অবস্থায় তিনি মনের আনন্দে গান করতে পারেননি, তথাপি যতটুকু গেয়েছেন, তাতে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। চমৎকার ক্রমানুসারে বিস্তার, প্রত্যেকটি পদ্ধতি নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকাশ, [illegible] সগম এবং বিভিন্ন কৌশলের দান সবগুলিই তিনি একে একে দেখিয়ে গেলেন। তারাপদবাবুর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম স্বরমিশ্রণ পদ্ধতিতে। প্রায় সকলকেই দেখলাম তাঁরা স্বরের সুমিষ্ট মিশ্রণ দেখিয়ে খ্যাতি অর্জনের অভিলাষী, কিন্তু তারাপদবাবু অত্যন্ত কঠিন স্বরসংযোগগুলি অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন একবার নয়, দু তিনবার করে। এই দিক দিয়ে কাজটি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সমস্ত তিনটি আসরে এমন বিভিন্ন তানের কাজ আর কাউকে করতে দেখলাম না। তাঁর গান যথার্থভাবেই উচ্চাঙ্গের এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শেষের ভৈরবী আলাপটিতে তিনি একটি সুন্দর ভঙ্গী প্রদর্শন করেছেন। তাঁর সঙ্গে মহাপুরুষ মিশ্রের তবলা সঙ্গত উপযুক্ত হয়নি। এই কাজের যোগ্য লোক ছিলেন কেরামতুল্লা। তিনি প্রথমদিকে আসরে ছিলেনও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাখা গেল না, দুঃখের বিষয়। শ্রীমান মিশ্র কিছু অপরিণত বয়স্ক বলেই বোধ হয় পিটিয়ে বাজাতে ভালবাসেন এবং হাততালির দিকে লক্ষ্যটাও বেশি রাখেন। গায়ককে ছাপিয়ে বাজাবার প্রবৃত্তি কোনক্রমেই প্রশংসার যোগ্য নয় এবং এই চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য তারাপদবাবু তাঁকে বারবার ইঙ্গিতে সাবধান করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তা ছাড়া গানের সঙ্গে তিনি জবাব দিতে গিয়ে গানের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করছিলেন। কয়েকটি গমকের উত্তরে বাঁয়ার অনুরূপ আওয়াজ তোলা হল, এটা যে মুখভঙ্গীর সামিল হল, সেটা বোঝবার ক্ষমতা তবলচির ছিল না, কিন্তু ধন্য শ্রোতৃবৃন্দ তাঁরা হাততালিতে মুখর হয়ে উঠলেন। অতি চমৎকার রসবোধ! গানের সঙ্গে সাধারণত এরকম জবাব দেওয়া হয় সারেঙ্গীতে এবং সেটা মানানসই। কেননা সারেঙ্গীর নমনীয়তা কণ্ঠস্বরের নমনীয়তাকে একভাবে অনুসরণ করে। গলায় যে তানটি ওঠে, সারেঙ্গীতে সেটি হুবহু সেইভাবেই দেখানো যায় সেই ঢঙে এবং সেই সুরে। তবলার প্রকৃতি এবং আওয়াজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তবলার একাজটা বরং বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে চলতে পারে, কিন্তু কণ্ঠের সঙ্গে এবম্বিধ প্রক্রিয়া যাকে বলে 'ভালগার'।

পরের আসরের প্রধান আকর্ষণ ডাগর বন্ধুর ধ্রুপদ। এঁদের গায়নভঙ্গী সুললিত। এঁরা নাকি ডাগরবাণী ধ্রুপদ পুরুষানুক্রমে গেয়ে আসছেন। এই ডাগরবাণী জিনিসটা কি সে বিষয়ে অনেকে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন, সুতরাং এবিষয়ে একটু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ধ্রুপদের চারটে রীতিকে চারটে বাণী বলা হয়, যথা—গৌড়ীয় বা গওরহার বাণী, খাণ্ডার বাণী, ডাগর বাণী এবং নওহার বাণী। এই বাণীগুলির প্রবর্তন সম্বন্ধে যে ইতিহাস প্রচলিত, তার সত্যতা নির্ধারণ করা শক্ত, তথাপি যেটুকু জানি সে হচ্ছে এই যে, গওরহার বাণীর প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং তানসেন (ইনি নাকি গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন)। এই রীতির ধ্রুপদ প্রসাদগুণে সম্পন্ন, শান্তরসাশ্রিত এবং এর গতি ধীর। খাণ্ডার বাণীর প্রবর্তন করেন মিশ্রী সিং (নোবাৎ খাঁ)। তাঁর বাসস্থানের নাম ছিল খাণ্ডার এবং এ থেকেই উক্ত নামের প্রচলন হয়। খাণ্ডার বাণী ধ্রুপদ তীব্র-রস উদ্দীপক—গতিও খুব বিলম্বিত নয়। ডাগর বাণীর উদ্ভাবন করেন ব্রিজচন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ এবং এর বাসস্থান ডাগুর নাম থেকেই বাণীটি ডাগর নামে পরিচিত হয়। ডাগর বাণী ধ্রুপদের প্রধান গুণ হল সারল্য ও লালিত্য, এর গতিও সহজ এবং সরল। এটি শুদ্ধবাণীরূপেও পরিচিত। নওহার বাণীর প্রচলন করেন শ্রীচন্দ নামক আকবরের এক রাজপুত সভাসদ। নওহার রীতি বলতে সিংহের গতি বোঝায়। এক সুর থেকে দু তিনটি

সুর লঙ্ঘন করে পরবর্তী সুরে যাওয়া, এর লক্ষণ। এই চারটি বাণীর মধ্যে গওরহার এবং ডাগর বাণীই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়।

অনেকের মতে এই চারটে বাণীই এখন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে গীতসূত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন—'ইহাদের অর্থ প্রকাশ নাই। কেহ কেহ বলেন, গৌড়ীয় হইতে গওরহার হইয়াছে। বোধ হয় চারিটি বিভিন্ন দেশ হইতে ঐ চারি বাণী সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। অধুনা ঐ চারি বাণীর বিভিন্ন প্রকার ধ্রুপদ প্রায়ই আর শুনা যায় না; উহারা এক্ষণে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন যে, এক্ষণে কেবল গওরহার বাণীর ধ্রুপদ প্রচলিত।' অতএব ডাগর বন্ধুদ্বয়ের ডাগর বাণী কতখানি প্রাচীন এবং প্রকৃত রীতির পরিচায়ক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ বর্তমান।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা উচিত বলেই মনে করি। অল বেংগল মিউজিক কনফারেন্স এবং ডোভার লেনের সংগীত সম্মিলনী উভয়ের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলিতে কিছু ভ্রম চোখে পড়ল—দুটিই মূলত এক। এগুলি সংশোধন করে দেওয়া আবশ্যক নতুবা সাধারণ পাঠক কয়েকটি বিষয়ে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারেন। প্রথমোক্ত কনফারেন্সের পুস্তিকায় বলা হয়েছে—

"....Dager-pani style of singing which was first inaugurated by Haridas Swami and later popularised by Nayak Gopal,"

প্রথমত কথাটা ডাগরপাণি নয়, ডাগর বাণী, দ্বিতীয়ত নায়ক গোপাল আলাউদ্দিন খিলজীর আমলের লোক (১২৯৪—১৩১০ খৃঃ) আমীর খস্রুর সমসাময়িক, হরিদাস স্বামী অনেক পরবর্তী কালের, শোনা যায় ইনি তানসেনের গুরু ছিলেন। নায়ক গোপালের সময় ধ্রুপদের প্রচলন হয়নি, তিনি প্রবন্ধাদি সংগীত গাইতেন। প্রাচীন পদ্ধতি থেকে ধ্রুপদের সংগঠন হয়েছে অনেক পরে প্রায় আকবরের রাজত্ব কালে।

আবার ইতিহাস থেকে সংগীতে আসি। গানের দিক থেকে এই অধিবেশনের আর দুটি প্রধান আকর্ষণ হল শ্রীমতী গংগুবাঈ হাংগল এবং বড়ে গোলাম আলির অনুষ্ঠান। এ কাননের গান অনেক আশা নিয়ে শুনতে বসেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের হতাশ করলেন, তেমনভাবে জমিয়ে গাইতে পারলেন না। শ্রীকানন সুকণ্ঠের অধিকারী, কিন্তু এই অধিবেশনে তাঁর গায়নভংগী উচ্চাংগের হয়নি। তিনি যেন তেমন গা লাগিয়ে গাইলেন না।

শ্রীমতী গংগুবাঈ উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীদের মধ্যে উচ্চতর স্থানের অধিকারী এটা নিঃসংশয়েই বলা যায়। শেষের আসরে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে এমন অবস্থায় এসেছে যে, গান করাই শক্ত তথাপি তিনি মেয়েকে সংগে নিয়ে গান গাইতে বসলেন—মুখে সরল, নিরহংকার, মিষ্টি হাসি। সুর দিতে গিয়ে দেখলেন গাওয়া শক্ত হবে, স্টেজের ওপর অগত্যা একটু চা'ও খেয়ে নিতে হল তাঁকে। শ্রোতাদের মধ্যে মৃদু হাসি এবং মৃদু গুঞ্জন চলেছে, হেসে তাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে ভরসা দিয়ে তিনি ধরলেন দরবারি কানাড়া। গলা জখম থাদের কাজ হল না, চড়ার দিকেও খুব যেতে পারলেন না। তথাপি গাইলেন আশ্চর্য সুন্দর। শ্রীমতী গংগুবাঈ-এর প্রধান কৃতিত্ব, তাঁর সুর লাগানোর কায়দায়। এক একটা পর্দায় পরিষ্কার স্পষ্ট সুর লাগাচ্ছেন, গলা একটুও চাপা নয়। চাপা গলায় সুর লাগানো তাঁর ধাতে নেই। কে কত বড় ওস্তাদ সেটা বোঝা যায় এই সুর লাগানোটুকুতেই। প্রত্যেকটি পর্দায় ইনি বেশ খানিকক্ষণ সুরের স্থায়িত্ব রক্ষা করেন। গলা একটুও কাঁপে না এবং সংগে সংগে সুরের অপূর্ব কারুকার্যও ফুটে ওঠে কণ্ঠস্বরে। এঁর আর একটি বৈশিষ্ট হল গায়নরীতির গাম্ভীর্য। সংগীতের কোন অংশে এঁকে একটু হালকা কাজ করতে দেখলুম না অথচ প্রতিটি কাজেই সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে। নিরভিমান সম্ভ্রমের সংগে তিনি গেয়ে গেলেন একটির পর একটি খেয়াল। কণ্ঠস্বরের রুদ্ধতার জন্য শেষের আসরে ইনি বিলম্বিত গাইলেন না, কিন্তু দ্রুত খেয়ালে এঁর বাহার এবং খাম্বাবতী অনেকদিন মনে থাকবে, বিশেষ করে বাহার। অল্পক্ষণের মধ্যে কত যে সুরের ফুলঝুরি ফুটিয়ে গেলেন তিনি—এ কেবল স্মৃতির অতলেই সঞ্চিত হয়ে রইল।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি অধিবেশনের শেষ শিল্পী এবং সাফল্য পেলেন সবচেয়ে বেশি। কলকাতায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং এই আসরেও তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রইল। হাতে তাঁর একটি যন্ত্র হার্পের অনুরূপ, গানের সময় এটিতে তিনি সুর রাখেন। তাঁর খেয়াল বাস্তবিকই উপভোগ্য। তিনি সপ্তকব্যাপী বিস্তার এবং তানের মধ্য দিয়ে তিনি খেয়ালের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে রক্ষা করেন। অতি মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী তিনি। এঁর মত [illegible] কাজ করতে আর কাউকে দেখা গেল না। একটি খেয়ালের পর অনেকগুলি ঠুংরি গাইলেন তিনি। তাঁর ঠুংরি শুনে লোকে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘন ঘন করতালিতে মুখর হয়ে পড়ল। এঁর ঠুংরি নিঃসন্দেহরূপেই খুব মিষ্টি, কিন্তু মানসকুঞ্জ যাঁরা চকচকে সিল্কের ফ্লাওয়ারে না সাজিয়ে গন্ধপুষ্পে সাজাতে চান, তাঁরা বোধ হয় ততটা পুলকিত বোধ করবেন না এই ধরণের ঠুংরি শুনে। গোলাম আলির ঠুংরি খুব রঙীন, মনকে পুলকিত করে, কিন্তু তার মধ্যে এমন আবেদন পেলাম না, যা অন্তরকে আলোড়িত করে আরও উচ্চতর ভাবের উদ্রেক ক'রে। আমার মনে হল, ঠুংরির চেয়ে খেয়ালে তিনি শ্রেষ্ঠ, কেননা খেয়ালে

তিনি অনেক বেশি পরিমাণে উচ্চাঙ্গ-শিল্প পরিবেশন করে গেলেন এবারকার আসরগুলিতে।

যন্ত্রসংগীতে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ও শ্রীরাধিকা মৈত্র সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই। এঁরা শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং যথাযথভাবেই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করেছেন। বিলায়েতের বাজনা বহুকাল মনে থাকবে। বাজাতে বাজাতে তাঁর আঙুল জখম হয়ে গেছে তথাপি কি অপূর্ব বাজিয়ে গেলেন তিনি!

ওস্তাদ হাফেজ আলি এখন ওস্তাদ-দের ওস্তাদ—অতি প্রবীণ ব্যক্তি। অতএব আসরে একটু-আধটু রসিকতা করবার অধিকার তাঁর আছে। এই আসরেও তিনি কিছু কৌতুকরস ছড়িয়ে দিলেন। চেহারায় বেশভূষায় দস্তুরমত "এরিস্টো-ক্রেট" তিনি -সাদা দাড়ি বিলক্ষণ নৈপুণ্যের সঙ্গে রঞ্জিত। সরোদ নিয়ে আসরে এসে বসলেন—ঘোষণা হল—ওস্তাদ হাফেজ আলি বলেছেন উপস্থিত সকলেই সমঝদার, অতএব কি রাগ তিনি বাজাচ্ছেন তা সকলেই বুঝতে পারবেন, জানিয়ে দেবার দরকার নেই। বুঝতে অবশ্যই শ্রোতাদের কোন কষ্ট হয়নি। শ্রী, মালকোষ বাজালেন তারপর বাজালেন দুর্গা, মধ্যে একবার ব্যান্ড শোনালেন তাতে মেয়েদের হাসি আর ছেলেদের কান্নাও আছে। এরই মধ্যে থেরাকুয়ার মত প্রবীণ তবলচিকে নাস্তা-নাবুদ করে ছাড়লেন। দুষ্টুমি করে এমনি বাজালেন যে, ছন্দ ঠিক রাখা মুশকিল। থেরাকুয়া তবলা ছেড়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ—পরে অবশ্য ব্যাপারটা ধরে ফেল্লেন এবং সপ্রতিভভাবে সংগত করে গেলেন। ওই খাপছাড়া বাজনার মধ্যেই সুরের মায়াজাল বিস্তার করে-ছিলেন হাফেজ আলি, কিন্তু আজকাল তাঁকে এর চেয়ে বেশি "সীরিয়াস" করা যায় না কোন আসরেই।

সেতারে আবদুল হালিম জাফর খাঁর বাজনা উপভোগ্য। অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে তিনি যে রকম বাজিয়েছেন এখানে সে রকম বাজাতে পারেন নি, তার কারণ, তাঁর সময়টা পড়েছিল রাত দুটোর পর এবং বেশিক্ষণ বাজাবার অবসরও তিনি পাননি। তথাপি তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বাজনা কিছুটা শুনলেই নিঃসংশয়ে বোঝা যায় তাঁর প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর এবং সম্মুখে বিপুল সম্ভাবনা। তাঁর শিল্পী-সুলভ প্রীতি কাজেই বর্তমান। যখন দ্রুত কাজ করে যাচ্ছেন তখনও এক-একটা এমন সুরের চমক লাগাচ্ছেন যা বিস্ময়কর। তাঁর সুরেলা মেজাজ এঁর আর রসজ্ঞান প্রখর এবং গাম্ভীর্যসম্পন্ন। ইনি "হেমন্ত" নামক একটি রাগ বাজালেন। আমার মনে হয়, এ সুরটি হালের রচনা। এই রকম ধরণের সুর বাজাতে বা গাইতে হলে এর পরিচয়টা শ্রোতাদের দিয়ে দিলে রসগ্রহণে সুবিধা হয় এবং রাগের তালিকায় স্থান-নির্দেশেরও সুবিধা হয়। শ্রীরাধিকা মৈত্র "ছায়া" রাগটির পরিচয়ও একটু দিয়ে নিলে ভাল করতেন। কূট রাগ, অপ্রচলিত রাগ বা নবরচিত রাগ পরিচয় না দিয়ে ব্যবহার করাটা সংগত নয়, কেননা, অধিকাংশ ব্যক্তি যেটা জানেন না সেটা তাঁদের জানিয়ে দিয়ে কোথায় বিশেষত্ব সেটা জানিয়ে দেওয়াটা কন-ফারেন্স বা বড় আসরে অবশ্য কর্তব্য। জাফর খাঁর সঙ্গে শ্রীমহাপুরুষ মিশ্রের সংগত তবলা বাদনের আতিশয্যে তেমন জমল না। শ্রীমান মিশ্র এক্ষেত্রেও নিজের কৃতিত্ব দেখাতে গিয়ে বাধার সৃষ্টি করছিলেন।

একক তবলা প্রত্যেকটিই ভাল হয়ে-ছিল, বিশেষ করে ভাল লাগল থেরাকুয়ার গম্ভীর এবং সংযত বাদনপ্রণালী।

সবদিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে ডোভার লেনের আসরটি সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে।

ভিজে রাত

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

আজ নিয়ে সাতদিন চলে যায়
সূর্য ওঠেনি
আকাশ নীল হয়নি
ঝমঝম্ বৃষ্টি থামেনি।
এই নিয়ে সাতটি রাত চলে যায়।

উঁচু পাহাড়ের মাথায় বর্ষা নামছে।
সাদা মেঘে ছাওয়া
পাহাড়ের দেহ
এদিক ওদিক
সমস্ত শ্যামল।

হালকা ফিনফিনে ভিজে মেঘে ছাওয়া।
শ্যামল পাহাড়ের অঙ্গে বর্ষা নামছে।

একা একা খুব নির্জন পাহাড়ের একটেরে আমার ঘরটি।
রাত বাড়ছে।
কেউ নেই
কথা বলবার কেউ নেই,
গল্প করবার কেউ নেই।
রান্নাঘরে পাহাড়ী ছেলে একা বসে রাঁধছে।
খুব একা একা খুব নির্জন একটেরে আমার ঘরটি।

চিত্র প্রদর্শনী

নয়াদিল্লীতে শিল্পী কিরণ সিং

ভারতস্থিত জার্মান দূত ডাঃ আর্নস্ট উইলহেলম্ মেয়ার সম্প্রতি নয়াদিল্লীর নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে শ্রীকিরণ সিংহের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে শিল্পী ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী গার্টরুড সিংহ কৃত বস্ত্রশিল্প মুদ্রণের (Textile Printing) নমুনাও প্রদর্শিত হয়।

দুইটি কারণে এই চিত্রপ্রদর্শনীটি বিশেষভাবে সমালোচক ও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, একক প্রদর্শনীতে সাধারণত যাহা সচরাচর সকলের চোখে পড়ে এখানে তাহা নাই—অর্থাৎ, গতানুগতিক, অনাবশ্যক ও রসব্যাহত নানা চিত্র দ্বারা প্রদর্শনীগৃহ পূর্ণ না করিয়া শিল্পী মাত্র ১৬খানি চিত্র পেশ করিয়াছেন এবং সেই কয়খানির মধ্য দিয়াই তাঁহার রুচি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হইলেও চিত্রগুলিতে তিনি নিজ রুচি অনুযায়ী একটি বিশিষ্ট রীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

সবগুলিই তৈলচিত্র। সাধারণত এহেন চিত্রে অন্যান্য শিল্পিগণ যেরূপ স্থূল ব্রাশের দীর্ঘ আঁচড়, ছুরি সাহায্যে বর্ণপ্রলেপ অথবা উপর্যুপরি তীব্রোজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে বিষয়বস্তুকে অল্প আয়াসে প্রকাশ করিতে চাহেন, শিল্পী সে সব কিছুই করেন নাই। উপরন্তু অপূর্ব কৌশলের সহিত ঘন ঘন বিন্দুসংস্থাপনের (Stippling method) দ্বারা তিনি প্রত্যেক চিত্রের মধ্যে নূতনভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

"ধানঝাড়া" — শ্রীকিরণ সিংহ

সংখ্যায় অল্প হইলেও চিত্রগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই শিল্পীর মানসিক ধারা ও তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেরূপ ঋতুবিশেষে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রূপ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে অন্যদিকে সেইরূপ জীবনসংগ্রামে পরাজিত হতভাগ্য দেশবাসীদের জন্য তাঁহার দরদী হৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। শীতকালের মাঝামাঝি হইতে যখন বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ধানঝাড়া শুরু হয় তখন চারিদিকে যেন এক নূতন জীবনের স্পন্দন জাগিয়া উঠে। উপরে উন্মুক্ত, নীল আকাশের বুকে বলাকাশুভ্র মেঘশিশুদের [illegible] লীলা, নিম্নে রৌদ্রস্নাত গ্রামের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী ধানঝাড়ার এক অবিরাম শব্দ ও তাহারই এক অপূর্ব ছন্দ ও চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব, স্নিগ্ধ বাস ধূলিজালের ক্ষীণ আবরণ এক কথায় পৌষ মাঘ মাসে কল্যাণময়ী কমলাদেবীর শুভ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন সমগ্র বাংলাদেশ এক নবীন মূর্তিরূপে ঝলমল করিয়া উঠে শিল্পীচিত্ত তখন আর স্থির থাকিতে পারে নাই। তাই তিনি "ধানঝাড়া" চিত্রের মধ্য দিয়া বাংলার এই বিশিষ্টরূপটুকু অতিশয় দক্ষতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গলার একটি নগণ্য পল্লীপ্রান্তে একটি সাধারণ বৃক্ষশোভিত দুই একটি ঘর, সম্মুখে নাতিবৃহৎ একটি প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে স্তবকে স্তবকে সজ্জিত স্বর্ণশীর্ষ ধান্যগুচ্ছ ও ইহাদেরই কেন্দ্র করিয়া দুইজন গ্রামবাসী পরমানন্দে ধান ঝাড়িয়া চলিয়াছে—ইহাই চিত্রের বিষয়বস্তু। কিন্তু কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বর্ণসম্ভার, নিজস্ব রীতি অনুযায়ী সূক্ষ্ম, সুদক্ষ পরিমিত বর্ণপ্রলেপ ও সর্বোপরি সুনিপুণ

ভাবে সর্বাঙ্গীণ সমতারক্ষা করিয়া ও আলোক ও ছায়ার বৈষম্য দেখাইয়া শিল্পী বাঙলাদেশের এই একান্ত নিজস্ব রূপটিকে অতি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রখানির স্বত্বাধিকারী ডাঃ ফেল্ডম্যান শিল্পীকে ইহা প্রদর্শিত করিবার অনুমতি দিয়া এ অঞ্চলের শিল্পরসিক তথা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, কারণ এই চিত্রখানি না থাকিলে এই প্রদর্শনী যেন এক হিসাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

অন্যদিকে "রাত্রি — হাবড়াপুলের নীচে" চিত্রে তিনি দরদী ও সহানুভূতি-

"পড়ন্ত রৌদ্রালোকিত মাঠ"
—শ্রীকিরণ সিংহ

...মনের পরিচয় দিয়াছেন। রাত্রিকালে ...শহরে বিচিত্র আলোকমালা-... হাবড়া পুলের উপর দিয়া যখন ... মোটরাদি যান আনন্দ ও ... বন্যা বহাইয়া আপনার মনে ... মুখে চলাচল করে, তখন ঠিক ...নিম্নে আলোকবিহীন স্বল্প-... কোন একটি নিভৃত কোণে বঞ্চিত, ... ও সর্বহারাদের দল নগ্ন ও ...ক্লিষ্ট দেহে কিভাবে জীবন যাপন ...এরই এক করুণ দৃশ্য শিল্পী ... সমবেদনার সহিত এই চিত্রে ... করিয়াছেন। ইহার পরেই যে চিত্রটি চোখে পড়ে সেটি "পড়ন্ত রৌদ্রালোকিত মাঠ।" দুইটি গ্রাম্য যুবতী অপরাহ্ণবেলার তাপহীন রৌদ্রে বসিয়া কিরূপে অলস অবসর যাপন করিতেছে শিল্পী কেবলমাত্র ক্রমবিলীয়মান লঘু-বর্ণকে পৃষ্ঠভূমিতে রাখিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। বসিবার স্বাভাবিক ভঙ্গী, সুষ্ঠু ও সাবলীল দেহলতাসৌষ্ঠব, সুদূরপ্রসারী চাহনীভঙ্গী ও বিলীয়মান দিগন্তরেখার দ্বারা শিল্পী বিষয়বস্তুটিকে সরলভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে "উদয়পুরে সন্ধ্যা" ও "তালিকুঞ্জ" উল্লেখযোগ্য।

বস্ত্রশিল্প মুদ্রণের যে কয়খানি নমুনা ছিল সে সবগুলিই শিল্পী ও তাঁহার পত্নী উভয়ে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রথমে বিভিন্ন ধরণের ডিজাইন অঙ্কিত করিয়া শিল্পীদম্পতি তাঁহাদের কাঠের ছাঁচ তৈয়ারী করেন ও পরে বিভিন্ন বর্ণে বস্ত্র ও রেশমের উপর তাহা মুদ্রিত করেন।

সুরুচিসম্মত ও স্থায়ী নানা বর্ণে মুদ্রিত বিভিন্ন ডিজাইন সমন্বিত রুমাল, বিছানার চাদর পরদা ইত্যাদি প্রদর্শনীতে পেশ করা হইয়াছিল। বাঙলাদেশের জনপ্রিয় লোকশিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকাংশ ডিজাইন অঙ্কিত এবং বিশেষ করিয়া "মা ও শিশু" ও "বধূ" প্যাটার্ন-গুলি প্রথমেই চোখে পড়ে। বাঙলাদেশে নূতন না হইলেও এ অঞ্চলে এহেন রুচি-সম্মত রূপরেখাসম্পন্ন দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর প্রদর্শনী খুব বেশী হয় নাই, তাই স্থানীয় শিল্পরসিকদের মধ্যে এই বস্ত্রশিল্প মুদ্রণের নমুনাগুলি জনপ্রিয় হইয়াছে। —"চিত্রপ্রিয়"

একটি চিত্রপ্রদর্শনী

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে শিল্পী অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন রায়, রবি রায়, মাণিক সরকার এবং আরো কয়েকটি নবীন শিল্পীর (যাদের নাম চিত্র তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি) একটি যৌথ চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

নব্য ভারতীয় শিল্পরীতি একদা যে সব শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করেছিলো শিল্পী অর্ধেন্দুপ্রসাদ তাদের অন্যতম। সেই সূত্রেই তিনি আমাদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন। ইদানীং কোন প্রদর্শনীর মারফৎ তার নতুন কোন রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়নি। এই দীর্ঘ নীরবতার পর তার চিত্র প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করেছিলো। তার কারণ সম্প্রতিকালে বাঙলাদেশে যে নতুন শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্ভব হচ্ছে তাদের রূপ ও রীতি প্রকাশের ভাষা নব্য ভারতীয় শিল্পরীতি থেকে

শিল্পী পঞ্চানন রায়

এতো বিপরীত ও ভিন্ন ধর্মী যে কোন যোগসূত্রের সন্ধান সেখানে পাওয়া যাবে না তবে এই নতুন স্রোতের মধ্যে সে যুগের শিল্পীরা কীভাবে আত্মরক্ষা করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই আশাই করে গিয়েছিলো। কিন্তু শিল্পী অর্ধেন্দুপ্রসাদ আমাদের আশ্চর্যভাবে হতাশ করেছেন এই প্রদর্শনী দেখবার পর মনে হয়েছে তিনি এই প্রদর্শনী থেকে অনুপস্থিত থাকলেই ভালো করতেন। কারণ আমাদের স্মৃতির মধ্যে তার অতীত শিল্পীত্বের যে ক্ষীণ অংশটুকু অবশিষ্ট ছিলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আঘাতে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। অবশ্য প্রদর্শিত ছবিগুলির

কোনটিই তার সাম্প্রতিক রচনা নয়। কিন্তু যে অপূরণীয় ত্রুটি ও দুর্বলতার দরুণ নব্য ভারতীয় শিল্পকলার স্রোত রুদ্ধ হয়েছিলো তারই সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে লক্ষ্য করা গেলো। কোন একটি ছবিও তার প্রাচীন বলিষ্ঠতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো না। প্রি র‍্যাফেলাইট শিল্প আন্দোলনের শেষ যুগ দীপ্তিহীন ও গতানুগতিক। কিন্তু নব্যভারতীয় শিল্পী গোষ্ঠীর অন্যতম শিল্পীর এই রচনার নমুনা সে আন্দোলনের বিরূপ সমালোচকের হাতিয়ার হয়ে রইলো।

শিল্পী পঞ্চানন রায়, রবি রায় ও মাণিক সরকার তিনজনেই বয়সে তরুণ। সেই কারণেই হয়তো নিজস্ব শিল্পভাষা এখনো গড়ে ওঠেনি। শিল্প সাধনার প্রথমস্তরে পূর্বসূরীদের অনুসৃত পথে চলাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সেই পথ ধরেই এরা অগ্রসর হয়েছেন। এদের মধ্যে পঞ্চানন রায় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বলা যেতে পারে এবং একটা স্বকীয় দৃষ্টিকোণের প্রচ্ছন্ন আভাস যেন তার কোন কোন রচনায় লক্ষ্য করা গেলো। তার কিছুটা পরিচয় আছে স্কেচগুলির মধ্যে। সেখানে তুলির টান দ্রুত, দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ। অবশ্য সেখানেও কোন নির্দিষ্ট রীতি গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও স্তর অতিক্রমণের সুস্পষ্ট প্রয়াস সেখানে লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন ধারার পরিচয় তার দুই একটি রঙীন কাজের মধ্যেও পাওয়া যায়।

রবি রায় ও মাণিক সরকারের রচনা নব্য ভারতীয় শিল্পধারা অনুযায়ী এবং মূলত রেখা অনুযায়ী। রবি রায়ের ছবির পরিচ্ছন্নতা ও ফিনিস অবশ্যই লক্ষনীয়। চৈতন্য এবং চন্দ্রালোক দুটি সুখদৃশ্য রচনা।

এবার সাধারণভাবে এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। নিজের রচনাকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার ইচ্ছা শিল্পীদের স্বাভাবিক। কিন্তু প্রদর্শিত ছবিরও একটা নিম্নতম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাছাই হয়ে আসা উচিত। নচেৎ অপরিণত শিল্পরচনা শুধু দর্শককে বিভ্রান্ত করে তাই নয়, দর্শকের শিল্পবোধকেও আহত করে। এই প্রদর্শনীতেই অনেক রচনা আছে যা নিঃসংশয়ে বর্জন করা চলতে পারতো এবং তাতে প্রদর্শনীটি আরো পরিচ্ছন্ন হতো। আশা করা যাক এ বিষয়ে ভবিষ্যতে শিল্পীরা সচেতন হবেন।

এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের চিত্র-তালিকাটির ভুলভ্রান্তির দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কর্মখালি—

বারেন্দ্র জাতীয়া একটি নিরাশ্রয়া দুঃস্থা মেয়ে আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে সংসারের কাজ-কর্মের জন্য আবশ্যক। ১২-১-৫৪ তারিখের মধ্যে লিখুন। দাস, ১২সি, হেষ্টিংস রোড, এলাহাবাদ—১।

(এম)

মহাশূন্যের ওপার হতে

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের আবাসভূমি পৃথিবীকে ঘিরে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত রয়েছে অসীম অনন্ত মহাশূন্য। মহাশূন্যের এক প্রান্তে একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী এবং অপর প্রান্তে আছে বহু গ্রহ-উপগ্রহ, জ্যোতিষ্ক, নীহারিকাপুঞ্জ। এই দুই প্রান্তের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান এত বিরাট যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে মহাশূন্যের ওপারের অনেক জ্যোতিষ্কের দেখা পাওয়া ভার। এবং অন্তহীন দূরত্বের পারে এমন জ্যোতিষ্কও আছে যা আজকের সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণে ধরা পড়েনি। কিন্তু চোখে না দেখতে পেলেও শব্দ শুনে অনেক জিনিস তো আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মহাশূন্যের ওপারের জ্যোতিষ্কপুঞ্জ থেকে এক প্রকার 'ধ্বনি' প্রতিনিয়ত ভেসে আসে পৃথিবীতে—সে ধ্বনি আমাদের কানে পৌঁছয় না বটে, তবে বিশেষ ধরণের যন্ত্রে তার সংকেত পাওয়া যায়।

আমরা জানি, জল স্থল মহাশূন্য সর্বব্যাপী এক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন বিজ্ঞানীরা এবং এর নাম দিয়েছেন ঈথর। তাঁদের মতে ঈথর হলো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের বাহক। পুকুরের এক স্থানে কোনো কারণে সামান্য একটু আলোড়নের সৃষ্টি হলে তা ঢেউয়ের আকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আলোড়িত স্থলে মুহূর্তে যে শক্তি সঞ্চিত হয় তা স্বাভাবিক অবস্থায় এক স্থানে স্তূপাকারে থাকতে পারে না সেই ঢেউয়ের হয় উৎপত্তি এবং সেই ঢেউই আলোড়নের শক্তিকে বহন করে ছড়িয়ে দেয় সর্বদিকে। ঈথর-সমুদ্রেও তেমনি কোনো এক স্থানে প্রথমত তড়িৎ-কণা বা ইলেকট্রনের কম্পন দ্বারা তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির সৃষ্টি হয় এবং এই শক্তি অতি দ্রুত তরঙ্গাকারে চারিদিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

আমরা আরও জানি, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের প্রাথমিক উপাদান মৌলিক কণাগুলি সর্বদাই গতিশীল অবস্থায় আছে এবং এই গতিশীলতার ফলে তারা তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরূপে তেজ বিকিরণ করে থাকে। এই বিকিরণ আমাদের কাছে সাধারণত পরিচিত হয় তখন, যখন এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আলো ও উত্তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমান হয়। কোনো পদার্থ যথেষ্ট উত্তপ্ত হলে যেমন আলো বিকিরণ করে, গতিশীল পরমাণু থেকেও তেমনি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকীর্ণ হয় এবং বেতার গ্রাহক যন্ত্রে এই তরঙ্গ সংগৃহীত হতে পারে। তবে বেতারকেন্দ্র থেকে প্রেরিত সাধারণ তরঙ্গের তুলনায় এই তরঙ্গ অতি ক্ষীণ এবং সেজন্যেই এতদিন পর্যন্ত এই তরঙ্গের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতার-কলাকৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে সূক্ষ্মানুভূতিশীল এমন বেতার গ্রাহক যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয় যার সাহায্যে যে কোনো পদার্থ থেকে বিকীর্ণ বেতার স্পন্দন সংগ্রহ ও পরিমাপ করা যায়, অবশ্য যদি না তা অধিকতর শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

মহাশূন্যের ওপার থেকে যে ক্ষীণ বেতার তরঙ্গ পৃথিবীতে নিরন্তর ভেসে আসে তার অস্তিত্ব সাধারণভাবে আমরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু Beamed Aerial System বা দিক-

অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা থেকে আগত সংকেতধ্বনি র‍্যাডার যন্ত্রের পর্দায় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে
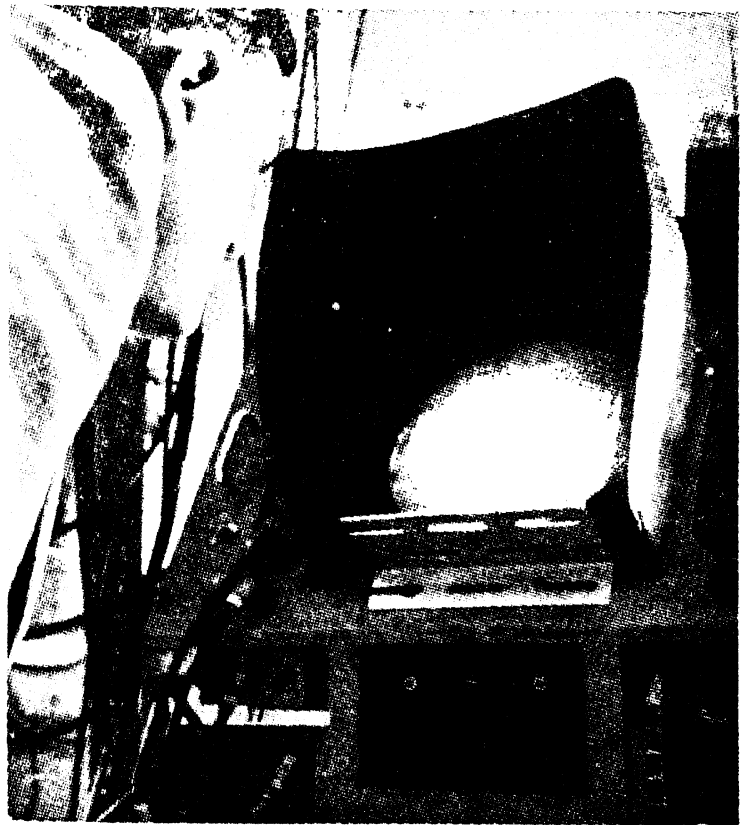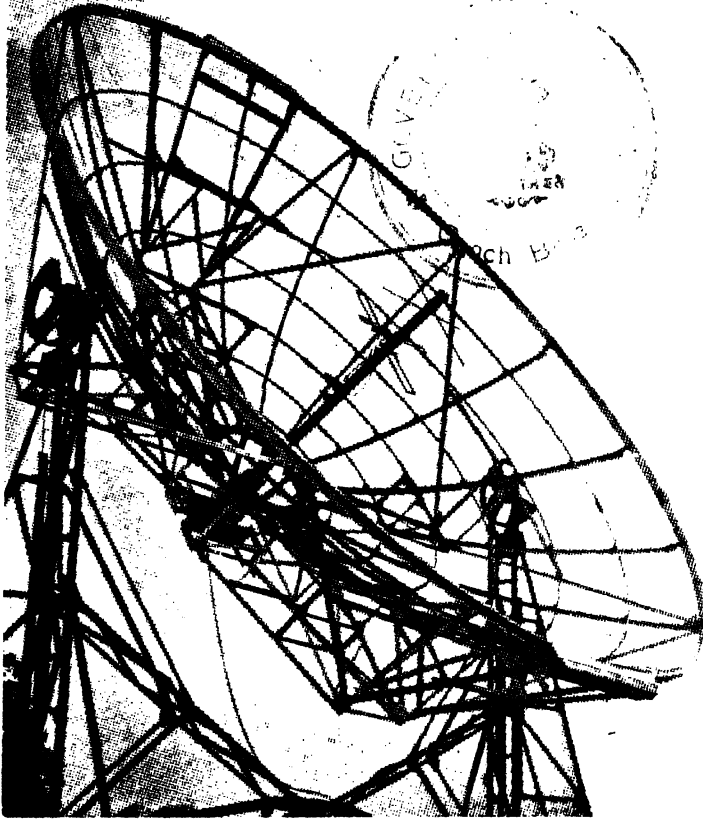
নবপরিকল্পিত বিশাল আকৃতির বেতার-দূরবীক্ষণের নমুনা

ধর্মী এরিয়েল পদ্ধতিতে (যে প্রণালীর দ্বারা তরঙ্গের দিক নির্ণয় করা যায়) বহির্বিশ্বের বহুদূরস্থিত জ্যোতিষ্ক থেকে আগত এই বেতার তরঙ্গসমূহ সংগ্রহ করা যায় এবং সূক্ষ্মানুভূতিশীল গ্রাহকযন্ত্রে তাদের শক্তি ও বিবিধ পরিবর্তনের পরিমাপ করা যায়। এই এরিয়েল, রিসিভার ও স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডার সমন্বিত সমগ্র ব্যবস্থাকে বলা হয় Radio-telescope বা বেতার-দূরবীক্ষণ।

১৯৩২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর যন্ত্রবিজ্ঞানী কে জি জ্যানস্কী পৃথিবীর বহির্দেশ থেকে আগত বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম নির্ধারণ করেন। সে সময় তিনি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের বেতারবার্তা সংক্রান্ত গবেষণায় রত ছিলেন। গবেষণায় ব্যাপৃত থাকাকালীন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সূর্যের দিক থেকে যেন একটা ক্ষীণ ধ্বনি ভেসে আসছে পৃথিবীতে। এক বৎসরব্যাপী পর্যবেক্ষণের পর তিনি দেখলেন যে, এই ধ্বনির উৎস সূর্য নয়—সাধারণভাবে ছায়াপথের দিক থেকে ভেসে আসে এই ধ্বনি। সূর্যের দিক থেকে এই ধ্বনি ভেসে আসছে বলে প্রথমে যে মনে হয়েছিল তার কারণ হলো সূর্য তখন ছায়াপথের ওই অংশে অবস্থান করছিল। জ্যানস্কী তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এই ক্ষীণ বেতার তরঙ্গ বিকিরণের উৎস হচ্ছে নক্ষত্রলোক বা ছায়াপথে বিস্তীর্ণ নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী পদার্থসমূহ।
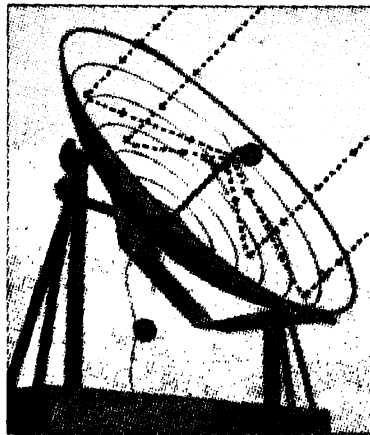
বেতার-দূরবীক্ষণের রেখাচিত্র

প্রায় আকস্মিকভাবে জ্যানস্কী মহাশূন্যের ওপারের এই যে অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তা এক নব অধ্যায়ের সূচনা করলো। কিন্তু ১৯৪০ সালের পূর্বে পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীরা কেউ তেমন মাথা ঘামান নি। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেবার একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র তৈরী করে বহির্বিশ্বের দূরাগত এই বেতার-স্পন্দন পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের সময় বেতার-কলাকৌশলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং তার ফলে দূরাগত বেতার স্পন্দন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পথ সুগম হয়। যুদ্ধের গোপনীয় সংবাদ আদান প্রদানের জন্যে যে সূক্ষ্মানুভূতিশীল বেতার গ্রাহকযন্ত্র ও দিকধর্মী এরিয়েল ব্যবহৃত হতো সেগুলিকেই পরবর্তীকালে বেতার-দূরবীক্ষণে রূপান্তরিত করা হয়। এইভাবে গ্রেট-বৃটেনে চেশায়ারের জোড্রেল ব্যাঙ্ক এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেশনে ডাঃ ক্রেগ যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত ন্যুব্জপৃষ্ঠ বিরাট একটি র‍্যাডার-প্রতিফলককে পরিবর্তিত করে বেতার-দূরবীক্ষণ প্রতিফলকে পরিণত করেন। এই বিরাট যন্ত্রের সাহায্যে ডঃ ক্রেগ ও ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর সহকর্মীরা পাঁচ মিলিয়ন 'মিলিয়ন মিলিয়ন (এক মিলিয়ন = দশ লক্ষ) মাইল দূরবর্তী অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা থেকে অবগত বেতার স্পন্দন আহরণ করে তাদের তীব্রতা পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন। ডঃ ক্রেগ-এর

সহকর্মীদের মধ্যে কে দাস গুপ্তওয়ালা নামে জনৈক ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন।

দূরবর্তী জ্যোতিষ্ক এবং নীহারিকা-পুঞ্জের বেতার-তরঙ্গ সংগ্রহে সাফল্য অর্জনের ফলে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বিপুল অর্থব্যয়ে বৃহত্তর আর একটি বেতার-দূরবীক্ষণ নির্মাণের ব্যবস্থা করেছেন। এই যন্ত্রটি ১০০ গজ ব্যাসের একটা বৃত্তাকার রেলের ওপর স্থাপিত হবে। যন্ত্রটির মোট ওজন ১২৭০ টন। নির্দিষ্ট জ্যোতিষ্ক অভিমুখে স্থাপন করবার জন্যে যন্ত্রটিকে রেলের ওপর যে কোনো জায়গায় সরানো তো যাবেই, তাছাড়া একচুল এদিক-ওদিক করাও সম্ভব হবে। এর সাহায্যে নক্ষত্র-জগৎ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক সম্পর্কীয় অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে।

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দূরাগত বেতারস্পন্দন কিভাবে ধরা পড়ে তার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে রেখা চিত্র থেকে। সুদূর জ্যোতিষ্ক থেকে শূন্যপথে আগত বেতার তরঙ্গ প্রথমত A-চিহ্নিত হেলানো অর্ধ বৃত্তাকারের প্রতিফলকে সংগৃহীত হয় এবং তারপর B-চিহ্নিত নাভিকেন্দ্রে সংহত হয়। সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে C-চিহ্নিত তারের মধ্য দিয়ে বেতার গ্রাহক যন্ত্রে উপস্থিত হয়। ক্ষীণ বেতার-স্পন্দন সেখানে বহু গুণ বর্ধিত হয় এবং এই পরিবর্ধিত ধ্বনি স্বয়ংক্রিয় রেকর্ডার বা লেখন-যন্ত্রে একটা সূক্ষ্ম শলাকাকে নিচে থেকে ওপরে ওঠায়-নামায়। সংকেত-ধ্বনির শক্তি অনুযায়ী শলাকাটি কম্পিত হয় এবং লেখন-যন্ত্রের কাগজের ওপর তার বক্র রেখা-চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায়। এই রেখাচিত্র দেখে দূরাগত সংকেত ধ্বনির শক্তির তারতম্যে সময়ের ব্যবধান নির্ণীত হয়। সময়ের পরিমাপ একেবারে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ তা থেকেই জানা যায় কতদূরের কোন্ জ্যোতিষ্ক থেকে বেতার-তরঙ্গ ভেসে আসছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আসরে বেতার-দূরবীক্ষণ সম্পূর্ণ নবাগত, তাই তার কার্যকলাপের সম্যক পরিচয় সে এখনও দিতে পারেনি। তবে তার ভবিষ্যৎ যে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। উন্নত থেকে উন্নততর শ্রেণীর বেতার-দূরবীক্ষণ প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যের ওপারের কত রহস্যই না উদ্‌ঘাটিত হবে কে জানে!

ভিজে কলকাতা

কিরণশংকর সেনগুপ্ত
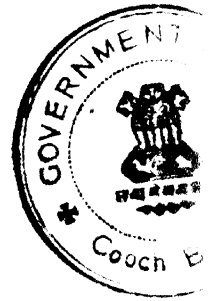
ঘর্মাবিধ্বস্ত দিন, থমথমে ঘন অন্ধকার
গহন নিবিড় নীলে; গ্রীষ্মশেষে দুরন্ত শহরে
উন্মুখ শ্রাবণধারা, অসহ্য গুমোট ঘরে-ঘরে
জুড়ে গিয়ে নীলাঞ্জন শ্রান্তচোখে লাগে সবাকার।
ভিজে ট্রামে ভিজে বাসে অজস্র যাত্রীর আনাগোনা
ভিড় বাড়ে, লোক জমে মোড়ে-মোড়ে পড়ন্ত বিকেলে
ছোকেরা প্রতীক্ষায়; চৌরঙ্গীতে ইলেকট্রিক জেলে
আড্ডা জমে রেস্তোরাঁয়, সিনেমায় অতৃপ্ত কামনা
চরিতার্থ করে কেউ; তারপর স্তব্ধ অর্ধরাতে
অতল কান্নার সুরে গুমরিয়া ওঠে কলকাতা
উত্তরে হাওয়ার বেগে, কুষ্ঠরোগী জাগে ফুটপাথে
একক ভীতির রাত, শহরের পাষাণে শূন্যতা
মৃত্যুর মতোই ভারী, কুকুরের আর্ত কণ্ঠস্বরে
নির্জন দ্বীপের কান্না, লালা ঝরে আহত অধরে।

ছলনা

দিবাকর সেনরায়

আকাশের মুখ থম্‌থম্‌,
এখুনি হয়তো ঝম্‌ঝম্‌
নামবে অঝোর ধারায়—
খানিক আগের কালো আকাশের তারায়
কোনোই আভাস ছিলো না কিন্তু তার;
কোথায় সে তারা? আকাশ ভাঙলো হয়ে যেন শতধার।

অপ্রত্যাশিত ঘটে যায় কতো কিছু,
যেমন কখনো ভাবি অভিমানে মুখ করে আরো নীচু;
তখন কি জানি মুখ নীচু করে হাসি চাপবার চেষ্টা?
কান্না তো নয় হাসিই চাপছো—যদিও জানি তা শেষটা।
এমনি করেই বরষার নভে—তোমারি চোখের আকাশে—
কতো ছলনার খেলা চলে কভু কাঁদে আর কভু বা হাসে।
তুমি ও আকাশ—দুজনে মিলে এ ছলনা
কতোদিন আর করবে আমায় বলো না!

রজনীগন্ধা

অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুটি পিতলের ফুলদানীতে
সাজিয়ে দিয়ে গেলে দুইগুচ্ছ রজনীগন্ধা
দুটি নিপুণ হাতের সোহাগ দিয়ে।

যাবার আগে--
মাটির পরে নামিয়ে ধরলে দীর্ঘায়ত দুটি চক্ষুপল্লব,
সলজ্জ কণ্ঠে জড়িত জিহ্বায় ঘোষণা করলে—
"আমি রইলুম না, রইল আমার রজনীগন্ধা
আমার প্রতিভূ।"

তারপরে দাঁড়াওনি তুমি একটুও,
দ্রুতছন্দে বেরিয়ে গিয়েছিলে ঘর থেকে
বাতাসে হিল্লোল তুলে।

চেয়ে দেখলুম--
রজনীগন্ধার শ্যামল দীঘল তনু
নত হয়ে পড়েছে পুষ্প দাক্ষিণ্যে
পূর্ণ যৌবনভারে ঈষদাবনতা
তোমার প্রতিভূ।

উপমাটা ভালই দিয়েছ—
কাছে গিয়ে সকৌতুকে সেগুলি স্পর্শ করলুম
লঘুস্পর্শে তুলে ধরলুম পুষ্পমঞ্জরী
যেমন করে কতদিন তুলে ধরেছি তোমার সলজ্জ চিবুক
আমার প্রসন্ন মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে।

তারপরে,
দিনের সহস্র কাজের মাঝে
ভুলে গিয়েছিলুম
তুমি এসেছিলে—এনেছিলে রজনীগন্ধা,
তুমি চলে গিয়েছিলে, রেখে গিয়েছিলে তোমার প্রতিভূ।

সন্ধ্যার দীপ-না-জ্বালা প্রহরে
ঘরে ঢুকতেই অভ্যর্থনা পেলুম পরিচিত গন্ধের
জ্বাললুম আলো—
দেখলুম তোমার রজনীগন্ধা
সলজ্জ অধীরতায় উন্মুখ—তোমার প্রতিভূ!

*   *   *

দিন যায় দিন আসে,
পুষ্পস্তবকের নীচের ফুলগুলি—
একটির পর একটির পাপড়ি মুড়ে আসে,
খসে পড়ে ফুলদানীর গোড়ায়
বৃন্তবন্ধের দাগ দেখা যায় শুষ্ক ক্ষতের মত—
উপরের ফুলগুলি তাদের ম্লান পাপড়িগুলি মেলে ধরে
পরিশ্রান্ত গৃহস্থবধূর রাত্রির [illegible] মত
দায় আর দায়িত্বের করুণ সমাবেশ।
চিকণ সবুজ পাতার
বর্শাফলকের মত মাথাগুলি মুড়ে এসেছে পিঙ্গল বেদনায়
গন্ধ হয়ে এসেছে ম্লান,
মিলনের হাসি নয়—
আসন্ন বিচ্ছেদের অশ্রুসংকেত—
ভারাক্রান্ত করে তোলে মন্থর সন্ধ্যার অবকাশ।

অকস্মাৎ তোমার কথা মনে হল
তুমি বলে গিয়েছিলে—রজনীগন্ধা তোমার প্রতিভূ।
আর্তবেদনায় বুকে হাত চেপে বসে পড়লুম।
তারপর নিষ্করুণ হাতে
দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিলুম—
নিঃস্ব জীবনের ক্লান্ত অবশেষকে
আমার দৃষ্টির অন্তরালে।

জীবনী

শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, প্রাপ্তিস্থান—নভেল পাবলিশিং হাউস, ২-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য রচিত এই গ্রন্থ জনসাধারণে যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণেই প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা অমৃতাধিক, সেই জীবনকথা স্মরণ বর্ণন ও পঠনে বিশ্বাসীর হৃদয় দিব্য জিজ্ঞাসা এবং পারমার্থিক ব্যাকুলতা লাভ করে, আর অবিশ্বাসীর সকল যুক্তিবাদের কাঠিন্য বিস্ময়ে অভিভূত হয়। ভক্ত ও সাধক তাঁহার ধ্যানের ও আরাধনার মাতৃমূর্তির মধ্যে যে মহিমার প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া নিত্য তৃপ্তি অনুভব করেন, বিশ্ব শতাব্দীতেই এক মহীয়সীর জীবনে সেই মহিমারই প্রকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিল সাধারণ মানুষ। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা এবং সাধকের সাধনারই মাতৃরূপ শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনে মূর্ত হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীমা, তাঁহার জীবনচর্যা তাঁহার সাধনা এবং তাঁহার উপদেশ জ্ঞান শিক্ষা এবং আনন্দের এক সুধার্ণব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য সেই মহাজীবনের বহুবিধ যে বর্ণন-সম্ভোর দ্বারা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থটি বাঙলা ভাষায় লিখিত জীবনী সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থটি যে লেখকের প্রভূত শ্রম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সৃষ্টি, তাহার পরিচয় গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যসম্মত প্রণালী অনুসারে লিখিত জীবনী হিসাবে এই গ্রন্থটিই শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে লিখিত প্রথম উল্লেখযোগ্য জীবনী-গ্রন্থ। এই দিক দিয়া লেখক বাঙলা জীবনী-সাহিত্যেরই একটি অভাব পূরণ করিয়াছেন। পরিশিষ্টসহ সাতাশটি বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনবৃত্তান্ত ও উপদেশাবলী লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের সাহিত্যগত মূল্য অপেক্ষা তত্ত্বগত উৎকর্ষের মূল্য বেশি। সেই বিচারে গ্রন্থটি বাঙলার আধ্যাত্মিক সাহিত্যেরও একটি বিশিষ্ট এবং সার্থক নিদর্শন।

গ্রন্থটির মুদ্রণ সৌষ্ঠবও প্রশংসনীয়।

৫৫০।৫৩

বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ, অনুবাদক—শ্রীঋষি দাস ; ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২; মূল্য ছয় টাকা।

গীতার কর্মবাদের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। গৈরিক আবরণের অন্তরালে জ্বলন্ত কর্মস্পৃহা, সমাজচেতনা আর দেশহিতৈষণা এই মহাত্যাগীর বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় স্বামীজীর দানও কম নয়। বিবেকানন্দের মন্ত্র ছিলো ধর্ম-সহিষ্ণুতা আর ধর্মীয় সার্বজনীনতা। সকল প্রকার সংকীর্ণতা আর ক্লিষ্টতা তিনি পরিহার করতেন। গৃহকোণের প্রদীপের মত তিনি শুধু নিজ গৃহ প্রাঙ্গণটুকু আলোকিত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, উল্কার মত দেশের পরিধি ছাড়িয়ে দেশান্তরেও আলোক বিতরণ করেছিলেন।। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজাত চিন্তাধারা ও মতবাদকে বিশ্লেষণী দৃষ্টির মাধ্যমে দিকে দিকে প্রচারিত করেছেন। ভক্তির স্রোতকে জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। তাঁর মর্মবাণী: 'সর্বজীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস করি। সকল জাতির যাহারা দুর্বৃত্ত, দরিদ্র, নিপীড়িত, তাহারাই আমার ভগবান। এই ভগবানের জন্য আমি বারে বারে জন্মিতে চাই; জন্ম জন্ম দুঃখ পাইলেও আমার দুঃখ নাই।' জীবের সঙ্গে শিবের এই একাত্মবোধই বিবেকানন্দের ধর্মজীবনের মূলকথা।

আলোচ্য গ্রন্থটি মনীষী রোমাঁ রোলাঁকৃত এই নামের বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ। ইতিপূর্বে এই জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদক হিসাবে শ্রীঋষি দাস যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনুবাদের প্রাণবস্তু শুধু ভাষান্তরই নয়, রচনার গাম্ভীর্য ও ভাবসম্পদ অক্ষুণ্ণ রেখে যথাযথ রূপান্তর। পশ্চিমের ঋষির প্রাচ্যের মহামানবের প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুবাদকের নিপুণ লেখনীগুণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। ভারতীয় দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের মতবাদের যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ এই গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে এমন প্রাঞ্জল অনুবাদ বোধ হয় সম্ভব নয়।

এ জাতীয় অনুবাদ গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ এ কথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। ৩৯৯।৫৩

ভ্রমণ কাহিনী

চীন দেখে এলাম—মনোজ বসু, প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

ইদানীং অনেক ভারতীয় চীন দেশ ঘুরে এসেছেন। তাদের বইও বাজারে বেরিয়েছে বেশ কয়েকখানা। প্রবন্ধও লিখেছেন তাদের অনেকেই খবরের কাগজে। আবার রাজনৈতিক বিবৃতিকারীরও অভাব নেই দেশে যারা চীনের নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখেন। তাদের দিক থেকেও জ্ঞান বিতরণের ত্রুটি নেই। বেশীর ভাগ লেখাতেই আছে নিছক ভাবালুতা অথবা রাজনৈতিক মতলববাজী। এদেশের পাঠকের মনে চীন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রচুর। কিন্তু তারা চায় চীনের জীবনধারার একটা বাস্তব বিশ্লেষণ। ভালমন্দ মিশিয়েই সেখানকার মানুষ ও তার জীবনধারা। তার অতীত ইতিহাস ও তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার জীবনের বাস্তব বিচারের অভাব আছে। সে অভাব কতটা বর্তমান লেখক দূর করতে পেরেছেন সেটা পাঠকের বিচার্য।

লেখক সুপরিচিত সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের দরদ দিয়েই তিনি চীনের মানুষকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি রাজনীতিক নন। তিনি "ওসব বোঝেনও না।" তাই "সংখ্যাতত্ত্ব বা রাজনীতিক

বিশ্লেষণের" তিনি ধার ধারেননি। "মানুষেরা থাকবে আমার কাহিনী জুড়ে। সামান্য আর মহৎ যত মানুষ দেখছে পাচ্ছি। তাদের এই সুবিপুল উল্লাস আর কঠিনতম সাধনা।" পুস্তকে ঘটনাবলীর বর্ণনায় ও প্রকাশের ভাব ও ভঙ্গীতে মানুষের প্রতি লেখকের গভীর দরদই পরিস্ফুট।

লেখক গিয়েছিলেন চীনে ১৯৫২ সালে পিকিংএ শান্তি বৈঠকে যোগদান করতে। "নিজের দেখা জিনিস ও অন্তরের উপলব্ধির" বর্ণনা তার এই প্রথম পর্বে। পাঠককে দিয়েছেন তিনি নিবিড় পরিচয় তার উপলব্ধির সঙ্গে। দৃশ্যমান ছবির মত পরিস্ফুট তার যাত্রা পথের বর্ণনা। পরিচয় মেলে মানুষ-গুলোর, তাদের চালচলন ও প্রাণোচ্ছ্বাসের। চীনে যাওয়ায় নিমন্ত্রণ থেকে শান্তি বৈঠক পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনাবলীর বর্ণনা রূপ নিয়েছে চলচ্চিত্রের ছবির মত। চলমান এই বর্ণনা যাত্রীর চলার ছন্দে।

লেখক ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছেন রাজ-নীতিক বা সমাজনীতিক মতবাদের কচকচানী। তাতে অসুবিধা আছে সত্য। বিশেষ করে যেখানে দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে চীন সম্বন্ধে লেখার বিচার হয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক জানতে চায় চীন তার জাতীয় ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছে কি উপায়ে। তাদের জীবনেও কোন অভাব বা অভিযোগ আছে কিনা। সাধারণ পাঠক যেমন বিশ্বাস করে না যে, চীনের কোটি কোটি জনগণ রাশিয়ার পদানত দাস বা সেখানকার মাটি কৃষকের রক্তে লাল, তেমনি তারা এও বিশ্বাস করে না যে, চীন একটা সবপেয়েছির দেশ। বাস্তব এই দুইয়ের থেকেই স্বতন্ত্র। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের বিচার ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে সত্য, বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দেশকে বুঝবার জন্য। কিন্তু পাঠকের সেই চাহিদা পূর্ণ করা বর্তমান পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়। চীনের নরনারী ও তাদের ক্রিয়া-কলাপ সাহিত্যিকের মনে যে ভাব ও রসের সৃষ্টি করেছে তাই পরিবেশন করেছেন লেখক তার পাঠককে। ৫৪০।৫৩

ছোটগল্প

সৌরভ : দুর্গাপদ সিংহ, প্রকাশক ডক্টর পীযূষাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। কলিকাতা—৯; মূল্য আড়াই টাকা।

গত বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলা ছোট গল্প অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ করেছে। শুধু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বেই নয়, রচনা পারিপাট্যে, আঙ্গিক নৈপুণ্যে, শব্দচয়নে, সুসমঞ্জস্য প্রকাশ ভঙ্গীতে আধুনিক বাংলা ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যের গর্বের বস্তু। আশার কথা, অন্যান্য প্রদেশের ছোট গল্প লেখকরাও বাংলা ছোট গল্পকেই মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ন্যায়ভাবে এবং অন্যায়ভাবে বাংলা ছোট গল্পের অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছোট গল্পের এ সাফল্যের অন্তরালে খ্যাতিমান লেখকদের চেষ্টা ছাড়াও বহু স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিকেরও শ্রম আর নিষ্ঠা রয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি গল্প-সংকলন। লেখকের নটি গল্প এতে সংযোজিত হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে লেখক নবাগত, সে তুলনায় দু-একটি গল্প নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সুনিপুণ শব্দ প্রয়োগ অথবা আঙ্গিকের ঝকমকানী বিরল, সহজ সরলভাবে গল্পগুলি বর্ণিত হয়েছে, তবু মনে হয় গল্প বলার সাবলীল ভঙ্গী লেখকের সহজাত। উপযুক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ অচিরে না হোক, বিলম্বে হওয়াও বিচিত্র নয়। ১১৯।৫৩

অনুবাদ সাহিত্য

মা : ম্যাকসিম গর্কি। বাঙলা অনুবাদ (কিশোর সংস্করণ)। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টো-পাধ্যায় সম্পাদিত। র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২, টাকা।

গর্কির 'মাদার' (মা) উপন্যাসটির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাঙলা ভাষায় বহুকাল পূর্বেই এই উপন্যাসের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থটি খ্যাতনামা অনুবাদক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কিশোরদের উপযোগী করিয়া রচিত। বলা বাহুল্য, কিশোর কিশোরীদের হস্তে এই পুস্তকটি বিনা দ্বিধায় তুলিয়া দেওয়া যায়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ৫২৭।৫৩

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব সঞ্চয়ন—সম্পাদক শ্রীমৎ সিদ্ধানন্দ সরস্বতী। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২, টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির পরিচয়ে ইহার নামেই পাওয়া যায়। সাধক গ্রন্থকার গুরুগীতা, ছান্দোগ্য উপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, মনু-সংহিতা, যোগসূত্র, সাংখ্য প্রবচন সূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, পঞ্চদশী প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে গুরু মাহাত্ম্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আচার্য শঙ্কর, নানক, তুলসীদাস, জ্ঞানেশ্বর, রামদাস স্বামী, কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীমৎ লালদাস বাবাজী, ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের রচনা হইতে গুরু মাহাত্ম্য-পূর্ণ বচনাবলী এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ঠাকুর সত্যদেব, শ্রীমৎ সন্তদাস বাবাজী, শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংসদেব, এই সব মহাপুরুষ এবং আচার্যবর্গের গুরু-তত্ত্ব ব্যাখ্যামূলক বাণীতে গ্রন্থখানা বিভূষিত হইয়াছে। অধ্যাত্মরস পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সুন্দর। ৫৪৫।৫৩

ভাগবত-ধর্ম—স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র শিকদার কর্তৃক কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা, আসাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২, টাকা।

গ্রন্থকার বহু শ্রুত ব্যক্তি, বিশেষত তিনি একজন সাধক পুরুষ। আলোচ্য পুস্তকখানির পত্রে পত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ শাস্ত্র জ্ঞানের ও উচ্চ অধ্যাত্মানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যকে তিনি সোজা কথায় প্রকাশ করেন, অধিকন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্বপ্রকার সংস্কারবর্জিত এবং সার্বভৌম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী ভূমানন্দ জীর লেখা পড়িতে ভাল লাগে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার লেখায়, ধর্মের নামে আমাদের সমাজ-জীবনে গোড়ামী ভাঙ্গাইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জনের যে কারবার চলিতেছে, তাহার বলিষ্ঠ বিরুদ্ধতা ব্যক্ত হয় এবং উন্নত অধ্যাত্ম জীবনের প্রেরণায় অন্তর উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ভারত পুরাণকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। এজন্য স্বামীজী প্রথমেই ভাগবতের পরিচয় দিয়াছেন। দ্বাদশ স্কন্ধ মহা পুরাণের কোন স্কন্ধে কোন বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে ক্রমিকভাবে সাধ্য সাধনতত্ত্বের নির্দেশ আছে। বৈষ্ণবের সাধনাঙ্গ এবং আচার প্রভৃতিরও নির্দেশ এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। কারণ, দেখা যায় ভাগবত ধর্মের সাধ্য সাধন নির্ণয়ে সম্পর্কিত যে কয়েকটি অধ্যায় পুস্তকে আছে, গ্রন্থকার তাহার কোনটিতেই কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। মহামুনি বেদব্যাস বেদান্ত দর্শন এবং মহাভারত রচনা করিবার পর মনে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তখন দেবর্ষি নারদ আসিয়া তাঁহাকে ভগবান বাসুদেবের লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে উপদেশ প্রদান করেন। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনই ভাগবতের মূল উদ্দেশ্য। যোগ এবং জ্ঞান বেদান্ত দর্শনে যথেষ্টরূপেই আলোচিত হইয়াছে এবং মহা-ভারতে তৎসম্পর্কিত আধ্যাত্মিক সত্যের নির্দেশে বেদব্যাস ত্রুটি কিছুই রাখেন নাই। ত্রুটি ছিল শুধু শ্রীকৃষ্ণলীলার সবিস্তার বর্ণনার। ভাগবতে এই অভাবই পূরণ করিয়া বেদব্যাস কৃতার্থতা লাভ করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলার কীর্তনই ভাগবতের মুখ্য লক্ষ্য এবং তাহার তুলনায় অন্য সবই গৌণ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, স্বামীজী এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ভাগবত অর্থই শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা, তাঁহার মতে এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত এবং আমাদের দেশে অনেকের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল আছে বলিয়া তিনি দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত ধারণাটি ভ্রান্ত হইল কিরূপে তাহা আমাদের উপলব্ধিতে আসে না। মহামুনি

নারদের বাক্যেও ভ্রান্তি। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" ইহাই তো ভাগবতের নির্দেশ। ভাগবত ধর্ম বলিতে ভগবান্ সম্বন্ধীয় ধর্মই বুঝায়, গ্রন্থকার প্রারম্ভে একথা বলিয়া লইয়াছেন। ভগবানকে বাদ দিয়া ভাগবত ধর্ম, ইহাতে লোকে ধাঁধায় পড়িবে আশ্চর্য নয়।

গ্রন্থকার প্রকৃত প্রস্তাবে মায়াবাদের অনুগামী। তিনি জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতে ভক্তিরই প্রাধান্য পদে পদে পরিকীর্তিত হইয়াছে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও সে সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জ্ঞান যোগ বস্তুত সেই অধ্যায়েও প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। আবার ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, ধর্মাচরণের শেষ লক্ষ্য মুক্তি। কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও যাঁহার আছে, তিনিও জানেন [illegible], ভাগবতে মুক্তি, মোক্ষ বা নির্বাণকে তুচ্ছ [illegible] হইয়াছে।

'প্রণব মহামন্ত্র এবং বেদের নিধান'। [illegible] গ্রন্থকার [illegible] এই [illegible] মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এমন কথাই [illegible]। এই সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে [illegible] এই মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়া-[illegible], [illegible] শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] অক্ষরে ষোলটি নাম একত্র জপ ও [illegible] কীর্তন করিবার ব্যবস্থা দিলেন। [illegible] ইহাই চরম সীমা।" [illegible] বিস্তৃত আলোচনা এখানে অসম্ভব। [illegible] এইটুকুই বলিব যে, [illegible] এই অভিমত শাস্ত্রবিরোধী। [illegible] মতে ঐ মন্ত্রও মহামন্ত্র—অর্থাৎ [illegible] সমতুল্য, প্রভুর বিশেষ কৃপাশক্তিযুক্ত [illegible] প্রণবেই উপনীত হয়। মন্ত্রের ইহা [illegible] হয় নাই পরন্তু সমুন্নতি-সীমা। [illegible] ছাড়িয়া ভাগবতধর্মের সাধনা সম্ভব নয় [illegible] 'তত্ত্বরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার', [illegible] কৃষ্ণতনুসম', এ সত্য উপলব্ধিও [illegible] হইতে পারে না। অবশ্য যাঁর সেই মত [illegible] সার্বভৌম। ইহা সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা [illegible] ধর্মের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

৫০৭।৫৩

[illegible]ান বিজ্ঞান

ফ্রয়েড প্রসঙ্গে: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। [illegible] পাবলিশিং কোং, লিঃ, ১১বি, চৌরঙ্গী [illegible] কলিকাতা-২০। মূল্য দু টাকা [illegible] আনা।

মনোবিজ্ঞানজগতে মনস্বী ফ্রয়েডের দান [illegible]সীম। মানবমনের অজ্ঞাত গভীর [illegible] রহস্যোন্মোচনের চেষ্টা করে তিনি [illegible]জ্ঞানজগতে নতুন আলোকপাত [illegible]। আমাদের চিন্তাধারা, আচেতন ও [illegible] ব্যবহার সবই যে নির্জ্ঞানের [illegible] মেনে চলে এই বৈপ্লবিক সত্যই [illegible] মতবাদের মূলকথা। এ দেশে আর ও দেশে এই মতবাদ বোধ হয় সর্বাধিক আলোচিত। মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের ফলস্বরূপ অ্যাডলার ও জাং এই দু জন সুখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর মতবাদও মাঝে মাঝে ফ্রয়েডীয় মতবাদ বলে চলে এসেছে। মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে রোগনির্ণয়ও ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের অঙ্গ।

আলোচ্য গ্রন্থটি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা। ফ্রয়েডীয় মতবাদ আলোচনা সাপেক্ষ। ইদানীং বহু মনীষী গবেষণামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে ফ্রয়েড সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন। [illegible] যে সকল কিছুর উৎস এ বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থটি নিছক ফ্রয়েড-তত্ত্বের আলোচনা নয়, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সমালোচনার সমাবেশ।

প্রতিপাদ্য বিষয়, উপাত্ত ও উপনীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লেখকের সঙ্গে একমত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও, চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গি, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণী শক্তি, দুরূহ বিষয়ের স্বচ্ছ প্রতিপাদন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি শক্তির সাহায্যে প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ সুসমঞ্জসভাবে লিখিত।

ফ্রয়েডবাদের সঙ্গে সম্যক পরিচিত নন, এমন পাঠকের পক্ষে অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থটি সহজবোধ্য হওয়ার কথা নয়। মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র অথবা ফ্রয়েড, প্যাভলভ ও মার্কসবাদী [illegible] সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত এমন পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি আদরণীয় হবে, অন্যথা নয়।

১১৯।৫৩

বিবিধ

ডিসকভারী অব নিউ ওয়ার্লড বা নূতন জগৎ আবিষ্কার—[illegible] ওয়ার্লড [illegible] ইনস্টিটিউট অব ডিভাইন পাওয়ার, [illegible] কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান [illegible], ২৪এ, [illegible] রোড, কলিকাতা। সাধারণ সংস্করণ [illegible], শোভন সংস্করণ [illegible]।

পুস্তকখানির ভূমিকা হইতে জানা যায়, ইংরেজী ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে "ঐশী শক্তি বিশ্ব গবেষণাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ এবং তাহার [illegible] বর্ণনা করা হইয়াছে। মেটামুটি ভগবচ্চিন্তায় যুক্ত হইয়া সর্বপ্রকার স্বার্থ সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইলে, মানুষ ঐশী শক্তির সহিত যুক্ত হইতে পারে। সে অবস্থায় সে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং বিশ্ব ও বিশ্বাতীত অনেক রহস্য তাঁহার দৃষ্টিতে উন্মুক্ত হয়, গ্রন্থের ইহাই বক্তব্য। মানুষ এই পথ ছাড়িয়া যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় জগৎকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, এজন্য গ্রন্থকার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রস্তাবিত আদর্শানুসারে ভগবচ্চিন্তায় দেশ এবং জাতির কোন বিভেদ নাই, সকলে সর্বাবস্থাতেই তাহা করিতে পারেন এবং শক্তিরও অধিকারী হইতে পারেন। প্রতিষ্ঠান হইতে ইহার প্রণালী এবং কার্যক্রম প্রচার করা হইবে। এই গবেষণাগারে এবং এতৎসম্পর্কিত যাবতীয় কার্য পরিচালনার জন্য দক্ষিণ কলিকাতায় "লেকের ধারে ডিভাইন পাওয়ার হাউস" নামে একটি সুবৃহৎ চারতলা বাড়ী, সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হইবে।" এই প্রতিষ্ঠানের কাজে সাহায্য করিবার জন্য পুস্তকখানিতে বিশ্ববাসীর কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

৪৬১।৫৩

আলোচনা

রাজা রামমোহন রায় ও ইংরাজী শিক্ষা

মহাশয়,—সম্প্রতি আপনার পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায় ও ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করিয়া যে কয়টি প্রবন্ধ ও পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যেমন তথ্যমূলক তেমন যুক্তিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিতেছি।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে রাজা রামমোহন কেন উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই এই সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" শীর্ষক বক্তৃতায় (১লা জানুয়ারী—১৮৭৫—বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩৮) বলিয়াছেনঃ "হাইড্ ইস্ট সাহেব ও হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া ১৮১৬ সালের ১৪ই মে দিবসে কলিকাতার প্রধান ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন........রাজা রামমোহন সেই সময়ে ধর্মসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন...। তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবশত হিন্দুসমাজস্থ লোকেরা বলিয়াছিলেন, 'রামমোহন রায় ইহাতে থাকিলে আমরা থাকিব না।' তাহাতে মহামনা রামমোহন রায় স্বীয় মহত্ত্বগুণে বলিয়াছিলেন 'আমি থাকিলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে, তবে আমি ইহার সংস্রবে থাকিব না।'"

প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার ডেভিড হেয়ারের জীবনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন

"It was subsequently reported that Ram Mohun Roy would be connected with the college. The orthodox members, one and all said,—we will have nothing with the college. Sir Hyde East was in a fix and the whole plan was upset.

Hare bestirred himself in arranging with Rammohun Roy as to his having no connection with the college, and this secured the support of the orthodox Hindu gentlemen. There was no difficulty in getting Rammohun Roy to renounce his connection, as he valued the education of his countrymen more than the empty flourish of his name as a Committee-man".

(David Hare—১৮৭৭—পৃঃ ৬)।

কোলেট লিখিত রাজার জীবনীতে অনুরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছেঃ

"Rammohun feeling that his presence at the preliminary meeting might embarrass its deliberations, had generously abstained from attending it, but his name had been mentioned as one of the promoters. Rammohun Roy willingly allowed himself to be laid aside lest his active co-operation should mar the accomplishment of the project"—(২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৫)

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেনঃ "যখন এরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় তখন তিনি ইহার প্রতিবাদই করিয়াছিলেন।" এখানে "এরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র" বলিতে কোনটির উল্লেখ করিতেছেন জানি না। তিনি যখন কোন নাম করেন নাই এবং হিন্দু কলেজ প্রসঙ্গে এই উক্তি করিয়াছেন তখন অনুমান করা যায় তিনি ঐ কলেজের কথাই বলিতেছেন। আমরা দেখিয়াছি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তবে একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি আপত্তি তুলিয়াছিলেন। সে কলেজের সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। সরকার যখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের অনুশীলনের জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তখন রাজা রামমোহন ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁহার বিখ্যাত পত্রে তিনি বলিয়াছিলেনঃ—

"The Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness ......it will load the minds of youth and grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use."

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁহার এত উৎসাহ তিনি যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় এইরূপ আপত্তি তুলিবেন তাহা একান্ত স্বাভাবিক। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই পত্রখানি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"It was owing, perhaps to this agitation, that the foundation stone of the building intended for the Sanskrit college was laid in the name of the Hindu College (Feb. 1824) and the Hindu College was located their together with the Sanskrit College."

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮১৭ সালে। অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগের উপক্রমণিকা অংশে ষড়দর্শনের আলোচনায় রাজা রামমোহনের এই ঐতিহাসিক পত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রবর্তক তিনি স্বভাবতই প্রাচীন শিক্ষার নিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মনে হয় অনবধানবশত ডাঃ মজুমদার হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজ গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি এমন কোন নজির তাঁহার হস্তগত হইয়া থাকে যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি হিন্দু কলেজ বা ইংরাজী শিক্ষার জন্য পরিকল্পিত অন্য কোন কলেজ স্থাপনার ব্যাপারে কোন কারণে কোন সময়ে কোন আপত্তি তুলিয়াছিলেন তবে হইলে সেই নজিরের উল্লেখ করিতে ডাঃ মজুমদারকে অনুরোধ করিতেছি। এরূপ কোন নজির থাকিতে পারে এরূপ অনুমান করিবার অবশ্য কারণ নাই।

ডাঃ মজুমদার স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে সরকার পরিকল্পিত "স্বাধীনতার ইতিহাস" গ্রন্থের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করি তাঁহার ইতিহাসে বাঙালী চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারক সম্বন্ধে কোন নতুন মত প্রচারিত হইলে সেই মতের সমর্থনে নতুন নজিরের উল্লেখ থাকিবে। ইতি—শ্রীরবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, দিল্লী।

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহরু কলিকাতায় আসিয়া তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসসেবীদের নগর এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত।—"নগরের সেরা পাড়া চৌরঙ্গীতে কংগ্রেস ভবন এবং অদূরে ধেনুচরা খোলা মাঠ, এই দু'য়ের যোগাযোগেও যদি সম্বন্ধ পাকা না হয়ে থাকে তাহ'লে একবার ঘটকের শরণ নিয়ে দেখতে পারেন"—বলেন খুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু আরো বলিয়াছেন যে, ভারত নাকি বর্তমানে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে একটি বিশিষ্ট অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।—"কিন্তু ছায়াবাজি বা ছায়াচিত্রে অভিনয় মাতে না পারলে শুধু থেটারে কোন কাজ হলে ব'লে মনে হয় না"—মন্তব্য শ্যামলালের।

* * *

নেহরুজীর অন্য এক মন্তব্যে শুনিলাম — শুধু ম্যাজিকে

রাতারাতি ভারতের উন্নতি সাধন সম্ভব না।—"তাই আমরা ম্যাজিক ছেড়ে মাইক্ ধরেছি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

সাম্প্রতিক ছাত্রবিক্ষোভের প্রসঙ্গে জহরলালজী বলিয়াছেন যে, তিনি এখনও নিজকে ছাত্র বলিয়াই মনে করেন। জনৈক কিশোর ছাত্র সহযাত্রী মন্তব্য করিল—"উপরে মাস্টার মশাই না থাকলে এবং ঐ সঙ্গে পরীক্ষা না থাকলে নিজেকে ছাত্র মনে করা সহজ"!!—

* * *

নাগপুরের জনৈক মন্ত্রী মহাশয়ের গাড়ি একটি বাঘকে চাপা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম।—"রেগে গিয়ে কোলকাতার 'বাঘ' যাতে মানুষে চাপা না দেয় তার ব্যবস্থা হচ্ছে।" 'নিরাপত্তা এবং সৌজন্য সপ্তাহটা' হাসি-তামাসার আওতায় আসে না, তাই বলব, যারা পথ চলতে মনে করেন তাঁদের প্রাণ রক্ষার দায় মোটর চালকের তাঁরা এই শিক্ষায় উপকৃত হবেন। তবে মোটর-চালকদের সৌজন্য রক্ষা সত্যি একটু শক্ত, তাঁদের গাড়ির ধুলোয় সবচেয়ে আগে যে-বস্তুটি উড়ে যায় সেটি হ'লো সৌজন্য!!!

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, দেওরির সন্নিকটে কোন এক স্থানে নাকি প্রস্তরযুগের কতকগুলি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।—"কিন্তু পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা একটু চোখ খুলে পথ চললে দেখতে পাবেন প্রস্তরযুগের নিদর্শন পথে-ঘাটে ছড়ানো আছে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

শুনিলাম পশ্চিমবঙ্গের মাটির তলায় নাকি সোনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।—"তাই কোলকাতার মাটি আর

এখন কড়িটির দরে বিকোয় না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

লাহোরে পাক্-আমেরিকান সংস্কৃতি ও সাহিত্য সমিতি সংগঠিত হইয়াছে।—"এ সম্বন্ধে আমাদের বলবার এমন কী আছে, শুধু বলতে পারি, যেন ক্ষীরের সনে পাকা আমটি মানিয়েছে"—বলে শ্যামলাল।

* * *

জনাব সুরাবর্দী পাকিস্তানের মোল্লা-তন্ত্র সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছেন।—"কিন্তু এখন আর সে কথায় লাভ কী,

—আপনি মজিলে রাজা, মজাইলে কনক লঙ্কায়"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রাশ্যার জনৈক জেলে নাকি "চন্দ্র মৎস্য" নামক একটি অদ্ভুত মৎস্য ধরিয়াছে।—"এখানে রাশ্যানপন্থীরা মাছের বদলে গোটা চাঁদ ধরবার জন্যেই জাল বুনছেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

সংবাদে প্রকাশ, দেরাদুনের সন্নিকট কোন স্থানে নাকি কোন রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।—"নরমেধ যজ্ঞের ইটগুলোর সংরক্ষণের ব্যবস্থা হ'লে উত্তরাধিকারীরা উপকৃত হবেন"—বলে শ্যামলাল।

—শৌণ্ডিক—

ইতিহাসে চৈতন্য হোক

ইতিহাসকে আমাদের দেশে যেভাবে হেনস্তা করা হয়, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে চলা হয়, পৃথিবীর আর কোথাও তার তুলনা বিরল। সত্য মানেই ইতিহাস এবং ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটানো মানে সত্যেরই অপলাপ করা। আরও বড়ো অপরাধ হচ্ছে ঐতিহাসিক বাস্তবকে অলৌকিক কল্পনায় পর্যবসিত করা। ভারতীয় ছবিতে ইতিহাস পরিবেশনে এই প্রণালীই অবলম্বিত হয়ে এসেছে আবহমানকাল ধরে। অনুশীলন, পড়াশুনো, খোঁজ-খবর নেওয়ার ঝামেলা পোয়ানোর চেয়ে মস্তিষ্কের কারখানায় যদিচ্ছা কল্পনামাকু চালিয়ে দরকার মতো কিছু বুনে নিয়েই কাজ সারা হয়ে আসছে। ইতিহাসের সঙ্গে মিল রইলো কি না, সে কথা বিচার্য হয় না, মিল না রাখার মাত্রা অনুযায়ীই 'মৌলিক চিন্তা'র বাহাদুরীর মান নির্ধারিত হয়। একেবারে সাম্প্রতিক এর উদাহরণ শ্রীচৈতন্যের জীবনী বলে পরিবেশিত দু'খানি চলতি ছবি। এদের একখানি বাংলাতে—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য", আর অপরখানি হিন্দীতে—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু"। শ্রীচৈতন্য ধরারই মানুষ ছিলেন। খুব বেশি দিনের কথাও নয়, মাত্র ৬।৭ পুরুষ আগেকার ইতিহাস। তার জন্ম থেকে নির্বাণ পর্যন্ত জীবন-কালের ঘটনাবলী তৎকালীন আচার-বিচার, সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থা, সাজপোশাক আসবাব ইমারতের চেহারা সবেরই সঠিক বাস্তব বিবরণ পাওয়া দুঃসাধ্য নয়। মাত্র সাড়ে চার শো বছর আগেকার কথা। নবদ্বীপও দুর্গম স্থান নয়। কিন্তু ছবি দুখানি দেখলে কে মনে করবে সে কথা!

* * *

দুখানি ছবিতে দু' রকমের শ্রীচৈতন্যকে পাওয়া যাচ্ছে, অথচ নির্মাতারা দুজনেই দাবী করছেন তাঁরা সেই একই নবদ্বীপ-গৌরাঙ্গেরই কাহিনী অবলম্বন করে ছবি তুলেছেন। কিন্তু দেশের ছেলেমেয়েরা দেখবে ঃ দুটি ছবিতেই জগাই ও মাধাই আছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন চেহারার, ভিন্ন ভিন্ন আচরণ তাদের, তাদের গৌরাঙ্গ

"ট্যাক্সী ড্রাইভার" চিত্রে দেব আনন্দ ও শীলা রমানি

"রাসী ধোবান" চিত্রে অভী ভট্টাচার্য ও কামিনী কৌশল

অনুরক্ত হওয়ার কাহিনীও একেবারে আলাদা। দুটি ছবিতেই একজন করে নটি আছে, কিন্তু তাদের এক-একটিতে এক একরকমের ঘটনা। তান্ত্রিক রয়েছে একজন করে দুখানি ছবিতেই, কিন্তু এক ছবিতে একরকমভাবে, আর এক ছবিতে আরেক রকমভাবে। নিতাই বাঙলাতে একরকম, হিন্দীতে আরেক রকম। বাঙলাতে এক চণ্ডাল পরিবার গল্পের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে, হিন্দীতে তারা নেই। বাঙলাতে সাজপোশাক, আসবাব, ঘরবাড়ির চেহারা সেরকম, হিন্দীতে তা নয়। বাঙলায় চৈতন্য সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনের জন্য গৃহত্যাগের রাত্রে দেখা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে ঘরের স্নেহে বেঁধে রাখার চেষ্টায় নিজ হাতে তাঁকে সাজিয়ে দিলেন ফুল চন্দনে মনমতো করে; কিন্তু হিন্দীতে ঠিক তার উলটো; হিন্দীতে বিষ্ণুপ্রিয়াকেই ভোলাবার জন্য চৈতন্যদেবই নিজের হাতে তাকে সাজিয়ে দিলেন। এমনিধারা বাঙলা এবং হিন্দীর পরস্পরের মধ্যে আগাগোড়া সব বিপরীত ব্যাপার। অথচ জীবন-কাহিনী একই ব্যক্তির!

* * *

একই জীবনী ভিন্ন ভিন্ন ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে ওঠার কারণ, নির্মাতাদের কেউই বাস্তবের সত্যকে অনুসরণ করেন নি। বরং বলা যায়, বাস্তবকে পরিহার করে তাঁরা কল্পনামাকুর বুননদক্ষতার ওপরই নির্ভর করেছেন, যাতে অলৌকিকত্বের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে মানুষের সহজবিশ্বাস ও ভক্তিপ্রবণতাকে অভিভূত করে ফেলা যায়। চৈতন্যদেব অবতার বলে তাঁর জীবনকে পৌরাণিকের ধাপে তুলে যদিচ্ছা কল্পনা প্রয়োগ করার সুযোগ করে নেওয়া হয়েছে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন বাঙলাখানিতে—মৃত সন্তানের গৌরাঙ্গপদরেণু স্পর্শে পুনর্জীবন প্রাপ্তি; চৈতন্য বিষপান করতে মন্মথর কাছে পাত্র তুলেছেন, অপরদিক থেকে চৈতন্যকে হত্যা করার জন্য নিক্ষিপ্ত এক ব্যাধের অব্যর্থলক্ষ্য তীর চৈতন্যের অঙ্গে না লেগে বিষপাত্রটি চূর্ণ করে দিলে। তেমনি আবার হিন্দীতে কারাগারের দ্বার খুলে যাওয়া, শোকে মূর্ছিতা শচী-

'দুই বেয়াই'-এর বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধ ধীরাজ ভট্টাচার্যের ২৫ বছর আগে তোলা ছবি এটি নয়—রূপসজ্জা দক্ষতায় রূপান্তরিত ২৫ বছর বয়সের এই যুবক চেহারায় তিনি অভিনয় করছেন অমর মল্লিক পরিচালিত নির্মীয়মান ছবি শরৎচন্দ্রের "সতী"র নায়কের ভূমিকায়

মাতাকে নিমাইয়ের বেশে শ্রীকৃষ্ণের গৃহে পৌঁছে দেওয়া; জগাই মাধাইকে শাসন করার জন্য নিমাইয়ের সুদর্শনচক্র ধারণ; আলিঙ্গন করে তান্ত্রিকের রোগ নিরাময়; ইত্যাদি আরও কতো রকমের ঐন্দ্রজালিক ঘটনা। শ্রীচৈতন্যদেব অবতার ছিলেন, সুতরাং তাঁর জীবনে এমন সব অলৌকিক ইন্দ্রজালের রহস্য থাকতেই হবে এই মনে করেই গল্প ফাঁদা হয়েছে। অবশ্য কতক কতক এ ধরনের ঘটনা চৈতন্যদেবের জীবনী বর্ণনায় যে কয়েক শত চরিতকথা লিপিবদ্ধ আছে, তার অনেকের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব ঘটনা চরিতকথাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের অলঙ্কার হিসেবে কল্পনা থেকে গড়ে নিয়ে। বাস্তবে অমন সব ব্যাপার প্রকৃতই ঘটে না। শ্রীচৈতন্য বাস্তবেরই মানুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি এমন অতিমানবিক শক্তির পরিচয় দেন, যাতে তাঁকে সাধারণ মানুষের পদ থেকে তুলে অবতারের মর্যাদায় ভূষিত করে নেওয়া হয়েছে।

* * *

শ্রীচৈতন্যকে অবতার বলে জ্ঞান করা হয়, যেমন আজ লোকে মহাত্মা গান্ধীকে জ্ঞান করে। মহাত্মাজী অবশ্যই একজন অবতারই ছিলেন; তিনি অতিমানবিক শক্তির অনেক পরিচয় দিয়েছিলেন, যা আজকের তাজা ইতিহাস হয়ে সবায়েরই মনে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো অলৌকিক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন এ দৃষ্টান্ত নেই। অথচ এক শ্রেণীর লোক সে চেষ্টাও করছে। চীনেবাজারের এক ছবির দোকানে বেশ বড়ো রঙীন হাতে আঁকা একখানা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। ফুলে ফুলে শোভাময় একটি উদ্যানে শ্যামল ঘাসের ওপরে মহাত্মাজী উপবিষ্ট, কাঁধে তাঁর একটি তানপুরা, মুখে "রঘুপতি রাঘব" গান, আর তাঁর সামনে চুপটি করে বসে আছে শ্রীকৃষ্ণ নাড়ুগোপালের বেশে। চিত্রকর মানবাবতার মহাত্মাজীর জীবনীতে এমনিভাবে একটা অলৌকিকত্বের ভূষণ যোগ করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে ময়দানে একটা দৃশ্য চোখে পড়তো। কাঠের বাক্সের গায়ে বসানো চোঙায় লাগানো মোটা কাঁচের মধ্যে দিয়ে "দিল্লীকো লালকিল্লা দেখো, "আগ্রেকা তাজমহল দেখো, কাশী বিশ্বনাথ দেখো" ইত্যাদি দুনিয়ার বহু দ্রষ্টব্য জিনিস প্রত্যক্ষ করার "বায়স্কোপ খেল"-এর সাহায্যে মহাত্মাজীর জীবনকাহিনী দেখানো এবং শোনানো হতো হিন্দী গানের মধ্যে দিয়ে। গানের কথা সঠিক মনে নেই; তার দ্বারা এক একখানি ছবির অন্তর্গত ঘটনা বর্ণনা করা হতো। আর সে ঘটনা ও বর্ণনা এই রকম—মহাত্মাজী পুরুলিয়ার কুষ্ঠাশ্রমে গিয়ে রোগীদের স্পর্শ করতেই তারা রোগমুক্ত হয়ে গেলো; মাদ্রাজের মীনাক্ষী মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না শুনে মহাত্মাজী গিয়ে দাঁড়ালেন সামনে হাত জোড় করে; মন্দিরের দরজা বন্ধ, মুখে তাঁর রঘুপতি নাম, সে নামে দরজা আপনা হতেই খুলে গেল। আর রয়েছে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রের ওপরে মহাত্মাজী দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে তাঁর সেই হাসি আ

তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিদ্যুচ্ছটা নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে এবং সেই ছটা গিয়ে লাগছে ভারতের উপকূলত্যাগী একদল ব্রিটিশ সৈনিকের গায়ে। এমনিধারা আরও অনেকগুলি ছবির বর্ণনা রয়েছে। মহাত্মাজীকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক দেবতারূপে দেখাবার উদ্দেশ্যেই যে ঐ সহজবিশ্বাসী শৌখিক অমন ছবি ও গান রচনা করে নিয়েছে, সেটা বলাই বাহুল্য, কিন্তু বাস্তব ইতিহাস কি বলবে ঐ দেখে? মহাত্মাজী বাস্তবেরই মানুষ ছিলেন সেইটেই তাঁর জীবনের মাহাত্ম্য। তাঁর জীবনকে অলৌকিকত্বের ভূষণে সাজিয়ে তোলা মানে তাঁর বাস্তবের সেই স্বকীয় মাহাত্ম্যকে অস্বীকার করা। শ্রীচৈতন্যের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে ছবিখানিতে, তাতে নির্মাতাদের বিরুদ্ধে এমন অনুযোগ তোলা বোধহয় অহেতুক হবে না যে, তাঁরা সত্যিকারের ইতিহাসকে পরিহার করে কিম্বদন্তী ও মানুষের মনগড়া আলঙ্কারিক বিভূতি সম্বল করে তাঁর জীবনীর পরিকল্পনা করেছেন।

* * *

ইতিহাসকে অনুসরণ না করার একটা বিচিত্র যুক্তি বাঙলা ছবিখানির প্রচার-বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হচ্ছে। ছবিখানির প্রশস্তিসূত্রে ভাগবদাচার্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী এম এ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্যরত্ন বলছেন: "ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত জীবনকথা, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তা সহজেই অনুমেয়।" ভাগবদাচার্য গোস্বামী মহাশয় বিশিষ্ট বিদ্দ্বজ্জন বলেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু কে তাঁকে শেখালে যে, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে পরিস্ফুট করা যায় না? তিনি যে ছবির প্রশস্তি গাইছেন সে ছবিতে তা হয়নি বলেই তিনি অনুমান করে নিচ্ছেন, ঐতিহাসিক তথ্যমূলক জীবনকথা পরিস্ফুট করা কঠিন, এটা পণ্ডিত ব্যক্তির বিচার নয়। ব্যক্তিগতভাবে এ ছবি তাঁর ভালো লাগুক, সেটা কারুর কাছে আপত্তিকর হতে পারে না, কিন্তু তাঁর উক্তিতেই তিনি একরকম স্বীকারই করে নিচ্ছেন যে, ছবিখানি ঐতিহাসিক তথ্য মেনে চলেনি, কিন্তু তিনি সেটা ত্রুটি বলে জ্ঞান করছেন না। একেবারে হাতের কাছে সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেলেও তা ব্যবহার না করে তার বদলে কাল্পনিক কিছু সামনে তুলে ধরা ১৩৬০ সালে চলে না; কয়েক শ' বছর আগে চলতো ইতিহাসকে পৌরাণিকের আকৃতিতে পরিবেশন করা। এখন আর তা চলে না, এখন তা করতে যাওয়া সত্য ও বাস্তবকে বিকৃত ও জনসাধারণের সামনে থেকে অপসারিত করার অধিকার কারুর নেই।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল প্রায় তিন মাস হইতে চলিল ভারত-ভ্রমণ করিতেছে। এই তিন মাসের মধ্যে ইহারা ভারতের বহু স্থানে বিভিন্ন দলের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এমন কি এই পর্যন্ত এই দলের সহিত ভারতীয় বাছাই দলের দুইটি বেসরকারী টেস্ট ম্যাচও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরও এই দলের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে কাহারও কিছু জানিবার বা শুনিবার থাকিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল না। সেইজন্য সম্প্রতি বাঙলার ক্রীড়াসাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করিয়া জলযোগের পর এই দলের গঠনকারীকে দলের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলিতে দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য হইতে হইয়াছে। ইহার উক্তি শুনিয়া ক্রীড়া-সাংবাদিকগণের ধারণা কি হইয়াছে বলিতে পারি না তবে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ যথেষ্ট ঠাট্টা তামাসা করিবার খোরাক পাইয়াছেন ইহার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। কেহই যে ইহার উক্তির উপর কোনই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই ইহা বলাই বাহুল্য। একজনকে বলিতে শুনিয়াছি "কন্ট্রোল বোর্ড যে দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছেন ইহার পর ইহাকেই যে সকল দেনার জন্য দায়ী করিবেন—ইনি সাফাই না গাহিলে পরে যে "নাস্তানাবুদ" হইবেন।" অপর একজন বলিতেছেন "আরে তা নয়, ক্রিকেট খেলা যে কিছুই বোঝেনা ধরা পড়েছে এখন বিশেষজ্ঞ প্রমাণ কর্বার চেষ্টা করছেন।" অপর একজন বলিয়াছেন "চরম নির্বোধের পরিচয় দিয়াছেন—দু'মাস আগে বললে কিছু হতো না এখন সকলেই হাসছেন মাত্র।" এইরূপ অনেক কিছুই উক্তি আমাদের শুনিতে হইয়াছে। বোর্ডের বহু অর্থ ব্যয়ের পর যে দল গঠিত হইয়াছে ও যিনি তাহা সম্ভব করিয়াছেন তাহার পক্ষে কোন কিছু না বলাই উচিত ছিল। আমরা সত্যই ইহার জন্য দুঃখিত। খেলোয়াড়রা খেলিতে না পারিলে ইনি কি করিবেন? কলিকাতার ইডেন উদ্যানে রজত জয়ন্তী দল যে সুবিধা করিতে পারিবেন না এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।

রজত জয়ন্তী দলের খেলোয়াড়ের স্বদেশ যাত্রা

রজত জয়ন্তী দলের ব্যাটসম্যান এফ ক্লাপ স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইনি গ্লস্টারসায়ার ও ইংলণ্ডের একজন কৃতী ব্যাটসম্যান। কিন্তু তাহা স্বত্ত্বেও ভারত ভ্রমণকালে ইহাকে মাত্র ২টি খেলায় অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় ও দুইটি খেলাতেই ব্যাটিংয়ের চরম ব্যর্থতা প্রদর্শন করেন। ইহার চর্মরোগ দেখা দেওয়ায় দেশে ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। এই দলের অপর খেলোয়াড় ম্যাককননকেও খুব সম্ভব শীঘ্রই স্বদেশ অভিমুখে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। ইঁহার জামসেদপুরে খেলিবার সময় হাঁটুতে আঘাত লাগিয়াছে ও ডাক্তারগণ এক মাস বিশ্রাম করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ভ্রমণকারী দলের সকল খেলাও এক মাসের মধ্যেই শেষ হইবে। এইরূপ অবস্থায় দেশে ফেরৎ পাঠান ছাড়া উপায় নাই। ইহার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কৃতী ব্যাটসম্যান ফ্রাঙ্ক ওরেল ও বোলার রামাধীনও দেশের খেলার প্রয়োজনে শীঘ্রই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ইহাদের পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার গুগলী বোলার জ্যাক আইভার্সন ও ইংলণ্ডের কৃতী ব্যাটসম্যান ওয়ার্টকিন্স শীঘ্রই ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন। এইভাবে দলের খেলোয়াড়ের আসা যাওয়ার কথা পূর্বের কোন কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ সময় দেখা যায় নাই। সর্বাপেক্ষা যে বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে চিন্তিত করিতেছে তাহা হইল এই সকল খেলোয়াড়দের যাতায়াতের বিরাট খরচার কথা। এত অধিক ব্যয়বহুল খেলার ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। দেশের চরম আর্থিক দুর্গতির দিনে এইভাবে একজন বোলিংয়ে সফলতা লাভ করেন অপর বোলার ও আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিশেষ সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহা ছাড়া দলের খেলোয়াড়গণও এই পর্যন্ত কোন খেলাতেই অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ব্যাটিং বিষয় কোন কোন খেলোয়াড় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও দলগত হিসাবে এমন কিছুই করিতে পারেন নাই যাহার পর ইহাদের অভিনন্দিত বা "ধন্য ধন্য" বলিয়া প্রশংসা করিতে পারা যায়।

বিহার রাজ্যপাল দলের খেলা

জামসেদপুরে কীনান স্টেডিয়ামে রজত জয়ন্তী ও বিহার রাজ্যপাল দলের তিন দিন-ব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। খেলার সূচনায় বিহার রাজ্যপাল দল যেরূপ নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করেন তাহাতে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই। এইজন্যই আশঙ্কা হয় যে, এই রজত জয়ন্তী দল ভ্রমণের অবশিষ্ট কোন খেলাতেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা সত্যই বিস্ময়কর হইবে।

বিহার রাজ্য দলের নৈরাশ্যজনক সূচনা

বিহার রাজপাল দল বাঙলা, বিহার ও নিখিল ভারতীয় খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করিয়া মাত্র ১২৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। রামাধীন যিনি ভ্রমণের কোন খেলাতে কি ব্যাটিং কি বোলিং কোন বিষয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে সর্বপ্রথম এই বিহার রাজ্যপাল দলের বিরুদ্ধে মারাত্মক বোলিং করিতে দেখা যায়। ইহার সহিত বোলিংয়ে সফলতালাভ করেন অপর বোলার লোডার। রজত জয়ন্তী দল পরম উৎসাহে খেলা আরম্ভ করেন। সিম্পসন অল্প রানে আউট হইলেও মার্শাল ও ওমেট যেরূপভাবে খেলিতে আরম্ভ করেন তাহাতে দল বিরাট রান সংখ্যা সংগ্রহ করিবে ধারণা হয়। হঠাৎ সুঁটে ব্যানার্জির বল বিপর্যয় সৃষ্টি করে। ২৮২ রানে ইনিংস শেষ হয়। ১৫৫ রান পশ্চাতে পড়িয়া বিহার দল খেলা আরম্ভ করে। রজত জয়ন্তী দলের খেলোয়াড়দের পূর্বের মত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। ফলে বিহার রাজ্যপাল দল দ্বিতীয় ইনিংসে বেপরোয়াভাবে খেলিয়া ৭ উইকেটে ৩৪৬ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে। রজত জয়ন্তী দল পরে খেলিয়া মাত্র ৯৭ মিনিটে ৬ উইকেটে ১৩৫ রান করিলে খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। তবে শেষ সময় রজত জয়ন্তী দলের দ্রুত রান তুলিবার প্রচেষ্টা দর্শকগণের অনেকেরই উৎসাহের কারণ হয়। খেলার ফলাফলঃ

বিহার রাজ্যপাল দলের ১ম ইনিংসঃ—১২৭ রান। (ওমপ্রকাশ ৫৯ নট আউট, পি সেন ১৭, বি ফ্রাঙ্ক ১৮, গিরিধারী ১১, লোডার ৩৫ রানে ৩টি, রামাধীন ৫১ রানে ৪টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী দলের ১ম ইনিংসঃ—২৮২ রান (মার্শাল ৮৯, ওমেট ৭১, ওরেল ১৭, মিউলম্যান ২৭, রামাধীন ২৭ নট আউট। সুঁটে ব্যানার্জি ৩৯ রানে ৪টি, সনি পাণ্ডে ৩২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

বিহার রাজ্যপাল দলের ২য় ইনিংসঃ—৭ উই ৩৪৬ রান। (গিরিধারী ৮৭, ওমপ্রকাশ ৫৬, সুধীর দাস ২৬, উমরিগর ৬৬, ফ্রাঙ্ক ২১, সুঁটে ব্যানার্জি ২২, লোডার ৭৭ রানে ২টি, মার্শাল ৬৫ রানে ২টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী দলের ২য় ইনিংসঃ—৬ উই ১৩৫ রান (এমেট ৪২, ওরেল ২২, মার্শাল ২৪, সুব্বারাও ১০ নট আউট। উমরিগার ৫০ রানে ৩টি, সুঁটে ব্যানার্জি ৫৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

পূর্ব পাঞ্জাব ও সার্ভিসেস একাদশ

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় পূর্ব পাঞ্জাব দল প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী হইয়া সার্ভিসেস একাদশকে পরাজিত করিয়াছে।
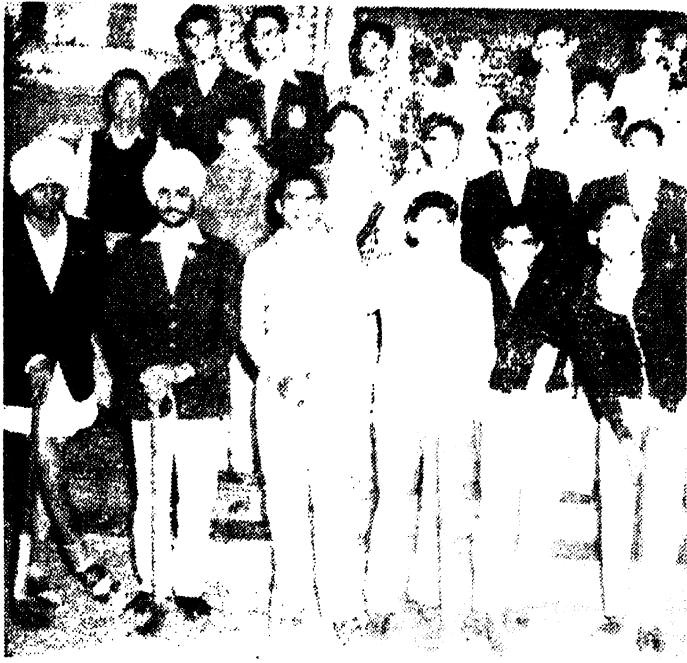
নিখিল ভারত স্কুল হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বাঙলার স্কুল হকি দলের খেলোয়াড়গণ

খেলায় উভয় দলের একজন করিয়া খেলোয়াড় শতাধিক রান করিয়াছেন। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:

সার্ভিসেস একাদশ ১ম ইনিংস ৩৪৫ রান (পি কি যোশী ১১৩, অধিকারী ৪৮, দেবরাজ ১৩৭ রানে ৪টি ও সতীশ নন্দী ৮০ রানে ২টি উইকেট পান।)

পূর্ব পাঞ্জাব ১ম ইনিংস:—৩৬৭ রান (পৃথিরাজ ১১৯, ওমপ্রকাশ কুমারিয়া ৮৫, বিনয় মেহেরা ৫৩, রাজেন্দ্রনাথ ৩৬, উইলিয়াম ঘোষ ৩১, ইকবাল করণ ৮২ রানে ৪টি ও সিংহ ১১৮ রানে ৪টি উইকেট পান।)

সার্ভিসেস একাদশ ২য় ইনিংস:—৫ উইঃ ১২৯ রান (সি গাদকারী ৫৫ রানে নট আউট, উইলিয়াম ঘোষ ৩১ রানে ৪টি উইকেট পান)।

পূর্ব পাঞ্জাব ২য় ইনিংস:—২ উই ৭৯ রান (উইলিয়াম ঘোষ ৩ রানে নট আউট)।

বাঙলা বনাম রজত জয়ন্তী দল

আগামী ২৬শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে বাঙলা বনাম রজত জয়ন্তী দলের তিন দিনব্যাপী খেলা আরম্ভ হইবে। উক্ত খেলায় বাঙলার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বেশ শক্তিশালী করিয়া দল গঠন করা হইয়াছে সত্য, তবে অধিনায়ক নির্বাচন আমরা সমর্থন করিতে পারিলাম না। যদি কোন ঘটনা ঘটে এই অধিনায়কের নির্বুদ্ধিতার জন্যই হইবে। দল পরিচালনা সম্পর্কে ইহার কোন জ্ঞান নাই। খেলোয়াড় নির্বাচকগণ ইহার কেন যে ইহাকে মনোনীত করিলেন বুঝিতে পারি না। নিম্নে বাঙলার মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল:

নির্মল চ্যাটার্জি (রাজস্থান) অধিনায়ক, এস ব্যানার্জি (ভবানীপুর), এন চৌধুরী (মোহনবাগান), প্রেমাংশু চ্যাটার্জি (মোহনবাগান), এস বসাক (মোহনবাগান), উইকেটরক্ষক, এস পি গুপ্ত (কালীঘাট), ডি এন মজুমদার (মোহনবাগান), পি বি দত্ত (কালীঘাট), পি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), শিবাজী বসু (মোহনবাগান), বি দাসগুপ্ত (এরিয়ান)।

দ্বাদশ—কে মিত্র (মোহনবাগান)।

অতিরিক্ত—এ ভট্টাচার্য (ইস্টবেঙ্গল), পি ভট্টাচার্য (মোহনবাগান) ও এ মজুমদার (এরিয়ান)।

ব্যাডমিণ্টন

বাঙলা দেশের ব্যাডমিণ্টন খেলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা চিরকালই ভাল ধারণা পোষণ করিয়াছি। বিশেষ করিয়া এই খেলা কয়েক বৎসর বিশেষ জনপ্রিয় হওয়ায় আমরা মনে মনে ধারণা করিয়াই লইয়াছিলাম যে শীঘ্রই বাঙলাকে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ক্রীড়াক্ষেত্রে শীর্ষস্থানে দেখিতে পাইব। কিন্তু সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান সিপের শেষভাগের খেলার সময় কতকগুলি তরুণ খেলোয়াড়কে উত্তেজিত হইয়া যে সকল কার্যকলাপ করিতে দেখিয়াছি, তাহাতে পূর্বের ধারণা পরিবর্তন করিতে একরূপ বাধ্য হইতেছি। সামান্য আম্পায়ারের ত্রুটিকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানকে পণ্ড করিবার জন্য খেলায় না যোগদান ও বাহিরে দলগঠন করা প্রভৃতি বিষয় অপর কেহ সমর্থন করিতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না। এইরূপ আচরণ প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ নহে ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। দলাদলি সৃষ্টিতে কেবল যে খেলার অবনতি হইবে তাহা নহে খেলার জনপ্রিয়তাও অনেক হ্রাস হইবে। এইজন্য আমাদের আন্তরিক অনুরোধ এই সকল খেলোয়াড়দের নিকট, তাঁহারাই যেন নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া মিটমাটের জন্য অগ্রসর হন। ইহাতে তাঁহাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইবে।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে বোম্বাই সাফল্যলাভ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর হইতেই বোম্বাই এই গৌরব অর্জন করিতেছে; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। তবে বাঙলার দল যে শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালে উন্নীত হইতে সক্ষম হইয়াছিল ইহা খুব সুখের বিষয়। ভবিষ্যতে তরুণ খেলোয়াড়গণ বাঙলার পক্ষ সমর্থন না করিলে ফলাফল আরও খারাপ হইবে। আমরা আশা করি, ইহা উপলব্ধি করিয়াই তরুণ খেলোয়াড়গণ এখন হইতেই মান সম্মান বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

হকি

বোম্বাই হকি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও উহার সহযোগে এইবার সর্বপ্রথম নিখিল ভারত স্কুল হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙলা দেশে এই সময় কেহই হকি খেলায় যোগদান করেন না। ইহা সত্ত্বেও বাঙলা দেশ হইতে একটি স্কুলদল যে বোম্বাইতে নিখিল ভারত স্কুল হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, ইহাতে পরিচালকদের প্রশংসা করিতে হয়। বাঙলার দল সাফল্য লাভ না করিলেও অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন ও ভবিষ্যতে বাঙলার সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিবেন, এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। স্কুলে হকি খেলায় বহুল প্রচার ব্যতিরেকে ভারতের বিশ্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত খেলোয়াড় দেশে সৃষ্টি হইতে পারে না।

দেশী সংবাদ

১৪ই ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ কলিকাতার এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিল্পপতি ও ব্যবসায়িবর্গকে তাঁহাদের 'প্রস্তরীভূত' অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়া সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে ভারতের ৩৫ কোটি নরনারীর সমস্যাসমূহ বিবেচনা করিবার আহ্বান জানান।

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এন সি চক্রবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা শ্রীঅনন্ত সিং, কুমারী রুবি সেন এবং আরও পাঁচজনকে সকল অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আবেদন অনুযায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র ব্যানার্জি রোডে একটি গহনার দোকানে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

পারদী ক্ষেত সত্যাগ্রহ সম্পর্কে ১১ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীঅশোক মেটাকে আজ যারবেদা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৫ই ডিসেম্বর—বাঙলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম ও তাঁহার পত্নী ইউরোপে ছয়মাসকাল অবস্থানের পর গতকল্য শেষ রাত্রিতে বিমানযোগে রোম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কবির আরোগ্যলাভের আশা ইউরোপের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভিয়েনার একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক কবিকে পরীক্ষা করিয়া এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার মস্তিষ্কের খিল্ শুকাইয়া গিয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর—বিশেষ বিবাহ বিলের ব্যাপারে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি নিয়োগের প্রশ্ন লইয়া লোকসভা ও রাজ্য পরিষদের মধ্যে যে অধিকারগত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্য লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কাটজুর যুক্তিপূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণের পর উহার অবসান ঘটে।

ভারতের বর্তমান কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল শ্রী ভি নরহরি রাওএর অবসর গ্রহণের পর শ্রীঅশোককুমার চন্দ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৭ই ডিসেম্বর—অকালী নেতা মাষ্টার তারা সিং আজ আমেদাবাদে ঘোষণা করেন, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য। আমি ভারত সরকারকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে অনুরোধ জানাইয়াছি; কারণ পাকিস্থানের অসদভিপ্রায় সম্পর্কে আমি কয়েকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। পাকিস্থান সরকার হিন্দুদের নিকট হইতে শিখদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে আলোচনার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—ভারতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সংশোধনের অনুরোধ জানাইয়া আজ লোক-সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে দেশে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

মালিক-শ্রমিক বিরোধ আইন অনুযায়ী সাংবাদিকদিগকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করিবার অনুরোধ জানাইয়া অদ্য লোকসভায় কংগ্রেসী সদস্য অধ্যাপক ডি সি শর্মা কর্তৃক উত্থাপিত এক বে-সরকারী প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মিশ্র এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির ফলে ভারত যদি নিরপেক্ষতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য।

১৯শে ডিসেম্বর—আজ খিদিরপুরে কংগ্রেস প্রভাবিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন ও বামপন্থী প্রভাবিত ডক মজদুর ইউনিয়ন এই উভয় ইউনিয়নের ডক শ্রমিকদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ হয় এবং উহা মিটাইতে গিয়া পুলিশ লাঠি ও গুলী চালায়। পুলিশের লাঠি চালনায় ও শ্রমিকদের সংঘর্ষে প্রায় ৬০ জন শ্রমিক আহত হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আগামী ২৩শে জানুয়ারী কল্যাণীতে কংগ্রেসের ৫৯ তম অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

২০শে ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

আজ শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর সম্মানার্থে 'অর্ঘ্যদান' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিল্পাচার্য বর্তমান বৎসরে ৭১ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন।

নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে কলিকাতার প্রেস রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের উপর পুলিশী নিপীড়ন সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রায়ে উল্লিখিত ১৪৪ ধারার ব্যাখ্যায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই ডিসেম্বর—অদ্য ভিয়েৎমিন সরকারী বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইন্দোচীন সংগ্রামের অবসান ঘটাইবার জন্য ফ্রান্স যদি উদ্যোগী হইয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে, তবে ভিয়েৎমিন নেতা হো-চি-মিন সে আলোচনায় যোগ দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

১৫ই ডিসেম্বর—লণ্ডনে এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষস্থিত সোভিয়েট দূত মঃ মেনসিকভ "আমেরিকা যদি পাকিস্থানকে অস্ত্রসজ্জিত করাই স্থির করে, তবে সহজ সর্তে ভারতের নিকট সামরিক দ্রব্য বিক্রয় সম্পর্কে আলোচনা প্রস্তাব ঘরোয়াভাবে উত্থাপন করিয়াছেন।

১৬ই ডিসেম্বর—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকমিশনের সভাপতি জেঃ থিমায়া আজ ঘোষণা করেন যে, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক বন্দিগণকে আটক রাখার ব্যাপারে যদি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রপুঞ্জ সেনা-কর্তৃপক্ষ একমত না হন, তবে ২২শে জানুয়ারী তারিখে আমি বন্দিগণকে মুক্তি দিব।

১৭ই ডিসেম্বর—মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্টের এক বিশেষ অধিবেশনে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সোভিয়েট বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রসচিব ও পুলিশ অধ্যক্ষ লাভরেন্তি বেরিয়ার বিচার হইবে। বেরিয়ার সহিত তাঁহার ছয়জন সহযোগীরও বিচার হইবে। ইঁহারা সকলে তাঁহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন। সকল আসামীর বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে।

পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী অদ্য করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থানের প্রস্তাবিত সামরিক চুক্তির কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "সামরিক সাহায্য সম্পর্কে আমাদের ঘরোয়া আলোচনা হইয়াছে মাত্র।"

২০শে ডিসেম্বর—করাচীস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের নিকট পাকিস্থানে প্রস্তাবিত মার্কিন ঘাঁটি সম্পর্কিত সোভিয়েট নোটের জবাব দেওয়া হইয়াছে। পাক সরকারের জবাবে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্থানের নিরাপত্তা বজায় রাখার সর্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন পাক সরকারের অবশ্য কর্তব্য।

প্রতি সংখ্যা—৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বলেন নাই; কিন্তু জীবিকার কথা বড় করিয়া না ভাবিয়া আদর্শকেই বড় করিয়া দেখিবার জন্য তিনি শিক্ষক-সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই আমরা মনে করি। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ গুরুগণের আদর্শ তৎকালীন সমাজের অর্থ-নীতিক প্রতিবেশের মধ্যে সুসমঞ্জস ছিল, বেখাপ্পা বস্তু ছিল না। কিন্তু বর্তমান ভারতের সমাজের কোন অংশের বৃত্তিই ভারতের প্রাচীন সেই ঐতিহ্যের রীতি বা আদর্শ অনুযায়ী উদ্‌যাপিত হইতেছে না এবং বাস্তবে তাহা সম্ভবও নয়। এরূপ অবস্থায় নিতান্তই গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান যাঁহাদের পক্ষে সমস্যা, সেই শিক্ষকদিগকেই প্রাচীন আদর্শের কথাটা এত বড় করিয়া স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পরন্তু সেই ধরণের যুক্তি এবং উক্তি পরিহাসের মতই শোনায়। ডাঃ কাটজু এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের জন-সাধারণ শিক্ষকদের অবস্থার প্রতিকার সাধন করিতে গভর্নমেণ্টকে বাধ্য করিবে। বাধ্য হইয়া না করিলে গভর্নমেণ্ট এ কাজটা করিবেন না, ইহাই কি তাঁহার বলিবার অভিপ্রায়? শিক্ষকদের জীবিকাগত সমস্যার সমাধান হইলে শিক্ষার আদর্শ উচ্চ হয় এবং দেশের উন্নতির পক্ষে তাহাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক রীতিতে পরিচালিত এবং জাতীয় স্বার্থে জাগ্রত গভর্নমেণ্ট যদি এই নিতান্ত সহজ সত্যটি এখনও উপলব্ধি না করিয়া থাকেন, তবে লজ্জার কথা বলিতে হইবে।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন

সম্প্রতি বহুপ্রতিশ্রুত এবং বহু-প্রত্যাশিত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্যবৃন্দের নাম ঘোষিত হইয়াছে। উড়িষ্যার রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল আলি মিশরের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার পানিক্কর এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু—এই তিনজনকে লইয়া কমিশন গঠিত হইয়াছে। সদস্যদের মধ্যে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর নাম সর্বজনবিদিত। সর্দার পানিক্কর পিকিংয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র-দূতরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনজন সদস্যের দুইজন সৈয়দ ফজল আলি ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু উত্তর প্রদেশের এবং সর্দার পানিক্কর ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের অধিবাসী। রাজ্য পুনর্গঠন এবং সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে দুইটি রাজ্যের কোনটিরই সম্পর্ক নাই। সদস্যদের নিরপেক্ষ বিচারে ইহা সহায়ক হইবে এই মনোভাব ইঁহাদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে কাজ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা প্রত্যেকেই উপযুক্ত ব্যক্তি এবং ইঁহাদের নিরপেক্ষতার সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। কমিশনের কার্যক্রম সম্বন্ধে ভারত সরকার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নির্দেশ করেন নাই। ইহাতে কমিশনের বিচার ক্ষেত্র ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। বস্তুত রাজ্য পুনর্গঠনে কমিশনের কোন হাত থাকিবে না, রাজ্য-গুলির পুনর্গঠন কিংবা সীমানার পরিবর্তনের যৌক্তিকতার সম্বন্ধে শুধু তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। বলা বাহুল্য এই কাজও খুব সহজ নয়। ইংরেজ শাসকেরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য-গুলি গঠন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি রাজ্য বলিতে জনসমষ্টির যে ভাষা বা সংস্কৃতিগত সংহতি বোঝায়, বিদেশী শাসকেরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য গঠনে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আদৌ প্রয়োজন বোধ করে নাই। পক্ষান্তরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই ঐক্য এবং সংহতির সূত্রকে তাহারা ছিন্ন করিয়াছে এবং নিতান্ত কৃত্রিম ভিত্তির উপর রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। বাঙলা দেশই এ পক্ষে বড় প্রমাণ। কংগ্রেস রাজ্য গঠনে ভাষা এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য ও সংহতি সাধনের নীতিকে বহু পূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সে সম্বন্ধে বিবেচনার ক্ষেত্রে ভারতের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য, শাসনগত সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নও বর্তমানে বিবেচ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সেসব বিচার-বিবেচনাকে একেবারে উপেক্ষা করিতেছি না; কিন্তু আমাদের মতে ভাষাকেই এই বিবেচনার মূল সূত্রস্বরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে বহু জটিলতা দেখা দিবে এবং বর্তমান ব্যবস্থাই শেষটা বজায় রাখা সমীচীন বলিয়াও মনে হইতে পারে। বস্তুত তদ্দ্বারা সমস্যার স্থায়ীভাবে সমাধান সম্ভব হইবে না।

উদ্ভট যুক্তি

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী ঘোষণা করিয়াছেন যে, শক্তিশালী পাকিস্থান পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুই সীমান্তে ভারতকে রক্ষা করিবে। সুতরাং পাকিস্থান যদি মার্কিনের সামরিক সাহায্য পাইয়া শক্তিশালী হয়, তবে ভারতের আপত্তি করিবার কি আছে, বরং তেমন চেষ্টা ভারতে সংবর্ধিত হওয়াই উচিত। বলা বাহুল্য, সম্প্রতি লোক-সভায় পাক-মার্কিন চুক্তি সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে, জনাব মহম্মদ আলীর উক্তি তাহারই প্রত্যুত্তর। বলা বাহুল্য, পাকিস্থান শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, ইহাতে ভারতের আপত্তি নাই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, প্রবল বিদেশী শক্তির তাঁবেদার হইয়া কোন্ রাষ্ট্র কবে শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে? বস্তুত কোন রাষ্ট্র বা জাতিকে শক্তিশালী করিবার নামে নিজেদের প্রভুত্ব সেখানে সম্প্রসারিত করা সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির প্রধান কৌশল এবং এই কৌশলে তাহারা সুদীর্ঘকাল সমগ্র এশিয়ায় শাসন এবং শোষণ সমভাবে চালাইয়াছে। মার্কিনকে মুখপাত্র করিয়া সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তিরা কূটনীতির সেই খেলার আসরে নূতন আকারে অবতীর্ণ হইতেছে। পাকিস্থানকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের এই উদ্যমে এশিয়ার সর্বত্র উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র এশিয়া, বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া পাকিস্থান শক্তিশালী হইবে, ইহা নিতান্তই উদ্ভট যুক্তি। বলা বাহুল্য, এ-পথে পাকিস্থান নিজের স্বাধীনতাই বিকাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। নিজের স্বাধীনতা এইভাবে বিপন্ন করিয়া পাকিস্থান ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিবে, জনাব মহম্মদ আলীর এমন যুক্তি নিতান্তই হাস্যকর।

আমার ছবিই আমার বাণী

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু গত ২রা ডিসেম্বর ৭১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২০শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন কলাভবনের 'নন্দন প্রাঙ্গণে' তাঁহার শিষ্য-শিষ্যারা ও অগণিত ভক্তবৃন্দ তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করেন।

সকাল সাড়ে সাতটায় আচার্য তাঁহার প্রথম যুগের তিনজন প্রিয় ছাত্র শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব-বর্মন সহযোগে উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র শঙ্খধ্বনি সহযোগে শিল্পাচার্যকে স্বাগত জানানো হয়। তাঁহার জন্য আলিম্পন-রেখায় সুসজ্জিত বেদীতে ধীরে ধীরে আরোহণ করিয়া তিনি স্মিতমুখে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহাকে মাল্যদানে বিভূষিত করা হয়।

আচার্য ক্ষিতিমোহন বেদমন্ত্র দিয়া শিল্পাচার্যকে সম্বর্ধনা জানান, "হে শিল্পের মহাসাধক, তোমাকে এই সম্বর্ধনায় আহ্বান করি। ও শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি॥ মানব তাহার শিল্প দিয়াই দেশবাসীর পূজা করে।"

সমগ্র পরিমণ্ডল শান্ত ও গম্ভীর; তিনি অতঃপর বলেন, "তুমি চিত্র, অর্থাৎ অপূর্ব। অপূর্ব রসসৃষ্টির দ্বারা নবপ্রাণরসে আমাদিগকে শক্তি ও গতি দান কর। তোমাকে আবাহন করি। সুদূর শিল্পলোকের অপার রহস্য লইয়া তোমার শিল্পসাধনা আমাদের মধ্যে সমাগত। এই চিত্র সাধনার অনন্তরূপ আমাদের চিত্ত চাহিয়া দেখুক। ......মানবজীবন রসে জীবন্ত, তোমার রূপ সৃষ্টি তখনও যেন আমাদের কাছে জরাগ্রস্ত পুরাতন মনে না হয়। তোমার দীপ্ত সাধনা কখনও যেন আমাদের কাছে মলিন বা জীর্ণ না হয়। ......আমাদিগকে সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত কর, সে বন্ধনপাশ উত্তমই হউক বা অধমই হউক। ...আমরা যেন ছন্দোময় হই। আমরা যেন সত্য হই।"

আচার্য ক্ষিতিমোহন বলেন, "হে শিল্পগুরু, তোমার মহনীয় তপস্যায় আমাদের চিত্তকে ভরিয়া দাও। আজি সুমহৎ আনন্দের মধ্যে আমাদের উদ্বুদ্ধ কর। আমাদের নবজন্ম হউক। আজ আমাদিগকে নবতর অপূর্ব কল্যাণতর রূপ দাও।"

অতঃপর আচার্য প্রার্থনা করেন, "আত্মানম্ নো নবং কৃধি॥ আত্মানম্ অভয়ং কৃধি॥ আত্মানম্ অমৃতং কৃধি॥ অর্থাৎ আজ আমাদের আত্মাকে নবীন করিয়া দাও। আজ আমাদের আত্মাকে অভয় করিয়া দাও। আজ আমাদের আত্মাকে অমৃত করিয়া দাও।"

আচার্য ক্ষিতিমোহনের ভাষণের পর শিল্পাচার্যের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীগণ তাঁহাকে একে একে অর্ঘ্য প্রদান করিতে থাকেন। প্রথমে ছাত্রীরা আসেন। তাঁহারা একে একে আসিয়া ফল, ফুল,
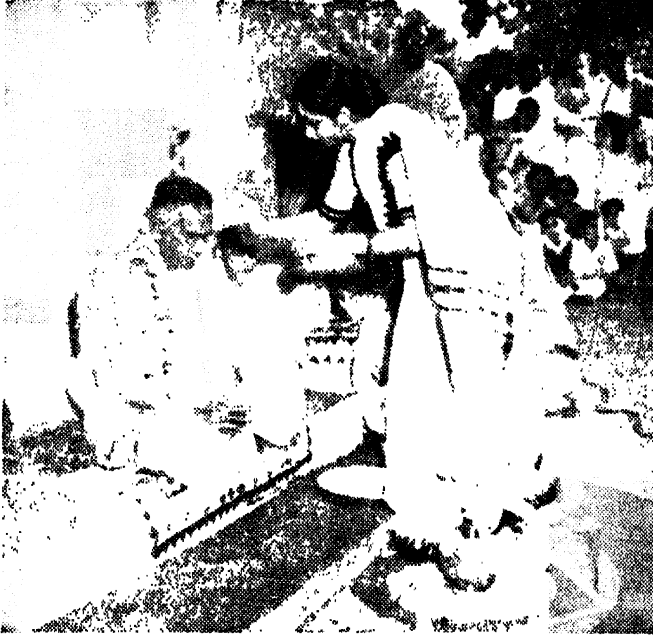
অর্ঘ্যদান উৎসবে জনৈকা ছাত্রী শিল্পাচার্যর ললাটে চন্দন লেপন করিতেছে

শিল্পাচার্যের প্রাক্তন ছাত্র এবং চারু ও কারু মহাবিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গুরুকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করিতেছেন

চন্দন, বস্ত্র এবং নিত্য ব্যবহার্য নানাবিধ দ্রব্যাদি 'মাস্টার মহাশয়ের' পদতলে রাখিয়া তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের পরে আসেন ছাত্রেরা। তাঁহারা এক একটি ফুল তাঁহার পদতলে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন।

অতঃপর স্বভাবকুণ্ঠ শিল্পাচার্য ধীরে ধীরে তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন। তিনি প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। অতঃপর বলেন,—

"আজ আপনাদের স্নেহ ও ভালবাসা পেয়ে বড় গৌরব ও আনন্দ বোধ করলাম। আমার সকল ছাত্র ও ছাত্রীকে শুভেচ্ছা স্নেহ ও ভালবাসা জানাচ্ছি। আশ্রমবাসী সকল গুরুজন ও সহকর্মীকে শ্রদ্ধা ও নমস্কার নিবেদন করছি।"

"শ্রীযুত উপাচার্য মহাশয় ও আশ্রমিক সঙ্ঘের সভ্যাদিগকে এই অর্ঘদান উৎসবের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

অনুষ্ঠান ক্ষেত্র হইতে শিল্পাচার্যকে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শনী গৃহে 'নন্দনে' লইয়া যাওয়া হয়। তিনি প্রদর্শনীটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবার সময় জনৈক দর্শক তাঁহার শিল্পিজীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি স্বভাবকুণ্ঠ চিত্তে বলেন,—'আমার ছবিই আমার বাণী।'

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে শিল্পাচার্যের গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা ও অনুরাগিবৃন্দ শান্তিনিকেতনে আসিয়া সমবেত হন। ছাত্রছাত্রীরা সুদূর দিল্লী, বোম্বাই, হায়দরাবাদ, নাগপুর, উড়িষ্যা, পাটনা এবং কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন।

আচার্যদেবের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান হইতে শুভেচ্ছা বাণী পাঠাইয়াছেন। তন্মধ্যে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণনও একটি বাণী পাঠাইয়াছেন।

আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় শিল্পাচার্য নন্দলালের অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে। কলিকাতার প্রদর্শনীতে প্রায় ২৫০টি চিত্র থাকিবে। মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুরূপ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে।

সম্প্রতি ইন্দোচীনে ভিয়েৎমিন বাহিনীর কাছ থেকে বেশ একটা বড়ো রকমের তাড়া খেয়ে ফরাসীদের অনেকখানি পিছে হঠে আসতে হয়েছে। লাও রাজ্যের থাকেক শহর এখন ভিয়েৎমিনের হাতে। দক্ষিণ-মুখে ধাবমান ভিয়েৎমিন বাহিনীর গতি-রোধ করার জন্য ফরাসীরা চেষ্টা করছে। যে-রকম অবস্থা হয়েছে তাতে অনেকে মনে করছিল যে হয়ত আমেরিকা সৈন্য পাঠাবে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে ইন্দোচীনে সৈন্য পাঠাবার কথা তাঁরা চিন্তা করছেন না। তবে চীনকে বার বার সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে চীন যেন ইন্দোচীনে ভিয়েৎমিনের সঙ্গে যোগ না দেয়। অবশ্য ইন্দোচীনে ফরাসী পক্ষের যুদ্ধের ব্যয়—মানুষ ছাড়া—আমেরিকাই অনেকখানি বহন করছে। ইন্দোচীনে এপক্ষের, অর্থাৎ লাও, কম্বোডিয়া প্রভৃতি রাজ্যের দেশী সৈন্য বাহিনীগুলি গড়ে তোলার সম্পূর্ণ খরচই এখন আমেরিকা দিচ্ছে। তবে আমেরিকা সহজে নিজ সৈন্য ইন্দোচীনে পাঠাবে না। যদি ইন্দোচীনের সম্পূর্ণ-রূপে কম্যুনিস্ট-কবলিত হওয়ার আশংকা উপস্থিত হয় তখন কী হবে বলা যায় না। তখনও পদাতিক সৈন্য না এনে প্রথমে বিমান বহরের প্রয়োগ হয়ত হবে।

কিছুদিন পূর্বে ভিয়েৎমিনের সঙ্গে একটা রফা নিষ্পত্তির কথা উঠেছিল। ডক্টর হো একজন সুইডিশ সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা বলেন তা থেকে অনেকের মনে হয়েছিল যে তাঁর সঙ্গে একটা রফা নিষ্পত্তি সম্ভব। ফ্রান্সের পক্ষেও ইন্দোচীনের যুদ্ধের ক্ষয় অসহনীয় হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। ফ্রান্স বুঝতে পারছে ইন্দোচীনে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে সে য়ুরোপে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, বিশেষ করে জার্মানী যখন আবার প্রবল হয়ে ওঠার উদ্যোগ করছে। কিন্তু ইন্দোচীন ছেড়ে আসতে সে পারছে না। সে পথে দুটি বড়ো অন্তরায়। একটা তো হোল ইন্দোচীনকে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব, যেটা ফ্রান্সের মিত্রগণ—আমেরিকা ও বৃটেন তার উপর ন্যস্ত করেছে। অপর বাধাটা হচ্ছে কতকগুলি কায়েমী স্বার্থের বাধা—সেগুলি কেবল চিরাচরিত ঔপনিবেশিক স্বার্থ নয়, তার সঙ্গে আর একটা স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যাদের পক্ষে যুদ্ধটাই নানাভাবে একটা অত্যন্ত লাভজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরাসী সরকারী মহলের উপর এদের প্রভাবও কম নয়। বলা বাহুল্য এদের দ্বারা দুর্নীতির প্রসার চলেছে।

* * *

কোরিয়ার যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা একটা নূতন সংকটে এসে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধবিরতির চুক্তির সর্তানুসারে স্বদেশ-প্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক বন্দীদের বুঝাবার সময়ের মেয়াদ ছিল ৯০ দিন। সেটা গত ২৩ ডিসেম্বর তারিখে শেষ হয়েছে। চুক্তিতে ছিল যে বুঝাবার পরেও যারা ফিরে যেতে চাইল না তাদের প্রশ্ন প্রস্তাবিত রাজনৈতিক কনফারেন্সে বিবেচিত হবে, সে বিবেচনার জন্য ৩০ দিন সময় নির্দিষ্ট ছিল। সেই ৩০ দিনের পরেও যারা স্বদেশ প্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক থাকবে তারা বেসামরিক নাগরিক বলে গণ্য হবে অর্থাৎ তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং যেখানে যেতে চায় তাকে সেখানে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে।

প্রকৃতপক্ষে কোনো সর্তই লেখা অনুযায়ী পালিত হয় নি এবং বাকীটুকু যে পালিত হবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। বুঝাবার জন্য যে ৯০ দিন ছিল তার মধ্যে দিন দশেক মাত্র বুঝাবার কাজে ব্যয়িত হয়েছে, বাকী দিনগুলি ঝগড়া-ঝাঁটি ও 'অচল-অবস্থায় কেটেছে। ২২ হাজার বন্দীকে বুঝাবার জন্য উপস্থিত করাই সম্ভব হয় নি। বলপ্রয়োগ করে উপস্থিত করার চেষ্টা ভারতীয় পাহারাদার ফৌজ করে নি। জোর করতে গেলে যে-হাঙ্গামা হোত তাতে বহু বন্দীর হতাহত হবার সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় পাহারাদার ফৌজ বলে, সে দায়িত্ব তারা নিতে পারে না যদি Neutral Nations Repatriation Commission সর্ব-সম্মতিক্রমে তাদের বলপ্রয়োগ করার অনুমতি না দেন। কিন্তু কমিশনের সুইডেন এবং সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা বলপ্রয়োগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এমনকি সুইটজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি একথাও বলেন যে বুঝাবার জায়গায় আনার জন্য বন্দীদের প্রতি বলপ্রয়োগ করার উদ্যোগ হলে সুইটজারল্যাণ্ড কমিশনেই আর থাকবে না। সুতরাং জোর করে বুঝাবার ব্যবস্থা হয় নি। অতি অল্পসংখ্যক বন্দীদের সম্বন্ধে বুঝানোর সর্ত অন্তত নামে প্রতিপালিত হয়েছে।

এখন বাকীদের নিয়ে কী করা? যে-রাজনৈতিক কনফারেন্স হবার কথা তার তো কোনো উদ্দেশ নেই। ২৩এ জানুয়ারীর মধ্যে যে রাজনৈতিক কনফারেন্স সম্মিলিত হয়ে এই প্রশ্নে হাত দিতে পারবে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আদৌ রাজনৈতিক কনফারেন্স হবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। চীনা ও উত্তর কোরিয়ান পক্ষ বলছে, বন্দীদের বুঝাবার সময় বাড়িয়ে দিতে হবে। তারা বলছে, বুঝাবার জন্য গুণে গুণে ৯০ দিন চাই অর্থাৎ যে-দিনগুলি বুঝাবার কাজে ব্যয়িত হয়েছে কেবল সেই-গুলিকেই গুণে ৯০ দিন করতে হবে। ইউ-এন পক্ষ এ ব্যাখ্যায় রাজী নয়। তাদের বক্তব্য, এই রকম ধরলে কম্যুনিস্টরা টালবাহানা করে দেরী করিয়ে দিয়ে অনির্দিষ্টকাল বন্দীদের মুক্তিদানে বাধা দেবে, ব্যাখ্যা-কালের প্রথম দিকে কম্যুনিস্ট পক্ষ বাজে ওজর তুলে অনেক-দিন নষ্ট করেছে, ইত্যাদি। ইউ-এন পক্ষের মতে যে-সব বন্দীরা ব্যাখ্যা শুনতে উপস্থিত হয় নি তারা স্বদেশে ফিরতে চায় না বলে মনস্থির করেছে।

আরো মুশকিল হয়েছে এই যে, Neutral Nations Repatriation

Commissionই দুভাগ হয়ে গিয়েছে। গত তিন মাসের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কমিশন সর্বসম্মত কোনো রিপোর্ট দিতে পারেন নি। দুই দিকের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট কমিশন যে 'সরকারী' রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে পোল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিগণ এবং চেয়ারম্যান হিসাবে ভারতীয় প্রতিনিধি সই করেছেন, সুইডেন ও সুইটজারল্যান্ডের প্রতিনিধিরা তাতে সই করেন নি, তাঁরা আলাদা একটা রিপোর্ট দিয়েছেন। সরকারী রিপোর্টের একটা গুরুতর কথা হচ্ছে এই যে ইউ-এন-ধৃত বন্দীদের শিবিরে এরূপ সংগঠনের প্রমাণ পাওয়া গেছে যাতে বুঝা যায় যে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে বন্দীদের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ মোটেই বাধাহীন নয়। এই সংগঠনের মূলসূত্র রী সরকারের হাতে বলে সরকারী রিপোর্টের সিদ্ধান্ত। সুইডেন ও সুইটজারল্যান্ডের প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ এখন পর্যন্ত এদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি, তবে এঁরা নাকি বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিবার পক্ষপাতী ছিলেন, অতীত ঘটনার বিষয়ে খুঁটিনাটি বিচারের মধ্যে যেতে চান নি। যাই হোক দুই সামরিক পক্ষের নিকট দুই রিপোর্ট পৌঁচেছে। কমিশন উভয় পক্ষকে বন্দীদের বিষয়ে বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছেন কিন্তু বর্তমান অবস্থায় দুই পক্ষ যে একমত হয়ে কিছু করবেন এ আশা নেই। কমিশনও যে একমত হয়ে কোনো নির্দেশ দিতে পারবেন সে ভরসাও নেই। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধি হলেন কমিশনের চেয়ারম্যান, তাঁকে একটা পথ নিতেই হবে।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভারতীয় পাহারাদার ফৌজ কোরিয়ায় থাকতে পারে না এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দীদের হেফাজতে রাখার চেষ্টা হলে যে-হাঙ্গামা উপস্থিত হবে ভারতের পক্ষে সেটা ঘাড়ে নেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠতে পারে না। সুতরাং ২৩এ জানুয়ারীর মধ্যে হয় দুই পক্ষ একমত হয়ে বাকী বন্দীদের সম্বন্ধে কোনো একটা ব্যবস্থা করতে কমিশনকে সাহায্য করবে অথবা কমিশনের ভারতীয় চেয়ারম্যানকেই যথাকর্তব্য স্থির করতে হবে। তবে এটা বুঝা যাচ্ছে যে উভয় পক্ষের সম্মতি ছাড়া ২৩এ জানুয়ারীর পরে ভারতীয় পাহারাদার ফৌজ বন্দীদের হেফাজতের কাজ করতে স্বীকৃত হবে না। কিন্তু কোরিয়ায় উভয় পক্ষ যদি একমত না হয় তবে ছেড়ে আসাও মুশকিল আছে। ছেড়ে আসতে হলে যার যার ধৃত বন্দীদের তার তার হাতে দিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। তার ফলে ইউ-এন পক্ষ যা চায় তাই হবে অর্থাৎ ২৩এ জানুয়ারীর পরে ইউ-এন-ধৃত ২২ হাজার বন্দী ফিরে যেতে অনিচ্ছুক বলে ছাড়া পাবে। চীনা ও উত্তর কোরিয়ান পক্ষ তাতে ভীষণ চটবে এবং ভারতীয় প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত কমিশনের পূর্বোল্লিখিত সরকারী রিপোর্ট প্রকাশের পরে তাদের রাগটা অনেকের কাছেই অন্যায় বলে মনে হবে না। সুতরাং ভারতবর্ষের এখন উভয়সংকট। এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার অবশিষ্ট উপায় হচ্ছে ইউ-এন জেনারেল এ্যাসেম্বলী ডাকিয়ে তার কাছ থেকে নির্দেশ চাওয়া। সেই চেষ্টাই এখন হচ্ছে।

৩০।১২।৫৩

গাংচিল

অরুণকুমার সরকার

'হাজার শহর আছে পৃথিবীতে;
সাবধান।
হাজার শহর আছে পৃথিবীতে,
পুরোপুরি হাজার শহর',
হুঁশিয়ার ক'রে দিল মর্মরনির্মিত এক
উদ্যান-বালক।

'এবং যন্ত্রণা যাকে কেউ না করুণা ক'রে থাকে
এবং নিঃসঙ্গ যত যাদুকর আছে সেইখানে,
এবং মানবকণ্ঠ পাখি আছে,
এবং প্রেমিক যত ক্লান্তরুগ্ন হ'য়ে গেছে প্রেমে,
এবং গাংচিল সেই গাংচিল
সেই গাংচিল তীব্র হিংস্র উন্মাদ।'

(পিটার ভাইরেকের ইংরিজি থেকে)

বিশ্বভারতীর সমাবর্ত্তন উৎসবের ভাষণ

শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ

শ্রদ্ধেয় উপাচার্যদেব, মাননীয় সদস্যবৃন্দ ও আশ্রমবাসী গুরুজন ও বন্ধুমণ্ডলী—

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন সভায় অভিভাষণ দেবার যোগ্যতা আমার নেই সে কথা জানি এবং মানি। কিন্তু আশ্রমের দাবীকেও অস্বীকার করতে পারি নে। সুতরাং ডাক যখন এল, তখন সাড়া না দিয়ে থাকা গেল না। শিষ্টাচার সম্মত বিনয়ের আধিক্য নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কেবলমাত্র এইটুকু স্বীকার করে নিই যে, এই সমাবর্তন সভায় আমাকে আহ্বান করে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষগণ, প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রীদের বিশেষরূপে সম্মানিত ও উৎসাহিত করেছেন। এর জন্য তাঁদের তরফ থেকে ও আমার নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বপ্রথমে ভগবানের নাম নিয়ে ও গুরুদেবের পুণ্য স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, গুরুজন যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের উদ্দেশে, এবং যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের প্রণতি জানিয়ে, আজকের দিনের কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হই। আশ্রমদেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন ও অনুকূল হউন এবং আমাদের আশীর্বাদ করুন।

গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে যেতে যেতে দেখতে পাওয়া যায় মাঝে মাঝে প্রস্তর স্তম্ভ। তাতে লেখা থাকে কত মাইল পথ পেরিয়ে এসেছে এবং সামনের বড় শহরে পৌঁছতে আর কত মাইল বাকি আছে। শ্রান্ত পথিক, এইরকম স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে একবার পেছন ফিরে দেখে, এবং তারপর সামনের দিকে তাকায়। ভাল করে বুঝে নেয় যে, সে ঠিক পথে চলেছে কি না। যদি পথ ভুলে থাকে, তবে তাকে ফিরে গিয়ে, ঠিক পথ ধরে নিতে হয়। মানুষের জীবনযাত্রার পথেও, এইরকম স্তম্ভের মত দেখা দেয় তার জন্মদিনগুলি। সেইদিনটিতে মানুষ একটু থামে, এবং পেছন ফিরে দেখে কতটা পথ পার হয়ে সে এলো—ঠিক পথ ধরে সে চলেছে কি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তনদিবস এইরকম একটি ফিরে তাকবার এবং বিশ্রাম নিয়ে আবার সামনে চলা শুরু করবার দিন। আজকে আমরা বিশ্বভারতীর এইরকম একটি দিনে এসে দাঁড়িয়েছি।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তনসভা আমরা করে থাকি, প্রত্যেক বছর আশ্রমের পৌষ উৎসবের মধ্যে। মহর্ষিদেবের ধর্মজীবনের
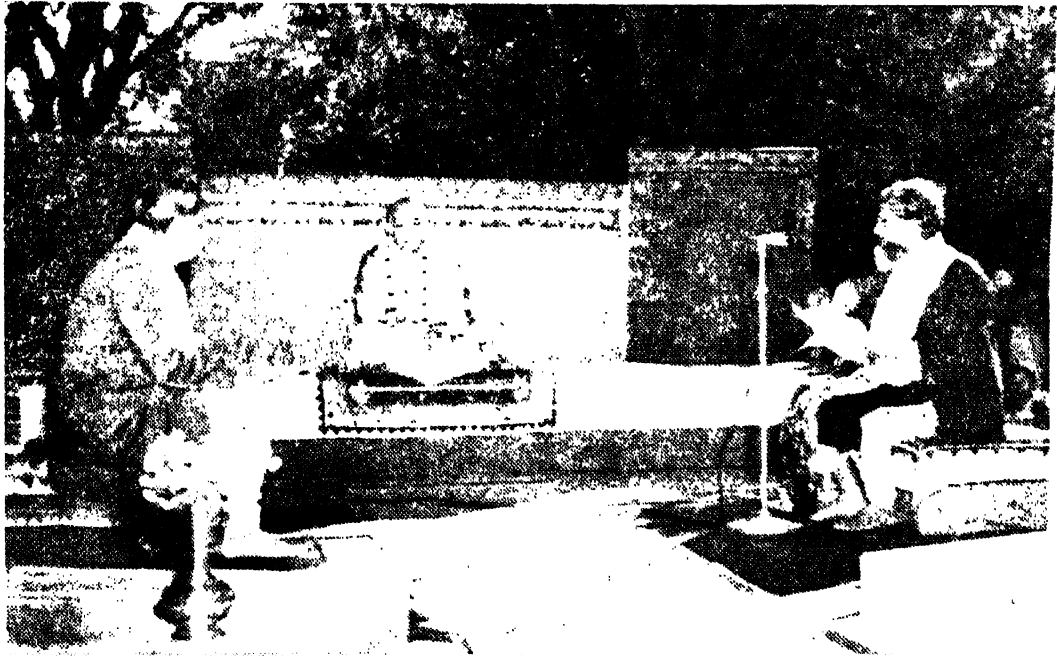
বিশ্বভারতীর সমাবর্তন সভায় মধ্যে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ। দক্ষিণে উপাচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন বামে রেজিস্ট্রার শ্রীনিশিকান্ত সেন

উপাধিপ্রাপ্ত বিদেশী স্নাতককে প্রধান অতিথি চন্দনলেপনে অভিষিক্ত করিতেছেন

সঙ্গে এই পৌষ উৎসব জড়িত। এই শান্তি নিকেতন আশ্রম সেই ধর্মনিষ্ঠ মহাপুরুষের সাধনার ক্ষেত্র। সেই পুণ্য-ক্ষেত্রে গুরুদেব রোপণ করেছিলেন একটি সতেজ বীজ, যা প্রথমে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল একটি ছোট ব্রহ্মবিদ্যালয়ের রূপ নিয়ে। তারপর গুরুদেবের নিরন্তর যত্নে সেটি পল্লবিত হয়ে বেড়ে উঠলো—বিশ্ব-ভারতীর প্রতিষ্ঠা হলো 'শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্'এর নাম নিয়ে। গুরুদেব যে আদর্শের পরে একে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আজকের দিনে ভাববার কথা, তার থেকে এ কোনোরকমে বিচ্যুত হয়ে গেছে কিনা,—একে আমরা আমাদের সেবাদ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি কিনা, না, তাতে জরা এসে ছুঁয়েছে। কী সে ছিল, কী সে হয়েছে, এবং কী তার হতে হবে—এই হচ্ছে সমাবর্তন দিনের ভাবনার প্রধান বিষয়বস্তু।

আজকে আমরা যাকে বিশ্বভারতী-রূপে দেখছি, তাকে ভাল করে বুঝতে গেলে, তার আরম্ভ কোন্ জায়গায়, এবং তার প্রাণউৎসের উৎপত্তি কোনখানে গোপনে নিহিত আছে তা জানার নিতান্তই প্রয়োজন আছে। আজকের দিনে সেই কথাই বলবার বাসনা করি।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে গুরুদেব এইখানে একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি সাধারণ স্কুল খুলবার তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, কেন না সেরকম স্কুল ত শহরে অনেকই ছিল। সেরকম স্কুলের সম্বন্ধে গুরুদেবের মনে এতটুকুও যে আস্থা ছিল না, তা তাঁর লেখা থেকে সম্যক জানা যায়। 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে তিনি লিখে গেছেন,—

> "ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন—ছাত্ররা দুই চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ী ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপর মার্কা পড়িয়া যায়।"

বোর্ডিং স্কুল তাঁর মনে বিভীষিকা এনে দিত। তিনি লিখেছেন—

> "বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে, তাহা বোর্ডিং ইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে, তাহা মনোহর নয়,—তাহা বারিক, পাগলা গারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্টিভুক্ত।"

তিনি চেয়েছিলেন এমন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে প্রকৃতির কোলে, সুকুমারমতি বালকদের শরীর মন পুষ্ট হবে, এবং তারা প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারবে। তাই বলেছেন,—

> "বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনি তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে, সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলি দ্বারা উদ্ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন, তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতা শাখাপল্লবিত নাট্যশালায়, ছয় অঙ্কে, ছয় ঋতুর নানা রসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয়, তাহাদের সামনে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক নববর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজল নিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দ গর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপর আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে, এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানাবর্ণে বিচিত্র দিগন্তব্যাপী শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও।"

পরে বলেছেন

> "তাই আমি বলিতেছি শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান ও গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক, এই শিক্ষা নিয়মের

উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ এ নিয়ম মানব চরিত্রে নিত্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

সাধারণ ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের বিদ্যা বেচার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে, পরে আদর্শ শিক্ষকের এই ছবি তিনি এঁকে গেছেন,—

"এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়। তাঁহার স্নেহের দ্বারা, তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরব লাভ করিতে পারেন—তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত, সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তি গ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশী দিয়া আপন কর্মকে মহিমান্বিত করেন।"

এই রকম মহান্ আদর্শ নিয়ে শহরের কল-কোলাহলের বাইরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের নির্জন ও অবারিত প্রান্তরে, গুরুদেব ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কেন না,

"যেখানে নিত্যই উপাসনা হয়, সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি, যেখানে যোগসাধন হয়, যেখানে একাগ্রের সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তি লাভ করি; যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান, সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক, আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি, কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।"

তপোবনের গুরুগৃহের যে ছবি গুরুদেব মানসক্ষেত্রে দেখেছিলেন, তারই অনুরূপে এইখানে তিনি একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

যতদূর স্মরণ আছে, ১৯০৫ সালে, অত্যন্ত বালক বয়সে এসেছিলাম এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে। তখন নীচুবাংলা, দেহলী, মন্দির, দোতালা বাড়ী, পশ্চিমে ছাতিম তলায় উপাসনা বেদী, দক্ষিণে টালির দোচালা লম্বা ঘর, যাকে এখন আমরা প্রাক্‌কুটীর বলি, আর তারই পশ্চিমে একতালা পাকা ঘর, যেখানে ছিল গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগার, তারপর মস্তবড় টিনের খাবার ঘর ও আর দু'একখানা চালাঘর—এ ছাড়া আর কিছু ছিল বলে মনে পড়ে না। তখন চারিদিকে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর—বাড়ীঘরদুয়ারে তখন দৃষ্টি অবরুদ্ধ হোতো না। ভোরের বেলা পূবদিকে চাইলে দেখতে পাওয়া যেতো রেল-লাইনের ঢিবির উপরকার তালগাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যোদয়ের সোনার আভা। ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পশ্চিম-দিগন্তে অস্তমান সূর্যের রক্তিম গোলকের গায়ে গৃহাভিমুখী রাখাল ও তার গরুর চলন্ত কালো ছায়াছবি। তখন সুরুলের বন ঝাপসা করে বৃষ্টি চলে আসতো যেন হেঁটে হেঁটে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে ভিজেমাটির গন্ধ বহন করে। প্রাক্‌-কুটীরের সামনের শালবীথিতে ঝড় দোলা দিত ঝোঁকে ঝোঁকে। কোপাইনদীতে যখন বান ডাকতো, তখন কেয়াফুলের গন্ধ ভেসে আসতো বর্ষার জলো হাওয়ার সংগে মিশে। ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা ও নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যেতো শরৎকালের সারা দিনমান। সে সময় আশ্রমের জীবনযাত্রা সরল ও সহজ ছিল—সাদাসিধে ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে আমরা বাস করতাম। রোদে, বৃষ্টিতে আমাদের শরীর সতেজ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতো। ঋতু উৎসবের আনন্দ আমাদের হৃদয়কে নিঃশব্দে ও অলক্ষিতে প্রশস্ত করেছে এবং আমাদের মনকে বিদ্যাগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছে। এখানে তখন উপনিষদের মন্ত্রসকল শ্রদ্ধার সংগে উচ্চারিত হোতো। সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান করে, পট্টবস্ত্র পরে আমরা বসতাম উপাসনায়। উপাসনার তাৎপর্য, কি মানে, কিছুই তখন বুঝিনি। কম্বলের আসনে বসে দু'একটা কাঁকর যে কাঠবিড়ালীকে লক্ষ্য করে মারিনি, তাও বলতে পারিনে। কিন্তু চুপ করে বসবার একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছিল—তারও যে কোন মূল্য নেই,

সমাবর্তন সভায় উপাধিপ্রাপ্ত স্নাতকদের সমাবেশ

গুরুদেব আমাদের পরেই দিয়ে গেছেন। আমাদের স্বীকার করতেই হ'বে যে, আমরা সে কর্তব্য পালন করতে পারিনি। কেন পারিনি, কার দোষে পারিনি, সে কথার আলোচনায় কোনো ফল হ'বে না। আজকে বিশ্বভারতীর সামনে নানা জটিল সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। মনে মনে অনুভব করছি যে, একটা সংকটময় অমঙ্গল আমাদের দিকে আসছে। সে যেন আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তুলেছে। এই সমস্যার মীমাংসা, এ বিরোধের প্রতিকার এবং এই অমঙ্গল নিবারণ আমাদের করতেই হ'বে, বিশ্বভারতীকে বাঁচিয়ে রাখতেই হ'বে। আজকে যে সমস্যা উঠেছে, তর্কে তার মীমাংসা হ'বে না, ভোটের জোরে তার নিষ্পত্তি হ'বে না। বিশ্বভারতী যেন ভোটের ব্যাপারে পর্যবসিত না হয়। ভগবান আমাদের সে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। এখন প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা, ত্যাগ ও কল্যাণ সাধনা ও নিজেদের মধ্যে ঐক্য, শুধু কথায় নয়, মনে প্রাণে এবং কর্মে। বিশ্বভারতী তোমার আমার চেয়ে অনেক বড়, এ সত্য যেন কখনো না ভুলি। আত্মকলহে একে যেন খর্ব না করি। যে মহান ঐশ্বর্য গুরুদেব আমাদের দিয়ে গেছেন, তাকে আমরা যেন না হারাই, ছোটখাটো মিথ্যা আত্মাভিমানের কুহক প্ররোচনায়। ভগবান আমাদের শুভবুদ্ধি দিন, ও বাহিরের বিপদ এবং আত্মবিরোধের সংকট হতে আমাদের সর্বদা রক্ষা করুন। আশ্রম দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাদের আশীর্বাদ করুন- আজকে সমাবর্তন সভায় একান্ত মনে ইহাই কামনা করি।

বাংলার প্রেম শিল্পী শ্রীরামদাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

সংবাদপত্রের দুন্দুভিনাদে যাঁর প্রতিষ্ঠা হয়নি, রাজনীতির জুয়াখেলায় যাঁর সাধনা ছিল না, জীবনের ঘটনা বাহুল্যে যাঁর প্রশস্তি রচনা হয়নি, ধার্মিক সম্প্রদায়ের বাদপ্রতিবাদে যাঁর প্রতিপক্ষ নাই, সামাজিক মর্যাদালাভের আসর জমান বৈভব যাঁর কাছে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ করেনি সেই পুরুষপ্রবর আজ কোন্ শক্তির প্রভাবে অসংখ্য নরনারীর নয়নজলে স্নাত ও দীপ্ত?

আজ থেকে সাতাত্তর বৎসর পূর্বে ফরিদপুরের অখ্যাত পল্লীগ্রাম কুমোরপুরের গুপ্ত পরিবারে যে ক্ষুদ্র শিশু শ্রীরাধিকা গুপ্ত নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর উত্তরজীবনের অসামান্য প্রতিভা অসাধারণ ত্যাগ ও সংযমপূত জীবনের কথা ভাবলে মানবমনের একটি অতীন্দ্রিয় শক্তির দ্বার খুলে যায়।

সেই শ্রীরাধিকা গুপ্তই পরবর্তিকালে শ্রীরামদাস বাবাজীনামে খ্যাত পুরুষ। তাঁর ঐকান্তিক নীরব সাধনা মানব মনের প্রেমশিল্পের প্রতিভা, ভূমার রস সৌন্দর্যের নিবিড় অনুভূতি বাংলার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে নবরূপ দান করেছে। ভূমার আনন্দকে যেখানে বিশেষভাবে ব্যক্ত করে তাই যদি শিল্প হয় এবং সাধ্যতত্ত্ব যেখানে ভূমার পরিভাষায় সার্বভৌম সত্যে

প্রভাবিত হয় তাই যদি মানবধর্ম হয় তাহ'লে বলা চলে তাঁর জীবনে ধর্ম ও শিল্পের একত্র সম্মিলন হয়েছে। সে শিল্প প্রেমের শিক্ষা আর সে ধর্ম বৈষ্ণবের ধর্ম। বৈষ্ণবের এই সাধনাই তাঁর জীবনকে সত্য শিব সুন্দরে রূপায়িত করেছে। তা জনগণের হৃদয়ে গাঢ় স্পর্শানুভূতি দিয়েছে।

প্রেম সাধনার ঐতিহ্যই বাংলার বলিষ্ঠ ভাবধারা, সে ভাবধারায় সাম্প্রদায়িকতা নাই, প্রাদেশিকতা নাই, আছে শুধু পরকে আপন ক'রে ভারতের জনজীবনের মূলে অতীন্দ্রিয়ের প্রেরণা আর চেতনা। এই প্রেরণা আর চেতনা জাগানই শ্রীল বাবাজী মহারাজের নীরব নাম সাধনা।

কৈশোরের কোন এক শুভ লগ্নে ফরিদপুরের জগবন্ধুকে বন্ধুরূপে পেয়ে আবার শ্রীল রাধারমণ চরণদাস বাবাজী মহাশয়ের আনুগত্য লাভ ক'রে বৈষ্ণব ধর্মের বিশুদ্ধ পন্থায় তিনি অধিরূঢ় হ'লেন। শ্রীগুরুতত্ত্বের পারমার্থিকতা তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন। তাঁর সমগ্র জীবনে গুরুতত্ত্বের মহামহিম স্বরূপ এমনিভাবে অনুরণিত হয়েছে যেন শ্রীগুরু ভাবনার অভিন্ন ভাব্য স্বরূপে নিজেই কখন সকলের অলক্ষ্যে অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে গুরুরূপে প্রকটিত হ'য়ে পড়েছেন তা তিনিই জানেন না, আজও তাঁর ব্যবহারে কোন শিষ্য কখনই তাঁকে গুরুর ব্যবহার দেখতে পায়নি; চিরদিনই তিনি নিজেকে শ্রীগুরুর সেবক ব'লে দৈন্যের সহিত তা প্রকাশ করেন।

শ্রীগুরু প্রেরণাতেই তাঁর অপূর্ব কণ্ঠধ্বনির স্বর বিতানে শ্রীহরিসংকীর্তনের রোল বাংলার তথা ভারতের নরনারীর হৃদয়ে ও কর্ণে প্রবেশ করেছে। শ্রীহরি সংকীর্তনই যে ভারতের মৌলিক সাধনা তা পন্ডিত মূর্খ সকলের কাছে বিশেষ শক্তি সঞ্চার ক'রে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সংকীর্তনে বৈয়াকরণ দেখেছেন পাণিনির স্ফোটবাদ, শব্দের নিত্যতা মীমাংসক উপলব্ধি করেছেন এই তাঁর জৈমিনির "নিত্যস্তু স্যাদর্শনস্য পরার্থত্বাৎ, সংখ্যাজ্ঞানী বুঝেছেন চিত্তের বেদনা প্রকাশই এই শব্দঝংকারে এবং ভাগবত-

বাদী উল্লসিত হয়েছে নামমন্ত্রের অভিন্ন সাধনা এই শ্রীহরি সংকীর্তনেই প্রকটিত হয়। সংকীর্তনেই তিনি সমস্ত শাস্ত্রের শব্দালঙ্কার, রসানুভূতি, উপাস্যতত্ত্ব, ধাম বৈভব, ধামতত্ত্ব, অভিধেয় বৈশিষ্ট্য, জীবের প্রয়োজন বৈশিষ্ট্য, উপাসনা রহস্য, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই পরিবেশন করেছেন। কীর্তনাবলীর অক্ষররাশি এক একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। অথচ একথা সর্ববাদী সম্মত যে, তিনি মাত্র নয় বৎসর বয়সে সেই যে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছিলেন তার অতিরিক্ত একখানিও শিক্ষণীয় পুস্তক অধ্যয়ন করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাঁর কীর্তনের আখরগুলিতে যেমন রূপোপমা, লুপ্তোপমা, কর্মোপমা, সিদ্ধোপমা প্রভৃতি উপমার সমাহার তেমনি আবার ভাব বিভাব অনুভাব, স্থায়ীভাব, সঞ্চারীভাব, ব্যভিচারীভাব, সাধারণভাব, প্রভৃতিরও সঞ্চয় বিকাশ। বড়ই বিচিত্র কথা যে তাঁর কীর্তনের অক্ষরগুলি যেন রসশাস্ত্রের গভীর অনুসন্ধানের খনি। রসের যে সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব অর্থাৎ রসের কোনটি মিত্র কোনটি শত্রু, কোনটি তটস্থ স্বরূপ তাও সুনিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন। সর্বাপেক্ষা বিস্ময় যে, রসের এই সমস্ত তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করে যখন কীর্তন করেন তখন অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাবে যে সব সূক্ষ্মতত্ত্ব যেমন—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য, ভাবশান্তি, প্রলাপ, বিলাপ, সংলাপ, উপদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি সবগুলি তাঁর শরীরে তন্মুহূর্তেই কীর্তনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হয়েছে। সর্বাপেক্ষা মাধুরী বিকাশ হয়েছে তাঁর গঠিত জীবনের উপাসনা-রহস্যের প্রচার ও নিজের অনুভূত বস্তুর অকুণ্ঠ দানে। বাংলায় একদিন বৈষ্ণব ধর্মের যেভাবে বিকাশ হয়েছিল এবং কয়েকটি ধারায় তা যেভাবে প্রচারিত হয়েছিল শ্রীল বাবাজী মহারাজ তার সমন্বয় সাধনের সুপ্ত ধারাটিকে পরিপূর্ণভাবে প্রচার করেছেন এবং বিশিষ্ট রসানুভূতির নিবিড় উৎসসম্ভূত রূপটিকেও সকলের সামনে ধরে দিয়েছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম একদিন এই বাংলায় উদ্ভূত হয়ে আবার তাদের পরবর্তীকালে সেটি তিনটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। প্রথমত শ্রীচৈতন্যের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরিত রূপ-সনাতন প্রভৃতি ছয় গোস্বামী এবং তাঁদের অনুগত বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রে আকৃষ্ট হয়েও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাকেই প্রধানভাবে মেনে নিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসেই অবগাহন করতেন এবং সেই শিক্ষা দেবার জন্যই সেই রস-সম্বলিত যাবতীয় গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় ধারায় শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার শিবানন্দ সেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গের রূপরসেই আকৃষ্ট হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার প্রাধান্য স্বীকার করে সেই ভাবের অনুকূলে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তৃতীয় ধারা—শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার যুগপৎ ধারা প্রবর্তন করে সেই সেই ভাবের পুষ্টি বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বাংলার তথা ভারতের গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই তিন ধারার কোন একটি ধারার আশ্রয় করে আজও তাদের উপাসনা পদ্ধতি ধারণ করে আছেন এবং তাদের অনুগত জনমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ও এই তিন ধারার ব্যতিক্রম করেন নাই। তিনি নিজে দ্বিতীয় ধারার ভাবেই শ্রীগুরু আনুগত্যে স্মরণ মনন সাধনাদির আচরণ ও শিক্ষণ প্রচার করেছেন, তবুও তাঁর অনুভূত রসের যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা দিয়াছে সেটিকেই তিনি আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন।

সে ধারার বৈশিষ্ট্য এই যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য, প্রবোধানন্দ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ উপাসকগণ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম। এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম"। এই তাঁদের উপায় উপেয়তত্ত্বের পূর্ণ রূপ। তথাপি যেন কোথায় একটু গ্রন্থি থেকে গেল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপ তো সন্ন্যাসী স্বরূপ, সে স্বরূপে ব্রজের নিগূঢ় নিকুঞ্জ রসবিলাস কেমন করে সম্ভব? তাই শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁর হৃদয় নিঙড়ান কীর্তন সুধার আখর কথায় প্রকাশ করেছেন—

গৌর হ'লেন শুদ্ধ রাধা।
নদীয়ায় এ স্বভাব তো বিকাশ হয় নাই।
নদীয়ায় আবরণ ছিল, কাটোয়াতে খুলে গেল।
সন্ন্যাস লীলার ছলে হইলেন শুদ্ধ রাধা, শুধু শুদ্ধ রাধা নয়। হইলেন বিরহিনী রাধা।

শ্রীবাবাজী মহাশয়ের রাধাভাব বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ উপাসনাই বিশেষ দান। একাধারে পূর্ব পূর্ব আচার্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন লীলার মাধুরী অনুভব করেছেন আবার সন্ন্যাসী গৌরের অব্যক্ত রূপটিকে প্রকাশ করে নিজে তাতে প্রমত্ত মাধুরী ভোগ করছেন, আর অকাতরে তা দান করছেন। সন্ন্যাসী গৌরের সন্ন্যাস বেশটিও একটি ছদ্মসেবা শক্তি। সেটি যে সংকর্ষণ তত্ত্ব, লীলাশক্তি এবং সেইটিই যে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব এ রহস্যও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে অপ্রকাশ ছিল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেটিকে অশেষ বিশেষে প্রকাশ করেছেন কীর্তনের ভিতর দিয়ে—

যেমন—

প্রভুর মনে সন্ন্যাস বাসনা হলো
অমনি সঙ্গে আছেন সেবা বিগ্রহ
তাঁর হৃদয়ে যেমন প্রতিফলিত।
এমনি অভিন্ন তনু শ্রীনিত্যানন্দ
কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

বলিলেন—

তুমিতো বলেছো শ্রীমুখে
তোমার যাবেক কাজ আমা হতে হবে।
তুমি থাক আপন সুখে
আমি সাধ্‌ সাজাব তোমাকে
ওই বিগ্রহ নিতাই রতন
বেশ রূপে ছিলেন আবরণ॥
নিতাই আছেন সন্ন্যাসী বেশ ধরি।
আবরণ করি প্রাণ গৌরহরি।
এ রহস্য কেউ জানতে নারে।
যুগল মাধুর্যের ভিতরে বিহার॥

এই নিতাই জড়িত গৌরাঙ্গ উপাসনাই তিনি সংকীর্তনের মাধ্যমে সারাটি জীবন কেঁদে কেঁদে প্রকাশ করেছেন। প্রেমধর্মের আর একটি বিশিষ্ট রূপও তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি। শিল্পীর তাই তো স্বভাব, হৃদয়ের আকুল করা ভাব বাইরের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ দিয়ে যদি প্রকাশ না হয় তবে তাঁর জীবন অপূর্ণ থাকে। শ্রীবাবাজী মহাশয়ের জীবনে সে অপূর্ণতাও নাই। অন্তরের ভাবনা অন্তরের রসানুভূতি বাবাজী মহারাজে বাইরে রূপ পেয়েছে। তাঁর দানের মহিমায় তিনি "ভূরিদ" হয়ে আছেন।

একটি লিরিক

নিজন দে চৌধুরী

দু'চোখ ভ'রে স্বপ্ন আসে? আসুক না!
ঘুমে এ মন ভাসুক না—
স্বপ্ন আসে, আসুক না।

একটি কাজল-কালো চোখের অন্ধকারেঃ
স্বপ্ন এসে আঘাত করুক বন্ধ দ্বারে
বারে বারে
দমকা হাওয়ার ঝটকা নিয়েই হাতছানি তার আসুক না!
ঘুমেল দুটি চোখের মায়া
ভাসবে যদি ভাসুক না।
আজকে তাকে এ মন ভালো বাসুক না!

আজকে ধু ধু বন্ধ্যা মরুঃ
শুকনো তরু—
সূর্য-জ্বলা রশ্মিতাপে
শুকিয়ে মরে!
জীবন-প্রদীপ নিভ্‌লো বুঝি 'লু'এর ঝড়ে—
এই প্রহরে।

তাই যদি এ ফাগুন-মাসে
একটি নোতুন স্বপ্ন—যেথার নীল গুন-গুন স্বপ্ন আসে
শিশির-ঘাসে' অবকাশে
সেই দুটি চোখ, চোখের মায়া, ভাসেই যদি ভাসুক না—
আজকে তাকে এ মন ভালো বসুক না!

কাটিহার রেল স্টেশনে

অরুণেন্দু দাস

রাত থমথম তবু গমগম
এখানে এই এ' প্রান্তঃ
নয় নিঃঝুম নামেনাক ঘুম
রাত্রি হয়নি শ্রান্ত।

পথ কতদূর? বহু বহুদূরে
নদী-নালা-বন মাড়িয়ে
যেন শেষ নেই কোথা কোন সেই
তিস্তা-ডুয়ারস্‌ ছাড়িয়ে।

কথা ফিস্‌ফাস কত হিস্‌হাস
বাষ্পীয় সুর শোনা যে—
জ্বলে বিদ্যুৎ কত মেঘদূতে
বায়বীয় জাল বোনা যে!

বাজে হুইসিল জাগে মন-খিল
ছুটে যাওয়া কোন মায়াতে—
মিঠে মনমাতা এই আঁখিপাতা
কাঁপে চন্দিল ছায়াতে।

গতি উদ্দাম এই দুর্দম
কয়লা ও জল-ইস্পাত
নিয়ে চলে ট্রেন 'লোকাল' মেলে
জেগে জম্‌জমে কালো রাত।

মন ঃ তোমাকে

পারিতোষ খাঁ

এমন অন্ধকারঃ মন হাওয়ায় মেলে ডনা।
শীতে হিম। আলোর কালো আকাশে ঠিকানা
ফেরারী। দিন আহত, একী আবেগ! মন কানা॥

ভাঙা সরাই। মধুর ভাঁড়ে কাদা। গন্ধ হাওয়া।
নিখোঁজ সেতু। কপাটে তালা। মিথ্যে চাওয়া
ঘুরে ঘুরে। সূর্য সাধঃ শিসের মত কান্নাপাওয়া॥
বিষ না আর। হার মানি। জয়—তোমার চোখে হাসি—
কী সুখে মানি। দুহাতে স্বাদ। কাছে আসি।
আলোয় দিক অবাকঃ বলি—'তোমাকে ভালোবাসি'॥
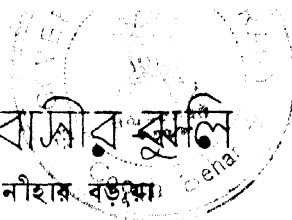
প্রান্তবাসীর ঝুলি

নীহার বড়ুয়া

[**ই**তিপূর্বে দেশ পত্রিকায় 'প্রান্তবাসীর ঝুলি' থেকে 'সোনারায়' পূজার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এবারেও সেই 'প্রান্তবাসীর ঝুলি' থেকে 'নমলোকাতি' পূজার বৃত্তান্তটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করার প্রয়াসী হয়েছি। 'নমলোকাতি' (১) অর্থাৎ অকালের কার্তিক পূজা।]

[এক]

"হায় হে দিদি বাড়ীত আছিস?"

"কায় (২)?"

"এন্তি (৩) বিরাও তো।" বেরিয়ে দেখি সদাহাস্যময়ী মাঝিপাড়ার ফুলবাশী মাইকানী।

"কি হইচে রে ফুলবাশী?" প্রশ্ন করি।

"পান দিবার (৪) আসনু হে দিদি।" একজোড়া 'গুয়াপান' (৫) বাটায় করে সামনে ধরে ফুলবাশী। এইটি কোন কাজে অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার রীতি।

"কিসের পান রে?"

"দিদি এখনো কাতি নিচং।"

"কাতি, মানে নাচের বুঝি হাউস (৬) হইচে?"

"এঃ হাউস তো আছে। ওটা আরো সেই কোটাই (৭) যাইবে। তা এখনা হেল মানসার (৮) পূজা।"

"মানসা! কিসের? বইস বইস।" পাশের পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বসে গল্প জোড়ে ফুলবাশী।

"আর কইসে না দিদি। আইজ সাত বছর হইল ছাওয়াটার (৯) না বিয়াও (১০) নিচং। বনুসটার (১১) কিচ্ছুই নাই। আগাবার (১২) জীবধন মণ্ডলের কাতিবাড়ী গেচি; অটাইকোনা (১৩) চেংড়ীগুলা ধরিবান্দি বনুসটার চেসরী (১৪) ফেলাইল। যদি সুফল হয় তা হইলে 'হাতীর উপরা কাতি' দিবার মানসা করিল। তা দিদি তোমারগুলার চরণের আশীর্বাদে এবার এখনা রক্তের দানা (১৫) উপজিচে (১৬)।"

"হয় নাকি রে? কি ছাওয়া?"

"আশীর্বাদ কর দিদি মরং ছাওয়ার(১৭) হইচে। আ উঁয়ার কোনটা বিশ্বাস ক'। ঐ বাদে যার জিনিস তারে পাওত সঁপি দেইম (১৮)।" স্নেহাধিক্যের অজানা আশঙ্কায় চোখ ছলছল করে ওঠে ফুলবাশীর।

"আইজ তো তা হইলে বুড়াবুড়ী দেবতাকনের নাচা খাইবে।" বলে কথাটাকে হালকা করার চেষ্টা করি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে। রসিকতায় সহজ হয়ে হেসে ওঠে ফুলবাশী।

"তা হইলে তোক ছাড়িম দিদি, বুড়াবুড়ীর নগত (১৯) তোকো নামাইম। ক' তা হবে না নাহবে?"

"যাইম রে যাইম।" সানন্দেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। তারপর অভ্যাগতাকে 'গুয়াপান চুন-তামাকুর'(২০) দিয়ে আতিথ্য রক্ষা করি। গুয়াপান খাওয়ার সঙ্গে দু'টো ঘরকন্না সুখদুঃখের কথাও হয়। তারপর যাবার সময় ফুলবাশী আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে বলে, "পাচে বা নাযাইস, যাওয়ার খাইবে কিন্তুক। আইর-মাসী, সগগাকে (২১) নিয়া যাইস। ডেরী না করিস। ঝকরারপার, বাইগনতলী, নাটিয়াবক চাইরো ভিতি পান দিচং। ঝকরারপারের মশোমাসীও আইসবে। বাপ বুড়ী কোনা আচ্চা গীদালী(২২) দিদি।" ফুলবাশী বাড়ীর ঝি থেকে গিন্নী সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিল।

[দুই]

এই অঞ্চলে কার্তিকপূজাই মেয়েদের সব চেয়ে বড় উৎসবের অনুষ্ঠান। কার্তিক সংক্রান্তি থেকে এর শুরু। তারপর সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস ধরে চলে এই 'নমলোকাতি'। আবার কোন কোন অঞ্চলে কার্তিকের পয়লা তারিখ থেকেই আরম্ভ হয় এবং কার্তিক পূজার দিনে এসে শেষ হয়। তবে আমি যে অঞ্চল সম্বন্ধে বলছি সেখানে কার্তিক সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে অগ্রহায়ণের সংক্রান্তিতে এসে শেষ হয়।

যদিও কার্তিক সংক্রান্তির দিনটিতেই কার্তিকপূজার রীতি কিন্তু তাতে উৎসবটা যে একদিনেই শেষ হয়ে যায়। তা ছাড়াও কেবলমাত্র সেই দিনটিতেই যদি পূজো দেওয়া হয় তা হলে অন্য কারো বাড়ীতে আর যাওয়া চলে না। তাতে কেবল পূজোর অনুষ্ঠানই হয় উৎসব হয় না। সেইজন্যই মনে হয় এই 'নমলোকাতি'র সৃষ্টি। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেদের সুবিধে মতো—তিথি পুঁথির বালাই বাদ দিয়ে সারা অগ্রহায়ণ মাস ধরে এক একদিন এক একজনার বাড়ীতে 'কাতি' হয়। এবং সারা গ্রামের তো বটেই অন্যান্য গ্রামেরও বালিকা থেকে বৃদ্ধারা এসে সেই বাড়ীতে জড়ো

১। ধান বা অন্যান্য শস্যাদিও সময় মত লাগাতে না পারলে পরে লাগালে "নমলা" হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।
২। নমলা—অকালে সময়ের পরে।
২। কায়—কে।
৩। এন্তি—এইদিকে।
৪। পান দেওয়া—নিমন্ত্রণ দেওয়া।
৫। গুয়া—গুবাক্। শুপারী।
৬। হাউস—সখ।
৭। কোটাই—কোথায়।
৮। মানসা—মানত।
৯। ছাওয়া—ছেলে।

১০। বিয়াও—বিয়ে।
১১। বনুস—বধূ।
১২। আগাবার—আগেবারে।
১৩। অটাইকোনা—ঐখানে।
১৪। চেসরী—পুত্রের জন্য কার্তিকের কাছে বর নেওয়ার জন্য একটি অনুষ্ঠান। কার্তিকের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুইয়ে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে গান ও কতকগুলি 'তুক' করা হয়।
১৫। রক্তের দানা—ছেলে সম্বন্ধে।
১৬। উপজিচে—জন্মেছে।
১৭। মরংছাওয়া—পুত্র সন্তান।
১৮। দেইম—দেবো।
১৯। নগত—সঙ্গে।

২০। তামাকুর—তামাক পাতা। ('তামাকু' বললে 'তামাক' বোঝায়)।
২১। সগগাকে—সবাইকে।
২২। গীদালী—নিপুণা গায়িকা।

হন। আর এই পুজোকে উপলক্ষ করে সমস্ত রাত ধরে চলে নাচ, গান, আমোদ আহ্লাদ।

কার্তিকের প্রসন্নতা লাভ করলে বিশেষ করে বংশ এবং শস্য বৃদ্ধি হয় বলে এই অঞ্চলে বিশ্বাস। নিম্নলিখিত গানটিতেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"আগা হাটে যায়া রসিক বামোনা রে
কি ও বামোনা কেনে আগল (২৩)
কলার ঝুকি (২৪)।
হাটুয়া (২৫) মানুষে পোছে রসিক বামোনা রে
কি ও বামোনা কি করেন আগল কলার ঝুকি
কাতিঠাকুরের বরে পুত্র পাইচং কোলে,
কাতিঠাকুরের বরে শষ্ আসিচে ঘরে,
কাতিঠাকুরের বরে ধন আসিচে ঘরে,
তারে না করিমু স্যাবা পুজা।"

[তিন]

সে দিন ফুলবাশীর 'কাতিবাড়ী'র জন্য দেখি সন্ধ্যের মধ্যেই কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ীর সব মেয়েরাই তৈরী। দলবল নিয়ে রওনা হলাম। পথে ক্রমেই দল ভারী হয়ে চলল। যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় আটটা।

ঝক্‌ঝকে নিকোনো চক্‌মেলান বাড়ীর উঠোনের মাঝখানে একটি সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তারই নীচে উঠোনের উত্তর দিকে দক্ষিণমুখ করে, বিঘৎখানিক উঁচু মাটির বেদীতে ঠাকুর বসান হয়েছে। সম্পূর্ণ ঠাকুরটি সোলা দিয়ে তৈরী। হাতীর উপর ময়ূর, ময়ূরের উপর কাতিঠাকুরটি তীর ধনু নিয়ে বসে আছেন। সাধারণত কেবল ময়ূরের উপরেই কার্তিক থাকেন। কিন্তু একটু অধিক অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায় কখন বা 'জোড় কাতি' অর্থাৎ দুইটি কার্তিক, কখন বা 'হাতির উপর কাতি' দেওয়া হবে বলে মানত করা হয়ে থাকে।

ঠাকুরের পেছনে একটি 'ময়না' (২৬) গাছের ফলশুদ্ধ ডাল পুঁতে দেওয়া হয়েছে। বেদীর চারকোণে চারটি কলাগাছ। গাছ চারটির উপরদিকে তিনধারে অর্থাৎ দুইপাশ ও পেছনে একটার সঙ্গে আর

২৩। আগলকলা—কাঁদির প্রথম ছড়া কলা।
২৪। ঝুকি, হাতা—ছড়া।
২৫। হাটুয়া—যারা হাট করতে যায়।
২৬। ময়নাগাছ—জংলী কাঁটাগাছ বিঃ।

একটা দড়ি দিয়ে টান করে বাঁধা। সেই দড়িতে সোলার ফুল এবং জোড়া জোড়া 'আটিয়া ও মনুয়া' অর্থাৎ বিচে ও কাঁঠালী কলা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুইটি মস্ত বড় ডালিতে খৈ-এর মোয়া ও মুড়কি। কলাগাছ চারটির গোড়ায় একটি করে জলভরা ঘট আর তার উপর একটি করে ধনু। এইরকম আরও পনের বিশটা ঘট ও ধনু একপাশে সারি সারি করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলি আগন্তুক-দের যাঁরা যাঁরা মানত করেছেন তাঁরা দিয়েছেন। নিজেদের বাড়ীতে পুজো না দিলে অন্যের বাড়ীতে এইভাবে দেওয়া হয়।

এক আঁটি ধানের গাছ শিষসুদ্ধ গোড়া থেকে তুলে এনে ঠাকুরের সামনে একটু বাঁদিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও আলপনা দিয়ে যথারীতি ঘট, নৈবেদ্য, ধূপ, বাতি ইত্যাদি পুজার উপ-করণ সাজান।

ঠাকুরের চারপাশে ঘুরে নাচার জন্য বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা রেখে বাকি উঠোনটি সতরঞ্চ, মাদুর, কাঁথা, বাঁশের চাটাই, পাটি ইত্যাদি দিয়ে গাইয়ে এবং দর্শকদের জন্য ফরাশ পাতা। এরি মধ্যে বহু অভ্যাগতরা এসে গিয়েছেন। তাঁদের হাস্যপরিহাসে গল্পগুজবে আসর জমজমা করছে। যুবতী, কিশোরী ও বালিকারা কেউ বা নাচের জন্য সাজগোজ কেউ বা রসালাপে ব্যস্ত। বৃদ্ধারা একটি আগুনের কুণ্ডকে ঘিরে 'গুয়া-পান-চুন-তামাকুর'কে আয়ত্তে আনার জন্য কাঠের মস্ত একটি হামামদিস্তা নিয়ে বসে গিয়েছেন। ছোট্ট বাচ্চারা এদিকে ওদিকে কম্বল কাঁথা চাপা দিয়ে ঘুম দিচ্ছে।

আমরা যেতেই হাস্যমুখী 'মারে-য়ানী' (২৭) অর্থাৎ ফুলবাশী "আসচিস্ দিদি" বলে আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে পাটিতে বসাল। তারপর অন্যান্য অভ্যাগতদের যথারীতি অভ্যর্থনা জানিয়ে গীদালী মশোমাসীর দিকে চেয়ে বলল—

"ও বুড়ার বেটি, নেও মাও 'কাতি-

২৭। মারেয়ানী—কর্মকর্ত্রী। (কর্মকর্তাকে 'মারেয়া' বলা হয়)।

সিজ্জন' কোনা করো। রাইত হইল।' বৃদ্ধবৃদ্ধাদের বুড়া বা বুড়ী বলে সম্বোধন করা অসম্মানজনক। 'বুড়ার বেটা' বা বুড়ার বেটি বলে ডাকা হয়ে থাকে।

এই পুজো অনেকে বামুন ডাকিয়ে শাস্ত্রীয় আচার অনুযায়ীও করে থাকেন। তবে 'নমুলাকাতি' বেশীর ভাগই শাস্ত্র-বাদ দিয়ে দেশাচার অনুযায়ী নিজেরাই করে থাকেন।

প্রথমে ঠাকুরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ঢাকের বাজনার তালে তালে কতক-গুলি বিশেষ ধরণের মুদ্রার সঙ্গে—পান, ফুল, ধূপ, বাতি দিয়ে ঠাকুরটিকে বরণ করা হয়। তারপর পুজোর পাটটাও নিজেরাই সেরে নেন। এর পরে রাত্তিরে নাচগান শুরু হওয়ার আগে প্রথমে 'কাতিসজ্জন' অর্থাৎ 'কার্তিকসৃজন' বৃত্তান্তটি গানে করা হয়। এর মাঝে মাঝে আবার আংশিক অভিনয়ও থাকে।

গ্রামের এইসব উৎসবের অভিনয়-গুলির উপাদান সংগ্রহ হয় নিত্য-নৈমিত্তিক পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে। যেমন কৃষিকর্ম, মাছধরা, শিকার করা ইত্যাদির চিত্রগুলি হাস্যকৌতুকে পরি-পুষ্ট হয়ে এক একটি নাট্যরূপে নেয়। পুজোর ব্যাপারে যদিও পৌরাণিক কাহিনীর ছায়া অবলম্বন করেই আরম্ভ করা হয় কিন্তু শেষে দেখা যায়, তা একটি দৈনন্দিন সামাজিক চিত্ররই রূপ গ্রহণ করেছে। এই 'কাতিসজ্জন' ব্যাপারটিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইসব অভিনয়গুলি সবই প্রায় কৌতুকাভিনয়ের পর্যায় পড়ে। এইসবের রঙ্গরসিকতা এখনও কতকগুলি সেই সনাতন প্রথারীতি অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আবার চিরকুমার 'কাতিঠাকুরটি' ভাবে-অভাবে অর্থাৎ মার্জিত অমার্জিত সব রকম গান শুনলে তবেই নাকি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিয়ে থাকেন বলে বিশ্বাস। নাচের সময় আবার নানারকম খুশীমত সাজ পোশাক করা হয়ে থাকে। এই দিনটিতে তাই পুরুষপক্ষকে বাইরের ঘরে আস্তানা নিতে হয়। সেদিন মা 'শ্বশুরী', 'বৌয়ারী' (২৮), 'ঝিয়ারী' (২৮)

২৮। বৌয়ারী, ঝিয়ারী—বৌ ঝি।

সবারই পূর্ণ স্বাধীনতা। তাই শ্বশুর, ভাশুর, জামাই, ছেলেদের অন্দরে প্রবেশ নিষেধ। কেন না শাশুড়ী হয়তো কোঁচাকাছা দিয়ে নাপিত সেজে আসলেন কিন্তু জামাই দেখে ফেললে 'নাককাটা' (২৯) ব্যাপার। আর শ্বশুরের সামনে বৌ তো সাহেব সেজে বিবি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। তবে শাশুড়ীর দল মহাখুসী, বৌটি "রসিকা" বটে। আসরে আসলে শাশুড়ী বৌ, মা মেয়ে, মাসি-পিসি সবাই একবয়সী সখি। তারি মধ্যে মর্যাদা রেখে সব রকম রঙ্গরসিকতাই চলে।

[চার]

এখন এই 'কার্তিসিঙ্গজনে'র সময় একজনকে কার্তিকের জননী সাজান হয়। সাধারণত পুত্রাকাঙ্ক্ষিনীদের এই ভূমিকায় নামান হয়ে থাকে। তা ছাড়াও হাঁরা, ঝিরা, নাপিত, ধাইয়ানী ইত্যাদির ভূমিকা থাকে। এই গান ও অভিনয় পর্বটি 'শিবের বিয়া' থেকে আরম্ভ করে কার্তিকের 'ছুয়া কামান' অর্থাৎ অশৌচান্তে গিয়ে শেষ হয়। প্রথম গানটি শুরু করা এইভাবে। সবাই কার্তিকের সামনে গিয়ে বসেন। তখন মূলগায়িকা গানের প্রথম পদটি ধরে দেন এবং আর সবাই তার পুনরাবৃত্তি করে ধুয়াটি ধরেন। গানটি হচ্ছে—

(ধুয়া)—কি আজ লো বুড়াশিব রে।
ভাং ধুতুরা খায়া বুড়াশিব অচেতন হইল
তিনদিন তিনরাতি উপাসে (৩০) কাটিল।
চেতন পায়া বুড়াশিব ভাবে মনে মনে
এ শুনে পুরীতে আমাক দাখে কোন জনে।
দৌড় দিয়া যায় বুড়াশিব নারদ ভাগিনার বাড়ী
বিয়ার উপায় ভাগিনা করেন শিগ্‌গির করি।
যায় যায় নারদ ভাগিনা পণ্ডিতঠাকুরের বাড়ী
বুড়াশিবের বিয়ার জোরা দেখো বিচার করি।
কি থাকেন পণ্ডিতঠাকুর নিচিন্তে (৩১) বসিয়া
বুড়াশিবের বিয়ার লগন দেও বোল গণিয়া।
রূপার পাঞ্জি খুলিয়া দ্যাখে নাই শিবের জোরা
সোনার পাঞ্জি খুলিয়া দ্যাখে চণ্ডীর সতে জোরা।
কি করেন ওরে মামা নিচিন্তে বসিয়া
তোমারে না জোরা আছে চণ্ডী মাওক দিয়া।

২৯। নাককাটা—লজ্জার ব্যাপার।
৩০। উপাসে—উপবাসে।
৩১। নিচিন্তে—নিশ্চিন্তে।

নও কড়া কড়ি বুড়াশিব বাহির করি আনিল
নারদ ভাগিনার হাতে কড়ি গণিয়া বা দিল।
যায় যায় নারদ ভাগিনা চণ্ডীর বাবার কাছে
পোণের (৩২) কথা খাষা করে
চণ্ডীর বাবার সতে। (৩৩)
তারপাছে দিনখেন ঠিক না করিয়া
কৈলাশ বুলি নারদ ভাগিনা আসিল ঘুরিয়া।
কি করেন ওরে মামা নিচিন্তে বসিয়া
তোমারে না বিয়ার লগন যায়
বোল বিতিয়া (৩৪)
কি করেন চাকর নফর নিচিন্তে বসিয়া
শিবেরে না বিয়ার লগন যায় বোল বিলিয়া।
ধান ভাঙেয়া বুড়াশিব চাউল চিরা বনাইলো
সরিষা ভাঙ্গিয়া বুড়াশিব তেল না করিলো।
মন্দির ঘরে সোন্দেয়া শিব নিল কড়ির থলি
যায় যায় বুড়াশিব আগাহাট বুলি।
আগা হাটে কেনে চণ্ডীর শিশের সেন্দুর,
আরো না কেনে চণ্ডীর শাকা এক মুটি,
আরো না কেনে চণ্ডীর অগ্নিপাটের সাড়ী,
আরো না কেনে চণ্ডীর নাকের কানের সোনা।
মাজহাটে কেনে শিব সোনার চাইলন বাতি,
আরো না কেনে শিব সোনার ঘট গাছা,
আরো না কেনে শিব সোনার মটুক (৩৫) ফুল
পাছা হাটে কেনে শিব নিজের পেন্দনের ধুতি
আরো না কেনে শিব মনিরাজ পাগড়ী
শেষ হাটে কেনে শিব পান আর শুপোরী
আরো না কেনে শিব কলা হাতাচারি।
আরো না কেনে শিব দই বা পঞ্চ ঘটি
আরো না কেনে শিব দানা (৩৬)
আরো চকি। (৩৭)
ভারির (৩৮) ঘাড়ে ভার দিয়া
হাত দোলেয়া হাটে
ভারভারাটি নিয়া শিব ফিরিল আপন পাটে।
কি করেন নারদ ভাগিনা নিচিন্তে বসিয়া
বামন, সজ্জন, পাড়াপড়শিক খবর দেও যায়া।
কি করেন চাকর নফর নিচিন্তে বসিয়া
বাদাকর, নাউয়া (৩৯) বৈরাতীক (৪০)
খবর দেও যায়া।
ভাঙা ঢোল, ভাঙা কাকা ডাকিয়া আনিল
ভাঙা ঢোলে, ভাঙা খোলে বিয়াত সাজিল।
সর্পের না মালা শিব গলাতে পিন্দিল
বাঘের না ছাল বুড়াশিব কমরে বান্দিল।

৩২। পোণের—পণের। অনেক সমাজে এখনও এই 'কন্যাপণ' দিতে হয়।
৩৩। সতে—সঙ্গে।
৩৪। বিতিয়া—সময় বয়ে যাওয়া।
৩৫। মটুক—টোপর।
৩৬, ৩৭। দানা, চকি—গুড় বিঃ।
৩৮। ভারি—মুটে।
৩৯। নাউয়া—নাপিত।
৪০। বৈরাতী—বিয়ের কাজ করার জন্য সধবা নারী।

কিসের ধুতি কিসের পাগড়ী
সগলে (৪১) রইল পড়ি
যায় যায় বুড়াশিব বিরিয়ের পিটিত চড়ি।
যায় যায় বুড়াশিব চণ্ডী মায়ের বাড়ী
জই জোকারে (৪২) আয়ও (৪৩) মায়ও নিলে
শিবক বরি।
সোবরণের (৪৪) ঝারি দিয়া পাও না ধোয়াইল
শেতো চণ্ডার বাবা বরিয়া না নিল।
শুভখেনে বুড়াশিব বিয়াতে বসিল
সুলগন দেখিয়া বাবা কন্যাদান দিল।
বিয়া করি শিব চণ্ডী সোন্দাইল (৪৫) বাসরে
মন্দিরেতে যায়া শিব জুয়া পাশা খেলে
দুয়োরে লাগেয়া দিল ঘিয়ের পঞ্চবাতি
মাজিয়ায় (৪৬) পাড়িয়া দিল
কামরাঙার পাটি। (৪৭)
খেলেয়া উঠিয়া শিব পানিপন্তা (৪৮) খাইলো
পানিপন্তা খায়া শিব কৈলাশে ফিরিলো।

এইবারে যে মেয়েটিকে 'কার্তিক-জননী' সাজান হয়েছে তাকে নিয়ে 'কার্তিক'র সামনে বসান হ'ল। তারপর তার কোঁচড়ে একজোড়া কলা ও একজোড়া 'গুয়াপান' দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল। এই ফলকে সন্তানের প্রতীকরূপে মনে করা হয়।

এইবারে গানের আর একটি অংশ গাওয়া আরম্ভ হ'ল। এখানে ধুয়া হচ্ছে—

(ধুয়া)—কি আজ লো চণ্ডী মাও রে।
একে একে চণ্ডী মায়ের বার বছর হইলো
বার বছরে চণ্ডী ঋতুস্নান করিলো।
একদিন হইলো চণ্ডীর হইলো দুইওদিন
দুইদিন হইলো চণ্ডীর হইলো তিনদিন।
রূপার বাটায় নিল চণ্ডী সেওয়া সরিষার ধুলা
সোনার বাটায় নিল চণ্ডী আমলা আর খইলা।
হাঁরা ঝিরা দুই বান্দী আগে আর পিছনে
যায় যায় চণ্ডীমাও বাইর ঘাটে ছিনানে।
কেহ না ঘসে চণ্ডীর আউলা মাথার কাশ
মুখখোনা ঘসে চণ্ডীর পান খাওয়া বাটা
বুকখানি ঘসে চণ্ডীর পূর্ণিমার চাটা।
গলাখানি ঘসে চণ্ডীর সুবরণের ঝারি

৪১। সগলে—সকলি।
৪২। জইজোকার—উলুধ্বনি।
৪৩। আয়ও—এয়ো। সধবা।
৪৪। সোবরণের—সুবর্ণের।
৪৫। সোন্দাইল—প্রবেশ করিল।
৪৬। মাজিয়া—মেজে।
৪৭। কামরাঙার পাটি—কাজ করা পাটি বিশেষ।
৪৮। পানিপন্তা—পান্তা ভাত।

ডেনা (৪৯) দুখ্‌না ঘসে চণ্ডীর
মুলেঙের ডারি।
নগুলগুটি (৫০) ঘসে চণ্ডীর
সুন্দীহোলার (৫১) কোরা
পেটখানি ঘসে চণ্ডীর চুলিরে নাগেরা।
পিটি কোনা ঘসে চণ্ডীর ধোবারেনা পাটা
কমরখানি ঘসে চণ্ডীর মেঘনালের (৫২) সুতা।
চরুদুখনা (৫৩) ঘসে চণ্ডীর
কলারে মাঞ্জিলা (৫৪)
হাটুদুখ্‌না ঘসে চণ্ডীর ছাওয়ার
হাতের ঘিলা (৫৫)
পাও দুখ্‌না ঘসে চণ্ডীর
নেউকীয়া (৫৬) জুতা।
গাটা পানিত নামিয়া চণ্ডী
গাটা করিলো শুধ্‌ (৫৭)
হাটু পানিত নামিয়া চণ্ডী হাটু করিলো শুধ্‌,
কমর পানিত নামিয়া চণ্ডী কমর করিলো শুধ্‌,
হিয়া পানিত নামিয়া চণ্ডী দিল পঞ্চ ডুব্‌।
কুঘাটে নামিয়া চণ্ডী সুঘাটে উঠিলো
ধরম্‌ করম বসুমিতাকে (৫৮)
পরণাম জানাইলো।
একহন্দ মাথার কাশ দুইহন্দ করিয়া
হীরা জীরা দুই বান্দী দেয় মায়ের মুছিয়া।
কাঁও মোছায় মাথা চণ্ডীর কাঁও মোছায় গাও
কাঁও মোছায় হাত মায়ের কাঁও মোছায় পাও।
ভিজা বস্তর ছারিয়া চণ্ডী সুকান বস্তর পরে
যায় যায় চণ্ডী মাও আপন মন্দির ঘরে।
মন্দিরেতে যায়া মাও ধেয়ানে বসিল
কৈলাসেতে বুড়াশিব অন্তরে জানিল।
অন্তরে জানিয়া শিব না থাকিল রইয়া
চন্ডীরে না ঋতুছিনান যায় বোল ছুটিয়া।
বিরষের পিটিত্‌ চাড়ি শিব যাত্রা করিল
চণ্ডীর মন্দিরে যায়া দরিশন দিল।
সোনার ঝারিত নিল চণ্ডী উত্তম গঙ্গার জল
সোনার কাসিত নিল চণ্ডী পঞ্চগোটা ফল।
লং শুপারী গুয়োপান বাটা ভরেয়া নিল
শিবের হাতে দিয়া চণ্ডী পরণাম করিল।
আগা রাতি গেল চণ্ডীর পানতামাকুর খাইতে
মাজ রাতি গেল চণ্ডীর হাসিতে খিলিতে,
শ্যাষ রাতি গেল চণ্ডীর ধৈ ধামাইল্‌ খেলাইতে,
ভোররাতি শিবচণ্ডী গ'ওয়াইলো (৫৯)
নিন্দেতে।

ঐ ডুবে ঐ ছিনানে কাতি থিতি হইল
একমাস হইল চণ্ডী মনেতে জানিল।

এই সময় একজন 'কাতি'র মাকে ছুঁয়ে একটি লম্বা সুতো নিয়ে বসল। তারপর গানে যখন একমাসের কথা বলা হচ্ছে সে সময় ঐ সুতোতে একটি 'সর্‌কাগিটো' অর্থাৎ আল্‌গা ফাঁস বা গেরো বান্ধা হল। তারপর দুই, তিন করে দশ মাস পর্যন্ত প্রত্যেক সারি গানের সময় একটি একটি করে দশটি আল্‌গা গেরো বান্ধা হল। এর অর্থ সন্তানটি যেন মাসে মাসে নাড়ীর দশবন্ধনে বাঁধা পড়ছে। এই দশ বন্ধন খুলে তবে সন্তানকে ভূমিষ্ট হতে হয়। এইসব আচারগুলিও পুজোর অঙ্গ বলে মানা হয়ে থাকে। তখনকার গান—

"এক এক করিয়া চণ্ডীর হইলো দুই মাস
দুই দুই করিয়া চণ্ডীর হইলো তিন মাস
তিন তিন করিয়া চণ্ডীর হইলো চারি মাস,
চাইর চাইর করিয়া চণ্ডীর হইলো পাঁচ মাস,
পাঁচ মাস হইলে চণ্ডীর সোয়ামী জানিলো,
পাঁচ পাঁচ করিয়া চণ্ডীর হইলো ছয় মাস,
ছয় মাস হইলে চণ্ডীর ননন্দী জানিলো।
ছয় ছয় করিয়া চণ্ডীর হইলো সাত মাস,
সাত মাস হইলে চণ্ডীর শশুরী জানিলো।
পঞ্চগাভীর দুধ বুড়াশিব ছোকিয়া আনিলো,
পঞ্চমুটি চাউল বুড়াশিব খুজিয়া আনিলো,
আইলের (৬০) কচু বাইলের (৬০) কচু
তুলিয়া আনিলো,
সাত মাসে চণ্ডীমাওক সাধ না খেয়াইলো।
সাত সাত করিয়া চণ্ডীর হইলো আট মাস
আট আট করিয়া চণ্ডীর হইলো নয় মাস
নয় নয় করিয়া চণ্ডীর হইলো দশ মাস
দশ মাস দশ দিন পুর্ণিত হইলো
গরভের বিষে মাও ভূমিতে পড়িলো।
কি কর হে হীরা জীরা নিচিন্তে বসিয়া
গরভের বিষে মুক্রি (৬১) যাঁও বোল মরিয়া।
দৌর দিয়া যায় হীরা কেতাই ধাইয়ানীর বাড়ী
কি করেন্‌ হে ধাইমাও আইসেন্‌
শিগ্‌গির করি।
না থাকেন হে ধাইমাও নিচিন্তে বসিয়া
গরভের বিষে চণ্ডী যায় বোল মরিয়া।"

হীরা গিয়ে কেতাইধাইয়ানীর বাড়িতে উপস্থিত। এত ডাকাডাকি কিন্তু কেতাই সাড়া দেয় না। বহু তোষামোদ ইত্যাদির পর ধাইয়ানী জবাব দিচ্ছে—

"একদিন গেইচং (৬২) তোমার বাড়ী,
রাও (৬৩) করিচেন চাড়ি চাড়ি (৬৪)
মনের গৈরবে নাই করেন রাও,
এ্যালো (৬৫) ক্যানে ধরেন আসি
ধাইয়ানীর পাও।

মুখ ঘুরিয়ে বসল 'কেতাই'। আবার অনুনয় বিনয়।

"আই না বোলং (৬৬) তোক বুলিচং মাও,
আইজকার মনে (৬৭) মাও সগুলে খেমা দেও
এখানেও নানারকম ছড়া কেটে উত্তর প্রত্যুত্তর আছে। যাই হোক, বহু সাধ্য সাধনার পর রাজী হয়ে কেতাই চলল চণ্ডীর ওখানে। তখন গান হচ্ছে—
"লাল পানাতি (৬৮) কেতাই তখন কমরে
গুঞ্জিলো
সোনারে মাইজ্‌কাটারি (৬৯) কোনা
ঝোলোঙায় ভরাইলো
হেমতালের নাটি কেতাই হস্তে নিল্‌ তুলিয়া
যায় যায় কেতাই ধাইয়ানী চণ্ডীর ঘর বুলিয়া
চণ্ডীকে তুলিয়া কেতাই তেলপানি দিলো,
শুভখেনে চণ্ডীর কোলে কাতি জনম নিলো।
ঝাকে ঝাকে পড়ে জোকার চণ্ডীমায়ের ঘরে
দেও দেবতা তিরভুবনে জানিলো অন্তরে।"

এই সময় উলুধ্বনির মাঝখানে সুতোর সেই দশটি গেরো এক টানে খুলে ফেলা হল। আর 'কাতি'র মায়ের কোলে যে ফল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল কেতাই সেগুলি নিয়ে একটি কুলোতে তুলে এনে রাখল। দশবন্ধন খুলে সন্তান ভূমিষ্ট হ'ল।

তারপরে নাড়ীকাটা, নাওয়া ইত্যাদি পরবর্তী সব অনুষ্ঠানের পর কাতির শরীরটি কিভাবে সৃজন হয়েছে তা বর্ণনা করে গান করা হয়। যথা—

"কাতি রে তোর মাথা বানাইলে কোনজনে
আদু জনমে রে ছিরিফল (৭০)
বিলাচি (৭১) রে
মাথা বানাইলে বাসুদেবে,
জন্ম দিলো শংকাই বাপে।

৪৯। ডেনা—সমস্ত হাতটি।
৫০। নগুলে—আঙ্গুল।
৫১। সুন্দীহোলা—এক জাতীয় সাপ্‌লাফুল।
৫২। মেঘনাল—জলজ গাছ বিশেষ।
৫৩। চরু—উরু।
৫৪। মাঞ্জিলা—মাজ, মধ্যভাগ।
৫৫। ঘিলা—খেলনা বিঃ।
৫৬। নেউকীয়া—ইহার অর্থ পাওয়া যায় না।
৫৭। শুধ্‌—শুদ্ধ।
৫৮। বসুমিতা—বসুমতী।
৫৯। গ'ওয়াইল—কাটাইল।

৬০। আইল, বাইল—আল। রাস্তা। 'বাইল' অর্থ নাই।
৬১। মুক্রি—আমি।

৬২। গেইচং—গিয়াছিলাম।
৬৩। রাও—রা'। কথা।
৬৪। চাড়িচাড়ি—চড়াচড়া।
৬৫। এ্যালো—এখন।
৬৬। বোলং—বলছি।
৬৭। মনে—জন্যে।
৬৮। নালপানাতি—লাল রংয়ের পানশুপারি রাখার বাটুয়া।
৬৯। মাইজকাটারি—ছোটকাটারি বিঃ।
৭০। ছিরিফল—শ্রীফল, বেল।
৭১। বিলাচি—বিলাইয়াছি।

কাতি রে তোর মুখ বানাইলে কোন জনে
আনু জনমে রে বাটা বিলাচি রে
মুখ বানাইলে বাসুদ্যাবে
জন্ম দিলো শংকাই বাপে।"

এইভাবে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের বর্ণনা করতে হয়। যেমন চক্ষু অর্থাৎ চোখের সময় 'তারা' বিলাচি। 'নাকে'র সময় 'বাঁশী'। 'কানের সময় 'পলাশ'। 'গলা' অর্থাৎ গলার সময় 'ঝারি'। 'বুকের' সময় 'পাটা'। ডেনা অর্থাৎ সমস্ত হাতটির সময় পদ্ম। নগুলে অর্থাৎ আংগুলের সময় মরুচ মানে লংকা। 'কমরে'র সময় মোড়া। পেটের সময় সারিন্দা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপরে দ্বিতীয় দৃশ্য। এইবারে এমান্ হইয়া অর্থাৎ আঁতুর ওঠার পালা। তখন নাপিতের ডাক পড়ে। এই দৃশ্যটিও অনেকগুলি ছড়া ও গানের সমন্বয়ে অভিনীত হয়। নাপিতকে নিয়ে নানারকম রঙ্গরসিকতার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং নাপিতকে বহু দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

আম গুনেগুনে নিধি করুণা গুনেগুনে নিধি
নাউয়ার কপালে দুঃখ ঘটেয়া দিল বিধি।"

তবে নাউয়াকে দুঃখিত হতে তো দেখাই যায় না বরং তার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। ছেলে কামিয়ে তারপর চেয়ে দেয়ে বিদায়ী নিয়ে তবে নাপিত বিদায় নেয়।

এরপর আবার ছেলে নাচান হ'চ্ছে। বলা হচ্ছে—

আরে দুগইতা(৭২) ছাওয়া কোলা(৭৩)
বুলিয়া কান্দে রে
আরে কে তোরে বাপ ছাওয়া কেবা তোরে
মাও রে।
আরে দুগইতা ছাওয়া দুধ বুলিয়া কান্দে রে
'অমুক' তোরে বাপ আর 'অমুক' তোরে
মাও রে।

এইখানে যাকে পুত্রবর দেওয়া হয়. 'অমুকে'র স্থানে তার স্বামীর এবং তার নাম বলা হয়ে থাকে।

তারপরের অধ্যায়টিকে 'কাতিঘামান' বলে। সে সময় কাতির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ হয়। তখন 'কাতি' ঘরের লোক। কাতিকে বলা হচ্ছে—

"কাতি রে তোর এও মাসে না হইল বিয়া।
এইবারে উঠিবে 'ডেঙরা' (৭৪)
'অমুকে' জনাক দিয়া।"

কিম্বা—

"ও মোর কাতিকা রে
আসিবার কাতিকা মোর না আসিলেন ক্যানে।
আজি কাতিকা আসিবে বইলে
ভাত রান্দিয়া থুচি
সেও ভাত মোর হইয়া গেলো খর
ও মোর কাতিকা রে।
আজি কাতিকা আসিবে বইলে
ব্যজন রান্দিয়া থুচি
সেও ব্যজন হইয়া গেল বাসি
ও মোর কাতিকা রে।
আজি কাতিকা আসিবে বইলে
দুধ আউটিয়া(৭৫) থুচি
ঘন আওটা দুধে মোর পড়িয়া গেল মাছি
ও মোর কাতিকা রে
আজি "একহন্দ মাথার ক্যাশ দুইহন্দ"
কইরে(৭৬) রে
তোর কাতিকার পায় ধরি
আমায় দিয়া যাও পঞ্চ পুত্রের বর রে।"

তা ছাড়াও এইখানে কতকগুলি আদি রসাত্মক ভাবের অভিব্যক্তি এবং গান ও ছড়া বলার বিধি আছে। এই সব গান ছড়া ইত্যাদিকে মোটা পয়ার(৭৭) বা কৃষ্ণধামালী বলা হয়।

এই সময় কার্তিকের চার পাশে ঘুরে ঘুরে এইসব গান ও ছড়া বলা হয়ে থাকে। এইখানে এই অধ্যায়টির শেষ।

[পাঁচ]

এই অধ্যায়টির পর এবারে নাচের পর্ব। তখন 'ঢাকুয়া'র ডাক পড়ে। এই নাচে একমাত্র বাদ্যযন্ত্র 'ঢাক'। যদিও এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ কিন্তু নাচের সঙ্গে বাদ্য চাই। বাজনা না হ'লে তো নাচ জমে না। তাই 'ঢাকুয়া' মহাশয়ের অনুমতিপত্র তো থাকেই, সঙ্গে নিমন্ত্রণপত্রও দিতে হয়।

'ঢাকুয়া' এসে 'আসর বন্ধন' করতেই আসর জমজম করে উঠল। ততক্ষণে নাচনীর দল শাড়ীটিকে আঁট সাঁট করে পরে আঁচলটিকে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছেন। তারপর পায়ে 'নেপুর' পরে একটি চাদরকে কাঁধের দুই পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে এসে সব আসরে দাঁড়ালেন। আজকের আসরের প্রধানা নর্তকী মাঝিপাড়ার মরুচমতী ও বড়ুয়াপাড়ার দুর্গা। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, একজনের তারও উপরে। দুর্গার সঙ্গে নামল তার চার বছরের নাতনীটি। দলের আবার নায়িকার পদ নিয়ে যিনি নামলেন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি ছাড়িয়ে গেছে। 'ঢাকুয়া' তখন তাল বদলে ধরলেন 'নাচনের বাইজ'। নাচনীরা আগে কাতিকে পরে আসরে প্রণাম করে নৃত্য করলেন শুরু।

এই নৃত্য কখনও ঢাকের সঙ্গে, আবার কখনও গানের সঙ্গে করা হয়। সারারাত ধরে চলে এই বিরামহীন নাচের অনুষ্ঠান। এক একবার এক এক দল উঠে নাচতে থাকে। আবার এরই মধ্যে এমনও অনেকে থাকে যারা সারারাত অবিরাম নেচেই চলে, এতটুকুও ক্লান্ত হয় না। কেমন যেন একটা ভাবের ঘোরে নেচে যায়। এইরকম মেয়েদের 'নাচনী' বলে খ্যাতি থাকে এবং এইসব উৎসবে তাদের চাহিদা বেশী ও সেইজন্য সম্মানও বেশী। গানের জন্যও তেমনি 'গীদালী' মহিলাদের খুব সম্মান। কেন না, গান ছাড়া নাচ বেশীক্ষণ চলে না। যদিও মাঝে মাঝে কেবল ঢাকের সঙ্গেও নাচা হয় তা হ'লেও গান ছাড়া নাচ জমে না। কারণ বেশীর ভাগ লোকনৃত্যগুলি হয় এক একটি ধরণে, একই রকম নাচের পুনরাবৃত্তি। এ নাচও তেমনি। তাই এই গান দিয়ে তার একঘেয়েমীটাকে ভাঙ্গা হয়। গানগুলির কথার ভাব ও সুরের অদল বদলেও বৈচিত্র্য আনে। আবার কখনও 'চট্কা' অর্থাৎ দ্রুততালের গানের মাঝে মাঝে থাকে 'ভাওয়াইয়া' অর্থাৎ টানাসুরের ঢিমা লয়ের গান। তাতেও এই একঘেয়েমীর পরিবর্তন আনে। এখানে দুই একটি নাচের গানের পরিচয় দিচ্ছি। এইটি 'ভাওইয়া'—

৭২। দুগইতা—দুঃখী।
৭৩। কোলা—কোল।

৭৪। ডেঙরা—কলংক।
৭৫। আউটিয়া—ঘন করিয়া।
৭৬। 'একহন্দ মাথার ক্যাশ' দুইহন্দ কইরে—প্রণাম করার সময় মাথার চুল দুই ভাগ করে নিয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা জানান রীতি ছিল।
৭৭। মোটাপয়ার বা কৃষ্ণধামালী—অমার্জিত। সুকল পয়ার বা শুক্লধামালী—মার্জিত।

"পরশী (৭৮) আপনার নোয়ায় বান্ধব রে।
নলের আগ্‌নে তলে তলে খাগ্‌ড়ার
আগ্‌নে জ্বলে
মোর আবাগীর (৭৯) মনের আগ্‌নে নিবায়
কোন জনে রে।
দল্‌বাড়ী খান দলো রে দলো তাতে বাঘের ভয়
তোমরা ক্যানে আসিলেন বান্ধব
আমরা গেইলং হয় রে।
ঝরি পড়ে রিমি রে ঝিমি
মলেয়ায় তোলায় বাও (৮০)
ওরে ছাইনচা দোয়্‌য়া (৮১) আসিয়া
বান্ধব খোপায় মোছ পাও রে।

৭৮। পরশী—প্রতিবেশী। পড়শী।
৭৯। আবাগী—অভাগিনী।
৮০। বাও—বাতাস।
৮১। ছাইমচা দোয়ারা—কানাচ বাহিয়া।

এইটি চট্‌কা—

"ধউলী মোরে মাঁই, সুন্দরী মোরে মাঁই
দোনো জনে বুদ্ধি করি চল্‌ পালেয়া যাই।
নাই শোনং মাঁই তোর মুখের রাও (৮২)
চাঁদি রূপার মতো জ্বলে তোর গাও
তোক যদি পাওং মাঁই ছারোং বাপ মাও।
এটি (৮৩) যদি হয় মাঁই গণ্ডগোল
একদমে চলি যামু 'মরুচবাড়ীর' কোল
অটি (৮৪) আছে বড়মামা শুনিবে
আন্ডোল, (৮৫)।

৮২। রাও—কথা।
৮৩। এটি—এখানে।
৮৪। অটি—ওখানে।
৮৫। আন্ডোল—আব্দার।

তবে কথা দিয়ে এর পার্থক্য বোঝান যায় না। সুর, তাল, লয়ের ভেতর দিয়েই এর ভিন্নরূপটি প্রকাশ পায়। এখানে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ে, তাই এখানে তার আভাস মাত্র দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এ সম্বন্ধে যাঁরা ভাল 'গীদালী' থাকেন তাঁদের আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে। এই একই ধরণের নাচকে তাঁরা কখনই এক-ঘেয়ে হতে দেন না। আমাদের 'গীদালী' মশোমাসীও কথা, সুর, তালের অদল-বদলে সমস্ত রাতটিকে একটি অদ্ভুত গতি দিয়ে কি করে পার করে নিয়ে গেলেন জানি না। যখন কাক কোকিল ডেকে উঠল তখন সবাইর খেয়াল হল রাত শেষ হয়ে এসেছে। এখনও 'আগ্‌নেওয়া'র (৮৬) ব্যবস্থা বাকি।

এটিও একটি অভিনয় পর্ব। এখানে সমস্ত কৃষিকর্মটি হাস্যকৌতুকের মাঝখান দিয়ে দেখান হয়। জমিতে হাল দেওয়া থেকে শুরু করে ধান ঘরে তোলা পর্যন্ত এর মধ্যেও গান এবং বহু ছড়াকাটা হয়ে থাকে।

প্রথমে 'হাল্‌য়া' (৮৭), মশায় 'ঝাপি' (৮৮) মাথায়, এক হাতে একটি মেলো হুঁকো টানতে টানতে, কাঁধে বাঁশের কাল্পনিক 'নাঙল জোঙাল' ও এক হাল গরু নিয়ে আসরে ঢুকলেন। অবশ্য গরু দুটি চতুষ্পদ নয়, দুটি ছোট্ট মেয়েকে হামাগুড়ি দিয়ে চতুষ্পদ সাজান হয়েছে। তারপর 'হাল্‌য়া' মশায় যেই 'হাল জুড়লেন' অমনি বাঘের তর্জন গর্জন। ঘটি মুখে মুখ লাগিয়ে ঐরকম গর্জন করা হয়। তখন গান শুরু হয়েছে।

"শোন সোয়ামী সোনার ধন বাইরাইস না
বাঘার দুন্দুলি ছাড়ে
এটি কোনার বাঘ নোয়ায় বগড়ী বাড়ীর বাঘ
বাঘের পেন্দনে নেংটি, মাথায় পাগ্‌ (৮৯)।
কুত্তি গেলু রে থের্‌থেরা নাটি,

৮৬। আগ্‌নেওয়া—নতুন ধান হলে প্রথম ঘরে ধান তোলার সময় পুজো দিয়ে ধান তোলার নিয়ম প্রচলিত। এই ধান ঘরে তোলাকে 'আগনেওয়া' বলে।
৮৭। হাল্‌য়া—যারা হাল দেয়।
৮৮। ঝাপি—স্থানীয় টোকা।
৮৯। পাগ্‌—পাগড়ী।

বাঘাক পিট্টিয়া(৯০) থোং বাইরগাঙের ভাটি
শোন সোয়ামী সোনার ধন বাইরাইস্ না
, বাঘায় দন্দুলি ছাড়ে।"

কিন্তু যতই ভয় দেখান হোক, বাঘ এসে গরু দুটি নিয়ে উধাও। তখন 'হালুয়া মশায়' প্রাণপণ চেঁচাতে শুরু করেছেন, লোকজন ডাকা হচ্ছে, (ছড়া)—

"সামার বেটা মামা রে গরু নিয়া
গেইল বাঘেরে
নিয়া গেইলতে নিয়া গেইল আগা হালের
গরুরে।"

তখন লোকজন এসে বাঘ মেরে গরু উদ্ধার করে আনল। (ছড়া)—

"বাঘ মারিয়া আইলংরে, ইমাম্ বকসিস
পাইলংরে।"

তারপরে যথারীতি হাল দিয়ে ধান ফেলা হচ্ছে। (গান)

"হেঁউতি (৯১) বিত্তির (৯১) আরো
ধান ফেলাইলং জমিনে
বইনার নওং মুক্তি বইনের নওং মুক্তি
যাইম রসিয়ার সঙ্গে রে।" ইত্যাদি

এবারে নিড়ানি—

(ছড়া) "মারেয়া ঘরের নিড়ানি, থানিকো
না দেয় জিরানি,
পানিক করি নিলিয়া খাই,
ঘাড়ায় ঘাড়ায় জল খাই।"

তারপরে ধান তো পাকল, এবারে ধান-কাটার পালা। এইটে মারেয়ানীর করণীয় পর্ব। ফুলবাশী পুরেবধূকে উদ্দেশ করে বলল, "যাও রে, যা যাও তুই 'আগ' বেলা তোল যায়য়া। রাইত পোয়াইল্ দেরী না করিস।" বধূ মধুমালা তখন একখানা কুলো ও একটি 'কাচি'(৯২) নিয়ে কাতির সামনে যে ধানের চারটি পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল এবং 'জুই-জোকারের' মাঝে সেই ধানের শিষগুলি কেটে নিয়ে কুলোয় তুলে রাখল।

তারপর সেই ধান আবার 'মাড়া' 'মাড়ার' বাবস্থা হল। তারপর ঘরে তোলার জন্য কিছুটা ধান কুলোয় তুলে রেখে বাকিটা বিক্রির ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে ঐ শিষ থেকে তো আর ধান বেরুতে পারে না, তাই এক ডালি ধান আলাদা করে রাখা থাকে তার সঙ্গে এই ধান মিশিয়ে দেওয়া হয়।

৯০। পিট্টিয়া—তাড়াইয়া।
৯১। হেঁউতি—আমন। 'বিত্তির—আউস।'
৯২। কাচি—কাস্তে।

এখন ধান কিনবে কে? দেখা গেল, এক বিরাট ভুঁড়িওয়ালা এবং তেমনি বিরাট এক পাগড়ী বাঁধা 'ভাটিদেশ'(৯৩) থেকে এক 'ভাটিয়া ব্যাপারী' এসে হাজির হয়েছে। তার কাপড়টি হাঁটুর ওপরে হলেও কোঁচাটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। একটি টাকার থলি কোমরে বাঁধা। তখন তাকে নিয়ে আবার চলল হৈচৈ হাসি মশকরা। তখন গান হচ্ছে—

"ভাটি হাতে আইল্ ব্যাপারী
তার হোঁদোলা(৯৪) প্যাট্টা
আচ্ছা বাই হে নাচকাট্টা(৯৫)
দাড়িও পাকায়, ভুরুও চট্কায়, আরো কিবা
কয় হে
হাটিয়া যাইতে, ঠাট্টা মারে, কার শরীলে সয় হে
আচ্ছা বাই হে নাচকাট্টা।" ইত্যাদি

পরে অনেক দরকষাকষির পর দরদাম ঠিক হ'লে তবে সেই ধান বিক্রি হ'ল। এই পর্ব শেষ হতে হতে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। তখন সে আর এক দৃশ্য। নাচনীদের আর সেই ললিত লীলায়িত রূপ নেই। লুটিয়ে পড়া চাদরটি কোমরে জড়িয়ে ঘটের মুখ থেকে সবাই এক একটি ধনু তুলে নিয়ে কাতির চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। এবারে 'বাদুলহানার'(৯৬) পালা। কোন

৯৩। ভাটিদেশ—ব্রহ্মপুত্রের ভাটিতে যারা বাস করে তাদের 'ভাটিদেশা' বা 'ভাটিয়া' বলা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকদের বলা হয়ে থাকে। এবং উজানে যারা বাস করে তাদের উজানীয়া বলে।
৯৪। হোদোলা—হোঁৎকা।
৯৫। নাচকাট্টা—নাককাটা, নির্লজ্জ।
৯৬। বাদুলহানা—বাদুড়মারা।

'দুরদেইশা 'বাদুল' এসেছে কি গোপন অভিসন্ধি নিয়ে—তারি বিরুদ্ধে অভিযান। গান আরম্ভের সঙ্গে তীর মারার ভঙ্গীতে নৃত্য শুরু হল। এই ধনুকগুলি এমনভাবে তৈরী করা থাকে যে, গুণ টেনে ছেড়ে দিলে তীরগুলি বেরিয়ে যায় না, খট্ করে আওয়াজ হয়ে আটকে যায়। গানের সঙ্গে খট্ খট্ করে তাল দিয়ে নাচ হচ্ছে। গানে বলা হচ্ছে—

"দূর হাতে আইল রে বাদুল কলা খাবার আশে
ঐ গাছের কলা গাছে রইল
বাদুল গেইল মোর দাশে রে।
গাছের আড়ে থাকিয়া বাদুল
কানের সোনা দাচে রে,
গাছের আড়ে থাকিয়া বাদুল
কমরের সাড়ী দাচে রে।
ঐ গাছের কলা গাছে রইল
বাদুল গেইল মোর দাশে রে।"

তাই তো! তা হলে কার জন্য আর এই রণসজ্জা। এ কোন্ নিস্পৃহ বাদুল! তখন মারেয়ানীকে বলা হচ্ছে—

"তীর পড়ে ঝাকে রে ঝাকে বাটুল(৯৭)
পড়ে রয়য়া(৯৮)
কুড়ি গেল, রে মারেয়ার মাইয়া(৯৯) তীর
কুড়াও আসিয়া রে।"

তখন তীরধনুক রেখে দেওয়া হল।

এখানে যে সব 'লোকসংগীত' প্রচলিত আছে, তাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় 'প্রণয়ী'কে কোন পক্ষী, মৎস্য বা অন্য কোন জীবের কাল্পনিক নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। যেমন—

৯৭। বাটুল—গুলতি।
৯৮। রয়য়া—রয়ে, রয়ে—থেকে থেকে।
৯৯। মাইয়া—স্ত্রী।
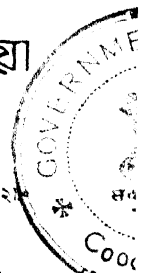
"গঙ্গাধরের ধূ ধূ বালা, 'রাজহংসা'
পংখী কান্দে
গলায় তার গজমতির মালা,
'রাজহংসা'র কান্দনে বাড়ী ঘর
মোর না খায় মনে রে
মনটা মোর বাইরাওং রে বাইরাওং করে।"

কিম্বা

"ও কুড়ুয়া(১০০) হায় রে হায়,
তোস্যা নদীর পারে রে পারে,
"ও কুড়ুয়া হায় রে হায়
ওকি দ্যাখাও কুড়ুয়া মোক বাবার দ্যাশের
ময়াল(১০১)রে
তোস্যা নদীর পারে রে পারে,
আমার কুড়ুয়া নিত্যে আহার করে রে।

১০০। কুড়ুয়া—কুঁড়োপাখী।
১০১। ময়াল—মহল, বাড়ী।

পুবালা পাবিরা রে রাও,
আমরা কুড়ুয়া ধূলায় অধিকার রে
সাড়ীরে আঞ্চল রে দিয়া মোছং
কুড়ুয়ার গায়েরে না ধূলা রে।

এখানে 'রাজহংসা' ও 'কুড়ুয়া' প্রণয়ীকেই উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে।

[ছয়]

এবারে ভোর হয়ে গেছে। পূর্বদিকে মেঘের কোলে লালচে আভা ফুটে উঠেছে। এবারে খোঁজ পড়ল 'ঢাকুয়া'র। ঢাকুয়া মশায়ের অবস্থাটি বড় অদ্ভুত। অনুষ্ঠানে বেচারা যোগ দিতেও পারে না কিন্তু সারারাত সমানেই মাঝে মাঝে বাজাবার জন্য জেগে থাকতে হয়। এই দীর্ঘ অভিনয়টির ফুরসতে বাইরে গিয়ে বেচারা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আবার তাকে হৈ চৈ করে তুলে আনা হল। এবারে আগনেওয়ার পালা। বাজনা হল শুরু। ফুলবাশী এবারে নিজে এসে কার্তিককে প্রণাম করে ধান তুলে রাখা আগনেওয়ার কুলোটি মাথায় নিয়ে কার্তিকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে নাচনীর সমস্ত দলটি তিনবার ঘোরার পর ফুলবাশী নাচতে নাচতেই দলবল নিয়ে চলল এইবারে পুবের বাস্তুঘরটির দিকে।

মুখ ঘুরিয়ে বসতেই সেদিন যে অপূর্ব দৃশ্যপটটি চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল আজও তা মনের মধ্যে অপরূপ রূপ নিয়ে আঁকা হয়ে আছে।

ঘরের কানাচ দিয়ে উত্তরে চোখ পড়তেই দেখি বাঁশঝাড়টির পাশ দিয়ে 'হিমগিরি' তার তুষারধবল ঝকঝকে রূপালী চূড়াটি বাঁকিয়ে যেন বিমোহিত হয়ে এই নৃত্যলীলা উপভোগ করছেন। চারদিক থেকে আমাদের 'পরশী' ও 'দূরদেইশা' নবাগত বিহঙ্গকুল একযোগে এক অভিনব সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। উপর দিয়ে চলেছে ধনুর ফলার মত একটি 'রাজ-হংসা'র ঝাঁক 'বাইর গাঙ'-এর অভিমুখে। তারাও এই অপূর্ব সমারোহে আকৃষ্ট হয়ে ঘাড়টিকে বাঁকিয়ে দেখে তাদেরও সঙ্গীতটিকে উপহার দিয়ে গেল।

এদিকে সূর্যদেব হাল্‌কা কুয়াশা ঢাকা গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সহস্রটি রঙিন হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের শিল্পিবৃন্দ পূর্বদিকে মুখ ফেরাতেই তরুণ অরুণ তাঁর রাঙা সোনার হাতের মৃদু উষ্ণস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানালেন। রঙিন আভা ফুটে উঠল তাঁদের ক্লান্তিমধুর মুখমণ্ডলে।

ততক্ষণে তাঁরা সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন। চালের উপর জল ছড়িয়ে দিলে তবেই ঘরে ঢুকতে পারবেন। একটি কিশোরী ছুটলো জলের উদ্দেশে। কিন্তু এই বিলম্বজনিত কষ্ট 'হিমাচলে'র যেন সহ্য হল না। ছুটে এল এক 'উত্তরে দেইশা রসিয়া শৈতা' হাওয়া। ঘরের সামনেই একজোড়া শিশির ভেজা 'গুয়া' গাছ সদ্যস্নাতা দুটি সখির মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের এলিয়ে পড়া চুলের মতো পাতাগুলিকে নাড়া দিল এসে। ঝুর্ ঝুর্ করে হীরের কুচির মত শিশিরকণা ছড়িয়ে পড়ল শিল্পীদের মাথায়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত প্রকৃতিদেবী ও ধরিত্রীদেবীর দুলালীদের সম্মিলিত এই অপূর্ব মহোৎসব নির্বাক বিস্ময়ে উপভোগ করছিলাম।

এমন সময় কলহাস্যে ফিরে তাকিয়ে দেখি, ঠাট্টার সম্পর্কীয়ারা হাতধরাধরি করে দোরের সামনে সারি করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। 'মারেয়ানী'র ঘরে ঢোকার উপায় নেই। 'মারেয়ামশায়'কে উদ্দেশ করে গানে বলা হচ্ছে "শিগ্‌গির টাকা সিক্কা বার কর, তবে এই 'হাওর'(১০২) খুলবে। নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে তোমার গৃহিণীই শীতে কষ্ট পাবে।" কিন্তু মারেয়া মশায় তখনো সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাই তাঁর অনুপস্থিতিতে মারেয়ানীকেই তাদের সঙ্গে রফা করে নিতে হল। তখন আগল খোলা পেয়ে মারেয়ানী 'আগ' নিয়ে ঘরে তুললেন। এইখানেই পূজার অনুষ্ঠান শেষ হল।

ততক্ষণে প্রসাদ বিলি আরম্ভ হয়েছে। অভ্যাগতারা কেউ বা মোলামুড়কীর পুঁটলী, কেউ বা পূজার ধনু ও ঘ[illegible] কাঁধে নিয়ে সারি সারি বাড়ী অভিমুখে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। ফুলবাশী বেরিয়ে আসতে তার সেই 'রক্তের দানা'টির মঙ্গলকামনা জানিয়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই অভূতপূর্ব পরিবেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

১০২। হাওর—আগল।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সে

সে ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১

'সে' কেবল ছোট গল্পের সমষ্টি নয়, বিশেষভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিতও বটে। তৎসত্ত্বেও ইহাতে বয়স্কদের উপভোগের সামগ্রী যথেষ্ট আছে, এমন কি বয়স্কদের উপভোগের সামগ্রীই যেন অধিক। ইহার গল্পগুলির সমগ্র ও যথার্থ রস অল্পবয়স্কদের গ্রাহ্য হয় না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু ইহাকে ছোট গল্পের সমষ্টি গণ্য না করিলেও চলে, ইহার অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা বর্তমান। কাহিনীর ধারাবাহিকতা নয়, নায়ক-নায়িকার ধারাবাহিকতা। 'সে' গ্রন্থের প্রধান নায়ক-নায়িকা তিনজন, আমি (গল্প-কথক), তুমি (গল্পের শ্রোতা অর্থাৎ পুপুদিদি) আর সে। এ তিনজন ছাড়াও অরও লোক আছে, তবে তাহারা গৌণ, কেবল শেয়াখালের সুকুমারের কিছু গৌরব আছে।

'সে' গ্রন্থটি কিম্ভূত-রসাশ্রিত একটি কাহিনীর ধারা। 'সে' মানুষটি কিম্ভূত-রসাশ্রিত একটি ব্যক্তি। তাহার চরিত্রের কিম্ভূতরসের সম্ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া গল্পগুলি গঠিত বলিয়াই সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন যে, এতদিন রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্রকে আশ্রয় করিয়া গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এবারে এই সর্বমানবের যুগে একটি অতিশয় সাধারণ মানুষকে অবলম্বন করিয়া রূপকথা লিখিতে বাধা কি? তাহার একমাত্র পরিচয় সে মানুষের পুত্র, তাহার অধিক আর কিছু নয়, তাহার অধিক আর কী ই বা হইতে পারে?

আগের দিকে এক স্থানে বলিয়াছি যে, 'সে' গ্রন্থটি বুঝিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিশ্ব-পরিচয় মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। ছবির সঙ্গেই 'সে'-র সম্বন্ধটা স্পষ্টতর। রবীন্দ্রনাথের ছবির মতোই 'সে' কিম্ভূত-রসাশ্রিত শিল্প। অনেকে যেমন মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি তেমন অবাস্তব নয়, উহা কিম্ভূত-রসাশ্রিত বাস্তব। সাধারণতঃ ছবি বলিতে যাহা বুঝি, তাহা রূপের রূপ, রবীন্দ্রনাথের ছবি অরূপের রূপ। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে রূপ হইতে অরূপে গিয়াছেন, আর ছবির বেলায় অরূপ হইতে রূপে নামিয়াছেন। এই মূল কথাটা যে না বুঝিল, তাহার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও চিত্র দুই-ই দুর্বোধ্য হইয়া থাকিতে বাধ্য। এখন অরূপে আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কাজেই তাহার ছবিও কতক অস্পষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য। ঐ অস্পষ্টতার আলো-আঁধারেই কিম্ভুতের লীলাভূমি। সেই যে লীলাভূমি হইতে কবি ছবিগুলিকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেখান হইতেই 'সে'কেও বাহির করিয়াছেন।

আর বিশ্ব-পরিচয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে হুঁহাউ দ্বীপের কাহিনীটিতে।৩ বৈজ্ঞানিক সত্যকে বালকের উপভোগ্য কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম নয়, আগেও আছে; এই শেষ নয়, পরেও আছে গল্পসল্প গ্রন্থে।

সুকুমার বালকটির মধ্যে তিন সঙ্গী গ্রন্থের অভীককুমারের পূর্বগামিনী ছায়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মনে হয়। দু'জনেই ছিল চিত্রকর, আর অবশেষে এঞ্জিনীয়ার হইবার উদ্দেশ্যে দুজনেই বিলাত রওনা হইয়া গিয়াছে। অভীককুমার বাল্যকালে হয়তো বা সুকুমারের মতোই ছিল।

---

১ "নবপর্যায় সন্দেশ পত্রিকার ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে ঐ গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোন কোন অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কার্তিক, পৃঃ ১—৬) যাহা মুদ্রিত হয় প্রায় তাহাই 'সে' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে; ভূমিকাংশটি (রংমশালের পাঠ) 'সে' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় ঈষৎ রূপান্তরিতভাবে গ্রথিত আছে। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠায় 'এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ' কবিতাটি ১৩৪১ বৈশাখের মুকুল পত্রিকায় (নবপর্যায় পৃঃ ১—২) 'বাঘের চিতা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।" গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ৬৫২--৫৩ রবীন্দ্ররচনাবলী ২৬শ খণ্ড।।

'সে'—১ম অনুচ্ছেদ।

৩ ২য় অনুচ্ছেদ।। বিশ্বপরিচয় প্রকাশ ১৩৩৪ সাল।

একাদশ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 'সে' এক রকম চলিয়া আসিয়াছে, এক প্রকার অলৌকিক গাঁজার ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হইয়া তাহার দেহ ও ব্যক্তিত্ব যেন সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ দ্বাদশ অনুচ্ছেদে আসিয়া 'সে'র এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুর-বেসুরের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বসৃষ্টির যে ইতিহাস সে বর্ণনা করিয়াছে, অপরূপ কবিত্বে ও ভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তাহা পূর্বতন সে-র পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কবি-প্রতিভার Fancy এতক্ষণ যাহাকে Caricatureরূপে আঁকিতেছিল, এবারে তাঁহার Imagination তাঁহাকে সবলে সবেগে পূর্ণায়ত সৃষ্টির স্বর্গে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। দ্বাদশ অনুচ্ছেদটিই গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শেষের কবিতার প্রথমাংশে যে কিম্ভূত অমিত রায়কে দেখিতে পাই, তাঁহার সঙ্গে শিলংএর অমিত রায়ের কতক পরিমাণে এই রকম পার্থক্য।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ ছাড়াও পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদও কবিত্বে ও ভাবের গভীরতায় পূর্বতন অনুচ্ছেদগুলির চেয়ে অনেক রস-সমৃদ্ধ। এই শেষ তিনটি অনুচ্ছেদে কবির কলম যেন পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য, 'সে' গ্রন্থের সর্বত্রই ভাষার ভঙ্গীতে ও Fancy-র লীলায় রবীন্দ্রনাথের হস্তচিহ্ন বর্তমান, শেষের তিনটি অনুচ্ছেদ তো অমূল্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বইখানা অল্পবয়স্কের সম্পূর্ণ উপভোগ্য বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য এত অধিক যে ছেলেমেয়েরা তাহাদের মতো গ্রহণ করিবে আর বয়স্কগণ তাহাদের মতো গ্রহণ করিবে, তবু সব ফুরাইবে না। মহৎ লেখকের অকিঞ্চিৎকর রচনার ইহা একটি বৈশিষ্ট্য।

গল্পস্বল্প

"গল্পস্বল্প ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়।"১

গল্পস্বল্প গ্রন্থে ষোলটি গল্প আছে প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে একটি করিয়া কবিতা সংযুক্ত, ঐ গল্পের ভাবার্থবাহী।

গল্পস্বল্পের অনেকগুলি গল্পের মূলে কবির বাল্যস্মৃতি বর্তমান। সেই সব স্মৃতির একহারা রূপ জীবনস্মৃতি বা ছেলেবেলায় পাওয়া যাইবে।২

গল্পগুলি প্রত্যক্ষত অল্পবয়স্কের জন্য লিখিত হইলেও এগুলির সম্যক রস গ্রহণ কেবল বয়স্কদের পক্ষেই সম্ভব। ক্ষীণকায় গল্পস্রোতের আড়ালে যে প্রচুর মননশীলতা বর্তমান—তাহাই এ-গল্পগুলির প্রধান সম্পদ। আর প্রধানতম সম্পদ গল্পসংলগ্ন কবিতাগুলি। গল্পগুলি সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে; কবিতাগুলি সম্বন্ধে সে অবকাশ সংকীর্ণ।

শেষ কবিতাটিতে কবি যেন স্বহস্তে জীবন রঙ্গমঞ্চের যবনিকাপাত করিয়া বাতি নিভাইয়া দিবার পূর্বে বিচিত্র জীবন-নাট্যের ভরতবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন—

সাঙ্গ হ'য়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।

সময় হ'য়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার যবনিকা

খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা

চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনমতেই চলবে নাতো আর

অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে কিম্বা হ'ল হার।

(ক্রমশ

১ "দু একটি মাত্র বাদে গল্পস্বল্পের সমস্ত রচনা রবীন্দ্রজীবনের শেষ বৎসরের ফসল।" গ্রন্থ পরিচয়, পৃষ্ঠা ৬৫৩, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬শ খণ্ড॥

২ রাজার বাড়ী, মুনশী, ম্যাজিশিয়ান, মুক্তকুন্তলা প্রভৃতি বাল্যস্মৃতিমূলক।
'রাজার বাড়ী'র ভাবাবলম্বনে শিশুকাব্যের **রাজার বাড়ী কবিতাটি লিখিত।**

সোনার সিঁড়ি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ঋষিতুল্য লোক তারাপদবাবু। তারাপদ রায়। কিন্তু তা হলে রে কি। সংসারে যাঁরা সৎ ও মহানুভব রা দুঃখ পান বেশি। দুঃখ তাঁদের ধ্যে পাকাপাকিভাবে আসন পেতে বসে কছুতেই নড়তে চায় না।

দীর্ঘকালের অদর্শনের পর সেদিন রাপদবাবুকে দেখে কথাটা আবার মনে ল। বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ মূর্তি ক্লান্ত অসহায় ষ্টি। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। কমন আছেন?' প্রশ্নটা অন্যভাবে করলাম। াপনার শরীর এখন কেমন, সেই যে স্রাবে একটু শুগার পাওয়া গিয়েছিল' নমটায় ছিলেন কেমন?'

'ও কিছু না, ও কমে গেছে।' চিরকাল তাঁর স্বভাব, নিজের দুঃখ অপরে ঝতে না পারে তার প্রাণপাত চেষ্টা করে শেষ ব্যস্ত হয়ে তারাপদবাবু বললেন, সুন বসুন। কবে ফিরলেন? তারপর, পনার ব্যবসাবাণিজ্য চলছে কেমন?'

'মোটামুটি ভাল। পরশু ফিরেছি লকাতায়।' ঈষৎ হেসে কথাটা বললেও শ তীক্ষ্ণভাবেই তাঁর দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম ক'মাসে তিনি আরো বেশি বুড়িয়ে গেছেন, কপালের রেখা ক'টা আরো গভীর ও দীর্ঘ হয়েছে। যেন পরমুহূর্তে আমি কি প্রশ্ন করব টের পেয়ে তারাপদ-বাবু তাড়াতাড়ি চাকরকে ডাকলেন, 'কইরে বাবুকে চা দিলিনে।'

বললাম, 'দেবে, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। একবার তো খেয়ে বেরিয়েছি। তারপর—' চুপ করে গেলাম। লক্ষ্য করলাম তারাপদবাবুও হঠাৎ অতি-মাত্রায় গম্ভীর হয়ে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে আছেন। শূন্য আর্ত চাউনি। একটা ঢোক গিললাম। আর, একটুক্ষণ কাটতেই আমার খেয়াল হল যেন বাড়িটা বড় বেশি চুপচাপ হয়ে আছে। যেন কে নেই, কারা নেই। তারাপদবাবুর মত আমিও গম্ভীর হয়ে তাঁর পিছনে টাঙ্গানো দেয়ালপঞ্জীটা দেখতে লাগলাম। চাকর টেবিলে চা রেখে গেল। দেয়ালের কোন্-দিকে একটা টিকটিকি শব্দ করে উঠল। 'তারপর, বাইরে জিনিসপত্র কোলকাতার চেয়ে সস্তা দেখে এলেন নিশ্চয়।' তারা-পদবাবু চোখ তুললেন।

'হ্যাঁ, কিছুটা, তা-ও সব না, দুধ মাংসটা একটু—' অপ্রাসঙ্গিক না হলেও নিতান্তই সময় কাটানোর জন্যে, অথবা চট করে মূল প্রসঙ্গ না টেনে আমি সতর্কতাস্বরূপ বেশ কায়দা করে তারাপদ-বাবু অন্যদিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করছেন বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু ঐ 'একটু' পর্যন্ত বলার পর আমি থেমে যাওয়াতে তিনি যেন ধরা পড়ে গিয়ে, কেমন থতমত খেয়ে আবার মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অবশ্য তার কারণ ছিল। তারাপদ সারাজীবন যে কি অপরিমেয় ঘা খেয়েছেন এবং এখনো খাচ্ছেন সংসারে আমার চেয়ে সেকথা আর কেউ বেশি জানে না। এক সঙ্গে এক জায়গায় অনেকদিন দু'জনে কাজ করেছি। ব্যবসার লাইনে চলে গেলেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র বরাবর বজায় আছে। সময় এবং সুযোগ পেলেই আমি দেখা করতে ছুটে আসি। তারাপদ নিঃসংকোচে তাঁর দুঃখের কথা আমাকে খুলে বলেন। এবার অনেক দিনের অসাক্ষাতে বেশ একটু সংকোচ বোধ করছেন টের পেয়ে আমি আস্তে আস্তে

প্রশ্ন করলাম, 'রমাপদর আর কোন খবর পেয়েছেন কি? সে বাড়ি এসেছিল?'

একটু সময় চুপ থেকে তারাপদবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন করুণ-ভাবে হাসলেন যে দেখে বড় কষ্ট হল।

'আপনি তো জানেন আমার কষ্ট বাড়ানো ছাড়া কমানোর পাত্র সে নয়।' কথা শেষ করে বাঁ হাতের তেলো দিয়ে তিনি চোখের কোণা মুছলেন।

একটুও ইতঃস্তত না করে বললাম, 'আপনি খামকা দুঃখ করছেন। যে ফিরবার নয় যার সংশোধনের কোনো আশা নেই, মিছিমিছি তার কথা ভেবে হায়-আপসোস করে লাভ কি।' একটু থেমে পরে বললাম, 'কি, আবার টাকা চাইতে এসেছিল বুঝি?'

'না।' বলে তারাপদ আবার অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'বৌমা ভাল আছেন তো, খুকু কেমন আছে?' এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কই নাতনিকে দেখছি না যে, বাইরে বেড়াতে গেল কি?

'না।' হাতের তেলো দিয়ে তারাপদ আবার চোখ মুছলেন। 'খুকুকে ওর মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'বৌমা বাপেরবাড়ি গেছেন বুঝি?' একটু ইতঃস্তত করে বললাম, 'হঠাৎ?'

কিছু বললেন না তিনি। আমার চোখে চোখ রেখে তারাপদ সেই বুক-ভাঙ্গা হাসি হাসলেন। আমি চোখ সরিয়ে নিই। আশঙ্কা না শুধু, কেন জানি স্থির বিশ্বাস জন্মাল, এর পিছনে, অর্থাৎ একটিমাত্র সন্তানসহ রমাপদর স্ত্রীর বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কারণও তারাপদর সুপুত্রটি রয়েছে। হ্যাঁ, রমাপদ, তারাপদবাবুরও চোখের মণি, একমাত্র সন্তান। অপদার্থ নিশ্চয় সম্প্রতি বাড়িতে এসে এমন কোন কাজ করেছে যার জন্যে বৌ বাচ্চাটাকে নিয়ে এখান থেকে সরতে বাধ্য হয়েছে, কি দিনের পর দিন স্বামীর দুষ্কৃতি দুরন্তপনার কথা শুনে শুনে লজ্জায় দুঃখে এই সংসারের সকল বন্ধন সমস্ত মায়া আশা ত্যাগ করে দুঃখিনী দূরে সরে গেল। এই হয় এই স্বাভাবিক।

না, খুব যে একটা খারাপ ছেলে হবে রমাপদ ছেলেবেলায় তা বোঝা যায়নি। তারাপদ বড় যত্ন করতেন, সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন ছেলেকে। বিশেষ, খুব অল্প বয়সে ও মাকে হারায়। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার ফলে সংসারে অশান্তি বাড়বে, রমাপদর অনাদর হবে বুঝতে পেরে তারাপদ সেই পথেই যাননি। তখন আর তাঁর বয়স কত, বত্রিশ তেত্রিশ মোটে ছিল। কিন্তু তারাপদ তা গ্রাহ্য করেননি। বরং ছেলের যত্ন করে সারাক্ষণ তার খাওয়া-পরা স্বাস্থ্য লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে তিনি সুখী ছিলেন। বছর যেতে লাগল রমাপদ একটু একটু করে বড় হতে লাগল। বেশ ভালভাবেই ও ম্যাট্রিক পাশ করল। দেখতেও বেশ সুশ্রী হয়ে উঠল। কতদিন তারাপদবাবু ছেলেকে নিয়ে অফিসে গেছেন। আমরা তারাপদর বন্ধুরা প্রায় কাড়াকাড়ি করে রমাপদকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে আদর করেছি কেক-সন্দেশ খাইয়েছি। চা খেত না। তারাপদ বলতেন, চায়ে লিভার খারাপ করে আমি রোজ ওকে একবাটি করে টমেটোর রস খাওয়াই। বলতাম আমরা, টমেটো ফুরিয়ে গেলে কি খায় ছেলে? একটু ঠাট্টার সুর ছিল আমাদের কথায় টের পেয়েও তারাপদ তা গ্রাহ্য করতেন না, বলতেন সরবতি নেবুর রস দিই বেদানা দিই। শুনে আমরা চুপ করে গেছি। হ্যাঁ, যেমন লেখাপড়া তেমনি পুত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বাপের বড় বেশি সতর্ক দৃষ্টি ছিল। আর তার ফলে রমাপদর গায়ের রংটিও হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল মসৃণ, সুন্দর গায়ের চামড়া। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। ষোল সতেরো বছর বয়স তখন ওর। প্রথম যৌবনের লাবণ্য সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছিল। ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফের রেখা প্রতিভামণ্ডিত স্বচ্ছ সুন্দর চোখ মখমলের মত তকতকে ঝকঝকে কালো চুলে যে কী অদ্ভুত দেখাত তারাপদর ছেলেকে। সেই ছেলে কলেজে ভর্তি হল। তারাপদ গাড়ি ঠিক করে দিলেন ছেলেকে কলেজে নিয়ে যেতে কলেজ ছুটির পর বাড়ি পেঁৗছে দিতে। রাস্তাঘাটে বাজে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে রমাপদ না খারাপ হয়ে যায় এই চিন্তা বাপের সর্বক্ষণ ছিল। হায়, সেই ছেলে কলেজে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কি হয়ে গেল! লেখাপড়ার দিকে আর মন নেই। সর্বদা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। কিছু বললে রমাপদ নাকি উত্তর দিত কি হবে এইসব ধরাবাঁধা পাঠ্য পুস্তক মুখস্ত করে, এসব হল কেরানী তৈরী করার ওষুধ, —এগুলো গলাধঃকরণ করে অফিসে চাকরি পাওয়া যেতে পারে মানুষ হওয়া যায় না। শুনে তারাপদ স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। অফিসে গোপনে আমাকে ডেকে সব বলতেন। একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে রমাপদকে কাছে ডেকে আদর করে আমি অনেক বোঝালাম। বললাম, বেশ তো অন্তত আই-এটা পাশ করে ফেল। এক বছর কেটেছে আর একটা বছর তো আছে মোটে। তারপর না হয় একটা টেকনিক্যাল লাইনে ঢুকিয়ে দেয়া যাবে। আমি ওর বাপের বন্ধু এবং বাইরের লোকও বটে, যেন বেশ একটু লজ্জা পেয়ে রমাপদ সেদিন চুপ করে অধোবদন হয়ে আমার সদুপদেশ শুনল। পরদিন থেকে নিয়মিত-ভাবেও পড়াশোনা করতে লাগল, কলেজে যেতে আরম্ভ করল। তারাপদ যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি সেটা। ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল বলে দুদিন একেবারে বাড়ি থেকে বেরোইনি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে একটু গল্পসল্প করব মতলব করে তারাপদর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হতে দেখি একলা মুখ ভার করে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। দেখেই মনে হল তারাপদ ঐ অবস্থায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে আছেন। কি ব্যাপার। অনেকক্ষণ জেরা করবার পর যা শুনলাম তাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পরীক্ষার ফিজ দেবে বলে রমাপদকে তিনি যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা নিয়ে রমাপদ বাড়ি থেকে পালিয়েছে। আজ দু'দিন। কোথায় গেছে কি বৃত্তান্ত তারাপদ কিছুই জানতে পারছেন না। কেবল ফিজের টাকা নিয়ে নিবৃত্ত থাকেনি। তারাপদর হাত-বাক্সের তালা ভেঙ্গে আরো শ'চার টাকা নিয়ে গেছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে তারাপদ কেঁদে উঠলেন। আমি অনেক করে বন্ধুকে বোঝালাম। অল্প বয়েস ছেলের। রক্ত গরম। নিশ্চয় কোনো বদ ছেলের উস্কানিতে পড়ে সে এই কর্ম করেছে। তা এ-টাকায় ওর ক'দিন যাবে। দুনিয়ার ও

কি দেখেছে। গেছে ভালই হয়েছে। একটু ধাক্কা খাক। ঠোক্কর খেয়ে আবার এখানেই ফিরে আসবে। ও এমন কোনো একটা লায়েক হয়ে যায়নি যে এখনি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে।

আমার কথা ফলল। দেড় মাস পর খবর পেলাম তারাপদর ছেলে বাড়ি ফিরেছে। শুনেই আমি তারাপদর বাড়ি গেলাম। তারাপদ দুঃখও করলেন, হাসলেনও। কি বিষয়, না রমাপদ নাকি সোজা মাদ্রাজে চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে একটা শিপ-ইয়ার্ডে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল। তার ইচ্ছা ছিল জাহাজের কারখানায় চাকরি নিয়ে সেখানে থেকে ধীরে ধীরে জাহাজ চালানোও শিখে ফেলবে। প্রথমে সাধারণ নাবিক পরে কাপ্তানের পদে যাবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সন্দেহ কি। কিন্তু শিপ-ইয়ার্ডে ঢোকা হল না এক ফিরিঙ্গি ছোকরার প্যাঁচে পড়ে। রমাপদকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেবে বলে নানারকম লোভ দেখিয়ে ফিরিঙ্গিটা রমাপদর সব টাকা আত্মসাৎ করল। রমাপদ গোড়ার দিকে একটা হোটেলে উঠেছিল। সেখানেই ছেলেটার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। টাকা নিয়ে সেই ছোকরা একদিন হাওয়া হতে রমাপদর চোখ খুলে যায়। তারপর আর কি। ক'দিন খেয়েদেয়ে রমাপদ যখন হোটেলওলার টাকা দিতে পারলে না হোটেল থেকে তাকে বার করে দেওয়া হল। রমাপদর তখন রাস্তায় দাঁড়ানোর অবস্থা। শেষটায় এক গুজরাতি ভদ্রলোক সব শুনে সদয় হয়ে কিছু টাকা দিয়ে নাকি রমাপদকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাহিনী শেষ করে তারাপদ মৃদু মৃদু হাসছিলেনঃ 'রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার করে ফিরেছে, কি বলেন।' শুনে আমি কতক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিলাম। বস্তুত ঐ কাহিনীর পিছনে কতটা সত্য ছিল আসলে কি ঘটেছে এবং এতগুলি টাকা এক সঙ্গে হাতে পেয়ে রমাপদ কোন্ দিকে পা বাড়িয়েছিল ইত্যাদি ভেবে কেন জানি আমার মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। অবশ্য তারাপদকে আমি সে সব কিছুই বললাম না। শুধু প্রশ্ন করলাম এখন ছেলে বলছে কি, আবার কলেজে ঢুকবে, পরীক্ষাটরীক্ষা দেবার মতলব আছে? তারাপদবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'না,—আমার মাথায় অন্য রকম প্ল্যান এসেছে। আর কলেজ ফলেজ না।' আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে সব শুনলাম। হাঁ না কিছু বললাম না। কথা শেষ ক'রে তারাপদ বললেন, 'বড় সাহেবকে আমি অলরেডি সাউন্ড ক'রেছি। আশাও পেয়েছি। দু'টো পয়সা নিজের হাতে হাতাবে এবং এদিক থেকেও একটু একটু দায়িত্ব বোধ জাগবে। ঠিক হয়ে যাবে,—আমার তো মনে হয় চাকরি এবং বিয়ে এক সঙ্গে ওকে পাইয়ে দিলে মতিগতি ফিরবে, শত হোক মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী ছেলে তো,—তাই নয় কি?' মৃদু মস্তক সঞ্চালন ক'রে সম্মতি দেওয়া ছাড়া হঠাৎ সেদিন আমার আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম বৌ পেয়ে কেমন তেমন চাকরি নিয়ে তারাপদর পুত্র সন্তুষ্ট থাকবে না। কেরানী হয়ে থাকা সে চাইত না। জানি না কথাটা তখনকার মত তারাপদবাবু ভুলে গিয়েছিলেন কি না।

বোধ করি হুট ক'রে এত অল্প বয়সে বিয়ের কথা শুনে রমাপদ নিজেও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে ছিল। দেখলাম তাই হ'ল। দিব্যি অফিসে যেতে লাগল। এদিকে বেশ খরচপত্র ক'রে তারাপদ রমাপদর বিয়ে দিলেন। রমাপদ দেখতে খুবই সুশ্রী কিন্তু দেখা গেল বৌটি আরো সুশ্রী আরো বেশি সুন্দর। বিয়ের পর পুরো একটা বছর তো অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস ছাড়া রমাপদকে আমরা কেউ ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে কি একটু সময়ের জন্যে বাড়ির বারান্দায় এসেও কোনো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে দেখিনি। সব দেখেশুনে তারাপদ আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন। অর্থাৎ তাঁর মনের ভাব ছিল কেমন হ'ল তো, আধারে না পুরলে পারদ ছড়ে-ছিটকে যাবেই, হাজারটা পা মেলে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করবে। ইংরেজীতে সে জন্যেই এর নাম দিয়েছে 'কুইক সিল্ভার'। মানুষের প্রথম যৌবনও তাই। যথাস্থানে একে আটকে না রাখলে বিপদ ঘটে।

ভাল, মনে মনে রমাপদর সুখী জীবন কামনা ক'রে আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু অনেকের জীবনেই সুখ সহ্য হয় না। রমাপদর কথা বলছি না। সে তার সুখের জীবন খুশিমত হয়তো বেছে নিয়েছিল। অপার দুঃখে নিমজ্জিত হলেন তারাপদ। দু' মাসের পাওনা ছুটি নিয়ে আমি সেবার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছুটির শেষে কোলকাতায় পা দিতে না দিতে তারাপদ আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার? রমাপদ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। চাকরি ছেড়েছে ব'লে তারাপদ দুঃখ করলেন না। বাড়ি-ঘর পর্যন্ত ছেড়েছে। কোথায় আছে কি করছে প্রশ্ন করবার আগেই তারাপদ যা বললেন শুনে আবার স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রমাপদ টালিগঞ্জে আছে এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুটি বড়লোকের ছেলে এবং বিশ্ব-বখাটে। বন্ধু পরামর্শ দিয়েছে, কেরানীগিরি রমাপদর লাইন নয়। পৃথিবীতে করবার, বাঁচবার অনেক ভাল ভাল পথ খোলা আছে। কোথায় কবে কি ক'রে সেই বন্ধু রমাপদকে জপিয়েছে তারাপদ সে-সব সংবাদ কোনোদিন পান নি। তিনি শুধু লক্ষ্য করতেন, রমাপদ আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে। অফিসে তো যাচ্ছেই না, বাড়িতেও খুব কম থাকে। বৌমাকে দু' একটা প্রশ্ন ক'রে তারাপদ শুধু এইটুকু জানলেন, রমাপদ নাকি কি একটা ব্যবসা করার ফিকিরে আছে। টাকার সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছে। এক বন্ধু কিছু টাকা দেবে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, আরো টাকার দরকার। সারাদিনের মধ্যে তারাপদ ছেলের দেখা পেতেন না। হয়তো তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়তেন অনেক রাত্রে রমাপদ বাড়ি ফিরত। তখন ছেলেকে ডেকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করার সময়ও হ'ত না এবং তাঁর মেজাজও থাকত না। এক রবিবার সকালে তারাপদ বাজারে গিয়েছিলেন, বেশ বেলা ক'রে বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন, রমাপদ তখনো ঘুমোচ্ছে। বৌ-মাকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলেন, রাত দু'টোর সময় রমাপদ বাড়ি ফিরেছিল। তারাপদ সেদিন সোজাসুজি ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, বিষয় কি। রমাপদ জানান, তার এখন কিছু টাকার দরকার এবং ব্যাঙ্কে তারাপদ-বাবুর যে-টাকাটা আছে তা তিনি তুলে দিতে

রাজী আছেন কিনা। ভাল একজন পার্টনার পেয়েছে এবং সে তার টাকাও দিয়েছে কিন্তু রমাপদ তার অংশের টাকাটা দিতে পারছে না ব'লে অত্যন্ত লজ্জিত আছে। কিসের ব্যবসা করা হবে প্রশ্ন করার পর তারাপদ যা শুনলেন, তা'তে তাঁর চক্ষু চড়কগাছে উঠল। রেসের ঘোড়া কেনা হচ্ছে। একটা আফগানি জলের দরে তার ঘোড়া দু'টো বিক্রী ক'রে দেশে চলে যাচ্ছে। লোকটা একটা খুনের মামলায় পড়েছে। তাই রাতারাতি এখান থেকে পালাবার মতলব। খুব গোপন সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে। কিছু টাকা দিতে পারলেই রাতারাতি তার চতুর্গুণ রিটার্ণ আসে। তৈরী ঘোড়া। এর পিছনে টাকা ঢাললে মার নেই। রমাপদ তার বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে নিজের চোখে ঘোড়া দু'টো দেখে এসেছে। সেজন্যই কাল বাড়ি ফিরতে এতটা রাত হ'ল। তারাপদ সেদিন ঘাড়ে ধ'রে ছেলেকে রাস্তায় বার ক'রে দিতেন, কিন্তু পারলেন না বৌ-মা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটাই তাঁর ভুল হয়েছে। বৌ-মা হয়তো রমাপদর জন্যে ভাবত, কিন্তু রমাপদর মনে যে তার স্ত্রী সম্পর্কে এক তিল স্নেহ-মমতা ভালবাসা ছিল না, ঐ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পর তারাপদবাবু ভাল হাতে তার প্রমাণ পেলেন। সেদিন তারাপদ বেশ কড়া সুরে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এসব ব্যবসা করতে হয় রমাপদ বাইরে থেকে টাকা জোগাড় ক'রে করুক, তিনি একটি আধলা দিয়েও সাহায্য করবেন না। রমাপদ সেই যে বাড়ি থেকে বেরোলো ক'দিন আর ফিরল না। এদিকে রমাপদর স্ত্রী খুব কাঁদাকাটি করছিল এবং তারাপদ মনে মনে ভাবছিলেন, খোঁজ খবর নিয়ে ছেলেকে ডেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন কিনা, কিন্তু তার আগেই একদিন রমাপদ এসে হাজির। অবশ্য কত রাত ক'রে সে বাড়িতে ঢুকেছিল সেদিনও তারাপদবাবু টের পান নি। টের পেলেন পরদিন সকালে। হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে তিনি বৌ-মাকে ডাকছিলেন চা দিতে। তাঁর গলার আওয়াজ শুনে বৌ-মা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তারাপদবাবুর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বিমূঢ় বিস্মিত তারাপদবাবু কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে পুত্রবধূর হাতে ধরে তাকে মাটি থেকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে একটি একটি প্রশ্ন ক'রে যখন সব জানতে পারলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, রমাপদকে আর এ-বাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছি ছি, ভদ্রসমাজের কোন ছেলে এই ধরণের কাজ করতে পারে, তারাপদ স্বপ্নেও ভাবেন নি। রমাপদ স্ত্রীর সব গয়না সমেত তার হাত-বাক্সটি চুরি ক'রে পালিয়েছিল। তখনই রমাপদকে পুলিশে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তারাপদ সেদিন সেটা করতে সাহস পান নি আমরা বেশ বুঝতাম। অবশ্য তারপর আর একদিনও রমাপদ বাড়ি আসে নি। তারাপদবাবু তো না-ই, রমাপদর স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর কথা আর ভুলেও মুখে আনত না। তারাপদ সব বলতেন আমাকে। হ্যাঁ একটি মেয়ে হয়েছিল রমাপদর। নাতনীর চেহারা অবিকল মা'র মতন, রমাপদর মুখের আদল প্রায় ছিল না ব'লে তারাপদবাবু সুখীই হয়েছিলেন। রমাপদকে যে তিনি কতটা ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছেন তা থেকেই তখন বোঝা গেছে। এবং নাতনী ও পুত্রবধূকে নিয়ে তারাপদ আবার নতুন উদ্যমে সংসাস বাঁধছেন দেখতাম। পৈত্রিক সম্পত্তি কিছুটা পেয়েছিলেন এবং নিজেও তিনি ভাল চাকরি করতেন রেলে। প্রভিডেন্ড্ ফন্ডের মোটা টাকা হাতে নিয়ে তিনি আর মাস পাঁচ ছয় পরেই চাকরি থেকে অবসর নিলেন। বালিগঞ্জে জায়গা কিনলেন এবং বেশ খরচপত্র করেই নতুন বাড়ি করলেন। আমরা, তারাপদর বন্ধুরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করেছি। রমাপদ বলতে গেলে একরকম ত্যাজ্যপুত্র হয়ে বাইরে বাইরে আছে। উচ্ছৃংখল অধঃপতিত সন্তান। কিন্তু গোড়ায় যেমন তারাপদর চোখে-মুখে একটা ক্লেশ লেগে থাকত এদিকে আর সেটা আমাদের চোখে পড়ত না। বরং দেখতাম, অধিকতর উৎসাহ, উদ্যম এবং যেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন নিয়ে নাতনীর হাত ধরে ঘুরে ঘুরে বাড়ির দরজা জানালায় রং করিয়েছেন, বাগানে মালীদের কাজের তদারক করেছেন, ক্লান্ত হ'লে বারান্দায় উঠে এসে তারাপদবাবু ইজি-চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে আরামে চোখ বুজেছেন। বৌ-মা তখন শ্বেত-পাথরের গ্লাসে সরবৎ নিয়ে শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। না, এ পক্ষ থেকে স্নেহ মমতা ও ভালবাসার যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি ওপক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা ভালবাসা সেবা যত্ন প্রস্রবণের ধারার মত অবিরত বইছিল। দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, মনে হ'ত না কারো মনেই পড়ত না এখানে একজন অনুপস্থিত: রমাপদ নেই,—খুকির বাবা, তারাপদর পুত্র, বৌ-মার স্বামী। কতখানি অবাঞ্ছিত হ'লে জীবিত একটা মানুষকে প্রায় অস্বীকার ক'রে দিনের পর দিন কাটানো নয় শুধু, সুন্দরভাবে, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা যায়, তারাপদবাবুর সংসার দিয়ে আমরা মনে মনে তার পরিমাপ করেছি এবং বিস্মিতও হয়েছি।

তাছাড়া, দিন দিন রমাপদ নিচের দিকে এমন দ্রুত নামতে শুরু করেছিল সে, স্বামী বা পুত্র হিসাবে তাকে অস্বীকার ক'রে থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক তো বটেই, নিরাপদও ছিল। রমাপদর দুষ্কৃতির সংবাদ অহরহ আমাদের কানে এসে পৌঁচেছে। মিথ্যা বলতে ত্রিভুবনে তার জুরি কেউ আছে কিনা আমাদের সন্দেহ হ'ত। প্রথম যৌবনে বাপের ক্যাশ-বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরি ক'রে জাহাজের কাপ্তান হওয়ার বাসনায় বিদেশ যাত্রা ও পরে স্ত্রীর গায়ের অলংকার চুরি ক'রে রেসের ঘোড়া কিনে বড়লোক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁচেছিল একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা গেছে। অনাদি সেন আমার এবং তারাপদবাবুরও বন্ধু বটে। অসুস্থ হয়ে অনেকদিন তিনি শয্যাশায়ী থাকার দরুণ তারাপদবাবুর পরিবার সম্পর্কে তেমন একটা খোঁজ খবর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনাদিবাবু উদার এবং পরোপকারী ব'লে আমাদের মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সাহায্য চেয়ে কেউ তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হ'য়ে ফিরেছে আমরা কোনোদিন শুনিনি। রমাপদ সেই ভালমানুষ অনাদি সেনের বদান্যতার সুযোগ নিলে। মেয়ের অসুখ বাবার এবং তার নিজের হাত-টান যাচ্ছে,

তাছাড়া অসুখটা একটু খারাপ রকমের, ডাক্তারে ওষুধে ইতিমধ্যে হাজার দুই খরচ হ'য়ে গেছে, এখন রেডিয়ম ট্রিট্‌মেণ্ট হবে, শহরের নামকরা একজন স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো হয়েছে, সুতরাং আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আবার সাত আট শ টাকা দরকার ইত্যাদি ব'লে রমাপদ অনাদিবাবুর কাছ থেকে দিব্যি চেক্ লিখিয়ে নিয়ে আসে। অনাদিবাবু অবশ্য এর দিন দুই পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। কিন্তু তখন আর রমাপদকে তিনি কোথায় পান। সব শুনে লজ্জায় দুঃখে তারাপদবাবু অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই যেতে পারেন নি। পত্র লিখে ক্ষমা চেয়ে তিনি অনাদি সেনের টাকাটা অবশ্য শোধ করলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং জানাশোনা সবাইকে জানিয়ে দিলেন, রমাপদকে যেন কেউ টাকা ধার না দেয়, রমাপদ তাঁর সঙ্গে থাকে না, এমন কি নিজের স্ত্রী-কন্যার সঙ্গেও বহুকাল তার কোনোরকম সম্পর্কই নেই।

কিন্তু তা ব'লে কি আর রমাপদর টাকার অভাব হ'ত। কোথা থেকে কি ক'রে সে টাকা জোগাড় করছে সব সংবাদ আমরা পেতাম না, তবে এইটুকু শুনতাম, সে নাকি এই শহরেই আছে এবং বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। কেবল পুরুষ না, মেয়ে বন্ধুও রমাপদ অনেক জুটিয়েছে ইত্যাদি কুৎসিত ধরণের সংবাদও আমাদের কানে অনেক আসত। কিন্তু সে-সব আমরা, তারাপদবাবু তো নয়ই, গায়ে মাখতাম না। উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎ-চরিত্র রমাপদর ভাল হবার, সংসারে ফিরে আসার সকল আশা আমরা বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। কবে মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় কা'কে গাড়ি চাপা দিয়ে জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে, কবে এক বড়লোক পাঞ্জাবী বন্ধুর স্ত্রীর গলার দামী হার ছিনিয়ে নিয়ে মাস ছয় গা-ঢাকা দিয়ে আবার একদিন বেরিয়ে ভালমানুষ সেজে এর ওর কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে ব'লে টাকা চাইতে আরম্ভ করেছে সে-সব কাহিনী বলতে গেলে একটি মহাভারত হবে। তবে এইটে ঠিক, অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছেও নাকি রমাপদ বড় আশা, বড় কথা ছাড়া কথা বলত না। এবং এই ক'রে ক'রে সে তার দিনগুলি সুখেই কাটাচ্ছিল। 'ডেভিল',—তারাপদবাবু আমাকে অনেকদিন বলেছেন, 'সংসারে এদের মার নেই। যারা সৎপথে থাকে দুঃখ তাদের জন্যে।' বস্তুত শেষ পর্যন্ত তারাপদবাবুর কথাই ফলল কিনা আজ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাই ভাবছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তারাপদ চাকরকে ডাকলেন। চাকর এসে আমার পরিত্যক্ত শূন্য চায়ের পেয়ালাটা সরিয়ে নিয়ে গেল। মশলার থালা থেকে একটা লবঙ্গ মুখে তুলে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম, 'বৌমা কবে ফিরবেন। খুকুর শরীর ভাল আছে ওখানে, কিছু খবর পেয়েছেন?'

যেন আমার কথা তাঁর কানে গেল না। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত নিচু গলায় তারাপদবাবু বললেন, 'কয়েকদিন আগে রমাপদ বাড়ি এসেছিল।'

'এসেছিল!' রুদ্ধস্বরে বললাম, 'অনেকদিন পর, কি ব্যাপার, মতিগতি ফিরেছে ব'লে মনে হ'ল কি?'

'একটা সিনেমা কোম্পানী খুলেছে।' স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ফেললেন তারাপদ। 'অনেক টাকা পয়সা খরচ ক'রে কি একটা নামকরা বই করছে, বলল এসে।'

'তাই বলুন।' এবার আমি বুকভাঙা হাসি হাসলাম। 'নিশ্চয় টাকার জন্যে এসেছিল। আপনি 'না' ক'রে দিয়েছেন তো?'

একটু চুপ থেকে তারাপদ বললেন, 'না আমি টাকা দিইনি, আমার কাছে এবার সে-সব কিছু চায়নি।'

'তবে?' নির্নিমেষ চোখে তারাপদকে দেখছিলাম।

'ডেভিল', ক্লান্ত চোখ দুটো মেঝের দিকে নামিয়ে তারাপদ যেন জোর ক'রে একটুখানি হাসলেন। 'শয়তানের পয়সা শয়তানে জোটায় এ তো আর আপনার অজানা নেই শশধরবাবু। কে টাকা দিচ্ছে আমি জিজ্ঞেসও করিনি।'

'ভাল করেছেন।' ইতস্তত না ক'রে আমি প্রশ্ন করলাম, 'ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমরা যাকে 'অ্যাম্বিশন' বলতাম এতদিনে তা হ'লে পূরণ হচ্ছে। দুষ্টু এখানে এসেছিল কেন?'

'তাই বলব বলেই আপনাকে মনে মনে ক'দিন ধরে খুঁজছিলাম শশধরবাবু। আপনাকে তো আজ অবধি কিছু গোপন করিনি।' তারাপদর চোখের কোণায় আবার জল এসেছে।

'না তা তো করেন নি।' অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'দীর্ঘদিন ছিলাম না এখানে, তাই ছুটে এসেছি, জানতে চাইছি কেমন আছেন, আপনার খবর কি।'

বস্তুত আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এতকাল পর বাড়ি ফিরে রমাপদ আবার কি আঘাত দিয়ে গেছে বাপকে, কি সর্বনাশ ও করল। দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তারাপদ। সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন, ওর অ্যাম্বিশন এবার ষোল কলায় পূর্ণ হ'ল।'

আমার মুখে কথা আসছিল না। প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিললাম শুধু।

তারাপদ বললেন, 'এসে আমাকে নয়, বৌ-মাকে বলল, নাম-করা বইয়ের ছবি তোলা হচ্ছে, হিরোইনের পার্ট নিতে হবে বিভাকে, রূপের দিক থেকে বিচার ক'রে তার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে রমাপদ এই শহরে আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

কেমন স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ নীরব থেকে পরে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলাম, 'কি বললেন বৌ-মা, বিভা শেষ পর্যন্ত কি ব'লে বিদায় করলেন হতভাগাটাকে।'

'রাজী হয়েছে।' টেবিলের ওপর দু'টো হাত রেখে তার মধ্যে তারাপদ মাথা গুঁজলেন। 'আজ ছ'দিন হয় দু'টিতে চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। খুকুটা ভয়ানক কাঁদাকাটি করছিল। শিলিগুড়ি ওর মামাবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

যেন কি একটা সুন্দর গন্ধ আসছিল, অনেকক্ষণ গাঢ় নিশ্বাস নিয়ে পরে টের পেলাম, বাইরে তারাপদর বাগানে হাস্নুহানা ফুটেছে।
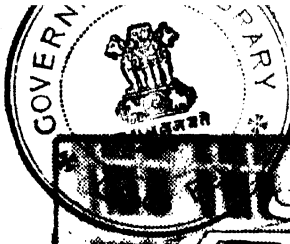
ষোল

দায়রা-বিচারে কাশিম ফকিরের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

সুযোগ্য জজসাহেব বয়সে নবীন নন কিন্তু জজিয়তির আসনে নবারূঢ়। পেছনে রয়েছে মুন্সেফ আর সব-জজগিরির সুদীর্ঘ সোপান। ছিলেন ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক। জীবন কাটিয়েছেন পাট্টা কবুলিয়ত আর জীর্ণ তমসুকের ধুলো ঘেঁটে। মানুষ যা-কিছু ঘেঁটেছেন, সব ঐ দলিলের মত ঘুনে-ধরা, —জাল, জোচ্চুরি, ঘুস আর মিথ্যা সাক্ষ্যের গোপন বিষে ন্যুব্জ দেহ। সেই সব মানুষ দেখেছেন জজসাহেব। দেখেননি তাজা মানুষ, ঋজু মানুষ, উচ্ছল প্রাণরসে ভরা মেঠো গেঁয়ো আর বুনো মানুষ, জীবন মৃত্যু যাদের পায়ের ভৃত্য এবং চিত্ত ভাবনা-হীন।

খুনীর সঙ্গে জজসাহেবের এই প্রথম পরিচয়, মৃত্যুদণ্ডে এই প্রথম হাতেখড়ি।

সে দণ্ডকে রূপ দিতে গিয়ে শুভ্রকেশ বিচারকের সুদৃঢ় লেখনী হয়তো একবার কেঁপে উঠেছিল। সে কম্পন অনুরণিত হল তার আবেগজড়িত কণ্ঠস্বরে, বিচার-মঞ্চের উচ্চাসন থেকে যখন তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর ন্যায়-নিবদ্ধ কঠোর আদেশঃ—

. . . . the said Kasim Fakir be hanged by the neck till he be **dead. . . .**

দণ্ডদাতা বিচলিত হলেন, গ্রহীতা রইল নির্বিকার। পরম ঔদাসীন্যে গ্রহণ করল চরম আদেশ। রায় যখন শেষ হল, কাঠগড়ার উপর দাঁড়িয়ে একবার চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল। মনে হল কাকে যেন খুঁজছে তার ব্যাকুল দৃষ্টি। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল রেলিং ঘেরা কাঠের মঞ্চ থেকে। পুলিশের লোকেরা এসে ঘিরে দাঁড়াল। চোখেই পড়ল না। ফিরেও দেখল না অপেক্ষমাণ স্তব্ধ জনতার বিস্মিত দৃষ্টি। নিঃশব্দে এগিয়ে চলল আদালতের বাইরে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে কালো ঘেরাটোপ ঘেরা কয়েদীর গাড়ি।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন উকিলবাবু। মক্কেলের প্রাণরক্ষার জন্যে প্রাণপণ করেও ফল পাননি। বোধ হয় ইচ্ছা ছিল গোটাকয়েক দার্শনিক সান্ত্বনা দিয়ে পূরিয়ে দেবেন সেই ব্যর্থতার শূন্য স্থান। কিন্তু মক্কেলের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর মুখেও আর কথা জোগাল না। কোনোরকমে ব্যক্ত করলেন নেহাৎ যেটুকু কাজের কথা—এখানে একটা সই কর তো ফকির। সাতদিনের মধ্যেই হাইকোর্টে আপীল দায়ের করতে হবে।

একটু থেমে অনেকটা যেন আপন মনে বললেন, দেখা যাক্, আর একবার চেষ্টা ক'রে।

ফকির দাঁড়াল। মুখে ফুটে উঠল এক অদ্ভুত বিকৃত হাসির কুঞ্চন। শুষ্ক কণ্ঠে বলল, কী লাভ বাবু? এখানেও তো চেষ্টা কম করেননি।

ফকিরের সঙ্গে আমার দেখা আসাম সীমান্তের কোনো ডিস্ট্রিক্ট জেলে। দেশ ছিল তার ময়মনসিং, ইংরেজ-শাসিত বাংলার সবচেয়ে বড় জিলা। বিশাল ভূখণ্ড। শুধু আয়তনে নয়, তার বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে। দক্ষিণ আর পূর্বদিক জুড়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি—ব্রহ্মপুত্র যমুনার অকৃপণ করুণায় শস্যসম্ভারে ঐশ্বর্যময়। রুদ্র বৈশাখের খরতাপে তার মাঠে মাঠে ফাটল ধরে। আষাঢ়ের শেষে সেখানেই নেমে আসে বর্ষার প্লাবন। ফেঁপে ফুলে কূল ছাপিয়ে ছুটে আসে দুর্বার-যৌবনা নদী। শ্রাবণে সেই মাঠের বুকে দশ হাত গভীর জলের উপর দিয়ে পাল তুলে যায় সওদাগরি পানসি, ভেসে বেড়ায় অসংখ্য জেলে ডিঙ্গি। জল শুধু জল। কিন্তু দেখে দেখে চিত্ত বিকল হয় না। তার রূপে নেই বন্ধ্যার রুক্ষতা। তার উপর বিছানো থাকে সুপুষ্ট শ্যামল আমন ধানের আস্তরণ। বন্যার সঙ্গে তাদের রেষারেষি। জল যদি বাড়ে চার আঙ্গুল, ধানের গাছ উঠবে আধ হাত। রুদ্রা প্রকৃতির সঙ্গে করুণাময়ী প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। জয়পরাজয় নির্ভর করে মানুষের ভাগ্যের উপর।

কার্তিকের শেষে এই বিপুল জলরাশি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় ভোজবাজির মত। দীর্ঘ ধানগাছ লুটিয়ে পড়ে। মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সোনার শীষ। তার নিচে যে কোমল মাটি, তার মধ্যেও স্বর্ণ-রেণু, কৃষকের ভাষায় যার নাম পলি। তারই স্পর্শে মেতে ওঠে রবি-শস্যের খন্দ, লক্ লক্ করে মটরের ডগা, হলুদের নেশা লাগে সর্ষে ক্ষেতে, গুঁজি তিলের অতসীফুল মনে ধরিয়ে দেয় বৈরাগ্যের ছোপ।

আল বাঁধা নেই, জলসেচ নেই, কাদা-ঘাঁটা নেই, একটি একটি করে ক্ষীণপ্রাণ ধানের চারা পুঁতে রুগ্ন শিশুকে তিল তিল করে মানুষ করবার দুরূহ সাধনা নেই, জল জল করে চাতকচক্ষে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার বিড়ম্বনা নেই। মাটিতে কয়েকটা আঁচড় কেটে যেমন তেমন করে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গান গেয়ে মাছ ধরে আর দাঙ্গা করে দিন কাটায় ময়মন-সিংহের চাষী। বাকী যা কিছু সব দেয় নদী, দেয় ব্রহ্মপুত্র আর তার কল্যাণী কন্যা যমুনা। তাই এদেশের নাম নদী-মাতৃক দেশ।

এরা যে পাট জন্মায় তার খ্যাতি আছে ডাণ্ডী আর নিউইয়র্কের বাজারে। এদের বিরুই চালের মিষ্টি স্বাদ আজও লেগে আছে আমাদের মত বিদেশী অন্ন-লোভীর রসনায়। জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাকৃতিক ঔদার্য এদের দেহে দিয়েছে স্বাস্থ্যের দৃঢ়তা, মনে এনেছে নির্ভীক সবলতা। প্রাণ দেওয়া-নেওয়া এদের বিলাস। ধন এবং নারী লুণ্ঠন এদের ব্যসন। এদের পরিভাষায় 'abduction' কথাটার প্রতিশব্দ "বউটানা", অর্থাৎ পরের বৌকে প্রকাশ্য বাহুবলে টেনে এনে বশ করার নাম নারীহরণ, গোপনে চুরি করে অরক্ষিতা কুমারী কিংবা বিধবার উপর বলপ্রয়োগ নয়। প্রথমটায় আছে হিংস্র পৌরুষ, দ্বিতীয়টায় কামুকের ইতর কাপুরুষতা।

ময়মনসিংহ গীতিকবিতার দেশ। তারও মূলে আছে প্রকৃতির অজস্র বদান্যতা। বাংলার রত্নভাণ্ডারে বিক্রমপুর দিয়েছে মনীষা, বরিশাল দিয়েছে স্বদেশ-প্রেম, আর ময়মনসিংহ দিয়েছে পল্লীকাব্য। এর পথে ঘাটে, নদীর চরে, আমের বনে, নিরক্ষর কৃষকের গোবর-নিকানো আঙিনায় এখনো ভেসে বেড়ায় নদের ঠাকুর আর মহুয়া বেদেনীর বিরহ-মিলন, লীলা-কঙ্কের প্রেম-গুঞ্জন, কবি চন্দ্রাবতীর মৌন আত্মত্যাগ।

এই গেল দক্ষিণের রূপ। উত্তরের চেহারা একদম আলাদা। সেখানে নেই দক্ষিণের এই প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্য। রুক্ষ বন্ধুর বনভূমি, মাঝে মাঝে অনুচ্চ পাহাড় শ্রেণী। কৃপণা বসুমতী প্রসন্ন সহাস মুখে বরদান করেন না। বহু খোঁড়াখুঁড়ি করে তবে শস্যকণার সাক্ষাৎ মেলে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের একটা অংশ জুড়ে রয়েছে মধুপুরের গড়। এককালে ছিল ভবানী পাঠকের কর্মক্ষেত্র, আজ পুলিশ-ভীত দস্যু-তস্কর এবং ফেরারী আসামীর লীলাভূমি। এরই কোনোখানে জনহীন জঙ্গলে-ঘেরা এক টিলার ধারে ছিল কাশিম ফকিরের আখড়া। পাশাপাশি দুখানা খড়ের চালা, একটি ভাঙ্গা দরগা, তার চারদিকে ঘিরে ভাঙ্ আর ধুতুরার বন। সম্পত্তির মধ্যে ছিল নাতনীর বয়সী একটি রূপসী স্ত্রী, গোটাকয়েক গরু ছাগল, একপাল মুরগী আর একটি ময়না।

ফকির পঞ্চাশোর্ধ্ব। তার উপর তার যৌবনের ইতিহাস চিহ্নিত আছে পুলিশের খাতায়। তার এই বনংব্রজেৎ অর্থহীন নয়। কিন্তু একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা চঞ্চলা নারী কোন্ দুঃখে কিংবা কিসের আকর্ষণে সংসারের যা-কিছু সব ত্যাগ করে বরণ করেছিল এই নির্জন বনবাস, বেছে নিয়েছিল এক অনাসক্ত বৃদ্ধের নিরানন্দ সঙ্গ সে-রহস্য জানেন শুধু তার সৃষ্টিকর্তা।

বৃদ্ধ ফকির দরগার পাশে বসে মালা জপ করে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ম কণ্ঠে ডাকে, কুটী, ও-ও কুটী। কুটীবিবি তখন বন্য হরিণীর মত চঞ্চল চরণে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, উদ্গত-শৃঙ্গ, সতেজ ছাগশিশুর সঙ্গে "পৈটে" খেলে—তার মাথা ধরে ঠেলে, ক্ষেপিয়ে দেয় আর সে যখন সামনের পা দুটো তুলে শিঙ্ উঁচিয়ে লাফিয়ে আসে, হাততালি দেয় আর খিল খিল করে হাসে। কখনো মুরগীর পেছনে তাড়া করে বেড়ায়, সুর নকল করে ঝগড়া বাধায় কোকিলের সঙ্গে, কিংবা পোষা ময়নার গলা ধরে ভাব জমায়।

মাঝে মাঝে ফকির সফরে বেরোয়। আলখাল্লা পরে ঝুলী কাঁধে ফেলে একমুখ দাড়ি আর এক মাথা পাকা চুল নিয়ে আঁকা বাঁকা লাঠিটা হাতে করে যখন বনপথে অদৃশ্য হয়ে যায়, কুটী সেদিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসে। কি ভাবে, কে জানে? ফকিরের ফিরতে মাস কেটে যায়। হাটে হাটে কেরামতি দেখিয়ে বেড়ায়, তাবিজ কবচ দেয়, জলপড়া খাওয়ায়, ঝাড়ফুঁক করে, আর সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনো একটা আড়াল জায়গা বেছে নিয়ে নোট্ ডবলের খেলা দেখায়। দু' টাকা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চার টাকা করে দেয়, পাঁচ টাকাকেও দশটাকা করে। তার বেশী যদি কেউ দেয়, ফিরিয়ে দিয়ে বলে, আখড়ায় যেও। দরগার সিন্নি লাগবে একটাকা সোওয়া পাঁচ আনা। একা যেও; লোকজন থাকলে হবে না।

তারপর একদিন ফকির ফিরে আসে। ঝোলাভর্তি টাকা সিকি আর বৌ-এর জন্যে টুকিটাকি। কুটীর খুশি আর ধরে না।

দু'চার দিন পরেই আসতে শুরু করে নোট-ডবলের মক্কেলের দল। ছোট খাট পার্টিকে আমল দেয় না ফকির। কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দেয়। তিন, চার, পাঁচ শ' নিয়ে যারা আসে, তাদের বলে, বসো। রাত এক পহরের পর সিন্নি হবে।

প্রহর কেটে যায়। মক্কেলের ডাক পড়ে দরগার পাশে। ফকির সমাধিস্থ। ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরছে তার হাতের তসবী। রাত বাড়তে থাকে। টিলার পেছনে প্রহর জানায় শেয়ালের পাল। নিস্তব্ধ বনালয়ে মাঝে মাঝে শোনা যায় বন্য জন্তুর ডাক। হঠাৎ এক সময়ে কাশিম চোখ মেলে চায়। তসবী কপালে ঠেকিয়ে গাঢ় কণ্ঠে বলে, খোদা মেহেরবান্। দাও, টাকা দাও।

ভক্ত নোটের তাড়া তুলে দেয় ফকিরের হাতে। রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করে, কখন সে তাড়া ডবল হয়ে ফিরে আসবে।

—এই নাও সিন্নি।

ভক্ত হাত বাড়িয়ে নেয় দুখানা বাতাসা, একটু ফল আর এক গেলাস

সুস্বাদু সরবৎ। সমস্ত দিনের ক্লান্তি ও দীর্ঘ অনশনের পর ভারী ভাল লাগে। কিন্তু এ কি! সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সর্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ছে কেন? চোখ যে আর খুলে রাখা যায় না। ঘুম আসছে। অপার, অনন্ত ঘুম। সে-ঘুম যেন আর ভাঙবে না।

সে ঘুম সত্যিই আর ভাঙে না। ঘণ্টাখানেক পরে মাথার দিকটায় স্বামী আর পায়ের দিকটায় স্ত্রী, ভক্তকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় টিলার পেছনে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে কাটা আছে সুন্দর কবর। অজ্ঞান ভক্তকে তারই মধ্যে ফেলে দিয়ে ফকির কপালের ঘাম মোছে। কুটী হেসে ওঠে কলকণ্ঠে। বনপ্রান্তে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। তারপর নিপুণ ভাবে মাটিচাপা দিয়ে, ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করে স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে যায়। এবং পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ে। সকালে উঠে নোটগুলো হাঁড়ি-বন্ধ করে পুঁতে রাখে মাটির তলায়। তারপর বেশ ক'রে জল দেয় ভাঙ আর ধুতরা গাছের জঙ্গলে।

এমনি করে বছরের পর বছর নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালিয়ে মহাসুখে ছিল ফকির-দম্পতি। মাঝে মাঝে হতভাগ্য মক্কেলের কোনো আত্মীয়-স্বজন যদি আসতো তার খোঁজে, ফকির একেবারে আকাশ থেকে পড়ত। সে কি! এখনো বাড়ি ফেরেনি রহমন? সে যে সেইদিনই ডবল নোট্ ট্যাঁকে গুঁজে চলে গেল। কি বল, বিবিজান, তাই না? বিবিজান ঘর ঝাট দেওয়ার ফাঁকে কিংবা রান্না করতে করতে মুখ টিপে হাসে। বলে, সে তো সেই ক—বে চলে গেছে। ফকির ব্যস্ত হয়ে পড়ে, খোঁজ, খোঁজ, ভালো করে খোঁজ! বড্ড চোর ডাকাতের উৎপাত এ দিকটায়। অতগুলো টাকা নিয়ে, ঈস্......

তারপর একদিন এল এক নতুন মক্কেল। বাইশ তেইশ বছরের জোয়ান ছোকরা। দেহ তো নয়, যেন নিপুণ ভাস্করের হাতে গড়া কালো পাথরের মূর্তি। মাথায় ঢেউ-খেলানো বাবরি চুল। সরু কোমরে আঁট করে বাঁধা লাল চারখানার গামছা। হাতে তেলে পাকানো বাঁশের লাঠি। চঞ্চল চোখ দুটো দিয়ে উপছে পড়ছে স্বাস্থ্য আর খুশীর ঝলক। এদিক ওদিক চেয়ে খুঁজতে খুঁজতে আসছিল ফকিরের আস্তানা। আঙিনার পাশে প্রথমেই চোখাচোখি হয়ে গেল কুটীর সঙ্গে। থমকে দাঁড়াল ছেলেটি। মুখে ফুটে উঠল স-কৌতূহল বিস্ময়ের চিহ্ন। তারপর সেটা মিলিয়ে গেল কৌতুক হাসির কুঞ্চনে। সে হাসির নিঃশব্দ প্রতিধ্বনি জেগে উঠল কুটী-বিবির অনিন্দ্য ঠোঁট দুখানির কোণে। সে শুধু পলকের তরে। তারপর তার সদা-চঞ্চল চাহনির উপর নেমে এল কালো একজোড়া আঁখি-পল্লব। আনত দীপ্ত মুখের উপর দেখা দিল আরক্তিম ছায়া। কিসের ছায়া কে জানে?

ফকির দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল। মক্কেল এগিয়ে গিয়ে একটা নোটের বাণ্ডিল তার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, পাঁচশ টাকা আছে। গুণে নাও। আর এই নাও তোমার সিন্নির খরচা, এক টাকা সোওয়া পাঁচ আনা, বলে ট্যাঁক থেকে খুচরো পয়সাগুলো ছুঁড়ে দিল মেঝের উপর। ফকির কথা বলল না। ইঙ্গিতে বসতে বলে হুঁকোটা তুলে দিল শাঁসালো মক্কেলের হাতে। তারপর সিন্নির পয়সা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, নোট রেখে দাও। ও-সব কি দিনের বেলায় হয়? জিরোও, তামাক খাও। সিন্নি হবে সেই রাত এক পহর বাদে।

বহুকাল পরে সেদিন চিরুণি পড়ল কুটীবিবির মাথায়। জটপাকানো অলক চুলের বোঝা কোনোরকমে বশে এনে খোঁপায় পড়ল একটি নাম-না-জানা বনফুল। তারপর বেশ করে গা ধুয়ে এল আধ মাইল দূরে এক ঝর্ণা থেকে। বাড়ি এসে পরল একখানা আসমানি রঙ-এর টাঙ্গাইল শাড়ি। গত বছর ঈদের সময় ফকির এনে দিয়েছিল কোন্ হাট থেকে। দুবার মাত্র পরেছে কাপড়খানা। ফকির বলেছে, চমৎকার মানায় তাকে।

কই, কোথায় গেলে? মিঞাসাহেবকে কিছু খেতে টেতে দাও। কদ্দুর থেকে আসছে বেচারা। বেলা কি আর আছে!

—এখানে পাঠিয়ে দাও। খাবার দিয়েছি, রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল কুটী।

অতিথি এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের সামনে। কুটী বেরিয়ে এল। হাতে একবাটি দুধ আর এক সাজি মুড়ি। অতিথির চোখে অপলক মুগ্ধ দৃষ্টি। একখানা মাদুর বিছিয়ে দিল দাওয়ার উপর। সযত্নে আঁচল দিয়ে মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বলল কুটী, বসো না?

হোসেনের যেন জ্ঞান ফিরে এল এতক্ষণে। বলল, তুমিও থাক নাকি এই জঙ্গলে?

কুটী অবাক্—বাঃ কোথায় থাকবো তবে?

—কি ক'রে এলে এখানে?

কুটী কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলল, আহা! জানেন না যেন? আমি তো ফকিরসাহেবের বিবি।

—ঐ ফকিরের বিবি তুমি!—বলে হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেল ছোকরা।

বিবি বিরক্ত হল, হাসছ যে?

—না, না, ও কিছু না। এই টাকাটা তুলে রাখো। আমি ফাঁকা থেকে ঘুরে আসি একটু। উঃ কী জঙ্গল। দম আটকে আসছে,—বলে দুধটা এক চুমুকে শেষ করে আর মুড়ির সাজিটা কোচরে ঢেলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে গেল।

কুটী নিজ হাতে জবাই করল তাদের সবচেয়ে যেটা সেরা মুরগী। যত্ন করে রাঁধল তার "ছালুন", আর চমৎকার লাল বিরুই চালের ভাত। ঘন করে জ্বাল দিল নিজের হাতে দোওয়া কালো গরুর দুধ। সামনে বসে খাওয়ালে অতিথিকে। খানিকটা দুধ রেখে উঠে যাচ্ছিল হোসেন। কুটী অনুনয় করে বলল, আমার মাথার কিরা, ওটুকুন খেয়ে ফেল।

তারপর একটু মুখ টিপে হেসে তরল কণ্ঠে বলল, একে তো জঙ্গলে এসে মিঞাসাহেবের মনটা পালাই পালাই করছে। তারপর দুটো পেট ভরে খেতে না পেলে বাড়ি গিয়ে এক ঝুড়ি নিন্দে করবে তো আমার?

হোসেন সে প্রশ্নের জবাব দিল না। মৃদু কণ্ঠে বলল, খু—ব খেলাম। এত যত্ন করে সামনে বসে আমাকে কেউ কোনোদিন খাওয়ায়নি।

কেরোসিনের ঢিবরির মৃদু আলোকে কুটীবিবির মুখখানা স্পষ্ট দেখা গেল না। বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যে নিশ্বাস, তাও সে চেপে গেল।

খাবার পর হোসেন মিঞা বারান্দায় বসে গল্প করছিল ফকিরের সঙ্গে। পাশের চালাটায় নিজের হাতে পরিপাটি করে বিছানা পেতে মশারি খাটিয়ে দিয়ে কুটী এসে বলল, এবার কিন্তু শুয়ে পড়তে হবে। সেই কোন্ দেশ থেকে কত মেহনৎ করে আসা। এখন কি গল্প করবার সময়?

হোসেন চলে গেলে ফকিরের পাশে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত কি ভাবল কুটীবিবি। তারপর দৃঢ় চাপা গলায় বলল, "এর বেলা ও-সব চলবে না, বলে দিলাম।" ফকির লক্ষ্য করছিল সবই। অন্ধকারে চোখ দুটো তার হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। ব্যঙ্গ করে বলল, বড্ড দরদ দেখছি। এরই মধ্যে মজে গেলি?

—মজেছি, বেশ করেছি—রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল কুটী, কিন্তু এর যদি কিছু করতে যাস্, তোরই একদিন কি আমারি একদিন। মনে থাকে যেন।

ফকির নিজেকে সামলে নিল। আঁচল ধরে টেনে বসাল বৌকে। কণ্ঠে আদর ঢেলে বলল, তোর কথা আমি কোনোদিন ঠেলেছি, না ঠেলতে পারি কুটী? তোকে ক্ষেপাচ্ছিলাম একটু।

বৌএর সুন্দর মুখখানা তুলে ধরে বলল, বাঃ, আজকে তোকে যা' দেখাচ্ছে, কুটী!

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে কুটী উঠে চলে গেল। যতদূর দেখা যায়, পেছন থেকে এক জোড়া হিংস্র জ্বলন্ত চোখ তার চলন্ত দেহের উপর আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

গভীর নিষুতি রাত। শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ এইমাত্র হেলে পড়েছে দূরে, বনের আড়ালে। জীব-জগৎ নিষুপ্ত। জেগে আছে শুধু গহন বন। তার অদ্ভুত রহস্যময় ভাষা শোনা যায় নিস্তব্ধ রাত্রির কানে কানে। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল কাশিম ফকির। আলগোছে বাঁশের ঝাপ খুলে নিঃশব্দে তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বিছানার এক প্রান্তে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে তার রূপসী স্ত্রী। গাছের আড়াল থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক ম্লান জ্যোৎস্না এসে পড়েছে তার সুপ্ত সুন্দর মুখের উপর। সে মুখে যেন ফুটে উঠেছে কোন্ সদালব্ধ পরম তৃপ্তির আভাস। স্বল্পাবৃত উন্নত বুক-খানা উঠছে, নামছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। নিঃশব্দে চেয়ে রইল ফকির। তার কুৎসিত শীর্ণ মুখের পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁতে উঠল ঘর্ষণের শব্দ। কোটরগত চোখ থেকে ঠিকরে পড়ল জ্বালা। শিরাবহুল হাতের শক্ত কাঠির মত আঙ্গুলগুলো দংশনোদ্যত বৃশ্চিকের মত এগিয়ে গেল নিদ্রিতার গলার কাছে। একটিবার টিপে ধরলেই শেষ হয়ে যাবে ঐ বুকভরা নিঃশ্বাসের ভাণ্ডার। তাই যাক্—অস্ফুট গর্জন শোনা গেল ফকিরের ভাঙ্গা গলায়, তাই যাক্। দুনিয়া থেকে সরে যাক্ সয়তানী।......

নিজের স্বর শুনে চমকে উঠল ফকির। হাত গুটিয়ে পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

পাশের ঘরে নতুন বিছানায় আর নতুন অনুভূতির উত্তেজনায় হোসেনের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল বারে বারে। ফকিরের হাত তার গায়ে ঠেকতেই ধড়মড় করে উঠে বসল।

—কে?

—আমি, ফিস ফিস করে উত্তর এল।

—সময় হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এস।

দরগার পাশে একটা মোমবাতি জ্বলছিল। তার কাছে নিয়ে মক্কেলকে

বসিয়ে দিলে মাদুরের উপর। গায়ে মাথায় খানিকটা মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিয়ে বলল, নোট দাও।

—নোট তো বিবির কাছে।

বিবির কাছে! সেখানে কি করে গেল?

—আমি রাখতে দিয়েছি।

আরেকবার জ্বলে উঠল ফকিরের হিংস্র চোখ দুটো।

—বেশ। এই নাও সিন্নি। খোদার নাম নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেল।—ভক্তের হাতে তুলে দিল সরবতের গেলাস।

একরাশ কড়া ভাঙ্ আর তার সঙ্গে মেশানো ধুতরার বিষ। অত বড় বলিষ্ঠ ছোকরা আধ ঘণ্টার মধ্যে অসাড় হয়ে গেল। ফকিরের জীর্ণ দেহে কোথা থেকে এল অসুরের শক্তি। আলখেল্লা খুলে ফেলে দিয়ে দোহাই আল্লা বলে পা ধরে টেনে নিয়ে চলল হোসেনের নিশ্চল দেহ। বারে বারে বসে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিয়ে কোনোরকমে পৌঁছল গিয়ে টিলার পেছনে। কবর খোঁড়াই ছিল। ঠেলে ফেলতেই গলা থেকে বেরোল অস্ফুট গোঙানির শব্দ। পাগলের মত কোদাল চালাল ফকির। কবর ভরে গেল। গোঙানির আওয়াজ স্তব্ধ হল চিরদিনের তরে। কাশিমের কাজ যখন শেষ হল রাত্রির শেষ প্রহর তখন বিদায়োন্মুখ।

কুটীর ঘুম ভাঙল ভোরবেলা কি এক দুঃস্বপ্ন দেখে। তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে বাইরে এসে প্রথমেই ছুটে গেল পাশের ঘরে। এ কি! ঘর যে খালি! ফকির পড়ে ছিল বারান্দায়, ঘুমিয়ে কিংবা ঘুমের ভান করে। ডাকতেই খেঁকিয়ে উঠল, ডাকাডাকি করছিস কেন ভোরবেলা?

—ওকে তো দেখছি না, ব্যাকুল কণ্ঠে বলল কুটী।

—চলে গেছে হয়তো।

—চলে যাবে, না বলে?

ফকির আর জবাব দিল না। কুটী উদ্‌ভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল সরবতের শূন্য গেলাস। একবার নাকের কাছে ধরতেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। এ গন্ধ তো তার অচেনা নয়। ছুটে গেল টিলার ধারে। যেটুকু সন্দেহ তখনো লেগে ছিল মনের কোণে, নিঃশেষে উড়ে গেল।

উন্মত্ত আবেগে ছুটে এসে ফকিরের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল কুটীবিবি। পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে এল কান্না। সে কান্নার যেন আর শেষ নেই। ফকির তাকিয়ে রইল সর্প-চক্ষু মেলে, যেমন করে তাকিয়ে থাকে ব্যাধ, তারই হাতে শর-বিদ্ধ যন্ত্রণা-বিহ্বল হরিণীর দিকে।

হঠাৎ কি মনে করে উঠে বসল কুটী। আয়ত চোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। পাতলা ঠোঁট দুটির উপর ফুটে উঠল ক্রুর হাসির বাঁকা রেখা। চলচলে মুখখানা যেন এক নিমেষে কঠিন পাথর হয়ে গেল। চঞ্চলা হরিণী মরে গেল। তার থেকে জন্ম নিল এক ক্রুদ্ধা সর্পিনী।

কাশিম বিস্ময়-ভীত দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল এ রূপান্তর। কিন্তু কণ্ঠ তার নির্বাক। কুটীবিবি সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোমরের চারদিকে শক্ত করে জড়িয়ে নিল লুটিয়ে পড়া আঁচল। তারপর স্বামীর মুখের উপর তর্জনি তুলে রুদ্ধ শ্বাসে বলল, শোধ নেবো, এর শোধ নেবো আমি।

কাশিমের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই সে ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফকিরও ছুটল,—কোথায় যাস্ কুটী? ফের্ শোন্।

কেউ সাড়া দিল না। মুহূর্তে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তড়িৎগতি তনুদেহ।

বন ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠের শেষে আবার বন। গ্রীষ্মের চষা ক্ষেত। মাটি তো নয়, যেন পাথর। কোমল পা দুখানা রক্তে ভরে উঠল। ফিরেও দেখল না কুটী। ভ্রূক্ষেপ করল না বিস্মিত পথিকের হতবাক্ কৌতূহল। মাঝে মাঝে শুধু শোনা গেল ক্লান্ত কণ্ঠের ব্যাকুল প্রশ্ন,—কোনো পথচারীকে চমকে দিয়ে—বলতে পার, থানা আর কদ্দুর?

চৈত্রের আকাশ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়। সুগৌর মুখখানা থেকে ফেটে পড়ছে রক্তের আভা। ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গের বসন। কুটীর দাঁড়াবার অবসর নেই। চলেছে তো চলেছেই।

বাইশ মাইল পথ পার হয়ে থানার মাঠে এসে যখন পৌঁছল, মনে হ'ল, তার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। বারান্দায় উঠতে পারলো না। অস্ফুট কণ্ঠে একবার শুধু বলল, পানি। বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

ডাক্তারের সাহায্যে জ্ঞান যখন ফিরে এল, চোখ মেলেই চেঁচিয়ে উঠল কুটী—খুন, খুন হয়েছে রাউজানের জঙ্গলে। শীগ্‌গির চল তোমরা।

চলবার শক্তি ছিল না। সেই রাত্রেই ডুলি চড়ে পুলিশের সঙ্গে ফিরে এল আখড়ায়। কবর খুঁড়ে বের করা হল হোসেনের মৃতদেহ। মনে হ'ল যেন জোয়ান ছেলেটা এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একবার ডাকলেই উঠে পড়বে। কুটী চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের উপর। পরম স্নেহে আঁচল দিয়ে মুখের উপর থেকে মুছে নিল মাটির দাগ। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, ওগো, একজন ডাক্তার ডাক, তোমরা। ও মরেনি। একটু ওষুধ দিলেই বেঁচে উঠবে।

পাশের কবরগুলোও খোঁড়া হল। পাওয়া গেল একটা গলিত শব আর দশটা কঙ্কাল।

(ক্রমশ)

নোংরা হাত

জাঁ-পল সার্ত্র্
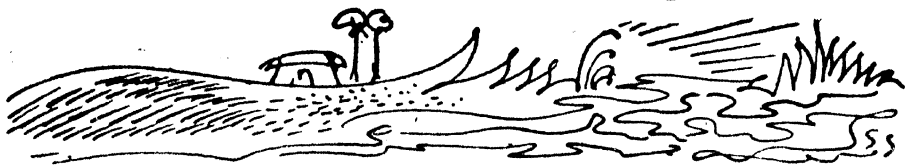
অনুবাদঃ শিবনারায়ণ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য

স্টুডিও।

হুগো পুরোপুরি পোশাকপরা অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। গায়ের ওপরে লেপ চাপানো। ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে নড়ে যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে ওঠে। যেসিকা পাশে স্তব্ধ হয়ে বসে। হুগো আবার কাতর শব্দ করে, যেসিকা উঠে কলঘরে যায়। কল হতে জল পড়ার শব্দ শোনা যায়। জানলার পর্দার আড়াল হতে পর্দা সরিয়ে ওলগা উঁকি মারে; তারপর মনস্থির করে হুগোর কাছে যায়। তারদিকে চেয়ে থাকে। হুগো আবার কাতর শব্দ করে। ওলগা বালিশের পরে তার মাথাটা ঠিক করে দেয়। এরমধ্যে যেসিকা ফিরে এসে তাদের লক্ষ্য করছে। তার হাতে মাথায় দেবার ভিজে ন্যাকড়া।

যেসিকা। বড় দয়া আপনার! সুসন্ধ্যা!

ওলগা। চেঁচিয়ে উঠ না। আমি......

যেসিকা। আমার মোটেই চেঁচাবার ইচ্ছে নেই। বসবেন না?

ওলগা। আমি ওলগা লোরাম।

যেসিকা। জানি।

ওলগা। হুগো আমার কথা বলেছে?

যেসিকা। হ্যাঁ।

ওলগা। ওর কি চোট লেগেছে?

যেসিকা। না। মাতলামীর জের। [ওলগার সামনে যেয়ে] মাফ করবেন। [হুগোর কপালে ভিজে ন্যাকড়া রাখে]

ওলগা। ওভাবে নয়। [অন্যভাবে লাগিয়ে দেয়।]

যেসিকা। মাফ করবেন।

ওলগা। হোয়েডেরারের কি খবর?

যেসিকা। হোয়েডেরার? বসুন দয়া করে। [ওলগা বসে] বোমাটা কি তুমি ছুঁড়েছিলে?

ওলগা। হ্যাঁ।

যেসিকা। কেউ মরেনি। পরের বার যদি এর চাইতে ভাল বরাত হয়। এখানে ঢুকলে কি করে?

ওলগা। দরজা দিয়ে। তোমরা বেরোবার সময় খুলে রেখে গেছলে। দরজা কখনো খুলে রেখে যেতে নেই।

যেসিকা। [হুগোকে দেখিয়ে] তুমি জানতে ও অফিসে আছে?

ওলগা। না।

যেসিকা। কিন্তু তুমি জানতে ও থাকতে পারে।

ওলগা। এটুকু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

যেসিকা। একটু ভালো বরাত হলে ওকে মেরে ফেলতে পারতে।

ওলগা। ওর পক্ষে তাই সবচেয়ে ভালো হত।

যেসিকা। সত্যি?

ওলগা। পার্টি বেইমানদের তেমন পছন্দ করে না।

যেসিকা। হুগো বেইমান নয়।

ওলগা। আমিও তা বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্যেরা সেকথা মানতে চাইছে না। [থেমে] কাজটা সারতে বড্ড বেশি সময় নিচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে চুকে যাবার কথা।

যেসিকা। ওকে ত' সুযোগ পেতে হবে।

ওলগা। সুযোগ তৈরী করে নিতে হয়, পাওয়া যায় না।

যেসিকা। পার্টি তোমাকে পাঠিয়েছে?

ওলগা। আমি যে এসেছি পার্টি জানে না।

যেসিকা। ও, বুঝেছি। থলির মধ্যে একটা বোমা গুঁজে নিয়ে সিধে চলে এসেছিলে। ভেবেছিলে হুগোর গায়ে এটা ছুঁড়ে মেরে তাকে দুর্নামের লজ্জা থেকে বাঁচাবে।

ওলগা। বোমাটা ঠিকমত লাগলে, সবাই ভাবত হুগো হোয়েডেরারকে মারতে যেয়ে তার সঙ্গেই সাবাড় হয়ে গেছে।

যেসিকা। ঠিক। কিন্তু তাতে হুগোও তো মারা যেত।

ওলগা। যেভাবেই কাজ হাঁসিলের চেষ্টা করুক, এখান হতে সে যে জ্যান্ত বেরুতে পারবে, তার বড় আশা নেই।

যেসিকা। তোমরা তোমাদের বন্ধুত্বের খুব দাম দাও বটে।

ওলগা। তুমি তোমার ভালবাসাকে যেটুকু দাম দাও, তার চাইতে বেশি সন্দেহ নেই। [তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।] তুমি কি ওর কাজে বাধা দিচ্ছিলে?

যেসিকা। আমি কোন কিছুতেই বাধা দিই নি।

ওলগা। কিন্তু তুমি ত' ওকে সাহায্যও কিছু করনি?

যেসিকা। আমি কেন ওকে সাহায্য করব? ও কি পার্টিতে যোগ দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে যোগ দিয়েছিল? ও যখন ঠিক করল যে অচেনা একটা মানুষকে বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেওয়ার চাইতে ভাল আর কোন কিছু ওর জীবনে করার নেই তখন কি ও আমার সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিল?

ওলগা। ও তোমার পরামর্শ নেবে কেন? কিই বা তুমি ওকে বলতে পারতে?

যেসিকা। কিছু না।

ওলগা। ও পার্টিতে যোগ দিয়েছে; এই কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়েছে; তোমার পক্ষে এই ত' যথেষ্ট।

যেসিকা। আমি তা মনে করি না। [হুগো কাতর শব্দ করে ওঠে]

ওলগা। ওর শরীর ভালো নেই। ওকে এভাবে মাতাল হতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

যেসিকা। তোমার বোমাটা ওর মুখের পরে ফাটলে ওর অবস্থা এতক্ষণে আরো কাহিল হত। [থেমে] কি দুঃখু ও তোমায় বিয়ে করেনি! তুমি যখন শহরতলী শহরতলীতে বোমা ছোঁড়ায় ব্যস্ত থাকতে ও তখন বেশ ঘরে বসে তোমার শায়া শেমিজ ইস্তিরি করত। আমরা তিনজনেই খুব সুখী হতাম। [ওলগার দিকে তাকিয়ে] আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ঢ্যাঙা আর চোয়াড়ে।

ওলগা। গোঁফশুদ্ধু?

যেসিকা। না, গোঁফ নয়। নাকের এক-পাশে একটা আঁচিল। তোমার সঙ্গে-দেখা করে এলেই ওকে খুব ভারিক্কী দেখাত। বলত, আমরা রাজনীতি আলোচনা করছিলাম।

ওলগা। স্বভাবতই ও তোমার সঙ্গে কখনো রাজনীতি আলোচনা করেনি।

যেসিকা তোমার কি ধারণা, ও রাজ-নীতি আলোচনার জন্যে আমাকে বিয়ে করেছিল? [থেমে] তুমি ওর প্রেমে পড়েছ, তাই না?

ওলগা। এর ভেতরে প্রেম এল কোত্থেকে? তুমি বড্ড বেশি উপন্যাস পড়।

যেসিকা। তা কোনো মেয়ের রাজনীতিতে আগ্রহ না থাকলে তাকে অন্য কিছু একটা নিয়ে থাকতে ত' হবে।

ওলগা। ভাবনা কোরোনা! আমার মত মেয়েদের কাছে প্রেমের কোন গুরুত্ব নেই। ও ছাড়াই আমাদের চলে যায়।

যেসিকা। মানে আমার চলে না?

ওলগা। সব ন্যাকা আবেগবিলাসীদের মত।

যেসিকা। বুদ্ধিবিলাসীর চাইতে আবেগ-বিলাসী হওয়া আমার কাছে ঢের ভাল।

ওলগা। বেচারী হুগো!

যেসিকা। হ্যাঁ। বেচারী হুগো!

ওলগা। ওকে উঠিয়ে দাও। আমার ওকে কিছু বলার আছে। [যেসিকা বিছানার ধারে যেয়ে হুগোকে নাড়া দেয়।]

যেসিকা। হুগো! হুগো! তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।

হুগো। কি! [উঠে বসে] ওলগা! ওলগা! তাহ'লে এলে তুমি! তোমায় দেখে কি খুশি যে হয়েছি! আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে। [বিছানার কিনারায় বসে] ও, ভগবান! মাথার যে কি ভয়ানক অবস্থা! আমরা কোথায়? তুমি এসেছ কি খুশি যে হয়েছি! রোসোঃ কি যেন একটা কান্ড ঘটেছে। একটা ভয়ানক কিছু। তুমি সাহায্য করতে পারবে না। না, এখন আর তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। বোমাটা তুমিই ছুঁড়েছিলে, তাই না?

ওলগা। হ্যাঁ।

হুগো। তুমি কেন আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না?

ওলগা। হুগো, পনেরো মিনিটের মধ্যে দেয়ালের ওপার হতে একটা দড়ি ছুঁড়ে দেবে, আমাকে তা বেয়ে নেবে যেতে হবে। আমার একটুও সময় নেই। মন দিয়ে শোন।

হুগো। তুমি কেন আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না?

ওলগা। যেসিকা, আমাকে জলের বোতল আর গেলাসটা দাও ত'। [যেসিকা সেগুলো এগিয়ে দেয়, ওলগা গ্লাসে জল ভরে হুগোর মুখে জলের ঝাপটা মারে]

হুগো। উহ্!

ওলগা। কথা শুনছ?

হুগো। হ্যাঁ। [মুখ মোছে] মাথার যে কি ভয়ানক অবস্থা! একটু খাবার জল দাও ত'। [যেসিকা গ্লাসে জল ঢেলে দেয়, হুগো পান করে] আমাদের ছেলেরা কি ভাবছে?

ওলগা। যে তুমি বিশ্বাসঘাতক!

হুগো। তারা বাড়াবাড়ি করছে।

ওলগা। তোমার আর একদিনও নষ্ট করার মত সময় নেই। কাল সন্ধ্যের মধ্যেই কাজ হাসিল করতে হবে।

হুগো। তোমার তা বলে বোমাটা ছোঁড়া উচিত হয়নি।

ওলগা। হুগো, তুমি নিজে জোর করে শক্ত কাজের ভার নিয়েছিলে। জোর করে একা সে ভার নিয়েছিলে। তোমাকে সে কাজ না দেবার একশো কারণ সত্ত্বেও আমিই প্রথম তোমার ওপর বিশ্বাস রাখি। আর অন্যদের মধ্যে সে বিশ্বাস সঞ্চারিত করি। কিন্তু আমরা বয়স্কাউট খেলছি না। তোমাকে কেরামতী দেখানোর সুযোগ দেবার জন্যে পার্টি গড়া হয়নি। একটা কাজ করার দরকার পড়েছে, সেটা করতেই হবে। কাকে দিয়ে করানো হল সেটা একেবারেই অবান্তর। যদি আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার দায়িত্ব পালন করতে না পারো, সে কাজ করার জন্যে তোমার জায়গায় অন্য কাউকে পাঠানো হবে।

হুগো। তাহলে আমিও পার্টি ছেড়ে দেবো।

ওলগা। কি আজেবাজে বকছ? তুমি কি ভেবেছ যে তোমার পার্টি ছাড়ার ক্ষমতা আছে? আমরা এখন যুদ্ধ করছি, হুগো, আমাদের লোকেরা কিছু আর খেলা করছে না। পার্টি ছাড়তে হলে প্রাণটাও রেখে যেতে হবে।

হুগো। আমি মরার ভয় করি না।

ওলগা। মরাত' কিছুই না। কিন্তু সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে দিয়ে উজবুকের মত মরা—কিম্বা তার চাইতেও যা খারাপ—অপটুতার জন্যে যাকে সাবাড় করতে হয় এমনি বোকার মত মরা—তাই কি তুমি চাও? হাসি আর গর্বে ঝলমলে মুখ নিয়ে যখন তুমি প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে তখন কি এই মৃত্যু তুমি চেয়েছিলে? [যেসিকাকে] তুমি কেন ওকে বলছ না? তুমি যদি ওকে একটুও ভালবাস, তুমি ত' চাইবে না ওকে কুকুরের মত গুলী করে মারুক।

যেসিকা। তুমি ভাল করেই জান আমি রাজনীতি বুঝি না।

ওলগা। [হ্যুগোকে] তাহ'লে কি বল তুমি?

হ্যুগো। তোমার তা বলে বোমাটা ছোড়া উচিত হয়নি।

ওলগা। কি সিদ্ধান্ত করলে?

হ্যুগো। কাল বলব।

ওলগা। বেশ। বিদায়, হ্যুগো।

হ্যুগো। বিদায়, ওলগা।

যেসিকা। পুনর্দর্শনায়, কি বলেন?

ওলগা। আলোটা নিবিয়ে দাও। [যেসিকা আলো নিবিয়ে দেয়। ওলগা দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।]

যেসিকা। আলোটা জ্বালব?

হ্যুগো। দাঁড়াও। ও আবার ফিরে আসতে পারে। [অন্ধকারে দুজনে অপেক্ষা করে]

যেসিকা। খড়খড়িটা ফাঁক করে একটু দেখি।

হ্যুগো। না। [চুপচাপ]

যেসিকা। তোমার মনে কি খুব কষ্ট হচ্ছে? [হ্যুগো জবাব দেয় না] অন্ধকার থাকতে থাকতে বল।

হ্যুগো। শুধু মাথাটা কেটে যাচ্ছে। [থেমে] যে বিশ্বাসের এক সপ্তাহের বেশি টেকবার ক্ষমতা নেই, তার খুব বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে না।

যেসিকা। না, খুব বেশি গুরুত্ব থাকতে পারে না।

হ্যুগো। তোমাকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে, কি করে তুমি বাঁচবে?

যেসিকা। আমাকে কোনদিনই কেউ বিশ্বাস করেনি তুমি ত' সবচেয়ে কম। তবু কোন রকমে চালিয়ে ত' এসেছি।

হ্যুগো। ওই একমাত্র পৃথিবীতে আমাকে কিছুটা বিশ্বাস করত।

যেসিকা। হ্যুগো……

হ্যুগো। ওই একমাত্র—আমি তা জানি। [থেমে] এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিরাপদে বেরিয়ে গেছে। আলোটা জেলে দিতে পার। [নিজেই আলোর সুইচ টেপে। যেসিকা হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।] কি হল?

যেসিকা। তোমার দিকে চেয়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে।

হ্যুগো। আলোটা কি আবার নিবিয়ে দেব?

যেসিকা। না। [তার দিকে ফেরে] তুমি, তুমি নিজে একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছ!

হ্যুগো। আমি কি করতে যাচ্ছি, আমি কি নিজেই জানি।

যেসিকা। আমায় বন্দুকটা দেখাও তো।

হ্যুগো। কেন?

যেসিকা। কি রকম দেখতে তাই দেখব।

হ্যুগো। সারা বিকেল ত' ওটা তোমারি সঙ্গে ঘুরেছিল।

যেসিকা। হ্যাঁ। কিন্তু তখন ওটা ছিল একটা খেলনা।

হ্যুগো। [রিভলবারটা বার করে ওকে দিয়ে] সাবধান কিন্তু।

যেসিকা। হ্যাঁ। [সেটার দিকে চেয়ে] আশ্চর্য!

হ্যুগো। কি আশ্চর্য?

যেসিকা। এখন এটা দেখে আমার ভয় করছে। এটা ফিরিয়ে নাও। [থেমে] তুমি একটা মানুষ খুন করতে যাচ্ছ। [হ্যুগো হাসতে আরম্ভ করে] হাসছ কেন?

হ্যুগো। আমায় তাহলে তুমি বিশ্বাস করছ? আমাকে বিশ্বাস করবে মনে মনে ঠিক করেছ?

যেসিকা। হ্যাঁ।

হ্যুগো। ভালো সময়েই ঠিক করছ। আর কেউ এখন একথা বিশ্বাস করে না। [থেমে] এক সপ্তাহ আগে ঠিক করলে হয়ত কাজে লাগত……

যেসিকা। সে কি আমার দোষ? আমি যা দেখতে পাই তাই শুধু বিশ্বাস করি। ও যে মারা যাবে আজ সকাল পর্যন্ত একথা কখনো কল্পনাও করতে পারতাম না। [থেমে] এই-মাত্র অফিসে এলাম, দেখি একটা মানুষ দাঁড়িয়ে, তার গাল হতে রক্ত গড়াচ্ছে। আর হঠাৎ আমার মনে হল তোমরা সবাই মরে গেছ। হোয়েডেরার মারা গেছে, তার মুখে সেকথা দেখতে পেলাম। তুমি যদি ওকে খুন না কর, ওরা অন্য কাউকে পাঠাবে।

হ্যুগো। আমিই ঠিক করব। [থেমে] অত রক্ত, বীভৎস, তাই না?

যেসিকা। হ্যাঁ।

হ্যুগো। হোয়েডেরারেরও অমনি রক্ত গড়াবে।

যেসিকা। চুপ কর।

হ্যুগো। বোকার মত মেঝের পরে পড়ে থাকবে, আর তার পোশাক-আশাক সব রক্তে ছুপিয়ে উঠবে।

যেসিকা। [আস্তে নরম গলায়] আমি বলছি, চুপ কর।

হ্যুগো। ও দেয়ালের ওপার হতে বোমা ছুঁড়েছিল, এটা এমন কিছু বীরত্বের কাজ নয়, আমাদের ও দেখতে পর্যন্ত পায়নি। কি করছে তা চোখে দেখতে না হলে যে কোন লোকই মানুষ খুন করতে পারে। আমি গুলী করতে যাচ্ছিলাম। আমি একদম তৈরি হয়েছিলাম। আমি ওদের দিকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলী করতে যাচ্ছিলাম। আমি যে আমার সুযোগ হারালাম সে ত' ওর দোষ।

যেসিকা। তুমি সত্যি ওকে গুলী করতে যাচ্ছিলে?

হ্যুগো। আমার হাত ছিল পকেটের মধ্যে, আমার আঙুল ঠিক বন্দুকের ঘোড়াটার পরে।

যেসিকা। আর তুমি গুলী করতে যাচ্ছিলে! তুমি নিঃসন্দেহ তুমি গুলী করতে যাচ্ছিলে?

হ্যুগো। আমি তখন………আমি তখন খুব রেগে গিয়েছিলাম। নিশ্চয় আমি গুলী করতাম। এখন আবার গোড়া হতে শুরু করতে হবে। [হেসে ওঠে] তুমি শুনলে ওর কথা ঃ ওদের ধারণা আমি বেইমান। ওদের ত' খুব সোজা—ওখানে বসে ঠিক করলে একজনকে মারতে হবে—যেন টেলিফোন গাইড হতে একটা নাম কেটে দিলে। খাসা পরিচ্ছন্ন ব্যাপার। এখানে মারাটা একটা রীতিমত কাজ। কসাইখানার মত। [থেমে] ও মুখে মুখে বলে যায়, তামাক টানে, আমার সঙ্গে পার্টির কথা আলোচনা করে, নানা কাজের নক্সা বানায়—আর সমস্তক্ষণ আমি শুধু ভাবতে পারি, ও একটা মরা

দেহ। এ অশ্লীল। তুমি ত' ওর চোখদুটো দেখেছ।

যোসিকা। হ্যাঁ।

হুগো। দেখেছ কি কঠিন আর উজ্জ্বল? কি জীবন্ত?

যোসিকা। হ্যাঁ।

হুগো। হয়ত আমি ওকে ঠিক দুটো চোখের মাঝখানে গুলী করব। জান ত', তুমি লক্ষ্য করলে পেটের দিকে, কিন্তু বন্দুকটা ঝাঁকি দিয়ে উঠে গেল ওপর দিকে।

যোসিকা। ওর চোখ দুটো আমার ভালো লাগে।

হুগো। (আচমকা) এটা একটা বিদেহী কল্পনা।

যোসিকা। কি?

হুগো। খুন। আমি বলছি ওটা একটা বিদেহী কল্পনা। তুমি ঘোড়াটা টিপলে, আর তারপর যা ঘটে কিছুই তুমি বুঝতে পার না [থেমে] যদি না তাকিয়ে গুলী করা যেত। [থেমে] জানিনে তোমায় এসব কেন বলছি।

যোসিকা। আমিও তাই ভাবছি।

হুগো। দুঃখিত। [থেমে] আচ্ছা, আমি যদি মরণাপন্ন অবস্থায় ওই বিছানায় পড়ে থাকি তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না? যাবে?

যোসিকা। না।

হুগো। দুই-ই এক কথা—মারা কি মরা—দুই-ই এক কথা—দু'এতেই তুমি সমান একা। ওর কপাল ভাল, ও শুধু একবারই মরবে। কিন্তু এই দশ দিন ধরে আমি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে ওকে বারবার খুন করেই চলেছি। [আচমকা] তুমি কি করবে যোসিকা?

যোসিকা। তার মানে?

হুগো। শোন। কালকের মধ্যে যদি ওকে মারতে না পারি তাহ'লে হয় আমাকে মুছে যেতে হবে—আর নয়ত ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমি ওদের বলব : আমাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে হয় কর। আর যদি ওকে খুন করি......[মুহূর্তকালের জন্যে দু হাতে নিজের মুখ ঢাকে] আমি কি করব? তুমি কি করতে?

যোসিকা। আমি? তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমি কি করতুম?

হুগো। আর কাকে জিজ্ঞেস করব? জগতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

যোসিকা। তা সত্যি। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু আমি। বেচারী হুগো! [থেমে] আমি হলে হোয়েডেরারের কাছে গিয়ে বলতাম, দেখ, আমাকে এখানে তোমাকে খুন করার জন্যে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু আমি মন বদলেছি—আমি তোমার সংগে থেকে কাজ করতে চাই।

হুগো। বেচারী যোসিকা!

যোসিকা। তুমি কি তা করতে পার না?

হুগো। তাকেই ওরা বলে বেইমানী।

যোসিকা। [বিষণ্ণভাবে] তবেই দেখ। আমি তোমাকে কোনো উপদেশই দিতে পারি না। [থেমে] আচ্ছা, তুমি কেন তা করতে পারবে না? তুমি যা ভাব হোয়েডেরার তা ভাবে না বলে?

হুগো। যদি তা বলো, তাই।

যোসিকা। তাহ'লে যার সংগে তোমার মতে মিলবে না তাকেই তুমি খুন করবে?

হুগো। কখনো কখনো।

যোসিকা। তুমি কেন লুই আর ওলগার মত ভাবতে ঠিক করলে?

হুগো। ওরা ঠিক ভাবে, তাই।

যোসিকা। কিন্তু হুগো, ধর গত বছর যদি লুই-এর সংগে না হয়ে হোয়েডেরারের সংগে তোমার দেখা হ'ত, তখন ত' তুমি তার ভাবনাই ঠিক মনে করতে?

হুগো। তোমার মাথা খারাপ।

যোসিকা। কেন?

হুগো। তোমার কথা শুনলে মনে হবে সব মতই বুঝি সমান—আর লোকেরা সংক্রামক ব্যাধির মতই মতের কবলে পড়ে।

যোসিকা। তা আমি ভাবি না—আমি—......আমি কি ভাবি আমি জানি না। হুগো, ও কি রকম শক্তিমান পুরুষ, ও মুখ খুললেই মনে হবে ওর কথাই নিশ্চয় ঠিক। তাছাড়া আমার ত' মনে হয় ও খাঁটি লোক আর ও পার্টির ভালোর জন্যে কাজ করছে।

হুগো। ও কি চায় · কিম্বা কি ভা[বে] তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যা[থা] নেই—আসল কথা হল ও কি করে[…]

যোসিকা। কিন্তু......

হুগো। বাস্তববিচারে ও সামাজি[ক] বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করছে।

যোসিকা। [বুঝতে না পেরে] বাস্তব বিচারে?

হুগো। হ্যাঁ।

যোসিকা। ও। [থেমে] ধর, তুমি [কি] করবে ভাবছ সেকথা ও যদি জান[ত] ও কি ভাবত না যে, তুমিও একজ[ন] সামাজিক বিশ্বাসঘাতক।

হুগো। আমি জানিনে।

যোসিকা। কিন্তু ও তা ভাবত কিনা?

হুগো। তাতে কি এসে গেল? হ্যাঁ বোধ হয় ভাবত।

যোসিকা। তাহ'লে কে ঠিক?

হুগো। আমি।

যোসিকা। কি করে জানলে?

হুগো। রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। তুমি যে ঠিক আর অন্য লোক যে ভুল তা এখানে স্পষ্ট করে প্রমাণ করা যায়।

যোসিকা। তবে অপেক্ষা করছ কেন?

হুগো। সে বোঝাতে অনেক সময় লাগবে।

যোসিকা। সারা রাত ত' রয়েছে।

হুগো। মাস, বছর লেগে যাবে।

যোসিকা। ও! [বইগুলোর কাছে যেয়ে] আর সে সব ব্যাখ্যা এতে লেখা আছে।

হুগো। একদিক দিয়ে, হ্যাঁ। অবশ্য ওদের মানে ঠিকমত বুঝতে পারলে।

যোসিকা। ভগবান! [একটা বই তোলে, খুলে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রেখে দেয়।] ও ভগবান!

হুগো। এখন যাও, আমাকে একলা থাকতে দাও। ঘুমোতে যাও।

যোসিকা। কি হল? আমি কি বলেছি?

হুগো। কিছু না, কিচ্ছু না। আমারি ভুল। তোমার কাছে সাহায্য চাওয়াটা পাগলামী। তোমার উপদেশ আসছে আর এক জগৎ হতে।

যোসিকা। সে দোষ কার? আমাকে কেউ

কখনো কোনো কিছু শেখায়নি কেন? কখনো কিছু বোঝায়নি কেন? ও কি বলল শুনেছ? আমি তোমার বিলাস! উনিশ বছর ধরে আমি তোমাদের এই পুরুষদের জগতে বড় হয়েছি, এ জগতে কোনো কিছু ছুঁতে আমার মানা। তোমরা আমাকে বুঝিয়ে এসেছ সবকিছুই খাসা চলছে; আমার কাজ শুধু ফুলদানী সাজিয়ে ফুল রাখা আর তোমাদের জীবনে একটু সুগন্ধ বয়ে আনা। কেন তোমরা সবাই আমাকে শুধু মিথ্যে বলে এসেছ? কেন আমায় এমন অজ্ঞ করে রাখলে? তারপর একদিন তুমি আমাকে জানালে দুনিয়াটা ফেটে চৌচীর হতে চলেছে, তুমি একেবারে অসহায়। আমাকে বাছতে দিয়েছ হয় আত্মহত্যা, নয় খুন। আমি বাছব না—আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে দেব না, আমি তোমাকে খুন করতেও দেব না। এ বোঝা আমার কাঁধে কেন চাপালে? আমি তোমার কোনো সমস্যা বুঝি না—আমার তাতে কোনো দায়িত্ব নেই। আমি শোষক নই, সামাজিক বিশ্বাসঘাতক নই, বিপ্লবীও নই। আমি ত' কিছু করিনি—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

হুগো। আমি ত' আর তোমার কাছে কিছু চাইছি না, যেসিকা।

যেসিকা। বড় দেরী হয়ে গেছে, হুগো, এখন আমি তোমার পরিকল্পনার অংশ হয়ে গেছি। এখন আমাকে বাছতেই হবে। তোমার জন্যে, আমার জন্যে। তোমার জীবন বাচার ভেতরে আমার জীবনই আমি বাছছি। আর আমি......ও ভগবান! আর যে পারি না।

হুগো। বুঝতে পেরেছি।

[চুপচাপ। হুগো বিছানায় বসে শূন্যে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যেসিকা পাশে বসে তার গলা নিজের দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে]

যেসিকা। কিছু বোলো না। আমার জন্যে ভেব না। আমি একটা কথাও বলব না। আমি তোমার ভাবনায় বাধা দেব না। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকব। হিম প্রত্যূষে আমার দেহ হতে একটু উত্তাপ নিলে তোমার ভাল লাগবে। এটুকুই শুধু তোমায় আমি দিতে পারি। মাথায় কি এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে?

হুগো। হ্যাঁ।

যেসিকা। আমার কাঁধের পরে মাথাটা রাখ। তোমার কপাল পুড়ে যাচ্ছে। [চুলে আঙুল বুলোয়] বেচারী কপাল।

হুগো। [আচমকা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে] আর না, ঢের হয়েছে!

যেসিকা। [নরম গলায়] হুগো!

হুগো। তুমি আমার সঙ্গে মা-মা খেলা করছ।

যেসিকা। আমি খেলা করছি না। আর কোনোদিনই খেলা করব না।

হুগো। হিম তোমার দেহ—আমাকে দেবার মত কোন উত্তাপ তোমার নেই। মায়ের ঢং-এ কাউকে বুকে টেনে তার চুলে বিলি কাটা কিছু শক্ত কাজ নয়, যে কোন খুকী মেয়েই তার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন তোমাকে আমার দু বাহুতে টেনে নিয়ে সহধর্মিনী হতে ডেকেছিলাম, তখন ত' বিশেষ সুবিধে করতে পারনি।

যেসিকা। বোলো না।

হুগো। কেন বলব না? তুমি কি জান না আমাদের এই ভালবাসা শুধু একটা প্রহসন?

যেসিকা। আজ রাতে যেটা বড় কথা, সে আমাদের ভালবাসা নয়, সে হল তুমি কাল কি করবে।

হুগো। সবই এক কথা। যদি নিশ্চয় করে জানতাম......[হঠাৎ] যেসিকা, আমার দিকে চাও, বলতে পার তুমি আমায় ভালবাস? [তার দিকে চেয়ে থাকে। চুপচাপ] দেখলে ত', তাও আমার জুটল না।

যেসিকা। আর তোমার সম্বন্ধে কি হুগো? তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর তুমি আমায় ভালবাসতে? [হুগো জবাব দেয় না] দেখলে ত'। [চুপচাপ। হঠাৎ] ওকে কেন বোঝাবার চেষ্টা কর না?

হুগো। কাকে বোঝাব? হোয়েডেরারকে?

যেসিকা। তুমি বলছ তার ভুল। সেটা ত' তুমি তার কাছে প্রমাণ করে দেখাতে পার।

হুগো। তোমার বুঝি তাই ধারণা? ও ভারী চালাক।

যেসিকা। তুমি যদি তোমার মত প্রমাণ করতে না পার, তবে তা যে ঠিক তা জানবে কি করে? হুগো! কি ভালোই না হবে, তুমি সবাইকে আবার মিলিয়ে দেবে, সবাই খুশি হবে, তোমরা সবাই এক সঙ্গে কাজ করবে। চেষ্টা করে দেখো হুগো, লক্ষ্মীটি, চেষ্টা করে দেখো। অন্তত ওকে খুন করার আগে একবার চেষ্টা করে দেখো। [দরজায় আওয়াজ হয়, হুগো চমকে ওঠে। তার চোখ জ্বলছে]

হুগো। নিশ্চয় ওলগা। ও ফিরে এসেছে! আমি জানতাম ও ফিরে আসবেই। আলো নিবিয়ে দরজাটা খুলে দাও।

যেসিকা। তোমার তাকে খুব দরকার, তাই না? [আলো নিবিয়ে দরজা খুলে দেয়। হোয়েডেরার প্রবেশ করে। দরজা বন্ধ করার পর হুগো আলো জ্বালে]

যেসিকা। [হোয়েডেরারকে চিনতে পেরে] আঁ?

হোয়েডেরার। ভয় পেয়েছ?

যেসিকা। একটু নার্ভাস হয়ে গেছি! বোমাটা পড়ল......

হোয়েডেরার। ঠিক, ঠিক। তোমরা কি সাধারণত অন্ধকারে বসে থাক?

যেসিকা। আমার চোখ দুটো বড় ক্লান্ত লাগছে কিনা, তাই।

হোয়েডেরার। ও! [থেমে] আমি এক মিনিট বসতে পারি? [হাতল-ওয়ালা চেয়ারটায় বসে পড়ে] আমার জন্যে ভেব না।

(ক্রমশ)

তিনদিনের ভ্রমণ কাহিনী

সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

পঞ্চনদীর দেশ শতস্মৃতিবিজড়িত পাঞ্জাব! সুদূর অতীতে "রণধারা বাহি, জয়গান গাহি" যাহারা সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, ভারতভূমির দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল, ভারতের এই তোরণদ্বার সেদিন তাহাদের পদভরে কম্পিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালেও পারসিক, গ্রীক, শক, হূণ, পাঠান এবং মোগল অভিযানের বন্যা এই পথেই বার বার ভারতভূমি প্লাবিত করিয়াছে। গুরু নানক, গুরুগোবিন্দের কর্মভূমি এই পাঞ্জাবেই সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখজাতি নবজন্মলাভ করিয়া অভিনব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই পাঞ্জাবেই মহারাজা রণজিৎ সিংহ মোগল-মহিমার ধ্বংসাবশেষের উপর এক অভিনব রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। বিদেশী বণিকের শৌর্য ও কূটকৌশল এবং রণজিৎ সিংহের উত্তর সাধকগণের অকর্মণ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। ১৮৩৯ সালে তাঁহার দেহাবসানের পর ১০ বৎসরের মধ্যেই পাঞ্জাব বৃটিশ সিংহের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিল। সে অন্য কাহিনী।

১৯১৯ সালে এই পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগেই মদোদ্ধত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অনুচরবৃন্দ রক্তস্রোত বহাইয়া দিয়াছিল। তারপর ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবে যে আত্মঘাতী নারকীয় নিধন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল মানুষের লিখিত ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। পাঞ্জাবের উন্মত্ত জনতা সেদিন নির্বিচারে নরহত্যা, নারীধর্ষণ এবং পরস্বাপহরণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। মানুষ সেদিন মানুষ ছিল না।

বর্ষাধিককাল পাঞ্জাবে আছি। মফঃস্বল শহরের একটা নামজাদা কলেজে ছাত্র চরাই। ছুটিগুলো বাঙলাদেশের তুলনায় কম। বহুদিন হইতেই পাঞ্জাবের পল্লীঅঞ্চল দেখিবার ইচ্ছা ছিল। গ্রামেই জাতি এবং সংস্কৃতির খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়। শহরের জীবন ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়। সঙ্গীর অভাবে এতদিন যাইতে পারি নাই প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় ভাষাজ্ঞানের দৈন্য। পাঞ্জাবী ভাল জানি না। দ্বিতীয় অন্তরায় শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদবর্গের ভীতি প্রদর্শন। শহরের বাহিরে গেলেই নাকি ডাকাতের হাতে পড়িবার আশঙ্কা। তাঁহাদের আশঙ্কা অতিরঞ্জিত হইলেও অমূলক নহে। প্রতিবেশী রাজ্য পেপসু হইতে তাড়া খাইয়া দস্যু-তস্করের দল পাঞ্জাবে আসিয়া আসর জমাইয়া তুলিতেছে। সকালবেলা যে কোন পাঞ্জাবী কাগজ খুলিলেই খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী-ধর্ষণের বীভৎস কাহিনী চোখে পড়ে। সময়ে সাবধান না হইলে অদূরভবিষ্যতে পাঞ্জাব তথা ভারত সরকারকে হয়ত গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। যাক্, সে ভাবনার দায় আমার নহে।

পূজার ছুটি বলিয়া এখানে কিছু নাই। তবে পূজার সময় একসঙ্গে দুইদিন ছুটি পাওয়া গেল। সঙ্গে রবিবার। দুইজন সঙ্গীও জুটিয়া গেল। যাত্রার দিন, গন্তব্যস্থান প্রভৃতি ঠিক হইল। অষ্টমী পূজার দিন ২৯শে আশ্বিন, (ইংরেজি ১৬ই অক্টোবর) বাহির হইব স্থির করিলাম। সঙ্গী দুইজনই কলেজের ছাত্র। ইঁহাদের একজন জগজিৎ (জগজিৎ) সিং এবং দ্বিতীয়জন সরবজিৎ (সর্বজিৎ) সিং।

বেলা ৯টা ৫ মিঃ-এ গাড়ি। স্টেশন বাড়ি হইতে প্রায় দেড় মাইল। খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বেলা ৮টা বাজিয়া গেল। সঙ্গীদের কাহারও দেখা নাই। প্রায় ৮॥টার সময় অপর একজন ছাত্রের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, জগজিৎ কাল রাত্রিতে জরুরী কাজে হঠাৎ জলন্ধর চলিয়া গিয়াছে পথে জলন্ধরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবে। সবরজিৎ স্টেশনে অপেক্ষা

প্রদোষের প্রান্তর

সম্পন্ন কৃষকের অন্দরমহল
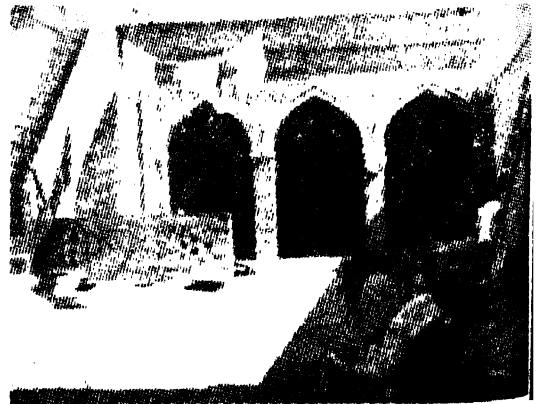
করিতেছে। তাড়াহুড়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিতেছে। টিকেট করিয়া গাড়িতে উঠিতে না উঠিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ক্রমে জলন্ধর আসিল। কোথায় জগজিৎ? প্ল্যাটফর্মে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার দেখা মিলিল না। একটু দমিয়া পড়িলাম।

বেলা ১২টায় লুধিয়ানা। দিল্লীর লোদি রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথম এইখানেই বসতি

অজ্ঞাতনামা শহীদের সমাধি (ডাংগো)

স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই ইহার নাম লোদিয়ানা। এই লোদিয়ানাই বর্তমানে লুধিয়ানায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পাঞ্জাবীরা বলে লুদিয়ানা। লুধিয়ানা মাঝারীগোছের শহর। ইহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। কয়েকজন বাঙালীও নাকি এখানে আছেন। লুধিয়ানার সরকারী কলেজ এবং সরকারী কৃষিবিজ্ঞান কলেজ পাঞ্জাবের দুইটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন। লুধিয়ানার আর্য হাইস্কুল বোধ হয় পাঞ্জাবের বৃহত্তম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। ইহার ছাত্রসংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

লুধিয়ানায় সর্দার সন্তোখ (সন্তোষ) সিং দেউলের অতিথি হইলাম। ইনি সরবজিতের খুল্লতাত। শিখধর্মে জাতিভেদের স্থান না থাকিলেও শিখগণ সকলে কিন্তু আজও জাতির মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সেই জন্যই ইহারা অনেকে নামের শেষে নিজ নিজ কৌলিক পদবী—বেদি, শোধি, সুদ, ভাল্লা, আহুজা, দেউল, রন্ধাওয়া, গিল ইত্যাদি—জুড়িয়া দেয়।

গৃহস্বামিনী আমাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। বাঙালী হিন্দু-সমাজে গুরুজনের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিবার নিয়ম প্রচলিত। গুরুজন মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করেন। পাঞ্জাবী সমাজে গুরুজন স্নেহভাজন জনকে কাছে টানিয়া গণ্ড চুম্বন করেন। এই প্রথা নাকি সাধারণত পল্লীবাসীদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন কোন ক্ষেত্রে বয়োকনিষ্ঠ জনকে গুরুজনের উভয় জানু স্পর্শ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও দেখিয়াছি। প্রগতির কল্যাণে এই সমস্ত প্রাচীন প্রথা সর্বত্রই অতি-দ্রুত লোপ পাইয়া যাইতেছে।

গৃহস্বামীর সহিতও দেখা হইল। একটু রাশভারি লোক। পাঞ্জাবের আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ। অতিথির আদর-আপ্যায়নে পাঞ্জাবী গৃহস্থের আতিশয্য না থাকিলেও আন্তরিকতার অভাব নাই। এই নীতিই সর্বোত্তম মনে হয়। আদরের বাড়াবাড়িতে আদৃত জন বহুক্ষেত্রেই বিব্রত হইয়া পড়ে।

স্নানাহার শেষ করিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। খাওয়ার ব্যবস্থা খুব সাদা-সিধা। রন্ধন-নৈপুণ্য, খাদ্য-বৈচিত্র্য এবং ভোজন-পারিপাট্যে বাঙালীর তুলনা নাই। খাওয়া শেষ হইবার পূর্বেই জগজিৎ আসিয়া উপস্থিত। খুব জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় সে জলন্ধরে আমাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই।

বেলা প্রায় ৪টার সময় লুধিয়ানা মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর স্টেশনে—স্থানীয় ভাষায় আড্ডায় হাজির হইলাম। পাঞ্জাবের রাস্তাঘাট এবং যানবাহন ব্যবস্থা বেশ উন্নত। অনেক জায়গাতে সুদূর পল্লীতেও নিয়মিতভাবে বাস যাতায়াত করে। পাঞ্জাব সরকারের পরিবহন বিভাগের বাসও বহুস্থানে যাত্রীবহন কার্যে নিয়োজিত। লুধিয়ানা মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী একটি মাঝারি গোছের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহার মূলধন ৩০০,০০০৲। লুধিয়ানা হইতে ২৭ মাইল রায়কোট, রায়কোট হইতে ২৪ মাইল দুরুনা, লুধিয়ানা হইতে ১৮ মাইল পাখোয়াল এবং রায়কোট হইতে ১৯ মাইল জাগ্রাঁও পর্যন্ত নিয়মিত-ভাবে এই কোম্পানীর বাস যাতায়াত করে। কোম্পানীর প্রায় ২০।২৫খানা বাস আছে। কোম্পানীর অংশীদারগণের

প্রত্যূষের পল্লী (ডাংগো)

মধ্য হইতেই সাধারণত কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়।

আমাদের গন্তব্যস্থান রায়কোট। লুধিয়ানা হইতে রায়কোট আগাগোড়া পিচঢালা রাস্তা। সন্ধ্যায় রায়কোট পৌঁছিলাম। সরবজিতের মা রায়কোট থাকেন। তাহার বাবা নাই। তাহার খুল্লতাত ভাই গুরুচরণ (গুরুচরণ) সিং মোটর কোম্পানীর রায়কোট শাখার ম্যানেজার। ইনি এক সময় খেলাধুলায় বেশ নাম করিয়াছিলেন।

রায়কোট একটি ছোটখাট শহর। ইহার অধিবাসী সংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

ইহাদের মধ্যে অর্ধেক হিন্দু এবং অর্ধেক শিখ। কিছু কম-বেশী হইতে পারে। রায়কোটের বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে ন্যূনাধিক ৪,০০০ পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত শরণার্থী। দেশ বিভাগের পূর্বে রায়কোটে প্রায় ৪,০০০ মুসলমান বাস করিত। তাহাদের একজনও আজ আর নাই। কিছু মরিয়াছে। অন্যেরা পাকিস্থানে আশ্রয় লইয়াছে। শরণার্থিগণ তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর এবং জমি-জমা দখল করিয়া লইয়া নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছে। রায়কোটে ছেলেদের জন্য দুইটি এবং মেয়েদের জন্য দুইটি হাইস্কুল আছে। ইহা ব্যতীত থানা, ডাকঘর, মিউনিসিপ্যালিটি এবং একটি পশু-চিকিৎসালয়ও আছে। ছেলেদের একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় লুধিয়ানা জেলা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। বাঙলা দেশে জেলাবোর্ড পরিচালিত হাইস্কুলের কথা শুনি নাই। পাঞ্জাবের জেলা-বোর্ডগুলি কিন্তু বহু হাইস্কুল স্থাপন করিয়া শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে লুধিয়ানা জেলা পাঞ্জাবের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল অঞ্চল। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুযায়ী লুধিয়ানার শিক্ষিতের হার প্রতিশতে ৪০ জন।

শিখগুরু গোবিন্দসিংহের স্মৃতি-জড়িত গুরুদ্বারা টাহলিসাহেব রায়কোটের প্রধান দর্শনীয় স্থান। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে গুরু-গোবিন্দ এখানে আসিয়া প্রায় দুই মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। রায়-কোটে পৌঁছিয়া পথশ্রান্ত গুরু বিশ্রামের জন্য শহরের বাহিরে একটি শিরীষ গাছের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। শিরীষ গাছকে পাঞ্জাবীতে শিশম এবং টাহলি বলা হয়।

রায়কোটের মুসলমান শাসনকর্তা রায়কালা গুরুগোবিন্দকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। গুরুর আগমন সংবাদ পাইয়া রায়কালা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে গুরু তাঁহার নিকট দুগ্ধ পান করিতে চাহিলেন। কাছেই একটি মহিষী চরিতেছিল। সে তখন দুধ দিত না। কিন্তু গুরুর ইচ্ছায় সে দুগ্ধবতী হইল। দুধের ত ব্যবস্থা হইল। কিন্তু পাত্র কোথায়? দুধ রাখা হইবে কিসে?

রথ

গুরু রায়কালাকে একটি সছিদ্র গাড়ু দিয়া তাহাতে করিয়াই দুধ আনিতে বলিলেন। সছিদ্র পাত্রে দুগ্ধবতীর মহিষীর দুগ্ধ দোহন করিয়া আনা হইল। সেই দুগ্ধ পান করিয়া গুরু তৃপ্ত হইলেন। গুরুপ্রদত্ত এই পাত্র 'গঙ্গা-সাগর' নামে পরিচিত। তিনি এই পাত্র এবং খাণ্ডাসাহেব নামে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা রায়কালাকে প্রদান করেন।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রায়কালার বংশধরগণ রায়কোটেই বসবাস করিতে-ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তাঁহারা পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বোধ হয় এখন মণ্টগোমারি জেলায় আছেন। গঙ্গাসাগর গাড়ু তাঁহারা লইয়া গিয়াছেন। খাণ্ডাসাহেব তাহার পূর্বেই বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে অপসারিত হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ জীবনে বহু শোক পাইয়াছেন। তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে দুইজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। অপর দুই পুত্র জোরোয়ার সিং ফতে সিং ধর্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত না হওয়ায় সিরহিন্দের শাসনকর্তা বাজিদ খানের আদেশে তাঁহাদিগকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয় (ডিসেম্বর, ১৭০৪)। রায়কোটে আসিবার পর এই দুঃসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয়। নূরা নামে রায়কালার একজন বিশ্বাসী ভৃত্য সিরহিন্দ হইতে এই সংবাদ লইয়া আসে। এই মর্মঘাতী সংবাদ শ্রবণে গুরু কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কোন কথা না বলিয়া তিনি একটি ঘাস টানিয়া তুলিলেন। রায়কালা ইহার তাৎপর্য জানিতে চাহিলে গুরু বলিলেন যে, এই ঘাসের ন্যায় মোগল-সাম্রাজ্যও শিথিলমূল হইয়া পড়িয়াছে এবং অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

দুই মাস পর গুরু রায়কোট ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। তাঁহার রায়কোটে আগমন এবং অবস্থান স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য ১৯২২ সালে গুরুদ্বারা টাহলিসাহেব নির্মিত হয়।

প্রাতরাশের পর গুরুদ্বারা টাহলি সাহেবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। গুরু-দ্বারার প্রবেশপথে জনৈক দৈর্ঘ্য শ্বেতশ্মশ্রু শিখের সঙ্গে দেখা। সর্দার দেবা (দেব) সিং তাঁহার নাম। সর্দার দেবা সিং গুরুদ্বারার অবৈতনিক গ্রন্থি খালসা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়টি এই বৎসরই স্থাপিত হইয়াছে। গুরুদ্বারা কমিটিই ইহার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্মস্থানগুলি যদি শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে ব্রতী হয়, তাহা হইলে তাহাদের জনপ্রিয়তা রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে পারে।

সর্দার দেবা সিং একটু খোঁড়াইয়া চলেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসর খালসা কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি জালিয়ান-ওয়ালাবাগে গুলিতে আহত হইয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে বার্ধক্যে সায়াটিকায় ভুগিতেছেন। পিঠের ডানদিকে আজও গুলীর চিহ্ন আছে। সর্দার দেবা সিং বলিলেন যে, গোবিন্দ সিং প্রদত্ত গঙ্গা-সাগর গাড়ু তিনি দেখিয়াছেন। সছিদ্র গাড়ুতে বালি রাখিলে পড়িয়া যায়; কিন্তু দুধ বা জল রাখিলে পড়ে না।

জুতা খুলিয়া এবং মাথা ঢাকিয়া গুরুদ্বারায় প্রবেশ করিলাম। ইহাই নিয়ম। শিখগণ প্রতিমা-পূজা করে না। প্রত্যেক গুরুদ্বারায় আদিগ্রন্থ বা

সাহেব রক্ষিত এবং নিয়মিতভাবে পঠিত হইয়া থাকে। আদি গ্রন্থের সম্মুখে ভোগও দেওয়া হয়। যদি ইহাকে পূজা বলা যায়, তবে শিখগণকে আদি গ্রন্থের উপাসক বলা যাইতে পারে; কিন্তু এই পূজার কোন মন্ত্র নাই। ফুল, চন্দন, ধূপ, দীপ প্রভৃতিরও প্রয়োজন হয় না। অনেক গৃহস্থবাড়িতেও গ্রন্থসাহেব পূজিত হইয়া থাকে। হিন্দু বাড়ির ঠাকুরঘরের ন্যায় স্বতন্ত্র একটি ঘরে বেদীর উপর গ্রন্থসাহেব রক্ষিত হয়। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে বেতনভুক্ 'গ্রন্থী' অর্থাৎ পুরোহিত দৈনিক আসিয়া গ্রন্থসাহেব পাঠ করিয়া যান।

গুরুদ্বোরার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মেঝে ফরাসে পা মুড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। বেদীর উপর গ্রন্থসাহেব। বেদীর নীচে একটি থালায় কিছু পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা আসিয়াছেন, সকলেই প্রথমে গ্রন্থসাহেবের সম্মুখে প্রণাম করিয়াছেন। প্রায় সকলেই নিজের [illegible] থালায় কিছু প্রণামীও দিয়াছেন। সকলেই যে দিয়াছেন, এমন নহে। কোন বাধ্যবাধকতা নাই। তরুণ 'গ্রন্থী' সুরে [illegible] গ্রন্থসাহেব পাঠ করিতেছিলেন। [illegible] এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তবে [illegible] মধুর এবং পরিচিত [illegible] [illegible] ভক্ত নরনারী নিবিষ্ট [illegible] শ্রবণ করিতেছিলেন।

[illegible] মাস গণনা, পূর্ণিমা এবং [illegible] শিখদিগের নিকট বিশেষ [illegible] গুরুদ্বোরাগুলিতেও এই কয়দিন [illegible] জনসমাগম হইয়া থাকে। আজ [illegible] মাসের সংক্রান্তি হইলেও [illegible] মাস গণনা অনুযায়ী কার্তিক [illegible] প্রথম দিন। সেইজন্যই আজ [illegible] সমাগম অন্যান্য দিনের তুলনায় [illegible] বেশী।

কিছুক্ষণ পর 'গ্রন্থী' পঞ্চম গুরু [illegible] রচিত 'বারমাহা' অর্থাৎ বারমাসী [illegible] আরম্ভ করিলেন চৈত্র মাসে প্রভুর [illegible] করিলে অপার আনন্দলাভ করিবে। [illegible] ঈশ্বরকে যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনই সার্থক। ঈশ্বর [illegible] স্থলে, আকাশে, পাতালে, অরণ্যে বিরাজমান...... পরম পিতার সঙ্গচ্যুত [illegible] বৈশাখ মাসে কেমন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবে? ধন, জন, সমস্তই নশ্বর। একমাত্র ঈশ্বরই শাশ্বত, সনাতন...... জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভুর সহিত মিলিত হও। ঈশ্বরের নামরূপ অমূল্য সম্পদ কেহই হরণ করিতে পারে না......

শ্রীরাধা এবং বেহুলার বারমাসীতে প্রোষিতভর্তৃকা নারীর সতীর বিরহ বেদনার মত গুরু অর্জুনের বারমাসীতে ভক্তহৃদয়ের আকুতি সার্থক বাণীরূপে লাভ করিয়াছে।(১)

পাঠের পর প্রসাদ বিতরণ। প্রসাদ

সপরিবারে সর্দার গুরুচরণ সিং (রায়কোট)

গ্রহণের পর হাত-মুখ ধুইবার রীতি নাই। মাথায় বা কাপড়ে হাত মুছিয়া ফেলিতে হয়। সর্দার [illegible] আমাদিগকে চারিদিক ঘুরাইয়া দেখাইলেন। প্রত্যেক গুরুদ্বোরায় একটি করিয়া অন্নসত্র [illegible] থাকে। ইহাকে লঙ্গর বলে। আমাদিগকে লঙ্গরে কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল। আমরা অসম্মতি জানাইলাম।

বেলা [illegible] রায়কোট ত্যাগ করিলাম [illegible] দশ মাইল দূরে হালোয়ারা আসিয়া সেখান হইতে সাইকেলে [illegible] উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পল্লী ও প্রান্তরের বুক চিরিয়া উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে দিগন্তপ্রসারী মাঠ, মধ্যে মধ্যে দু-একখানা গ্রাম। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কখনও কখনও পথচারী এবং সাইকেল ও উষ্ট্রারোহী পথিকের সহিত দেখা হইতেছে। এক সাইকেলে এক সঙ্গে একাধিকজনের আরোহণ বোধ হয় আইনত নিষিদ্ধ। পাঞ্জাবে কিন্তু পাঁচজন পর্যন্ত এক সাইকেলে যাইতে দেখিয়াছি। কথাটা বিশ্বাস করিবার মত না হইলেও নির্ভেজাল সত্য।

রাখাল গরু-মহিষের দল লইয়া ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে। পাঞ্জাবের মানুষের মত গৃহপালিত পশুগুলিও সুস্থ এবং সবলকায়। ধুলায় ঝড় তুলিয়া প্রায় দিগম্বর শিশু এবং বালকের দল খেলা করিতেছে। এক জায়গায় রাস্তার দুই ধারে বহুদূর পর্যন্ত ঘন-বিন্যস্ত [illegible] বৃক্ষশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। বাতাসে মৃদু [illegible]। আমার বাল্য ও কৈশোর [illegible] পল্লীঅঞ্চলে কাটিয়াছে। মাঠের মধ্য দিয়া উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তা এবং [illegible] হারানো দিনের কথা মনে করাইয়া দিল। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। চাষীরা এখনও মাঠে কাজ করিতেছে। পাঞ্জাবী কৃষক অসুরের মত খাটিতে পারে। আরও [illegible] মত।

সন্ধ্যায় [illegible] পৌঁছিয়া সর্দার [illegible] সিং [illegible] অতিথি হইলাম। ইনি গুরুচরণের পিতা এবং সরবজিতের [illegible] সিং বেশ সম্পন্ন চাষী। প্রায় [illegible] বিঘা জমির মালিক। পাঞ্জাবে [illegible] পঞ্চায়েৎ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসী কর্তৃক নির্বাচিত পঞ্চায়েৎ আছে। এই পঞ্চায়েতের সভাপতিকে 'সরপঞ্চ' বলা হয়। [illegible] সিং [illegible] 'সরপঞ্চ'।

[illegible] ইহার সরকারী রাজস্ব [illegible] ৩,২০০। পাঞ্জাবে জমিদারী প্রথা নাই। কৃষকগণ সরাসরি সরকারকে রাজস্ব প্রদান করে। প্রত্যেক গ্রামে একজন 'লম্বরদার' অর্থাৎ রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী আছেন। ইনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার উপর একটা কমিশন পাইয়া থাকেন। [illegible] ১২০০ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় [illegible] জন [illegible] শিখ অর্থাৎ [illegible]। শিখ ধর্ম উদার, সার্বজনিক আদর্শের উপর

(১) The Sikh Religion by Max Arthur Macauliffe, Vol. III. Pp. 124-30.

প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিখ সমাজে আজও অস্পৃশ্যতা বর্তমান। রামদাসিয়াগণ ধর্মে শিখ হইলেও অন্যান্য শিখগণ ইহাদের সহিত পানাহার করে না। বৈবাহিক আদান-প্রদানের কথা ত উঠিতেই পারে না। ডাঙ্গোর রামদাসিয়াগণ অতিশয় দরিদ্র। ইহাদের কাহারও জমি-জমা নাই। জাতীয় ব্যবসায় অথবা দিনমজুরী করিয়া ইহারা কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামে কোন গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হইলে রামদাসিয়াগণকে সেই পশুর শব সরাইয়া ফেলিতে হয়। পারিশ্রমিকস্বরূপ চামড়াটি তাহারা নেয়। ডাঙ্গোতে ৫।৬ ঘর হিন্দুও বাস করে। বাদবাকী শিখ। দেশ বিভাগের পূর্বে ডাঙ্গোতে প্রায় ৪০০ মুসলমানও বাস করিত। ১৯৪৭ সালের তাণ্ডবে ইহাদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন নিহত হইয়াছে। কিছু প্রতিবেশিগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। অন্যেরা পাকিস্থানে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে।

পরদিন সকালবেলা গ্রাম দেখিতে বাহির হইলাম। পাঞ্জাবের গ্রামগুলি পরস্পর সংলগ্ন নহে। দুইটি গ্রামের মধ্যে সাধারণত ২।২॥ মাইলের ব্যবধান। গ্রামের বাড়িগুলি একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো। দুই দিকে বাড়ি। মাঝখানে কাঁচা রাস্তা। সমস্ত বাড়ির ময়লা জল আসিয়া এই রাস্তায় পড়ে। ফলে রাস্তাটি নরককুণ্ডে পরিণত হয়। দুইটি বাড়ির মধ্যে ফাঁকা জায়গা রাখা হয় না। ইহাতে একদিকে যেমন ব্যয়-সংক্ষেপ হয়, অপরদিকে তেমনই আবার জমিও বেশ খানিকটা বাঁচিয়া যায়। পাঞ্জাবের কোন গ্রামেই খড়, কাঠ বা টিনের ঘর দেখি নাই। হয় মাটির কোঠা, না হয় পাকা ইমারত। পাড়াগাঁয়ে কোন বাড়িতেই পায়খানার বালাই নাই। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এই অবশ্য-প্রয়োজনীয় দৈব কার্যটি মাঠে সমাধা করে। মেয়েরা খুব ভোরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে অথবা সন্ধ্যার পর এই কাজটি সারে। পুরুষেরা অন্য সময়ে। কাছে জল না থাকিলে মাটি, পাথর, ঘাস ইত্যাদি যাহা হাতের কাছে পায়, তাহা দ্বারাই শৌচ করে। শহরেও অনেককে বাড়িতে পায়খানা থাকা সত্ত্বেও মাঠে যাইতে দেখিয়াছি। খাওয়ার পরও ইহারা হাত-মুখ বড় একটা ধোয় না।

কৃষক পরিবারের পুরুষগণ চাষের মরসুমে খুব ভোরে কিছু খাইয়া কাজে বাহির হইয়া যায়। সারাদিন আর ঘরে ফিরে না। দুপুরে বাড়ি হইতে খাবার যায়। সাধারণত মেয়েরাই খাবার পৌঁছাইয়া দেয়। মেয়েরা ঘরের কাজ করে এবং অবসর সময়ে চরখায় সূতা কাটে। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই চরখা আছে। দুঃস্থা নারীদিগের মধ্যে অনেকে ক্ষেত-মজুরের কাজও করে। সম্পন্ন চাষী পরিবারের মেয়েরা অনেকক্ষেত্রে মাঠের কাজের তদারক করে। খুব অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারেও রান্নাবান্না, ধোয়ামোছার কাজ মেয়েরাই করে। চাকর বা রাঁধুনী কোথাও দেখি নাই।

পাঞ্জাবের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা সাদাসিধা। পূর্বেই একথা বলিয়াছি। তবে খাঁটি দুধ, ঘি, মাখন ইহারা অনেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাইয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের তুলনায় পাঞ্জাবী কৃষকের অবস্থা ভাল। জীবনযাত্রার মানও অপেক্ষাকৃত উন্নত। দেশ বিভাগের বিপর্যয়ের ঘা পাঞ্জাব প্রায় সম্পূর্ণভাবেই সামলাইয়া লইয়াছে। মনে পড়ে নিজের দেশের কথা। সরকারী অযোগ্যতা এবং ঔদাসীন্য অনস্বীকার্য। কিন্তু একমাত্র সরকারই কি দায়ী?

পাঞ্জাবীর পান-ভোজনের বহরও তাহার শক্তি-সামর্থ্য এবং দৈহিক আয়তনের অনুরূপ। জনৈক শিখ-নেতার একটি সম্প্রতিক ভাষণে প্রকাশ যে, ১৯৫২-৫৩ সালে পাঞ্জাবের শিখপ্রধান অঞ্চলগুলিতে প্রায় চার কোটি টাকার মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে।

গ্রামে এবং শহরে হিন্দু ও শিখ পাশাপাশি বাস করিলেও ইহাদের সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক খুব প্রীতি-মধুর বলিয়া মনে হয় না। সম্পর্ক ক্রমশই তিক্ততর হইতেছে। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!

ডাঙ্গোতে দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাড়িতে একটি বিশেষ ধরণের গরুর গাড়ি দেখিলাম। গোযানের এই রাজ-সংস্করণকে পাঞ্জাবীরা রথ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। বরোদার যাদুঘরে এই প্রকার একটি রথ দেখিয়াছি তাহা অবশ্য আরও বড় এবং জমকালো। ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবে 'রথে' বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু প্রগতি এব মোটরের কল্যাণে রথ আজ মর্যাদাভ্রষ্ট তবে পল্লীঅঞ্চলে কালে-ভদ্রে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে আজও রথ ব্যবহৃ হয়।

বেলা ১॥টায় বাসে লুধিয়ানা ফিরিয় চলিলাম। জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা রাস্তার দুই পাশে মাঠ। রৌদ্রে চারিদি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সকালে এবং সন্ধ্যা ঠাণ্ডা পড়িতে আরম্ভ করিলেও দুপুরে এখনও প্রচণ্ড গরম। ইহারই মধ্যে চাষ মাঠে কাজ করিতেছে। এক জায়গা দেখিলাম যে, উট লাঙল টানিতেছে। কোথাও এক তিল জমি অনাবাদী পড়ি নাই। এদিকে ধুলা, গরম এবং ঝাঁকুনিতে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

এক জায়গায় রাস্তায় বেশ ভিড় হিন্দু এবং শিখ উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে। আজ বিজয়া দশমী। দশহর উৎসব উপলক্ষে মেলা বসিয়াছে। রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং মেঘনাদের মূর্তি পোড়াই খুব সমারোহের সহিত এই উৎস প্রতিপালিত হয়। বাজিও পোড়ে অনেক

ডাঙ্গো হইতে লুধিয়ানা ১৭ মাইল পৌঁছিতে পৌঁছিতে বেলা ৩টা বাজিয়া গেল। সর্দার সন্তোষ সিং-এর গৃহে চা পানান্তে শহর দেখিতে বাহির হইলাম। রাস্তায় বেশ ভিড়। দশহরা উৎসব দেখিবার জন্য আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোক শহরে আসিয়াছে এই ভিড়ের মধ্যে নিজেকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হইল। জনারণ্যের মধ্যে থাকিয়াও এই একাকিত্ববোধ প্রবাস জীবনের মস্ত একটি দুঃখ। বাঙলার বাহিরে অনেক শহরেই একটি সিভিল লাইন (civil line) আছে। শহরের এই অঞ্চল সর্বত্রই বেশ পরিষ্কার এবং ফিটফাট। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও বেশ ভাল। সরকারী আফিস, আদালত প্রভৃতি এই অঞ্চলে অবস্থিত। শহরের অপর অংশ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

সন্ধ্যার গাড়িতে ঘরে ফিরিয়া চলিলাম। বাড়ি পৌঁছিতে পৌঁছিতে রাত্রি ১০টা হইল।

গানের আসর

শাঙর্গদেব

জলসা না কনফারেন্স—এ নিয়ে এবারে শ্রোতৃমহলে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। দেখা গেল অনেকেই কনফারেন্সের নামে জলসা হোক এটা চান না আবার দেখা গেল একটি সম্মিলনীতে আলোচনার উদ্যোগ হতেই শ্রোতাদের অনিচ্ছা এবং বিরুদ্ধতায় তাকে বন্ধ করতে হল। এ আলোচনাকে অবশ্য ঠিক আলোচনা বলে না কেন না অমুক ওস্তাদ বল্লেন, আমার গুরু ঠিক যথাযথ ধ্রুপদ জানতেন তার রূপটা এই রকম আর বাকি যারা ধ্রুপদ জানেন সব ভুল শিখেছেন—এই বলে তাদের উদ্দেশ্য একটা যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে মনে করলেন খুব বাহাদুরি দেখিয়েছেন—এই রকম টাইপের আলোচনা যত কম হয় ততই ভাল। আলোচনার রূপটা একটা ধারাবাহিক ক্রম অনুযায়ী হওয়া উচিত আর যারা আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যেও সহিষ্ণুতা এবং শিক্ষার্থী মনোভাব থাকা দরকার। আমার জিনিসটা ঠিক কিন্তু কেন ঠিক সেটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার, আর অপরের জিনিসটা ভুল কিন্তু কেন ভুল সেটাও প্রমাণ করে দেখিয়ে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে ভাল হয় যদি দুটো বা বিভিন্ন মত মিলিয়ে একটা পদ্ধতি গঠন করা যায়। আলোচনাটা গালাগালি বা বিরুদ্ধতায় পরিণত না করে সংগঠনমূলক করাই উচিত যতটা পারা যায় এবং পরে এই সব আলোচনা সম্বলিত পুস্তিকার বহুল প্রচার হওয়া উচিত যাতে সেটা সকলের উপকারে আসতে পারে।

আলোচনার একটা পন্থা আছে। সব ক্ষেত্রে সব রকম আলোচনা প্রযোজ্য নয়। শুষ্ক নীরস এবং পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা যে পরিবেশে চলে আমাদের সম্মিলনীগুলি সে ধরণের সমাবেশ নয়। এখানে খুব উঁচুদরের বিষয় নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা না করে যে কোন রাগ গাইবার বা বাজাবার সময় তার রূপটি দেখিয়ে দেওয়া তার বিশেষত্ব বর্ণনা করা বা গায়ক বা বাদক তাকে কি বৈশিষ্ট্য দিচ্ছেন সেটি বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। এগুলিতে শ্রোতাদের আপত্তি হবে কেন? বরঞ্চ এটা তাঁদের হৃদয়গ্রাহী হবে। সম্মিলনীগুলিতে ঘোষণার জন্য কালবোর্ড ব্যবহার করা হয় তাতে এই সব বিশেষত্বগুলি লিখে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

সম্মিলনীতে রাগের রূপ না দেখিয়ে চেপে বাজানো বা যে কোন সাধারণ রাগকে কূট রাগে পরিণত করবার চেষ্টা প্রশংসনীয় নয় তো বটেই বরঞ্চ নিন্দনীয়। রাগটি স্পষ্টভাবে জানা থাকলে উপভোগ করতে সুবিধা হয়—কোথায় শিল্পী বিশেষত্ব আনছেন, সমধর্মী রাগ থেকে তাকে কিভাবে আলাদা করে দেখাচ্ছেন সব কায়দা কানুনগুলি এতে করে বেশ ভাল-ভাবে বুঝে সমগ্র শিল্পটির আস্বাদ গ্রহণ করা যায়।

যিনি যত বড় শিল্পী তিনি তত উদার হবেন এটাই তো আমরা আশা করি। মোটেই ভাল লাগল না যখন হাফিজ আলীর মত প্রবীণ ওস্তাদ জানালেন তিনি কি রাগ বাজাবেন তা সমঝদাররা নিজেরাই ঠিকমত বুঝে নিন। কথাটা তিনি রহস্যাচ্ছলে বলে থাকতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ওস্তাদের মনোভাব এই রকমই। অপরকে সহজে তাঁরা কি গাইছেন বা বাজাচ্ছেন এটা বুঝতে দিতে চান না। এইভাবে বিচার করলে সমঝদারকে অত্যন্ত ছোট করে দেখা হয়। পরীক্ষাটা কি কেবল রাগ নির্ণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তা নয়। যাঁরা সমঝদার সমস্ত বিষয়টা তাঁদের কাছে পরিষ্কার করে মেলে ধরলে শিল্পীর উদারতাই প্রকাশ পায় কেননা যাঁদের কাছে শিল্পের প্রকাশ হচ্ছে তাঁরা যে শিল্পীর মতই তার মর্ম জানেন। শিল্পী এবং শ্রোতা এইভাবে যদি একে অপরকে বুঝতে পারেন তবেই তো হবে সম্মিলনীর সার্থকতা।

সম্প্রতি কাগজে একটি চিঠি পড়লুম এই বিষয়ে। একজন রসজ্ঞ শ্রোতা রাগ-মিশ্রণ সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর আলোচনা তুলেছেন। বাস্তবিক এই ধরণের আলোচনা সম্মিলনীতে হলে কত ভাল হত। কতকগুলি রাগ আছে

যেগুলি অপর রাগের সঙ্গে মিশ্রিত হলে একটু আশ্চর্য ঠেকে আবার পরস্পর বিরোধী কয়েকটি রাগ আছে যার মিশ্রণ সম্ভব নয় এবং সম্ভব করলে শ্রুতিকটু হবার সম্ভাবনা। এই কারণে রাগ মিশ্রণে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন এবং এটাও বিচার করা উচিত যে দুটি রাগের মিশ্রণে যে সুরটি উৎপন্ন হল সেটিকে মিশ্র রাগ আখ্যা দেওয়া যায় না সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি রাগ হয়ে দাঁড়াল এবং এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই মিশ্র রাগে এমন একটি স্বাতন্ত্র্য থাকবে যাতে করে এটি কোন প্রচলিত রাগের দ্বৈতরূপ হয়ে না দাঁড়ায়।

অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে শ্রীরবিশংকর সেতারে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে একটি রাগ বাজিয়েছেন সেটি হ'ল রাগ-হিন্দোল-কেদার। এখন কথা হ'ল এই দুই রাগের মিশ্রণ কতখানি সম্ভব এবং সম্ভব হলেও এটিকে "ইমন কল্যাণ", "সিন্ধু খাম্বাজ", "কাফিসিন্ধু" প্রভৃতি মিশ্ররূপের মত আলাদা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে কি না। পত্রলেখকের মতে হিন্দোল এবং কেদারা এই দুটি রাগের মূলেই বৈষম্য। হিন্দোল রাগে মা (শুদ্ধ)রে এবং পা তিনটি স্বর বর্জিত আর কেদারায় শুদ্ধ মধ্যমই প্রধান স্বর এছাড়া রে এবং পা ও আসছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে এ রকম দুই রাগের মিল সম্ভব কি না। এ সম্বন্ধে যদি কনফারেন্সে আলোচনা হত তাহলে বিষয়টি বিশদভাবে বোঝা যেত এবং শুধু তাই নয় রাগমিশ্রণের একটি পদ্ধতিও নির্ণীত হতে পারত। এই সব সমস্যা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে প্রকাশ্যে আলোচনা হয়ে একটি নির্দিষ্ট পন্থা স্থির হলে সত্যিই অনেক সন্দেহের নিরসন ঘটে।

এখন কথা হচ্ছে দুটি রাগের মিশ্ররূপ অবলম্বন করে একটি রাগের আখ্যা যখন দেওয়া হয় তখন বস্তুতই কি সেটা দুটি রাগের আধাআধি অস্তিত্ব অবলম্বন করে করা হয়? এ না হয়ে এমনও তো হতে পারে যেখানে একটি রাগেরই মূলত প্রাধান্য আছে এবং আর একটি রাগের ছায়াপাত ঘটায় তার উল্লেখে এই যৌথ নামের উৎপত্তি হয়েছে। শেষোক্ত মতটিই অধিকতর সম্ভব। "হিন্দোল-কেদার" একটি রাগের নাম হলে আমরা কিভাবে তার বিচার করব। সেকি অর্ধেক হিন্দোল আর অর্ধেক কেদারা (বা তার উল্টো) অথবা মূল রাগটি কেদারা কিম্বা হিন্দোলের একটি এবং আর একটি রাগের প্রভাব এসে পড়ায় তার এই রকম নামকরণ হয়েছে। এক্ষেত্রে হিন্দোল এবং কেদারার রূপে সমান সমান আছে এমন অনুমান করা সঙ্গত নয় কেননা সেটা হয় না। হতে পারে এই রকম যে কেদারার রূপটি সমধিক বর্তমান এবং তাতে হিন্দোলের ছায়াপাত হয়েছে অথবা রূপটি মূলত হিন্দোল কিন্তু তাতে কেদারার একটা বৈশিষ্ট্যও আনা হয়েছে। অনেকের মতে এই রকম দুই রাগের মিশ্রণে একটি রাগ-রূপ দাঁড় করালে শেষোক্ত রাগটিই হবে মুখ্য। ভালভাবে বিচার করে দেখলে এই মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় অনেক বড় বড় রাগ বাহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই রকম মিশ্র রাগের সৃষ্টি হয়েছে এবং মূলত বাহারকে অবলম্বন করেই উক্ত রাগগুলির কোন কোন অংশ প্রকটিত হয়ে থাকে। আবার এর বিপরীত মতও অনেকে পোষণ করে থাকেন। বাংলা গানে এমন অনেক বেহাগ-খাম্বাজ আমি শুনেছি যাতে বেহাগের প্রাধান্যই বেশি, তাকে ঠিক খাম্বাজাশ্রিত বেহাগ বলা যায় না সেটা বেহাগাশ্রিত খাম্বাজই হওয়া উচিত। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতবিরোধ থাকলেও এটা নিশ্চিতই সত্য যে দুটি রাগের একটিকে মূল বলে ধরতেই হবে। হিন্দোল কেদারার মধ্যে মূল একটিই হবে—হয় কেদারা নয় হিন্দোল। সুতরাং এইভাবে বিচার করেই এই মিশ্র রাগকে উপভোগ করতে হবে। এর এদিক ওদিক যে করা যায় না তা নয় তবে সেটা নির্ভর করে শিল্পীর মুন্সীয়ানার ওপর।

আবার এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেখানে একই মেলের দুটি রাগ মিশে একটি ভিন্ন রাগরূপে পরিচিত হয়েছে, যেমন চুনে হলুদে মিশে একটা অন্য রঙে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে এমন মিশ্র রাগ আছে যার কোন রাগটাকেই আলাদা করে গেয়ে দেখান যায় না; কেননা সেগুলির আকৃতি কি ছিল, অনেকেই সেটা জানেন না।

এবারকার আসরগুলিতে এমন কয়েকটি রাগ শুনেছি যেগুলি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য দু' একটিকে ঠিক রাগ বলে স্বীকার করতে আমি রাজি নই এদের ধুন বলাই সঙ্গত কেননা [illegible] রাগের প্রকৃতি বা আকৃতি এগুলিতে [illegible] সুর হিসেবে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে [illegible] এরকম একটি বিশেষত্ব সম্পন্ন রাগ [illegible] গেল যার নাম শ্যামকল্যাণ। এই [illegible] রাগটি বর্তমানে যেভাবে প্রচলিত, [illegible] কামোদের অস্তিত্বই বিশেষভাবে [illegible] কিন্তু এর মধ্যে অপরাপর কয়েকটি রাগের ছায়াপাত হয়েছে। এর আরোহী অবরোহী রূপটি এইরকম— ন্‌া সা রা মা রা হ্মা পা না র্সা। র্সা না ধা পা হ্মা পা গা মা [illegible] ন্‌া সা॥ এই রূপটি থেকে বোঝা যায় এটিতে কিভাবে মিশ্রণ আনা হয়েছে। কামোদকে প্রধান রেখে অন্য রাগের [illegible] করে একে একটা মিশ্র রাগের আখ্যা দেওয়া হয় নি, কিন্তু বোধ হয় দেওয়া [illegible] পারত এবং তারপরেই কোন শিল্পী একটি নতুন নাম দিয়ে বাহাদুরি নেবার [illegible] করতেন। বাংলা দেশে একরকম [illegible] প্রচলিত ছিল, সেটা হাম্বীর এবং কেদারার মিশ্রণ। এর গঠনবৈশিষ্ট্য অন্য রকম। এর রূপটি মূলত কেদারা, কিন্তু "পা ধা [illegible] গা মা ধা" এই অঙ্গটি এসে কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করছে। এইটিকেও কোন গুণী শিল্পী যদি হাম্বীর কেদারা নাম দিয়ে রাগ রচনা করেন তাহলেও কিছু বলবার নেই।

অপর একটি রাগ শোনা গেল, সেটির নামের সঙ্গে পরিচয় আছে, কিন্তু রূপটির সঙ্গে অনেকে পরিচিত নন। রাগটির নাম—ছায়া। এই রাগের যে পরিচয়টি আমার জানা আছে, সেটি হলো এইরকম: —সা ধ্‌া প্‌া প্‌া সা রা গা ন্‌া রা সা, ন্‌া সা রা গা মা পা, রা গা মা গা রা গা রা সা, পা র্সা না র্রা র্সা, ধা না ধা [illegible] র্সা ধা পা, পা গা মা রা গা মা পা গা মা রা সা॥ আসরে বাজনার যে সুর শুনেছি সে উল্লিখিত সুরের অনুরূপ বলেই মনে হল।

অনেকে কিন্তু ছায়া রাগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে ছায়ানট বা ছায়াতে বিশেষ তফাৎ নেই এবং এটি প্রাচীন নট রাগের একটি প্রকারভেদ মাত্র। নটের সাধারণ অঙ্গ "গা পা, মা রা" এই অঙ্গটিতে। প্রাচীনকালে নট একটি প্রসিদ্ধ পরিবার ছিল এবং এর বহু প্রকারভেদ

[২৭]

একটা মশা বহুক্ষণ ধরে অতসীকে বিরক্ত করছে। তাড়িয়ে দিলেও উড়ে উড়ে আসে, কখনও কপালে, কখনও গ্রীবামূলে, কখনও কানের ভাঁজে বসে গুন গুন গান গায়। হাতটা মাঝে মাঝে তোলে অতসী, বিরক্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করে, মশাটা তবু ধরা দেয় না, পালায়, দেয়ালে মুহূর্তেক বসে, ফের ফিরে আসে। কয়েক মিনিটেই অতসী অস্থির হয়ে উঠল।

হয়ত শুধু মশাটাই নয়। কতটুকু বা প্রাণী, ওর হুলে কী-ই-বা বিষ। অতসীকে অস্থির করেছে ভাবনা, ঠিক যেন মশাটারই মত, উড়িয়ে দিলেও ফিরে আসে, বারকয়েক গুন গুন করে, তার পরেই সুযোগ বুঝে দংশন করে ঠিক মর্মমূলে। কী বিষ, কী জ্বালা। মশাটা অতসীকে বসতে দিল না সুস্থির হয়ে, ভাবনাটা টিঁকতে দিল না ঘরে।

পথে বেরিয়ে এল অতসী, গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় পড়ল। এখন সবে সাড়ে দশটা, অফিসমুখী জোয়ার শেষ হয়নি। তোড়ের পর তোড় আসছে —ট্রাম-বাস, গাড়ি-ঘোড়া, আর পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার মত অগুণতি লোক। সামনের মোড়ে একটা চ্যাপটা পিপের উপরে ঘর্মাক্ত পুলিশ কলের পুতুলের মত হাত তোলে, নামায়, অনর্গল স্রোত মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়, ফের চলতে শুরু করে। কোথা থেকে ভলান্টিয়ার-বোঝাই গোটা তিনেক লরী ছুটে এল, পাঁচ-বাঁধান ফাঁপা পথ থরথর কেঁপে উঠল, প্রবল উল্লাসে জয়ধ্বনি দিলে ছেলেরা। আদিত্য মজুমদারের দল নয়, এরা এই ওয়ার্ডের প্রার্থী যতীশ বিশ্বাসের সমর্থক। অতসীর মনে পড়ল, ঠিক পাঁচ দিন পরেই ইলেকশন। ঠিক তখনই বিপরীত দিক থেকে এল আর দুখানা ট্রাক, তেমনি লোক-বোঝাই, আগেকার লরীর লোকেদের লক্ষ্য করে কী-একটা কুৎসিত টিটকিরি দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে জবাব গেল, বিকটতর হুঙ্কার ছাড়লে ওদিককার লোক। দাঁড়িয়ে-পড়া বাসের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বললেন, এবার টিল পড়বে, পটকা ফাটবে। ভালয় ভালয় অফিসে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। পিপে থেকে নেমে এল পুলিশ, পাগড়িটা নড়ে গেছে, সামলাবার সময় নেই, হাত নেড়ে নেড়ে কী হুকুম দিলে লরীগুলোকে, চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেছে। অতসী বিব্রত, ভাবলে ফের গলিতে গিয়ে ঢোকে, কিন্তু গেল না, দাঁড়িয়ে রইল, সম্মোহিত অথচ অস্বস্তিগ্রস্ত।

ঘটনা বেশিদূর গড়াল না। আরও খানিকটা গালিগালাজ ঢালাঢালি হল দু তরফ থেকেই, কিন্তু বোমা ফাটল না, টিল পড়ল না, খানিকটা ক্লীব আস্ফালন আর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গির পর ক্লান্ত লোকগুলো নিজেরাই ক্ষান্তি দিল ট্রাক চলল, পুলিশ উঠল গিয়ে পিপেয়।

কপালের ঘাম মুছে অতসী চলতে শুরু করল। ভীড়ে পথ চলার সুবিধে এই নিজেকে বিশেষ কিছু করতে হয় না পা দুটোও যন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় হয়ে পড়ে, দু-চারজন বড়জোর ঘেঁষাঘেঁষি করতে চাইবে, কিন্তু জনহীন পথে একা চলার চেয়ে সেটা ঢের নিরাপদ।

চৌরাস্তায় এসে অতসী ফের বিমূঢ় হয়ে পড়ল—এবার কোন্ দিকে। যান-বাহনের স্রোতের ধারা তেমনি অব্যাহত, একটা মূঢ়, পরবশ সরীসৃপ সত্তা যেন অনিবার্য, অন্ধবেগে এগিয়ে চলেছে মাঝে মাঝে লাল-নীল আলোর সংকেতে সে স্তম্ভিত হয়, চলে, দাঁড়ায়, চলে।

মোড় থেকে খানিকটা এগিয়ে একটা গাড়ি ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কৌতূহল ছিল না, অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই অতসী ভিতরে তাকাল। পিছনের সীটে একটি মেয়ে। খুব ঘটা করে সেজেছে সন্দেহ নেই- নিপুণ টানে আঁকা উদ্ধত চাঁদ ভুরু, সুকৃষ্ণ পক্ষ্মরেখা, তবু মুখের চামড়ার অনেক পাউডার ছাই উড়িয়ে যদি রঙের রতন মেলে।

এ-মেয়েটিকে কিম্বা এমনি আরও কাউকে অতসী এর আগেও দেখেছে, কিন্তু কবে কোথায়, হঠাৎ স্মরণ হল না। ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবতেই মনে হল, হয়ত কোন থিয়েটারে। মেয়েটি সম্ভবত অভিনেত্রী। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্কু-ভাবনাটা আবার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। শশাঙ্ক না বলেছিল আদিত্য কোন অভিনেত্রীর প্রণয়াসক্ত?

কী ভেবে নিকটতম একটা ডাক্তার-খানায় ঢুকল অতসী, কাউন্টারের লোকটিকে বলল, 'ফোন করব।' লোকটা ইঙ্গিতে টেলিফোনটা দেখিয়ে দিল।

নির্দিষ্ট নম্বর বলবার পরেও বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, অপর প্রান্ত থেকে সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে কলটা টিপল বার বার, টের পেল কাউন্টারের লোকটা উৎসুক হয়ে ওর মুখের দিকেই চেয়ে

আছে, ধৈর্য হারিয়ে অতসী বার বার বলতে থাকল, হ্যালো, হ্যালো।

অনেক, অনেক পরে, কে জানে, কত মিনিট, ঘণ্টা না যুগ, ও-পার থেকে সাড়া এল, 'নো রিপ্লাই।'

জবাব নেই। অতসী বিস্মিত হল এমন সময় আদিত্যর বাড়িতে গরহাজির থাকবার কথা নয়। খুচরো পয়সা ক'আনা কাউণ্টারে রেখে ফের রাস্তায় এল অতসী আবার ফিরে গিয়ে বলল, 'আরেকটা ফোন করব।'

যেখানে-যেখানে আদিত্যর থাকবার সম্ভাবনা, একে একে সব ক'টা নম্বরই চাইল অতসী, ব্যাগ থেকে কেবলি খুচরো পয়সা কাউণ্টারে রাখে, ফোন তোলে, নম্বর চায়। একই জবাব আসে। আদিত্য? না, আদিত্য তো এখানে নেই।

পরবর্তীকালে অতসী বহুবার এই দিনটির কথা ভেবেছে। তখন দিনটি বহুদূর সরে গেছে, নৈকট্য নেই, জ্বালাও নেই, সেটা কতকটা ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখার মত। প্রেত-রোহিণী গোবিন্দলালকে পুকুরঘাট দেখিয়ে বলেছিল, 'এইখানে, এমন সময়ে আমি ডুবিয়েছিলাম।' অতীত অতসী কোন গোবিন্দলালকে নয়, নিজেকেই শাসায় বলেছে, এই দিনে, এমনই সময়ে—

সেদিন কিন্তু অতসী রাস্তায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকেও চাইতে পারেনি। বেলা তখন ঠিক দুপুর, আকাশটিকে মনে হয়েছিল অতিকায় একটা কালো কড়াই, অদৃশ্য দানবেরা মিলে কঠিন, উজ্জ্বল ধাতুপিণ্ডবৎ সূর্যকে জ্বাল দিয়ে গলিয়ে ফেলছে। পথে তেমনি কর্কশ কলরব, অনর্গল উচ্ছৃঙ্খল গতির সমারোহ।

প্রথম যে ট্রামটা পেল সেটাতেই অতসী উঠে বসেছিল।

আদিত্যর বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। ত্যাগী দেশসেবক আদিত্য মজুমদারকে ভোট দিন। ধামার বাক্সে ভোট দিবেন না ইত্যাদি। আদিত্যর বাড়ির ঠিক সামনেই ছোটখাটো একটা জটলা, অতসীর বুকের ভিতরে ছ্যাঁৎ করে উঠল। কী হয়েছে তবে আদিত্যর। কোন বিপদ—মনের বিবর থেকে ভয়ের একটা কেঁচো বেরিয়ে গুটিগুটি এগোতে থাকল।

যারা জটলা করছিল, অতসীকে তারা চেনে, পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু অতসীকে বেশিদূর যেতে হল না, লোহার ফটকে বিশাল একটা তালা। প্রবেশের পথ বন্ধ।

শুকনো পাতার মর্মরের মত ঝির-ঝিরে একটা চাপা হাসির স্রোত বয়ে গেল, জটলাকারীদের একজন এগিয়ে এসে বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন দিদিমণি, কেউ নেই।'

অতসী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনল মুখ থেকে মুখে। আদিত্যর ভলাণ্টিয়ার এরা,—অনেককেই সে চেনে।

'কেউ নেই?'

যে লোকটি এগিয়ে এসেছিল সেই জবাব দিল, 'কাল রাত্তির থেকেই আদিত্য মজুমদার বেপাত্তা। আজ সকালেই দেখছি দরজায় তালা ঝুলছে।'

পিছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'ভেবেছিলুম আপনি জানেন। তা দেখছি আপনাকেও কিছু বলে যান নি।'

'আপনাকেও' কথাটায় একটা কুৎসিত ঝোঁক ছিল, কিন্তু অতসী এখন সেটা গায়ে মাখলে না। নির্জীব গলায় বললে, 'না, আমাকেও কিছু বলে যান নি।'

আরেকটি কর্কশ কণ্ঠ বলে উঠল, 'সব শালার জোচ্চুরি। এ্যাদ্দিন গলা ফাটালুম, একটা পয়সা হাতে এল না। রেশনের দোকানে বাকি, পেট্রলের দোকানে বাকি—শালা বেমালুম শটকে পড়েছে।'

আপসোস করতে শোনা গেল এক-জনকে, 'এর চেয়ে মাইরি, যদি চল্লিশের ওয়ার্ডের পরমানন্দবাবুর হয়ে লড়তুম। ওখান থেকেও অফার এসেছিল। খাওয়া-দাওয়া বাদে রোজ নগদ দুটি করে টাকা।

কে বলে উঠল, 'প্রভাত মল্লিকও তো—'

ক্ষুব্ধ গুঞ্জনটা ক্রমশই বাড়তে থাকল, হিংস্র, সন্দিগ্ধ জনপিণ্ডের সমবেত দৃষ্টির জ্বালা সইতে না পেরে অতসী অনুচ্চ গলায় বলে উঠল, 'কখনও উনি নিজের ইচ্ছায় যান নি। আজ বাদে কাল ইলেকসন। কোথায় যাবেন। হয়ত—হয়ত—'

চকিতে একটা সম্ভাবনার কথা অতসীর মনে হল। হয়ত প্রভাত মল্লিকই আদিত্যকে সরিয়েছে, গুম করে রেখেছে কোথাও। ইলেকসনে এমন হয়, এদেশে না হ'ক, অনেক বিদেশী নজির অতসীর জানা।

দ্রুত-কম্পিত পায়ে ভীড়ের ভিতর থেকে পথ করে অতসী বেরিয়ে এল, পিছন থেকে তখনও টিটকিরি কানে আসছে—'এ-মাগীও শয়তান। সব জেনে-শুনে ন্যাকা সেজে আছে।'

'জনদর্পণ' অফিসের দরোয়ান আজও ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল, বেয়ারা এডিটরের কামরার কাটা দরজা ঠেলে দিল, কাগজের স্তূপে-ঠাসা চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছোট্ট সেই ঘরটিতে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় অতসী নিজেকে বলতে শুনল, 'মিঃ সরকার, আমি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।'

জীবনতোষ সম্পাদকীয় রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মাথা না তুলেই বললেন 'বসুন।'

পাশের ঘরে খটখট টাইপের আওয়াজ,

ঘন ঘন ঘণ্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে আহ্বান, নীচের তলায় যন্ত্রের গম্ভীর, চাপা গুম গুম, দেয়াল-ঘড়িটার টক-টক, কখনও আলাদা, কখনও এক হয়ে অতসীর স্নায়ুতন্ত্রীতে আঘাত করে গেল, মিনিটের পর মিনিট, কিন্তু জীবনতোষ খস খস লিখেই চলেছেন, মাথা তোলবার ফুরসৎ পেলেন না।

ধৈর্য এবং সঙ্কোচ খুইয়ে অতসী ফের বলল, 'মিঃ সরকার—'

চুরুটটা ছাইদানীতে শুইয়ে জীবনতোষ মুখ তুললেন। 'ও,—আপনি। কী দরকার, বলুন তো।'

ভাবলেশহীন ব্যস্ত একটি মুখ, হয়ত-বা ঈষৎ বিরক্ত, কঠিন। কিন্তু অতসী মনে মনে কথা গুছিয়েই এসেছিল।

'মিঃ সরকার, আদিত্যবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? বলেন কী। নাবালক শিশু অপহরণ—থানায় খবর দিতে পারেন,' লিখতে লিখতে যেন একটা জুৎসই কথা পেয়ে গেছেন, জীবনতোষ এমনভাবে হাসলেন, 'কিম্বা রেডিওতে।'

অতসী ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু এটা খবরের কাগজের অফিস, তাই ভেবে-ছিলুম, যদি—'

'ও, বিজ্ঞাপন দিতে চান? 'হারান, প্রাপ্তি, নিরুদ্দেশ'—কেমন? কিন্তু বিজ্ঞাপনের ঘর তো এটা নয়,—সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঠিক ডানধারে। দাঁড়ান, বেয়ারাকে ডেকে দিচ্ছি, আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দেবে। ওরা বোধ হয় লাইন-পিছু এক টাকা-মত নেয়।'

মুখ কালো করে অতসী উঠে দাঁড়াল।

'আপনি শুধু ঠাট্টাই করছেন। ইলেকসনের অল্প ক'দিন আগে একটা লোক নিখোঁজ হল, হয়ত এর পেছনে পলিটিক্যাল কোন কারসাজি আছে, হয়ত হয়ত—'

সম্পাদক হেসে ফেললেন। বলুন না, বলে ফেলুন যা বলতে চান। গুমখুন?'

তর্ক করা বৃথা, অতসী দরজার বাইরে পা রাখলে।

জীবনতোষ স্মিত দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছিলেন। তারপর, অতসী যখন সত্যিই চলে যাবার উপক্রম করল, তখন ওকে পিছন থেকে ডাকলেন।

'শুনুন।'

অতসী ফিরে তাকাতে জীবনতোষ বললেন, 'আপনি সত্যিই কিছু জানেন না?'

অতসী শুধু মূঢ়ের মত মাথা নাড়ল।

'আশ্চর্য!' জীবনতোষ ব্লটিংয়ে কয়েকটা অলস-কলম আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন—'অথচ আমরা ভেবে-ছিলাম, আদিত্যর সব কনফিডেন্সিয়াল ফাইল আপনার কাছে। আপনি আদিত্যর প্রধান সচিব অথচ জানেন না ওর একটি সখি মিথঃ আছে?'

অতসী শূন্য চোখে চেয়ে রইল। মাস্টার মশাই বোর্ডে দুরূহ একটা অঙ্ক কষে দিচ্ছেন, আর সে যেন কিছু-না-বোঝা ছাত্রী।

'তাকে নিয়েই আদিত্য কাল চুনার গেছে।' ব্লটিং কাগজের আঁকিবুকিতে একটা পাখি ধরা পড়েছিল, জীবনতোষ সেটাকে পুচ্ছ দিয়ে সম্পূর্ণ করতে লেগে গেলেন।

পাংশু মুখে অতসী তখনও বসে কী একটা কথা বলবে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না, চেন টেনে হাত-ব্যাগটা একবার খুলতে, বন্ধ করছে ফের।

'কিম্বা বিন্ধ্যাচলও হতে পারে' জীবনতোষ আবার যেন মজা পেতেই বললেন। —'তবে সঙ্গে সেই মেয়েটি যে আছে, তাতে কোন ভুল নেই। ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভেসন, দু'খানা টিকিট। ইলেকসনের জন্যে খেটে আদিত্যর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে।

অতসী জিজ্ঞাসা করল, 'জীবনতোষ-বাবু, সে কে? সেকি কোন অভিনেত্রী—'

মাথা নেড়ে জীবনতোষ বললেন, জানি না। আমরা খবরের কাগজ চালাই অতসী দেবী, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ নয়। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে যেটুকু খবর পেয়েছি, এ মেয়েটিকে আদিত্য হয়ত বিয়ে করবে।'

'বিয়ে?' স্থানকাল ভুলে অতসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

জীবনতোষ কলমের আঁচড়েই পাখিটার পক্ষচ্ছেদ করতে করতে বললেন 'বিয়ে। গান্ধর্ব, অপ্সরা, পৈশাচ, যে কোন মতেই হক না কেন, সে বিয়েও বিয়ে। এমন কি, ব্লটিং কাগজটাকে মুঠো করে পাকাতে পাকাতে জীবনতোষ বললেন, 'এমন কি এ বিয়ে হয়ে গিয়েও থাকতে পারে।'

কখন যে টলতে টলতে অতসী উঠে এসেছিল তার নিজেরও খেয়াল নেই। ঘরের ভিতরে মনে হয়েছিল একটা চাপা অন্ধকার মেঘ পৃথিবী ছেয়ে আছে; বেরিয়ে এসে দেখল, তখনও শেষ রৌদ্রটুকু যায়নি। বুক ভরে নিশ্বাস নিতে মস্তিষ্কের জড় আচ্ছন্নতা কেটে গেল। এ কী করেছে অতসী, কেন পালিয়ে এসেছে অক্ষম, অসহায় অবলার মত; তার কাছেও তো অস্ত্র ছিল, আদিত্যর সব পলিটিকাল উচ্চাশার মূলধন, কেন তার প্রয়োগ করেনি। সঙ্কোচ? এখনও সঙ্কোচ? ভয়? এখনও কলঙ্কের ভয়? হায়রে।

ফিরে যাবে অতসী, জনদর্পণ অফিসেই ফিরে যাবে, তাকে নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলেছে, সেই নির্বিবেক কুচক্রীর সর্বনাশের চাবি তার শত্রুদের হাতে সঁপে দেবে।

অবাক দরোয়ানটা আবার দরজা ছেড়ে দিল, বেয়ারাটা কাটা দরজাটা ঠেলে ধরতেও ভুলে গেল, অতসী আবার ফিরে এল সেই কাগজ গন্ধী ধোঁয়াটে চাপা ঘরে।

এবারে আর সঙ্কোচ করল না, চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই বসে পড়ল। স্পষ্ট, ঈষৎ-উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'জীবনতোষ-বাবু, আমি আবার এসেছি।'

মুখ তুলে জীবনতোষবাবু বললেন, শেষ তো।' এক মুহূর্তও দেরি করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন। আর অমনি অতসী যেন টের পেল এই আপাত-দাম্ভিক লোকটিও আসলে ভীরু, দুর্বলস্নায়ু, কারুর মুখোমুখি হলেই বিব্রত, অসহায় বোধ করে, তাড়াতাড়ি আঁকড়ে ধরে একটা কলম কিম্বা চুরুট, ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করতে চায়।

পরের কথাগুলো অতসীর ঠিক করাই আছে। বলবে, 'জীবনতোষবাবু, আমি একটা খবর দিতে এসেছি।' উৎসুক হয়ে ঝুঁকে পড়বেন জীবনতোষ, অতসী হেসে বলবে, 'প্রভাত মল্লিককেও খবর দিন'। তখন আর ধৈর্য থাকবে না জীবনতোষের, ডাকবেন প্রভাত মল্লিক কেন, যা বলবার আমাকেই নিঃসংকোচে বলতে পারেন।' তারপর আদিত্যের কপটতা, শঠতা, কলঙ্ক কাহিনী যখন একে একে উন্মোচন করবে অতসী, জীবনতোষের মুখভঙ্গী বদলে যাবে, সেই প্রথম বিস্মিত, পরে স্তম্ভিত এবং অবশেষে ঘৃণা কণ্টকিত দৃষ্টি কল্পনা করে অতসী বিচিত্র একটা হর্ষ, সুখ অনুভব করল।

অবিচলিত, স্পষ্ট গলায় অতসী বলল, 'সেদিন আপনারা আদিত্য মজুমদার সম্পর্কে কিছু গোপন খবর আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন। যে সে মেয়ের সর্বনাশ আদিত্য করেছে তাদের নামের লিস্টি পেলে এই ইলেকসনের মুখটাতে আপনাদের সুবিধে হয়, না? সব মেয়ের খবর তো দিতে পারব না, জীবনতোষবাবু, একটি মেয়ের কথাই শুধু বলতে পারি। আদিত্যকে যে সর্বস্ব দিয়ে বিশ্বাস করেছে, ঠকেছে।'

চুরুটের ধোঁয়ার আড়ালে জীবনতোষের মাংসপেশির কোন পরিবর্তন হল কি না দেখা গেল না, অতসী বলে গেল, 'পরিচয় পরে দেব, আগে তার কাহিনীটা বলি। শিক্ষিত মেয়ে, কিন্তু রুচিই তার কাল হল। স্বামীর ঘর করতে পারল না, ফিরে এল বাপের বাড়িতে। সেখানেও দুর্দশা, ক্রমে ক্রমে সংসারের সব চাপ তার ওপরেই পড়ল। মেয়েটি তবুও দমেনি। ভেবেছিল সামনে জীবন দীর্ঘ, শহরটাও বিপুল, এরই মধ্যে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার একটা পথ সে নিশ্চয় করে নিতে পারবে। সংগ্রামকে ভয় করেনি, ছোট-খাটো আঘাতকে তুচ্ছ করেছে। চাকরি নিল। প্রয়োজনের তুলনায় সে উপার্জনের পরিমাণ কিছু না। ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করল শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই কেবল শ্রম নয়, অনেক মর্যাদাবোধ, নীতি বাধা দিতে হয়। ভিতরটা বিদ্রোহ করে উঠল, ভাবল পিছিয়ে আসে। কিন্তু কোথায় পেছোবে। সেখানে সত্যাগ্রহ করে পথ জুড়ে শুয়ে আছে তারই মা, ভাই, রক্ত সম্পর্কিত পরিবার। গ্লানি লাগল দেহে, মলিন রঙ লাগল মনে, নীতিবোধ, নিরঙ্কুশ মুছে গেল। সে মেয়েটি মা পর্যন্ত হয়েছিল।'

জীবনতোষ হয়ত শিউরে উঠলেন, অতসী দেখতে পেল না, মাথা নীচু করে বলে গেল, 'মা হল সেই মেয়েটি, কিন্তু মাতৃত্বের অধিকার পেল না, পাপ-সম্ভব শিশুটিকে ওরা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এমনি প্রবঞ্চনা পদে পদে। নিষ্কৃতির কোন পথ তখন খোলা ছিল না।'

'ছিল' জীবনতোষকে অতসী নির্বিকার গলায় বলতে শুনল, 'একটা পথ ছিল। মেয়েটি আত্মহত্যা করতে পারত।'

সমস্ত ঘৃণা আর রোষ যেন একটা বিস্ফোরকের মত বিদীর্ণ হয়ে গেল, অতসী দৃপ্ত কণ্ঠে বললে, 'এই বিবেচনা নিয়ে আপনারা সম্পাদকীয় লেখেন, সব মুশকিলের আসান করেন? তৃষ্ণা মেটাতে হবে বিষ খেয়ে? কেন জীবনবাবু, কেন। কেন আমাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও থাকবে না,—নিঃসম্বল বলে? অসহায় বলে?'

মৃদু-মৃদু হেসে জীবনতোষ বললেন, 'উত্তেজিত হয়ে মেয়েটির পরিচয় আপনি দিয়ে ফেলেছেন, অতসী দেবী।'

দৃঢ় স্বরে অতসী বলল, 'দিয়েছি, দেব বলেই আজ ফিরে এসেছি। একটু আগেই আপনি আত্মহত্যার কথা তুলেছিলেন। নিজের সব কলংক কাহিনী অপকটে রটনা করতে এসেছি, এও তো এক রকমের আত্মহত্যাই জীবনবাবু। নিজে মরলুম, আমার এখন একমাত্র সাধ, তাকেও মারব। আদালতে দাঁড়িয়ে একে একে সব বলব, কিছু গোপন করব না। শিশুটি আছে এক অনাথ-আশ্রমে। সে ঠিকানাও জানি।'

চুরুটটা পুড়ে পুড়ে ফুরিয়ে

এসেছিল, সেটাকে ছাইদানিতে রেখে জীবনতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

গলায় সবটুকু আকুতি ঢেলে অতসী বলল, 'আপনি শুধু প্রভাত মল্লিককে একটা খবর দিন। বলুন, সেদিন যে মেয়েটি টাকার লোভেও কিছু বলেনি, আজ সে নিজে থেকেই এসেছে। যে খবর প্রভাত মল্লিক চান, সেই খবরই তাঁকে দেবে। বিনিময়ে মেয়েটি আর কিছু চায় না, প্রভাত যেন তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেস লড়তে সাহায্য করেন।'

ভস্মশেষ চুরুটটির দিকে দৃষ্টি রেখে জীবনতোষ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। —'না অতসী দেবী, প্রভাত মল্লিক আজ আর আসবে না।'

'আসবে না? আদিত্যকে লোকচক্ষে হেয় করার এই সুযোগ—'

বাধা দিয়ে জীবনতোষ বললেন, 'তবু আসবে না।'

সব তেজ পলকে নিবে গেছে, নির্জীব, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অতসী বলল, 'কেন, জীবনবাবু। সেদিন তো উনি দু'হাজার টাকা পর্যন্ত—'

তেমনি মাথা নেড়ে নেড়ে জীবনতোষ বললেন, 'আসবে না, কেননা আদিত্যর সঙ্গে প্রভাতের আর কোন কলহ নেই।'

একটা আঘাতে পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে গেছে, অতসী ভীত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কলহ নেই?'

জীবনতোষ বললেন, 'না। ইলেকসনের ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে রফা হয়ে গেছে।'

এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণাটির জন্যে অতসী প্রস্তুত ছিল না, রক্তশূন্য মুখ সামান্য হাঁ হয়ে পড়ল, নীল-হিম চোখ দুটি বিস্ফারিত। অশ্রুতপ্রায় গলায় বলল, 'রফা হয়ে গেছে?'

জীবনতোষ বললেন, 'হাঁ। আদিত্য প্রভাতের অনুকূলে নাম প্রত্যাহার করেছেন। চুণারে যাবার আগে স্টেটসনেই দিয়ে গেছেন, এই দেখুন তার কপি। কাল সব কাগজে ছাপা হবে।'

কাগজটা পড়ে দেখতে অতসী বিন্দুমাত্র উৎসুক ছিল না। তিক্ত গলায় বলে উঠল, 'হঠাৎ আদিত্যর রাজনীতিতে অরুচি?'

'অরুচি নয়। শীগগিরই এ্যাসেম্বলির একটা উপনির্বাচন হবে। সেই আসনটি প্রভাত মল্লিকের দল বিনাযুদ্ধে আদিত্যকে ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। পোড় রাজনীতির খোঁয়াড়ে আদিত্যর আর কুলোচ্ছে না অতসী দেবী,' জীবনতোষ হেসে বললেন, 'তার বিচরণের জন্যে এখন বিস্তৃততর ক্ষেত্র চাই।'

অতসীর কিছু বলবার ছিল না, চেয়ারের হাতলটা শক্ত মুঠিতে চেপে সে বসে আছে। জীবনতোষই ফের বললেন, 'এই চুক্তিটা আর দিনকতক আগে হলেই ভাল হ'ত। আদিত্য কিছু দেরিতে নাম প্রত্যাহার করলেন, ফলে নির্দিষ্ট দিনে নামমাত্র একটা ভোটগ্রহণ করা হবে। অবশ্য প্রভাত মল্লিক অনায়াসেই জিতে যাবেন, কোন বাধা হবে না। জলে-জলে মিশে গেল অতসী দেবী, দু'পক্ষই মানী, কারুরই লোকসান হল না, কী বলেন।'

চেয়ার ছেড়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল অতসী। অতিশ্রান্ত, প্রায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, মানীদের মান রইল বটে।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সমুদ্রশঙ্খ

শ্রীঅনিলকুমার রায়

হিজিবিজি সময়ের ধূপছায়া ফেলে ফেলে রাত ভোর হয়
জলের জানালা থেকে চিক্ চিক্ ক'রে জ্বলে বালুকার সোনা
মৃত্তিকা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যত ঢেউ ছিল ঘুমে তিন...চার...ছয়
নূপুর, ফেনার মেয়ে সাড়া দিল চুপি চুপি কেউ জানলো না।

ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এলো ঢেউয়ের শিশুরা সব মাছের মতন
আরো আরো এলো সব অনেকদিনের জানা মুখচেনা মুখ
সূর্য বিদ্যুৎরেখা ছুঁই-ছুঁই। ঝিনুকের আলোঝরা মন
দু'চোখের আয়নায় দেখে ভয় থম্‌থমে একটি শামুক।

দুপুর বেকেল হয়। ছায়ার কাজল ঢালে কালো মৌচাক
তারপর সে গাঁয়ের জলঢেউ উপকূলে সন্ধ্যা-পথ হাঁটে
ঈশান-নৈঋত কোণে শব্দ-ঢেউ তুলে বাজে সাগরের শাঁখ
ডানা মেলে রাত নামে। ঘুম ঘন হয় নীল চোখের মলাটে।

একাডেমী অব ফাইন আর্টস

গত ১৮ই ডিসেম্বর থেকে একাডেমী অব ফাইন আর্টস্‌এর বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সারা বছরের শিল্প-পরিক্রমার শেষে এই প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। সে আগ্রহ যে শুধু এর অতিকায়িক সমারোহের জন্য তা নয়; এর মাধ্যমেই আমরা বাৎসরিক শিল্প-প্রচেষ্টার ধারা ও গতির একটা সামগ্রিক পরিচয় পাই। সুতরাং আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও এই প্রদর্শনীটি একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে নানারকম অনুকূল ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে এসে আজও যে এই প্রতিষ্ঠানটি টিকে আছে রীতিমত প্রাণশক্তি নিয়ে, তার থেকেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তা অনুভব করা যায়। অবশ্য একাডেমীর বর্তমান উজ্জ্বল অধ্যায়টির মূলে আছে কয় একজন শিল্পপ্রেমিকের অতন্দ্র শিল্পনিষ্ঠা, যা শুধু বছরে একবার বিভিন্নপন্থী শিল্পীদের একত্রিত করেই সন্তুষ্ট নয়, আমাদের সাম্প্রতিক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও মর্যাদা দেবার কাজেও একান্ত সচেতন।

একাডেমীর গত বছরে যাঁরা কর্মকর্তা ছিলেন, এ বছরে তার মধ্যে কিছু রদবদল লক্ষ্য করা গেলো। হয়তো সেই পরিবর্তনের দরুণই প্রদর্শনীর উপরও কিছু প্রভাব এসে থাকবে। প্রতিবারই আমরা প্রদর্শিত শিল্পসংখ্যা কমিয়ে সত্যি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। এবারে প্রদর্শিত শিল্পসংখ্যা গতবারের থেকে অনেক কম এবং নিঃসংশয়েই নির্বাচনের দিকে অধিকতর মনোযোগ লক্ষ্য করা গেলো। একান্ত দুর্বল ও প্রাথমিক শিল্প-রচনার দৃষ্টান্ত এবারে বিরল। কোন অগোচর প্রতিভাকে একাডেমী হয়তো এবার আবিষ্কার করতে পারে নি, কিন্তু এটা নিঃসংশয়েই অনুভব করা যায় প্রদর্শিত ছবির সাধারণ মান অন্য যে কোন বছরের চেয়ে অনেক উন্নত। অন্ততপক্ষে শিল্পগুলিকে একটা নিম্নতম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হয়েছে। এদিক থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

বিভিন্ন মিডিয়ামে অঙ্কিত ছবি এবারেও একাডেমীকে সমৃদ্ধ করেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের শিল্পীদের তেল-রঙ ব্যবহারের প্রতি যে একটি কুসংস্কার ছিলো, তা যে ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে, তা এই কয় বছরের প্রদর্শনী থেকেই অনুভব করা যায়। টেম্পেরা এবং জল-রঙের মতো তেল-রঙকেও শিল্পীরা যে সফল মিডিয়াম হিসেবে গ্রহণ করছেন এবং আশ্চর্য দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তা ব্যবহার করছেন, তার পরিচয় এই প্রদর্শনী থেকেই পাওয়া যাবে। তেল-রঙ মিডিয়ামের মধ্যে যে

পসারিণী — শিল্পীঃ দিনকর কৌশিক

প্রসাধন — শিল্পীঃ মাখন দত্তগুপ্ত

পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে, তারই বিভিন্ন ধারার পরিচয় এখানে রয়েছে।

রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বৈতরণী' বিরাট ক্যানভাসে রচিত হলেও কোন বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। এর চেয়ে 'ফেরীঘাট' ছবিটিতে রূপ-রচনার (Composition) বিশিষ্টতা ও তুলি ব্যবহারের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। কে সি এস পানিকর এবার আমাদের নিরাশ করেছেন। তাঁর দুটি ছবি 'ক্যানেলে নৌকা' ও 'লাল ব্রিজ' একান্ত গতানুগতিক। বরং তাঁর 'বিশ্রামরতা মডেল' ছবিটি অনেক বলিষ্ঠ। যদিও ছবিটি ইংরেজ শিল্পী মাথ্যু স্মিথের ১৯২৪ সালে আঁকা 'নগ্ন' (nude) ছবিটির প্রায় হুবহু অনুকরণে আঁকা। এইচ হনুমানিয়ার 'প্রত্যুষ' ছবিটিতে আলোকসম্পাতের দক্ষতার পরিচয় আছে। সেদিক থেকে 'বৃদ্ধ বট' রচনাটি অনেক দুর্বল বলে মনে হলো।

তেল-রঙের ছবির মধ্যে এঁদের রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সোমসুন্দরের 'জলের ধার', চন্দ্রনাথ দে'র 'দ্বিপ্রহর', রাখাল রায় চৌধুরীর 'উড়িষ্যার একটি নদী', চন্দ্রশেখরের 'সূর্যস্নান', ইন্দ্র দুগারের 'গ্রামের শেষ', এম সেনের কৈলাসের দুটি ছবি প্রভৃতি।

অতুল বসুর অপূর্ব প্রতিকৃতি কয়টি এবারের একাডেমীকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু প্রতিকৃতি রচনায় এবারেও আমাদের আশ্চর্য করেছেন কিশোরী রায়। শিল্প-রচনার মধ্য দিয়ে তিনি যেন আমাদের অঙ্কিত মানুষের চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন। শিল্পীর পিতার প্রতিকৃতিটি এবারের একাডেমীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অবশ্যই স্বীকৃত হবে।

মাখন দত্ত গুপ্তের 'ক্ষীণ আলোকে' ছবিটিতে টোন সৃষ্টি ও বর্ণ ব্যবহারের দক্ষতার গুণে সার্থক রচনা বলে পরিগণিত হবে।

'ফেরী' ছবিটি ছ'টি শিল্পীর যৌথ রচনা। তা সত্ত্বেও এর টেক্সচার সৃষ্টির অপূর্বতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পরিচিত ও প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে ডি কে দেববর্মণ ও সুধীর খাস্তগীর আমাদের হতাশ করেছেন। এঁদের যে কৃতিত্বের সঙ্গে এতদিন আমরা পরিচিত ছিলাম, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় সৃষ্টি যাতে না হয়, সে বিষয়ে শিল্পীদের অবশ্যই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

টেম্পেরা এবং জল-রঙ বিভাগে গোপাল ঘোষ তাঁর দীপ্ত আশ্চর্য রকমে উজ্জ্বল রেখেছেন। তাঁর যে ক'টি রচনা এখানে স্থান পেয়েছে, তাতে শিল্পীর প্রতিভার আর একটি মৌলিক দিক উদ্ঘাটিত করছে। রঙ ব্যবহারের এমন বিচিত্র নৈপুণ্য আমাদের শিল্পে অজানা এবং সেখানে তিনি এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করলেন।

কল্যাণ সেনের 'পূজারিণী' তাঁর পরিচিত রীতি ব্যবহারের নিদর্শন, কিন্তু একেবারে ভিন্ন ধারায় অঙ্কিত 'গ্রাম্য-দৃশ্য' উল্লেখযোগ্য রচনা। মোহন সামন্তের 'রাজা মানসিং ও পিয়া পূজারী' এক্সপ্রেসন সৃষ্টির দিক থেকে অনেক সার্থক। জি কে যোশীর 'নর্মদার তীর' কম্পোজিশন ও বর্ণ ব্যবহারের দিক থেকে এক উল্লেখযোগ্য রচনা। শান্তিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ওয়ে সাইড কেফ' শৈলী সৃষ্টির সার্থক দৃষ্টান্ত। বীরেন দে'র রচনায় ফটোগ্রাফিক প্রাধান্য থাকলেও 'প্রতীক্ষা' অনেক অংশে চিত্রগুণাক্রান্ত। জ্ঞানায়ুধের রচনায় আলোছায়ার মায়াজাল সৃষ্টির প্রচেষ্টা এবারেও লক্ষ্য করা গেলো। তার মধ্যে 'মৃত গাছ' ও 'হঠাৎ বৃষ্টি' দুটি ছবিতে তাঁর শৈলীর বিশিষ্টতার পরিচয় আছে। ডি ডি চিণ্ডলকর এবার কোন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের বিস্মিত করেন নি। তাঁর ক'টি ছবির মধ্যে 'খাজরানা গেট' উল্লেখযোগ্য।

গোপেন রায়ের রূপকথার ছবি ক্রমশই যেন গতানুগতিক হতে আরম্ভ করেছে। ইন্দ্র দুগার এবার তাঁর কোন

ছবিতেই তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে 'হ্যামলেট' সুখদৃশ্য রচনা। ক্ষীতিন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রতিভা এখন অস্তগামী বলেই মনে হলো। তবুও তাঁর ছবি কটিতে সেই রেখাকুশলতা ও রোমাণ্টিক উন্মাদনা সৃষ্টির আভাস যেন পাওয়া যায়। ত্রিভঙ্গ রায়ের অনেকগুলি রচনা এবারের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। রচনার কুশলতা সত্ত্বেও কোন বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের পরিচয় তিনি দিতে পারেন নি। প্রণবকুমার গাঙ্গুলীর দুটি রচনা স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে 'সকাল' ছবিটি রচনা-কুশলতার দিক থেকে প্রশংসা পাবার যোগ্য। দিলীপ চৌধুরীর মুরগী-দম্পতির ছবিটি বর্ণ-ব্যবহার ও রচনার কুশলতায় সার্থক। রাধাচরণ বাগচীর 'শান্তির পথ' ও 'সিরাজের কবরে' রচনা দুটিতে মিনিয়েচার পদ্ধতির ভালো নিদর্শন লক্ষ্য করা গেলো।

সমর ঘোষ তাঁর রচনাগুলিতে প্রাচীন পুঁথির চিত্র-লেখনের ধারার বৈশিষ্ট্য

সঙ্গীতশিল্পীর স্বর্গ — শিল্পীঃ মোহন সামন্ত
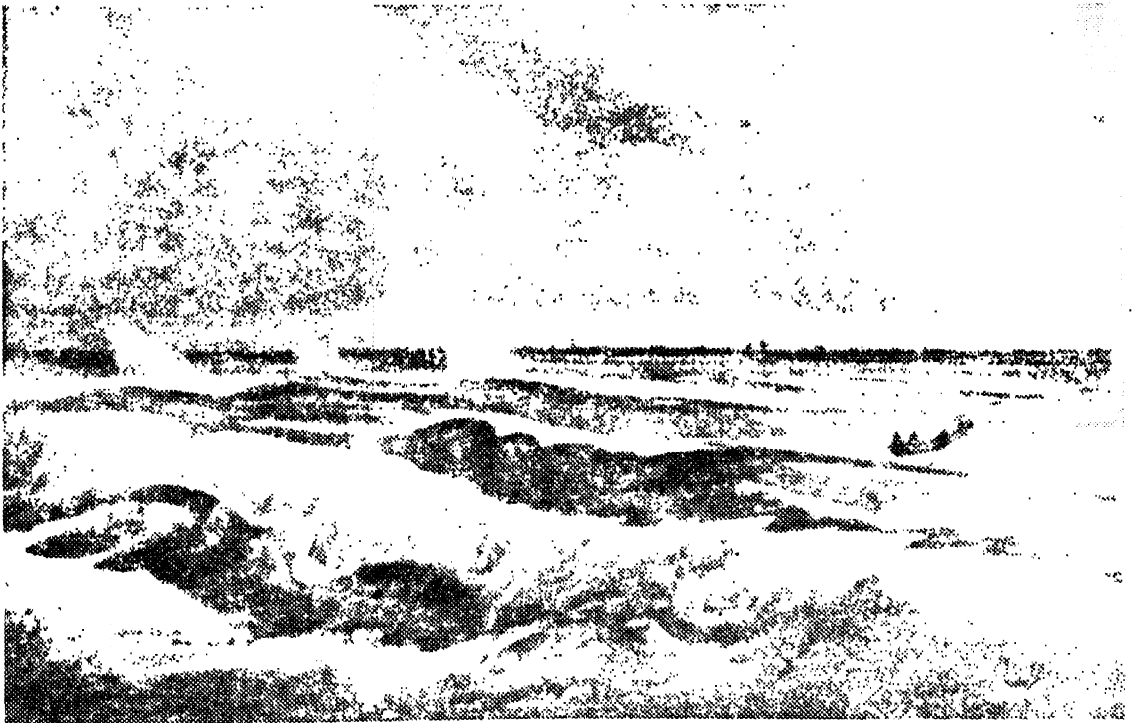
লহরীলীলা — শিল্পীঃ গোপাল ঘোষ

শকুন্তলা শিল্পীঃ **সমর ঘোষ**

আনবার চেষ্টা করেছেন এবং সেদিক থেকে তার সাফল্য অনস্বীকার্য। এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ রচনা হলো শকুন্তলা। অরূপ দাসের 'রামকৃষ্ণের জন্ম' কোন চিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্বাচিত হলো, তা বোঝা গেল না। এই বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে হয়েছে গৌরাংগচরণ সোমের 'নৃত্য' নামে ছবিটি। একটি প্যানেলে ক'টি নৃত্যরত নরনারী তাদের সুঠাম ভঙ্গিমা ও নৃত্য উল্লাস আশ্চর্য সফলতার সংগে মূর্ত হয়েছে। রঙ ব্যবহারের দিক থেকেও শিল্পী অত্যন্ত সতর্ক। তুলি চালনার স্থির দক্ষতা, ও ভাব-ব্যঞ্জনার গুণে এ প্রদর্শনীর এটি একটি শ্রেষ্ঠ রচনার দাবী করতে পারে।

গ্রাফিক আর্টস্ বিভাগে সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর সব ক'টি রচনার মধ্যেই নিপুণ দক্ষতার পরিচয় আছে। হরেন দাসের কাঠ-খোদাইগুলির মধ্যে 'শরৎ' রচনাটি নিঃসংশয়েই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। রঙীন কাঠ-খোদাইএর উল্লেখযোগ্য কাজ যদিও এবার প্রদর্শনীতে নেই, তবুও দীলিপকুমার গাংগুলীর 'দাবার ছক' ভালো রচনা।

ভাস্কর্য বিভাগে উমা রায়ের রচনা নিঃসংশয়েই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাঁর 'অবসর' এ বিভাগের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকৃত হবে। [illegible] দাসের 'গোপন কথা'র চেয়ে '[illegible]' নিঃসংশয়েই রসোত্তীর্ণ রচনা। [illegible] চৌধুরীর স্লেটের উপর খোদাই '[illegible] পথে' রচনাটির নিপুণ দক্ষতা প্রশংসনীয়।

এই প্রদর্শনীর যেসব শিল্পীর রচনা উল্লেখ করা হলো, এ ছাড়াও বহু শিল্পীর রচনার মধ্যে ভবিষ্যতের স্বাক্ষর এবং প্রতিভার পরিচয় লক্ষ্য করা গিয়েছে। সাধারণভাবে সেইসব শিল্পীর রচনাই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যাঁদের রচনা ইতিমধ্যেই আমাদের সুপরিচিত এবং তাঁদের দৃষ্টিকোণের পরিচয় পূর্বেও পাওয়া গিয়েছে। এই প্রসংগে এই কথাও অবশ্যই স্বীকার করবো যে, এবারের প্রদর্শনী আমাদের উচ্চ আশাকে পূর্ণ করতে না পারলেও গভীরভাবে আনন্দ দিয়েছে এবং আধুনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত করেছে।

সৈয়দ মুজতবা আলী

(১৫)
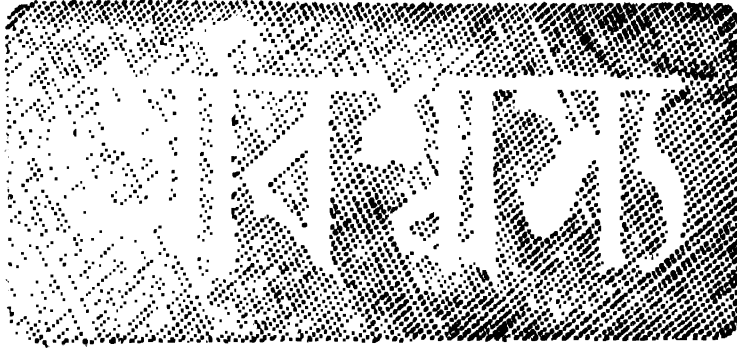
আমার বাপ মা দুজনেই এক মাসের ভিতর মারা যান। আমি বৃত্তি পেয়ে লণ্ডনে পড়াশুনো করতে এলুম।

আমার মনে হয় বড় শহরে মানুষের জীবন বৈচিত্র্যহীন। অকস্মাৎ সাময়িক ভাবে কিছু একটা ঘটে না। তার কারণ এ শহরের জীবনস্রোত বড় অতিশয় তীব্র বেগে। তুমি তার উপর দিয়ে ভেসে যাও খরবেগে। সে বেগে চলার সময় ডাইনে বাঁয়ে মোড় নেওয়া অসম্ভব। আর ছোট শহর, কিম্বা গ্রামে জীবনগতি শান্ত [illegible]। সে যেন গ্রামের নদী। তার উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় সামান্য খড়কুটোটি নানা চক্করে বহু প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে এগিয়ে যায়। দেখে মনে হয় তার জীবনে স্বাধীনতা অনেক বেশী।

মানুষের জীবনের উপর লণ্ডনের এ জগদ্দল, তার দাবী বহুল—কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি মানুষ যে কি বদ্ধ পাগলের মত ছোটাছুটি হুটোপুটি করে সেই তুমি গঞ্জের লোক বুঝবে কি করে? এবং তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, থ্যাঙ্ক্ গড্, মধু-[illegible]কে কখনও বুঝতে হবে না।

কিন্তু জানো সোম, সেই খরস্রোতে ভেসে ভেসে হঠাৎ আমি একদিন শেষ সীমানায় পৌঁছে গেলুম। দেখি সমুখে ঘন নীল সমুদ্র আর তার উপর ফিরোজা আকাশের ঢাকনা। বিলেতের সমুদ্র আর আকাশ সচরাচর নীল রঙের বাহার ধরতে জানে না—কুয়াশা, বৃষ্টি আর বরফ তাকে করে রাখে ঘোলাটে, তামাটে, পাঁশুটে। আমার সঙ্গে সমুদ্রের চাঁদ চক্ষের মিলন হল নিদাঘ মধ্যাহ্নে—নীলাম্বুজ আর নীলাকাশ সেদিন বর্ষণ শেষে আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে দেহখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

সে সমুদ্র মেবল্।

তোমাকে বোঝানো অসম্ভব, সোম, কারণ এ জিনিস বোঝার জিনিস নয়। তোমার বহু সদ্গুণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু প্রেম কি বস্তু তা তুমি জানো না। কতবার দেখেছি, ছোঁড়াছুঁড়ি পালিয়ে গিয়ে কেলেঙ্কারী করেছে, তুমি সর্বদাই সমাজের হয়ে তাদের উপর কড়া শাসন করেছ, পুলিশের কুলিশ পানি দিয়ে। তারা কিসের নেশায় পাগল হয়ে সমাজের সব বেড়া ভাঙল, সব দড়াদড়ি ছিঁড়ল তুমি কখনো বুঝতে পারোনি। আমি দু'একবার ইঙ্গিত করে দেখেছি তুমি অন্ধ, বরঞ্চ নৈতিক সামাজিক ধর্ম রক্ষা করা যার সর্বপ্রধান কর্তব্য সেই পাদ্রী বুড়োবুড়ীর হৃদয়ে অনেক বেশী দরদ, তাদের চিত্ত বহুগুণে প্রসারিত।

মেবল সেই গ্রীষ্মের দুপুরে হাইড পার্কের গাছতলার বেঞ্চিতে বসে অলস নয়নে সার্পেণ্টাইনের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল।

তুমি তাকে দেখেছ, বহুবার বহু পরিবেশে দেখেছ, অবশ্য আমার চোখ দিয়ে দেখনি, কিন্তু তুমি জানো সে সুন্দরী। অসাধারণ সুন্দরী।

হিন্দুধর্ম, হিন্দু দর্শনের অনেক কিছু আমি এদেশে এসে শুনেছি, পড়েছি কিন্তু তার অল্প জিনিসই আমি বিশ্বাস করতে শিখেছি। তার একটা, জন্মান্তরবাদ। না হলে কি করে বিশ্বাস করি সেই সামাজিক কড়াকড়ির যুগে বিনা মাধ্যমে কি করে আমাদের আলাপ হ'ল, প্রথম দর্শনেই কি করে দুজনার হৃদয়ে একে অন্যের জন্য ভালোবাসা জন্মাল? এ যুদ্ধ বিলেতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, অজানা মানুষের সঙ্গে বিলেতে আলাপ পরিচয় করা এখন আর কঠিন

নয়, তার ধাক্কা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের আন্ডাঘরেও এসে পৌঁচেছে, সে খবর তুমি জানো, কিন্তু সে যুগে দু'দণ্ডের ভিতর এতখানি হৃদ্যতা পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া অন্য কোন স্বতঃসিদ্ধ দিয়ে বোঝানো যায় না।

মেবল আমার কাছে সমুদ্রের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

সে সমুদ্র আমাকে নিদাঘে শীতল করেছে, শীতে আতপ্ত তৃপ্তিতে সর্ব সত্তা ব্যাপ্ত করে ভরে দিয়েছে।

বিলেতে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে সময় লাগে। সংসার চালাবার মত রোজগার করতে করতে বয়স প্রায় ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে যায়। আমার কিন্তু একদিনেরও তর সইছিল না। তাই আমি চাকরী নিলুম ভারতবর্ষে। যে মাইনে প্রথম চাকরীতে ঢুকেই এখানে পাওয়া যায় তাই দিয়ে অনায়াসে দুটো সংসার পাতা যায়। কিন্তু মেবলকে বললুম, 'দাঁড়াও, দেশটা প্রথম দেখে আসি, তোমার সইবে কি না।' মেবল আপত্তি জানিয়েছিল, সে তখন আমার সঙ্গে নর্থ পোল, সেন্ট্রল আফ্রিকা সর্বত্র যেতে তৈরী। আমি কিন্তু তখন তাকে দিতে চেয়েছিলুম এমন কিছু যার জন্য তাকে আমাকে যেন পরে পস্তাতে না হয়। যদি দেখি ভারতবর্ষের বাতাবরণে আমাদের প্রেম তার পরিপূর্ণতা পাবে না, তবে ফিরে যাবো বিলেতে, না হয় বছর কয়েক খেটে সেখানেই সংসার পাতব।

বোম্বাই কলকাতা দু'জায়গাতেই আমার মন কিন্তু কিন্তু করেছিল কিন্তু পাদ্রীর টিলার মোড় ঘুরে মধুগঞ্জে পৌঁছতেই আমার মন থেকে সর্ব দ্বিধা অন্তর্ধান করলো। এ যে আমার আয়ারল্যান্ডের পাড়াগাঁকেও হার মানায়। এই বক্সওলারা কেন যে ভ্যানর ভ্যানর করে মধুগঞ্জের নিন্দে করে আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, বোধহয় করাটা ফ্যাশান, কিম্বা হয়ত ভাবে, না করলে খানদানী সায়েবরা ভাববে ওরা বুঝি নেটিভ। কালা আদমী বনে গিয়েছে।

লন্ডন থেকে মধুগঞ্জ! এর চেয়ে দূরতর পরিবর্তন আমি কল্পনা করতে পারিনে।

সেই মধুগঞ্জে আমি অনেক কিছু পেলুম। ভগবান অকৃপণভাবে ঢেলে দিলেন তাঁর সব দৌলত, তাঁর দাবৎ ঐশ্বর্য। নৌকো বাচ থেকে আরম্ভ করে পাদ্রী টিলার মেয়েগুলি।

ভালোই। এদের কথা উঠলো। তুমি জানো আমি ওদের সঙ্গে ঢলাঢলি করার মৎলব নিয়ে পাদ্রী টিলায় যাইনি, কিন্তু এক জায়গায় আমার আজানাতে আমি একটা ভুল করে ফেলি। প্রাচ্য দেশের মেয়েরা যে এত স্পর্শকাতর হয় আমি অনুমান করতে পারিনি তাই আমি তাদের সামান্যতম গতানুগতিক হৃদ্যতা জানাতেই হঠাৎ দেখি, ওরা দিচ্ছে তরুণীর অকুণ্ঠ প্রেম। আমার আপসোসের অন্ত নেই যে, সে ভালোবাসার ন্যায্য সম্মান আমি দেখাতে পারিনি। আশা করি ওরা জানতে পেরেছে যে, আমি ওদের ফিরিঙ্গি বলে অবহেলা করিনি। আমি জানতুম, তুমি এই বিশ্বাসটি ওদের ভিতর জন্মাতে পারবে তোমার পাকা মুন্সিয়ানা দিয়ে, তাই তোমারই হাতে এটি সঁপে দিয়েছিলুম।

তারপর আমি বিলেত গেলুম মেবলকে নিয়ে আসতে।

এই পৃথিবীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সর্বত্রই প্রতি মুহূর্তে নরনারীর ভিতর প্রেম মুকুলিত হচ্ছে বিকশিত হচ্ছে তার ফল কখনো মধুময় কখনো তিক্ত—এই হল জীবনের দৈনন্দিন, গতানুগতিক ধারা। কিন্তু যদি প্রেমের মেলা দেখতে চাও, প্রেম যেখানে অন্য সব-কিছু ছাপিয়ে উপচে পড়ছে তবে একটিবারের জন্য কোনো এক জাহাজে করে সপ্তাহ তিনেকের জন্য কোথাও চলে যেয়ো। দেখবে কী উন্মাদ অবন্ধন মেলার ফূর্তি সেখানে চলে—ইচ্ছে করেই 'মেলা' বলছি কারণ এ জিনিস দৈনন্দিন নয়। জাহাজের অধিকাংশ নরনারী সেখানে সমাজের সর্ব প্রকার কড়া বন্ধন থেকে মুক্ত, প্রতিবেশীকে ডরিয়ে চলতে হয় না পাছে সে কেলেঙ্কারী কেচ্ছা সর্বত্র রটিয়ে দেয়—জাহাজ মোকামে পৌঁছলেই তো সবাই ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি, কে কাকে জানাতে যাবে, কে কি করেছে? এবং সব চেয়ে বড় কথা, এ তিন হপ্তা মানুষ জীবনসংগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সর্বপ্রকারের দায়িত্ব থেকে পূর্ণ মুক্ত। আহার নিদ্রা আশ্রয়—এ তিন সমস্যার সমাধান হওয়া মাত্রই, তা সে যত সাময়িকই হোক না কেন,—তিন সপ্তাহ কি কম সময়?—মানুষের জাগে আসঙ্গলিপ্সা, যৌনক্ষুধা। সে যেমন বিরাট তেমনি বিকট—স্থল বিশেষে। তাই এ রকম জাহাজে মানুষ এডনিস না হয়েও পায় কার্তিকের কদর, মোনা লিসা না হয়েও পায় ভিনাসের পুজো।

বৃথা বিনয় করব না। আমি জানি আমি কুরূপ কুচ্ছিৎ নই। তাই আমার কাছে তখন বহু হৃদয় অবারিত দ্বার, বহু যুবতী আমার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘন ঘন সাপ খেলাবার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছেন। আর দু'চারটি ভীরু লাজুক তরুণী নির্জনে পেলে ফিক করে একটুখানি হেসে কিশোরী-সুলভ নাতিস্ফীত নিতম্বে সচেতন ঢেউ তুলে দিয়ে জাহাজের নির্জনতর কোণের দিকে রওয়ানা দিত।

কিন্তু আমি তো চলেছি আমার বধূর সন্ধানে। আমার ফিয়াঁসে, যে আমার ব্রাইড হতে যাচ্ছে, আমার বঁধু যে আমার বধূ

হতে চলেছে। প্রপেলারের প্রতি আঘাত আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারই কাছে, এই লক্ষ লক্ষ টাকার জাহাজ, হাজার হাজার টাকার বেতনভোগী কর্মচারীরা এরা সবাই অহোরাত্র খাটছে আমাকেই, শুধু আমাকেই, আমার রাণীর কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। ঝড়-ঝঞ্ঝায় এ জাহাজ ডুবতে পারে না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ পেলেও এ জাহাজ পৌঁছবে মার্সেলেস্ বন্দরে, সেখানে জাহাজ থেকে দেখতে পাবো, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন মেবল যে পোষাক পরে হাইড পার্কে বসেছিল সেই পোষাক পরে বন্দরের পারে দাঁড়িয়ে তার মস্ত্ রঙের রুমাল দোলাচ্ছে।

'ভগবান কোথায়?'—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে। কৃচ্ছ্রসাধনাসক্ত দীর্ঘ তপস্যারত, চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, 'তরুণ তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।' আমার হৃদয় আর মেবলের রুমাল-নাড়ার মাঝখানে থাকবেন স্বয়ং ভগবান।

থাক্, সোম। আগেই বলেছি তোমাকে এ-সব বলা বৃথা। তবু বলছি, কেন জানো। হয়ত বুঝতে পারবে, হয়ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে। অবিশ্বাস্য তো কিছুই নয়, অসম্ভবই বা কোথায়?

(ক্রমশ)

জীবনেতিহাস

মনীষী-জীবনকথা (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ সুশীল রায় ঃ ঃ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী; ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ঃ প্রতি খণ্ড দু'টাকা।

আমাদের এই বাংলা দেশ, এর অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করলে সারা মন গর্বে ভরে ওঠে। চারিত্রে আর চিন্তায়, শৌর্যে আর সংগঠনে বাঙালীর মনীষা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তার প্রতিভার সৌরভ সেদিন সংকীর্ণ কোনো সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে। পরশাসনের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশের মধ্যেও সেই সৌরভ যে এতটুকু ম্লান হয়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীই তার প্রমাণ। চিন্তার বলিষ্ঠতায় এবং জীবনচর্যার প্রকাশে বাংলাদেশ সেদিন এক আশ্চর্য মহিমার সম্পদলাভ করেছিল।

সেই মহিমার ক্ষেত্র থেকে যে আজ আমরা এত শোচনীয়ভাবে বিচ্যুত হয়েছি তার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব ঘটেছে। শ্রদ্ধা নেই, তাই প্রত্যয়ও নেই। প্রত্যয়বিহীন এই শ্রদ্ধাহীন জীবন, পুনরায় যদি একে সেই প্রাক্তন মহিমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তো সর্বাগ্রে সেই শ্রদ্ধাবিনম্র মনোভাবটিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সুশীল রায়ের এই গ্রন্থখানি পড়ে মনে হলো, সে-কাজ শুরু হয়েছে। সুখের কথা, সন্দেহ নেই। গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ডে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীচণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, শ্রীরাজশেখর বসু, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীনীলরতন ধর, শ্রীমেঘনাদ সাহা ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও কর্মসাধনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ'রা প্রত্যেকেই কৃতী পুরুষ, এ'দের মনীষাও সর্বজনস্বীকৃত। এবং সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে, আপনাপন সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙালীর চিন্তা ও মনীষার সংস্কৃতি সাধনাকে যে এ'রা একটি প্রগাঢ় তাৎপর্য প্রদান করেছেন, তাকে একটি বিপুল এবং বলিষ্ঠ সম্ভাবনার ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। জাতীয় জীবনের প্রাণস্পন্দনকে যদি অনুভব করতে হয় তো এই মনীষীদের জীবনেতিহাস পাঠের দ্বারাই সে কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

সুশীল রায়কে ধন্যবাদ, বাঙালী পাঠক-সাধারণ যাতে অনায়াসে সেই জীবনেতিহাসের পরিচয় লাভ করতে পারে, তিনিই সর্বপ্রথম তার সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন। তাঁর এই গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়েই তিনি একটি সৌজন্য-সুন্দর, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর আলোচনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ; তথ্যবহুল, কিন্তু রসস্নিগ্ধ। সর্বোপরি, সেই আলোচনার মধ্যে যে শ্রদ্ধা-বিনম্র চিত্তের পরিচয় পাওয়া গেল, তার কথাও উল্লেখ করবার মতো। তথ্য এবং তত্ত্বের সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, ইতিহাসকে তিনি সাহিত্যের কোঠায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। মহৎকে যারা শ্রদ্ধা করতে জানেন তাদের প্রত্যেকের কাছেই যে এ গ্রন্থ একটি অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হবে, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই।

দু'টি খণ্ডেরই মুদ্রণ-পরিপাট্য লক্ষণীয়। প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাও সুন্দর হয়েছে।

৩২৬, ৫২৫।৫৩

শ্রীমা সারদামণি—শ্রীতামসরঞ্জন রায়। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী লোকপূজ্যা শ্রীশ্রীসারদামণির জীবন-প্রসঙ্গ বর্ণনায় লেখক যে প্রাঞ্জল ও সুন্দর ভাষানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহারই গুণে এই গ্রন্থটি শ্রীশ্রীমা'র জীবন-প্রসঙ্গ সম্পর্কিত সাহিত্যের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মহীয়সীর সাধনাপূত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা লেখক যে এক বিশেষ রীতিতে সাজাইয়া পরিবেশন করিয়াছেন, তাহাতে জীবন-বৃত্তান্ত বস্তুত এক মহাকাহিনীসুলভ প্রসাদগুণে মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা'র মহাজীবনের তত্ত্বকে পাঠকের চিত্তে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অনুভবগ্রাহ্য করিয়া তোলা উচ্চস্তরের শিল্পনৈপুণ্যেরই প্রমাণ। শ্রীশ্রীমা সারদামণির জীবনের ভাবমাধুর্য এবং দিব্যজ্ঞানদীপ্ত মহিমার কথা লেখকের বর্ণনায় কখনো করুণাময় আবেদন কখনো বা উজ্জ্বল রূপণা লাভ করিয়াছে। পুস্তকটিকে সুখপাঠ্য বলিলে অল্প বলা হয়। ইহার মধ্যে একাধারে উচ্চ শিক্ষা এবং শুদ্ধ আনন্দের আস্বাদ সমাবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা'র জীবনের তত্ত্বকে এত প্রাঞ্জলভাবে পরিবেশনের দক্ষতা লেখকেরও আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। দেশবাসীর মন বর্তমানে সুশিক্ষার উপায় সম্বন্ধে অনেক দুশ্চিন্তা করিতেছেন। শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণও এ বিষয়ে উপায় নির্ণয়ের গবেষণা করিয়া থাকেন। আমরা বলিতে পারি, শ্রীতামসরঞ্জন রায়ের লিখিত 'শ্রীমা সারদামণি'র মতো গ্রন্থ জনশিক্ষা এবং সুশিক্ষার পক্ষে একটি আদর্শ সহায়ক গ্রন্থ। কারণ ইহার প্রতি ছত্রে জীবনের শিক্ষাই নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমা'র আবির্ভাব শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীশ্রীমা'র জীবন-সম্পর্কিত সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে; আলোচ্য গ্রন্থটি তাহার মধ্যে সার্থক লিখনকুশলতার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পুস্তকটির মুদ্রণসৌষ্ঠব অত্যন্ত রুচি-সম্মত শিল্পকারুতার প্রমাণ।

স্বদেশী যুগের কথা

স্বদেশী আন্দোলন—(১৯০৫) উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়। শিক্ষাতীর্থ কার্যালয়, ৪০।১ সিকদারবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

১৯০৫ সালের জাতীয় আন্দোলনের একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এ জাতীয় আলোচনার প্রধান বিড়ম্বনা উচ্ছ্বাস ও ভাবালুতা, যাহা আদর্শবাদের মোহে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের অতিরঞ্জিত বা বর্ণবহুল ব্যাখ্যায় আস্থা রাখে বেশি। আলোচ্য পুস্তিকাখানি স্বল্প পরিসরে বাংলার তথা ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের একটি যথার্থ পরিচিতি উপস্থাপিত করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি, তাহার ভাব-ধারার বিবর্তন এবং ইহাকে বিপ্লব বলিয়া চিহ্নিত করা যায় কি না, এই কয়টি প্রতিপাদ্য পুস্তিকার বিষয়বস্তু। লেখক ও লেখিকা উভয়েই ইতিহাসের অধ্যাপক। কাজেই তথ্য সংগ্রহ ভালই হইয়াছে। কিন্তু তথ্য নিরূপণে ও সমালোচনায় তেমন মৌলিকত্বের পরিচয় নাই। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। তিনি যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল স্বাজাত্যবোধে সন্ত্রস্ত হইয়া গঠনমূলক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেশীয় শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কর্মে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ এ গ্রন্থে নাই। ৪৫২।৫৩

জাতি বিচার

বাঙালীর ধর্মনাশ, সামাজিক দুর্দশা ও প্রতিকার—প্রথম খণ্ড। অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী এম এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা।

পুস্তকখানিতে বহুবিধ শাস্ত্র যুক্তি এবং ঐতিহাসিক তথ্য সহযোগে বৈদ্য জাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের অভিমত এই যে, বাঙলার কোন জাতি শূদ্র নহে। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়, সুবর্ণ বণিক গন্ধ বণিক ইত্যাদি বাণিজ্যজীবী জাতিগুলি প্রাচীন বণিকদের সন্তান, সুতরাং বৈশ্য। বাঙলার চাষীরা ও শিল্পীরা শূদ্র নহেন। ইঁহারাও প্রাচীন বৈশ্যদেরই ধারা। বস্তুতঃ আজ যাঁহারা শূদ্র নামে পরিচিত, তাঁহারা কেহই শূদ্র নহেন। অতীতে শূদ্র জাতি ছিল, এখন নাই। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণই ছিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই দুইটি বিশেষণের দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্বর্তী দুইটি পৃথক শ্রেণী বুঝাইত। লেখক বলেন, বর্তমানে প্রাচীন সে আর্য জাতি নাই; সুতরাং প্রাচীন কোন বর্ণ বা জাতিও নাই। এখন আমরা সকলেই হিন্দু এবং ধর্মে ব্রাহ্মণ। গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের আবির্ভাব না হইলে তাঁহার অনির্বচনীয় দয়া, আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা না পাইলে সমগ্র বাঙালী জাতি বোধ হয় মুসলমান হইয়া যাইত।"

পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় স্বাজাত্যানুরাগ, স্বদেশ-প্রীতি এবং মানব মর্যাদা বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৪৫।৫৩

অনুবাদ গ্রন্থ

চীনের কৃষক জমি ফিরে পেল—শিয়াও চি-য়েন। অনুবাদক বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী। কোয়ালিটি পাবলিশার্স, ৮৪।২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি অনুবাদ-গ্রন্থ হলেও মূলের আস্বাদ ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বজায় রাখতে পেরেছে, এটি কৃতিত্বের কথা। আমাদের নিকট প্রতিবেশী চীনদেশে যে মস্ত বড় বিপ্লব হয়ে গেল এবং তারি ফলে সেখানে যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা হল, একথা সবাই জানেন। কিন্তু সমস্ত প্রথার উচ্ছেদের পরে বহুদিন-ব্যাপী পীড়িত কৃষক-সম্প্রদায় কেমন করে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাদের হারানো জমি পুনরধিকার করল, বর্তমান গ্রন্থে তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। ১৯৫০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিরাট ভূমি-সংস্কার ও ভূমি-বণ্টন আরম্ভ হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে, সুশিক্ষিত মানবকর্মীদের অক্লান্ত নিষ্ঠায় যে 'টেক নিকালা' বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং বাস্তব কৃষি-উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। [illegible] প্রকাশিত পুস্তকের এই বঙ্গানুবাদ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিশেষ কাজে লাগবে। ৪৩৫।৫৩

জীবনী

THOMAS JEFFERSON : By Gene Lisitzky. Indian University Publishers, Kashmere Gate, Delhi-6. Price Re. 1 8 as.

যে কোন জাতির স্রষ্টা ইতিহাসে তাঁর স্বাক্ষর রেখে যান। কিন্তু যে মানুষ নির্ভীক সত্যনিষ্ঠায় বাধাবিপত্তি ভ্রূক্ষেপ না করে জাতীয় জীবনকে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। জেফারসন ছিলেন এমনি এক চিন্তা-নায়ক ও কর্মবীর। যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় সভাপতি জেফারসন কেমন করে স্বরাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা সাধন করেন, নানাবিধ বিরোধ ও প্রতিক্রিয়া জয় করে উদারধর্ম, সহনশীল নীতি এবং কায়মনোবাক্যে স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনা করেন, সে কাহিনী বর্তমান পাঠক সমাজেও সমাদৃত হবে। চিন্তায় ও কর্মে যিনি যুক্তরাষ্ট্রের তথা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পুরোধা, তাঁর জীবনীর মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি পরম প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন করে লেখা হয়েছে এ বইখানিতে। ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ পাঠক বর্গ এ গ্রন্থ পড়ে সত্যই উপকৃত হবেন। ৪৪০।৫৩

ধর্মগ্রন্থ

জপসূত্রম্—শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্, কারিকা,সম্বলিতম্। তৃতীয় খণ্ড। শ্রীকালীপদ মৈত্র কর্তৃক ৭৭, যতীন দাস রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫, টাকা।

স্বদেশী-যুগে বাঙলার সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের যাঁহারা উদ্বোধন করেন তাঁহাদের মধ্যে ডক্টর প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় অন্যতম অগ্রণী। তন্ত্রশাস্ত্রের নিগূঢ় মাহাত্ম্য উন্মুক্ত করিয়া তিনি এদেশের আত্মচেতনাকে সংহত করিয়া সমাহিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি লোকলোচনের অন্তরালে থাকিয়া নিগূঢ় সাধনায় আত্মসমাহিত হন। অধুনা তাঁহার এই সুদীর্ঘ তপস্যালব্ধ অমৃতের ভাণ্ডার তিনি আমাদের জন্য উন্মোচন করিয়াছেন। তাঁহার বিরচিত 'জপসূত্রম্' এই অমৃতের ভাণ্ডার। অক্ষয় অব্যয় রসের ধারা ইহা হইতে উৎসারিত হইতেছে। আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। জপ সাধনার মর্মীভূত আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধির গতি এবং রীতি অত্যন্ত নিগূঢ়। এমন বিষয় ভাষায় পরিস্ফুট করা খুবই কঠিন। তিনি সহজে প্রকাশ করিয়াছেন, শুধু তাঁহার পক্ষেই সে সব কথা স্পর্শ করিয়া বলা সম্ভব। সে দৃষ্টি ঋষির দৃষ্টি; ফলতঃ প্রজ্ঞা প্রভাবেই সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দজী ঋষিকল্প এমন প্রজ্ঞারই অধিকারী। তাঁহার আলোচনায় কোথাও কিছু অস্পষ্ট নাই, সবই সর্বাবয়বের মত সুস্পষ্ট। তিনি যে প্রণালীতে বিজ্ঞানীর ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থখানি সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ হইলে অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান বিশ্বমানবের এক অপূর্ব বস্তু হইবে। জগতের কোন সাহিত্যে এমন জিনিস আছে বলিয়া জানা যায় না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতাচার্য গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় গ্রন্থের ভাবগর্ভ ভূমিকায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট করিয়া স্বামীজীর এই বিরাট এবং বিশাল অবদানের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা পাঠে পাঠকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সংক্ষেপের মধ্যে সম্ভব নয়, গ্রন্থকার ভারতের সমগ্র অধ্যাত্ম শাস্ত্র মন্থন করিয়া সুনিশ্চিতভাবে সত্যের নির্ণয় করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ভাবধারার মধ্যেও ভারতের আধ্যাত্মিক সত্যের সার্থকতা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এইসব জটিল এবং দুরূহ বিষয়ের আলোচনা সাধারণের পক্ষে হয়ত শুষ্ক এবং নীরস মনে হইতে পারে, কিন্তু আদৌ তাহা নয়। এইখানে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের আলোচনার বিশেষত্ব। তন্ত্রের সাধনা রসেরই সাধনা। যুগলতত্ত্বের সেখানে উপাসনা। এই আলোচনায় রসের রীতি উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে সূত্র, কারিকা এবং ব্যাখ্যার অনুধ্যান করিলে জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রেই পরম আনন্দ লাভ করিবেন। সে আনন্দের ছন্দ গভীরভাবে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়া মর্মার্থে অনুপ্রবিষ্ট করাইবে। বৈষ্ণব এই আলোচনার মধ্যে ভাগবতের রসের উৎসের সন্ধান পাইবেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস, কবিরাজ গোস্বামী বিশেষভাবে শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং নরোত্তমের রসের অপরূপ মাধুর্য তাঁহাদের আবিষ্ট করিবে। শাক্ত এই আলোচনায় দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত, চণ্ডীর সারতত্ত্ব এবং রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃসাধকবর্গের উদ্গীতি অমৃতরস আস্বাদনে উল্লসিত হইবেন। শুধু এক জপের দ্বারাই যে সকল সাধনার সাধ্যতত্ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এ সম্বন্ধে মনে কোন সংশয় থাকিবে না। অধ্যাত্ম-রাজ্যের অচিন্ত্য বিভবের অধিকারী হইবার পথ ইহাতে সুগম হইবে। সাধক জপশক্তির প্রভাবে প্রাণকে হৃদয়ে অর্থাৎ মধ্যমায় অনুপ্রবিষ্ট করিতে সমর্থ হইলে শব্দ হইতে ঝঙ্কার ফোটে,—স্বরস্ফোট। ছন্দরূপ সুপর্ণ শ্রীভগবানের মুখপদ্ম নীড়ে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেয়—জ্ঞানশক্তি অপ্রতিহত বেগে ষট্চক্র ভেদ করিয়া একেবারে সোজা উপরে লইয়া তোলে। পথের বাধা, জটিল কুটিল নাগপাশ ছুটিয়া যায়। কুলকুণ্ডলিনী এ পথে সহজে জাগেন।

তথাপি এই অবস্থা লাভের পথে অনেক অন্তরায় আছে। মায়ার খেলা নানাভাবে চলে। গ্রন্থকার পুনঃ পুনঃ সে সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন এবং জপের পথের ধ্রুবা গতিতে মনকে নিষ্ঠিত রাখিয়া পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম জপের ভিতর দিয়া সত্তাকার পথে চলিলে এই ভূতপ্রকৃতির শুদ্ধির রীতি কি তিনি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

আমরা তাৎপর্য মাত্র দিবার চেষ্টা করিলাম। গ্রন্থখানি পাঠ, শুধু পাঠের দ্বারাই এ মন্ত্র গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। গ্রন্থকার স্বামীজী বিভিন্ন মন্ত্রবীজের বিশ্লেষণ করিয়া শব্দার্থের অভিব্যক্তিতে এই শক্তির রস-বিস্তারের রীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বিভিন্ন বর্ণ, কিভাবে সুষম ছন্দে শিবশক্তির আনন্দলীলাকে মন্ত্রের ভিতর নাদে পরিস্ফুর্ত করিয়া তোলে এবং বহুভাবকে চিদাকার দিয়া একই মহাভাব বা প্রেমকে উন্মুক্ত করে, তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ প্রাকৃত জগতে আমরা দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতস্বরূপে দেখিতেছি, জপের প্রভাবে মনকে সুষম ছন্দের রাজ্যে লইতে পারিলে তাহাতে শিব-দুর্গারই আনন্দলীলা উপলব্ধি হইবে, এই সত্য তিনি দীপ্ত করিয়াছেন। অনলসভাবে সাধনা না করিলে সন্তায় কিস্তি মাৎ করা যায় না, একথা তিনি বারম্বার বলিয়াছেন। 'কৃপা'র ব্যাখ্যা—কৃ কর, পা রক্ষা করিব, পাকেই। কৃপার তিনি এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শুদ্ধা শক্তির ইহা ক্রিয়া—কিন্তু প্রমাদ আলস্য, নিদ্রা গুরুকৃপায় থাকে না। সাধনার জন্য বীর্য জাগে। গুরুকৃপার ক্ষত গতিকে তিনি যেভাবে অভিব্যক্তি দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। নামের মহিমা তিনি যে ভাষায় কীর্তন করিয়াছেন, তাহা বিরল। প্রকৃতপক্ষে "জপসূত্রম্" ভারতের ঋষিপ্রদর্শিত অধ্যাত্ম সম্পদের অক্ষয়স্বরূপ। ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে মণিমাণিক্যের ছটার উজ্জ্বলতা রহিয়াছে। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যালব্ধ সম্পদের সত্র এখানে উন্মুক্ত করিয়াছেন। অধ্যাত্মরস-পিপাসু চিন্তাশীল সমাজ এই সত্র হইতে অশেষ সম্পদ আহরণ করিয়া উপকৃত হইবেন এবং কৃতার্থতা লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

কোর আন্ পরিচয়—উদ্বোধন খণ্ড। ইমামে আওয়ালুদ্দীন আলী কর্তৃক প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স, ১।১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৵০ আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে কোর-আনের সুরা আল ফাতেহার মর্মকোশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ১১৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ কোর-আনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক ব্যাখ্যা বাঙলা ভাষায় দেওয়া প্রকাশকের অভিপ্রায়। ব্যাখ্যা পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। ব্যাখ্যাতা বাঙলা এবং আরবী উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত। দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ব্যাখ্যার পদ্ধতিটি বড়ই সুন্দর। ৫১১।৫৩

ছোট গল্প

মনের পটে অমর ছবি—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় (দাদুভাই)। গ্রন্থ-জগৎ, ৭-জে, পন্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—১৯।

ছোট্ট বাইশ পৃষ্ঠার বই। পাঁচটি ক্ষুদ্রকায় গল্পের সমষ্টি। এর মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ, এ দুটি গল্পের সত্য ভিত্তি। বাকি তিনটি মন-গড়া কাহিনী। অকিঞ্চিৎকর গল্পের তুলনায় নামটি বেশি জাঁকালো।

বিবিধ

INDIAN ECONOMY: As Revealed in the Five Year Plan. অজিত রায়। এস্ সি সরকার এন্ড সনস্ লিঃ, ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্ল্যানিং কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যা ও মন্তব্য একত্র করাই এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য। গ্রন্থখানি সংকলন জাতীয় রচনা। লেখক আপনার মতামত প্রকাশ করেন নাই। সমালোচনার অংশগুলি পরিকল্পনা সমিতির ভাষ্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এ বইখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইবে। ভারতের অর্থনীতি সংক্রান্ত বহু বিষয় ও নূতন তথ্য কমিশন আলোচনা করিয়াছেন। এগুলি পড়িলে ছাত্রছাত্রীদের উপকার এবং মৌলিক চিন্তার উদ্বোধন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৪৪১।৫৩
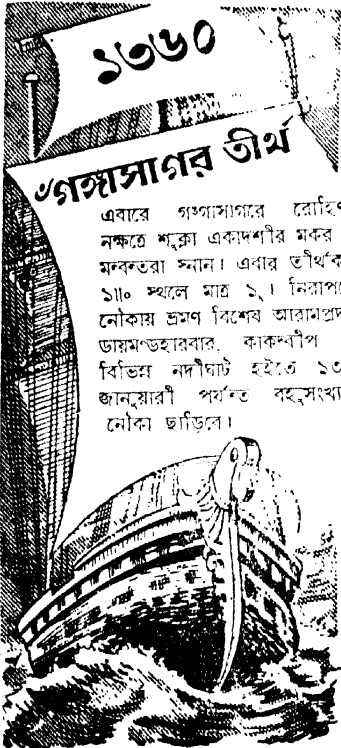
পাটের কথা: অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এ মুখার্জি এন্ড কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

দেশের ছেলেমেয়েরা আজকাল অনেক কিছু শেখে ও শিখছে। কিন্তু বাঙলাদেশ যে দুটি প্রধান শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ, সেই ধান ও পাটের কথা তারা অনেকেই জানে না। নাম দুটি নিশ্চয়ই তারা শুনেছে কিন্তু এ শস্যের চাষ, তার কৃষি-কর্মের ইতিহাস, তার আর্থিক মূল্য ও উপকারিতা, এ সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা দূর করার জন্যই গ্রন্থকার এই সুলিখিত বইখানি প্রকাশ করেছেন। বইখানি সত্যই সুন্দর, কি লেখায় কি ছাপায়। ছোট ছেলেমেয়েদের এ বই উপহার দেওয়া চলবে অনায়াসে এবং মনে হয় শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভাষা অতি সহজ ও সুবোধ্য। ছবিগুলিও মনোরম। ৪২৮।৫৩

চলতি পথে—শ্রীমৃণালকান্তি বসু প্রণীত। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিমিটেড, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ আনা।

গ্রন্থকার সংবাদপত্রসেবী এবং শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্বরূপে সুপরিচিত। তিনি আলোচ্য পুস্তকখানিতে ব্যক্তি জীবনকে ভিত্তি করিয়া আমাদের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যাসমূহের স্বরূপ নির্ণয় এবং সেগুলির সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনায় সমগ্র-ভাবে বাঙগালী জাতির বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। ব্যক্তিকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থকার জাতির পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন নাই, কিংবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা আমাদিগকে শুনান নাই। দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সম্বন্ধে বন্ধুর মত তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ তিনি পুস্তকখানিতে দিয়াছেন। এ আলোচনা প্রধানত নৈতিক। সংযম, সৌজন্য, সদাচার, তিতিক্ষা, সাহস, আত্মপ্রত্যয়, এইগুলি পালন করিয়া চলিলে আমাদের জীবনের অনেক সমস্যারই সমাধান হয় এবং সেগুলি পালন করাও যে সুকঠিন নহে বরং সাংসারিক ও পারিবারিক দিক হইতে নিজেদের স্বার্থের পক্ষেও সুবিধাজনক, গ্রন্থকার এই সত্যটি ব্যাপকভাবে আলোচনার ভিতর দিয়া সহজ ভাষায় এবং সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই উপকৃত হইবেন। ৫৪২।৫৩

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি "দেশ" পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ধম্মপদং—মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী। ৫৪৬।৫৩

এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা—স্বপনবুড়ো। ৫৪৭।৫৩

NEW HUMANISM—M. N. Ray.

The Philosophy of Union by Devotion—Srimat Swami Nityapadananda Abadhuta. ৫৪৯।৫৩

শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য পরিচয়—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য। ৫৫১।৫৩

কালটু গুলটু—মৌমাছি। ৫৫২।৫৩

দর্পিতা—অনুবাদক শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। ৫৫৩।৫৩

রাজোয়ারা—দেবেশ দাশ। ৫৫৪।৫৩

শুকসারী—সন্তোষকুমার ঘোষ। ৫৫৫।৫৩

সহজ জ্যোতিষ (ছেলে মানুষে করার সোজা উপায়)—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৫৫৬।৫৩

মহামানব—সাবর্ণি। ৫৫৭।৫৩

সংক্ষিপ্ত প্রবাস রত্নাকর—শ্রীসত্যরঞ্জন সেন। ৫৫৮।৫৩

মনোলীনা—প্রতিভা বসু। ৫৫৯।৫৩

অফুরন্ত—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ৫৬০।৫৩

কন্যা—অন্নদাশঙ্কর রায়। ৫৬১।৫৩

কলিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। ৫৬২।৫৩

গণ্ডূষ—জ্যোতিকুমার। ৫৬৩।৫৩

গ্রহরত্নের কথা—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ৫৬৪।৫৩

প্রতিবেশী—শ্রীঅনিল সেন। ৫৬৫।৫৩

আজন্ম—শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ৫৬৬।৫৩

ঢেউ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৫৬৭।৫৩

শ্রীশ্রীমা—শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫৬৮।৫৩

গঠনকর্ম ও গঠনকর্মীর প্রাণধর্ম—শ্রীসুজনকুমার দত্ত। ৫৬৯।৫৩

স্বাধীন ভারত ও নাগরিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি—শ্রীচিত্তানন্দ আচার্য। ৫৭০।৫৩

স্বপ্নশেষ—বনমালী অধিকারী। ৫৭১।৫৩

ভাঙ্গো ভাঙ্গো শৃঙ্খল—শ্রীবিমল সেনগুপ্ত। ৫৭২।৫৩

ট্রামে-বাসে

ইংরেজী ১৯৫৪ সালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য মন্ত্রীদের আশ্বাসের কথা মনে পড়িতেছে। জনাব কিদোয়াই বলিয়াছিলেন, উৎকৃষ্ট চাউল ১৯৫৪ সাল হইতেই সহজপ্রাপ্য হইবে। শ্রীযুত সেনের গণনায় উৎকৃষ্ট চাউলের আবির্ভাব কাল ১৯৫৫। বিশু খুড়োর বিশুদ্ধ পাঞ্জিকামতে আবির্ভাব কাল ১৯৯৯ সালের ১লা এপ্রিল, বেলা ১১টা, ৪৯ মিনিট, ৪৯ সেকেণ্ড গতে। কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রীযুত নেহরু অবশ্য সমস্ত ব্যাপারে জ্যোতিষের উপর নির্ভর করাকে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে তিথি-নক্ষত্র এখনও সরকারী স্বীকৃতি পাইতেছে বলিয়াই আমরা বিশু খুড়োর গণনার উল্লেখ করিলাম। যদি তাঁর গণনা নির্ভুল হইয়া থাকে, তাহা হইলে নববর্ষের শুভ
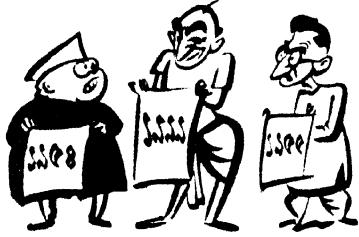
কামনা আমরা ১৯৯৯ সালের জন্যই তুলিয়া রাখিতেছি। গৃহিণীরা ততদিন পর্যন্ত যদি রন্ধনরূপ প্রাগৈতিহাসিক প্রথাটি ভুলিয়া না যান, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যাকাশ আস্কে পিস্টকে সমুজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা। সেই সুদিনের জন্য অস্টরম্ভা হাতে নিয়া অপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে অন্য কিছু বরণীয় এবং প্রার্থনীয় বোধ হয় আর নাই!!

* * *

পাক্-আমেরিকান সামরিক চুক্তির কথা শুনিয়া আমাদের প্লীহা স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ মাভৈঃ উচ্চারণ করিলেন পাকিস্থানের প্রধান উজীর সাহেব। তিনি বলিয়াছেন, শক্তিশালী পাকিস্থান ভারতের সীমান্ত রক্ষায় সক্ষম হইবে।—"মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে, তেমন দরদীর সন্ধান আমরা এতদিনে পেলাম"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্য দানের জন্য আমেরিকার কাছে কে প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে জনাব মহম্মদ আলী সরাসরি কোন উত্তর না দিয়া বলিয়াছেন যে, যিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহার নামের আদ্য অক্ষর 'ন' (N)—আমাদের শ্যামলাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—'নিশ্চয় নষ্টামি'!!

* * *

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন, শিক্ষা-দানের ব্যাপারে Right type of people-কে নিয়োগ করিতে হইবে।—"কিন্তু Left type নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি হবেন না" বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ অন্য এক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের যা আদর্শ ছিল, কংগ্রেসসেবীদিগকে আবার সেই আদর্শই অর্জন করিতে হইবে।—"কিন্তু হাত একবার পাকা হয়ে গেলে আদর্শ-লিপি মক্‌শ করার আর কোন মানে হয় না"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় শেখ আবদুল্লাকে যে ডক্টরেট উপাধি দান করিয়াছিলেন, সংবাদে শুনিলাম, উহা নাকি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।—"শেখ আবদুল্লা নিশ্চয়ই কালীঘাটের কুকুরের জন্ম ইতিহাস জানেন না, জানা থাকলে লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়কে অন্তত সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, বোম্বাইতে নাকি আত্মহত্যার হিড়িক লাগিয়া গিয়াছে।—"এটা নির্ঘাৎ পান বর্জন আইনের ফল" জনৈক সহযাত্রী এই মন্তব্য করিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতায় ঘোড়দৌড় সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী ব্যবস্থাটার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মন্তব্য করিলেন—"তদন্তের প্রয়োজন আছে বৈকি, বেটারা টানাটানি করে লুটেপুটে খাচ্ছে, আর আমরা ঘোড়ার কাজ-কর্ম দেখে বেট্ করতে গিয়ে হেরে ঢোল হচ্ছি"!!

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, জ্ঞানার্জনের কোন বাঁধা

সড়ক নাই।—"নেই বলেই তো এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় চলতে গিয়ে খালি হুমড়ি খেয়ে মরছি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ময়ূর সিংহাসনটি ভারতে ফিরাইয়া আনা সম্ভব কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুত মালব্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, খুব সম্ভব ময়ূর সিংহাসনের অস্তিত্ব আর বর্তমানে নাই।—"হয়ত তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়, বায়সের প্রয়োজনে ময়ূর হয়ত তার সমস্ত পাখা দান করে বর্তমানে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে"।

চক্রদত্ত

শিশু যখন অসময়ে 'ক্ষিদে পেয়েছে' বলে বায়না ধরে, তখন তাকে নানা আবোল-তাবোল প্রশ্নে কিছুটা অন্যমনস্ক করার চেষ্টা হয়। তখন হয়তো শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়—ক্ষিদে কোথায় পায়? এ প্রশ্নে শিশু ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে থাকে, উত্তর খুঁজে পায় না। শুধু শিশু নয়, যিনি প্রশ্ন করেন, হয়তো তিনিও এর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন না। সাধারণভাবে সকলেই বলি, পেটে ক্ষিদে পায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মস্তিষ্কের নীচে হাইপোথ্যালামাস নামে একটি জায়গায় ক্ষুধার অনুভূতি জাগে। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, এই হাইপোথ্যালামাসের একটি অংশ খাওয়ার ইচ্ছাটা অনুভব করে, আর একটি অংশ এই ইচ্ছাটি নিয়ন্ত্রণ করে। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, হাইপোথ্যালামাসের ইচ্ছাকারী অংশটি নষ্ট হয়ে গেলে খাওয়ার কোনও ইচ্ছা থাকে না। সাধারণভাবে অন্যান্য সব আচরণ ঠিক থাকে, শুধু কোনও সময় খেতে চায় না। আবার ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রণকারী অংশটি নষ্ট হয়ে গেলে সব সময় খাওয়ার ইচ্ছা হয়, আর অনবরত খেয়ে খেয়ে ক্রমে ক্রমে মোটা হয়ে যায়। আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে পরিমাণ কার্বো-হাইড্রেট্ থাকে, সেইটাই হাইপোথ্যালামাসে গিয়ে তাকে কার্যক্ষমতা দেয়।

*

আধি ও ব্যাধির মধ্যে অতিনিকট সম্বন্ধ। বহুদিন ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে থাকতে থাকতে মনের ওপর একটা ভয়ানকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, আবার মনের রোগে বেশীদিন ভুগলেই দেহে কোনও ব্যাধি দেখা দেয়। মনোবৈজ্ঞানিকরা বলেছেন যে, দৈহিক পরিশ্রমে মানুষ যে পরিমাণে ক্লান্ত হয়, মানসিক চিন্তায় তার চেয়ে কোনও অংশে কম ক্লান্তি আসে না। এঁরা টেলিভিসন পর্দায় ফেলে মনের গতিবিধি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, মানসিক চিন্তা থেকে ক্রমে ক্রমে দেহে নানারকম রোগ ধরে। মানসিক চিন্তা থেকে বিশেষত, ব্লাড্ প্রেসার, করোনারী থ্রম্বসিস্, আর সেপটিক আলসার হয়। রোগী যদি নিজে টেলিভিসন পর্দায় নিজের মনের ছবি দেখতে পায় এবং শরীরের কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, লক্ষ্য করতে পারে, তাহলে নিজেই চেষ্টা করে নিজের চিন্তাজাল থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করবে।

*

ছোটখাট পিক্‌নিকে-এ বিরাটভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন না করে চাএর সঙ্গে সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা করলে বেশ ভালই লাগে। সব কিছুর জোগাড় বেশ স্বচ্ছন্দে হয় শুধু মুশকিল

পিক্‌নিক্ স্টোভ

হয় চা করা নিয়ে। ফ্লাস্কে চা নিয়ে গেলে কেমন একটা বোট্‌কা গন্ধ হয়ে যায় আবার তখনই চা তৈরী করে খাওয়াও তো বিপর্যয় কান্ড। কিসে জল গরম হবে তাই হয় সমস্যা। যদি বা একটা স্টোভ সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় তাও জ্বালানো মুশকিল; হয়তো হাওয়ার জন্য বারে বারে নিভে যাবে। আজকাল যে নতুন রকম ভাঁজা স্টোভ বার হয়েছে তাতে আর এসব কোনও অসুবিধাই ভোগ করতে হয় না। স্টোভটি ভেঁজে ফেললে লম্বায় ৫ ইঞ্চি আর চওড়ায় ৪½ ইঞ্চি, ১½ ইঞ্চি উঁচু হয়। স্টোভটির সঙ্গে এমন একটা বন্দোবস্ত করা আছে যে, ভাঁজটা খুলে দিলেই দুপাশে দুটো দেওয়াল মত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় ফলে স্টোভ ধরাবার সময় হাওয়ার দরুণ কোনও অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। স্টোভটা সম্পূর্ণ খোলার পর পরিধি নেহাৎ কম হয় না। তখন এর ওপর বেশ বড় একটা পাত্র বসিয়ে চা-এর জল গরম করে নেওয়া যায় কিংবা ফ্রাইং প্যানও চাপান যায়। স্টোভটা পেট্রলে জ্বলে। সাধারণ স্টোভের মত এতে পাম্প দিতে হয় না। মাত্র চার আউন্স পেট্রলে এটা দেড় ঘণ্টা জ্বলতে পারে।

*

পেটের আলসার রোগে যারা খুব বেশী ভোগেন তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুবই অসুবিধা হয়। এঁদের ভালো ভালো রান্না খাদ্যের প্রতি খুব লোভ থাকলেও খেতে পারে না। জনৈক ডাক্তার এদের এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য একটি ওষুধ বার করেছেন। আলসার রোগী এই ওষুধের বড়ি খেয়ে তারপর সাধারণভাবে যে কোনও রকম খাবার খেলেও তার কোনও ক্ষতি হবে না। দিনের বেলা প্রতি চার ঘণ্টায় একটা করে আর রাতে দুটো করে এই বড়ি খেতে হয়। যেসব উপাদানে এই বড়ি তৈরী হয় তার মধ্যে এ্যাট্রোপিন আর ফেনোবারবাইটাল স্নায়ুকেন্দ্রকে শান্ত রাখে আর ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ও এ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড পেটের মধ্যে যে অম্লতা উৎপন্ন হয় সেটা নষ্ট করে। এই বড়ি খেয়ে এক হাজারের মধ্যে ৯২৯ জন রোগী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ খাদ্য খেতে পেরেছে। আর এদের মধ্যে ১০[illegible] জনের প্রায় আড়াই বছর বাদে আবার আলসার হয়।

*

এ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ঝড়তি পড়তি মাল দিয়ে যে ওষুধের বড়ি তৈরী হয় সেগুলি কোলাইটীস রোগের পক্ষে খুব উপকারী। এই বড়িগুলি খেলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় আর রক্তের মধ্যে লাল রক্ত-কণিকা বাড়িয়ে তোলে। এতদিন গবাদি পশুর ওপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, বর্তমানে মানুষের ওপরও এই ওষুধটি প্রয়োগ করার জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে। অরিও মাইশিন, টেরামাইশিন, স্টেপ্টোমাইশিনের ঝড়তি পড়তি থেকেই এই ওষুধটি তৈরী হচ্ছে।

ছবির নামে ছ্যাবলামি

ছবি তৈরী করা ব্যাপারটা আজকাল একেবারেই ছেলেখেলার সামিল করে তোলা হচ্ছে। বাজার খারাপ বলে কম খরচে কাজ শেষ করতে গঠন-পারিপাট্য, আখ্যানবস্তুর সঙ্গতি এবং রুচি ও শালীনতার সব কিছুও হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার মতো দিনকাল যে কখনো আসতে পারে, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েকখানি বাঙলা ছবি দেখলে তাই মনে হয়। এই তালিকারই একখানি ছবি "অদৃশ্য মানুষ"। অদৃশ্য শুধু গল্পের মানুষই নয়, ছবিখানি যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁরা সকলেই এ এ বি পিকচার্স নামের অন্তরালে নিজেদের অদৃশ্য করে রেখেছেন। অভিনয়শিল্পীদের প্রায় সকলেই সুপরিচিত এবং তাঁদের পর্দায় দেখেই চেনা যায়। এই কারণেই কেবলমাত্র তাঁদেরই নাম প্রকাশ করা হয়েছে, নয়তো ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও অন্য কোন বিভাগের কোন কর্মীরই নাম প্রচার বিজ্ঞাপনে, এমন কি টাইটেলেও লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, গঠনকারীরা নিজেরাই বুঝেছিলেন, কি জঘন্য বস্তু তাঁরা পরিবেশন করতে যাচ্ছেন এবং সেই বস্তুর সঙ্গে নামটা জড়িয়ে রাখাটা তাঁদের নিজেদের কাছেও লজ্জাকর বলে মনে হয়েছে। শুধু তাই নয়, অভিনয়-শিল্পীরা ছবিতে আছেন এবং যার যা নামে, অর্থাৎ ভানুকে দেখা যায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নামের চরিত্রে; সাবিত্রী, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতারা সবাই রয়েছেন যার যা নাম নিয়ে। অর্থাৎ ছবিখানি যাঁরা তৈরী করেছেন, তাঁরা লোকের মনে এই ধারণা স্পষ্ট করে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ছবিখানিতে যা আছে, তা করেছে ঐ ভানু-অজিত-জহর-সাবিত্রী-যমুনাদের দলই, অন্য কেউ তার জন্যে দায়ী নয়। এইভাবে শিল্প সাহিত্যরস ও রুচিবর্জিত নির্জলা ছ্যাবলামি ও বেলেল্লাপনার এমন দৃষ্টান্ত পরিচয় "অদৃশ্য মানুষ-"এ ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা স্পষ্টতায় ও মুখরতায় "খিড়কী" জাতীয় ছবির বড়দা স্থানীয় বললেও যেন কম বলা হয়।

* * * *

—শৌভিক—

একেবারে মা-বাপ অভিভাবকহীন "অদৃশ্য মানুষ" এমন সব কাণ্ড দেখিয়েছে যে, সেন্সরের নীতিতে সেসব যে ছাড়া পেয়েছে, সেটা বিশেষভাবে বিস্ময়কর; আরও বিস্ময় লাগে এই ভেবে যে, এই সেন্সরের হাতেই মা আর শিশুপুত্রের আদরে আপত্তি ওঠে অথচ একদল কলেজের ছেলেমেয়ের পাল্লা দিয়ে 'ফ্লার্ট' করে যাওয়াটা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন এবং সর্ব-সাধারণের কাছে পরিবেশনযোগ্য ছবি বলে সসম্মানে ছাড়পত্র পেয়ে যায়! ছবির যেমন কোন অভিভাবক নেই, তেমনি ছবিতে যে সব চরিত্র দেখা যায়, তাদের মধ্যে অভিভাবক দেখা যায় মাত্র দুটি মেয়ের ক্ষেত্রে এবং তাও এমন অভিভাবক, যার মতে তরুণী মেয়েদের বেশি রাত করে বাড়ী ফেরাই উচিত। হাসির ঘটনার মধ্য দিয়ে

আগতপ্রায় "প্রফুল্ল"-তে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যারাণী

সবই ঠাট্টা করে বলা হয়েছে একথা সত্যি; যাকে বলে রগড় করা, কিন্তু এমনি রগড় যা দেখতে দেখতে তরুণ-তরুণীদের কানের পাশ গরম করে দেবে। ভানু হচ্ছে এ গল্পের নায়ক। চেহারায় হ্যাংলা, আচরণে ক্যাবলা, কিন্তু পড়াশুনায় ফার্স্ট। গ্রামের পাগলাটে এক বৈজ্ঞানিক মামার কাছে সে থাকে; ওদের দেখাশুনো করে বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবুদা। বাড়িওয়ালা নবদ্বীপ হালদার তার বারো বছরের মেয়ে পুঁটু-রাণীকে সঙ্গে নিয়ে তাগাদা করতে এসে শাসিয়ে যায় এই বলে যে, হয় বাড়িভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হোক, আর নয়তো পুঁটু-রাণীর সঙ্গে ভানুর বিয়ে দেওয়া হোক। এই অবস্থায় ভানু আই এস-সিতে ফার্স্ট হয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এলো পড়াশুনা করতে। এর পরেই আরম্ভ হলো বে-লাগাম কথাবার্তা ও আচরণ এবং শেষ পর্যন্ত যাকে বলে কাতুকুতু দিয়ে হাসানো প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে নয়, একেবারে স্পষ্ট প্রকাশ্যভাবে।

* * *

ভানু এসে উঠলো কলেজ হোস্টেলে। ওর কামরার সাথী তোতলা পশুপতি কুণ্ডু, আর প্রেমবাতিক রোমিও, সমীর-কুমার। এদের বিপরীত দলে রইলো অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, অরুণ চৌধুরী, অনুপকুমার ও পাপু মুখার্জি। ফার্স্ট বয় ভানুকে জব্দ করাই এদের লক্ষ্য। ভানু অবশ্য দৈহিক পরাক্রমে না হোক, বোলচালে এদের প্রায় দাবিয়েই রেখে চলে, ফলে ভানুর ওপর ওদের ঈর্ষা ও আক্রোশ বাড়তেই থাকে। তার ওপর কলেজের ব্যাপার। ক্লাসের বাইরে একধারে দাঁড়িয়ে ছেলেরা, আর একধারে মেয়েরা—এদের মধ্যে আছে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ, নমিতা চট্টোপাধ্যায়, শিখা-রাণী বাগ প্রভৃতি। ছেলেরা মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে, আর মেয়েরা কল্পনা করছে কার ওপরে মন বসাবে তাই নিয়ে। বেশ খানিকটা চোখ ঠারা-ঠারি। মেয়েদের অবশ্য সবায়েরই লক্ষ্য ফার্স্ট বয় ভানুর ওপরে। তারপর দেখা গেলো, সাবিত্রী ভিড়িয়ে নিয়েছে ভানুকে, যমুনা সিংহ বাগিয়েছে জহর রায়কে, নমিতা চট্টোপাধ্যায় অমনিধারা আর একজনকে, এমন কি শিখারাণীও দেখে শুনে ডেকে নিলে পশুপতি কুণ্ডুকে। এইভাবে যে যার যাকে নির্বাচন করে নিলে।

* * *

ওদিকে গ্রামে ভানুর মামা গেলেন মারা। নবদ্বীপ এলো দেবুর কাছে সেই পুঁটুরাণীকে নিয়ে, এখনও সেই কথা, হয় পুঁটুর সঙ্গে ভানুর বিয়ে দাও, নয় তো ভাড়া চুকিয়ে দাও। দেবু বাড়ি ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু নবদ্বীপ লোকজন নিয়ে এসে পড়ায় সেটা সুবিধে

উদ্ধার করে হোস্টেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হোস্টেলে ফিরতে না পারার জন্য ভানু তিরস্কৃত হলো; সাবিত্রীও মাসীর গঞ্জনা শুনলে। ভানুদের ঐভাবে জব্দ করার জন্য জহর-অজিত-যমুনারা বিজয়োৎসব পালনের জন্য এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গান শোনালে। তারপর সাবিত্রী বসলো গান গাইতে। জহরের দল সাবিত্রীর হাঁ লক্ষ্য করে দূর থেকে মটর ভাজা ছুঁড়তে লাগলো. উত্যক্ত হয়ে সাবিত্রী গান বন্ধ করে উঠে পড়লো। ভানু দেবুদার শরণাপন্ন হলো। এরপর যমুনা আরম্ভ করলে নাচতে। দেবুদার অদৃশ্য হাত ওকে

এ সপ্তাহের বাঙলা ছবি "মা ও ছেলে"-তে যমুনা সিংহ, নবগোপাল ও অনুভা

হলো না। নিরুপায় দেবু ভানুর মামার আবিষ্কৃত, মানুষ অদৃশ্য হওয়া, ওষুধটি গলাধঃকরণ করে ওদের চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেলো, শুধু জামা ও কাপড় দেখা যাচ্ছিল, তাও খুলে ফেলে দেবু একেবারে স্বচ্ছ নিরাকার হয়ে হাজির হলো কলকাতায় ভানুর হোস্টেলে। ভানুর তখন সমূহ বিপদ। একদিন ক্লাসের শেষে বৃষ্টি হওয়ার জন্য আটকা পড়ে ভানু আর সাবিত্রীর নিভৃত আলাপের সুযোগে জহর ভানুর ছাতাটা সরিয়ে নিয়ে যমুনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যমুনার বাপ শ্যাম লাহা ও মা রাজলক্ষ্মীর প্রিয়জন হয়ে জমিয়ে নিলে। বৃষ্টি থামার পর ভানুও এলো সাবিত্রীকে বাড়ী পৌঁছে দিতে। সাবিত্রী যমুনার মাসতুতো বোন, একই বাড়ীতে থাকে। ভানু এসেই এখানে তার ছাতাটা আবিষ্কার করে জহরকে যা-তা-ভাবে অপমান করলে। জহরের দল এর প্রতিশোধ নেবার জন্য ভানুকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলে। যুদ্ধ হবে বক্সিং; ভানু ভেবে আকুল, ঠিক এমনি সময়ে অদৃশ্য দেবুদার আগমন। নির্দিষ্ট দিনে বক্সিং আরম্ভ হলো। প্রথমটায় ভানুর অবস্থা কাহিল. কিন্তু শেষে দেবুদার অদৃশ্য হাত জহরকে তো শুইয়ে ফেললেই সেই সঙ্গে ভানুর বিরোধী দলের সবাইও অদৃশ্য ঘুষিতে আহত হলো। বক্সিংয়ের এ দৃশ্যে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফেটে প্রায় গড়িয়ে পড়ার অবস্থায় পৌঁছয়। কিন্তু এমনি মজা, অলক্ষ্য হাতের ঘুষিতে কাৎ হলো অতোগুলো লোক, কিন্তু তা নিয়ে কারুর মনে কোন বিস্ময় জাগলো না—যেন ভানুই সবাইকে ঘুষি মেরেছে।

*　　*　　*

জহর-অজিতরা ভানুর ওপরে প্রতি-শোধ নেবার এক ফন্দী করলে যমুনার সঙ্গে পরামর্শ করে। একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করা হলো এবং তাতে বিশেষ করে ভানু ও সাবিত্রীকে নিমন্ত্রণ করা হলো। শহর থেকে বেশ খানিক দূরে কাছাকাছি যানবাহনের সুবিধে নেই এমনি একটা বাগানে কলেজের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে গেলো। সেখানে তো নাচগান অভিসার যেনো ধুতি-শাড়ী পরা হাউই-দ্বীপের দৃশ্য। এক ফাঁকে ভানু আর সাবিত্রীকে একা ফেলে সকলে গাড়ী নিয়ে সরে পড়লো। দেবুদা ব্যাপারটা জানতে পেরে ওদের-

কাতুকুতু দিতে লাগলো; সে এক দারুণ হুল্লোড়ে ব্যাপার। অনবরত কাতুকুতুর চোটে যমুনার তো প্রাণসংশয়ের ব্যাপার। যমুনাকে তো বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো, সেখানেও তার কাতুকুতু থেকে রেহাই নেই। ডাক্তার বদ্যি এসে মাথা নেড়ে চলে গেলো। শেষে এলো ভানু; যমুনার ব্যারাম সে ভালো করে দেবে বললে, কিন্তু এক সর্তে। সর্ত হচ্ছে, সাবিত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া। রাজলক্ষ্মী প্রথমে রাজি হলো না, কিন্তু যমুনার অবস্থা দেখে রাজি হতে, ভানু দেবুদাকে ইশারা করতেই ব্যারাম সেরে গেলো। কিন্তু যমুনা সুস্থ হতেই রাজলক্ষ্মী সাবিত্রীর বিয়ের কথায় বেঁকে বসলো। ভানু আবার স্মরণ নিলে দেবুদার। এবার শুধু যমুনাই নয়, রাজলক্ষ্মী, শ্যাম লাহা সকলেই কাতুকুতুর চোটে অস্থির, এমন কি ছবির দর্শকরাও। শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হতে হলো। ছবির শেষ দু' বছর পরের দৃশ্যে। ভানু-সাবিত্রী তাদের বিবাহ-বার্ষিকীতে সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছে। সবাই জোড়ে এসে হাজির হচ্ছে—জহর-যমুনা, সমীরকুমার-নমিতা, আরও সবাই। একপাশে দোলনায় রয়েছে একটি শিশু-সন্তান। দেবুদারও অদৃশ্য থাকার মেয়াদ সেদিন শেষ।

* * *

"অদৃশ্য মানুষ" নামটির আকর্ষণ-শক্তি প্রবল এবং ছবিখানির হাসাবার শক্তিও প্রচণ্ড। বিশেষ করে বক্সিং লড়া আর শেষে কাতুকুতুর দৃশ্যে তো হাসতে হাসতে আসন থেকে উলটে পড়তে হয়। তা ছাড়া ছবিখানির পরিকল্পনার মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। কিন্তু রুচি ও শালীনতা বিষয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় মোটেই নেই। আর, তেমনি দোষণীয় হয়েছে এর আঙ্গিক পারিপাট্যের দিকটায়। সাত্যই ছবিখানি তোলায় দেখাশুনো করার কেউ ছিল তার কোন আভাসই পাওয়া যায় না। বিশ্রী ভাবভঙ্গী, যা তা সব কু-ইঙ্গিতপূর্ণ কথা। আলোকচিত্র-শিল্পীর দৃশ্য-রচনার প্রাথমিক জ্ঞানই যেন নেই; শব্দের দিকটা কোনমতে কথা অনুসরণ করা যায়; সংগীতাংশ এক জগাখিচুড়ি ব্যাপার। আর সত্যিই যে কেউ পরিচালনা কাজে ছিল না, তা বেশ বোঝা যায়। সস্তায় ছবি করতে হবে বলে, এমন বে-লাগাম বেলেল্লাপনা সমগ্র চলচ্চিত্র-শিল্পেরই মানহানিকর।

ক্রিকেট

ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের ভ্রমণসূচী প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। আগামী মাসের শেষেই তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবে। সুতরাং এই দলের আগমন ভারতীয় ক্রিকেটের আর্থিক, প্রচার ও ক্রীড়াকৌশলের উন্নতির কতখানি সাহায্য করিল এই বিষয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ চিন্তা না করিলেও আমাদের করিতে হয়। আর্থিক অনটনে জর্জরিত ভারতবাসীর প্রচুর অর্থ কেবল কতকগুলি বৈদেশিক পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধিতে যদি সাহায্য করে তাহা হইলে খুবই দুঃখের কারণ হইবে। আমরা যতদূর খবর রাখি এই ভ্রমণকারী দল আর্থিক দিক হইতে কন্ট্রোল বোর্ডের চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই পর্যন্ত কোন স্থানেই আশানুরূপ অর্থলাভ হয় নাই। বাঙ্গলাদেশ যেখানে খেলার পাগলের লোকের অভাব মোটেই নাই সেখানে পর্যন্ত বাঙ্গলা বনাম রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের খেলা দেখিবার জন্য যেরূপ দর্শক সমাগম হওয়া উচিত ছিল সেইরূপ হয় নাই। খেলার উন্নতি সাহায্য করিয়াছে কি না তাহা ক্রিকেট খেলার বিশেষজ্ঞগণেই সঠিকভাবে বলিতে পারেন। তবে সাধারণে ইঁহাদের খেলা দেখিয়া খুবই হতাশ হইয়াছেন। অধিকাংশ স্থানের দর্শকেরা জোর দিয়া বলিতে শোনা গিয়াছে "ইঁহাদের অপেক্ষা পার্টির অপর সকল খেলোয়াড়গণ ক্রিকেট দলের খেলা দেখিয়া খুবই আনন্দলাভ করা গিয়াছে।" দিল্লী, বোম্বাই, পুণা, জামসেদপুর প্রভৃতি স্থানে দর্শকগণ চরম হতাশাব্যঞ্জক উক্তি করিয়াছেন। কোন এক সাপ্তাহিক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "সময় হইয়াছে ইঁহাদের ক্রিকেটপ্রেমিক তোড়জোড় লইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবার।" এইরূপ উক্তির কারণ হিসাবে বলা চলে যে, এই দল ভ্রমণের অধিকাংশ খেলাতেই নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন খেলায় কোন কোন খেলোয়াড় ব্যাটিং বিষয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও অপর সকল খেলোয়াড় এইরূপ নৈরাশ্যজনক ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দেন যে, দলগতভাবে খেলার সকল আকর্ষণ ও উত্তেজনা নষ্ট হইয়া যায়। আসাম ও বাঙ্গলার প্রথম খেলায় রজত জয়ন্তী দল ইনিংস বিজয়ী হইলেও সাধারণের পূর্বের ধারণার কোন পরিবর্তন হয় নাই।
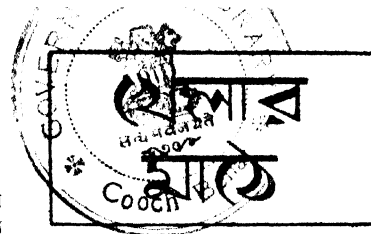
বাঙ্গলা দলের শোচনীয় পরাজয়

রজত জয়ন্তী বনাম বাঙ্গলা একাদশের তিনদিনব্যাপী খেলায় রজত জয়ন্তী দল এক ইনিংস ও ৮০ রানে শোচনীয়ভাবে বাঙ্গলা দলকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাই ভারত ভ্রমণকারী দলের ভ্রমণের দ্বিতীয় জয়লাভ। তবে বাঙ্গলা দল যে এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবে ইহা দ্বিতীয় দিন পর্যন্তও কেহ ধারণা করিতে পারে নাই। খেলা অমীমাংসিত হইবে ইহাই ছিল সকলের ধারণা। তবে এই শোচনীয় পরাজয় একমাত্র রামাধীনের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গলা দলের কোন খেলোয়াড়ই ইহার বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন নাই। ভারতের তিনমাসব্যাপী ভ্রমণের মধ্যে কোন খেলাতেই রামাধীনকে সফলতালাভ করিতে দেখা গেল না অথচ তিনি আসাম ও বাঙ্গলার মাঠে গৌরব অর্জন করিলেন ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ইহা বোধ হয় তাঁহার বিদায়ের শেষ দান। কারণ তিনি শীঘ্রই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ইহা ছাড়া রজত জয়ন্তী দলের ব্যারিক ও লক্সটন বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের জন্যও বাঙ্গলা দলকে বহু রান দলাতে পড়িতে হয়। তবে এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, বাঙ্গলা দলের ফিল্ডিং খুবই নৈরাশ্যজনক হয়। বাঙ্গলা দল এই খেলায় একটি বিষয়ে ভ্রমণকারী দলের রেকর্ডের কারণ হইয়াছে। বাঙ্গলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে যে রান সংখ্যায় ইনিংস শেষ করিয়াছে ইতোপূর্বে ভারতের কোন স্থানে কোন দলকেই রজত জয়ন্তী দল এত অল্প রানে ইনিংস শেষ করিতে বাধ্য করিতে পারে নাই। ইহাও বাঙ্গলা দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খুব গৌরবের বিষয় নহে। আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ়তার অভাব যে বাঙ্গলার প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের আছে তাহা এই খেলায় সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহার পর বাঙ্গলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ নিখিল ভারতীয় দলে স্থান লাভের আশা যে কিরূপে করেন সেই কথাই আমরা চিন্তা করিতেছি। ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অভাব বাঙ্গলাদেশে নাই। খেলার সাজ-পোশাক, খেলার সামগ্রীরও অভাব নাই। কেবল অভাব আছে উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী হইবার জন্য আত্মনিয়োগকারীর, ইহা না বলিয়া আমরা পারি না।

মঞ্জরেকার ও এস পি গুপ্তের ব্যর্থতা

ভি এল মঞ্জরেকার ও এস পি গুপ্তের ব্যর্থতাও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কেন এইরূপ হইল তাহাও অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার একমাত্র সদুত্তর হইল 'সংক্রামক ব্যাধি'। নিখিল ভারতীয় দলে হইলে এইরূপ করিবেন না এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ।

নৈরাশ্যজনক দর্শক সমাগম

বাঙ্গলা বনাম রজত জয়ন্তী দলের খেলায় আশানুরূপ দর্শক সমাগম হয় নাই। ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন; কিন্তু আমরা হই নাই। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচেও এইরূপ হইবে না। ভারত ও রজত জয়ন্তী খেলা যত নিম্নস্তরের হউক না কেন, ঐ খেলা টেস্ট বা আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তির খেলা, সেইজন্যই সাধারণ খেলা অপেক্ষা উহাতে অধিক আকর্ষণ বর্তমান আছে।

খেলার ফলাফল:—

বাঙ্গলা একাদশ **১ম ইনিংস:—২৭৫** রান (পি রায় ৮৬, মঞ্জরেকার ৬৪, **এন** চ্যাটার্জি ৩২, বি দাশগুপ্ত ৩৫, লক্সটন ৪৫ রানে ৩টি, এস রামাধীন ৬২ রানে ৪টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী ১ম ইনিংস:—৪৩৪ রান (সিম্পসন ৬৮, মর্শাল ৪২, মিউলম্যান ২৫, ব্যারিক ১৩৪, লক্সটন ১০০, গিব ২০, **এন** চৌধুরী ১১৭ রানে ৪টি, এস ব্যানার্জি ৮৮ রানে ২টি, এস পি গুপ্তে ১১৬ রানে ৩টি উইকেট পান।)

বাঙ্গলা একাদশ ২য় ইনিংস :—৭৭ রান (এন বসু ২৭, এস রামাধীন ২৯ রানে ৬টি, ই বেরী ৮ রানে ৩টি উইকেট পান।)

আসাম রাজ্যপাল দল পরাজিত

জোড়হাট আসাম রাজ্যপাল বনাম রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় রজত জয়ন্তী দল ১ ইনিংস ও ১২১ রানে আসাম রাজ্যপাল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া ভ্রমণের সর্বপ্রথম জয়লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছে। এই খেলায় গিব **প্রথম** খেলোয়াড় হিসাবে শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। খেলাটি অতি সাধারণ শ্রেণীর হয়। তবে দর্শক সমাগমের দিক হইতে আসামের ক্রিকেট খেলায় এক নূতন রেকর্ড করে।

খেলার ফলাফল:—

রজত জয়ন্তী দলের ১ম ইনিংস:—৭ উইঃ ৩৯৩ রান (গিব ১৫৪, মিউলম্যান ৭৯, সুব্বারাও ৩৭, বার্নেট ৩৩, **লক্সটন** ৬১ রানে নট আউট, এস ব্যানার্জি ৭৫ রানে ৩ টি, বুলক ৭৩ রানে ২টি, এস কে গিরিধারী ১১৩ রানে ২টি উইকেট পান।)

আসাম রাজ্যপাল ১ম ইনিংস:—**১২১** রান (লেঃ এম রায় ২৯, এ হাজারিকা ২৭, লোডার ৭ রানে ২টি, বেরী ১৪ রানে ২টি উইকেট পান।)

আসাম রাজ্যপালের ২য় ইনিংস:—**১৫১** রান (বি ফ্লক ৬৮, এস গিরিধারী ৭৯, বেরী ১৯ রানে ৩টি, রামাধীন ০ রানে ২টি, লোডার ৪৬ রানে ২টি, ব্যারিক ১৮ রানে ২টি উইকেট পান।)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২১শে ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় নিবারক নিরোধ আইন সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা করিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কাটজু ঘোষণা করেন, যতদিন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন হিংসাত্মক কার্যকলাপ কোনমতেই বরদাস্ত করা হইবে না! ডাঃ কাটজু বলেন যে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কা এবং অপরাধ বৃদ্ধির ফলেই এই আইনটি আরও এক বৎসর বলবৎ রাখিতে হইতেছে।

একশত কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া 'হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড' নামে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী গঠন এবং একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও জার্মানীর সংযুক্ত 'ক্রুপস এন্ড দেমাগ' কোম্পানীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

২২শে ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। এই কমিশন উড়িষ্যার গভর্নর সৈয়দ ফজল আলী (চেয়ারম্যান), পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও সর্দার কে এম পানিকরকে লইয়া গঠিত হইবে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

দেশের বিচার ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত একটি বিল আজ ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিলের বিধানানুযায়ী ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের সুদূর প্রসারী পরিবর্তন করা হইবে।

২৩শে ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় প্রস্তাবিত পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, পাকিস্থান যদি আমেরিকা হইতে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে, তবে পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর সহিত আমার যে চুক্তি হইয়াছিল, উহার সমগ্র পটভূমিকাই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। শ্রী নেহরু আরও বলেন, সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিলে সমগ্র দেশটাই ঘাটিতে পরিণত হইবে।

আজ শান্তিনিকেতনে এক শান্ত ভাব গম্ভীর পরিবেশে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়। বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ তাঁহার সমাবর্তন ভাষণে বিশ্বভারতীর সকল ছাত্রছাত্রী ও কর্মিগণকে সত্যনিষ্ঠা, সেবাপরায়ণতা এবং কল্যাণ-সাধন ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান জানান।

২৪শে ডিসেম্বর—ভারতীয় রেলপথ-সমূহের উন্নয়নকল্পে ২ কোটি ডলার (আনুমানিক দশ কোটি টাকা) আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও মার্কিন সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা কর্মসূচী অনুযায়ী এই সাহায্য প্রদত্ত হইবে।

অদ্য সেনেট হলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দান প্রসঙ্গে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু বলেন, ছাত্রগণ জীবিকার্জনের নিমিত্ত যে ক্ষেত্রই অবলম্বন করুন না কেন, জাতির সেবাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২৫শে ডিসেম্বর—শ্রীশ্রীনাম সাধক, প্রেম বিগ্রহ পরম বৈষ্ণব চূড়ামণি ১০৮ শ্রীল শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের প্রকটলীলা সম্বরণের একবিংশ দিবসে অদ্য বরাহনগরস্থ পাঠবাড়ীতে সহস্র সহস্র ভক্ত ও অনুগামি-গণের সমাবেশে তাঁহার বিরহ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৬শে ডিসেম্বর—কল্যাণীতে কংগ্রেসের ৫৯তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। আশা করা যায়, একপক্ষকালের মধ্যে কংগ্রেস নগর একটি সুদৃশ্য উপনগরে পরিণত হইবে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু ১৯শে জানুয়ারী কল্যাণীতে পৌঁছিবেন।

২৭শে ডিসেম্বর—শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জননী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব অদ্য বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর আন্তর্জাতিক অতিথিশালা এবং কলিকাতার অন্যান্য স্থানে গভীর নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। বেলুড় মঠে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে বেলুড় মঠ ও মিশনের সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দ তাঁহার শুভেচ্ছা বাণীতে বলেন যে, মাতৃভাবের পূর্ণ বিকাশই ছিল সারদা দেবীর জীবনের মহান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার স্বার্থলেশহীন স্নেহ সর্বপ্রকার ভেদ বৈষম্য অতিক্রম করিয়া সমগ্র মানব জাতির উপর সমভাবে বর্ষিত হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

২০শে ডিসেম্বর—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস'-এর এক খবরে প্রকাশ, ভারতের মেজর জেনারেল সাহেব সিং সোখেকে ১৯৫৩ সালের জন্য স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

২১শে ডিসেম্বর—ইরাণের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেকের প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ৩ বৎসরের জন্য নির্জন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ক্ষমার মনোভাব লইয়া ডাঃ মোসাদেকের প্রতি দণ্ডবিধান করিবার জন্য শাহ আদালতের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়াই আদালত দণ্ডাদেশের কঠোরতা হ্রাস করিয়াছেন।

২৩শে ডিসেম্বর—আজ মস্কোতে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের পদচ্যুত প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ বেরিয়া ও তাঁহার ছয়জন সহকর্মী রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং আজ তাঁহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর—অদ্য নিউজিল্যাণ্ডে একটি যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস ট্রেন নদী গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় ১৬৬ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে। ট্রেনটি ওয়েলিংটন হইতে অকল্যাণ্ড অভিমুখে যাইতেছিল।

২৫শে ডিসেম্বর—ফরাসী হাইকম্যাণ্ড আজ সাইগনে ঘোষণা করেন যে, ইন্দোচীনের পশ্চিম দিক দিয়া ভিয়েৎমিন বাহিনী বড় রকমের অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। অসামরিক ফরাসী জনগণকে লাওস থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত থাকেক ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী আজ করাচীতে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্থান শক্তিশালী হইলে ভারতের সীমান্ত রক্ষায় সক্ষম হইবে এবং ভারতের সম্পদরূপেই গণ্য হইবে।

ভিয়েৎমিন সৈন্যদল ফরাসী বাহিনীকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া চীন সাগরের উপকূল হইতে ইন্দোচীনের মধ্যভাগ দিয়া শ্যাম সীমান্ত অভিমুখে উহার তড়িৎ অভিযান সমাপ্ত করিয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর—প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার দক্ষিণ কোরিয়াস্থিত মার্কিন স্থল-সৈন্যের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ বর্ষ
সংখ্যা ১০

দেশ
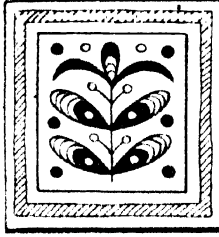
শনিবার
২৫ পৌষ, ১৩৬০
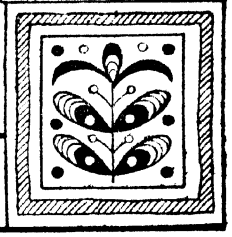
DESH SATURDAY, 9TH JANUARY 1954

সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

রেশনের চাউলের সুব্যবস্থা

কলিকাতা এবং শহরতলী রেশনভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের দুঃখ এবার দূর হইবে। গত ১৭ই পৌষ কলিকাতায় সংবাদিকদের এক সম্মেলনে ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই এই আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, রেশনীরা সিদ্ধ চাউল পাইবেন এবং ভাল চাউল অর্থাৎ কাঁকর, পাথরশূন্য চাউলই পাইবেন। কিন্তু কতদিন পরে শহর এবং শহরতলীর অধিবাসীদের এমন সৌভাগ্যের উদয় হইবে খাদ্যমন্ত্রী সেকথা কিছুই বলেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি হইতে চাউল ক্রয় করিবার অধিকার কলিকাতার স্পেশাল দোকানের ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের দিতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই অধিকার ব্যবসায়ীদিগকে দিলে মফঃস্বল অঞ্চলে চাউলের মূল্য কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। এমন ব্যবস্থার ফলেই নাকি গত বৎসর মফঃস্বল অঞ্চলে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদিগকে এই-ভাবে মফঃস্বল হইতে ধানচাউল ক্রয় করিতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই ব্যবস্থার কথা তিনি জানিতেন না। খাদ্যমন্ত্রী জনাইয়াছেন, উত্তর প্রদেশে সস্তা দরেই চাউল পাওয়া যাইতে পারে এবং স্পেশ্যাল দোকানের ব্যবসায়ীরা সেখান হইতে চাউল ক্রয় করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা সে চেষ্টা করিতেছেন না। অধিকন্তু তাঁহারা সরকারের উপর চাপ দিয়া পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে যাহাতে চাউল ক্রয়ের অধিকার পান সেই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উক্তি হইতে হঠাৎ প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলিকাতা এবং শহরতলীর অধিবাসীদের আতপ চাউল লইতে যে আপত্তি আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একথা তাঁহাকে জানান নাই। বিস্ময়ের কথা নিশ্চয়ই। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের খাদ্যমন্ত্রীর উক্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং চাউল ব্যবসায়ী এই উভয়ের উপরই কটাক্ষ রহিয়াছে। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতেই গম বিনিয়ন্ত্রিত করা হইবে, সুতরাং আটা সম্বন্ধে অভিযোগের কোন কারণ থাকিবে না খাদ্যসচিব এই আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা চায় চাউল। দেশে চাউলের অভাব নাই, পশ্চিমবঙ্গেও পর্যাপ্ত ধান ফলিয়াছে, এরূপ অবস্থায় রেশনভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের চাউল সম্পর্কে অভিযোগের কারণই বা থাকিবে কেন, ইহা আমরা বুঝি না। পশ্চিমবঙ্গে সস্তা দরে যথেষ্ট চাউল পাইবার ক্ষেত্র থাকা সত্ত্বেও রেশনভুক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়াই উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মধ্য প্রদেশের নিকৃষ্ট চাউল লইতে হইবে, এই দায় তাহাদের ঘাড়ে চাপান হইতেছে, নিশ্চয়ই পশ্চিম-বঙ্গের স্বার্থসাধনই এমন ব্যবস্থার লক্ষ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন্ যুক্তিতে এমন ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইতেছেন, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ফলত তাঁহাদের খাদ্য নীতি পরিচালনে আগাগোড়া একটা অব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থার মূলে নানা পথে দুর্নীতি পাকিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে দেশবাসী নিতান্ত অনর্থক ও অকারণে কষ্ট পাইতেছে এবং জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ নানাভাবে সৃষ্টি হইতেছে। বলা বাহুল্য, এতৎসম্পর্কিত সরকারী প্রতিশ্রুতিতে লোকে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খ্যাতিমান মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্যের আত্মকথামূলক নূতন রচনা "যখন পুলিস ছিলাম" আগামী সপ্তাহ হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক দেশ

পাকিস্থানের শক্তি সঞ্চয়

পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে সামরিক চুক্তির কোন আলোচনা আদৌ হয় নাই, এতদিন করাচীর কর্তৃপক্ষের মুখে এইরূপ কথাই আমরা শুনিতে-ছিলাম। কিন্তু ক্রমেই সুর ঘুরিতেছে। সূক্ষ্ম রাজনীতির ইহাই নীতি এবং রীতি। চাতুর্যং কেবলা নীতি, পাকিস্থান ইহা সার বুঝিয়া লইয়াছে। নববর্ষের বাণীতে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী শুনাইয়াছেন, সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ ও সবল পাকিস্থানই এশিয়া মহাদেশে

শান্তিরক্ষার পক্ষে প্রকৃষ্ট অবলম্বন। সেদিন কলিকাতায় সাংবাদিকদের নিকট জনাব মহম্মদ আলী তাঁহার ঐ উক্তির তাৎপর্য ভাঙিগয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পাকিস্থানের সামরিক সাহায্য প্রাপ্তির পশ্চাতে কোন দুরভিসন্ধি নাই। রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং পাকিস্থানের আদর্শগত স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। মিত্রভাবাপন্ন একটি দেশ হইতে সাহায্য লইয়া তাঁহারা দেশরক্ষার ভিত্তি গড়িয়া তুলিতেছেন ইত্যাদি। কিন্তু এজন্য পাকিস্থানকে কি মূল্য দিতে হইবে ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। আমেরিকা অবশ্যই অহেতুক প্রেম প্রণোদিত হইয়া পাকিস্থানকে সামরিক সাহায্যদানে অগ্রসর হয় নাই। প্রকারান্তরে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করাই তাহার উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য যে সামরিক, ইহাও সুস্পষ্ট। দুর্বলকে বাগে ফেলিয়া প্রবল শক্তিরা এমন কৌশলেই তাহাদের কার্যোদ্ধার করিয়া লয় এবং সেই পথেই তাহাদের অনাচার প্রশ্রয় পায়। প্রবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিতে যাওয়ার অর্থ যে দেশের স্বাধীনতাই কার্যত বিকাইয়া দেওয়া; দেখা যাইতেছে, পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী ঐতিহাসিক এই একান্ত সত্যটি এক্ষেত্রে বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা বিস্মৃত হইলেও এশিয়ার দেশগুলি যে সে ভুলে পুনরায় পড়িতে চাহিবে না, ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং পাকিস্থানের এই উদ্যমের প্রতিক্রিয়া এশিয়ার সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করিবে এবং তাহার ফলে শান্তি যে বিপর্যস্ত হইবে, ইহাও সুনিশ্চিত।

পরলোকে আশুতোষ মিত্র

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত শ্রীযুত আশুতোষ মিত্রের পরলোকগমনে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। মিত্র মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের সহকর্মী ছিলেন। সুদীর্ঘ-কাল সাক্ষাৎ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, ভগবন্নিষ্ঠ এবং অমায়িক প্রকৃতির পুরুষ

ছিলেন। ঠাকুরের কথা, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর কথা আলোচনায় তিনি সতত প্রীতি বোধ করিতেন। এ সম্বন্ধে 'দেশ'এ নিয়মিতভাবে তাঁহার অনেক লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে 'শ্রীমা' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা আমাদের একজন নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী স্বজনের বিয়োগ ব্যথাই অনুভব করিতেছি। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি; এবং তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতেছি।

বিদ্যা ও জ্ঞান

সম্প্রতি হায়দরাবাদ শহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু মানবসংস্কৃতির উপর যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব এবং তাহার পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলেন, আমার মনে হয়, আমরা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা যতই আয়ত্ত করিতেছি, ততই যেন জ্ঞানের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। দেখা যাইতেছে যাঁহারা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে এমনভাবে আচরণ করিতেছেন যাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়। ইঁহারা হিংসা এবং বিদ্বেষপরবশ হইয়া কাজ করিতেছেন এবং বৃহত্তর হিংসার পথ উন্মুক্ত করিতেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উক্তির সত্যতা অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু কারণটা কি? প্রধান-মন্ত্রীর উক্তিতেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। তিনি বলিয়াছেন, বিদ্যা এবং জ্ঞান এক বস্তু নয়। এই দুইটি একে অপরের পরিপূরক হইতে পারে, এই পর্যন্তই বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সভ্যতা বিদ্যার ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানের উন্মেষ সাধনে ততটা সাহায্য করে নাই।

ইহার ফলে মানুষ কৃতবিদ্য হইয়াও অনেক ক্ষেত্রে অমানুষ থাকিয়া যাইতেছে। পরন্তু তাহাদের বিদ্যাবত্তা নৈতিক অধোগতি সাধনে তাহাদিগকে সমধিক প্রণোদিত করিতেছে। স্বাধীনতালব্ধ ভারতের পক্ষে এই সম্বন্ধে গভীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ভারতের অতীত ঐতিহ্য বিদ্যার অপেক্ষা জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। প্রত্যুত, যে বিদ্যা জ্ঞানের সহায়ক নয়, এদেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহা অবিদ্যা স্বরূপেই গণ্য হইয়াছে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও জ্ঞানের সাধনা এদেশে চলিয়াছে এবং জ্ঞানের বর্তিকা এখানে কোনদিনই নিভে নাই। এদেশের ভক্ত, ভাবুক এবং সাধকেরা গভীর অন্ধকারের মধ্যেও জ্ঞানের আলোক-সম্পাত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিকতার মোহে, আমাদের সমাজ-জীবনে ইঁহাদের সাধনার প্রতি অনেকটা অশ্রদ্ধার ভাব দেখা দিতেছে এবং অসংযত অনাচারেরই যেন মূল্য বেশী হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের যুক্তি-বিচারের ধারাতে শুদ্ধ স্বার্থেরই সাড়া জাগিতেছে। প্রকৃতপক্ষে বাঁচিবার পথ ইহা নয়। ভারতকে যদি বর্তমান সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে হয়, তবে বিদ্যাকে জ্ঞানের পথেই পরিচালিত করিতে হইবে। অন্তর-রাজ্যে তাঁহাকে আলোকের সন্ধান করিতে হইবে। যদি আমরা সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হই, তবে সমাজ-জীবনে আমাদের সংস্থিতি ঘটিবে না, পরন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

গুহাভিমুখে

শিল্পী—রামকিংকর

দেবতা থেকে দূরে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

দেবতা দেখলাম অনেক।

খড়্গনাসা, বিস্তৃত বক্ষ আর প্রশস্ত ললাট—
তপঃপূত তপ্ত রক্তের উত্তরাধিকার :
সৌম্য ও প্রিয়দর্শী :
প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ:
শ্রদ্ধায় আনত হ'য়ে, আরতিতে উন্নত হ'য়ে
প্রণামে ও প্রদক্ষিণে
ঢের দেখলাম অরাতিসূদন
        ব্রোঞ্জ, তামা আর স্ফটিক-পাথরের শিল্পমূর্তি।
শুধুই শিল্পমূর্তি, কিন্তু শিল্পী নয়—
অবিকল মানুষের মুখের ছাঁচ,
                মানুষ নয় তবু।

দেবকন্যাদের কাহিনী নয় মুলতুবী থাক।
তরুণ দেবত্বও কি চোখ এড়িয়েছে কিছু!
নারী, সুরা আর পণ্যসম্ভার :
আরো জমি আর খামার আড়ত :
আরো বেশী গোলাবারুদ, রণপোত
—সেতারের বদলে না হয় গীটার,
        কি এমন হেরফের!
মসৃণ নগ্নতা মোড়া মসলিনের অংগবাসে—
ঝাঁঝ নয় কি তেমনি দুঃস্বাদ,
                কটু আর দুঃসহ!

এই ছলনার ছদ্মনাম,
এই দুঃসহ দুঃস্বপ্নের দেবশিবির থেকে
        আমাদের মুক্ত করো, ঈশ্বর!
ফিরিয়ে নাও এদের;
ফিরিয়েও চাইনে কোনো নোতুন দেবতা—
    কোনো বিফল স্বর্গ-কামনা পুষি না ত' মনে!

আমাদের মাটি দিয়েছ তুমি মায়ের মত।
স্বর্গ-মেঘের মতই পরিপাটি মাটি
        স্নেহময়ী, শস্যময়ী জননী বসুন্ধরা!
    সেই মাকে নিয়েই সুখী হ'তে চাই।
সেই মা, সেই মাটির মত
সেই মাটিরই ভাই
        বরং কিছু মানুষ দাও এবার।
মানুষ দাও—
        ফুলের মত পবিত্র আর সূর্যের মত সুন্দর
ইস্পাতের মত কঠিন-কঠোর, নির্ভীক মানবসন্তান—
কামানের বদলে কণ্ঠে যাদের গান :
ভালোবাসার গান;
সমুদ্রের মত বুক, নীলাকাশের মত মন—

দু'চোখে দুস্তর স্বপ্ন :
ভালোবাসার স্বপ্ন;
তবু যাতে বজ্র আছে, বিদ্যুৎ আছে,
        প্রয়োজনে আছে উন্মত্ত প্রভঞ্জনের ভ্রূকুটি।

প্রয়োজন আছে,
        প্রয়োজন আছে বুঝি অতিমানবেরো।
এই দেবতাদের বিনিময়ে প্রয়োজন আমাদের সবকিছু।
আলো-বাতাস, নদী-উপত্যকা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, অন্ন-পানীয়-
                                        পরমায়ু
আলো-বাতাস আর অন্নজল না পেলে কেমন ক'রে বাঁচি।
অন্নজল থেকেই ত' স্বাস্থ্য-পরমায়ু!
অটুট স্বাস্থ্য, দীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে তবু কি লাভ
অন্ধকার,
এক নিশ্চেতন আত্মা লালন ক'রে।

প্রজনন ক'রে, বাঁচে ত' পশুরাও।
মৃত্যুর,
দুর্জয় লোভ ও দুর্বার হিংসার
        এই কবলগ্রাসী পাইথন বিবরমুখী হ'লে,
আধিভৌতিক কোনো অণ্ডজ অবতার নয়—
রীতিমত মানুষের ঔরসে
মানবীমাতার গর্ভে অতিমানবেরো জন্ম হোক।
মানুষকে আরো সুন্দর,
মানুষের জীবনকে আরো মহৎ-মনোহর,
পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার
                খবর আছে যার জানা।
মানুষের জন্ম দাও ভগবান।
অথবা তুমিই মানুষ হ'য়ে জন্মাও আরেকবার।
বেথলহেমের আস্তাবলে কি কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদে
অথবা গুর্জরের পোরবন্দরে
ব্রেজিলে কি বেলজিয়ামে,
ক্যানারি না ক্যানবেরায়,
এশিয়ামাইনর, পলিনেশিয়ায় যেখানে হোক—
                তাতে কিছু এসে যাবে না।

যাদের সবুজ ঠোঁটে
    শুধু সবুজ শস্য আর নদীপ্রান্তরের গান :
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বসিত অমেয় শক্তির ঘ্রাণ—
যাদের চোখে করুণা, বুকে সুধা
আর পদ্মমধুর মত গাঢ় রক্তের রং;
মানুষের সহোদর ভাই :
পাঁকের ফুল পদ্মের মত সেই পঙ্কজ মানুষ চাই।

দেবতা নয়, দেবতা নয়, কোনো দেবতা নয় আর।

বৈদেশিকী

মধ্যপ্রাচ্যের "রক্ষার" জন্য Middle
: Defence Organisation-এর
কল্পনা কার্যে রূপান্তরিত করার
বিধা হচ্ছে বলে আমেরিকা নাকি এই
লের দেশগুলির সঙ্গে আলাদা আলাদা
রিক সাহায্যদানের চুক্তি করার চেষ্টায়
ছে। মিশর যদি MEDO-তে যোগ
স্বীকৃত হোত, তবে হয়ত এতদিনে
DO খাড়া হয়ে উঠত। তাহলে আরব
গ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ত। সেটা
র ও অন্য আরব রাষ্ট্রগুলি চায় না,
ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরব লীগের
ও কার্যকারিতা বর্তমানে বিশেষ
যোগ্য নয়। ইজরেলের সঙ্গে বিরোধও
রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে।
কে শায়েস্তা করতে পারেনি, বরং
লের সঙ্গে যুদ্ধে হটে গেছে—
মিশর ও আরব লীগের অন্য রাষ্ট্র-
ভুলতে পারছে না। তার উপর
রের সঙ্গে তো বৃটেনের ঝগড়া
ছে সুয়েজ অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনীর
ান নিয়ে। সেটা না মেটা পর্যন্ত
র ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের সঙ্গে পাকা-
ি সামরিক গ্রন্থিবন্ধন করতে চায় না।
শিয়াও মিশরকে সতর্ক করে দিয়েছে
, মিশর যদি MEDO-তে যোগদান করে,
সেটা রাশিয়া শত্রুর কাজ বলে মনে
রবে।

সম্প্রতি শুনা যাচ্ছে, মিশর নাকি
রপেক্ষ নীতি ঘোষণার কথা চিন্তা
ছে। এর উদ্দেশ্য সুয়েজ অঞ্চল
ম্পর্কে মিশরের অনুকূলে একটা
ষ্পত্তি করার জন্য বৃটেন ও আমেরিকার
পর চাপ দেয়া অথবা সত্যই মিশর একটা
তন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে
স্তুত হচ্ছে, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।
শর যদি নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করে,
বে তারপরে সুয়েজ অঞ্চল পুরোপুরি
মশরের হাতে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে
টিশ-ঘাটি তুলে নিয়ে আসতে বৃটিশ
ভর্নমেণ্ট রাজী হবেন, এটা বাস্তব বলে
মনে হয় না। যুদ্ধ লাগলে মিশর ইঙ্গ-
মার্কিন পক্ষেই থাকবে এবং সুয়েজ অঞ্চলের সদ্ব্যবহারের পক্ষে কোনো বাধা ঘটবে না, এই আশ্বাস পেলে তবে বৃটিশ সৈন্য সুয়েজ ছাড়তে পারে। এর সঙ্গে নিরপেক্ষ নীতির খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয়। আর একটি প্রশ্ন আছে। মিশর গভর্নমেণ্ট কি মার্কিন সাহায্য-প্রাপ্তির আশা একেবারে ত্যাগ করতে পারবেন? বৃটিশের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেলেই যথেষ্ট পরিমাণে মার্কিন সাহায্য পাওয়া যাবে, এইরকম একটা ধারণা চালু আছে। মিশরের অর্থনৈতিক প্রয়োজনও কম নয়। এ অবস্থায় মিশর গভর্নমেণ্টের পক্ষে "নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করব" বলে চাপ দেয়া যত সহজ নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করা তত সহজ হবে না।

আরো একটা কথা আছে। "ঠাণ্ডা যুদ্ধ"র সময় নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হলেও মিশরের যে ভৌগোলিক অবস্থান, তাতে "গরম যুদ্ধ" শুরু হলে সুয়েজ অঞ্চল করায়ত্ত করার জন্য চেষ্টা হবেই। সুতরাং সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হলেও যদি যুদ্ধ বাধে, তবে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই যদি হয়, যদি জড়িয়ে পড়তেই হয়, তবে গোড়া থেকেই এদের সঙ্গে থাকি না কেন?

কিন্তু মিশরের সাধারণ লোক নিশ্চয়ই যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু তারা করবে কী? যদি সমস্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্য সমেত) একজোট হয়ে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করতে পারত, তবে কিছু হোত। কিন্তু সে সম্ভাবনা কোথায়—যদিও ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী এই নীতির পক্ষে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন? তেলের খনি-পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির জন্য লড়াই ঠেকাবে কে? "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" তো সেখানে চলছেই এবং "গরম যুদ্ধ" বাধলে কি করা যাবে তার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছে।

ইরাক, ইরান ও সৌদি আরব—এই তিনটি দেশই তৈলসম্পদে ধনী। এদের

প্রত্যেককে এবং পাকিস্থানকে মার্কিন সামরিক সাহায্যের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা হচ্ছে। এটাকে MEDO'র বিকল্প ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। ইরানের সঙ্গে তো মার্কিন সামরিক সাহায্যদানের একটা চুক্তি পূর্বেই ছিল। সেই চুক্তির মেয়াদ এই ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত আছে। এই চুক্তি আবার নূতন করে করা হবে সন্দেহ নেই এবং শুনা যাচ্ছে নূতন চুক্তি অনুসারে সাহায্যের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে নাকি অনেক বেশি হবে।

তারপর পাকিস্থানের কথা। পাকিস্থানে যে মার্কিন সামরিক সাহায্য আসছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পাকিস্থানে বর্তমানে মার্কিন ঘাটি স্থাপনের হয়ত কথা নেই। তবে সমর-সম্ভারের সঙ্গে একটি "মিলিটারি মিশন" আসবে, এটা ধরে নেয়া যেতে পারে, কারণ নূতন অস্ত্র-শস্ত্র যদি আসে, তবে সেগুলির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও অবশ্য করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সংগঠনের ব্যাপারেও মার্কিন পরামর্শ-দাতাদের উপদেশ মিলবে।

মার্কিন সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পাকিস্থানকে দলে রাখা একান্ত দরকার। যদি যুদ্ধ বাধে এবং মধ্যপ্রাচ্য "রক্ষা" করতে হয়, তবে পিছনে পাকিস্থানে অন্তত সরবরাহের ঘাটি রাখা আবশ্যক। গত দুই মহাযুদ্ধের সময়েই দেখা গেছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চালাতে ভারতবর্ষে ঘাঁটি রাখা কিরূপ অত্যাবশ্যক ছিল। পিছনে ভারতবর্ষে ঘাটি না থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে সক্ষমতার সঙ্গে যুদ্ধ চালানো যেতো না। ইরাণ "রক্ষা" করতে হলে হয় ভারতবর্ষ অথবা পাকিস্থান পিছনে থাকা চাই। ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ থাকতে চায়, এ কাজের জন্য ভারতবর্ষকে পাওয়া যাবে না। সুতরাং পাকিস্থানকে পেতেই হবে।

তবে পূর্বের তুলনায় এক বিষয়ে অবস্থার একটা গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বের দুই মহাযুদ্ধে প্রধান শত্রু ছিল জার্মানী। এবার যদি যুদ্ধ হয়, তবে প্রধান বিপক্ষ হবে রাশিয়া ও তার মিত্র চীন। পূর্বে ভারতবর্ষের ঘাটি মোটামুটি নিরাপদ ছিল। ১৯৩৯—৪৫ সালের যুদ্ধে অবশ্য জাপানীদের দ্বারা ভারতের পূর্বপ্রান্ত কিঞ্চিৎ আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তাতে সরকারের ঘাটি হিসাবে ভারতবর্ষের পূর্ণ ব্যবহারে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের কোনো বেগ পেতে হয়নি। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ পাকিস্থানকে ঘাটি হিসাবে যখন ব্যবহার করবে তখন পাকিস্থানের উপর সঙ্গে সঙ্গে বিমান আক্রমণ করা রাশিয়া ও চীনের পক্ষে সম্ভব হবে।

পাকিস্থানের শাসকবর্গ একথা চিন্তা করেন নি এরূপ মনে হয় না। তা সত্ত্বেও তাঁরা মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন। কেন? খামকা তাঁরা দুই ষাঁড়ের লড়াইয়ের মধ্যে পাকিস্থানের মাথা বাড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা কি সম্ভব? আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র-সম্ভারের বলে বলীয়ান হয়ে পাকিস্থান যুদ্ধ করে কাশ্মীর দখল করে নিতে পারবে, অথবা যুদ্ধের ভয়ে ভারতবর্ষ আপনা থেকেই কাশ্মীর ছেড়ে দেবে—পাকিস্থানের কিছু লোকের এই রকম বোকা বনার্দ সম্ভব হতে পারে, কিন্তু পাকিস্থানী কর্তারা নিশ্চয়ই নিজেদের মনে এ রকম কোনো দুরাশা পোষণ করেন না। হয়ত আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে তাঁরা পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন যে এখন বিদেশী সাহায্য বিনা তাঁরা [illegible] চালাতে পারছেন না, পাকিস্থানী সৈন্যবাহিনীর বর্তমান ঠাঁট বজায় রাখাও এখন বিদেশী সাহায্য না নিলে সম্ভব হচ্ছে না। দেখা গেছে যুদ্ধের সময় ছাড়া কোনো দেশের উপর বিদেশী সামরিক সাহায্য চাপানো এই রকম অবস্থাতেই সম্ভব হয় থাকে। ৬।১।৫৪

পাওয়া যায় অন্তিম অধ্যায়ে—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ করলেন সে রহস্য উদ্ঘাটন।

বিবেকানন্দ যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রণত হয়েছিলেন সেদিন প্রাচ্য নূতন করে প্রতীচির কাছে বিজয়গৌরব লাভ করল। সমগ্র পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবান্বিত আমাদের প্রতিনিধি হয়ে বিবেকানন্দ তাঁকে যাচাই করতে অগ্রসর হয়েছিলেন—প্রতি পদে হলেন পরাজিত কিন্তু সে পরাজয় পরিয়ে দিল তাঁকে রাজমুকুট। জগৎকারণ প্রেমস্বরূপের ভাস্বর দ্যুতি প্রকাশ করে তুলল তাঁর সমক্ষে এক নূতন রূপ, যাবতীয় সমস্যা দেখা দিল সহজ সুন্দর বেশে। নির্বাণোত্থিত বুদ্ধের মত বিবেকানন্দ আবার জগৎকে দেখিয়ে দিলেন কল্যাণ মার্গের পন্থা। বিজ্ঞান আর ধর্মের একত্ব প্রতিপাদন করে সনাতন সত্য "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" মহাবাক্যকে করলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনালোকে যে অপূর্ব আদর্শের সন্ধান পেলেন আর যাকে রূপায়িত করার জন্য আজীবন ব্রত নিলেন—"He is my hero, that hero's life I will try to imitate" —সেই আদর্শের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী সারদা চরিত্রে। নীরবতার অবগুণ্ঠনে সযত্ন-আবরিত সে স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি তাঁকে করল বিস্মিত চমৎকৃত। মনে হয় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য সে অনন্য অনুভূতি সকলের কাছে তখন গোপন রেখেছিলেন, নিঃসন্দেহ হয়ে পরে গুরুভ্রাতাদের লিখলেন—"মাকে তোমরা কেউ বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে......।"

ত্যাগ তিতিক্ষা সর্বভূতে প্রেম সহিষ্ণুতা উদারতা আদি যেসব গুণরাজির স্বর্গীয় প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে দেখে হয়েছিলেন মুগ্ধ, সারদাজীবনও যে সেই আলোকে আলোকিত—তাই বুঝি বা ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণ বিশ্বাস হলো, বিশেষ যুগ প্রয়োজনে এ মহাশক্তির আবির্ভাব—"মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন; তাঁকে অবলম্বন করে আবার গার্গেয়ী মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব ঘটবে।"

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বুঝি বা জানালেন এঁকে প্রথম প্রণতি। এ পূজোতেই আসবে সর্বপূজোর সিদ্ধি, এই দেবী-মানবীকে কেন্দ্র করেই জগৎ জননী করবেন আত্মপ্রকাশ—জাগবে সমষ্টি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাই মাতৃপূজোতে করলেন স্বামী বিবেকানন্দ আত্মসমর্পণ, সগর্বে করলেন ঘোষণা—

"রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নহি, মাঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ। আগে মা আর তার মেয়েরা তারপর বাপ আর তার ছেলেরা।"

ভাবকে বেঁধে রাখে রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব যেন নিয়েছে সারদারূপে প্রতিষ্ঠা। প্রতি গৃহে সারদা-রূপ সৃষ্টি করতে পারলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব প্রকাশ পাবে নানা-রূপে নানা ছন্দে। যুগ প্রয়োজনে সমন্বয়াচার্যের আবির্ভাব হবে সার্থক।

বিবেকানন্দ সূত্রাকারে শ্রীশ্রীমার যে স্বরূপ নির্ধারণ করে দিলেন তার সরল ভাষ্য করে দিলেন ভগিনী নিবেদিতা তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ, ভিন্ন কৃষ্টি সম্পন্না, ভিন্ন পরিবেশলালিতা, কিন্তু সত্যের যে দুই রূপ নেই—তা এক অভিন্ন, বিবেক-প্রজ্ঞা রঞ্জিত দৃষ্টি নিবেদিতা সেই গ্রাম্য বালিকা সলজ্জ বধূ সারদা দেবীকে আমাদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতে বলছেন—

"ভারত রমণীর আদর্শ সম্বন্ধে সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের চরম কথা। অতি সাধারণ নারীচরিত্র কিন্তু জ্ঞান আর মাধুর্যের অপূর্ব সমাবেশ। সারদা দেবীর স্বাভাবিক সৌজন্য আর উদার মনোবৃত্তি তাঁর চরিত্রগত আধ্যাত্মিক প্রকাশের মতই অপূর্ব। কখনও কোন সমস্যাবহুল নূতন প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে তাঁকে কুণ্ঠিত দেখা যায়নি। প্রার্থনার নীরবতার মত পবিত্র শান্ত তাঁর জীবন। তিনি যে উচ্চ ভাবের সঙ্গে চিরসংযুক্ত অতি অসতর্ক মুহূর্তেও তা থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হতে হয় তাহার নূতন ধর্ম অথবা নূতন ভাব গ্রহণ করার ক্ষমতা আর উদার দৃষ্টিভঙ্গী দেখে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কৃষ্টির ইস্টারডে উৎসবে সারদাদেবীর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি-মাধুর্য উপস্থিত পাশ্চাত্য মহিলাদের বিস্মিত আর আনন্দিত করেছিল অপূর্বভাবে।"

গ্রাম্যবধূর অবগুণ্ঠনের আড়ালে সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাশির ঘনীভূত রূপ ছিল এতদিন আমাদের কাছে প্রচ্ছন্ন।

মহান ভাবরাশি যাঁদের জীবনে প্রতিফলিত হয় তাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলে থাকি। উচ্চ উচ্চ ভাবের জীবন্ত বিগ্রহরূপে এরা সকলের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—Saints are the object lesson of the principles. Christ আমাদের উচ্চতম পরিণতি, Jesus জীবনে তার বিকাশ হলো। বুদ্ধত্ব আমাদের মহান লক্ষ্য গৌতম জীবনে তা রূপায়িত হলো, মানবাকারে গদাধরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত-রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত হয়ে দেখা দিল।

শ্রীশ্রীসারদা জীবনী ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূল সুর আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। আবার যুগ-প্রয়োজনোচিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা, কুসংস্কার বর্জিত নির্মল মনো-বৃত্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তথা বুদ্ধিপ্রাখর্য সমুজ্জ্বল।

সমগ্র জগৎ ঘুরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—"হে ভারত ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী......"। তিনি সংঘ-মিত্রা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ, মীরাবাঈ চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিরাট প্রতিভা সম্পন্না তেজস্বিনী নোবল যখন বিবেকানন্দ-চরণে নিবেদিতা হলেন সনাতন ভারতীয় রাজনীতি পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করতে তাকে দিয়েছিলেন অনুজ্ঞা—এ কি কেবলমাত্র স্বাদেশিকতার গোঁড়ামি! বাস্তবিক এ ভাবনার কথা।

শ্রীশ্রীসারদা দেবী প্রায়ই বলতেন—"শান্তি যদি চাও মা, আগে নিজে শান্ত হও।" এর সত্যতা আজ সমগ্র জগৎ বুঝতে পারছে। অ্যাটম্ বোমা আর হাইড্রোজেন বোমার স্পর্ধা জানিয়ে শান্তি প্রস্তাবের মত হাস্যকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?

নারীর উচ্ছল রূপ তার শান্তির নিয়ামক হতে পারে না। বাহিরের

লিষ্ঠ গতি অন্তরের স্নিগ্ধ ভাবের সঙ্গে ালিত হলে দেখা দেয় সুষ্ঠু রূপ। রীসমাজ শান্ত তথা স্ব-প্রতিষ্ঠ হলে ড়ে উঠতে পারবে সুন্দর সমাজ। ন্তমুখীনতার সঙ্গে বহির্মুখীনতার ূর্ণ সমাবেশ হলেই ঘটবে ধর্ম তথা জ্ঞানের সমন্বয়—সম্ভব হবে প্রাচ্য-তীচীর মিলন; প্রতিষ্ঠা হবে জগতে ূর্ণ শান্তি।

নারী-জাগৃতি তাই যুগ-প্রয়োজন, ুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ করলেন ুচনা—সারদাজীবনী সে নব উদ্বোধন াপূর্ব স্নিগ্ধ শান্ত জীবন!—সামান্যতম াঘাত কেহ পায়নি তাঁর কাছে তিনি হলেন সকলের শান্তিনিকেতন। এই ারদা দেবীর তিতিক্ষার কাছে বুঝি বা ীতা চরিত্রও ম্লান হয়ে যায়। অতি নকটে অবস্থান করেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়তম-সান্নিধ্য পাওয়া দূরের কথা, দিনে একটিবার খাওয়াবার সময় কাছে যেতে ারেন সেই আনন্দ অবসরটুকুও যখন অনেক ভক্ত কেড়ে নিলেন, বিন্দুমাত্র াভ প্রকাশ পেলো না সে তিতিক্ষার িমূর্তিতে। তাই মনে হয় সীতা িদেবীকে কোথায় অন্বেষণ করব, এ দেশাগমে যে নারীজনোচিত যাবতীয় াবরার অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে— যাকে অবগাহন করে নিজেকে পবিত্র ি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-প্রচারে নিযুক্তা দেবীর সঙ্ঘনেতৃত্ব, বুদ্ধিমত্তা, এবং পরিচালনা শক্তি, আধ্যাত্মিক ীরতা আমাদের সঙ্ঘমিত্রা লীলাবাঈ র মীরাবাঈ-এর কাহিনী স্মরণ করিয়ে য়।

সর্বকর্ম জড়িত অথচ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এ ছদ্মবেশী মানবী অনেকের ছে রয়ে গেছেন অব্যক্ত, তপস্বিনীর ীর তপস্যার মর্ম থেকে গেল অস্পষ্ট। নভস্মে সচকিতা উমা শিবম্ সুন্দরম্‌কে াভ করার জন্য বরণ করেছিলেন কঠোর পস্যা। সমগ্র নারীজাতির অধোগতিতে ্যথিতা সারদা জগৎকল্যাণ সাধনে নারী-জাতিকে স্ব-মহিমায় সু-প্রতিষ্ঠিতা করার েষ্টায় করে গেলেন অদ্ভুত তপস্যা। "অপর্ণার"ই মত কতদিন শাক পাতা র্যন্ত জোটেনি, শুধু নুন ভাত খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন! কিন্তু সে কঠোরতার সংযম যেন তাঁর একেবারে নিজস্ব। বাইরে তাঁর স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি—সকলকে প্রাচুর্যতে পূর্ণ করে রেখেছেন।

শিশু যেমন মাতৃজঠর হতে শক্তি গ্রহণ করে পূর্ণ শিশুরূপে প্রকাশ পায়, আমাদেরও সজীবতার জন্য ঐ মাতৃ-জীবনী থেকে যাবতীয় উপাদান গ্রহণ করে বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ হতে হবে—তাই ইনি সকলের "মা"।

কবির কল্পনা, সাধকের দিব্যদৃষ্টি, সাহিত্যে পুরাণে ইতিহাসে যে সব কল্যাণী নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছে, যাঁদের পুণ্যস্পর্শে বিকশিত হয়েছে প্রেম, প্রীতি, মাধুর্য; যাঁদের প্রেরণায় বিকাশ লাভ করেছে নরের মহত্ব আর বীর্য—যাবতীয় চরিত্রের ঘনীভূত রূপ পাই ঐ সারদা জীবনে। তিনি যেন বিশ্বকোষ। সকল জটিল প্রশ্নের সমাধান মিলবে ঐ অভি-ধানে। কর্মী ক্রিয়া পদ্ধতির নিষ্ঠা দেখে হবেন বিস্মিত, শিল্পী তার প্রাপ্য সম্মান পেয়ে হবেন কৃতার্থ; গৃহী তার চরমা-দর্শের ইঙ্গিত পাবেন প্রতিটি আচার

অনুষ্ঠানে; সন্ন্যাসী পাবেন আপন মোক্ষ-মার্গের সুনির্দিষ্ট পন্থা।

নিজের সম্বন্ধে সারদা দেবীর গভীর নীরবতা প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে তাঁর বৈশিষ্ট্য সত্য; কিন্তু মহাশক্তির অবগুণ্ঠিত চন্দ্রিমা-কিরণেই যে দশদিক সমুজ্জ্বল; তার উন্মুক্ত রূপ মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রভা সহ্য করার শক্তি কোথায়? সে স্নিগ্ধ কিরণের অন্তরালে সূর্যালোক বুঝি বা প্রত্যক্ষ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কথঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশ উপলব্ধি করে স্বামী প্রেমানন্দ বলছেন—"শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে, ঐশ্বর্যের লেশ নাই, ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মার বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত;—এ কি মহাশক্তি।" এ মূর্তিতে যে বিচার বিভূতি সব স্থির হয়ে গেছে কেবল স্নিগ্ধ ভাব বিকীরণ।

জননী ত শিশুর নিকট স্বমহিমা প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করে না। স্নেহ করুণার মধ্য দিয়া মাতৃস্বরূপের সামান্য মাত্র আভাস পেয়ে শিশু বিস্ময়ে হতবাক্—তার কাছে 'জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী'। সারদাদেবীও যে আমাদের মা। তাঁর শান্ত স্নেহ স্পর্শে মাঝে মাঝে দিব্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। বিস্ময়বিমুগ্ধা নিবেদিতা স্তুতি গাইছেন—"স্নেহময়ী মা আমার তুমি প্রেমপূর্ণা, তোমার প্রেম আমাদের বা জাগতিক প্রেমের ন্যায় উদগ্র ও ভাবোচ্ছ্বাসময় নয়—এই সেই প্রেম যা স্নিগ্ধ শান্তি প্রদানকারী, নিখিল কল্যাণ-বর্ষী ও সর্ব অশুভ-কামনা-রহিত। লীলাচঞ্চল হেমদ্যুতি ভাস্বর তোমার প্রেম।"

বাস্তবিক অপার্থিব এ সারদা চরিত্র, প্রতিটি ভাব পূর্ণতা লাভ করেছে ঐ জীবনে, শুদ্ধাচারিণী, পবিত্রস্বরূপিণী, সরলা সদাবগুণ্ঠিতা কিন্তু স্বাধীনা তেজস্বিনী, প্রবল আচারনিষ্ঠাসম্পন্না বালবিধবারা ছিলেন তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী, তাদের নির্দেশ তিনি হাসিমুখে সলজ্জ বালিকা বধূটির মত নিত্য পালন করে যেতেন; কিন্তু ম্লেচ্ছকন্যা নিবেদিতা যখন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে উপস্থিত হলেন তিনি বিনা দ্বিধায় সাদরে তাকে নিজের ঘরে স্থান দিলেন; সঙ্গিনীদের সাহস হলো না প্রতিবাদ জানাবার, তাঁরা জানতেন এ দেবী-মানবী 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' সারদা-দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়ার মত ছিলেন, প্রতিটি নির্দেশ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন কিন্তু তাঁর অনু-বর্তিনী দাসীমাত্র ছিলেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমক্ষে প্রচুর ফল-মূল উপস্থিত করে সারদাদেবী আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। সর্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ হয় প্রাচুর্যতে সহধর্মিণীর আনন্দ ভেবে মৃদু অনুযোগ জানিয়েছিলেন। সারদাদেবী তৎক্ষণাৎ পূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "......নিশ্চয়ই এ আমার নিজের জন্য নয়"—নীরব ভর্ৎসনা জানিয়ে দিয়ে এলেন আপন কক্ষে। অপরাধী শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন—"ওরে ও রাগ করলে যে আমার সব যাবে।" লোক পাঠিয়ে তাঁর প্রসন্নতা সম্পাদন করালেন। ঘটনাটি সীতা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করিয়ে দেয়। শত বিরহ-বিচ্ছেদ-কাতরা সীতা দেবীর মুখে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শোনা যায়নি। কিন্তু রামচন্দ্র যখন বনগমন প্রাক্কালে সীতাকে সঙ্গে নিতে নানারূপ ভীতি প্রকাশ করতে লাগলেন, তিনি তীব্র তিরস্কার করে বলেছিলেন—"পিতা কি আমাকে পুরুষ নামধেয় ক্লীবের হাতে সমর্পণ করেছেন, যে আপন পত্নীকে সঙ্গে রাখতে ভয় পায়।" সদা রাম-অনুগামিনী সীতার দৃপ্তভঙ্গী আমাদের বিস্মিত করে, বাস্তবিক এঁরা সম্রাজ্ঞী। যিনি সম্রাজ্ঞী তিনিই ভিখারীর বেশে থাকতে পারেন অবিচলিত, যিনি চির-স্বাধীনা, পরাধীনতার গ্লানি করতে পারে না তাঁকে সংকোচিত।

মায়াবতীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত মঠে মূর্তি পূজো নিয়ে ঘটল প্রবল মতানৈক্য, সন্ন্যাসীদের মধ্যে বাদানুবাদ। লেখা হলো শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে। সহজ সরল উত্তর এলো—রামকৃষ্ণের ছেলে সবাই অদ্বৈত ভাবের। দ্বৈত থেকে অদ্বৈত—এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অদ্বৈত মঠে মূর্তি পূজার মধ্যে নেই কোন অসামঞ্জস্য, সুন্দর সমাধান—সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাল।

অস্পৃশ্যতা বর্জন, সার্বজনীনতা, আন্তর্জাতিকতা আদি যাবতীয় আদর্শ সারদাদেবীর দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি কাজের মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। যথার্থ জিজ্ঞাসু ঐ চরিত্র অনুধ্যানে যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ঐশ্বরিক দীপ্তিতে সমুজ্জ্বলা সারদা-দেবীকে দেবী-চরিত্র বলে কেবল পূজো তার শ্রদ্ধা জানালে আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি হবে নিরর্থক। তাঁকে সর্বতো ভাবে জীবনে গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে ভাবিত অনুপ্রাণিত জীবনের অপূর্ব ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্বামীজীর পত্রাবলীতে। তিনি বার বার লিখেছেন—"যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না", "তার ভাব পাছে ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া"; "ভাবের ঘরে চুরি নাই বলিলে বুঝিবে রামকৃষ্ণের সন্তান।" সারদাজীবনীতে অনুপ্রাণিত চরিত্র ও কেবলমাত্র সলজ্জ বধূভাবে গৃহকোণে প্রকাশ পাবে না। মাতৃ-ভাব-রঞ্জিত প্রেম-দৃষ্টিতে যারা করে তোলেন সব কিছু মধুময় তারাই সারদা তনয়া। কোন প্রতি-কূল অবস্থাতেই যে ধৈর্য হারায় না, চ্যুত হয় না আপনার শান্ত স্বরূপ থেকে; অসহিষ্ণু বাক্যবাণে করে তোলে না অপরকে জর্জরিত—সেই যথার্থ সারদা-তনয়া।

কর্মের ভালমন্দ বিচার হয় কর্ম-পদ্ধতি তথা কর্মনিষ্ঠার উপর। বর্তমান সমস্যাবহুল জীবনে নারীজাতিকে নানা কাজে লিপ্ত হতে হয়েছে—ক্ষতি কী? সেখান থেকেই লাভ করতে হবে চরম কল্যাণ, পরমা শান্তি। শুধু দিতে হবে

ইতিহাস না পলিটিক্স?

যোগানন্দ দাস

গত অক্টোবর মাসের শেষ দিকে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের জয়পুরে অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতি ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যে অভিভাষণ দিয়েছেন, সেটি একাধিক কারণে অভিনব হয়েছে। রামা শ্যামা যদু হরি ঐরূপ অভিভাষণ দিলে তার বিশেষ কোনো মূল্য থাকতো না, কিন্তু ডাঃ মজুমদারের ন্যায় একজন উচ্চপদস্থ ঐতিহাসিকের অভিভাষণের একটা 'জাতীয়' গুরুত্ব আছে, যাকে উপেক্ষা করা যায় না। এত দেরীতেও এ বিষয়ে আলোচনা করবার কারণ হল, এই জাতীয়তাবিরোধী ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের পরিপন্থী অভিভাষণ দেবার পরেও, আজও তিনি ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রস্তাবিত সরকারী ইতিহাস সংসদের সভাপতি রয়েছেন।

ডাঃ মজুমদারের অভিভাষণ গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ও তার পরের দিন 'যুগান্তরে' ছাপা হয় এবং সে সম্বন্ধে কোনো প্রকাশ্য প্রতিবাদ তিনি গত দু' মাসের মধ্যে আজ পর্যন্ত করেন নি। সুতরাং সংবাদপত্রের রিপোর্টকে সঠিক ব'লেই ধরে নিতে হবে। তারপরে, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন কাগজে ঐ অভিভাষণের প্রতিবাদে ৯।১০টির বেশী প্রবন্ধ, চিঠি প্রভৃতি বেরিয়েছে। গত দু' মাসের মধ্যে শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, অমল হোম, শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, শ্রীযোগেশ-চন্দ্র বাগল, ধীরেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সুধীবৃন্দ প্রচুর তথ্য ও যুক্তি সহ ডাঃ মজুমদারের বহু ভুল দেখানো সত্ত্বেও তিনি আজ পর্যন্ত নীরব আছেন, এটি উল্লেখযোগ্য।

॥ কংগ্রেস ও নেতাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ॥

যাই হোক, এ বিষয়ে আজ ভারত-বাসীর, বিশেষ করে কোনো বাঙালীর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়, কারণ তাঁর উদ্ধত অভিভাষণে মিথ্যা ইতিহাসের সৃষ্টি করে তিনি শুধু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকদেরই নয়, রামমোহন, কেশব-

হিন্দু মুসলমান খৃশ্চান
মিলনের অগ্রদূত
রাজা রামমোহন রায়

চন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রাণাডে থেকে শুরু করে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, আনন্দমোহন, গোখলে, লাজপত, রবীন্দ্র-নাথ, অরবিন্দ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার ও বাংলার বাইরের সমস্ত মনীষী ও শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অপমান করেছেন ও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃ-ভাব প্রচার করে ভুল করে গিয়েছেন। সুতরাং আজ আমাদের জাতীয় কর্তব্য হল, বিচার করে দেখানো যে, তাঁরা সবাই ভুল করছেন, না, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে একটা চটকদার 'থিওরি' ইতিহাসের নামে খাড়া করবার চেষ্টা করে ডাঃ মজুমদার নিজে ভুল করেছেন।

ডাঃ মজুমদারের অভিভাষণটি পড়লেই মনের মধ্যে যে-ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে, সেটি হল এই ডাঃ মজুমদার বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে ইতিহাস আলোচনা করেন নি, খণ্ড বা একপেশে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে করেছেন এবং পলিটি-শিয়ানের মন নিয়ে করেছেন, যদিও পরে তার সে-কথা অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছেন। পবিত্র শিক্ষামন্দিরে যখন পলিটিক্স ঢোকে, তার চেয়ে বড়ো দুর্দৈব জাতির ভাগ্যে কম ঘটে।

॥ ইতিহাসে বিরোধ ও মিলন ॥

ধর্মে - ধর্মে সম্প্রদায়ে - সম্প্রদায়ে বিরোধের ইতিহাস অতি পুরাতন ইতিহাস, শুধু ভারতবর্ষের নয়, আন্তর্জাতিক ইতিহাস। কিন্তু এই বিরোধের ইতিহাস ইতিহাসের সবটা নয়, আধখানা মাত্র, বাকী আধখানা হল মিলনের বা মিলনের প্রয়াসের ইতিহাস। কোনো দেশের সভ্যতা বা সংস্কৃতির ইতিহাসই সেই দেশের আদিম বা অকৃত্রিম অপরিবর্তিত সভ্যতা বা সংস্কৃতি নয়। বাইরে থেকে পৃথক জাতি তার পৃথক ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে, পরে উভয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়েছে, বিরোধের মধ্যে থেকে মিলনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, নূতন জাতি বা নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু ভারত-বর্ষে নয়, গ্রীসে, পারস্যে, ইংল্যাণ্ডে পৃথিবীর সর্বত্রই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মাঝখান থেকে মিলনের ভিত্তি দীর্ঘকাল ধরে ঐতিহাসিক নিয়মেই গড়ে উঠছিল এবং গত দুই শতাব্দীতে বহিরাগত তৃতীয় শক্তির প্রাণপণ বাধাসৃষ্টি সত্ত্বেও সেই মিলন ক্রমশ দৃঢ়তর হয়েছিল এবং হয়েছিল বলেই স্বাধীনতা সংগ্রাম দানা বাঁধতে পেরেছিল, ও খণ্ডিত হলেও স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে।

ডাঃ মজুমদার তাঁর অভিভাষণে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের উপরেই একমাত্র

দিয়েছেন, সেইটেকেই "ঐতিহাসিক" বলেছেন, 'ভ্রাতৃভাব'কে, মিলনের ... অনৈতিহাসিক বলে উড়িয়ে ... চেষ্টা করেছেন। এক জায়গায় তিনি ... (এখানে ডাঃ মজুমদারের অভি-... থেকে উদ্ধৃত অংশগুলির কয়েকটি ... অক্টোবরের 'যুগান্তর' থেকে নেওয়া, ... নিম্নলিখিত সমস্ত অংশগুলিই ... অক্টোবরের 'আনন্দবাজার ...') :

"কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক-গণ যে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব ... গ্রহণ করিয়া এই ভিত্তির উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই।"

অন্যত্র :

"ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া নিছক মিথ্যের উপর ... প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা যে সফল হইতে পারে না, তাহা আমাদের নেতাগণ এখনও বুঝিতে পারেন নাই।... ... হিন্দু-মুসলমানের ... মিলন ও ভ্রাতৃভাব ... করিয়া ... প্রয়াস পাইয়াছেন।" ...

আবার বলছেন :

"...কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃভাব যে ইতিহাসের ... বিরুদ্ধ ... ইহাই ... করিবার জন্যই এত কথা বলিলাম।"

দুঃখের বিষয় "তাহা" অতি সামান্য-... "প্রমাণিত" করতে পারেন নি। ... করেছেন শুধু নিজের ভ্রান্ত ও ... "ঐতিহাসিক" দৃষ্টি।

আগাগোড়া অভিভাষণটিই এই মনো-... পূর্ণ।

॥ ডাঃ মজুমদারের দ্বিজাতিতত্ত্ব ॥

ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার ... বাহক ও প্রচারক কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং একটি গালভরা শ্লোগান রচনা করেছিলেন, সেটি খুব চালুও হয়েছিল, ... তার বিষময় ফল আজো পৃথিবীর ... জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে। সেটি হল ... :

East is East and West is West
The twain shall never meet.

ডাঃ মজুমদারও দেখা যাচ্ছে, ইতিহাসের ছদ্মনামে একটি নিখিল ভারতীয় অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য অধিবেশনে দাঁড়িয়ে প্রকারান্তরে এই পরম-গরম পলিটিক্যাল শ্লোগান চালাবার চেষ্টা করেছেন :

The Hindu is Hindu,
the Muslim is Muslim
The twain should never meet.

জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্বের এ-পিঠ।

অবশ্য এটা তাঁর মনেরই বাসনা বা 'উইশফুল থিংকিং'। বাস্তব ইতিহাস উল্টো কথা বলে।

ভারতের জনক মহাত্মা গান্ধী
যিনি হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য
জীবন বলি দিয়েছেন

॥ ইতিহাস-বিকৃতি ॥

আকবর, ... শাহ, বাবর বা বাংলার আলাউদ্দীন হুসেন শাহ প্রভৃতির কথা বেমালুম চেপে দিয়ে দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন, সিকন্দর লোদী, আওরংগজেব প্রভৃতি কয়েকটি বাছাই-করা মুসলমান শাসকের উল্লেখ ডাঃ মজুমদার যত্নের সঙ্গে করেছেন, সত্য ইতিহাসের খাতিরে নয় মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করবার জন্য। কারণ, তিনি সম্রাট আলাউদ্দীনের (বা আল্লা-উদ-দীনের) চরিত্র বিকৃত করবার উদ্দেশ্যে একটি মুখরোচক গল্প রচনা করেছেন। আলাউদ্দীনের এক প্রধান মৌলবী হিন্দুদের নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবার জন্য সম্রাটের কাছে তাঁর যে 'মত' প্রকাশ করেছিলেন, সেইটি ডাঃ মজুমদার ফলাও করে উদ্ধৃত করেছেন। আলাউদ্দীন ও মৌলবী এক ব্যক্তি নয়। সব দেশেই গোঁড়া মৌলবী, পাদ্রী বা পুরুত-দের মত উগ্রই হয়ে থাকে। কিন্তু মজার কথা হল এই যে, ওটি মৌলবীর মত মাত্র হিসেবে আলাউদ্দীনের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল, এবং তার পরবর্তী যে জায়গায় আছে যে, **আলাউদ্দীন ঐ মত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন,** সে-অংশটি ডাঃ মজুমদার বেমালুম চেপে গিয়েছেন। হিন্দু মেয়েদের বাঁদী রাখার মতও আলাউদ্দীন গ্রহণ করেন নি, সে-কথাও ডাঃ মজুমদার চেপে গিয়েছেন। এই কি সত্য ইতিহাসের নমুনা? এরূপ 'ইতিহাস' বিকৃতির উদ্দেশ্য কি?

অথচ এর পাল্টা ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, মুসলমান আমলে সম্ভ্রান্ত ও ধনী হিন্দুরা অনেক মুসলমানকে বাড়িতে চাকর রাখতেন এবং তাঁদের দরজায় গরীব মুসলমানরা ভিক্ষে করত।

"Even Mussalman servants were found in their [Hindus'] suite. Before the Hindu aristocracy of wealth, the poor Mussalmans used to come as supplicants and were seen begging at their doors."(১)

যে মুসলমান ইতিহাসকারদের কথা ডাঃ মজুমদার বলেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সম্রাট আলাউদ্দীনের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটি ডাঃ মজুমদারের অঙ্কিত তথাকথিত ঐতিহাসিক চিত্র থেকে অনেক তফাৎ।

॥ সুলতান আলাউদ্দীন ॥

মহম্মদ কাসিম ফেরিশ্তা মুসলমান আমলের গোড়া থেকে আকবর পর্যন্ত পারস্য ভাষায় একটি ইতিহাস রচনা করে যান এবং আলেকজাণ্ডার ডাউ ১৭৬৮ সালে দুই খণ্ডে তার একটি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। (বিগসের আর একটি অনুবাদ আছে)। ডাউ থেকে দেখা যায়, শাসন ব্যাপারে কোনো কোনো বিষয়ে আকবরের চেয়েও উচ্চতর ও প্রগতিশীল ধারণা আলাউদ্দীনের ছিল। আজকের দিনেও সেগুলি বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

১৩০০ খৃঃ আলাউদ্দীন সুশাসন সম্বন্ধে ওমরাহদের কাছ থেকে পরামর্শ চান। সেই পরামর্শগুলি সঙ্গে সঙ্গে কাজে পরিণত করবার জন্য আলাউদ্দীন

(১) রাজ্যের মধ্যে মদ খাওয়া বন্ধ ক'রে দেন **হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে।** মদ খাওয়ার অন্যতম দোষ হিসাবে ওমরাহরা বলেছিলেন যে, মদের নেশায় অনেকে অনেক ভেতরের খবর প্রকাশ করে ফেলেন (যা আজকের দিনেও, এই ১৯৫৩-৫৪ সালেও অনেক ঘটছে)। তিনি নিজে প্রজাদের সামনে উদাহরণ দেখাবার জন্য মদ খাওয়া ছেড়ে দেন ও রাজ-প্রাসাদের সমস্ত মদের বোতল ভেঙে ফেলেন। তাঁর দেখাদেখি আমীর ওমরাহরাও তাই করে। (২)

(২) বিচার এত কঠোর ক'রে দেন যে, ফেরিশ্‌তার আছেঃ

"theft, formerly so common, were not heard of in the land. The traveller slept secure upon the highway, and the merchant carried his commodities in safety from the sea of Bengal to mountains of Cabul, and from Tilling to Cashmere.(৩)

(৩) ধনীর সম্পত্তি সংকোচ করার ব্যবস্থা করেন।

"He then lengthened his hand of violence upon the rich. He seized upon the wealth and confiscated the estates of Mussalmans and Hindus alike....Men in short were almost [brought?] to a level over all the empire.(৪)

দেখা যাচ্ছে, এখানে ধনী নির্যাতনে আলাউদ্দীন হিন্দু-মুসলমান ভেদ করেননি।

(৪) সরকারী আপিসের সমস্ত নজরানা প্রভৃতি বন্ধ ক'রে দেন এবং মাইনে কমিয়ে দেন। ফলে সরকারী কর্ম-চারীদের বিলাস একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায় এবং অনেককে চাকরবাকর ছাড়িয়ে স্ত্রীদের ও সন্তানদের দ্বারা কাজ চালাতে হ'ত। এ সত্ত্বেও চাকরি ছাড়বার হুকুম ছিল না, যতক্ষণ না কর্মচারীরা উপযুক্ত বদলী দিতে না পারছেন।(৫)

(৫) উৎপন্ন শস্য যে-পরিমাণ ট্যাক্স হিসাবে আদায় করা হ'ত, তার জন্য কর্ম-চারী নিয়োগ করে হুকুম দেন যে, গরীব চাষীরা তাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে **নিজেরা** যে হিসেব দেবে, সেই অনুসারে খাজনা আদায় হবে, তার বেশী আদায় করলে কর্মচারীর জরিমানা হ'ত ও বাড়তি অংশ কেড়ে নেওয়া হ'ত। এর জন্য বিশেষ গোয়েন্দা দল নিযুক্ত হয়েছিল। (৬)

(৬) সেনাবাহিনীর মাইনে কমিয়ে দেন। কিন্তু মাইনে কমাতে গেলে যে জিনিসপত্রেরও দর কমাতে হয়। এই আধুনিক দৃষ্টিও আলাউদ্দীনের ছিল। তাই বিশেষ ফার্মান দ্বারা সমস্ত জিনিসের বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের দর অর্ধেক ক'রে দেওয়া হ'ল, যদিও তার দ্বারা রাজকোষের অনেক ক্ষতি হয়। খাদ্যশস্যে একচেটিয়া কারবার বন্ধ করবার জন্য ব্যবস্থা করা হ'ল যে, চাষীরা নিজেদের পরিবারের সংখ্যা অনুসারে যতখানি প্রয়োজন, তত-খানি শস্য ঘরে মজুত রেখে **উদ্বৃত্ত শস্য সরকারী দরে** বাজারে বিক্রী করবে। গঙ্গা ও যমুনার এবং অন্যান্য জলপথের ধারে ধারে গোলাঘর (granaries) তৈরি করা হল। খাদ্যশস্য আমদানীতে উৎসাহ দেওয়া হ'ত, কিন্তু রপ্তানি নিষিদ্ধ হ'ল। **খাদ্য-শস্য রপ্তানির শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।** (৭)

(৭) কাপড়ের দর কমিয়ে দিয়ে কারবারীদের সেই **সরকারী দরে** বিক্রী করতে বাধ্য করেন। রপ্তানি বন্ধের হুকুম হ'ল এবং সরকার থেকে কর্জ (loan) দেওয়ার ব্যবস্থা করা হ'ল যাতে করে কারবারীরা আশপাশের গরীব দেশ থেকে শস্তায় কাপড় আমদানী করতে পারে।(৮) সম্রাট আলাউদ্দীন চোরাবাজারি বন্ধ করবার জন্য এমন পর্যন্ত হুকুম দিয়ে-ছিলেন যে, যে-সওদাগরের অঞ্চলে চড়া দরে খাদ্যশস্য বিক্রী হবে, আগে তাকে ধরে শূলে চড়িয়ে তবে তার কৈফিয়ৎ শোনা হবে। কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক হ'লে তাকে শূল থেকে নামানো হবে, নচেৎ মৃত্যুদণ্ড।

(৮) রাজ্য শাসন ব্যাপারে ধর্মীয় শাসনের অধিকার সংকোচ ক'রে দিলেন। মুসলমান ধর্মানুশাসন অনুসারে কাজীরা যে বিচার করতেন, সেখানেও হস্তক্ষেপ ক'রে আলাউদ্দীন "broke through all laws and customs."(৯) আলাউদ্দী[ন] সম্বন্ধে ফেরিশতা লিখছেন,

"It was with him a comm[on] saying 'That religion had [no] connection with civil governme[nt] but was only the business [or] rather amusement of priva[te] life.'"(১০)

রাষ্ট্র এবং ধর্ম যে আলাদা, এবং ধ[র্ম] যে মানুষের ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) ব্যাপা[র] একথা আজ আমরা বিংশ শতাব্দী[তে] শুনতে পাই। বিস্ময়ের কথা এই [যে] আলাউদ্দীনের এটা বাঁধা বুলি ছি[ল] আজ ৬৫০ বছর আগে।

আলাউদ্দীন গোড়ায় নিরক্ষর ছিলে[ন] কিন্তু নিজের চেষ্টায় পরে পারশী ভা[ষা] [illegible]

[illegible]

[illegible]

॥ আকবর, শায়েস্তা খাঁ, জয়নুল প্রভৃতি ॥

[illegible]

[illegible] হিন্দু [illegible] ছেড়ে দি[য়ে]-ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসীদের জন্য 'ধর্ম-পুরা' নামে, মুসলমান ফকিরদের [জন্য] 'খৈরপুরা' নামে এবং হিন্দু যোগী[দের] জন্য 'যোগীপুরা' নামে পান্থশালা তৈ[রি] করিয়ে দিয়েছিলেন।(১২), এসব তথ্য [illegible] মজুমদার উল্লেখ করেন নি কেন? [illegible] অথচ হিন্দু-মুসলমানের নিত্য [illegible] বিরোধ ও গলা-কাটাকাটির তথ্যকা[হিনী] ঐতিহাসিক চিঠিটি ব্যাহত হয় ব'লে [illegible]

আকবর হিন্দু-মুসলমান মিল[নে] আরো দূর এগিয়েছিলেন। প্রতি বছ[র] শিবরাত্রির দিন যখন দেশের সব [illegible]

কে যোগীরা এসে মিলিত হত, তখন ই মেলায় আকবর যোগ দিতেন (১৩). বর কন্যারাশিতে প্রবেশের অণ্টাহে, র্ব-বিশেষে দরবারে আসতেন কপালে ন্দুদের মত তিলক প'রে এবং হাতে হ্মণের বাঁধা রাখী প'রে।(১৪) সন্ধ্যার তি জ্বালানো হ'লেই আকবরের সংগে ঙ্গ দরবার শুদ্ধ লোককে ভক্তিভরে ঠ দাঁড়াতে হত।(১৫) এরূপ অনেক ণ্টান্ত আছে। ডাঃ মজুমদারের তিহাসে" এসব কথার ঠাঁই নেই।

বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসন-লে টাকায় আট মণ চাল বিক্রী হয়েছে। ই কারণে তিনি মহোল্লাসে ঢাকার পুর্ব-কে একটি তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়ে র ওপর দিব্যি দিয়ে লিখে দেন, নবাবের রাজ্যকালে ফের টাকায় আটমণ ল বিক্রী হবে তিনি যেন ঐ ফটক লেন। পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ড়ায় মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজত্বে চাল কায় ৫।৬ মণ ছিল। এর কিছু পরেই ফরাজ খাঁর সময়ে চাল আবার টাকায় ট মণ হয় এবং সরফরাজ খুব ধুমধাম রে ঐ ফটক আবার খুলিয়ে দেন।

ডাঃ মজুমদার এ-সব কথা এবং প বহু কথা উল্লেখ করেন নি কেন? য়েস্তা খাঁ বা সরফরাজের সময়ে কি সলমানদের জন্য টাকায় আট মণ ও ন্দুদের জন্য আট টাকায় এক মণ ল বিক্রী হত?

মুসলমান আমলে বার্ণিয়ে প্রভৃতি দেশী পর্যটকেরা বাংলা দেশের কি রকম না দিয়ে গিয়েছেন? মোগল রাজত্বের লাদেশকে কি 'জিন্নাৎ-উল্-বেলাদ' স্বর্গভূমি বলা হত? এগুলো কি তিহাসিক কথা, না, ডাঃ মজুমদারের ত, অনৈতিহাসিক?

"কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদীনের নাম (১৪২০-১৪৭০) এই প্রসংগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে রাজ্য শাসন, জিজিয়া কর উচ্ছেদ, হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর প্রজাদের কাছে প্রিয় করেছিল এবং এই কারণেই তাঁর শাসনকাল একটি গৌরবময় যুগ।" (১৬)

॥ ডাঃ মজুমদারের বিরুদ্ধে রামমোহনের সাক্ষ্য ॥

ডাঃ মজুমদার মুসলমান আমলে হিন্দুদের সম্বন্ধে বলেছেন :

"ইহারা কোন রাজনৈতিক অধিকারের দাবী করিতে পারিত না এবং সর্বপ্রকার নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়া কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই ছিল তাহাদের নিয়তি।"

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের উদ্দেশ্যে এত বড় ঐতিহাসিক অসত্য খুব কমই
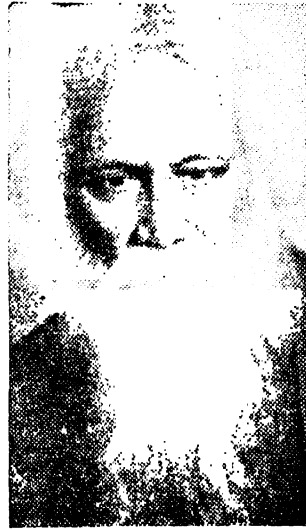
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেখা যায়। যে রামমোহন রায়কে ডাঃ মজুমদার তাঁর নিজের বিকৃত মতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন (যদিও রাম-মোহন রায়ের বাক্য উদ্ধৃত করেন নি), সেই রামমোহন এদেশের ছাপাখানার আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাজার নিকট যে আবেদন করেন, তাতে মুসলমান শাসন সম্বন্ধে লিখছেন,

"Your Majesty is aware, that under their former Muhammadan Rulers, the natives of this country *enjoyed every political privilege in common with Mussulmans*, being eligible to the highest offices in the state, entrusted with the command of armies and to the Government of Provinces and often chosen as advisers to their Prince, without disqualification or degrading distinction *on account of their religion* or the place of their birth.(১৭) (Italics mine)

এ বিষয়ে ভূরি ভূরি নজির থাকা সত্ত্বেও রামমোহন রায়ের বাক্য উদ্ধৃত করলাম এই জন্য যে, ডাঃ মজুমদার নিজেই সার্টিফিকেট দিয়ে বলছেন : "রাজা রামমোহন রায় মুসলমানদের সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র ও রাজনীতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।" ডাঃ মজুমদার নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়েছেন। যাঁকে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনেছিলেন, দেখা যাচ্ছে তিনি অতি দ্বিধাহীন ভাষায় ডাঃ মজুম-দারের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

॥ মন্দির ও মসজিদ ॥

ডাঃ মজুমদার বলেন :

"মুসলমানের মসজিদ ও হিন্দুর মন্দির—এই উভয়ের বাহিরের গঠন অথবা ভিতরের উপাসনা প্রণালীতে কাহারও কোন প্রভাব দেখা গেল না।"

"বাহিরের গঠন" সম্বন্ধে দেখা যাক। ভারতে মুসলমান স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এস্ এস্ ব্রিগস্ কুবাট মসজিদ সম্বন্ধে লিখেছেন :

"Its general character and its ornaments are Persian, but the Hindu tradition may be seen in the same features as at the tomb of Altamash just described."(১৮)

গুজরাটের মসজিদগুলি সম্বন্ধে ব্রিগস্ লিখছেন :

"....such mosque as the *Jami Masjid* at Cambay (1325) and the mosque of Hital Khan *Kazi* at Dholka near Ahmedabad (1333) contains numerous Hindu fragments as well as Hindu ideas, the columnar or trabeated affect being frequently introduced."(১৯)

উত্তর ভারতে, কাশীর নিকটে জৌন-পুরের দু'টি মসজিদের "বাইরের গঠন" সম্বন্ধে লিখছেন,

"....are frankly Hindu, as are the colonnades on either hand. Yet the interior arches and domes are distinctly Muhammadan in character."(২০)

গৌড়দেশের "সোনা মসজিদের" "বাইরের গঠন" সম্বন্ধে লিখছেন,

"The exterior is a monumental and most unusual design combining both Hindu and Saracenic elements, yet remaining decidedly original.(২১)

আমেদাবাদের মসজিদগুলি সম্বন্ধে লিখছেন,

"Here the mosque and other buildings erected by the Muslims are predominantly Hindu in character, in spite of occasional use of arches for symbolical purpose."(২২)

এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাভেল্ এর চেয়েও বেশী বলেন। তাঁর মতে, তাজমহলে এবং অনেক মসজিদের স্থাপত্যে যে পাঁচটি গম্বুজ—মাঝখানে একটি বড় ও চারপাশে চারটি ছোট—এটি হিন্দু মন্দিরের অনুকরণে। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রে এই স্থাপত্যরীতির নাম 'পঞ্চরত্ন'।(২৩)

মসজিদ মাত্রেই, ভিতরের দিকে, পিছনের দেওয়ালে, প্রায় গা-আলমারির সমান মাটি পর্যন্ত বিলম্বিত একটি খালি কুলুঙ্গি মত থাকে। এর নাম 'মেহ্‌রাব্'। এই মেহ্‌রাব্ মসজিদ মাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এরই সামনে নামাজ হয়। হাভেল বলেন যে, মসজিদের গঠনে এই 'মেহ্‌রাব্' বৌদ্ধ মন্দির থেকে নেওয়া। বৌদ্ধ মন্দিরে ঐ জায়গায় বুদ্ধমূর্তি থাকতো।(২৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, "বাইরের গঠনে" মুসলমানের মসজিদে হিন্দুর ও বৌদ্ধের মন্দিরের প্রচুর "প্রভাব" পড়েছে এবং এ বিষয়েও ডাঃ মজুমদারের দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল। ভিতরের উপাসনা সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করলাম না, তাতে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হবে।

॥ পূর্বাস্য — পশ্চিমাস্য ॥

ডাঃ মজুমদার হিন্দু ও মুসলমানকে কোনোমতেই মিলতে দিতে রাজী নন। সুতরাং দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্য দুয়ের মধ্যে কাল্পনিক "মূলগত" প্রভেদ আবিষ্কার করতেও তাঁর আপত্তি নেই। তিনি বলছেন,

"মুসলমানেরা প্রার্থনা করিত পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া, হিন্দুরা পূজা করিত পূর্বাস্য হইয়া। ইহার কারণ নিতান্ত আকস্মিক হইলেও ইহা যে হিন্দু ও

স্বামী বিবেকানন্দ

"In his acceptance of Vedanta, his preaching of Patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu, he (Vivekananda) claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Ram Mohan had mapped out."
— SISTER NIVEDITA.

মুসলমানের সভ্যতা ও সংস্কারের মূলগত প্রভেদের প্রতীক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" (যুগান্তর)

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সত্যের খাতিরে অস্বীকার করতে হচ্ছে। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষের মুসলমানের পক্ষে পশ্চিম-মুখে নামাজ পড়াটা 'আকস্মিক', কারণ, মক্কা ভারতের পশ্চিমে। ইউরোপের মুসলমানেরা পশ্চিমমুখে নামাজ করে না। তবেই, মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কারের পক্ষে পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রার্থনা করাটা 'মূলগত' নয়। সুতরাং দাঁড়াচ্ছে এই যে, ডাঃ মজুমদারের মতে হিন্দুর পক্ষে "পূর্বাস্য" হয়ে পূজা করাটাই আসলে হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কারের পক্ষে "মূলগত"। ডাঃ মজুমদার ঠিক জানেন তো? দুর্গাপূজো থেকে ইতু পূজো পর্যন্ত **সব** পূজোই হিন্দু 'পূর্বাস্য' হয়ে করে বা করত, এই অপূর্ব "ঐতিহাসিক" তথ্যটি ডাঃ মজুমদার কোথায় পেয়েছেন?

সম্প্রতি খবরের কাগজের মারফৎ "শ্রীশ্রী চিত্তেশ্বরী সর্বমঙ্গলা মাতার সেবাইতগণের পক্ষে সেবাইত শ্রীকালী... মুখোপাধ্যায়" জানাচ্ছেন : "আবহমান-কালের প্রথানুসারে পূজারী ব্রাহ্মণ উত্তর-মুখী হইয়াই নিত্যপূজো করেন। দেবীর সম্মুখীন হইয়া পূর্বমুখী বসেন না।" (যুগান্তর, ৪।১২।৫৩, পৃঃ ৪, চিঠিপত্র) কলকাতার ঠনঠনে কালীতলার কালীমূর্তি দক্ষিণমুখী। ভক্তেরা উত্তরমুখে দাঁড়িয়ে পূজা করেন। নিমতলা ঘাট স্ট্রীটে শনিতলায় শনিমূর্তি উত্তরমুখী। ভক্তেরা দক্ষিণমুখে পূজো করেন। আপার সার্কুলার রোডের পশ্চিম ফুটপাথে প্রবাসী আপিসের কিছু দক্ষিণে একটি পূর্বমুখী শিবমন্দির আছে। বরাবর বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দু ভক্তেরা মুসলমানদের মত পশ্চিম দিকে মুখ করে পূজো দিয়ে আসছেন। দাক্ষিণাত্য থেকে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী, ভুবনেশ্বর, কামাখ্যা পর্যন্ত উদাহরণ বাড়াবো না। মোট কথা হিন্দুর "সভ্যতা ও সংস্কারে" পূর্বাস্য হয়ে পূজো করাটা 'মূলগত',—তথ্যের দিক দিয়ে সে-কথা টেঁকে না। ডাঃ মজুমদার মনে রাখবেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুর পুরাণ-তন্ত্রে বিভিন্ন পূজার ব্যবস্থা বিভিন্ন, প্রদেশভেদে সংস্কার ও আচার বিভিন্ন। সূর্য ওঠে পূর্বদিকে, শিব-দুর্গা থাকেন উত্তরে (কৈলাসে), যমের নিবাস দক্ষিণে। সুতরাং হিন্দু মাত্রকেই **সব** পূজো পূর্বাস্য হয়েই করতে হবে বা হত, সেইটেই তার "মূলগত", সর্বকালে **সর্বদেশ ও সর্বসম্প্রদায়গ্রাহ্য** কোন্ হিন্দু শাস্ত্রে একথা আছে?

॥ মূর্তিপূজা, জাতিভেদ ॥

ডাঃ মজুমদার আর একটি তথ্যগত ভুল ইতিহাসের উপর তাঁর হিন্দু-মুসল

দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার টা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

> "মূর্তিপূজা,' জাতিভেদ ও আচার ব্যবহারের কঠোর নিয়ম ছিল হিন্দুর জীবনযাত্রার প্রধান উপাদান আর ঠিক এই তিনটি বিষয়েই মুসলমানের ধারণা ও আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই সাতশ' বছর একত্র বাস করার ফলেও সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানের পূজা পদ্ধতি, ধর্ম বিশ্বাস এবং সামাজিক আচার ব্যবহার যেমন বিপরীত পন্থী ছিল, তেমনই রহিল।" (যুগান্তর)

এখানেও ডাঃ মজুমদার একই ভুল রছেন, সর্বভারতের সকল সম্প্রদায়ের দুর জন্য একই ফর্মুলা দিয়েছেন—র্তিপূজা ও জাতিভেদ।

হিন্দুমাত্রেই মূর্তিপূজক নন, বা তিভেদ মানেন না। বৈদান্তিকরা র্তিপূজা মানেন না। বেদের সময় কেই হিন্দুসমাজের একাধিক অদ্বৈত-ী সম্প্রদায় মূর্তিপূজার বিরোধী। ব্জয়ী শঙ্করাচার্য মূর্তিপূজক লেন না। মুসলমান আমলেও ীর, দাদু প্রভৃতি একাধিক সাধক, দর বহু লক্ষ শিষ্য হয়েছিল, র্তিপূজক ছিলেন না এবং জাতিভেদ তেন না। কবীরের দোঁহা আছে ঃ তি পাতি, কুল কাপরা যেহ সোভা চারি" অর্থাৎ জাতি, পাঁতি, কুল, ড় এ সমুদয়ের শোভা দুই চারিদিন। অক্ষয়কুমার দত্ত বলেন, "ভক্তমালে খত আছে, রামানন্দীদের মতে জাতি-নাই।"(২৫) রামানন্দী সম্প্রদায় বহু ছে। রামানন্দ স্বামীর অনেক শিষ্যের া কবীর প্রভৃতি বারোজন প্রধান। সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীক্ষিতীমোহন সেন-ত্রী বলেন ঃ

> দাদুর সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম সম্প্রদায় বলে, যেহেতু দাদু পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। ইঁহারা বাহ্য মূর্তি প্রভৃতি পূজার বিরোধী বলিয়াও ইঁহাদিগের দলকে সকলে ব্রহ্ম সম্প্রদায় বলিত (পুরোহিত নারায়ণ, সুন্দরসার ১৩ ও ৯৫ পৃষ্ঠা।) পরে মাধবদের ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে নামের গোলমাল বলিয়া ইহার নাম রাখা হইল পরব্রহ্ম সম্প্রদায়(২৬)।

বাংলার আউল বাউল কর্তাভজা তি সম্প্রদায় মূর্তিপূজা বা জাতিভেদ নন না। গত শতাব্দীতে বাংলায় ব্রাহ্মসমাজ, বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ, মাদ্রাজে বেদসমাজ, লাহোরে আর্যসমাজ প্রভৃতি মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ মানতেন না। ১৮৯৬ সালের মধ্যে সারা ভারতে ২৫০টি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

১৯২১ সালের আদমসুমারীর বাংলা দেশের রিপোর্টে আছে ঃ

> Thus, though the number of professed Brahmos is small and has increased but little in the last 20 years, thousands of the intellectual Hindus of Bengal have been so profoundly influenced by the monotheistic ideas of the Brahmo Samaj as really to be Brahmos at heart though they have not actually joined the Samaj.(২৭)

পরে, আর্যসমাজের প্রভাব অনেক বেশী বিস্তৃত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। আজও হিন্দুসমাজে 'জাত-পাত-তোড়ক-মণ্ডল' রয়েছে।

তা ছাড়া, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারেই মূর্তিপূজা হিন্দুর পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। ওটি "দুর্বলাধিকারীর" সাধনা মাত্র। দেখা যাচ্ছে উপনিষদের যুগ থেকে গত শতাব্দী পর্যন্ত, যুগে যুগে হিন্দু-সমাজে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন হয়েছে। যাঁরা করেছেন তাঁরা সবাই হিন্দু।

সুতরাং মুসলমানের সঙ্গে "মূল-গত" প্রভেদ হিসাবে ডাঃ মজুমদারের মূর্তিপূজা ও জাতিভেদের যুক্তিও টেঁকে না।

রামমোহন রায় নিয়ে এখানে কোনো আলোচনা করলাম না, কারণ তাঁর সম্বন্ধে ডাঃ মজুমদার যে-কয়টি চমকদার কথা বলেছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটি ভুল এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় একাধিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বেরিয়ে গিয়েছে।

॥ উপসংহার ॥

মোট কথা, হিন্দু ও মুসলমান সম্বন্ধে ডাঃ মজুমদার তাঁর অভিভাষণে জিন্নার পাল্টা যে হিন্দু দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করেছেন, ইতিহাসের বিচারে সেটি ধোপে টেঁকে না, কারণ তত্ত্বটিই ভুল। হিন্দু-মুসলমান বলে নয় বা ভারতবর্ষ বলে নয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশে যে-কোনো দুটি জাতি সাত শো বছর পাশা-পাশি বাস করা সত্ত্বেও কোনো জায়গায় ধর্মে, সমাজে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, বিশেষ করে ধর্মে ও সমাজে তাদের মিলন বা মিশ্রণ ঘটল না,

শুধু তারা বিরোধের মধ্যেই যুগ-যুগ কাটিয়ে গেল, শুধু অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও অপমানের উপর দাঁড়িয়ে একটা রাজ্য-শাসনধারা সাতশো বছর টি'কে রইল, এ সব সর্বকালের সর্বদেশের ইতিহাসশাস্ত্রের মূল নীতির বিরুদ্ধ কথা। ডাঃ মজুমদারের পূর্বে আর কোনো খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এই উদ্ভট তথাকথিত "ঐতিহাসিক" থিওরি প্রকাশ্যে দেবার সাহস করেন নি।

এটি হল একশ্রেণীর উৎকট সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ঐতিহাসিকের উগ্রতর প্রতিধ্বনি। ইংরেজ মুসলমানকে হারিয়ে এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য কায়েম রাখবার জন্য তার বিপদস্বরূপ যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন তাকে নষ্ট করবার জন্য যে 'ঐতিহাসিক' কৌশল নিয়েছিলেন, সেটি হল এই যে, মুসলমান আমলে মুসলমান অত্যাচারকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো এই উদ্দেশ্যে যে, 'দেখ দেখ, ব্রিটিশ শাসন কি মহৎ, কি উদার, কোন নিদারুণ লাঞ্ছনা, অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে তোমাদের উদ্ধার সে করেছে!' ডাঃ মজুমদার কি আজকের দিনে, এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সেই পুরোনো বুলি আমাদের আবার নূতন করে শোনাতে চান?

গত ও বর্তমান শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব প্রচার করে এদেশের নেতারা ও কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-সম্মত কাজই করেছিলেন, কিছুমাত্র ভুল করেন নি। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যে কল্পিত তফাৎ ডাঃ মজুমদার দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তার চেয়ে দশ গুণ তফাৎ ছিল ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চম ও পারিয়ার। মুসলমান ঘরে ঢুকলে হয়ত তৈজসপত্র ধুয়ে শুদ্ধ করতে হত, অন্নজল ফেলে দিতে হত। কিন্তু ঐতিহাসিক ডাঃ মজুমদার কি জানেন না যে, ঘরে ঢোকা দূরে থাকুক, দূর থেকে পারিয়ার ছায়া মাড়ালেও ব্রাহ্মণকে স্নান করে শুদ্ধ হতে হত? হিন্দু ও মুসলমান গ্রামের মধ্যেই পৃথক পল্লীতে বাস করত। পারিয়াকে গ্রামের বাইরে বাস করতে হত। এদেশে চণ্ডালের নামই ছিল অন্তেবাসী। তবে কি ডাঃ মজুমদারের "ঐতিহাসিক" যুক্তি এই যে, পারিয়া বা হরিজনদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা বা তাদের নিয়ে জাতি গঠন করাটা ইতিহাসবিরুদ্ধ নীতি?

ইউরোপের দেশে দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইহুদী ও কৃশ্চান বাস করে এসেছে। ইহুদীরা এক সময়ে জঘন্য ঘেটোয় (ghetto) বাস করতে বাধ্য হয়েছে। কোনো রাজনৈতিক অধিকারই তাদের ছিল না। মুসলমানের আমলে তবু হিন্দুর জন্য কোনো পৃথক 'ঘেটো' ছিল না। এসব সত্ত্বেও কি সেখানে তারা কৃশ্চান-ইহুদীর বিরোধটাই 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়ে জীইয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে? দুইয়ে মিলে ইংলণ্ডে ইংরেজ জাতি, ফ্রান্সে ফরাসী জাতি, জার্মানীতে জার্মান জাতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক নিয়মেই গড়ে ওঠে নি?

হিন্দু-মুসলমানের দ্বিজাতিতত্ত্বে অন্ধ হয়ে ডঃ মজুমদার কি এদেশের ইতিহাস, কি আন্তর্জাতিক ইতিহাস সমস্ত নজিরই যেভাবে দু' পায়ে মাড়িয়ে গিয়েছেন এবং যে জাতীয়তাবিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে করে গভীর আশংকা হয়, তিনি যদি প্রস্তাবিত জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস সম্পাদন করেন বা তার সংস্পর্শে থাকেন, তবে সেটি কি বস্তু হবে তাই ভেবে। ভারত সরকারের সময় থাকতে এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

॥ প্রমাণ পঞ্জী ॥

(১) Proceedings of the Indian History Congress, 1939 p. 721.

(২) ডাউ-এর ফেরিশতা, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭৪

(৩) ঐ, পৃঃ ২৭৩-৪ (৪) ঐ, পৃঃ ২৭৪

(৫) ঐ, পৃঃ ২৭৫ (৬) ঐ, পৃঃ ২৭৫

(৭) ঐ, পৃঃ ২৭৮ (৮) ঐ, পৃঃ ২৭৬

(৯) ঐ, পৃঃ ২৭৫ (১০) ঐ, পৃঃ ২৭৭

(১১) বাদাউনির 'আকবর'। ইলিয়ট কর্তৃক অনূদিত ও অধ্যাপক জন্ ডসন কর্তৃক সম্পাদিত। সুশীল গুপ্তের সংস্করণ পৃঃ ৬২। আকবরের ইতিবৃত্ত তাঁর অনুরাগী আবুল ফজল প্রভৃতি অনেকেই লিখে গিয়েছেন। আমি এখানে ইচ্ছা করেই বাদাউনির বৃত্তান্ত নিলাম, কারণ তিনি আকবরের অনুরাগী ছিলেন না, বিরোধী ছিলেন। মুসলমান আমলের অনেক দুষ্প্রাপ্য ইতিহাস ছোট ছোট বই আকারে সুশীল গুপ্ত প্রকাশ করছেন।

(১২) বাদাউনি, পৃঃ ৭০ (১৩) ঐ পৃঃ ৭১

(১৪) ঐ, পৃঃ ৬২ (১৫) ঐ, পৃঃ ৬২

(১৬) শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস: 'ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা', পৃঃ ৩৮

(১৭) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজী পুস্তিকা (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত) *Rammohun Roy and Modern India*, ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(১৮) M. S. Briggs : "Muslim Architecture in India" in *Legacy of India*, edited by G. T. Garratt p. 241.

(১৯) ঐ, পৃঃ ২৪২ (২০) ঐ, পৃঃ ২৪৩

(২১) ঐ, পৃঃ ২৪৫ (২২) ঐ, পৃঃ ২৪৮

(২৩) E. B. Havell : *Indian Architecture*, p. 24.

২৪) ঐ, পৃঃ ৫-৬

(২৫) অক্ষয়কুমার দত্ত : 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', পৃঃ ২৮

(২৬) ক্ষিতিমোহন সেন : 'দাদূ', পৃঃ ৩৫

(২৭) *Census*, 1921, Vol. V Bengal, Part I, p. 163.
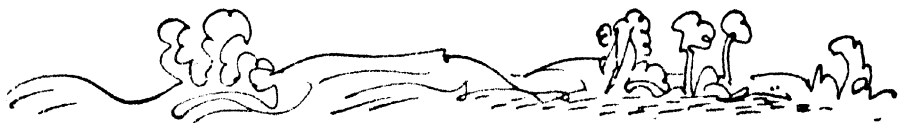
ইন্দ্রজিতের আসর

নিজেকে ক্ষুদে জন্‌সন্ হিসেবে জাহির করতে চেয়েছি বলে াপনাদের মুখে মুখে যে কৌতুক-হাস্য াচ্ছুরিত হয়েছে, সেটি পুরোপুরি ামার চোখ এড়িয়ে গেছে এমন কথা াববেন না। নিশ্চয় ভেবেছেন, লোকটার াস্পর্ধা কম নয়। মারি তো গণ্ডার, ূটি তো ভাণ্ডার আর হবেন তো াবেন একেবারে ডক্টর জন্‌সন্! আসলে াটা আস্পর্ধার কথা নয় বরং যথেষ্ট বনয়ের সঙ্গেই কথাটা বলেছি। তাছাড়া ান্‌সন্ হবার কথা তো বলিনি, বলেছি াুদে জন্‌সন্ হতে চাই। আমি শাস্ত্র-াাক্য ছাড়া এক পা চলি না, ডক্টর জন্‌সন্‌ও চলতেন না। শাস্ত্রে বলেছে, মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, পৃথ্বী যেমন বিপুলা, কাল যেমন নিরবধি, মহাজন তেমনি অসংখ্য। অনেক মহাজনকে তো যাচাই করে দেখলুম—এঁরা এত বেশী গুণ দাবী করেন যে, সে আমার কড়িতে কুলোয় না। অর্থাৎ অধিকাংশ মহা-পুরুষরা এমন সব অসম্ভব গুণের অধিকারী যে, তাঁরা একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে। এক কথায় মহাপুরুষেরা কেউ বড় সহজ ব্যক্তি নন। তেমন তেমন মহাপুরুষের সঙ্গে নিজেকে মিলাতে গিয়ে দেখি, একটি একটি করে গুণগুলো বাদ দিয়ে বিয়োগ ফল গিয়ে দাঁড়ায় শূন্যে। বিয়োগান্ত নাটক আর কাকে বলে! আমি তো বলি, মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছে কেবলমাত্র সাধারণ মানুষকে ছোট করবার জন্যে। একথা নিশ্চিত যে, মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে সাধারণ মানুষের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়ে যায় না। ক্রমাগত নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করা মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

একমাত্র জন্‌সনকে দেখলুম মানুষটা নির্জলা মানুষ—অতিমানুষ নন। গুণ অঙ্কটা যে আসলে যোগ অঙ্ক সেটা জন্‌সনকে দেখেই প্রথম বুঝলুম। খুব ছোট ছোট জিনিসের যোগে ওঁর গুণ-গুলো তৈরি হয়েছে। সে সব গুণ নিতান্ত নির্গুণ লোকরাও ইচ্ছে করলে আয়ত্ত করতে পারে। আর ডক্টর জন্‌সন্-এর যে সব দোষ ছিল (তার সংখ্যাও বড় কম নয়), সে সব দোষ আমরা রীতিমতো বুক ফুলিয়েই বলতে পারি, আমাদেরও আছে। সবাই জানেন, তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তা রূঢ়বাক্য প্রয়োগে আমি জন্‌সন্‌কে অনায়াসে ছাড়িয়ে যেতে পারি। আর তেমন অবস্থায় পড়লে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য-সম্রাটটি যে হাতাহাতি মারামারি করতেও পিছপা হতেন না, সে কথাও আমাদের জানা আছে। সে বিষয়ে আমরাও পিছপা নই। আমার জীবনে এমন ঘটনা হামেশা ঘটে থাকে। এই সেদিন একজনের সঙ্গে আমার একপালা হয়ে গেল। হাতাহাতিটা যে হয়নি, সে আমি নিতান্ত ক্ষুদে জন্‌সন্ বলেই পুরোপুরি জন্‌সন্ হলে আর রক্ষে ছিল না।

থিয়েটার-এ তাঁর নির্দিষ্ট আসনটি অপর ব্যক্তি দখল করে বসেছিল বলে জন্‌সন্ চেয়ারশুদ্ধ লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন, সে কথা আপনারা সবাই জানেন। এমন গর্হিত কার্য মহা-পুরুষ আখ্যাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি জীবনে করেছেন বলে আমি শুনিনি। চেয়ার এবং চেয়ারাসীন ব্যক্তি দু-এরই হয়তো তাতে অঙ্গহানি ঘটেছিল; কিন্তু এই ঘটনায় জন্‌সনের মহাপুরুষত্বের বিন্দুমাত্র হানি হয়েছে বলে আমি মনে করিনে। আমার তো বরং এর ফলে ডক্টর জন্‌সন্-এর প্রতি ভক্তি বেড়েই গিয়েছে। এই একটি খাঁটি মানুষ, যিনি রাগ হলে রাগেন, হাসি পেলে হাসেন, খিদে পেলে খান। এমন নিকট আত্মীয় মানুষ মহাপুরুষদের মধ্যে কখনো খুঁজে পাবেন না। মহা-পুরুষরা নিতান্তই মননরাজ্যে বাস করেন, ওঁদের যে একটা শারীরী জীবনও আছে কিম্বা থাকতে পারে, সে কথা দিব্য আমাদের ভুলিয়ে দেন। যে কবি 'মানস সুন্দরী' রচনা করেছেন, তাঁরও যে দু'বেলা খিদে পাওয়া সম্ভব, সে কথা ভাবতে আমাদের সংকোচ লাগে। আমা-দের জৈব প্রয়োজনগুলো দৈবাৎ তাঁদের প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—আজ যে মৌরালা মাছের ঝোলটি রেঁধেছিলে, তাতে ভারি একটি সুন্দর তার ছিল—বলবার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি অনুক্ত ইঙ্গিত থেকে যায়—মনে হয়, আমরা সাধারণ মানুষেরা বৈঠকখানা বাজার থেকে যে মৌরালা মাছ কিনে নিয়ে আসি, ওটা বোধ হয় সে মাছ নয়। ওঁর মৌরালা মাছ খুব সম্ভবত মানস সরোবরে জন্মায় এবং উক্ত মৎস্য আদৌ খাদ্য কি না সে বিষয়ে মনে সন্দেহ থেকে যায়।

যাক, এ সব কথা অবান্তর। আসল কথা হল, দোষে গুণে মিলিয়ে জন্‌সন্ এবং আমি—বেশ বুঝতে পারছি জন্‌সন্-এর সঙ্গে এক নিশ্বাসে নিজের নাম উচ্চারণ করছি বলে মনে মনে আবার আপনারা চটছেন—কিন্তু কি করব বলুন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ আমাদের দুজনকে কতকটা এক ছাঁচেই ঢালাই করেছেন। জন্‌সন্ এবং আমার দুজনেরই এক কথা—ভালো মানুষ নইরে মোরা ভালো মানুষ নই, গুণের মধ্যে ঐ আমাদের গুণের মধ্যে ঐ। অর্থাৎ কিনা আমরা অযথা ভালোমানুষি দেখাই না। আমরা যা আমরা তা-ই। ওটাই হল মানুষের সর্বোত্তম গুণ। অবশ্য ভালো মানুষ না হওয়ার গুণটা হল অলৌকিক গুণ। লৌকিক গুণের কথা যদি বলেন তো বলব, জন্‌সন্ আড্ডাচারী মানুষ, আমিও আড্ডাচারী মানুষ। ব্যস্, আর কোনো গুণের প্রয়োজন নেই। ঐ এক গুণেই আমাদের সহস্র দোষ ক্ষালন হয়ে গেছে।

আড্ডাচারী হিসেবে জন্‌সন্-এর চাইতে একদিকে আমি শ্রেষ্ঠ। জন্‌সনের আড্ডায় উনি হচ্ছেন একচ্ছত্র সম্রাট। নিজ মুখেই বলেছেন—My tavern chair is my throne. ওঁর আড্ডায় উনি বক্তা আর সবাই শ্রোতা। অপর কেউ যদি বা কথা বলেন, সে কেবল ওঁকে কথা বলার সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমাদের আড্ডায় আমরা সবাই সমান। রাজাও নেই, প্রজাও নেই, আমরা

সবই উজীর। আমরা সবাই কথা বলি, কেউ শুনি না। ওটাই আড্ডার আদর্শ রূপ। ওখানে ডিক্টেটর প্রথা অচল। জন্সন্-এর আড্ডায় এমন যে বাগ্মী কুলতিলক বার্ক, তিনিও নির্বাক শ্রোতা ছিলেন। অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর—এ অবস্থাটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। জন্সন্-এর সাধারণ কথা-বার্তাও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল বলেই রক্ষে, নইলে এ ধরনের আড্ডা নিতান্তই গুরুমশায়ের পাঠশালায় পরিণত হত।

আর সব যাই হোক, একদিক দিয়ে জন্সন্ আমাদের সবাইকে মেরে দিয়ে-ছেন। ও'র বস্ওয়েল ছিল, আমাদের নেই। ভেবেছিলাম ক্ষুদে জন্সন হিসেবে আমারও একটি ক্ষুদে বস্ওয়েল জুটবে। দুঃখের বিষয়, সাগরেদ যে ক'টি জুটেছে তাঁরা সবাই সেয়ানা। বস্ওয়েল হবার আগ্রহ কারো নেই, সবাই জন্সন্ হতে চান। ঐ যে বলেছি, আমাদের রাজতন্ত্রও নয়, প্রজাতন্ত্রও নয়, আমাদের উজীরতন্ত্র, ঐটিতেই মুশকিল করেছে। আমরা সবাই সমান—কথাটা শুনতে ভালো, কিন্তু দেখলুম কার্যত বড় সুবিধের নয়। ওঁদের যে বলব, বাপু হে, আগে কিছু-দিন বস্ওয়েলি কর, পরে রয়ে সয়ে জন্সন্ হয়ো—সে কথা বলতে সাহস হয় না, পাছে আড্ডাটাই ভেঙে যায়।

তা এখনও একেবারে আশা ছাড়িনি। স্বয়ং জন্সন্-এর বস্ওয়েল জুটেছিল পঞ্চান্ন বছর বয়সে। তা ছাড়া তখন ডক্টর জন্সনের খ্যাতি সারা ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার এখনও পঞ্চান্ন হতে ঢের দেরী। আর খ্যাতির কথা যদি বলেন, সেটা তো এই সবে ছড়াতে শুরু করেছে। ধৈর্য ধরে বসে আছি, আশা করছি আমার ক্ষুদে বস্ওয়েলটি যথা-সময়ে এসে দেখা দেবেন। আগে থেকেই অভয় দিচ্ছি, মরবার আগে এমন সার্টি-ফিকেট দিয়ে যাব, কোনো ম্যাকলের সাধ্যি থাকবে না আমার বস্ওয়েলকে ইডিয়ট্ আখ্যা দেয়।

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের দৃষ্টিতে আওরঙজীব

শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

[সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের রচয়িতা গোলাম হোসেন তবতবার পূর্বপুরুষ পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। আঠারো শতাব্দীতে এই পরিবার বিহারে বসবাস শুরু করেন। গোলাম হোসেন স্বয়ং নবাব আলীবর্দী দেওয়ান রামনারায়ণ, মীরকাসিম প্রভৃতির অধীনে পদস্থ কর্মচারীর কাজ করেন। তাঁর গ্রন্থটি সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকাল পলাসীর যুদ্ধ এবং বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার একটি প্রামাণ্য সমসাময়িক ইতিহাস।]

মোগল সম্রাট আওরঙজীবের রাজত্ব-কালে এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বেশ কয়খানি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করা হয়েছিলো। এগুলির মধ্যে মহম্মদ কাজিমের আলমগীর-নামা ও সাকী মুস্তাদ খাঁয়ের মাসির-ই-আলমগীরি সরকারী কাগজপত্রের ভিত্তিতে ফরমায়েসী-ভাবে সংকলন করা হয়েছিলো। বেসরকারী ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে হাসেম আলী বা খাফী খাঁয়ের মুন্তাখাব-উল-লুবাবই প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া ঈশ্বরদাস নাগর, শিহাবুদ্দিন তালিশ ইত্যাদির রচনাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আঠারো শতাব্দীর অষ্টম দশকে রচিত গোলাম হোসেনের সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণ (বর্তমান কালের পর্যালোচনা) এর মধ্যে এই পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজত্বকালের যে একটি বিবরণ আছে, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

গোলাম হোসেনের আওরঙজীব প্রসঙ্গের মধ্যে যে বস্তুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে লেখকের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী। পূর্ববর্তী ইতিহাসকারের মধ্যে মাত্র খাফী খাঁই আওরঙজীবের শাসনপ্রণালী বা কার্যক্রমের ভুলভ্রান্তির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গোলাম হোসেনের রচনা সে তুলনায় অনেক বেশী সমালোচনা-কণ্টকিত। বস্তুত কোনো মুসলমান ঐতিহাসিকই আওরঙজীবের ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি ও শাসননীতির এরূপ বিরুদ্ধ বিবরণ দেন নি।

লেখকের নিজের স্বীকৃতি অনুসারে সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের বিষয়বস্তু হচ্ছে আওরঙজীবের পরবর্তী বাদশাহ প্রথম শাহ আলম থেকে বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালের ও ঐ সময়কার অযোধ্যা ও বাংলার সুবেদারদের ধারাবাহিক ইতিহাস (১৭০৭-১৭৮৩)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আওরঙজীবের রাজত্বকাল এই গ্রন্থের বিষয় বহির্ভূত। অথচ লেখক তাঁর রচনার শেষভাগে অতর্কিতে আওরঙ-জীবের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

গোলাম হোসেন প্রথমেই দুইজন পূর্ববর্তী লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন প্রখ্যাত খাফী খাঁ এবং আর একজন নিয়ামত খাঁ আলী। খাফী খাঁ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে, তাঁর লেখার মধ্যে সম্রাটের সৎকার্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি দুইয়েরই সমান উল্লেখ আছে এবং কালোপযোগী যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করলেও তিনি আওরঙজীবের ভণ্ড ও কপট চরিত্র প্রকাশ না করে পারেন নি। নিয়ামত খাঁ আলির গোলকুণ্ডা অবরোধের বিবরণ গোলাম হোসেনের আর একটি ঐতিহাসিক উপাদান।

আওরঙজীবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শিয়া সুলতানদ্বয়ের বিরোধের বিস্তৃত বিবরণই গোলাম হোসেনের আওরঙজীব প্রসঙ্গের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে উক্ত সম্রাটের শাসননীতি ও চরিত্রের যে সমালোচনা আছে, সেইটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে গোলাম হোসেন যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, আধুনিক ঐতিহাসিক-দের সুচিন্তিত অভিমতের সঙ্গে তার প্রায় সম্পূর্ণ মিল আছে।

আওরঙজীবের প্রকৃতি সম্বন্ধে গোলাম হোসেনের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃতি-যোগ্য। "এই নৃপতি ধার্মিকতা ও ত্যাগের ছদ্মবেশের অন্তরালে তাঁর সীমাহীন লোভ ও অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে লুকিয়ে রাখতে

...েন। তিনি ছিলেন সুচতুর বিচক্ষণ কৌশলী। তাঁর পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও ...দের ওপর তিনি নির্মম অত্যাচার করেছিলেন।" গোলকুণ্ডার পতনের বর্ণনায় গোলাম হোসেন আওরঙজীবের ... নিন্দায় একেবারে মুখর হয়ে ...ছেন। তিনি লিখছেন,—"পাঠকবর্গ আওরঙজীবের একরোখামি, অর্থ-লোলুপতা, অগণিত কূটকৌশল এবং ...ক প্রতারণার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করুন এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য করুন যে, তাঁর ক্ষমাহীন বৈরনির্যাতন, ... আকাঙ্ক্ষা এবং প্রকাশ্য দৃষ্টান্তের ... তিনি কিভাবে কৃতঘ্নতা, প্রতারণা বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিতেন।" আওরঙজীব সম্বন্ধে এ ধরনের কঠোর ... আর কোনও লেখকের কাছ থেকে ... যায় না।

সম্রাটের শাসননীতির বিভিন্ন কার্য-... যে সমালোচনা গোলাম হোসেন ...ছেন, সেগুলির দৃষ্টিভঙ্গী এখনকার ...দের প্রগতিবাদী লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর ...রূপ। আওরঙজীবের নিরানন্দ ...নুসরণ, শিল্প ও সৌন্দর্যবিরোধী ...ভাব, মুসলিম ধর্মের অননুমোদিত ... বহুদিনব্যাপী রীতিনীতির প্রচলন-... মোল্লা ও কাজীদের লালন ও প্রশ্রয় ... জিজিয়ার পুনঃপ্রবর্তন সমস্ত কিছুই গোলাম হোসেনের লেখায় সুস্পষ্টভাবে নিন্দিত হয়েছে। মোগল সরকারে নিযুক্ত ... সমস্ত হিন্দু কর্মচারীদের অপসারণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ঐ সব রাজভক্ত ও সুবিনীত কর্মচারীরা ছিলো শাসনচক্রের অপরিহার্য অংশবিশেষ। ...সিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি রাজপুত সেনাপতিদের সঙ্গে আওরঙজীবের ...ব্যবহারের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, "তাঁর সেবানুরক্ত কতিপয় হিন্দু সামন্তদের প্রতি তাঁর ব্যবহার খুবই অদ্ভুত। এঁদের স্বজাতি ও স্বধর্মী ...দের প্রতি তাঁর একটি স্বভাববিদ্বেষ ছিলো।" জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তনের প্রত্যাহারের আবেদনকারী দিল্লীর হিন্দু জনতাকে নিষ্ঠুরভাবে ছত্রভঙ্গ করার নিন্দা করে গোলাম হোসেন মন্তব্য করেছেন যে, "এই নৃশংসতা ও কট্টরচিত্ততার পরিণাম শুভ হয়নি।" যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর ছলনা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা মাড়োয়ার অধিকারপ্রচেষ্টা ও তৎসংক্রান্ত রাজপুত-যুদ্ধেরও একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণে দেওয়া আছে। রাজপুত-যুদ্ধের একটি বিশেষ পর্যায়কে গোলাম হোসেন গুরুত্ব প্রদান করেছেন—সেটি হচ্ছে, শাহজাদা আকবরের বিদ্রোহ। নির্মম পিতার প্রতিহিংসার আতঙ্কে অভিভূত হয়ে শাহজাদা শেষ পর্যন্ত পারস্য সম্রাটের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। তদানীন্তন পারস্য সম্রাট সুলেমান শাফির ঔদার্য আতিথেয়তা এবং সহৃদয়তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লেখক প্রায় আত্মহারা হয়ে পড়েছেন।

দক্ষিণাপথে আওরঙজীবের পৌনঃপুনিক সমরোদ্যমের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গোলাম হোসেন উক্ত সম্রাটের সন্দেহপরায়ণতার ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে অগণিত সৈন্য, অফুরন্ত রাজভাণ্ডার এবং অনেক রাজভক্ত ও রণদক্ষ সেনানী থাকা সত্ত্বেও সম্রাট যে বিফলমনোরথ হয়েছিলেন তার মূলে ছিলো তাঁর সন্দেহপরায়ণ, কুটিল ও পরপ্রশংসাকাতর মনোবৃত্তি। এই প্রসঙ্গে লেখকের চূড়ান্ত অভিমত উদ্ধৃতি-যোগ্য—"জীবনের বহু বৎসর সেই সব অভিযানে ব্যাপৃত করে এবং সাম্রাজ্যের কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করার পর তিনি উপলব্ধি করলেন যে, দাক্ষিণাত্যকে করতলগত করার আশা এখনও সুদূর-পরাহত। উপরন্তু তিনি মারাঠাদের এমন-ভাবে অবিরাম সংগ্রাম ও শ্রমসাধ্য সৈন্য-চালনায় পারদর্শী করে তুললেন যে, তাঁর মৃত্যুর কিছু পরেই তারা বন্যার মতো সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশগুলিকে পর্যুদস্ত করলো এবং অসংখ্য মুসলমানের প্রাণ সংহার করলো।"

মোগল সম্রাট আওরঙজীবের নির্ভর-যোগ্য ইতিকথা হিসাবে সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, একথা স্বীকার করা বাহুল্যমাত্র। প্রথমত লেখকের মৌলিকতার অভাব। কিন্ত মৌলিকতাই ইতিহাসের একমাত্র মাপকাঠি না হতেও পারে। বিশেষত আওরঙজীবের শাসন-নীতি ও তাঁর প্রকৃতি যে মোগল সাম্রাজ্যের পক্ষে কতদূর সর্বনাশা হয়েছিলো, এ ধারণা তাঁর সমসাময়িক ইতিহাস-রচয়িতাদের মনে উদয় হওয়া সম্ভব হয়নি সময়ের ব্যবধানস্বল্পতার জন্য। সেদিক দিয়ে মৌলিক ও সমসাময়িক না হওয়া সত্ত্বেও আওরঙজীবের ইতিহাস হিসাবে হয়তো সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের সার্থকতা আছে।

সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের দ্বিতীয় ত্রুটি হচ্ছে এর একদেশদর্শিতা। একজন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের পক্ষে গোঁড়া সুন্নী মুসলমান আওরঙজীবের ছিদ্রান্বেষী হওয়াই স্বাভাবিক; বিশেষ করে যখন এই সম্রাট দাক্ষিণাত্যে দুইটি শিয়া রাজ্যের বিনাশসাধন করেছিলেন। তাই গোলাম হোসেনের লেখার মধ্যে বিজাপুর ও বিশেষ করে গোলকুণ্ডার সুলতান আবুল হাসানের গুণকীর্তন এবং পারস্যের শিয়াপন্থী সম্রাটদের সসম্ভ্রম প্রশস্তি একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, স্বসম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও গোলাম হোসেন ইতিহাসের নিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হননি। তার প্রমাণ আওরঙজীবের শাসকোচিত গুণাবলী ও বিপদের মুখে তাঁর অসামান্য সাহসের নিদর্শনও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, মোগল সম্রাটের রাজত্বকাল এবং তাঁর শাসননীতির আধুনিক মূল্য নিরূপণের সঙ্গে এই আঠারো শতাব্দীর মুসলমান লেখকের সিদ্ধান্ত ও মতবাদের প্রায় পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি হাজি মুস্তাফাকৃত সিয়ার-উল-মুতাক্ষরিণের ইংরেজী অনুবাদের বাংলা তর্জমা।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত
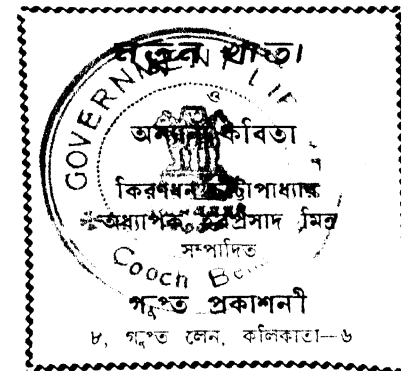
রেলের গাড়ীতে উঠেই ছোট ছেলে-মেয়েদের গাড়ীর গতিটা জানতে খুব ইচ্ছা হয়। অনেক সময় তারা ঘড়ি দেখে এবং মাইল পোস্ট দেখে দেখে গতি নির্ণয় করে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের এ কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক কারণ ছোট বেলা থেকেই তারা তাদের পাঠ্য পুস্তকে পড়ে আসছে যে, বাষ্পীয় পোত "ছয় ঘণ্টায় চলে যায় ছ'দিনের পথ।" ট্রেনে উঠে মনে হয় যেন মোটর
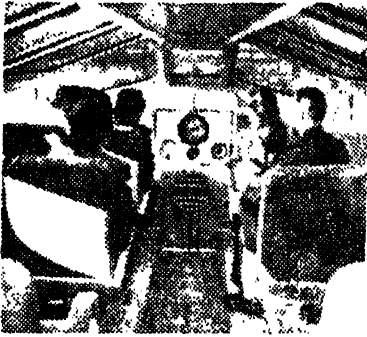
রেলের গাড়ীর কামরায় অল্টিমিটার সহ স্পিডোমিটার লাগান হয়েছে

গাড়ীটা অনেক জোরে চলে। মোটর গাড়ীর স্পীডোমিটার থেকে গাড়ীর গতি সহজেই জানা যায় কিন্তু ট্রেনের গতি এত সহজে জানার কোনও উপায় ছিল না। আজকালকার নতুন নতুন ট্রেনে এই স্পীডোমিটারের মত একটি গতি-নির্দেশক যন্ত্র লাগান থাকে। এর থেকেই গাড়ীর আরোহী কামরায় বসে বসেই গাড়ীর গতি জানতে পারে তাছাড়া এর সঙ্গে একটা অল্টিমিটারও থাকে। গাড়ীটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত উঁচুতে আছে তাও জানা যায়।

*

"টাকা উড়িয়ে" দেওয়ার কথা আমাদের কাছে নতুন নয় তবে সময় সময় টাকা পুড়িয়ে ফেলারও প্রয়োজন হয়। লণ্ডনে 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে' নোট পুড়িয়ে ফেলার একটি নতুন যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। এই যন্ত্রটি দিনে ২৫০,০০০ গুলি বাজে নোট পুড়িয়ে ফেলতে পারে। ইংলণ্ডের "জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী" এই যন্ত্রটি তৈরী করেছে। ব্যাঙ্কনোট নষ্ট করার এই প্রথম বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এটা একটা ওভেনের মত দেখতে। এর মধ্যে নোটগুলি রেখে যদি সুইসটি টিপে দেওয়া যায় তাহলে ওর থেকে নোট বার করে আনার সাধ্য আর কারো নেই। এমনকি ছাইগুলো পর্যন্ত বার করা যায় না। এর মধ্যে একবারে ৮০,০০০ নোট ভরে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা যায়। ½ লক্ষ পাউণ্ড দরের ব্যাঙ্ক-নোট ভরে রাখলে রাতের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে থাকে। একবার নোট ভরে দিলেই হলো, আর দেখা শোনা করতে হয় না। যন্ত্রটির ভেতরে খুব বেশী উত্তাপের সৃষ্টি হয় বলেই নোটগুলো পুড়ে যায় কিন্তু বাক্সর ওপরটা খুব অল্প গরম হয়। এর মধ্যে শুধু যে, জালনোট পোড়ান হয় তা নয় ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে যে সব নোট বাজেয়াপ্ত হয় সেগুলিও এর মধ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

*

বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা 'জয়ন্তে'র বার বার বন্দুকের গুলীর আঘাত থেকে বেঁচে যাওয়ার কাহিনী যতই রোমহর্ষক আর চিত্তাকর্ষক হোক্ না কেন এর সত্যতা সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে। এমন অভেদ্য দেহ সে কোথা থেকে পেল? আগেকার কালের কথা অবশ্য জানা নেই তবে বর্তমানে ব্যাপারটা খুব অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আজকাল একরকম 'বুলেট্ প্রুফ এপ্রন' বার হয়েছে। এই এপ্রনটি গায়ে পরা থাকলে মাত্র আট ফুট দূর থেকে গুলী ছুঁড়লেও গুলীটা এপ্রন ভেদ করে দেহে বিঁধতে পারে না। যে সব কারখানায় কাজ করতে করতে যন্ত্রপাতি থেকে লোহা লক্কড়ের টুকরা গায়ে এসে বিঁধতে পারে সেইখানের লোকেদের পক্ষে এই এপ্রন খুব কাজ-করী। কাঁচের কাপড়ের ওপর কোনও বিশেষ ধরণের রজনের পলস্তারা লাগিয়ে এই এ্যাপ্রন তৈরী করা হয়। এই রকম একটা এ্যাপ্রনের ওজন মাত্র তিন পাউণ্ড।

*

মানুষ একটু অবহেলা পেলেই আক্ষেপ করে বলে—'আমি তো কীটানুকীটের মত সংসারে আছি।' কিন্তু এই কীটানুকীটও আজকাল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের নয়। এদের নিয়ে মনুষ্যকুলে আজকাল রীতিমত মাথাব্যথা পড়ে গেছে। এরা কী খায়, কেমন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, এসব তত্ত্ব প্রায় জানা হয়ে গেছে, তবুও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের শান্তি নেই। এখন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সব কীট-পতঙ্গের কতখানি জ্ঞানগম্যি আছে, তা নিয়ে গবেষণা করছেন। পিসা য়ুনিভার্সিটির দুজন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, কীট-পতঙ্গের মধ্যে আলো ও সময়ের তারতম্য বোঝার এক ধরনের বোধশক্তি আছে। এই বোধ-শক্তিটা দেহের মধ্যের একটি বিশিষ্ট কারিগরি। এটাতে একাধারে ঘড়ি ও কম্পাসের কাজ হয়। এঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জলের ধারের স্যাঁতা বালির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয়, তার থেকে তারা দিক্‌নির্ণয় করতে পারে, তাছাড়া সূর্যের 'পোলারাইজড্' আলো থেকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে দিক্‌নির্ণয় করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা একটি 'বেলজারের' মধ্যে কয়েকটি পতঙ্গ রেখে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, পোকাগুলি ক্রমে সমুদ্রের দিকেই জড় হতে থাকে। আরও পরীক্ষার জন্য এঁরা ইটালির পশ্চিমাঞ্চলের টাইরেনিয়ান সাগরের তীর থেকে কয়েকটি পতঙ্গ নিয়ে পূর্বাঞ্চলের এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের তীরে ছেড়ে দেন। ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পতঙ্গগুলি টাইরেনিয়ানের দিকে উড়তে থাকে এবং সমস্ত জমি অতিক্রম করে ঠিক সূর্যাস্তের সময়েই টাইরেনিয়ানের উপকূলে পৌঁছায়।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠীর দয়া

শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় ফর্দ লিখাইতেছিলেন: "তিল, হরি-[illegible], বটের ডাল, পঞ্চশস্য, পঞ্চগব্য, [illegible]কের বাটি দু'টি, ষষ্ঠীর শাড়ী, [illegible]ডেরের ধুতি"—

ফা[illegible]ম প্রসাদ লিখিতে লিখিতে কলম [illegible]ইয়া বলিলেন, "আপনি ফ্যাসাদে [illegible]লেন ভট্চাজ্জি মশাই। এত ঝঞ্ঝাট [illegible] জানলে"—

শ্যামাপদ হাসিয়া বলিলেন, "আরে [illegible]ও যেমন! কলকাতায় তো তোমাকে [illegible]ই হবে। কলেজ স্ট্রীটের দশকর্মা [illegible]ভারে চুনীবাবুর কাছে ফর্দটি ফেলে [illegible]য় আসবে, ব'লে আসবে, 'অমুকদিন [illegible]' ও পিটুলির পুতুল বলো, আঁত-[illegible] ফল বলো, লোহা, ঘুন্সি, ঘৃত [illegible]পি বলো,—কিছু দেখতে হবে না। [illegible] ওরা যোগাড় করে দেবে। আরে ওরা [illegible] ঐজন্যেই ব'সে আছে, দু'টো টাকা [illegible]তি ধ'রে দিলেই নিশ্চিন্দি। সেবার [illegible]দের কুলদার মেয়ের বিয়েই দিয়ে [illegible]। পাত্র দেখা থেকে, লোক খাওয়ানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত সমস্ত যেন কলে হ'য়ে গেল—কিছু দেখতে হ'ল না কাউকে।"

ফতিমাপ্রসাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাঁচালেন মশাই। ঐ সঙ্গে সায়েবের ছেলে হইয়ে দেওয়ার কণ্ট্রাক্টটা যদি নিত! আমি এখন কোন্-দিক্ সামলাই বলুন তো? ওদিকে ঢাকের বায়না দিতে হবে, এদিকে একশ' আটটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা"—

শ্যামাপদ বলিলেন, "সবই তো হবে চাটুজ্জে, কিন্তু আমাকে যেন শেষপর্যন্ত ডুবিয়ো না। নেহাৎ কলকাতার কাছে আর তোমরা যজমানরা একটু আধুনিক ভাবাপন্ন বলে সাহস করছি, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত একঘরে হ'তে যেন না হয়। তা ছাড়া মেমসায়েবের জন্যে ষষ্ঠীপুজো করে জাতও যাবে—পেটও ভরবে না,—এ অবস্থায় যেন না পড়ি। আমি 'বুলক'ও জানি না, 'শ্যালক'ও জানি না, আমি জানি তোমাকে। করকরে কুড়ি টাকা নগদ নেব কিন্তু"—

কথাটা খুলিয়া বলা দরকার। ড্যালটন কোম্পানীর ছোটসাহেব মিস্টার 'বুলক'-এর ছেলে হইয়া বাঁচে না, দুই দুইটি সন্তান জন্মের সপ্তাহখানেক পরেই মারা গিয়াছে। মেমসাহেবের স্বাস্থ্য ভালো; ডাক্তার, শিক্ষিতা ধাত্রী, ঔষধপথ্য কিছুরই অভাব হয় নাই, তবু তাঁহার মৃতবৎসা দোষ ঘুচিল না। নানাজনের পরামর্শে ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী প্রভৃতি নানাপ্রকার চিকিৎসা করাইয়া পুত্রমুখ দর্শনের আশা ছাড়িয়া দিয়া সাহেব যখন 'থিয়জফি' পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ে একদিন অফিসের বাবুর দল তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। সাহেব বড়ো বংশের ছেলে, মাইডিয়ার লোক। বারো বৎসর ভারতবর্ষে আছেন, কর্মচারীদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার

সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে। 'অফিস আওয়ারের' মধ্যে খুব কড়া মনিব, ছুটির ঘণ্টা পড়িবার পরক্ষণেই অন্যলোক। তখন দফ্‌তরী বা বেহারার কাঁধে হাত দিয়া গল্প করিতে তাঁহার বাঁধে না। বাবুরা অনেকেই তাঁহাকে ভালোবাসেন, সকলেরই সুখে দুঃখে তিনি আছেন। সাহেবের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। হরিহরবাবু এক-বার কাসিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিলেন,—"হিস্ট্রিতে বলে সাহেব সম্রাট নেপোলিয়ন নাকি এরকম ক্ষেত্রে জোসে-ফাইনকে ডিভোর্স করেছিলেন"—

সাহেব শ্লেষভরে বলিলেন, "হিস্ট্রি পড়িয়াছেন ডেখিটেছি।"

হরিহরবাবু সাহেবের বিরক্তির অর্থ বুঝিলেন না, কথার জের টানিয়া বলিলেন, 'বংশধরতো একটি দরকার। তোমাদের যখন ডিভোর্স প্রথা আছে তখন"—

সাহেব মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "টুমি নিটান্ট, বুড্ঢ, না হইলে এই কঠা বলার জন্য টোমার হাড় চূর্ণ করিয়া ডিটাম।"

গজাননবাবু বলিলেন, "ছি ছি, ওকথা মুখে আনতে আছে? বুড়ো হয়ে আমাদের হরি খুড়োর ভীমরতি ধরেছে। না হ'লে এমন কথা মানুষে ব'লতে পারে? আমাদের মেমসাহেব হলেন সতীলক্ষ্মী,—সকালবেলা নাম ক'রলে পুণ্য হয়"—

হৃষীকেশবাবু বন্ধুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "পুণ্য মানে? সর্বকার্য সিদ্ধি হয়। দুর্গানামের বাবা। আমি তো সকালে দশবার 'আগাথা, আগাথা' না ব'লে বাড়ি থেকে বেরোই না। ছেলেগুলোকে শিখিয়ে দিয়েছি, 'বিপদে পড়লেই আগাথা ঠাকুমার নাম করবি।' ঘণ্টে সেদিন ট্রামচাপা পড়তে পড়তে"—

গোবর্ধনবাবুর মুখ চুলকাইতেছিল, এই সুযোগে বলিয়া উঠিলেন। "আরে ট্রাম-চাপা তো ভালো, আমি সাক্ষাৎ সেদিন পুলিশের মুখ থেকে বেঁচে এসেছি। ধর্মতলায় জোর লাঠি চলছে, আমি এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আটকে পড়েছিলুম। এগলি-সেগলি ঘুরে বড়ো রাস্তায় বেরিয়েছি, তা পড়বি তো পড় এক লাল-মুখো সার্জেণ্টের সামনে। আমি তখন মরিয়া। "জয় আগাথা বুলকাকি জয়" বলে গট্ গট্ করে তার সামনে দিয়ে চলে এলুম, ব্যাটা হাঁ করে চেয়ে রইল। যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছে।"

বুলক সাহেব মনে মনে খুশি হইলেও মুখে গাম্ভীর্য আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কিডিং করিবার প্রয়োজন নাই। আমি খোসামোদের ঢার ঢারি না। কিছু উপায় ঠাকে তো বলো।

হৃষীকেশবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "খোসামোদ কিসের সায়েব? হুঁঃ, এই হৃষীকেশ শর্মা উচিত কথা ব'লতে বাপকেও ডরায় না। ফল পেয়েছি, তাই বলছি। যাই হোক, উপায় কি করা যায়? ভেবে তো কেউ কূল পাচ্ছি না।"

জনার্দনবাবু প্রবীণ লোক, এতক্ষণ চুপ করিয়া সকলের কথা শুনিতেছিলেন, এতক্ষণে মুখ খুলিলেন। মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "উপায় তো আছে সায়েব, তুমি ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়। যেদিকেই যাও, দৈব ছাড়া পথ নেই। তা তোমরা ম্লেচ্ছ জাত, আমাদের ঠাকুর-দেবতা তো মানবে না?"

মিস্টার বুলক উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমার কোনো প্রেজুডিস নাই। ফল পাইলে আল্‌বট্ মানিবে।"

জনার্দনবাবু বলিলেন, "এই দ্যাখো না কেন, আমরা একশ' তেষট্টিটি ভদ্র-সন্তান আছি অফিসে, তার মধ্যে প্রায় আশিটি কোনো না কোনো ঠাকুরের দোর ধ'রে সংসারে এসেছে, ব'লতে গেলে ফিফ্‌টি পারসেণ্টই হ'ল। এই ধরো না কেন,—ক্ষেত্রমোহন—বাবা ক্ষেত্রপালের দয়ায়, পাঁচুগোপাল—পাঁচুঠাকুরের কৃপায়, তারকচন্দর—বাবা তারকনাথের বরে। কত ব'লব? আল্লাপদ, রাখোহরি, হরিপ্রসাদ, রামপ্রসাদ, ষষ্ঠীদাস, কালীপদ, হাজারী-লাল, চণ্ডীচরণ—সব ঠাকুর-দেবতার কাছে টিকি বাঁধা। এখনকার দিনে তোমাদের খৃষ্টানী, মোছলমানী ঠাকুর বা মহা-পুরুষদের কাছে ধর্না দিয়ে ছেলে হওয়া কমে গেছে, আমার বাবার আমলে তাও কত দেখেছি। মেরীপ্রসাদ, ঈশাচরণ—এমনকি ভিক্টোরিয়াপ্রসাদও ছিল আমাদের কলকাতাতেই। আর ফতিমাপ্রসাদ তো জলজ্যান্ত হাজির। তা' যা বলেছ সায়েব, কাজ পেলে আলবৎ মানতে হবে, তা সে হিঁদুর ঠাকুরই হোক, মোছলমানের পীরই হোক, আর খৃষ্টানের যীশু মেরীই হোক।"

হরিহরবাবু চালে ভুল করিয়া একবার ধমক খাইয়াছিলেন, এইবার সুযোগ বুঝিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "ডোণ্ট টেক এনি অফেন্স, সায়েব, আমাদের মাকড়দার মাকড়চণ্ডীর কবচ একটা ধারণ ক'রে দেখলে হ'ত। বড়ো জাগ্রত দেবতা, সায়েব।"

বুলক গর্জিয়া উঠিলেন, "শাট্ আপ্। টিনটা মাডুলি পরাইয়াছি টিন-কড়ির কঠায়। কিছু হইল না। সব বোগাস আছে।"

তিনকড়িবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "আমার কি অপরাধ বলুন? আমি তো ভালো ভালো ঠাকুরের স্বপনাদ্য মাদুলি সাধ্যমতো শুদ্ধাচারে নিয়ে এসেছি। আমার বৌ গিয়ে গাছে তিল বেঁধে এসেছে মেমসায়েবের নাম করে।"

জনার্দনবাবু বলিলেন, "তুমি শুদ্ধাচার করলে কি হবে? ওরা কি গরুশুয়োর খাওয়া ছাড়বে না? কি বলো সায়েব? এক বছর অখাদ্য খাওয়া ছাড়তে পারবে? তাহলে না হয় দেখি চেষ্টা ক'রে।"

মিস্টার বুলক দমিয়া গেলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, "গ্যারাণ্টি ডিলে সব ছাড়িটে পারে। ভাট খাইয়া ঠাকিবে। কিণ্টু ফল না পাইলে ডেখিয়া লইবে।"

জনার্দনবাবুর রিটায়ার করিবার সময় আসিয়াছে। হাসিয়া বলিলেন, "চাকরী খেয়ে দেবে, এই তো? বেশ, আমার চাকরী জামীন রইল। তুমি মেমসায়েবের সঙ্গে কথা বলো। তিন মাস শুদ্ধাচারে থাকো, তারপর ষষ্ঠীপুজো করাও বাড়িতে। দেখি কেমন ছেলে হ'য়ে না বাঁচে। আমার গিন্নীর পঁচিশ বছর বয়সে ষষ্ঠীপুজো ক'রে প্রথম মেয়ে হয়। এই তো সনাতনবাবুর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি,—বলুন না কেমন মেয়ে?"

সনাতনবাবু জনার্দনবাবুর অধীনেই কাজ করেন, আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন, "এমন মেয়ে হয় না মিস্টার বুলক। ভেরি গডেস অফ ফরচুন ডটার ইন ল।"

বুলক হাসিয়া বলিলেন, "টোমার ইংরাজি বুঝি না, বাংলা বলো।"

...নের বিদ্যা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, ...না তিনি ইংরাজী একটু বেশী ...। তিনি থতমত খাইয়া চুপ করিয়া ...না দেখিয়া জনার্দনবাবু বলিলেন, ... ব'লছেন, খুব লক্ষ্মী বৌ। ভেরি ... টেম্পারড্। তাহ'লে সেই ...ই করা যাক, কি বলো সায়েব? ... সব আমরাই ক'রে দেব, খরচ যা ... তুমি দেবে।"

...মিস্টার বুলক চিন্তিতভাবে বলিলেন, ...টো কলিকাটার বাহিরে করা যায় ... আমাডের সমাজের মডটে সুবিডা ... কি? খরচের আণ্ডাজ ডিটে ...বে?

জনার্দনবাবু বলিলেন, "বেশ তো, ...কাছি গ্রাম থেকে তো কত ভোল-...শার আসছে আমাদের। ওহে ...মা, তুমি ভার নিতে পারবে? খরচ ... কত হবে? পাঁচশো টাকাই ধরো ...কেন?"

বুলক টুপিটা তুলিয়া মাথায় দিয়া-...লেন। একটা সিগার ধরাইয়া বলিলেন, ...ল, রাইট. আগাথাকে বলিয়া দেখি।"

২

"হাইজ্জাঃ!"

হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনের একটি ...টো স্টেশন হইতে বর্ধমান লোক্যাল-...না হিস হিস করিতে করিতে উত্তর-...খে বাহির হইয়া গেল। স্টেশনে যাত্রী ...মিল মোট আটজন : তাহার মধ্যে ...কজনের হাতে শানাই, একজনের হাতে ...সি, আর একজনের কাঁধে পালক ও ...র দিয়া সাজানো একটি প্রকাণ্ড ঢাক। ...তুর্থ ব্যক্তির কাঁধে গামছা এবং দক্ষিণ ...স্তে দুইটি বংশশলাকা; সে বাম হস্ত ...রা নিজের বাম কপোলে একটি প্রচণ্ড ...পেটাঘাত করিয়া বলিল, "হাইজ্জাঃ! ...লার ঢাক যে নামানো হোলুনি গো? ...ক হবে? বলি ও গার্ডসাহেব,—দোহাই ...রেমবাপ"—

অপসৃয়মান গার্ডের গাড়িখানার ...পিছন পিছন দশ পনেরো গজ ছুটিয়া ...গোবর্ধন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই বসিয়া পড়িয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গী নিতাইচরণ ধমক দিয়া বলিল, "ব্যাটা দিনকানা কোথাকার! ভুললি ভুললি, ঢাকটাই ভুলে গেলি? বলি খাবি কি ক'রে এখন লক্ষ্মীছাড়া? সাধে কি আর বাবুরা আমাদের মুচি ব'লে গাল দেয়। ব্যাটা বাপ পিতামোর নাম ডুবোলি শেষটা? তাও একটু আধটু জিনিসটে নয়, যাকে বলে আম-আতন ঘোষের ভুঁড়ির তুল্য—গন্ধমাদন পব্বত তুল্য মালটা। নে, এখন কি বাজাবি বাজা! হায়, হায় রে! সায়েবের পুজো, দশ টাকা বায়না দিয়েচে, এখন ফাটক না দিলে বাঁচি।"

প্ল্যাটফর্মে যে আর চারজন যাত্রী নামিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক, একজন দেশী শাড়ী পরিহিতা মেমসাহেব আর দুইজন বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর লটবহর। হোল্ড অল, সুটকেস, টিফিন ক্যারিয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া 'জলযোগের' দধি, ভীম নাগের এবং দ্বারিকের সন্দেশ ও অন্যান্য মিষ্টান্নের হাঁড়ি, টিন, কাগজের প্যাকেট এবং ছোটো বড়ো চাঙ্গারি ও ঝুড়িতে স্টেশনের শোভা যেন বাড়িয়া গেল। স্টেশনের দুইজন কুলি, স্টেশন মাস্টার এবং তাঁহার সহকর্মী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের যাঁহারা এই যাত্রীদের অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সাহেব মেমকে লইয়া ব্যস্ত। কেহ চেয়ার আনিয়া দিতেছে, কেহ হাওয়া করিতেছে, কেহ ছাতা ধরিয়াছে। স্টেশন মাস্টার সেলাম করিয়া নিবেদন করিলেন, "বড্ড রোদ্দুর উঠে গেছে, এ বেলাটা এখানেই না হয় একটু বিশ্রাম ক'রে গেলে হ'ত—ওরে তেওয়ারি—যা বাবা যা"—

জনার্দনবাবু সাহেবের পক্ষ হইয়া বলিলেন, "আজ সকালে পুজো, এখন কি আর দাঁড়ানো চলে মাস্টারমশাই? ফেরবার পথে না হয়"—

এমন সময় একদল উৎসাহী যুবক চারটি শিশুপদবাচ্য বালিকাকে সঙ্গে লইয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল। এক-জনের কাঁধ হইতে কাপড়ে বাঁধা হারমোনিয়ম ঝুলিতেছে। দুইটি বালিকা সাহেব মেমের কণ্ঠে দুইটি গাঁদাফুলের মালা পরাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বাকী সকলে তারস্বরে গান ধরিল,

"ভূলোক দ্যুলোক পুলকি আলোকে
বুলক এসেছে আজি।
সতী পতিব্রতা এসেছে আগাথা
তারি সাথে সাথে সা—জি।
হুজুরের আজি দেশে আগমন,
বহু পুণ্য ফলে রাজদরশন"—

"রাজা, না হাতী! চোর, ডাকু, বিচ্ছুর জাত,—মার্চেণ্ট অফিসের কেরানীর সর্দার হ'ল রাজা? কালে কালে কত শুনব?" "ইনকিলাব জিন্দাবাদ। 'বন্দে মাতরম্'! গো ব্যাক বুলক!"

কৃষ্ণপতাকা সহ দশবারোজন যুবক এবং বিশপঁচিশটি বালকবালিকা এবং শিশু প্ল্যাটফর্মের বাহির হইতে হুঙ্কার ছাড়িল, ঐকতান সঙ্গীতের শব্দ ছাড়াইয়া তাহাদের চীৎকার শোনা গেল, "গো ব্যাক বুলক!

সাহেব ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মালপত্রের অধিকাংশই ততক্ষণে গরুর গাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে, কুলি শেষবারের মতো তিন হাঁড়ি দই মাথায় লইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়ে ঠক করিয়া একটা ঢিল আসিয়া সকলের উপরের হাঁড়িটাতে লাগিল। কুলির সর্বাঙ্গ বহিয়া শুভ্র চিনিপাতা দধির ধারা নামিল। স্টেশন মাস্টার অচ্যুতানন্দবাবু, "এ হে হে, এমন মালটা পথে ছড়িয়ে নষ্ট করলে বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিয়া কুলির মাথা হইতে বাকী দুই হাঁড়ি দধি নিজে টানিয়া লইয়া দ্রুতপদে নিজের অফিস ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ইষ্টক বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ কেহ ওয়েটিং রুমে ঢুকিলেন, কেহ রেল লাইন পার হইয়া ডাউন প্ল্যাটফর্মে পলাইলেন। কেবল জনার্দনবাবু, ফতিমাপ্রসাদ হৃষিকেশবাবু এবং আর কয়েকজন যুবক সাহেব মেমকে ঘিরিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। দুইটা চেয়ার সম্মুখে সাজাইয়া চারটি খোলা ছাতা দিয়া আত্মরক্ষার আয়োজন হইল। সাহেব বাহিরের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কি হইল? ইহাডের এটো রাগ কেন? আমিটো কাহারও ক্ষতি করে নাই?" জনার্দনবাবু বলিলেন, "তুমি কেন ক্ষতি করবে সায়েব, তোমার জাত করেছে। ওদের রাগ সাদা চামড়ার ওপর, ইংরেজ জাতের ওপর।"

"ঠিক হ্যায়" বলিয়া মিস্টার বুলক রক্ষীব্যূহ ভেদ করিয়া দ্রুত পদে স্টেশনের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইঁট ছোঁড়া বন্ধ হইল, যাহারা বেশী চীৎকার করিতেছিল এবং ইঁট ছুড়িতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন, "এই রে শালা ক্ষেপেছে, এইবার গুলী করবে। পকেটে রিভলবার আছে নিশ্চয়,—ঐ দেখ পকেটে হাত পুরে আসছে হন হন করে। পালা, পালা।" বলিয়া রণে ভঙ্গ দিল। বাকী কয়জন মরিয়া প্রকৃতির ছেলে ইষ্টক খন্ড লইয়া শেষ নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সাহেব তাহাদের কাছে আসিয়া পকেট হইতে দুই হাত বাহির করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই শোব, আমি আপনাডের ডেশোপ্রেম ডেখিয়া বড়োই আনণ্ডিট হইয়াছে। কিন্তু আমি ইংরাজ নহি, আইরিশম্যান। ইংরাজ ডুশমনকে আমরা ডেশ হইতে টাড়াইয়াছি, আপনারাও টাড়াইবেন। ইটিমড্যে আপনারা আমাকে বণ্ডু বলিয়া জানিবেন। আমি একটি পূজা করিব, সেখানে আপনারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলে সুখী হইব। নাউ কম, লেট্ আস্ সেক্ হ্যাণ্ডস্।"

বিস্মিত জনতার অগ্রবর্তী দুইচারিজন সাহেবের সহিত করমর্দন করিল, বাকী সকলে হতভম্ব হইয়া সরিতে সরিতে ছড়াইয়া পড়িল। সাহেব স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মেম সাহেব এবং অন্য সকলেই তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিলেন। বাঁশ ও বেতের বিচিত্র ছপ্পর দেওয়া গরুর গাড়িতে পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া বিছানা পাতা হইয়াছিল, মিসেস আগাথা জুতা খুলিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। সাহেব বন্ধুগণ সহ হাঁটিয়া রওনা হইবার পূর্বমুহূর্তে আমতার গোবর্ধন রুইদাস আসিয়া ধড়াস করিয়া তাঁহার সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িল। বলিল, দোহাই সায়েব, আমার ঢাক"—

মিস্টার বুলক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বাই জোভ, ঢাক কাহাকে বলে?"

এ এস এম মতিলালবাবু বুঝাইলেন, "ইণ্ডিয়ান ব্যাণ্ড, সার। ব্রট্ ফর্ ইয়োর ষষ্ঠীপূজা সেরিমনি সার। ওভারক্যারেড সার,—দেয়ার ইউ সি সার।"

নিতাইচরণ ঢাক স্কন্ধে পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, আভূমি নত হইয়া করজোড়ে নমস্কার জানাইল। পরক্ষণে মতিবাবুর ইঙ্গিতে গম্ভীর নির্ঘোষে ঢাক বাজিয়া উঠিল। পালকের শুভ্র সাজ দুলিল, তাহার মাথায় কৃষ্ণচামর দুলিল, উপস্থিত সকলের বক্ষের মধ্যে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি তুলিয়া মিনিট দুই পরেই ঢাক থামিল। মিস্টার বুলক হাসিয়া বলিলেন, "হট্ স্টাফ্! আমরা কি যুড্ঢে যাইব?" তারপর এ এস এমকে বলিয়া পরবর্তী স্টেশনে টেলিফোন করিয়া ঢাক আটকাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গোবর্ধনকে ঢাক উদ্ধারের জন্য যাতায়াতের ভাড়া দিয়া এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া নিতাইচরণের দলকে স্টেশনে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সকলে অতঃপর ফটিমোপ্রসাদের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জনতা ততক্ষণে প্রায় ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, কেবল দুই চারিজন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়াইয়া সাহেবের কান্ডকারখানা দেখিতেছে। সাহেব চলিতে চলিতে তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বণ্ডে মাটরম্"।

শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ মিলিয়া জয়ধ্বনি তুলিল, "বণ্ডে মাটরম্"।

একজন কলেজের ছাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওয়েলকম বুলক! লং লিভ আওয়ার আইরিশ ফ্রেণ্ড!" স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নিতাইচরণের ইণ্ডিয়ান ব্যাণ্ডে তখন সুপরিচিত ভারতীয় রণবাদ্য বাজিতেছে, "ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ, ঠাকুর যাবি বিসর্জন।" কেবলরামের শানাই গরুর গাড়ির আগে আগে ভৈরবীতে তান ধরিয়া চলিয়াছে।

৩

মা ষষ্ঠীর কৃপায় সাহেবের সন্তান ভাগ্য ফিরিয়াছে। প্রথমা কন্যা ষষ্ঠীপূজার এক বৎসরের মধ্যে জন্মিয়া নিরাপদে ছয় মাস কাটাইয়া দিলে কেবল তাহার পিতামাতা যে নিশ্চিন্ত হইলেন তাহাই নহে, অফিসশুদ্ধ সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। মেয়েটির ব্যাপ্‌টিজমে পাদ্রি যেমন অভিষেক করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন, তেমনি ষষ্ঠীপূজা এবং অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে হিন্দুমতে ক্রিয়াকর্মের ত্রুটি হইল না। এবার ব্রাহ্মণ ভোজনটা অবশ্য জনার্দনবাবুর কলিকাতার বাসাতেই হইল এবং দুইজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধুকেও ভোজসভায় দেখা গেল। সাহেবের বাড়িতে ঠাকুরঘর হইল, মুসলমান বাবুর্চি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ পাচক রাখা হইল। অফিসের বড়োকর্তা জর্জ ড্যালটন নামে 'গড ফাদার' হইলেও আসলে মেয়েটির ধর্মপিতার পদ লইলেন জনার্দনবাবু। তিনি মাদুলি তাগাতাবিজে ধর্মকন্যার ক্ষুদ্রদেহটি এমনই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। সাহেব বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই বিরক্ত হইলেন এবং বুলকের সহিত সামাজিকতা বন্ধ করিলেন। কিন্তু বুলক ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ষষ্ঠীরাণীর প্যারাম্বুলেটর ঠেলিয়া সাহেব মেম কেবল যে গড়ের মাঠে বেড়াইতেন তাহা নহে, বাঙালী কর্মচারীদের বাড়িতেও যখন তখন তাহাকে লইয়া মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেন। বাহিরের ঘরে যখন ষষ্ঠীরাণী বুলক স্তবপাঠ করিত তখন পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িত। ষষ্ঠীরাণীর জিহ্বার জড়তা ছিল না, তাহার মাতার মতো 'ডিভুজাং হেমোগাউর্যাঙ্গিং' না বলিয়া সে যখন স্পষ্ট বলিত, "দ্বিভুজাং হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং, অঙ্কার্পিতসুতাং ষষ্ঠীং অম্বুজস্থাং বিচিন্তয়েৎ" তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত। কিন্তু বিপদ হইত সে অন্দরে ঢুকিলে। অবোধ শিশু, কখন কি ছুঁইয়া বসে, কখন রান্নাঘরে, ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া পড়ে তাহার ঠিক নাই। কর্তাদের ভয়ে গৃহিণীরা তাহাকে গালিগালাজ বা মারধোর করিতে পারেন না, সুতরাং হাঁড়িকুঁড়ি লইয়া সামাল সামাল রব পড়িয়া যায়, কেহ কেহ অন্তর টিপ্পনি দিতে ছাড়েন না, এমন ঝাল তরকারী বা তেতো শুক্ত খাওয়াইয়া দেন যে, সে আর দ্বিতীয়বার সে বাড়ির অন্দরে আসিতে চায় না। তবু তাহাকে স্নেহযত্ন করিবার লোকের অভাব ছিল না। অফিসের ক্যাশিয়ার সুরেশ্বরবাবুর এককালে কবিখ্যাতি ছিল, হিসাবের খাতায় কবিতার দুই চারি কলি ধরা পড়ায় একবার তাঁহার চাকুরী যাইবার

সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। তিনি এখন ষষ্ঠী-রাণীর নামে কবিতা লিখিয়া সাহেবের নেক্ নজরে পড়িলেন, তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইল। সবটা মনে নাই, প্রথম কয় পংক্তি সত্যেন দত্তের 'ঝর্ণা' হইতে বেমালুম চুরিঃ

ষষ্ঠী, ষষ্ঠী, সুন্দরী ষষ্ঠী,
মা বাপের প্রাণারাম,—অন্ধের যষ্টি।
চঞ্চল চোখে করে খঞ্জন নৃত্য,
দুধে আলতার রঙে ভুলে যায় চিত্ত,
বুকভরা স্নেহমায়া, শিশু বিশ্বোষ্ঠী।

শেষ দিকে সমষ্টি এমনকি করকোষ্ঠীও বাদ যায় নাই। কবিতাটি কিছুদিন ধরিয়া অফিসের বাবুদের মুখে মুখে ফিরিত। বাড়ি ফিরিবার পথে ষষ্ঠীরাণীকে একবার না দেখিয়া গেলে জনার্দনবাবুর ভাত হজম হইত না। বুলক সাহেব তো 'শস্' বলিতে অজ্ঞান।

কিন্তু ষষ্ঠীরাণীর একাধিপত্য বেশী দিন রহিল না; সে যখন তিন বৎসরের তখনই 'মার্কে'র আবির্ভাবে তাহার পূজার নৈবেদ্যের বরাদ্দ কমিল। কেবল যে তাহার আশ্রিত বিড়ালগুলির দুধ এবং মাছের অকুলান হইতে লাগিল তাহাই নহে, তাহার নিজের দিকেও পিতামাতার স্নেহদৃষ্টির অভাব অনুভব করিয়া সে রুদ্ধ অভিমানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অসুখে পড়িল। চিকিৎসার ত্রুটি হইল না, মিস্টার বুলক অন্তত মৌখিক পূর্বস্নেহের জের টানিয়া চলিলেন এবং তাহার আবদার রাখিতে গিয়া দেশী-বিলাতী বিড়ালে বাড়ীটা ভরিয়া ফেলিলেন। মিসেস বুলক কিন্তু ছেলে লইয়া এতই ব্যস্ত যে তিনি দিনান্তে একেবারের বেশী দেখিতে আসিতেন না। জনার্দনবাবুর পরামর্শেই ছেলের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য তাহার নাম রাখা হইল মার্কণ্ডেয়, সংক্ষেপে 'মার্ক'। বুলক-সাহেব শ্বেতাঙ্গ সমাজে অবশ্য সেকথা স্বীকার করিতেন না, 'মার্কাস্ অরেলিয়সের দোহাই দিতেন। মেমসাহেব 'মার্ক্ এণ্ড' বলিয়া ডাকিলেও এইখানেই 'দি এণ্ড' হইল না, মার্কের পর বৎসরই আসিল স্পার্ক্। নামটা বুলকই দিলেন; পুত্র তো নয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ছয় মাস বয়সে খাট হইতে পড়িয়া নাকটা থেঁতো এবং ভোঁতা করিল, নয় মাস বয়সে হামাগুড়ি দিয়া সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতল ভাঙিয়া খানিকটা মুখ পোড়াইল এবং একটা চোখ নষ্ট করিল। দুই বৎসর না যাইতেই বিছানায় স্পিরিট ঢালিয়া বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিল। দমকল সময়ে আসিয়া উদ্ধার না করিলে সে রাত্রে বাড়ীশুদ্ধ সকলে পুড়িয়া মরিত। মিসেস বুলক স্পিরিট স্টোভে নবাগতা 'হানা'র জন্য দুধ গরম করিতে করিতে দুই মিনিট পাশের ঘরে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই এই কাণ্ড! হানার বিছানা সে ঘরে ছিল না তাই রক্ষা, সেই ছিল স্পার্কের সব চেয়ে বিদ্বেষের এবং ঈর্ষার পাত্রী। স্পার্কের অনুষ্ঠিত অগ্নিকাণ্ডে খাট, টেবিল, আলমারি, কাপড়-চোপড় পুড়িয়া মিস্টার বুলকের হাজার কয়েক টাকা অর্থদণ্ড হইলেও একটি উপকার হইল। ষষ্ঠীমাতার বাহন এবং ষষ্ঠীরাণী বুলকের আশ্রিত বিড়ালবাহিনীর অত্যাচারে বাড়ীর লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেও তাহাদের তাড়াইবার কোনো উপায় দেখা যাইতেছিল না। এই ব্যাপারে দুইটি বিড়াল অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেই বাকি সবগুলি সেই রাত্রে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে সেই যে গৃহত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল, তাহারা আর ফিরিল না। মার্ক এবং স্পার্কের মারামারিতে বাড়ীতে শান্তি ছিল না। তিন বৎসরের মধ্যে তিনবার নার্সিং-হোমে তাহাদের জন্য মোটা খরচ করিয়া চিকিৎসা করাইয়া মিস্টার বুলক যখন রীতিমত বিব্রত সেই সময়ে আগাথা বুলক একসঙ্গে যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। ম্যাগী এবং জন দুইজনেই মিটমিটে শয়তান। তাহারা ক্ষীণদেহ, মারামারির মধ্যে যায় না, ভাইবোনে যড়যন্ত্র করিয়া প্রথমত মিটসেফের খাবার চুরি করিতে আরম্ভ করিল, তাহার পর বাবার পকেট এবং ডেস্ক ও মায়ের বাক্স হইতে টাকা সরাইতে শিখিল। ছয় বৎসর বয়সে প্রতিবেশী ম্যাকফারসন সাহেবের সোনার ঘড়ি চুরি করিয়া জন যখন শিশু অপরাধীদের সংশোধনাগারে প্রেরিত হইল তখন আগাথা বুলক একত্রে চারটি সন্তান প্রসব করিয়া আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই পারিবারিক কলঙ্কটাও কাগজেপত্রে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। বলাবাহুল্য বুলক পরিবারে ইতিমধ্যে ষষ্ঠীভক্তি হ্রাস পাইয়াছে, বৌবাজার আর্ট স্টুডিও কর্তৃক প্রকাশিত ষষ্ঠীদেবীর বাঁধানো লিথো-প্রিণ্ট-খানির জায়গায় আয়ারল্যাণ্ডের কিলার্নি হ্রদের একখানি ছবি স্থান পাইয়াছে। এদিকে নবাগত চারটির মধ্যে 'দেইদ্রে' পিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বুলকের পূর্ববর্তী ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী খৃষ্টধর্মে নিষ্ঠাবতী, ষষ্ঠীরাণীর মতো পুরাণের গল্প না পড়িয়া বাইবল্ এবং সেণ্টদের জীবনী পড়ে। ষষ্ঠীরাণীর চেয়ে তেরো বৎসরের ছোটো হইলেও, সে তাহাকে 'হিদেন' বলিয়া ঘৃণা করে, তাহার ঘরে রক্ষিত ষষ্ঠীদেবীর ঘটে ঘরঝাঁট দেওয়া ময়লা ভরিয়া রাখে। 'ঈশ্বর পৃথিবীকে এমন প্রেম করিলেন যে তাঁহার একজাত পুত্রকে তাহার জন্য উৎসর্গিত করিলেন'। একথা ষষ্ঠীরাণী বিশ্বাস করে না শুনিয়া সে পাঁচ বৎসর বয়সেই তাহাকে নরকাগ্নির-ভয় দেখাইয়াছে, ষষ্ঠীপূজা এবং অন্যান্য অনাচারের জন্য পিতাকেও কম লাঞ্ছিত করে নাই। নবাগতদের অন্যতম 'প্যাট্রিক' প্যাট প্যাট করিয়া তাকাইয়া থাকে, সে জন্ম হইতেই বোবা, কালা। তাহার রোগ-মুক্তির জন্য সাহেব গোয়ার মেরীমাতার কাছে তীর্থযাত্রা করিলেন, ডাবলিনের সেণ্ট প্যাট্রিকের কেথিড্রালে পূজামানত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দশটি সন্তান লইয়া নানা অশান্তিতে বুলক পরিবার যখন বিপর্যস্ত সেই সময়ে সহসা কয়েকটা অচিন্তিতপূর্ব কারণে দারুণ লোকসান দিয়া ড্যালটন কোম্পানী ব্যবসায় গুটাইল। মিস্টার বুলকের চাকরী তো গেলই, কোম্পানীতে তাঁহার যে লক্ষাধিক টাকার শেয়ার খাটিতেছিল, তাহাও ডুবিয়া গেল। ভগ্ন হৃদয়ে প্রায় শূন্যহস্তে ভগ্ন-স্বাস্থ্য পত্নী এবং এক পাল পুত্রকন্যা লইয়া মিস্টার বুলক দেশে ফিরিলেন। ভারতীয় কর্ম-চারীদের মধ্যে অনেকের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা কমিয়া গিয়াছিল, জনার্দনবাবুকে তো তিনি ইদানীং দু' চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সকলেই তখন অন্নাভাবে বিব্রত, সকলেই নূতন চাকরীর চেষ্টায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, বুলকের দেশ-

ত্যাগের সংবাদ অনেকেরই কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্মে প্রবেশ করিল না। কেবল জনার্দনবাবু রিটায়ার করিয়া গঙ্গাস্নান এবং বিষয়সম্পত্তি বাড়াইবার সাধনায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনি লোক মারফৎ ষষ্ঠীরাণীর নামে হাজার টাকার এবং মিস্টার বুলকের নামে পাঁচ হাজার টাকার একখানি করিয়া চেক পাঠাইয়া দিলেন। বুলক প্রথমে পত্রবাহককে ধমক দিয়া বিদায় করিয়া দিতেছিলেন, কিন্তু ষষ্ঠীরাণীর পরামর্শে টাকাটা রাখাই শেষ পর্যন্ত স্থির হইল। প্রথম সুযোগেই ফিরাইয়া দেওয়া চলিবে, আপাতত জাহাজ ভাড়ার সুরাহা হয়তো হউক।

দেশে ফিরিয়া মিস্টার বুলকের দুর্গতির সীমা রহিল না। ভারতবর্ষে দাসদাসী এবং প্রাচুর্যের মধ্যে কাটাইয়া এখন তাঁহাকে অল্পবেতনের একটা কেরাণীর চাকুরী লইতে হইল। ট্রিনিটি কলেজের ছাপটা ছিল, সুতরাং দুইটি ছেলেকে পড়াইয়াও কিছু উপার্জন হইত। স্যাকভিল স্ট্রীটে তাঁহার পৈতৃক বাড়িটি দেনার দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেলে ডাবলিনের শহরতলীতে একটা অল্প ভাড়ার অপরিচ্ছন্ন বাড়ির একাংশে তিনি নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিলেন। বয়স পঞ্চান্ন ছাড়াইয়াছে, ব্যাঙ্কে পঞ্চান্ন পাউণ্ডও জমে নাই। আয়র্ল্যাণ্ডে আসিবার পরে পাঁচ বৎসরে তাঁহার পর পর চারটি কন্যা জন্মিয়াছে, সেই সঙ্গে একটি নূতন উপদ্রবেরও আবির্ভাব হইয়াছে। ভগ্নস্বাস্থ্য হইলেও আগাথা বুলকের তখনও রূপযৌবনের কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, তাহার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি তাহা মুখ দেখিয়া বোঝা যাইত না। তরুণ বয়সে তিনি বুলককে বিবাহ করিয়া একদা যে হতভাগ্যের জীবন মরুভূমি করিয়া দিয়াছিলেন সেই চার্লস সাহেব এ পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন এবং কোনো দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সূত্রে সহসা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বুলকের দুর্ভাগ্যের ভরা পূর্ণ করিতে এই সময় উদিত হইলেন। তাঁহার মোটর সকাল সন্ধ্যা বুলক সাহেবের বাসার দ্বারে দাঁড়াইতে লাগিল। থিয়েটারে বায়োস্কোপে বাজারেহাটে নিত্যনব প্রলোভনের পশরা লইয়া তিনি বুলক গৃহিণীর সম্মুখে ধরিতে আরম্ভ করিলেন। ষষ্ঠীরাণী একটি ভারতীয় ছাত্রকে বিবাহ করিয়া ভারতে ফিরিয়া গিয়াছে, মার্ক বিবাহ করিয়া পৃথক হইয়াছে। প্যাট্রিক একটা দাঙ্গায় হাতপা ভাঙিয়া বৎসরাধিককাল উত্থান শক্তি রহিত, তাহাকে খাওয়াইতে শোওয়াইতে স্নান করাইতে একমাত্র মিস্টার বুলকই পারেন, কারণ প্যাটের হাত না চলিলেও মুখ চলে এবং সে মুখের গালি গালাজ সহ্য করা পরিবারের কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ম্যাগি জুয়ার আড্ডায় নাচগান করে। ইচ্ছামতো আসে যায়, সংসারে এক পয়সা সাহায্য করে না। টাকার প্রয়োজন হইলে বাড়ির বই বা বাসনপত্র বেচিয়া কাজ চালাইয়া লয়। জন ব্যাঙ্কে একটা চাকরী পাইয়াছিল, সম্প্রতি তহবিল তছরুপের অভিযোগে জেল খাটিতেছে। আগাথা প্রায়ই হোটেলে খান এবং চার্লসের মোটরে বাহিরে কাটান সুতরাং উদয়াস্ত উপার্জনের চিন্তায় হাড় ভাঙা খাটুনির পর সংসারের রান্নাবান্না এবং ছেলেমেয়েদের পরিচর্যার ভার মিস্টার বুলকের উপরই পড়িয়াছে। চার্লস সাহেবের ব্যবহারটা ক্রমেই এমন দৃষ্টিকটু হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার পত্নীর আচরণে দিন দিন তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাবটা এমনই দুর্বিষহ হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, মিস্টার বুলকের পক্ষে আর নীরব থাকা চলে না, তথাপি তিনি নীরবেই আছেন। এমন সময় পঞ্চদশ সন্তানের আবির্ভাবাশঙ্কায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। হাসপাতালে যাইবার পথে পত্নী স্বামীকে নোটিশ দিলেন, আর সন্তান প্রসব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, এখনও সাবধান না হইলে তিনি নিষ্ঠুরতার অভিযোগে মিস্টার বুলককে ডিভোর্স করিয়া তাঁহার পূর্বপ্রণয়ীর একনিষ্ঠ নিষ্কাম প্রেমকে বরমাল্য অর্পণ করিবেন। বুলক মুখ খুলিতে গেলেন, কিন্তু ভদ্রতায় বাধিল। তিনি চার বৎসরের অধিককাল ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করিতেছেন। ষষ্ঠী মাতার কৃপা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ছোটো বড়ো কোনো সেন্টের নিকট বাতি মানৎ করিতে বাকী রাখেন নাই। একবার গঙ্গাস্নানের পাপ কাটাইবার জন্য বহু ব্যয়ে সাতবার জর্ডনের জলের ছিটা লইয়াছেন এবং সেণ্ট প্যাট্রিকের নাম করিয়া তিনবার 'লিফি' নদীর জলে স্নান করিয়াছেন, আর কি করিতে পারেন? পত্নীকে হাসপাতালে রাখিয়া অফিস যাইবার পথে লোয়ার স্যাকভিল স্ট্রীটের মোড়ে বিরাটকায় স্মৃতিস্তম্ভের মাথায় নেলসনের মূর্তিটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি মনে মনে মিনতি জানাইলেন, "হে বাবা নেলসন, তুমি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হাত থেকে ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করেছ, আজ ইণ্ডিয়ান ষষ্ঠীর হাত থেকে আমায় রক্ষা করো বাবা, দোহাই তোমার! কবরে যাবার আগে আর যেন পুত্রকন্যার মুখ দেখতে না হয়।"

অফিস হইতে ফিরিয়া সেদিন ছাত্র পড়াইতে যাওয়া হইল না, মিস্টার বুলক একতোড়া ফুল কিনিয়া হাসপাতালের দিকে যাত্রা করিলেন। হাঁ, মিসেস বুলক নির্বিঘ্নে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন এবং সুস্থ আছেন। পত্নীকে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিতে গিয়া বুলক দেখিলেন চার্লস সাহেব পূর্বেই একটি হীরার নেকলেস দিয়া গিয়াছেন। বুলক ক্রোধ দমন করিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "বেশ জিনিসটি?" মিসেস বুলক আজ অনেকদিন পরে তাঁহার সহিত হাসিয়া কথা কহিলেন, বলিলেন, "হ্যাঁ, চার্লি বলেছে এই রকম হীরেমুক্তো দিয়ে আমাকে মুড়ে দেবে, আর বিয়ের রাত্রে দশ লক্ষ টাকা নগদ আমার নামে লিখে দেবে। আমি আর পারছি না, ডার্লিং, তুমি আমায় মুক্তি দাও। সন্তান প্রসব ক'রে ক'রে আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। তুমি ছেলেমেয়ে ভালোবাসো, আমি সমস্ত ছেলেমেয়েদের তোমাকে দিয়ে যাব।" অবশেষে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সঙ্গিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত? এই ভয়ঙ্কর কথাটা মুখের উপর বলিতে তাহার মুখে বাধিল না? বুলক ধৈর্য হারাইলেন, বলিলেন, "বলো কি আগাথা? আমিই কেবল সন্তান চেয়েছিলুম, তুমি চাওনি? তোমার শেষ তিনটি সন্তানের জন্য কি আমি দায়ী?"

আগাথা মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুমি না হ'লেও তোমার ষষ্ঠী দায়ী, না হ'লে বৈজ্ঞানিক সাবধানতার ত্রুটি রাখিনি, তবু ছেলেমেয়ে হয় কি করে?" চার্লিকে বিয়ে করার পর যদি

র একটি ছেলে হয়, তবে সেই দণ্ডে কে ত্যাগ করব। অবশ্য শূন্যে হস্তে নয়, স্বচ্ছন্দ্যে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নেব মধ্যে।"

মিস্টার বুলেক দুঃখের মধ্যে হাসিলেন, বলেন, "কিন্তু আইন? ধর্ম? আমরা ক্যাথলিক? ডাইভোর্স আমাদের যে ধর্ম রুদ্ধ? "তোমার আমাকে ছেড়ে যেতে ট হবে না আগাথা?"

মিসেস বুলেক ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া লেন, "ফুঃ, আইন? ধর্ম? চার্লি ছে টাকা থাকলে সব ব্যবস্থা হয়ে বে। আর দেখ, তুমি যদি মুখথুরে মতো য়ারতুমি না ক'রে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ কার করে নাও তাহ'লে বিয়ের দিনে টা টাকা পাইয়ে দে'ব, তোমার ছেলে-য়েদের অন্নবস্ত্রের দুঃখ থাকবে না।"

এত বড়ো সুসংবাদটা পাইয়াও মিস্টার লেক শান্ত হইতে পারিলেন না। বাড়ি রিয়া যথারীতি গ্যাসস্টোভে রান্নাবান্না রিলেন, দেইদ্রের সাহায্যে শিশুগুলিকে ওয়াইয়া শোয়াইয়া দিলেন। সকলে মাইলে ডেস্ক হইতে পুরাতন চিঠির গোছা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। একটি চিঠিতে আগাথা লিখিয়াছেন, "ওগো ভারতীয় যাদুকর, তুমি ইন্দ্র-জালের দেশে গিয়া কি যাদু শিখিয়াছ? এক নিমিষে আমার জীবনটা বদলাইয়া দিলে! আজ আমি তোমার ক্রীতদাসী, দয়া করিয়া আমাকে পায়ে ঠেলিয়ো না।"

হাঁ, যাদুতেই আরম্ভ, যাদুতেই শেষ করিতে হইবে। কলিকাতায় শোনা একটা বাঙলা প্রবাদ মনে পড়িল, 'যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে'। হিন্দুয়ানির যুগে সাহেব একবার ধুতিচাদর পরিয়া ভিড়ের মধ্যে কালীঘাটের কালীদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। হ্যাঁ, একটা দেবতা বটে! কী ড্যাবডেবে চোখ, কী লকলকে জিভ! ষষ্ঠীকে হারানো সেণ্ট প্যাট্রিকের কর্ম নয়, কালী ছাড়া আর কেহ তাহাকে শায়েস্তা করিতে পারিবেন না। জয় মা কালীঘাটের কালী, অধম সন্তানকে রক্ষে করো মা! চার্লিটার যেন রাত না পোহায়, আজ রাত্রেই যেন আমার নামে সর্বস্ব উইল ক'রে ব্যাটা মরে। আর আগাথার যেন"—

ঢং করিয়া গীর্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। আর জাগিলে চলিবে না, কাল সকালে অফিস আছে, গৃহকর্ম আছে। মিস্টার বুলেক আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। 'শসের' চিঠি আসিয়াছে, "বাবা, আমি সুখী হইয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়ো, আশীর্বাদ করিয়ো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন এখানে শ্বেতাঙ্গের সম্মান পূর্বের চেয়ে বাড়িয়াছে বই কম নাই। তুমি আসিলে সহজেই ভালো চাকরী পাইবে, সুখে থাকিতে পারিবে। অনেক স্কীম হইতেছে, অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটিতেছে, কোনো চিন্তা নাই। সুযোগ পাইলে চলিয়া আসিয়ো।"

হাঁ, মিস্টার বুলেক যাইবেন, কিন্তু তাহার পূর্বে অনেক কাজ বাকী। উপস্থিত আগাথার ব্যবস্থা করা আগে দরকার। ভাবিতে ভাবিতে তিনি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বপ্ন দেখিলেন, ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। মা কালীর খাঁড়ার কোপে ষষ্ঠীর বিড়ালটা দু' আধখানা হইয়া গিয়া 'ম্যাও ম্যাও' শব্দে দুই দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে; ষষ্ঠীদেবী তাঁহার ডেস্কটার পিছনে বসিয়া কোনো-রূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন, মা কালী তাঁহাকে চুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া সম্মুখে আনিয়াছেন। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন, "বল্, আমার ভক্তকে ছাড়বি।" "ছাড়ব।" "বল্, যতগুলো ছেলেমেয়ে জুটিয়েছিস সব ফিরিয়ে নিবি।" "আঃ, লাগে, চুল ছাড়ো। বলছি তো নোবো, নোবো, নোবো।" "মা কালী উদ্যত খাঁড়া নামাইয়া, চুল ছাড়িয়া গলাধাক্কা দিলেন,—"যা, দূর হয়ে যা।" দেখিতে দেখিতে সব মিলাইয়া গেল। কালী নাই, ষষ্ঠী নাই, পুরেকন্যার দল নাই। আঃ, কি শান্তি!

দেইদ্রে পিতাকে ঠেলিয়া তুলিল, বলিল, "কি বকছিলে ঘুমের ঘোরে? সকাল হয়ে গেছে, উঠবে না?"

মিস্টার বুলেক স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন, দেইদ্রে শেলয়ের হাসি হাসিয়া ভক্তিমতী খৃস্টানীর উপযুক্তভাবে দুই অঙ্গুলি দ্বারা 'ক্রস' করিয়া চলিয়া গেল। বুলেক দমিলেন না। গৃহকর্ম সারিয়া আহার করিয়া অফিস যাত্রার পথে পোস্ট অফিসে গেলেন। মে মাসের মাহিনার টাকা অধি-কাংশই তখনও হাতে ছিল। জনার্দনবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন, "বাঁচাও। ষষ্ঠীর কৃপা হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় কি? কালীর সাহায্য লও। স্ত্রী ডিভোর্স করিতে চায়। কি করিব পঞ্চদশ সন্তানটি কন্যা, কাল ভূমিষ্ট হইয়াছে।"

সন্ধ্যার মধ্যেই উত্তর আসিল, "শেষ সন্তানটির নাম আন্নাকালী রাখো। ইণ্ডিয়ান কয়েনে সওয়া পাঁচ আনা মা কালীর কাছে মানৎ করো, আমি এখানে জোড়া পাঁঠা মানৎ করিলাম। স্বপ্নাদ্য বশীকরণ কবচ পাঠাইতেছি, অব্যর্থ। নেকলেসের লকেটে ভরিয়া পত্নীকে উপহার দাও। পছন্দমতো অন্য স্ত্রীলোক কেহ থাকিলে তাঁহাকেও দিতে পারো।"

নোংরা হাত

জাঁ-পল সার্ত্র্

অনুবাদ : **শিবনারায়ণ রায়**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হুগো। তোমার কি আমার সঙ্গে কোনো কথা আছে?

হোয়েডেরার। না। না, না। তুমি যখন একটু আগে রাগে একেবারে লাল টকটকে হয়ে উঠেছিলে তখন কিন্তু ভারী হাসি পেয়েছিল আমার।

হুগো। আমি......

হোয়েডেরার। এতে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। এটা আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। বরং তুমি আপত্তি না করলেই আমার ভাবনা হত। তোমাকে আমার অনেক কিছু বোঝাবার আছে। কিন্তু সব কাল। কাল তোমাতে আমাতে সত্যিকার কিছু বাতচিত করা যাবে। আজ দিনের মত তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমারো। বড় অদ্ভুত দিনটা, না? দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙিয়ে নাও না কেন? তাহ'লে এত খালি-খালি দেখায় না। ছাতের কুঠুরীতে কয়েকটা আছে। শিলক নাবিয়ে আনতে পারে।

যেসিকা। কি ধরনের ছবি?

হোয়েডেরার। এচিং, নানা ধরনের, তুমি বেছে নিও।

যেসিকা। না ধন্যবাদ। এচিং আমার ভালো লাগে না।

হোয়েডেরার। যা তোমার ইচ্ছে। তোমাদের এখানে মদ আছে?

যেসিকা। না, দুঃখিত।

হোয়েডেরার। ও! বেশ। আমি ঢোকবার আগে তোমরা কি করছিলে?

যেসিকা। কথা বলছিলাম।

হোয়েডেরার। বেশ ত', তোমরা কথা বল! বল! আমার কথা ভেব না। [পাইপটা ভরে নিয়ে ধরায়, ঘরে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। মৃদু হেসে] বুঝেছি।

যেসিকা। তুমি যে ঘরের মধ্যে নেই এটা ভাবা খুব সহজ নয়।

হোয়েডেরার। ইচ্ছে হলে তুমি আমাকে ঘর হতে বার করে দিতে পার। [হুগোকে] তোমার মনিবের মন খারাপ হয়েছে বলে তুমি কিছু তাকে সঙ্গ দিতে বাধ্য নও। [থেমে] এখানে কেন যে এলাম জানি না। ক্লান্ত হইনি, কাজ করবার চেষ্টা করলাম......[কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে] কোনো মানুষ সব সময়ে কাজ করতে পারে না।

যেসিকা। না, পারে না।

হোয়েডেরার। এ ব্যাপারটা প্রায় চুকে এসেছে......

হুগো। [দ্রুত] কোন্ ব্যাপার?

হোয়েডেরার। কারস্কির সঙ্গে। এখনো একটু গাঁইগুঁই করছে। তবে আমি যা ভেবেছিলাম তার চাইতে তাড়াতাড়িই হয়ে যাবে।

হুগো। [উত্তেজিতভাবে] তুমি......

হোয়েডেরার। শ! কাল! সব কাল! [থেমে] এই ধরনের কোনো কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে তখন হঠাৎ ভারী খালি খালি লাগে। এর পর যে কি করব ভেবেই পাওয়া যায় না। তোমাদের ঘরে একটু আগে আলো জ্বলছিল?

যেসিকা। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। আমি জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম। অন্ধকারে, ওরা যাতে আমাকে লক্ষ্য না করতে পারে। রাতটা কি অন্ধকার আর নিস্তব্ধ দেখেছ? তোমাদের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। [থেমে] আমরা মরণের খুব কাছাকাছি এসেছিলাম।

যেসিকা। হ্যাঁ।

হোয়েডেরার। [ছোট্ট করে হেসে ওঠে] খুব কাছাকাছি। [থেমে] খুব চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শিলক বারান্দায় ঘুমোচ্ছে, জর্জ বৈঠকখানায় পড়ে ঘুমোচ্ছে, লিয়ো হলঘরে ঘুমোচ্ছে। আমি ওদের তুলে দেব ভাবলাম। আর তারপরে..... বাঃ! [থেমে] এখানে চলে এলাম। [যেসিকাকে] কি ব্যাপার? বিকেলে যেমন ভয় পেয়েছ দেখাচ্ছিল, এখন ত' তেমন দেখাচ্ছে না।

যেসিকা। তোমাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে কি না তাই।

হোয়েডেরার। মানে?

যেসিকা। আমি ভাবিনি যে তোমারো কোনদিন কাউকে দরকার পড়তে পারে।

হোয়েডেরার। আমার কাউকে কোন দরকার নেই। [থেমে] শিলকের কাছে শুনলাম তোমার ছেলেপুলে হবে?

যেসিকা। [দ্রুত] না, ও বাজে কথা।

হুগো। সত্যি যেসিকা, শিলককেই যদি বলতে পার, তবে হোয়েডেরারকে বলতেই বা মানা কি?

যেসিকা। আমি শিলককে একটু জ্বালাতন করছিলাম।

হোয়েডেরার। [অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে] তাই বুঝি। [থেমে]

আমি তখন পরিষদের সদস্য, একটা লোকের সঙ্গে থাকতাম—তার একটা গ্যারাজ ছিল। সন্ধ্যেবেলায় তাদের খাবার ঘরে তামাক খেতে যেতাম। তাদের একটা রেডিও ছিল, ছেলে-মেয়েরা মেঝের পরে খেলা করত।... [থেমে] না, শুতে যাওয়া যাক। ও সব একটা মরীচিকা।

সিকা। কি সব?

য়েডেরার। [সব কিছু বোঝানোর ভঙ্গী করে] ওই সব কিছু। তুমিও। আমাদের কাজ করে যেতে হবে—তাই শুধু আমরা পারি। সকালে গ্রামে টেলিফোন করে কাউকে ডাকিয়ে জানলাটা মেরামত করিয়ে নিও। [হুগোর দিকে চেয়ে] তোমাকে খুব অবসন্ন দেখাচ্ছে। শুনলাম আজ বিকেলে নাকি মাতাল হয়েছিলে? ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। নটার আগে কাজ শুরু করার দরকার নেই। [উঠে পড়ে। হুগো এক পা এগোয়। যেসিকা তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।]

যেসিকা। হুগো—এখন।

গো। কি?

যেসিকা। তুমি কথা দিয়েছিলে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করবে।

হোয়েডেরার। আমাকে বোঝাবার?

হুগো। চুপ করো [যেসিকাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। যেসিকা কিন্তু তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।]

যেসিকা। ও তোমার সঙ্গে একমত নয়।

হোয়েডেরার। [মজা পেয়ে] আমিও সেটা লক্ষ্য করেছি।

যেসিকা। ও তোমাকে বুঝিয়ে বলতে চায়।

হোয়েডেরার। কাল! কাল!

যেসিকা। কাল দেরী হয়ে যাবে।

হোয়েডেরার। কেন?

যেসিকা। [তখনো হুগোর সামনে দাঁড়িয়ে] ও...ও বলছে তুমি ওর কথা না শুনলে ও আর তোমার সেক্রেটারীর কাজ করতে পারবে না। তোমাদের দুজনে কেউই ক্লান্ত নও, সামনে সারারাত রয়েছে......আর......আর তুমি ত' মরণের খুব কাছাকাছি হয়েছিলে—তোমার ত' আরও সহনশীল হওয়া উচিত।

হুগো। চুপ কর বলছি।

যেসিকা। হুগো, তুমি কথা দিয়েছ। [হোয়েডেরারকে] ও বলছে যে, তুমি সামাজিক বিশ্বাসঘাতক।

হোয়েডেরার। সামাজিক বিশ্বাসঘাতক! শুধু এই?

যেসিকা। বাস্তব বিচারে। ও বলছে, বাস্তব বিচারে।

হোয়েডেরার। [গলার স্বর বদলে] বোঝা গেল। [হুগোকে] বেশ, তোমায় যখন থামানো যাবে না, তখন যা মনে হয়েছে খুলে বল। শুতে যাবার আগে ব্যাপারটা চুকিয়ে যেতে হবে। আমি সামাজিক বিশ্বাসঘাতক কেন?

হুগো। তোমার এই চুক্তির মধ্যে পার্টিকে টেনে আনবার কোনো অধিকার তোমার নেই বলে।

হোয়েডেরার। কেন নেই?

হুগো। কেননা, এটা একটা বিপ্লবী সংগঠন আর তুমি এটাকে সরকারের একটা অংশ করতে চেষ্টা করছো।

হোয়েডেরার। সব বিপ্লবী দলই তৈরী হয় ক্ষমতা দখল করার জন্যে।

হুগো। ক্ষমতা দখল করার জন্যে, হ্যাঁ, জোর করে কেড়ে নেবার জন্যে। মালিকদের পায়ে তেল দিয়ে ক্ষমতা কেনার জন্যে না।

হোয়েডেরার। রক্তক্ষয় নেই বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে? কি করব বল, কিন্তু ভালোই বুঝতে পারবে জোর করে ক্ষমতা দখল আমরা কোনদিনই করতে পারতাম না। যদি গৃহযুদ্ধ হয়, পেণ্টাগনের হাতে রয়েছে সব অস্ত্র-শস্ত্র, সেনানায়কেরা সব তাদের দলে। পেণ্টাগন তখন বিপ্লববিরোধী সৈন্যশক্তির প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে।

হুগো। গৃহযুদ্ধের কথা কে বলছে? হোয়েডেরার, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। দরকার ত' শুধু একটু ধৈর্যের। তুমি ত' নিজেই বলছিলে, রুশ সৈন্য এলে রিজেণ্টকে তাড়িয়ে দেবে, আর সব ক্ষমতা আসবে আমাদের হাতে।

হোয়েডেরার। কিন্তু আমরা সে ক্ষমতা রাখব কি করে? [থেমে] আমি বলছি তোমায়, রুশ বাহিনী যখন আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ঢুকবে, তখন খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে।

হুগো। রুশ বাহিনী.........

হোয়েডেরার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। আমিও তারি জন্যে অপেক্ষা করছি। সমান অধৈর্যের সঙ্গেই অপেক্ষা করছি। কিন্তু ভেবে দেখ, যুদ্ধের সময় কি মুক্তির কি অন্য ধরনের সব সৈন্যবাহিনীই একরকম। গাঁয়ের সম্পদ শোষণ করেই তাদের টিকতে হয়। স্বভাবতই আমাদের চাষীরা রুশ সৈন্যদের ঘৃণা করবে। সেই সৈন্যশক্তি যে সরকারকে তাদের পরে চাপাবে আমাদের পার্টির সেই সরকারকেই বা তারা ভালবাসবে কেন? আমাদের হয়ত বলবে, বিদেশী পার্টি কি তার চাইতেও খারাপ কিছু। পেণ্টাগন আবার গুপ্ত সংগঠন হিসেবে কাজ শুরু করবে, তাদের রাজনৈতিক বুলিগুলো পর্যন্ত বদলাতে হবে না।

হুগো। পেণ্টাগন হল......

হোয়েডেরার। তা ছাড়া আরো এক ব্যাপার আছে। দেশ এখন সর্বস্বান্ত, হয়ত বা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। রিজেণ্টের জায়গায় যে সরকারই আসুক, তাকে অনেক কড়া আইন-কানুন চালাতে হবে—ফলে তা জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হবেই। রুশ বাহিনী এদেশ হতে চলে যাবার পরের দিনই বিদ্রোহের ঢেউ আমাদের সরকারকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

হুগো। বিদ্রোহ পিষে মুছে দেয়া যায়। আমরা কঠোর শাসনের ব্যবস্থা করব।

হোয়েডেরার। কঠোর শাসন? কি দিয়ে? বিপ্লবের পরেও সর্বহারারা হবে সবচেয়ে দুর্বল দল। অনেকদিন পর্যন্তই তারা তাই থাকবে। কঠোর শাসন! যখন একদিকে বুর্জোয়াদের পার্টি প্রাণপণে চেষ্টা করবে আমাদের সব কাজ বানচাল করতে, আর চাষীরা আমাদের না খাইয়ে মারার জন্যে তাদের সব ফসল পুড়িয়ে দেবে?

হুগো। তাতে কি? ১৯১৭ সালে বল-

শোভিক পার্টিকেও অনেক সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়েছিল।

হোয়েডেরার। বাইরের সৈন্যবাহিনী এসে তাদের ক্ষমতায় বসায়নি। এখন ভাই আমার কথাটা শোন, একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমরা কারস্কীর উদারপন্থী আর রিজেণ্টের রক্ষণশীলদের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করলাম। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, কোনো তর্ক নেই, কেননা সেটা জাতীয় সরকার। কেউ বলতে পারবে না যে, বাইরের কেউ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। আমি প্রতিরোধ কমিটিতে অর্ধেক আসন চেয়েছি, কিন্তু মন্ত্রিসভায় অর্ধেক আসন চাইবার মত বোকামী আমি করব না। আমরা সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হব। এমন সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যারা অপ্রিয় সব আইন করার দায়িত্ব অন্য দলের পরে ছেড়ে দেবে আর তারি সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ভেতর হতে তারই বিরোধিতা করে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করবে। ওরা ত' তখন একেবারে কোণঠাসা। দু বছরের মধ্যে ওদের উদারনীতির দেউলে দশা সকলের নজরে পড়বে—আর তখন আমরা যাতে আমাদের হাতে ক্ষমতা নিই, তারি জন্যে সারা দেশ আমাদেরই পেড়াপীড়ি করবে।

হুগো। আর তার সঙ্গে পার্টির কাজও খতম হয়ে যাবে।

হোয়েডেরার। কাজ খতম হয়ে যাবে? কেন?

হুগো। পার্টির একটা কর্মসূচী আছেঃ সে হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করা। আমাদের একটা পদ্ধতি আছেঃ শ্রেণী সংগ্রামের সুযোগ নেওয়া। তুমি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে শ্রেণী সহযোগিতার নীতি চালু করার জন্যে পার্টিকে ব্যবহার করতে যাচ্ছ। তুমি যাচ্ছ বছরের পর বছর ধরে ধাপ্পা দিতে, ষড়যন্ত্র করতে, প্যাঁচ কষতে, রফার পর রফা করতে। তুমি আমাদের কর্মীদের কাছে পার্টির সহযোগিতায় চালু সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুনকে সমর্থন করবে। কেউ তোমার কথা বুঝবে না। যারা পার্টির মধ্যে গোঁড়া কর্মী, তারা আমাদের ছেড়ে যাবে; বাকী সবাই যেটুকু বা রাজনৈতিক চেতনা তারা সম্প্রতি লাভ করেছিল, তাও ক্রমে ক্রমে হারাবে। আমাদের মধ্যে বিষ সংক্রামিত হবে, আমাদের সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়বে, আমাদের পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রচ্যুত হবে। আমরা হয়ে উঠব জাতীয়তাবাদী, সংস্কারপন্থী। আর শেষটায় আমাদের এমন দশা হবে যে, বুর্জোয়া পার্টিরা শুধু তাদের কড়ে আঙুলের ডগাটা তুললেই আমরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাব। হোয়েডেরার, পার্টি তোমার। কত চেষ্টায় আমরা একে গড়ে তুলেছি, এরি জন্যে কত ত্যাগ আমরা দাবী করেছি, কত বিধিনিষেধ আমরা চাপিয়েছি কর্মীদের পরে—এ তুমি ত' ভুলতে পার না। আমি তোমার পায়ে পড়ে ভিক্ষে চাইছি—নিজের হাতে তুমি এ সব নষ্ট করে দিও না।

হোয়েডেরার। কি বকবকই করতে পার! যদি ঝুঁকিই না নিতে চাও, তবে রাজনীতির খেলা খেলতে এসো না।

হুগো। আমি এমন ঝুঁকি নিতে রাজী নই।

হোয়েডেরার। চমৎকার! কিন্তু তাহলে ক্ষমতা মুঠোয় ধরে রাখবে কি করে?

হুগো। কি দরকার ক্ষমতা নেওয়ার?

হোয়েডেরার। তুমি কি পাগল? একটা গণবাহিনী এসে দেশ দখল করতে যাচ্ছে, আর তুমি তার সুযোগ না নিয়ে সে বাহিনীকে চলে যেতে দেবে? এ সুযোগ আর আসবে না। আমি বলছি তোমায় শুধু নিজেদের জোরে বিপ্লব করার শক্তি আমাদের নেই।

হুগো। অত দাম দিয়ে ক্ষমতা কেনা ঠিক নয়।

হোয়েডেরার। তবে পার্টি দিয়ে কি করতে চাও তুমি? ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বানাবার আস্তাবল করতে চাও? ছুরিকে প্রত্যহ শানাবার কি মানে হয়, যদি তা দিয়ে কোনোদিন কিছু নাই কাটবে? পার্টি একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। আর সে উদ্দেশ্য শুধু একটাতেই হতে পারেঃ ক্ষমতা হাতে পাওয়া।

হুগো। উদ্দেশ্য শুধু একটাই হতে পারেঃ আমাদের যত আদর্শ সব কাজে চালু করা, আমাদের প্রত্যেকটি আদর্শ, নিষ্কলুষভাবে শুধু আমাদেরই আদর্শ।

হোয়েডেরার। ভুলে গেছলাম, তোমার এখনো আদর্শের বালাই আছে। ও মোহ তুমি কাটিয়ে উঠবে।

হুগো। তুমি কি ভেবেছ এ ভাবনা শুধু একা আমার? রিজেণ্টের পুলিশের হাতে আমাদের যে সহকর্মী বন্ধুরা মারা গেছে, তারা কি এই আদর্শের প্রেরণাতেই প্রাণ দেয়নি? আমরা যদি তাদের সেই হত্যাকারীদের বাঁচাবার জন্যে পার্টিকে ব্যবহার করি, তাহলে কি তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না?

হোয়েডেরার। যারা মারা গেছে, তাদের জন্যে আমার একরত্তিও মাথাব্যথা নেই। তারা পার্টির জন্যে প্রাণ দিয়েছে; পার্টি যা ভাল বোঝে তাই করবে। আমার কর্মসূচী জীবন্ত—যারা বেঁচে আছে তাদের হাতে গড়া, তাদেরি জন্যে গড়া।

হুগো। আর তোমার বিশ্বাস যারা বেঁচে আছে, তারা তোমার এই সহযোগিতার চুক্তি মেনে নেবে?

হোয়েডেরার। তাদের আস্তে আস্তে গেলাতে হবে।

হুগো। তাদের ভাঁওতা দিয়ে?

হোয়েডেরার। মাঝে মাঝে ভাঁওতা দিয়ে।

হুগো। তোমাকে......তোমাকে দেখলে মনে হয়, তুমি এত বাস্তব, এত বলিষ্ঠ! তুমি আমাদের সহকর্মীদের ভাঁওতা দেবে এ কখনো সত্যি হতে পারে না।

হোয়েডেরার। কেন? আমরা এখন যুদ্ধ করছি। যুদ্ধের ধাপে ধাপে বর্ণনা কেউ আগে হতে সৈন্যদের দেয় না।

হুগো। হোয়েডেরার, আমি......আমি তোমার চাইতে অনেক ভালো করে জানি ভাঁওতা দেওয়া কি জিনিস। বাড়িতে প্রত্যেকে নিজেকে নিজে

ভাঁওতা দিত, আমাকে ভাঁওতা দিত। পার্টিতে যোগ দেওয়ার পর এই গত এক বছর আমি প্রথম বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছি। জীবনে এই প্রথম কিছু মানুষ দেখলাম, যারা পরস্পরকে ভাঁওতা দেয় না। প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে; সবচেয়ে সামান্যতম কর্মীও অনুভব করে যে, নেতাদের প্রতিটি নির্দেশ তার নিজের গভীরতম কামনাকেই তার কাছে উদ্ঘাটিত করছে। কোনো কঠিন কাজের ভার পড়লে সে জানে কেন সে প্রাণ দিতে রাজি হোল। তোমার অধিকার নেই...

হোয়েডেরার। কিসের কথা বলছ?

হুগো। আমাদের পার্টির কথা।

হোয়েডেরার। আমাদের পার্টি? কিন্তু সবাই ত' চিরকাল একটু আধটু ভাঁওতা দিয়ে এসেছে। আর পাঁচজন যেমন দেয়। তোমার নিজের কথাই ধর, হুগো। তুমি নিঃসন্দেহ, তুমি কখনো ভাঁওতা দেও নি, কখনো ভাঁওতা দাও না, এই মুহূর্তে ভাঁওতা দিচ্ছ না?

হুগো। আমি আমাদের সহকর্মীদের কখনো ভাঁওতা দিইনি। আমি...যদি মানুষদের এত অপদার্থই ভাবো যে মিথ্যে দিয়ে তাদের মাথা বোঝাই করতে তোমার বাধে না, তবে তাদের মুক্তির জন্যে লড়াই করে কি হবে?

হোয়েডেরার। যখন মিথ্যের একান্ত দরকার পড়ে, তখন আমি মিথ্যে বলি। আর অপদার্থ আমি কাউকেই ভাবি না। ভাঁওতা দেওয়া কিছু আর সংসারে আমি উদ্ভাবন করিনি। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ থেকেই এর উদ্ভব। জন্মসূত্রে এ আমাদের উত্তরাধিকার। আমরা মিথ্যে কথা বলব না বল্লেই সংসার হতে মিথ্যে কথা সব লোপ পাবে না। শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করার জন্যে যে অস্ত্র হাতে পাব, তাই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

হুগো। সব উপায়ই ত' ভালো নয়।

হোয়েডেরার। সব উপায়ই ভালো—যদি তাতে কার্য সিদ্ধি হয়।

হুগো। তাহলে তুমি কোন্ অধিকারে রিজেন্টকে তার নীতির জন্যে দোষী করছ? সে ত' দেশের স্বাধীনতা রক্ষে করার জন্যেই সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

হোয়েডেরার। তুমি কি ভেবেছ, আমি তাকে দোষ দিচ্ছি? অত নষ্ট করার সময় আমার নেই। তার বর্ণের যে কোন মূর্খ তার অবস্থায় পড়লে যা করত, সেও তাই করেছে। আমরা কংগুলো মানুষ কি একটা নীতির সঙ্গে ত' লড়াই করছি না; যে শ্রেণী এই সব মানুষ আর নীতির জন্ম দিয়েছে, তার সঙ্গেই আমাদের লড়াই।

হুগো। আর তোমার কাছে সেই লড়াই চালাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তাদের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগীদার হতে চাওয়া?

হোয়েডেরার। ঠিক তাই। আজকের অবস্থায় সেটাই শ্রেষ্ঠ উপায়। [থেমে] ছেলেমানুষ! নিজের পবিত্রতা সম্বন্ধে কি মোহ তোমার! কত ভয়, পাছে তোমার দু হাতে নোংরা লাগে! ভাল কথা, থাকো পবিত্র! কিন্তু তাতে কার কী সাহায্যটা হবে? আর কেনই বা তুমি আমাদের মধ্যে এসেছিলে? পবিত্রতা ফকির সন্ন্যাসীদের আদর্শ। তোমরা বুদ্ধিজীবীরা, বুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদীরা, তোমরা কিছু না করার কৈফিয়ৎ হিসেবে পবিত্রতাকে কাজে লাগাও। কোরো না কিছু, থাকো ছিমছাম, শরীরের দুপাশে ফিটফাট ঝুলিয়ে রাখো কনুই দুটো, নরম চামড়ার দস্তানায় ঢেকে রাখো তোমার হাত। আমার দু হাত নোংরা, রক্ত আর নোংরাম কনুই পর্যন্ত ডুবিয়েছি। তাতে কি? তুমি কি ভেবেছ একসঙ্গে শাসনও করবে, আবার আত্মাকে শুভ্র, নিষ্কলুষ রাখবে?

হুগো। একদিন দেখতে পাবে, রক্তকে আমি ভয় করি না।

হোয়েডেরার। চমৎকার লাল দস্তানা, খুব কায়দাদুরস্ত, ভারী সৌখীন। তোমার ভয় বাকী ব্যাপারটাতে। সেটা তোমার অভিজাত খুদে নাকে লাগে কি না।

হুগো। শেষ পর্যন্ত সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে এলাম—আমি অভিজাত—আমার কখনো ক্ষিধে পায়নি এমনি হারামী। কিন্তু আমার মত ত' শুধু আমার একার নয়—আর সেখানেই তোমার বিপদ।

হোয়েডেরার। একার নয়? তুমি কি এখানে আসার আগে আমার এই চুক্তি আলোচনার কথা কিছু জানতে?

হুগো। না.....না। আবহাওয়াতে এমনিতর একটা সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। আমরা পার্টির মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। আর বেশিরভাগেরই মত আমার সঙ্গে এক। আমি শপথ করে বলতে পারি, তারা কেউই অভিজাত নয়।

হোয়েডেরার। ছেলেমানুষ! তুমি আমার কথা ভুল বুঝেছ। পার্টির মধ্যে যারা আমার নীতির বিরুদ্ধে, তাদের আমি চিনি। আমি জানি, তারা আমারি জাতের মানুষ, তোমার জাতের নয়—আর শিগ্গিরই তুমি নিজেই সে কথা বুঝতে পারবে। তারা যদি আমার এ আলোচনায় আপত্তি করে থাকে, তার কারণ তারা ভাবছে, এটা এ আলোচনার ঠিক সময় নয়। অন্য অবস্থায় তারাই প্রথমে ঠিক এই জিনিস করবে। তুমি সব ব্যাপারটাকে আদর্শের প্রশ্ন করে তুলছ।

হুগো। আদর্শের কথা কে বলেছে?

হোয়েডেরার। তুমি এটা আদর্শের প্রশ্ন করে তুলছ না? বেশ কথা। তাহলে এ যুক্তিতে তোমার আস্থা হবে। আমরা যদি রিজেন্টের সঙ্গে রফা করতে পারি, তাহলে সে যুদ্ধ বন্ধ করবে। ইলীরিয়ার সৈন্য তখন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবে, কখন রুশ সৈন্য এসে তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেয়। আমরা যদি এ আলোচনা ভেঙে দিই সে জানবে তার আর কোন আশা নেই। সে তখন পাগলা কুকুরের মত মরিয়া হয়ে লড়বে। লক্ষ লক্ষ লোক সে লড়াইয়ে মুছে যাবে। কি বল তুমি? [থেমে] তা

হলে? কি বল তুমি? কলমের একটি খোঁচায় লক্ষ লক্ষ লোককে মুছে দিতে পার কি?

হুগো। [কষ্টে, চেষ্টা করে] ফুল বিছিয়ে ত' বিপ্লব করা সম্ভব নয়। যদি তাদের মরতেই হয়......

হোয়েডেরার। তাহলে?

হুগো। তাহলে, তারা মরবে।

হোয়েডেরার। দেখলে ত'। দেখলে ত'। তুমি তোমার প্রতিবেশী মানুষদের ভালবাস না, হুগো। তুমি শুধু তোমার নীতিকেই ভালবাস।

হুগো। আমার প্রতিবেশীরা? কেন তাদের ভালবাসব? তারা কি আমায় ভালবাসে?

হোয়েডেরার। তবে কেন তুমি আমাদের সংগে এলে? যদি প্রতিবেশী মানুষ-দের তুমি ভালইবাস না, তবে তাদের জন্যে লড়বে কি করে?

হুগো। পার্টির উদ্দেশ্য ন্যায়সংগত ছিল বলে পার্টিতে এসেছিলাম, যেদিন তা থাকবে না শুধু তখনই তাকে ছাড়ব। আর প্রতিবেশী মানুষদের কথা বলছ—তারা কী তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই। তারা কি হতে পারে তাতেই আমার আগ্রহ।

হোয়েডেরার। কিন্তু আমি তারা যা তার জন্যেই তাদের ভালবাসি। তাদের পাপ, নোংরামী সব কিছু নিয়ে। আমি ভালবাসি তাদের স্বর, তাদের উষ্ণ হাত, তাদের উদ্বিগ্ন মুখ, মৃত্যু আর দুঃখের বিরুদ্ধে তাদের মরিয়া সংগ্রাম। আমার কাছে পৃথিবীতে একজন লোক বেশী আছে কি কম আছে, এটাই বড় কথা। তার জীবন মূল্যবান। তোমাকে আমি জানি, ভাই, তুমি ধ্বংসজীবী। তুমি নিজেকে ঘেন্না কর বলেই মানুষকে ঘেন্না কর; তোমার পবিত্রতা মৃত্যুর পবিত্রতা। যে বিপ্লবের স্বপ্ন তুমি দেখ, সে আমা-দের বিপ্লব নয়। তুমি জগতটাকে বদলাতে চাও না—তাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিতে চাও।

হুগো। [উঠে দাঁড়িয়েছে] হোয়ে-ডেরার!

হোয়েডেরার। তুমি কি করবে; তোমরা বুদ্ধিজীবীরা সব একরকমের। কোনো বুদ্ধিজীবী কখনো সত্যিকারের বিপ্লবী হয় না—তার তাকত বড় জোর খুনে হওয়া।

হুগো। খুনে! হ্যাঁ!

যেসিকা। হুগো! [তাদের দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দরজায় চাবী ঘোরানোর আওয়াজ হয়। দরজা খোলে। জর্জ আর শ্লিক ঢোকে।]

জর্জ। এই ত' তুমি এখানে। আমরা সব জয়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

হুগো। তোমাদের আমার ঘরের চাবী দিলে কে?

শ্লিক। আমাদের কাছে সব ঘরের চাবী আছে। কেনই বা থাকবে না? আমরা ওর দেহরক্ষী।

জর্জ। [হোয়েডেরারকে] আমাদের যা ঘাবড়ে দিয়েছিলে! শ্লিক ঘুম ভেঙে উঠে দেখে কোথাও হোয়েডেরারের চিহ্ন নেই। যখন একটু হাওয়া খেতে বেরোও, আমাদের একটা হাঁক দিলে ত' পার।

হোয়েডেরার। তোমরা ঘুমোচ্ছিলে......

শ্লিক। [অবাক হোয়ে] তাতে কি? কবে থেকে আবার আমাদের ওঠাবার দরকার হলে পড়ে ঘুমোতে দাও?

হোয়েডেরার। [হাসতে হাসতে] কি যেন হয়েছিল আমার! [থেমে] চল, তোমাদের সংগে যাব। কাল সকালে দেখা হচ্ছে হুগো। নটায়। তখন আবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। [হুগো কথা বলে না।] শুভ রাত্রি, যেসিকা।

যেসিকা। শুভ রাত্রি হোয়েডেরার। [তারা বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ চুপচাপ।] তাহলে?

হুগো। তাহলে? তুমি ত' ছিলে—শুনলে ওর কথা।

যেসিকা। তোমার কি মনে হচ্ছে?

হুগো। আমার কি মনে হতে পারে আশা করছো? আগেই ত' বলে-ছিলাম ও শেয়ালের মত ধূর্ত।

যেসিকা। হুগো! ওই ঠিক।

হুগো। বোকা মেয়ে, তুমি এর কি জানো?

যেসিকা। তুমিই বা কি জান? ওর কাছে তোমাকে এতটুকু দেখাচ্ছিল।

হুগো। আমাকে ছোট দেখানো ওর পক্ষে সহজ। একবার লুইএর মুখো-মুখি হত। সে অত সহজ ঠাঁই নয়।

যেসিকা। হয়ত লুইকেও অমনি সহজেই চুপ করিয়ে দিত।

হুগো। কি? লুইকে? তুমি তাকে চেন না। তার কখনো ভুল হয় না।

যেসিকা। কেন হবে না?

হুগো। কেন—কেন সে যে লুই!

যেসিকা। হুগো, তুমি নিজের মনের বিরুদ্ধে কথা বলছ। তুমি যখন ওর সংগে তর্ক করছিলে আমি তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম। তুমি বুঝতে পেরেছ ও ঠিক।

হুগো। ও মোটেই আমাকে বোঝাতে পারেনি। সহকর্মীদের ভাঁওতা মারা ভাল, একথা কেউ আমাকে কোনো দিন বোঝাতে পারবে না। কিন্তু ও যদি আমাকে সত্যি বোঝাতে পারত তবে ওকে খুন করার সেটা আর একটা কারণ মনে করতাম। তার মানে ও অন্য সবাইকেও বোঝাতে পারবে কাল সকালে এর হেস্তনেস্ত করব

যবনিকা

(ক্রমশঃ)
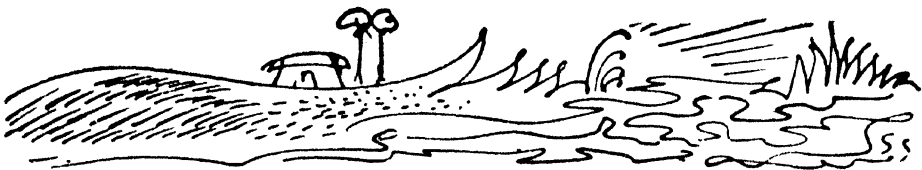
সতেরো

কথা হচ্ছিল কাশিম ফকিরের উকিল সুজিৎ রায়ের বৈঠকখানায়। ভদ্রলোকের বৃত্তি ওকালতি কিন্তু প্রকৃতি সাহিত্যিক। প্রথমটা তাঁর উপজীবিকা, দ্বিতীয়টা উপসর্গ। মফস্বল শহরে মাঝে মাঝে কোনো সাহিত্যিক-যশঃপ্রার্থী স্থানীয় লেখকের চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ কিংবা চিত্তাকর্ষক কবিতা পাঠ উপলক্ষ করে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বৈঠকখানায় যেসব চা-জলযোগের বৈঠক বসে, এই উকিলবাবুটি তারই একজন অকৃত্রিম সভ্য। ওরই একটা কি অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে-পরিচয় ক্রমশ গাঢ়তর হয়ে বন্ধুত্বের কোঠায় প্রমোশন লাভ করবার আয়োজন করছে, সেই সময়ের কথা। মক্কেলের জন্যে মৃত্যুদণ্ড আর নিজের জন্যে পরাজয় পকেটস্থ করে বাড়ি ফিরেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখলাম, উকিল হলেও ঘটনাটা তাঁর বুদ্ধির কোঠা পার হয়ে অন্তরের দরজায় করাঘাত করে ফেলেছে। কোনোরকম ভূমিকা না করেই তিনি কাশিম ফকিরের দীর্ঘ কাহিনী একটানা শুনিয়ে গেলেন। অর্থাৎ, আমি উপলক্ষ মাত্র। কথাগুলো শোনালেন তিনি নিজেকেই।

আমি জেলের লোক। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ইতিহাস আমার মনের পাতায় দাগ কাটে না। আমি দেখলাম ওর গদ্যময় বাস্তব দিকটা। বললাম, ফকির সাহেবের কল্যাণে আপনার খাটুনি যেটা হয়েছে, সেটা না হয় ছেড়ে দিলাম; খরচ-পত্তর বাবদ উকিলবাবুর পকেটের উপরেও তো চাপ কম পড়েনি। উনি বললেন, ঠিক উল্টো। বরং পারিশ্রমিক বলে পকেটে যেটা এসেছে, তার পরিমাণ, উকিলবাবু সচরাচর যা পেয়ে থাকেন, তার চেয়ে বেশী বই কম নয়।

বিস্মিত হলাম, বলেন কি? কোন্ সূত্রে এল? ফকিরের এতবড় বান্ধবটি কে?

—কেন, ওর বৌ কুটিবিবি?

আমি এমন চোখে তাকিয়ে রইলাম, সাধুভাষায় যাকে বলে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচন।

সুজিৎবাবু আরো পরিষ্কার করে বললেন, খরচ পত্তর তো দিয়েছেই, পাঁচ-বার দেখা করেছে আমার সঙ্গে।

কৌতূহল দমন করা গেল না। প্রশ্ন করলাম, স্বামী পয়গম্বরের সঙ্গে দেখা করতে চায়নি?

—না। একদিন আমি তুলেছিলাম সে কথা। মুখ বেঁকিয়ে বলল, "ও মুখ-পোড়াকে দেখে আমার কি হবে?" কিন্তু একথা সে অনেকবার বলেছে আমাকে, টাকা যা লাগে দেবো, উকিলবাবু। তুমি খালি দেখো, গলাটা যেন ওর বেঁচে যায়।.........

কিন্তু গলা বাঁচাতে পারলুম না। নিঃশ্বাস ফেলে বললেন সুজিৎবাবু।

সুজিৎবাবু যখন ছেড়ে দিলেন, তখন রাত এগারটা। সমস্ত রাস্তাটা ফকির-দম্পতির কীর্তি কাহিনীই মন আচ্ছন্ন করে রইল। একবার ভালো করে দেখতে ইচ্ছা হল লোকটাকে। বাড়ী না ফিরে সোজা জেলের মধ্যে গিয়ে হাজির হোলাম।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর নির্জন কক্ষ—জেলের ভাষায় যাকে বলে ফাঁসি ডিগ্রি বা Condemned Cell, লোহার গরাদে দেওয়া রুদ্ধ দরজা। তার ঠিক সামনেই জ্বলছে একটা তীব্র লণ্ঠনের আলো। তারই পাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে সতর্ক প্রহরী। এই একটি মাত্র কয়েদির জন্যেই সে বিশেষভাবে নিয়োজিত। তার শ্যেন-চক্ষুর প্রখর অবরোধ থেকে একটি সেকেণ্ডের তরেও মুক্তি নেই হত-ভাগ্য বন্দীর। ডিউটি অন্তে ও যখন চলে যাবে, ওর জায়গায় আসবে আর একজন। সে গেলে আর একজন। যতদিন না একে-বারে মুক্তি হয় ঐ বন্দীর—এই প্রহরী-পরিক্রমার বিরাম নেই। এইটাই আইনের বিধান। জানি না, এ বিধান কার রচনা। যারই হোক, ঐ একচক্ষু প্রহরীর মত তিনিও বোধ হয় দাঁড়িয়েছিলেন একমাত্র রাষ্ট্রশাসনের বেদির উপর। ঐ সিপাহীর মত তারও হাতে ছিল সমাজ-স্বার্থের লণ্ঠন। যার জন্যে তার বিধান রচিত হল, সেই মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে, তার দিকে

চেয়ে তিনি তাঁর আইনের একটি ধারাও যোজনা করেননি। একথা তাঁর মনে হয়নি, মৃত্যু-দণ্ড যত বড়ই নিষ্ঠুর হোক, এই হুঁশিয়ারির দণ্ড তার চেয়েও নির্মম। ফাঁসি-মঞ্চের যে অদৃশ্য ছায়া ঐ লোকটাকে অনুক্ষণ অনুসরণ করছে, দিনরাত্রির কোনো না কোনো ক্ষণে তাকে হয়তো ও ভুলে থাকতে পারে, কিন্তু মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারে না এই সদাজাগ্রত প্রখর দৃষ্টির অনুসরণ। সে-যে অষ্ট প্রহর নজরবন্দী, তার আহার নিদ্রা শয়ন উপবেশন তার কর্মক্লেশহীন দিনরাত্রির ক্লান্তি ও বিশ্রাম, সবারই উপরে চেপে রয়েছে এই যে নিরবচ্ছিন্ন সতর্কতার নিশ্ছিদ্র আবরণ, সে কি প্রতি নিমিষেই তার কণ্ঠরোধ করছে না? যে-দুটি দৈনন্দিন জৈব ক্রিয়া দেহী মাত্রেরই অবশ্য করণীয়, অথচ মানুষমাত্রেরই গোপনীয় তার জন্যেও কি এতটুকু অন্তরালের প্রয়োজন হয়নি ফাঁসির আসামীর?

শুনেছি, সম্ভাব্য আত্মহত্যার দুর্গতি থেকে রক্ষা করবার জন্যেই মৃত্যু-দণ্ডিতের উপর এই সতর্কতার অভিযান। কিন্তু তার দৈহিক হত্যাটাই বড় হল? আর, এই যে পলে পলে তিলে তিলে আত্মহত্যা করছে তার আত্মা, শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে তার লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব, সে কথাটা কি ভেবে দেখেছিলেন আইনস্রষ্টা বিজ্ঞের দল?

আর একটু এগিয়ে সেলের ঠিক সামনেটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বালিশ-শূন্য কম্বলশয্যার উপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে আমার বন্দী, Condemned prisoner কাশিম আলি ফকির। ঘুমুচ্ছে, না জেগে আছে, কে জানে? সে যে আছে, এইটুকুই আমার প্রয়োজন। এইটুকু দেখে এবং আমার বিশ্বস্ত কর্মীর মুখে শুনেই আমি নিশ্চিন্ত। তার মনের খবর আমি রাখি না। রাখবার কথাও নয়। তবু, কেন জানি না, কেমন আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে রইলাম ঐ সাড়ে চার ফুট লম্বা শীর্ণকায় লোকটার দিকে। ওর একমাথা চুল, একমুখ দাড়ি, মুদ্রিত চোখের কোণে গভীর বলি-রেখা, শীর্ণ দেহের উপর ঢোলা পোশাক এবং বিশেষ করে ওর ঐ পড়ে থাকবার নিশ্চিন্ত ভঙ্গী—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন মনে হল হাস্যকর—ইংরাজীতে যাকে বলে funny. এই লোকটা খুন করেছিল? একটা নয় দুটো নয়, বারোটা খুন!

ফকির আপীল করেনি। তবু আইনের বিধানে মৃত্যুদণ্ডে মহামান্য হাইকোর্টের সম্মতির প্রয়োজন। কদিনের মধ্যেই সে সম্মতি এসে গেল—Death sentence confirmed. এর পর রইল প্রাণ-ভিক্ষার পালা। প্রথমে ছোটলাট; সেখানে ব্যর্থ হলে বড়লাট; তিনিও যদি বিরূপ হন, মহামহিম ভারত সম্রাট। Mercy petitionএর খসড়াও তৈরি হল—বহু যত্নে রচিত, বহু হৃদয়দ্রাবী বিশেষণের একত্র সমাবেশ। কিন্তু ফকির সে আবেদনে টিপ সই দিতে রাজী হল না। প্রাণ-ভিক্ষা চায় না সে। অতএব অনাবশ্যক বিলম্ব না করে ফাঁসির দিন স্থির হয়ে গেল। আসামীর কাছে সেটা প্রকাশ করবার নিয়ম নেই।

কাউকে দেখতে ইচ্ছা করে?—সরকারীভাবে প্রশ্ন করা হল ফকিরকে।

এক মুহূর্ত কি ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে জানাল—না।

দিন তিনেক পরে বিকাল-বেলা সেল-ব্লকের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছি। ফকির বসেছিল তার 'ডিগ্রির' দরজার ঠিক পেছনে। মুখ দেখে মনে হল কি যেন বলতে চায়। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবে?

ফকির একটু ইতস্তত করে বলল, এখানে মেয়েমানুষ আসতে পারে, বাবু?

—কেন পারবে না? কাউকে দেখতে চাও?

—আমার বিবিকে একবার দেখতে চাই। নাম কুটিবিবি; মধুপুর থানায় রাউজান গ্রামে বাড়ী।

সরকারী চিঠি গেল কুটিবিবির নামে। তার নকল পাঠানো হ'ল থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে। বেসরকারী খবর পাঠালাম সুজিৎবাবুর বৈঠকখানায়। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং দিন সাতেক খোঁজাখুঁজি করে শুষ্ক মুখে এসে বললেন, পাওয়া গেল না মলয়বাবু। রায়ের দিনও কোর্টে এসেছিল। কিন্তু হাকিম উঠে যাবার পর বাইরে এসে আর দেখতে পাইনি।

থানা থেকেও খবর এল, উক্ত ঠিকানায় কুটিবিবি নামক কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেল না।

নির্দিষ্ট দিন এসে গেল। রাত চারটা বাজতেই আসামীকে ডেকে তোলা হল। বড় জমাদার তার সেলের সামনে গিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, বেরিয়ে এসো, ফকির। গোসল সেরে নিয়ে আল্লার নাম কর।

কাশিম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। সেলের দরজা খোলা হল। ফকির জমাদারের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে হবে?

এর উত্তরটা বোধ হয় আটকে গেল তেত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ কর্মচারী বহুদর্শী চীফ্ হেডওয়ার্ডার গজানন্দ সিংয়ের মুখে। গোসল বা আল্লার নাম করতে ফকির কোনো উৎসাহ দেখাল না। সেল-ব্লকের মেট এবং পাহারাওয়ালা এগিয়ে গিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে এল। মাথায় কয়েক মগ জল ঢেলে পরিয়ে দিল এক সুট নতুন তৈরি জাঙিয়া কুর্তা। মেট মুসলমান। ফকিরকে পাশে নিয়ে সেই নমাজ পড়ল। ফকির অনুসরণ করল যন্ত্রচালিতের মত।

শেষ ব্যবস্থা তদারক করবার জন্যে সেল-ইয়ার্ডে যখন হাজির হলাম, ঠিক তখনই ফকিরের নমাজ শেষ হয়েছে। এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, সে এল না বাবু?

এক মুহূর্ত ভেবে নিলাম। তার পর বললাম, এসেছিল ফকির। কিন্তু তোমার খবর শুনে কেঁদে কেঁদে অফিসের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, এ অবস্থায় ওকে দেখা করতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওষুধ পত্তর দিয়ে সুস্থ করে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। ফকির সর্বাঙ্গ দিয়ে শুনে গেল আমার কথার প্রতিটি অক্ষর। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে অস্ফুটকণ্ঠে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আল্লাহ্। মনে হল, এই নিঃশ্বাসের সঙ্গেই যেন বেরিয়ে গেল তার নিভৃত অন্তরের কোন্ বহুদিন রুদ্ধ বেদনার বোঝা। রাত্রি শেষের ক্ষীণালোকেও স্পষ্ট দেখলাম, মলিন মুখখানা তার এক নিমিষে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শীর্ণ কোটর-

চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কফোঁটা নীরব অশ্রু।

অন্তর্যামী জানেন, ফকিরকে যা ছিলাম, তার সমস্তটাই আমার রচনা। তু ঐটুকু মিথ্যার মূল্যে যে-পরম বন্ধু না পেলাম, তার সঙ্গে বিনিময় করতে র, সমস্ত জীবনব্যাপী সত্যভাষণের ূল গৌরব। শুধু কি পেলাম? যে তে তুলে দিলাম এই মৃত্যুপথযাত্রীর য়পাত্রে, তার মরণজয়ী মাধুর্যে আমার নেও অক্ষয় হয়ে রইল।

ফাঁসি-যন্ত্রের চারদিকে কর্মব্যস্ততা ল হয়ে উঠল। সুপার-সাহেব এলেন। সঙ্গে এলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। কারী ইউনিফর্মে সজ্জিত জেলর এবং সহকারীর দল সার বেঁধে এসে লেন একদিকে। আর একদিকে ল সশস্ত্র রিজার্ভ ফোর্স। চারদিক ব্ধ। অতবড় জেলের তেরশ চৌদ্দশ ক যেন রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে প্রহো- কোন্ মহাসংকটের প্রতীক্ষায়। লো ব্যারাক, যেন প্রেতপুরী। থাও নেই একবিন্দু প্রাণ-চিহ্ন।

সুপারের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আসামীকে আনা হল। মাথায় চোখঢাকা টুপি। পেছটা পেছন দিকে হাতকড়া দিয়ে দুদিক থেকে দুজন সিপাই আস্তে তাকে ধরে তুলল ফাঁসি মঞ্চের । মাথার ঠিক ওপরটাতে একটা র আড়ের সঙ্গে ঝুলছে মোটা লা দড়ির তৈরি ফাঁস। পায়ের নীচে র তক্তা। তার তলায় নাতি-গভীর জল্লাদ তৈরি হয়ে আছে। হুকুমের পেক্ষায়।

সুপারের হাতে ওয়ারেণ্ট। গম্ভীর- পড়ে গেলেন জজের আদেশ। তার লা তরজমা করে শোনালেন বিলিজ- রের ডেপুটি জেলর। সঙ্গে সঙ্গে না গেল রিজার্ভ চীফ্ হেডওয়ার্ডারের গম্ভীর কমান্ড্—Present Arms. ুর্তে নৈপুণ্যে উদ্যত হল রাইফেল- বেয়নেট। চিরবিদায়োন্মুখ বন্দীর দেশে বন্দীশালার সশস্ত্র বাহিনী জানাল দের শেষ সামরিক সম্মান।

রাইফেলের বাটের উপর তাদের হাতের দ তখনো মিলিয়ে যায়নি। হঠাৎ চারদিক সচকিত করে স্তব্ধ জেল-প্রাঙ্গণের বুক চিরে ফেটে পড়ল এক তীক্ষ্ণ আর্তস্বর—ছেড়ে দাও, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও—!' ফাঁসি মঞ্চের উপর থেকে ছুটে পালাতে চাইল ফাঁসির আসামী। দুজন জোয়ান সিপাহি তাকে ধরে রাখতে পারে না! জল্লাদ থমকে দাঁড়াল। সুপারের কপালে দেখা দিল কুঞ্চন রেখা। তার ইঙ্গিতে আরও দুজন সেপাই ছুটে গিয়ে জোর করে তুলে ধরল আসামীর ভেঙ্গে পড়া কম্পিত দেহ। ক্ষিপ্রহস্তে হ্যাংম্যান গলায় পরিয়ে দিল ফাঁস এবং মুহূর্ত মধ্যে টেনে দিল লোহার হাতল। পায়ের তলা থেকে লোহার পাত-খানা নিচে পড়ে গেল। তারি সঙ্গে চোখের নিমিষে গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল কাশিম ফকিরের শীর্ণ দেহ। একটা শক্ত মোটা দড়ি শুধু ঝুলে রইল আমাদের চোখের সামনে। একটুখানি কেঁপে উঠল একবার কি দুবার। তার পর সব স্থির।

সকলের মুখেই ঐ এক কথা। এ কী করে বসল লোকটা? গোড়াতে না করল আপীল, না পাঠাল একটা mercy petition, ভেঙ্গে পড়ল শেষকালে একে-বারে ফাঁসিকাঠের উপর! ড্রামাটিক কাণ্ড বটে!

ঐ ফাঁসি নিয়েই সেদিন জমে উঠল গল্পের আসর। সিনিয়র অফিসরেরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন। রবিনবাবু বললেন, ফাঁসি তো কতই দেখলাম। টেররিস্টদের কথা বলছিনে। তাদের ব্যাপারই আলাদা। তা ছাড়া যাদের দেখেছি, সবাইকেই প্রায় ধরে আনতে হয়েছে সেল থেকে gallows অবধি। একটা মুসলমান ছোকরা কিন্তু ভারী বাহাদুরী দেখিয়েছিল সেবার আলীপুর জেলে। আলি আহম্মদ না কি ছিল তার নাম; ঠিক মনে নেই। বড় লোকের ছেলে। বিয়েও করেছিল বনেদি ঘরে। বৌ নাকি ছিল পরমাসুন্দরী। এক মাস না যেতেই দিল একদিন তাকে খতম করে।

—খতম করে! কেন?

—কেন আবার? চরিত্রে সন্দেহ। কাঁচা বয়সে যা হয়ে থাকে। যেমন উন্মত্ত প্রেম, তেমনি পলক না ফেলতেই সন্দেহ। অবশ্য, ভুল বুঝতেও তার দেরি হয়নি। তখন ছোরা হাতে একেবারে থানায় গিয়ে হাজির। নিজে সে মামলা লড়তে চায়নি। কিন্তু বাড়ির লোকে শুনবে কেন? চেষ্টার ত্রুটি হল না। বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার, তদ্বির সুপারিশ ধরপাকড়, কান্নাকাটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গলা বাঁচল না।

তার ফাঁসির দিনটা বেশ মনে আছে। সেল থেকে বেরিয়ে এল গট্‌গট্ করে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল gallows-এর ওপর। বড় সাহেব ওয়ারেণ্ট পড়ছিলেন। মাঝখানেই বলে উঠল, ওসব রাখো সাহেব। ওয়ারেণ্ট তো আগেই শুনেছি। তোমার হ্যাংম্যানকে ডাক, ফাঁসটা লাগিয়ে দিক। I am ready.

...তারপর একটু থেমে ধীরে ধীরে আপন মনে বলে গেল—এই দুনিয়াতেই কসুর করেছিলাম; এই দুনিয়া থেকেই তার সাজা নিয়ে যাচ্ছি। আমার কোনো আপসোস নেই। আজ ময় বহুৎ খুস্ হ্যায়, বহুৎ খুস্ হ্যায়।

রাধিকাবাবু প্রবীণ লোক। জুনিয়র বাবুরা চেপে ধরল, আপনি দু'চারটা বলুন দাদা। আপনার নিশ্চয়ই অনেক ফাঁসি দেখা আছে।

তিনি বললেন, অনেক না হলেও, তা দেখেছি বৈকি দু'চারটে। তবে মনে করে রাখবার মত তাজ্জব কিছু ঘটতে দেখিনি। সবগুলোই মামুলি ব্যাপার। সেল থেকে ধরে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া। একটা Case শুধু পেয়েছিলাম, ওরই মধ্যে একটু বিশেষ ধরণের। লোকটার নামও মনে আছে। নিতাই ভট্‌চাজ্যি। ভয়ংকর মামলা-বাজ। পরের পেছনে কাঠি দেওয়াই ছিল তার কাজ। সারাজীবন কত লোকের সর্বনাশ করে, শেষটায় নিজেই পড়ে গেল এক মারাত্মক খুনী মামলায়। জমির দখল নিয়ে হাঙ্গামা। ওপক্ষে জোড়া খুন। লাশ গুম হয়ে গেল, কিন্তু তার রক্তমাখা কাপড় আর কি সব পাওয়া গেল ভট্‌চাজের ঘরে। দায়রা জজ ছিল এক সাহেব। ফাঁসির order দিয়ে বসল। আপীল লিখেছিল ও নিজেই। অনেক পাকা ব্যারিস্টারের কলম থেকে ওরকম draft বেরোবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু

কাজ হল না। লোয়ার কোর্টের রায়ই বহাল রইল শেষ পর্যন্ত। গোটা আষ্টেক অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে নিয়ে বৌটা প্রায়ই দেখা করতে আসত। অবস্থা এককালে বেশ স্বচ্ছল ছিল। মরবার আগে তাদের সর্বস্বান্ত করে পথে বসিয়ে গেল।

এই লোকটা কিন্তু বরাবর বলে এসেছে সে এ মামলার কিছু জানে না, একেবারে নির্দোষ, শত্রুপক্ষের লোকেরা আক্রোশ-বশতঃ ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সত্যি মিথ্যা জানি না। এরকম তো সবাই বলে থাকে। কিন্তু ফাঁসিকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ-মুহূর্তেও যখন ঐ একই কথা সে বলে গেল, সবটাই মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার মত জোর পেলাম না।......

রাধিকাবাবু চুপ করলেন। সেই শেষ দৃশ্যটা বোধহয় তার চোখের উপর ভেসে উঠেছিল। একটুখানি থেমে আবার শুরু করলেন—আসামী gallows-এর ওপর দাঁড়িয়ে। ওয়ারেণ্ট পড়া শেষ হয়েছে। হ্যাংম্যানটাও রেডি। সাহেবের ইঙ্গিতের শুধু অপেক্ষা। সবাই আমরা ঐদিকেই তাকিয়ে আছি। নিঃশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। হঠাৎ চমকে উঠলাম নিতাই-এর গলা শুনে। স্পষ্ট জোরালো গলা, না আছে একটু কাঁপুনি, না আছে জড়তা—তোমরা শোনো, বিশ্বাস করো, খুন আমি করিনি। খুন করছ তোমরা। একটা নিতান্ত নিরপরাধ লোককে জোর করে ঝুলিয়ে দিচ্ছ ফাঁসিকাঠে।......

এইটুকু বলেই তার সুর হঠাৎ কেমন নরম হয়ে এল। যেন প্রার্থনা করছে, এমনি-ভাবে আস্তে আস্তে বলল, অন্যায় করে, অবিচার করে যারা আমাকে বাঁচতে দিলে না, কেড়ে নিল আমার অসহায় স্ত্রী-পুত্রের মুখের অন্ন, হে ভগবান! তুমি তাদের বিচার করো।

মজলিসটা বসেছিল ডেপুটিবাবুদের আফিসে। কোণের দিকে নিঃশব্দে বসে-ছিলেন আমাদের তরুণ সহকর্মী সিতাংশু। ভদ্রলোক একটু ভাব-গম্ভীর। সকলের মধ্যে থেকেও কেমন স্বতন্ত্র। সেজন্যে পরিচিত মহলে তাঁর নিন্দা প্রশংসা দুটোরই কিঞ্চিৎ আতিশয্য ছিল। আজকার ভোরের অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। আমাদের গল্পের আসরে তিনি উপস্থিত থেকেও যোগ দেননি। হঠাৎ কি মনে হল। ওঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি বুঝি কোনো ফাঁসি দেখেননি, সিতাংশু বাবু?

উনি একটু চমকে উঠলেন; বোধহয় বাধা পেলেন কোনো নিজস্ব চিন্তা-সূত্রে। তারপর আবেগের সঙ্গে বিনীত কণ্ঠে বললেন, দেখেছি, স্যার, একটি মাত্র ফাঁসি দেখেছি। কিন্তু সে ফাঁসি নয়, শহিদ-বেদিমূলে দেশপ্রাণ ভক্তের জীবন-বলি। এ প্রসঙ্গে তাঁর কথা উল্লেখ করে তাঁর আত্মার অসম্মান করতে চাই না।

সিতাংশুর এই ভাবাবেগ আমি উপ-লব্ধি করছি। ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, তাদের জয়গানেও আমি কারো চেয়ে পশ্চাৎপদ নই। সিতাংশুর মত তাদের দু-একজনকে দেখবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। দেখেছি, মহৎ উদ্দেশ্যে যে মৃত্যুবরণ, তার মধ্যে এক প্রচণ্ড মোহ আছে। সে মোহ যখন মনকে আচ্ছন্ন করে মৃত্যুর বিভীষিকা বিলুপ্ত হয়ে যায়। মরণের রূপ তখন ভয়ঙ্কর নয়; মরণ সেখানে শ্যাম-সমান। ফাঁসিমঞ্চের ঐ লোহার পাতখানার উপর দাঁড়িয়েও তাই তাদের চোখে ভেসে ওঠে গভীর আত্মতৃপ্তি, কণ্ঠে জেগে ওঠে সতেজ গর্ববোধ। তারা জানে, তাদের জন্যে সঞ্চিত রইল দেশমাতৃকার অজস্র আশীর্বাদ আর দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ভাণ্ডার তাদের পূর্ণ। তাই উন্নত শিরে, সস্মিত মুখে তারা স্বচ্ছন্দে চলে যায়, কণ্ঠে পরে মানিলারজ্জুর বরমাল্য। এ তো মৃত্যু নয়, এ আত্মদান, মহত্তর জীবনের মধ্যে পুনরাবির্ভাব। এ মৃত্যু শুধু তার দেশের গৌরব নয়, তার নিজের কাছেও এক মহা-মূল্য অন্তিম সম্পদ্।

কিন্তু সে সম্পদের একটি কণাও যারা পেল না, মৃত্যু যাদের দিয়ে গেল শুধু ক্ষতি, মরণপথে একমাত্র পাথেয় যাদের লজ্জা, গ্লানি আর অভিশাপ, আইনের কাছে, সমাজের কাছে, স্বজন বান্ধব সকলের কাছে যারা কুড়িয়ে গেল খালি নিন্দার পশরা, সেই সব নিঃসম্বল, সংসারপরিত্যক্ত হতভাগ্য নরহন্তার দল মৃত্যুকে গ্রহণ করবে কিসের জোরে? কী অবলম্বন করে তারা পা বাড়াবে মরণ-সাগরের সীমাহীন অন্ধকারে? তাই মৃত্যু শুধু একটিমাত্র রূপে দেখা দেয় তাদের চোখে। সে রূপ বিভীষিকার রূপ। সে রূপ দেখে ফাঁসিমঞ্চের উপর কেউ আর্তনাদ করে, কেউ দাঁড়িয়ে থাকে বজ্রাহত মৃতদেহের মত, কেউ ভেঙে দুমড়ে আছড়ে পড়ে, কেউবা অর্থহীন প্রলাপের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় গ্রাসোদ্যত মরণের করাল ছায়া।

মৃত্যু-ছায়া যে কি বস্তু, সে তো স্বচক্ষে দেখেছি। আজ তোমার ফাঁসি —এই সরল ছোট্ট একটি মাত্র বাক্য কেমন করে একটা দুরন্ত সুস্থ মানুষের মুখের উপর থেকে সমস্ত রক্ত মুহূর্তে শুষে নেয়, সে বীভৎস দৃশ্যও আমার চোখে পড়েছে। মৃত্যু যে আসন্ন, এ কথা তো তার অজ্ঞাত ছিল না। এই দিনটির জন্যেই সে তৈরি হয়েছে বহুদিন ধরে। তবু আসন্ন আর আগতের মধ্যে দুস্তর ব্যব-ধান। নিশ্চিত হলেও মরণ এতদিন ছিল তার মনশ্চক্ষে। আজ সে সশরীরে উপস্থিত। আর রূপের আবির্ভাব। তারই নিঃশ্বাসে একটা জ্যান্ত মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে যায়। রক্তমাংসের গড়া জীবন্ত ধড়ের উপর দেখা দেয় চর্মাবৃত কঙ্কালের মুখ। এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে? সিতাংশুর জুটেছিল, কিন্তু সে দেখল না।

সিতাংশুর সঙ্গে আমার বিরোধ নেই। পুণ্যাত্মা শহিদদের জন্যে রইল আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু এই পাপাত্মা খুনীদের জন্যে রইল কি? কিছু না। সেখানে আমি রিক্তহস্ত। আমার কাছে, সংসারের মানুষের কাছে কোনো দাবী তাদের নেই। তবু, কখনো কচিৎ কোনো সঙ্গীহীন নিরালা সন্ধ্যায়, মন যখন গুটিয়ে আসে একান্ত আপনার মধ্যে, চোখ বুজলে আমি সেই মরণাহত, রক্তলেশহীন, ভীতি-পান্ডুর শীর্ণ মুখগুলো দেখতে পাই। ভয় নয়, ঘৃণা নয়, কী এক অব্যক্ত মমতায় সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে।

—— **সমাপ্ত** ——

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব

প্রভাংশু গুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দী তখনো বিদায় নেয় নি। ইংরাজি শিক্ষার পেছনে ছুটে এলো সাগরপার থেকে পাশ্চাত্য জড়বাদ। বাংলার নরম মাটির বুকে এই জড়বাদের বীজ বেশ কায়েমীভাবে আস্তানা নিলে। ইংরাজি শিক্ষার নূতনত্ব ও পাশ্চাত্য জড়বাদের বাহ্যিক চাকচিক্য সে সময়ের বাংলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দু-ধর্মের প্রতি কেবল অশ্রদ্ধাই নয়,—একটা বিদ্বেষের ভাবও সৃষ্টি ক'রেছিল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যক্ষ শক্তির পরিচয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজের একটা বৃহৎ অংশ নিরীশ্বর-বাদীর গোষ্ঠীভুক্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। আবার যাঁরা ধর্মকে আঁকড়ে ধ'রেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ধর্মের শাঁস ছেড়ে দিয়ে খোসা নিয়েই মাতামাতি ক'রছিলেন। হিন্দু ধর্মের ভেতরেই নানা মত ধর্মের পথে [illegible] সৃষ্টি ক'রছিল। শাক্ত-[illegible] ও [illegible] সম্প্রদায়ের মত [illegible] প্রচেষ্টার ফলে এক অন্যের [illegible] অজ্ঞান চোখেই দেখছিলেন। ফলে অবস্থা হ'ল এইরূপ— একদল হ'য়ে প'ড়লেন একেবারে নাস্তিক এবং [illegible] অস্তিত্বের দল হ'য়ে প'ড়লেন তার্কিক। নাস্তিক ও তার্কিকের [illegible] প্রকৃত সত্য ধামা চাপা রইলো।

'যত মত তত পথ'

বাংলার দুর্দিনের ঐ সন্ধিক্ষণে নরা-কারে দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে আত্মপ্রকাশ করেন। সাধনার সর্বপ্রকার পথ অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম সত্য আবিষ্কার ক'রেছিলেন 'যত মত তত পথ।' এবং এই সত্য জীবের কল্যাণে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর নিকট ভক্তমণ্ডলীর ভেতর থেকে যেমন নরেন্দ্র-নাথকে (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) নির্বাচিত ক'রেছিলেন, তেমনি নাটক ও রঙ্গমঞ্চ মারফৎ তাঁর কঠিন সাধনালব্ধ ফল লোকশিক্ষা হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করবার জন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নিকট ভক্তমণ্ডলীর ভেতর আশ্রয় দিয়েছিলেন।

যে সময়ের কথা ব'লছি, সে সময়ে বাংলার নাট্য-সাহিত্য সবেমাত্র একটা রূপ নেবার চেষ্টা ক'রছিল এবং নাট্যকার ব'লতে এক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর আর কোনো দ্বিতীয় নাট্যকারের অস্তিত্ব ছিল না। নাট্যকার, নট ও নাট্যাচার্য, এদের ভেতর এই তিনের সমন্বয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনে যে-ভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছিল, কোনো নাট্য-

পরমহংসদেব

কারের জীবনে তা বড় একটা দেখা যায় না।

জড়বাদের আকর্ষণ

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য সংস্পর্শে আসবার পূর্বে গিরিশচন্দ্র সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতো পুরোপুরি নাস্তিক হ'য়ে প'ড়েছিলেন। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি সাধন ও আত্মসুখ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য,—জড়বাদের এই মন্ত্রে গিরিশচন্দ্র তখন সমসাময়িক আর পাঁচ-জন শিক্ষিত ব্যক্তির মতোই মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলেন। নিরীশ্বরবাদীর দলে তিনিও যোগ দিলেন। ভারতের চিরন্তন মর্ম-বাণী,—গীতার প্রথম কথা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতা তিনি যুক্তি-বিচার দ্বারা মনে-প্রাণে নিতে পারলেন না। তাঁর নিজের কথায় প্রকাশ—

"......সে সময়ে জড়বাদ প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা একপ্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্বল্যের পরিচয়। সুতরাং সমবয়স্কের নিকট কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া 'ঈশ্বর নাই' এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম এবং এপাত ওপাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল যে ধর্ম কেবল সংসার রক্ষার্থে কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়......" [পরমহংস-দেবের শিষ্য স্নেহ—'উদ্বোধন', বৈশাখ, ১৩২৩]

কাজেই দেখা যায়, সেই সময়ে একদল হ'লেন ঘোরতর নাস্তিক এবং আর একদল অর্থাৎ আস্তিকের দল পরস্পর পরস্পরের মতবাদকে গালিগালাজ বর্ষণ ক'রে ধর্মের ভেতর অরাজকতাই সৃষ্টি ক'রলেন।

এই দুই ভ্রান্তপথে চালিত তদানীন্তন বাংলার শিক্ষিত সমাজ রঙ্গমঞ্চে প্রতি-ফলিত নাটকের জীবন্ত চরিত্র মারফৎ শ্রীরামকৃষ্ণের যে অমর বাণী নানা রূপ ও রসের সমন্বয়ে শুনেছিলেন, তার প্রত্যক্ষ কারণ স্বয়ং পরমহংসদেব হ'লেও পরোক্ষ কারণ যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

কিন্তু জড়বাদে মুগ্ধ নাট্যকার একদা লিখেছিলেন—

"কি প্রমাণ তিনি বিদ্যমান
প্রমাণ, প্রমাণ কই, কোথা ভগবান?"

[কালাপাহাড়]

আবার দেখি সেই সুর বুদ্ধদেব চরিত নাটকে।

"কোথা ব্রহ্ম? কোথা তাঁর স্থান,
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার—
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের অপার ধরা?"

আর যদি ঈশ্বর সত্যই থাকেন, তাহ'লে তিনি নিতান্তই শক্তিহীন। কারণ—

"এ সংসার সন্তাপসাগরে,
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন?
রোগ-শোকে করে আর্তনাদ—
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায়?

কিম্বা প্রভু শক্তিহীন, দুঃখের
মোচনে ?"

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া সত্যের পরিচয় নেই। জড়বাদের এই মূল কথা নাট্যকার মনে-মনে উপলব্ধি ক'রলেও তিনি বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রতে পারেন নি। তাই শুনি 'কালাপাহাড়' নাটকে—

"অনিশ্চিত! অনিশ্চিত! বুদ্ধি পরাজয়,
নির্ণয় না হয়, হায় কে আছ কোথায়!"

আর শাস্ত্রবাক্য—বেদ, পুরাণ, গীতা—কতকগুলি বড় বড় কথা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা—

"শাস্ত্রচ্ছটা, ব্যাখ্যাঘটা, বাক্যের বিন্যাস,
হতাশ হুতাশে করে মানবে নিক্ষেপ।"

কিন্তু নাট্যকারের অশান্ত মন বিশ্ব-শক্তিকে অস্বীকার ক'রেও শান্তি পায় নি। একদা নিজের বুদ্ধির অহংকারে গিরিশচন্দ্র গৃহের দেবমূর্তি বিচূর্ণ ক'রেছিলেন, কিন্তু সব ক'রেও বিক্ষুব্ধ মন শান্তি পেলে না। 'শ্রীচৈতন্যলীলা' নাটক রচনা করবার সময় নাট্যকারের মন কিছুটা আস্তিক পর্যায়ে উঠলেও সন্দেহ-তিমির তখনো তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। ঐ নাটকেই পড়ি—

"বিজ্ঞান কেবল মানুষের বল,
শত শত করিছে কৌশল
বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান
ঈশজ্ঞান অনর্থের হেতু!"

কিন্তু মনে আবার বিশ্বাস আসে। যুক্তি-তর্ক এ বিশ্বাসে বাধা দিতে পারে না। মন তখন বলে—

"ভক্তিস্রোতে যুক্তি ভেসে যায়
হেরি তরঙ্গ নিচয়
সভয় হৃদয় বিজ্ঞান পালায় দূরে।"

'শ্রীচৈতন্যলীলা' রচনা করবার পর আমরা অনুমান করতে পারি, নাট্যকার নিরীশ্বর-বাদীর দল ছাড়া হ'য়ে পড়লেন। এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৪ সনের অগাষ্ট মাসে। শ্রীচৈতন্যলীলার অভাবনীয় সাফল্যের সংবাদ সুদূর পল্লীগ্রামেও পৌঁছালো।

[ষ্টারে শ্রীরামকৃষ্ণ]

তারপর বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে এক বিচিত্র অধ্যায় শুরু হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্ব ইচ্ছায় 'শ্রীচৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য ১৮৮৪ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর ষ্টার থিয়েটারে আগমন করলেন। সে সময়ের ষ্টার থিয়েটার ক'লকাতার বিডন স্ট্রীটের অধুনা বিলুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারের স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাই হোক, এই অভিনয় দর্শন ক'রে ঠাকুর একাধিকবার সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েন। অপূর্ব রচনা ও অনবদ্য অভিনয় সমন্বয়ে 'শ্রীচৈতন্যলীলা' সেকালের নাট্য-জগতে এক যুগান্তরের সৃষ্টি ক'রেছিল। মূল ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী।

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর অভিনয় দর্শন ক'রে ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে আশীর্বাদ ক'রেছিলেন।

'শ্রীচৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ হবার পূর্বে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার দু'বার সুযোগ পেয়েছিলেন,—প্রথমবার বাগ-বাজারের বসুপাড়ার প্রসিদ্ধ এটর্নী দীননাথ বসুর গৃহে ও দ্বিতীয়বার রাম-কান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বলরাম বসুর ভবনে। প্রথম দর্শনে,—নাট্যকারের নিজের উক্তিতেই প্রকাশ, তাঁর মনে কোনো রেখাপাতই হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় দর্শনে তাঁর মনের ভাবের পরিবর্তন হয় এবং ফলে তিনি নিরীশ্বরবাদীর দল ছাড়া হ'য়ে ভক্তিমূলক নাটক 'শ্রীচৈতন্যলীলা' রচনা করেন।

ষ্টার থিয়েটারে পুনরায় হয় তৃতীয় দর্শন। ঐ স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত সান্নিধ্যে এলেও নমস্কার বিনিময় ছাড়া উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ আর কোনো পরিচয় হয়নি। কিন্তু এই তৃতীয় দর্শনের পরে নাট্যকারের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের যে বীজাণুকণা নিহিত ছিল, তা দূর হ'য়ে গেল এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে পাবার জন্য তিনি ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।

বুদ্ধি প্রয়োগে ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রে মনে-মনে গর্ব অনুভব ক'রলেও মন কিন্তু ক্রমেই অশান্তিতে ভেঙে প'ড়ছিল। মন চাইছিল এমন কোনো অসাধারণ ব্যক্তিকে যিনি তাঁর এই মনের দ্বন্দ্ব দূর ক'রে সত্য পথ দেখাতে পারেন। তাই এই সুর শুনি 'কালাপাহাড়' নাটকে—

"কোথা গেল ? বাতুল যে নয়, বাক্যে
তার জন্মায় প্রত্যয়, হায় কবে
হবে গুরু দরশন। কবে হবে সফল জীবন।
ঘোর তমনাশ, অবিশ্বাস যাবে দূরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নাট্যকারের চতুর্থ দর্শন পূর্বোল্লিখিত বলরাম বসুর বাটীতে। এবারে স্বয়ং ঠাকুর লোক মারফৎ গিরিশচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় এবং ঐ দিনই নাট্যকার গুরু কি, মন্ত্র কি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ঠাকুরকে ক'রেছিলেন। তারপর পঞ্চম দর্শন পুনরায় ষ্টার থিয়েটারে। নাট্যকারের নিজের কথায় প্রকাশ—"পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা বলিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোতে যেন আমার মস্তক উঠিতেছে ও নামিতেছে।" [উদ্বোধন, পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ]

ষষ্ঠ দর্শন মধু রায়ের গলিতে রাম-চন্দ্র দত্তের বাটীতে। তারপর থেকেই গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতে থাকেন এবং গুরুলাভে সমর্থ হন। পুণ্যপীঠ দক্ষিণেশ্বরে গিরিশচন্দ্র প্রথম উপলব্ধি ক'রতে পারেন যে, 'পর্বত গহ্বরে নির্জনে বসিলেও কিছু হয় না বিশ্বাসই একমাত্র সার পদার্থ।'

[নাট্যকারের বৈরাগ্য]

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাবার পর এই দক্ষিণেশ্বরেই নাট্যকার

"সুখের ছলনে মুগ্ধ ভুলে তাহা নর,
অহঙ্কার অন্ধকার ঘোরে।
হায়! দেখিতে না পায়,
সৌভাগ্য উদয় তার বিষ্ণুর কৃপায়,
ভাবে মনে—নিজ গুণে সুখের ভাজন।"

বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে ঈশ্বরের নাম ক'রতে পারলেই মুক্তি। রত্নাকরও নাম মাহাত্ম্যে ও ভক্তির জোরে বাল্মীকি হ'তে পেরেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের এ বাণীও নাট্যকার মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলেন। তাই তিনি 'নসীরাম' নাটকে লিখ্‌তে পেরেছিলেন—

"নাম শুনে মন মেতে উঠে।
পাথরে জল ঝরে ভাই
শুক্‌নো ডালে কলি ফোটে।"

[জীব সেবা—যুগধর্ম]

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে (পরে স্বামী বিবেকানন্দ) ব'লেছিলেন—"জীবে দয়া করবার আমাদের শক্তি কৈ? শিবজ্ঞানে জীব সেবাই ধর্ম।"

স্বামী বিবেকানন্দ এই জীব সেবাকেই কঠোর কর্মযোগের ভেতর দিয়ে যুগধর্ম-রূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বয়ং বিবেকানন্দ এই জীবসেবা সম্বন্ধে নাট্যকারকে ব'লেছিলেন—"জি সি, যদি জগতের দুঃখ দূর ক'রতে হাজার জন্ম নিতে হয়, তাতে কারো যদি এতটুকু দুঃখ দূর হয়, তাও শ্রেয়। ব্যক্তিগত মুক্তি দিয়ে কি হবে?"

এই জীবসেবা ধর্মকে নাট্যকার তাঁর কয়েকখানি নাটকে চমৎকার প্রতিফলিত ক'রেছেন।

'ভ্রান্তি' নাটকে নবাব মুর্শিদ আলি খাঁ যখন রঙ্গলালকে জিজ্ঞেস করলেন—"আচ্ছা, ফকির, তোমার মনসে এত্তা বল ক্যায়সে?...তোম্ নবাবকে নেহি মানো?"

রঙ্গলাল উত্তর দিলে—

"আমি যদি নিজের জন্য বাঁচতাম, তাহ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হ'ত, মরতে চাইতাম না। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানো? মরবার সময় পর্যন্ত যদি হাত ওঠে, তাহলে একটা পরের কাজ করে যাব। আমি পরের জন্য বেঁচে আছি, এক মরণ ভয় গেলেই সব ভয় গেল।"

'মায়াবসান' নাটকে কালীকিঙ্করের সেবাধর্ম একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কাল কিঙ্কর সেই শ্রেণীর ব্যক্তি যে সে ধর্মকেই যুগধর্মরূপে একাগ্রভাবে গ্র ক'রেছে। তাই রঙ্গিনী কালীকিঙ্কর ব'লছে—"মারী ভয় উপস্থিত হ কুটিরে কুটিরে তোমায় সেবা ক'র দেখেছি, পরের দুঃখে প্রাণ দিতে তোম উদ্যত দেখেছি, সামান্য জীবজন্তুর দুঃ ব্যাকুল হ'তে তোমায় দেখেছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শে অনুপ্রাণি গিরিশচন্দ্র রচিত নাটকগুলি বাংলা না সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। যদি গিরি চন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যসংস্পর্শে আস সুযোগ না পেতেন, তাহ'লে তি এরূপ অমূল্য নাট্য-সম্পদ বাংলা দেশ দিতে সক্ষম হ'তেন না। প্রশ্ন উ পারে, যদি গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ ও উপদেশ থেকে যে কো কারণেই হোক্, বঞ্চিত হ'তেন, তাহ' কি তিনি নাটক প্রণয়নে কৃতকার্য হ' পারতেন না? পারতেন নিশ্চয়, কি তাহ'লে তাঁর প্রধান নাটকগুলি আধ্যাত্মি সম্পদ থেকেও বঞ্চিত হ'ত।

যাই হোক্, বাংলার নাট্য-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব বলতে যদি কে গিরিশ-নাটকগুলির উল্লেখ করি, তাহ' ভুল হবে না। যেহেতু সেই যুগে বাংলা নাট্যকার বলতে ঐ একজনই ছিলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জন প্রতিভার মৃত্যু কোনোদিনই হয় ন তাই আজো 'বিল্বমঙ্গল' মনে হয় নৃ এবং এই বিল্বমঙ্গল নাটকেই নাট্যক ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ প্রভাব সব বেশী প্রতিফলিত হ'য়েছে দেখতে পা

[শেষ কথা]

'যত মত তত পথ'—এই বাণীর শে কথা 'কালাপাহাড়' নাটকে গিরিশচ এইভাবে প্রকাশ ক'রেছেন। তা উদ্ধৃ ক'রে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করলাম।

"যথা জল, একওয়া, ওয়াটার, পানি,
বোঝায় সলিলে, সেই মত আল্লা, গড়
ঈশ্বর, যিহোবা, যিশু নামে নানাস্থানে,
নানা জনে ডাকে সনাতনে। ভেদজ্ঞান
অজ্ঞান-লক্ষণ, ভেদ বুদ্ধি কর দূরে,
বহু নাম—প্রতি নাম সর্বশক্তিমান—
যার সেই নামে প্রীতি-ভক্তির উদয়,
প্রফুল্ল হৃদয়, যেই নামে মনস্কাম
পূর্ণ, সেইজন, সেই নাম উচ্চারণে।"

ট্রামে-বাসে

সংবাদে প্রকাশ কল্যাণী কংগ্রেসে আগামী ২৩শে জানুয়ারী আট হইতে বার বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের একটি অধিবেশন হইবে। সেই অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং পৌরোহিত্য করিবেন। বালক-বালিকারা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ—"১৯৬৪ সালের ভারত" সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বক্তৃতায় প্রকাশ করিবেন। খোকারা সবাই এখন "সে খোকা আর নেই তো", তবু Made easy note ছাড়া তারা যেমন পরীক্ষা পাশ করিতে পারেন না, তেমনি বক্তৃতার ব্যাপারেও কিছুটা নোট অন্ততঃ মুখস্থ করিয়া না রাখিতে পারিলে হয়তো বক্তৃতা তেমন জোরদার হইবে না। তাদের অভিভাবকগণ নিশ্চয় এ সম্বন্ধে নিজেরাও নোট মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ছেলেদের সুবিধার জন্য আমাদের পাকা অভিভাবক বিশুখুড়ো দুই একটি মাত্র [illegible] পয়েন্ট বাতলাইয়া দিলেন:—

"১৯৬৪ সালে [illegible] একেবারে [illegible] হইবে সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছে। [illegible] এবং উপবাসী হইবেন। তাঁহারা [illegible] চাউল লইয়া কী করা যায় এ সম্বন্ধে সভায় এবং গ্রামে সপ্তাহে সপ্তাহে অধিবেশন করিবে। [illegible] লোকে [illegible] ছাড়িয়া আকাশে বিচরণ করিবে, [illegible] মূল্যে ক্রীত [illegible] [illegible] হইয়া উঠিবে, পর্যন্ত দেশের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি হইবে [illegible] আত্মপ্রকাশ। বারোয়ারি পূজা মাসে পনেরদিন হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থকে একটি করিয়া মাইক রাখিতে হইবে। খাওয়া-পড়ার ভাবনা থাকিবে না বলিয়াই পড়ার ঝঞ্ঝাটও থাকিবে না। স্কুল কলেজের ভবনগুলিকে অতঃপর সিনেমা হাউসে রূপান্তরিত করা হইবে। ১৯৬৪ সালের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতে সিনেমা জগতে সেন্সার বলিয়া কোন পদার্থ থাকিবে না, যদৃচ্ছা নৃত্য-গীত এবং যদৃচ্ছা ডায়লগে স্বাধীন ভারতের সিনেমাশিল্প পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস রচনা করিবে। ছেলেমেয়েদিগকে সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন সিনেমা দেখার পয়সা জোগাইবার জন্য সমস্ত অভিভাবকগণ বাধ্যতামূলক আইন মানিতে বাধ্য থাকিবেন (বক্তৃতার এই অংশে Here Here বলিবার জন্য ভাড়াটিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলে বাজি মাৎ—এই টিপটিও বিশুখুড়োই দিয়া রাখিলেন)!

* * *

পাতিয়ালাতে শ্রীযুক্ত নেহরু বক্তৃতা দিতে উঠিলে সভায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মাস্টার তারা সিং নাকি বলেন যে, তিনি কিছুতেই বক্তৃতা দিতে দিবেন না। তারা সিং-এর প্রস্তাবে শ্যামলাল কবিতা আবৃত্তি করিল - Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are!!!

* * *

পাকিস্তান আমেরিকার নিকট হইতে কারিগরী শিক্ষার জন্য নাকি দুই কোটি [illegible] লক্ষ ডলার অর্থ-সাহায্য পাইয়াছে।—"বিনা কারিগরীতেই বিদেশী মহলে পাকিস্তানী [illegible] চালিয়া যে ছিল তা আমরা [illegible] [illegible] অনুশোচনাতেই টের পেয়েছিলাম, এবারে সত্যিকার কারিগরীতে নাকি বেশ গরম হওয়ার সম্ভাবনা রইল" মন্তব্য করলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সি ভি রামন বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ভারতের পক্ষে বৈদেশিক পরামর্শদাতার শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।—"কিন্তু তিনি তো এ কথাও জানেন যে, যোগ্য লোককে ভিখ্ দেওয়ার রীতি ভারতে নেই" বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত ভাবে বলিয়াছেন যে, খদ্দরের বদলে মিলের ধুতি পরিয়া ভারতের কমিউনিস্টরা মিল-মালিকদেরই বন্ধুর কাজ করিতেছেন।

—"কিন্তু নিজের নাক কাটার ভয়ে অন্যের যাত্রা বন্ধ করব না এটাই বা কোন্ নীতি" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মাদুরার এক সংবাদে প্রকাশ যে, কমিউনিস্টগণ তাঁহাদের তৃতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য একটি তোরণ তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবতী মীনাক্ষী দেবীর কুড়ি ফুট উচ্চ একটি রথ সেই তোরণের ভিতর দিয়া শোভাযাত্রায় যাইতে পারিতেছিল না বলিয়া শেষপর্যন্ত তোরণটি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি নাকি মন্তব্য করিয়াছেন—"ভগবানের নিকট নতি স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য।" আমাদের মন্তব্য শুধু—"একি কথা শুনি আজ কমিউনিস্ট মুখে"!!

* * *

পেশোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ, জনৈক ব্যক্তি কবর খুঁড়িতে খুঁড়িতে হঠাৎ কতকগুলি প্রাচীন স্বর্ণ-মুদ্রা পাইয়াছেন।—"তিনি ভাগ্যবান, আমরা হতভাগারা স্বর্ণমুদ্রা খুঁড়ে বার করতে গিয়ে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ি" —বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

সম্প্রতি পূর্বোত্তর রেলওয়ে "পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ" পালন করিয়াছেন।—"আমরা হালে সৌজন্য সপ্তাহ, নিরাপত্তা সপ্তাহ প্রভৃতি রকমারি সপ্তাহের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এবং মনে মনে হিসেব করছি বৎসরের মধ্যে আর মাত্র একান্ন সপ্তাহ বাকী, এই কটি সপ্তাহ প্রতিপালন করলেই সৌজন্যে, নিরাপত্তায়, পরিচ্ছন্নতায় আমাদের সম্বৎসর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

তথ্য এবং বেতার মন্ত্রী ডাঃ কেশকার নাকি বলিয়াছেন যে, সংগীতের শ্রোতা এবং সংগীত রসিক সৃষ্টি করাই বর্তমানের বড় সমস্যা। —"বেতার কেন্দ্রে অনুরোধের আসরের যা হোক একটা মানে এতদিনে পাওয়া গেল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট খেলার সময় দর্শকগণ নানা চীৎকার করিয়া বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করায় অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটস্‌ম্যান মিউলম্যান নাকি ব্যাট করিতে অস্বীকার করেন। দর্শকগণের অখেলোয়াড়ীসুলভ মনোভাব আমরা নিশ্চয়ই সমর্থন করি না। কিন্তু, এই সঙ্গে মিউলম্যানকে এই কথাও স্মরণ করাইতে চাই যে, ব্যারাকিং-এর জন্মস্থান কিন্তু অস্ট্রেলিয়া। বিদেশী শিক্ষায় দর্শকদের পক্ষে কখনও এমনি উচ্ছৃংখল হওয়া বরং সাজে, কিন্তু সত্যিকারের ক্রিকেটারের ধৈর্য হারানো কখনও উচিৎ নয়। পতৌদির নবাবকে 'গান্ধী' এবং জার্ডিনকে "Sardine" অস্ট্রেলিয়াই বলিয়াছিল, কিন্তু তাঁরা খেলিতে অস্বীকার করেন নাই, ইহাই ক্রিকেট!!!

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতির ভবনের জন্য এপ্রিল হইতে অক্টোবর —এই সাত মাসের মধ্যে এক কোটি তেইশ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে। —"তবু ভাগ্য বলতে হবে, রাষ্ট্রপতি ভবনে পুজোর বাজার বা জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্বের রেয়াজ নেই"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

স্যান-ফ্রান্সিস্‌কোর এক সংবাদে জানা গেল যে, হাইড্রোজেন বমের নাকি একটি ফিল্ম তোলা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, এই বোমার ধ্বংসের ক্ষমতার নাকি কোন পরিমাপ করা যায় না। —"হাইড্রোজেন ছাড়াও অনেক ফিল্ম যা তোলা হচ্ছে, তাদের ধ্বংসের ক্ষমতাও বড় কম নয়"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতা শিল্প মহাবিদ্যালয়

গত ২২শে ডিসেম্বর থেকে কোলকাতা সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক শিল্পপ্রদর্শনী শুরু হয়েছে। যে বিপুলসংখ্যক ছবি ও অন্যান্য শিল্পকর্ম নিয়ে এ প্রদর্শনী সাজানো হয়ে থাকে তার থেকেই নির্বাচকমণ্ডলীর ছাত্রশিল্পীদের উৎসাহ দান নীতি উপলব্ধি করা যায়। হয়তো আরো কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে শিল্পকর্মগুলিকে যাচাই করা চলতে পারতো। কিন্তু কোন শিক্ষায়তনের শিল্পপ্রদর্শনী সম্বন্ধে সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়। ছাত্রশিল্পীদের মধ্যে মৌলিক বিশিষ্টতা কীভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তার পরিচয় দেয়াই এইসব প্রদর্শনীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে এবারের প্রদর্শনী গতবারের থেকে বিশেষ অগ্রসর নয়। তবে বিভিন্ন বিভাগের কোন কোন রচনার মধ্যে পরিপূর্ণ শিল্প হয়ে ওঠার সামর্থ্য লক্ষ্য করা গিয়েছে।

অধিকাংশ প্রদর্শনীতেই লক্ষ্য করা যায় যে, নব্যভারতীয় শিল্পকলার রীতিতে অঙ্কিত রচনাগুলিকে ভারতীয় শৈলীর চিত্র নাম দিয়ে এক স্বতন্ত্র স্থান দেয়া

সিমেন্ট-ভাস্কর্য শিল্পী—রঘুনাথ সিংহ

সাঁকোর তলায় (কাঠখোদাই) শিল্পী—অনিমেষ চৌধুরী

সাঁওতাল কুটীর শিল্পী—বিমলেন্দু রায় চৌধুরী

'মুকুল' শিল্পী—শান্তিরঞ্জন মুখার্জি

য়ে থাকে। যে কারণেই হোক, এই রীতিতে অঙ্কিত ছবিগুলির প্রাণহীনতা দিন ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই তানুগতিক টেম্পেরা অথবা ওয়াসের যন্ত্র ব্যর্থ প্রচেষ্টা, চিরাচরিত পৌরাণিক, মীয় অথবা রোমাণ্টিক বিষয় আরোপ এবং জীবনবিচ্ছিন্নতা শিল্পগুলিকে একান্ত আবেদনহীন করে তোলে। এই প্রদর্শনীতেও ভারতীয় শৈলীতে অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যেও সেই ব্যর্থতারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেলো। তবুও এই শৈলীর আঙ্গিকগত দক্ষতার দিক থেকে শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের রচনাগুলি সকলেরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার 'মুকুল' নামে ছবিটি এই শৈলীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই বিভাগে কনকরঞ্জন বিশ্বাস বর্মণের একদিন তারা সুখে ছিল", সুশীল মজুমদারের 'নীলাচলে শ্রীচৈতন্য', নীলিমা দের 'পাশা খেলা' প্রভৃতি সুখদৃশ্য রচনা।

তেলরঙ বিভাগেও বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের পরিচয় বিরল। কিন্তু তেলরঙ ব্যবহারের দক্ষতা ও রূপসৃষ্টির ক্ষমতা কয়েকটি রচনাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বিমলেন্দু রায় চৌধুরী নিঃসংশয়ে প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাঁর 'সাঁওতাল কুটীর' রঙ ব্যবহারের বিশিষ্টতায় ও রূপরচনার গুণে এই বিভাগের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে স্বীকার করা যেতে পারে। বস্তির রাস্তা ছবিটিতেও আলোর এফেক্ট আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। রঙ ব্যবহারে পরিমিতির অভাবে কমল চৌধুরীর 'রাস্তা নির্মাণ' ছবিটিকে মূল্যহীন করেছে। অরুণ বোসের ডক ইয়ার্ড, মীরা সেনের দুটি ছবি—লাল-কুটির ও সিঁড়ি সার্থক রচনা বলে স্বীকৃত হবে।

জলরঙ বিভাগে কয়েকটি রচনা বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। অবদুল কুদ্দুসের 'মিসৃচিভাস' ছবিটিতে রঙ প্রয়োগের সংক্ষিপ্ততা এবং চরিত্রকে উদ্ভাসিত করবার ক্ষমতা লক্ষণীয়। অজয় চট্টোপাধ্যায়ের 'হিল স্টেশন', তুষারময় গুপ্তের 'আমরা দুজন', বিজয়কৃষ্ণ রায়ের 'শ্রমিক' প্রভৃতির মধ্যে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা ব্যক্ত হয়েছে। গণেশ হালই-এর সব কটি রচনাই সুনির্বাচিত এবং শিল্পীর কুশলতামণ্ডিত।

ভাস্কর্য ও মাটির কাজ বিভাগটি আমাদের সমচেয়ে তৃপ্ত করেছে বলা যেতে পারে। এই বিভাগের শিল্পীদের রচনায় শুধু যে দৃষ্টিভঙ্গীর আধুনিকতা ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, শিল্পসৃষ্টিও একটা বিশেষ মানের কাছে পৌঁচেছে বলা যেতে পারে। এদের মধ্যে সর্বরী রায় চৌধুরীর কয়েকটি রচনা প্রথম শ্রেণীর শিল্পমর্যাদা পাবার যোগ্য। অজিত চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীদাম সাহার কয়েকটি রচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ্রাফিক আর্ট বিভাগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন রচনা এবার সংগৃহীত হয়নি। তার মধ্যে অনিমেষ চৌধুরীর 'সেতুর নীচে', শান্তি বসু রায়ের 'নির্জন স্থানে' প্রভৃতি কাঠখোদাই এবং মৈত্রেয়ী সেনগুপ্তের 'শীতের ভোর' (একোয়াটিণ্ট) প্রশংসা পাবার যোগ্য।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের বাৎসরিক শিল্প প্রদর্শনী শুরু হয়েছে একই দিনে, অর্থাৎ গত ২২শে ডিসেম্বর। সরকারী শিল্পমহাবিদ্যালয়ের মতো এই প্রদর্শনীটির উজ্জ্বল সমারোহ নেই বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এই প্রদর্শনীর মধ্যে সূচিত হয়েছে তাতে এর বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। হয়তো বহু অপরিণত ছবি এই প্রদর্শনী থেকে বাদ দিয়ে একে সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করা

শিয়ালদহ থেকে একটি স্কেচ — শিল্পী—অশোক বসু

চলতে পারতো। কিন্তু এক গভীর বাস্তববোধ এই প্রদর্শনীকে এক মর্যাদা দিয়েছে। অতি আধুনিক শিল্পশৈলীর উন্নাসিকতা অথবা ভারত শৈলীর মাধ্যমে পৌরাণিক বিষয়ের পুনরাবৃত্তির পরিচয় এখানে একান্ত বিরল। তার পরিবর্তে বাস্তব জীবন বোধের পরিচয় প্রায় অধিকাংশ রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই সুস্থতার দরুণ অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও এই প্রদর্শনীটি অনেকের প্রীতি আকর্ষণ করবে।

অধিকাংশ রচনাই এখানে জল রঙে এবং এই মাধ্যমের রচনার মধ্যেই কোন কোন শিল্পীর কুশলতা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অজিত বর্মা, অশোক বোস, মনীষা বোস, জনতোষ চক্রবর্তী, সুনীলকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ গোতম। একটা মানবিক সমবেদনা, গভীর বাস্তববোধ এদের অধিকাংশ ছবিকেই সমৃদ্ধ করেছে। বীরেন্দ্রনাথ গোতমের "বস্তি" আলোক প্রক্ষেপণের ক্ষমতায় উৎকৃষ্ট রচনা বলে স্বীকৃত হবে। অশোক বোসের সব কটি স্কেচই প্রাণবন্ত। মনীষা বোসের 'ভাঙা কুটির', 'নারকেলডাঙা' উল্লেখযোগ্য রচনা বলে বিবেচিত হবে।

আশা করা যায়, আগামী বছরে এদের প্রদর্শনী আরো পরিচ্ছন্ন ও মনোজ্ঞ হবে।

হুসেন সাগর, হায়দরাবাদ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কালো জল আর কালো আকাশ,
আকাশে চাঁদ, তারার দল,
দূরে দূরে জবলে প্রদীপমালা।
সেতুর উপরে আমরা দুজন,
আমাদের মনে আলোক জবালা।

মোর মন আর তোমার মন,
উছলে জল, কে বাঁধে সেতু ?
হাসিছে স্বপন চাঁদ-তারার।
শোনো অশান্ত দূরের বাতাসে
ও-পারের ঢেউ ভাঙে এপার।

[২৮]

তার পরের দুটি ঘণ্টা অতসীর স্মৃতি থেকে একেবারে মুছে গেছে। কখন দিনটি নিস্তেজ হয়ে গেছে, জানালার উপরে আছড়ে পড়ছে রক্তাক্ত-হৃৎ শরণার্থী বিকেল আকাশ, তারই পিছে-পিছে অন্ধ সন্ধ্যা, কিছু টের পায়নি। অতসী তখনও বুঝি চেয়ারের হাতল ধরে চুপচাপ বসেই ছিল। তারপর জীবনতোষ হাত ঘণ্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে আলো জ্বেলে দিতে বলেছেন। কখন অতসী নমস্ক নমস্কার করে থাকবে, জীবনতোষও প্রতি-নমস্কার নিশ্চয়ই করেছেন, কিন্তু খেয়াল নেই। অদৃশ্য সুতোচালিত পুতুলের মত টলতে টলতে অতসী যখন নীচে নেমে এসেছিল, তখনও কি দরোয়ান ভাস্ত হাতে ওকে সেলাম করেছিল, সম্মান দেখাতে উঠেছিল টুল ছেড়ে? সব খুঁটিনাটি কিছু মনে নেই।

অস্পষ্ট যেন মনে পড়ে ট্রামের কণ্ডাক্টর সম্মুখে এসে দাঁড়াতে, অতসী তাকে একটা দুয়ানি দিয়েছিল। চটপট টিকিট কেটেছিল লোকটা, এই ছবিটা শুধু মনে আছে, ওর দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে ছিলার মত বেয়াদপিও করে থাকতে পারে। মনের স্বাভাবিক স্থৈর্যে অতসী রাগ করত, কিন্তু সেদিন দুঃস্বপ্নের একটা পঙ্কিল স্রোতে চেতনা শোলার মত ভাসছে আর ডুবছে,—রাগ করবে কী, অতসী ভয় পেয়েছিল। হয়ত এমন কোন ছাপ আছে তার মুখে, পরিচ্ছদে যা থেকে অচেনা একটি লোকও তাকে বিড়ম্বিত বলে চিনতে পেরেছে। নইলে কে কবে শুনেছে কণ্ডাক্টর অচেনা যাত্রিনীর দিকে চেয়ে হাসে।

কিছুক্ষণ জানালার বাইরে চেয়ে রইল, তারপর তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে পড়ল অতসী। তখনও হয়ত কণ্ডাক্টরটি হেসে-ছিল, কিন্তু ফিরে চেয়ে দেখার সাহস অতসীর ছিল না।

তারপর চেতনা আবার টুপ করে ডুবে গিয়েছিল। আয়ু থেকে খসে পড়েছিল এক টুকরো সময়।

প্রস্থে-দৈর্ঘ্যে পাঁচ-দশ মাইল বিপুল শহরটা নিমেষে যেন সংকীর্ণ হয়ে গেছে, অতসী পা রাখবে, সে জায়গাটুকুও নেই। আবার এক সময় মনে হল সমুখে প্রসারিত পথটা যেন নিরন্ত, দানবটা যেন অকস্মাৎ দেহ-বিস্তার করতে শুরু করেছে, তার স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়ে অহরহ পোড়া কয়লার গুঁড়ো যেমন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দেয়, তেমনি বুঝি মান-খোয়ানো একটি মেয়েকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে।

তবু অতসী বাড়ি পৌঁছেছিল। পথ ভুল হল না, পা পিছলে গেল না, গাড়ি-ঘোড়ার নিচে শরীরটা থেঁতলে গেল না, সাবধানী একটা সত্তা সারা রাস্তা আগলে আগলে ওকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এল ঠিক।

অথচ অতসী মরতে চেয়েছিল। বেঁচে থাকার শেষ স্পৃহাটুকু মুছে গেছে, সামনে একটি মাত্র রেখা, প্রায় দুর্নিরীক্ষ্য, তার ওপারেই মৃত্যু। এত কাছে থেকে অতসী কোনদিন তাকে দেখেনি।

মৃত্যুকে যারা হঠাৎ-পরিণতি বলে, তারা ভুল জেনেছে। মৃত্যু একটা ক্রম-সমাপ্য পদ্ধতি, খণ্ড-খণ্ড অবসানের সমষ্টি। একটির পর একটি আলো নিভে নিভে প্রেক্ষাগৃহ যেমন এক সময় পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায়, তেমনি প্রথমে যায় দৃষ্টি, শ্রুতি ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে, না থাকে স্পর্শে সুখ, না রসনায় স্বাদ। সেটা হল দেহগত মৃত্যু। আরেক রকম মৃত্যু ঘটে অগোচরে, দেহযন্ত্র অটুট, কিন্তু ভিতরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অনুভূতি, মান, মূল্য সব ধিকিধিকি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নিজের বুকের ভিতরে চেয়ে সেই মৃত্যুকেই প্রত্যক্ষ করল অতসী।

ছাতে দাঁড়িয়ে সুধা দেখেছিল অতসীকে আসতে। ঠিকমত পা পড়ছে না, অসংযত আঁচল রাস্তার ধুলোয়। একটা কাগজের নৌকো যেন টলতে টলতে জলে ভেসে আসছে।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল সুধা, দরজা খুলে দিয়ে অতসীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কী হয়েছে ফুলমাসী?'

অতসী নীরবে ওকে ঠেলে দিল।

সুধা তবু ফুলমাসির সংগ ছাড়ল না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'দিদিমা বাসায় নেই, জান।'

অতসী তবু কৌতূহল দেখাল না, ঘরে এসে শুধু বলল, 'আলোটা নিবিয়ে দে, সুধা।'

'তোমার একটা চিঠি আছে, দেখবে না, ফুলমাসি?'

অত্যন্ত ক্লান্ত, অত্যন্ত নিরুৎসুক-ভাবে অতসী হাত বাড়িয়ে দিল।

চিঠি আনতে টেবিলের দিকে যেতে যেতে সুধা বলল, 'দিদিমা কোথায় গেছে জিজ্ঞাসা করলে না তো। দিদিমা গেছে ছোট মামার সঙ্গে। ছোট মামা আজ এসেছিল, জান?'

তখনও চিঠিটার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে, অতসী বলল, 'কী করে জানব।'

যেন খুব গোপন কথা বলছে এমন গলায় সুধা বলল, 'ছোট মামা এসেছিল। সেই চাকরিটা আবার নাকি ফিরে পেয়েছে, বলল। বিয়ে করবে, কনেও ঠিকঠাক। দিদিমাকে বলল, তুমি অনুমতি দাও। দিদিমা কিন্তু আপত্তি করলেন না ফুলমাসি। শুধু বললেন, কর। আমি অনুমতি না দিলেই কি তুমি শুনবে। আমার কথা কে শোনে।

ছোট মামা বলল, আমি তোমার মেয়ের মত নই, মা। তোমার কোন্ কথা আজ পর্যন্ত না শুনেছি বল তো। দিদিমা বলল, তুমি আমার সোনার টুকরো ছেলে। তোমাকে একটা খারাপ গাল দিয়ে বলল, ওর কথা বলিস না, আমার হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলে।

অতসী ফোঁস করে উঠল, বলল, 'বলল মা এই কথা?'

সুধা বলে গেল, 'ছোট মামা তখন বললে এ-বাড়িতে কিন্তু আমরা থাকব না। অতসীর সঙ্গে একসঙ্গে থাকা আর নয়। আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে মেশামেশি করত বলে আমার যখন চাকরি গিয়েছিল, তখন আমি শুধু ওর পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিলাম। বার বার বলেছিলাম আদিত্যকে তুই ছাড় অতসী, আমাকে বাঁচা। সে-কথা ও রাখেনি, ওকে আমি চিনে নিয়েছি সেদিনই। দিদিমা বললেন, তুমি ওকে আজ চিনলে বাবা, আমি চিনেছি অনেকদিন। আর বলল,—একটু থেমে, যেন সংকুচিত হয়ে, সুধা বলল, 'বাকিটা বলব ফুলমাসি?'

অতসীর তখন শোভন-অশোভন জ্ঞান নেই, বলল, 'কেন বলবি না।'

'দিদিমা বলল, অতসীকে আমি চিনেছি অনেকদিন আগেই। আদিত্যকে ছাড়বে কেন, পুরুষ মানুষের গন্ধ না শুঁকলে ওর যে ভাত হজম হয় না। ছোট মামা বলল, যাক, ওসব যেতে দাও। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে, মা। একটা ছোট বাসা দেখেছি মাণিকতলায়, যাবে আমার সঙ্গে? পছন্দ করে আসবে? দিদিমা তো ছোট মামার সঙ্গে যাবে, আমি কোথায় যাব, ফুলমাসি?'

অতসী ততক্ষণ চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করেছে। উত্তর দিল না। পড়া শেষ হলে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এ-চিঠি কে নিয়ে এল রে?'

'একটা লোক, ফুলমাসি। দিদিমারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।'

'লোক, কেমন লোক?'

'তা-তো ভাল করে দেখিনি ফুল-মাসি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অতসী বলল, 'আমি যাব। তুই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসবি সুধা?'

'কোথায় যাবে ফুলমাসি? এত রাত্রে?'

'রাত্রে?' ম্লান হেসে অতসী বলল, 'আজ আর আমার কিছুতে ভয় নেই, সুধা।'

গলির মুখ পর্যন্ত পৌঁছে, অতসীর মনে হল কে যেন পিছে। ফিরে চেয়ে বলল, 'এ কী, সুধা? তুই কোথায় চলেছিস?'

সুধা এগিয়ে এসে শক্ত করে আঁচল চেপে ধরল অতসীর। বলল, 'আমিও যাব। তোমার আজ কী যেন হয়েছে ফুলমাসি, আমার ভারী ভয় করছে। তোমাকে আজ একা কোথাও যেতে দেব না।'

সুধার মনে আছে সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত অতসীকে অনুসরণ করেছিল।

ঘড়ির হিসাবে রাত তখন হয়ত খুব বেশি না, কিন্তু মনে হয়েছিল, না-জানি কত, সব যেন নিশুতি হয়ে এসেছে। এত ভীড়, ঠেলাঠেলি, গাড়ি, আলো, কিন্তু যে-দুটি মেয়ে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলেছে, তারা যেন এখানকার কেউ নয়, পথ ভুলে বিদেশি, অচেনা শহরে এসে পড়েছে।

গলি ফুরিয়ে গেল, সদর রাস্তায় পড়েও অতসী ট্রাম নিল না, বলল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি, এ ট্রাম সেদিকে যায় না। তুই হাঁটতে পারবি তো, সুধা।'

সুধা বলল, 'পারব ফুলমাসি।'

তখনও জানত না, পথ কত।

সদর রাস্তা ধরে মিনিট দশেক সোজা হাঁটল অতসী, ডাইনে মোড় নিল, কিছুটা এগিয়ে ফের বাঁয়ে। ডাইনে-বাঁয়ে অসংখ্য মোড় নিতে নিতে ওরা কোথায় এল, কতদূরে, সুধার হিসাব গুলিয়ে গেল, দিকের আন্দাজ রইল না, মনে হল পথের আর শেষ নেই, চলা ফুরোবে না, অন্তত আজ রাতে না, হঠাৎ বুঝি ভোর হয়ে যাবে, কোন একটা পথের বাঁকে দীপ্ত দিন গা-ঢাকা দিয়ে আছে, সেখানে পৌঁছলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীক্ষ্ম তীর নিয়ে পথশ্রান্ত দুটি মেয়ের উপরে হানা দেবে।

বড় রাস্তা, ছোট রাস্তা, ফের বড় রাস্তা। দোকানে দোকানে কেনা-বেচা প্রায় শেষ, পানের দোকানের রেডিওতে ক্লান্ত বেহাগ। সুধার একবার মনে হল ওর জুতোর তলা বুঝি খসে গেছে, হোঁচট খেতে খেতে একবার সামলে নিল। ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞাসা করল 'রাত কতটা, বল তো ফুলমাসি।'

সামনেই ছিল একটা ঘড়ির দোকান, অতসী ওকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'যেটা খুশি বেছে নে।'

'তার মানে?'

'দোকানে যেমন অনেক সাজান জিনিসের ভেতর থেকে আমরা পছন্দ মত জিনিসটি বেছে নিই, এও তেমনি। ঘড়ির দোকানে সব রকম সময়ই ছড়ান আছে, তুই যেটা খুশি বেছে নে।'

সুধা রাগ করে বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ ফুলমাসি।'

পথের ধারে ঘুমন্ত একটা ট্যাক্সি ওদের দেখে জেগে উঠে হর্ণ বাজিয়ে ইশারায় ওদের ডাকল, আশায় আশায় একটা রিক্সা ঠুনঠুন করে পিছে পিছে এল অনেক দূর, অতসী বলল, 'এই তো, আর খানিক দূর।' চিঠিটা বার করে ঠিকানা ফের পড়ে নিল।

ততক্ষণে ওরা বাঁশির মত ক্রমশ-সরু একটা গলিতে পড়েছে। মোড়ে সরবতের দোকানের সমুখে ক'জন লোক জটলা করছে, ওদের দেখে তারা হঠাৎ ফুর্তিমত্ত হয়ে উঠল, একজন এক খিলি পান চিবোতে চিবোতে হিন্দী গানের দু'কলি

গয়ে উঠল, সেই গানের রেশ নিয়ে নিয়ে-বিনিয়ে শিস্ দিলে আরেকজন।

অতসী বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ল, সুধা।'

ওদের পায়ের ঠোকর খেয়ে অদৃশ্য, যায় অশরীরী, একটা কুকুর কেঁউ করে পালিয়ে গেল, আচমকা ঘুম ভেঙে একটা ভিখিরি গুটিসুটি হয়ে একটা বাড়ির রকে উঠে বসল।

গলি, গন্ধ, আধ-অন্ধকার, ছায়া, ভয়। শিরশিরে শীত, তবু ঘাম, গায়ে কাঁটা, দম বন্ধপ্রায়।

পিছনে নিস্তেজ গ্যাসের আলো, দুটি দেহের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে সামনে। নির্জন গলিতে দুজন নয়, চারজন নিঃশব্দে পাশাপাশি চলেছে। হাঁপিয়ে পড়েছে অতসী আর সুধা, কিন্তু ছায়া দুটি অনায়াসে তরতর করে বাকি পথটুকু পেরিয়ে গেছে; রাস্তার শেষে পুরনো যে বাড়িটা গলিটাকে থামিয়ে দিয়েছে, তার একে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আরও কয়েক পা এগোল ওরা, ছায়া দুটিও অমনি সাপের মত হেলে হেলে পুরনো বাড়িটার দেয়াল বয়ে উঠতে লাগল, আর খানিকটা গেলে চুপে চুপে ছাতটাও টপকে যাবে বুঝি।

সেই বাড়িটার সমুখে দাঁড়িয়ে অতসী চিঠিটার সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে দেখল। তারপর শুরু করল কড়া নাড়তে।

সুধা পিছনে দাঁড়িয়ে, কে এসে দরজা খুলে দিলে, দেখতে পেল না। একটু পরেই অতসী পা বাড়াল ভিতরে ঢুকবে বলে, চোখের ইশারায় সুধাকে বলল ওকে অনুসরণ করতে।

শতছিন্ন একটা ধুতি লুঙ্গিমত করে পরা একটা লোক আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। দরজা খুলে দিয়েছিল বোধ হয় এই। সুধা ঘরটার চারধারে চোখ বুলিয়ে নলে। থাকে থাকে প্যাকিং বাক্স সাজিয়ে ঘরটাকে দুভাগ করা হয়েছে, ভিতরটা বোধ হয় অন্তঃপুর। একদিকে গুটিয়ে রাখা একটা মাদুরের ওপর বালিশ, যে লোকটি এখুনি বেরিয়ে গেল সে বুঝি শোবার উদ্যোগ করছিল। আরেক দিকে ছোট্ট একটা তাকে আয়না, দাড়ি কামানর সরঞ্জাম; আড়াআড়ি করে বাঁধা দড়িতে খান দুই পাট ভাঙা ধুতি, গামছা, ময়লা গেঞ্জি। দেয়ালে পেরেকের সঙ্গে ঝোলান একটা পাঞ্জাবি। আর ছবিওয়ালা একটা ক্যালেন্ডার, কোন্ সালের কে জানে। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্যাকিং বাক্সগুলোর উপরে রাখা ধূম্রলোচন একটা ধুকধুকে বুক হারিকেন দু' পাশেই আলো, ঠিক করে বলতে গেলে ফিকে অন্ধকার বখরা করে দিচ্ছে। একমেব-অদ্বিতীয় জানালার নীচে কুজোর উপরে উপুড় করে রাখা একটা এলুমিনিয়ম গ্লাস, তার ঠিক পাশেই সচিত্র একটা সাপ্তাহিক টুপটুপ জলে ভিজে ভিজে ফুলে উঠেছে।

এসব দেখতে সুধার মিনিটখানেকের বেশি লাগেনি, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পরিত্যক্ত আধ-অন্ধকার ঘরটিতে ওরা দুজন কতক্ষণ না জানি দাঁড়িয়ে আছে। প্যাকিং বাক্সের আড়াল থেকে একটু পরেই যে লোকটি বেরিয়ে এল, তাকে দেখে চমকে উঠল সুধা, অতসীর হাত শক্ত করে চেপে ধরল। শুনল, বিহ্বল বিস্মিত কণ্ঠে ফুলমাসি বলছে 'নীলুদা, সত্যি তুমি?'

নীলাদ্রির কোটরলীন চোখ দুটিতে হাসি খেলে গেল।

'আমি অতসী। এখনও ভূত-প্রেত হইনি, কিম্বা মরদেহ ধরে তোমাকে ছলনা করতে আসিনি।'

'কিন্তু আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না, নীলুদা—'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বিশ্বাস না হয় চিমটি কেটে পরীক্ষা করতে পার। দেখবে ব্যথা পাব, হয়ত চেঁচিয়ে উঠব। ভূতের চেয়ে মানুষ হয়ে থাকার সুখই তো ওইখানে,—মানুষ দুঃখ পায়, ব্যথা বোধ করে।'

অতসী বলে উঠল, 'কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না নীলুদা? জানতুম তুমি দক্ষিণ ভারতের কোন স্যানাটোরিয়মে, হঠাৎ আজ চিঠি পেয়ে চমকে উঠলুম, এসে দেখি তুমি কলকাতাতেই, এক ঘুপচি গলির কোণে—'

'চিঠিতে নাম সই করিনি। আমার চিঠি তুমি বুঝতে পেরেছিলে অতসী?'

অতসী ধীরে ধীরে বলল, 'পেরেছিলুম। নইলে এত রাত্রে কি আসি। এ কার বাসা নীলুদা, কবে এলে?'

'সব ধোঁয়াটে লাগছে? রহস্যময়?' নীলাদ্রি অল্প অল্প হেসে বলল, 'সে অনেক কথা। তোমাকে সব বলব বলেই ডেকেছি। কিন্তু আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, অতসী, এখনও শরীর বড় দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়ালেই পা কাঁপে। এদিকে চল, বিছানা পাতা আছে, বসে বসে গল্প করা যাবে।'

ঈষৎ-ত্রস্ত গলায় অতসী বলল, 'কিন্তু নীলুদা, এখন যে রাত অনেক হল।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বেশি হয়নি। অনেক জায়গা আছে যেখানে এখন রাত মোটে সাতটা।'

অতসী বলল, 'সেতো ভিয়েনা, প্যারিস কি লণ্ডনে।'

নীলাদ্রি তেমনি হাসতে হাসতে বলল, স্কুল-টীচার কিনা, তাই ভূগোলের অঙ্কের কথাই তোমার মনে পড়ল। আমি কিন্তু অত দূর দেশের কথা বলিনি। লোকে টের পায়না, কিন্তু এই কলকাতা শহরেই আলাদা আলাদা সময় আছে অতসী। এই গলিটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে, অনেক পাড়ায় তখন সবে সন্ধ্যা,—যেমন ধর, চৌরঙ্গী। এতো গেল কালের কথা। স্থানের হিসাবেও এ রকম গরমিল আছে। গাড়ি যদি না থাকে তবে শ্যামবাজারের লোক বৌবাজারে এলে রাত নটা বাজতে না বাজতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে; আবার টালার লোক, গাড়ি থাকলে দশটার পরও নিশ্চিন্ত হয়ে টালীগঞ্জে বসে থাকতে পারে, যেন পাশের বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে। তা, তুমি তো গাড়িতেই এসেছ অতসী?'

অতসী চমকে উঠল, 'গাড়ি,—কার গাড়ি?'

'কেন, আদিত্য মজুমদারের?'

গম্ভীর মুখে অতসী বলল, 'আমি হেঁটে এসেছি।'

'ও শখ।' নীলাদ্রি হেসে উঠল, 'বড় লোকদেরও মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে চলে, বেড়াবার শখ হয়, সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম, অতসী।'

তীক্ষ্ম কণ্ঠে অতসী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়লোক? কাকে বড় লোক বলছ, নীলুদা?'

নীলাদ্রি নির্বিকার গলায় বলল, 'কেন তুমি। আদিত্য মজুমদারের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায়নি, অতসী?'

দাঁতে ঠোঁট চেপে অতসী অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করল। দরজার দিকে পা

দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাই, নীলুদা। শুধু অপমান করবে বলে ডেকে এনেছ আমি বুঝতে পারিনি।'

সুধাও অতসীর পিছে পিছে যাবে বলে এগিয়েছে, হঠাৎ নীলাদ্রি প্রবল গলায় বলে উঠল, 'যেওনা অতসী। শোন।'

ফিরে তাকাল অতসী, চোখ দুটি জলে টলমল করছে, বলল, 'কী।'

'তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। এসো, এদিকে এসো।'

রগ-বেরুনো রোগা হাত, উত্তেজনায় আবেগে থরথর কাঁপছে, নীলাদ্রি চেপে ধরল অতসীর মনিবন্ধ, টেনে নিয়ে গেল প্যাকিং বাক্সের ওধারে। অতসী বাধা দিল, পারল না, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, হাত ছাড়াতে গিয়ে কব্জি মচড়ে গেল, ছটফট করতে লাগল অতসী, যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলল, আর সেই কান্না থামিয়ে দিতেই বুঝি নীলাদ্রি ওকে উগ্র আগ্রহে টেনে নিল, নুয়ে পড়ে তীক্ষ্ম হিংস্র দাঁত দিয়ে অতসীর ঠোঁট দুটি চেপে ধরল।

নীলাদ্রির স্থির দুটি চোখ ওর মুখের উপরে, তপ্ত ঘনশ্বাসে কপোল পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে, অতসীর মনে হল, মুখ তো নয়, কে যেন একটা দো-নলা বন্দুক ধরেছে ওর সমুখে, কোটর থেকে গুলীর মত ধ্বকধ্বক দুটি চোখ যে কোন মুহূর্তে গুলীর মত ঠিকরে পড়ে ওকে আঘাত করতে পারে।

ত্রস্ত, স্রস্তবাস, পরাস্ত, অতসী বারবার মিনতি করে বলতে থাকল, 'ছাড়, ছাড়; নীলুদা।'

নীলাদ্রিও শ্রান্ত, ওকে ছেড়ে দিয়ে নেশাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলে গেল, 'ফাঁসির আসামীকে পেট ভরে খেতে দেয় শুনেছ তো। আমারও তো মৃত্যু পরোয়ানায় সই হয়েই গেছে, তাই জীবনের শেষ সুখটুকু উশুল করে নিলুম।'

বেশ-বাস অসম্বৃত, সে কথা খেয়ালও নেই অতসীর, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আকুল স্বরে বলতে থাকল, 'এ তুমি কী করলে, নীলুদা। কেন করলে।'

নিষ্ঠুর, কিন্তু আসক্তি-গাঢ় কণ্ঠে নীলাদ্রি বলল, 'তোমাকে ভালবাসি বলে।'

স্তম্ভিত জড় পাথরের মূর্তির মত পাশের ঘরে বসে সুধা অতসীকে বলতে শুনল, 'মিথ্যা কথা। তুমি ভালবাস শুধু নিজেকে। নইলে আদিত্য মজুমদারের কথায় আমাকে ফেলে পালাতে না।'

তিক্ত গলায় নীলাদ্রি বলল, 'সে সব অতীতের কথা থাক অতসী। বর্তমানে এস। শুধু অপমান করতে তোমাকে ডাকিনি অতসী, একটুখানি সুখ ছিনিয়ে নিতেও নয়। আমার উদ্দেশ্য আরও স্থূল। আমাকে কিছু টাকা দাও, অতসী। সে টাকায় চিকিৎসা করাব। আমি শুধু সেরে উঠতে চাই অতসী। অনেক দূরে চলে যাব। কথা দিচ্ছি, আর কোনদিন ফিরে আসব না, তোমাদের সুখের পথে কাঁটা হব না। টাকা দাও অতসী।'

চোখের জল শুকিয়ে গেছে, বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত উঠে বসল অতসী। বলল, 'টাকা? টাকা কোথায় পাব?'

'নীচ। ইতর।' নীলাদ্রির চোখ দুটি দিয়ে যেন ফুলকি ঝরতে থাকল। 'আজ বাদে কাল শহরের অন্যতম ধনীর যে অঙ্কশায়িনী হবে তার কাছে টাকা নেই, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না অতসী।'

ক্লিষ্ট স্বরে অতসী বলল, 'বেশ, বিশ্বাস করনা। আদিত্যর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, একথাও বোধ হয় বিশ্বাস কর না।'

নীলাদ্রি আবার সজোরে বলতে যাচ্ছিল 'না', কিন্তু অতসীর চোখে চোখ পড়ে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেল। বিমূঢ়, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'সম্পর্ক নেই?'

অতসী নিস্তেজ গলায় বলল, 'না। আদিত্য আমাকে ঠকিয়েছে।'

'তোমাকে ঠকিয়েছে', নিজেই কথাটা আবৃত্তি করল নীলাদ্রি, কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল। বলল, 'তোমাকেও ঠকিয়েছে? তবে তো আদিত্য আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে অতসী।'

প্রশ্ন করতে হল না, নীলাদ্রি নিজে থেকেই বলে গেল, 'হাসপাতাল থেকে আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল সারিয়ে তুলবে বলে, সাউথ ইণ্ডিয়ায় চালান করে দিল, হাতে কিছু টাকা দিয়ে। বলল, স্যানাটোরিয়মে চিঠি লিখে দেবে, গেলেই ওরা আমাকে ভর্তি করে নেবে। কিন্তু সে চিঠি তো লিখল না। দিনের পর দিন স্যানাটোরিয়মের দরজায় ধন্না দিলুম, সীট নেই। চিঠি লিখলুম আদিত্যকে, জবাব পেলুম না। হাতের টাকা ফুরিয়ে এল, শেষে কোন গতিকে ফের পালিয়ে এলুম কলকাতাতে। আদিত্যর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছি, পারিনি।'

দম নিয়ে নীলাদ্রি ফের বলল, 'তোমাদের ওখানে উঠিনি, কেননা তোমার মা পছন্দ করতেন না। তা-ছাড়া যে সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে, সেটার জের টানতে আমার রুচি ছিল না। উঠলুম এখানে, আমার এক বন্ধুর বাসায়। বৌ বাপের বাড়ি, বন্ধু থাকতে দিলে। কিন্তু এ আস্তানাও আমার ঘুচবে অতসী, ওর বৌ কাল-পরশুই এসে পড়বে, চিঠি এসেছে, কোলে একটা বাচ্চা নিয়ে। একটা মোটে ঘর, বাইরের লোককে রাখবে কোথায়।' গলা নামিয়ে নীলাদ্রি ফিস-ফিস করে বলল, 'আমার কী অসুখ এরা এখনও জানে না, তবু বন্ধুটি কিছু সন্দেহ করেছে মনে হয়। আজ সকালে বারকয়েক কেশেছি, তখন ও বারবার সন্দিগ্ধ চোখে আমার মুখের দিকে চাইছিল। এ রোগ তো লুকোনো যায় না, ঝলকে ঝলকে বেরোয়। অগত্যা আজ তোমাকে খবর দিয়েছিলুম। ভাবলুম তুমি তো অনেক পেয়েছ, আমি শুধু গোটা কতক টাকা নিয়ে যাব। ঘুষ দিয়ে মৃত্যুর পেয়াদাকে, আর একবার ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

অল্প-অল্প হাঁপাতে শুরু করেছে নীলাদ্রি কিন্তু কোটর থেকে প্রায় ঠিকরে পড়া মণি দুটো ফের যথাস্থানে ফিরে গিয়ে স্থির হয়েছে। পরম অনুরাগে অনুতাপে অতসীর কৃশ, শিথিল একখানি হাত হাতে টেনে নিয়ে নম্র গলায় বলে গেল, 'হিংসা-দ্বেষে অন্ধপ্রায় হয়েছিলুম, নইলে আমার আগেই বোঝা ছিল।' অতসীর শীর্ণ নিষ্প্রভ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'অসুখের সঙ্গে আমার নিত্য সম্পর্ক, তবু অ-সুখকে দেখামাত্র চিনতে পারিনি। তোমাকে আর আদিত্যকে অভিন্ন ভেবেছিলুম। তোমাকে অপমান করে আদিত্যর ওপর চেয়েছিলুম শোধ তুলতে। যে ভ্রান্ত বুদ্ধির বশে বিধর্মী মন্দির অপবিত্র করতে ছোটে, এও তাই।' অতসীর কোলে আকুল মুখ ডুবিয়ে অসহায় শিশুর মত ওর কটি

ন করল নীলাদ্রি, ধরা-ধরা গলায় লি বলল, 'ক্ষমা.কর, ক্ষমা কর।'

আর, অতসী এবারে সংকুচিত হল না, করল না, সরে গেল না, গভীর স্নেহে, গে নীলাদ্রির চুলে আঙুল বুলিয়ে চ দিতে বলল, 'চুপ কর। তোমার কোন নেই।'

নীলাদ্রি উঠে বসল, বিস্ফারিত চোখে বলল, 'এত সবের পরেও বলছ, দোষ ?'

'এত সবের পরেই বলছি।' অতসী চ কণ্ঠে বলল, 'আসলে কী জান দা, আমরা সবাই চলাফেরা করছি কার একটা ঘরে। আপন পর চিনতে নে, নিজেদেরই মাঝে মাঝে আঘাত বসি।'

নীলাদ্রি বলল, 'আমার অবস্থা আরও ণ। এই অন্ধকার ঘরেও আমার স্থান না।' নিজের জীর্ণ বুকের দিকে ল দেখিয়ে বলল, 'অন্ধকারতর লে যাবার ডাক এসেছে।'

'না।' দৃঢ় গলায় অতসী বলে উঠল, নেই থাকবে তুমি। পারি তো এই কারেই একটি কোণ, আমরা আলো তুলব।'

'আমরা, অতসী?' নীলাদ্রি চমকে ন, 'তুমি আর আমি?'

নীলাদ্রির একখানা হাত করতলে নিয়ে সী বলল, 'তুমি আর আমি।'

অনেকক্ষণ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে চেয়ে ন নীলাদ্রি, মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে ল, 'না, তা হয় না।'

অতসী বলল, 'কেন হয় না, কেন হয় নীলুদা।'

তেমনি মাথা নেড়ে নীলাদ্রি বলল, মাকে সবাই ঠকিয়েছে অতসী, আমি ঠকাব না। আর ক'দিন বা আয়ু ার, তোমাকে কী দিতে পারব। সহায় ঘর না, এমন কি আমার এই রোগ, এই স্থ্য, তোমাকে একটি সন্তানও দিতে ব না। দেওয়া উচিতও হবে না।

অতসী বলল, 'তবু।'

'তার চেয়েও ভয়ের কথা কী জান, র অনেক আগেই আমাদের ভিতরে চ থাকার ইচ্ছেটুকুও মরে গেছে, াদের সব পরাজয়ের এও হয়ত একটা বড় কারণ। আমার কাছে কিছু তো পাবে না অতসী।'

অতসী বলল, 'চাইনে।'

একটু থেমে, অনেক সংকোচ জয় করে বলল, 'আমিই বা কী দেব তোমাকে। কিছু না। একটা নিষ্পাপ শরীর পর্যন্ত না।'

পরম মমতায় একটি সরমকম্পিত দেহ স্পর্শ করে নীলাদ্রি বলল, 'আমি জানি।'

সুধার মনে আছে ওদের বিদায় দিতে নীলাদ্রি সেদিন দরজা পর্যন্ত এসেছিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সেই লোকটা, নীলাদ্রির বন্ধু। হিম-হিম শীতে বিড়ি টানছিল, আর একবার আকাশে, একবার রাস্তার গ্যাসের আলোর দিকে চেয়ে ছিল।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ীর নূতন উপন্যাস 'অচিন রাগিণী' ধারাবাহিকরূপে বাহির হইবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

হয়ত ভাবছিল, কতদূরে গেলে গ্যাসের এই আলোটাকে আকাশের তারার মত নিবু-নিবু, ক্ষীণ দেখাবে।

নীলাদ্রি বলল, 'সুবোধ, এ'দের একটা রিক্সা ডেকে দাও।

হাতের বিড়িটা ফেলে দিয়ে লোকটা জোরে জোরে পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল, একটু পরে, বোধ হয় সদর রাস্তা থেকে, একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে এল।

দোকানপাট কখন বন্ধ হয়ে গেছে, নির্জন মোড়ের পাহারাওলার মতই ঝিমান পথ, ষাঁড় আর কুকুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফুটপাথে, বারান্দার নীচে বেঠিকানা অনেকগুলি মানুষ শাদা চাদরে বুক ঢেকে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে আছে, অল্প অল্প হাওয়া। ভূগর্ভ নালায় একটি নিরবধি জলধারা, তালে তালে রিক্সার ঠুনঠুন সংগৎ, আর কোন শব্দ নেই।

সেই স্তব্ধতা ভেঙে সুধা হঠাৎ বলে উঠল 'আমি কোথায় যাব, ফুলমাসি।'

অতসী বুঝি চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি রিক্সার হাতলটা ধরে বলল, 'তুই তবে সব শুনেছিস?'

সুধা বলল, 'শুনেছি।'

মাথা নীচু করে খানিকক্ষণ কী ভাবল অতসী, আস্তে আস্তে বলল, 'তুই দিদির কাছেই ফিরে যা সুধা।'

সমস্ত দেহ কঠিন করে সুধা দৃঢ় অস্বীকৃতি জানাল।

'না, ফুলমাসি, সেখানে আমাকে ফিরে যেতে ব'লনা।'

চোখ দুটি জলে ভরে গেল সুধার, পথ ঝাপসা, রাস্তার প্রতিটি আলো যেন দুটো হয়ে গেছে। ফুলমাসি বোঝেনা কেন সেখানেও সুধা বাঁচবেনা। বেশ তো ছিল সেখানে, অজ্ঞান, অবোধ কৈশোর-মোহে। কেন ফুলমাসি তাকে টেনে আনল শহরে, তিক্ত-বিচিত্র-মধুর জীবনের স্বাদ দিল। ফুল তুলত, ফল কুড়োত যে-মেয়েটি, সে কবে মরে গেছে, আজ কার কাছে ফিরে যাবে সুধা।

অতসী বলল, 'সেখানে অন্তত এই শহরটার চেয়ে বেশি শান্তি পাবি সুধা।'

সুধার চোখের সমুখে চকিতে একটা ছবি ভেসে উঠল। বাবা উদ্‌ভ্রান্ত, মা জীবন্মৃত, নীলু নিখোঁজ, ভাইবোনেরা উপবাসী। তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'না ফুলমাসি, সেখানেও শান্তি নেই। বাবা তো তোমাকে সব বলে গেছে।' বলতে বলতে অতসীর একেবারে গা ঘেঁষে বসল সুধা, রিক্সাটা নড়ে উঠল, অতসীর হাত দুটি চেপে ধরে সুধা মিনতি করে বলল, 'আমি তোমার কাছেই থাকব ফুলমাসি।'

অতসী চট করে কোন উত্তর দিতে পারল না, রিক্সাটা আরও অনেকটা পথ গড়িয়ে গেল। সাহসে ভর করে সুধা বলল, 'একেবারে বোকা মেয়েটি এসেছিলাম, কিছু বুঝতাম না। আমাদের জায়গা গ্রামে নেই, শহরেও নেই সেটা এখন বুঝেছি। পালিয়ে কোথায় যাব। তবু—' বলতে বলতে প্রবল একটা আবেগে সুধার দেহ রোমাঞ্চিত হল, 'তবু যদি বুকে জোর থাকে ফুলমাসি, তবে হয়ত এই শহরটাকেই আমরা একদিন আপন করে নিতে পারব।"

—শেষ—

কবিতা

উত্তরমেঘ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দুই টাকা।

সাহিত্যসমালোচনা উপন্যাস গল্প ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর দান মুক্তহস্ত। সেসব ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন; কিন্তু আসলে তিনি কবি। কবিতায় তাঁর সেই কবিমনের গুঞ্জন ছত্রে ছত্রে মুখরিত। শ্রীযুত বিশীর কথা উদ্‌ধৃত করেই তাঁর উত্তরমেঘ কাব্যগ্রন্থটির আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিল্পকীর্তির জন্যই নন্দিত, কিন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিষয়ে অনেকেই উদাসীন, অবনীন্দ্রনাথের এই-দিক সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথবাবু এইরূপ মন্তব্য করেছেন—"বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তির দুর্ভাগ্য এই যে, অনেক সময়েই এক দিকের খ্যাতির তলে তাঁহার অন্য দিকের কৃতিত্ব চাপা পড়িয়া যায়; সব দিকের কৃতিত্ব কদাচিৎ সমানভাবে স্বীকৃত হয়। তার কারণ, প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি সাধারণ মানুষের কেমন-যেন একটা অবিশ্বাসের ভাব আছে। তাই সে একটা মাত্র কৃতিত্বকে আদরে বাছিয়া লইয়া অন্যগুলিকে অবহেলা করে। পাঠকের রসাস্বাদে বহুমুখিতার অভাব প্রতিভার বহু-মুখিতার অস্বীকৃতির অন্যতম কারণ।"

আমাদের মনে হয় প্রমথবাবুর ক্ষেত্রেও এই কথা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। অকপটে বলা যায়, তাঁর যে পরিমাণ সাহিত্যিক খ্যাতি আছে, সেই পরিমাণ কবি-খ্যাতি নেই। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের কৃতিত্বের অন্তরালে তাঁর কবি-খ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু আসলে তিনি যে কবি তা মাঝে মাঝে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা দ্বারা তিনি প্রমাণিত করে থাকেন, বর্তমান গ্রন্থটি সেইসব প্রকাশিত কবিতার সংকলন রূপে নূতনভাবে সেই প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

উত্তরমেঘ কাব্যগ্রন্থে গদ্যছন্দ ও পদ্য-ছন্দের সতেরোটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। বইটির নাম সার্থক হয়েছে বলা যায়। কেননা, এই বইয়ের বেশির ভাগ কবিতায়ই শ্রীযুত বিশী তাঁর মনকে যেন এক অজানা অলকার উদ্দেশে উড্ডীন করে দিয়েছেন; এ গ্রন্থে কবি 'সুদূরের পিয়াসী'রূপে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন। "আমি টাইম-টেবল পাড়ি" কবিতায় তাঁর এই রূপটি অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে; কবি টাইম-টেবলের পাতা উল্টে চলেছেন, অমনি তাঁর চোখের সমুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নিসর্গের চিত্র, চলচ্চিত্রের মত পর পর দেখা যাচ্ছে সেই ছবি, এইসব পরিচ্ছন্ন বর্ণনার শেষে এসে তিনি যাকে পেলেন সেই সম্ভবত তাঁর স্বপ্নের 'তন্বী শ্যামা শিখর দশনা...' মানসী-প্রতিমা, তিনি দেখলেন—

> তোমার চরণ দুখানি ঘিরে ঝালর ঝুলিয়েছে
> শুভ্র শাড়ির সবুজ পাড়;
> চলনের তালে চঞ্চল,
> পরনের ভঙ্গীতে কুণ্ঠিত,
> সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রান্ত
> যেন তালে তালে স্তব ক'রে নাচছে
> সুন্দরী পৃথিবীর।

তারপর তিনি সেই মানসসুন্দরীকে বলছেন—

> 'আমার বাসনার ফুলবনের উপর দিয়ে
> ওই দুটি চরণ চলে যাক,
> আমার কামনার দ্রাক্ষাবন দলে যাক,
> আমার কানে কানে বলে যাক,
> 'ধরা দিই নি বলেই ধরতে চাইছো,
> অন্বেষণেই তো মৃগয়ার আনন্দ।
> স্বর্ণমৃগী ধরা দেয় না বটে
> তাই তো সেই মৃগয়াসুখেরও অবসান
> নেই কোনো কালে।'

যুগে যুগে পৃথিবীর কবি স্বপ্নের এই সোনার হরিণের পিছনে ধাওয়া করে চলেছে বলেই কবিতার অভিযান সম্ভব হয়েছে; যে দিন সেই হরিণ আমাদের আয়ত্তে এসে যাবে সেই দিনই হবে কবিতার অপমৃত্যু। তাই, যাকে চাই তাকে যেন না পাই—কবির মনের আকাঙ্ক্ষা অবশ্য এই; যদি পেয়েই গেলাম তবে চাওয়ার আর রইল কি। চাওয়া সাঙ্গ হলে ছন্দও যে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই কবির মন গুঞ্জন ক'রে ওঠে—

> তোমাকে পেয়ে স্বস্তি নাই,
> তোমাকে ছেড়ে শান্তি নাই;
> হে সঙ্গীতের সরস্বতী।

এই কাব্যগ্রন্থটি থেকে অনেক অংশ উদ্‌ধৃত করার লোভ হচ্ছে। কিন্তু তাতে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে—এ ভয়ও আছে।

'নুলিয়া' 'পৃথিবীর প্রতি সমুদ্র' 'দলমা পাহাড়ে' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে কবি তাঁর কাব্যপ্রতিভার যেরূপ পরিচয় দিয়েছেন, একালের কবিতায় তা বিরল। 'যুগচ্ছন্দ' কবিতায় কবি এর কারণ জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন—

> সৌন্দর্যের পুষ্পে ঢুকেছে আজ
> সংশয়ের কীট,
> যে-অমৃত ঘুচাবে তৃষ্ণা
> সেই অমৃতই যে আজ তৃষিত।
> কে দূর করবে বিশল্যকরণীর শল্য ?...
> এ যুগের সুখ পৌঁছয় না আনন্দে,
> এ যুগের দুঃখ নিতান্তই ব্যক্তিগত।
> কোথায় সে আনন্দের অভ্রভেদী উচ্ছ্বাস ?

জীবনের আনন্দ থেকে আজকাল আমরা আমাদের বঞ্চিত করে রাখছি বলেই সম্ভবত আমাদের কাব্যে আর গান নেই,—

> তুমি গেলে গান যায়
> গান গেলে আর থাকে কী ?

কবির এ জিজ্ঞাসার জবাব কবি নিজেই দিয়েছেন। তিনি স্বচ্ছন্দ গান দিয়ে মহিমা প্রচার করেছেন গানেরই। উত্তরমেঘের কবিতা বেদনাভারাক্রান্ত আনন্দের সার্থক সংগীত।

৩৭০।৫৩

নূতন কবিতা—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখো-পাধ্যায় প্রণীত। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২ টাকা।

লেখক সাহিত্যিক সমাজে অপরিচিত নহেন। এক সময়ে তাঁহার লিখিত কবিতা প্রবাসী, বিচিত্রা, উত্তরা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষর আধুনিক ছন্দে রচিত উভয়বিধ কবিতা আলোচ্য পুস্তকখানিতে আছে। কবিতাগুলিতে তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট। এগুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে। রসিক সমাজে পুস্তকখানির আদর হইবে।

৫৭৬।৫৩

কলিকা—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। এস কে পালিত এণ্ড কোং, ৮, শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।।০ আনা।

ছোট ছোট কবিতায় ভাবগর্ভ উপদেশ সরস এবং সহজ ভাষায় বিকাশ করাই কবিতা-গুলির উদ্দেশ্য। শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিত লেখকের রচনাগুলি এইদিক হইতে বেশ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। কিশোর চিত্তে আনন্দ

নীতিবোধ উজ্জীবনের পক্ষে কবিতাগুলি য্য করিবে।

৫৬২।৫৩

বনী

শ্রীশ্রীমা—শ্রীতমোনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নীল ভঞ্জ কর্তৃক সাধারণ সাহিত্য সংস্থা, কাশী বসু লেন, কলিকাতা হইতে শিত। মূল্য ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদা দেবীর শত-র্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে পুস্তকখানি স্বরূপে নিবেদিত হইয়াছে। ডক্টর কালি-নাগ পুস্তকখানির একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা খয়া দিয়াছেন। ঠাকুরের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের , যিনি যেভাবে বলেন, তাহাই মধুর। কার সমগ্র অন্তর দিয়া মায়ের পাদপদ্মে পচার নিবেদন করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থ-ন মধুর হইতেও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। বাহুল্য, ঠাকুরকে ছাড়া শ্রীশ্রীমায়ের কথা যায় না, আবার মাকে ছাড়িয়া ঠাকুরের ম্যাও কীর্তন করা সম্ভব নয়। গ্রন্থকার যুগল-লীলারসের বিস্তার সাধন করিয়া-। শুদ্ধ অনাবিল ভাবের যে প্রতিবেশটি কী করিয়া তিনি শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-কে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন, হাতে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের চয় পাওয়া যায়। ভাবের প্রবাহ ধারার মত বহিয়া চলিয়াছে। কোথায়ও হার গতিতে আড়ষ্টতা দেখা যায় নাই। ড়তে পড়িতে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীশ্রীমায়ের তোবাৎসল্য কৃপা-মাধুর্য অন্তরে আসিয়া র্শ করে এবং উচ্চনীচ সকলের প্রতি জননী রদা দেবীর আত্মভাবনার শুভ্রালোকচ্ছটায় প্রাণ উদ্ভাসিত হয়; শ্রীশ্রীমায়ের মধুর সিটি চোখের সামনে জাগে। উদার মাতৃভাবের ভার সাধন এবং সমাজ-জীবনে তাহা প্রসারিত করিয়া নারীর আদর্শ, নারীর দর্শ, ভারতীয় সাধনার মূল, আধ্যাত্মিকতা ত্যাগের আদর্শ প্রকটিত করাই শ্রীশ্রীমায়ের লীলার তাৎপর্য। গ্রন্থকার সেই তাৎপর্যের প্রতি শবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার ধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ছাপা, বাঁধাই, চ্ছদপট সবই সুন্দর।

৫৬৮।৫৩

স্তব-কুসুমাঞ্জলি বা শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ-বন্দনা—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫৲ টাকা।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ পরম ভক্ত এবং সাধক পুরুষ। সাধনার উচ্চস্তরে ইনি অধিরূঢ় হইয়া সর্বজনশ্রদ্ধেয় আসন অধিকার করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র ইঁহার যশোরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন এই পরম বৈষ্ণবের দ্বিষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন-স্বরূপে ভক্ত, সাধক এবং মনীষিবর্গের রচনা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। প্রেমিক সাধকের পুণ্যজীবনের এই মহিমা পাঠে চিত্ত পবিত্র হয়, মন-প্রাণে অনাবিল আনন্দরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, সম্বুদ্ধ মতিলাল রায়, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ডক্টর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ইঁহাদের বিরচিত প্রশস্তিতে এই মহাপুরুষের সাধনার রহস্য অনেকখানি উন্মুক্ত হইয়াছে। নাম-প্রেমে বিভোর ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের এই প্রশস্তি পুস্তকখানি অধ্যাত্মপিপাসু নর-নারীর প্রীতি বর্ধন করিবে এবং তাঁহারা ভাগবত জীবনের উচ্চতম আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুন্দর। প্রচ্ছদপট শোভন এবং কয়েকখানি ফটো চিত্রে পুস্তকখানির সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

৫৭৩।৫৩

মহামানব—সাবর্ণ প্রণীত। শ্রীচুণীলাল রায়চৌধুরী, পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর হইতে প্রকাশিত।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী। গ্রন্থকার জীবনীকে সূত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার জীবনাদর্শ পুস্তকখানিতে অভিব্যক্ত করা হইয়াছে এবং তাঁহার উপদেশের কিছু কিছু সংগ্রহ পুস্তকখানিতে পাওয়া যায়।

৫৫৭।৫৩

শ্রীশ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের লীলা মাধুরী (সূচক)। শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান—ভাগবত ভবন, ১০২।৩, বকুল বাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ৷৹ আনা।

সূচক কীর্তন বলিতে গুণকীর্তন বুঝায়। বৈষ্ণব ভক্ত এবং মহাজনগণের তিরোভাব তিথিতে সাধারণতঃ ইহা কীর্তিত হইয়া থাকে। সূচক কীর্তনের বিশেষ একটি ধারা আছে। ইহাতে সাধকের জীবনলীলা সূত্র-স্বরূপে গীতিচ্ছন্দে নিবদ্ধ করা হয়। ভাবকে সংক্ষেপের মধ্যে জমাইয়া অনুধ্যানে জীবন্ত এবং মর্মস্পর্শী করাতেই সূচক কীর্তনের সার্থকতা। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাজনের এই সূচক কীর্তন সে হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বাবাজী

...র অনুরাগিগণ পণ্ডিত দ্বিজপদ ...ামীর গভীর ভক্তিরসানুসিক্ত রচনা আস্বাদন করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

গানের বই

অমিয়-গীতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র গণচৌধুরী প্রণীত। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এস-সি এবং শ্রীমিলনচন্দ্র সরকার বি কম কর্তৃক ৫৭নং ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

গানের বই। শতাধিক গান আছে—রাগ প্রধান, আধুনিক, পল্লীগীতি, কীর্তন, ভজন—বলিতে গেলে সব রকমের গান। অনেক-গুলি গানে অনুকরণের ছাপ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়; ইহা ছাড়া বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনারও অভাব। তবে কতকগুলি গান ভাব, ভাষা ও ছন্দে জমিয়া উঠিয়াছে। 'যদি কোন শিল্পী-কণ্ঠে আমার এই সকল গানের কয়েকটিও ধ্বনিত হয়, তবেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক মনে করবো', লেখক এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে কিনা বলা কঠিন, কারণ সংগীতের প্রচার ও প্রসার জনমানসে সংবেদন জাগাইবার উপযোগী যিনি সংগীতকার, তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। আর্ট পেপারে ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই। ৫৭৪।৫৩

ছোটগল্প

গণ্ডূষ—জ্যোতিকুমার প্রণীত। শ্রীসুকুমার বসু কর্তৃক ৭২-১, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

ছয়টি ছোট গল্প। গল্পগুলি অনেকটা একই ভাবের। তবে লেখকের লিখিবার হাত আছে, বোঝা যায়। 'চিহ্ন' নামক গল্পটি বেশ জমিয়াছে। ৫৬৩।৫৩

সোভিয়েটের অর্থনীতি

AN ESSAY ON SOVIET ECONOMIC DEVELOPMENT: By Amlan Datta. Leftist Book Club. 24. Chowringhee, Calcutta-13. Price Re. 1|-.

অর্থনীতির শাস্ত্রজ্ঞানে ও অধ্যাপনায় শ্রীঅম্লান দত্তের খ্যাতি আছে। 'ডেমোক্রেসির স্বপক্ষে' তাঁর বইখানি তাঁর সে খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে এবং আইনস্টাইন-প্রমুখ মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। বর্তমান পুস্তিকাটি চল্লিশ পৃষ্ঠায় সোভিয়েট রাশিয়ার আর্থনীতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত একটি মনোগ্রাফ্ বা প্রবন্ধ-বিশেষ। সোভিয়েট অর্থনীতিক ব্যবস্থা নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়েছে এবং অনেকেই এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সোভিয়েট অর্থনীতিক সমর্থকের দল যে অভাবিত সাফল্য দাবী করেন, গ্রন্থকার তাঁর বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজস্ব যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করে বলেছেন যে, সোভিয়েট সরকার-প্রদত্ত তথ্য, সংখ্যাতত্ত্ব এবং বাজেটের ওপর অযথা গুরুত্ব অর্পণ করা যুক্তিসংগত নয়। এবং সেই ভিত্তিতে সোভিয়েট অর্থনীতির সংগে অ-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতির তুলনামূলক সমালোচনা করাও সমীচীন নয়। গ্রন্থকারের বক্তব্য অথবা প্রতিপাদ্য সমালোচনা-সাপেক্ষ। মরিস ডব্-এর মতপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত এ পুস্তিকা বামপন্থী কোনও কোনও পাঠক-সমালোচকের হয়তো বিরক্তি উদ্রেক করবে। Collectivisation-এর বিরোধী যুক্তির পরিণাম কি, শেষ পর্যন্ত কৃষি-কর্মীর সমাজ-চেতনা হেগেলের দার্শনিক সংজ্ঞার পর্যায়ে পড়বে কিনা—এ নিয়ে মতদ্বৈধের যথেষ্ট অবসর রয়েছে। তবু গ্রন্থকার যে একটি সুলিখিত পুস্তিকায় সোভিয়েট অর্থনীতির আলোচনা করেছেন মুদ্রা-নীতির স্ফীত তথ্যের দিক থেকে নয়, বাস্তব কর্ম ও কৃতিত্বের দিক থেকে, এটা আনন্দের কথা। বৈদেশিক অর্থনীতির অপক্ষপাত আলোচনাই সকলের কাম্য। ৩৭৯।৫৩

বিবিধ

গঠন কর্ম ও গঠনকর্মীর প্রাণধর্ম—শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত প্রণীত। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক ৩৩।২ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ আনা।

গ্রন্থকার বিশিষ্ট সংগঠন কর্মী। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মিস্বরূপে তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপীড়িত নোয়াখালিতে সেবাকার্যে গিয়াছিলেন। পরে পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের সহকর্মী হইয়া বরিশালে ছিলেন। গ্রামকে ভিত্তি করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-জীবন গঠনকেই তিনি আদর্শরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং নারী সমাজের উন্নয়নের উপর পুস্তকখানিতে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার আদর্শ বর্তমান প্রয়োজনের পক্ষে উপযোগী। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৫৬৯।৫৩

সংক্ষিপ্ত প্রবাদ রত্নাকর—শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সেন ব্রাদার্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ৪৲ টাকা।

গ্রন্থকার বাঙলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যগুলির সংগ্রহ এবং সেগুলির প্রয়োগ-পদ্ধতিও পুস্তকখানিতে দৃষ্টান্তযোগে বিবৃত করিয়াছেন। বঙ্গভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই পুস্তকখানি বিশেষ কাজে আসিবে। ৫৫৮।৫৩

গ্রহরত্নের কথা—শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। শ্রীসুশীলকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক ৪০, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—২৷৷০ টাকা।

মানুষের জীবনের সহিত গ্রহগণের প্রভাব এবং তাহার ফলে মানুষের প্রকৃতি, মনোভাব ও শারীরিক সুস্থতা, অসুস্থতার বৈসাদৃশ্য কিরূপে ঘটে, পুস্তকখানিতে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকের মতে মস্তিষ্কের নয়টি কোষে নয়টি গ্রহের কাজ চলে। বর্ণের ধারা ধরিয়া গ্রহরাজির এই প্রভাব কাজ করে। এজন্য শারীরিক সুস্থতা বিধানের জন্য গ্রহরত্ন ধারণ প্রয়োজন হইয়া থাকে। পুস্তকখানির সাহায্যে গ্রহরত্ন ধারণের কাজ চলিবে লেখকের ইহাই অভিমত। এ সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তিবর্গ পুস্তকখানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। সুন্দর প্রচ্ছদপট, ছাপা ও কাগজ ভাল। ৫৬৪।৫৩

পণ্ডিত ওংকারনাথ সঙ্গে তবলায় পণ্ডিত অনোখেলাল ও বেহালায় শ্রী ভি জি যোগ

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

পঙ্কজ দত্ত

অনুষ্ঠানের কথা ধরতে গেলে নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনী শ একটা জাঁক করার মতো ব্যাপার হয় তিবারই। প্রথম বছর থেকেই সর্বজন-শ্রুত মনীষী ও দেশনায়কদের হাতে য়ে সম্মেলনের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন য়। গত বছর এই সম্মিলনী সর্বভারতীয় ীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম য় স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নে হাজির করে। এতে আরো স্পষ্ট-াবেই বোঝা গেল যে, ভারতীয় ঙ্গীতের সংরক্ষণ, প্রচার' ও প্রসার এবং নই সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্‌দের সম্মান ও াহায়তা দেবার জন্য রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবেই চেষ্ট। সেকথা এবারের সম্মিলনীর দ্বোধক ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকারও ভালো-াবেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তা'ছাড়াও বতার ও তথ্যমন্ত্রী আরও কতকগুলি রকারী কথাও শুনিয়েছেন।

পণ্ডিত নন্দীশঙ্কর অগ্নিহোত্রীর ঙ্গলাচরণের পর পূর্ববর্তী বৎসরের মতো এবারও বন্দে মাতরম্ গান করেন পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর এবং এবারও তিনি বিষ্ণু দিগম্বরের সুরেতেই গান করেন। এটা রাষ্ট্র অনুমোদিত সুর নয় এবং কোন রাষ্ট্রমন্ত্রী যে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন সেখানে এই সুরটা ব্যবহার করে সৌজন্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায় কিনা একবার ভেবে দেখা দরকার; গত বছরের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এই বিষয়ে মন্তব্য করতে হয়েছিল। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পদে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত গিরিধারীলাল মেহতা উপস্থিত সুধিবৃন্দকে স্বাগতম জানান। সম্মিলনীর কার্যকরী সমিতির সভাপতি সার বিজয়-প্রসাদ সিংহ রায় তাঁর বক্তৃতায় সম্মিলনী এবং সম্মিলনীর চেষ্টায় পরিচালিত ভূপেন্দ্র মেমোরিয়াল সঙ্গীত বিদ্যালয় ও কস্তুরবা বালিকা সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ক জর কথা উল্লেখ করেন।

সম্মিলনীর প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীদামোদর-দাস খান্না অনুষ্ঠানের সভাপতি, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে বাঙলাতে বক্তৃতা দেন। শ্রী খান্না বলেন যে, এলাহাবাদে শ্রী ডি আর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মিলনী দেখেই তিনি কলকাতায় অনুরূপ সম্মিলনীর উদ্যোগে ব্রতী হন এবং তাঁর বরাবরই অভিলাষ ছিল, শ্রী ভট্টাচার্যকে এই সম্মিলনীতে উপস্থিত দেখবার; এবার তাঁর সেই অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে অনুষ্ঠানে শ্রী ভট্টাচার্য উপস্থিত হওয়ায়। কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ করণ সিং, রাজস্থানের রাজপ্রমুখ, জয়-পুরের মহারাজা, বম্বের বিচারপতি চম্পকলাল প্রভৃতি আরও বিশিষ্ট ক'জনের সম্মিলনীতে যোগদানের জন্যই উপস্থিত হওয়ার কথা শ্রী খান্না উল্লেখ করেন। ডাঃ কেশকার সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি বলেন বেতার ও তথ্যমন্ত্রীর নাম বালকৃষ্ণ; একদা এক বালকৃষ্ণ মুরলীধ্বনিতে সমগ্র বিশ্বকে যেমন মোহিত করেছিলেন, তেমনি মন্ত্রী
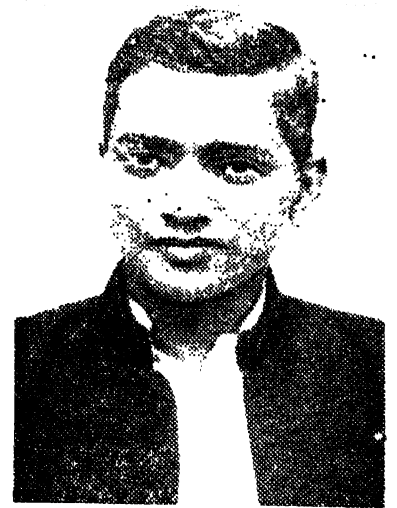
পণ্ডিত দত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর
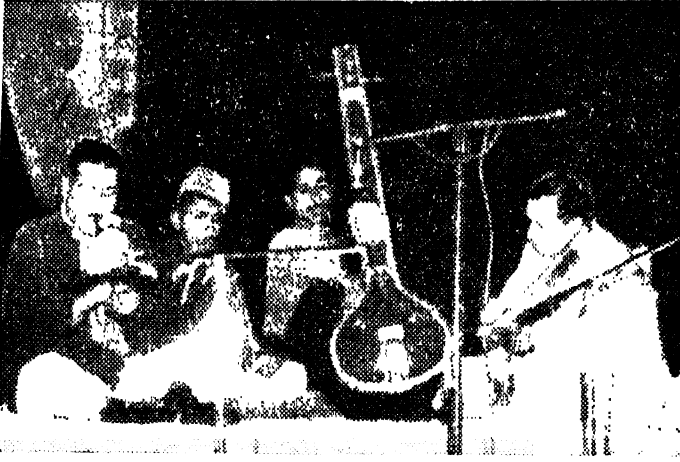
সম্মিলিত যন্ত্রসংগীতের আসরে মিয়াঁ বিসমিল্লা এবং শ্রী ভি জি যোগ

ডাঃ বালকৃষ্ণ কেশকারও সংগীতকে তেমনিভাবে প্রসারিত হওয়ার সহায়তা দান করবেন।

কলকাতা শহরের পক্ষ থেকে মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ডাঃ কেশকারকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। ডাঃ কেশকার তাঁর লিখিত ভাষণ থেকে ভারতীয় সংগীতের মহান্ ঐতিহ্যের কথা অবতারণা করে বলেন যে, আজ কিন্তু অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংগীত উন্নতি করে আসছে; দেশে কতো রাজত্ব বদলেছে কিন্তু ভারতীয় সংগীত আগের মতোই দীপ্ত হয়ে রয়েছে। মোগল আমলে ভারতীয় সংগীত রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে, কিন্তু ইংরেজ আমলে তা বন্ধ হয়ে যায়, আর সেই জায়গায় প্রভাব বিস্তার করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি; তাতে ভারতীয় সংগীতের ক্ষতি হতে থাকে। দেশীয় রাজন্যবর্গ কিছু কিছু জিইয়ে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু আপামর জনসাধারণের জীবন থেকে সংগীত দূরে সরে যায়। দেশের নবজাগরণকালে পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখ মনীষিবৃন্দ ভারতীয় সংগীতকে আগেকার মতো জনসাধারণের জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ডাঃ কেশকার ভারতীয় সংগীতের বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, কারণ কোন সুপরিকল্পিত পথ ধ'রে যাওয়া হ'চ্ছে না। তিনি হাল্‌কা ধরণের সংগীতের প্রতি অনুরক্তির নিন্দা করে বলেন, গানবাজনার প্রয়োজন কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের জন্যই নয়, সংগীত মানুষের মনের ভাব প্রকাশের উপাদান। হাল্কা সুর স্থূলে ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু গভীর ভাব ফুটিয়ে তুলতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের দরকার। বর্তমানে দ্রুত লয়ের সংগীতের দিকে বেশী ঝোঁকেরও ডাঃ কেশকার নিন্দা করেন।

এ বছরের নবাগতা শিল্পীদের একজন ডাঃ সুমতী মুতাতকর

উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমঝদার শ্রোতা গ'ড়ে তোলার কথা প্রসঙ্গে ডাঃ কেশকার দক্ষিণ ভারতীয় জনসাধারণের সংগীত প্রিয়তা ও সংগীতের প্রতি আদর্শ শ্রদ্ধার প্রশংসা ক'রে বলেন, দক্ষিণে গান-বাজনা শোনার জন্য হাজার হাজার লোক নিবিষ্ট হ'য়ে বসে থাকে, আর সে জায়গায় উত্তর ভারতের সংগীতের জলসায় লোকে আসে বেশ মৌজ করে বসে গাল গল্প করার সুবিধে হবে বলে। ডাঃ কেশকার সংগীতকে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তোলার কথায় বলেন যে, প্রতি পরিবারেই যেন সংগীতের চর্চা থাকে এবং তা প্রবর্তিত করতে দরকার হ'লে সামাজিক চাপও যেন প্রয়োগ করা হয়। তিনি বলেন, এখন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার দিন নেই; এখন সে দায়িত্ব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। ডাঃ কেশকার আশ্বাস দেন এই বলে যে, রাষ্ট্র আজ সে দায়িত্ব গ্রহণে তৎপর হয়েছে এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের পুনরুদ্ধারই শুধু নয় তার সুপ্রচারেরও চেষ্টা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে বেতারের একটি মুখ্য অংশ রয়েছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ ও লঘু সংগীতের বিরোধের কথা উল্লেখ করে বলেন সব মানুষ একই রকম হয় না। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রই উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরাগী। তিনি বলেন, ভগবানের আরাধনা থেকেই সংগীতের উদ্ভব। সংগীতের আরও একটা মস্ত গুণ হচ্ছে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোককে একই আসরে সম্মিলিত করা।

অধিবেশন বিবরণ

নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি যেমন জাঁকিয়ে হয়, তেমনি নিষ্প্রভ হয় সংগীতের সাধারণ

দঙ্গল সংগীতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ওস্তাদ আলি আকবর, সঙ্গে তবলায় বামে পণ্ডিত অনোখেলাল এবং ডানদিকে ওস্তাদ কেরামৎ আলি

ধবেশনগুলি। ভারতের বহু খ্যাতনামা ল্পীদের কর্তৃপক্ষ নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ধকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা বসেছেন একেবারে কা প্রেক্ষাগৃহে। শ্রোতাতে আসর জম-াটি না থাকলে গানবাজনায় শিল্পীর । দমে যায়। কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী ই নিয়ে আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন। ক্ষাগৃহভর্তি শ্রোতা পান এমন ভাগ্যবান ল্পী এ আসরে খুব কমই। এ আসরের াতারা সব চেয়ে অবজ্ঞা দেখান স্থানীয় ল্পীদের ক্ষেত্রে। স্থানীয় শিল্পীর নাম ড়লেই প্রেক্ষাগৃহ প্রায় খালি হয়ে যায়, বং যাঁরা বসে থাকেন তাদেরও অনেকে াততালি দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করেন।

বচেয়ে ভাগ্য ভালো নৃত্যশিল্পীদের; দের অনুষ্ঠানের সময়েই কেবল প্রেক্ষা-গৃহে ঠাসাঠাসি লোক জমে যায়। বারেও সবচেয়ে জনসমাবেশ হয় কটি াচের অনুষ্ঠানে এবং 'মীরাবাঈ' ও ভক্ত কবীর' নৃত্যনাট্য দুটির অভিনয়-ালে। লোকের প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে চলে াওয়ার আরও একটা কারণ বেতারে প্রচার ব্যবস্থা। এবার তিনটি অধি-বেশনের শেষদিকের অনুষ্ঠান আকাশ-বাণীতে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং

বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন বালক শিল্পী শ্রীমণিলাল নাগ

ঐভাবে বাড়ীতে বসে সংগীত উপভোগের সুযোগ পাওয়ায় স্বতঃই অনেকে প্রেক্ষা-গৃহ ছেড়ে চলে যায়।

সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ প্রেক্ষাগৃহের বাইরের জনসাধারণকেও অধিবেশনে পরিবেশিত সংগীত উপভোগের একটি চমৎকার ব্যবস্থা করে দেন। অনুষ্ঠানক্ষেত্র রক্সী সিনেমার সংলগ্ন খানিকটা খোলা জায়গায় তাঁরা একটা বড়ো স্পীকার বসিয়ে দেন। হাজার কতক লোক ওখানে দাঁড়িয়ে, কাগজ পেতে বসে গানবাজনা শুনেও যাচ্ছিল কিন্তু চারদিন চলার পর হঠাৎ বাধা এলো পুলিশের তরফ থেকে। স্থানীয় অফিসার রাত দশটার পর স্পীকার বন্ধ করে দিলেন পঞ্চম দিন থেকে। বাইরে লোকে অত্যন্ত শান্তভাবেই কোনরকম ঝামেলার সৃষ্টি না করেই গানবাজনা শুনছিল কিন্তু তা যে কি কারণে পুলিস কর্তৃপক্ষের কাছে অসহনীয় হয়ে দাঁড়ালো বুঝে ওঠা মুশকিল। শহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্পীকারের ব্যবস্থা করে আকাশবাণীতে প্রচারিত অংশ

স্বনামধন্যা শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার

শহরের লোককে শোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যও সম্মিলন কর্তৃপক্ষ প্রশংসনীয় হন।

২৫শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতদিনে মোট ন'টি অধিবেশনের মধ্যে সত্যিই জমাটি আসর বলতে হয় শেষদিন। সেদিন অধিবেশন ছিল দুটি, সকালে এবং সন্ধ্যায়। কিন্তু সকালের অধিবেশনটি এতো দীর্ঘ হয়ে পড়ে যে, মাঝে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক বিরামের পরই সান্ধ্য অধিবেশন আরম্ভ হয়ে শেষ হয় পরদিন সকালে। অর্থাৎ দুটো অধিবেশন মিলিয়ে এক নাগাড়ে প্রায় বাইশ ঘণ্টা ঐ আসর থেকে সংগীত পরিবেশিত হয়। কলকাতায় এতো দীর্ঘ অধিবেশন বড়ো একটা শোনা যায়নি। সংগীত পরিবেশনের দিক থেকেও এমন শিল্পসমৃদ্ধ অধিবেশনও ক্বচিৎই সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে এই অধিবেশনের জন্যই এবারকার সম্মিলনী স্মরণীয় হয়ে থাকবে কলকাতার সংগীত রসিকদের মনে।

প্রথম অধিবেশন

উদ্বোধন পর্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হবার পর সংগীত সূচী আরম্ভ হয় পুণার শ্রীঅম্বাদাসের মৃদঙ্গ বাজনা দিয়ে। সাধারণত আসর আরম্ভ হয় ধ্রুপদ গানে, এখানে মৃদঙ্গ সে স্থান গ্রহণ করলো এবারে। এরপর অনুষ্ঠানসূচীতে সামান্য পরিবর্তন করে এই বছর তানসেন বিষ্ণুদিগম্বর বৃত্তি প্রাপ্তা পুণার শ্রীমতী মীনাক্ষী ত্রেসীকে খেয়াল গাইতে বসানো হয়। বিলম্বিত লয়ে গৌড় মলহার রাগে তিনি একখানি গান শোনান যা উদ্বোধন অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়নি মোটেই। আসরের ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা এনে দেন এরপরই শ্রীদত্তাত্রেয় বিষ্ণু পালুসকর এসে। কলকাতার আসরের অতি প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে শ্রীপালুসকর অন্যতম। কেদারা রাগে তিনি একখানি খেয়াল আরম্ভ করেন। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম গাওয়া, মিষ্টি গলা। খেয়ালের পর যথারীতি তিনি মীরার ভজন শোনান 'পাওজী মৈনে রামরতন ধন পাও।" পালুসকরের আরো একটা গুণ গানের সময়ে সংগতীয়াদেরও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার সুযোগ করে দেওয়া। তার সঙ্গে ছিলেন তবলায় পণ্ডিত অনোখেলাল, বেহালায় শ্রী যোগ এবং সারেঙ্গীতে গোপাল মিশ্র। শ্রী পালুসকর আলাদা আলাদাভাবে এদের প্রত্যেককেই সুর তোলার অবকাশ করে দেন, তাতে গানের শোভাও অনেক বেড়ে যায়। এরপরও শ্রী পালুসকরকে শ্রোতাদের অনুরোধে আর একখানি ভজন গাইতে হয়, "আঁখিয়া হরি দরশন কে প্যাসি"। আসরের আবহাওয়া বেশ ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে এরপর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ধ্রুপদ ও ধামার গানে। বাহার রাগে ধ্রুপদ শুনিয়ে তিনি ধামার শোনান আড়ানা বাহারে। বিষ্ণুপুরের শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে একখানি খেয়াল শোনান মধুমালতী রাগে, পরে তিনি হিন্দুস্তানী খেয়াল "ক্যায়া করু ন মানেরী"-র অনুসরণে পরোজ রাগে রবীন্দ্রনাথের রচনা "ডাক মোরে আজি এ নিশীথে" গেয়ে আসরে একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে রবীন্দ্রনাথের রচনা পরিবেশনে শ্রীরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রথম অধিবেশনের শেষ গায়ক ছিলেন দিল্লীর শ্রীপ্রাণ নাথ। ইনি কিরানার খান সাহেব আবদুল ওয়াহিদ খান চিস্তী সাদরীর শিষ্য। ছোট বয়সে লাহোরে খান সাহেবের গান শুনে মোহিত হয়ে তাঁর কাছে গান শিখতে যান, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। উপর্যুপরি প্রাণনাথ তিন বছর ধ'রে খান সাহেবের কাছে ধর্ণা দিতে থাকেন এবং তারপর খান সাহেব ওর অধ্যবসায় দেখে শিষ্য করে নিতে স্বীকৃত হন। শ্রীপ্রাণনাথ কলকাতার আসরে এই

কলকাতার আসরে নবাগতা শ্রীমতী সরদারবাঈ কারাদগেকার

ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ

ম যোগদান করেন এবং সুরের বিচিত্র ন্বয়ে রাগ বিস্তারে তিনি কিরানা ঘরানার শিষ্ট্য ফুটিয়ে তুললেও তাঁর গাইবার গীর জন্য লালিত্যটা চাপা পড়ে যায়। ও কলকাতার কিরানা ভক্ত শ্রোতাদের নুরোধে প্রথম গান দরবারি কানাড়াতে য়ালের পর আরও দু'খানি গান তিনি নান। অধিবেশন শেষ হয় নাচের সের দিয়ে যার মধ্যে ছিলেন উত্তমা দে লুকদার, অনুরাধা গুহ, মিনতি গচী, বেবীরাণী এবং গোপাল পিল্লাই। ক্ষ্ণৌয়ের শম্ভু মহারাজ ও আচ্ছন মহাজের শিষ্য এবং বর্তমান কথক নৃত্যশিল্পীদের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলীর ছাত্রী অনুরাধা হ কথক নৃত্যের শিল্পরস প্রণয়নে শেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের প্রারম্ভে র শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার পরিকল্পিত নৃত্যনাট্য "মীরাবাঈ"। শ্রীমতী ঞ্জলিকা রায় চৌধুরী নাম ভূমিকায় বতরণ করেন এবং আবহ সংগীত রিচালনা করেন শ্রীরবি রায় চৌধুরী। দাঁর ভজনগুলির জন্য এই নৃত্যনাট্যটি ঙ্গীতরসিকদের আনন্দ দিয়ে আসছে ীর্ঘকাল ধরেই। নৃত্যনাট্যটি শেষ হতে দতার ও তথ্যমন্ত্রী কলকাতা ছাড়বার গে শ্রীমতী অঞ্জনাবাঈ লোলেকারের গান শানার অভিলাষ ব্যক্ত করায় এই সময়কার নুষ্ঠান সূচী একটু বদল করা হয়। শ্রীমতী লোলেকার কেদারা রাগে একখানি খয়াল এবং পরে একখানি ঠুংরী গেয়ে শানান। বিশেষ জমেনি তাঁর গান। এরপর নির্ধারিত অনুষ্ঠান সূচী অনুযায়ী বাগেশ্রীতে খেয়াল গেয়ে শোনান শ্রীমুক্তিপদ দত্ত। এই অধিবেশনে কর্ণাটি সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয় ছর নয় দশের মীনাক্ষী স্বামী ও ললিতা স্বামীকে দিয়ে। বসন্ত ও বন্ধু বররালি রাগে তাঁরা দু'খানি গান শোনান কিন্তু কোন ছাপ দেবার মতো কৃতিত্ব পাওয়া গেল না। কর্ণাটি সংগীতকেও এসব আসরে ঠাঁই দেওয়া দরকার, কিন্তু তার জন্যে আরও বড়ো শিল্পীদের এনে না বসালে কর্ণাটি সংগীতের ওপরে এ

কেরালার নৃত্যশিল্পী কমলা ও লীলা

অঞ্চলের জনসাধারণের শ্রদ্ধা জাগবে না। দীর্ঘকাল পর শ্রীশচীন দাস (মতিলাল) আসরে বসেন। প্রথমে তিনি চন্দ্রকোষ রাগে খেয়াল এবং তারপর ঠুংরী গান "বলো রাতি কঁহা থা" গেয়ে প্রেক্ষাগৃহকে এমন মাতিয়ে তোলেন যে, শ্রোতারা তাঁকে আরও গাইবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। সে সময় বেতারে অনুষ্ঠান প্রচারের সময় এসে পড়ায় কর্তৃপক্ষ মতিলালের গান আর চালানো সম্ভব নয় জানান। কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের অনুরোধ শুনতে রাজী না হওয়ায় মতিলাল একখানি নানকের ভজন গেয়ে শোনান। স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে শ্রীশচীন দাসের একটি উঁচু আসন আছে, বিশেষ করে ঠুংরী গানে তার সঙ্গে তুলনা করবার মতো শিল্পী বোধ হয় ভারতে খুব কমই আছে।

বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার আরম্ভ হয় দিল্লী আকাশবাণী কেন্দ্রের ডাঃ সুমতী মুতাতকরের গান দিয়ে। শ্রীমতী মুতাতকর প্রথমে সিন্ধুরাতে সরস্বতী বন্দনা করে হাম্বীর এবং খাম্বাজে দু'খানি খেয়াল শোনান। ওস্তাদ কেরামৎ আলির তবলা এবং শ্রী যোগের বেহালা সংগতের জোরে শ্রী মুতাতকরের গান চলে গেলো একরকম: তা নাহ'লে উল্লেখ করার মতো কোন শিল্পকৃতিত্বই তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। বাঁধাধরা ছকটানা গাওয়া। দিল্লীর শ্রীমতী শরণরাণী মাত্র গত বৎসর তানসেন-বিষ্ণু দিগম্বর বৃত্তি পেয়ে কলকাতার আসরে আগমন করলেও তিনি এখানকার সংগীতরসিকদের মনে বেশ ছাপ রেখে রেখেছেন। এই অধিবেশনে তিনি হেমন্ত রাগে সরোদ বাজিয়ে শোনান। মিষ্টি হাত, দ্রুত লয়ে ঝালার কাজেও সুদক্ষ কিন্তু এখনও ছন্দের দিক থেকে সুরকে শোভময় করে তোলার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; তবুও মনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করার একটা স্বতঃস্ফূর্ত রেশ তাঁর বাজনার মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁর বাজনাকে আরও জমাট করে তোলে পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদের তবলা সংগত। দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ শিল্পী ছিলেন ওস্তাদ নিসার হোসেন খান। রামপুর দরবারের গায়ক ওস্তাদ ফিদা হোসেন খাঁর কাছ থেকে ইনি প্রাচীন দুর্লভ রচনাবলী আয়ত্ত করেছেন। তার গমক, বোলতান ও সরগমের সাবলীলতা রসিক মনকে মোহিত করে তোলে। বেশ নিটোল ভরাট কণ্ঠস্বর তাঁর। এ অধিবেশনে যোগ রাগে তাঁর খেয়াল গান তাঁর ঘরোয়ানার ঐশ্বর্যকে সামনে তুলে ধরলেও তেমন যেন জমতে পারলো না। এ সময়ে প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহও শিল্পীর মনকে দমিয়ে দিয়েছিল হ'তে পারে।

তৃতীয় অধিবেশন

রবিবার, ২৭শে ডিসেম্বর সকালের অধিবেশন আরম্ভ হয় শ্রীব্রজগোপাল

সেনের দিলরুবা বাজনা দিয়ে। আগের রাত্রে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর সকালের রাগ শোনাতে ইচ্ছুক বলে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে তাঁর গান দিয়েই। কিন্তু তবুও নির্ধারিত সময়ে খুব বেশী শ্রোতা উপস্থিত না হতে পারাতেই বোধ হয় গোড়ায় দিলরুবা বাজনা দেওয়া হয়। শ্রী সেন জৌনপুরী ও ভৈরবীতে প্রায় আধ ঘণ্টা তাঁর বাজনা শোনাবার পর পণ্ডিত ওংকারনাথ আসরে এসে বসেন এবং কোমল আশাবরীতে খেয়াল আরম্ভ করেন। এক ঘণ্টারও বেশীক্ষণ গানখানি তিনি গেয়ে যান এবং সুললিত ছন্দের কাজ দেখিয়ে মুহুর্মুহু শ্রোতাদের কাছ থেকে করতালি লাভ করতে থাকেন। খেয়ালের পর শ্রোতাদের অনুরোধ প্রাবল্যে একখানি ভজন শোনান "কনহৈয়া ঝিঁঝরিয়া নৈয়া, গহরি নদীয়া"। এই অধিবেশনে সবচেয়ে চমকপ্রদ কৃতিত্ব প্রকাশ করেন ওস্তাদ আলি আকবর সরোদ বাজিয়ে। সঙ্গে তাঁর শিষ্য শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বসেন সেতার নিয়ে এবং তবলা সংগতে বসেন পণ্ডিত অনোখেলাল মিশ্র। রাগ নট ভৈরোঁ। সরোদ-সেতারের মোহনীয় সুরে তান সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকে পুলকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে। দ্বিতীয়টি বাজানো হ'লো মুলতানি গৎ। কিন্তু তাতেও যেন শ্রোতাদের তৃপ্তি পরিপূর্ণ নয়, আরও বাজাবার জন্য প্রবল অনুরোধ হলেও লালাবাবু অনুনয় করায় এ'রা শ্রোতাদের কাছ থেকে ছাড়া পেলেন। এ'দের সঙ্গে পণ্ডিত অনোখেলালের সংগত বাজনা জমে ওঠায় বিশেষ সহায়ক হয়। শেষ অনুষ্ঠান হয় শ্রীমতী অঞ্জলিবাঈ লোলেকারের ভীমপলশ্রী রাগে খেয়াল গান। গায়িকার শিল্পীজনোচিত মনোরম ব্যক্তিত্বই আছে কিন্তু গান তেমন জমাতে পারলো না, যদিও এটা তাঁর এবারকার দ্বিতীয় বৈঠক।

চতুর্থ অধিবেশন

কেরালা ভগ্নীত্রয় কমলা, লীলা ও লক্ষ্মীর নাচ দিয়ে চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। কলকাতায় সাধারণ আসরে নতুন শিল্পী এরা। এদের নাচের মধ্যে ললিতভঙ্গী আছে, ছন্দের কাজ আছে যা সহজেই মনে দোলার সৃষ্টি করে দেয়।

ওস্তাদ আসাদ আলি খান

চতুশ্রম, ত্রিশ্রম, মিশ্রম ও রূপকম তালে তাঁরা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাচ দেখান। প্রায় সবই ভারত নাট্যম পদ্ধতির নাচ; ওরই মধ্যে ওরিয়েণ্টাল আখ্যাত লঘু ভঙ্গীর কয়েকটি মিশ্র ভঙ্গীর নাচও রয়েছে—না থাকলেই ভালো হতো অন্তত এই ক্ল্যাসিক্যালের আসরে।

চতুর্থ অধিবেশনে একটি বিস্ময়কর প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় ১৪ বৎসর বয়স্ক সেতারবাদক শ্রীমণিলাল নাগের মধ্যে। কলকাতার খ্যাতনামা সেতারিয়া শ্রীগোকুল নাগের পুত্র মণিলাল সোহিনী ও খাম্বাজ বাজিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে তাঁর শিল্পকারিতায় স্তম্ভিত করে দেন। তাঁর সঙ্গে তবলা সংগতে পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদও বাজনার শোভা ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক হন। আর এই অধিবেশনে সেতার বাজিয়ে শোনান ওস্তাদ মুস্তাক আলি খান। তার কেদারা, আড়ানা ও খামাজ শ্রোতাদের কাছ থেকে মুহুর্মুহু প্রশংসা লাভ করে। গানের দিক থেকে এ আসরের শেষ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। তিলক কামোদে সেদিনকার তাঁর খেয়াল গান দীর্ঘকাল মনে অনুরণিত হয়ে থাকবে। দেশ, বেহাগ ও কামোদের সংমিশ্রণে তিলক-কামোদ রাগটি রচনা করেন তানসেনের কন্যা সরস্বতী দেবীর বংশের পিয়ার খান। শোনা যায়, একদা গ্রামের পথ দিয়ে ভ্রমণকালে পিয়ার খান এক গ্রাম্য রমণীকে গম ভাঙতে ভাঙতে একটা বিচিত্র সুরে গুঞ্জন করতে শুনে সেই অনুপ্রেরণায় তিলোক-কামোদ রচনা করেন। এইদিন আর গান শুনিয়ে খুশী করেন শ্রী পালুসকর। বিলম্বিত লয়ে দরবারী কানাড়াতে খেয়াল শোনাবার পর তিনি দ্রুত লয়ে আড়ানাতে আর একখানি খেয়াল শোনান।

পঞ্চম অধিবেশন

পঞ্চম অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেন স্থানীয় শিল্পী শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী ও শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী এবং লক্ষ্ণৌয়ের শ্রী ভি জি যোগ। সরোদ বাজনায় শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী বাঙলার গর্ব করার মতো কৃতিত্বের পরিচয় দেন ছায়া-হিন্দোল রাগ বাজিয়ে। সংগীত-রসিক বংশে জন্ম শ্রী গাঙ্গুলী দশ বৎসর বয়সে কেরামৎ উল্লা খাঁর কাছে প্রথমে সেতার শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন ধীরেন্দ্রনাথ বসুর কাছে এবং এ'রই কাছে তিনি সেতার থেকে সরোদের ওপরে তাঁর ঝোঁক পরিবর্তিত করেন। একাদিক্রমে ১৮ বৎসর ধীরেন্দ্রনাথ বসুর কাছে শেখবার পর দু' বছর শেখেন কালিদাস পালের কাছে এবং গত বারো বছর ধ'রে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর কাছে শিখছেন। তাঁর বাজনার ভঙ্গীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ঘরোয়ানার ছাপ মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে। বেহালা বাজনায় শ্রী ভি জি যোগ তাঁর ছাত্রী, এই বৎসর তানসেন-বিষ্ণু দিগম্বর বৃত্তিপ্রাপ্তা কুমারী শিশিরকণা দে'কে সঙ্গে নিয়ে বসেন। প্রথমে তাঁরা মারু বেহাগ বাজিয়ে শোনান, তারপর শ্রী যোগ তাঁর নিজের রচিত রাগ-সাগর শোনান যাতে বেহাগ, মারু-বেহাগ, ভৈরবী, কাফি, পিলু প্রভৃতি সগোত্রীয় দশটি রাগকে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে। গানের দিক থেকে এ অধিবেশনে বসেন আলাদীয়া খাঁর শিষ্য শ্রী নিবৃত্তি বুয়া সরনায়ক এবং পুণার শ্রীমতী সরদারবাঈ কারাদগেকর। এ'রা দু'জনেই কলকাতায়

নবাগত। মনে করে রাখবার মতো কোন ছাপ এ'রা দিতে পারেননি। তবে এ আসরে গান জমিয়েছিলেন শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বাগেশ্রীতে খেয়াল গেয়ে। শ্রী চক্রবর্তী এখন সর্বভারতীয় পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে যে একজন তার আর একটি প্রমাণ তিনি সেদিন দিলেন। এই দিনের অধিবেশনের গোড়ার দিকে নৃত্য প্রদর্শন করেন কুমারী রত্তী মুখোপাধ্যায় ও কুমারী ভারতী সেনগুপ্তা। প্রখ্যাত কথকশিল্পী শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী তেমন সুবিধে করতে পারলেন না। শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর শিষ্যা শ্রীমতী নীহারকণা মুখোপাধ্যায়ও ইমন-কল্যাণ রাগে এ আসরে ধ্রুপদ গেয়ে শোনান।

ষষ্ঠ অধিবেশন

মঙ্গলবার ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হয় মিয়া বিসমিল্লা ও সম্প্রদায়ের সানাই দিয়ে। পূরবী রাগে মাত্র মিনিট পঁচিশের মধ্যে বাজানো শেষ হলো, কিন্তু তেমন যেন তৃপ্তি পাওয়া গেল না। তবে মিয়া বিসমিল্লা এই অধিবেশনের শেষ অনুষ্ঠানে প্রথমে মালকোষ, দ্বিতীয় একটি ঠুংরী এবং শেষে টোড়ী বাজিয়ে তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করেন এবং এইবারই প্রাণকে মাতিয়ে তোলার কৃতিত্ব তিনি প্রকাশ করেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এ অঞ্চলে নতুন রাগ বাচস্পতি শুনিয়ে তাঁর অতুলনীয় দক্ষতার পুনরাবৃত্তি করেন। বাজনা শেষ হতে আরও বাজাবার জন্য শ্রোতাদের প্রচণ্ড অনুরোধে তিনি মিশ্র গারাতে গৎ শোনান কিন্তু সেটা নেহাৎই লোক ভোলানোর জন্যে। ফৈয়াজ খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্তাদ আসাদ আলি খাঁ নট-বেহাগ শোনান দু'তিনটি গানের কথা নিয়ে যার মধ্যে রয়েছে "ঝন ঝন ঝন পায়েল বাজে" এবং ওস্তাদ আসাদ আলি এইভাবের গাওয়াকে জোড়ী খেয়াল বলে আখ্যাত করেন। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বসন্ত রাগে একখানি খেয়াল এবং একখানি ঠুংরী গান তাঁর সাবলীল ভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে। এছাড়া গানে ছিলেন শ্রীবিজনকুমার বসু। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সুর-শৃঙ্গারে নাগধ্বনি কানাড়া শোনান। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ছিল কেরালা ভগ্নী-দ্বয়ের নৃত্য।

শ্রীনিবৃত্তি বুয়া সরনায়েক

সপ্তম অধিবেশন

ভক্তিমূলক নৃত্যনাট্য "ভক্তকবীর" দিয়ে সপ্তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার এ নৃত্য-নাট্যখানিরও পরিকল্পয়িতা। এতেও প্রধান অংশে অবতরণ করেন শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী এবং আবহ-সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীরবি রায় চৌধুরী। এই অধিবেশনের উজ্জ্বলতম আকর্ষণ ছিল সম্মিলিত যন্ত্রসংগীত। আগে ঠিক ছিল, এই দংগল সংগীতে অংশ গ্রহণ করবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আলি আকবর, শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী ও শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পণ্ডিত রবিশঙ্করের ইচ্ছায় আসরে যোগদান করেন তিনি নিজে এবং সঙ্গে ওস্তাদ আলি আকবর। এক শ্রেণীর শ্রোতাদের মধ্যে থেকে সূচীর এই পরিবর্তনের জন্য প্রবল আপত্তি ওঠায় এবং শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলীর বাজনা শুনতে চাওয়ায় সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন, পরদিন শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী ও ওস্তাদ মুস্তাক হোসেনের সম্মিলিত বাজনার আয়োজন করা হয়েছে। সপ্তম অধিবেশনের সম্মিলিত বাজনা পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ওস্তাদ আলি আকবরের সঙ্গে সঙ্গত করেন পণ্ডিত অনোখেলাল ও ওস্তাদ কেরামৎ আলি। প্রথমে বাজানো হয় মাজ খাম্বাজ এবং পরে ভৈরবী ঠুংরী। শেষ পর্যন্ত বাজনা তবলার শুধু দাপাদাপিতে পরিণত হয়ে সমাপ্ত হয়। এ ধরণের সম্মিলিত যন্ত্রসংগীতে রোমাঞ্চ আসে কিন্তু সৌন্দর্য ও সংগীতমাধুর্য চাপা পড়ে থাকে। এছাড়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীশিবকুমার চট্টোপাধ্যায় গান শোনান।

অষ্টম ও নবম অধিবেশন

শেষ অধিবেশন দুটি ধরতে গেলে একটি বাইশ ঘণ্টার দীর্ঘ অধিবেশনে পরিণত হয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় আরম্ভ হয়ে অষ্টম অধিবেশন শেষে মাত্র ঘণ্টাখানেকের বিরতির পর একেবারে শেষ হয় শুক্রবার সকাল প্রায় ন'টায়। দৈর্ঘ্যেই শুধু নয়, শিল্প-শোভা পরিবেশনের দিক থেকেও এই সম্মিলিত অধিবেশন কলকাতার সংগীত আসরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে। গানের দিক থেকে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ, শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার, ওস্তাদ আসাদ আলি খান এবং শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার যেমন তেমনি বাজনার দিক থেকে শ্রী ভি জি যোগ, শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী ও ওস্তাদ মুস্তাক হোসেনের সম্মিলিত যন্ত্রসংগীত, শ্রীমন্টু ব্যানার্জি, শ্রীমতী শরণরাণী এবং পরি-শিষ্টে শ্রী ভি জি যোগের সঙ্গে মিয়া বিসমিল্লার সম্মিলিত বাজনা মিলে এ বছরের সম্মিলনীকে সার্থক করে তোলেন। এইদিনের অধিবেশন দু'টিতে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন গানে, শ্রীবমবম চতুর্বেদী, কুমারী অপর্ণা চক্রবর্তী (তানসেন-বিষ্ণু দিগম্বর বৃত্তিপ্রাপ্তা), শ্রী এ কানন, শ্রীমতী অঞ্জন-বাঈ লোলেকার এবং রবীন্দ্রসংগীতে শ্রীসমরেশ চৌধুরী। শ্রী চৌধুরী দু'খানি রবীন্দ্রসংগীত গাইবার পর সময়ের অনটন জানিয়ে তাঁর গান বন্ধ করে দেওয়া একটা বিসদৃশ ব্যাপার। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন, বেহালায় শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং নৃত্যে এংলো গুজরাটি গার্লস স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ।

বিশাখাপত্তনে একটি অপরাহ্ন

শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য

ভূগোল পাঠক হিসেবে বাল্যকালে 'ভিজাগাপত্তন' নামের সাথে যথারীতি পরিচয় ঘটেছিল; কিন্তু নামটি কোনদিনই কৌতূহল-লুব্ধ মনকে হাতছানি দিয়ে আমন্ত্রণ করেনি। জায়গাটি ছিল নিতান্ত অখ্যাত একটি জনপদ—ভারতের পূর্ব উপকূলে অশান্ত সমুদ্রের ক্ষুব্ধ তরঙ্গাহত একটি ভৌগোলিক সত্তামাত্র।

এহেন জনপদ দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরম কুলীন হয়ে উঠেছে। বোম্বের সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী যেদিন এখানে আধুনিক জাহাজনির্মাণশালা স্থাপন করেন, সেদিন থেকে এর নবজন্ম। সমগ্র ভারতে এখানেই ভারতের নিজস্ব, একমাত্র ও প্রথম সামুদ্রিক জাহাজ নির্মাণের কারখানা। বাষ্পশক্তি আবিষ্কারের পর এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতিকূলতায় ভারতের যে সুপ্রাচীন নৌ-শিল্প ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপথে এসে থেমে গিয়েছিল, নবপর্যায়ে তারই পুনরভ্যুদয় এখানে। বিদেশী প্রদত্ত বিকৃত নামের খোলস ছেড়ে 'ভিজাগাপত্তন' এখন 'বিশাখাপত্তন'। ভারতে জাহাজ নির্মাণের ছিন্ন সূত্রটিকে জোড়া লাগাবার সাধনা চলেছে এখানে। বিশাখাপত্তনে প্রথম নির্মিত জাহাজ 'জল উষা'। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মার্চ ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যেদিন 'জল উষা'র জলাবতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন তখন থেকেই উৎসুক ছিলুম বিশাখাপত্তনের শিল্পতীর্থটি দেখতে।

সুযোগ ঘটল দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। সম্প্রতি পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ পরিক্রমা করে বাড়ি ফেরার পথে একদিন প্রত্যূষে যাত্রাভঙ্গ করলুম রায়পুর স্টেশনে। অন্য প্ল্যাটফরমে বিশাখাপত্তনের গাড়ি প্রস্তুতই ছিল। তখন আমের দিন। কলিকাতাগামী মাদ্রাজী আমের রাশি রাশি ঝুড়িতে প্ল্যাটফরমে তিল ধারণের স্থান নেই। ঝুড়ির ফাঁকে ফাঁকে পথ করে এবং পক্ক আমের সৌগন্ধে নাসারন্ধ্র পূর্ণ করে একখানি থার্ড ক্লাশ কামরার একান্তে ঠাঁই নিলুম। গাড়ি ছাড়বে ভোরে আর সমস্ত স্টেশনে থেমে থেমে বিশাখাপত্তনে পৌঁছুবে রাত আটটায়। প্রভাতসূর্যের স্নিগ্ধ কিরণস্নাত যাত্রার প্রথম অংশ কাটল একটা সজীব কৌতূহলরসের মধ্যে। তারপর অলস মন্থর মধ্যাহ্নে খরতাপ মাথায় করে ট্রেন ছুটে চলেছে শ্যামল অরণ্যানী ও পাহাড় পেরিয়ে উড়িষ্যার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে মাদ্রাজের সীমা লক্ষ্য করে।

ট্রেন যতই বিশাখাপত্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে, ততই মন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে অনির্দেশ্য, অদেখা জাহাজ নির্মাণশালার প্রতি। কী দেখব সেখানে? রাশি রাশি শ্রমিকের অজস্র ব্যস্ততা, লোহালক্কড়ের ছড়াছড়ি, হাঁকাহাঁকি, আসুরিক উত্তেজনা? কল্পনায় কোন সুস্পষ্ট রূপ দানা বাঁধলো না, কিন্তু ভাবতে জাহাজ তৈরীর ঐতিহ্যের একটা সুনির্দিষ্ট সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। বিশাখাপত্তনের কর্মশালার রূপ যাই হোক, এর গুরুত্ব বুঝতে হলে একে সেই প্রাচীন ইতিহাসের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় রেখেই দেখতে হবে।

তিন হাজার বৎসরেরও বেশিকাল ভারতের জাহাজ নির্মাণ ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল অপ্রতিহত। এই নৌশক্তির বলে প্রাচীন ভারত জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, কাম্বোডিয়া, পেগু, এমন কি সুদূর জাপান পর্যন্ত প্রাচ্য মহাখণ্ডের দেশগুলোতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল; দক্ষিণ চীন, মালয়, আরব, পারস্যের প্রধান প্রধান শহর ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য সম্প্রসারিত করেছিল। শুধু এশিয়া নয়, রোম এবং তৎকালীন জ্ঞাত জগতের বহু দেশই বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সূত্রে ভারতের সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছিল।

ভারতে জাহাজ নির্মাণ, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং দুস্তর সমুদ্রপথে দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাস যে কত প্রাচীন, তার সাক্ষী প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ। বেদ-পুরাণ থেকে আরম্ভ করে বিরাট সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে ভারতবাসীর সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপের অজস্র উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন ভারতের জন-মানসে পালতোলা সামুদ্রিক জাহাজের কী অমোঘ প্রভাব ছিল, তার পরিচয় আছে শিল্প ভাস্কর্যেও। সাঁচী স্তূপে, অজন্তার চিত্রকলায় ও বহু মন্দির-গাত্রে জাহাজের প্রতিকৃতি দেখা যায়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ব উপকূলে প্রচলিত কয়েকটি অন্ধ্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে যাতে দুই মাস্তুলের জাহাজ খোদাই রয়েছে।

বাষ্প-শক্তি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত জাহাজমাত্রই তৈরি হত কাঠ দিয়ে এবং মাস্তুলের ওপর পাল তুলে তরী ভাসত সাগরজলে। প্রাচীন ভারতে জাহাজ-নির্মাণ-শিল্পীদের জাহাজ নির্মাণের উপাদান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কাষ্ঠের গুণাগুণ সম্বন্ধে নিখুঁত জ্ঞান ছিল। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁর 'এ হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান সিপিং' গ্রন্থে "যুক্তি-কল্পতরু" নামক একখানি সুপ্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেছেন। "যুক্তিকল্পতরু"তে প্রাচীন ভারতের জাহাজ নির্মাণ পদ্ধতির আনুপূর্বিক বিবরণ পাওয়া যায়। সামুদ্রিক জাহাজ 'দীর্ঘা' ও 'উন্নতা' এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। দীর্ঘা শ্রেণীর জাহাজের বৈশিষ্ট্য ছিল দৈর্ঘ্য এবং উন্নতা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য উচ্চতা। আবার, দৈর্ঘ্যভেদে দীর্ঘা শ্রেণীর জাহাজ দশ প্রকার এবং উচ্চতা-ভেদে উন্নতা শ্রেণীর জাহাজ পাঁচপ্রকার হত। দীর্ঘা শ্রেণীর জাহাজের দৈর্ঘ্য ৩২ থেকে ১১২ হাত এবং উন্নতা শ্রেণীর জাহাজের উচ্চতা ১৬ থেকে ৪৮ হাত হত। জাহাজ সোণা রূপা তামা দ্বারা নানা অলঙ্করণে ভূষিত এবং নানা চিত্র-কর্মে খচিত হত। জাহাজের মুখ সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক, মনুষ্য-মুণ্ড প্রভৃতির আকারে নির্মিত

হত। জাহাজে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের নানা আয়োজনেরও অভাব থাকত না। জাহাজে কেবিন ছিল এবং কেবিনের দৈর্ঘ্য ও অবস্থান অনুসারেও জাহাজের শ্রেণী ছিল তিনটি—সর্বমন্দিরা, মধ্যমন্দিরা ও অগ্রমন্দিরা। সর্বমন্দিরার কেবিন থাকত সমগ্র জাহাজ জুড়ে এবং এই শ্রেণীর জাহাজ ব্যবহৃত হত রাজকোষ, অশ্ব ও নারীদের বহনের জন্য। মধ্যমন্দিরার কেবিন থাকত মধ্যভাগে এবং এগুলো ছিল রাজাদের প্রমোদ-তরণী। অগ্রমন্দিরার কেবিন থাকত জাহাজের অগ্রভাগে। সমুদ্রযাত্রার পক্ষে এগুলোই ছিল প্রশস্ত এবং রণতরী হিসেবেও এগুলোই ব্যবহৃত হত। প্রাচীন জাহাজের আয়তন এবং নাবিক-সংখ্যা সম্বন্ধেও সংস্কৃত সাহিত্য ও বৌদ্ধ জাতকের বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। বাঙলার রাজা সিংহবাহুর নির্বাসিত পুত্র বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয় কাহিনী সুপরিচিত। কথিত আছে, বিজয়ের সাতশত অনুচর এবং তাদের স্ত্রীপুত্র নিয়ে প্রায় দেড় হাজার আরোহী ছিল বিজয়ের নৌ-বহরে। বৌদ্ধ জাতকে পান্না নামক এক বণিকের কাহিনী আছে। পান্না তিনশতজন বণিক সহ এক জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। তিনশত জন বণিক এবং নাবিকদের স্থান সংকুলানের পরও জাহাজে এত জায়গা ছিল যে, একটি বৌদ্ধ বিহার তৈরীর জন্যে তাঁরা প্রচুর কাঠ নিয়ে এসেছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পর্যটক মার্কোপলো ভারতবর্ষের তৈরী জাহাজের এক বর্ণনায় বলেছেন যে, বড় জাহাজ চালাবার জন্যে তিনশত এবং অন্যান্য জাহাজ চালাবার জন্যে দেড়শো থেকে দু'শ জন নাবিকের প্রয়োজন হত। এই জাহাজগুলো ছয় হাজার বস্তা মরিচ বহন করতে পারত। এই হিসাবকে আধুনিক জাহাজের টনেজ বলা যেতে পারে।

হিন্দুযুগে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কালে এবং মুসলমান যুগে আকবরের রাজত্বকালে ভারতে জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের স্বর্ণযুগ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে জাহাজ নির্মাণ রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল—একচেটে সরকারী নিয়ন্ত্রণে তখন জাহাজ তৈরি হত। আকবরের রাজত্বকালে জাহাজ নির্মাণের প্রধান ঘাটি ছিল বাঙলা দেশ।
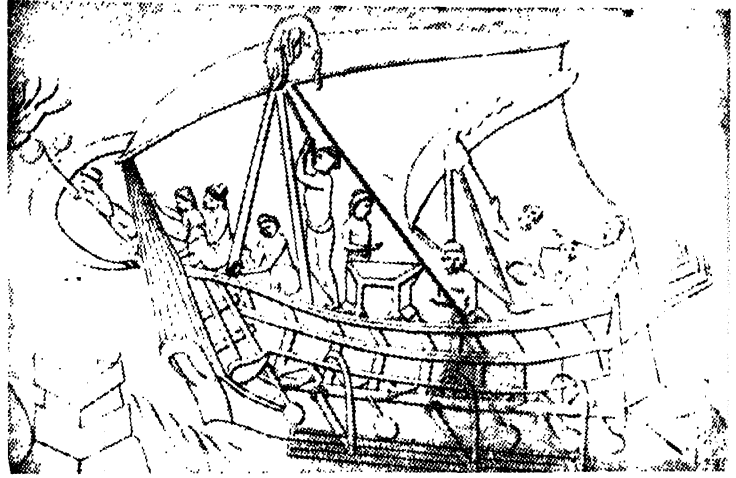
যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনকল্পে ভারতীয় নৌবাহিনীর অভিযান (বরোবুদুর মন্দিরের স্থাপত্য হইতে সংগৃহীত)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও ভারতের জাহাজ তৈরির সুনাম অক্ষুন্ন ছিল। ইংলণ্ডে জাহাজ তৈরি হত ওক গাছের তক্তা দিয়ে এবং নির্মাণ-ব্যয়ও ছিল বেশি। ভারতে শাল শিশু সেগুন কাঠের তৈরি জাহাজ যেমন বেশি মজবুত হত, তেমনি তৈরি করার খরচও হত কম। এজন্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় তত্ত্বাবধানে ভরতেই বাণিজ্য জাহাজ ও রণতরী নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে সেগুন কাঠে নির্মিত জাহাজ এত শক্ত ছিল যে, বাষ্পীয় জাহাজ যখন পুরাতন পালতোলা জাহাজকে উৎখাত করে দেয়, তখনও দু-তিনবার হাত বদলের পরও ভারতে তৈরি পালতোলা জাহাজ নরওয়ে, স্কটল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের উপকূলে দেখা যেত। ১৬১৫ থেকে ১৭৩৫ সাল পর্যন্ত সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র সুরাটে জাহাজ তৈরি হচ্ছিল। ১৭৩৫ সালে বোম্বাই-এ জাহাজ নির্মাণের জন্যে ডক তৈরি হলে সুরাটে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। বোম্বাই-এ পার্শি সমাজ জাহাজ-নির্মাণ শিল্পে কৃতবিদ্য ছিলেন। সুরাট কারখানার ফোরম্যান লাওজী-নাসারানজী নামক এক পার্শী যুবক বোম্বাই ডকে নিযুক্ত হন। তখন বোম্বাই-এর জাহাজ-নির্মাণ-ক্ষেত্র 'বোম্বে মেরিন' নামে পরিচিত ছিল। লাওজী পরিবার পুরুষানুক্রমে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত বোম্বে মেরিনে প্রধান নৌ-স্থপতিরূপে কাজ করে খ্যাতিমান হন। মোগল-সম্রাট আকবর নৌ-শিল্পে বাঙলাকে যে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, ইংরেজরাও তা অক্ষুন্ন রেখেছিল। ১৭৮১ সাল থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত হুগলী তীরে কলকাতা, হাওড়া, সালকিয়া, কাশীপুর, টিটাগড়, খিদিরপুরে ও ফোর্ট গ্লস্টারে ৩৭৬ খানি জাহাজ তৈরি হয়েছিল বলে হিসাব পাওয়া যায়। তা ছাড়া শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং ঢাকায়ও জাহাজ তৈরি হত। ভারতে তৈরি জাহাজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে ১৭৯৬ সাল থেকেই ভারতে জাহাজ তৈরির বিরুদ্ধে বিলাতে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত পুরাদমে ভারতে জাহাজ তৈরির কাজ চলছিল। ভারতে নৌ-শিল্পের অবনতির সূচনা ১৮৪০ সাল থেকে। তারপর ব্রিটিশ রাজশক্তি কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরই ১৮৬৩ সালে ভারতের শিল্প-সভ্যতার নিদর্শন, তিনশত শতাব্দীর প্রাচীন ও অনন্য গৌরবময় নৌ-শিল্প নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

নিজস্ব নৌ-শিল্প বঞ্চিত হয়ে বহির্বাণিজ্যের জন্যে ভারতকে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ পণ্য ও যাত্রীবাহী জাহাজের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ব্রিটিশ বণিকদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতে

নৌ-শিল্প প্রতিষ্ঠার সমস্ত দাবীর প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। ভারতের ব্যবসায়ীরা বিদেশী কোম্পানীগুলিকে জাহাজ ভাড়া বাবত বৎসরে কোটি কোটি টাকা দিতে বাধ্য হন। লর্ড ইঞ্চকেপের পরিচালনায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ কোম্পানী সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বহনের একচ্ছত্র অধিকার অর্জন করে। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের কোন অস্তিত্বই রইল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঠিত হয়ে ব্রিটিশ জাহাজী কোম্পানীর সম্মুখে এক দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হল। ব্রিটিশ কোম্পানী সিন্ধিয়াকে কোনপ্রকারে কাবু করতে না পেরে তাদের কোম্পানী কিনে নেবার প্রস্তাব পর্যন্ত করেছিল। ব্রিটিশ বনাম ভারতীয় কোম্পানীর নাছোড়বান্দা প্রতিযোগিতায় সিন্ধিয়া কোম্পানীর মূলধন বহু পরিমাণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু তবুও সিন্ধিয়া কোম্পানী পরাভব স্বীকার করেনি।

ভারতে নৌ-শিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রথম আধুনিক জাহাজ নির্মাণশালা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রাপ্য। ১৯৪১ সালে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীই বিশাখাপত্তনে জাহাজ নির্মাণের কারখানা তৈরির কাজ আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রু আক্রমণ আশঙ্কায় কাজ ব্যাহত হ'লেও ১৯৪৭ সালে তা সম্পূর্ণ হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বিশাখাপত্তনে তৈরি প্রথম জাহাজ জলে ভাসে।

এর পরই এক দুর্লঙ্ঘ্য সংকট দেখা দিল—অর্থকৃচ্ছ্রতা। সিন্ধিয়া কোম্পানী তাঁদের হিসাব মত ১৯৫০ সালের জুন পর্যন্ত চার কোটি টাকারও বেশি খরচ করেন। কিন্তু আধুনিক সামুদ্রিক জাহাজ তৈরির জন্যে আরও বিরাট অঙ্কের পুঁজি চাই। সিন্ধিয়া কোম্পানী জাহাজ নির্মাণশালার স্রষ্টা হ'লেও পূর্ণ স্বত্ব আর নিজের করায়ত্ত রাখতে পারলেন না। তাঁরা ভারত সরকারের শরণাপন্ন হলেন। এদিকে রাজকোষেও অর্থাভাব। কিন্তু এই উদীয়মান জাতীয় শিল্পকে অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'তেও দেওয়া যায় না। ভারত সরকার তখন শিল্পটির অস্তিত্ব শুধু আপাতত টিকিয়ে রাখার জন্যে কতকগুলো জাহাজ তৈরির অর্ডার দেন। সর্ত এই, কোম্পানী কোন লাভ পাবে না, শুধু তৈরির খরচটা পাবে।

ভারত সরকার ইতিমধ্যে জাহাজ তৈরির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্যে ১৯৪৯ সালে কয়েকজন ফরাসী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করেন। ফরাসী বিশেষজ্ঞরা বিশাখাপত্তনকেই ভারতে জাহাজ তৈরির পক্ষে আদর্শ স্থান বলে রায় দিলেন। তারপর সিন্ধিয়া কোম্পানী ও ভারত সরকারের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল। এই আলোচনার ফলে জন্মলাভ করল হিন্দুস্থান শীপ ইয়ার্ড লিমিটেড। এখন বিশাখাপত্তনে এই কোম্পানীই জাহাজ নির্মাণশালা পরিচালনা করছে। নবগঠিত কোম্পানীতে ভারত সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ ও সিন্ধিয়া কোম্পানীর এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দুস্থান শীপ ইয়ার্ড লিঃ রেজিস্ট্রি হ'য়ে ঐ বৎসরেরই মার্চ মাস থেকে কারখানার ভার গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ শেয়ারের মালিক হ'য়ে গভর্নমেণ্টই জাহাজ নির্মাণশালাটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। নির্মাণশালাটি যে অঞ্চলে তার নাম রাখা হয়েছে গান্ধীগ্রাম।

বিশাখাপত্তনগামী আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। উড়িষ্যার সীমার ভেতরে ট্রেন যতক্ষণ ছিল যাত্রীদের বেশির ভাগ ছিল মলিন যৎসামান্য কাপড়-চোপড় জড়ান দীনহীন কাঙ্গাল নারী-পুরুষ। অনেকেই বিনা টিকিটের যাত্রী এবং চেকাররা পাকড়াও করতে কসুর করছে না। বিকেল থেকেই এই নিঃস্ব শ্রেণীর যাত্রীদল অদৃশ্য হয়ে গেল, কামরা পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল সুবেশ মার্জিত যাত্রী-সমাগমে—আবালবৃদ্ধবনিতা কারু মধ্যে দৈন্যের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেনি উড়িষ্যাবাসী যাত্রীদের মত। ট্রেন তখন অন্ধ্র রাজ্যের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বিশাখাপত্তন নবগঠিত অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাত্রি হয়ে এসেছে। হঠাৎ জানালা দিয়ে নজরে পড়ল অন্ধকার পটভূমিতে দুই সারি জ্যোতির্ময় আলোক রেখা ঊর্ধমুখে আকাশের দিকে উঠে গেছে। একজন সহযাত্রীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে সে বললে, এ হচ্ছে সীমাচলম মন্দির। ক্রমোচ্চ প্রায় এক হাজার সিঁড়ির প্রতি ধাপের দুপাশে বিজলি আলো জ্বলছে। সে আরও বললে যে এটি ওয়ালটেয়ারের সমীপবর্তিতাও ঘোষণা করছে।

বিশাখাপত্তনের আগের স্টেশন ওয়ালটেয়ারে নেমে পড়লুম। নামে পৃথক হলেও প্রকৃতপক্ষে ওয়ালটেয়ার ও বিশাখাপত্তন একটি অভিন্ন শহর। ট্রেন থেকে নেমে ওয়ালটেয়ারে একটি হোটেলে আশ্রয় নিলুম।

পরদিন ভোর।

জাহাজ নির্মাণশালা খোলার দেরী আছে। এ অবসরে পূর্ব রাত্রির দেখা আলোক রেখায় বিজ্ঞাপিত সীমাচলম মন্দির দর্শন করে আসা গেল। পরিচ্ছন্ন পিচঢালা সড়ক দিয়ে বাসে করে যেতে হয় মাইল সাত-আট। শুনলুম হিরণ্যকশিপুর উদর-বিদারী নৃসিংহ অবতার এখানকার অধিষ্ঠাতা দেবতা। সীমাচলমের চূড়া থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সমতল ভূমির গাম্ভীর্যময় শোভা দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করে।

হোটেলে ফিরে এসে স্নান এবং রসম ও সম্বরম সহযোগে আহার শেষ করে

একটা সাইকেল রিক্‌শ ডাকলুম। ওয়াল-টেয়ারে সাইকেল-রিক্‌শই সাধারণ বাহন। রিক্‌শ শহর-সীমা অতিক্রম করে সমুদ্রের অগভীর একটা খাড়ি সেতুর উপর দিয়ে পেরিয়ে গান্ধী-গ্রাম অভিমুখে চলল। পূর্ব সীমায় অনুচ্চ শৈলমালার প্রাকার বেষ্টিত এক উদার সমতল ক্ষেত্র। জেঠিতে কতগুলো সামুদ্রিক জাহাজ ও ছোট ছোট বোট বাঁধা। দূরে শৈলশ্রেণীর পাদমূল দিয়ে বিশাখাপত্তন স্টেশন থেকে আসা একটা রেল লাইন গান্ধী গ্রামের দিকে চলে গেছে।

সাইকেল-রিক্‌শ পাকা মসৃণ রাস্তা দিয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে দু একটি প্রাইভেট মোটর গাড়ি পাশ কেটে চলে গেল। কিন্তু হঠাৎ এত প্রবলবেগে বায়ু বইতে আরম্ভ করল যে, ধুলায় একদিকে যেমন অন্ধ হবার উপক্রম, তেমনি রিক্‌শর অবস্থা পাদমেকং ন গচ্ছামি। ঘর্মাক্তকলেবর রিকশ-ওয়ালার প্রাণান্ত পরিশ্রমে যদিবা এক ইঞ্চি এগোয়, পরক্ষণেই চার ইঞ্চি পিছিয়ে যায়। 'বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে' কলিটি এই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও মনের মাঝে গুঞ্জরিত হতে লাগল। ক্ষিপ্ত পবন দানবীয় মত্ততা নিয়ে বেঁকে বসেছে, কিছুতেই যেন এগুতে দেবে না। পনেরো মিনিটে যে পথ অতিক্রম করা উচিত ছিল, ঘণ্টা দেড়েক লাগলো তা অতিক্রম করতে। ধূলিধূসরিত অঙ্গে গান্ধী গ্রামের ফটকে যখন নামলুম, বেলা তখন প্রায় গড়িয়ে এসেছে।

প্রথম দর্শনে গান্ধী গ্রামকে মনে হল কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেল যেন। অনুচ্চ প্রাচীর ঘেরা প্রায় ৫৬ একর জমির ওপর জাহাজ নির্মাণশালা। প্রধান ফটকে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন। আর একটি ফটকে ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট। আগন্তুক-দের এর মারফৎ ভেতরে প্রবেশ করবার নিয়ম। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নির্দেশে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বরাবরে এক-খানা দরখাস্ত পেশ করলুম। লিখলুম, কলকাতার এক সাংবাদিক এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পটি দেখবার অনুমতিপ্রার্থী। সৌভাগ্যের বিষয়, অনতি-বিলম্বে একজন বেয়ারা এসে আহ্বান করল।

ফটক সংলগ্ন ক্ষুদ্র কক্ষটির বাইরে আসতেই বহু আকাঙ্ক্ষিত আধুনিক জাহাজ নির্মাণশালা। ভেবেছিলুম, ভেতরে না জানি বিশ্বকর্মার কি কর্মতাণ্ডব, শ্রমিক-জনতার কি হৈ-হুল্লোড়ের সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু ভেতরে ঢুকে মুগ্ধ হলাম সুপরিসর ব্যাপ্তির মধ্যে কোলাহলবর্জিত একটা সৌম্য-শ্রী দেখে। আমার পথপ্রদর্শক উর্দি-পরিহিত তরুণ বেয়ারা সোৎসাহে আমাকে প্রাথমিক জ্ঞান দান করতে লাগল। বললে, এই যে দেখছেন কারখানাটা, এটা এমন-ভাবে তৈরি যে দুষমনেরা সহজে ক্ষতি করতে পারবে না। এবং সত্যিই তাই। একটা দুর্গের নিরাপত্তা দিয়ে সমগ্র কারখানাটি পরিকল্পিত। কারখানার পরিধির ভেতরে অনেকগুলো টিলা। বেয়ারা বললে, প্রয়োজন মত টিলাগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে যায়গা বার করা হবে। আরও অনেক টিলা ছিল, সেগুলো উড়িয়ে দিয়ে সমভূমিতে পরিণত করা হয়েছে।

উঁচু একটি টিলা প্রদক্ষিণ করে এলুম অফিস ভবনে। এটিকে বলা হয় এডমিনি-স্ট্রেটিভ ব্লক। ঢুকতেই সম্মুখ প্রাঙ্গণে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান পরলোকগত বালচাঁদ হীরাচাঁদের মর্মর-মূর্তি। এই মনস্বী শিল্পপতির স্মৃতির প্রতি মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করলুম। এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক জ্যামিতিক রেখার মত সরল ও দীর্ঘায়ত। লম্বা বারান্দা অতিক্রম করে চীফ ইঞ্জি-নিয়ারের ঘরে প্রবেশ করলুম।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার একজন ফরাসী ভদ্রলোক। তিনি সাদর সম্ভাষণ করে আমার দরখাস্তখানা হাতে তুলে বললেন, জাহাজ তৈরির পদ্ধতি মোটামুটি জানতে চেয়েছেন। কত সময় আছে আপনার হাতে?

কারখানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত—এই ঘণ্টা তিনেক।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার বিরাট হাস্য করে বললেন, তিনটি মাস যদি বুঝাই, তা হলেও সব বলা হবে না।

আমি সবিনয়ে বললুম, আজ্ঞে, আমি খুঁটিনাটি যান্ত্রিক কলাকৌশল জানতে চাই না, বুঝবও না। মোটামুটি শাদা চোখে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুতেই খুশী হব।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার তখন সেক্রেটারীকে ডেকে আমাকে তাঁর জিম্মা করে দিলেন। সেক্রেটারী মিঃ এম ভি হাতে একজন
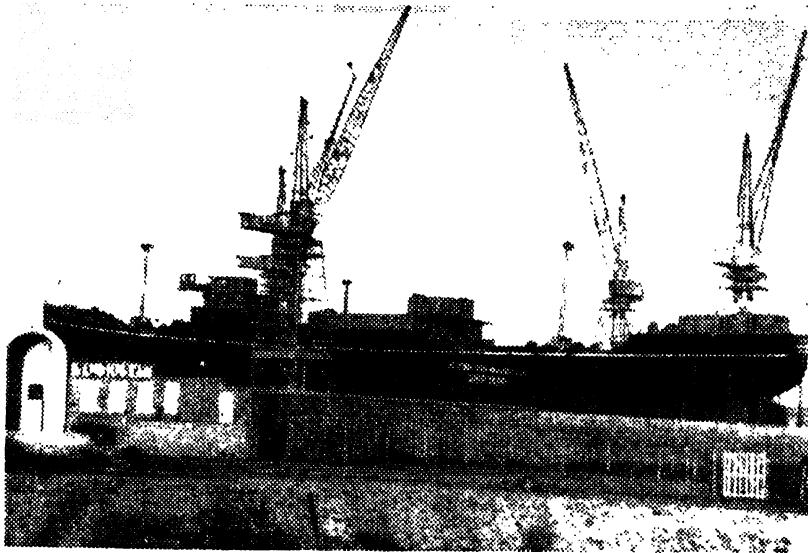
বিশাখাপত্তনে সম্প্রতি নির্মিত জাহাজ জলপঙ্খী

সুদর্শন যুবক। তিনি পাশেই তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনিও আমার সময়ের অপ্রাচুর্যের উল্লেখ করে বললেন, দেশের লোক আধুনিক জাহাজ তৈরির এই নতুন উদ্যমের খবর খুব কম রাখে। সংবাদিকরা এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পটির বিষয় প্রচার করলে দেশবাসীকে শিল্পসচেতন করা হবে। তিনি ভবিষ্যতে যথেষ্ট সময় নিয়ে আর একবার পদার্পণের আমন্ত্রণ জানিয়ে কারখানা দেখাবার ব্যবস্থা করলেন।

জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে প্রথম পর্ব পরিকল্পনা। প্রথমেই স্থির করতে হয় দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় জাহাজের আয়তন, শ্রেণী, গতিবেগ, টনেজ ইত্যাদি। তারপর এই পরিকল্পনা প্রথম রূপায়িত হয় নক্সায়। এডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের পাশেই নক্সাংকন ও পরিকল্পনা অফিস। (Designing and drawing office). এটি হল সমগ্র কর্মশালার মস্তিষ্ক। জাহাজের কি কি অংগ থাকবে, কোথায় কার্নটি বসবে, ইস্পাতের বিভিন্ন কাঠামোর আকার ও প্রকার কি হবে—সমস্ত খুঁটি-নাটি অভ্রান্ত নিশ্চয়তার সংগে নির্ণীত হয় এখানে। জাহাজের উপকরণের তালিকাও তৈরি করে দেন এরা। তারপর স্টোর বিভাগ টেন্ডার আহবান করে সমস্ত মালমশলা জোগাড় করেন। ডিজাইনিং অফিসে প্রস্তুত নক্সার এক একটি প্রতিলিপি অন্যান্য সমস্ত বিভাগেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর দ্বিতীয় অধ্যায় যেখানে আরম্ভ তার নাম মোল্ড লফ্ট (Mould Loft)। মোল্ড লফ্ট নক্সাংকন বিভাগেরই সংলগ্ন একটি বড় হলঘর। এর মেঝে ব্ল্যাকবোর্ডের মত কালো রং করা। এখানে নক্সায় প্রদর্শিত জাহাজের সমস্ত অংশ ও কাঠামো পূর্ণা-বয়বে মেঝের উপর আঁকা হয়। এর উদ্দেশ্য, নির্মাণের বিভিন্ন স্তরে কোথাও বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি ও প্রমাদ না ঘটে, সমস্ত কাজ পর পর সুশৃংখলভাবে অগ্রসর হতে পারে তারই নিশ্চয়তা বিধান। কাঠামোর কোথায় কোথায় স্ক্রু, নাট-বল্টু বসাতে হবে, এক অংশের সাথে অন্য অংশ কোথায় জোড়া লাগবে, সমস্তই মেঝেতে অংকিত চিত্রে চিহ্নিত করা হয়। তারপর এই চিত্র অনুযায়ী কতকগুলি কাঠের ফ্রেম তৈরি করা হয়। এই ফ্রেমগুলির নাম টেমপ্লেট (Tem-plate)। এগুলোকে জাহাজের বিভিন্ন কাঠামোর মডেল বলা যেতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ের যবনিকা উন্মোচিত হল 'হাল সপে' (Hull Shop)। পূর্ববর্তী দুই বিভাগের সমস্ত প্রস্তুতি এখানে বাস্তব রূপায়ন লাভ করতে থাকে। 'হাল সপ' হল কারখানা যেখানে জাহাজের খোলের অংশ ও ইস্পাতের অন্য সমস্ত কাঠামো নক্শা ও মডেল অনুযায়ী আগে থাকতে তৈরি করে রাখা হচ্ছে। সুবৃহৎ কারখানাটি ইস্পাত কাটার, বাঁকাবার, ছেঁদা করার সমস্ত যন্ত্রপাতি ও একটি বিশেষ ফারনেসে সুসজ্জিত। একটি করাত কল এবং কাঠের কারখানাও আছে। সেখানে কাষ্ঠনির্মিত সমস্ত আসবাব তৈরি হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে এসে জাহাজ কায়া ধারণ করতে আরম্ভ করে। এই অধ্যায়ের কাজ যেখানে হয় তার নাম 'বার্থ' (Berth)। বার্থ হচ্ছে জলের ঢালু কিনারায় অতিকায় ও অতিদৃঢ় এক সারি ইস্পাতের কাঠামো যার জঠরে জাহাজের খোল তৈরি হতে থাকে। বার্থের অপর নাম 'স্লিপওয়ে' (Slipway)। প্রথমে বার্থের মেঝের উপর অনেকগুলো শক্ত চৌকো কাষ্ঠখণ্ড বিছিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো এত শক্ত হওয়া চাই যাতে নির্মীয়মান জাহাজের সমগ্র ভার বহন করতে পারে। তারপর খোলের ঠিক যে অংশটি কেন্দ্রস্থল হবে, সেখানে প্রথম ইস্পাত ফলক স্থাপন করা হয় এবং সংগে সংগে জাহাজ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। কেন্দ্রস্থল থেকে ইস্পাত স্থাপনের কাজ চলতে থাকে। জাহাজের ঊর্ধাংশ সামনের দিকে এবং নিম্নাংশ জলের দিকে থাকে। বাঁশের মাচা বেঁধে ঊর্ধাংশের কাজ হয়।

বার্থ যখন দেখতে গেলুম, তখন পাশাপাশি দুটি বার্থে জাহাজ তৈরী হচ্ছে। একটির কাজ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। দেখলুম, সমাপ্তপ্রায় খোলটিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সাহায্যে ঝালাই কাজ (ওয়েল্ডিং) হচ্ছে। ঝালাই-এর কর্ণ-পটাহবিদারী তুমুল শব্দে কান ঝালা-পালা। কেউ কানের কাছে উচ্চ কণ্ঠে কথা বললেও শ্রুতিগোচর হয় না। নির্বাক কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলুম। ইঞ্জিনীয়াররা নক্সা হাতে মনোযোগের সাথে কাজ নিরীক্ষণ করছেন। একটি প্রকাণ্ড চলমান ক্রেন ঐরাবতের মত দীর্ঘ শুঁড় তুলে কর্মরত শ্রমিকদের কাছে মালমশলা তুলে দিচ্ছে। 'হাল সপ' থেকে যথাক্রমে বিভিন্ন অংশ নিয়ে এসে নক্সা অনুযায়ী জোড়া লাগান হচ্ছে।

বিশাখাপত্তনে বর্তমানে তিনটি বার্থ আছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন আয়তনের জাহাজ তৈরির জন্যে আরও পাঁচটি বার্থ তৈরি হবে। বর্তমান বার্থগুলোতে ৩২০ থেকে ৫৫০ ফুট দীর্ঘ এবং ৫০০০ থেকে ১৫,০০০ টনেজের জাহাজ তৈরি হ'তে পারে। বিশাখাপত্তনে একটি জাহাজ সম্পূর্ণ করতে প্রায় এগারো মাস সময় লাগে। অন্যান্য দেশেও সচরাচর এর চেয়ে কম সময়ে হয় না।

বার্থে জাহাজের খোল ও অন্যান্য অংশ, যেমন, পাটাতন, প্রপেলার ইঞ্জিন বয়লার প্রভৃতি বসাবার জায়গা এবং নানা মাপের কাঠামো স্থাপন করা হয়। খোল এবং মোটামুটি কাঠামো তৈরি হ'য়ে গেলে জাহাজকে আর স্থলে রাখার দরকার নেই, জলে ভাসমান অবস্থায় অবশিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। বার্থ খালি হ'য়ে গেলে আর একটি জাহাজ তৈরির কাজেও হাত দেওয়া যায়।

অন্যান্য দেশে গ্রীজ ও চর্বি দিয়ে নির্গম পথ পিছল ক'রে বার্থ থেকে জাহাজকে জলে নামানো হয়। কিন্তু বিশাখাপত্তনে কলা বিছিয়ে 'স্লিপওয়েকে' পিছল করা হ'য়ে থাকে। চর্বি ব্যবহার করলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্যতাপে তা গলে যেতে পারে, কিন্তু কলায় সে আশংকা নেই। জাহাজের জলাবতরণের এই পদ্ধতি অন্যান্য দেশে নাকি কৌতূহলের সঞ্চার করেছে।

জাহাজকে জলে নামিয়ে অঙ্গসজ্জা ও অবশিষ্ট কাজ যেখানে সম্পন্ন করা হয়, তার পারিভাষিক নাম 'ফিটিং আউট হোয়ারফ্' (Fitting out wharf)। এখানে জাহাজের ভেতর ইঞ্জিন, প্রপেলার, বয়লার বসান হবে, কেবিন, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যবস্থা হবে—এক কথায় জাহাজের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় উপকরণ বিন্যস্ত হবে। বিশাখাপত্তনে ফিটিং আউট হোয়ারফের দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুট। এখানে দু'টি বড় বড় ও একটি মাঝারি জাহাজের নির্মাণকার্য এক সঙ্গে চলতে পারে। ফিটিং আউট হোয়ারফ্ জাহাজ নির্মাণের পঞ্চম অঙ্ক।

বিশাখাপত্তনের জেটি, বন্দর ও ডক অবস্থান বৈশিষ্ট্যে ভারতে অদ্বিতীয়। সমুদ্রের একটি হ্রস্ব বাহু সংকীর্ণ খালের আকারে দু'দিকে দু'টি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উপকূল ভেদ ক'রে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। সমুদ্রের খালটির জল স্থির, নিস্তরঙ্গ, আবেগহীন। যেন একটা দেয়ালের এক পাশে একটি শান্ত দীঘি আর ঠিক ওপাশেই—মহাসমুদ্র। মাত্র শতখানেক গজ দূরে ভারত মহাসাগরের নিত্যবিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গ বিশাখাপত্তনের শান্তিকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে না। বন্দরে জাহাজগুলো যেন মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করে। বন্দরে দেখলুম, সিন্ধিয়া কোম্পানীর জাহাজ "জলকেতু" কোথায় যাত্রার উদ্যোগ করছে।

'হাল সপের' কাছে ছোট বড় অনেকগুলো কাঠের বোট তৈরি হচ্ছে। 'হাল সপের' কর্মকর্তা কারখানার বিভিন্ন বিভাগ দেখিয়ে বললেন, একমাত্র প্রপেলার ও ইঞ্জিন ছাড়া আর সমস্ত সরঞ্জাম এখানে তৈরি হয়। জিজ্ঞাসা করে আরও জানলুম, জাহাজ তৈরির জন্যে যে ইস্পাতের প্রয়োজন, দেশে উৎপাদিত ইস্পাতে তার সমগ্র চাহিদা পূরণ হয় না। ইস্পাতের জন্যে জাপানের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রপেলার ও ইঞ্জিন সম্পর্কেও একই কথা। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য নিজের চাহিদা মিটিয়ে অন্য দেশের চাহিদা মেটাতে অল্পই সক্ষম। তাই ইঞ্জিনের জন্যেও নাকি জাপানের ওপর নির্ভর করতে হবে।

এ পর্যন্ত বিশাখাপত্তনে আট হাজার টনেজের সাতটি জাহাজ নির্মিত হয়েছে—চারটি সিন্ধিয়া কোম্পানীর আর তিনটি ভারত সরকারের। বিশাখাপত্তনে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৬·৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এখানে প্রায় চার হাজার কর্মী কাজ করেন। তাঁদের বাসস্থানের জন্যে একটা উপনিবেশ গ'ড়ে উঠেছে। তাঁদের জন্যে পৃথক্ থানা, ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। গান্ধী-গ্রামের দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে বেশি মনে যা রেখাপাত করল, তা হচ্ছে এই কারখানাটির পরিবেশ। এখানে শিল্পাঞ্চলসুলভ কলরব, ঘিঞ্জি, শ্বাসরোধকারী অপরিচ্ছন্নতা ও ধূম্র-কলঙ্কিত বায়ুমণ্ডল নেই। নীল সমুদ্র ও সবুজ পাহাড়-ঘেরা এক উদার বিস্তীর্ণ ভূ-প্রকৃতির মধ্যে গান্ধী-গ্রাম আত্ম-সমাহিত। একমাত্র ঝালাই কাজের কর্কশ বজ্রনাদ ছাড়া কারখানার চারদিকে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ!

বেলা প্রায় পাঁচটায় বেরিয়ে এলুম জাহাজ-নির্মাণশালা থেকে। জেটিতে একটা খেয়া নৌকা অপেক্ষা করছে। কারখানা ছুটির পর শ্রমিকদের ওপারে ওয়ালটেয়ারে পৌঁছে দেবে। আমিও খেয়া নৌকার আরোহী হলাম। "জলকেতু" একবার ভোঁ শব্দে ধোঁয়া উদ্গীরণ ক'রে বন্দর ত্যাগ করল এবং পাহাড়ের বাঁক ঘুরে সমুদ্রে অদৃশ্য হল।

"জলকেতু" চলে যাবার পর খেয়া নৌকা ওপারে ভিড়ল। দৃষ্টি-অবরোধক পাহাড়টি অতিক্রম ক'রে বেলাভূমিতে এসে দাঁড়াতেই সামনে উত্তাল তরঙ্গময় ভারত মহাসমুদ্র। আরও সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দেখলুম, গোধূলিম্লান দূর চক্রবালে "জলকেতু" ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে।

খেলার মাঠে

ক্রিকেট

ভারত ভ্রমণকারী রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের ভারতের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ সত্য সত্যই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের উপর্যুপরি চারিটি খেলাতেই রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ দুই মাস ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া যে দল কোন খেলাতেই বিজয়ী হইতে পারিল না, অধিকাংশ খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিল ও পরাজয় বরণ করিল সেই দল পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিতে আসিয়াই এইরূপভাবে পর পর চারিটি খেলায় কিরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইল ইহা অনেকেরই চিন্তার কারণ হইয়াছে। হওয়াও স্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলে খেলিতে আসিয়াই রজত জয়ন্তী দল শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ফ্রাঙ্ক ওরেলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিনি দুইটি খেলায় যোগদান করিয়া তৃতীয় খেলার মধ্যপথেই আহত হইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এমনকি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিস্ময়কারী গুগলী বোলার এস রামাধীন পূর্বাঞ্চলের সকল খেলা শেষ হইবার পূর্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তবে এই দুইজন কৃতী খেলোয়াড়ের স্থান পূরণ করিয়াছেন ইংলণ্ডের চৌখস খেলোয়াড় এলান ওয়াটকিন্স ও অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা স্পিন বোলার জ্যাক আইভারসন। এই দুইজনের আগমনে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে শক্তি বৃদ্ধি পাইলেও ব্যাটিংয়ের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপ শক্তিহীন দল কিরূপে ভারতীয় দলকে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে পরাজিত করিল ইহা অনেকেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা খেলার কিছু জানেন ও খেলার সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের একবাক্যে বলিতে শোনা গিয়াছে "দলের অধিনায়কের নির্বুদ্ধিতার জন্যই দল পরাজিত হইয়াছে।" খেলা সম্পূর্ণ করায়ত্তের মধ্যে আসিয়াও অধিনায়কের বিচক্ষণতার অভাবের জন্য নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। যে দলের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী সেই দল জয়ী হইয়াছে।

রজত জয়ন্তী দল পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বিহারের জামসেদপুরে বিহার রাজ্যপাল দলকে যে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাহা কেবল রামাধীনের মারাত্মক বোলিং ও দলের শক্তিহীনতার জন্য সম্ভব হয়। দ্বিতীয় খেলায় আসামেও ঐ একই কারণে রজত জয়ন্তী দল বিজয়ী হয়। তৃতীয় খেলায় বাঙ্গলা দলকে যে পরাজিত করে তাহার কারণ হিসাবেও পূর্বের যুক্তিই প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ সম্পর্কে তাহা বলা চলে না। এই খেলায় ভারতের পক্ষে দুই দুইজন খেলোয়াড় শতাধিক রান করিয়াছেন। যাহা রজত জয়ন্তী দলের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুতরাং কৃতী ব্যাটসম্যান থাকা সত্ত্বেও অপর সকল খেলোয়াড় সেইরূপ দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সহিত না খেলায় দল অধিক রান তুলিতে পারে না। ইহার উপর অধিনায়ক ঠিকমত বোলারের সাহায্যে আক্রমণ ব্যবস্থা রচনা করিতে না পারায় প্রতিপক্ষ দলের পক্ষে রান তোলা সহজ হইয়াছে।

জয়-পরাজয় সমান সমান

ভারত ও রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের বেসরকারী টেষ্ট পর্যায়ের খেলায় জয়-পরাজয় বর্তমানে সমান সমান হইয়াছে। প্রথম টেষ্ট খেলায় দিল্লীতে ভারত জয়ী হয়। কিন্তু দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা বোম্বাইতে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ও ভারত একটি খেলায় জয়ী হইয়া অগ্রগামী থাকে। কলিকাতায় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দল ৬ উইকেটে পরাজিত হওয়ায় রজত জয়ন্তী দল টেষ্ট পর্যায়ের খেলায় সমান স্তরে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছে।

ইডেন উদ্যানের পিচের প্রশংসা

রজত জয়ন্তী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বেন বার্নেট ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট পিচের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। চারিদিনব্যাপী টেষ্ট খেলার কোন সময় পিচ নষ্ট হয় নাই এইজন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এমনকি মাঠের স্কোর বোর্ডেরও প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, খেলার সময় তিনি স্বদেশের মাঠে খেলিতেছেন বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। বার্নেটের প্রশংসাবাণী ইডেন উদ্যানের ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের পরিচালকদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। তাঁহারা কেন উৎসাহিত হইয়াছেন ইহা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে। কয়েক মাসে পূর্বের কথা—এই পিচের প্রশংসাসূচক বাণী ইহাদের জোগাড় করিতে কি না অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই মাঠে পুনরায় যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার সংযুক্ত ষ্টেডিয়াম গঠনের কথা উত্থাপন করেন তাহা হইলে বার্নেটের উক্তি প্রতিরোধ অস্ত্র হিসাবে ঐ মাঠের মালিকগণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

পিচ রক্ষার বৃথা চেষ্টা

ইডেন উদ্যানের মালিকানী স্বত্ব এন সি সি'র আর কতদিন থাকিবে সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মাঠ সম্পর্কে যেরূপ মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় এন সি সির কর্তাদের ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ কোন আশঙ্কা না থাকিলে দুইটি ধুরন্ধর ব্যক্তি যাঁহারা এই ক্লাব গঠনে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন তাঁহারা হঠাৎ কেন ক্লাবের কর্তৃপক্ষমণ্ডলী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন? একজন ক্রিকেট সমালোচক বেশ সুস্পষ্টই এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "টাকা কড়ি আর নাই, যাহা ছিল বা আছে তাহার উদ্ধার করা অসম্ভব। ক্লাব সম্পূর্ণ দেনাগ্রস্ত। চতুর্দিক হইতে কেবল তাগাদা। ইহার উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হুমকি। এতগুলি সহ্য করিয়া কোন ভদ্রলোক কি থাকিতে পারে?"

উক্তির অর্থ বিশ্লেষণ করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই, তবে আমরা বলিয়াছি ক্লাব গঠনের সময় সকল সভ্যের মধ্যে যেরূপ একতা ও নিষ্ঠা ছিল তাহা আর নাই। দলগুলি, ভাগাভাগি হওয়ায় ক্লাব সর্বপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে সকল ক্রীড়ামোদী ষ্টেডিয়াম গঠনের আশায় ক্লাবের সভ্যভুক্ত হইয়াছিলেন তাহাদের টাকাও গেল, ষ্টেডিয়ামও গঠিত হইল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি ইহা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া গঠন করেন ও এই সকল ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিবেচনা করেন তাহা হইলেই ষ্টেডিয়ামও গঠিত হইতে পারে ও এই সকল ব্যক্তি নব-গঠিত ষ্টেডিয়ামে বসিয়া ষ্টেডিয়াম কমিটির সভ্য হিসাবে খেলা দেখিতে পারেন। তবে এই সময় চিন্তা করিতে হইবে যে এই সকল লোকেদের টাকার কথা যদি এন সি সির জমার খাতায় লিখিত থাকে তবেই ভাল। আর যদি না থাকে তাহা হইলে অন্য কথা।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ

ভারত বনাম রজত জয়ন্তী দলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের সূচনায় ভারত টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করেন। প্রথম দিনের শেষে ভারত ৯ উইকেটে ২২৬ রান করে। এই রান সংখ্যার মধ্যে পলি উমরিগর একাই শতরান করিয়া নট আউট থাকেন। আর বেরী ও জ্যাক আইভারসনের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্য ভারতীয় দলের অধিকাংশ ব্যাটসম্যান অল্প রানে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের সূচনাতেই ভারতের প্রথম ইনিংস ২৩৮ রানে শেষ হয়। উমরিগর ১১২ রান করিয়া আউট হন। পরে রজত জয়ন্তী দল খেলিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৯৯ রান করিতে সক্ষম হন। রজত জয়ন্তী দলের পক্ষে এত অধিক রান করাও সম্ভব হইত না কেবলমাত্র ভারতীয় দলের শোচনীয় ফিল্ডিং ও অধিনায়কের ত্রুটিপূর্ণ বোলিং পরিবর্তনই উহা সম্ভব করে। রজত জয়ন্তী দল ২৪৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেন। এস পি গুপ্তের বোলিং কার্যকারী হওয়ায় অবশিষ্ট ব্যাটসম্যানগণ অল্প রানে আউট হন। ভারত প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। মাত্র ৩০ রানে ৫টি উইকেট হারায়। তখনই

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল খেলার প্রারম্ভে রজতজয়ন্তী ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়-গণের সহিত করমর্দন করিতেছেন

উপলব্ধি করা যায় যে, ভারতীয় দল পরাজিত হইবে। তাহা হইলেও রামচাঁদের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং ও শতাধিক রান করিয়া নট আউট থাকায় ভারত তৃতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনে মাত্র ২৫ মিনিট খেলা চলিবার পরই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯০ রানে শেষ হয়। রামচাঁদ শেষ পর্যন্ত খেলিয়া ১১১ রানে আউট হন। রজত জয়ন্তী দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা খুবই নৈরাশ্যজনক হয়। ৪টি উইকেট ৬৫ রানের মধ্যে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহার পরে মার্শাল ও ওয়ার্টাকিন্সের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের জন্য রজত জয়ন্তী দল জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করিয়া পঞ্চমদিনব্যাপী খেলার মীমাংসা চতুর্থ দিনেই করে ও ছয় উইকেটে বিজয়ী হয়। খেলার ফলাফলঃ—

ভারত ১ম ইনিংসঃ—২৩৮ রান (পি উমরিগর ১১২, অধিকারী ২৪, পি রায় ২১, জি রামচাঁদ ৩৫, আর বেরী ৬১ রানে ৪টি, জ্যাক আইভারসন ৭৮ রানে ৪টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী ১ম ইনিংসঃ—২৪৫ রান (কে মিউলম্যান ৭৫, জি এমেট ৩৯, আর সিম্পসন ২৪, বি বার্নেট ২১, জ্যাক আইভারসন ২০, গোলাম আমেদ ৬৪ রানে ৩টি এস পি গুপ্তে ৯৫ রানে ৬টি উইকেট পান।)

ভারত ২য় ইনিংসঃ—১৯০ রান (জি এঃ রামচাঁদ ১১১, গাদকারী ২৫, পি সেন ১১ পি লোডার ৪৪ রানে ৩টি, জ্যাক আভারসন ৪৭ রানে ৬টি উইকেট পান।)

রজত জয়ন্তী ২য় ইনিংসঃ—৪ উইঃ ১৮ রান (মার্শাল নট আউট ৮৮, ওয়ার্টাকিন্স নটআউট ৫৫, মিউলম্যান ১৭, সুন্দররাম ৩০ রানে ২টি, রামচাঁদ ৭ রানে ১টি ও এস পি গুপ্তে ৭১ রানে ১টি উইকেট পান।)

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী প্রতি টেস্ট খেলায় যেরূপভাবে দল গঠনে অদলবদল করিয়া থাকেন, মাদ্রাজের ভারতীয় চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট দল গঠনে তাহার কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে সকলেই আশ্চর্য হইয়াছেন দলের অধিনায়ক নির্বাচন বিষয়ে। গোলাম আমেদ যিনি কোনদিন কোন ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক দূরের কথা, বিশিষ্ট দল পরি-পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন নাই তাঁহাকে কিরূপে ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হইল ইহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে কোন একজন নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সাফ জবাব দেন "ইহা বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ, ইহার দল গঠন ও অধিনায়ক নির্বাচন কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নহে।" বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ সকলেই জানে, কিন্তু খেলার সময় দর্শকগণের এমন কি সাধারণ ক্রিকেট উৎসাহিগণ পর্যন্ত ইহা স্মরণে রাখিতে পারেন না। তাঁহারা ভারত ও বৈদেশিক দলের প্রতিনিধিমূলক খেলা ধারণা করিয়া খেলার ফলাফলে হয় আনন্দ না হয় ব্যথা অনুভব করিয়া থাকেন। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী এই সকল বেসরকারী টেস্ট খেলার কোন গুরুত্ব আরোপ না করিলেও সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া এত অধিক হয় যে, ভবিষ্যৎ ভারতের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে ইহারা কখনও আশান্বিত কখনও হতাশ হইয়া পড়েন। ইহার ফল কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রিকেট খেলার উন্নতি ও অবনতিতে যথেষ্ট নির্ভর করে। সুতরাং বেসরকারী ও সরকারী যে কোন প্রকারের প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট খেলায় উপযুক্ত দল গঠন করাই যুক্তিসংগত।

চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট দল তৃতীয় টেস্ট দল অপেক্ষা ব্যাটিং ও ফিল্ডিং বিষয় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হইয়াছে ইহা অস্বীকার আমরা করিতে পারি না। সেইজন্য আশা হয় চতুর্থ টেস্টে হয়তো বা ভারতীয় দল জয়ী হইতে পারে। নিম্নে চতুর্থ টেস্ট দলের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল।—

(১) গোলাম আমেদ (হায়দরাবাদ) অধিনায়ক
(২) ডি জি ফাদকার (বাঙলা)
(৩) পি আর উমরিগর (বোম্বাই)
(৪) জি এস রামচাঁদ (বোম্বাই)
(৫) ভি এল মাঞ্জরেকার (বাঙলা)
(৬) পি রায় (বাঙলা)
(৭) সি ডি গোপীনাথ (মাদ্রাজ)
(৮) এস পি গুপ্তে (বাঙলা)
(৯) কে এস শ্রীনিবাসম (উইকেটরক্ষক) (মহীশূর)
(১০) আর বি কেনী (বোম্বাই)
(১১) কৃপাল সিংহ (মাদ্রাজ)

দ্বাদশ ব্যক্তিঃ—সূর্যনারায়ণ (মাদ্রাজ),

অতিরিক্তঃ—পি জি যোশী, অনিল লাম্বকারী, এস জি ধানওয়াড়ে।